

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□□ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (৩ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : [link](#)

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

□□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— “আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।”

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

৭৪ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি

- বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস খিলাফত
- আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ
- চার ইমাম এবং মহান মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের অবদান
- বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস
- বাতিল ফেরকাসমূহের শাসনকাল
- গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন

অভিমত:

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার সাহেব

সংকলন:

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

উস্তাদ, ইসলামের ইতিহাস, জামিয়া আর-রশীদ করাচি

আল-মানহাল পাবলিশার্স

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

বনু মারওয়ানের খলিফাগণ

থেকে

বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পতন পর্যন্ত

৭৩ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি

(৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)

তৃতীয় খণ্ড

গবেষণা:

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, মক্কা টাওয়ার, জোহর ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তাকারিয

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

জামিয়া উলুম ইসলামিয়া

আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিনুরী টাউন

করাচি ৭৪৮০০ - পাকিস্তান

Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences)

Allama Muhammad Yousuf Banuri Town,

Karachi - Pakistan.

সূত্র নং: _____ তারিখ: _____

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক
আম্বিয়া ও মুরসালিনদের সরদার এবং তাঁর সকল পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের ওপর।

আম্মা বাদ:

প্রথাগত জ্ঞানসমূহের মধ্যে ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা
যেমন কঠিন, তেমনি এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার সুযোগও কম। এর দুটি মৌলিক কারণ
রয়েছে: প্রথমত, ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো সাধারণত সেই সতর্কতা ও সাবধানতার মর্যাদা
থেকে বঞ্চিত থাকে যা সাধারণত হাদিসের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক
বর্ণনায় ঐতিহাসিকগণ ব্যক্তিগত প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে খুব কমই মুক্ত থাকতে
পারেন। তাই বাহবিচারহীনভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য মনে
করে কোনো মতবাদ বা চিন্তা লালন করা সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতির রূপ নেয়। এজন্য
ইতিহাসের শিক্ষার্থীর জন্য ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে অন্তত তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি:

- ১. ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে ইতিহাসের এমন কিছু মূলনীতি জানা প্রয়োজন যাতে উম্মতে
মুসলিমার স্বীকৃত চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিগুলোর বর্ণনা থাকে; যাকে আপনি
ইতিহাস অধ্যয়নের মৌলিক নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় আদব হিসেবেও অভিহিত করতে
পারেন।
- ২. ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য উৎস, লেখক, তাদের
মেজাজ এবং অসতর্ক ঐতিহাসিকদের সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা উচিত।
- ৩. অনেক সময় প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের প্রসিদ্ধ উৎসগুলোতেও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা
পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তাই ঐতিহাসিক উৎসগুলোর গুণাগুণ ও ত্রুটি উভয় বিষয়ে
নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত সম্পর্কে অবগত হওয়াও জরুরি।

ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য এই উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিষয়গুলো ইতিহাসের কিতাবসমূহে
বা এ সংক্রান্ত আলোচনায় একত্রে, সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে খুব কমই পাওয়া যায়।
তবে আল্লাহর মেহেরবানি যে, তাওফিকপ্রাপ্ত আলেমদের থেকে কোনো যুগই শূন্য থাকে
না। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় “তারিখে উম্মতে মুসলিমা” নামে একটি সংকলন আমাদের
সামনে এসেছে যাতে উপরোক্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অধিকন্তু (যতটুকু আমি দেখেছি) এই সংকলনটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা, চিন্তা ও ঝোঁকের
ক্ষেত্রে ভারসাম্য, চমৎকার বিন্যাস এবং প্রকাশের উৎকর্ষের দিক থেকে একটি অনন্য
ও মানসন্মত প্রচেষ্টা। আশা করা যায় এই সংকলনটি সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য
সমানভাবে উপকারী হবে। ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণ কবুলিয়ত ও ব্যাপক
জনপ্রিয়তা দান করেন। আমিন, ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।

ওয়াসাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামা আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি
আজমাইন।

ফাকাত ওয়াসসালাম

আল-আব্দ আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার

(মাওলানা ডাক্তার) আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার

মুহতামিম, জামিয়া উলুম ইসলামিয়া আল্লামা বিনুরী টাউন, করাচি।

প্রশংসাসমূহ | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

হযরত মাওলানা ডক্টর মনজুর আহমদ মেঙ্গল সাহেব

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু আলা নাবিয়্যিহি

আম্মা বাদ!

নিশ্চয়ই আজ মুসলিম উম্মাহ বাহ্যিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং দিন দিন মুক্তির পথ ও চিরস্থায়ী আবাস থেকে দূরে সরে গিয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। যার সবচেয়ে বড় কারণ যেমন কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও আমল থেকে দূরত্ব, তেমনি নিজেদের আকাবির ও আসলাফের বীরত্বগাথা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাও বটে; যা কোনো বড় দুঃটনা এবং দুরারোগ্য সংক্রামক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির চেয়ে কম নয়।

তদুপরি যদি কোনো ব্যক্তি ইতিহাসের প্রতি কিছুটা আগ্রহ রাখেও, তবে তাকে এমন ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয় যা তার মনে আসলাফদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করে। আর এই তথাকথিত ইসলামি ইতিহাস ইসলামের প্রতিরক্ষার পরিবর্তে ইসলামের দুর্গে ফাটল ধরানোর কাজ করে। বরং এর চেয়েও বড় কথা হলো, নাউযুবিল্লাহ, ইসলামি ইতিহাসে এমন সব মনগড়া ইসরায়েলি বর্ণনা রয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এমন সব বর্ণনা থেকে আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মতো নিষ্পাপ সত্তারাও রেহাই পাননি।

এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে ইসলামি ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে আমরা জানতে পারি যে উম্মাহর ওপর পরিস্থিতির কঠোরতা ও অবনতি, বাহ্যিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, পারস্পরিক অনৈক্য ও বিবাদ এবং ইসলামবিদ্বেষীদের হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এবং এগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধের বিষয়ে ইসলাম কী বলে এবং এ ব্যাপারে আমাদের আকাবির ও আসলাফদের কর্মপন্থা কী ছিল। এই সবকিছুই আমাদের জন্য ইসলামের ইতিহাস থেকেই জানা সম্ভব, যার জন্য সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং আজোবাজে কথা মুক্ত কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামি ইতিহাসের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ছিল।

যার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.), উস্তাদ, ইসলামি ইতিহাস বিভাগ, জামিয়াতুর রশীদ করাচি—যিনি অনেকগুলো কিতাবের লেখকও বটে—মাশাআল্লাহ অনেক চমৎকার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যা অধর্মের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে এবং মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে সাধারণভাবে প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য।

আল্লাহ তাআলা জনাবের এই প্রচেষ্টাকে উভয় জগতে নাজাত ও উন্নতির উসিলা করুন এবং পাঠকদের জন্য ব্যাপক উপকারের মাধ্যম বানান।

মনজুর আহমদ

প্রশংসা

“তারীখে উম্মতে মুসলিমা”-এর জন্য কাব্যিক প্রশংসা

পক্ষ থেকে: শায়েরে ইসলাম, হযরত আসর জৌনপুরী মদদাজিল্লুহল আলী

প্রচেষ্টা, সংকল্প ও অবিচলতার দ্বার যখন উন্মোচিত হলো

একজন ঐতিহাসিক পুনরায় প্রাণপণ কোমর বেঁধে নামলেন

সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতকে এক অমূল্য উপহার দিয়ে গেলেন
কাগজ ও কলম নিজেরাই অবাক হয়ে রইল, কী আর বলব

চিন্তার উড্ডয়ন মঙ্গল গ্রহের উচ্চতায় পৌঁছে গেল

তর্ক-বিতর্কের কাঁটাগুলো হার মেনে অস্ত্র ত্যাগ করল

অতীতের স্মৃতির শহরকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন

একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি মাওলা মেহেরবান হলেন

বহরের পর বহর সাধনা অবশেষে শান-শওকতের সাথে রঙ নিয়ে এলো

সেই যুবক এমন যে বৃদ্ধদের থেকেও বাজি জিতে নিলেন

এমন এক কীর্তি সমাপ্তি পেল, কী আর বলব

যখন তিনি ইতিহাসের পাখির ওপর কলম ধরলেন

এভাবেই ইসমাইল ইলমের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলেন

যেন মুসলমানদের সামনে একটি আয়না এনে রাখলেন

প্রশংসা

“তারীখে উম্মতে মুসলিমা”

যাতে সকল ঈমানদার ব্যক্তি এতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়

কীভাবে মুসিবতসমূহ সহজ হয়ে যায়, তা দেখতে পায়

সাইয়েদুল আবরার ﷺ কীভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন

আমার সরকার ﷺ কীভাবে দ্বীনের পতাকা উড়িয়েছেন

কোন অন্ধকারে হেদায়েতের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে

সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে নিজেদের রক্ত দিয়ে দ্বীনের বাগান সিঞ্চন করেছেন

একদিকে সুরাইয়া নক্ষত্রের উচ্চতার মহিমাম্বিত দৃশ্য

অন্যদিকে পাতালের প্রাণঘাতী কণ্টকাকীর্ণ পথ

একদিকে আত্মত্যাগ, তাকওয়া এবং অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব

অন্যদিকে গোঁড়ামি, লোভ-লালসা এবং সম্পদের মোহ

প্রথম শ্রেণিটি দুনিয়া ও দ্বীনের নেয়ামতের হকদার

দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো কেন্দ্র বা অক্ষ নেই

হে খোদা! প্রভাব বিস্তারকারী আহাজারির ওপর প্রভাবের দ্বার খুলে দাও

বেঁচে থাকতেই যেন প্রভাবের স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবায়িত হয়

ইসলামের শৌর্য-বীর্যের সেই স্বর্ণযুগ আবারও দেখিয়ে দাও

পৃথিবীতে আবারও যেন তোমার নামের ডঙ্কা বেজে ওঠে

ইসমাইল রেহানের প্রচেষ্টাকে হে খোদা কবুল করো

ইখলাসের কুঁড়িকে জাম্নাতুল ফেরদাউসের ফুলে পরিণত করো

সূচিপত্র

পাঠকদের প্রতি কিছু কথা ৩৫

প্রথম অধ্যায়: বনু মারওয়ানের খিলাফত ৩৮

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ৩৯

আবদুল মালিক - খলিফা নাকি বাদশাহ? ৩৯

বনু মারওয়ানের রাজনীতি ৪১

বনু মারওয়ানের ইশতেহার ৪১

ক্ষমতা হস্তান্তরের সুসংহত সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ৪২

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থবিরতার মূল কারণ ৪৩

আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং এর নেপথ্যের সম্ভাবনাগুলো ৪৩

৪৩

হাজ্জাজ কি আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করিয়েছিলেন? ৪৫

খারেজীদের বিদ্রোহ ৪৬

কুফায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভয়াবহ ভাষণ ৪৭

উমাইর বিন জাবি-র মৃত্যুদণ্ড ৪৮

খারেজী কাতারি বিন ফুজাআ-র দমন ৪৯

খারেজী শাবিবের সাথে যুদ্ধ ৫০

একজন খারেজী নারীর সাহসিকতা ৫০

জিহাদের পুনর্জাগরণ আফ্রিকার বিজয়সমূহ ৫২

জুবাইর বিন কাইসের শাহাদাত ৫২

হাসান বিন নুমানের কীর্তিসমূহ ৫২

আবদুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহ ৫৪

বিদ্রোহের কারণসমূহ ৫৪

প্রথম যুদ্ধ হাজ্জাজের পরাজয় ৫৬

দাইরুল জামাজিমের যুদ্ধক্ষেত্র ৫৬

চূড়ান্ত যুদ্ধ, ইবনে আশআসের পরাজয় এবং হাজ্জাজের প্রতিশোধ ৫৭

কুমাইল বিন জিয়াদের হত্যাকাণ্ড ৫৮

কুররা ও উলামায়ে কেরাম যারা নিহত হয়েছেন বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ৫৯

ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহর সাথে আচরণ ৬০

দাইরুল জামাজিমের স্বাধীনতাকামীরা একনিষ্ঠ ছিলেন ৬০

তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ফুকাহায়ে কেরামের সিয়াসাতে শারঈয়াহ নিয়ে নতুন করে চিন্তা-

ভাবনা ৬১

বিদ্রোহ কোন শর্তে বৈধ হবে ৬৩

ছেলেদের জন্য উত্তরাধিকারের বাইয়াত ৬৪

সাইদ বিন মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা ৬৪

আবদুল মালিকের মৃত্যু ৬৫

সন্তানসন্ততি ৬৬

আবদুল মালিকের জীবনের ওপর একটি পর্যালোচনা ৬৭

অবয়ব এবং ইলম ও ফযীলত ৬৮

হাস্যরসিকতা... একটি কৌতুক ৬৯

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৬৯

দামেস্কের মিথ্যাবাদীর দমন ৬৯

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ৭১

ইসলামী মুদ্রা প্রচলন ৭১

দাপ্তরিক ব্যবস্থা আরবি ভাষায় রূপান্তর করা ৭১

নতুন শহরসমূহ ৭২

হারামাইনের খিদমত ৭৩

বাইতুল মুকাদ্দাসের খিদমত ৭৩

মসজিদ নির্মাণ ৭৩

রাজনীতির ধরণ ৭৩

বড়দের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় লক্ষণীয় ৭৪

সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি ৭৪

হৃদয়ের কোমলতা ৭৫

সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে ইযামের প্রতি সম্মান ৭৫

সত্যবাদিতার মূল্যায়ন ৭৬

হারাম ও হালালের খেয়াল ৭৭

সারকথা ৭৭

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ৭৮

একটি কৌতুক ৭৮

কুতাইবা বিন মুসলিম আল-বাহিলীর বিজয়সমূহ ৮০

চীনের খাকানের সাহায্যকারী বাহিনীর সাথে মোকাবিলা ৮১

বুখারা বিজয় ৮১

কুতাইবা বিন মুসলিম খোরাসানে ৮২

খাওয়ারিজম বিজয় ৮৩

সমরকন্দ বিজয় ৮৩

চীনের সীমান্তে ৮৫

আন্দালুস বিজয় ৮৭

আন্দালুসের অবস্থান ও ভূগোল ৮৭

ইসলামের পূর্বে আন্দালুসের ইতিহাস ৮৭

আন্দালুসে সাহাবায়ে কিরামের অভিযান ৮৮

মুসা বিন নুসাইর, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাহচর্য ৮৮

থেকে মরক্কোর গভর্নর হওয়া পর্যন্ত ৮৮

তারিক বিন যিয়াদ: দাসত্ব থেকে তানজার শাসন পর্যন্ত ৮৯

কাউন্ট জুলিয়ান এবং ফ্লোরিভা ৯০

অদৃশ্য সুসংবাদ ৯১

প্রতিটি দেশই আমাদের দেশ ৯১

বারো হাজার বনাম এক লক্ষ ৯২

তারিক বিন যিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণ ৯৩

ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধ ৯৪

দক্ষিণ ও মধ্য আন্দালুস বিজয় ৯৬

মুসা বিন নুসাইর (রা.)-এর আগমন এবং এর প্রকৃত কারণসমূহ ৯৭

মুসা বিন নুসাইর (রা.)-এর তুফানি বিজয়সমূহ ৯৭

মুসা বিন নুসাইর এবং তারিকের সাক্ষাৎ ৯৮

অন্ধকার সমুদ্রে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি ৯৮

উত্তর আন্দালুস বিজয় ৯৯

উপমহাদেশে মুসলিমদের বিজয়ের সূচনা

উপমহাদেশের জাতিসমূহ ১০০

উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ ১০০

আরব নারীদের কাফেলার ওপর দাহিরের সৈন্যদের আক্রমণ ১০০

উবাইদুল্লাহ বিন নাবহান এবং বুদাইল বিন তুহফাহ সিন্ধুতে ১০১

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্বাচন ১০২

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স... একটি ভুল ধারণার নিরসন ১০৩

সৈন্য অভিযানের প্রস্তুতি এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সূক্ষ্মদর্শিতা ১০৪

সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রথম পদক্ষেপ। দেবল অবরোধ ১০৫

দেবল বিজয় ১০৬

মেহরান উপত্যকার পূর্ব অংশ বিজয় ১০৭

সিন্ধু নদ পার হওয়া ১০৮

রাজা দাহিরের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ ১০৮

আরব নারীদের উদ্ধার ১১০

ব্রাহ্মণাবাদ বিজয় ১১১

অরোর-এর যুদ্ধ ১১১

মুলতান বিজয় ১১২

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু ১১২

সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর হত্যাকাণ্ড ১১৪

সত্য কথা বলা প্রশংসনীয় ১১৪

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ ১১৭

হাজ্জাজের রক্তপাত ১১৮

দুর্বল বর্ণনায় হাজ্জাজের জুলুমসমূহ ১১৮

হাজ্জাজের বাড়াবাড়ির প্রমাণ, সহিহ বর্ণনা থেকে ১২০

সহিহ বর্ণনায় হাজ্জাজের কিছু গুণাবলি ১২০

সহিহ বর্ণনায় হাজ্জাজের জুলুমপূর্ণ ইজতিহাদ এবং মন্দ সিদ্ধান্তসমূহ ১২২

দুর্বল বর্ণনায় হাজ্জাজের কিছু গুণ ও নেক কাজসমূহ ১২৩

এক বৃদ্ধের গালি শুনে ক্ষমা করে দেওয়া ১২৪

দোষ স্বীকার করা ১২৪

হাজ্জাজের চরিত্রের সারসংক্ষেপ। হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.)-এর ভাষায় ১২৫

শেষ মুহূর্তে হাজ্জাজের কথাগুলো ১২৫

ওয়ালিদের নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

দামেস্কের জামে মসজিদ নির্মাণ ১২৬

দামেস্কের জামে মসজিদের ওপর অমুসলিম দূতের মন্তব্য ১২৬

মসজিদে নববীর নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ১২৮

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু ১২৮

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক

বনু মারওয়ানের আমিরদের মধ্যে দলাদলি ১২৯

উমর বিন আব্দুল আজিজ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মধ্যে দ্বন্দ্ব ১৩০

ওয়ালিদ ও সুলাইমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ১৩১

সুলাইমান কেন ওয়ালিদের সেনাপতিদের বরখাস্ত করেছিলেন? ১৩১

কুতাইবা বিন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড ১৩২

মুহাম্মদ বিন কাসিমের হত্যাকাণ্ডের ট্র্যাজেডি ১৩৩

মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর সাথে আচরণ ১৩৫

মুসা বিন নুসাইরের মৃত্যু ১৩৬

তারিক বিন জিয়াদের নির্জনবাস ১৩৭

সেনাপতিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ভূমিকা ১৩৭

আন্দালুসের নায়েব শাসক আব্দুল আজিজের হত্যাকাণ্ড ১৩৮

সুলাইমানের আমলের সংস্কারসমূহ ১৩৮

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের আমলের বিজয়সমূহ ১৩৯

তাবারস্তান বিজয় ১৩৯

কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) অবরোধ ১৪০

সুলাইমানের ইনসাফ ও মৃত্যু ১৪২

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-কে উত্তরসূরি হিসেবে মনোনয়ন ১৪৪

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের আমলের ওপর এক নজর ১৪৬

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. ১৪৬

উমর বিন খাত্তাব রা.-এর প্রপৌত্র ১৪৭

শিক্ষা ও লালন-পালন ১৪৮

গভর্নর থাকাকালীন সময়ে ১৪৯

জুলুমের কারণে বিতৃষ্ণা এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ১৫০

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দরবারে উমর বিন আব্দুল আজিজ ১৫০

উমর বিন আব্দুল আজিজ এবং সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের সম্পর্ক ১৫২

উমর সানির খিলাফতকাল ১৫৪

তিনটি তাৎক্ষণিক নির্দেশ ১৫৪

সরকারি প্রটোকল গ্রহণে অস্বীকৃতি ১৫৫

পূর্ববর্তী খলিফার আসবাবপত্র নতুন খলিফার মালিকানাধীন হওয়ার প্রথা বিলোপ ১৫৫

প্রথার অবসান ১৫৬

উমর সানির খিলাফতের পূর্বে প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রটিসমূহ ১৫৭

সেই আমলের সরকার ও সমাজে কী ধরনের ক্রটি ছিল? ১৫৮

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার আমলের ওপর এক নজর ১৫৯

শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও মনগড়া আচরণ ১৫৯

সেনাপতিদের সীমাহীন ক্ষমতা ১৫৯

হযরত আলী এবং হযরত হুসাইন রা.-এর অবমাননা ও মর্যাদাহানি ১৬১

মদিনা মুনাওয়ারার অবমূল্যায়ন ১৬২

বাইতুল মালে অপচয়, উপদেশে ক্ষুব্ধ হওয়া ১৬২

ইবাদতে বিদআতসমূহ ১৬৩

জুমার নামাজে বিলম্ব ১৬৩

সরকারি আনুগত্য ফরজে আইন ১৬৫

জাগির বা ভূসম্পত্তির প্রতিযোগিতা, স্বজনপ্রীতি এবং বিলাসিতা ১৬৫

সমাজে সৃষ্ট ব্যাধিসমূহ ১৬৬

একটি আদর্শ সরকারের আবির্ভাব ঘটে ১৬৮

নেতৃত্ব জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল ১৬৮

সংস্কারের সূচনা নিজের ঘর ও পরিবার থেকে ১৬৯

রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ সুবিধাসমূহের অবসান ১৭০

অবৈধ সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া ১৭০

নিজের এবং নিজের স্ত্রীর আংটিও বাইতুল মালে ১৭০

আমীরদের জবাবদিহিতা ১৭১

শাহজাদাকেও ছাড় দেওয়া হয়নি ১৭১

ফাদাক সমস্যা ১৭১

পরিবারের চাপ প্রত্যাখ্যান ১৭২

বন্ধুর খাতির না করা ১৭৩

ফুফুর আবেদন প্রত্যাখ্যান ১৭৩

উমর বিন আব্দুল আজিজের সংস্কারসমূহ ১৭৪

অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে উসওয়ায়ে হাসানা ১৭৪

খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা ১৭৪

তদন্তে নির্যাতনের প্রবণতা এবং এর ক্ষয়ক্ষতি ১৭৫

উমর বিন আব্দুল আজিজ কর্তৃক দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে উসওয়ায়ে হাসানা অনুযায়ী
মধ্যপন্থা ১৭৫

রাসূলের অবমাননাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না
..... ১৭৬

জালেম কর্মকর্তাদের হিসাব গ্রহণ ও পাকড়াও ১৭৭

সরকারি ভীতির অবসান ১৭৭

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর আস্থা ১৭৭

জিম্মি ও মাওয়ালিদের প্রতি দয়া ১৭৭

মাওয়ালিদের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের প্রতি তাগিদপূর্ণ পত্র ১৭৯

সরকারের লক্ষ্যসমূহের উচ্চতা ১৮০

আমরা লাঙল চালিয়ে নিজেদের পেট ভরব ১৮০

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পথপ্রদর্শক, কর আদায়কারী নন ১৮০

কর তুলে দেওয়া হলো ১৮০

শুল্ক কেন্দ্র বিলুপ্তি ১৮১

উৎসবগুলোতে কর্মকর্তাদের উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ ১৮১

শাসক পরিবারের ব্যবসায় অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ১৮১

প্রাণীদের অধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ ১৮১

খলিফার সাধারণ ও জাহিদানা জীবন ১৮১

ঘরে পেঁয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ১৮২

হজের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-অনটন ১৮২

যাও তুমি মুক্ত ১৮২

পোশাকে সাদাসিধে ভাব ১৮২

এক জোড়া পোশাকে দিনাতিপাত ১৮৩

নিজের কাজ নিজের হাতে করা ১৮৩

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা ১৮৩

বাইতুল মালের চুলায় নিজের জন্য পানি গরম করা থেকে বিরত থাকা ১৮৩

ব্যক্তিগত কাজে সরকারি বাহন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ১৮৪

অন্যদের যুহদ ও অল্পে তুষ্টির শিক্ষা ১৮৪

আপনার দাপ্তরিক জীবনের একটি দৃশ্য ১৮৫

ক্ষমতার অলিন্দে আদর্শিক ও ব্যবহারিক সংস্কারের প্রচেষ্টা ১৮৬

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের তাগিদ ১৮৬

পাপকাজ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ১৮৬

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মতপার্থক্য এবং ফিরকাবন্দি ১৮৬

মুহাদ্দিসগণ হযরত আলী এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.) সম্পর্কে মতামত সংশোধন করে দিয়েছেন	১৮৭
নিজেদের জিহ্বাকে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কলুষিত করবেন না	১৮৭
সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণ চোখের মতো	১৮৮
খুতবায় হযরত আলী (রাযি.)-এর ওপর সমালোচনার নিষেধাজ্ঞা	১৮৮
পূর্ববর্তী খলিফাদের বর্ণনায় সতর্কতা	১৮৯
সুন্নতে নববীর প্রচার ও প্রসার	১৮৯
মাগাযী, সীরাতে নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের মানাকিব (মর্যাদা) পাঠের সূচনা	১৮৯
উলামায়ে কেরামের জন্য ভাতা	১৯০
দ্বীনের তাবলীগ	১৯০
গোত্রীয় গোঁড়ামি দূর করার চিন্তা	১৯০
চরিত্রের নির্ঘাস... আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের চিন্তা	১৯১
দাবিকের রাতগুলো এবং জাহান্নামের ভয়	১৯২
মৃত্যুর পর আমাকে দেখা	১৯২
ছুটি নিলে কাজ বেড়ে যাবে	১৯২
জান্নাত ছাড়া আর কিছুই চাই না	১৯২
অশ্রুতে চুল্লি নিভে গেল	১৯২
চিন্তার চরম সীমা	১৯৩
সুহাইল, আব্দুল মালিক এবং মুযাহিম... বিশেষ সহযোগীগণ	১৯৩
খিলাফতকে শূরা ভিত্তিক পদ্ধতিতে নেওয়ার চিন্তা এবং বনু মারওয়ানের বিরোধিতা	১৯৪
খিলাফতের যোগ্য: কাসেম বিন মুহাম্মদ	১৯৫
সহযোগীদের ইন্তেকাল	১৯৫
শেষ খুতবা এবং মানুষের প্রতি অনীহা	১৯৬
খারেজীদের সাথে মুনাজারা (বিতর্ক) এবং আপনার অবকাশ প্রার্থনা	১৯৬
শেষ দিনগুলো এবং ওফাতের বিয়োগান্তক ঘটনা	১৯৯
শেষ মুহূর্তগুলো এবং সন্তানদের প্রতি ওসিয়ত	১৯৯
সমাজে উমর সানি (দ্বিতীয় উমর)-এর সংস্কারের প্রভাব	২০১
অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সমাপ্ত	২০১
যাকাত গ্রহণের লোক দুপ্রাপ্য হয়ে গেল	২০১
ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল	২০১
মানুষের মেজাজ ও প্রবণতায় পরিবর্তন	২০২
কেন বহিঃশত্রু বিজয় হয়নি?	২০২
রোম সম্রাটও আপনার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ	২০২
উন্নয়নমূলক কাজ	২০৩
ঋণ মুক্তি	২০৪
সরকারি আয় বৃদ্ধি পেল	২০৪
উমর বিন আব্দুল আজিজের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা, একটি চিন্তার বিষয়	২০৪
এক জায়গায় কেঁদে পুরো দুনিয়ায় প্রভাব!!	২০৫
সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার দুটি বৈশিষ্ট্য	২০৫
উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পর	২০৬
ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক (ইয়াজিদ সানি)	২০৯
অভ্যন্তরীণ বিপদসমূহ	২০৯
বৈদেশিক অভিযান... ফ্রান্সে আক্রমণ	২১০
সীরাত ও চরিত্র	২১১
হিশাম বিন আব্দুল মালিক	২১২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সিন্ধু জিহাদ ২১২

সিন্ধুতে ইসলামী কেন্দ্র “মানসুরা” নির্মাণ ২১২

তুর্কিস্তান অভিযানসমূহ ২১৩

জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার জিহাদ ২১৮

রোমানদের সাথে যুদ্ধ ২১৯

বারবারদের বিদ্রোহ ২২০

ফ্রান্স জিহাদ ২২২

আন্দালুসের স্থিতিশীলতা ও উন্নতি ২২৪

আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক গোত্রপ্রীতির বৃদ্ধি ২২৪

উপদলীয় কোন্দল ও গোত্রপ্রীতির প্রকৃত সমাধান ২২৫

যায়েদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিদ্রোহ ও শাহাদাত ২২৫

মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল ২২৫

হিশাম বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু ২২৬

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ২২৬

জুমার নামাজে উপস্থিত না হওয়ায় শাহজাদাকে তিরস্কার ২২৬

সঙ্গীত থেকে বিরত থাকা - একটি কৌতুক ২২৭

জিহাদের উদ্দীপনা ২২৭

বুজুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ২২৭

সেরা অডিট সিস্টেম ২২৮

সারকথা ২২৮

ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক (ওয়ালিদ সানি) ২২৯

হিশামের ভুল ২২৯

ওয়ালিদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি - যোগ্য আমিরদের অপসারণ ২৩০

আরব গোত্রপ্রীতির প্রসার ২৩১

ওয়ালিদ সানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ২৩১

ওয়ালিদ সানি সম্পর্কিত সন্দেহজনক বর্ণনা ২৩২

ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক (ইয়াজিদ সালেস) ২৩৪

ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ২৩৬

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান (মারওয়ান সানি) ২৩৭

বনু হাশিমের দাওয়াতের ইতিবৃত্ত - কিছু মৌলিক কথা ২৩৯

বনু হাশিমের বিপ্লবী দাওয়াত ২৪১

বিদ্রোহের কারণসমূহ ২৪২

শিয়ানে আলী তিন দলে বিভক্ত ২৪৩

শিয়ানে আলী যায়েদ বিন আলীকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে ২৪৪

শুভাকাঙ্ক্ষীরা যায়েদ বিন আলীকে নিষেধ করেছিলেন ২৪৪

যায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহ ও শাহাদাত ২৪৫

যায়েদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতে খলিফা হিশামের দুঃখ ২৪৫

উম্মতের আলেমদের দৃষ্টিতে যায়েদ বিন আলীর মর্যাদা ২৪৫

বনু হাশিমের বুজুর্গরা কি ইমামতের আকিদার কারণে বিদ্রোহ করতেন? ২৪৬

খিলাফত ও ইমামত সম্পর্কে হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা

চিত্তাধারা ২৪৭

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতের আকিদা সৈন্যরা ছড়িয়েছিল ২৪৮

হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি ২৪৯

হযরত মুহাম্মদ বাকির রাযিয়াল্লাহু আনহুর আকিদা ২৪৯

হযরত জাফর সাদিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ২৫০

সূচিপত্র

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া এবং বনু আব্বাসের মুরুব্বীদের রাজনৈতিক অবস্থান	২৫১
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা	২৫২
মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পুত্র আবদুল্লাহ আবু হাশিম	২৫৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	২৫৪
বনু হাশিমের অধিকাংশ মুরুব্বীর রাজনৈতিক অবস্থান	২৫৪
আবদুল্লাহ আবু হাশিম এবং মুহাম্মদ বিন আলী কেন আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন?	২৫৫
ইমাম জয়নুল আবেদীন রা.-এর শানে ফারাজদাকের অবিস্মরণীয় তাৎক্ষণিক কাসিদা	২৫৫
সাদাতগণ কেন জনগণের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশা করেছিলেন?	২৫৭
মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসী-এর আন্দোলন	২৫৭
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ও কাঠামো	২৫৭
খুরাসানকে কেন দাওয়াতের ময়দান বানানো হয়েছিল?	২৫৮
কেন্দ্রের জন্য কেন ইরাককে পছন্দ করা হয়েছিল?	২৫৮
ইরাক ও খুরাসানের মানুষের আব্বাসী আন্দোলনে আগ্রহের কারণ	২৫৮
বনু ফাতিমাকে অন্তর্ভুক্ত করতেও সাফল্য	২৫৯
হিশাম বিন আবদুল মালিকের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন আলীর প্রতি শিথিলতা	২৫৯
মুহাম্মদ বিন আলীর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা	২৬০
আন্দোলনের খাতিরে আকিদা ও মতাদর্শে শিথিলতা ও অস্পষ্টতার নীতি	২৬০
রাজনৈতিক স্বার্থে দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতার ভয়াবহ পরিণতি	২৬১
কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আব্বাসী দাঁড়দের ধরপাকড়	২৬১
মুহাম্মদ বিন আলীর মৃত্যু এবং ইবরাহিমের স্থলাভিষিক্ত হওয়া	২৬১
আবু মুসলিম খুরাসানী	২৬২
ইয়ামানি ও মুদারি গোত্রীয় বিদ্বেষ চরমে, মসজিদে মিস্বর আলাদা আলাদা	২৬৩
গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে খুরাসানে সরকারি বাহিনীগুলোর পারস্পরিক যুদ্ধ	২৬৪
আব্বাসী ইমাম ইবরাহিমের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড	২৬৫
আবুল আব্বাস সাফফাহ-এর আবির্ভাব	২৬৬
মারওয়ান বিন মুহাম্মদের অভিযান এবং শোচনীয় পরাজয়	২৬৭
দামেস্কের ওপর আব্বাসীদের দখল এবং উমাইয়া শাহজাদাদের গণহত্যা	২৬৮
মারওয়ান বিন মুহাম্মদের পরিণতি	২৬৮
উম্মতের সুলতানদের দৃষ্টিতে শেষ উমাইয়া খলিফা	২৬৯
বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ানের যুগের ওপর এক নজর	২৭০
উমাইয়া রাষ্ট্রের (বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ান) পতনের কারণসমূহ	২৭২
বনু আব্বাসের সাফল্যের কারণসমূহ	২৭৩
বনু আব্বাসের দ্বীন ও আকিদা	২৭৪
উমাইয়া যুগ ও জুবাইরি খিলাফতের সারণি - শুরু ও শেষ	২৭৪
উমাইয়া যুগ (বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ান) ও জুবাইরি খিলাফতের সারণি - পরিস্থিতি ও বিপ্লবসমূহ	২৭৫
উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাসে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ভূমিকা	২৭৭
উম্মতে মুসলিমাহর একটি বৈশিষ্ট্য	২৭৮

দ্বীনি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভাজন ২৭৯

রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান ২৮১

দ্বীনি নেতৃত্ব সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান ২৮১

শাসকদের দ্বীনি নেতৃত্বের সাথে আচরণের ধরন ২৮২

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ. ২৮৪

জন্ম... জ্ঞান অর্জন ২৮৪

মদিনার মুফতি ২৮৪

স্মৃতিশক্তির চমৎকারিত্ব এবং বিনয়ের চরম সীমা ২৮৫

শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা ২৮৫

হাররার ঘটনা ২৮৫

আবদুল মালিক এবং সাঈদ বিন মুসাইয়িব ২৮৫

সরকারি রোযানলের সম্মুখীন হওয়া ২৮৬

কন্যার জন্য রাজপুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ২৮৮

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতার বিষয় ২৯০

নামাজ সংশোধন করে দেওয়ায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ২৯০

স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা ২৯০

তাকওয়া, আত্ম-সমালোচনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ ২৯১

হালাল উপার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ ২৯১

আসল ইবাদত হলো মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ২৯২

তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন ২৯২

ওফাত ২৯২

হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. ২৯৩

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২৯৩

ইলমি মাকাম ২৯৩

ইবাদত ও রিয়াযত ২৯৪

বিদ্রোহে অংশগ্রহণ এবং মৃত্যুদণ্ড ২৯৫

ইমাম আমির বিন শাহাহিল শাবি রহ. ২৯৬

ইলমি মাকাম ২৯৬

পরিশ্রম ও সাধনা... স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ২৯৬

চরিত্র ও মেজাজ ২৯৭

হাদিস ও আকিদা সংরক্ষণে শাবি রহ.-এর অসাধারণ প্রচেষ্টা ২৯৭

রাফেজিদের চেনার উপায়... শাবি রহ.-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টির কারিশমা ২৯৯

সরকারি মহলে শাবি রহ.-এর অবস্থান ৩০০

বিদ্রোহে অংশগ্রহণ, আত্মগোপন এবং নির্বাসন ৩০১

ওফাত ৩০২

হযরত হাসান বসরি বিন ইয়াসার রহ. ৩০৩

বংশ ও বংশপরিচয় ৩০৩

যৌবনকাল এবং জ্ঞান অর্জন ৩০৩

মুসলিম বিশ্বে তাঁর অবস্থান ৩০৪

চরিত্র ও কর্ম ৩০৫

বাকপটুতা এবং দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা ৩০৫

বস্তুবাদ ও অর্থের লালসার নিন্দা ৩০৫

আখেরাতের চিন্তার গুরুত্বারোপ ৩০৬

মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা ৩০৬

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তওবার ওপর গুরুত্বারোপ ৩০৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ৩০৭

ফরজদকের তওবা ৩০৭

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ওপর গুরুত্বারোপ ৩০৮

নিফাক সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ৩১০

মানুষের তিন প্রকার ৩১০

সুখভোগী মুনাফিক এবং ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদালোভী মুনাফিক ৩১১

শাসকদের মধ্যে নিফাকের ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত ৩১১

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য ৩১১

আহলে ইলমদের জন্য আত্মশুদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ ৩১২

আহলে ইলমদের দুনিয়াপ্রীতির ওপর দুঃখ প্রকাশ ৩১২

অভ্যন্তরীণ ব্যাধি নিরাময়ের বিশেষ মজলিস ৩১২

নির্ভীক সত্যবাদিতা ৩১৩

জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে সঠিক কৌশল ৩১৩

জীবনের শেষ সময়ে শাসকদের নিকট আপনার মর্যাদা ও অবস্থান ৩১৩

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর নামে ঐতিহাসিক পত্র — ইমামে আদিলের গুণাবলি ৩১৪

ওফাত ৩১৬

তাঁর ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা ৩১৬

হযরত মুহাম্মদ বিন সিরিন রহ. ৩১৮

বংশপরিচয়, শৈশব ও ইলম অর্জনের সময়কাল ৩১৮

ইলমি যোগ্যতা ৩১৮

উসূলে হাদিস সংকলন ৩১৯

তাকওয়া ও পরহেজগারি ৩১৯

অবৈধ মুনাফা থেকে বাঁচতে মূল পুঁজি নষ্ট করে দেওয়া ৩১৯

শাস্তি সহ্য করা — সরকারের সাথে খিয়ানত অসহনীয় ৩২০

নিজের কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা ৩২০

সদাচার ও সুন্দর পোশাক পরিধান ৩২০

শাসকদের থেকে বিচ্ছিন্নতা ৩২১

ইলমে তাবিরের ইমাম ৩২১

দুঃখজনক ওফাত ৩২২

সন্তানদের প্রতি শেষ ওসিয়ত ৩২২

ইসলামি বিশ্বে ধর্মীয় মতভেদ এবং উন্মত্তের আলেমদের ভূমিকা ৩২৩

(১) শিয়া ৩২৫

(২) নাওয়াসিব ৩২৮

সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি: হাদিস অস্বীকার বা জাল হাদিস তৈরি ৩২৮

(৩) খারেজি ৩২৮

খারেজিদের প্রধান উপদলসমূহ ৩২৯

নাজদিয়া ৩২৯

আজারিকা ৩২৯

ইবাদিয়া ৩৩০

(৪) মুরজিয়া ৩৩০

(৫) মুতাজিলা ৩৩২

(৬) জাবরিয়া ৩৩৪

৭ কদরিয়া ৩৩৪

৮ জহমিয়া ৩৩৫

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশিষ্ট দল ৩৩৬

ইমাম আবু হানিফা রহ. - এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ৩৩৮

তাঁর যুগের অস্থিরতা ৩৩৮

আকিদাগত বিতর্ক এবং মুনাযারা বা বিতর্কে দক্ষতা ৩৩৮

তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধি ৩৩৯

ফিকহ শাস্ত্রে আগ্রহ ৩৪০

মসনদে দরস ও ফতোয়া প্রদান ৩৪১

উপার্জন, আমানতদারি এবং লেনদেনে ব্যবহারিক দক্ষতা ৩৪১

চরিত্র ও গুণাবলি ৩৪২

উসূলে দ্বীন এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর খিদমত ৩৪৪

বনু উমাইয়া যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির এক ঝলক ৩৫০

প্রথম হিজরি শতাব্দী ৩৫১

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী ৩৫৭

খিলাফতে বনু উমাইয়া - শিক্ষা ও উপদেশ ৩৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: খিলাফতে আব্বাসিয়া বাগদাদ ৩৬৬

আবুল আব্বাস সাফফাহ ৩৬৭

আব্বাসি বংশের ফাতেমি বুজুর্গদের সাথে নৈকট্য ৩৬৭

সাফফাহর প্রথম ভাষণ - সাবায়িদের ওপর আঘাত - আদল ও ইনসাফের প্রতিশ্রুতি ৩৬৮

সাফফাহর চাচা দাউদ বিন আলীর ভাষণ - কিতাবুল্লাহ এবং সীরাতে নববীর ওপর চলার প্রতিশ্রুতি ৩৬৯

সাফফাহর দরবারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কথোপকথন ৩৬৯

সাফফাহর মাযহাব ৩৭১

আনবারে রাজধানী স্থাপন ৩৭১

দানশীলতা ৩৭১

একটি কৌতুক ৩৭১

বনু উমাইয়ার ওপর জুলুম ৩৭২

ইবনে হুযায়রাকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর মৃত্যুদণ্ড ৩৭৪

আব্বাসি আন্দোলনের অর্থনৈতিক স্তম্ভ আবু সালামা উজির-এ-আলে মুহাম্মাদের হত্যাকাণ্ড ৩৭৪

বিদ্রোহসমূহ ৩৭৫

ইমাম ইবরাহিম বিন মায়মুনের হত্যাকাণ্ড ৩৭৬

আবু মুসলিমের মর্যাদা তুবার সমান - মনসুরের অভিমত ৩৭৬

সাফফাহর মৃত্যু - তাঁর শাসনকালের বৈশিষ্ট্য ৩৭৭

কিছু বিদআতের নিরসন ৩৭৭

দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দেওয়ার সুন্নত ৩৭৮

ঈদের নামাজের পর খুতবা দেওয়ার সুন্নত ৩৭৮

বনু উমাইয়ার ওপর জুলুম সম্পর্কিত কিছু বর্ণনার পর্যালোচনা ৩৮০

আব্বাসি খলিফাদের ওপর একটি আপত্তি ৩৮২

আব্বাসি আন্দোলনের সফলতা এবং একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ৩৮৩

আবু জাফর আল-মনসুর ৩৮৪

বিরোধীদের অবসান... চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর সাথে দ্বন্দ্ব ৩৮৪

আবু মুসলিম খোরাসানীর পরিণতি ৩৮৫

বিশ্বাসগত ফিতনাসমূহ ৩৯০

সিনবাদ মজুসীর বিদ্রোহ ৩৯১

রাওয়ান্দিয়া আন্দোলন ৩৯১

মা'ন বিন যায়েদার হত্যাকাণ্ড ৩৯২

উস্তাদ সীসের ফিতনা ৩৯৩

আফ্রিকায় খারেজীদের আবির্ভাব ৩৯৩

মনসুর আব্বাসীর যুগে ফিকহ সংকলন ৩৯৪

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকহী খিদমত ৩৯৪

হাদিসের খিদমত এবং কিতাবুল আসার ৩৯৪

কিতাবুল আসারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৯৫

হাদিস বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর শর্তাবলি ৩৯৫

ফিকহ সংকলন - সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং মহানতম কীর্তি ৩৯৮

ইমাম মালিক বিন আনাস রহ. এবং মুয়াত্তা ৪০২

আলাবী মহোদয়গণের বিদ্রোহ ৪০৫

আবদুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না রহ. ৪০৫

মুহাম্মদ নফসে জাকিয়ার পক্ষ থেকে মাহদী হওয়ার দাবি ৪০৬

পিতার ওসিয়ত - আত্মগোপন এবং তল্লাশি ৪০৭

গ্রেপ্তার এবং নির্যাতন ৪০৭

নফসে জাকিয়ার বিদ্রোহ ৪০৮

মনসুর এবং নফসে জাকিয়ার মধ্যে পত্রালাপ ৪০৯

নফসে জাকিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান ৪১৩

আলোচনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ৪১৪

চূড়ান্ত যুদ্ধ - নফসে জাকিয়ার শাহাদাত ৪১৫

ইবরাহিমের সাথে যুদ্ধ ৪১৬

মনসুরের দুঃখ ও বেদনা ৪১৮

শিক্ষণীয় স্থান ৪১৮

নফসে জাকিয়া আন্দোলনের বিশ্বাসগত প্রভাব ৪১৯

ফাতেমীয়দের বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হতে থাকল? ৪২০

বনু ফাতেমার বিদ্রোহ - ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রহ.-এর মাযহাব? ৪২১

নফসে জাকিয়া ও ইবরাহিমের বিদ্রোহের পরবর্তী প্রভাব ৪২২

জমহুর সাদাত এবং রাফেজীদের আকিদার পার্থক্য ৪২২

সাদাতদের বিদ্রোহের আন্দোলনসমূহ... সারকথা ৪২৬

বাগদাদ নির্মাণ ৪২৮

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কারাবরণ ও পরকাল যাত্রা ৪৩১

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাজীর পদ গ্রহণ না করার কারণসমূহ ৪৩৩

ফিকহ সংকলনের জন্য একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তা ৪৩৩

পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা ৪৩৩

বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে মনসুরের রাজনীতি ৪৩৫

আন্দালুস এবং আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া ৪৩৫

আল্লাহর শোকর যে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে ৪৩৫

রোমান সাম্রাজ্য ৪৩৬

মনসুরের মৃত্যু ৪৩৭

মনসুরের চরিত্রের ওপর এক নজর

নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ও ব্যস্ততা ৪৩৭

কঠোর পরিশ্রম ও কর্মশক্তি ৪৩৭

বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদ থেকে নির্লিপ্ততা ৪৩৮

মনসুরের দৃষ্টিতে শাসনের মূলনীতি ৪৩৮

রাজনীতি একটি শিল্প ৪৩৯

বুদ্ধিমত্তা ও সংবেদনশীলতা ৪৩৯

না পাওয়ার আক্ষেপ ৪৪০

জ্ঞানতাত্ত্বিক কীর্তিসমূহ ৪৪১

মনসুর ও আবদুল মালিকের মধ্যে সাদৃশ্য ৪৪১

সুসংহত সরকার প্রতিষ্ঠা, মনসুরের কীর্তি ৪৪২

আল-মাহদী বিন মনসুর ৪৪৩

চরিত্র ও আচরণ ৪৪৩

রাজনীতির ধরন ৪৪৪

খায়জুরান ও মারিয়া বিনতে মারওয়ান... মানবিক সহমর্মিতার একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

৪৪৪

হযরত মুসা কাযিম রহ.-এর সম্মাননা ৪৪৬

বৈদেশিক অভিযান... রোমানদের সাথে যুদ্ধ ৪৪৭

যিন্দিক ফিতনা এবং মাহদীর ভূমিকা ৪৪৮

মুকান্নার ফিতনা ৪৪৮

শুউবিয়া আন্দোলনের কণ্টকাকীর্ণ বন ৪৪৯

যিন্দিকদের দমনের জন্য স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা ৪৫১

যিন্দিকদের নির্মূলের জন্য মাহদীর ওসিয়ত ৪৫৩

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৪৫৩

উত্তরাধিকার ৪৫৪

মৃত্যুর পয়গাম ৪৫৫

মাহদীর মৃত্যু ৪৫৬

আল-হাদী বিন মাহদী ৪৫৭

হুসাইন বিন আলীর বিদ্রোহ ৪৫৭

হাদীর একটি অনুপযুক্ত ইচ্ছা যা পূরণ হতে পারেনি ৪৫৮

আর-রশীদ বিন মাহদী ৪৫৯

হারুনুর রশীদের চরিত্র ৪৫৯

বারমাকিদের উত্থান এবং পরিবর্তন ও তাদের মৃত্যু ৪৬০

অনারবদের অংশীদারিত্ব - রাজনৈতিক বিপ্লব ৪৬০

অভ্যন্তরীণ অভিযানসমূহ ৪৬২

বিদ্রোহসমূহ ৪৬২

ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ হাশেমীর বিদ্রোহ ৪৬৩

বিশ্বজনীন খিলাফত বিলুপ্তির সূচনা ৪৬৪

ইদ্রিসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৪৬৪

আফ্রিকান গোত্রসমূহের বিদ্রোহ এবং আগলাবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৪৬৪

বারমাকিদের উত্থান ও পতন ৪৬৬

বারমাকির কারণ ছিল? ৪৬৬

খালিদ বারমাকি, আবু মুসলিম খুরাসানীর ডান হাত ৪৬৬

খালিদ বারমাকির মন্ত্রিত্বের কাল ৪৬৭

অনারবদের আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা ৪৬৭

খলিফাদের সাথে দুগ্ধ-সম্পর্ক ৪৬৮

উস্তাদ ও উস্তাদজাদার সম্পর্ক ৪৬৮

হারুন ইয়াহইয়া বারমাকিকে বাবা বলে ডাকতেন ৪৬৮

হারুনের ক্ষমতার জন্য ইয়াহইয়া বারমাকির প্রচেষ্টা ৪৬৮

জাফর বিন ইয়াহইয়া বারমাকির ক্ষমতা ৪৬৯

ফজল বিন ইয়াহইয়া বারমাকির কীর্তিসমূহ ৪৬৯

বারমাকিদের শান-শওকত ও ক্ষমতা ৪৭০

হারুন কেন বারমাকিদের এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন? ৪৭১

হারুনের ভুলের অনুভূতি ৪৭৩

বারমাকিদের কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? ৪৭৪

রবী হাজিবের পরিবার ৪৭৪

ফজল বিন রবী ৪৭৫

বারমাকিদের সম্পর্কে হারুনের সন্দেহ ও সংশয় ৪৭৬

বারমাকিরা কি সত্যিই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল? ৪৭৭

হারুনের সন্দেহের প্রথম প্রধান কারণ ৪৭৭

হারুনের সন্দেহের দ্বিতীয় প্রধান কারণ ৪৭৮

তৃতীয় প্রধান কারণ ৪৭৯

উত্তরাধিকার ঘোষণা ৪৮০

বারমাকিদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ ৪৮১

বারমাকিদের হত্যা, সঠিক না ভুল? ৪৮২

একটি ভিত্তিহীন কাহিনী ও তার বাস্তবতা ৪৮৩

বারমাকিদের পর ৪৮৫

বৈদেশিক অভিযানসমূহ ৪৮৬

রোমানদের সাথে যুদ্ধসমূহ ৪৮৬

আন্দালুস ও ফ্রান্স ৪৮৮

হারুনের শেষ অভিযানসমূহ - আলী বিন ইসার ঘটনা - রাফে বিন লাইসের বিদ্রোহ ৪৮৯

৪৮৯

হারুনের মৃত্যু ৪৯০

হারুনের যুগ ও চরিত্রের ওপর পর্যালোচনা ৪৯১

বিজ্ঞান ও কলার উন্নতি এবং কাগজ তৈরির বিপ্লব ৪৯১

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ৪৯২

আল্লামা সুয়ুতির জবানিতে হারুনের জীবনী ৪৯২

নবীপ্রেম ৪৯৩

সাহাবায়ে কেরামের আদব ও সম্মান ৪৯৩

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক ৪৯৪

হৃদয়ের কোমলতা ৪৯৪

সাম্রাজ্যের মূল্য এক পেয়ালা পানি ৪৯৫

দানশীলতা ৪৯৫

ফিকহে হানাফির উত্থান ৪৯৬

আমিনুর রশীদ ৪৯৭

মামুনুর রশীদের খেলাফত ঘোষণা ৪৯৮

আমিনের উদাসীনতা ৪৯৮

বাগদাদ অবরোধ ৪৯৯

আমিনের করুণ পরিণতি ৫০০

আমিনুর রশীদের রাজনৈতিক ভুলসমূহ ৫০১

রোম সাম্রাজ্য ৫০২

মামুনুর রশীদ ৫০৩

প্রাথমিক অবস্থা... সীরাত ও যোগ্যতা ৫০৩

খেলাফতের সূচনা এবং খন্দান-এ-সহলের আধিপত্য ৫০৬

ফিতনা-ফাসাদ ও বিদ্রোহের আন্দোলনসমূহ ৫০৮

শামের বিদ্রোহীদের দমন ৫০৮

সাদাতদের বিদ্রোহসমূহ ৫০৮

আলাবীদের এই আন্দোলনগুলোর সাথে পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর পার্থক্য ৫০৯

হারসামা বিন আয়ান-এর হত্যাকাণ্ড ৫১১

মামুনের অনুপস্থিতিতে বাগদাদের অবস্থা ৫১২

আলী রাজা (রহ.)-এর উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়ার সিদ্ধান্ত - আব্বাসীয়দের প্রতিক্রিয়া

এবং মামুনের বাগদাদ সফর ৫১৩

আলী রাজা (রহ.)-এর ইন্তেকাল ৫১৬

বাগদাদে মামুনের সিংহাসন আরোহণ ৫১৬

খুরাসানে তাহের বিন হুসাইনের নিযুক্তি ৫১৭

তাহের বিন হুসাইনের উপদেশনামা ৫১৮

খুরাসান ও ইয়েমেনের নতুন সরকারসমূহ - তাহেরী রাষ্ট্র - যিয়ারী রাষ্ট্র ৫১৯

বুরানের সাথে বিবাহ ৫২০

আহমদ বিন আবি খালিদের মন্ত্রিত্ব ৫২১

بابک খুররামী ৫২১

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ৫২১

দার্শনিকদের কিতাব অনুসন্ধান ৫২২

দার্শনিকদের কিতাবসমূহের অনুবাদ ৫২২

মামুনের নিজের দর্শন শেখার প্রতি আগ্রহ ৫২৩

বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কৃতিত্বসমূহ ৫২৪

নাহ্, আদব, কবিতা ও ইতিহাসের কাজ ৫২৪

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকারিতা ৫২৫

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপকারিতা ৫২৫

মামুন কীভাবে ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হলেন? ৫২৭

মামুনের প্রবর্তিত বিদআতসমূহ ৫৩০

খালকে কুরআন ইস্যুতে মামুনের কঠোরতা ৫৩১

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫৩১

জুবাইদা খাতুনের ইন্তেকাল - জুবাইদার সীরাত ও চরিত্র - নহরে জুবাইদা ৫৩২

মামুনের মিশর সফর এবং বিদ্রোহীদের দমন ৫৩৩

খালকে কুরআন মাসআলা - ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের গ্রেফতারি ৫৩৪

মামুনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল? ৫৩৬

মামুনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ৫৩৬

মামুনী যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা ৫৩৭

ত্রুটিসমূহ ৫৩৭

গুণাবলি ৫৩৮

মু'তাসিম বিল্লাহ বিন আর-রশীদ ৫৪০

লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ... বীরত্বে অনন্য ৫৪০

সিংহাসন আরোহণ ৫৪০

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলাবীর বিদ্রোহ ৫৪১

তুর্কি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ৫৪১

নতুন শহর... সামারা ৫৪২

বাবাক খুররামীর সমাপ্তি ৫৪২

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫৪৪

উত্তর তো নিজেই দেখে নেবে ৫৪৪

সৈন্যবাহিনীর যাত্রা এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহ ৫৪৫

তুর্কীদের ইবাদত ৫৪৬

মাসআলা ‘খালকে কুরআন’-এ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর অবিচলতা ৫৪৮

জন্ম ও শিক্ষা ৫৪৮

ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ এবং তার মোকাবিলা ৫৪৯

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর দৃঢ়তার কাহিনী ৫৪৯

তার নিজের জবানীতে ৫৪৯

আবুল হাইসামের জন্য দুআ ৫৫৩

ইমাম সাহেবের রহ. সম্মান ও মর্যাদা ৫৫৪

মু’তাসিমের মৃত্যু ৫৫৪

কৃষিকাজে আগ্রহ ৫৫৪

মু’তাসিম এবং আট সংখ্যা ৫৫৫

আবাসীয় সরকার ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী কতটুকু ছিল? ৫৫৫

আল-ওয়াসিক বিল্লাহ বিন মু’তাসিম ৫৫৭

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর আত্মগোপন ৫৫৭

আহমদ বিন নাসরের বিদ্রোহ এবং তার পরিণতি ৫৫৭

রোমানদের সাথে বন্দি বিনিময় ৫৬০

ইমাম আবু আবদুর রহমান আল-আযদি রহ.-এর সত্যবাদিতা ৫৬১

ওয়াসিক বিল্লাহর চিন্তাধারায় পরিবর্তন ৫৬১

ওয়াসিকের মৃত্যু ৫৬৫

আল-মুতাওয়াক্কিল আল্লাহ ৫৬৫

সুন্নাহর পুনর্জাগরণ এবং বিদআতের অবসান ৫৬৬

জিহাদী অভিযানসমূহ ৫৬৮

সীরাত ও আখলাক ৫৬৮

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মৃত্যু ৫৬৯

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ৫৬৯

উত্তরাধিকার ও হত্যাকাণ্ড ৫৭০

সুসংবাদ ৫৭১

জাল বর্ণনা ৫৭১

কুরআন খতমের অনুষ্ঠান ৫৭১

প্রকৃত সুখী কে? ৫৭১

উত্থান যুগের শেষ খলিফা ৫৭২

আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং আবাসীয় খিলাফত ৫৭৩

বনু আব্বাসের উত্থান যুগে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ৫৭৫

ফকিহে শাম, ইমাম আওয়ামী রহ. (৮৮ হিজরী - ১৫৭ হিজরী) ৫৭৬

ইমাম দারুল হিজরত... মালিক বিন আনাস রহ. (৯৩ হিজরী - ১৭৯ হিজরী) ৫৮০

প্রথম প্রধান বিচারপতি... ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (৯৩ হিজরী - ১৮২ হিজরী) ৫৮২

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী রহ. (১৩২ হিজরী - ১৮৯ হিজরী) ৫৮৭

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী রহ. (১৫০ হিজরী - ২০৪ হিজরী) ৫৯০

তরবারি ও কলমের অধিকারী কাজী আসাদ বিন ফুরাত (১৩৩ হিজরী - ২১২ হিজরী)

..... ৫৯৪

সিকিলিয়া (সিসিলি) বিজয় ৫৯৫

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১১৮ হিজরি - ১৮১ হিজরি) ৫৯৭

মুজাহিদ ও হাজীদের জন্য ব্যয় ৫৯৮

জিহাদের উদ্দীপনা ৫৯৯

ফুযাইল বিন আইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নামে রণসঙ্গীত ৫৯৯

বন্দী নারীদের শোক ৬০০

সিহাহ সিভার সংকলকগণ ৬০২

সিহাহ সিভাহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ৬০৪

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬০৬

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১০

ইমাম নাসাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১০

ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১২

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১৩

ইমাম ইবনে মাজাহ কাযভিনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১৪

তাজকিয়া ও ইহসানের ইমামগণ ৬১৫

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১৬

হযরত দাউদ তাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১৭

হযরত ফুযাইল বিন আইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১৮

হযরত মারুফ আল-কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২০

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২১

হযরত যুননুন মিসরী (সাওবান বিন ইবরাহীম) রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২২

হযরত সারী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২৩

হযরত আবু ইয়াযীদ বাস্তামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬২৪

বনু আব্বাসের উত্থানকাল শিক্ষা ও উপদেশ ৬২৬

তৃতীয় অধ্যায়: বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত - পতনের যুগ ৬২৮

বনু আব্বাসের পতন যুগের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৬২৯

দুর্বল খিলাফত না থাকাই কি ভালো ছিল? ৬২৯

৩০৯ বছরের পতন যুগের ২৭ জন খলিফা কেন অখ্যাত? ৬৩০

পতন যুগ সংক্ষেপে উপস্থাপন করার কারণ ৬৩০

বনু আব্বাস - পতন যুগের তিনটি পর্যায় ৬৩২

১. প্রাথমিক পর্যায় ৬৩২

২. মধ্যবর্তী পর্যায় - বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্য: ৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি ৬৩৩

৩. শেষ পর্যায় - খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত: ৪৫০ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি ৬৩৩

বাগদাদ খিলাফতের পতন, প্রাথমিক পর্যায়, প্রথম ধাপ পতনের সূচনা - তুর্কিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ৬৩৫

আল-মুনতাসির বিল্লাহ ৬৩৬

আল-মুসতাসিন বিল্লাহ ৬৩৭

আলাবীদের বিদ্রোহ ৬৩৭

মুসতাসিনের হত্যাকাণ্ড ৬৩৯

আল-মুতাজ বিল্লাহ ৬৪০

মিসরে তুলুনী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ৬৪০

সাফফারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ৬৪১

আল-মুহতাদী বিল্লাহ ৬৪২

মুহতাদীর হত্যাকাণ্ড ৬৪৩

আল-মুতামিদ আলান্নাহ

বিদ্রোহসমূহ ৬৪৪

উত্তরাধিকারী ঘোষণা ৬৪৪

সাহিবুজ জাঞ্জ আলী বিন মুহাম্মাদের ফিতনা ৬৪৪

জঘন্য আকিদা ও মিথ্যা দাবি ৬৪৫

মুসলিমদের গণহত্যা ৬৪৫

বসরায় রক্তের নদী ৬৪৫

জাঞ্জিদের প্রথম পরাজয় ৬৪৬

আব্বাসীয় বাহিনীর আক্রমণ এবং জাঞ্জিদের পরাজয় ৬৪৬

আব্বাসীয় খিলাফত ও তুলুনিদ রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ৬৪৭

রোমানদের আক্রমণ ৬৪৯

সাফারিদ রাষ্ট্রের উত্থান ৬৪৯

সামানিদ রাষ্ট্র ৬৫০

উত্তরাধিকারী পরিবর্তন। একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ৬৫০

বাগদাদ খিলাফতের পতন, প্রাথমিক যুগ, দ্বিতীয় পর্যায়: সাময়িক উপশম ৬৫১

আল-মুতাদিদ বিল্লাহ

মুতাদিদের একটি গুরুতর পদক্ষেপ ও প্রত্যাবর্তন ৬৫২

কারামাতিদের আবির্ভাব ৬৫৩

আল-মুকতাফি বিল্লাহ

তুলুনিদ রাষ্ট্রের অবসান, মিসর পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতে অন্তর্ভুক্ত ৬৫৪

রাশিয়ার বন্য জাতিগুলোর মধ্য এশিয়ায় আক্রমণ ৬৫৪

রোমানদের সাথে যুদ্ধ ৬৫৫

মুকতাফির মৃত্যু ৬৫৫

বাগদাদ খিলাফতের পতন, প্রাথমিক যুগ, তৃতীয় পর্যায়: বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা ৬৫৬

আল-মুকতাদির বিল্লাহ

তিউনিসিয়া, মিসর ও মরক্কোতে উবায়দিদের দখলদারিত্ব ৬৫৭

মনসুর হাল্লাজের হত্যা ৬৫৭

রোমানদের সাথে সন্ধি ও যুদ্ধ ৬৫৮

দাইলামি শিয়া ও কারামাতিদের আক্রমণ ৬৫৮

কারামাতিরা হাজারে আসওয়াদ উপড়ে নিয়ে যায় ৬৫৮

ধর্মীয় বিতর্ক ৬৫৯

নারীদের শাসন ও ব্যর্থ বিদ্রোহ ৬৫৯

দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও মুকতাদিরের হত্যা ৬৫৯

আল-কাহির বিল্লাহ

দাইলামিদের আধিপত্য—কাহিরের পরিণতি ৬৬১

আর-রাজি বিল্লাহ

বুইয়িদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৬৬২

ইবনে রায়িকের স্বায়ত্তশাসন—আন্দালুসের শাসকের খিলাফতের দাবি ৬৬৩

অশান্ত পরিস্থিতি ৬৬৪

আব্বাসীয় উজির ইবনে মুকলাহ-র হত্যা ৬৬৪

রাজির মৃত্যু ৬৬৫

ইখশিদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ৬৬৫

ইখশিদের মৃত্যু এবং কাফুরের উত্থান ৬৬৬

ইখশিদি রাষ্ট্রের পতন ও সমাপ্তি ৬৬৬

আল-মুত্তাকী লিল্লাহ ৬৬৭

অত্যাচারী আমিরদের খলিফা ও নাগরিকদের সাথে আচরণ ৬৬৭

“আমিরুল উমারা” পদের জন্য আমিরদের লড়াই ৬৬৭

রুমালের বিনিময়ে রোম থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্তি ৬৬৮

ইসলামি বিশ্বের ওপর রাশিয়ার আক্রমণ ৬৬৮

বনু হামদানের পক্ষ থেকে খলিফাকে সমর্থন ৬৬৯

খলিফা মুত্তাকীর হত্যাকাণ্ড ৬৬৯

আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ ৬৭০

বনু আব্বাসের পতন যুগের প্রথম শতাব্দীতে প্রখ্যাত উলামাদের ভূমিকা ৬৭১

ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৭২

পিতার স্বপ্ন ৬৭২

জ্ঞানের অন্বেষণে বিশ্বভ্রমণ ৬৭৩

বাগদাদে ইফতা ও হাদিসের দরস ৬৭৪

ছাত্রবৃন্দ ৬৭৪

দিন ও রাতের রুটিন ৬৭৫

কুরআন মাজিদের প্রতি অনুরাগ ৬৭৬

ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা এবং শাসকদের প্রতি নির্লিপ্ততা ৬৭৭

খিলাফত দরবারে নির্লিপ্ত উপস্থিতি ৬৭৯

আকিদা সংস্কারে তাঁর প্রচেষ্টা ৬৭৯

রাফযি মতবাদ খণ্ডনে তাঁর প্রচেষ্টা ৬৮০

নাসিবিদের খণ্ডন ৬৮১

তাওহিদের রক্ষায় ইমাম তাবারীর সত্যবাদিতা ৬৮২

শারীরিক গঠন এবং অভ্যাস ও আচরণ ৬৮৩

মৃত্যু ৬৮৩

ইমাম তাবারীর ইলমি নিদর্শনসমূহ ৬৮৪

ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৬

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৬

ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৮

ফাযায়েলে সাহাবার ওপর কতিপয় আলেমের প্রচেষ্টা ৬৮৯

ইলমে হাদিসের খিদমত, আবু ইয়াল মুসিলী ৬৮৯

ইমাম তাবারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৮৯

ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কীর্তিসমূহ ৬৮৯

ইবনে আল-আনবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯০

আলী বিন ঈসা আল-জাররাহ, আব্বাসীয় খিলাফতের উজির ৬৯০

সুফিয়ায়ে কেরাম ৬৯১

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯১

শেখ আবু বকর শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬৯২

বাগদাদ খিলাফতের পতন: বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্য, মধ্যযুগ (৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি) ৬৯৪

কুহিস্তান-এ-দাইলামের রহস্যময় কাহিনী ৬৯৫

যাইদি শিয়াদের ধর্ম প্রচার ৬৯৫

দাইলামি আমিরদের উত্থান ৬৯৬

বনু বুওয়াইহ-এর উত্থান ৬৯৬

খলিফাগণ এবং বনু বুওয়াইহ-এর সম্পর্ক ৬৯৬

খলিফা মুস্তাকফী-এর পদচ্যুতি ৬৯৭

বনু বুওয়াইহ কেন আব্বাসীয় খিলাফত বহাল রাখল? ৬৯৮

আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর আগ্রহ ও অগ্রাধিকারসমূহ ৬৯৮

আল-মুতি লিল্লাহ ৬৯৯

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৬৯৯

দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ৬৯৯

বনু বুওয়াইহ-এর বিলাসিতা ৭০০

হাজারে আসওয়াদ প্রত্যাবর্তন ৭০০

শিয়াদের অবাধ স্বাধীনতা ৭০০

শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা ৭০১

সাহাবায়ে কেরামের ওপর তাবাররা বাজি (গালিগালাজ) ৭০১

মাতমি মিছিল এবং ঈদে গাদীরের বিদআতের সূচনা ৭০১

বখতিয়ার ইজুদৌলার যুগ... সমগ্র মুসলিম বিশ্বে রাফেযী মতবাদের প্রসার ৭০২

রোমানদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ এবং মুসলমানদের অসহায়ত্ব ৭০২

সাইফুদৌলার মৃত্যু ৭০৫

রোমানদের লুণ্ঠন ৭০৫

রোম সম্রাটের বিদ্রোহাত্মক ও হুমকিমূলক কাব্যিক পত্র ৭০৫

সম্রাটের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং সীমান্ত লঙ্ঘন ৭০৭

বাগদাদের বাজারে অগ্নিসংযোগ। শিয়া উজির কর্মফলের শিকার ৭০৭

জিহাদ আন্দোলনের সাথে বনু বুওয়াইহ-এর উপহাস ৭০৮

খলিফা মুতি-এর পদত্যাগ ও মৃত্যু ৭০৮

আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ৭০৯

আত-তাই লিল্লাহ ৭১০

আযুদুদৌলা বুওয়াইহীর উত্থান ৭১০

প্রথম শাহেনশাহ উপাধি ৭১০

শাহজাদী জামিলা বিনতে হামদানের বেদনাদায়ক ঘটনা ৭১১

উবাইদীদের হাতে তুর্কি আমিরের পরাজয় ৭১২

আযুদুদৌলার মৃত্যু। বনু বুওয়াইহ-এর পতনের সূচনা ৭১২

আল-কাদির বিল্লাহ ৭১৪

বাগদাদে অশান্তি। শিয়াদের মিছিল ৭১৫

মুসআব বিন যুবায়ের দিবস পালনের বিদআত ৭১৫

আমীদুল জুইউশ-এর শাসনকাল। মিছিল বন্ধ। দাঙ্গা সমাপ্ত ৭১৫

মুসহাফে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের প্রকাশ, সুন্নি-শিয়া দ্বন্দ্ব ৭১৬

এতে ইহুদিদের ভূমিকা ৭১৬

বনু বুওয়াইহ-এর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ৭১৬

খলিফা কাদির বিল্লাহ ইসলাম ও খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট ৭১৭

সুলতান মাহমুদ গজনভীর উত্থান এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা ৭১৭

উবাইদী শাসকের খিলাত (সম্মানসূচক পোশাক) অগ্নিসাৎ ৭১৭

খলিফা কাদির এবং সুলতান মাহমুদ গজনভী বাতিল আকিদা নির্মূলে সক্রিয় ৭১৭

তারিখ মিলাতে মুসলিমা

মাহমুদ গজনভী কর্তৃক খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখি উপহার ৭১৮

হাজ্জাজ কাফেলার ওপর ডাকাতি, বাগদাদের উজিরের পাল্টা ব্যবস্থা ৭১৮

বনু বুওয়াইহ-এর পারস্পরিক অনৈক্য এবং গজনভীর প্রতি তাদের ভীতি ৭১৮

কাওয়ামুদৌলার জুলুম ও মৃত্যু ৭১৯

সুলতান মাহমুদের ইরান দখল ৭১৯

বাগদাদে রাফেজিদের কুফরি শব্দ সম্বলিত খুতবার ওপর নিষেধাজ্ঞা ৭১৯

সুলতান মাহমুদ ও খলিফা কাদিরের ইন্তেকাল ৭২০

রোমানদের আক্রমণ ৭২০

আল-কায়িম বি-আমরিলাহ

বনু বুওয়াইহ অভ্যন্তরীণ ভাঙনের শিকার ৭২১

বাসাসিরির জুলুম এবং জালালুদৌলার উদাসীনতা ৭২১

জালালুদৌলার ‘শাহেনশাহে আজম’ উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা ৭২২

মুমূর্ষু খিলাফত এবং সেলজুকদের উত্থান ৭২২

জালালুদৌলার মৃত্যু এবং বাগদাদে আবু কালিজার বুওয়াইহির শাসন ৭২২

সেলজুকদের ইসফাহান বিজয় ৭২৩

সেলজুকদের বিজয়ের পরিধি এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত ৭২৩

আহলে সুন্নাত ও শিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৭২৩

তুঘরিল সেলজুকির বাগদাদে আগমন ৭২৪

বাসাসিরির ষড়যন্ত্র..... খলিফা নির্বাসিত ৭২৪

সুলতান তুঘরিলের হাতে খিলাফতের পুনরুদ্ধার ৭২৬

এক নজরে বনু বুওয়াইহ যুগ ৭২৮

বনু বুওয়াইহ এবং সাদাত কিরামের মাযহাব ৭২৮

বনু আব্বাসের উত্থান যুগে রাফেজি আন্দোলনগুলো কেন সফল হয়নি? ৭২৯

রাফেজি মতবাদের প্রতি আইন্মায়ের সাদাতের অনীহা ৭৩০

বনু বুওয়াইহ এবং ইসনা আশারিয়া ৭৩১

ইসনা আশারিয়াদের “সিহাহ আরবা” ৭৩১

ইসনা আশারিয়াদের সিহাহ আরবা-তে বর্ণিত বর্ণনার সংখ্যা ৭৩২

ইসনা আশারি আকিদা এবং বনু বুওয়াইহ-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ৭৩৩

ইসনা আশারি আকিদার দর্শন ৭৩৩

বনু বুওয়াইহ কেন সাদাতদের ক্ষমতায় বসায়নি? ৭৩৪

বনু বুওয়াইহ-এর ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযানসমূহ ৭৩৬

বিবেচ্য বিষয় ৭৩৭

ইসলামি ইতিহাসে ভেজাল ৭৩৭

আল-আগানির বর্ণনা এবং বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসীয় খলিফাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য?

..... ৭৩৭

খলিফাদের বিলাসিতা এবং সন্দেহজনক বর্ণনা ৭৩৮

বনু আব্বাসের পতন যুগের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রখ্যাত উলামায়ে কিরামের ভূমিকা ৭৪১

বাতিল ফিরকাগুলোর ইলমি মোকাবিলা ৭৪৩

আবু বকর আল-আজুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৪৩

কাযী আবু বকর ইবনুল বাকিল্লানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৪৩

শাইখ আবু ইসহাক আসফারাইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৪৫

আল-ফাশীদ ইয়াযদি রহ. ৭৪৫

আবু মনসুর আব্দুল কাহের বাগদাদী আল-ইসফারাইনী রহ. ৭৪৬

বানু মান্দা পরিবার ৭৪৬

বাতিল সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী উলামায়ে কেরাম ৭৪৭

কাজী আসসাল ইসফাহানী রহ. ৭৪৭

হাফেজ আব্দুল গনি আবু মুহাম্মদ আল-আযদি রহ. ৭৪৭

কাজী ইয়াহইয়া বিন মনসুর রহ. ৭৪৮

ইমাম আবুল হাসান কাজভিনী রহ. ৭৪৮

ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারাইনী রহ. ৭৪৮

ইমাম হাসান বিন আহমদ সামিহী রহ. ৭৪৯

ইমাম হাকেম আল-কাবীর রহ. ৭৪৯

ইমাম আল-মাওয়ারদী রহ. ৭৪৯

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রচেষ্টা ৭৫১

জারহ ওয়া তাদীল ৭৫১

অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৭৫২

আন্দালুসের উলামায়ে কেরামের অবদান ৭৫২

একজন অজ্ঞাতনামা আলেমের কীর্তি ৭৫৩

ফলাফল ৭৫৩

বাগদাদ খিলাফতের পতন, শেষ যুগ, প্রথম পর্যায়: সেলজুক সুলতানদের ছায়ায় আব্বাসীয়

খিলাফত ৭৫৪

সালাজিকা (সেলজুকগণ) ৭৫৫

সুলতান তুঘরিল বেগ - সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ৭৫৫

তুঘরিল বেগ ৭৫৬

আব্বাস আরসালান এবং মানজিকাটের যুদ্ধ ৭৫৬

মালিক শাহ ৭৫৯

বিখ্যাত প্রকৌশলী ওমর খৈয়াম ৭৬০

নিজামুল মুলক তুসী ৭৬০

দ্বিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা - নিজামুল মুলক তুসীর মহান কীর্তি ৭৬২

সেলজুক শাসকদের বিভিন্ন শাখা ৭৬৩

আল-কাযিম, পুনরায় শাসন ৭৬৪

নুকতাহ (পয়েন্ট) ৭৬৪

আল-মুজ্জাদী বি-আমরিলাহ ৭৬৫

তিন মুজাহিদ সুলতানের উত্থান ৭৬৫

সিসিলির পতন ৭৬৫

শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা ৭৬৫

আল-মুস্তাজহির বিলাহ ৭৬৬

মালিক শাহের উত্তরসূরিদের মধ্যে বিভেদ ৭৬৬

প্রথম ক্রুসেড - বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ৭৬৬

সেলজুকদের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সন্ধি ৭৬৬

সিরিয়ায় ফিরিজিদের (ক্রুসেডার) ক্রমাগত বিজয় ৭৬৭

সেলজুক বাহিনীর ব্যর্থ অভিযান ৭৬৭

তিবরিয়ায় ফিরিজিদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ৭৬৭

ফিরিজিদের সাহায্যে মুসলিম আমিরদের একে অপরকে দমনের ধারা ৭৬৮

বাতিনীদের ফিতনা ৭৬৮

সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকের মৃত্যু, মাহমুদ সেলজুকের সিংহাসন আরোহণ ৭৬৮

মুসলমানদের দুর্দশা এবং এর কারণ ৭৬৮

রাজনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী কে? ৭৬৮

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ ৭৭০

ইরাকে গৃহযুদ্ধসমূহ ৭৭০

সিরিয়ায় রাফেজিদের নিপীড়ন ৭৭০

দুবাইস বিন সাদাকার ফিতনা ৭৭১

সুলতান মাসুদ সেলজুকি এবং খলিফার মধ্যে দ্বন্দ্ব ৭৭১

ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধারাবাহিকতা ৭৭২

খলিফা আল-মুসতারশিদের হত্যাকাণ্ড ৭৭৩

আসল অপরাধী কে ছিল? ৭৭৩

সুলতান মাসুদের আদেশে দুবাইসের হত্যাকাণ্ড ৭৭৩

আর-রাশিদ বিল্লাহ ৭৭৪

খলিফা এবং সুলতান মাসুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৭৭৪

রাশিদ বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড ৭৭৪

আল-মুকতাফি লি-আমরিবিল্লাহ ৭৭৫

খোরাসানে তুর্কান-এ-গুজ-এর ফিতনা এবং সেলজুকদের পতন ৭৭৫

তুর্কান-এ-গুজ-এর মোকাবিলায় সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির পরাজয় ও বন্দিত্ব ৭৭৫

সুলতান সাঞ্জরের মুক্তি ও মৃত্যু ৭৭৬

ইসলামি বিশ্বের নতুন রক্ষক: ইমাদউদ্দিন জঙ্গি ৭৭৬

নুরুদ্দিন জঙ্গি ৭৭৭

সুলতান মাসুদ এবং খলিফার মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ৭৭৭

খলিফার বদদোয়া এবং সুলতানের মৃত্যু ৭৭৭

সেলজুক যুগের ওপর এক নজর ৭৭৮

সেলজুকদের পতনের কারণসমূহ ৭৭৯

বাগদাদ খিলাফতের পতন, সমাপ্তি কাল, শেষ পর্যায়: খিলাফতের স্বাধীন মর্যাদা পুনরুদ্ধার ৭৮০

খলিফা মুকতাফি, খিলাফতের স্বাধীন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পর ৭৮১

খলিফার দাকুকা এবং খুজিস্তানে সামরিক অভিযান ৭৮১

বাগদাদের ওপর একটি ব্যর্থ আক্রমণ ৭৮১

খলিফা মুকতাফির মৃত্যু ৭৮১

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ ৭৮২

ফিতনাবাজ লোকদের থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ৭৮২

উজির আল্লামা ইবনুল হুবায়রার মৃত্যু ৭৮২

উজির জামালুদ্দিন ইসফাহানির মৃত্যু ৭৮৩

নুরুদ্দিন জঙ্গির কীর্তিসমূহ ৭৮৩

মুসতানজিদের মৃত্যু ৭৮৩

আল-মুসতাদি বি-আমরিবিল্লাহ ৭৮৪

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর প্রতি ভক্তি ৭৮৪

সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা সম্বলিত কিতাবসমূহ ধ্বংস ৭৮৪

মিসরে বনু উবাইদ শাসনের অবসান - আব্বাসীয় খুতবা পুনর্বহাল ৭৮৫

সিরিয়া ও মিসরে আইয়ুবীয় সালতানাত প্রতিষ্ঠা ৭৮৫

ঘুরি, واززم শাহী এবং তুর্কান-এ-খিতার উত্থান ৭৮৫

খলিফার অসুস্থতা ও মৃত্যু ৭৮৫

আন-নাসির লি-দিনিল্লাহ ৭৮৬

গোয়েন্দাগিরির বিস্ময়কর ব্যবস্থা ৭৮৬

গোপন দাওয়াতের দক্ষ খলিফা ৭৮৬

আন-নাসিরের চারিত্রিক ত্রুটি ও ভ্রান্ত আকিদা ৭৮৭

মাতমি মিছিলের অনুমতি, শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা পুনরায় শুরু ৭৮৭

খলিফার বিদ্বেষপরায়ণতা এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা ৭৮৭

রণকৌশলের পরিবর্তে খেলাধুলার উৎসাহ প্রদান ৭৮৮

রাফেজিদের প্রতি ঘৃণার কারণে উত্তরাধিকারীর অপসারণ ও তার প্রভাব ৭৮৯

নাসিরের পক্ষাঘাত আক্রমণ ও মৃত্যু ৭৮৯

ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতারী আক্রমণ ৭৮৯

আয-জাহির বি-আমরিল্লাহ ৭৯০

সচ্চরিত্র খলিফা ৭৯০

যুগ যোগ্য ব্যক্তিদের কদর করে না ৭৯০

আল-মুস্তানসির বিল্লাহ ৭৯১

বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও হাসপাতাল ৭৯১

বিশাল সেনাবাহিনী ৭৯১

ন্যায়পরায়ণতা ৭৯১

আল-মুস্তাসিম বিল্লাহ ৭৯২

দুর্বল শাসক ৭৯২

নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ ৭৯২

বাগদাদের পতন: আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি ৭৯২

আব্বাসীয় খিলাফতের পতন... কারণ ও শিক্ষা ৭৯৩

বনু আব্বাসের খলিফাদের তালিকা... খলিফাদের শুরু ও শেষ ৭৯৮

বনু আব্বাসের খলিফাদের তালিকা - অবস্থা ও ঘটনাবলি ৮০১

চতুর্থ অধ্যায়: আব্বাসীয় খিলাফত, বাগদাদের সমসাময়িক সরকারসমূহ ৮০৫

আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে প্রতিষ্ঠিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকার ৮০৬

মিসরের সরকারসমূহ ৮০৬

তুলুনি রাষ্ট্র ৮০৬

ইখশিদী রাষ্ট্র ৮০৭

মধ্য এশিয়া এবং ইরান ও ইরাকের সরকারসমূহ ৮০৮

তাহিরি রাষ্ট্র ৮০৮

জাইদিয়া তালিবিয়া রাষ্ট্র (তাবারস্তান) ৮০৮

সাফফারি রাষ্ট্র ৮১০

সামানি রাষ্ট্র ৮১১

বনু হামদান রাষ্ট্র ৮১৩

হামদানি রাষ্ট্র (মুসেল) ৮১৪

হামদানি রাষ্ট্র (হালাব) ৮১৫

বনু হামদান যুগের ওপর এক নজর ৮১৬

বাহরাইন ৮১৬

উয়ুনি রাষ্ট্র (বাহরাইন) ৮১৬

সেলজুক সালতানাত ৮১৭

মহান সেলজুক ৮১৭

সেলজুক সালতানাতের বিভাজন ৮১৮

ইরাকের সেলজুক ৮১৮

খোরাসানের সেলজুক ৮২০

সিরিয়া ও আল-জাজিরার সেলজুক ৮২১

রুমের সেলজুক ৮২২

আজারবাইজানের আতাবেগ ৮২৩

উত্তর আফ্রিকার সরকারসমূহ (বনু আব্বাসের যুগে প্রতিষ্ঠিত)

রুস্তমিয়া রাষ্ট্র ৮২৪

বনু মিদরার রাষ্ট্র (সিজিলমাসা - মরক্কো) ৮২৫

ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্র (মরক্কো) ৮২৫

আগলাবি রাষ্ট্র, তিউনিস ৮২৬

উত্তর আফ্রিকার সরকারসমূহ (যা বনু আব্বাসের পতনের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) ৮২৮

জিরিয়া রাষ্ট্র (তিউনিস, আলজেরিয়া) ৮৩০

বনু হাম্মাদ রাষ্ট্র, আলজেরিয়া ৮৩০

আল খাযরুন রাষ্ট্র (বনি যানাতা) লিবিয়া ৮৩১

ইয়েমেনের সরকারসমূহ ৮৩৩

ইয়াফুরিয়া রাষ্ট্র (সানা, ইয়েমেন) ৮৩৪

যিয়াদিয়া রাষ্ট্র (যাবিদ - ইয়েমেন) ৮৩৪

নাজাহিয়া রাষ্ট্র (যাবিদ - ইয়েমেন) ৮৩৪

সুলাইহিয়া রাষ্ট্র (ইয়েমেন) ৮৩৪

বনু যুরাই রাষ্ট্র (এডেন, ইয়েমেন) ৮৩৫

হামদানিয়া রাষ্ট্র (সানা) ৮৩৫

যাইদিয়া রাষ্ট্র - আল আরসি (সানা - ইয়েমেন) ৮৩৬

পঞ্চম অধ্যায়: আব্বাসী খিলাফতের সমান্তরাল বিভ্রান্ত দলগুলোর সরকারসমূহ ৮৩৬

খিলাফতের সমান্তরাল বিভ্রান্ত দলগুলোর আন্দোলনের পটভূমি ৮৩৮

ইসমাইলিয়া দল ৮৪২

কারামিতা ৮৪৪

সিরিয়ায় কারামিতাদের রাজত্ব ৮৪৫

আবু সাঈদ জাম্বাবি, বাহরাইনে কারামতি সরকারের প্রতিষ্ঠাতা (২৮০ হি. থেকে ৩০১ হি.)

..... ৮৪৫

আবু তাহের কারামতি (৩০১ হি. থেকে ৩৩২ হি.) ৮৪৫

আবু মনসুর কারামতি (৩৩২ হি. থেকে ৩৫৯ হি.) ৮৪৬

আসাম কারামতি... বনু উবাইদের সাথে সংঘাত এবং কারামিতাদের পতন ৮৪৬

ইরান ও সিন্ধুতে কারামিতা ৮৪৭

আল-হাসায় কারামতি সরকার ৮৪৭

এক নজরে কারামিতা ৮৪৭

বনু উবাইদ রাষ্ট্র (দ্বিতীয় পর্যায়) আফ্রিকা ও মিশরে ইসমাইলিয়া ফেরকার সরকার ৮৪৮

৮৪৮

বনু উবাইদ ও ফ্রিম্যাসনরি আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ৮৪৯

আফ্রিকায় আবু আব্দুল্লাহ শিয়ার কর্মকাণ্ড ৮৫০

আফ্রিকার সরকারগুলোর অবস্থা ৮৫১

আগলাবিদের রাজনৈতিক সংকট এবং আবু আব্দুল্লাহ শিয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ ৮৫১

৮৫১

আবু আব্দুল্লাহ শিয়া কর্তৃক কায়রাওয়ান দখল ৮৫১

উবাইদুল্লাহ বিন মায়মুনের আফ্রিকায় আগমন ও গ্রেফতারি ৮৫২

নামধারী ‘ফাতেমি রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা ৮৫২

ওলামাদের নির্বিচারে হত্যা ৮৫২

মুসলমানদের ওপর নির্যাতন - মসজিদসমূহের অবমাননা ৮৫৩

মুসলমানদের প্রতিরোধ এবং তাদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ৮৫৪

আবু আব্দুল্লাহ শিয়ার মুখোশ উন্মোচন ৮৫৫

উবাইদুল্লাহর নির্দেশে আবু আব্দুল্লাহর হত্যাকাণ্ড ৮৫৫

ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সমাপ্তি	৮৫৬
উবাইদুল্লাহ বিন মায়মুনের ধারাবাহিক বিজয়সমূহ	৮৫৬
বনু আগলাবের প্রাসাদ ও দুর্গসমূহের ধ্বংসসাধন	৮৫৬
মাহদিয়া প্রতিষ্ঠা	৮৫৬
শরিয়তে বিকৃতি— ইসলামের নামে কুফরের প্রচার	৮৫৬
রিসালাতের প্রকাশ্য ঘোষণা	৮৫৭
মিথ্যা অভিযোগে আলেমদের ফাঁসি	৮৫৭
উবাইদুল্লাহর শিক্ষণীয় মৃত্যু	৮৫৭
অবতরণের জন্য এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান	৮৫৮
উবাইদুল্লাহর বংশপরিচয়	৮৫৮
কিছু ঐতিহাসিকের একটি গুরুতর ভুল এবং তার নিরসন	৮৫৮
উবাইদি সরকারের বিরুদ্ধে আলেমদের প্রতিক্রিয়া	৮৫৯
বনু উবাইদের সাথে মুনাজারা	৮৬০
দুনিয়াপূজারী আলেমগণ	৮৬২
বনু উবাইদ রাষ্ট্র (উত্থানকাল) আল-কায়েম	৮৬৩
আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ এবং ইসলামি আলেমদের পক্ষ থেকে সমর্থন	৮৬৩
আল-মানসুর	৮৬৬
খারেজি আবু ইয়াজিদের অভিযান এবং আহলে সুন্নাতের সাথে অমানবিক আচরণ	৮৬৬
আবু ইয়াজিদ হত্যাকাণ্ড	৮৬৬
একজন অন্ধ আলেমের সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি	৮৬৬
দ্বীন রক্ষার জন্য হক্কানি আলেমদের প্রচেষ্টা	৮৬৭
আল-মানসুরের মৃত্যু	৮৬৭
আল-মুয়িজ	৮৬৮
আলেকজান্দ্রিয়া দখল	৮৬৮
ঈদে গাদীর এবং শোক মিছিল	৮৬৯
কায়রো এবং জামে আল-আজহারের ভিত্তি স্থাপন	৮৬৯
কুফরি কবিতা	৮৬৯
কারামতিয়াদের সাথে সংঘাত	৮৭০
সিরিয়াবাসীদের ওপর জুলুম	৮৭০
ফকিহ আবু বকর নাবুলসির ওপর অমানবিক নির্যাতন	৮৭০
আন্দালুস দখলের ব্যর্থ চেষ্টা	৮৭১
আল-আজিজ	৮৭২
যদি সত্যবাদী হও তবে নিজের বংশপরিচয় বর্ণনা করো	৮৭২
ইহুদি বংশোদ্ভূত উজির ইবনে কিলিস	৮৭৩
ইহুদি উজিরের মৃত্যুতে আল-মুয়িজের শোক	৮৭৩
জাওহারের মৃত্যু	৮৭৪
সানহাজা গোত্রের ক্ষমতা	৮৭৪
আল-হাকিম	৮৭৫
হাকিমের অদ্ভুত সব নির্দেশাবলি	৮৭৫
আবু রাকুওয়ার বিদ্রোহ	৮৭৭
আবু রাকুওয়ার আত্মহত্যা	৮৭৭
জুলুমের চরম সীমা— আল-হাকিম নিজ পরিবারের হাতে নিহত	৮৭৮
মুয়িজ বিন বাদিস— আফ্রিকায় মুসলমানদের সাহায্যকারী	৮৭৮
আল-জাহির	৮৭৯
হাজারে আসওয়াদের অবমাননা	৮৭৯
সিরিয়া হাতছাড়া হয়ে যাওয়া	৮৮০
আল-মুস্তানসির	৮৮১
বাগদাদেও খুতবা	৮৮১
সাহাবীদের গালিগালাজ, আহলে সুন্নাত উলামায়ে কেরাম কারাবন্দী	৮৮১
ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে বন্ধুত্ব	৮৮১
মুস্তানসির প্রশাসনিক যোগ্যতাহীন - বদর জামালীর উত্থান	৮৮১
উত্তর আফ্রিকায় আহলে সুন্নাতের বিজয় - আল-জিরিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা	৮৮১
বনু উবাইদের ছায়া থেকে মুক্তির ঘোষণা	৮৮২
মুসলমানদের আপসে লড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা	৮৮৩
মুইজ বিন বাদিসের মৃত্যু - সীরাত ও চরিত্রের ওপর এক নজর	৮৮৪
বনু উবাইদের পতন শুরু, সিরিয়ায় সেলজুকদের দখল	৮৮৪
ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ	৮৮৪
মিশরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ	৮৮৪
বিপর্যয়ের যুগ - মুস্তানসিরের মৃত্যু	৮৮৫
বনু উবাইদ রাষ্ট্র (পতন যুগ) - আল-মুসতালি	৮৮৬
নিজারিয়া ফেরকার আবির্ভাব - হাসান বিন সাববাহ এবং শায়খুল জাবাল সিনান	৮৮৬
প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ	৮৮৬
আল-আমির	৮৮৭
আল-হাফিজ	৮৮৭
আল-জাফির	৮৮৮
আল-ফায়েজ	৮৮৮
আল-আদিদ	৮৮৮
তালিকা - বনু উবাইদের শাসকগণ	৮৮৯
বনু উবাইদ যুগের ওপর এক নজর	৮৯০
মৌলিক অধিকার হরণ	৮৯০
ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলোৎপাটন	৮৯০
সাহাবীদের অবমাননা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হওয়া	৮৯০
মালেকী ফিকহের ওপর নিষেধাজ্ঞা	৮৯১
আযান ও নামাযে পরিবর্তন - মসজিদগুলো জনশূন্য	৮৯১
কায়রো নির্মাণের ওপর এক দৃষ্টি	৮৯১
চিন্তার মুহূর্ত	৮৯২
বনু উবাইদ ও বনু বুওয়াইহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রশ্ন	৮৯৩
বাতিনী রাষ্ট্র আলমুত	৮৯৪
ইসমাইলি দাঈর বেশে হাসান বিন সাববাহ	৮৯৪
আলমুত দখল	৮৯৫
কৃত্রিম জালাত ও হাশিশের পাতা	৮৯৬
মালিক শাহর দূত প্রেরণ এবং হাসানের প্রভাব-প্রতিপত্তি	৮৯৭
বাতিনীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র - খানজান দুর্গ	৮৯৮
সরকারি কর্মচারীদের তদন্ত	৮৯৯
বাতিনীদের হাতে ফখরুল মুলকের শাহাদাত	৮৯৯
ইসফাহানের বাতিনী দুর্গে সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকির অভিযান এবং শায়খ সানজানী (রহ.)-এর দূরদর্শিতা	৮৯৯
ইবনে আভাশের হত্যা এবং খানজান দুর্গের ধ্বংসসাধন	৯০০

হাসান বিন সাব্বাহর মৃত্যু এবং তার উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ড ৯০০

জালালুদ্দিন হাসানের ইসলাম প্রকাশ ৯০১

আলমুতের ধ্বংস ৯০১

ইসমাইলিদের অন্যান্য দলসমূহ ৯০৩

নিজারি ৯০৩

বোহরা ৯০৩

আগাখানি ৯০৪

গ্রিক দর্শনের আক্রমণ এবং বাতিনিয়্যাহর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণা ৯০৫

দর্শন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুতাজিলা ও বাতিনিয়্যাহর মধ্যে পার্থক্য ৯০৫

আল-ফারাবি এবং বু আলী সিনা ৯০৬

বাতিনিয়্যাহ ৯০৭

দার্শনিক ফিতনাগুলোর মোকাবিলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ৯০৯

শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাইল আনসারি রহ. ৯১০

ইমাম আবু ইসহাক শিরাজি রহ. ৯১২

ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি রহ. ৯১৪

ইমাম আবু হামিদ গাজালি রহ. ৯১৫

ইমাম আল-কিয়া আল-হাররাসি ৯১৭

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহ. ৯১৮

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর সংস্কারক এবং সুলুক ও ইহসানের ইমামগণ ৯২০

হযরত শাইখ আব্দুল কাদির জিলানি রহ. ৯২০

আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. ৯২২

শাইখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহ. ৯২৪

এক নজরে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পাঁচ শতাব্দী ৯২৬

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী ৯২৭

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ৯৩৭

চতুর্থ হিজরি শতাব্দী ৯৫১

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ৯৬৪

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দী ৯৭৮

সপ্তম হিজরি শতাব্দী ৯৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির উত্তর ১০০৩

ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে আপত্তিসমূহ ১০০৪

ইমাম আবু হানিফা এবং খুররজ-এর সমর্থন ১০০৫

(১) ইমাম বালাজুরি রহ.-এর বর্ণনা ১০০৫

(২) আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো ১০০৫

(৩) আবুল ফারাজ ইসফাহানি থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো ১০০৬

(৪) আবু বকর জাসসাস আল-রাজি রহ.-এর মন্তব্য ১০০৮

(৫) খতিব বাগদাদি রহ. থেকে বর্ণিত বর্ণনা ১০০৮

(৬) মুওয়াফফাক মক্কি রহ. থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো ১০০৯

(৭) মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মদ হানাফি রহ.-এর বর্ণনা ১০১০

(৮) জামালুদ্দিন হুসাইনির বর্ণনা ১০১০

একমাত্র বর্ণনা যা দুর্বলতা সত্ত্বেও অনেকটা নির্ভরযোগ্য ১০১১

ইমাম মালিক এবং খুরজের পৃষ্ঠপোষকতা ১০১৩

১. ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনা ১০১৩

২. জামালুদ্দীন হুসাইনীর বর্ণনা ১০১৪

৩. ইবনে তাইমিয়া ও দিনাওয়ারীর বর্ণনা ১০১৪

খুরজ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম শাফেয়ীর প্রবণতা ১০১৫

সারকথা ১০১৬

সীরাতে ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ওপর আপত্তি ১০১৭

উন্মতের আলেমদের দৃষ্টিতে ইমাম তাবারীর মর্যাদা ১০২৫

ইমাম তাবারী সম্পর্কে ইসলামের মহান আলেমদের অভিমত ১০২৫

ইমাম আবু বকর ইবনে খুজাইমার অভিমত ১০২৫

আবদুর রহমান বিন ইউনুস আল-মিসরী আল-হাফিজের অভিমত ১০২৬

আবদুল আজিজ আবুল হাসান আল-তাবারীর অভিমত ১০২৬

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারগানীর অভিমত ১০২৬

ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনীর অভিমত ১০২৭

আল-হাফিজ আবু ইয়ালা আল-খালীলীর অভিমত ১০২৭

খতীব বাগদাদীর অভিমত ১০২৭

ইমাম আবদুল কাহের আল-বাগদাদী আবু মনসুর আল-ইসফারায়িনীর অভিমত ১০২৮

ইমাম আবু ইসহাক শিরাজীর অভিমত ১০২৮

আল্লামা ইবনে সালাহর অভিমত ১০২৮

ইমাম শরফুদ্দিন নববীর অভিমত ১০২৮

আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকীর অভিমত ১০২৮

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত ১০২৮

হাফিজ যাহাবীর অভিমত ১০২৯

হাফিজ ইবনে কাসীরের অভিমত ১০২৯

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত ১০২৯

আল্লামা মাহমুদ আলুসীর অভিমত ১০২৯

সমকালীন ইলমী উৎস থেকে সমর্থনমূলক কিছু উদাহরণ ১০২৯

উস্তাদ ও হাদীস ১০৩০

ইমাম তাবারীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ১০৩২

হাদীস, তাফসীর ও আকায়েদের কিতাবসমূহে তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস ও বক্তব্যের প্রমাণসমূহ ১০৩৩

হাদীসের কিতাবসমূহে ইমাম তাবারীর বর্ণনা ১০৩৩

তাফসীরের কিতাবসমূহে ইমাম তাবারীর বর্ণনা ১০৩৪

আকায়েদ ও আহকামের কিতাবসমূহে ইমাম তাবারীর বর্ণনা থেকে দলিল গ্রহণ ১০৩৫

রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা নির্ধারণে ইমাম তাবারীর মতামতের ওপর নির্ভরতা ১০৩৫

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণে ইমাম তাবারীর মতামতের ওপর গবেষকদের নির্ভরতা ১০৩৬

ইমাম তাবারী এবং তারিখুত তাবারীর ওপর কিছু আপত্তির জবাব ১০৩৭

ইমাম তাবারীর দাফন রাতে হওয়া কি তাঁর রাফেযী হওয়ার দলিল? ১০৩৭

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে শিয়া বলেছেন? ১০৩৮

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা সম্বলিত মুরসাল বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করা কি তাঁর রাফেযী হওয়ার প্রমাণ? ১০৩৯

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি দুই পা মাসেহ করার প্রবক্তা ছিলেন? ১০৪৩

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি বাতিল আকিদার অধিকারী ছিলেন? ১০৪৬

ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি মিথ্যা সনদ তৈরি করতেন? ১০৪৭

সারী বারবার ইমাম তাবারীকে কীভাবে বর্ণনা লিখে পাঠাতেন? ১০৪৮

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি ইমাম তাবারীর ওপর রাফেযীদের জন্য বর্ণনা জাল করার অভিযোগ করেছেন? ১০৪৮

হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি ইমাম তাবারীর ওপর শিয়াদের জন্য বর্ণনা তৈরির অভিযোগ আরোপ করেছেন? ১০৪৯

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ওপর কি ইমাম দারাকুতনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জরাহ করেছেন? ১০৫০

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক গাদীরে খুমের হাদিসকে সহীহ বলা কি শিয়া হওয়ার প্রমাণ? ১০৫১

আবু হাইয়ান আন্দালুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি ইমাম তাবারীকে শিয়াদের ইমাম বলেছেন? ১০৫৩

হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি ইমাম তাবারীকে শিয়াদের ইমাম বলেছেন? ১০৫৫

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-র ওপর লানত করেছেন? ১০৫৬

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী এবং মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম কি একই ব্যক্তি ছিলেন নাকি দুইজন? ১০৫৮

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি নবীদের নিষ্পাপতা এবং সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে বর্ণনা জাল করেছেন? ১০৫৯

ইমাম তাবারীর অদ্ভুত ও বিরল বর্ণনা সংগ্রহ করা কি তাঁর ভ্রান্ত আকিদা হওয়ার প্রমাণ? ১০৬০

দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী এবং জাল বর্ণনার তালিকায় ইমাম তাবারীকে নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি ১০৬৬

জাল বর্ণনা চেনার কিতাবগুলোতেও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি ১০৬৮

সারকথা ১০৭০

চারটি বড় উদ্ধৃতি ১০৭০

বিবিধ প্রশ্নাবলি ১০৭৩

উমাইয়া আমলের ইতিহাস কি বানোয়াট এবং তাদের বিরোধী আব্বাসী খলিফাদের তত্ত্বাবধানে লিখানো হয়েছে? ১০৭৩

আব্বাসী আমলের ইতিহাসে কি তাদের দোষত্রুটি শিয়া বর্ণনাকারীরা অন্তর্ভুক্ত করেছে? ১০৭৬

বনু আব্বাসের আমলে আঞ্চলিক সরকারগুলোর প্রতিষ্ঠাকে কেন মেনে নেওয়া হয়েছিল? ১০৭৭

আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং ফুকাহায়ে কেরামের ভূমিকা ১০৭৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

পাঠকদের প্রতি কিছু কথা

উম্মতের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এখন আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে রাজনৈতিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এই যুগের প্রাথমিক বছরগুলোতে আনাস বিন মালিক (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মতো ইলম ও ফজিলতের মূর্ত প্রতীকগণ বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক বিষয়াবলি থেকে—যা ইতিহাসের প্রধান অংশ হয়ে থাকে—বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ ইলমি ও তারবিয়াতি কর্মকাণ্ডে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নির্জনবাসে জীবন অতিবাহিত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন সাহাবীর অবস্থাও প্রায় একই ছিল। মোদাকথা, এখন আমরা যে যুগের পাতা উল্টাতে শুরু করেছি, তাতে এমন কোনো মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যার সাথে রাজনৈতিক সংঘাতকে মুশাজারাতে সাহাবার মতো নাজুক বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পাঠকদের কাছে এটি গোপন নয় যে, হযরত উসমান জুন-নুরাইন (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনের সূচনা থেকে শুরু করে ৭৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতের সময় পর্যন্ত আমরা ঘটনাবলির যাচাই-বাছাই এবং ব্যক্তিবর্গের অবস্থা অনুসন্ধানে সেই কঠোর শর্তাবলি মেনে চলেছি, যা মুহাদিসগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবলম্বন করতেন। আমরা গত খণ্ডের শুরুতে এই শর্তাবলির প্রয়োজনীয়তার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছি এবং এটি প্রমাণ করেছি যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগের পারস্পরিক বিবাদ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সঠিক চিত্র ও ব্যাখ্যা তখনই সামনে আসতে পারে যখন আমরা ইতিহাস সংকলনের জন্য সহিহ সনদের বর্ণনাগুলোকে মানদণ্ড বানাব এবং সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক জয়িফ বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করব। ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে তাঁদের বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর ছড়িয়ে দেওয়া সন্দেহজনক ও মাওজু বর্ণনাগুলোর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার এটাই একমাত্র পথ এবং এখন পর্যন্ত আমরা এটিই ব্যবহার করে আসছি।

এখন আমরা সাহাবায়ে কেরামের স্থলে পরবর্তী প্রজন্মকে পরিস্থিতির লাগাম ধরতে দেখছি। এই নতুন প্রজন্মে সাহাবীদের তারবিয়াতি ছাঁচে গড়া নেক ও সালেহ ব্যক্তিরাত ছিলেন, আবার তাঁদের সোহবত ও তারবিয়াত থেকে বঞ্চিত আমলহীন ও দুশ্চরিত্রের লোকও ছিল। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ এবং উমর বিন আবদুল আজিজের মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যাঁরা উম্মতের জন্য মহান কীর্তি সম্পাদন করেছেন; আবার এমন লোকও ছিল যারা নেক সোহবতে থেকেও তাজকিয়ায়ে নাফস এবং অভ্যন্তরীণ তারবিয়াত থেকে উপকৃত হতে পারেনি এবং উম্মত...

...জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এমন কিছু ব্যক্তিও ছিলেন যাদের কিছু অবস্থা ঈর্ষণীয় ছিল কিন্তু কোনো কোনো সময় তারা ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত দেখা যেতেন। এমন লোকও ছিলেন যারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্মত্তের জন্য কষ্টের কারণ প্রমাণিত হয়েছিলেন কিন্তু শেষ বছরগুলোতে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। এটি কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে এবং বিশ্বের প্রতিটি সমাজে এমন ব্যক্তিদের উদাহরণ রয়েছে যারা ভালো-মন্দ, মিশ্র কাজ করেছেন। কিছু উপকারী ও সওয়াবের কারণ এবং কিছু ক্ষতিকর ও গুনাহের কারণ।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকগুলোতে পূর্ণতা, ভারসাম্য ও অবিচলতার অধিকারী সেই জামাত দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিল যাদের প্রতিটি সদস্য ‘আস-সাহাবাতু কুল্লুহুম উদুল’ মানদণ্ডের অধীনে সমালোচনার উর্ধ্ব ছিলেন। তাদের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিলেন সেই সব লোক যাদের সম্পর্কে মুহাদিস ও ফকীহগণ ‘হুম রিজালুন ওয়া নাহনু রিজালুন’ মানদণ্ড নিয়ে প্রতিটি ব্যক্তিকে যাচাই ও পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরও তাদের সমস্ত ফজিলত ও মর্যাদা সত্ত্বেও কোনো সাধারণ সাহাবীর সমান হতে পারতেন না এবং উন্মত্তের কোনো সামষ্টিক প্রয়োজনে যেমন কোনো ইলমি আলোচনা বা রাজনীতিতে সঠিক পথ অনুসন্ধানের জন্য আহলে ইলমগণ তাদের ওপর সমালোচনার অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। এই কারণেই মুহাদিসগণ তাদের কাউকে সিকাহ, কাউকে সাদুক, কাউকে জয়ীফ এবং কাউকে অবিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সিকাহ, হুজ্জাত এবং উন্মত্তের ইমাম হিসেবে স্বীকৃত, তাদের ওপর জারাহ করার জন্য অবশ্যই ঐতিহাসিক বর্ণনার সনদ সহীহ হওয়া জরুরি হবে। কিন্তু যারা এই মর্যাদা ও স্তরের নন, যদি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো জয়ীফ বর্ণনা থেকে দলিল গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে, তবে যৌক্তিক মূলনীতির বিচারে তাতে কোনো ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। ফলে আমরা পরবর্তী যুগে এমন অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা ছাড়াই জয়ীফ বর্ণনাগুলোকেও গ্রহণ করেছি।

কাল এবং রিজাল-এর পার্থক্য ছাড়াও জয়ীফ বর্ণনা গ্রহণের দ্বিতীয় কারণ হলো, পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সহীহ বা হাসান বর্ণনা (চাই তা ঐতিহাসিক হোক বা হাদিস সংক্রান্ত) খুবই কম। অনেক অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে আমরা একটিও সহীহ বা হাসান বর্ণনা পাই না। এখন যদি আমরা এখানেও সেই মানদণ্ড বজায় রাখার চেষ্টা করি যা সাহাবায়ে কেরামের যুগের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে ফলাফল এই দাঁড়াবে যে আমরা আমাদের ইতিহাসের একটি বিশাল অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। এছাড়া পরবর্তী যুগের ঘটনাবলির অধিকাংশ অংশ খলিফা ও বাদশাহদের সিংহাসন আরোহণ, পদচ্যুতি, বিজয়, অভিযান এবং বিদ্রোহের মতো পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এই ধরনের আলোচনায় সাধারণ সূত্রের খবর (যদি তা অকাট্যভাবে বর্ণনার পরিপন্থী না হয়) নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত, যেমন আজও বিশ্বের খবরাখবরের জন্য আমাদের নির্ভরতা সাধারণ সংবাদে ওপর।

তাই আমরা উল্লিখিত এই দুটি কারণের প্রেক্ষিতে পরবর্তী যুগগুলোর বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করব। তবে সতর্কতা ও দ্রায়াত-এর মূলনীতি কার্যকর থাকবে। যেখানে গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হবে সেখানে বর্ণনাকে দ্রায়াতের মূলনীতিতে যাচাই করব এবং চেষ্টা করব যেন প্রাচীনতম উৎসেরই উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার মূলে পৌঁছানো যায় যাতে বানোয়াট কথা ও বিভ্রান্তি থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা যায়। তবে সাধারণ ঘটনাবলি যেখানে কোনো মতভেদ নেই, সেখানে পরবর্তীকালের আলেমগণ যেমন: হাফেজ ইবনে কাসীর,

আল্লামা ইবনে আসীর এবং হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে।

□□□

ইতিহাসের ছাত্ররা সাধারণত একটি বড় বিভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইতিহাস এক আলাদা জগত এবং ইসলামি বিধান অন্য কোনো জগতের জন্য। এই কারণেই কুরআন মাজীদ, হাদীস এবং ফিকহের ইসলামি বিধান ও আদবের অধীনে সেই সব শিক্ষা পড়ার সময় যেগুলোর সম্পর্ক শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি এবং উম্মাহর নেতৃত্বের সাথে, খুব কম লোকের মনেই এই কথা আসে যে, এই শিক্ষাগুলোর বাস্তব রূপায়ন, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীতে সেগুলোর প্রয়োগ এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীতে সেগুলো থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অন্যদিকে ইতিহাসে রাজনৈতিক সংকট, গৃহযুদ্ধ, সালতানাতের পতন এবং জাতিসমূহের অধঃপতনের ঘটনাবলী পড়ার সময় খুব কম লোকের মনেই এই চিন্তা আসে যে, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় কারণ হলো সেই সব নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যা ইসলাম আমাদের দিয়েছে। এই মানসিকতার পেছনে মূলত সেকুল্যার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের সেই প্রচেষ্টা সক্রিয় রয়েছে যাতে তারা দীর্ঘকাল ধরে লিপ্ত। এই প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করা, শাসনব্যবস্থা ও ধর্মের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা এবং রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রবণতা ও ধর্মীয় নৈতিকতা বর্জিত করা। পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির এক বিশাল অংশ এই মানসিকতা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং রাজনীতিতে ইসলামের কোনো অংশ মানতে তারা প্রস্তুত নয়। এই ধরনের রাজনীতি সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল যথার্থই বলেছেন:

দ্বীন যদি রাজনীতি থেকে আলাদা হয়ে যায়, তবে তা কেবল চেঙ্গিসী হয়েই অবশিষ্ট থাকে।
উম্মাহর ইতিহাসের গত দুই অংশের মতো এই অংশেও পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে যেন দ্বীন ও রাজনীতির এই সম্পর্ককে সামনে রেখে ঐতিহাসিক বিপ্লবগুলোকে স্পষ্ট করা যায়, যাতে পাঠকদের এই বিশ্বাস জন্মে যে, অতীতেও আমাদের প্রতিটি পরাজয় এবং প্রতিটি গৃহযুদ্ধের মূল কারণ ছিল ইসলামি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং দ্বীনি রাজনীতি থেকে বিমুখতা; আর বর্তমানেও এমন প্রতিটি সংকটের সমাধান মুমিনসুলভ নৈতিকতা অবলম্বন এবং দ্বীন অনুযায়ী রাজনীতি করার ওপর নির্ভরশীল।

ইতিহাসের সংশোধন ও নতুন বিন্যাসের এই সফর অব্যাহত রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহত থাকবে। পাঠকদের কাছে সাহস, সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং কবুলিয়াতের জন্য দোয়ার বিনীত আবেদন রইল।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

রবিবার - ৪ রমজানুল মুবারক ১৪৩৯ হিজরি

২০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ - মাগরিবের পর

প্রথম অধ্যায়

বনু মারওয়ানের খিলাফত

৭৩ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি

৬৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ

আবদুল মালিক বিন মারওয়ান

জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি থেকে শাওয়াল ৮৬ হিজরি পর্যন্ত

অক্টোবর ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অক্টোবর ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

১৭ জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি থেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনের যুগ শুরু হয়, যার পর ১৩২ হিজরি পর্যন্ত তার সন্তানরাই মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। আমরা বর্তমান যুগের সাধারণ ঐতিহাসিকদের বিপরীতে এই শাসনকালকে “খিলাফতে বনু মারওয়ান” নামে অভিহিত করেছি; কারণ “বনু উমাইয়া” ছিল একটি বিশাল গোত্র যার অন্যান্য শাখাগুলো এই নতুন শাসনে শরিক ছিল না। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর বনু উমাইয়ার দুটি পরিবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল:

প্রথমটি ছিল হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর পরিবার। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বংশধারা হলো “মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান বিন হারব বিন উমাইয়া”। এই পরিবারে তাঁর পর ইয়াজিদ এবং মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ শাসক হয়েছিলেন। এটি ছিল বনু উমাইয়ার সুফিয়ানি শাখা যার শাসন এখানেই শেষ হয়ে যায়।

এরপর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতের যুগ শুরু হয়েছিল যার সময়কালে মারওয়ান বিন আল-হাকাম একজন বিদ্রোহী হিসেবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। মারওয়ানের বংশধারা হলো “মারওয়ান বিন আল-হাকাম বিন আল-আস বিন উমাইয়া”। পরবর্তীতে মারওয়ানের সন্তানরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর সন্তান বা বনু উমাইয়ার অন্যান্য পরিবারের এতে কোনো অংশ ছিল না, কেবল তাদের কিছু ব্যক্তি রাষ্ট্রের কিছু অধস্তন পদে আসীন ছিলেন। এই কারণেই প্রাচীন ঐতিহাসিকগণও এই শাসক পরিবারের জন্য “বনু মারওয়ান” বা “আলে মারওয়ান” পরিভাষাটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন এবং আমরাও এটিকেই গ্রহণ করেছি।

আবদুল মালিক - খলিফা নাকি বাদশাহ?

আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের সাথে সাথেই হিজাজও আবদুল মালিকের সামনে নতি স্বীকার করে। সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা এবং ইরাক আগেই তার দখলে চলে এসেছিল। এভাবে মুসলিম বিশ্বে এখন আর তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; তাই সব জায়গার সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার বায়াত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

বনু মারওয়ানের এই শাসনের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতভাবেই কোনো আইনি ও শরয়ি পদ্ধতিতে হয়নি বরং এই শাসন ছিল একটি সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক বিদ্রোহ...

এর ফলে অস্তিত্বে এসেছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর অস্তিত্ব অস্বীকার করাও সম্ভব ছিল না। এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না যে, এখন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক ইমামত মারওয়ানের বংশধরদের কবজায়। এখন কথা হলো, এই সরকারকে রাজতন্ত্র বলা হবে নাকি খিলাফত? তো এই বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মত হলো, এই ধরনের সরকার কাঠামোর দিক থেকে রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যদি শাসকের মধ্যে খলিফার প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যবস্থাকে স্থগিত না করেন এবং শরীয়তকেই রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে কার্যকর রাখেন এবং মুসলিম জনগণ এই সরকারকে রাজনৈতিক কেন্দ্র ও ঐক্য হিসেবে মেনে নেয়, তবে একে “খিলাফত” বলার অবকাশ আছে, চাই খলিফার মধ্যে ব্যক্তিগত ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকুক না কেন। এই খিলাফত, খিলাফতে রাশেদার মতো আদর্শ বা অনুকরণীয় নমুনা হবে না, তবে একে “খিলাফতে আম্মাহ” (সাধারণ খিলাফত)-এর মর্যাদা দেওয়া হবে এবং এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য খিলাফতের দাবি করা সঠিক হবে না যাতে মুসলমানরা রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

মোদাকথা, ইসলাম এমন পরিস্থিতিতেও পথনির্দেশনা দিয়েছে যে মুসলমানরা এমন অবস্থার মোকাবিলা কীভাবে করবে। কুরআন ও সুন্নাহ এবং আকল ও নকলের দলিল থেকে উপকৃত হয়ে উম্মতের ফকিহগণ এই নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন যে, যে শাসক মুসলমানদের সম্মতি ছাড়াই তরবারির জোরে তাদের ওপর চেপে বসবে, তাকে খলিফা বা ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। এরপর সে চাই জুলুম করুক না কেন, তার বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করা হবে এবং বৈধ কাজে তার আনুগত্য করা হবে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন:

“অধিকাংশ আলেমের অবস্থান হলো, জালেম শাসকের আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে উত্তম; কারণ তার মোকাবিলা ও বিদ্রোহের ক্ষেত্রে শান্তির পরিবর্তে ভয়ভীতি, রক্তপাত, নির্বোধ লোকদের বাড়াবাড়ি, মুসলমানদের ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং জমিনে ফাসাদের আশঙ্কা থাকে।” [১]

এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে শুনলেন যে পরবর্তী যুগে জালেম আমিররা চেপে বসবে, তখন তারা আরজ করলেন: “আমরা কি তাদের মোকাবিলা করব না?” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম রাখে।” [২]

এই কারণেই উম্মতের আলেমগণ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং তার উত্তরসূরিদের খলিফাদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাদের জন্য খলিফার উপাধি “আমিরুল মুমিনীন”-ই ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণেই যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আবদুল মালিককে পত্র লিখে বায়আত গ্রহণ করেন, তখন “আমিরুল মুমিনীন” উপাধি ব্যবহার করেন। সেই পত্রের পাঠ ছিল নিম্নরূপ:

“আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের নামে: আমি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীনের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী আনুগত্য ও বাধ্যগত থাকার অঙ্গীকার করছি। আমার পুত্ররাও এর অঙ্গীকার করেছে।” [৩]

একইভাবে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ (রহ.)-ও, যিনি রাজনৈতিক বিবাদ থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন, বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত পত্র পাঠান:

[১] তাফসীরে কুরতুবী: ১০৯/২, ত: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৯১০, কিতাবুল ইমারাহ, বাব খিয়ারুল আইম্মাহ ওয়া শিরারুহম।

[৩] “যখন মানুষ আবদুল মালিকের বায়আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে লিখলেন: ‘আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের প্রতি, আমি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের জন্য আল্লাহর সুন্নাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমার সামর্থ্য মোতাবেক শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি এবং আমার পুত্ররাও এর অঙ্গীকার করেছে।’” (সহীহ বুখারী, হা: ৭২০৫, কিতাবুল আহকাম, বাব কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাস)

“আমি উম্মতকে মতভেদ করতে দেখে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিলাম। এখন খিলাফতের বিষয়টি আপনার কাছে এসেছে। আর মানুষ আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে, তাই আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমি আপনার প্রতিনিধি হাজ্জাজের হাতে আপনার বাইয়াত গ্রহণ করছি। আমরা চাই যে আপনি নিরাপত্তা প্রদান করবেন এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন, কারণ অঙ্গীকার ভঙ্গের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”

আব্দুল মালিক জবাবে লিখলেন: “আমি আপনাকে আল্লাহ ও রাসূলের জিম্মায় এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের কোনো ক্ষতি করা হবে না।” [১]

আব্দুল মালিকের খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ৮০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [২]

বনু মারওয়ানের রাজনীতি:

বনু মারওয়ানের শাসকরা নিজেদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এর যোগ্যতাও তাদের ছিল। তারা যুদ্ধবিদ্যা এবং রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আব্দুল মালিক এবং তার সন্তানদের অধিকাংশ খিলাফতের পদের অধিকাংশ শর্তও পূরণ করতেন। যদিও তাদের মধ্যে কিছু খলিফা অসংলগ্নতা, বাড়াবাড়ি এবং রাজনৈতিক বিচ্যুতিতে লিপ্ত হয়েছিলেন, তবে তাদের অধিকাংশ খলিফা সাধারণ অবস্থায় প্রজাবৎসল ছিলেন। ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুতি এবং জুলুমের উদাহরণ আমরা সাধারণত সেই সব ক্ষেত্রে দেখতে পাই যখন তাদের কোনো বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হতো অথবা যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে আসত এবং সবকিছুর উর্ধ্বে যখন ক্ষমতা এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে স্থানান্তরিত হতো। এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রক্তপাতে কোনো দ্বিধা বোধ করত না।

বনু মারওয়ানের ইশতেহার:

উম্মতের ইতিহাসের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে আমাদের বারবার এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় যে, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের সরকারকে হরণকারী কোনো উচ্চাভিলাষী যখন নিজে ক্ষমতার মসনদে বসত, তখন সে পূর্ববর্তী শাসকের মতোই প্রজাবৎসল, দয়ালু এবং উম্মতের কল্যাণকামী প্রমাণিত হতো। এর কারণ ছিল এই যে, সেই যুগে কল্যাণ প্রবল ছিল এবং মানুষের ধর্মীয়, আদর্শিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। অধিকাংশ রাজনীতিবিদ জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অবশ্য কখনো কখনো তারা কোনো ভুল বোঝাবুঝি, কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা গোত্রীয় শত্রুতার কারণে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতেন, কিন্তু যখন বিদ্রোহে সফল হয়ে নিজেরা সরকার গঠন করতেন, তখন সাধারণত প্রজাবৎসল আচরণ করতেন। তাদের কাছে কোনো আলাদা ধর্ম, কোনো ইসলাম-বিরোধী ইশতেহার বা নতুন কোনো সংবিধান ছিল না যার মাধ্যমে তারা উম্মতকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গোমরাহিতে ঠেলে দেবেন। বরং আদালতগুলোতে শরয়ী আইনই প্রচলিত ছিল যা শাসকরাও মেনে চলতেন; তাই তাদের যুগে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাও ছিল এবং বৈদেশিক বিজয়ের ধারাও অব্যাহত ছিল। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য লক্ষ্য রাখার মতো। তা হলো এই যে, কোনো ব্যবস্থা রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১১০, ত. দার সাদির

[২] আনসাবুল আশরাফ: ২/২৯৩, ত. দারুল ফিকর

চাই তা যত বড়ই ব্যাপক কর্মসূচি প্রদান করুক না কেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হয় যতক্ষণ রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও অনুধাবনের ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। অন্যথায় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যুক্তি এবং নিয়ম-কানুনের দপ্তরকে একপাশে সরিয়ে রেখে শক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে এবং এর ফলাফল এক পক্ষের শোচনীয় পরাজয় অথবা উভয় পক্ষের ধ্বংসের রূপ নিয়ে সামনে আসে। যাদেরকে আমরা তলোয়ার ও বর্শার জোরে ক্ষমতা দখল করতে দেখি, তারা সবাই যে স্বভাবগতভাবে নিষ্ঠুর ও জালেম ছিলেন তা নয়, বরং তাদের অধিকাংশকেই আমরা সাধারণ জীবনে দয়ালু, ভদ্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে পাই। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, সেই যুগের মানুষ যুক্তির পরিবর্তে তলোয়ারের মাধ্যমে ফয়সালা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল; তাই প্রত্যেককে রাজনৈতিক সংগ্রামে তলোয়ারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি সুসংবদ্ধ সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা:

এ ধরনের বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি সামনে আসে যে, আসল ত্রুটি ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথার মধ্যে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনায় গেঁথে যাওয়া স্থবিরতার কারণে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কোনো সুসংবদ্ধ কর্মপন্থা প্রণয়ন করা হয়নি। যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হতো যার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়টি রক্তপাত ছাড়াই সম্পন্ন হতো, তবে মুসলিম উম্মাহ অনেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারত। কুরআন মাজীদ শ্রেষ্ঠ মানুষের মাপকাঠি হিসেবে ‘সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী’ নির্ধারণ করেছে। [১] কুরআন ও সুন্নাহ এমন ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য شورايت (পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা) এবং استيناس (মানুষের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ) এর মতো মৌলিক নীতি প্রদান করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য, শাসকের শর্তাবলী এবং দায়িত্বসমূহও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ফকীহগণ নিয়মিত কিতাব রচনা করেছেন যেমন ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর ‘আস-সিয়ারুল কাবীর’, ইমাম গাজালীর ‘আত-তিবরুল মাসবুক’, আল্লামা মাওয়াদীর ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ’ এবং তর্জুমীর ‘সিরাজুল মুলুক’। কুরআন ও হাদীস, খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা এবং ফিকহী ভাণ্ডার থেকে সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা মোটেও কঠিন ছিল না।

এই সিলসিলায় হযরত উমর রা.-এর ফর্মুলাকে উন্নত করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থার রূপ দেওয়া যেত। একটি রাজনৈতিক দস্তুর বা সংবিধান তৈরি করা যেত। উদাহরণস্বরূপ, উম্মাহর একশ জন শ্রেষ্ঠ মুরুব্বী এবং ইলম ও ফযীলতের অধিকারীদের নিয়ে একটি শূরা গঠন করা যেত। যেকোনো শাসক নির্বাচনের ক্ষমতা তাদের কাছেই থাকত। তাদের মধ্যে রাজধানী বা দারুল খিলাফতের ব্যক্তিবর্গও থাকতেন এবং অন্যান্য প্রদেশ ও বড় শহরগুলোর প্রতিনিধিরাও থাকতেন। এই ব্যক্তিবর্গ খিলাফতের জন্য পাঁচ বা দশজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করতেন। তারপর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠজনকে বেছে নিতেন। যদি তাদের মধ্যে ঐকমত্য না হতো, তবে এই মজলিসে শূরায় ভোটদানের পদ্ধতি অবলম্বন করা যেত যেমনটি হযরত উমর ফারুক রা.-এর ছয় সদস্যের কমিটি করেছিল। মতপার্থক্য দূর করা এবং ঐকমত্যের দৃঢ়তার জন্য জনপদ থেকেও মতামত নেওয়া যেত যেমনটি হযরত উসমান রা. এবং হযরত আলী রা.-এর মধ্যে কোনো একজনকে খলিফা বানানোর জন্য আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের মতামত নিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়াকে নিয়মিত ভোটদানের রূপ দেওয়াও কোনো কঠিন ছিল না। এটিও নির্ধারণ করা যেত যে, জরুরি অবস্থা ছাড়া সাবেক শাসকের কোনো...

[১] নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

নিকটাত্মীয়, ভাই, ছেলে ইত্যাদিকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হবে না, যেমনটি হযরত উমর (রা.) গুরুত্বের সাথে করেছিলেন। সংবিধানে এমন একটি ধারা রাখা যেত যার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ থাকত এবং খেলাফত কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির ওপর আধিপত্য বিস্তার করত না এবং অন্যদের কোনো অভিযোগ থাকত না। শাসকের বা খলিফার ওপর এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেত যে, ফকীহদের অনুমোদন ব্যতীত তার কোনো আদেশ কার্যকর হবে না, যাতে শাসকের আদেশ শরীয়তের সীমানা অতিক্রম না করে। শরয়ী আদেশ-নিষেধের আওতায় আসা বিষয়সমূহ এবং মুবাহ (বৈধ) সীমার অন্তর্ভুক্ত নিছক প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে আলাদা রাখার একটি ব্যবস্থাও করা যেত। শরীয়তের অবমাননা করা, অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া এবং জাতির স্বার্থের ওপর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া শাসককে অপসারণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শক্তিশালী কমিটিও গঠন করা যেতে পারত। এই শেষোক্ত দুটি ধারা উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের কেউ কেউ তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামী ইতিহাসের যেকোনো যুগে এবং যেকোনো সমাজে হাদীস ও ফিকহী ভাণ্ডার থেকে কাজ নিয়ে একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও সংরক্ষিত ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব ছিল।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থবিরতার আসল কারণ

কিন্তু এই সবকিছু তখনই সম্ভব হতো যখন রাজনৈতিক শ্রেণি এর জন্য প্রস্তুত থাকত। যখন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উত্তরাধিকার নীতি আঁকড়ে ধরে ক্ষমতার জোর খাটিয়ে তা নিজেদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নীতি গ্রহণ করল, তখন ফকীহ ও মুজতাহিদদের প্রচেষ্টা কেবল বইয়ের পাতায়ই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। যদি এমন কোনো ব্যবস্থা কার্যকর হতো এবং রণকৌশলী ও বীর যোদ্ধারা তা মেনে চলতেন, তবে আমরা ক্ষমতার সিঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হতে দেখতাম না। আমাদের ইতিহাসের বিয়োগান্তক ঘটনার সময়কাল অনেক কম হতো; কারণ এই পরিবারগুলোর অনেক সদস্যই শাসন পরিচালনার গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর শাহাদাত এবং এর নেপথ্যের সম্ভাবনা

আবদুল মালিকের খেলাফতের শুরুতে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর শাহাদাতের বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, যিনি শেষ যুগের একজন মহান সাহাবী ছিলেন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হজ পালন করতেন। ৭৩ হিজরিতে তিনি যথারীতি হজ পালন করেন। মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার সময় তিনি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের লোকেরাও সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিল। প্রচণ্ড ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির মধ্যে তাদের কারো বর্শা আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর পায়ের তলায় বিদ্ধ হয়। [১]

পায়ের তলা ছাড়াও বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তার পাশের আঙুলের মধ্যবর্তী পর্দা কেটে যায় এবং এত রক্ত প্রবাহিত হয় যে তার পা সওয়ারির রেকাবের সাথে আটকে যায়। [১]

তিনি ইবাদতে এতটাই মগ্ন ছিলেন যে তা অনুভব করতে পারেননি। তার সাহেবজাদা সালেম রক্ত দেখে তাকে অবহিত করেন। [২]

সাইদ বিন জুবায়ের (রা.) রেকাব থেকে পা বের করেন, [৩] আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)

এই অবস্থাতেই হজের কার্যাদি সম্পন্ন করেন। [৪]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৯৬৬, কিতাবুল জুমুআহ, বাব মা ইউকরাহ মিন হামলিস সিলাহ ফিল ঈদ ওয়াল হারাম; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৮৬, ১৮৭, দার সাদর।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৮৫, ১৮৬।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৯৬৬।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১৮৫, ১৮৬।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অসুস্থতা দেখতে তাঁর বাসভবনে এল। আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিছানায় শুয়ে ছিলেন, হাজ্জাজ সালাম দিল, তিনি উত্তর দিলেন। সে জিজ্ঞেস করল: “কেমন আছেন?” বললেন: “সুস্থ ও নিরাপদ।”

হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল: “আপনি কি জানেন আপনার পায়ে কে আঘাত করেছে?”

বললেন: “না।” [১]

হাজ্জাজ বলল: “আমি তার থেকে আপনার প্রতিশোধ নেব।”

বললেন: “Allah-ই তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। Allah-ই তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন।” [২]

হাজ্জাজ যাওয়ার সময় বলল: “আমি যদি জানতে পারি, তবে আল্লাহর কসম, আমি সেই লোকটিকে হত্যা করাব।” [৩]

দ্বিতীয়বার অসুস্থতা দেখতে এসে সে আবার একই প্রশ্ন করল যে, কে আঘাত করেছে?

عبدالله بن عمر رضى الله عنه (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: “তুমিই আমাকে হত্যা করিয়েছ।”

হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল: “সেটা কীভাবে?”

বললেন: “হারামের সীমানায় যেখানে অস্ত্র বহন করা হালাল নয়, সেখানে অস্ত্র বহনের অনুমতি তুমিই দিয়েছ, ফলে তোমারই কোনো লোকের অস্ত্র আমাকে আঘাত করেছে।” [৪]

হাজ্জাজ আরও একবার অসুস্থতা দেখতে এলে আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে দেখা করা পছন্দ করলেন না। চোখ বন্ধ করে নিলেন এবং কোনো কথার উত্তর দিলেন না। হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে ফিরে গেল। [৫]

যদিও আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি হাজ্জাজকে হত্যাকারী বলেননি, তবে তার ওপর অবশ্যই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

মৃত্যুর আগে আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:

“দুনিয়াতে তিনটি জিনিস ছাড়া আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই: গ্রীষ্মের রোজার তৃষ্ণা, রাতের ইবাদত এবং এই কথা যে, আমি কেন সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হলাম না যারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল।”

তাঁর ছাত্র সাঈদ বিন জুবায়ের রাহিমাল্লাহু-এর মতে, এখানে বিদ্রোহী দল বলতে হাজ্জাজের বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে যারা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল। [৬]

عبدالله بن عمر رضى الله عنه (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১লা মহরম ৭৪ হিজরিতে ৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। মক্কায় দাফন হওয়া তিনি শেষ Sahabi।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৯৬৭, কিতাবুল জুমুআ, বাব: মা ইয়াকরাহ মিন হামলিস সিলাহ ফিল ঈদ ওয়াল হারাম; তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮৫/৪

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৫৮৭০, হাইসামি বলেন: তাবারানি এটি দুই সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮৫/৪, তাবা দার সাদির

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৯৬৬, ৯৬৭, কিতাবুল জুমুআ, বাব: মা ইয়াকরাহ মিন হামলিস সিলাহ ফিল ঈদ ওয়াল হারাম; তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮৭/৪

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৮৬/৪

[৬] সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তিনি বললেন: “আমি কেন সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম না যারা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল অর্থাৎ হাজ্জাজ।” (কিয়ামুল লাইল লি-মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী: ৬২/১; ওয়াসায়াল উলামা ইনদা হুদুরিল মাউত লি-ইবনে যাবর আর-রাবায়ী মৃত্যু ৩৭৯ হি.)

এই সনদটি মুত্তাসিল যার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সাঈদ বিন জুবায়ের এটি তাঁর কিতাবসমূহে উদ্ধৃত করেছেন।

আপনিই ছিলেন। আপনি দুই হাজার ছয়শত ত্রিশ (২৬৩০)টি হাদিসের ভাণ্ডার রেখে গেছেন। [১]

যেহেতু আপনি মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, তাই এখানে দাফন হতে লজ্জাবোধ করছিলেন। ফলে মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেছিলেন যে, আমাকে যেন হারামের সীমানার বাইরে দাফন করা হয়, কিন্তু হাজ্জাজ তা মানেনি। সে-ই জানাজার নামাজ পড়িয়েছে এবং মক্কায় মুহাজিরদের কবরস্থান ‘মুহাসসাব’-এ দাফন করিয়েছে। [২]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে কি হাজ্জাজ হত্যা করিয়েছিল?

মৃত্যুর আগে আপনার এবং হাজ্জাজের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল, যার কারণ ছিল হাজ্জাজের অভদ্রতা ও উগ্র মেজাজ। আপনি আবদুল মালিকের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও একবার হাজ্জাজ আপনাকে একটি চিরকুট লিখেছিল:

“আমি সংবাদ পেয়েছি যে আপনি খিলাফতের প্রত্যাশী, কিন্তু এই পদ কোনো দুর্বল, কৃপণ এবং আবেগপ্রবণ ব্যক্তির জন্য নয়।”

আপনি (রা.) উত্তরে লিখেছিলেন:

“তুমি খিলাফত তলব করার কথা উল্লেখ করেছ, অথচ আমি কখনো এই পদ তলব করিনি, এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর দুর্বলতা, কৃপণতা ও আবেগপ্রবণ হওয়ার ব্যাপারে কথা হলো—যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করে সে দুর্বল হতে পারে না, আর যে জাকাত আদায় করে সে কৃপণ হতে পারে না। আর তুমি যে আবেগপ্রবণতার কথা উল্লেখ করেছ, তবে সন্তান যদি নিজেকে বাবার পরিবর্তে অন্য কারো দিকে সম্বন্ধ করে, তবে আমি সহ এমন কে আছে যার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে না?”

এর উদ্দেশ্য ছিল যে, কিছু না কিছু আবেগপ্রবণতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। এর থেকে কেউ মুক্ত নয়। [৩]

হাজ্জাজ একদিন ভাষণ দিতে গিয়ে বলছিল: “আবদুল্লাহ বিন যুবাইর আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে ফেলেছে।”

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর প্রতিবাদ করে বললেন:

“আল্লাহর শত্রু! তুই মিথ্যা বলেছিস, বরং তুই হারাম শরীফের সম্মান ধূলিসাৎ করেছিস। বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করেছিস।”

হাজ্জাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল:

“তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছ, মতিভ্রম হয়েছে তোমার। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে আর শিশুরা তোমার লাশ টেনে হিঁচড়ে বেড়াবে।” [৪]

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) উত্তর দিলেন: “যদি তুমি পুনরায় এমন কথা বলো, তবে আমিও পুনরায় এটাই বলব।” [৫]

এই বাদানুবাদ আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর শাহাদাতের কয়েকদিন পর হয়েছিল। এই কারণেই ঐতিহাসিকদের মতে হাজ্জাজই আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে হত্যা করিয়েছিল। সে কাউকে নিযুক্ত করেছিল যেন সুযোগ বুঝে তাকে বিষাক্ত বর্শা দিয়ে আঘাত করে। [৬]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/২৩৭, ২৩৮

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৪/১৮৭, তাবা দারে সাদির

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৫৮৬৭, হাইসামি বলেন: এটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে এটি মুরসাল।

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৪/১৮৪, মুসলিম বিন ইবরাহিম থেকে সহিহ সনদে।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৩০

[৬] হাজ্জাজ তার কোনো এক অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছিল, সে একটি বিষাক্ত বর্শা নিয়ে ইবনে উমরের পায়ে আঘাত করে। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩/২৩০... মুহাশিশি বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)

খাওয়ারিজদের বিদ্রোহ

শাসকদের পক্ষ থেকে শক্তির আস্থালন এবং বংশানুক্রমিক শাসনের ওপর জেদ খাওয়ারিজদের বিদ্রোহকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। আব্দুল মালিক খিলাফতের মসনদে বসার আগেই তাদের সাথে মোকাবিলা হয়েছিল। খাওয়ারিজরা নীতিগতভাবে পরামর্শভিত্তিক শাসনের প্রবক্তা ছিল। তাদের মতে, প্রত্যেক মুসলমান যে সাহসী ও মুত্তাকী, সে শাসনের যোগ্য, চাই সে আরব হোক বা অনারব, কুরাইশ হোক বা অ-কুরাইশ। তাদের মতে, কোনো শাসক গুনাহ বা জুলুম করলে সে অপসারিত হয়ে যেত এবং মানুষের ওপর তার বায়াত ভঙ্গ করা ওয়াজিব হয়ে যেত। এজন্য তারা হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে শুরু করে আব্দুল মালিক পর্যন্ত কাউকেই বৈধ খলিফা বলে মানত না; কারণ তাদের মতে এরা সবাই গুনাহ ও জুলুমের অপরাধী ছিল।

যেহেতু তাদের শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ-সরল এবং কঠোর জবাবদিহিতার শর্তযুক্ত ছিল, যার ফলে শাসকের ওপর সমালোচনা ও পর্যালোচনার অধিকার সবার ছিল, তাই যুবকদের কাছে খাওয়ারিজম অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। তবে অসুবিধা ছিল এই যে, খাওয়ারিজদের আকিদা-বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত ভাসাভাসা, যার মধ্যে কোনো স্থায়িত্ব বা স্থিরতা ছিল না। এ কারণে খাওয়ারিজদের মধ্যে দ্রুত নতুন নতুন দল তৈরি হতো এবং আর্মীররা বদলে যেত। তাদের জীবন ছিল যাযাবরদের মতো। কোনো স্থায়ী ঠিকানা বা অবস্থান ছিল না।

যাই হোক, শাসকদের এই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আব্দুল মালিকের মোকাবিলায় বেরিয়ে আসে। তাদের একটি দল বাহরাইনে আবু ফুদাইকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চালিয়ে আসছিল। ৭৩ হিজরিতে আব্দুল মালিকের সেনাপতি উমর বিন আব্দুল্লাহ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করেন এবং আবু ফুদাইক নিহত হন। [১]

তবে খাওয়ারিজদের সবচেয়ে বড় দল ‘আযারিফা’ পুরো পারস্য এবং ইরাকে ক্রমাগত লুটতরাজ চালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং উমাইয়া বাহিনী যা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহর অধীনে ছিল, তাদের পরাজিত করেছিল।

অবশেষে আব্দুল মালিক সরাসরি নিজের নির্দেশে ইরাকের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাকে এই অভিযানের দায়িত্ব দেন, যিনি আগে থেকেই খাওয়ারিজদের সাথে যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রাখতেন। মুহাল্লাব সৈন্য নিয়ে খাওয়ারিজদের মোকাবিলায় ‘রামহুরমুজ’ রণাঙ্গনের দিকে রওনা হন যেখানে খাওয়ারিজদের জোর সবচেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু যুদ্ধের আগেই কুফার শাসক বিশর বিন মারওয়ানের মৃত্যুর খবর আসে, যা শুনে অধিকাংশ সৈন্য নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়াই ফিরে আসে। এই পরিস্থিতি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ না-ও হয়, তবে তা কার্যত পরাজয় স্বীকারের সমতুল্য ছিল, যার ফলে ইরাকের ওপর খাওয়ারিজদের আধিপত্য আরও বেড়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল। [২]

[১] তারিখ আল-তবারী: ১৯৩/৬

[২] তারিখ আল-তবারী: ১৯৬/৬ থেকে ১৯৮

কুফায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভয়াবহ ভাষণ:

এই মুহূর্তে আবদুল মালিক প্রয়োজন অনুভব করলেন যে, ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার জন্য কোনো কঠোরতম প্রশাসককে পরীক্ষা করা উচিত। ফলে তিনি ৩৫ বছর বয়সী হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ৭৫ হিজরিতে হিজাজের শাসনভার থেকে সরিয়ে ইরাকের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি রমজান মাসে মাত্র বারোজন আরোহী নিয়ে কুফায় পৌঁছালেন। সরাসরি জামে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং ঘোষণা দিয়ে জনগণকে সমবেত করলেন। মুখের ওপর পাগড়ির আঁচল জড়িয়ে যখন তিনি মিস্বরে দাঁড়ালেন, তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অনেক দুষ্ট লোক হাতে পাথর নিয়ে নতুন শাসককে ‘অভ্যর্থনা’ জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। এরা সেই সব লোক যারা শুরু থেকেই ফিতনা-ফাসাদে অভ্যস্ত ছিল এবং শাসকদের উত্যক্ত করা তাদের স্বভাব ছিল। হাজ্জাজ তাদের হাবভাব দেখতে থাকলেন। কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর তার কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল:

“আমি অন্ধকার চিরে দেওয়া সূর্য, গিরিপথ অতিক্রম করায় পারদর্শী। যখন আমি পাগড়ি খুলব, তখন তোমরা আমাকে চিনতে পারবে।”

এ কথা বলে তিনি মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে দিলেন। মানুষ কেঁপে উঠল। হাত থেকে পাথরগুলো পড়ে গেল। এরপর হাজ্জাজ সেই অগ্নিবরা ভাষণ দিলেন যার প্রতিটি বাক্য উপস্থিতদের কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন:

“হে লোকসকল! আমি মন্দের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করি। যে যেমন করে তার সাথে তেমন ব্যবহার করি। আমি অনেক মাথা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর কেটে ফেলার সময় এসে গেছে। অনেক পাগড়ি ও দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হতে চলেছে। হে ইরাকবাসী! আমাকে দমানো যাবে না। আমাকে ভেবেচিন্তেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমি রক্তল মুমিনীন তার তুণীর সব তীর বের করে সেগুলোর কঠোরতা পরীক্ষা করেছেন এবং যাকে সবচেয়ে কঠোর মনে হয়েছে তাকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছেন। তোমরা দীর্ঘকাল ধরে ফিতনা-ফাসাদ ও অবাধ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে আছ, কিন্তু এখন মনে রেখো! আমি তোমাদের চামড়া এমনভাবে ছাড়িয়ে দেব যেমন গাছের ছাল ছাড়ানো হয়। তোমাদের কাঁটায়ুক্ত ঝোপঝাড়ের মতো কেটে ফেলব। তোমাদের এমনভাবে মারব যেমন অবাধ্য উটকে পেটানো হয়। আমি তলোয়ার দিয়ে তোমাদের এমন খবর নেব যে তোমাদের সন্তানরা এতিম এবং নারীরা বিধবা হয়ে যাবে। শোনো! বিদ্রোহী দলগুলো থেকে দূরে সরে যাও এবং সঠিক পথে ফিরে এসো। যদি বিদ্রোহীরা সফল হয়ে যায় তবে না খাজনা আদায় হবে, না সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব হবে। আল্লাহর কসম! যখন আমি কোনো ওয়াদা করি তখন তা পূর্ণ করি। কোনো বিষয়ের সংকল্প করলে তা করেই ছাড়ি। যে বিদ্রোহী ভঙ্গিতে তোমরা মুহাল্লাবের সঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছ, তা আমার জানা আছে। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, তিন দিন পর আমি যাকে এখানে দেখব, তার ঘাড় উড়িয়ে দেব এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করব।”

এই ভাষণ মানুষের হৃঁশ উড়িয়ে দিল। তারা স্তব্ধ হয়ে হাজ্জাজের ভয়ংকর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর হাজ্জাজ তার ঘোষককে নির্দেশ দিলেন যেন কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে খলিফা আবদুল মালিকের পত্র পড়ে শোনায়।

চিঠির শুরুর শব্দগুলো ‘আসসালামু আলাইকুম’ মাত্র পড়া হয়েছিল, এমন সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উপস্থিতদের ওপর ফেটে পড়লেন এবং বললেন: “আমীরুল মুমিনীন তোমাদের সালাম দিচ্ছেন আর তোমরা জবাব পর্যন্ত দিচ্ছ না।” মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ “ওয়ালাইকুমুস সালাম” ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। হাজ্জাজ বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের আদব শিখিয়েই ছাড়ব।” এরপর খলিফার চিঠি পড়ে শোনানো হলো এবং কুফাবাসী তাদের সমস্ত অহংকার ভুলে রণক্ষেত্রের দিকে দৌড়ে চলল। কুফার ব্রিজে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে কুফা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। সমস্ত পুরুষ রণক্ষেত্রের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল। [১]

উমাইর বিন জাবি-র মৃত্যুদণ্ড:

সেই দিনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একজন সরকারি কর্মকর্তা আহত অবস্থায় হাজ্জাজের কাছে এসে জানালেন: “এক বৃদ্ধ লোক রণক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করছে। আমার পীড়াপীড়িতে সে আমাকে আহত করেছে।” হাজ্জাজ তাকে ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। তাকে হাজির করা হলে হাজ্জাজ তাকে অস্বীকার করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল: “আমি অনেক বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুর্বল।” সাথে এও বলল: “আমি আমার পরিবর্তে আমার দুই জোয়ান ছেলেকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।” এমন সময় হাজ্জাজের সাথে সেখানে উপস্থিত জনৈক আমীর আনবাসা বিন সাঈদ তাকে চিনে ফেললেন যে, এ হলো হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী শিয়া উমাইর বিন জাবি।

তিনি হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি কি এই লোকটিকে চেনেন?” হাজ্জাজ না-বোধক উত্তর দিলেন। আনবাসা বললেন: “এ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের একজন। এ সেই ব্যক্তি যে হযরত উসমান (রা.) শহীদ হওয়ার পর তার লাশে লাথি মেরেছিল এবং লাশের ওপর লাফিয়ে পড়ে পাঁজরের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।” হাজ্জাজ রাগে ফেটে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে?” সে বলল: “হ্যাঁ!” হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন: “কেন?” সে বলল: “কারণ হযরত উসমান (রা.) আমার বৃদ্ধ পিতাকে জেলে ঢুকিয়েছিলেন।” হাজ্জাজের কিছু একটা মনে পড়ে গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন: “আচ্ছা, তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি যে এই কবিতাটি বলেছিল:

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفْعَلْ وَكَدْتُ وَلَيْتَنِي تَرَكْتُ عَلَى عُثْمَانَ تَبْكِي حَلَالُهُ

‘আমি সংকল্প করেছিলাম কিন্তু তা করতে পারিনি, যদিও আমি তা করার উপক্রম হয়েছিলাম। হায়! আমি যদি উসমানকে এমন অবস্থায় রেখে আসতাম যে তার স্ত্রীরা তার জন্য বিলাপ করত।’” [২]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/২০৬ থেকে ২০৯।

[২] উমাইর বিন জাবির উল্লেখ হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা ও অবরোধের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে এসেছে। সে বিদ্রোহ ও অবরোধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং শাহাদাতের পর লাশের অবমাননাও করেছিল, তবে সরাসরি আক্রমণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তার উল্লিখিত কবিতা থেকেও বোঝা যায় যে, সে হত্যাকাণ্ডে নিজে অংশ নিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি।

পূর্ববর্তী খলিফাদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ না থাকায় তার ওপর হাত দেওয়া হয়নি। যা হোক, এখন কুফা খালি হয়ে যাওয়ার আকস্মিক সুযোগে নিজের অভদ্রতার কারণে সে সরকারি কর্মকর্তাদের নজরে এবং হাজ্জাজের কবলে পড়ে গেল।

সে মিথ্যা বলায় কোনো লাভ না দেখে অপরাধ স্বীকার করে নিল। সম্ভবত তার আশা ছিল যে, সত্য কথা বললে হাজ্জাজ তার বার্ষিক্যের বিবেচনা করে তাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু হাজ্জাজ এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর তার ব্যাপারে ফয়সালা শুনিয়ে বলল: “তোমাকে হত্যা করার মধ্যেই কুফা ও বসরার কল্যাণ নিহিত বলে মনে হচ্ছে।”

হাজ্জাজের উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে এই ব্যক্তি তো যে কোনোভাবেই অপরাধী। তাছাড়া এই সময়ে তাকে হত্যা করলে মানুষ ভীত হবে যে, হাজ্জাজ সরকারি আদেশ পালনে অবহেলা করার কারণে কোনো বৃদ্ধকেও ক্ষমা করে না। ফলে হাজ্জাজের ইশারায় প্রহরী উমাইর বিন জাবি-র শিরশ্ছেদ করে দিল। [১]

কাতারি বিন ফুজাআ খারেজির দমন:

হাজ্জাজের আদেশে কুফার হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক রণক্ষেত্রে পৌঁছালে মুহাল্লাব তাদের নিয়ে আজারি দলভুক্ত খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এখন তাদের নেতা ছিল কাতারি বিন ফুজাআ। মুহাল্লাব বিভিন্ন রণাঙ্গনে দেড় বছর ধরে তাদের ক্রমাগত ধাওয়া করেন কিন্তু কাতারি বিন ফুজাআ ধরা পড়েনি। সে এক ময়দান থেকে পিছু হটলে অন্য জায়গায় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিত। সে অত্যন্ত সাহসী এবং চতুর যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি একজন নামকরা কবিও ছিল।

৭৭ হিজরিতে এমন এক ঘটনা ঘটল যে কাতারির দলে ফাটল ধরে গেল। ঘটনাটি ছিল এই যে, তার একজন কর্মকর্তা কোনো এক নামকরা খারেজিকে হত্যা করে ফেলে। খারেজিরা এসে কাতারির কাছে দাবি জানাল যে, হত্যাকারীকে আমাদের হাতে সোপর্দ করা হোক যাতে আমরা তাকে আমাদের সাথীর বদলে হত্যা করতে পারি। কিন্তু কাতারি এই বলে সেই কর্মকর্তার কাছ থেকে কিসাস নিলেন না যে, এটি হত্যাকারীর ইজতিহাদি ভুল। এতে দলের অধিকাংশ লোক কাতারিকে অবিচারকারী সাব্যস্ত করল এবং আলাদা হয়ে আবদ রাবিহিল কাবিরের নেতৃত্বে পৃথক দল গঠন করল এবং কাতারির সাথে শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত হলো।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারেজিদের মধ্যে ফাটল ধরার খবর পাওয়া মাত্রই মুহাল্লাবকে প্রতিপক্ষের ওপর চূড়ান্ত হামলা করার নির্দেশ দিলেন। মুহাল্লাব কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন এবং খারেজিদের এই দুই দলকে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরতে দিলেন। যখন তারা লড়াই করে সংখ্যায় কমে গেল, তখন প্রথমে আবদ রাবিহিল কাবিরের দলকে চূর্ণ করলেন এবং তারপর কাতারির পিছু ধাওয়া করতে করতে তার পেছনে তাবারিস্থানের আকাশচুম্বী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন। এটি ৭৯ হিজরির ঘটনা।

এখানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কাতারির অবশিষ্ট বাহিনীও খতম হয়ে গেল। সে নিজে পালানোর চেষ্টায় পাহাড়ের ঢাল থেকে পিছলে গেল এবং গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়ল। ওদিক দিয়ে এক লোভী গ্রামবাসীর যাতায়াত ছিল। কাতারি, যে গুরুতর আহত ছিল, পানি চাইল। গ্রামবাসী বলল: “আগে কিছু দাও, তবেই পানি পান করাব।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/২০৭, ২০৮

কাতারি বলল: “তোমার কি লজ্জা হয় না? আমার কাছে এই অস্ত্রগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। আগে পানি পান করাও, তারপর আমি অস্ত্র দিয়ে দেব।”

গ্রামবাসী বলল: “না, আগে অস্ত্র দাও।”

কাতারি অস্বীকার করলে গ্রামবাসী পাহাড়ের ঢালে উঠে গেল এবং সেখান থেকে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে দিল, যার আঘাতে কাতারি আধমরা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মুহাম্মাবের সৈন্যরা এসে পৌঁছাল এবং তার শিরশ্ছেদ করল। [১]

শাবিব খারেজির সাথে যুদ্ধ:

ঠিক এই দিনগুলোতে খারেজিদের একটি দল “আস-সুফরিয়াহ” আত্মপ্রকাশ করে, যার নেতা ছিল শাবিব বিন ইয়াজিদ বিন নুয়াইম শায়বানি। এই রণকুশলী ও সাহসী নেতা ৭৬ হিজরি থেকে ৭৭ হিজরি পর্যন্ত আল-জাজিরা এবং ইরাকের সমতল অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিয়ে সরকারি বাহিনী এবং তাদের সাহায্যে আসা সিরীয় সৈন্যদের একের পর এক পরাজিত করে।

আব্দুল মালিক এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একের পর এক অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি এবং সর্বোত্তম সৈন্যদের তার মোকাবিলায় পাঠাতে থাকেন, কিন্তু শাবিব সবাইকে পরাজিত করতে থাকে। সে আমাদ-এর কাছে হারিস বিন উমাইরাকে পরাজিত করে, এরপর সুফিয়ান বিন আবুল আলিয়া, সুরাহ বিন হুর, জাযল বিন সাঈদ কিন্দি, সাঈদ বিন মুজালিদ, সুওয়াইদ বিন আব্দুর রহমান এবং উসমান বিন কাতানের মতো অভিজ্ঞ সেনাপতিদের কয়েক হাজার সৈন্যের বাহিনীসহ হাজ্জাজের পক্ষ থেকে একের পর এক তার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়, কিন্তু সে সবাইকে তাড়িয়ে দেয়।

এরপর যায়িদাহ বিন কুদামাহ এবং যুহর বিন কাইস দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বের হন, তারাও পরাজিত হন। কেবল আব্দুর রহমান বিন আশআসের মোকাবিলায় শাবিবের পাঁচটি কিছুটা দুর্বল ছিল এবং আব্দুর রহমানের রণকৌশল দেখে সে মোকাবিলায় আসেনি, কিন্তু এরপর পরবর্তী যুদ্ধে সে কুফার সেনাপতি উসমান বিন কাতানকে হত্যা করে। পরবর্তী মোকাবিলায় হাজ্জাজ ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী দিয়ে আত্তাব বিন ওয়ারকাকে পাঠান। যেন ইরাকের পুরো শক্তিই ঢেলে দেওয়া হলো। সাবাত-এর কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাবিবের কাছে মাত্র এক হাজার জানবাজ যোদ্ধা ছিল, কিন্তু সে এত বড় বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত করে যে সেনাপতি আত্তাবও নিহত হন। [২]

একজন খারেজি নারীর সাহসিকতা:

শাবিব দুই বছর পর্যন্ত আল-জাজিরা থেকে ইরাক উপত্যকা পর্যন্ত এলাকা থেকে কর আদায় করতে থাকে। এই দলের কোনো শহর বা দুর্গে স্থায়ী আবাস ছিল না, বরং তারা সবসময় সৈন্যদের মতো টহল দিত। শাবিবের সাহসিকতা এমন ছিল যে, ৭৭ হিজরির জমাদিউল আখির মাসে “খায়রা”-র কাছে সুওয়াইদ ও উসমানকে পর্যুদস্ত করার পর সে হাতেগোনা কয়েকজন লোক নিয়ে সরাসরি কুফায় ঢুকে পড়ে, যাদের মধ্যে তার তলোয়ার চালনায় পারদর্শী স্ত্রী গাজালাও ছিল। সেখানে সে কুফার বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি —আবু সুফিয়ানের মুক্ত করা দাস আবু সালিম, আবুল লাইস বিন আবু সালিম, আদি বিন আমর এবং আযহার বিন উবাইদুল্লাহকে হত্যা করে। তার স্ত্রী গাজালা কুফার জামে মসজিদে প্রবেশ করে তার প্রতিদিনের ইবাদত ও জিকিরের নিয়ম সম্পন্ন করে। এরপর সে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে, যার জন্য সে মানত করেছিল। শাবিব কুফায় ঝড়ের মতো এল এবং চলে গেল। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৭৩০, ৩১০

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/২১৯ থেকে ২৬৬

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৭৪

হাজ্জাজ তখন বসরায় ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত কুফায় ফিরে আসেন। তিনি ইরাকি বাহিনীকে সম্পূর্ণ অকেজো মনে করে সিরিয়া থেকে আব্দুল মালিকের পাঠানো সাহায্যকারী দল এবং বিশেষ করে নিজের মাওয়ালিদের সাথে নিয়ে নিজেই শাবিবের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়েন। কুফার বাইরে তিনি শাবিবকে ধরে ফেলেন। দুই দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শাবিব প্রথমবারের মতো পরাজিত হন এবং পিছু হটেন। হাজ্জাজ তাকে দমনেওয়ার সুযোগ দেননি এবং পশ্চাদ্ধাবনে সতেজ বাহিনী পাঠিয়ে দেন।

অবশেষে ৭৭ হিজরিতে আহওয়াজের কাছে নদীর তীরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সারাদিন যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় খারেজিরা অটল থাকে। সন্ধ্যায় যুদ্ধ সাময়িকভাবে থামলে শাবিব নদীর ওপর নৌকার সেতু তৈরি করান এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এই সেতু পার হতে শুরু করেন যাতে নদীর ওপারে শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ থেকে সঙ্গীদের বিশ্রাম দিতে পারেন। হঠাৎ সেতুর মাঝখানে তার ঘোড়াটি চমকে ওঠে, শাবিব নদীতে পড়ে যান এবং তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে:

﴿যাতে আল্লাহ এমন এক কাজ সম্পন্ন করেন যা নির্ধারিত ছিল।﴾

একটি ডুব খেয়ে তিনি ভেসে উঠলেন এবং বললেন:

﴿এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।﴾

তারপর তিনি ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে যান। এভাবে এই বীর, যাকে বড় থেকে বড় বাহিনীও শেষ করতে পারেনি, পানির ঢেউয়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারান। হাজ্জাজ এবং আব্দুল মালিক এক কঠোর শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পান, যে এক-দেড় হাজার অশ্বারোহী নিয়ে দুই বছর ধরে তাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে ছিল। [১]

শাবিবের মোকাবিলায় কয়েক গুণ বড় ইরাকি বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয়ের একটি বড় কারণ ছিল স্বয়ং হাজ্জাজের আচরণ। তিনি মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতেন। এমন পরিস্থিতিতে বাহিনী আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে কীভাবে লড়তে পারে? সামনে কুয়ো আর পেছনে খাদের মতো পরিবেশে তাদের অবশিষ্ট আত্মবিশ্বাসও শেষ হয়ে যেত।

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/২২৮ থেকে ২৮৭, ৭৬ হিজরি থেকে ৭৭ হিজরির ঘটনাবলি।

জিহাদের পুনর্জাগরণ..... আফ্রিকা বিজয়

আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি যে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার শেষ দিনগুলোতে কুসাইলা নামক এক বারবার (Berber) সর্দার বিদ্রোহ করে আফ্রিকার বিজয়ী উকবা বিন নাফিকে শহীদ করে দিয়েছিল এবং উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের সেনানিবাস কায়রোয়ান পর্যন্ত ইসলামী অধিকৃত অঞ্চলগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। এরপর আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর খিলাফতকালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে মুসলমানরা পুনরায় আফ্রিকায় আক্রমণ করতে পারেনি। পাঁচ বছর পর্যন্ত কায়রোয়ানসহ পুরো তিউনিসিয়া কুসাইলার দখলে ছিল।

জুহাইর বিন কায়েসের শাহাদাত:

৬৯ হিজরিতে আব্দুল মালিকের ভাই মিসরের গভর্নর আব্দুল আজিজ জুহাইর বিন কায়েসের নেতৃত্বে এখানে একটি বাহিনী পাঠান। কুসাইলা আতঙ্কিত হয়ে কায়রোয়ান থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু জুহাইর বিন কায়েস তাকে ধাওয়া করে ‘মাস’ নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কুসাইলা তার অধিকাংশ সঙ্গীসহ নিহত হয়।

ফেরার পথে জুহাইর বিন কায়েস সিসিলির নৌবাহিনীর সংবাদ পান, যারা ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে বারকার ওপর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। জুহাইর দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তাদের বাধা দিতে পৌঁছান। এখানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় যাতে জুহাইর তার সঙ্গীসহ শহীদ হন, তবে প্রতিপক্ষ কোনো ইসলামী শহর দখল করতে পারেনি। বারকা এবং কায়রোয়ান নিরাপদ থাকে। [১] আব্দুল মালিক এই পরাজয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন কিন্তু অন্যান্য অভিযানের কারণে কিছু করতে পারেননি।

হাসসান বিন নু’মানের কীর্তিসমূহ:

৭৪ হিজরিতে আব্দুল মালিক সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতা গ্রহণের পর হাসসান বিন নু’মানের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী আফ্রিকায় পাঠান যাতে পুরো উত্তর অঞ্চল থেকে গোলযোগ ও বিদ্রোহের অবসান ঘটানো যায়।

সে সময় উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহর ‘কার্থেজ’ (কারতাজিনা) অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাসসান বিন নু’মান এখানে আক্রমণ করেন। রোমান, ফ্রাঙ্ক এবং বারবারদের এক বিশাল বাহিনী এখানে সমবেত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয়। তারা নৌকায় চড়ে সিসিলির দিকে পালিয়ে যায় এবং কার্থেজ বিজিত হয়।

হাসসান বিন নু’মান কিছু দিন কায়রোয়ানে অবস্থান করে নতুন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। এখন তাদের লক্ষ্য ছিল ‘কোহ-এ-আওরাস’-এর...

[১] ফুতুহুল বুলদান লিল-বালাজুরি, পৃ. ২২৭; আল-ইসতিকসা লি-আখবার দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা লিস-সালাভি: ১/ ১৪৭-১৪৮

আকাশচুম্বী দুর্গ ছিল যেখানে বার্বারদের সহ এক বিশাল জনশক্তি বিদ্যমান ছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এক অত্যন্ত ধূর্ত জাদুকরী, যার বয়স একশ বছরের বেশি ছিল। তার তিন ছেলে শাসনকার্য তদারকি করত। মরক্কোর তানজাহ শহর থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত তার রাজত্ব ছিল। হাসান বিন নুমান যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ‘কোহে আওরাস’ পৌঁছালেন, তখন জাদুকরীর অনুসারীরা এত তীব্রভাবে মোকাবিলা করল যে মুসলমানদের পা টলে গেল। তাদের এক বিশাল অংশ শহীদ ও বন্দি হলো। অবশিষ্ট সেনাবাহিনী পিছু হটতে হটতে কায়রোয়ান থেকেও পেছনে কাবিসের সীমান্ত পর্যন্ত চলে গেল। প্রতিপক্ষ বাহিনী কায়রোয়ান থেকে কাবিস পর্যন্ত সমস্ত এলাকা দখল করে নিল। জাদুকরীর ধারণা ছিল যে মুসলমানরা সম্পদের জন্য আক্রমণ করে থাকে; তাই সে মরক্কো থেকে তিউনিসিয়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল এবং সেখানকার কৃষি, বাণিজ্য ও জনবসতি উজাড় করে দিল।

পাঁচ বছর পর্যন্ত এখানে জাদুকরীর দখল বজায় ছিল। এই সময়ে জাদুকরীর সমর্থক কিছু বার্বার গোত্রও দেশের অর্থনীতির ধ্বংস দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল; তাই তারা মুসলমানদের সাথে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ৭৯ হিজরিতে আব্দুল মালিক হাসান বিন নুমানকে নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে পুনরায় আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এবার বিজয় ও সাহায্য পদচুম্বন করল। জাদুকরীর সমর্থকরা পিছু হটতে থাকল। অবশেষে জাদুকরী নিজে মোকাবিলায় এল এবং নিহত হলো। তার শিরশ্ছেদ করা হলো। সেই সময় তার বয়স ছিল ১২৭ বছর। সে ৩৫ বছর পর্যন্ত শাসন করেছিল। হাসান বিন নুমান তার কেন্দ্র ‘কোহিস্তান আওরাস’-এর ওপরও দখল প্রতিষ্ঠা করলেন। জাদুকরীর অনুসারী অনেক বার্বার গোত্র এই সুযোগে ইসলাম গ্রহণ করল এবং ভবিষ্যতে ইসলামের সত্যনিষ্ঠ অনুগত হিসেবে প্রমাণিত হলো।

জাদুকরীর সাথে গত যুদ্ধে একজন প্রখ্যাত সৈনিক খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন কায়েস বন্দি হয়েছিলেন। জাদুকরী তাকে নিজের কাছে ভালোভাবেই রেখেছিল। হাসান বিন নুমান এই সদাচরণের বিনিময়ে জাদুকরীর ছেলেদের প্রাণভিক্ষা দিলেন এবং তাদের নওমুসলিম বার্বারদের একটি আলাদা বাহিনী গঠন করে তার অফিসার নিযুক্ত করলেন। এভাবে পুরো উত্তর আফ্রিকার ওপর মুসলমানদের দখল এতটাই সুসংহত হলো যে ভবিষ্যতে এই এলাকাগুলো আর কখনো শত্রুদের দখলে যায়নি। এই বিজয়গুলোর এক বছর পর ৮০ হিজরিতে হাসান বিন নুমানের মৃত্যু হয়। [১]

[১] আল-ইসতিকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১/১৪৯, ১৫০।

আবদুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহ

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের জীবনের শেষ এবং সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ছিল আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আশআসের বিদ্রোহ। এই উচ্চাভিলাষী এবং যুদ্ধবাজ সেনাপতিকে খোরাসান ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছিল যাতে সেখানকার ক্রমাগত বিদ্রোহগুলো দমন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ খোরাসানে স্থানীয় অগ্নিপূজক সর্দার রতবিল মুসলমানদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। [১] রতবিল ৭৪ হিজরিতে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে তাকে দমন করার জন্য একে একে প্রথমে আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া এবং পরে উবায়দুল্লাহ বিন আবি বাকরা অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু উভয়কেই চরম পরাজয় বরণ করে ফিরে আসতে হয়। রতবিলের যুদ্ধের পদ্ধতি ছিল এই যে, সে মুসলমানদের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে সৈন্যবাহিনীকে ডানে-বামে ছড়িয়ে দিত। যখন মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে সংকীর্ণ উপত্যকায় প্রবেশ করত, তখন সে তাদের ঘিরে ফেলত।

৮০ হিজরিতে যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুর রহমান বিন আশআসকে বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে এই ফ্রন্টে পাঠান, তখন এই অভিজ্ঞ যোদ্ধা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন। তিনি অল্প অল্প এলাকা দখল করে তার নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করতেন এবং তারপর সামনে অগ্রসর হতেন। এভাবে রতবিলের জালে আটকা না পড়ে তিনি শীতকাল আসার আগেই দক্ষিণ খোরাসানের অর্ধেক অংশ পুনরুদ্ধার করে নেন। এরপর ছাউনি ফেলে হাজ্জাজকে বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে লিখলেন: “এই বছর আমরা যতটুকু এলাকা দখল করেছি তা যথেষ্ট। পরবর্তী এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করে আমরা আগামী বছর আবার অগ্রসর হব এবং শেষ সীমানা পর্যন্ত দখল করে নেব।” [২]

বিদ্রোহের কারণসমূহ:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আবদুর রহমান বিন আশআসের প্রতি আগে থেকেই কিছুটা হিংসা ছিল। এই চিঠি পড়ে তিনি অগ্রসর হওয়া বন্ধ করার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জবাবে লিখলেন: “তোমার লেখা শত্রুর সাথে আপসকামিতার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটচ্ছে। এটি সেই শত্রু যে মুসলমানদের চরম ক্ষতি করেছে। আল্লাহর কসম! তোমার প্রস্তাব কোনো পরিকল্পনার ওপর নয় বরং ভীড়তার ওপর ভিত্তি করে। অবিলম্বে সামনে অগ্রসর হও এবং শত্রুর দুর্গ ধ্বংস করে দাও এবং সৈন্যদের হত্যা করতে থাকো।”

আবদুর রহমান এই চিঠি পড়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, এমন সময় হাজ্জাজের দ্বিতীয় তাগিদনামা পেলেন যাতে লেখা ছিল: “সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর ভূখণ্ড পদদলিত করো, অন্যথায় সেনাবাহিনীর কমান্ড তোমার ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে সরে দাঁড়াও।”

[১] রতবিল ছিল মধ্য খোরাসান বা বর্তমান আফগানিস্তানের কাবুল শাহদের উপাধি যাদের কেন্দ্র ছিল কাবুল। এখানকার শাসককে রতবিল বলা হতো।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩০৭, ৩০৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৮১ হিজরি।

হাজ্জাজের এই অন্যায় কঠোরতা আব্দুর রহমান বিন আশআসের মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার জন্য চরম আঘাতের কারণ হয়েছিল। তিনি নিশ্চিত হলেন যে হাজ্জাজ কেবল শত্রুতা মেটানোর জন্য তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন, তাই তিনি সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

“আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি আগামী বছর পর্যন্ত অভিযান স্থগিত করেছিলাম। তোমাদের সকল অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এই মতামতে আমাকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু হাজ্জাজ একে আমাদের দুর্বলতা মনে করছেন এবং সেই সীমানায় আক্রমণের জন্য জেদ করছেন যেখানে আমাদের কত ভাই তাড়াহুড়ো এবং অদূরদর্শিতার কারণে নিহত হয়েছে। এখন তোমরা বলো এই বিষয়ে কী করা উচিত?”

এ কথা শুনেই সেনাবাহিনীর আমীরগণ, যারা বেশিরভাগই কুফা ও বসরার অধিবাসী ছিলেন, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন: “আমরা হাজ্জাজের কথা কখনোই মানবো না।” একজন আমীর বললেন: “চলো হাজ্জাজকে আমাদের শহরগুলো থেকে বের করে দিই।” অন্যজন বললেন: “হাজ্জাজ আল্লাহর শত্রু। তাকে পদচ্যুত করে আব্দুর রহমান বিন আশআসের হাতে বায়আত গ্রহণ করো।”

সবাই এই ডাকে সাড়া দিলেন এবং আব্দুর রহমান বিন আশআসের হাতে বায়আত গ্রহণ করে অঙ্গীকার করলেন যে হাজ্জাজকে ইরাক থেকে বের করেই দম নেবেন। যেহেতু হাজ্জাজের আচরণ এবং কিছু ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে সবাই অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই সেনাবাহিনী ছাড়াও প্রখ্যাত উলামা ও ক্বারী, ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের এক বিশাল দল এই অভিযানে শরিক হলেন, যাদের মধ্যে সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. এবং ইমাম শাবী রহ.-এর মতো বুজুর্গ ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের কারণ সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী রহ. লিখেছেন:

“ক্বারীগণ, যারা কুরআনের ধারক ও নেককার লোক ছিলেন, ইরাকে হাজ্জাজের জুলুম এবং সালাত ও জুমার সালাতে তার বিলম্ব করার কারণে বিদ্রোহ করেছিলেন। এটি ছিল বনু উমাইয়াদের একটি বাজে পদ্ধতি, যেমনটি নবী ﷺ সংবাদ দিয়েছিলেন যে তোমাদের ওপর এমন আমীরগণ চাপিয়ে দেওয়া হবে যারা সালাত নষ্ট করবে।” [১]

আব্দুর রহমান বিন আশআস প্রথমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রতবিলের সাথে সন্ধি করে নিলেন যাতে পেছন থেকে আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে। এরপর ইরাকের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। এই বাহিনীর স্লোগান ছিল “ইয়া সারাতুস সালাত” (হায় সালাতের প্রতিশোধ); কারণ হাজ্জাজ প্রায়ই সালাতে দেরি করে ফেলতেন। [২] হাজ্জাজ এই সংবাদ পেলে রাজধানী থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা একদিকে আব্দুর রহমান বিন আশআসকে চিঠি লিখে গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়াতে নিষেধ করলেন। অন্যদিকে হাজ্জাজকে পরামর্শ দিয়ে তার পত্রে লিখলেন: “ইরাকিদের অবস্থা ঢালু পথে বয়ে যাওয়া বৃষ্টির পানির চেয়ে ভিন্ন নয়। এই লোকেরা প্রতিটি কাজ অত্যন্ত জোশ ও উদ্দীপনার সাথে শুরু করে এবং পরে পরিবার-পরিজনের মায়ায় পড়ে থেমে যায়। তাদের আসতে দিন। স্বদেশে পৌঁছামাত্রই তারা স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।” [৩]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩০৬, হাদিসটি ইমাম মুসলিম, তিরমিজি ও আবু দাউদ মুসলিমের শব্দে বর্ণনা করেছেন: “তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন তোমার ওপর এমন আমীরগণ থাকবে যারা সালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে দেরি করবে অথবা সালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে।” (সহীহ মুসলিম, হা: ১৪৯৭, কিতাবুস সালাত, বাব: কারাহিয়াতু তাখিরিস সালাতি আন ওয়াক্তিহা)

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার, সন ৮৩ হিজরি।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৪০।

প্রথম যুদ্ধ..... হাজ্জাজের পরাজয়:

হাজ্জাজ এই মূল্যবান পরামর্শ উপেক্ষা করে মোকাবিলার জন্য সৈন্য পাঠালেন, যারা ‘তুসতার’-এর কাছে ইবনে আশআসের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, যারা খোরাসানের দিক থেকে আসছিল। জোরালো যুদ্ধের পর হাজ্জাজের বাহিনী পরাজিত হলো, পলাতক সৈন্যরা ১০ই জিলহজ ঠিক সেই সময়ে বসরায় পৌঁছাল যখন হাজ্জাজ ঈদুল আজহার নামাজের খুতবা দিচ্ছিলেন। পরাজয়ের খবর শুনে হাজ্জাজ তৎক্ষণাৎ বসরা থেকে পালিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান ইবনে আশআস ধাওয়া করে শহরে প্রবেশ করলেন। ১০ই জিলহজ ৮১ হিজরিতে তিনি শহরের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হাজ্জাজের মুহাল্লাবের নসিহত মনে পড়ল, কিন্তু তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। [১]

দাইরুল জামাজিমের রণাঙ্গন:

৮২ হিজরির শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনে আশআস এবং হাজ্জাজের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ও লড়াই চলতে থাকে। কখনো একজন জিততেন, কখনো অন্যজন। কুফা ও বসরা কখনো একজনের দখলে আসত, কখনো অন্যজনের। এই সময়ে বসরার বাইরে উভয় পক্ষের মধ্যে দুটি বড় যুদ্ধ হয়: একটি মরুরমের শুরুতে ‘জাবিয়া’ নামক স্থানে। দ্বিতীয়টি সফরের শুরুতে ‘মাযহারুল বারদ’-এর ময়দানে। এতে উভয় পক্ষের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। শেষ পর্যন্ত হাজ্জাজের পাল্লা ভারী হয় এবং তিনি বসরা পুনরুদ্ধার করেন। তবে আবদুর রহমান ইবনে আশআস অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে কুফায় পৌঁছে যান। সেখানে তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। তার সমর্থকদের সংখ্যা আগের চেয়েও বেড়ে যায় এবং তাদের সংখ্যা দুই লাখে পৌঁছে যায়। ৮৩ হিজরির শুরুতে আবদুর রহমান ইবনে আশআস এই বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজ্জাজের সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য যাত্রা করেন। বসরা থেকে হাজ্জাজও সিরীয় সৈন্যদের নিয়ে বের হন। উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ময়দানের সন্ধানে ফোঁরাত নদীর দুই তীর ধরে পাশাপাশি চলতে থাকে।

অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসের শেষে হাজ্জাজ ‘দাইরে কুররা’ এবং ইবনে আশআস ‘দাইরুল জামাজিম’-এর কাছে ছাউনি ফেলেন। জামাজিম হলো জুমজুমাহ (মাথার খুলি)-এর বহুবচন। জাহেলিয়াত যুগে এখানে আরব ও ইরানিদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, বিজয়ী আরবরা নিহত শত্রুদের মাথার খুলিগুলো এখানে একটি মন্দিরের কাছে স্থাপন করেছিল; তাই এই জায়গাটি ‘দাইরুল জামাজিম’ (মাথার খুলির আস্তানা) নামে পরিচিতি পায়। এই স্থানটি কুফা থেকে ২১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। [২]

উভয় পক্ষ দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পরিখা খননের মাধ্যমে ছাউনি সুরক্ষিত করে, যার পর সংঘর্ষ শুরু হয়। রবিউল আউয়াল থেকে জমাদিউল উলা পর্যন্ত প্রায় তিন মাস ব্যক্তিগত মোকাবিলা ও খণ্ডযুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে। ইরাকিরা কুফা থেকে ক্রমাগত খাদ্য ও রসদ পাচ্ছিল; তাই তাদের অবস্থা শক্তিশালী ছিল, অন্যদিকে হাজ্জাজের বাহিনী তাদের রসদ কেন্দ্র দামেস্ক থেকে দূরে হওয়ার কারণে খাদ্য সংকটের শিকার হয়েছিল। ইবনে আশআসের ছাউনিতে প্রখ্যাত মুহাদিসগণের উপস্থিতির কারণে জায়গায় জায়গায় ইলমি মজলিস কায়েম হয়েছিল; তাই হাদিসের ভাণ্ডারে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যাতে উল্লেখ আছে যে, এই হাদিস অমুক তাবিঈ দাইরুল জামাজিমে শুনিয়েছেন। বলা হয় যে, ইবনে আশআসের সাথে বিদ্রোহে শরিক হওয়া প্রখ্যাত উলামা ও কুররাদের সংখ্যা ছিল পাঁচশ, যেখানে অ-

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৪০; তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮১

[২] মুজাম্মুল বুলদান: ২/৫০৩

প্রখ্যাত আলেমগণ হাজার হাজার ছিলেন। যুদ্ধে এই আলেম ও ক্বারীগণের দলগুলো আলাদা আলাদা পতাকার নিচে লড়াই করত। [১]

সেই দিনগুলোতে হাসান বসরী (রহ.) মানুষকে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁর ভাই সাঈদ (রহ.) এর প্রবক্তা ছিলেন। একদিন সাঈদ (রহ.) হাসান বসরী (রহ.)-কে বললেন: “আমরা বায়আত ভঙ্গ করিনি, আমরা তাকে পদচ্যুত করতে চাই না, তবে আমরা এই কারণে অসন্তুষ্ট যে খলিফা কেন আমাদের ওপর হাজ্জাজকে চাপিয়ে দিলেন। আমাদের দাবি হলো খলিফা যেন হাজ্জাজকে পদচ্যুত করেন। এখন বলুন, আগামীকাল যখন সিরিয়াবাসীদের সাথে আমাদের মুখোমুখি দেখা হবে, তখন আমাদের সাথে তাদের আচরণ কেমন হবে?”

হাসান বসরী (রহ.) বললেন: “হাজ্জাজ আল্লাহর আযাব, তলোয়ার দিয়ে তার মোকাবিলা করো না।” এরপর বললেন: “সিরিয়াবাসীদের সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, হাজ্জাজ যদি তাদের দুনিয়াবি লোকমা খাইয়ে দেয়, তবে সে তাদের যে কাজেরই নির্দেশ দেবে, তারা তা-ই করে ফেলবে।”

এদিকে দামেস্কে আব্দুল মালিক গৃহযুদ্ধের এই আগুন পুরো ইরাকে ছড়িয়ে পড়তে দেখে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ মূলত হাজ্জাজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তিনি তাঁর ভাই মুহাম্মদকে পাঠিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আশ’আস এবং সমস্ত বিদ্রোহী ইরাকি আমিরদের কাছে এই প্রস্তাব দিলেন যে, “যদি তারা যুদ্ধ ত্যাগ করে, তবে হাজ্জাজকে ইরাক থেকে বরখাস্ত করা হবে, ইরাকি সেনাবাহিনীর বেতন সিরিয় সেনাবাহিনীর সমান করে দেওয়া হবে, আব্দুর রহমান ইবনে আশ’আসকে আজীবন তাঁর পছন্দের শহরের শাসনভার দেওয়া হবে। কিন্তু যদি তারা যুদ্ধে অনড় থাকে, তবে হাজ্জাজই তাদের ওপর বহাল থাকবে এবং তার ইখতিয়ার থাকবে সে যেভাবে ইচ্ছা বিরোধীদের দমন করবে।” [২]

এই উদার প্রস্তাবের মাধ্যমে ইবনে আশ’আসের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছিল; তাই তিনি এটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমর্থকদের সংকল্প এখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তারা একযোগে অস্বীকার করে বলল: “আল্লাহ শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার ওপর ক্ষুধা, সংকীর্ণতা ও লাঞ্ছনা চেপে বসেছে। আমরা সংখ্যায় বেশি এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী। আমরা কখনোই এই শর্তগুলো মেনে নেব না।” এভাবে ইরাকি আমিররা নিজেরাই ইরাকের ওপর হাজ্জাজের আধিপত্য বজায় রাখার পথ সুগম করে দিল। আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমস্ত ক্ষমতা হাজ্জাজের হাতে সঁপে দেওয়া হলো যেন সে যেভাবে ইচ্ছা শত্রুদের নির্মূল করতে পারে। [৩]

চূড়ান্ত যুদ্ধ, ইবনে আশ’আসের পরাজয় এবং হাজ্জাজের প্রতিশোধ:

আলোচনা ব্যর্থ এবং সন্ধির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উভয় পক্ষ আরও তীব্রভাবে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। ইবনে আশ’আসের সাথে এক লক্ষ পেশাদার সৈন্য এবং এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক ছিল। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পরিখার আড়াল থেকে আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৪ই জমাদিউল আখিরা ৮৩ হিজরিতে যুদ্ধরত বাহিনীগুলো খোলা ময়দানে বেরিয়ে এল। একটি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো যাতে শেষ পর্যন্ত ইরাকিদের বিশাল সংখ্যা এবং উদ্দীপনার ওপর সিরিয়দের শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা এবং অভিজ্ঞতা জয়ী হলো।

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৪৬ থেকে ৩৪৯; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৬। এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী আলেম ও ক্বারীগণের অবস্থা জানতে দেখুন:

তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবী, ওফাত: ৮১ হি. থেকে ১০০ হি.।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/১৬৪, সহীহ সনদে, এর বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৪৬ থেকে ৩৪৯।

এসে গেল। ইরাকিরা বিপুল সংখ্যায় নিহত হলো এবং বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আবদুর রহমান বিন আশআস বেঁচে পালিয়ে গেলেন। [১]

হাজ্জাজ কুফায় পৌঁছে তলোয়ারের জোরে মানুষের কাছ থেকে বায়াত নিলেন, যে কেউ আপত্তি করল তাকেই হত্যা করলেন। এদিকে ইবনে আশআস বসরায় পৌঁছে পুনরায় সেনাবাহিনী গঠন করলেন। মাকস খোর, রার, রার সৈন্যরা আবারও একত্রিত হলো।

৮৩ হিজরির শাবান মাসে বসরার উত্তর-পূর্বে আহওয়াজের নিকটবর্তী দুজাইল (মাসকান) নামক স্থানে আবারও উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হলেন। পনেরো দিনের শক্তি পরীক্ষার পর অবশেষে ইবনে আশআস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। তিনি পালিয়ে খোরাসানে চলে গেলেন এবং রতবিলের কাছে আশ্রয় নিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার পিছু ছাড়লেন না। তিনি রতবিলকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ইবনে আশআসকে আশ্রয় দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখালেন। সেই সাথে সাত বছরের খরাজ (কর) মওকুফ এবং যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশেষে রতবিল আবদুর রহমান বিন আশআসের শিরশ্চেদ করে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এটি ৮৫ হিজরির ঘটনা। এভাবে এই মহান সেনাপতির জীবন এক করুণ পরিণতির মাধ্যমে শেষ হলো। [২]

ইবনে আশআসকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকে সরকারের বিদ্রোহীদের বেছে বেছে নির্মূল করলেন। যুদ্ধের পর তিনি যাদের গ্রেফতার করে হত্যা করেছিলেন তাদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বলা হয়। [৩]

সঠিক আকিদার শিয়ানে আলী বিপুল সংখ্যায় এই খুরাজে (বিদ্রোহে) शामिल ছিলেন; কারণ সেনাপতি আবদুর রহমান বিন আশআস নিজেই হযরত কায়েস বিন আশআস (রা.)-এর নাতি ছিলেন, যিনি হযরত আলী (রা.)-এর একজন প্রখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তাদের সাথে উচ্চপদস্থ শিয়ারাও যুদ্ধে শরিক ছিলেন। বিখ্যাত শিয়া বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবীও কুফাবাসীদের সাথে ইবনে আশআসের সাথে ছিলেন। [৪]

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদও এই খুরাজে शामिल ছিলেন এবং এরই শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়। [৫]

কমিল বিন জিয়াদের হত্যাকাণ্ড:

বন্দীদের মধ্যে কুফার একজন অতি বৃদ্ধ আবেদ ও জাহেদ ব্যক্তি কমিল বিন জিয়াদ নাখয়ীও ছিলেন [৬] যাকে খাটিয়ায় করে হাজ্জাজের কাছে

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৬১ থেকে ৩৬৩

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৭

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার, পৃ: ৮৩ হিজরি

[৪] তারিখুত তাবারী: ৬/৩৮৯ থেকে ৩৯৩

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/৩৫৮, ৩৫৯

[৬] কমিল বিন জিয়াদের ব্যক্তিত্ব বিবেচনার দাবি রাখে। মুহাদ্দিসগণ এবং জারাহ ও তাদিলের ইমামগণ তাকে সেকাহ (নির্ভরযোগ্য) মনে করেন। ইমাম বুখারী কমিল বিন জিয়াদকে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (আত-তারিখুল কাবীর: ৭/২৭৩) জারাহ ও তাদিলের বিশেষজ্ঞগণ তাকে সেকাহ বলেছেন। (আস-সিকাত লিল ইজলী: ৬/২২৮; আল-জারাহ ওয়াত তাদিল লি ইবনে আবি হাতিম: ৭/১৭৪, ১৭৫; আস-সিকাত লি ইবনে হিব্বান: ৫/৩৪১) মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বায় তার বর্ণনা পাওয়া যায় যা বেশিরভাগই হযরত আলী এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। অন্যদিকে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো বলে যে, তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে शामिल ছিলেন। এর আগে তিনি তাকে হত্যার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। (ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল লি সাইফ বিন উমর, পৃ. ৮৩; তারিখুত তাবারী: ৪/৪০৩-৪০৪) কিছু বর্ণনায় এও আছে যে, তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর লাশে লাথি মেরেছিলেন। এমন ব্যক্তিকে কীভাবে সেকাহ মানা যেতে পারে? গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, যেহেতু কমিল বিন জিয়াদের দিকে আরোপিত উল্লিখিত অপরাধগুলোর উল্লেখ শুধুমাত্র একজন দুর্বল বর্ণনাকারী সাইফ বিন উমরের ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে রয়েছে, তাই মুহাদ্দিসগণ এই উপাদানগুলোকে জারাহ হিসেবে গুরুত্বযোগ্য মনে করেননি। লাশে লাথি মারার বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, এই অপবিত্র কাজটি উমাইর জাবি করেছিল যার উল্লেখ আগে চলে গেছে। বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, কমিল হযরত উসমান (রা.)-এর বিরোধীদের সেই অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে উসমানী আন্দোলনের লোকেরা اِلْيَاس (রূপক অর্থে) “কাতলায়ে উসমান” বলত এবং সম্ভবত তিনি তওবাও করেছিলেন। যদি তিনি হত্যাকারী হতেন তবে হযরত আলী (রা.)-এর সাহেবে সির (ঘনিষ্ঠ সহচর) হতেন না, এবং হযরত আলী ও পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে ক্ষমা করতেন না।

আনা হলো। সে ইবনে আশআসের বিদ্রোহে তার গোত্রসহ সক্রিয় ছিল। হাজ্জাজ তাকে দেখে বলল:

“হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে প্রবেশকারীদের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ বাকি নেই।” [১]

তারপর তাকে সম্বোধন করে বলল: “হে নখয়ী! সামাজিক বিষয়ে তুমি পঙ্গু এবং ফিতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সুস্থ ও সবল!! হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তোমাকে ক্ষমা করেছিলেন এবং দান-অনুদান দিয়েছিলেন, ইয়াজিদ এবং খলিফা আব্দুল মালিকও তোমাকে ক্ষমা করেছিলেন। তারপর বনু তামীমের এক বেদুঈন (ইবনে আশআস) এল তো তুমি তার সাথে দাঁড়িয়ে গেলে। আমি তো চাচ্ছিলাম যে তোমাকে হত্যা করার জন্য আমাকে কোনো বাহানা না দেওয়া হোক।” - এই বলে সে তার শিরশ্ছেদ করে দিল। [২]

ক্বারী ও ওলামা যারা নিহত হয়েছেন বা যুদ্ধে শরীক হয়েছেন:

ইবনে আশআসের সাথে বিদ্রোহে অনেক আলেম শরীক ছিলেন, যুদ্ধের সময় অনেকে নিহত হয়েছেন, কেউ নিখোঁজ হয়েছেন, কাউকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়েছে এবং কাউকে প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই আলেম ও ক্বারীগণের মধ্যে মুসলিম বিন ইয়াসার মুযানী (রহ.)-ও ছিলেন যিনি অত্যন্ত ফকীহ এবং আবেদ ও জাহিদ ছিলেন। সালাতে তাঁর খুশু-খুযু এবং একাগ্রতা প্রবাদতুল্য ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তলোয়ার চালাতেন না এবং তীর ছুড়তেন না। যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের মধ্যে উকবা বিন আব্দুল গাফির, উকবা বিন ওয়াসাজ এবং মায়মুন বিন আবি শাবীব (রহ.)-ও ছিলেন যারা ইরাকের ক্বারী ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য হতেন। [৩]

তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন গালিব হুদানী (রহ.)-ও ছিলেন যার কবর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিশকের সুঘ্রাণ আসত। [৪] আবু মিকদাম আজলী, আব্দুর রহমান বিন যায়েদ কুফী, আবুল জাওয়া আযদী, আবুল বখতারী আত-তায়ী (রহ.)-ও নিহত হয়েছেন যাদের থেকে মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। [৫]

আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা (রহ.) এবং আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রহ.) উভয়ই প্রবীণ তাবেয়ী এবং উচ্চপর্যায়ের মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য হন। দুজাইল-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা উভয়ই নিজেদের ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন এবং তারপর তাদের আর কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি। বাহ্যত তারা উভয়ই ডুবে গিয়েছিলেন। [৬]

গ্রেফতারির পর নিহতদের মধ্যে ইমরান বিন এসাম আল-নাসবী (রহ.)-ও ছিলেন যিনি বসরার আবেদ ও জাহিদ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে হাজ্জাজের সামনে আনা হলে হাজ্জাজ বলল: “সাক্ষ্য দাও যে তোমরা কুফরি করেছ। আমি তোমাদের ছেড়ে দেব।”

তারা বলল: “আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমরা আল্লাহকে মেনেছি, কখনো কুফরি করিনি।” হাজ্জাজ তাদের গর্দান উড়িয়ে দিল। [৭]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) লেখেন: “গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে যে কুফরির স্বীকৃতি দিত, হাজ্জাজ তাকে ছেড়ে দিত [৮], অন্যথায় তাকে হত্যা করে ফেলত।” [৯]

[১] আল-মা'রিফাত ওয়াত-তারিখ: ৪৮৯/২

[২] আল-মিহান, পৃ. ২২৯

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩৬৫/৬

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৬; আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারী: ১৮০/১; তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, ওফাত: ৮১ হি. থেকে ১০০ হি.

[৫] আস-সিকাত লি ইবনে হিব্বান: ২০/৫

[৬] আল-ইকমাল ফি যিকর মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফি মুসনাদিল ইমাম আহমাদ সিওয়া মান যুকির ফি তাহযিবিল কামাল, পৃ. ২৬২; আত-তারিখুল আওসাত: ১৮০/১; তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী, ওফাত: ৮১ হি. থেকে ১০০ হি.

[৭] আল-ইসবাহ: ১২/৫, তরজমা: আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৪৮/১২

[৯] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩০৭/৪

তা সত্ত্বেও কিছু আলেম ও মুহাদ্দিস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে বের হতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে সরকারের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা থেকেও নিরাপদ থাকেন। তাদের মধ্যে সাইয়্যার বিন সালামাহ আবুল মিনহাল, মালিক বিন দিনার, নাদর বিন আনাস বিন মালিক, আবু উবাইদাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মুররাহ বিন দিয়াব, তালহা বিন মুসাররিফ, জুবাইদাহ বিন আল-হারিস আল-ইয়ামী, আতা বিন সাইব, আবু নুজাইদ হিমসি, আবুল শাইখ হানায়ী এবং সাঈদ বিন আবিল হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখযোগ্য। বসরাবাসীদের পীড়াপীড়িতে হযরত হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ)-ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন, [১] তাই তিনি হাজ্জাজের ক্রোধ থেকে বাঁচতে তার মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন। [২]

ইমাম শাবী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে আচরণ:

কুফাবাসীদের মধ্যে ইমাম শাবী মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ক্বারী হিসেবে গণ্য হতেন। তাকে ‘জাইমুল কুররা’ (ক্বারীদের নেতা) বলা হতো। দাইরুল জামাজিমের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি আত্মগোপন করেন। অবশেষে দীর্ঘ সময় পর তিনি হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হন। হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করল: “আল্লাহর শত্রুর পক্ষ কেন নিয়েছিলে?”

শাবী (রাহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত সাবলীল ও অলঙ্কারপূর্ণ আরবিতে বললেন: “আমাদের অন্তর ছিল অনুর্বর এবং আবাসস্থল ছিল প্রতিকূল। ভয় ছিল আমাদের ওড়না ও বিছানা এবং ফিতনা আমাদের গ্রাস করেছিল। আমরা নিষ্পাপ পরহেজগার, কোনো শক্তিশালী বা দুরাচার নই।” [৩]

হাজ্জাজ এই অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যগুলো শুনে বিমোহিত হয়ে পড়ল এবং বলল: “ওহ! তোমার পিতার কল্যাণ হোক, ঠিক আছে তুমি যেতে পারো।” [৪]

এটি ছিল তাবেয়ীদের মেধার একটি নমুনা। মিথ্যাচার না করেই নিজেকে সরকারের রোষানল থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।

দাইরুল জামাজিমের মুক্তিকামীরা একনিষ্ঠ ছিলেন:

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দাইরুল জামাজিমের অধিকাংশ মুক্তিকামীই একনিষ্ঠ ছিলেন। তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিশুদ্ধ খিলাফতে রাশেদার আদলে বাস্তবায়ন করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ, তাদের নিহতদের সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের আচরণ করা হবে। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তাদের কারো কারো কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতো। তাদের এই কাজ বীরত্ব ও আত্মমর্যাদার দিক থেকে গর্ব করার মতো, এজন্যই ইসলামী আলেমগণ তাদের নামের সাথে ‘রাহিমাহুল্লাহ’ যুক্ত করেন। এই লোকদের অপরাধী সাব্যস্ত করা সঠিক নয়, বরং পূর্বসূরিদের (আসলাফ) বক্তব্য হলো: “দাইরুল জামাজিম ও হাররাবাসীদের চেয়ে উত্তম বিদ্রোহকারী দল আর নেই।” [৫]

কিন্তু অন্যদিকে বাস্তবতা এটিও ছিল যে, এই বিদ্রোহের ফলাফল উম্মাহর সামষ্টিক ক্ষতির রূপ ধারণ করেছিল। এতে মহান আলেম ও মাশায়েখদের শাহাদাতের ফলে উম্মাহর এক বিশাল ইলমী ও আধ্যাত্মিক সম্পদ নষ্ট হয়। এই ক্ষতির আন্দাজ বিদ্রোহে শরিক কিছু ব্যক্তির আগে থেকেই ছিল। হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এজন্যই অংশগ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে আশআসকে কিছু উপদেষ্টা বলেছিলেন: “আপনি যদি চান যে মানুষ আপনার চারপাশে পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করুক, তবে হাসানকে অবশ্যই ডাকুন।”

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৬-২৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৪৬-৩৪৮; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবী, ওফাত: ৮১ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৫২।

[৪] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ: ৬/২৪৯; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৮।

[৫] আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লিল ইমাম আহমাদ বি-রিওয়ায়াতি ইবনিহি আব্দুল্লাহ: ৩/১৬৮।

অবশেষে হযরত হাসান বসরী রহ.-কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসতে হলো। [১]

যুদ্ধের সময় বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ার অনুভূতি কিছু বুজুর্গের হয়েছিল; তাই তারা ব্যবহারিকভাবে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলিম বিন ইয়াসার রহ., যিনি যুদ্ধের সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন, না তীর ছুড়েছেন না তলোয়ার চালিয়েছেন। যুদ্ধের পর তিনি বলতে লাগলেন: “আল্লাহর শোকর যে আমি তীর চালাইনি, না নেজা না তলোয়ার।”

তঁার ছাত্র আবু কিলাবা বললেন: “আপনি নিজে তো লড়েননি কিন্তু আপনাকে দেখে এত মানুষ এই ধারণা করেছিল যে মুসলিম বিন ইয়াসার আমাদের সাথে আছেন, যিনি হক ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্য লড়েন না। আপনার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে লড়তে লড়তে তারা প্রাণ দিয়ে দিল। এই লোকদের দায়িত্ব কার ওপর?”

এ কথা শুনে মুসলিম বিন ইয়াসার রহ. এত বেশি কাঁদলেন যে তঁার হেঁচকি উঠে গেল। [২] লড়াইতে শরিক হওয়া এক বুজুর্গ জুবাইদ বিন আল-হারিস রহ. একবার কাউকে হাসতে দেখে বললেন: “যদি তোমরা জামাজিম যুদ্ধে শরিক হতে তবে এভাবে হাসতে না। হায়! আমার হাত যদি কবজি থেকে কাটা যেত আর আমি এই যুদ্ধে शामिल না হতাম।” [৩]

সেই যুগের এক বুজুর্গ বলেন: “ইবনে আশআসের সাথে নিহত হওয়া এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যার মৃত্যুতে কেউ খুশি হয়েছে। বেঁচে যাওয়া এমন কেউ ছিল না যে আল্লাহর শোকর আদায় করেনি যে সে বেঁচে গেছে।” [৪]

তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ফকীহদের সিয়াসাতে শরঈয়্যাহর ওপর নতুন করে চিন্তাভাবনা:

এই ধরনের কিছু তিক্ততম অভিজ্ঞতার পর আমরা প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুর কয়েক দশকে উম্মতের উলামা, ফকীহ এবং ফতোয়া প্রদানকারীদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বের করতে দেখি। এর আগে যেহেতু সাধারণত এই সমস্যাগুলোকে এত গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়নি; তাই অনেক নামী দামী ফতোয়া প্রদানকারী আলেমও কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বাহ্যিক نصوص (নস) থেকেই হেদায়েত নেওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকতেন।

যেমন প্রসিদ্ধ হাদিস হলো: [৫] **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ**

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখবে সে যেন তা শক্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়।” [৬]

এটি দেখে সেই যুগে অনেক আলেম জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (খুরুজ) বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন, অনেক বুজুর্গ অন্যান্য হাদিসের ভিত্তিতে তা থেকে নিষেধ করতেন। মোটকথা খুরুজের শর্তাবলি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোনো একটি ঐক্যবদ্ধ মতামত ছিল না। কিন্তু যখন হাররার ট্র্যাজেডি এবং দাইরুল জামাজিম যুদ্ধের মতো ঘটনায় উম্মতকে বারবার জনবল, সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অসহনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো, তখন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গভীর চিন্তাভাবনার পর দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর সময় আহলে সুন্নাত ওয়াল...

[১] তারিখ দামেশক: ৫৮/১১৭; আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী: ২/৩০২

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৫৭

[৩] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৮৭

[৪] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৮৬

[৫] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৩৪০; কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমর ওয়ান নাহি, আলবানী বলেছেন: সহীহ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই বিষয়ে ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শাসকদের জুলুম ও নির্যাতনের ওপর ধৈর্য ধারণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) না করা ওয়াজিব।

এর অর্থ এই নয় যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে ফকীহগণ নিজ থেকে দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন এবং এই নতুন বিধানগুলো উদ্ভাবন করেছেন। মোটেও তা নয়, বরং এই নির্দেশনাগুলো কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহে (নুসুস) আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যখন উলামা ও ফকীহগণ বারবার রাজনৈতিক সংকট প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তারা চিন্তা করলেন যে, এমন নির্দেশনাগুলো খুঁজে বের করা উচিত যা অনুসরণ করে এ ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয় এবং যদি এই বিষয়ে দলীলসমূহ বাহ্যিকভাবে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, তবে সেই বিরোধ দূর করে মূল বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

এই গবেষণার ফলে কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান এই নির্দেশনাগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শাসক যদি ব্যক্তিগতভাবে ফাসেক ও ফাজের হয় এবং প্রজাদের অধিকারও খর্ব করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে না। বরং মৌখিক সত্য প্রকাশ এবং দাওয়াত ও উদ্ধৃকরণের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে দ্বীনি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে, যেমনটি এই বিষয়ে সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। আউফ বিন মালেক (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি:

“তোমাদের সর্বোত্তম শাসক তারা যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক তারা যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়।”

সাহাবীগণ আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! এই অবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না?” তিনি বললেন: “না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম রাখে।” (তিনবার বললেন) তারপর বললেন: “সাবধান! যে ব্যক্তি তার শাসককে আল্লাহর নাফরমানি করতে দেখে, সে যেন সেই গুনাহকে ঘৃণা করে কিন্তু শাসকের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়।” [১]

সহীহ মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবীগণ আরজ করলেন: “আমরা কি তলোয়ারের জোরে এমন শাসকদের সরিয়ে দেব না?” তিনি বললেন: “না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করতে থাকে। তবে যখন তোমরা শাসকদের অপছন্দনীয় কাজ করতে দেখবে, তখন তাদের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে কিন্তু আনুগত্য ত্যাগ করবে না।” [২]

একটি হাদীসে আছে: “তোমাদের ওপর এমন শাসকগণ চাপিয়ে দেওয়া হবে যাদের তোমরা চিনতে পারবে এবং তাদের সমালোচনা করবে। যে ব্যক্তি (তাদের মন্দ কাজকে) মন্দ মনে করল সে নিরাপদ রইল। যে ব্যক্তি সমালোচনা করল সেও শান্তিতে রইল। তবে যে ব্যক্তি (তাদের মন্দ কাজে) সন্তুষ্ট রইল এবং তাদের অনুসরণ করল (সে ধ্বংস হলো)।” [৩]

এই নির্দেশনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জালেম ও ফাসেক শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ (খুরুজ) করা যাবে না। তবে তাদের আনুগত্য কেবল বৈধ বিষয়েই করা হবে, অবৈধ নির্দেশ মানা যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে হাদীসে এই পর্যন্ত তাকিদ দেওয়া হয়েছে যে:

“كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ”

(তুমি আল্লাহর নিহত বান্দা হও, কিন্তু আল্লাহর হত্যাকারী বান্দা হয়ো না।)

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৮১০, কিতাবুল ইমারাহ, বাব: থিয়ারুল আইন্নাহ ওয়া শিরারুহ্ম।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৯১১।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৯০৭, কিতাবুল ইমারাহ, বাব: উজুবুল ইনকার আলাল উমারা ফীমা ইউখালিফুশ শার’আ।

“নিহত বান্দা হয়ে যেও, কিন্তু হত্যাকারী বান্দা হয়ো না।” [১]

একটি হাদিসে আছে: “একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য শোনা এবং মানা আবশ্যিক, চাই সেই বিষয়টি তার পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ না তা গুনাহের কাজ হয়। যদি গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তা শোনারও কোনো সুযোগ নেই এবং মানারও নয়।” [২]

খুরুজ কোন শর্তাবলীর অধীনে বৈধ হবে:

এই সমস্ত বর্ণনাকে সামনে রেখে ফকীহগণ এটি স্থির করেছেন যে, যদি সরকারের জুলুম এবং তার ধর্মহীনতা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তারা সালাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, একইভাবে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দ্বীনের নিদর্শনাবলী মিটিয়ে দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে খুরুজ ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার এবং ব্যবস্থা সামলানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে হবে এবং খুরুজের ফলে আগের চেয়ে বেশি ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

শুধুমাত্র মুতাজিলা এবং খারিজিদের মাযহাব এটি যে, তারা প্রতিটি অবস্থায় ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে খুরুজ করাকে জরুরি মনে করে। [৩]

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১৬০৫, ২১৬০৬; মুসনাদে ইবনে আবি শাইবাহ, হা: ৯০২

[২] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ৫৩৩১

[৩] আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ: ৮/৩১৭, ৩১৮

ছেলেদের জন্য উত্তরাধিকারের বাইয়াত

৮৫ হিজরিতে খোরাসানে রতবিলের হাতে ইবনে আশআসের মৃত্যু হয়েছিল। [১] এরপর আব্দুল মালিক পূর্ণ নিশ্চিন্তে শাসনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা উন্নত করার সুযোগ পান। বনু মারওয়ানের হাতে খিলাফতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেদের উত্তরাধিকারী বানাতে, কিন্তু মারওয়ান আব্দুল মালিকের পর তার ভাই আব্দুল আজিজকে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন; তাই আব্দুল মালিকের এই ইচ্ছা পূরণ হওয়া কঠিন ছিল। তবে ভাগ্য তার সহায় হয়েছিল এবং ৮৫ হিজরিতে আব্দুল আজিজের মৃত্যু হয়। [২]

আব্দুল মালিক চেয়েছিলেন তার ছেলেরা দ্বীনদার হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতার অধিকারীও হোক। তিনি তার দুই ছেলে ওয়ালিদ ও সুলাইমানের উত্তরাধিকারের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর একদিন তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কি কখনো কোনো হারাম কাজ করেছ?” তারা উভয়েই বলল: “আল্লাহর কসম! কখনো না।”

আব্দুল মালিক বললেন: “রবে কাবার কসম! তোমরা অবশ্যই এই খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করবে।” [৩]

তখন আব্দুল মালিক পূর্ণ আস্থার সাথে তার ছেলে ওয়ালিদ এবং তার পরে সুলাইমানের জন্য উত্তরাধিকারের বাইয়াত গ্রহণ করেন। [৪] এভাবে উত্তরাধিকার প্রথা ইসলামী খিলাফতের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় যা বারবার চরম ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি।

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা:

শাহ মঈনুদ্দীন নদভী তার “তারিখে ইসলাম”-এ লিখেছেন যে, মদিনায় সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) উত্তরাধিকারের বাইয়াত দিতে অস্বীকার করলে মদিনার গভর্নর হিশাম বিন আব্দুল মালিক তার ওপর চরম কঠোরতা করেন, তাকে চাবুক মারেন এবং জনসমক্ষে অপমানিত করে কারারুদ্ধ করেন। [৫] এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় যে, মদিনার এই গভর্নর হিশাম বিন আব্দুল মালিক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন হিশাম বিন ইসমাইল। শাহ মঈনুদ্দীন নদভী মরহুমের পক্ষ থেকে এটি একটি ভুল হয়েছে। তাবারী এবং সমস্ত ইতিহাসে হিশাম বিন ইসমাইল-ই লেখা আছে। হিশাম বিন আব্দুল মালিক, যিনি পরবর্তীতে খলিফা হয়েছিলেন, তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন।

[১] তারিখে তাবারী: ৩৯২/৬

[২] তারিখে তাবারী: ৪১৮/৬

[৩] তারিখে তাবারী: ৪১৬/৬, ৪১৭

[৪] তারিখে তাবারী: ৪১২/৬, ৪১৩

[৫] তারিখে ইসলাম, শাহ মঈনুদ্দীন নদভী: ৪২২/১

দ্বিতীয় কথা হলো, এই ঘটনাটি এই পর্যন্ত প্রমাণিত যে চাবুক মারা হয়েছিল। জনসমক্ষে অপমান করা এবং কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করার বিষয়টি কোনো সহিহ বর্ণনায় নেই। যেহেতু এই ঘটনাটি ওয়াকিদির মতো দুর্বল বর্ণনাকারীরা অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন; তাই সম্ভবত অতিরঞ্জিত এই অতিরিক্ত কথাগুলো দুর্বল বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে যুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ আলাম।

তৃতীয় কথা হলো, আব্দুল মালিক এই শাস্তিকে অপহৃদ করে গভর্নরকে তিরস্কারমূলক চিঠি লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন: “সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকার রাখেন, মারধরের নয়। তাঁর পক্ষ থেকে বিরোধিতার কোনো আশঙ্কা নেই।” [১]

আব্দুল মালিকের মৃত্যু:

৮৬ হিজরির শাওয়াল মাসে আব্দুল মালিক মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল: “আপনি কেমন অনুভব করছেন?” উত্তর দিলেন: “ঠিক তেমনই যেমন আল্লাহ বলেছেন: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا خَوَّيْنَاكُمْ وِرَاءَ ظُهُورِكُمْ (আর তোমরা আমার কাছে একাকী এসেছ যেমন আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ।) [২]”

যখন মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, তখন পুত্র ওয়ালিদ কেঁদে ফেলল। আব্দুল মালিক বললেন: “মেয়েদের মতো এই কান্না কেন?” তারপর বললেন: “ওয়ালিদ! যে দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করে যাচ্ছি সে বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে থেকো। ভাইদের সাথে মতবিরোধ এড়িয়ে চলবে, নেককার হয়ে শিশুদের মতো থাকবে, বোনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখাবে কারণ যুদ্ধ কারও মৃত্যুকে সময়ের আগে নিয়ে আসতে পারে না। কল্যাণের ক্ষেত্রে হিদায়াতের মিনার হয়ে থেকো কারণ কল্যাণ মানুষের নামকে জীবিত রাখে, অন্তরকে ভালোবাসায় পূর্ণ করে দেয় এবং জিহ্বায় প্রশংসা জারি করে দেয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সম্মান করবে কারণ সে তোমার জন্য শহরগুলো জয় করেছে এবং শত্রুদের পরাজিত করেছে।”

এই নির্দেশ দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন তারপর বললেন: “সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হোক।” নির্মল বাতাস ভেতরে এলে একটি দীর্ঘশ্বাস নিলেন এবং বললেন: “দুনিয়া! তুমি কতই না আনন্দদায়ক কিন্তু তোমার দীর্ঘ সময়ও সংক্ষিপ্ত, তোমার প্রচুর সম্পদও সামান্য, আমরা সবাই তোমার প্রতারণার শিকার হয়েছি।”

বাতাসের ঝাপটায় কোনো ধোপার কাপড় ধোয়ার শব্দ ভেসে এল। জিজ্ঞেস করলেন: “ওটি কে?” লোকজন বলল: “ধোপা।” আব্দুল মালিক বললেন: “হায়! আমিও যদি একজন ধোপা হতাম, প্রতিদিনের মজুরি দিয়ে দিনাতিপাত করতাম, খিলাফতের দায়িত্ব আমার ওপর না আসত, আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত থাকতাম।” [৩]

১৫ শাওয়াল ৮৬ হিজরিতে ৬০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। দামেস্কে দাফন করা হয়। [৪]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৪১৭/৬

[২] সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৯৪

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩৯২/১২ থেকে ৩৯৫

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ৪১৮, ৪১৯/৬

সঠিক মত অনুযায়ী তার খিলাফতের মেয়াদ ১৩ বছর ৫ মাস হয়। গবেষকদের মতে এর আগের নয় বছরের সময়কাল (৬৪ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি) তিনি একজন স্বাধীন বিদ্রোহী শাসক হিসেবে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়কালকে খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করা ইসলামি রাজনীতির মূলনীতির পরিপন্থী।

সন্তানাদি:

সন্তানদের মধ্যে ষোলজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে ছিল। ছেলেদের মধ্যে ওয়ালিদ, সুলাইমান, ইয়াজিদ, হিশাম, মাসলামাহ, মুনজির এবং আনবাসাহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। [১] মেয়েদের মধ্যে ফাতিমা তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আব্দুল মালিক তাকে ইয়েমেনের প্রাচীন বাদশাহ মারিয়ার দুটি কানের দুল ছাড়াও একটি বিরল ও দুপ্রাপ্য মুক্তা দিয়েছিলেন যার পৃথিবীতে কোনো নজির ছিল না। [২] এই মেয়েটিই পরবর্তীতে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং নিজের পরহেজগারি, দানশীলতা, ইবাদত ও সাধনার কারণে ইসলামি ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্থান লাভ করেন। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৯৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৯৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৯৩

আব্দুল মালিকের জীবনের ওপর একটি পর্যালোচনা

আব্দুল মালিকের জীবন আমাদের কাছে তিনটি অংশে বিভক্ত বলে মনে হয়: প্রথম পর্যায়টি হলো তার যৌবন থেকে ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত, যাতে তাকে একজন আলেম, আবেদ এবং মুজাহিদ হিসেবে দেখা যায়। তিনি অধিকাংশ সময় তিলাওয়াত, জিকির, নফল ইবাদত এবং হাদিস শোনা ও শোনানোর কাজে মশগুল থাকতেন। তিনি আফ্রিকার কিছু যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং জিহাদের অনেক পদক তার বক্ষে শোভা পাচ্ছিল। তার অধিকাংশ সময় নির্জনে অতিবাহিত হতো। তা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির তা নেতৃত্বদানের গুণাবলি আঁচ করতে পারতেন।

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং তিনি একই বছর অর্থাৎ ২৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে খুব বেশি মেলামেশা ছিল না, তবে ইয়াজিদ তার গুণাবলির স্বীকৃতি দিতেন। একবার ইয়াজিদ তার সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সুফরাহ-এর সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় দ্বাররক্ষী বলল: “আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সাক্ষাতের অনুমতি চাচ্ছেন।” ইয়াজিদ বললেন: “আমরা তো তার এবং তার পিতার আবেদন পূরণ করে দিয়েছি, তাহলে আবার কী কাজ?” দ্বাররক্ষী বলল: “তিনি বলছেন যে, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলবেন, বসবেন না।” ইয়াজিদ বললেন: “ঠিক আছে, আসতে দাও।”

কয়েক মুহূর্ত পর কারীদের ঢঙে পাগড়ি বাঁধা এবং শিমলা (পাগড়ির বুলন্ত অংশ) সামনে থেকে পেছনের দিকে বুলিয়ে রাখা এক সুশ্রী যুবক ভেতরে প্রবেশ করল। সে ইয়াজিদের সাথে সংক্ষেপে কথা বলল। ইয়াজিদ ইতিবাচক উত্তর দিলেন। যুবকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, ইয়াজিদ দীর্ঘক্ষণ তার চলে যাওয়া দেখছিলেন। তারপর মুহাল্লাবকে বললেন: “আহলে কিতাবরা বলে যে, এই যুবক অচিরেই শাসনভার গ্রহণ করবে।” মুহাল্লাব বললেন: “আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এমনটি হলে (ভালোই হবে); কারণ সে একজন পবিত্র মুসলিম এবং তার পরিবারের একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ।” [১]

আব্দুল মালিকের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো ৬৩ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত, যাতে তিনি সিরিয়ার অবৈধ শাসক ছিলেন এবং যেকোনো মূল্যে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর শরয়ি খিলাফত খতম করতে চেয়েছিলেন। ৭০ হিজরিতে যখন রোমানরা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইসলামি বিশ্বের সীমান্তে আক্রমণ ও লুটতরাজ শুরু করল, তখন আব্দুল মালিক প্রতি সপ্তাহে এক হাজার দিনার প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করে নিলেন, যাতে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা যায়। এই কর্মপন্থা সাহাবা যুগের রাজনীতির বিপরীত ছিল; কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এমন পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামি বিশ্ব রক্ষার জন্য লড়াই করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন, যার ফলে রোমান সম্রাট ভীত হয়ে পিছু হটেছিল।

[১] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৬৬

তারিখ মিলাতে মুসলিমা

রোমানদের সাথে আব্দুল মালিকের সন্ধি সম্পর্কে হাফিজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দুর্বলতা যা সৃষ্টি হয়েছিল। যার কারণ ছিল কেবল পারস্পরিক মতভেদ।” [১] এই ক্ষমতা লাভের জন্য আব্দুল মালিক হাজ্জাজের তলোয়ার দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত খিলাফতের অবসান ঘটান। আব্দুল মালিকের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ১৩ বছরে আমরা তাকে একজন দায়িত্বশীল ও মধ্যপন্থী শাসক হিসেবে দেখতে পাই, যিনি কঠোর প্রয়োজনে শাস্তিও দেন এবং সাধারণত একজন ক্ষমাশীল প্রতিপালকের মতো আচরণ করেন। তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং সফল, যার কাছে প্রতিটি শত্রু পরাজিত হয়। প্রজারা তার গুণগান গায় এবং জ্ঞান ও ফযিলতের অধিকারীরা তার চারপাশে সমবেত হয়।

অবয়ব এবং গুণ ও ফযিলত:

আব্দুল মালিক মাঝারি গড়ন ও সুশ্রী ছিলেন। শরীর ভারী কিন্তু পাতলা ছিল। চোখ বড় ছিল এবং নাক ছিল খাড়া। মাথা ও দাড়ির চুল দ্রুত সাদা হয়ে গিয়েছিল। [২]

কেউ জিজ্ঞেস করল: “আপনার চুল এত দ্রুত সাদা হয়ে গেল কেন?”

তিনি উত্তর দিলেন: “নিজের বুদ্ধিকে অন্যদের সাথে তুলনা করার কারণে।”

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, সেই যুগে মদিনা মুনাওয়ারায় চারজন বড় ফকীহ ছিলেন: সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.), উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা.), কাবিদাহ বিন যুয়াইব (রহ.) এবং চতুর্থজন ছিলেন আব্দুল মালিক। [৩]

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলতেন: “মানুষের ঘরে সন্তান জন্ম নেয়, কিন্তু মারওয়ানের ঘরে পিতা জন্ম নিয়েছে।” [৪]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাবিঈ নাফি (রহ.) বলেন: “আমি মদিনায় আব্দুল মালিকের চেয়ে বড় মুজাহিদ, বড় ফকীহ এবং কুরআন মাজীদের বড় কারী আর কাউকে দেখিনি।” [৫]

কিছু বর্ণনায় আছে যে, যখন তিনি মারওয়ানের মৃত্যু এবং নিজের শাসক হওয়ার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। এই সংবাদ শুনে তিনি কালামে পাক বন্ধ করে বললেন: “এটিই শেষ সাক্ষাৎ।” [৬]

এর অর্থ এই ছিল না যে শাসক হিসেবে কুরআন মাজীদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না; বরং উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হওয়ার পর এখন আর একাগ্রচিত্তে তিলাওয়াতের সময় পাওয়া যাবে না। তাই তিনি এই কথাগুলো দুঃখ ও আফসোসের সাথে বলেছিলেন।

ইমাম শাবী (রহ.) বলতেন: “আমি যেসব ওলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের প্রত্যেকের ওপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছি, আব্দুল মালিক ছাড়া। আব্দুল মালিকের সাথে যখনই কোনো হাদীস বা কবিতা নিয়ে আলোচনা হতো, তিনি সেই জ্ঞানে কিছু না কিছু বৃদ্ধি করে দিতেন।” [৭]

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গবার: ৫৮/১

[২] তারিখ দিমাশক: ১২১/৩৭

[৩] তারিখ বাগদাদ লিল-খতিব আল-বাগদাদী: ৩৮৯/১০

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩৭৮/১২

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২৩৪/৫

[৬] তারিখ দিমাশক: ১২০/৩৭

[৭] তারিখ দিমাশক: ১২৪/৩৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হাস্যরসবোধ..... একটি কৌতুক:

তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় অনন্য ছিলেন। মেজাজে গাভীর্ষ প্রবল থাকলেও হাস্যরসবোধের অনুভূতি একেবারে মরে যায়নি। একবার তিনি এক বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলে সে বলল: “আমার এই প্রতিদান পাওয়া উচিত নয়।”

জিজ্ঞেস করলেন: “তাহলে কী প্রতিদান পাওয়া উচিত?”

সে বলল: “আমি তো আপনার মঙ্গলের জন্যই বিদ্রোহে শরিক হয়েছিলাম; কারণ আমি অলক্ষুণে হিসেবে পরিচিত। আমি যার সাথে যোগ দিই, তার পরাজয়ই হয়। আমি যদি আপনার বিরোধীদের সাথে থাকি, তবে তা আপনার জন্য এক লক্ষ সৈন্যের চেয়েও বেশি (উপকারী) হবে।” আবদুল মালিক হেসে ফেললেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। [১]

রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

যদিও সাময়িক কৌশলের কারণে আবদুল মালিক রোমানদের সাথে সন্ধি করেছিলেন, কিন্তু খলিফা হওয়ার দেড় বছর পর তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার সেই ধারা পুনরায় শুরু করেন যা আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে চালু ছিল।

৭৫ হিজরির শীতকালে তিনি তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন মারওয়ানকে সেনাবাহিনী দিয়ে রোমান সীমান্তে জিহাদের জন্য পাঠান। এই বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে আবান বিন ওয়ালিদ বিন উকবা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। [২]

পরের বছর মুহাম্মদ বিন মারওয়ান পুনরায় অগ্রসর হন এবং মালাতিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। [৩]

৭৭ হিজরিতে তাঁর উত্তরাধিকারী ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক সেনাবাহিনী নিয়ে মাল্টা থেকে মাসিসা পর্যন্ত অগ্রসর হন। [৪]

৭৮ হিজরিতে মুহরিজ বিন আবি মুহরিজ এশিয়া মাইনরে রোমানদের পিছু হটতে বাধ্য করে “আজকাল” জয় করেন। [৫]

৭৯ হিজরিতে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক মালাতিয়া ফ্রন্টে সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। [৬]

দামেস্কের মিথ্যাবাদীর দমন:

আবদুল মালিক আকিদার ক্ষেত্রে একজন খাঁটি মুসলিম ছিলেন। তিনি ভ্রান্ত আকিদা সহ্য করতেন না। এই যুগে হারিস বিন সাঈদ নামক এক মিথ্যাবাদী (কাজ্জাব) দামেস্কের জামে মসজিদে যুহুদ ও ইবাদতের মাধ্যমে একটি বড় দলকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। জিনের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তাদের শক্তিতে সে কারামত দেখাত। মসজিদে স্থাপিত মার্বেল পাথরের ওপর আঙুল দিয়ে আঘাত করলে সেখান থেকে তাসবিহ পাঠের শব্দ আসত। শীতকালে গ্রীষ্মের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতের ফল তার কাছে থাকত। যারা তার একনিষ্ঠ মুরিদ হয়ে যেত, তাদের সামনে সে গোপনে নবুওয়াতের দাবি করত। কত মানুষ এই ফিতনায় পড়ে ধমহীন হয়ে গেল।

কাসিম নামক এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই চক্রান্ত বুঝতে পারলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শহরবাসীকে জানিয়ে দিলেন। বিষয়টি আবদুল মালিক পর্যন্ত পৌঁছাল। হারিস কাজ্জাবের খোঁজ শুরু হলে সে দামেস্ক থেকে পালিয়ে গেল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পরেও তাকে পাওয়া যায়নি।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/২৮৮

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৭৬

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৭০

[৪] তারিখ ইবনে খালদুন, পৃ: ২৭৭

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৭৫

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২৭৮

একদিন তাঁর দুই পথভ্রষ্ট মুরিদ এসে আব্দুল মালিককে জানাল যে, সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) বাইতুল মুকাদাসের এক বিশেষ মুরিদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আব্দুল মালিক এ কথা শোনামাত্রই তাঁর সৈন্যদের নিয়ে দামেস্ক থেকে বাইতুল মুকাদাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি সেই বাড়ির ওপর গোপন নজরদারির নির্দেশ দিলেন। এক রাতে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আব্দুল মালিক বাড়ির চারপাশে কয়েক ডজন সৈন্য মোতায়েন করলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনামাত্রই যেন মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর তিনি তাঁর এক গোয়েন্দাকে কাজ্জাবের মুরিদ সাজিয়ে সেই বাড়ির দিকে পাঠালেন। সে দরজায় পৌঁছালে পাহারাদার তাকে বাধা দিয়ে বলল: “আল্লাহর নবী এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন।”

কাজ্জাবের ভেতরে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই তথ্যদাতা সংকেত দিল। আব্দুল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী ঘেরাওকারীরা শত শত মশাল জ্বালিয়ে দিল, ফলে রাত যেন দিনে পরিণত হলো। কিছু সৈন্য ভেতরে ঢুকে হারিস কাজ্জাবকে খুঁজতে শুরু করল। তার মুরিদরা বলল: “আল্লাহর নবী তো হযরত ঈসার মতো আসমানে চলে গেছেন।”

সৈন্যরা তল্লাশি চালিয়ে যেতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটি সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল। সে সেখানেই লুকিয়ে ছিল। তাকে বেঁধে আব্দুল মালিকের কাছে আনা হলো। তিনি তাকে বন্দি করলেন এবং উলামা ও ফুকাহাদের মাধ্যমে তাকে তওবা করানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে রাজি হলো না। অবশেষে আব্দুল মালিক তাকে শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

জল্লাদ যখন তাকে শূলে বেঁধে বর্শা দিয়ে আঘাত করল, তখন মনে হলো বর্শাটি কোনো লোহার ওপর লেগেছে। বর্শার আগা বাঁকা হয়ে গেল। এটি দেখে আব্দুল মালিক বললেন: “ওরে হতভাগা! তুই কি আল্লাহর নাম নিয়ে বর্শা মেরেছিলি?” জল্লাদ বলল: “না।”

আব্দুল মালিক বললেন: “আল্লাহর নাম নিয়ে আঘাত কর।”

জল্লাদ আল্লাহর নাম নিয়ে আঘাত করল এবং বর্শাটি বিদ্ধ হয়ে কাজ্জাব মারা গেল। আসলে সে যেসব জিন ও শয়তানদের বশ করেছিল, তারা কাজ্জাবকে রক্ষা করছিল এবং বর্শাকে অকেজো করে দিচ্ছিল। আল্লাহর জিকিরের ফলে সেই প্রভাব দূর হয়ে গেল এবং জিন ও শয়তানরা পালিয়ে গেল।

এই ঘটনা থেকে যেমন আব্দুল মালিকের দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর ইলমি যোগ্যতা ও ফিকহী প্রজ্ঞাও প্রকাশ পায়; কারণ সুন্নাহর বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল জানতে পারেন যে, জিনদের তাড়াতে আল্লাহর জিকিরের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

সেই যুগের এক বুজুর্গ আলা বিন যিয়াদ বলেন: “আব্দুল মালিকের অন্য কোনো কাজের জন্য আমি তাঁর প্রতি ততটা ঈর্ষা করি না যতটা এই কাজের জন্য করি; কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে যে সে নবী। যে এমন বলবে তাকে হত্যা করো। তাদের মধ্যে যে কাউকে হত্যা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” [১]

আব্দুল মালিক দ্বীনি নিদর্শনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবার সফরকালে একটি সাধারণ মুদ্রা কোনো এক নোংরা কুয়ায় পড়ে গেল। তিনি শ্রমিকদের তেরো দিনার (প্রায় ছয় তোলা সোনা) দিয়ে সেই মুদ্রাটি উদ্ধার করালেন। একটি মুদ্রার জন্য এত দিনার খরচ করায় কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আব্দুল মালিক বললেন: “এতে আল্লাহর নাম লেখা ছিল।” [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/২৮৫ থেকে ২৯০।

[২] তারিখ দামেশক: ৩৭/১৪০।

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

আবদুল মালিককে দ্রুতগত গোলযোগ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; তাই তিনি নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের খুব বেশি সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড অবিস্মরণীয়।

ইসলামী মুদ্রা প্রচলন:

মুসলিম বিশ্বে তখন পর্যন্ত সব ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। নিজস্ব কোনো বিশেষ মুদ্রা ছিল না। হিজাজ, ইরাক ও সিরিয়ার দিরহাম ও দিনার ভিন্ন ভিন্ন মানের ছিল। সেগুলোতে রোমান, পারস্য ও মিশরীয় মুদ্রাও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। ওজনের ভিত্তিতে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হতো। আবদুল মালিকই প্রথম শাসক যিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ৭৬ হিজরিতে নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এই সিদ্ধান্তের একটি তাৎক্ষণিক কারণ এটিও ছিল যে, আবদুল মালিকের যুগে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও ফরমানসমূহ “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরুদ ও সালামের মাধ্যমে শুরু করা হতো। অমুসলিম রাজাদের কাছে এটি অপ্রীতিকর মনে হতো। একবার রোম সম্রাট (কায়সার) তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন: “আপনার লেখায় আপনার রাসূলের স্মরণের যে নতুন পদ্ধতি শুরু করেছেন, তা বন্ধ করুন। অন্যথায় আমরা আমাদের মুদ্রায় এমন কিছু খোদাই করব যা আপনার কাছে খারাপ লাগবে।”

আবদুল মালিক অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে ডেকে ঘটনাটি শোনালেন। খালিদ বললেন: “চিন্তা করবেন না। তাদের মুদ্রা বন্ধ করে দিন এবং নিজের মুদ্রা তৈরি করে নিন।”

আবদুল মালিক খুশি হয়ে বললেন: “তুমি আমার চিন্তা দূর করেছ, আল্লাহ তোমাকে দুঃখ থেকে দূরে রাখুন।”

খালিদ বিন ইয়াজিদ ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের প্রথম রসায়নবিদ এবং ধাতু গলানোর বিশেষজ্ঞ। তিনি দামেস্কে প্রথম ইসলামী টাকশাল স্থাপন করে উম্মাহকে অন্যদের মুদ্রা থেকে মুক্তি দেন। [১]

দাপ্তরিক ব্যবস্থা আরবি ভাষায় রূপান্তর:

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণির অধিকাংশ মনোযোগ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রসারের ওপর নিবদ্ধ ছিল। ইলমে ফিকহও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এর পাশাপাশি কাব্য-সাহিত্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ছিল। সরকারি ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যা অর্থাৎ: গণিত, অর্থনীতি এবং দাপ্তরিক হিসাব-নিকাশ জানা লোক অবশ্যই ছিল কিন্তু খুব কম; তাই শহর ও প্রদেশগুলোর আয়-ব্যয়, সেনাবাহিনীর খরচসহ হিসাব-নিকাশের বিষয়গুলোতে প্রায়ই পারস্য ও রোমান লোকদের দিয়ে কাজ করানো হতো। ইরাক ও ইরানের পুরো দাপ্তরিক ব্যবস্থা কিসরার যুগের মতো ফারসি ভাষায় ছিল যা স্থানীয় লোকেরাই সম্পন্ন করত। একইভাবে সিরিয়া, মিশর ও আফ্রিকার পুরো দাপ্তরিক হিসাব-নিকাশ কায়সারের যুগের মতো রোমান ভাষায় ছিল যা গণিতে দক্ষ খ্রিস্টান কর্মচারীরা সম্পন্ন করত।

[১] উয়ুনুল আখবার: ১/২৯৬, ত. আল-ইলমিয়াহ; আল-আওয়াইল লিল আসকারি, পৃ. ২৫৪, ত. দারুল বাশির; তারিখ তাবারী: ৬/২৫৬।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর আরবের সাধারণ সভ্যতা প্রভাবশালী ছিল, তারা নতুন শিল্পকলার ঝামেলা থেকে দূরে থাকত। কিন্তু যখন অর্ধশতাব্দী পর মানুষের ওপর নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পেতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে এই শিল্পকলা বুঝতে সক্ষম মুসলমানরাও সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। আব্দুল মালিক দীর্ঘকাল ধরে চিন্তিত ছিলেন যে, কীভাবে সমস্ত দাপ্তরিক ব্যবস্থা আরবিতে স্থানান্তরিত করা যায় যাতে মুসলমানদের জন্য তা পড়া, বোঝা এবং সম্পাদন করা সহজ হয়।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমল থেকে সিরিয়ায় কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলোর প্রধান সচিব হিসেবে সারজুন নামক একজন খ্রিস্টান কাজ করে আসছিল। আব্দুল মালিক তাকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, সেই সময় মুসলিম বিশ্ব জর্ডানের অর্থ সচিব সুলাইমান বিন সা’দ-এর রূপে এমন একজন বিশেষজ্ঞ পেয়েছিল যিনি আরবি এবং রোমান উভয় ভাষাই সমানভাবে জানতেন। আব্দুল মালিক তাকে ডেকে বললেন:

“মুসলমানদের বিষয়াদি খ্রিস্টানদের হাতে থাকা শুরু থেকেই আমার অপছন্দ। আমি আমার পিতা মারওয়ানকে এটি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিছু কারণে বলতে পারিনি। এখন তুমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করো।”

সুলাইমান বিন সা’দ কাজে বিদ্যমান কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু আব্দুল মালিক তাকে সাহস জুগিয়ে রাজি করালেন। এরই মধ্যে সারজুন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আব্দুল মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার পর এই কাজ কে সম্পন্ন করতে পারে?” সে একজন খ্রিস্টানের নাম নিল এবং সাথে সাথেই বলল: “যদি মুসলিম কর্মচারী প্রয়োজন হয়, তবে সুলাইমান বিন সা’দ সবচেয়ে উপযুক্ত।” এভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুলাইমান বিন সা’দকে দেওয়া হলো।

সুলাইমান কেন্দ্রীয় অর্থ সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেই সমস্ত হিসাব-নিকাশ এবং দাপ্তরিক ফাইলগুলো আরবিতে স্থানান্তর করতে শুরু করলেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল কারণ লেখা, পড়া, অনুলিপি করা, কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং স্থানান্তরের বর্তমান মাধ্যমগুলো একেবারেই ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই পূর্ববর্তী খলিফারা এতে দ্বিধা করতেন যে, পাছে ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ না হয়ে যায়। কিন্তু আব্দুল মালিকের সাহস এবং সুলাইমান বিন সা’দ-এর যোগ্যতা এটি করে দেখাল। এর পাশাপাশি সালতানাতের কর্মরত রোমান সচিবদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে, সবাই যেন নিজেদের জন্য অন্য কোনো কর্মসংস্থান খুঁজে নেয়। [১]

নতুন শহর:

আব্দুল মালিকের আমলে অনেক নতুন শহর বসানো হয়েছিল এবং প্রাচীন জনশূন্য শহরগুলোকে পুনরায় আবাদ করা হয়েছিল। আজারবাইজানের প্রাচীন শহর বাইলাকান, আরদাবিল এবং বারযা ইসলামি আমল পর্যন্ত জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। আব্দুল মালিকের আমলে স্থানীয় গভর্নররা সেগুলোকে পুনরায় আবাদ করেন। এই অঞ্চলে “আল-মানসুরা” নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করা হয়েছিল।

ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত রাখতে, ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যাকে আবাসন দিতে এবং সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্য তার গভর্নর হাজ্জাজ ইরাকের বিখ্যাত শহর “ওয়াসিত” নির্মাণ করেন। এর প্রাচীর, সরকারি ভবন এবং জামে মসজিদের ওপর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। যেহেতু এই শহরটি কুফা এবং বসরার মাঝখানে অবস্থিত ছিল, তাই এর নাম ওয়াসিত রাখা হয়েছিল। [২]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা: ১: ৩০৩-৩০৪, তারিখ দামেশক: ২২: ৩৬০

[২] মু’জামুল বুলদান: ৫: ৩৪৮

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ২০৩

হারামাইনের খিদমত:

আবদুল মালিক হারাম শরীফের অনেক বড় খিদমত করেছেন। তিনি কাবার স্তম্ভগুলোর উপরের অংশে পঞ্চাশ মিসকাল সোনা লাগিয়েছিলেন [১]। প্রতি বছর তিনি কাবার জন্য রেশমি গিলাফ এবং মসজিদে নববীর সুগন্ধির জন্য ধূপ ও আগর কাঠ পাঠাতেন। ৮০ হিজরিতে মক্কায় এক ভয়াবহ বন্যা আসে। মক্কা উপত্যকার পুরো জনপদ পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং শহরবাসীরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আবদুল মালিক ভবিষ্যতে বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য উপত্যকার কিনারায় এবং হারামের চারপাশে বাঁধ ও প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। এভাবে মক্কা বন্যা থেকে নিরাপদ হয় [২]।

বাইতুল মুকাদাসের খিদমত:

আবদুল মালিক কুব্বাতুস সাখরার (পাথরের গম্বুজ) খিদমতের দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। ৬৬ হিজরিতে তিনি বাইতুল মুকাদাসে সাখরার (পাথর) ওপর একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ গম্বুজ নির্মাণ করান, যা আজও প্রশংসিত হচ্ছে। এই বরকতময় কাজের জন্য তিনি মিশরের অগাধ সম্পদ গ্রহণ করেন এবং রাজা বিন হাইওয়াহ-এর মতো একজন নেককার ব্যক্তি ও দক্ষ স্থপতিদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, নির্মাণ কাজে যেন কোনো দ্বিধা ছাড়াই অর্থ ব্যয় করা হয়। কুব্বাতুস সাখরাকে একটি প্রাসাদের মতো করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এর জন্য চারটি দরজা তৈরি করা হয়েছিল। ছাদটি ২০ হাজার সেগুন কাঠের টুকরো দিয়ে খোদাই করা হয়েছিল। আলোর জন্য এক হাজার মোমবাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মসজিদে আকসার হারামের জন্য দরজা তৈরি করা হয়েছিল। আলোর জন্য পাঁচ হাজার প্রদীপ স্থাপন করা হয়েছিল এবং পঞ্চাশটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ শেষ হলে সাখরা যিয়ারতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। একে মিশক ও জাফরান দিয়ে এত বেশি সুগন্ধিযুক্ত করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি যিয়ারত করতে যেত, তার পোশাকে কয়েক দিন পর্যন্ত সুগন্ধি লেগে থাকত। মানুষ বলত যে, আজ সাখরা যিয়ারত করা হয়েছে [৩]।

মসজিদ নির্মাণ:

তাঁর অনুসারী তাবেয়ীগণও মসজিদ নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামতের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন মারওয়ান বারযা'র মসজিদ নতুন করে নির্মাণ করেন [৪]। ওয়াসিতে জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয় [৫]। আবদুল আজিজ বিন মারওয়ান মিশরের জামে মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন [৬]।

রাজনীতির ধরণ:

আবদুল মালিক বলতেন যে, কেবল শাসকের উত্তম চরিত্রই জনগণকে সংশোধন করতে পারে না, যতক্ষণ না জনগণ নিজেরা সংশোধিত হতে চায়। তিনি বলতেন: “হে লোকসকল! আমাদের সাথে ইনসাফ করো। তোমরা চাও যে আমরা আবু বকর ও উমরের মতো চরিত্র অবলম্বন করি, অথচ তোমরা নিজেদের জন্য আবু বকর ও উমরের প্রজাদের মতো চরিত্র পছন্দ করো না।” তিনি চরম প্রয়োজন ছাড়া রক্তপাত অপছন্দ করতেন এবং প্রজাদের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার চেষ্টা করতেন।

[৪] আখবার মক্কা লিল-আযরাকী, ২: ১৬৮, ১৬৯

[৫] ফুতুহ আল-বুলদান, পৃষ্ঠা ৩০৩

[৬] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৬২, ত: মাকতাবা নিযার

[১] আখবার মক্কা লিল-আযরাকী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৭, ত: দার আল-আন্দালুস

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৫১

[৩] ফুতুহ আল-বুলদান, পৃষ্ঠা ২০৯

যদি কোনো কর্মকর্তার বাড়াবাড়ির খবর পাওয়া যেত, তবে তিনি তার প্রতিকার করতেন। ইবনে আশআসের বিদ্রোহ দমন করার জন্য হাজ্জাজ অনেক মানুষকে হত্যা করেছিলেন এবং নিজের সঙ্গীদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করেছিলেন। আব্দুল মালিক যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন তিনি লিখলেন:

“আমি রক্তপাতে তোমার সীমা লঙ্ঘন এবং সম্পদের অপচয়ের সংবাদ পেয়েছি। আমি এই উভয় বিষয় সহ্য করতে পারি না। আমি রুল মুমিনীন আল্লাহর আমানতদার। তাঁর নিকট কারো হক আটকে রাখা বা হক ছাড়া কাউকে দেওয়া উভয়ই সমান। আমি রুল মুমিনীন তোমাকে আগেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কেউ ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তবে তার থেকে কিসাস নাও, আর যদি ভুলবশত হত্যা হয় তবে দিয়াত গ্রহণ করো। যদি (জুলুম ও নির্যাতনের) মাধ্যমে তোমার উদ্দেশ্য এই হয় যে মানুষ আমার অনুগত হয়ে যাবে, তবে এতে মানুষের কোনো ফায়দা নেই। আর যদি তুমি মনে করো যে এভাবে মানুষ তোমার অনুগত হয়ে যাবে, তবে এতে তোমার কোনো ফায়দা নেই। তোমাকে আমার পক্ষ থেকে কোমলতা ও কঠোরতা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আনুগত্যে তোমার কল্যাণ এবং অবাধ্যতায় তোমার ধ্বংস নিহিত। যখন তুমি কোনো বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করো, তখন সন্ধি প্রত্যাশী ব্যক্তি এবং বন্দীদের কখনোই হত্যা করো না।”

হাজ্জাজ জবাবে নিজের কাজের কারণসমূহ পেশ করে শেষে লিখলেন: “যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের জন্য আপনি একটি সীমা নির্ধারণ করে দিন যাতে আমি তা অতিক্রম না করি।” [১]

বড়দের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় লক্ষণীয়:

আব্দুল মালিক প্রশংসা ও মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন। কোনো দূত আসলে আব্দুল মালিক তাকে বলতেন:

“চারটি বিষয় বাদ দিয়ে যা ইচ্ছা বলো: আমার চাটুকানিতা করো না, যা আমি জিজ্ঞাসা করিনি সে সম্পর্কে বলো না, মিথ্যা বলো না এবং প্রজাদের ওপর আমাকে রাগান্বিত করো না, তাদের আমার দয়া ও করুণার প্রয়োজন রয়েছে।”

এক ব্যক্তি আলাদাভাবে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন: “এই শর্তে যে আমার প্রশংসা করবে না, আমি নিজেকে তোমার চেয়ে বেশি জানি। মিথ্যা বলবে না, মিথ্যাবাদীর কথার কোনো গুরুত্ব নেই। কারো চুগলখোরি (পরিনিন্দা) করবে না।” [২]

সন্তানদের লালন-পালনের মূলনীতি:

সন্তানদের শিক্ষা ও লালন-পালনের জন্য ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই নির্দেশনাগুলো দিয়েছিলেন:

“তাদেরকে যেভাবে কুরআন মাজীদ শেখাও, সেভাবেই সত্য কথা বলা শেখাবে, নিচু অভ্যাস থেকে বাঁচাবে; কারণ এই শাহজাদারা সবচেয়ে বেশি বেপরোয়া ও বেয়াদব হয়ে থাকে। তাদেরকে চাকর-বাকরদের মাঝে ঘিরে থাকতে দিও না, কারণ তারা তাদের নষ্ট করে দেবে। তাদের বুদ্ধি ও চেতনার মূর্ত প্রতীক বানাও যাতে তারা উচ্চমর্যাদাশীল হয়। তাদের খাবারে গোশত খাওয়াবে যাতে শরীর মজবুত হয়। কাব্য ও সাহিত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে যাতে তারা সম্মানিত ও ভদ্র হয়। তাদের সুন্নাত অনুযায়ী ডান থেকে বামে মিসওয়াক করা শেখাবে। পানি চুমুক দিয়ে পান করার অভ্যাস করাবে, ঢকঢক করে পান করা থেকে বাঁচাবে। যখন শাস্তি দিতে হবে তখন সবার সামনে নয়, বরং আলাদা নিয়ে গিয়ে দেবে যাতে তারা অপমানিত বোধ না করে।” [৩]

[১] মুরুজুয যাহাব: ৩/৩৪১, ৩৪২ বৈরুত সংস্করণ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৮৭

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৮৮

হৃদয়ের কোমলতা:

তিনি হৃদয়ের কোমলতার গুণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। নসিহত শুনে কেঁদে ফেলতেন।

যির ইবনে হুবাইশ রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি পত্রে তাকে নসিহত করেছিলেন:

“আমিরুল মুমিনিন! আপনার সুস্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ জীবনের লোভ করা উচিত নয়, কারণ আপনি নিজেকে ভালো করেই জানেন। যখন সন্তানাদি হয়ে যায়, শরীর বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং একের পর এক রোগব্যাধি আসতে শুরু করে, তখন বুঝে নিন যে ফসল কাটার সময় হয়ে এসেছে।” [১]

এই বাক্যগুলো পড়ে আব্দুল মালিক এত বেশি কাঁদলেন যে তার রুমাল ভিজে গেল।

একবার খুতবায় বললেন: “হে আল্লাহ! আমার গুনাহ অনেক বেশি, কিন্তু আপনার সামান্য ক্ষমাও সেগুলোর চেয়ে অনেক বড়। আপনি আপনার সামান্য ক্ষমা দিয়ে আমার পাহাড়সম গুনাহ মার্ফ করে দিন।” এ কথা বলার সময় তার ওপর কান্নার ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। [২]

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে যখন এই বাক্যগুলো পৌঁছাল, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন: “এই কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য।” [৩]

তিনি মৃত্যুকে প্রায়ই স্মরণ করতেন। একা খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। একবার দস্তুরখান বিছানো হলে একে একে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ, উমাইয়া বিন আব্দুল্লাহ, খাল্লাদ বিন ইয়াযিদ এবং অন্যান্য বন্ধুদের ডাকলেন। প্রতিবারই দারোয়ান এই উত্তর দিল: “তারা তো ইন্তেকাল করেছেন।” তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

ذَهَبَتْ لِذَاتِي وَانْقَضَتْ أَيَّامُهُمْ ... وَغَبِرْتُ بَعْدَهُمْ وَلَسْتُ بِخَالِدٍ

“আমার সমসাময়িকরা চলে গেছেন, তাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি বাকি রয়ে গেছি, কিন্তু আমিও তো চিরকাল থাকব না।” [৪]

সাহায্যে কেরাম এবং আহলে বাইতে এজামের প্রতি সম্মান:

তার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্যে কেরাম কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যে কেরামের অত্যন্ত সম্মান করতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ইবনে আশআসের বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে শহরবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল, তখন সে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও ডেকে পাঠাল এবং অত্যন্ত কঠোর আচরণ করল। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন চুপ থাকলেন। [৫] পরবর্তীতে আব্দুল মালিকের কাছে এই অভিযোগপত্র লিখলেন:

“যদি কোনো ব্যক্তি মাত্র এক রাত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আশ্রয় দিত বা তার সেবা করত, তবে খ্রিস্টানরা তার মর্যাদা বুঝত এবং তাকে সম্মান করত। যদি কেউ হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর একদিন সেবা করত, তবে ইহুদিরা তার মর্যাদার কথা মাথায় রাখত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম এবং সাহাবী, কিন্তু হাজ্জাজ আমাকে কষ্ট দিয়েছে, দুর্ব্যবহার করেছে এবং কটু কথা বলেছে। আপনি তাকে থামান। ওয়াসসালাম।”

আব্দুল মালিক চিঠিটি পড়ে কেঁদে ফেললেন। এরপর প্রচণ্ড রাগান্বিত অবস্থায় হাজ্জাজকে একটি চিঠি লিখলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল এই:

“ইউসুফের পুত্র! তুমি কি তায়েফে তোমার বাপ-দাদার পেশার কথা ভুলে গেছ, যারা কুয়া খনন করত এবং বাঁধ নির্মাণ করত, পিঠে পাথর বহন করে নিয়ে যেত? তোমার এত বড় সাহস যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বেয়াদবি করো। আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই নিজে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাও।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯০/১২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯১/১২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯২/১২

[৪] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তবারানি: ২৪৭/১

[৫] তারিখু দামেশক: ১৪১/৩৭; আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা ৩২৩, ৩২৪

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হাজ্জাজ এই চিঠি পেয়ে হুঁশ ফিরে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আনাস বিন মালিক-এর বাড়িতে তাঁর দরবারীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন। ক্ষমা চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন যে, আমিরুল মুমিনীনকে যেন তাঁর মুক্তির জন্য একটি চিঠি লিখে দেন। আনাস বিন মালিক বললেন: “আল্লাহ আমিরুল মুমিনীনকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমি তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম।” এরপর তিনি আব্দুল মালিকের কাছে হাজ্জাজের ক্ষমা ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা লিখে দিলেন।

আব্দুল মালিক আহলে বাইতের প্রতি সম্মান বজায় রাখতেন। হাজ্জাজ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: “আহলে বাইতের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। পূর্ববর্তী শাসকরা এমনটি করেছিল, তারা হুসাইন-কে শহীদ করেছিল, ফলে তাদের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।” [২]

সত্যবাদিতার মূল্যায়ন

তিনি সত্য কথা বলা ব্যক্তিদের কদর করতেন। ৭৫ হিজরিতে যখন তিনি হজে গেলেন, তখন মদিনার এক আমির মদিনাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বিগত দিনের ঘটনাবলির (হাররার যুদ্ধ ইত্যাদি) দিকে ইঙ্গিত করে বললেন:

“তোমাদের উদাহরণ সেই জনপদবাসীর মতো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

‘তারা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, সবদিক থেকে তাদের কাছে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত।

কিন্তু তারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করল; ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন।’” [৩]

এটি শুনে মদিনার এক প্রবীণ ব্যক্তি ইবনে আব্দুর রহমান তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন:

“তুমি মিথ্যা বলেছ, আমরা তেমন নই। তুমি পরের আয়াতটি পড়ো:

‘আর তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল।’ [৪]

আমরা তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি।”

এটি শুনে শাসকের লোকেরা তাঁকে ধরে আব্দুল মালিকের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন: “আমি তো ক্ষমা করে দিচ্ছি, কিন্তু অন্য কারো সামনে এমন কথা বললে তারা তা সহ্য করবে না।” এই বলে তিনি তাঁকে পুরস্কার হিসেবে ছয়শ দিনার প্রদান করলেন। [৫]

[১] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা ৩২৭।

[২] আনসাবুল আশরাফ, ৭/২৩৩, দারুল ফিকর। দ্রষ্টব্য: এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনু উমাইয়রা হযরত হুসাইন-এর হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে নিজেদের মুক্ত মনে করত না; বরং তারা ভীত ছিল যে, যেভাবে হযরত হুসাইন-এর হত্যাকাণ্ডের কারণে বনু উমাইয়াদের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে তাদেরও যেন একই পরিণতি না হয়।

[৩] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১২।

[৪] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৩।

[৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫/২৩৬।

তারিখ মিলাতে মুসলিমা

হারাম ও হালালের খেয়াল:

পানাহার, পোশাক-আশাক এবং জীবনযাত্রায় তিনি হালাল ও হারামের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ইমাম যুহরী (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসগণ তাঁর কর্মপদ্ধতিকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল: “সোনার তার দিয়ে দাঁত বাঁধানো কি জায়েজ?” তিনি উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ, আবদুল মালিক এমনটি করতেন।” [১]

যদি আবদুল মালিকের জীবনযাত্রা শরীয়ত মোতাবেক না হতো, তবে ইমাম যুহরী তাঁর কাজকে কখনোই দলিল হিসেবে পেশ করতেন না।

সারকথা:

আবদুল মালিকের শাসনের প্রতিষ্ঠা মূলত রক্তপাতের মাধ্যমেই হয়েছিল, তবে যাই হোক, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ রাজনীতিবিদ এবং যোগ্য ব্যক্তি, যিনি সমস্ত বিরোধীদের দমন করে চীনের সীমান্ত থেকে মরক্কো পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে গুণাবলীও ছিল এবং ত্রুটিও ছিল। যদি আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে সংঘাত, সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড এবং হাজ্জাজের জুলুমের দাগ তাঁর আঁচড়ে না থাকত, তবে নিঃসন্দেহে তিনি তাবেরী যুগের সবচেয়ে ঈর্ষণীয় শাসক হিসেবে গণ্য হতেন।

আমরা আবদুল মালিকের যুগে মুসলিম বিশ্বে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শেষ হতে দেখি। এরপর বহু বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ, সমুন্নত, সমৃদ্ধ এবং সম্পদশালী হিসেবে দৃশ্যমান হয় এবং তাঁর উত্তরসূরি ওয়ালিদের সময়ে পুনরায় গৌরবময় বিজয়াভিযান শুরু হয়।

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/২৩৫, তবা দার সাদির।

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক

শাওয়াল ৮৬ হিজরি রবিউল আউয়াল ৯৬ হিজরি

অক্টোবর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রিস্টাব্দ

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সমস্ত বিরোধীদের নির্মূল করে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তাঁর উত্তরসূরির এত ফল ভোগ করার কথা ছিল, যাদের মধ্যে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ছিলেন তালিকার শীর্ষে। ওয়ালিদের জন্ম ৫০ হিজরিতে হয়েছিল। তিনি আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বড় ছেলে ছিলেন। আব্দুল মালিক নিজে অত্যন্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তাই ওয়ালিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কমতি রাখেননি, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই লেখাপড়া শিখতে পারেননি।

ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং আরবি সাহিত্যে তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, কথাবার্তায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাকরণগত (সরফ ও নাহ) ভুল করতেন। আরবিতে যের, যবর, পেশের সামান্য হেরফেরে কথার অর্থ অনেক সময় পুরোপুরি বদলে যায়। ওয়ালিদকে প্রায়ই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো। এমন অবস্থায় তাঁর সঙ্গীদের তাঁর কথার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হতো।

একটি কৌতুক:

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করতে এল। ওয়ালিদ তার আত্মীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন: “মান খাতানাকা?” (আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এখানে ‘খাতানুকা’ নুনের ওপর পেশ দিয়ে হওয়া উচিত ছিল। যবর দেওয়ার কারণে অর্থ হয়ে গেল, তোমার খতনা কে করেছে?) সেই ব্যক্তি বলল: “হাজাম (নাপিত)।” লোকেরা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, আমিরুল মুমিনীনের উদ্দেশ্য হলো: “মান খাতানুকা?” (তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?) তখন সেই ব্যক্তি তার শ্বশুরবাড়ির বংশের নাম বলল। [১]

তবে তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে শাসন পরিচালনার জন্মগত যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল; তাই তিনি বনু মারওয়ানের সেই খলিফাদের মধ্যে গণ্য হন যাদের যুগ “স্বর্ণযুগ” নামে পরিচিত। খেলাফতের মসনদে বসার সময় তাঁর বয়স ৩৬ বছর হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত তিনি এমন যোগ্য ও দক্ষ সেনাপতিদের পেয়েছিলেন যারা একই যুগে খুব কমই একত্রিত হন।

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৮৫/১

তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিম, কুতাইবা বিন মুসলিম, মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জিয়াদের নাম ইতিহাসের দিগন্তে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে। ওয়ালিদের ছোট ভাই মাসলামা বিন আব্দুল মালিকও নিজ সময়ের একজন প্রখ্যাত জেনারেল ছিলেন। ওয়ালিদের খিলাফতকালে যখন এই মুজাহিদগণ জিহাদি অভিযান শুরু করেন, তখন ইসলামের পতাকা চীন থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত উড়তে থাকে। এই দশ বছরের সময়কালে মধ্য এশিয়া, খাওয়ারিজম, খুরাসানের শেষ জেলাসমূহ এবং এশিয়া মাইনরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর বিজিত হয়। এই সমস্ত বিজয়ের চেয়েও বড় ছিল সিন্ধু ও আন্দালুসের বিজয়, যা একদিকে উপমহাদেশে ইসলামের দ্বার উন্মোচন করে দেয় এবং অন্যদিকে মুসলমানরা প্রথমবারের মতো ইউরোপে একটি ইসলামি সরকার কায়েম করতে সক্ষম হয়। পূর্বে তাদের এই বিজয়ের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, যিনি আব্দুল মালিকের সময় থেকেই পুরো ইরাক ও ইরানের শাসক ছিলেন এবং খুরাসান থেকে শুরু করে উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক কাজ তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা ও জেনারেলরাই পরিচালনা করতেন। [১]

পশ্চিমে আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল সংলগ্ন পুরো এলাকা গভর্নর মুসা বিন নুসাইরের অধীনে ছিল। এই দুই নেতাই বিশ্বের মানচিত্র সামনে রেখে পূর্ব ও পশ্চিম বিজয়ের পরিকল্পনা তৈরি করতেন এবং খলিফার কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে সেনাবাহিনী এগিয়ে দিতেন। পূর্ব রণাঙ্গনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং কুতাইবা বিন মুসলিমের মতো সেনাপতি পেয়েছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিমে মুসা বিন নুসাইরের বিজয়ের স্বপ্নকে তারিক বিন জিয়াদের মতো জেনারেল বাস্তবে রূপ দান করেন। [২]

আসুন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলের এই গৌরবময় বিজয়গুলোর আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করি।

[১] বর্তমানে খুরাসান ইরানের একটি প্রদেশ, অথচ সেই সময়ে খুরাসান বলতে একটি বিশাল এলাকা বোঝাত যার কেন্দ্রীয় শহর ছিল তিনটি: হেরাত, নিশাপুর এবং মার্ভ। অতঃপর এই তিনটি বিশাল শহরের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ডজন ডজন ছোট শহর এবং শত শত জনপদ ও গ্রাম খুরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে হেরাত আফগানিস্তানের, নিশাপুর ইরানের এবং মার্ভ (মেরি) তুর্কমেনিস্তানের অংশ। এভাবে প্রাচীন খুরাসান এই তিনটি দেশে বিভক্ত হয়ে এমনভাবে অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে একে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমরা বলতে পারি যে প্রাচীন খুরাসানে আফগানিস্তানের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম, ইরানের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং তুর্কমেনিস্তানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সীমানা পূর্বে আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী প্রদেশ বামিয়ান, উত্তরে আমু দরিয়ান নদী, দক্ষিণে জাহেদান এবং পশ্চিমে ইসফাহান পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো কোনো আলেম খুরাসানকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করেছেন: প্রথম জেলায় নিশাপুর, হেরাত, বাঘিস এবং তুস অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় জেলা মার্ভ, নাসা, আবিওয়ার্দ, সারাখস এবং আমুল ছাড়াও আমু দরিয়ান নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত শহরগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। তৃতীয় জেলা বামিয়ান, বাঘলান এবং বাদাখশানের সমন্বয়ে গঠিত। (মু'জামুল বুলদান লিল হামাভী: ২/৩০৫, ৩০৬; মারাসিদুল ইত্তিলা' আলা আসমাইল আমকিনাতি ওয়াল বিকা' লি সাফিউদ্দিন আব্দুল মুমিন আল-কুতাইয়ি আল-বাগদাদী: ১/৪৫৬)

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১৯৮ থেকে ১০০; তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৬৮, ত নজার

কুতাইবা বিন মুসলিম আল-বাহিলীর বিজয়সমূহ

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হলো মধ্য এশিয়া বিজয়। মধ্য এশিয়া হলো সেই বিশাল এলাকা যা চীনের সীমান্ত থেকে খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সবচেয়ে উর্বর এলাকা হলো ‘মাওয়ারাউন নহর’, যা সিহন নদী (সির দরিয়া) এবং জিহন নদী (আমু দরিয়া)-র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে সমরকন্দ, বুখারা, তিরমিয, খোয়ারিজম, হাজার আম্প এবং খিওয়ার মতো প্রাচীন ও জনবহুল শহরগুলো অবস্থিত ছিল। এই এলাকাকে তুর্কিস্তানও বলা হতো। একে চীনের খাকানের অধীনস্থ একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। এখানকার সমস্ত শাসক তাকে কর প্রদান করত এবং এর বিনিময়ে চীনের খাকান প্রয়োজন পড়লে সৈন্য ও সাহায্যের মাধ্যমে বহিরাগত আক্রমণকারীদের হাত থেকে তাদের সুরক্ষা দিত। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে এখানে বেশ কিছু এলাকা বিজিত হয়েছিল এবং অনেক ছোট-বড় সর্দার করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পেলেই এই লোকেরা বিদ্রোহ করে বসত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ঘটনায় চীনের খাকানের সমর্থন থাকত। এই কারণে এখানে এখন পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি মজবুত হয়নি।

অবশেষে ৮৫ হিজরিতে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এখানে পূর্ণ দখলের পরিকল্পনা করেন এবং কুতাইবা বিন মুসলিম আল-বাহিলীকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। খোরাসানের কেন্দ্র ছিল বর্তমান তুর্কমেনিস্তান প্রজাতন্ত্রের শহর ‘মার্ভ’, যাকে এখন ‘মেরি’ বলা হয়। কুতাইবা এখানে সৈন্য বিন্যস্ত করেন এবং আমু দরিয়া পার হয়ে তুর্কিস্তানে আক্রমণ করেন। মুসলমানদের সৌভাগ্য ছিল যে, সেই দিনগুলোতে তুর্কিস্তানি আমিরদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ চলছিল। ফলে অনেক এলাকা দ্রুত পদানত হয়ে যায়। এই আক্রমণেই কুতাইবার উপ-সেনাপতিরা ফারগানা ও কাশান জেলাগুলো জয় করে নেন।

পরের বছর ৮৭ হিজরিতে কুতাইবা পুনরায় ‘মার্ভ’ থেকে যাত্রা করেন এবং ‘আমু দরিয়া’ পার হয়ে বুখারার নিকটবর্তী শহর ‘বাইকান্দ’ আক্রমণ করেন। এখানে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রটি এতটাই কঠিন ছিল যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নির্দেশে ইরাকের মসজিদগুলোতে নামাজের পর মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য নিয়মিত দোয়া করা হতো।

অবশেষে একদিন মুসলমানরা প্রতিপক্ষকে রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং তাদের পিছু ধাওয়া করে শহরটি দখল করে নেয়। কুতাইবা এখানে কিছু সৈন্যসহ একজন মুসলিম শাসক নিযুক্ত করেন এবং ফিরে যাত্রা করেন। পথেই খবর পান যে ‘বাইকান্দ’-এ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, স্থানীয় লোকেরা মুসলিম শাসক ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের হত্যা করেছে। কুতাইবা ফিরে এসে পুনরায় শহরটি ঘেরাও করেন এবং সুড়ঙ্গ খুঁড়ে শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। শহরবাসী আপসের চেষ্টা করেছিল কিন্তু কুতাইবার তাদের ওপর বিশ্বাস ছিল না; তাই তলোয়ারের জোরে এখানে দখল কায়েম করেন।

...এবং মোকাবিলায় আসা সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করে দম নিলেন। এই বিজয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং ধন-সম্পদ হস্তগত হলো। ৮৮ হিজরিতে কুতাইবা পুনরায় মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন গোত্রকে পদানত করেন। [১]

খাকান চীনের সাহায্যকারী ফৌজের সাথে মোকাবিলা:

চীনের খাকান কুতাইবার বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল। এই সময়ে সে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে এবং মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। যখন কুতাইবা মধ্য এশিয়ার অভিযান থেকে ফিরছিলেন, তখন খাকান চীন তার ভতিজা ‘কুরান গাবুন’কে দুই লক্ষ পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনীর সাথে অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিল।

কুতাইবা বিন মুসলিম অগ্রবর্তী দলের সাথে দরিয়ায়ে আমুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, চীনা বাহিনী তাদের পেছনের দলগুলোর ওপর আক্রমণ করে দিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন কুতাইবার ভাই আব্দুর রহমান বিন মুসলিম। এই বাহিনী কুতাইবার বাহিনী থেকে এক মাইল দূরে ছিল। আব্দুর রহমান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করলেন এবং সাথে সাথে কুতাইবাকে সংবাদ পাঠালেন। কুতাইবা দ্রুততার সাথে সেই উপত্যকায় ফিরে এলেন যেখানে আব্দুর রহমান চীনা বাহিনীর সাথে লড়াই করছিলেন। মুসলমানদের পা টলমল করছিল, কিন্তু কুতাইবার আগমনে তাদের সাহস বেড়ে গেল। কুতাইবা বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে কয়েকবার জোরালো আক্রমণ চালিয়ে চীনা বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। এরপর মুসলমানরা তিরমিজ যাওয়ার প্রধান সড়কে সফর করে দরিয়ায়ে আমু পার হয়ে নিরাপদে নিজেদের কেন্দ্রে পৌঁছে গেল। [২]

বুখারা বিজয়:

বুখারা মধ্য এশিয়ার প্রাচীনতম এবং অত্যন্ত জনবহুল শহর ছিল। এটি পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে জয় করা হয়েছিল, কিন্তু তুর্কি সর্দাররা বারবার বিদ্রোহ করত। সমরকন্দ এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য শহরের অবস্থাও একই ছিল। কুতাইবা বিন মুসলিম এই ভূখণ্ডকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করার সংকল্প করলেন। তিনি ৮৯ হিজরিতে বুখারার ওপর একটি পরীক্ষামূলক আক্রমণ করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে শহরের পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করে পাঠালেন। হাজ্জাজ ধারণা করলেন যে বর্তমান প্রস্তুতির সাথে শহর জয় করা সম্ভব হবে না; তাই তিনি কুতাইবাকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। পরের বছর কুতাইবা বড় পরিসরে পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে বুখারা ঘেরাও করলেন। এই সময়ে আশেপাশের তুর্কি সর্দাররা তাদের বাহিনীর সাথে বুখারাবাসীদের সাহায্যের জন্য এসে পৌঁছাল। তাদের দেখে বুখারার বাহিনীও ময়দানে বেরিয়ে এল। তারা সবাই মিলে কাতারবদ্ধ হলো। তুর্কি খাকান এবং তার শাহজাদাও স্বয়ং এই বাহিনীতে উপস্থিত ছিল।

অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগে ‘কাবিলায়ে আজদ’-এর দলগুলো ছিল, যারা তুর্কিদের পঙ্গপাল সদৃশ আক্রমণের চাপ সহ্য করতে পারল না এবং তাদের পা উপড়ে গেল। তারা পিছু হটতে হটতে নিজেদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুসলিম মহিলারা লাঠি হাতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এই সময়ে ইসলামী বাহিনীর ডানে ও বামে থাকা বীর যোদ্ধারা তুর্কিদের ওপর প্রাণপণ আক্রমণ শুরু করল। তুর্কিরা লাশের স্তুপ ফেলে রেখে পিছু হটতে শুরু করল। তাদের একটি বড় অংশ নিহত হলো। অবশিষ্ট বাহিনী টিলাগুলোর একটি সারিতে আশ্রয় নিয়ে পুনরায় কাতারবদ্ধ হলো। কুতাইবা বিন মুসলিম এই দৃশ্য দেখে আওয়াজ দিলেন: “কে আছে যে এদের পিছু হটাবে?”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৮৬ হিজরি থেকে ৮৮ হিজরি পর্যন্ত।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৮৮ হিজরি।

...এটি দেখে কুতাইবা খুশি হয়ে বললেন: “এই দিনটিও তোমাদের বিগত কীর্তিসমূহের মতোই।” কুতাইবা পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেন, অশ্বারোহী বাহিনীকে হারিম বিন আবি তাহমার কমান্ডে দিলেন এবং পুনরায় তুর্কিদের পেছন থেকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। পথে একটি বড় নদী পড়ল যাতে পানির স্রোত অত্যন্ত তীব্র ছিল। ওয়াকি আওয়াজ দিলেন: “যে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত, সে এই নদী পার হয়ে দেখাক।” আটশ মুজাহিদ নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে গেলেন। ওয়াকি তাদের নিয়ে তুর্কিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওদিকে হারিম অশ্বারোহীদের নিয়ে অন্য দিক থেকে আক্রমণ করলেন। তুর্কিরা, যারা এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। খাকান এবং তার পুত্রও আহত হলো কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। [১]

কুতাইবা বিন মুসলিম খুরাসানে:

উত্তর খুরাসানে (উত্তর আফগানিস্তান) বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কৃতিত্বও কুতাইবা বিন মুসলিমের প্রাপ্য, যিনি এই অঞ্চলে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী কোথাও কোমলতা ও আলোচনার পথ অবলম্বন করেছেন আবার কোথাও বাহুবল প্রয়োগ করেছেন। এই কৌশলের ফলে বাদগিসের (উত্তর আফগানিস্তান) সর্দার নাইজাক তাঁর সহযোগী হয়ে যান এবং তিনি কিছু যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

নাইজাক দীর্ঘ সময় মুসলমানদের সহযোগী ছিলেন কিন্তু তুর্কিস্তানে কুতাইবা বিন মুসলিমের একের পর এক বিজয় দেখে তিনি মুসলমানদের শক্তি নিয়ে আশঙ্কাবোধ করতে শুরু করেন। ফলে তিনি বলখ, ফারিয়াব, তালকান এবং জুযজানসহ উত্তর আফগানিস্তানের সমস্ত শহরের সর্দারদের একত্রিত করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সাথে তিনি কাবুলের শাসককেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে নিজের সাথে মিলিয়ে নেন। তুখারের গোত্রীয় শাসক বাগুবিয়াও নাইজাক দ্বারা প্রভাবিত ও অভিভূত ছিলেন, তাঁর প্ররোচনায় তিনি তুখারে বিদ্রোহ করেন এবং স্থানীয় মুসলিম শাসককে সেখান থেকে বহিস্কার করেন। কুতাইবা বিন মুসলিম এই সংবাদ এমন সময় পেলেন যখন তাঁর বাহিনী প্রস্তুত ছিল না।

যাই হোক, তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমান বিন মুসলিমকে বারো হাজার সৈন্য দিয়ে ‘বারুকান’-এ অবস্থান করার এবং শীতকাল শেষ হতেই তুখারের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নিজে নিশাপুর থেকে বিশাল সাহায্যকারী বাহিনী আনিয়ে তালকানে আক্রমণ করেন এবং এখানকার বিদ্রোহীদের কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে তলোয়ারের আঘাতে নিধন করলেন।

শীতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ৯১ হিজরিতে তিনি ফারিয়াব, জুযজান এবং বলখ একের পর এক কোনো রক্তপাত ছাড়াই পুনরায় জয় করেন। নাইজাক তাঁর দলবল নিয়ে এই অঞ্চলেই অবস্থান গ্রহণ করছিলেন। কুতাইবা তাঁর ভাই আবদুর রহমানের সাথে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে এগিয়ে চললেন। নাইজাক ‘খুলম’-এর অত্যন্ত দুর্গম গিরিপথ দিয়ে (যা মাজার-ই-শরীফ থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত) অতিক্রম করে বাগলান পৌঁছে যান এবং গিরিপথে প্রহরা বসান। ‘খুলম’ গিরিপথের মুখে একটি দুর্গ ছিল যার অবস্থান এমন ছিল যে, সেখানে মাত্র কয়েকজন লোকের সাহায্যে বিশাল বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯০ হিজরি সাল।

কুতায়বা অনেক দিন নসিব-এ অবস্থান করে সামনে অগ্রসর হওয়ার কৌশল নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। সৌভাগ্যবশত একজন স্থানীয় ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে এলেন এবং কুতায়বাকে দুর্গের পেছনের দিকে পৌঁছানোর একটি গোপন পথ বলে দিলেন। মুসলমানরা সেই পথ দিয়ে গিয়ে দুর্গে মোতায়েন বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পথ পরিষ্কার করে দিলেন। কুতায়বা সরাসরি নাইজাকের পিছু ধাওয়া করে বাগলানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সামান্যগানের দিকে মুখ ফেরালেন এবং সেখান থেকে নাইজাকের পিছু ধাওয়া করতে রওনা হলেন। নাইজাক ইতিমধ্যে বাগলান থেকে পালিয়ে ফারগানা পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং “কারজ” নামক একটি দুর্ভেদ্য উপত্যকায় আত্মগোপন করেছিলেন। তুখারিস্তানের শাসক জাবগুয়াহ-ও তার সাথে ছিলেন। কুতায়বা “কারজ” উপত্যকা অবরোধ করলেন। এই উপত্যকা ঘোড়া বা পদাতিক বাহিনী কেউই অতিক্রম করতে পারত না। তাই কুতায়বা দুই মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে অবরুদ্ধরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত এবং চুলকানির রোগে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে কুতায়বা আলোচনার মাধ্যমে তাদের বাইরে ডেকে আনলেন। জাবগুয়াহ-র প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হলো কিন্তু নাইজাক যেহেতু দুই বছর ধরে ইসলামী বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন এবং তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ছিল, তাই তার শিরশ্ছেদ করে খলিফার কাছে দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [১]

খাওয়ারিজম বিজয়:

মধ্য এশিয়ায় খাওয়ারিজম এলাকাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যার শাসকের উপাধি ছিল “খাওয়ারিজম শাহ”। ৯৩ হিজরিতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশে কুতায়বা বিন মুসলিম এখানে প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। খাওয়ারিজম শাহ ছিলেন নামমাত্র শাসক; তার ভাই খুরজাদ রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। খাওয়ারিজম শাহ এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি কুতায়বা বিন মুসলিমের কাছে গোপন পত্র লিখে এই শর্তে আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন যে, মুসলমানরা তাকে খুরজাদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি দেবে। কুতায়বা বিন মুসলিম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং মার্ব থেকে সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন।

খাওয়ারিজম শাহ নিজের সৈন্য নিয়ে বের হলেন যাতে কুতায়বা বিন মুসলিম অন্যদিকে মোড় নিতে পারেন। খাওয়ারিজম শাহ শত্রুর ফিরে যাওয়ার খবর শুনে উৎসব পালনের নির্দেশ দিলেন। উৎসব চলছিল এমন সময় খবর এলো যে কুতায়বার বাহিনী মাথার ওপর এসে পৌঁছেছে এবং হাজারাস্প-এ তাবু গেড়েছে। এই সবকিছু কুতায়বা এবং খাওয়ারিজম শাহের মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছিল।

এখন খাওয়ারিজম শাহ তার আমিরদের বোঝালেন যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা নিরর্থক। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড় বাহিনীকে পরাজিত করেছে। তিনি বাহিনীকে রাজি করিয়ে কুতায়বার কাছে সন্ধির দূত পাঠালেন। এভাবে খাওয়ারিজম ভূখণ্ড কোনো রক্তপাত ছাড়াই ইসলামের পতাকাতলে চলে এলো।

কুতায়বা খাওয়ারিজম বিজয়ের পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাওয়ারিজম শাহের ভাই খুরজাদের পিছু ধাওয়া করে তাকে নির্মূল করলেন। [২]

সমরকন্দ বিজয়:

মধ্য এশিয়ায় এখন সমরকন্দই ছিল তুর্কিদের শেষ ঘাঁটি যেখানে তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েছিল। এই শহরের প্রাচীর দুর্ভেদ্য বলে গণ্য হতো; তাই পুরো “মা ওয়ারাউন নাহার”-এ এর চেয়ে নিরাপদ শহর আর কোনোটি ছিল না। সমরকন্দ এবং এর...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর: ৫৯০-৫৯১ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর: ৫৯৩ হিজরি থেকে।

এর চারপাশের এলাকা সোগদ নামে পরিচিত ছিল। কুতাইবা এখানকার সর্দারদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। খাওয়ারিজম বিজয়ের পর কুতাইবা বলেছিলেন:

“খাওয়ারিজমবাসী এবং সমরকন্দবাসীর উদাহরণ ঠিক বনু কুরাইজা এবং বনু নাজিরের মতো।” অর্থাৎ এই লোকেরা রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদি গোত্রগুলোর মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাখে।

কুতাইবা বিন মুসলিম খাওয়ারিজম ফ্রন্ট থেকে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর উপদেষ্টা মুহাসশার বিন মুজাহিম বললেন:

“আপনি যদি সমরকন্দ দখল করতে চান, তবে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর নেই। তারা আপনাকে খাওয়ারিজমে ব্যস্ত মনে করে এখন নিশ্চিত রয়েছে।”

কুতাইবা জিজ্ঞেস করলেন: “এখান থেকে সমরকন্দের পথ কত দিনের?”

উপদেষ্টা বললেন: “দশ দিনের।”

কুতাইবা তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহিনীকে নিজের ছাউনি মার্ভের দিকে কুচকাওয়াজের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সেই সাথে নিজের ভাই আব্দুর রহমানকে গোপন নির্দেশ দিলেন যেন পশ্চিমধ্যে বাহিনীর একটি অংশ সমরকন্দের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাহিনীর মার্ভের পথে যাওয়ার কারণে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে মুসলমানরা ফিরে যাচ্ছে। পশ্চিমধ্যে বাহিনীর একটি অংশ সমরকন্দের দিকে মোড় নিল। এভাবে কুতাইবা সেই মুজাহিদদের নিয়ে হঠাৎ সমরকন্দ পৌঁছে অবরোধ করলেন। যদিও সমরকন্দের বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবুও তাদের শক্তি এতটাই ছিল যে এক মাস পর্যন্ত মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখল। সেই সাথে খাকানের কাছে সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানোর বার্তা পাঠিয়ে দিল।

খাকান তুর্কি শাহজাদা এবং বিখ্যাত নবাবদের নেতৃত্বে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে একটি লশকর তৈরি করে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। পরিকল্পনা ছিল এই যে, রাতে সমরকন্দ পৌঁছে কুতাইবার লশকরের ওপর অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রমণ করা হবে। কুতাইবা গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এই তথ্য পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সেনাপতি সালিহ বিন মুসলিমকে কিছু বাছাইকৃত সৈন্য দিয়ে সাহায্যকারী লশকরের ওপর পথে অতর্কিত নৈশ হামলার নির্দেশ দিলেন। সালিহ অল্প কিছু লোক নিয়ে তুর্কিদের সাহায্যকারী লশকরের পথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বাকি সৈন্যদের মহাসড়কের ডানে-বামে লুকিয়ে রাখলেন। মধ্যরাতের সময় তুর্কিরা যখনই এখানে পৌঁছাল, সালিহ আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করলেন। এদিক থেকে ডানে-বামে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরাও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারে আক্রমণকারী কতজন তা আন্দাজ করা কঠিন ছিল; তাই তুর্কিদের মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় কুতাইবা নিজে আরও সৈন্য নিয়ে পৌঁছে গেলেন এবং তুর্কিদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। তাদের বড় বড় সর্দার এবং শাহজাদারা বন্দি হলেন।

কুতাইবা এখন সমরকন্দের ওপর কঠোরতম আক্রমণ শুরু করলেন এবং মানজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ তীব্র করে দিলেন। তিনি এই শহরের আকাশচুম্বী প্রাচীর দেখে বলতেন: “হে সমরকন্দ! কতদিন তুই শয়তানদের আশ্রয় দিয়ে রাখবি।”

অবশেষে শহরের প্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে গেল। পরদিন খুব ভোরে মুসলমানরা প্রাচীরের ওপর হামলা চালিয়ে দিল। সমরকন্দবাসী প্রাচীর...

...থেকে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করছিল, কিন্তু মুসলমানরা ঢালের আড়ালে সামনে অগ্রসর হতে থাকল এবং অবশেষে ফাটলটি দখল করে নিল। সাহায্যকারী বাহিনীর পরাজয় এবং প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় সমরকন্দবাসীদের সাহস দমে গিয়েছিল। তারা সন্ধির আবেদন করল। কুতাইবা বিন মুসলিম নিম্নলিখিত শর্তে এই আবেদন মঞ্জুর করলেন:

- ১. স্থানীয় বাহিনী সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করবে।
- ২. এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং জুমার নামাজ আদায় করা হবে।
- ৩. সমরকন্দবাসী প্রতি বছর বারো লক্ষ দিনার খরাজ প্রদান করবে।
- ৪. সমরকন্দবাসী এই বছর মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ত্রিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য প্রদান করবে।

ان شرائط پر یہ تاریخی شہر فتح ہوا۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے وقار و تحمل کا ثبوت دیا۔ شہریوں کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس علاقے میں بت پرستی عام تھی۔ قتیبہ نے اس بدعقیدگی کو مٹانے کے لیے بتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پجاریوں کو معلوم ہوا تو بولے:

ہم آپ کی خیر خواہی کے طور پر بتا رہے ہیں۔ ان بتوں کو گزند پہنچانے کی کوشش “کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔

قتیبہ نے کوئی پروا نہ کی اور بتوں کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بت پرستوں کے باطل خوارزم اور سمرقند جیسے اہم صوبوں کا ایک ہی سال میں فتح [۵] معبود کوئلہ بن گئے۔ کر لینا قتیبہ بن مسلم کا بہت بڑا کارنامہ شمار ہوا۔ اگلے سال ۹۴ھ میں اس مرد مجاہد نے [۶] چین کی سرحد کے قریب واقع شاش (تاشقند) اور فرغانہ کو بھی فتح کر لیا۔

:چین کی سرحد پر

وسط ایشیا میں بار بار ہونے والی بغاوتوں کو شہ دینے میں چین کی حکومت کا بڑا ہاتھ رہتا تھا؛ اس لیے جب تک خاقان چین کا سر نیچا نہ کر دیا جاتا، وسط ایشیا میں امن قائم ہونا ممکن نہیں تھا؛ اس لیے دو برس کی تیاری کے بعد قتیبہ بن مسلم نے ۹۶ھ میں چین کی طرف پیش قدمی کی اور قسم کھائی کہ جب تک اسلامی لشکر بزور قوت چینی حکومت سے خراج وصول نہ کر لے، واپسی نہیں ہوگی۔ قتیبہ نے خود سرحد پر پڑاؤ ڈالا جبکہ ان کے سالاروں نے آگے یلغار کرتے ہوئے چین کا سرحدی ضلع کاشغر فتح کر لیا۔

خاقان چین وسط ایشیا میں اپنی باج گزار ریاستوں کو اسلام کے پرچم تلے دیکھ کر سیخ پا تھا۔ اگر اسے اسلامی افواج کے چین کی سرحد پر آ جانے کی اطلاع نہ ملتی تو شاید وہ کچھ ہی دنوں میں وسط ایشیا کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کرتا، مگر اب اسے یہی بہتر محسوس ہوا کہ بات چیت کر کے کسی طرح اپنا ملک بچا لیا جائے۔ بے پناہ طاقت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تکبیر کے نعروں سے مرعوب ہو چکا تھا۔

اس نے مذاکرات کے لیے قتیبہ سے سفارتی وفد طلب کیا۔ قتیبہ نے ہبیرہ بن مشمرج کو ...دس معزز مسلمانوں کے

[۵] الکامل فی التاریخ سنۃ ۹۳ھ

[۶] الکامل فی التاریخ سنۃ ۹۴ھ

সাথে চীনের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। চীনের খাকান শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফিরে যেতে রাজি করানোর চেষ্টা করতে থাকেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাতের পর অবশেষে তিনি বললেন:

“তোমার সরদারকে বলে দাও যেন সে ফিরে যায়। আমি তোমাদের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জানি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমি এমন এক বাহিনী পাঠাব যা তোমাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে।”

হুতাইরা বিন মুশামরাজ বললেন: “আপনি এমন এক জাতির সংখ্যা কম কীভাবে বলতে পারেন যার এক প্রান্ত চীনের সীমান্তে এবং অন্য প্রান্ত সিরিয়ায়। আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না কারণ মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারিত আছে। জিহাদে প্রাণ দেওয়া আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়; তাই আমাদের নিহত হওয়াতে কোনো লজ্জা নেই এবং কোনো ভয়ও নেই। আমাদের আমির কসম খেয়েছেন যে, যতক্ষণ না তিনি নিজের পায়ে আপনার ভূমি পদদলিত করে কর আদায় করবেন, ততক্ষণ তিনি ফিরে যাবেন না।”

এই উত্তর খাকানকে মানসিকভাবে পিছু হটতে বাধ্য করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে মুসলমানরা তাদের সংকল্পে অটল। তিনি করের বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং অনেক উপহার দিয়ে প্রতিনিধি দলকে ফেরত পাঠালেন। কুতাইবার উদ্দেশ্যও ছিল কেবল চীনের খাকানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাকে বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে বিরত রাখা। এই উদ্দেশ্যটি খুব ভালোভাবে অর্জিত হয়েছিল।

ইসলামি বিশ্বের সীমানা এখন চীনের সাথে গিয়ে মিশেছে। একের পর এক বিজয় পুরো ইসলামি বিশ্বে কুতাইবার বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জয়জয়কার ছড়িয়ে দিয়েছিল। [১]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯৬ হিজরি।

ফাতহে আন্দালুস

আন্দালুসের অবস্থান ও ভূগোল:

আন্দালুস একটি উপদ্বীপ। এর পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর (বাহরে জুলুমাত বা আটলান্টিক) অবস্থিত। পশ্চিমে এর সীমানা পর্তুগালের সাথে এবং উত্তরে ফ্রান্সের সাথে মিলিত হয়েছে। গ্রীকরা এই দেশটিকে “আইবেরিয়া” নামে ডাকত, রোমানরা একে “হিস্পানিয়া” বলত এবং আরবরা একে “আন্দালুস” নাম দিয়েছে। আরব ভূগোলবিদ ইদ্রিসীর মতে, এই দেশটির দৈর্ঘ্য প্রায় এগারোশ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ছয়শ মাইল। কর্ডোভা, গ্রানাডা, মুরসিয়া, আলমেরিয়া, মালাগা, বাস্তা, আবলাত, বাতলিয়ুস, শারিয়া, টলেডো, সারগোসা, টরটোসা এবং কাস্টিল এখানকার বিখ্যাত প্রদেশ। জাবালুশ শাইখ, আশ-শারাত, আল-বাজারাত, জাবালুল আলবারানস এবং জাবালুত তারিক এখানকার বিখ্যাত পর্বতমালা। প্রায় দুইশ ছোট-বড় নদী এই উঁচু-নিচু পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে আন্দালুসের প্রতিটি কোণকে সিক্ত করে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। এগুলোর মধ্যে ওয়াদিউল কাবীর এবং ওয়াদিউল নেকাস সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত।

আন্দালুসের আবহাওয়া ইউরোপের সমস্ত দেশের তুলনায় উন্নত ও নাতিশীতোষ্ণ। রূপা, সোনা, পারদ, মূল্যবান পাথর এবং ইমারতি পাথর এখানকার বিশেষ খনিজ সম্পদ। গম, ভুট্টা, ছোলা, কমলা, বাদাম, ডালিম, কলা, পিচ, চন্দন, জাফরান, আদা এবং উদ এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। [১]

ইসলামের পূর্বে আন্দালুসের ইতিহাস:

ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের আগে থেকেই আন্দালুসে রোমানদের শাসন চলে আসছিল। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের পাঁচ শতাব্দী পর পূর্ব ও উত্তর ইউরোপ থেকে অসভ্য গথ জাতির তুফানি আক্রমণের ফলে আন্দালুসে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই দেশটি গথ জাতির বন্যদের হাতে চলে যায়। যদিও গথরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম-এর দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার পর তারাও কুফর ও শিরকের উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হতে থাকে। দুইশ বছর ধরে এই দেশটি গথ জাতির হাতে জিম্মি ছিল। তাদের শাসনামলে পাদ্রিদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল যে তারা যা খুশি তাই করত; ফলে আন্দালুসের অ-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুরা পাদ্রিদের জুলুম ও অত্যাচারের নিচে পিষ্ট হচ্ছিল।

গথ জাতির শেষ রাজা উইটিজা যখন পাদ্রিদের বাড়াবাড়িতে জনগণকে তিলে তিলে মরতে দেখলেন, তখন তিনি...

[১] সিফাতু জাজিরাতিল আন্দালুস: ৩২/১, উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, প্রথম খণ্ড, ভুক্তি: আন্দালুস।

ধর্মের নামে মানবতার এই শোষণ বন্ধ করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু পাদ্রীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাদশাহর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারা ষড়যন্ত্র করে উইটিজাকে অপসারিত করে এবং একজন সহিংস সামরিক জেনারেল রডারিককে (আল-মাজরিক) রাজসিংহাসনে বসায়। [১]

আন্দালুসে সাহাবায়ে কেরামের অভিযান:

নবুওয়াতের যুগ থেকেই ইউরোপ সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে কনস্টান্টিনোপলের জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে প্রত্যেক বৃদ্ধ ও যুবককে পূর্ব ইউরোপের দিকে প্রেরিত বাহিনীগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য নিজের নাম পেশ করতে ব্যাকুল করে রেখেছিল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কনস্টান্টিনোপলের উপসাগর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন, কিন্তু তিন দিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত শহরের ভৌগোলিক দুর্গবেষ্টনী আক্রমণকে প্রায় অসম্ভব করে রেখেছিল। অবশেষে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথমে পশ্চিম ইউরোপে আক্রমণ চালিয়ে স্পেন দখল করা হোক, এরপর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো দেশগুলো জয় করে মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। এভাবেই আন্দালুসে আক্রমণের সূচনা হয়।

সেই সময় পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা মুসলমানরা জয় করে নিয়েছিলেন। আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যসাগর প্রবাহিত, যাকে ‘বাহরে মুতাওয়াসসিত’ও বলা হয়। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে হতে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং মরক্কোর উপকূল ‘সেউটা’ (Ceuta)-তে একটি প্রণালীর রূপ ধারণ করে, যার অপর তীরে আন্দালুসের বিখ্যাত উপকূল ‘আল-জাজিরাতুল খাদরা’ অবস্থিত। এখানে সমুদ্রের প্রস্থ প্রায় ২০ কিলোমিটার রয়ে যায়। ২৭ হিজরিতে তৃতীয় খলিফার আদেশে একটি বাহিনী এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে আক্রমণ করে এবং কিছু এলাকা জয় করে নেয়। আন্দালুসে এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এই বিজয় স্থায়ী ছিল না। অবশেষে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের খিলাফতকালে এই অঞ্চলটি পুরোপুরি জয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুসা বিন নুসাইর, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহচর্য থেকে মরক্কোর গভর্নর হওয়া পর্যন্ত:

সেই সময়ে আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন মুসা বিন নুসাইর রাহিমাহুল্লাহ, তাকে তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। তিনি ১৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি হযরত তামীম দারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেহের মানুষ, নৌ-যুদ্ধে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাইপ্রাসে নির্মাণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। মুসা বিন নুসাইরকে দেখে তিনি বলতেন: “শাসকের উচিত এমন বলিষ্ঠ দেহের মানুষকে সহযোগী বানানো।”

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে মুসা বিন নুসাইর রাহিমাহুল্লাহ তার বাইয়াত গ্রহণ করেন, মারজ রাহিতের যুদ্ধে তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমর্থনে মারওয়ান বিন হকামের মোকাবিলায় তরবারি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু পরে সিরিয়াবাসীদের বিজয়ী হতে দেখে তিনি মারওয়ানের পুত্র আব্দুল আজিজ (উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ-এর পিতা)-এর আশ্রয়ে চলে যান। [২]

[১] নাফহত তীব: ১/১৩৭, ১৪০; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৯২ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৪৬৬।

[৩] তারিখু দামেশক: ৬১/২১২, ২১৩।

আবদুল আজিজ যখন মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব পেলেন, তখন মুসা বিন নুসায়ের (রহ.) তাঁর উজিরের মর্যাদা লাভ করেন। ৭৯ হিজরিতে তাঁকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সেই বছরই তিনি মরক্কো আক্রমণ করেন এবং নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই বারবার গোত্রগুলোর ওপর হামলা করেন যারা তাদের নেতা কাসিলার নেতৃত্বে ৬৪ হিজরিতে উকবা বিন নাফেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিল। মুসা বিন নুসায়ের (রহ.) এখানে দুই বছর জিহাদ অব্যাহত রাখেন, এই সময়ে কাসিলা ও তার বাহিনী ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে। মুসা বিন নুসায়ের (রহ.) ৮১ হিজরিতে তাদের বিশ হাজার লোককে বন্দী করে ফিরে আসেন। পরবর্তী দশ বছরে তিনি উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ দমন করে সানহাজা, কাওলা এবং সুস আল-আকসাও জয় করে নেন। এক লক্ষেরও বেশি বারবার যোদ্ধা বন্দী হয়, যাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে লশকরে মুহাম্মাদীর সৈনিক হয়ে যায়। ৮৯ হিজরিতে মুসার বাহিনী সিসিলি ও এয়ারলাক্কের মধ্যবর্তী সমুদ্রে অবস্থিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ বানু জারকা এবং মিনোরকা জয় করে নেয়। এখন ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌজাহাজগুলোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা শত্রুর দ্বীপগুলোতে হামলা করার জন্য স্বাধীন ছিল। মহররম ৯৩ হিজরিতে ইসলামী সালতানাতের সীমানা মরক্কোর তানজিয়ার শহর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এভাবে আফ্রিকায় ইসলামী শাসন প্রথমবারের মতো এতটাই সুসংহত হয় যে, এখন একে কেন্দ্র বানিয়ে ইউরোপে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। [১]

তারিক বিন জিয়াদ: দাসত্ব থেকে তানজিয়ারের শাসন পর্যন্ত:

মুসা বিন নুসায়ের (রহ.) তানজিয়াতে তাঁর মুক্ত করা দাস তারিক বিন জিয়াদকে নায়েব নিযুক্ত করেন। তারিক বিন জিয়াদের নাম ইসলামের সেই মহান সেনাপতিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যাদের ঈমানি শক্তি, দৃঢ় সংকল্প, রণকৌশল এবং যুদ্ধবিদ্যা সারা বিশ্বকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করেছে। তিনি ছিলেন সাহস, বীরত্ব, দৃঢ়তা এবং সংকল্পের মূর্ত প্রতীক। তাঁর সম্পর্ক ছিল আফ্রিকার বারবার গোত্রগুলোর সাথে, যারা ইসলাম গ্রহণের আগে মারামারি এবং হত্যাযজ্ঞে নিজেদের কোনো তুলনা রাখত না, কিন্তু যখন ইসলামের আলো আফ্রিকার ঘন জঙ্গল এবং তপ্ত মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন বারবার গোত্রগুলো ইসলামের বিজয়ের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে প্রমাণিত হলো।

তাদের একটি বড় সংখ্যা, যারা মরক্কোর প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে দাস হিসেবে বন্দী হয়েছিল, ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মুসলিম মনিবদের নেতৃত্বে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তারিক বিন জিয়াদ শুরুতে মুসা বিন নুসায়ের (রহ.)-এর দাস ছিলেন, তিনি মুসার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারিকের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে মুসা বিন নুসায়ের (রহ.) তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মরক্কোর সামরিক ঘাঁটি “তানজিয়ার”-এর শাসক নিযুক্ত করেন। [২]

তানজিয়ারের উপকূলে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এখান থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউগুলো আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উত্তাল দেখা যায়, অন্যদিকে উত্তরে ভূমধ্যসাগরের ওপারে দক্ষিণ স্পেনের সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়াগুলো দূরবীন ছাড়াই দেখা যেতে পারে। প্রায় চল্লিশ কিলোমিটারের এই দূরত্ব তারিক বিন জিয়াদের মতো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সৈনিকদের কাছে কোনো গুরুত্ব রাখত না। মুজাহিদরা প্রণালীর ওপারে স্পেনের উপকূলের অস্পষ্ট রেখার ওপর দৃষ্টি...

[১] তারিখ দামেশক: ৬১/২১৫, ২১৭; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২২৮; নাফহত তিব: ১/২৩০

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/৪৩; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/২১৭; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৬/৩৩৯

ফেলে এই ভুখণ্ডের মজলুম অধিবাসীদের জুলুম ও অত্যাচারের শাসন থেকে মুক্তি দিতে এবং এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দ্বীনের প্রদীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল যে, আমীর মুসা বিন নুসাইর (রহ.) খলিফার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভ করেন। [১]

কাউন্ট জুলিয়ান এবং ফ্লোরিডা:

মুসা বিন নুসাইর (রহ.) স্পেন আক্রমণের ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলেন, কিন্তু এর আগে তিনি মরক্কোর উপকূলে তানজাহর কাছে অবস্থিত খ্রিস্টানদের শেষ শক্তিশালী কেন্দ্র সেউটা (Ceuta) দখল করা জরুরি মনে করতেন, যা স্পেনের রাজা রডরিকের প্রতিনিধি কাউন্ট জুলিয়ানের শক্তিশালী দুর্গ ছিল এবং কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা সেনাপতি।

ইসলামী লঙ্কর দুটি আক্রমণ সত্ত্বেও সেউটাকে তার লৌহকঠিন হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সেউটার খ্রিস্টান সেনাপতির সফল প্রতিরোধ এবং অন্যান্য অভিযানে মুসা বিন নুসাইরের ব্যস্ততার কারণে সম্ভব ছিল যে, স্পেনের ওপর মুজাহিদ্দীনে ইসলামের সাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা আরও বিলম্বিত হতো, কিন্তু হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যার পর এই নেক কাজে বিলম্বের আর কোনো অবকাশ রইল না। [২]

সেউটার শাসক কাউন্ট জুলিয়ানের মেয়ে ফ্লোরিডা স্পেনের রাজধানী তলেদোতে (Toledo) রডরিকের প্রাসাদে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। রডরিক ছিল চরম পর্যায়ের নির্লজ্জ, ভোগবিলাসী এবং পশুতুল্য মানুষ। সে ফ্লোরিডার সতীত্ব হরণ করে। মজলুম মেয়েটি তার বাবাকে গোপন পত্র পাঠিয়ে এই কেয়ামত সদৃশ ঘটনার খবর দেয়। কাউন্ট জুলিয়ান রাগে অস্থির হয়ে পড়লেন কিন্তু কী আর করবেন, রক্তের ঘোঁট গিলে রয়ে গেলেন। রাজার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি তার ছিল না। অবশেষে তিনি সংকল্প করলেন যে, আরবের জানবাজদের স্পেনের পথ দেখিয়ে তিনি রডরিকের কাছ থেকে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। তিনি নিজের অসন্তুষ্টি গোপন রাখলেন এবং রাজধানীতে পৌঁছে রাজার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও বিনীত ভঙ্গিতে আরজি পেশ করলেন:

“ফ্লোরিডার মা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন, তাকে আমার সাথে সেউটা যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।”

রডরিক তাকে আসল ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত মনে করে অনুমতি দিয়ে দিল। জুলিয়ান ফ্লোরিডাকে নিয়ে রওনা হওয়ার সময় রডরিক বলল: “আমি শুনেছি যে আফ্রিকার বাজপাখি খুব চমৎকার হয়, আমার জন্য কয়েকটি বাজপাখি পাঠিয়ে দিও।”

জুলিয়ান উত্তর দিলেন: “আমি এমন বাজপাখি পাঠাব যা আপনি কখনো দেখেননি।”

সেউটা পৌঁছামাত্রই জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাকে নিজের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিয়ে অবিলম্বে স্পেন আক্রমণের উৎসাহ দিলেন। মুসা বিন নুসাইর (রহ.) সুযোগটিকে গনিমত মনে করে খেলাফত দরবারে অনুমতি চাইলেন। খলিফা ওয়ালিদ বললেন যে, অতর্কিত আক্রমণ করো। মুসলমানদের সমুদ্রের ভয়াবহতার মধ্যে ফেলো না।

মুসা (রহ.) উত্তর পাঠালেন: “এটি বড় কোনো সমুদ্র নয়, কেবল একটি উপসাগর। আন্দালুসের উপকূল সামনেই দেখা যায়।”

অবশেষে ওয়ালিদ এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, আগে অতর্কিত আক্রমণ করে শত্রুর শক্তি দেখে নেওয়া হোক। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯২ হিজরি; নাফহত তীব: ১/২৩০

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯২ হিজরি; কিসসাতুল আরব ফি ইস্পানিয়া, মন্টগোমারি ওয়াট (অনুবাদ: আলী জাযিম, লমক) পৃ. ১৮, ১৯; নাফহত তীব: ১/২৫১, ২৫২

[৩] নাফহত তীব: ১/২৩১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২২৮

মুসা বিন নুসাইর (রহ.) অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই প্রথম রমজান ৯১ হিজরিতে তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বে একটি ঝটিকা বাহিনী পাঠান। এরপর আবু যুরআর নেতৃত্বে বারবার স্বেচ্ছাসেবকরা প্রণালী পার হয়ে আন্দালুসের উপকূলে সফল আক্রমণ চালায়। এগুলো ছিল ‘রেকি’ বা প্রাথমিক অভিযানের মতো, যার মাধ্যমে মুসলমানরা পরিস্থিতির অনুকূল হওয়ার বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

রমজান ৯২ হিজরিতে (৭১১ খ্রি.) মুসা বিন নুসাইরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারিক বিন যিয়াদ তিনশ আরব এবং সাত হাজার বারবার সৈন্য নিয়ে জাহাজে চড়ে স্পেনের দিকে রওনা হন। কাউন্ট জুলিয়ান পথপ্রদর্শক হিসেবে তাদের সাথে ছিলেন। [১]

গায়েবি সুসংবাদ:

পশ্চিমধ্যে তারিক বিন যিয়াদ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জিয়ারত লাভ করেন। তিনি দেখলেন যে, নবী আল-মালাহিম (সা.) মুহাজির ও আনসারদের একটি সশস্ত্র দলের সাথে অবস্থান করছেন এবং বলছেন: “হে তারিক! এই শান-শওকতের সাথে সামনে এগিয়ে যাও।” এরপর দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামসহ আন্দালুসে প্রবেশ করছেন। তারিক বিন যিয়াদ স্বপ্নে নিজেকে সেই পবিত্র দলের পেছনে পেছনে আন্দালুসে প্রবেশ করতে দেখলেন। মুসলমানরা একে একটি গায়েবি সুসংবাদ মনে করলেন, যার ফলে তাদের মনোবল সুউচ্চ এবং সংকল্প দৃঢ় হলো। তারা একে বিজয়ের পূর্বাভাস হিসেবে বিশ্বাস করলেন।

মঙ্গলবার ৫ রজব ৯২ হিজরি (৭১১ খ্রি.) ইসলামি বাহিনী আন্দালুসের উপকূলে একটি আকাশচুম্বী পাহাড়ের সামনে নোঙর ফেলে। এই পাহাড়টি পরবর্তীতে জাবালুত তারিক নামে প্রসিদ্ধ হয়। আজ একে জিব্রাল্টার বলা হয়। [২]

হর মুলক মুলকে মাস্ত:

প্রসিদ্ধ আছে যে, তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসের উপকূলে নোঙর ফেলার সাথে সাথেই নিজের যুদ্ধজাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল এটাই যে, তার সৈন্যদের মনে যেন পলায়নের কোনো কুমন্ত্রণা না আসে এবং তারা বিজয় অথবা শাহাদাত ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ কল্পনা না করে। ডক্টর ইকবাল মরহুম এই ঘটনাকে কাব্যিক ঢঙে এভাবে উপস্থাপন করেছেন:

তারিক চু বর কিনারা-এ আন্দালুস সাফিনা সোখত

গুফতান্দ কার-এ তু বা নিগাহ-এ খিরদ খতান্ত

দুরীম আয সাওয়াদ-এ ওয়াতান, বায চু রসীম?

তর্ক-এ সবব যি রুয়ে শরীয়ত কুজা রওয়ান্ত?

খন্দীদ ও দস্ত-এ স্বীশ ব শমশীর বুরদ ও গুফত

হর মুলক মুলক-এ মাস্ত কি মুলক-এ খোদা-এ মাস্ত

(তারিক বিন যিয়াদ যখন আন্দালুসের উপকূলে নিজের জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিলেন, তখন লোকেরা বলল: “বিবেকের দৃষ্টিতে আপনার এই কাজ ভুল; আমরা স্বদেশ থেকে দূরে আছি; কীভাবে ফিরে যাব? উপায়-উপকরণ বর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোথায় বৈধ?” তিনি হাসলেন এবং নিজের হাত তলোয়ারের ওপর রেখে বললেন: “প্রতিটি দেশই আমাদের দেশ, কারণ তা আমাদের আল্লাহর দেশ।”)

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ, সন ৯২ হিজরি; নাফহত তীব: ১/২৫৩, ২৫৪।

[২] নাফহত তীব: ১/২৩৯, ২৫৪।

পরিত্যাগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কীভাবে জায়েজ হতে পারে? তারিক তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে হেসে বললেন: “প্রতিটি দেশই আমাদের দেশ; কারণ তা আমাদের পরওয়ারদেগারের দেশ।” [১]

তারিক বিন জিয়াদ জাবালুত তারিক-এ কয়েক দিন অবস্থান করার পর প্রথমে পাহাড়ের সামনে অবস্থিত কারতাজানা (কার্তিজিয়া) শহর এবং তারপর জাজিরাতুল খাদরা কোনো বাধা ছাড়াই দখল করে নেন।

দক্ষিণ স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চলের গভর্নর ডিউক থিওডেমির তারিকের অগ্রযাত্রায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি একটি বাহিনী প্রস্তুত করে এক স্থানে তারিকের মোকাবিলা করেন, কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মধ্য স্পেনের দিকে পিছু হটেন। একই সাথে তিনি দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে রডারিককে এই বার্তা পাঠান: “আমাদের ভূখণ্ডে এমন এক জাতি আক্রমণ করেছে যে আমরা জানি না তারা আকাশ থেকে নেমে এসেছে নাকি জমিন থেকে উঠে এসেছে।” [২]

বারো হাজার বনাম এক লক্ষ:

মুসলমানদের অগ্রযাত্রার সংবাদে রডারিকের হুঁশ উড়ে গেল। তার জন্য এই খবরটি আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল যে, এই বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাউন্ট জুলিয়ান কাজ করছেন। রডারিক সেনাবাহিনীতে সাধারণ নিয়োগের ঘোষণা দিলেন, ধর্ম ও দেশের নামে তার অনেক বিরোধী এবং গোথ রাজবংশের রাজপুত্রদেরও সাথে নিলেন এবং কর্ডোভার ওয়াদিউল কাবির নদীর ওপারে একটি সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তারিক বিন জিয়াদের কাছে তখন মাত্র সাত হাজার সৈন্য ছিল। মরক্কোতে মুসা বিন নুসাইর (রহ.) প্রতি মুহূর্তের খবর পাচ্ছিলেন। শত্রুর এত বড় সমাবেশের কথা শুনে তিনি তারিকের জন্য ৫ হাজার সৈন্যের সাহায্য পাঠালেন। এভাবে মুজাহিদিনে ইসলামের সংখ্যা বারো হাজার হয়ে গেল। [৩]

[১] তারিক বিন জিয়াদের নৌকা পুড়িয়ে ফেলার এই কাহিনী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হলেও বিভিন্ন কারণে সন্দেহজনক। ইতিহাসে এর উল্লেখ সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হামি শরীফ আল-ইদ্রিসি (মৃত্যু ৫৬০ হিজরি)-এর রচনায় পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আরব সৈন্যরা তারিকের সাহসিকতার ওপর আস্থা রাখছিল না। তারিক এই পদক্ষেপ নিয়ে তাদের সন্দেহ দূর করে দেন। “নিশ্চয়ই আরবরা তার ওপর আস্থা রাখছিল না, তাই তিনি নিজের ওপর থেকে এই অপবাদ দূর করতে চাইলেন এবং যে নৌকাগুলোতে তারা পার হয়েছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন, ফলে তিনি সেই অপবাদ থেকে মুক্ত হলেন যা তার ওপর আরোপ করা হয়েছিল।” (নুজহাতুল মুশতাক: ৫৪০/১)। এরপর ইবনে কারদুস (মৃত্যু ৫৭৭ হিজরি) এটি বর্ণনা করেছেন। (আল-ইকতিফা ফি আখবারিল খুলাফা: ১৭৪/২, মদিনা মুনাওয়ারা সংস্করণ)। একাদশ হিজরি শতকের ঐতিহাসিক আল-মাক্কারি বর্ণনা করেছেন যে, রডারিকের কর্মকর্তারা তাকে এই সংবাদ দিয়েছিল যে, মুসলমানরা তাদের নৌকা পুড়িয়ে ফেলেছে যাতে তারা ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। “তারা তাদের নৌকাগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে যাতে ফিরে যাওয়ার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকে।” (নাফহত তিব: ২৫৮/১, দার সাদির বৈরুত সংস্করণ)। আল-ইদ্রিসি এবং ইবনে কারদুস ষষ্ঠ হিজরি শতকের এবং আল-মাক্কারি একাদশ হিজরি শতকের ঐতিহাসিক। তারা কোনো প্রাচীন উৎস বা সনদের উদ্ধৃতি দেননি; তাই এই বর্ণনাগুলোর প্রামাণিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিছু ঐতিহাসিক তারিক বিন জিয়াদের ভাষণে একটি বাক্য “সমুদ্র তোমাদের পেছনে এবং শত্রু তোমাদের সামনে” উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে এই সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে যে, মুসলমানরা আন্দালুসে প্রবেশের সময় তাদের নৌবহর পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। (নাফহত তিব: ২৪০/১)। যাই হোক, প্রাচীন উৎসগুলোতে নৌকা পুড়িয়ে ফেলার কথা স্পষ্টভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। এই দিকটিও বিবেচনায় রাখা উচিত যে, যুদ্ধের আগে নিজের বাহিনীকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করা তারিক বিন জিয়াদের লক্ষ্য ছিল, যার জন্য মরক্কো থেকে আরও সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। ফিরে আসার পথ খোলা রাখা সাহায্যের চেয়েও বেশি জরুরি ছিল যাতে পরাজয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই দিকটি বিবেচনা করলে সেনাপতির নৌকা পুড়িয়ে ফিরে আসার পথ নিজেই বন্ধ করে দেওয়া অসম্ভব না হলেও পর্যালোচনার দাবি রাখে। আমরা নৌকা পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাটি অস্বীকার করছি না বরং এর গবেষণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আবু আব্দুল্লাহ আয-যাহাবি “আবাতিল ইয়াজি বু আন তুমহা মিনাত তারিখ” গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং নৌকা পুড়িয়ে ফেলাকে একটি দুর্বল দাবি হিসেবে গণ্য করেছেন।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৯২ হিজরি; নাফহত তিব: ২৭০/১

[৩] নাফহত তিব: ২৬২/১; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪০/৪

রডরিক তার অগণিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ আন্দালুসিয়ার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গুয়াদালেত নদীর ডান তীরে এসে পৌঁছালেন। তারিকও তার মুজাহিদদের নিয়ে এই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

উভয় বাহিনী মহাসাগরের উপকূল থেকে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল দূরে গুয়াদালেত (যাকে ওয়াদিয়ে লাক্লা বা গুয়াদালেত বলা হয়) উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির চূড়ান্ত রূপ দিতে লাগল। [১] মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষের আগে তাদের বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি মনে করে রডরিক তার গোয়েন্দাদের মুসলমানদের ছদ্মবেশে ইসলামী শিবিরের দিকে পাঠালেন। এই গোয়েন্দারা ইসলামী বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ফিরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারা যা দেখল তা তাদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল। মুসলমানদের জোশ ও জজবায় উদ্দীপ্ত চেহারা এবং স্বদেশ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও তাদের চালচলনে প্রশান্তি ও নির্ভীকতার ছাপ তাদের অন্তরে মুজাহিদদের ভীতি সঞ্চার করল।

গোয়েন্দারা ফিরে গিয়ে রডরিককে বলল: “এই আক্রমণকারীরা হয় নিজেদের মৃত্যু চায় অথবা আপনার ভূখণ্ড। তারা তাদের যুদ্ধজাহাজগুলোও পুড়িয়ে দিয়েছে যাতে ফিরে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে এবং এই ভূখণ্ডে দৃঢ়পদ হয়ে কাতারবদ্ধ হয়েছে।” [২]

তারিক বিন জিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণ:

তারিক বিন জিয়াদ একজন দক্ষ সেনাপতি হওয়ার পাশাপাশি একজন অগ্নিবীরা বক্তাও ছিলেন। যদিও তিনি আফ্রিকান বারবার ছিলেন, কিন্তু আরবি সাবলীলভাবে বলতে পারতেন। তিনি চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে তার সৈন্যদের সামনে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন যার প্রতিটি শব্দ ঈমানের চিরন্তন উষ্ণতায় ভরপুর এবং যার প্রতিটি বাক্য আজও আত্মার গভীরে প্রবেশ করে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয় বলে অনুভূত হয়। তারিক বললেন:

“হে লোকসকল! পালিয়ে কোথায় যাবে? তোমাদের পেছনে সমুদ্র আর সামনে শত্রু। আল্লাহর কসম!”

[১] যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত এটাই যে, যুদ্ধ ওয়াদিয়ে লাক্লা (গুয়াদালেত নদীর তীরে) সংঘটিত হয়েছিল, তবে এখানে দ্বিতীয় একটি মতও রয়েছে যার অনুযায়ী এই যুদ্ধ ওয়াদিয়ে কুনা (লাজান্দা হ্রদের তীরে) হয়েছিল। মরহুম মাওলানা গোলাম রসুল মেহের লিখেছেন: “স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটি নদী প্রবাহিত হয় যাদের মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়েছে। একটি বারবাতে নদী, অন্যটি গুয়াদালেত নদী। যার পথে লাজান্দা হ্রদ পড়ে। এই নদীর তীরে দুটি বড় শহর অবস্থিত: একটি বারবাতে এবং অন্যটি জেরেজ। ফলে নদীর দুটি নাম হয়ে গেছে। এখন এটি বাস্তব সত্যে উপনীত হয়েছে যে, তারিক ও রডরিকের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ আল-বুহাইরা (লাজান্দা হ্রদ)-এর নিকটবর্তী ওয়াদিয়ে বারবাতেই হয়েছিল।” (আতলাস ফুতুহাত-ই-ইসলামি, পৃ. ৩৬০, বরাতে হাশিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া তারিখ-ই-আলম: ১/১৮, হাশিয়া মাওলানা গোলাম রসুল মেহের)

[২] নাফহত তীব লিল মাক্কারি: ২৫৮/১। কিছু আরব ভাষাবিদদের মতে স্পেনীয় ভাষায় “নৌকা পুড়িয়ে দেওয়া” একটি রূপক যার অর্থ হলো: “নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দেওয়া, অর্থাৎ যুদ্ধ করা বা মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।” - “আহরাকতু কুল্লি সুফুনি... আই বাদালতু কুল্লি তাক্বতি বিমা’না ক্বাতালু আও মুতু।” সুতরাং এটি সম্পূর্ণ সম্ভব যে মুসলমানদের দৃঢ় সংকল্প বা তারিক বিন জিয়াদের ভাষণকে কোনো বিদেশি তার প্রবাদ অনুযায়ী বর্ণনা করতে গিয়ে নৌকা পুড়িয়ে দেওয়ার শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তীকালে লোকেরা একে বাস্তব ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তোমাদের জন্য অটল থাকা এবং অবিচল থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভালো করে জেনে রেখো যে, এই উপদ্বীপে তোমাদের অবস্থা সেই এতিমের চেয়েও অধম যে নীচ লোকদের দস্তুরখানে বসে আছে। তোমাদের প্রতিপক্ষ সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমাদের মোকাবিলায় চলে এসেছে, তাদের কাছে পানাহারের পর্যাপ্ত সরঞ্জামও রয়েছে। অথচ তোমাদের অবস্থা এই যে, তলোয়ার ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। খাবারও তোমাদের জন্য কেবল ততটুকুই জুটবে যতটুকু তোমরা শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে। যদি তোমাদের সময় এভাবেই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কাটতে থাকে এবং তোমরা কিছু না করো, তবে তোমাদের গাভীর্ঘ্য নষ্ট হয়ে যাবে। যারা তোমাদের ভয়ে ভীত ছিল তারা তোমাদের মোকাবিলায় সাহসী হয়ে উঠবে। অতএব তোমরা এই অবাধ্য জাতিকে পরাজিত করে পরিণামের লাঞ্ছনা থেকে নিজেদের বাঁচাও। তারা কেল্লাবন্দি শহর থেকে বেরিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছে। যদি তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো তবে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারো। যে বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করছি আমি নিজেও তা থেকে গাফেল নই। আমি তোমাদের এমন এক পথে নিয়ে চলব যেখানে জীবন সবচেয়ে মূল্যহীন বলে গণ্য হয়। মনে রেখো! যদি তোমরা কিছু সময় কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরো তবে দীর্ঘকাল বিলাসিতা ও শান্তিতে কাটাতে পারবে।

খুব ভালো করে বুঝে নাও, আমি তোমাদের যে আহ্বান জানাচ্ছি তা গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি আমি নিজেই। যখনই দুই বাহিনী একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, আমি এই কাফেরদের প্রধান লযরিক (রডরিক)-এর ওপর হামলা করে ইনশাআল্লাহ তাকে হত্যা করব, তোমরাও আমার সাথে আক্রমণকারী হবে। যদি আমি লযরিক (রডরিক)-কে হত্যা করার পর শহীদ হয়ে যাই তবে তোমাদের কাজ পূর্ণ করে যাব, তখন তোমরা কোনো সাহসী ও সচেতন ব্যক্তিকে আমার বানিয়ে নিও। আর যদি আমি লযরিককে মারার আগেই নিহত হই তবে তোমরা আমার এই সংকল্প পূর্ণ করো এবং তোমরা নিজেরাই তার ওপর আক্রমণকারী হয়ো। নিশ্চিতভাবে তাকে হত্যার মাধ্যমে এই উপদ্বীপ বিজয়ের পরিকল্পনা সফল হয়ে যাবে; কারণ এরপর শত্রু ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। [১]

ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধ:

এটি ছিল রমজান মাস, ২৭তম রাত ছিল, মুসলমানরা সারা রাত ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-তিলওয়াত ও দোয়ায় মশগুল ছিল। তলোয়ারগুলো ধারালো করা হলো, ঘোড়ার পিঠে জিন কষে নেওয়া হলো, দিগন্তে ভোরের চিহ্ন ফুটে উঠলে আন্দালুসের জমিনে মুজাহিদদের আজান বাতাসের ঝাপটায় দূর-দুরান্ত পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। ফজরের সালাতের পর ইসলামের মুজাহিদরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাতারবদ্ধ হলেন। এটি ছিল ২৭ রমজানুল মুবারক ৯২ হিজরি (১৯ জুলাই ৭১১ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঐতিহাসিক সকাল। এটি সেই স্মরণীয় দিন ছিল যাতে তারিক বিন জিয়াদের অন্তর থেকে উৎসারিত দোয়াগুলোকে মরহুম ইকবালের কল্পনা ভাষা দিয়ে এই বিশ্বখ্যাত কবিতায় রূপ দিয়েছিল:

[১] নাফহত তীব: ১/২৪০, ২৪৯

এই গাজী, এই তোমার রহস্যময় বান্দা, যাদের তুমি দান করেছ খোদায়ী স্বাদ।

তাদের এক ঠোকে মরুভূমি ও নদী দ্বিখণ্ডিত হয়, তাদের ভয়ে পাহাড় সংকুচিত হয়ে
সরিষার দানার মতো হয়ে যায়।

দুই জগত থেকে হৃদয়কে বিমুখ করে দেয়, এক অদ্ভুত জিনিস হলো পরিচয়ের স্বাদ।

শাহাদাতই মুমিনের কাম্য ও উদ্দেশ্য, গনিমতের মাল নয়, দেশ জয়ও নয়।

বাগানে কতকাল ধরে লাল ফুল প্রতীক্ষায় আছে, এর জন্য আরবের রক্তের পোশাক
প্রয়োজন।

যুদ্ধের দামামায় আঘাত পড়ল এবং উভয় বাহিনী একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
বারো হাজার সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী লশকর বা বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল
পদাতিক। তাদের কাছে উন্মুক্ত তলোয়ার, আরবী ধনুক এবং নেজা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র
ছিল না, যেখানে রডারিকের অধিকাংশ সৈন্য ছিল অশ্বারোহী। তারা বর্ম পরিহিত ছিল এবং
সব ধরনের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে সহজলভ্য ছিল। তাদের জন্য খাদ্য-রসদ এবং
অতিরিক্ত সৈন্যের কোনো অভাব ছিল না। স্বয়ং রডারিক অত্যন্ত অহংকারের সাথে বাহিনীর
মধ্যভাগে চাকাযুক্ত এক চমৎকার কারুকার্যখচিত সিংহাসনে বসে ছিল। এই সিংহাসনের
সামনে দুটি ঘোড়া জোড়া ছিল। রডারিক এই ভ্রাম্যমাণ সিংহাসনে বসে বসেই তার বাহিনীর
তদারকি করতেন এবং তাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের উদ্দীপনা
ও উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। খ্রিস্টানদের অশ্বারোহী দল যখন ধুলোবালির মেঘ উড়িয়ে
পদাতিক মুসলিম সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করত, তখন মনে হতো তাদের সামনে আসা
প্রতিটি জিনিস তখনই হয়ে যাবে এবং প্রতিরোধকারী মুসলমানরা ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট
হয়ে যাবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাবয়ীদের নেতৃত্বে লড়াইরত
বীর মুজাহিদরা নিজেদের জায়গা থেকে এক কদমও পিছু হটতেন না। তাদের সারিতে
বিন্দুমাত্র ফাটল সৃষ্টি হতো না। তারা আক্রমণকারী অশ্বারোহীদের নেজার আগায় এবং
তলোয়ারের ধারে বিদ্ধ করতেন এবং তাদের বড় একটি অংশকে ধুলো ও রক্তে রঞ্জিত
করে বাকি শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করতেন।

এই স্মরণীয় যুদ্ধ এক-দুই দিন নয়, পুরো আট দিন পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্রতার সাথে চলতে
থাকে। শুরুতে খ্রিস্টানদের মনোবল তাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে তুঙ্গে ছিল।
ইসলামী মুজাহিদদের সংখ্যাগত স্বল্পতাকে তারা তাদের বিজয়ের পূর্বাভাস মনে করতেন।
কিন্তু কয়েক দিনের রক্তক্ষয়ী লড়াই খ্রিস্টানদের এই বিশ্বাস এনে দিল যে, তাদের
মোকাবিলা এমন এক জাতির সাথে, যাদেরকে কেবল সংখ্যাধিক্য এবং অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের
ভিত্তিতে পরাজিত করা অসম্ভব।

৫ই শাওয়াল উভয় পক্ষ লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তবুও মুসলমানদের
মনোবল ছিল দৃঢ় এবং তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ঈমানী উদ্দীপনায় কোনো ঘাটতি
আসেনি। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের কেবল শক্তিই নিঃশেষ হয়নি, বরং তাদের সাহসও
জবাব দিয়ে দিয়েছিল। লড়াই চলাকালীন মুজাহিদরা খ্রিস্টানদের মধ্যে সাহসহীনতার লক্ষণ
অনুভব করে তাদের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি আক্রমণাত্মক হামলা চালিয়ে তাদের সারিগুলো
ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। বাহিনীর ডান ও বাম অংশের
পরাজয় সত্ত্বেও রডারিক কেন্দ্রীয় দলকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এটি দেখে
তারিক বিন জিয়াদ তার কয়েকজন জানবাজ সঙ্গীকে নিয়ে শত্রুর মূল বাহিনীর সারিতে
ঢুকে পড়লেন। তার নজর রডারিকের ওপর পড়লে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন: “এই তো
সেই খ্রিস্টানদের...”

“রাজা” এবং তার দেহরক্ষীদের বেষ্টনী ভেঙে সেদিকে অগ্রসর হলেন, রডারিক মৃত্যুকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল এবং এরপর তার আর কোনো হৃদিস পাওয়া যায়নি। গুয়াডালিট নদীর তীরে জলাভূমিতে তার সাদা ঘোড়াটি আটকে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়, তার একটি রত্নখচিত স্বর্ণসূত্রে বোনা জামা এবং একটি সোনালি মোজাও সেই জলাভূমিতে পাওয়া গিয়েছিল, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছিল যে সে প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মারা গেছে।

রডারিক পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই শত্রু ময়দান খালি করে দিয়েছিল। যখন লাশ গণনা করা হলো তখন জানা গেল যে তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছেন, যেখানে নিহত খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল অগণিত। [১] ওয়াডি লাক্সার এই যুদ্ধ আন্দালুস বিজয়ের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, খ্রিস্টানরা এরপর আর কোথাও শত্রু অবস্থান নিয়ে লড়াইতে পারেনি এবং মুসলমানরা শত্রুদের শহরগুলো সহজেই জয় করতে থাকেন।

তারিক বিন জিয়াদ একজন ভালো কবিও ছিলেন। তিনি বিজয়ের খুশিতে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন:

رَكِبْنَا سَفِينًا بِالْمَجَازِ مُقِيرًا عَسَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مِنَّا قَدْ اشْتَرَى

“আমরা প্রণালীতে এমন নৌকায় আরোহণ করেছি যেগুলোর ছিদ্র আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল, এই আশায় যে আল্লাহ আমাদের থেকে কিনে নিয়েছেন...”

نَفُوسًا وَأَمْوَالًا وَأَهْلًا بِجَنَّةٍ إِذَا مَا اشْتَيْنَا الشَّيْءَ فِيهَا تَيَسَّرَا

“...আমাদের জান, মাল এবং পরিবার-পরিজনকে সেই জান্নাতের বিনিময়ে, যাতে যখনই আমরা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করব, তা আমাদের কাছে সহজলভ্য হবে।”

وَلَسْنَا نُبَالِي كَيْفَ سَأَلَتْ نَفُوسُنَا إِذَا نَحْنُ أَدْرَكْنَا الَّذِي كَانَ أَجْدَرَا

“আমাদের জানগুলো কীভাবে ক্রমাগত কুরবানি হচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো পরোয়া নেই। কারণ আমরা এর বিনিময়ে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান বস্তু (অর্থাৎ জান্নাত) লাভ করছি।” [২]

দক্ষিণ ও মধ্য আন্দালুস বিজয়:

ওয়াডি লাক্সার গৌরবময় বিজয়ের পর তারিক বিন জিয়াদ মুসা বিন নুসাইর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অনুমতি ছাড়াই কাউন্ট জুলিয়ানের পরামর্শে বাহিনীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রানাডা ও মালাকাসহ দক্ষিণ আন্দালুসের অধিকাংশ জেলা জয় করে নেন। এরপর তিনি মধ্য আন্দালুসের দিকে অগ্রসর হন এবং কর্ডোভাও জয় করেন। [৩] এই সময়ে মুসা বিন নুসাইর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পক্ষ থেকে তারিকের কাছে বার্তা পাঠানো হয় যে কর্ডোভার আগে আর আক্রমণ না করতে [৪], কিন্তু কাউন্ট জুলিয়ান তারিককে বোঝালেন যে এই মুহুর্তে আন্দালুসের সমস্ত শহর খালি পড়ে আছে এবং সেগুলো জয় করা অত্যন্ত সহজ; তাই আপনি অবিলম্বে টলেডোর দিকে অগ্রসর হোন। অবশেষে রবিউল আখির ৯৩ হিজরিতে তারিক অগ্রসর হয়ে আন্দালুসের রাজধানী টলেডোও দখল করে নেন। [৫]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৯২ হিজরি; নাফহত তিব: ১/২৪০, ২৪২, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০

[২] নাফহত তিব: ১/২৬৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৪১

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ২২৮

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৪১

রাজপ্রাসাদের কোষাগার থেকে মুসলমানরা গথ রাজাদের চব্বিশটি [২৪] মুকুট লাভ করেন। প্রতিটি মুকুটে সেটি ব্যবহারকারী রাজার নাম এবং তাঁর রাজত্বকাল খোদাই করা ছিল। আন্দালুসে সেই সময় পর্যন্ত গথ বংশের ২৪ জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। প্রত্যেক রাজার জন্য নতুন মুকুট তৈরি করা হতো এবং মৃত রাজার মুকুট রাজকীয় কোষাগারে জমা রাখা হতো। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল ইসলামের বরকতে ইউরোপের শাসকদের এই বহুমূল্য মুকুটগুলো, যা স্পর্শ করার সাহস কেউ করতে পারত না, মুসলমানদের পদতলে স্তূপ করে দিয়েছিলেন। [১]

মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর আগমন এবং এর প্রকৃত কারণ:

তারিক বিন জিয়াদের কাছে খুব বেশি সৈন্য ছিল না। আবার বিভিন্ন শহর বিজয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল; তাই প্রবল আশঙ্কা ছিল যে স্প্যানিশরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। এ কারণে তারিক আমির মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমির মুসা রহ. পত্র পাঠিয়ে তারিককে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেন [২] এবং আঠারো হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে আন্দালুসের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই বাহিনীতে অনেক তাবেরী এবং একজন সাহাবী মুনযির রাযিয়াল্লাহু আনহুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৩]

কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুসা বিন নুসাইর রহ. তারিক বিন জিয়াদের বিজয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে আন্দালুসের দিকে যাত্রা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারিকের মতো তিনিও খ্যাতি অর্জন করবেন। এটি কিছু বর্ণনাকারীর অনুমান হতে পারে, কোনো অকাট্য বিষয় নয়; কারণ মুসা বিন নুসাইর রহ. এর আগে আফ্রিকায় যে বিজয়গুলো অর্জন করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁর নাম বাঁচিয়ে রাখার জন্য তা যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া আন্দালুস অভিযান তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল, তারিক বিন জিয়াদের অবস্থান ছিল কেবল একজন নায়েব বা প্রতিনিধির।

আর তর্কের খাতিরে যদি মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর হিংসা হতোই, তবে তারিককে বরখাস্ত করার ফরমান জারি করা বা আন্দালুস পৌঁছে পুরো অভিযানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া কি খুব কঠিন ছিল? কিন্তু ওয়াদি লাক্কাহর যুদ্ধের পর পুরো এক বছর পর্যন্ত মুসা বিন নুসাইর রহ. এমন কিছুই করেননি। মুসা বিন নুসাইর আন্দালুস অভিযানে সেই সময় গিয়েছিলেন যখন বিশাল বিজিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা, অবশিষ্ট এলাকাগুলো জয় করা এবং এরপর উত্তর আন্দালুস হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের জন্য বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও জনবলের প্রয়োজন ছিল। আল্লামা মাক্কারি লিখেছেন যে, মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর লক্ষ্য ছিল আন্দালুসের গিরিপথগুলো অতিক্রম করে পুরো ইউরোপ জয় করে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। [৩]

মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর ঝটিকা বিজয়সমূহ:

৯৩ হিজরির রমজান মাসে মুসা বিন নুসাইর রহ. আন্দালুসের উপকূল ‘আল-জাযিরাতুল খাদরা’-তে অবতরণ করেন। তিনি পূর্ব দিক থেকে তাঁর অভিযান শুরু করেন এবং পথের শহরগুলো: শায়ুনা, কারমুনা এবং বাজা একে একে জয় করে এগিয়ে যেতে থাকেন।

[১] নাফহত তিব: ১/২৮৯, তারিখ-ই আন্দালুস, মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী, পৃ. ৯২, ৯৩ টীকা সহ।

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, ডক্টর আব্দুর রহমান আলী, পৃ. ৬৮।

[৩] নাফহত তিব: ১/২৩৩... বা হিকমত হযরত উসমান যুন-নুরাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিল। তিনি ২৭ হিজরিতে আফ্রিকার গভর্নরকে লিখেছিলেন: নিশ্চয়ই কনস্টান্টিনোপল সমুদ্রের দিক থেকে বিজিত হবে, আর তোমরা যখন আন্দালুস জয় করবে, তখন তোমরা শেষ জামানায় কনস্টান্টিনোপল বিজয়ীদের সওয়াবের অংশীদার হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২২৬)

ইশবিলিয়াকে কঠোর অবরোধ এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জয় করা হয়েছিল। এরপর আন্দালুসের প্রাচীন রাজধানী ‘মারদাহ’-এর অবরোধও অত্যন্ত দীর্ঘ প্রমাণিত হয়েছিল। অবশেষে ৯৪ হিজরির রমজান মাসের শেষে একটি চুক্তির অধীনে এই শহরটি জয় করা হয়েছিল। [১]

এদিকে তলাইতলার বিজয়ের পর তারিক আরও অগ্রসর হন এবং আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ি অঞ্চল: ওয়াদিউল হিজারা এবং আস্তুরকা পর্যন্ত বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে তলাইতলায় ফিরে আসেন। [২]

মুসা বিন নুসাইর এবং তারিকের সাক্ষাৎ:

৯৪ হিজরির জিলকদ মাসে মুসার বাহিনী পূর্ব আন্দালুস জয় করে তলাইতলা থেকে দেড়শ কিলোমিটার পশ্চিমে তালাবেরায় পৌঁছে যায়। তারিক বিন জিয়াদ তলাইতলা থেকে তালাবেরায় এসে তাঁর আমিরের খিদমতে উপস্থিত হন। [৩]

মুসা বিন নুসাইর (রহ.) নিষেধ করা সত্ত্বেও অগ্রসর হওয়ার কারণে তারিককে তিরস্কার করেন। [৪] তারিক চরম শৃঙ্খলা প্রদর্শন করে উফ পর্যন্ত শব্দ করেননি এবং বললেন: ‘আমি আপনার গোলাম, এই বিজয়গুলো আপনারই নামে।’ [৫]

সংক্ষেপে, আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তারিক তাঁর ক্রটির এমন ক্ষতিপূরণ করলেন যে মুসা বিন নুসাইর (রহ.) সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। [৬]

অন্ধকার সমুদ্রে আমরা আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি:

কিছু দিন পর মুসা বিন নুসাইর (রহ.) তারিককে এই বিজয়গুলোর জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: ‘আমিরুল মুমিনীন ওয়ালিদ পুরস্কার হিসেবে তোমাকে আন্দালুসে তাঁর নায়েব (প্রতিনিধি) হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখন তুমি এখানকার নিয়ামতগুলো উপভোগ করতে থাকো।’

কিন্তু তারিক বললেন: আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না যতক্ষণ না অন্ধকার সমুদ্র (আটলান্টিক মহাসাগর) পর্যন্ত পৌঁছে আমার ঘোড়া তাতে না নামিয়ে দিই। [৭]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৯১; নাফহত তিব: ১/২৬৯ থেকে ২৭১

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৯১

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, ড. আবদুর রহমান আলী, পৃ. ৮৩

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬

কিছু ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুসা আদেশ অমান্য করার কারণে তারিককে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং জনসমক্ষে অপমান করেছিলেন, কেউ কেউ লিখেছেন যে মাথা মুগুন করে দিয়েছিলেন এবং কিছু দিন বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই কথাগুলো কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, অগ্রসর হওয়া বন্ধ করার নির্দেশ না মানার কারণে মুসা কর্তৃক তারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কারণ এমন পদক্ষেপের ফলে মুসলমানদের বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারত। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তারিকের প্রতিটি অভিযানের ফলাফল বিজয়ের রূপেই এসেছিল। এটাই ছিল মুসার উদ্দেশ্য। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় এত বেশি অসন্তুষ্ট যে শাস্তি দেওয়া হবে এবং বন্দী করা হবে, তা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ইবনে আযারি শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন: ‘ফাওয়াব্বাখাহ মুসা ওয়া গাদিবা আলাইহি’ (মুসা তাকে তিরস্কার করলেন এবং তার ওপর রাগান্বিত হলেন), এরপর শাস্তি দেওয়ার দুর্বল বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন: ‘কিলা ইম্নাহ ওয়াদাআস সাওতা আলা রা’সিহি’ (বলা হয় যে তিনি তার মাথায় চাবুক রেখেছিলেন), এবং ‘কিলা ইম্নাহ দরাবাহ আসওয়াতান কাসিরাতান ওয়া হালাকা রা’সাহ’ (বলা হয় যে তিনি তাকে অনেক বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তার মাথা মুগুন করেছিলেন)। (আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬)। তাছাড়া পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মুসা এবং তারিকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক আস্থা বজায় ছিল; এজন্যই মুসা তারিককে তাঁর নায়েব পদে বহাল রেখেছিলেন, অন্যথায় তাঁর কাছে সেনাপতির কোনো অভাব ছিল না।

একইভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, তারিক বিন জিয়াদ একটি শহর থেকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হীরা-জহরত খচিত একটি টেবিল পেয়েছিলেন, তারিক মুসার কাছে পেশ করার আগে সেটির একটি পা ভেঙে লুকিয়ে রেখেছিলেন। (আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৯১)। এটিও একটি সনদবিহীন বর্ণনা। ড. আবদুর রহমান আলী ‘আত-তারিখুল আন্দালুসি’-তে এই অভিযোগের অসারতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫০০

[৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২২৮

[৬] নাফহত তিব: ১/২৪২

উত্তর আন্দালুসের বিজয়সমূহ:

পরবর্তী কয়েক মাসে মুসা বিন নুসাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তারিক বিন যিয়াদ উত্তর আন্দালুসে তাদের বাহিনী ছড়িয়ে দেন। কিছু যুদ্ধ উভয়ই মিলে লড়েছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পথে অগ্রসর হয়েছেন। কিছু স্থানে অতর্কিত আক্রমণকারী দল পাঠানো হয়েছিল এবং কিছু অভিযানে তারা নিজেরাই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মুসার লক্ষ্য ছিল মূলত উত্তর-পূর্ব দিকে, আর তারিকের লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম দিকে। মুসা সারাকুস্তা প্রদেশ এবং তারিক গ্যালিসিয়া প্রদেশ জয় করেন। এক বছরের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী দল পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ফ্রান্সের সীমান্তে প্রবেশ করেছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের কারকাসোন শহরটি জয় করা হয়েছিল এবং বাকি শহরগুলো তাদের আক্রমণের মুখে ছিল। [১]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, ডক্টর আব্দুর রহমান আলী, পৃষ্ঠা ৮৫ থেকে ৯৫।

উপমহাদেশে মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা

বিশ্বের মানচিত্রে উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান) প্রাচীনকাল থেকেই এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশ নয়, বরং বিভিন্ন জাতি ও বংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট মহাদেশ। উত্তরে কারাকোরাম পর্বতমালা একে চীন থেকে পৃথক করেছে। এর পশ্চিম সীমান্ত ইরানের সাথে মিশেছে। উত্তর-পশ্চিমে এর সীমানা সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কোনো কোনো শাসক হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্তও শাসন করেছেন। উত্তর-পূর্বে হিমালয় পর্বতমালা একে তিব্বত থেকে পৃথক করেছে। এর তিন দিকে সমুদ্র। দক্ষিণ-পূর্বে এটি বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত। [১]

উপমহাদেশের জাতিসমূহ:

মধ্য উপমহাদেশের উর্বর অঞ্চলে কৃষিকাজ করা প্রাচীন জাতিগুলোকে ‘দ্রাবিড়’ বলা হতো। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার আর্য উপজাতিগুলো সুলাইমান পর্বতমালার গিরিপথ দিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। তারা স্থানীয় লোকদের পরাজিত করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাদের ধর্মীয় গুরুরা ‘ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত ছিল, যারা মূর্তিপূজাকে সাধারণ করে তুলেছিল এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। শাসনের দায়িত্ব আর্য সরদারদের ওপর অর্পিত হয় যারা ‘ক্ষত্রিয়’ নামে পরিচিত হতে থাকে। কৃষি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ‘বৈশ্য’ বলা হতে থাকে। গোলাম বানানো স্থানীয় লোক এবং তাদের সন্তানদের ‘শূদ্র’ নাম দিয়ে জন্মগত পাপী ও অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়, যাদের জীবন-মরণ ছিল উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য। বর্ণপ্রথার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের একজন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ (যিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন) বিদ্রোহ করেন এবং একটি আলাদা ধর্ম প্রবর্তন করেন যাতে বর্ণপ্রথার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই ধর্মকে ‘বৌদ্ধ ধর্ম’ বলা হয়। [২]

উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ:

আর্যরা পাঞ্জাব থেকে আরও অগ্রসর হয়ে মধ্য ভারতের গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা পছন্দ করে এবং এই ভূখণ্ডের নাম রাখে ‘আর্যাবর্ত’। রাসূল ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় এখানে রাজা হর্ষের শাসন ছিল, যিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব, কনৌজ, বাংলা, উড়িষ্যা এবং মালব জয় করে একটি শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর সিন্ধু ও নেপালকে পদানত করে উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে (২৭ হিজরি) তাঁর মৃত্যুর পর রাজপুতরা উত্তর ভারতে অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র ছিল ‘কনৌজ’, যার মধ্যে রাজপুতানা ও মালব রাজ্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারত...

[১] উপমহাদেশের ইতিহাস, প্রফেসর এম. এ. জামিল, পৃষ্ঠা ১১, ১২

[২] উপমহাদেশের ইতিহাস, প্রফেসর এম. এ. জামিল, পৃষ্ঠা ১৪ থেকে ১৭

একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হতো। বাংলা, বিহার এবং সিন্ধুও পৃথক পৃথক শাসকদের অধীনে ছিল।

খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকেই মুসলমানরা উপমহাদেশে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে ইসলামী বাহিনীর একটি বড় অংশ খোরাসান, আফ্রিকা এবং রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে ব্যস্ত ছিল এবং উপমহাদেশের ওপর আক্রমণের ধরন ছিল অনেকটা গেরিলা অভিযানের মতো। মুসলমানরা এখানে অনেক বিজয় অর্জন করেছিলেন কিন্তু কখনও কোনো পরিকল্পনার অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করে সেখানকার জনগণের ওপর জিজিয়া বা খরাজ ধার্য করেননি। হযরত মুয়াবিয়া [রা.] -এর যুগে ইসলামী বাহিনী খাইবার গিরিপথের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে লাহোর পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু এখানেও শত্রুকে পর্যুদস্ত করার পর বাহিনী ফিরে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশ ছিল এক বিশাল জগত যেখানে অন্ধভাবে প্রবেশ করা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারত; তাই আমরা দেখি যে এখানে মুসলমানদের অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। [১]

আরব নারীদের কাফেলার ওপর দাহিরের সৈন্যদের আক্রমণ:

উপমহাদেশে সিন্ধু রাজ্য তখন ছিল একটি বিশাল রাষ্ট্র যা উত্তর-দক্ষিণে আরব সাগরের উপকূল থেকে মুলতান পর্যন্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে রাজপুতানা থেকে মাকরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উচ্চ সিন্ধুর কেন্দ্র ছিল ‘অরোর’ এবং নিম্ন সিন্ধুর কেন্দ্র ছিল ‘ব্রাহ্মণাবাদ’। সিন্ধুর মূর্তিপূজক শাসকরা দীর্ঘকাল ধরে ইরানীদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে আসছিল। বেলুচিস্তানে ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ অবস্থানে ইরানী ও সিন্ধুদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত; তাই ইসলামের খলিফাগণ সিন্ধুকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। তবে তারা দীর্ঘকাল এখানে কোনো বড় আক্রমণ করতে পারেননি।

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে মুসলমানদের উপমহাদেশে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। এই যুগে এই অঞ্চলটি রাজা দাহিরের অধীনে ছিল। তার পিতা রাজা চচ ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা যিনি সিন্ধুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জয় করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই লোকেরা ছিল ব্রাহ্মণ, যখন তাদের প্রজাদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। দাহির তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করত যার কারণে প্রজারা তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। দাহিরের কুপ্রকৃতির অবস্থা এমন ছিল যে সে নিজের আপন বোনকে বিয়ে করেছিল। [২]

আরব বণিকরা ইসলামের আগেও ভারতের উপকূলে যাতায়াত করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তাদের ঝাঁক বেশিরভাগই ছিল দক্ষিণ ভারতের দিকে। বণিকদের কাফেলা জাজিরাতুল আরব থেকে ইরাকে যেত এবং সেখানে বসরার কাছে পারস্য উপসাগর থেকে নৌকা ও জাহাজের মাধ্যমে ভারতের উপকূলে পৌঁছাত। ইয়েমেনের বন্দরের একটি পথও ছিল যেখান থেকে উপমহাদেশের উপকূল খুব বেশি দূরে নয়। ইসলামী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও উন্নতি হলে উপমহাদেশে আরব বণিকদের যাতায়াতও বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশে সারান্দ্বীপ (শ্রীলঙ্কা) দ্বীপটি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশাল কেন্দ্র ছিল।

[১] তারিখ-এ-হিন্দ, ড. মনসুর চৌধুরী থেকে, পৃ. ২৩, ২৪।

[২] ফাতহনামা-এ-সিন্ধু (চচনামা নামে পরিচিত) আলী বিন হামিদ বিন আবি বকর আল-কুফি থেকে, পৃ. ৫০ থেকে ৫৫; তারিখ-এ-সিন্ধু আব্দুল হালিম শারার থেকে, পৃ. ১৭৩; তারিখ-এ-সিন্ধু মীর মাসুম শাহ ভাক্কারি থেকে, পৃ. ১৮।

কেন্দ্র ছিল। পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে অনেক আরব বণিক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে তাদের মধ্যে কিছু বণিক ইন্তেকাল করেন এবং তাদের পরিবার এখন নিজ দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যা ছিল নারীদের। শ্রীলঙ্কার রাজা একজন প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে মৃত আরব বণিকদের উত্তরসূরির ফিরে যেতে চায়, তখন তিনি বেশ কয়েকটি নৌকায় তাদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং খলিফা ওয়ালিদের জন্য মূল্যবান উপহারও সাথে দিলেন, যার মধ্যে হীরা, মুক্তা, দৃষ্টিনন্দন পোশাক এবং তৈজসপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিছু সরকারি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এই কাফেলাটি উপমহাদেশের উপকূল ঘেঁষে পারস্য উপসাগরের দিকে যাচ্ছিল যাতে বসরা বন্দরে নোঙর করতে পারে। এই সময়ে যখন এটি সিন্ধুর দেবল উপকূলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এখানকার জলদস্যুরা নৌকাগুলোকে ঘিরে ফেলল। সারানদীপের কর্মকর্তারা এই দৃশ্য দেখে বললেন:

“আমরা মুসলমানদের খলিফার কাছে যাচ্ছি, এই মাল ও আসবাবপত্র তাঁরই জন্য।”

কিন্তু আক্রমণকারীদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ল না। তারা নারীদের বন্দি করল এবং সমস্ত মালামাল লুট করে নিল। সাথে সাথে বলল:

“যদি মুক্তি চাও তবে এর মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।”

সেই সময় বনী ইয়ারবু গোত্রের এক নারী চিৎকার করে বললেন: “হে হাজ্জাজ! হে হাজ্জাজ! সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসো!”

কয়েকজন ভাগ্যবান মুসলমান এই সুযোগে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারা সরাসরি হাজ্জাজের কাছে পৌঁছালেন এবং সেই নারীদের ফরিয়াদ শোনালেন। এই ঘটনা শোনার সাথে সাথেই হাজ্জাজের মুখ থেকে বের হলো: “সম্ভবত আমি ঘুমাচ্ছিলাম, এই আওয়াজ আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে।” তারপর তিনি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন: “লাববাইক! লাববাইক!”

তিনি অবিলম্বে একজন দূতের মাধ্যমে রাজা দাহিরের কাছে একটি পত্র পাঠালেন যাতে এই বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দেওয়া হয়। অন্যথায় সিন্ধু রাষ্ট্রকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে।

হাজ্জাজ দূতকে এই তাকিদও দিলেন যে তিনি যেন অপহৃত কাফেলার সন্ধান করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

দূত সিন্ধু পৌঁছালেন এবং হাজ্জাজের বার্তা পৌঁছে দিলেন। দাহির ক্ষমতার দস্তে এই পত্রের কোনো তোয়াক্কা করলেন না এবং বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বললেন: “এটি জলদস্যুদের কাজ। তাদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।” [১]

উবাইদুল্লাহ বিন নাবহান এবং বুদাইল বিন তাহফা সিন্ধুতে:

কিন্তু হাজ্জাজের মতো অভিজ্ঞ মানুষকে এই টালবাহানা দিয়ে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি খেলাফত দরবার থেকে সিন্ধুতে জিহাদের অনুমতি চাইলেন এবং অনুমোদন পেতেই বেলুচিস্তানের শাসক উবাইদুল্লাহ বিন নাবহানকে সিন্ধুতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উবাইদুল্লাহ বিন নাবহান রণক্ষেত্রে পৌঁছালে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। উবাইদুল্লাহ শহীদ হলেন এবং বাহিনীকে পিছু হটতে হলো। [২]

[১] চাচনামা, পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০

[২] ডক্টর মেহরীন মুহাম্মদ দাউদপোতা “চাচনামা”-র টীকায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এই যুদ্ধ বর্তমান করাচির উপকূলে হয়েছিল এবং ক্রিফটনে অবস্থিত আব্দুল্লাহ শাহ গাজীর মাজারটি প্রকৃতপক্ষে এই উবাইদুল্লাহ বিন নাবহানেরই। আল্লাহই ভালো জানেন।

হাজ্জাজ যখন খবর পেলেন, তখন তিনি তাঁর অন্য এক সেনাপতি বুদাইল বিন তাহফাহ-কে, যিনি বানু বাজিলা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই অভিযানে পাঠালেন। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বাহিনী হাতিও ব্যবহার করেছিল, যা দেখে আরবদের ঘোড়াগুলো ভড়কে যাচ্ছিল। বুদাইল অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি বাহিনীকে সাহস জোগাতে জোগাতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন এবং হাতিদের কাছে পৌঁছে গেলেন। হাতিরা আক্রমণ করলে বুদাইলের ঘোড়া ভড়কে যেতে শুরু করল। বুদাইল নিজের পাগড়ি খুলে ঘোড়ার চোখের ওপর বেঁধে দিলেন এবং তাকে তাড়া দিয়ে বীরত্বের সাথে শত্রুদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। শহীদ হওয়ার আগে তিনি নিজ হাতে ৮০ জন শত্রুকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর ইসলামি বাহিনীকে আবারও পিছু হটতে হলো।

বুদাইলের শাহাদাত এবং মুসলমানদের পরাজয়ের খবর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলল। বুদাইল বিন তাহফাহ অত্যন্ত যোগ্য সেনাপতি ছিলেন, তাঁর অতুলনীয় সাহসিকতা ও যোগ্যতার কারণে তিনি হাজ্জাজের প্রিয় সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাজ্জাজের শান্তি ও আরাম হারাম হয়ে গেল। তিনি প্রতিটি আযানের পর বুদাইলের জন্য রহমতের দোয়া করতেন এবং এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করতেন।

হাজ্জাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে সিন্ধুর রাজার শক্তি অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি এবং যতক্ষণ না পুরো সিন্ধু দখল করে এই জালিমের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ মুসলমানদের সম্মানও বিপদের মুখে থাকবে এবং তাদের বাণিজ্যিক পথগুলোও। অবশেষে হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে অনুমতি চাইলেন যেন উপমহাদেশে একটি বড় অভিযান শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। ওয়ালিদ পূর্ববর্তী অভিযানগুলোর ব্যর্থতার পর উপমহাদেশে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন না, তিনি উত্তর পাঠালেন:

“এটি একটি দূরবর্তী রণাঙ্গন যেখানে মূর্খ লোক বসবাস করে। সেখানে জিহাদের জন্য যে পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং জনবল প্রয়োজন, তাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, চরম কষ্ট সহ্য করতে হবে। প্রতিবার মুসলমানরা সেখানে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।”

খলিফার পত্র হাজ্জাজের আশার বিপরীত ছিল কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না বরং এই অভিযানের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পুনরায় আবেদন পাঠালেন:

“আমিরুল মুমিনীন! দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে যে মুসলমান বন্দিরা কাফেরদের কবলে নির্যাতিত হচ্ছে। সেখানে ইসলামি বাহিনী যে পরাজয় বরণ করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়াও জরুরি। এই মুসলমান বন্দিদের মুক্ত করাও অপরিহার্য। আমিরুল মুমিনীন তাঁর মহান পত্রে উল্লেখ করেছেন যে রণাঙ্গন অনেক দূরে এবং এই অভিযানে প্রচুর খরচ হবে, তবে আমি আমিরুল মুমিনীনকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে দারুল খিলাফতের কোষাগার থেকে এই অভিযানে যত টাকা খরচ হবে, ইনশাআল্লাহ বিজয়ের পর তার দ্বিগুণ অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে ফেরত জমা দেওয়া হবে।” [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্বাচন:

হাজ্জাজের এই পত্রটি এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী ছিল যে ওয়ালিদকে অনুমতি দিতেই হলো। অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই হাজ্জাজ বড় পরিসরে যুদ্ধ...

[১] চচ নামা, পৃ. ৯১ থেকে ৯৬; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪১৯, ৪২০।

প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। রাজধানী থেকে ছয় হাজার রাজকীয় সৈন্যের সাহায্য চাইলেন এবং এই অভিযানের নেতৃত্বের জন্য বসরার প্রাক্তন গভর্নর কাসিম বিন মুহাম্মদের তরুণ পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নির্বাচন করলেন, যিনি সেই সময় পারস্যের সীমান্তে মোতায়ন ছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর যুদ্ধের প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি তখন থেকেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। ৮৩ হিজরিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে পারস্যের গভর্নর বানিয়ে কুর্দি বিদ্রোহীদের দমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম বিদ্রোহীদের নির্মূল করে দিয়েছিলেন। [১]

এত অল্প বয়সে এত বড় সাফল্যের ওপর একজন কবি নিম্নোক্ত কবিতাটি বলেছিলেন:

নিশ্চয়ই বীরত্ব, উদারতা ও দানশীলতা মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

তিনি সতেরো বছর বয়সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন, আহা! জন্মের পর কত দ্রুতই না এই নেতৃত্ব অর্জিত হলো। [২]

“নিঃসন্দেহে বীরত্ব, উদারতা ও মহানুভবতা কাসিম বিন মুহাম্মদের পুত্র মুহাম্মদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তিনি সতেরো বছর বয়সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। চমৎকার! জন্মের পর এই নেতৃত্ব কত দ্রুতই না অর্জিত হলো।”

সিন্ধু অভিযানের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বড় বড় অভিজ্ঞ আমীরদের পরিবর্তে তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে এই কারণে বেছে নিয়েছিলেন যে, এই অভিযানের জন্য অসাধারণ আনুগত্য, দুঃসাহসিক মনোভাব এবং কেন্দ্রের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের প্রয়োজন ছিল; কারণ অভিযানের পুরো নকশা হাজ্জাজের মাথায় ছিল। তাঁর এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি তাঁর ইশারা বুঝবেন এবং দ্বিধাহীনভাবে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বনু সাকিফ গোত্রের এই উজ্জ্বল রত্নের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। [৩]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স..... একটি ভুল ধারণার নিরসন:

সাধারণ ধারণা হলো সিন্ধু আক্রমণের সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স ছিল ১৭ বছর। কিন্তু এই কথাটি সঠিক নয়। গবেষণালব্ধ তথ্য হলো সেই সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স ছিল ২৭ বছর। [৪]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৮; তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি, হাওয়াদিস: ৮৩ হি.।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৪/৬৩; তারিখু দিমাশক: ৬৫/১৬৪।

কিছু বর্ণনায় এই কবিতাটি এভাবে আছে: ‘সাসার রিজালা লিসাবআ আশরাতা হুজ্জাতান... ওয়া লিযযাতিহি ইয যাকা ফি লা’বিশ শাগাল’ (তিনি সতেরো বছর বয়সে পুরুষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যখন তাঁর সমবয়সীরা খেলাধুলায় মগ্ন ছিল)।

[৩] চাচনামা, পৃ. ৯৪, ৯৫, ৯৬।

[৪] একটি মত অনুযায়ী ইবনে কাসিমের জন্ম ৬২ হিজরিতে। সেই হিসেবে সিন্ধু অভিযানের সময় তাঁর বয়স হয় ৩০ বছর। (আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৬/৩৩৩ টীকা সহ)। যেসব ব্যক্তিবর্গ সিন্ধু আক্রমণের সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সতেরো বছর বয়সী বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের একমাত্র দলিল হলো এই কবিতাটি। অথচ এই কবিতাটি সিন্ধু নয় বরং পারস্য অভিযানের সাথে সম্পর্কিত। ৯২ হিজরিতে সিন্ধু অভিযানের সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সতেরো বছর ধরা হলে, এর নয় বছর আগে পারস্যের গভর্নর হওয়ার সময় তাঁর বয়স ৮ বছর ধরতে হবে, যা অসম্ভব। তাই সঠিক কথা হলো পারস্যের গভর্নর হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল সতেরো বছর। যেসব কবিতায় সতেরো বছর বয়সে বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে, সেগুলো সিন্ধু নয় বরং পারস্য অভিযানের সাথে সম্পর্কিত। এই কবিতাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এতে সিন্ধু আক্রমণের কোনো উল্লেখ নেই। শুধু এই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই তরুণ সতেরো বছর বয়সে বাহিনীর কমান্ড শুরু করেছেন এবং স্পষ্টতই তিনি প্রথমবার বাহিনীর কমান্ড পারস্যে করেছিলেন। সিন্ধু যুদ্ধ ছিল তাঁর দ্বিতীয় বড় অভিযান। যুক্তিযুক্ত বিষয়ও এটাই যে, সিন্ধুর মতো কঠিন রণাঙ্গনে যেখানে অনেক নামী সেনাপতি পরাজিত হয়েছিলেন, সেখানে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিই নেতা হতেন, এমন কোনো তরুণ নয় যে প্রথমবার নেতৃত্ব দিচ্ছে। হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালিদের কাছে অনেক জোরাজুরি করে এই অভিযানের অনুমোদন নিয়েছিলেন। এটা অসম্ভব যে তিনি কোনো অনভিজ্ঞ ছেলেকে এত কঠিন যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিতেন।

সিন্ধুর ইতিহাস

দ্বিতীয় অংশ

লশকর অভিযানের ব্যবস্থাপনা এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সুস্পন্দিতা:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ লশকরকে সমস্ত সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সাথে প্রস্তুত করেন। দুর্গ ধ্বংসকারী মানজানিক এবং অগ্নিসংযোগের জন্য বারুদি মশলা থেকে শুরু করে সুই-সুতা পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস সাথে রাখেন। আরব সৈন্যরা সালুন রান্নার জন্য সিরকা ব্যবহার করত যা সিন্ধুতে দুপ্রাপ্য ছিল। সিন্ধুর গরমের কারণে বোতলে পাঠানো সিরকাও নষ্ট হয়ে যেতে পারত; তাই হাজ্জাজ সিরকাকে তুলায় ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নেন এবং সেই তুলার বস্তাগুলো এই নির্দেশনার সাথে পাঠিয়ে দেন যে, যখনই প্রয়োজন হবে, এই তুলা পানিতে ভিজিয়ে প্রয়োজনমতো সিরকা সংগ্রহ করে নেওয়া যাবে। এই সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস ছিল ‘আরুস’ নামক মানজানিক যা পাঁচশ লোক মিলে পরিচালনা করত। এর আগের ইতিহাসে এত বড় মানজানিকের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। লশকর রওনা হওয়ার আগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জুমার নামাজের সমাবেশে এক জোরালো ভাষণ দেন। এই বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য তার দ্বীনি গায়রাত ও আত্মমর্যাদার প্রতিফলন ছিল। তিনি বলেন:

“যমানা পরিবর্তনশীল। যুদ্ধের উদাহরণ কুয়ের বালতির মতো, কখনো উপরে, কখনো নিচে। সময় দুধারী তলোয়ারের মতো, কখনো আমাদের পক্ষে থাকে, কখনো আমাদের বিপক্ষে। কখনো আমাদের বিজয় হয় আবার কখনো পরাজয়। ব্যর্থতায় ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করা উচিত যাতে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং দুর্ঘটনার ক্ষত শুকিয়ে যায়। আমরা আমাদের প্রকৃত নেয়ামতদাতা মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করি এবং তাঁর করুণার কাছে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি সর্বদা আমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ বজায় রাখবেন। তাঁর দয়ার দরজা কখনো বন্ধ করবেন না।

সিন্ধুর রণাঙ্গনে শহীদ হওয়া বুদাইলের কণ্ঠস্বর প্রতি মুহূর্তে আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি সব সময় এই ডাকের জবাবে লাববাইক লাববাইক বলছি। আল্লাহর কসম! যদি এই লশকর অভিযানে আমাকে পুরো ইরাকের সম্পদ এবং আমার সবকিছু উৎসর্গ করতে হয়, তবুও আমি এই অভিযান সম্পন্ন না করে শান্তিতে বসব না।”

লশকরকে বিদায় জানানোর সময় হাজ্জাজ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বলেন:

“শিরাজের পথ দিয়ে যাবে এবং মঞ্জিলে মঞ্জিলে অবস্থান করবে, যতক্ষণ না রসদপত্র তোমার কাছে পৌঁছে যায়।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের নির্দেশনা অনুযায়ী শিরাজ পৌঁছান, যখন দামেস্ক থেকে পাঠানো সামরিক সাজ-সরঞ্জাম এসে পৌঁছাল তখন তা নৌকার মাধ্যমে দেবলের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে স্থলপথে মকরানের দিকে যাত্রা করেন যা সেই যুগে উপমহাদেশের সাথে ইসলামি বিশ্বের শেষ সীমান্ত ছিল।

মকরানে কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর ইসলামের এই সাহসী তরুণ সেনাপতি মূর্তিপূজার দেশ হিন্দুস্তানে পা রাখেন। “পাঞ্জগুর” এবং “বেলা” (লাস বেলা) জয় করে লশকর দ্রুত উপকূল ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে আরেকজন মুসলিম সেনাপতি জাহম বিন জাহরও লশকরের সাথে এসে মিলিত হন। এখানে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি পত্র পান যাতে লেখা ছিল:

“যখন দেবল-এর কাছাকাছি পৌঁছাবে, তখন ছাউনি ফেলার সময় খুব সতর্ক থেকে। পরিখা খনন করে তাঁবু এলাকাকে সুরক্ষিত করো। অধিকাংশ সময় জাগ্রত থেকে। লশকরে যত লোক কুরআন মাজীদ পড়তে জানে, তারা সবাই (অবস্থানকালে) তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। বাকিরা দোয়া করতে থাকবে। মেহনত ও মুজাহাদার সাথে হুঁশিয়ার থেকে এবং গান্ধীর্ষ ও প্রশান্তি বজায় রেখো। আল্লাহর যিকির যেন সবসময় তোমাদের জিহ্বায় থাকে। আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করতে থাকো যাতে আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষক হন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অধিক পরিমাণে পাঠ করো, এই ওযীফা তোমাদের সাহায্যকারী হবে। দেবল-এর সামনে পৌঁছে যখন তাঁবু ফেলবে, তখন তার চারপাশে আঠারো ফুট চওড়া এবং নয় ফুট গভীর পরিখা খনন করো। পরিখার চারপাশে মাটির উঁচু বাঁধ তৈরি করো। শত্রুদের স্লোগান এবং অলীল গালিগালাজের প্রতিক্রিয়ায় কখনো যুদ্ধ শুরু করো না। শত্রুর মুখোমুখি হলে শান্ত থেকে। যতক্ষণ আমার নির্দেশ না পাও, যুদ্ধ শুরু করো না। যখনই আমার কোনো পত্র পাবে, তা পড়বে এবং বিস্তারিত উত্তর লিখে পাঠাবে। এই কাজটি খাওয়া-দাওয়ার চেয়েও আগে করবে। আমার নির্দেশনাবলী মেনে চলো। ইনশাআল্লাহ সফল হবে।” [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধুতে প্রথম পদক্ষেপ - দেবল অবরোধ:

৯২ হিজরির জমাদিউল আখির (৭১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ) মাস ছিল যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনী হাব নদী পার হয়ে বন্দ মুরাদের কাছ দিয়ে সিন্ধুর সীমানায় প্রবেশ করে এবং বর্তমান করাচি শহর, যা তখন কেবল একটি মরুভূমি ছিল, তা অতিক্রম করে দেবল-এ পৌঁছে যায়। সেই সময়েও সিন্ধু নদ মেহরান উপত্যকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। নদীর পশ্চিম দিকে দেবল, নিরুন (নিরুন কোট, হায়দ্রাবাদ) এবং সাদুস্তান (সিউস্তান, সেহওয়ান শরীফ) বিখ্যাত শহর ছিল। পূর্ব দিকে সান্দড়া (সান্দড়), বেট (ভাট শাহ), জাহাম (জাম সাহেব), জিউর (খায়েরপুর), কাজি কাট (কোট ডিউজি), রাওয়ার (রানি পুর) এবং ‘আরুর’ (অরোর)-এর মতো শহর ও দুর্গ ছিল। এই সবকিছুর চেয়ে বড় ছিল ব্রাহ্মণাবাদ (শাহদাদপুরের কাছে), যা ছিল রাজা দাহিরের রাজধানী।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার বাহিনীর সাথে জুমার দিনে দেবল-এর সামনে ঘোড়া থেকে নামেন। সফরের ব্যবস্থাপনা এতটাই সুসংগঠিত ছিল যে, একই দিনে সমুদ্রপথে নৌবাহিনীও রসদপত্র এবং দুর্গ ধ্বংসকারী যন্ত্রপাতির সাথে পৌঁছে যায়।

দেবল-এর স্থানীয় উচ্চারণ ছিল “দেউল”, যা “দেবতার উপাসনালয়” বা “মন্দির”-এর সমার্থক শব্দ। এখানকার মন্দিরটি খুব বিখ্যাত ছিল যার গম্বুজ ষাট ফুট উঁচু ছিল। মন্দিরে কেবল পূজারীদের সংখ্যাই ছিল সাতশ পর্যন্ত। দেবল-এর দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে সিন্ধু নদ ছিল। শহরের সামনে এসে সিন্ধু নদের পানি আরব সাগরে মিশে যেত। এখানে খালাস করা বাণিজ্যিক মালামাল নৌকার মাধ্যমে সিন্ধু নদের পথে সিন্ধুর দূরদূরান্তের শহরগুলোতে সহজেই পৌঁছে যেত; তাই দেবল-এর বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। মুসলমানরা দীর্ঘ অবরোধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল; তাই সৈন্যরা ছাউনি ফেলতে শুরু করে। রাত নাগাদ তাঁবুর শহর গড়ে ওঠে যেখানে প্রতিটি দলের সদস্যরা আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা ও পতাকাসহ অবস্থান করছিল। ক্যাম্পের চারপাশে পরিখা খনন করা হয়। পরিখার সামনে মাটির বাঁধ তৈরি করে তাতে পতাকা স্থাপন করা হয়।

[১] চচ নামা, পৃ. ৯৭ থেকে ১০৪; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২০

সেখানে বর্শাধারীরা দাঁড়িয়ে গেল যাতে শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

ক্যাম্প প্রস্তুত হতেই মুহাম্মদ বিন কাসিম মানজানিকগুলো স্থাপন করালেন এবং শহরের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দিলেন। শহরবাসীরা অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে থাকল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরায় বসে এই রণাঙ্গনের প্রতিটি খবরের খোঁজ রাখতেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি তৃতীয় দিনে মুহাম্মদ বিন কাসিম সমস্ত পরিস্থিতি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। হাজ্জাজ সেগুলো পর্যালোচনা করে নতুন নির্দেশনা পাঠাতেন। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু দেবল-এর প্রাচীর নতি স্বীকার করল না।

শহরের মাঝখানে মন্দিরের আকাশচুম্বী গম্বুজটি মাইলের পর মাইল দূর থেকে দেখা যেত, যার ওপর একটি লাল রঙের পতাকা উড়ছিল। শহরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ এই পতাকা না পড়বে ততক্ষণ তাদের পরাজয় হবে না। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সংবাদ পেয়ে মানজানিক চালকদের মন্দিরের পতাকাটি ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা বেশ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করল কিন্তু পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল। ‘আরুস’ নামক মানজানিকটিও এই চেষ্টায় ব্যর্থ হলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজকে বিস্তারিতভাবে এই পরিস্থিতি লিখে পাঠালেন। তিনি মানচিত্র পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলেন যে, মানজানিক দিয়ে সঠিক লক্ষ্য স্থির করা যাচ্ছে না। তিনি জবাবে লিখলেন:

“আরুসকে সামান্য পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দাও এবং একে এক ডিগ্রি কোণ কমিয়ে লক্ষ্যভেদ করো।”

এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ওপর কতটা দক্ষতা ছিল। [১]

দেবল জয় হলো:

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই বিন্যাস অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করে পাথর নিক্ষেপ করলে ‘আরুস’-এর পাথর সরাসরি মন্দিরের গম্বুজে গিয়ে আঘাত করল। গম্বুজ ভেঙে পড়া এবং পতাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই দেবলের মূর্তিপূজারীদের পরাজয় নিশ্চিত মনে হলো। কিন্তু তাদের ধারণা অনুযায়ী দেবতাদের ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ফলে তারা শহরের দরজা খুলে ময়দানে চলে এল। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সময়েরই অপেক্ষায় ছিলেন। মুসলিম তলোয়ারবাজরা তাঁর সংকেত পাওয়া মাত্রই সারিবদ্ধ হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হিন্দুরা লাশের স্তুপ ফেলে রেখে শহরের দিকে পালাল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। তবে ইসলামী বাহিনী ধাওয়া করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে প্রাচীর উপকানোর দক্ষ সৈন্যরা হুক লাগিয়ে দড়ির সাহায্যে ওপরে উঠে গেল এবং প্রাচীরের ওপর হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হলো। শীঘ্রই এখান থেকেও শত্রুদের নির্মূল করা হলো। কুফার এক নাগরিক, যার সম্পর্ক ছিল বনু মুরাদ গোত্রের সাথে, সিন্ধুর এই প্রথম বিজিত শহরে ইসলামী পতাকা উত্তোলনের গৌরব অর্জন করেন। দেবলের পলায়নকারী সৈন্যরা রাজা দাহিরের কাছে চলে গেল এবং তাকে পরাজয়ের সংবাদ শোনা। মুহাম্মদ বিন কাসিম শহর দখলের পর স্থানীয় লোকদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন। চার হাজার মুসলমানকে এখানে পুনর্বাসিত করে উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম জনবসতির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এই অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করান।

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২০, ৪২১; তারিখ ইয়াকুবি, পৃ. ২২৬; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/১৮, ১৯। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবনুল আসির সমস্ত ঐতিহাসিকদের বিপরীতে সিন্ধু বিজয়কে ৮৯ হিজরির অধীনে বর্ণনা করেছেন যা সঠিক নয়।

সাধারণ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য দেবল বিজয়ও একটি বড় সাফল্য ছিল, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আসল লক্ষ্য ছিল রাজা দাহিরকে দমন করা, যে মুসলিম নারীদের বন্দী করেছিল। [১]

ওয়াদিয়ে মেহরানের পূর্ব অংশ বিজয়:

রাজা তখন তার কেন্দ্র ‘আরোর’-এ ছিল। এই স্থানটি সেই সময়ে সিন্ধুর রাজধানী হওয়ার কারণে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। সুক্কুর জেলার রোহড়ির দক্ষিণ-পূর্বে এখনও ‘আরোর’-এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে সিন্ধু নদের পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে দখল মজবুত করা জরুরি মনে করেছিলেন যাতে নদী পার হয়ে আরোর আক্রমণের সময় পেছন থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে। ফলে ইসলামী বাহিনী নিরুন্ন কোট (হায়দ্রাবাদ)-এর দিকে যাত্রা করল। মুসলমানদের উত্তম আচরণ ও দয়ার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; তাই এখানকার শাসক ভাদর কান সন্ধি করে নিলেন এবং শহরের দরজা খুলে দিয়ে ইসলামী বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি মুসলমানদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের সওয়ারিগুলোর জন্য ঘাসের ব্যবস্থাও করলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে অগ্রসর হতে হতে যখন নদীর ঢেউ পার হলেন, তখন সামনে ওয়াদিয়ে মেহরানের উর্বর এলাকা ছিল যেখানে সাম্মুন সরদারদের জায়গির ছিল। এই লোকেরা রাজা দাহিরের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল; তাই তারা ইসলামী বাহিনীকে স্বাগত জানাল এবং খরাজ প্রদানে সম্মত হলো। ইসলামী বাহিনী ওয়াদিয়ে মেহরানের যেখানেই পৌঁছাল, মানুষ অনুগত হতে লাগল। এমনকি বাহিনী সিউস্তান (সেহওয়ান) পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

এখানকার রাজা ‘বাজহরা’ তার প্রজাদের এবং আমিরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইসলামী বাহিনী পৌঁছালে সে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল। এই সময়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে বার্তা পাঠালেন:

“আমরা সবাই রাজাকে ঘৃণা করি। এই যুদ্ধের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। রাজার কাছে সৈন্যও বেশি নেই।”

এই বার্তায় মুসলমানদের সাহস আরও বেড়ে গেল; অবরোধ আরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকল। অবশেষে বাজহরা হতাশ হয়ে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে রাজা দাহিরের কাছে পালিয়ে গেল, শহরবাসী দরজা খুলে দিয়ে মুসলমানদের স্বাগত জানাল।

মনে হয় যে সেহওয়ান এবং এর আশেপাশের শহরগুলো জয় করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিমের ইচ্ছা ছিল সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর ধরে লাড়কানা বা শিকারপুর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া এবং রোহড়ির কাছ থেকে নদী পার হয়ে রাজধানী আরোর আক্রমণ করা, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে মুসলমানরা যেন অবিলম্বে ফিরে আসে এবং নিরুন্ন কোট (হায়দ্রাবাদ) থেকে ভিট (ভিট শাহ) পর্যন্ত প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করে নদী পার হয়। [২]

সিন্ধু নদ পার হওয়া:

মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্দেশ পালন করলেন। তিনি নিরুন্ন (হায়দ্রাবাদ) ফিরে এলেন এবং কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর ভিটের দিকে রওনা হলেন।

[১] চচ নামা, পৃ. ১০৭ থেকে ১১০; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২১; তারিখ ইয়াকুবি, পৃ. ২২৬

[২] চচ নামা, পৃ. ১১১ থেকে ১২২

হয়ে গেলেন। এই সময়ে রাজা দাহির মুহাম্মদ বিন কাসিমের দ্রুতগত বিজয়ের খবর পাচ্ছিলেন। বন্দি মুসলিম নারীরা তখনও অরোর দুর্গে তার অধীনে ছিল। দাহিরের মধ্যে যদি বুদ্ধি বলতে কিছু থাকত, তবে সে এই নারীদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে মুজাহিদ্দীনে ইসলামের ধারালো তলোয়ার থেকে বাঁচার চেষ্টা করত। কিন্তু সে ছিল চরম পর্যায়ে একগুঁয়ে ও অহংকারী মানুষ। নিজের শক্তির ওপর তার অন্ধ বিশ্বাস ছিল। যখন সে দেখল যে তার অধীনস্থ সকল রাজারা মুসলমানদের রুখতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে নিজের সমস্ত সৈন্য একত্রিত করে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে অরোর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রওনা হলো এবং কোট ডিজির বিশাল দুর্গে আস্তানা গেড়ে সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশকে সিন্ধু নদের দিকে পাঠিয়ে দিল যাতে মুসলমানদের নদী পার হওয়া থেকে ঠেকানো যায়।

এদিকে ইসলামের বাহিনী আক্রমণ করতে করতে ভেইট (ভালিয়া, ভাট শাহ)-এর সামনে পৌঁছে গিয়েছিল যা নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল। হাজ্জাজের নির্দেশ অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম সমস্ত সৈন্য ও তাঁর সিন্ধু নদ পার করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু এই সময়ে রাজা দাহিরের বাহিনী নদীর অপর প্রান্তে দৃশ্যমান হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশনার হিকমত এখন প্রকাশ পেল; কারণ মুসলমানরা যদি সেই সময় সেহওয়ানে থাকত তবে তারা পেছন থেকে ঘেরাও হয়ে যেত এবং তাদের ফিরে আসার কোনো পথ থাকত না।

ইসলামের বাহিনী সিন্ধু নদ পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলে উত্তাল ঢেউয়ের সাথে সাথে অপর তীরে মোতায়েন দাহিরের তীরন্দাজ বাহিনীও তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

সেই যুগে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার সেতু তৈরি করা হতো। নৌকাগুলোকে মজবুত রশির মাধ্যমে একে অপরের সাথে বেঁধে নদীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে দেওয়া হতো যার ওপর দিয়ে সেনাবাহিনী পার হয়ে যেত। কিন্তু এখানে মুসলমানরা যখনই নৌকার সেতু তৈরির চেষ্টা করত, তীরের বৃষ্টি তাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম নৌকাগুলোকে নদীর মাঝখানে বাঁধার পরিবর্তে অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নদীর প্রস্থের সঠিক পরিমাপ করে নদীর এই তীরেই নৌকাগুলোর একটি দীর্ঘ শিকল তৈরি করলেন। এই শিকলের এক প্রান্ত একটি মজবুত খুঁটির সাথে বেঁধে বাকি অংশ নদীর স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পানির স্রোত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৌকাগুলোর এই সেতুকে ঠেলে অপর তীরে নিয়ে গেল। নৌকায় বসা সৈন্যরা ঢালের মাধ্যমে নিজেদের শত্রুর তীর থেকে রক্ষা করতে থাকল এবং অপর তীরে পৌঁছানো মাত্রই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত্রুকে উপকূল থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর নৌকার সেতুটিকে অপর প্রান্তে বেঁধে দেওয়া হলো। এরপর সমস্ত বাহিনী অনায়াসে নদী পার হয়ে এল। [১]

রাজা দাহিরের পিছু হটে যাওয়া সৈন্যরা জাম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। এখন ভেইট শহর সামনে ছিল। এখানকার রাজা ‘মোকা’ রাজা দাহিরের অধীনস্থ ছিল। এই সমস্ত লোক রাজা দাহিরের জুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম আলোচনার মাধ্যমে ‘রাজা মোকা’কে আনুগত্য স্বীকারে রাজি করানোর চেষ্টা করলে সে জবাবে লিখল: “যদি আমি যুদ্ধ না করে অস্ত্র সমর্পণ করি তবে তা আমার পরিবারের জন্য অপমানের কারণ হবে। ভালো হবে যে আমি একটি ছোট দলের...”

[১] চচ নামা, আলী বিন হামিদ আল-কুফি, পৃ. ১২৪ থেকে ১৩৩; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২১।

“...সাথে সাজ্জড়া (সাজ্জড়)-এর দিকে চলে যাই এবং আপনি এই সময়ের মধ্যে এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিন।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সাজ্জড়ার রাজা মোকা (সাজ্জড়) রওনা হলেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনাপতি হানানা বিন হানজালা পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে অনুসরণ করে গ্রেফতার করে নিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা মোকার সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করলেন; তাকে এক লক্ষ দিরহাম নগদ দিলেন এবং সেই সাথে এই ফরমান লিখে দিলেন যে, ভীট-এর শাসনভার বংশপরম্পরায় তারই কাছে থাকবে। [১]

রাজা দাহিরের সাথে ফয়সালাকারী যুদ্ধ:

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে জেওয়ার (খাইরপুর) দখল করে সামনে অগ্রসর হলেন যেখানে রাজা দাহির তার বিশাল বাহিনী নিয়ে চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তার অধীনে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। প্রথম সারিতে ছিল ভয়ংকর হাতিদের একটি দল। দাহির নিজে বাহিনীর পেছনে একটি সাদা হাতির ওপর সওয়ার ছিলেন। তার চারপাশে দাসীদের একটি দল ছিল যারা তাকে ময়ূরপাখা দিয়ে বাতাস করছিল। ১লা রমজান ৯২ হিজরিতে যুদ্ধ শুরু হয়, যা ছিল সিন্ধুর তপ্ত ভূমিতে জুনের সবচেয়ে উত্তপ্ত মাস। উভয় বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দশ দিন পর্যন্ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোনো ফয়সালা হতে পারছিল না।

অবশেষে ১০ই রমজান ৯২ হিজরিতে ফয়সালাকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় পক্ষই তাদের জানপ্রাণ দিয়ে লড়েছিল। হাতিদের দলটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছিল। রাজা দাহির নিজে পাহাড়ের মতো বিশাল এক হাতির ওপর সওয়ার ছিলেন। তার কাছে একটি ধারালো চক্র ছিল যা ঘুরিয়ে তিনি কাছে আসা প্রত্যেকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন। এই সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাতিদের তাড়ানোর জন্য অগ্নি-নিষ্ক্ষেপক অস্ত্রের সাহায্য নিলেন। আগুনের শিখা বর্ষিত হতে দেখে হাতিগুলো ভড়কে গেল এবং নিজেদের বাহিনীকেই পদদলিত করে পালাতে লাগল। রাজা দাহিরের হাতিটিও উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করল এবং তার শিবিরের পেছনে অবস্থিত নদীতে গিয়ে নামল। যখন আগুনের শিখা গায়ে লাগল, তখন সে নিজেকে বাঁচাতে পানিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। মাহত অনেক কষ্টে তাকে ওঠাল কিন্তু হাতিটি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ না করে দুর্গের দিকে পালাতে থাকল।

রাজা দাহির হাতি থেকে নেমে পড়লেন এবং পদব্রজে যুদ্ধ করতে থাকলেন কিন্তু তার সৈন্যদের পা উপড়ে যাচ্ছিল। হাতিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর মুসলমানরা এগিয়ে এসে আক্রমণ করছিল। রাজা দাহির তাদের নাগাল থেকে বাঁচতে পারলেন না। কাসিম বিন সালাবা নামক একজন আরব মুজাহিদ তার দেহরক্ষীদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং নিজের তলোয়ার রাজা দাহিরের দেহের এপার-ওপার করে দিলেন। রাজা দাহির সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন। কাসিম বিন সালাবা একজন সুবক্তা কবি ছিলেন। তিনি নিজের এই বীরত্বপূর্ণ কাজে গর্ব করে এই কবিতাগুলো পাঠ করেন যা ইতিহাসের কিতাবগুলোতে সংরক্ষিত আছে এবং রাজা দাহিরের শিক্ষণীয় মৃত্যুর একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে:

অশ্বারোহী বাহিনী দাহিরের যুদ্ধের দিন এবং বর্ষাগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদও (সাক্ষ্য দিচ্ছেন)।

নিশ্চয়ই আমি পিছু না হটে শত্রুবাহিনীকে বিদীর্ণ করেছি, যতক্ষণ না আমি আমার ধারালো তলোয়ার দিয়ে তাদের প্রধানকে ধরাশায়ী করেছি।

অতঃপর আমি তাকে ধূলিঝড়ের নিচে ভুলুষ্ঠিত অবস্থায় ফেলে এসেছি, যার দুই গাল ছিল ধূলিমলিন এবং কোনো বালিশ ছিল না।

[১] চচ নামা, পৃ. ১৩৩ থেকে ১৩৬।

“অশ্বারোহীরাও সাক্ষী এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদও, যে দাহিরের সাথে যুদ্ধের দিন আমি ভিড় চিরে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং তাদের বাদশাহর মাথায় হিন্দুস্তানি তলোয়ার উঁচিয়েছিলাম, আমি তাকে ধুলোবালির পর্দার আড়ালে এমনভাবে ছেড়ে এসেছিলাম যে সে কোনো বালিশ ছাড়াই ধুলো ও রক্তে পড়ে ছিল এবং তার গাল মাটিতে মাখামাখি ছিল।” [১]

রাজার মৃত্যুর পর তার সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যায়, তবুও তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানভাবে লড়াই চালিয়ে যায়। ততক্ষণে হাজার হাজার লাশ পড়ে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বয়ে যায়। সূর্য ডোবার আগেই দাহিরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং সিন্ধুতে ইসলামী শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল।

রাজা দাহিরের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী রাওয়ার (রানি পুর) দুর্গে ছিল যেখানে রাজপরিবারের এক রানি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম দেরি না করে আক্রমণ চালিয়ে রাওয়ার অবরোধ করেন এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দুর্গটি জয় করেন। মুসলমানদের দুর্গে প্রবেশ করতে দেখে রানি তার দাসীদেরসহ নিজেকে আগুনের কুণ্ডলীতে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেন। [২]

আরব নারীদের উদ্ধার:

এই একের পর এক বিজয়ের পরেও মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন; কারণ বন্দি আরব নারীদের তখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিকে রাজা দাহিরের উজির “বসা কর” কোনোভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সন্তুষ্টি চাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই আরব নারীদের মুক্তই করেননি বরং নিজে তাদের নিয়ে মুসলমানদের কাছে আসেন। এতে মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত খুশি হন; কারণ এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই কৃতিত্বের জন্য বসা কর-কে এত সম্মান দেন যে তাকে আগের মতোই নিজের সরকারের উজির বানিয়ে দেন এবং সিন্ধুবাসীদের প্রতিটি বিষয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। [৩]

ব্রাহ্মণাবাদের বিজয়:

রাজা দাহিরের ছেলে জয় সিংহ এখনো কোনো না কোনোভাবে নিজের শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণাবাদকে কেন্দ্র বানিয়ে নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঠিক করার পর ৯৪ হিজরিতে ব্রাহ্মণাবাদের দিকে রওনা হন। জয় সিংহ অবরোধের মধ্যে পড়লে প্রাণের ঝুঁকি অনুভব করেন; তাই তিনি শহর থেকে বেরিয়ে যান। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদ ঘিরে ফেলে এবং অবরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। শহরের প্রাচীর ছিল অত্যন্ত মজবুত,

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/১৯; চচ নামা, পৃ. ১৫৮ থেকে ১৮১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২২; তারিখ-ই-সিন্ধু, মির মাসুম শাহ ভাক্কারি, পৃ. ২৭

[২] চচ নামা, পৃ. ১৯২ থেকে ১৯৫; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২২; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৭৬

চচ নামা অনুযায়ী আত্মহত্যা করা নারী ছিলেন দাহিরের বোন মাই বাই, অন্যদিকে বালায়ুরির মতে তিনি ছিলেন তার স্ত্রী। উভয় বর্ণনা মেলালে প্রমাণিত হয় যে, ইনি সেই বোনই ছিলেন যাকে দাহির স্ত্রী বানিয়ে রেখেছিলেন। হতে পারে যে গ্রেফতারি থেকে বাঁচতে মাই বাই এমনটি করেছিলেন এবং এটিও সম্ভব যে তিনি হিন্দুদের “সতী” প্রথা পালন করেছিলেন যাতে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী আত্মহত্যা করে।

হিন্দুরা মৃতদেহকে কুণ্ডলীতে পোড়ায় যাকে “চিতা” বলা হয়। “সতী” প্রথা অনুযায়ী স্বামীর লাশের সাথে নারীও সেই “চিতা”য় পুড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এমন নারীকে হিন্দুরা পবিত্র মনে করে এবং তাকে “দেবী”র মর্যাদা দেয় (নাউয়ুবিল্লাহ)।

[৩] চচ নামা, পৃ. ১৯৯, ২০০; ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ১৪১ থেকে ১৪৩; ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২২; তারিখ-ই-ইয়াকুবি, পৃ. ২২৬

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধের কোনো ফয়সালা হতে পারল না। এই সময়ে জয় সিংহ একটি দল গঠন করে মুসলমানদের রসদ বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণে তাকে চরম আঘাত সহিতে হয় এবং তিনি সিন্ধুর শাসনভার ভুলে গিয়ে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যান। ব্রাহ্মণাবাদ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। স্থানীয় বাহিনী মাঝেমাঝে বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করত এবং পুনরায় শহরে ঢুকে পড়ত। শহরের অধিবাসীরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রজাবৎসলতার কথা শুনেছিল; তাই তারা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে শহরের দরজাগুলো স্বেচ্ছায় খুলে দেয়। মুসলমানরা ধাওয়া করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। এভাবে এই শহরটিও পদানত হয়। রাজা দাহিরের এক স্ত্রী রানী লাডি এখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অনুমতি নিয়ে তাকে বিবাহ করেন। [১]

আরোর-এর যুদ্ধ:

সিন্ধুতে প্রতিরোধের এখন কেবল একটি স্ফুলিঙ্গই অবশিষ্ট ছিল। এটি ছিল রাজা দাহিরের ছোট ছেলে গোপী, যে মানুষকে এই বিশ্বাস জোগাচ্ছিল যে রাজা দাহির জীবিত আছেন এবং ভারতে নতুন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন। এই অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে হাজার হাজার সৈন্য তার চারপাশে সমবেত হয়, যাদের সাহায্যে সে রাজধানী আরোর-এ যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সংবাদ পেয়ে সরাসরি আরোর অভিমুখে রওনা হন। তার নির্দেশে রানী লাডি নিজেই শহরবাসীকে বিশ্বাস করান যে দাহির মারা গেছেন। শহরবাসী প্রথমে মানেনি এবং গোপীর নেতৃত্বে লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর গোপী পালিয়ে যায় এবং শহরবাসী এই শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করে যে, বুদ্ধের উপাসনালয়ের (মূর্তিঘর) কোনো ক্ষতি করা হবে না। মুহাম্মদ বিন কাসিম আলিমদের সাথে পরামর্শ করে সেই উপাসনালয়কে গির্জা ও অগ্নি উপাসনালয়ের পর্যায়ভুক্ত করেন এবং তা অক্ষত অবস্থায় রেখে দেন। [২]

মুলতান বিজয়:

উপত্যকা মেহরান ‘বাব-উল-ইসলাম’ জয় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঈমানি শক্তি তাকে আরও বিজয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। আসকান্দা (কান্ধকোট) প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিজিত হয়। এখন ইসলামি বাহিনী পাঞ্জাবের সবুজ ময়দানগুলোতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছোট শহর ও দুর্গ দ্রুত বিজিত হতে থাকে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানে পৌঁছে যান। সেই যুগে এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। এখানে রাজা গোরসিংহের শক্তির প্রভাব পুরো পাঞ্জাবে স্বীকৃত ছিল। [৩]

[১] চচনামা, পৃ. ২০৫ থেকে ২০৮; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৬, ৪২৭... ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবশেষ হায়দ্রাবাদ থেকে উত্তর-পূর্বে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানটি শাহদাদপুর থেকে ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আব্বাসীয় যুগে এর কাছেই একটি শহর আবাদ বা বসতি স্থাপন করা হয় যা মানসুরা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইয়াকুত হামাভির মতে, এটি সিন্ধু নদের দুই শাখার মাঝখানে অবস্থিত ছিল এবং মুলতান থেকে এর দূরত্ব ছিল বারো মঞ্জিল (প্রায় পৌনে তিনশ কিলোমিটার)। পরবর্তীতে মানসুরাই রাজধানী হয়। (মু'জামুল বুলদান: খণ্ড ৪, পৃ. ৪২৬, ৪২৭, মানসুরা দ্রষ্টব্য)।

[২] চচনামা, পৃ. ২২১ থেকে ২৩৪; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৬... আরোর-এর ধ্বংসাবশেষ রোহড়ি থেকে এগারো কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সিন্ধু নদের একটি শাখা ‘নারা’র পশ্চিম তীরে আজও বিদ্যমান। আরব ঐতিহাসিকরা এই শহরকে সাধারণত ‘আলুর’ বলে উল্লেখ করেছেন।

[৩] এখানে চচনামায় ‘আব-ই-বিয়াস’ (বিয়াস নদী) অতিক্রম করার কথা উল্লেখ আছে। সিন্ধুর পথে মুলতানে বিয়াস নদী কোথাও পড়ে না। সম্ভবত এটি সিন্ধুরই কোনো খাল ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মূলতানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই জোরালো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। গোর সিংহের বাহিনীর কাছে দুর্গের সুরক্ষা ছিল এবং রসদও প্রচুর ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের কাছে খাদ্যের মজুদ কম ছিল; তাই এই অভিযান অত্যন্ত কঠিন প্রমাণিত হলো। অবরোধ দীর্ঘায়িত হলে মুসলমানরা সওয়ারির পশু জবাই করে খেতে বাধ্য হলো। অবস্থা এমন হয়েছিল যে বাহিনী ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হতো, এমন সময় হঠাৎ একটি তথ্য যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। একজন স্থানীয় ব্যক্তি মুসলমানদেরকে প্রাচীরের দুর্বল অংশগুলোর কথা জানিয়ে দিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম অবিলম্বে মানজানিক দিয়ে সেই অংশগুলোতে পাথর বর্ষণ শুরু করালেন। অবশেষে প্রাচীর ভেঙে গেল। গোর সিংহের সৈন্যরা বাধ্য হয়ে খোলা ময়দানে বেরিয়ে এল। এখানে তারা মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারল না এবং পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বিজয়ের পর যখন মূলতানের বুদ্ধ মন্দিরের পর্যালোচনা করা হলো, তখন সেখানে অঢেল সম্পদ পাওয়া গেল। মন্দিরের কোষাগারটি ২৭ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫ ফুট প্রশস্ত একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত ছিল যা স্বর্ণে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। ওজনের দিক থেকে এই স্বর্ণ ছিল কয়েকশ মণ [১]।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই অভিযানে ছয় কোটি দিরহাম ব্যয় করেছিলেন। যখন গনিমতের মালের সাথে রাজা দাহিরের মাথা তার সামনে রাখা হলো, তখন তিনি গনিমতের মাল গণনা করালেন, যা বারো কোটি দিরহামের সমান বের হলো। হাজ্জাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “আমরা আমাদের প্রতিশোধও নিয়ে নিলাম এবং দাহিরের মাথাও। আর যতটুকু ব্যয় করেছি আল্লাহ তার চেয়ে দ্বিগুণ দান করেছেন।” [২]

মুহাম্মদ বিন কাসিম ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মূলতানের পর নেহালপুর বিজিত হলো, তারপর ইসলামী বাহিনী মধ্য ভারতে আক্রমণ চালিয়ে কনৌজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল [৩]। এরই মধ্যে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু হলো এবং নতুন খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে পদচ্যুত করলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সদাচরণ, দয়া ও মহানুভবতা স্থানীয় মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল; তাই এখান থেকে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল।

[১] চচ নামা, পৃ. ২৩৬ থেকে ২৪১; ফুতুহুল বুলদান: ৪২৩; তারিখ-ই-ইয়াকুবি, খণ্ড ২, পৃ. ২২৬।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০/৪; সন ৮৯ হিজরি।

টীকা: (১) সিন্ধুর এই বিজয়সমূহের অধিকাংশ বিবরণ আলী বিন হামিদ কুফির সংকলিত “চচ নামা”-এর ফারসি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা মূলত মুহাম্মদ বিন কাসিমের চাচাতো ভাই দাউদ পোতার টীকা সহ হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। চচ নামা এই বিষয়ে প্রাচীনতম ও নির্ভরযোগ্য উৎস এবং এর এই সংস্করণটিই সবচেয়ে ভালো ও সঠিক।

(২) সিন্ধু বিজয়ের প্রসঙ্গে যেসব স্থানের নাম এসেছে, সেগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে। তবে ব্রাহ্মণাবাদ ও আরোর ছাড়া অন্য কোনো স্থানের ব্যাপারে ঐকমত্য পাওয়া যায় না। দেবল সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি মত হলো দেবল সেই জায়গা যেখানে এখন করাচির পোর্ট মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্মিত হয়েছে। ডক্টর উমর দাউদ পোতা অনেকগুলো সূত্র একত্রিত করে এই মত দিয়েছেন যে দেবল হলো লাহিড়ী বন্দরের পুরনো নাম। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বই “ভান্সোর”-এর তথ্য অনুযায়ী দেবল আসলে “ভান্সোর”-এরই অন্য নাম। ভান্সোরের ধ্বংসাবশেষ করাচি থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদ যাওয়ার শাহরাহ-ই-লাহোরের তীরে অবস্থিত, যেখানে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও বিদ্যমান। সিন্ধু নদ একটি সরু খাড়ির আকারে এখানে পৌঁছাত। যদি ভান্সোরের ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত হয় (যা বর্তমানে নদী থেকে অনেক দূরে), তবে এটি সম্ভব যে ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তবে এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে ভান্সোরকে কেন শহর হিসেবে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? বাইত কোহ বাহাওয়ালপুরের উপকণ্ঠেও বলা হয়েছে। মানজম (যা জওহরীর মতে জাম সাহেব) কে বুম্পিরও বলা হয়েছে। কেউ কেউ রাওড়কে বর্তমান হায়দ্রাবাদ এবং নিরুন কোটকে হায়দ্রাবাদ থেকে কিছু দূরে “বরক” নামক স্থানে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা এই সমস্ত মতভেদ সামনে রেখে সিন্ধুর মানচিত্র তৈরি করেছি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের গতিপথ এবং ভৌগোলিক তথ্যের আলোকে যে ধারণা করা হয়েছে, তাতে স্থানের নামকরণে ভুলের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে।

[৩] তারিখ-ই-সিন্ধু আজ মীর মাসুম শাহ ভাক্কারি, পৃ. ২৯।

সিন্ধুর অধিকাংশ লোক যদিও তাদের মূর্তিপূজায় অটল ছিল, তবুও তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ভালোবাসত। এই দয়ালু যুবকের বিদায়ের সময় তারা অঝোরে কেঁদেছিল। অনেক মূর্তিপূজারী মন্দিরে সম্মানের সাথে তার মূর্তি তৈরি করে রেখেছিল। [১] এই কথাটি সেই সব লোকদের খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট যারা মুসলিম বিজয়ীদের জালিম, রক্তপিপাসু এবং লুণ্ঠনকারী হিসেবে প্রচার করে। যদি মুসলিম বিজয়ীরা অমুসলিমদের ওপর জুলুম ও জবরদস্তি করত, তবে স্থানীয় লোকেরা কখনোই তাদের প্রতি এভাবে ভক্তি প্রকাশ করত না।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ২৫ রমজান ৯৫ হিজরিতে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৭৩ হিজরিতে আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে হিজাজের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ২২ বছর পর্যন্ত তিনি সরকারের স্তম্ভ হিসেবে ছিলেন। [২] তিনি অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধিমান এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, বনু উমাইয়া সরকারের ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে তার অনেক বড় ভূমিকা ছিল। সিন্ধু এবং মধ্য এশিয়ার বিজয়গুলোও তার সংকল্প ও পরিকল্পনারই ফল ছিল। কুরআন মাজীদের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং তিনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। [৩]

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) তার জুলুমের কারণে তাকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু সাথে সাথে এও বলতেন: “কুরআন মাজীদের প্রতি তার নিমগ্নতা দেখে আমার ঈর্ষা হয়।” [৪]

পুরো ইরাকের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তার জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তার মৃত্যুর সময় আসবাবপত্রের মধ্যে একটি কুরআন মাজীদের কপি, একটি তলোয়ার, একটি ঘোড়া এবং একশ (১০০) দিরহাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই দিরহামগুলোর ব্যাপারে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যে, এর এক-তৃতীয়াংশ দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ দেশের বাইরে জিহাদে ব্যবহার করা হোক। [৫]

সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর হত্যাকাণ্ড:

মৃত্যুর কিছুকাল আগে হাজ্জাজ বিখ্যাত তাবেরী সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-কে হত্যা করেছিলেন। সাইদ বিন জুবায়ের বারো বছর আগে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আব্দুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহে শরিক ছিলেন; পরাজয়ের পর তিনি হিজাজে চলে যান এবং কয়েক বছর সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন। মক্কার গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি তাকে গ্রেফতার করেন এবং আব্দুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। হাজ্জাজ তাকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং জিজ্ঞেস করেন: “সাইদ! তুমি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কেন?”

তিনি বললেন: “আল্লাহ আমিরকে শান্তিতে রাখুন! আমি একজন সাধারণ মুসলমান। কখনো সঠিক কাজ করি, কখনো ভুল।”

হাজ্জাজ বললেন: “আমিরুল মুমিনীনের বায়াত কেন ভাঙলে?”

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৪। [২] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ১৬৮/২; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩০৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫১১/১২, ৫৫০।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫১১/১২, ৫৪৯। [৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৫১, ৫৫/১২। [৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৫২/১২।

নোট: হাজ্জাজের সাধারণ জীবনযাপন সম্পর্কে এই বর্ণনাগুলো দুর্বল সূত্রে বর্ণিত, তবে এগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই; কারণ কুরআন বলছে: “অতঃপর তিনি তাকে তার পাপাচার ও তার তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন” (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৮)। এর অর্থ হলো মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় গুণই রাখা হয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে উভয়টিই প্রকাশ পায়। সুতরাং হাজ্জাজের মন্দ কাজের কারণে তার উল্লিখিত গুণাবলি অস্বীকার করা গোঁড়ামি হবে এবং তার এই গুণাবলি দেখে তার জুলুমকে সত্য বলে মেনে নেওয়াও কোনোভাবেই সঠিক হবে না।

সাইদ রহ. বললেন: “ইবনে আশআস আমার কাছ থেকে তার আনুগত্যের বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং কসম দিয়েছিলেন।”

হাজ্জাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল: “তোমার কি মনে নেই? আমি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে হত্যা করার পর মক্কায় তোমাদের কাছ থেকে খলিফার আনুগত্যের বাইয়াত নিয়েছিলাম, তারপর আমি কুফার গভর্নর হয়ে এলাম, এখানেও তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত নিলাম। তোমরা আমিরুল মুমিনীনের দুই বাইয়াত ভুলে গেলে, আর ওই তাঁতির ছেলের বাইয়াত মনে রাখলে।”

হাজ্জাজ তার নাম ও মর্যাদা জানত কিন্তু তাকে ভীত করার জন্য জিজ্ঞেস করল: “বলো! তোমার নাম কী?”

বললেন: “আমার নাম সাইদ।” (অর্থাৎ সৌভাগ্যবান)

হাজ্জাজ বলল: “কার ছেলে তুমি?” সাইদ বিন জুবায়ের রহ. বললেন: “জুবায়েরের।” (জুবায়ের অর্থ সংশোধন করা হয়েছে এমন কিছু)

হাজ্জাজ বিদ্রূপ করে বলল: “না, তুমি শাকি বিন কাসীর।” (শাকি অর্থ হতভাগা, কাসীর অর্থ ভাঙাচোরা জিনিস)

সাইদ বিন জুবায়ের রহ. বললেন: “আমার মা আমার নাম তোমার চেয়ে ভালো জানতেন।”

হাজ্জাজ বলল: “তুমিও হতভাগা আর তোমার মা-ও।”

সাইদ বিন জুবায়ের রহ. ধৈর্যের সাথে বললেন: “সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিষয়টি তোমার এখতিয়ারে নেই।”

হাজ্জাজ বিগড়ে গিয়ে বলল: “দেখো! এখন আমি তোমাকে কীভাবে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিই।”

সাইদ রহ. স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “তার মানে আমার মা আমার নাম সঠিক রেখেছিলেন।” (অর্থাৎ তোমার মতো জালেমের হাতে শহীদ হয়ে আমি যদি সৌভাগ্যবান হই, তবে তাতে সন্দেহের কী আছে?)

হাজ্জাজ বলল: “তুমি কি বিদ্রোহ করে কুফরি করোনি?”

সাইদ বললেন: “না, যখন থেকে ঈমান এনেছি, কখনো কুফরি করিনি।”

হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বলল: “দেখো, এখন আমি তোমাকে জীবনের বদলে কীভাবে জাহান্নামে পাঠাই।”

সাইদ বিন জুবায়ের রহ. বললেন: “যদি আমি জানতাম যে মৃত্যু তোমার এখতিয়ারে, তবে তোমাকেই মাবুদ বানিয়ে নিতাম। কিন্তু আমার আকিদা হলো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।”

হাজ্জাজ ছটফট করে বলল: “বলো, আমি তোমাকে কীভাবে হত্যা করব?”

সাইদ রহ. প্রশান্তির সাথে বললেন: “যেভাবে নিজের জন্য পছন্দ করো। সামনে তোমার জন্য বদলা অপেক্ষা করছে।”

হাজ্জাজ বলল: “তোমার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।”

সাইদ রহ. বললেন: “ধ্বংস তো তার জন্য যাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে দাখিল করা হবে।”

অবশেষে হাজ্জাজ জল্লাদকে নির্দেশ দিল যেন তাকে হত্যা করা হয়।

সাইদ বিন জুবায়ের রহ. মৃত্যুদণ্ডের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি হেসে উঠলেন।

হাজ্জাজ জানতে পেরে তাকে আবার ডেকে পাঠাল এবং জিজ্ঞেস করল: “তুমি কোন বিষয়ে হাসলে?”

সাইদ (রহ.) বললেন: “আল্লাহর ব্যাপারে তোমার ধৃষ্টতা দেখে এবং আল্লাহ তাআলার সহনশীলতার ওপর।”

হাঙ্গাজ জল্লাদকে বলল: “আমার সামনে ওর গর্দান উড়িয়ে দাও।”

সাইদ (রহ.) বললেন: “ঠিক আছে, আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করে নিই।”

এ কথা বলে তিনি সালাত আদায় করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে বললেন:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

“আমি আমার মুখমণ্ডল সেই পবিত্র সত্তার দিকে ফেরালাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

হাঙ্গাজ বলল: “ওর মুখ কিবলার দিক থেকে সরিয়ে নাসারাদের কিবলার দিকে করে দাও, যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ ও মতভেদ সৃষ্টি করেছে।”

সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর মুখ সেদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন:

﴿أَيْنَا تَوَلَّوْا فَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

“তোমরা যেকোনো মুখ ফেরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ বিদ্যমান।”

হাঙ্গাজ বিরক্ত হয়ে বলল: “ওকে উপুড় করে শুইয়ে দাও। আমরা তো কেবল বাহ্যিক বিষয়ের ওপর আমল করতে দায়বদ্ধ।”

সাইদ (রহ.) বললেন:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

“আমি তোমাদেরকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করব।”

হাঙ্গাজ নির্দেশ দিল: “হত্যা করো।”

সাইদ (রহ.) বললেন: “আমি তোমাকে এই কথার সাক্ষী বানাচ্ছি:

“أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ”

তুমি এই সাক্ষ্যটি সংরক্ষিত রেখো, কিয়ামতের দিন যখন দেখা হবে তখন আমি এটি বুঝে নেব।”

তারপর দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! আমার পরে একে আর কারো ওপর জুলুম করার সুযোগ দিও না।”

অবশেষে তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে গর্দান কেটে ফেলা হলো।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শাহাদাতের পর তাঁর শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বের হলো, হাঙ্গাজ বিস্মিত হলো। সে চিকিৎসকের কাছে এর কারণ জানতে চাইল। সে বলল:

“তাঁর অন্তর ছিল সম্পূর্ণ প্রশান্ত, অন্তরে হত্যার বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না; এ কারণে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক ছিল। সাধারণ মানুষের রক্ত মৃত্যুর ভয়ে আগেই শুকিয়ে যায়।”

সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর বয়স ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি। তিনি তাঁর সময়ের প্রথম সারির আবেদ, যাহেদ, ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলতেন: “সেই যুগে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী ছিল না।” [১] এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি ৯৫ হিজরির।

সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর হত্যার সংবাদে মুসলিম বিশ্বের ইলমি ও আধ্যাত্মিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) যখন জানতে পারলেন, তখন দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! হে জালেমদের কোমর ভেঙে দানকারী! হাজ্জাজের কোমর ভেঙে দিন।” [২]

এমনই হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই ঘটনার কয়েক দিন পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এটি ছিল পাকস্থলীর ক্যান্সার যা তাকে একেবারে জীর্ণ ও দুর্বল করে দিয়েছিল। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানতে পারলেন যে পেটে কৃমি হয়ে গেছে। রোগের প্রভাব মস্তিষ্কেও পড়েছিল এবং সে আরোলাতাবোল কথা বলতে শুরু করল। যখনই চোখ বন্ধ হতো, সে দেখত যে সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.) তার কলার ধরে জিজ্ঞেস করছেন: “আল্লাহর শত্রু! আমাকে কেন হত্যা করলে?”

হাজ্জাজ ধড়ফড় করে উঠে বসত এবং বলত: “সাইদের সাথে আমার কী লেনদেন, তাঁর সাথে আমার কী সম্পর্ক।”

এই অবস্থায় কয়েক দিন পর তার মৃত্যু ঘটে। [৩]

কালিমায়ে হক বুলন্দ করা প্রশংসনীয়:

সাইদ বিন জুবায়েরের ঘটনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে, তাঁর সশস্ত্র বিদ্রোহে শরিক হওয়া সেই যুগে একটি মতভেদপূর্ণ বিষয় ছিল, কিন্তু হাজ্জাজের সামনে কালিমায়ে হক বুলন্দ করা প্রতিটি যুগে অনুকরণীয় ছিল এবং থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের ওলামায়ে কেরাম তাঁর সত্যবাদিতার ওপর গর্ব করতে পারেন। শরীয়ত দুশ্চরিত্র ও জালেম শাসকদের সংশোধনের জন্য ওলামাদের ওপরই এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, তাঁরা সত্য কথা বলবেন এবং সঠিক মাসআলা বর্ণনা করবেন। এটি ভিন্ন কথা যে, কোথাও পরিস্থিতির বিচারের দাওয়াতি ও হিকমতপূর্ণ পদ্ধতি হওয়া উচিত এবং কোথাও জালেমের মাথা নত করার জন্য উচ্চকণ্ঠে হকের আওয়াজ তোলা জরুরি হয়, যেমনটি সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.) করেছিলেন। এর বিপরীতে এখানে হাজ্জাজের ভূমিকা নিঃসন্দেহে জুলুমপূর্ণ ছিল; কারণ যখন বিদ্রোহীদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তখন শরীয়ত এমন অবস্থায় বিদ্রোহী বন্দীদের হত্যা করার অনুমতি দেয় না। এখানে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল; তাই সাইদ বিন জুবায়ের (রহ.) থেকে কোনো বিপদ ছিল না, কিন্তু হাজ্জাজ তাঁকে এবং তাঁর মতো আরও অনেক তাবয়ীকে বেছে বেছে হত্যা করিয়েছে কারণ হাজ্জাজের চিন্তাধারায় চরম উগ্রতা ছিল। সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কুফর বলত। বিদ্রোহী বন্দীদের প্রতি তার দাবি ছিল যে, তাদের তওবা তখনই কবুল হবে যখন তারা নিজেদের পদক্ষেপকে কুফর বলে স্বীকার করবে এবং কুফর থেকে তওবা করবে। যদি তারা নিজেদের মুসলিম বলত, তবে হাজ্জাজ তাদের কুফর ও ইরতিদাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে হত্যা করিয়ে দিত। এই কাজের জুলুম এবং এই মতবাদের গোমরাহি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৪৬৫ থেকে ৪৭০; আল-মিহান, পৃ. ২৩৩ থেকে ২৩৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৪৬৫ থেকে ৪৭০

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩০৭

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চরিত্রের পর্যালোচনা

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুসলিম উম্মাহর সেই ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত যারা অত্যন্ত বিতর্কিত। তার চরিত্র কিছু ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় এবং কিছু ক্ষেত্রে দুঃখজনক। বিভিন্ন বর্ণনা সামনে রাখলে মনে হয় যে, হাজ্জাজ খারেজীদের মতো ধর্মীয় চরমপন্থার শিকার ছিল। এর পাশাপাশি সে অভদ্র, নিষ্ঠুর এবং নির্বিচারে হত্যাকারীও ছিল।

বাস্তবতা হলো হাজ্জাজ একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ কিন্তু স্বৈরাচারী রাজনীতিবিদ এবং একজন খামখেয়ালী মেজাজের মানুষ ছিল। সম্ভবত একই দেহে দুইজন মানুষ বাস করত। একজন জেদী, পাষণ্ড হৃদয় এবং অহংকারী। অন্যজন আত্মমর্যাদাশীল এবং জাতীয় চেতনায় ভরপুর। তার ঘনিষ্ঠ লোকেরাও বুঝতে পারত না যে কখন কোন বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে। ইঁ্যা, তার মধ্যে দুটি বিষয় যাই হোক স্থায়ীভাবে দেখা যেত: এক, সরকারের প্রতি চরম আনুগত্য, দুই, কঠোরতা এবং একগুঁয়েমি। তার কিছু ইজতিহাদ ছিল অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। উদাহরণস্বরূপ, তার নিকট সরকারের আনুগত্য করা সালাতের মতো ফরজে আইন ছিল এবং সে এর অবাধ্যতাকারীকে অস্বীকারকারী গণ্য করত, তাকে কাফের এবং ওয়াজিবুল কতল মনে করত। তার হাতে অধিকাংশ মানুষ এই ‘ইজতিহাদ’-এরই লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। সে বিদ্রোহকে কুফর মনে করত এবং গ্রেফতারকৃত বিদ্রোহীদের নিকট দাবি করত যে তারা যেন নিজেদের কুফরের স্বীকৃতি দিয়ে তওবা করে। যে এতে ইতস্তত করত তাকে হত্যা করা হতো। [১]

হাজ্জাজের রক্তপাত:

হাজ্জাজের রক্তপাত, জুলুম এবং কঠোরতা সম্পর্কে কিছু কথা অতিরঞ্জিতও রয়েছে। তবে কিছু কথা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর সুনানে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের সনদ পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক লক্ষ বিশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর হত্যা করিয়েছিল। [২] অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে তার হাতে নিহতদের সংখ্যা গণনার বাইরে।

হাজ্জাজের জুলুম, যয়ীফ বর্ণনায়:

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম, বুজুর্গ এবং সম্মানিত নাগরিকদের ওপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুমের কথা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু বর্ণনা যয়ীফ এবং কিছু সহীহ সনদ। এটি প্রমাণিত যে, আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ৭৫ হিজরীতে মক্কার সাথে মদীনার ওয়ালীও বানিয়ে দিয়েছিলেন, এভাবে পুরো হিজাজ তার শাসনাধীনে চলে এসেছিল। কিছু বর্ণনায় আছে যে, মদীনায় এসে সে

[১] তাহযীবুত তাহযীব: ২/২১০, ত’ দাক্ষিণাত্য।

[২] হিশাম বিন হাসসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাজ্জাজ যাদেরকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছে তাদের গণনা করা হয়েছে এবং তা এক লক্ষ বিশ হাজার নিহতে পৌঁছেছে। (সুনানে তিরমিযী, হা: ২২২০, অনুচ্ছেদ: সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারীর আগমন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে)। আলবানী বলেছেন: সহীহ... এবং হিশাম বিন হাসসান হলেন বসরার মুহাদ্দিস, তিনি হাজ্জাজের যুগে যুবক ছিলেন, তিনি হাসান বসরী এবং ইবনে সীরীনের হাদীস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। যাহাবী বলেছেন: হিশাম বিন হাসসান নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত, সহীহ সিভাহর সংকলকগণ তার মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন। (তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৯/৩২০)।

শহরবাসীদের ভয় দেখাতেন এবং কঠোর আচরণ করতেন। তিনি মদিনাবাসীদের হযরত উসমান [রা.] -এর হত্যাকাণ্ডে শরিক মনে করতেন। মদিনার যে কোনো শহরবাসীর ওপর হযরত উসমান [রা.] -এর বিরোধিতার সন্দেহ হতো, তাকে লাঞ্ছিত করা হতো এবং তার শরীরে সীসা দিয়ে দাগ দেওয়া হতো যা দাসত্বের চিহ্ন ছিল।

সাহল বিন সাদ আনসারী [রা.] মদিনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন। ৯১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, হাজ্জাজ তাকে ডেকে বললেন: “তুমি আমিরুল মুমিনীন উসমান [রা.] -কে সাহায্য করোনি কেন, এর কারণ কী?” তিনি বললেন: “আমি সাহায্য করেছি।” হাজ্জাজ বললেন: “তুমি মিথ্যা বলছো।” এই বলে তিনি তার ঘাড়ে সীসা দিয়ে দাগ লাগিয়ে দিলেন। [১]

মদিনার প্রবীণ সাহাবী জাবির বিন আবদুল্লাহ [রা.] -কে (যার বয়স তখন ৯৪ বছর ছিল) ডেকে তার হাতে দাগ লাগিয়ে দেওয়া হলো। যখন হাজ্জাজ কুফায় গেলেন, তখন সেখানে রাসূলুল্লাহ [সা.] -এর খাদেম আনাস বিন মালিক [রা.] -এর ঘাড়ে দাগ লাগিয়ে দিলেন। [২]

এক বর্ণনায় আছে যে, হাজ্জাজ যখন কুফার গভর্নর হয়ে গেলেন, তখন ইবনে আশআসের বিদ্রোহের ব্যাপারে সব মানুষের সাথে আনাস বিন মালিক [রা.] -কেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলেন। যখন তিনি আসলেন, হাজ্জাজ বললেন: “আরে নোংরা লোক! প্রতিটি ফিতনায় তুমিই অগ্রগামী! কখনো আলীর সাথে, কখনো ইবনে জুবায়েরের সাথে, কখনো ইবনে আশআসের সাথে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলব, যেমন গুইসাপের মতো টেনে বের করা হয়।”

আনাস [রা.] নশ্রতার সাথে বললেন: “আল্লাহ ভালো করুন, কার কথা বলা হচ্ছে?” হাজ্জাজ বললেন: “আরে বধির! তোমাকেই বলা হচ্ছে।” আনাস [রা.] ‘ইন্না লিল্লাহ’ পাঠ করতে করতে ফিরে আসলেন এবং বললেন: “যদি আমার সন্তানদের কথা মনে না আসত, তবে আমি এমন উত্তর দিতাম যে সে চিরদিনের জন্য নির্বাক হয়ে যেত।” [৩]

বনু উমাইয়াদের সমর্থন এবং বনু হাশিমের বিরোধিতায় সে নাসিবিয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত হুসাইন [রা.] -কে সে রাসূলুল্লাহ [সা.] -এর বংশধর বলে স্বীকার করত না। একজন আলেম ইয়াহইয়া বিন ইয়ামুর [রহ.] তাকে এই বিষয়ে নিরন্তর করে দিলেন। হাজ্জাজ তার দলিল মেনে নিলেন কিন্তু সাথে সাথেই তাকে এই সত্য বলার অপরাধে দেশান্তর করে দিলেন। [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ১৯৫/৬, আনিল ওয়াকিদী। জাবির বিন আবদুল্লাহ [রা.] এই ঘটনার চার বছর পর ৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। সাহল বিন সাদ [রা.] এই ঘটনার ষোলো বছর পর ৯১ হিজরিতে প্রায় ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

[২] তারিখুত তাবারী: ১৯৫/৬।

[৩] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২৪৭/১, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া। সনদে মুকাব্বিন বিন ইয়াজিদকে ‘সারিকুল হাদিস’ বলা হয়েছে। জাফর বিন সুলাইমান সাদুক শিয়া। আলী বিন জাইদ (দাদা) হাফেজ ইবনে হাজারের মতে দুর্বল এবং দারাকুতনীর মতে ‘লাইয়িন’। হাফেজ যাহাবী তাকে ‘লাইসা বিশাই’ বলেছেন। আনাস বিন মালিক [রা.] এই ঘটনার সময় ৮৫ বছর বয়সী ছিলেন। এর ১৮ বছর পর ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী, হা: ১১৯৬৮ দুই সনদে, যার একটিতে মেহরান এবং অন্যটিতে লাইস বিন আবি সুলাইম রয়েছে। মেহরান এবং লাইস বিন আবি সুলাইম উভয়ই দুর্বল। তবে সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা হাজ্জাজের যে বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হয়, সেগুলোর আলোকে এই দুর্বল রেওয়ায়েতগুলোতে বর্ণিত জুলুমের মধ্যে কোনো বিশেষ অতিরঞ্জন অনুভূত হয় না। সহীহ রেওয়ায়েতগুলোতে হাজ্জাজের এই ধরনের কর্মকাণ্ড সামনে আসবে।

হাজ্জাজের বাড়াবাড়ির প্রমাণ, সহীহ বর্ণনা থেকে:

সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হাজ্জাজ একজন দয়াহীন এবং কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিল যে তার নীতির বিরুদ্ধে সামান্যতম কথাও সহ্য করত না এবং এর জন্য কঠোরতম শাস্তি দিত। ‘সহীহ বুখারী’তে আছে যে, লোকেরা আনাস বিন মালিক (রা.)-এর কাছে হাজ্জাজের আচরণের অভিযোগ করলে তিনি ধৈর্যের উপদেশ দেন এবং বলেন: “আমি তোমাদের নবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তোমাদের ওপর এমন কোনো যুগ আসবে না যার পরবর্তী যুগ তার চেয়ে খারাপ হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও।” [১]

সাহাবায়ে কেরাম এবং নারী সাহাবীগণও তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ ছিলেন না। যেমন তার আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে হত্যা করানো, এই কৃতিত্বের ওপর গর্ব করা, তাঁর লাশ উল্টো বুলিয়ে রাখা এবং হযরত আসমা (রা.)-এর সাথে অভদ্র আচরণ করা সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে। [২] সহীহ মুসলিমে আছে যে, সে সালামা বিন আকওয়া (রা.)-কে, যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর থেকে রাবায়ার পল্লী অঞ্চলে বসবাস করছিলেন, অত্যন্ত কঠোরভাবে ধমক দেয় এবং বলে: “আরে আকওয়ার ছেলে! তুই উল্টো পায়ে দ্বীন থেকে ফিরে গেলি, গ্রাম্য হয়ে গেলি।” তিনি নশ্রতার সাথে বললেন: “না, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে পল্লী অঞ্চলে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।” [৩]

হাজ্জাজের কিছু গুণাবলী, সহীহ বর্ণনায়:

কোনো কোনো সময় সে উপদেশের কথায় হাত গুটিয়েও নিত। সহীহ বর্ণনা রয়েছে যে, হাজ্জাজ একজন তাবেয়ী আব্বাস বিন সাহলকে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-এর প্রতি আনুগত্যের অভিযোগে প্রহার করছিল, এমন সময় তাঁর পিতা সাহল বিন সাদ (রা.), যিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাজ্জাজ প্রহার বন্ধ করে দিল। সাহল বিন সাদ (রা.) বললেন: “তুমি কি আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওসিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখবে না?” সে বলল: “রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাদের ব্যাপারে কী ওসিয়ত করেছেন?” তিনি বললেন: “এই যে, আনসারদের নেককারদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং মন্দদের ক্ষমা করে দেওয়া।” এটি শুনে হাজ্জাজ আব্বাসকে ছেড়ে দিল। [৪]

হাজ্জাজের বাগ্মিতা ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা প্রবাদতুল্য। সে মানুষকে চমৎকার ওয়াজ ও নসিহত করত। তার জুলুমের খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো মুহাদ্দিস তার খুতবার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম মুসলিম আমাশের সূত্রে হাজ্জাজের একটি খুতবার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন: “কুরআন মাজীদকে সেভাবে জমা করো যেভাবে জিবরাঈল (আ.) জমা করেছিলেন।” [৫]

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৬৮, কিতাবুল ফিতান, বাব লা ইয়াতি যামানুন ইল্লাল্লাযী বাদাছ শাররুন মিনহু।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৬৬০; মুসনাদে আহমদ, হা: ২৬৯৭৪।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৮৭; সহীহ মুসলিম, হা: ৪৯৩২, কিতাবুল ইমারাহ, বাব তাহরীমু রুজুয়িল মুহাজির ইলা ইস্তিতানি ওয়াতানিহি... এটি ৭৪ হিজরীর ঘটনা যখন হাজ্জাজের বয়স ছিল ৩৩ বছর এবং সালামা বিন আকওয়া (রা.)-এর বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। যদি তাঁর জায়গায় কোনো সাধারণ মানুষও হতো, তবুও একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা নৈতিকতা ও সৌজন্যের পরিপন্থী ছিল। হাজ্জাজের এই আচরণকে অভদ্রতা ও অহংকার ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না।

[৪] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৭২৮৭; মুসনাদে আবু ইয়লা, হা: ৭৫৩২; আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানী, হা: ৮৩৫; সহীহ মুসলিম, হা: ৩১৯৬, কিতাবুল হাজ্জ, বাব রাময়িল জামরাহ...।

[৫] তবে এর অর্থ এই নয় যে হাজ্জাজ একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিল। হাফেজ যাহাবী তার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন: “সে ছিল জালিম, স্বৈরাচারী, নাসিবী, খবীস এবং রক্তপিপাসু।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৩৪৩, আর-রিসালাহ) ইমাম নাসাঈ বলেন: সে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত নয়। (তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২/১০৭৬, বাশার)

এটিও সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, সে হজের মানাসিক (বিধি-বিধান) পালনে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর অনুসরণ করত এবং আবদুল মালিক তাকে এ বিষয়ে তাকিদ করেছিল যে, মানাসিক পালনে যেন তাদের শিক্ষার ওপর চলে। [১]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। একটি উত্তম সনদের বর্ণনায় রয়েছে যে, হাজ্জাজ আনাস (রা.)-কে ডাকল এবং নিজের সরকারি মোহর তাকে দিয়ে বলল: “আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী, তাদের আমল ও পদ্ধতি দেখেছেন। এই আমার মোহর আপনার কাছে রইল, আমি আপনার নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করব না।” তারপর সে তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া কঠোরতম শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। [২]

কিছু সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আনাস বিন মালিক (রা.) কখনো কখনো হাজ্জাজকে প্রকাশ্যে সংশোধন করে দিতেন। একবার হাজ্জাজ বক্তৃতায় ওয়ূর পদ্ধতি বলছিল। কিন্তু সে কুরআনের আয়াত ﴿فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন এক কিরাআতে পাঠ করল যা জমহুর উলামা ও ফারীগণের নিকট পরিচিত নয়। এটি শুনে আনাস বিন মালিক (রা.) বললেন: “আল্লাহ সত্যবাদী এবং হাজ্জাজ মিথ্যাবাদী।” [৩]

একবার হাজ্জাজ আনাস বিন মালিক (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কার্যকর করা কঠোরতম শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি জানালেন যে, কিছু লোক ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের উট লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মধ্যে দু’জনের চোখ গরম শলাকা দিয়ে দগ্ধ করেছিলেন, দু’জনের হাত-পা কেটে ফেলেছিলেন এবং দু’জনকে শূলে চড়িয়েছিলেন। [৪]

জানা গেল যে, হাজ্জাজ হযরত আনাস (রা.)-এর মতো সাহাবীদের সাথে এতটুকু সম্পর্ক অবশ্যই ছিল যে সে তাদের কাছে হাদীস জিজ্ঞাসা করত।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ১৬৬২, ১৬৮৩, কিতাবুল হজ, বাব কাসরুল খুতবা বি-আরাফাহ। এই দিকগুলো দেখে কিছু লোক এই ধারণা পোষণ করে যে হাজ্জাজের সাথে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু প্রথমত তো ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো এটি প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ত, ড্রামাটিক দিক থেকেও এটি অসম্ভব নয়। সহীহ বর্ণনাগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, সে শুধু ইবনে মাসউদ (রা.)-কে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষা করত না বরং তার মাসহাফ (কুরআনের পাণ্ডুলিপি) ধ্বংস করারও ইচ্ছা রাখত। এছাড়া সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় প্রমাণিত যে, সে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে হত্যা করে গর্ব করেছিল, তাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করেছিল এবং হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর বার্ষিক্য ও দুর্বলতার তোয়াক্কা না করে তার সাথে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেছিল। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কীভাবে সুধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে সে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর বার্ষিক্যের কোনো তোয়াক্কা করত? এজন্যই মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবসমূহে ‘যিকর কাযযাব সাকীফ ও মুবীরহা’ (সাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকারীর আলোচনা) শিরোনামে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ফাসেক ও রক্তপিপাসু হাজ্জাজ বিন ইউসুফকেই এর লক্ষ্যবস্তু সাব্যস্ত করেছেন।

[২] মুসনাদে আবি আওয়ানা: ৪/৮৪ সহীহ মুত্তাসিল সনদে, তাবা দারুল মারিফাহ। সনদটি হলো: ইসহাক বিন সাইয়্যার আল-নাসীবী (কিছু পাণ্ডুলিপিতে আতীক বিন সাইয়্যার আল-নাসীবী রয়েছে যা ভুল) < আমর বিন আসেম < সালাম বিন মিসকীন < আবু রাওহ < সামেত সাবিত আল-বুনানী। ইসহাক বিন সাইয়্যার আল-হাফেজ আল-সাবত। আমর বিন আসেম আল-কিলাবী মৃত্যু ২১৩ হিজরী, তিনি সদুক ও সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী। সালাম বিন মিসকীন মৃত্যু ১৬৭ হিজরী, তিনি সিকাহ। সাবিত আল-বুনানী মৃত্যু ১২৭ হিজরী। সমস্ত বর্ণনা সামনে রাখলে এটি স্পষ্ট হয় যে শুরুতে হাজ্জাজের আচরণ আনাস বিন মালিক (রা.)-এর সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল, কিন্তু পরে যখন আবদুল মালিক তাকে তার এই আচরণের জন্য ধমক দিল (যার আলোচনা আগে এসেছে), তখন সে নিজের আচরণ পরিবর্তন করে। হাজ্জাজ তাকে নিজের মোহরও দিয়েছিল, তার কাছ থেকে হাদীসও জেনেছিল এবং তারপর সেগুলোর ওপর নিজের মনগড়া ইজতিহাদের সাথে আমলও করেছিল।

[৩] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ১/১১৭, তাবা আল-ইলমিয়্যাহ।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৫৬৮৫, কিতাবুত তিব্ব, বাব আদ-দাওয়া বি-আলবানিল ইবিল।

হাজ্জাজের যালিমানা ইজতিহাদ এবং মন্দ ফয়সালাসমূহ - সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে:

কিন্তু হাজ্জাজ স্বঘোষিত মুজতাহিদ সেজে হাদীস থেকে নিজেই মাসআলা উদ্ভাবন করত। **جنانچه** হযরত আনাস (রা.) থেকে মর্মান্তিক শাস্তির রেওয়ায়েত শোনার পর সে মুসলমানদের ওপরও এই ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে। সে মিস্বরে আরোহণ করে লোকদের এই ধরনের শাস্তি দেওয়ার ওপর গর্ব প্রকাশ করত এবং বলত: “আমাদেরকে আনাস (রা.) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নাফরমানির কারণে হাত-পা কেটে দিয়েছিলেন এবং চোখ উপড়ে ফেলেছিলেন। তবে কি আমরা আল্লাহর নাফরমানির ওপর এই ধরনের শাস্তি দেব না?” [১]

কিছুকাল পর যখন আনাস বিন মালিক (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় আসলেন, তখন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) জানতে চাইলেন যে, তিনি হাজ্জাজকে কোন হাদীস শুনিয়েছিলেন। আনাস বিন মালিক (রা.) যখন সেই হাদীসটি পুনরায় শোনালেন, তখন উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বললেন: “হায়! আপনি যদি হাজ্জাজকে এই হাদীসটি না শোনাতেন তবে ভালো হতো। তারা তো ছিল সেই লোক (যাদের ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন) যারা মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং মদীনার চারণভূমিতে লুটতরাজ করেছিল। হাজ্জাজ এই হাদীসের ভিত্তিতে ঐসব লোকদের রক্ত হালাল মনে করে নিয়েছে যারা ইসলাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেনি এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও হয়নি।” [২]

হাসান বসরী (রহ.)-ও বলতেন: “হায়! আনাস (রা.) যদি হাজ্জাজকে এই হাদীসটি না শোনাতেন।” [৩]

স্বয়ং আনাস বিন মালিক (রা.) বলতেন: “আমি কোনো বিষয়ে এত লজ্জিত হইনি যতটা হাজ্জাজকে এই হাদীস শুনিয়ে লজ্জিত হয়েছি।” [৪]

মোটকথা, হাজ্জাজের সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলমী ফায়দা হাসিল করাও প্রমাণিত এবং সাধারণ মানুষের ওপর যুলুম-অত্যাচারও।

হাজ্জাজ অনেক সময় জনসমাবেশের কারণে নামায দেরিতে পড়াত, যার ফলে আনাস বিন মালিক (রা.) এবং অনেক বড় বড় সাহাবী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) নামাযে বিলম্বের কারণে আক্ষেপ করে বলতেন: “আমি নবী করীম (সা.)-এর যামানার কোনো কিছুই এখন আর দেখছি না, কেবল নামায ছাড়া, আর এখন নামাযও নষ্ট হতে শুরু করেছে।” [৫]

একবার হাজ্জাজের নামাযে বিলম্ব করার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে আনাস বিন মালিক (রা.) তাকে সতর্ক করার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু সঙ্গীরা তার জীবনের আশঙ্কায় তাকে বারণ করলেন। পরিশেষে তিনি সওয়্যারিতে বসে এই বলতে বলতে বাড়ি ফিরে গেলেন: “এখন তো কালিমা শাহাদাত ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।” [৬]

হাজ্জাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী খলীফা ও শাসকের আনুগত্য করা ছিল ফরযে আইন এবং এতে সামান্য অবাধ্যতা করা ব্যক্তিকে বিদ্রোহী ও কাফির...

[১] মুসনাদ আবি আওয়ানা: ৪/৮৪, তাবা দারুল মা’রিফাহ বৈরুত।

[২] আল-মু’জামুল আওসাত, হা: ৯৪৭৭, তাবা দারুল হারামাইন।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৫৬৮৫।

[৪] ফাতহুল বারী: ১৪২/১০।

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৫২৯, ৫৩০।

[৬] আমি সাবিত বুনানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমরা আনাস বিন মালিকের সাথে ছিলাম, তখন হাজ্জাজ নামাযে বিলম্ব করল। আনাস (রা.) তাকে কথা বলার (সতর্ক করার) জন্য দাঁড়ালেন, কিন্তু তার ভাইয়েরা (সঙ্গীরা) তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে (তার ক্ষতির আশঙ্কায়) তাকে বারণ করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে তার সওয়্যারিতে আরোহণ করলেন এবং পশ্চিমধ্যে বললেন: আল্লাহর কসম, আমি নবী (সা.)-এর যুগে আমরা যে বিষয়ের ওপর ছিলাম তার কিছুই এখন আর চিনতে পারছি না, কেবল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য ছাড়া। এক ব্যক্তি বলল: হে আবু হামযা! নামাযের কী হবে? তিনি বললেন: তোমরা তো যোহরকে মাগরিবের সময় করে ফেলেছ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামায কি এমন ছিল? (ফাতহুল বারী: ১৩/২)।

প্রমাণিত হতো। একবার সে মসজিদে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল:

“আল্লাহর কসম! আমি যদি লোকদের মসজিদের একটি দরজা দিয়ে বের হতে বলি আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ উভয়ই হালাল। আমি যদি মুযার গোত্রের বদলে রাবিআ গোত্রকে শাস্তি দিই, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য হালাল।” [১]

সে কুরআনকে উসমানী পাণ্ডুলিপি (রসম-এ-উসমানী) অনুযায়ী প্রচলিত করতে চেয়েছিল, যা একটি প্রশংসনীয় বিষয় ছিল। কিন্তু যেহেতু তার মেজাজে কঠোরতা ছিল, তাই সে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সেই মহান সাহাবায়ে কেরামের ওপর প্রকাশ্য সমালোচনা করত যাদের পাণ্ডুলিপি উসমানী পাণ্ডুলিপির অনুরূপ ছিল না। ফলে সে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কথা অত্যন্ত ঘৃণার সাথে এভাবে বলত:

“আফসোস হুযাইল-এর গোলামের ওপর! সে মনে করত যে সে আল্লাহর কুরআন পড়ছে। না, সে তো আরব বেদুইনদের ছন্দোবদ্ধ কবিতা পড়ছিল। আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-এর ওপর তা নাযিল করেননি।” [২]

হাজ্জাজ এও বলত: “আমি যদি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে পেতাম, তবে তাকে হত্যা না করে ছাড়তাম না।” [৩] এই রাগ শুধু এই কারণে ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কিরাত হযরত উসমান (রা.)-এর কিরাত এবং উসমানী পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু জায়গায় ভিন্ন ছিল।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) সূরাগুলোকে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা বলতেন এবং এটাই সমস্ত সাহাবী, সমস্ত ইসলামী আলেম এবং ক্বারীগণের রীতি ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মেজাজে বাড়াবাড়ির অবস্থা এমন ছিল যে, সে এভাবে বলাকে বেয়াদবি মনে করত এবং বলত: “সূরাগুলোকে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসা বলা না, বরং এভাবে বলা: সেই সূরা যাতে গাভীর কথা এসেছে, সেই সূরা যাতে আলে ইমরানের কথা এসেছে।” [৪]

তার কঠোরতার একটি প্রমাণ হলো এই যে, আল্লাহর অসীম রহমত, মাগফিরাত এবং অল্প আমলে বেশি সওয়াবের হাদীসগুলোর ওপরও তার সন্দেহ হতো। ফলে শবে কদরের হাদীসগুলো তার মতে সন্দেহজনক ছিল। [৫]

হাজ্জাজের কিছু গুণ ও নেক কাজ—দুর্বল বর্ণনাসমূহে:

এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও তার মধ্যে কিছু কল্যাণও ছিল। সিন্ধু বিজয় তার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। সে কুরআন মাজীদকে উসমানী পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী প্রচলিত করার এক প্রবল আহ্বানকারী ছিল। কুরআন মাজীদের হরফসমূহে নুকতা (বিন্দু) এবং হরকত (জের-যবর) লাগানো তার সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। [৬]

[১] সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৫, আলবানী বলেছেন: সহীহুল ইসনাদ।

[২] ইবনে আবিদ দুনিয়া এটি বর্ণনা করেছেন এমন সনদে যা আমার কাছে ওয়াসিল বিন আব্দুল আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর বিন আইয়াশ আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাকে অর্থাৎ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে বলতে শুনেছি (অতঃপর তার খুতবা বর্ণনা করেন যাতে রয়েছে): আল্লাহর কসম, আমি যদি মুযারের বদলে রাবিআকে পাকড়াও করতাম তবে তা আমার জন্য হালাল হতো। হুযাইলের গোলামের ব্যাপারে বিশ্বয় জাগে, সে দাবি করে যে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কুরআন পড়ছে। আল্লাহর কসম, এটি বেদুইনদের ছন্দোবদ্ধ কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর কসম, আমি যদি হুযাইলের গোলামকে পেতাম তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। (আল-আশরাফ ফি মানাযিলিল আশরাফ, পৃ. ১৩৫)। এটি একটি মুত্তাসিল সহীহ সনদ। এই বর্ণনাটি মুত্তাদরাক হাকেম, হা: ৬৩৫২-তেও রয়েছে, যার সনদে আবু উমর আহমদ বিন আব্দুল জাব্বার রয়েছে এবং তিনি যঈফ (দুর্বল)।

[৩] সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৫, আলবানী বলেছেন: সহীহুল ইসনাদ।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ১৭৫০, কিতাবুল হাজ্জ, অধ্যায়: প্রতিটি কক্ষর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা।

[৫] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৭৭০১।

[৬] ওফায়াতুল আ'ইয়ান: ২/৩২, দার সাদির সংস্করণ।

এক বৃদ্ধের গালি শুনে উপেক্ষা:

তাকে প্রায়ই নির্দয় ও নিষ্ঠুর মনে হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত কঠোর ধৃষ্টতাকেও কোনো সামান্য কারণে উপেক্ষা করে যেত। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করে ফিরে আসার সময় সে মদিনা মুনাওয়ারার কাছে পৌঁছালে এক বৃদ্ধের দেখা পেল। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল: “মদিনাবাসীদের কী অবস্থা?”

বৃদ্ধ বলল: “খুবই খারাপ। নবীর হাওয়ারির ছেলেকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।”

হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল: “কে শহীদ করেছে?”

সে বলল: “দুশচরিত্র, অভিশপ্ত হাজ্জাজ। তার ওপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, সে ধ্বংস হোক, তার আল্লাহর প্রতি সামান্যতম ভয় নেই।”

হাজ্জাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠে বলল: “আরে বৃদ্ধ! হাজ্জাজকে দেখলে কি চিনতে পারবে?”

সে বলল: “হ্যাঁ অবশ্যই। আল্লাহ হাজ্জাজকে ভালোর চেনার তৌফিক না দিন, তাকে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা না করুন।”

হাজ্জাজ মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে দিল এবং বলল: “বৃদ্ধ, এখনই যখন তোর রক্ত ঝরবে তখন বুঝতে পারবি।”

চতুর বৃদ্ধ হাজ্জাজকে চিনে ফেলে তৎক্ষণাৎ সুর বদলে ফেলল, বলল: “হাজ্জাজ! আল্লাহর কসম, এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। আপনি যদি আমাকে চিনতেন তবে এমন কথা বলতেন না। আমি আব্বাস বিন আবি দাউদ, আমার প্রতিদিন পাঁচবার পাগলামির ঝোঁক চাপে।”

হাজ্জাজ বলল: “যা ভাগ এখান থেকে। আল্লাহ তোর রোগ দূর না করুন।” [১]

দোষ স্বীকার:

হাজ্জাজকে প্রায়ই আমাদের কাছে একগুঁয়ে মনে হয়, কিন্তু মাঝেমধ্যে সে নিজের ভুল খোলা মনে স্বীকারও করত। গভর্নর হওয়ার আগে একবার সে হজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করল। কাতারে সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব (রা.) তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাজ্জাজ সিজদায় যাওয়া এবং ওঠার ক্ষেত্রে ইমামের আগে আগে করে ফেলছিল। ইমাম সালাম ফেরালেন এবং সালাত শেষ হলে সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রা.) হাজ্জাজের জামার আঁচল ধরে তাকে থামিয়ে দিলেন। এরপর নিজের তাসবিহ পাঠ শেষ করে জুতো হাতে নিলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন:

“আরে চোর! আরে খায়েন! তুই এভাবে সালাত আদায় করিস? মন চাইছে এই জুতো দিয়ে তোর খবর নিই।”

হাজ্জাজ কোনো উত্তর দিল না। এর কিছুকাল পর সে যখন মদিনার গভর্নর হয়ে এল, তখন মানুষ ভয় পেল যে হাজ্জাজ এখন সাঈদ বিন মুসায়্যিবের ওপর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে সাঈদ (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: “ঐ কথাগুলো আপনিই বলেছিলেন।”

সাঈদ (রা.) নিজের বুকে হাত মেরে বললেন: “হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম।”

হাজ্জাজ বলল: “আল্লাহ আপনার মতো উস্তাদকে সর্বোত্তম জাযায়ে খায়ের দান করুন। ঐ দিনের পর আমি যখনই সালাত আদায় করেছি, আপনার কথা মনে পড়ে যেত।” [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫১৬, ৫১৭

[২] তারিখু দামেশক: ১২/১১৯, ১২০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫১৩

হাজ্জাজের সীরাতের সারসংক্ষেপ—হাফিজ ইবনে কাসীর রহ.-এর ভাষায়:

হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তার মধ্যে যেমন প্রচণ্ড সাহস ছিল, তেমনি তার তলোয়ারে ছিল রক্তপাত। সে সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অকাতরে মানুষ হত্যার মতো কাজ করত, অথচ আল্লাহ এই কাজকে অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছেন। সে নিজের ধারণায় যিয়াদের সদৃশ হতে চাইত, আর যিয়াদ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সদৃশ হওয়ার চেষ্টা করত, অথচ এই লোকগুলো মোটেও সেই পর্যায়ে ছিল না।” [১]

শেষ মুহূর্তে হাজ্জাজের কথা:

সেই যুগের সাধারণ মানুষ তো হাজ্জাজকে মুনাফিক এমনকি কাফির পর্যন্ত বলত। উলামায়ে কেরামও তাকে চরম গুনাহগার ও জালেম মনে করতেন। হাজ্জাজ নিজেও জানত যে মানুষের মধ্যে তার খ্যাতি কেমন, তাই সে শেষ মুহূর্তে এই কবিতাগুলো পড়ত:

হে আমার রব! শত্রুরা শপথ করেছে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছে

যে আমি জাহান্নামবাসীদের একজন।

তারা কি অদৃশ্যের ওপর শপথ করেছে? তাদের ধ্বংস হোক!

গাফফারের মহান ক্ষমা সম্পর্কে তাদের কী জ্ঞান আছে?

নিশ্চয়ই মনিবগণ যখন তাদের দাসরা বৃদ্ধ হয়ে যায়

তাদের দাসত্ব থেকে পুণ্যবানদের মতো মুক্তি দিয়ে দেন।

আর হে আমার স্রষ্টা! আপনি তো দয়ার ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি হকদার।

আমি দাসত্বে বৃদ্ধ হয়ে গেছি, সুতরাং আমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিন।

“হে আল্লাহ! আমার বিরোধীরা দৃঢ় শপথ করে বলছে যে আমি জাহান্নামী। তাদের সর্বনাশ হোক যে তারা কেন একটি অদেখা বিষয়ে শপথ করেছে, গাফফারের অসীম ক্ষমা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। গোলামরা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন দয়ালু মনিবরা তাদের মুক্ত করে দেন। হে আমার স্রষ্টা! আপনি তো তাদের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু। আমি গোলামিতে বৃদ্ধ হয়ে গেছি, অতএব আমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিন।”

এরপর দুআ করল: “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেখিয়ে দিন; কারণ মানুষ বলে যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না।” কিছুক্ষণ পর তার রুহ কবজ হয়ে গেল। এই ঘটনাটি ২৭ রমজান ৯৫ হিজরীর।

হযরত হাসান বসরী রহ. তার প্রতিটি মজলিসে হাজ্জাজের জন্য বদদুআ করতেন। যখন তিনি হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর পেলেন তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। হাজ্জাজের ভয়ে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে বাইরে এলেন এবং মানুষের কাছে তার মৃত্যুর অবস্থা জানতে চাইলেন। যখন মানুষ জানাল যে সে মৃত্যুর সময় এই কথাগুলো বলতেন, তখন হযরত হাসান বসরী রহ. বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “সত্যিই কি?” মানুষ যখন তা নিশ্চিত করল তখন হাসান বসরী রহ.-এর মুখ থেকে বের হলো: “কে জানে হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫১০

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৪৫ থেকে ৫৫২

ওয়ালিদের নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কীর্তিসমূহ

পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্ময়কর বিজয় ছাড়াও ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামল জনকল্যাণমূলক সেবা এবং নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দিক থেকেও ঈর্ষণীয় ছিল। তিনি পুরো ইসলামি বিশ্বে রাস্তাঘাট মসৃণ ও উন্নত করেন, সমস্ত শহরের জামে মসজিদগুলোর সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করান এবং স্থানে স্থানে খাল খননের প্রকল্প শুরু করেন। [১]

বেশ কিছু কীর্তিতে তিনি অগ্রণী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি প্রথম শাসক ছিলেন যার আদেশে মহাসড়কগুলোতে প্রতি এক মাইল অন্তর নির্দেশক ফলক (মাইলফলক) স্থাপন করা হয়েছিল। এই কাজ ৮৮ হিজরি (৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সম্পন্ন হয়। [২] তিনি প্রথমবারের মতো রাজ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল খোলেন। একইভাবে তিনি প্রথম শাসক যিনি অন্ধদের পথপ্রদর্শন এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের দেখাশোনার জন্য সেবক নিযুক্ত করেন এবং তাদের জন্য মাসিক সহায়তার অর্থ বরাদ্দ করেন। শিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সমস্ত অভাবী মানুষের জন্য সরকারি তহবিল চালু করেন। রমজান মাসে সরকারিভাবে মসজিদগুলোতে ইফতারের ব্যবস্থা শুরু করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল মজবুত এবং সমস্ত বিভাগ সক্রিয় ছিল। [৩]

জামে মসজিদ দামেস্কের নির্মাণ:

জামে মসজিদ দামেস্কের নির্মাণ ওয়ালিদের সবচেয়ে বড় নির্মাণশৈলী হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ভবনটি শহরের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। এই ভবনের ইতিহাস ছিল এই যে, প্রাচীনকালে এটি নক্ষত্রপূজারী গ্রিকদের উপাসনালয় ছিল। রোমানরা গ্রিকদের ওপর বিজয়ী হলে এই ভবনটি গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। এটি একটি বিশাল প্রাঙ্গণ ছিল যার পূর্ব অংশে নাসারারা বলিদানের বেদী তৈরি করে রেখেছিল। একে “চার্ট অফ জন” বলা হতো। হযরত উমর رضى الله عنه-এর যুগে মুসলমানরা দামেস্কের ওপর দ্বিমুখী আক্রমণ করে অর্ধেক অংশ সন্ধির মাধ্যমে এবং অর্ধেক অংশ তলোয়ারের জোরে জয় করেন। সন্ধির মাধ্যমে জয় করা এলাকায় নাসারাদের গির্জাগুলো একইভাবে বহাল রাখার চুক্তি হয়েছিল। তলোয়ারের জোরে জয় করা এলাকায় এই চুক্তি ছিল না। শহর মেপে পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় বিভক্ত করা হলে এই গির্জাটি ঠিক মাঝখানে পড়ে। এটিকেও ভাগ করে নেওয়া হয়। পূর্ব অংশ যেখানে পশু জবাই করা হতো, তা মুসলমানদের অংশে আসে। ইসলামি বাহিনীর আমির আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ رضى الله عنه এখানে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নামাজের ইমামতি করেন। [৪]

[১] কিতাবুল উয়ুন ওয়াল হাদায়েক (জুয আল-ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক) লি ইবনে মিসকাওয়াইহ, পৃ. ৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৪৯৭/৬

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৮, ত ত নযর; তারিখু ইয়াকুবী: পৃ. ২২৭; তারিখুত তাবারী: ৪৯৯/৬

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৬০/১২ থেকে ৫৬৫, এবং ৫৯০

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময় পর্যন্ত মুসল্লিদের আধিক্যের কারণে মসজিদটি খুব সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, গির্জাটি একদম পাশেই ছিল এবং খ্রিস্টানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শব্দ মুসল্লিদের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাত। অবশেষে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক পাদ্রিদের কাছ থেকে গির্জাটি কেনা প্রয়োজন মনে করলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, তাদের শহরের উপকণ্ঠে বিশাল জমি দেওয়া হবে যেখানে তারা চারটি গির্জা নির্মাণ করতে পারবে, এর সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থও প্রস্তাব করা হলো। পাদ্রিরা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং সেই চুক্তিপত্র দেখাল যার অনুযায়ী মুসলমানরা শহরের পশ্চিম অংশের সমস্ত গির্জা বহাল রাখতে বাধ্য ছিল। এটি শুনে ওয়ালিদ বললেন: “ঠিক আছে, তাহলে পূর্ব অংশের ‘ক্লিসায়ে তুমা’ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, আমি এটি ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করব।”

“ক্লিসায়ে তুমা” খ্রিস্টানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ছিল, তাই তারা ঘাবড়ে গিয়ে তাদের জেদ ত্যাগ করল এবং ওয়ালিদের প্রস্তাব গ্রহণ করে মসজিদের সাথে সংলগ্ন প্রাচীন গির্জাটি মুসলমানদের হাতে তুলে দিল। [১]

এভাবে দামেস্কের ঠিক মাঝখানে হিজরি প্রথম শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মসজিদ নির্মাণ শুরু হলো। নির্মাণ সামগ্রী হিন্দুস্তান, পারস্য এবং মরক্কো পর্যন্ত থেকে আনানো হয়েছিল। সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে আঠারোটি জাহাজে সোনা ও রূপা বোঝাই করে আনা হয়েছিল। পুরো বিশ্বে এই নির্মাণ কাজের শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। রোমান সম্রাট সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য মিনাকারি ও কারুকার্যের চমৎকার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। মার্বেল পাথর এবং সুমাক পাথরের সর্বোত্তম প্রকারগুলো খুঁজে বের করে দেয়াল ও স্তম্ভগুলোকে সাজানো হয়েছিল। একেকটি স্তম্ভের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। গম্বুজ ও মিনারের জন্য ভিত্তি এত গভীর করে খনন করা হয়েছিল যে পানি বেরিয়ে এসেছিল। [২]

আলোর জন্য শত শত ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছিল। এর মধ্যে ছয়শ ঝাড়বাতি সোনার শিকল দিয়ে ঝুলানো হয়েছিল। মসজিদের প্রশস্ততা এমন ছিল যে এতে বিশ হাজার মানুষ অনায়াসে সমবেত হতে পারত। পুরো ভবনটি মার্বেল পাথরের ছিল। মাঝখানে বিভিন্ন রঙের পাথর রঙিন আভা ছড়িয়ে দিত। দরজাগুলোতে সোনার প্রলেপ দেওয়া ছিল। কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি মেহরাব আকৃতির দরজা ও দেয়ালগুলোকে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য দান করেছিল। মেহরাবগুলোতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও নিপুণতার সাথে মূল্যবান মুক্তা ও হীরা স্থাপন করা হয়েছিল। ভবনের ছাদে সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল যা শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে এবং শত শত বছর ধরে নষ্ট হয় না। আর উপরে সিসার চাদর বিছানো হয়েছিল যার কারণে বৃষ্টির এক ফোঁটা পানিও ভেতরে ঢুঁইয়ে পড়ত না। [৩][৪]

নির্মাণের কাজ ৮৭ হিজরিতে শুরু হয়েছিল, পাঁচ বছর পর সালাত শুরু হয়। সাজসজ্জা, ক্যালিগ্রাফি এবং মিনাকারির কাজ বিশ বছরে সম্পন্ন হয়েছিল। নির্মাণ প্রক্রিয়ায় বারো হাজার স্থপতি ও শ্রমিক অংশ নিয়েছিলেন। এক হিসাব অনুযায়ী এই প্রকল্পে ৫৬ লক্ষ দিনার খরচ হয়েছিল। [৫] মসজিদের নির্মাণ সম্পন্ন হলে বড় বড় ব্যক্তিত্ব এখানে এসেছিলেন। বসরা থেকে...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৬৫ থেকে ৫৬৭; মুরুজুয যাহাব: ৩/২৬৫, ৩৬৬

[২] আহসানুত তাকাসিম ফি মা’রিফাতিল আকালিম লিল মাকদিসি, পৃ. ১৫৭ থেকে ১৫৯; মাসালিকুল আবসার লিল উমারি: ৩/৫১৮; তারিখু দামেশক: ২/২৯১

[৩] আহসানুত তাকাসিম, পৃ. ১৫৭ থেকে ১৫৯; তারিখু দামেশক: ২/২৬৩ [৪] শাযারাভুয যাহাব ফি খাবারি মান যাহাব লি ইবনিল ইমাদ আল-হাম্বলি: ১/৩৫৩

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৭৫। এই অর্থ বর্তমানে প্রায় চৌদ্দ কোটি ডলার (চৌদ্দ আরব রুপি) এর সমান।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) দামেস্কে আসলেন এবং ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের পেছনে এই মসজিদে সালাত আদায় করলেন। এটি ৯৩ হিজরীর ঘটনা। এর পরের বছর ৯৩ হিজরীতে আনাস বিন মালিক (রা.) ইন্তেকাল করেন। [১]

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই মসজিদের পূর্ব মিনারে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ হবে। তিনি দুই ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে মিনারে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। [২]

জামে মসজিদ দামেস্কের ওপর অমুসলিম দূতের মন্তব্য:

এই সুউচ্চ মসজিদটি তৎকালীন বিশ্বের সেই সব ইমারতগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসতেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) তাঁর শাসনামলে মসজিদের এই সাজসজ্জা এবং বিশেষ করে সোনা ও রূপার ব্যবহারকে অপচয় মনে করে তা খুলে বাইতুল মালে জমা করার ইচ্ছা করেছিলেন। সেই দিনগুলোতে রোমান সাম্রাজ্যের এক দূত দামেস্কে আসলেন এবং জামে উমাইয়া দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি বলতে লাগলেন: “আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে মুসলমানরা এমন ইমারত তৈরি করতে পারে। আমরা রোমানরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে আরবদের উত্থান ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই ইমারত দেখে আমি বুঝে গেছি যে তাদের শাসন টিকে থাকবে।” হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) যখন এই প্রতিক্রিয়া জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং বললেন: “যদি সত্যিই এই ইমারত দেখে অমুসলিমরা ঈর্ষান্বিত হয়, তবে একে এভাবেই থাকতে দাও।” [৩]

মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ:

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আরেকটি বড় স্থাপত্য কীর্তি হলো মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। এর আগে মসজিদে নববীর শেষ সম্প্রসারণ হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে হয়েছিল যা থেকে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মসজিদের মুসল্লি ও যিয়ারতকারীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমান ইমারতটি এত বড় সমাবেশের জন্য একেবারেই অপরিপূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছিল; তাই এই প্রকল্পটি সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল।

এই মহান প্রকল্পের সূচনা ৮৮ হিজরীর শুরুতে হয়। সেই সময় মদীনার গভর্নর ছিলেন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.)। ওয়ালিদ তাঁকে লিখলেন যে মসজিদে নববীর পুরনো ইমারতটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হোক, মসজিদের সাথে অবস্থিত উম্মাহাতুল মুমিনীনদের হুজরা এবং প্রতিবেশীদের ঘরগুলো কিনে মসজিদের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যারা তাদের ঘর বিক্রি করতে দ্বিধা করবে, তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি নিয়ে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হোক।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) এই নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্য লোকদের সাথে কথা বললেন। সবাই সানন্দে নিজেদের ঘরগুলো হস্তান্তর করে দিলেন। যেহেতু পুরনো ইমারতটির প্রতি মানুষের আবেগীয় টান ছিল, তাই এটি ভাঙার কাজ শুরু করার সাহস কারো হচ্ছিল না; তাই হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ মদীনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করলেন যাতে...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৯০।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৭৫৬০, আল-ফিতান ওয়া আশরাত আস-সাআহ, বাবু যিকর আদ-দাজ্জাল।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৮১-৫৮২; আল-উয়ুন ওয়াল হাদায়েক, পৃ: ১১।

তাদের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়া এবং এর কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক-এর নাতি কাসিম বিন মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ বিন উমর-এর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। মসজিদে নববীর কিবলার দিকের দেয়াল আরও সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং প্রতিবেশীদের ঘরগুলো মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করার পর মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ তিনশ ফুট হয়ে গেল। কায়সার-ই-রোম ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের অনুরোধে এই নির্মাণ প্রকল্পের জন্য এক লক্ষ মিসকাল সোনা এবং বিপুল পরিমাণ মিনা ও নকশার সরঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন। [১]

উমর বিন আব্দুল আজিজ এই প্রকল্পে অসাধারণ মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে কাজ করেছিলেন এবং ওয়ালিদ এর জন্য অটেল আর্থিক সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। শুধুমাত্র কিবলার দিকের দেয়ালের নকশা ও সাজসজ্জায় ৪৫ হাজার দিনার (প্রায় সোয়া এক কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছিল। মসজিদের আঙিনায় একটি ফোয়ারাও লাগানো হয়েছিল যা মসজিদের সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই প্রকল্প তিন বছরে সম্পন্ন হয়েছিল যার প্রশংসা সারা মুসলিম বিশ্ব ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে জানিয়েছিল। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ৯১ হিজরিতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক রওজা-ই-আতহার জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সাথে তিনি মদিনাবাসীদের জন্য অকাতরে অর্থ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করে তাদের ধন্য করেন। [২]

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু:

শনিবার ১৫ই রবিউল আউয়াল ৯৬ হিজরিতে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৫১ বছর, তিনি নয় বছর পাঁচ মাস শাসন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন নেক ও সৎ মানুষ ছিলেন। সরকারি ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন কুরআনের পাঁচ পারা তিলাওয়াত করা তার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। সাধারণ শাসকদের বিপরীতে তিনি তার ভাইদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাদের অধিকারের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। স্বভাবগতভাবে তিনি অত্যন্ত মার্জিত ও সুস্থ রুচির অধিকারী ছিলেন যে তিনি বলতেন:

“যদি কুরআন মাজিদে কওমে লুতের কথা উল্লেখ না থাকত, তবে আমি কখনো ভাবতেও পারতাম না যে কোনো মানুষ এমন জঘন্য কাজ করতে পারে।” [৩]

কিছু ঐতিহাসিক ওয়ালিদের এই গুণাবলির সাথে এটিও উল্লেখ করেছেন যে তিনি অত্যন্ত জালিম ও কঠোর ব্যক্তি ছিলেন। এই কথাটি এই দিক থেকে সঠিক যে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার রাগও ছিল অত্যন্ত মশহুর, যা কখনো তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখতেন আবার কখনো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়তেন। তা সত্ত্বেও তিনি তেমন রক্তপিপাসু, নির্দয় এবং অহংকারী ছিলেন না যেমনটা সাধারণত মনে করা হয়। [৪]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৬/৪৩৫, ৪৩৬।

[২] ওয়াফা আল-ওয়াফা: ২/৯৩, ৯৪, ৯৭; আল-উয়ুন ওয়াল-হাদাইক, পৃষ্ঠা ১১; তারিখ আল-তাবারী: ৬/৪৩৬।

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১/৮৬; দুওয়াল আল-ইসলাম লিজ-জাহাবী: ১/৮৪; তারিখ ইয়াকুবী: ২২৭; মুরুজ উজ-জাহাব লিল-মাসউদী: ৩/৩৭৪।

[৪] হাফিজ ইবনে কাসিরের অভিমত হলো যে ঐতিহাসিকরা ওয়ালিদ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভুল নয়, যাতে বর্ণিত হয়েছে: “ওয়ালিদ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতেন। যখন রাগ আসত তখন তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত জেদি ছিলেন, খুব বেশি খেতে পছন্দ করতেন এবং বেশি বেশি বিয়ে ও তালাক দেওয়ার অভ্যাস ছিলেন। বলা হয় যে তার অধীনে দাসী ছাড়াও ৬৩ জন নারী বিবাহিত ছিল।” হাফিজ ইবনে কাসির এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন: “এর দ্বারা ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ উদ্দেশ্য হতে পারে যে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক নয়, যিনি জামে দামেস্কের প্রতিষ্ঠাতা।” (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/১২, ১০৬, ৬১)। ওয়ালিদের ক্রোধ ও কঠোরতা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তার চরিত্রে বিলাসিতা ও শরয়ী সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ কেউ করেনি, বরং কঠোরতার সাথে সাথে তার সরলতা এবং কৃষ্ণসাধনও মশহুর। এর বিপরীতে ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদের বিলাসিতা এবং অন্যান্য অনৈতিকতা বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই হাফিজ ইবনে কাসিরের এই অভিমতটিই সঠিক মনে হয়।

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক

রবিউল আউয়াল ৯৬ হিজরি হতে সফর ৯৯ হিজরি

ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে অক্টোবর ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতের যুগকে বনু উমাইয়ার জবাবদিহিতার যুগ বলা হলে ভুল হবে না। তাঁর পিতা আব্দুল মালিকের যুগ অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের খতম করতে এবং বড় ভাই ওয়ালিদের যুগ বাহ্যিক বিজয় অর্জনে অতিবাহিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে শাসনব্যবস্থা সেনাবাহিনীর হাতে চলে এসেছিল; কারণ এই সমস্ত অভিযান সেনাবাহিনীর শক্তির ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হচ্ছিল। এর অনিবার্য ফল এই দাঁড়ালো যে, ক্ষমতার অলিন্দে সামরিক জেনারেলদের ক্ষমতা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেল, যার ফলে দুর্নীতি, জুলুম এবং অবিচারের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করল। জাতির শুভাকাঙ্ক্ষীরা এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু ওয়ালিদ সেদিকে কোনো মনোযোগ দেননি।

প্রকৃতপক্ষে সামরিক অভিযানের অনুরাগী ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের স্বভাবে কিছুটা উগ্রতা থাকা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল, এই একই মেজাজ তাঁর অনেক অধস্তনদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, যিনি ইরাক থেকে শুরু করে খোরাসান এবং ভারতীয় বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসক ছিলেন, তিনি এই অনমনীয় ও কঠোর নীতির অভ্যস্ত ছিলেন; তাই সরকারের পক্ষ থেকে যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতো, তখন তার পরিধি বিস্তৃত হতো এবং কখনো কখনো কিছু নিরপরাধ মানুষও এর কবলে পড়ে যেত। এই কারণেই ওয়ালিদের যুগে শাসকদের প্রভাব ও ত্রাস সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছিল। এই কঠোর নীতির কবলে উলামা, মাশায়েখ এবং দ্বীনের বুজুর্গ ব্যক্তিরাত্তি চলে আসতেন। সাঈদ বিন জুবায়ের [রা.] -এর হত্যার বেদনাদায়ক ঘটনা এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করতেন; তাঁদের চেষ্টা ছিল যে যতটুকু সম্ভব মানুষকে সরকারি রোযানল থেকে বাঁচানো যায় এবং যেখানে সম্ভব জনগণের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা যায়।

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক প্রকৃতি, মেজাজ এবং চিন্তাধারায় তাঁর বড় ভাই ওয়ালিদ থেকে ভিন্ন ছিলেন। তাঁদের পিতা আব্দুল মালিকের মধ্যে বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল এবং প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উদারতা এবং গঠনমূলক বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক রুচির গুণাবলি একই সাথে বিদ্যমান ছিল। কুদরতে ইলাহি এই গুণাবলিকে ওয়ালিদ ও সুলাইমানের মধ্যে এভাবে বণ্টন করে দিয়েছিল যে সামরিক গুণাবলি এবং গঠনমূলক রুচি...

...ওয়ালিদের ভাগে এসেছিল, যেখানে রাজনৈতিক চিন্তা, জ্ঞান ও সাহিত্য, ন্যায়বিচার এবং দানশীলতা ও উদারতা ছিল সুলাইমানের আঁচলে।

বনু মারওয়ানের আমিরদের মধ্যে দলাদলি:

নীতির পার্থক্যের কারণে বনু মারওয়ানের আমিরদের মধ্যে দুটি দল তৈরি হয়েছিল: কঠোর নীতির সমর্থকদের মধ্যে ওয়ালিদ, হাজ্জাজ এবং তাদের মতো কিছু আমির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নরম নীতির প্রবক্তা কর্মকর্তাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আজিজ, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক এবং রাজা বিন হাইওয়াহ অগ্রগণ্য ছিলেন। প্রথম দলের ঝাঁক ছিল এই যে, তরবারি হাতে নিয়ে অধিক থেকে অধিকতর অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা হোক এবং সরকারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো প্রতিটি জিনিসকে পিষে ফেলা হোক। দ্বিতীয় দলের চিন্তা ছিল এই যে, অধিক ভূখণ্ডের পরিবর্তে বর্তমান অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হোক এবং দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করা হোক।

উমর বিন আব্দুল আজিজ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] হাজ্জাজের ওপর এতটাই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর মদিনা মুনাওয়ারার গভর্নর থাকাকালীন একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে ইমারতে হজ অর্পণ করা হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী মদিনার গভর্নর প্রত্যেক আমির-ই-হজকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে বাধ্য ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.]-এর কাছে এটি অসহনীয় ছিল। তিনি খলিফা ওয়ালিদকে পত্র পাঠিয়ে হাজ্জাজের আতিথেয়তা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ওয়ালিদ হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন: “উমর বিন আব্দুল আজিজ তোমার মেহমানদারি থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন; এমন ব্যক্তিকে মেহমানদারির কষ্ট দেওয়া তোমার জন্য সমীচীন নয় যে এর জন্য প্রস্তুত নয়।” ফলে হাজ্জাজকে মদিনা এড়িয়ে মক্কায় যেতে হয়েছিল। [১]

মতপার্থক্য থেকে শুরু হওয়া এই ফাটল ওয়ালিদের শেষ দিনগুলোতে অত্যন্ত গভীর হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অত্যাচারের অভিযোগ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে করেছিলেন, তখন ওয়ালিদ হাজ্জাজের পক্ষ নিয়ে উমর বিন আব্দুল আজিজকে মদিনার শাসনভার থেকে অপসারিত করেন। [২]

হাজ্জাজ মারা গেলে উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন: “আল্লাহ হাজ্জাজের যুগের অবসান ঘটিয়েছেন। আমার মস্তক তাঁর দরবারে অবনত হচ্ছে।” উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] এই উপলক্ষে খলিফা ওয়ালিদের কাছে হাজ্জাজের মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশও করেননি। ওয়ালিদ এটি অনুভব না করে পারলেন না এবং কারণ জিজ্ঞাসা করে বসলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] এই বলে রেহাই পেলেন: “হাজ্জাজ আমাদের ঘরের লোক ছিল, অন্যদের উচিত আমার কাছে শোক প্রকাশ করা, আমার অন্যদের কাছে নয়।” [৩]

সরকারি নীতির সমালোচনার কারণে উমর বিন আব্দুল আজিজকে বহুবার ওয়ালিদের আরও রোষানলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিন ওয়ালিদ নিয়মের বাইরে তাঁকে দুপুরের সময় ডেকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে খলিফার কপালে ভাঁজ পড়ে আছে এবং বিশেষ কর্মকর্তা খালিদ বিন রাইয়ান তরবারি কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ালিদ তাঁকে দেখামাত্রই গর্জে উঠে বললেন: “যে ব্যক্তি খলিফাদের গালিগালাজ করে, তার সম্পর্কে তুমি কী বলো? তাকে হত্যা করা হবে কি হবে না?” উমর বিন আব্দুল আজিজ [রহ.] চুপ থাকলেন।

[১] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৯

[২] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৮

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/৪৮১, ৪৮২

ওয়ালিদ ধমক দিয়ে বললেন: “কেন উত্তর দিচ্ছ না?” তিনি তবুও চুপ রইলেন। ওয়ালিদ আবার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বললেন: “আপনার কি হত্যার ইচ্ছা আছে?” ওয়ালিদ বললেন: “না, প্রশ্নটি হলো খলিফাদের দোষ অন্বেষণ করা সম্পর্কে।” উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বললেন: “আমার মতে খলিফাদের অবমাননাকারীকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।”

ওয়ালিদ মাথা তুলে খালিদ বিন রাইয়ানের দিকে তাকালেন, উমর (রহ.) ভাবলেন যে এখন হত্যার আদেশ দেওয়া হবে, কিন্তু ওয়ালিদের জিহ্বাকে কোনো অদৃশ্য শক্তি আটকে দিয়েছিল। তিনি এই বলতে বলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন: “এ লোক তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অহংকারী।” [১]

ওয়ালিদ ও সুলাইমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

এই ঘটনাগুলোর পর ওয়ালিদ তার ভাই সুলাইমানের উত্তরাধিকার বাতিল করার কথা ভাবতে শুরু করেন, যিনি আব্দুল মালিকের ওসিয়ত অনুযায়ী দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন। ওয়ালিদ তার পরিবর্তে নিজের ছেলে আবদুল আজিজকে উত্তরসূরি বানাতে চেয়েছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুতাইবা বিন মুসলিম এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো প্রখ্যাত সামরিক জেনারেলরা এ বিষয়ে খলিফার সাথে একমত ছিলেন, কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজ এই বলে এই মতের বিরোধিতা করেন যে, (আব্দুল মালিকের আমলে) আমাদের কাছ থেকে সুলাইমানের উত্তরাধিকারের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। এতে ওয়ালিদ এতটাই রাগান্বিত হলেন যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-কে একটি কুঠুরিতে বন্দি করে উপর থেকে মাটির আস্তরণ দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অবশেষে ঘরের কিছু মহিলার সুপারিশে তিন দিন পর তাকে মুক্ত করা হয়, তখন তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

এই সময়কালে হাজ্জাজ মারা যান এবং ৫ মাস পর ওয়ালিদও তার ছেলের উত্তরাধিকারের বায়াত নেওয়ার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ফলে আব্দুল মালিকের পুরনো ওসিয়ত অনুযায়ী সুলাইমান খলিফা হন। তিনিও একজন রাজনীতিবিদের ছেলে ছিলেন। তিনি তার ভাইয়ের সংকল্পের কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই তিনি ওয়ালিদের অনুগত আমিরদের কাছ থেকে বিপদ অনুভব করতে শুরু করেন। [২]

সুলাইমান কেন ওয়ালিদের জেনারেলদের বরখাস্ত করেছিলেন?

সেই সময় মুসলিম বিশ্বে পূর্ববর্তী খলিফার জেনারেলদের অগ্রযাত্রার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পূর্বে কুতাইবা বিন মুসলিমের সেনাবাহিনী চীনের সীমান্তে ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান জয় করার পর রাজপুতানার ওপর আক্রমণ শুরু করেছিলেন। আন্দালুসের গভর্নর মুসা বিন নুসাইর হযরত উসমান গনি (রা.)-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ফ্রান্স এবং তারপর পুরো ইউরোপকে পদানত করে পশ্চিম দিক থেকে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের সংকল্প করেছিলেন।

এই জেনারেলদের ওপর আস্থা রেখে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে আশা করা যেত যে, ইসলামি খিলাফতের আয়তন আরও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল বৃদ্ধি পেত। বিশেষ করে ইউরোপে সেই সময়কার চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বিজয়ের পথ সুগম করে রেখেছিল; তাই এই সুযোগ নষ্ট না করা জরুরি ছিল। তবে অন্যদিকে এই সম্ভাবনাও ছিল যে, এই জেনারেলরা পূর্ববর্তী খলিফার প্রতি গভীর আনুগত্য এবং বর্তমান খলিফার সাথে মতপার্থক্যের কারণে নিজ নিজ এলাকায় বিদ্রোহ করে স্বাধীন সরকার গঠন করে ফেলতে পারেন। যদি এমন হতো, তবে মুসলিম বিশ্ব টুকরো টুকরো হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ত। লাভ-ক্ষতির এই সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করে...

[১] সিরাত উমর লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ৩০

[২] তারিখ আবি জুরআ আদ-দিমাশকি, পৃ. ৫১৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬১৩; তারিখ দিমাশক: ৩৬/৩৬৯

করে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক অনুভব করলেন যে আরও বিজয়ের চেয়ে স্থিতিশীলতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি প্রথম সুযোগেই সেই সব আমির ও সেনাপতিদের বরখাস্ত করতে শুরু করলেন যারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘনিষ্ঠ বা ওয়ালিদের বিশেষ অনুগত ছিল।

কুতাইবা বিন মুসলিমের হত্যা:

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের কিছু জেনারেলের ব্যাপারে সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হলো। চীনের সীমান্তে অভিযানরত বিজয়ী কুতাইবা বিন মুসলিম সুলাইমানের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথেই খেলাফত দরবারে এই মর্মে পত্র পাঠালেন যে, যদি আমাকে বরখাস্ত করা হয় তবে আমি বিদ্রোহ করব। সুলাইমান ধৈর্য ধরে কাজ নিলেন এবং জবাবে কুতাইবাকে পদে বহাল রাখার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু কুতাইবা খেলাফত কেন্দ্রের প্রতি এতটাই সন্দিহান ছিলেন যে খলিফার জবাব পাওয়ার আগেই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং তার সমর্থকদের খলিফার বিরুদ্ধে লড়তে প্ররোচিত করলেন। কিছু সর্দার তার কথা মেনে নিল এবং কিছু খলিফার প্রতি অনুগত থাকার ওপর জোর দিল। এভাবে কুতাইবার সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হলো।

কুতাইবার সমর্থক কম এবং খলিফার অনুগত বেশি ছিল; তাই এই যুদ্ধে কুতাইবা পরাজিত হলেন। খলিফার অনুগত অফিসাররা কুতাইবার মাথা কেটে দামেস্কে পাঠিয়ে দিল। এভাবে ইসলামী বিশ্বের এই অত্যন্ত দক্ষ জেনারেল ও রাজনীতিবিদ ভুল রাজনীতির শিকার হয়ে এক বেদনাদায়ক পরিণতির সম্মুখীন হলেন। এই ঘটনা সুলাইমানের খেলাফতের প্রথম বছর অর্থাৎ ৯৬ হিজরির। [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের হত্যার ট্র্যাজেডি:

কুতাইবা বিন মুসলিমের মতো সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমও হাজ্জাজ ও ওয়ালিদের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কুতাইবার মতো অভিজ্ঞ জেনারেলকে বিদ্রোহ করতে দেখে সিন্ধু বিজয়ী সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের পর এই যুবকের কাছ থেকেও কোনো বিপদ অনুভব করা কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তবে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণের পর কয়েক মাস পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। অন্যদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মনেও কোনো বিদ্রোহী পদক্ষেপের চিন্তা ছিল না।

এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল যে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক হঠাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্য দেবী ও পরিমল দেবীকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে দামেস্কে পাঠিয়েছিলেন। খলিফা একদিন তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে এক রাজকুমারী তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ফন্দি আঁটলেন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তার সতীত্ব নষ্ট করার মিথ্যা অপবাদ দিলেন। খলিফা এ কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ফলে খেলাফত দরবারের নির্দেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ঠিক সেই সময়ে বরখাস্ত করা হলো যখন লস্কর-ই-ইসলামের একটি অংশ গঙ্গা নদীর তীরে আবাদ রাজধানী কনৌজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় অংশ স্বয়ং মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে রাজস্থানের মধ্যবর্তী শহর ‘অওধপুর’ থেকে যাত্রা করে মধ্য ভারতের দরজায় কড়া নাড়ছিল। [২]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৫০৬/৬ থেকে ৫২২, আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯৬ হিজরি।

[২] চচ নামা, পৃষ্ঠা ২৪১ থেকে ২৪৪।

দরবারে খিলাফত থেকে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেফতার করে ইরাকে স্থানান্তর করা হোক। যেহেতু মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলগুলোতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং দয়ার মাধ্যমে শাসনের দ্বারা মানুষের মন জয় করেছিলেন, তাই প্রজারা এতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভক্তরা চেয়েছিলেন যে, তাঁর ফিরে যাওয়া এবং গ্রেফতারের নির্দেশ পালন না করা হোক এবং এখানে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য এমন করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না, কিন্তু এই দূরদর্শী যুবক ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং উম্মতের মধ্যে কোনো গৃহযুদ্ধের কারণ হওয়া পছন্দ করেননি। ইবনে কাসিম অস্বীকারের একটি শব্দও মুখ থেকে উচ্চারণ না করে শুধু এতটুকু বলেছিলেন:

“তারা আমাকে হারিয়ে ফেলেছে, আফসোস! তারা কেমন এক যুবককে হারাল, যে যুদ্ধের দিনে এবং সীমান্ত রক্ষায় তাদের কাজে আসত।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেকে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশার হাতে সঁপে দিলেন, যিনি এই বীর পুরুষকে একজন বিপজ্জনক অপরাধীর মতো শিকল পরিয়ে ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ইরাকের নতুন গভর্নর সালেহ বিন আবদুর রহমান, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার অনুসারীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অনেক আগে তার ভাইকে, যার সম্পর্ক খারেজি গোষ্ঠীর সাথে ছিল, হাজ্জাজ হত্যা করেছিলেন। হাজ্জাজ তো মারা গিয়েছিলেন; তাই সালেহ বিন আবদুর রহমান নিজের ভাইয়ের প্রতিশোধ হাজ্জাজের জামাতার কাছ থেকে নেওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ওয়াসিতের কারাগারে নিক্ষেপ করে জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানালেন। নির্জন কারাকক্ষের যন্ত্রণায় মুহাম্মদ বিন কাসিম যে মর্মস্পর্শী কবিতাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো তাঁর একজন দক্ষ কবি হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। এই কবিতাগুলোর প্রতিটি পঙক্তি হৃদয়ের তন্ত্রীকে নাড়িয়ে দেয়। ইবনে কাসিম বলেছিলেন:

“যদি আজ আমি ওয়াসিতের কারাগারে এবং এই ভূমিতে বেড়ি ও শিকলে বন্দি হয়ে থাকি তো কী হয়েছে?”

“আমি কত পারস্য অশ্বারোহীর জ্ঞান হারিয়ে দিয়েছি এবং কত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে ফেলে রেখেছি।”

খিলাফতের কেন্দ্রের প্রতি নিজের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন:

“বনু মারওয়ান কি আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ভুলে গেল? যদিও আমার কাছ থেকে যা কিছু চলে গেছে তাতে আমি ধৈর্যশীল।”

“আমি তাদের জন্য সাবুর থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এলাকা বর্ষার আঘাতে জয় করে দিয়েছি।”

“যেখানকার মানুষ যুদ্ধের এবং গেরিলা আক্রমণেরও বিশেষজ্ঞ।”

وَلَوْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ الْقَرَارَ لَوَطَنْتُ ... إِنْ أَتَيْتُ لَوَغَى وَ ذُكُورُ

“আমি যদি (সিন্ধুতে) থিতু হওয়ার সংকল্প করতাম, তবে কতই না নর-নারী মাতম করতে বাধ্য হতো।”

وَمَا ذَخَرْتُ خَيْلُ السَّكَاكِ بِكَ عَسْكَرِي ... وَلَا كَانَ مِنْ عَكَ بِكَ عَلَى أَمِيرُ

“না সাকাসিকের অশ্বারোহীরা আমার সামরিক ছাউনিতে প্রবেশ করতে পারত, আর না আক্ক গোত্রের কোনো ব্যক্তি আমার ওপর আমার নিযুক্ত হতো।”

[১] وَلَا كُنْتُ لِلْعَبْدِ الْمَزُونِي تَابِعًا ... فَيَا لَكَ دَهْرًا بِالْكَرَامِ عَثُورُ

“আর না আমি মাজুনি দাসের অনুগত হতাম। হায়! জামানা শরীফদের কীভাবে হোঁচট খাওয়ায়।”

অবশেষে সালেহ বিন আবদুর রহমান কঠোর নির্যাতন করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ৯৮ হিজরির। এভাবে মুসলিম উম্মাহর একজন অত্যন্ত সাহসী, দক্ষ এবং জনপ্রিয় সেনাপতি আপনজনদের অবমূল্যায়নের শিকার হলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর দাহিরের কন্যারা খলিফার সামনে নিজেদের মিথ্যার কথা স্বীকার করে বলল: “মুহাম্মদ বিন কাসিম আমাদের সাথে ভাইদের মতো আচরণ করেছিলেন। আমরা তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম যাতে বাবার রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারি।”

এ কথা শুনে খলিফা অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন। তিনি দাহিরের কন্যাদের কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং দুঃখ ও শোকে নিজের আঙুল কামড়াতে লাগলেন। [২] কিন্তু এখন এই অনুশোচনা সেই সুশ্রী যুবককে ফিরিয়ে আনতে পারত না, যিনি উপমহাদেশের অন্ধকার দিগন্তে ভোরের শুকতারা হয়ে উদ্ভিত হয়েছিলেন। উপমহাদেশের মুসলমানরা আজও এই বিজয়ীর প্রতি কৃতজ্ঞ, যাঁর বদৌলতে তারা তাওহিদের নেয়ামত লাভ করেছে।

আপন হোক বা পর, আভিজাত্য ও বীরত্বের এই মূর্ত প্রতীককে সবাই স্মরণ করতে থাকে। হিন্দুস্তানের বাসিন্দারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে স্মরণ করে দীর্ঘকাল ধরে কাঁদত। অনেক হিন্দু মন্দিরগুলোতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ছবি ও মূর্তি তৈরি করেছিল এবং এই মুজাহিদকে দেবতার মর্যাদা দিতে শুরু করেছিল। শতাব্দী ধরে শাসকদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার এই মানুষগুলো ভাবত যে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী কোনো মানুষ এত দয়ালু হতে পারে না। এত মেহেরবানি কেবল খোদাই করতে পারেন। [৩]

মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর সাথে আচরণ:

আন্দালুসের বিজয়ী মুসা বিন নুসাইরও ওয়ালিদের ঘনিষ্ঠ সেনাপতিদের মধ্যে গণ্য হতেন; তাই সুলাইমান বিন আবদুল মালিক তাঁর ওপরও পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তারিক বিন যিয়াদকেও মুসার বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে সন্দেহভাজন মনে করা হতো।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৬২, ৬৩। সাকাসিক বলতে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশার গোত্রকে বোঝানো হয়েছে, যার সৈন্যরা এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেপ্তার করেছিল। একইভাবে আক্ক এবং মাজুন গোত্রের অফিসাররাও মুহাম্মদ বিন কাসিমের কারাবরণ ও নির্যাতনের সাথে জড়িত ছিল।

[২] চচ নামা, পৃষ্ঠা ২৪৫।

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ৪২৪।

নোট: চচ নামার লেখক যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হত্যার নির্দেশ খলিফা ওয়ালিদের দিকে নিসবত করা হয়েছে। একই বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমকে একটি সিন্দুকে বন্দি করে সিন্ধু থেকে পাঠানো হয়েছিল এবং দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই বর্ণনাটি সমস্ত ঐতিহাসিকের বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুলাইমানের আমলে তাঁর নির্দেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেপ্তার হওয়া এবং ওয়াসিতে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় পৌঁছানো এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা একটি সর্বসম্মত বিষয়।

মুসা বিন নুসাইর (রহ.) এবং তারিককে পূর্ববর্তী খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক তার শেষ দিনগুলোতে দামেস্কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন যাতে আন্দালুসের গৌরবময় বিজয়ের জন্য তাদের পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা যায়। মুসা বিন নুসাইর (রহ.) আন্দালুসে তার পুত্র আব্দুল আজিজকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং নিজে গনিমতের মালের স্তুপ সাথে নিয়ে রওনা হন। ৯৬ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসের শুরুতে যখন তিনি খেলাফতের রাজধানীতে পৌঁছান, তখন খলিফা ওয়ালিদকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পান। খলিফা তাকে অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। জমাদিউল আখিরা মাসের মাঝামাঝি সময়ে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু হয়। সুলাইমান সিংহাসনে আরোহণ করেই মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-কে আন্দালুসের প্রতিনিধিত্ব থেকে অপসারিত করেন। মুসা এই আদেশের সামনে মাথা নত করেন। [১]

মুসার নির্লোভ মানসিকতা এমন ছিল যে, একবার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: “যখন আন্দালুসে আপনার কাছে সবকিছুই সহজলভ্য ছিল, তখন আপনি আপনার সম্মান ও শক্তির সেই কেন্দ্রে কেন অবস্থান করলেন না? (খলিফার দরবারে উপস্থিত হওয়ার আদেশ মেনে) নিজেকে কেন বিপদে ফেললেন?” মুসা বিন নুসাইরের উত্তর ছিল: “আল্লাহর কসম! আমি যদি সেখানে থাকতাম, তবে শাসকরা আমার একটি চুলও বাঁকা করতে পারত না। কিন্তু আমার কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির প্রয়োজন ছিল, আনুগত্য এবং জামাত (সংগঠন) থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমার কাছে অসহনীয় ছিল।” [২]

সুলাইমান মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর প্রতি কিছুকাল আস্থাহীন ছিলেন। পরবর্তীতে সুলাইমানের ভুল বোঝাবুঝি দূর হয় এবং তিনি মুসাকে নিজের সহচর বানিয়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের পরিকল্পনা করার সময় সুলাইমান বিশেষভাবে মুসার পরামর্শ গ্রহণ করেন। মুসার ওপর আস্থার একটি নিদর্শন এটিও যে, আন্দালুসের শাসনভার মুসার পুত্র আব্দুল আজিজের কাছেই বহাল ছিল। [৩]

মুসা বিন নুসাইরের মৃত্যু:

মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর বয়স ৮৭ বছর হয়েছিল, তার ইচ্ছা ছিল যেন মদিনা মুনাওয়ারায় তার মৃত্যু হয় এবং জান্নাতুল বাকির মাটি নসিব হয়। ৯৭ হিজরিতে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলে মুসা বিন নুসাইরকেও সাথে নেন। মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে মুসা (রহ.) ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এভাবে আফ্রিকা ও আন্দালুসের এই বিজয়ীর শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হলো। [৪]

মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর মৃত্যু হজের বরকতময় সফরে হয়েছিল, যা আল্লাহর কাছে তার খিদমত কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন। মুসা কেবল ভূখণ্ডই জয় করেননি, বরং বিজিত এলাকাগুলোতে দাঈ ও ফারী নিযুক্ত করে ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীনি ইলমকেও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় অধিবাসী বিশেষ করে বারবার গোত্রগুলোর এক বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ করে। [৫] এসব কীর্তির কারণে আজ পর্যন্ত মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬৩০; আত-তারিখুল আন্দালুসি, পৃ. ১২৬, ১২৭।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/২১।

কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, সুলাইমান মুসাকে কারারুদ্ধ ও লাঞ্চিত করে রেখেছিলেন এবং তার ওপর ভারী জরিমানা ধার্য করেছিলেন যা তিনি পরিশোধ করতে পারেননি এবং এই দুর্দশার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই বর্ণনাগুলো অতিরঞ্জিত। অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী, মুসা গনিমতের মাল থেকে কর্মকর্তা ও সৈন্যদের ওপর নিয়মের বাইরে যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন, সে কারণে সুলাইমান তার হিসাব গ্রহণ করেন এবং এই জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুলাইমান তাকে অপমান করার শপথ করেন এবং শপথ পূর্ণ করার জন্য তাকে কয়েক ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তার ওপর মুছা ভাব দেখা দিলে সুলাইমান নিজের আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন এবং এরপর শেষ পর্যন্ত তিনি মুসাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে মুসাও দশ লক্ষ দিনারের বিশাল অংকের অর্থ পরিশোধ করে নিজের হিসাব পরিস্কার করে দেন। (আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/২০, ২১; আত-তারিখুল আন্দালুসি, পৃ. ১২৬, ১২৭)।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২০, ২১; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৪৯৯।

[৪] আত-তারিখুল আন্দালুসি, পৃ. ১২৭, ১২৮।

[৫] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/১৪৬।

তারিক বিন যিয়াদের নির্জনবাস:

তারিক বিন যিয়াদকেও আন্দালুস বিজয়ের পর দামেস্কে ফিরে আসার পর পুনরায় কোনো বড় সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়নি। সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের তারিকের প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি ছিল না, বরং কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তিনি এই রণকুশলী সেনাপতিকে পুনরায় আন্দালুসে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। [১]

এই মহান ইসলামী বীরের অবশিষ্ট জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত হয়, এমনকি তাঁর মৃত্যুর বছরটিও ঐতিহাসিকদের জানা নেই। এমন মনে হয় যে, উম্মতকে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে এবং খিলাফতের সময়কালকে আশঙ্কা থেকে বাঁচাতে তিনি নিজেই নির্জনবাস বেছে নিয়েছিলেন, যাতে কোনো প্রকার দলাদলির সৃষ্টি না হয়।

আল্লাহর এই নেক বান্দারা সিন্ধু, মধ্য এশিয়া এবং আন্দালুসের মতো বিশাল ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা একটি কড়িও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা কতই না নিঃস্বার্থ ও নিরোভ মানুষ ছিলেন। তাঁদের কীর্তিও ছিল মহান এবং চরিত্রও।

সেনাপতিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ভূমিকা:

মহান ইসলামী সেনাপতিদের সাথে সুলাইমানের অনুচিত আচরণের কারণ ও ধরণ আমরা সতর্কতার সাথে বর্ণনা করেছি। কিছু ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কিছু অতিরঞ্জিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন যেগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করা কঠিন। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিককে নিষ্ঠুর, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন এবং সন্দেহপ্রবণ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি তেমন ছিল না। আমরা সতর্কতার সাথে যেসব ঘটনা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বর্ণনা করেছি, সেগুলোর আলোকে সুলাইমানকে অকারণে কারো ওপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত দেখা যায়নি।

কুতাইবা বিন মুসলিমের ব্যাপারে সুলাইমানকে মোটেও দোষারোপ করা যায় না। সুলাইমান তাঁকে পদে বহাল রাখার নিশ্চয়তাও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কুতাইবা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে চিঠি পড়ার আগেই বিদ্রোহ করে বসেন, যার পরিণতি ছিল দুঃখজনক। সুলাইমান মুহাম্মদ বিন কাসিমকেও পদে বহাল রেখেছিলেন। তবে পরবর্তীতে হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর ভুল অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তেজিত হয়ে তাঁর গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হত্যাকাণ্ডে সুলাইমান সরাসরি জড়িত ছিলেন না, বরং এই পদক্ষেপটি ছিল সালিহ বিন আব্দুর রহমানের। তবুও সিন্ধু বিজয়ীর ওপর যে জুলুম হয়েছে, তার দায় থেকে সুলাইমান মুক্ত নন। সুলাইমান নিজেও তা অনুভব করতেন এবং পরবর্তীতে এই বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য অনুশোচনা করতেন।

মুসা বিন নুসাইর এবং তারিককে তিনি অবশ্যই আন্দালুস থেকে অপসারিত করেছিলেন, যার ফলে ইউরোপে বিজয়ের ধারা থমকে গিয়েছিল। কিন্তু সুলাইমানের কাছে এই পদক্ষেপটি এজন্য প্রয়োজনীয় ছিল যাতে এত দূরবর্তী কোনো প্রদেশ মুসার পারিবারিক রাজ্যে পরিণত না হয়। সম্ভবত মুসা কর্তৃক তাঁর সন্তানদের আন্দালুসের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা এই সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করেছিল। যদিও মুসার মনে এমন কোনো চিন্তা ছিল না, কিন্তু খলিফা সন্দেহের বশবর্তী হয়েছিলেন। যা-ই হোক, ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে সুলাইমান যদি মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং মুসার ওপর ভরসা...

...করত এবং তাদের অভিযানগুলো আরও দশ-পনেরো বছর অব্যাহত থাকত, তবে সম্ভবত আজ বিশ্বের মানচিত্র অন্যরকম হতো।

আন্দালুসের নায়েবে হাকাম আব্দুল আজিজের হত্যাকাণ্ড:

আন্দালুস থেকে মুসা বিন নুসাইর (রহ.)-এর অপসারণ একদিকে যেমন ফ্রান্স ও ইউরোপের দিকে মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে স্থগিত করে দিয়েছিল, অন্যদিকে বিজিত আন্দালুসেও মুসলমানদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুসা (রহ.) সেখানে তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজকে নায়েব বানিয়ে এসেছিলেন। সুলাইমান পছন্দ করতেন না যে সেখানে কোনো একটি পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য থাকুক। তবে আব্দুল আজিজকে আন্দালুস থেকে অপসারণ করার আগেই স্থানীয় মুসলিম কর্মকর্তারা আব্দুল আজিজকে হত্যা করে ফেলে।

প্রকৃতপক্ষে আব্দুল আজিজ আন্দালুসের প্রাক্তন রাজা রডারিকের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তাঁর ধর্ম খ্রিস্টধর্মের ওপর অটল ছিলেন। আব্দুল আজিজ এই স্ত্রীর খুব খাতির করতেন। তাঁর অনুরোধে মাঝেমাঝে ঘরে ইউরোপীয় শাসকদের মতো মুকুট পরিধান করতেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এর খবর পেয়ে যান। সেই সাথে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি স্ত্রীর ভালোবাসায় খ্রিস্টান হয়ে গেছেন। ফলে উত্তেজিত সৈন্যরা আক্রমণ করে আব্দুল আজিজকে হত্যা করে। সেই সময় তিনি মসজিদে ফজরের নামাজের ইমামতি করছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এও লিখেছেন যে, এই গুজব ছড়ানোর পেছনে খলিফার হাত ছিল, কিন্তু এই কথার কোনো শক্তিশালী বর্ণনা বিদ্যমান নেই। যা-ই হোক, এটি নিশ্চিত যে আব্দুল আজিজ সচ্চরিত্রবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং প্রচুর নফল রোজা রাখতেন। তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁর হত্যাকাণ্ড যা-ই হোক না কেন, কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা ষড়যন্ত্রের অধীনেই হয়েছিল। [১]

সুলাইমানের যুগের সংস্কারসমূহ:

সুলাইমানের শাসনকাল বৈদেশিক বিজয়ের দিক থেকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখে না। তবে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ওপর তিনি অনেক মনোযোগ দিয়েছিলেন। ওয়ালিদের যুগে উমাইয়া খিলাফত বিজয়, তামাদুনিক উন্নতি এবং অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এই দিকগুলোতে আরও মনোযোগ দেওয়ার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল না। এর পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলো দূর করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুলাইমান এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন।

এই সিলসিলায় সরকারি কর্মকর্তা ও অফিসারদের সংশোধন সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল, যাদের কঠোর ও অসতর্ক আচরণের কারণে খিলাফত প্রতিষ্ঠানটিও বদনাম হচ্ছিল। বিগত কিছু খলিফার জালেম হিসেবে পরিচিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ এটিও ছিল যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তাঁর মতো কিছু গভর্নর ও তাঁদের অধীনস্থরা যখন জুলুম করত, তখন খলিফাদের পক্ষ থেকে সেই বাড়াবাড়িগুলো প্রতিকারের দিকে খুব কম মনোযোগ দেওয়া হতো। এই কারণে খলিফাদের নিজেদেরও জুলুমে জড়িত মনে করা হতো। যা-ই হোক, সুলাইমান সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই জুলুম প্রতিকারের কাজ শুরু করে দেন। নির্বাসিত ব্যক্তিদের ফিরে আসার অনুমতি দেন। সন্দেহবশত বন্দি করা ব্যক্তিদের মুক্তি দেন। কর্মকর্তা ও অফিসারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন, তবে এই প্রক্রিয়ায় কিছু জায়গায় জালেম কর্মকর্তাদের নির্দোষ অধীনস্থরাও এই ধরপাকড়ের কবলে পড়ে যায়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯৭ হিজরি

সামনে যেমন হাজ্জাজের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো বিজেতা রোষানলে পড়েছিলেন। সুলাইমান কিছু ধর্মীয় সংস্কারও করেছিলেন। গভর্নররা নামাজে দেরি করতে শুরু করেছিলেন। সুলাইমান তাদেরকে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ আদায়ের তাগিদ দেন। [১]

মসজিদুল হারামে পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি “কোহে শাবীর”-এর পাদদেশে মার্বেল পাথরের একটি বিশাল পুকুর তৈরি করান যাতে পাহাড়ী ঝর্ণার পানি জমা হতো। তারপর পুকুরের পানি পাইপলাইনের মাধ্যমে মসজিদুল হারামের চত্বরে পৌঁছাত যেখানে মার্বেল পাথরের আরেকটি ছোট পুকুর ছিল যাতে পানি ফোয়ারার আকারে উপচে পড়ত। এই ফোয়ারার কারণে মক্কায় মিষ্টি পানির প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং মসজিদুল হারামের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়। [২]

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের যুগের বিজয়সমূহ

সুলাইমান এই বিষয়টি ভালোভাবেই অনুভব করেছিলেন যে, বিগত যুগের প্রখ্যাত সেনাপতিদের অপসারণের কারণে জিহাদের ধারা থেমে গেছে, যার ফলে খেলাফত দরবারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুলাইমান এই ত্রুটি দূর করতে চেয়েছিলেন। তাই শীঘ্রই তিনি তাঁর প্রখ্যাত সেনাপতিদের বিভিন্ন ফ্রন্টের অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁদেরকে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করেন।

তবারস্তান বিজয়:

সুলাইমান ৯৭ হিজরিতে খোরাসানে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে নিযুক্ত করেন, যিনি বনু উমাইয়ার প্রাক্তন সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবি সুফরার পুত্র এবং একজন বড় প্রখ্যাত সৈনিক ছিলেন। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব কাস্পিয়ান সাগরের দিকে আক্রমণ করেন এবং এর চারপাশের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী সেই কাফের জাতিগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন যাদের বিদ্রোহ ও লুটতরাজ দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াজিদের এই অভিযানগুলো দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। অনেক জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হয় এবং বিজয় ইয়াজিদের পদচুম্বন করে। বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা “তবারস্তান”-এর শাসক বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে ইয়াজিদের সাথে সন্ধি করে নেন।

ইয়াজিদ এরপর জুরজানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং দুর্গম পাহাড়ি গিরিপথ অতিক্রম করে জুরজানের কেব্লা পর্যন্ত পৌঁছে যান। কঠোর অবরোধের পর অবশেষে শত্রুরা পরাজিত হয়। এভাবে এই অভিযান ৯৮ হিজরিতে সমাপ্ত হয়। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব এই জাতিগুলোকে বশীভূত করার পর “নহর জান”-কে একটি পূর্ণাঙ্গ শহরের আদলে নির্মাণ করে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করান। এভাবে এই এলাকাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৯, ত. নিযার

[২] তারিখে ইয়াকুবি, পৃ. ২২৮

[৩] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: সন ৯৭ হি., ৯৮ হি.

কন্সটান্টিনোপলের জিহাদ

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক চেয়েছিলেন যে ওয়ালিদের যুগের বিজয়ের স্মৃতিগুলো আবারও সজীব হোক এবং সিন্ধু ও আন্দালুসের বিজয়ের চেয়েও বড় কোনো জিহাদি কৃতিত্ব সম্পন্ন হোক। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। বিশ্বের এই মহান ঐতিহাসিক শহরে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং এরপর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে অভিযান চালানো হয়েছিল যা সফল হতে পারেনি। এরপর আর কেউ এদিকে ফিরে তাকায়নি। সে সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য চরম অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় কাইসার নাস্টাস-এর যুগ থেকে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা বর্তমান কাইসার ‘থিওডোসিয়াস তৃতীয়’-এর শাসনামলেও অব্যাহত ছিল; তাই বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করার জন্য এটিই ছিল সর্বোত্তম সুযোগ।

সুলাইমান যখন এই অভিযানের দায়িত্ব নিলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং কুতাইবা বিন মুসলিমের মতো তলোয়ারবাজদের অনুপস্থিতিতে এই অভিযান ততক্ষণ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে না যতক্ষণ না তিনি নিজে সেনাবাহিনীর সাথে বের হন। এটি ছিল বড় সাহসের কাজ। বিগত খলিফাদের মধ্যে কেউ এত দূরবর্তী রণাঙ্গনে নিজে অগ্রসর হননি। আবার সুলাইমান স্বভাবগতভাবে বিলাসপ্রিয় এবং আরামপ্রিয় ছিলেন; তাই তার কাছ থেকে এমন সাহসের আশা করা যেত না; কিন্তু একবার সংকল্প করার পর আল্লাহর এই বান্দা কোনো সমস্যার পরোয়া করেননি এবং ৯৮ হিজরিতে এক বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে নিজের ছেলে এবং পরিবার-পরিজনসহ এই কঠিন অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। ওমর বিন আব্দুল আজিজ এবং রাজা বিন হাইওয়াহ উপদেষ্টা হিসেবে তার সাথে ছিলেন। এছাড়া বনু উমাইয়ার অন্যান্য রাজপুত্র এবং বিশিষ্ট আমীরগণও তার সফরসঙ্গী ছিলেন। এই অভিযান জল ও স্থল উভয় পথেই পরিচালিত হচ্ছিল।

সুলাইমানের নিজের যুদ্ধ পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন তার ছোট ভাই মাসলামা বিন আব্দুল মালিক, যিনি একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং নামকরা যোদ্ধা ছিলেন। সুলাইমান সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগ এবং রসদ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য সীমান্ত দুর্গ ‘দাবিক’-এ তাবু গাড়েন, অন্যদিকে মাসলামা এশিয়া মাইনরের শেষ প্রান্ত ‘আমোরিয়াম’ হয়ে কন্সটান্টিনোপল প্রণালীতে পৌঁছে যান। এখানে নৌবহরও তার সাথে যোগ দেয়। মাসলামা প্রণালী পার হয়ে রোমান রাজধানীর সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেন এবং স্থলপথ থেকেও অবরোধ করেন।

মুসলমানদের এই অভিযানে লিওন নামক এক রোমান রাজনীতিবিদের গোপন সহায়তা ছিল। এই ব্যক্তি অত্যন্ত চতুর ছিলেন এবং কাইসার রোমকে মুসলমানদের আক্রমণের ভয় দেখিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং নিজে সিংহাসন দখল করতে চেয়েছিলেন। তিনিই মাসলামাকে তার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে অবরোধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এই শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন যে, যদি কন্সটান্টিনোপল বিজয় হয়ে যায়, তবে তিনি এই দেশের খাজনা মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে একজন অনুগত শাসক হিসেবে থাকবেন।

যখন অবরোধের কঠোরতায় কাইসার রোমের সাহস ভেঙে পড়তে শুরু করল, তখন লিওন পরবর্তী চাল চাললেন এবং রোমান আমীরদের প্রস্তাব দিলেন যে তারা যেন তাকে বাদশাহ বানিয়ে নেয়, তবে তিনি মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবেন। আমীরগণ তার ওপর আস্থা রেখে বর্তমান কাইসারকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং লিওনকে...

সিংহাসনে বসিয়ে দিল। লিওনের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল; তাই সিংহাসনে আরোহণের পর সে মুসলমানদের সাথে করা চুক্তিকে পেছনে ফেলে দিল এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখল।

মাসলামা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি বিজয় অর্জন না করে ফিরে যাবেন না। সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাহায্য এবং খাদ্য ও রসদ সরবরাহ অব্যাহত ছিল, তবুও মাসলামা সতর্কতা হিসেবে আশেপাশের জমিতে ফসল চাষ করালেন যাতে কোনোভাবেই খাদ্যের অভাব দেখা না দেয়।

এই সময়ে শীতকাল শুরু হয়ে গেল। ভাগ্যের পরিহাস যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি তুষারপাত হতে লাগল। ইসলামী বাহিনী এত কঠোর শীতে অভ্যস্ত ছিল না, হাজার হাজার সৈন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। শত শত মানুষ প্রাণ হারাল। চাষ করা ফসল নষ্ট হয়ে গেল। তুষারপাত সরবরাহ লাইনও বন্ধ করে দিল এবং সৈন্যরা খাদ্যাভাবের শিকার হলো। এই পরিস্থিতিতে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। মাসলামা বারবার দূত পাঠিয়ে সুলায়মানের কাছে ফিরে আসার অনুমতি চাইলেন, যিনি তখনও “দাবিক”-এর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাজপরিবার এবং বনু উমাইয়াদের আমিরদের সমাবেশের কারণে সেই সময় “দাবিক”-এর ক্যাম্পটি একটি শহরের রূপ ধারণ করেছিল।

সুলায়মান এখানেই অবস্থান করলেন এবং বিজয় ছাড়া ফিরে যেতে রাজি হলেন না। এখানকার আবহাওয়াও ছিল কঠোর। সুলায়মান নিজেও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া তার কাছে অসহনীয় ছিল। একদিন তিনি এক ব্যক্তির জানাজায় শরিক হলেন। দাবিকের একটি ক্ষেতে লাশ দাফন করা হলো। সুলায়মান, যিনি মৃত্যু এবং আখেরাতকে খুব বেশি স্মরণ করতেন, কবরের মাটি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন: “এই মাটি কতই না চমৎকার ও পবিত্র।”

এক-দুই দিন পর তিনি গোসল করে নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে আয়না দেখছিলেন। নিজের সৌন্দর্য দেখে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল: “আমিই তো যুবক বাদশাহ!”

এক দাসী পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলায়মান তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কী দেখছ?”

সে তাৎক্ষণিকভাবে এই কবিতাটি আবৃত্তি করল:

أَنْتَ نِعَمَ الْمَتَاعُ لَوْ كُنْتَ تَبْقَى ... غَيْرَ أَنْ لَا بَقَاءَ لِلْإِنْسَانِ
لَيْسَ فِيمَا عَلَيْهِ فَيْكَ عَيْبٌ ... كَانَ فِي النَّاسِ غَيْرُ أَنَّكَ فَانٍ

“আপনি যদি টিকে থাকতে পারতেন তবে আপনি হতেন সর্বোত্তম পাথের। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে টিকে থাকা নেই। আমি যতটুকু জানি আপনার মধ্যে এমন কোনো দোষ নেই যা অন্য মানুষের মধ্যে থাকে, কেবল এটি ছাড়া যে আপনি নশ্বর।” [১]

এই ঘটনাগুলোর মধ্যে যেন সুলায়মানের মৃত্যুর পদধ্বনি লুকিয়ে ছিল।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯৯

সুলাইমানের অসুস্থতা ও মৃত্যু... উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন:

কিছু দিন পর আবহাওয়ার তীব্রতায় রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় সুলাইমানের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তার বড় ছেলে আইয়ুব, যাকে সে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিল, কিছুকাল আগেই ইন্তেকাল করেছিল; তাই সে তার উত্তরাধিকারী নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তার যুবক ছেলে দাউদ যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। সুলাইমান তাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাইল এবং তার উপদেষ্টা রাজা বিন হাইওয়াকে জিজ্ঞাসা করল: “আমার ছেলে দাউদ সম্পর্কে তোমার পরামর্শ কী?”

রাজা বললেন: “তার কোনো খবর নেই, সে জীবিত আছে কি না তাও জানা নেই।”

সুলাইমান বললেন: “ঠিক আছে, আমার অন্য ছেলেদের জামা ও চাদর পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

ঐ শিশুদের রাজকীয় পোশাক পরিয়ে সামনে আনা হলো। শিশুরা ছোট ছিল; তাই জামা ও চাদরগুলো মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। সুলাইমান আক্ষেপের সুরে বললেন:

إِنَّ بَنِي صَبِيَّةٍ صِغَارُ ... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ كِبَارُ

“আমার সন্তানরা ছোট ও অল্পবয়সী। সেই ব্যক্তিই সফল যার ছেলেরা বড়।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

“নিশ্চয়ই সফল সেই ব্যক্তি যে পবিত্র হয়েছে, যে তার রবের নাম স্মরণ করেছে এবং সালাত আদায় করেছে।”

তারপর সুলাইমান বললেন: “তাদের কোমরে তলোয়ার বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

নির্দেশ পালন করা হলো। শিশুদের যখন এভাবে আনা হলো, তখন তলোয়ারগুলো তাদের সাথে মাটিতে হেঁচড়ে আসছিল।

সুলাইমান এটি দেখে দুঃখিত স্বরে বললেন:

إِنَّ بَنِي صَبِيَّةٍ صَيْفِيُونُ ... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيُونُ

“আমার সন্তানরা ছোট এবং শেষ বয়সের সন্তান। সেই ব্যক্তিই সফল যার সন্তানরা তার যৌবনকালে জন্মগ্রহণ করেছে।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

“নিশ্চয়ই সফল সেই ব্যক্তি যে পবিত্র হয়েছে, যে তার রবের নাম স্মরণ করেছে এবং সালাত আদায় করেছে।”

সুলাইমানের দৃষ্টি এবার উমর বিন আব্দুল আজিজের ওপর স্থির হলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার চেয়ে উত্তম উত্তরাধিকারী আর কেউ হতে পারে না। তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল: “আল্লাহর কসম! আমি এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে যাব যার মধ্যে শয়তানের কোনো প্রভাব থাকবে না।”

তিনি নির্জনে রাজা বিন হাইওয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন: “উমর বিন আব্দুল আজিজ সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?”

রাজা বললেন: “তিনি অনেক বড় আলেম, ফাযেল এবং নেক মুসলমান।”

সুলাইমান বললেন: “আল্লাহর কসম! আমারও একই ধারণা, কিন্তু আমি যদি আব্দুল মালিকের সন্তানদের পুরোপুরি উপেক্ষা করে তাঁকে খলিফা বানিয়ে দিই, তবে এই লোকেরা তাঁর শাসন টিকে থাকতে দেবে না; তাই আমি উমরকে খলিফা এবং ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিককে তাঁর ওয়ালি আহদ মনোনীত করছি। এভাবে পরিবারের লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে উমরের খেলাফত মেনে নেবে।”

রাজা সমর্থন করলেন। সুলাইমান তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে এই অসিয়তনামা লিখে দিলেন।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম!

“এই লেখা আল্লাহর বান্দা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে উমর বিন আব্দুল আজিজের জন্য। আমি আমার পরে তোমাকে খলিফা বানালাম এবং তোমার পরে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিককে। হে মুসলমানগণ! কথা শোনো এবং আনুগত্য করো। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিজেদের মধ্যে মতভেদ করো না, অন্যথায় শত্রুরা তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করবে।”

সুলাইমান অসিয়তনামাটি মোহরবদ্ধ করে রাজার কাছে হস্তান্তর করলেন এবং তাকিদ দিলেন যেন তিনি রাজপরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করেন এবং উমর বিন আব্দুল আজিজের নাম প্রকাশ না করেই মনোনীত খলিফার জন্য তাদের বায়আত গ্রহণ করেন।

রাজা তখনই গিয়ে রাজপরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সেনাবাহিনীর আমিরদের কাছ থেকে পরবর্তী খলিফার বায়আত গ্রহণ করলেন। সবাই বায়আত করল। এর কিছুক্ষণ পর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের রুহ পরওয়াজ করল (ইন্তেকাল করলেন)। এই ঘটনা ২০ সফর ৯৯ হিজরির।

রাজা কৌশলগত কারণে এই খবরটি গোপন রাখলেন। মরহুম খলিফার লাশ বালিশের সাহায্যে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং একজন চতুর খাদেমকে পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। এরপর আমিরদের মজলিসে ঘোষণা করা হলো যে, খলিফা তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য নিজের সামনেও বায়আত নিতে চান। সবাই একে একে সুলাইমানের তাঁবুতে গেল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করত। খাদেম খলিফা অসুস্থতার কারণে উত্তর দিতে অক্ষম—এমন ভাব প্রকাশ করে তাঁর পক্ষ থেকে নিজেই উত্তর দিত এবং তারপর বলত: “আমিরুল মুমিনীন চান যে আপনারা ওয়ালি আহদের বায়আত ও আনুগত্যের ওপর অটল থাকুন।” প্রত্যেক আমির ও শাহজাদা এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসত। এভাবে উমর বিন আব্দুল আজিজের বায়আত গ্রহণের পর্যায়াটি সফলভাবে সম্পন্ন হলো। [১] এই সমস্ত কার্যক্রম রাজধানী থেকে শত শত মাইল দূরে ‘দাবিক’-এর সামরিক ছাউনিতে হচ্ছিল।

উমর বিন আব্দুল আজিজ প্রচলিত রাজনীতির কলুষতা দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই সরকারি পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন; তাই তাঁর মনে শাসনের বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না, কিন্তু তাঁর এই আশঙ্কা হলো যে অসিয়তনামায় কোথাও তাঁর নাম লিখে দেওয়া হয়নি তো; তাই তিনি রাজা বিন হাইওয়ার সাথে দেখা করলেন এবং কসম দিয়ে বললেন: “আমার ভয় হচ্ছে অসিয়তটি আমার সম্পর্কে না হয়। আপনাকে কসম দিয়ে বলছি যে যদি এমনটি হয় তবে আমাকে জানিয়ে দিন যাতে আমি আগেই ইস্তফা দিয়ে দিই।”

[১] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩৩; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৯৯ হিজরির অধীনে।

রাজা বললেন: “আমি একটি অক্ষরও বলতে পারব না।”

এতে উমর বিন আবদুল আজিজ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ফিরে গেলেন। [১]

সুলাইমানের দাফন-কাফনের আগে রাজা বিন হাইওয়াহ শাসক পরিবারের শাহজাদা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করে আরও একবার তাদের কাছ থেকে পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়তনামা মেনে চলার বায়আত গ্রহণ করলেন। যখন সবাই দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল, তখন অসিয়তনামার ইবারত ঘোষণা করে বলা হলো: “আমি আমার পরে উমর বিন আবদুল আজিজকে খলিফা নিযুক্ত করেছি।”

শাহজাদা হিশাম বিন আবদুল মালিক, যিনি খেলাফতের সবচেয়ে বড় আশাবাদী ছিলেন, এটি শোনামাত্রই ‘হায়’ বলতে বলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। একজন শামী আমির তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন: “আমিরুল মুমিনীনের আদেশের ওপর ‘হায়’ বলছ!!” ইতিমধ্যে অসিয়তনামার বাকি অংশ পাঠ করা হলো।

“আর আমি উমর বিন আবদুল আজিজের পরে ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিককে খলিফা নিযুক্ত করলাম। তোমরা শোনো এবং মানো।”

এটি শুনে হিশাম বিন আবদুল মালিক বললেন: “আমরা শুনলাম এবং মানলাম।”

এরপর সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের জানাজার নামাজ পড়া হলো। মৃতদেহ কেল্লার বাইরে আনা হলো এবং দাফন সম্পন্ন করা হলো। [২]

সুলাইমানের নিজের সন্তানদের পরিবর্তে উমর বিন আবদুল আজিজকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত বরকতময় একটি সিদ্ধান্ত। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পারিবারিক স্বার্থের ওপর উম্মতের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতেন। এই নেক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কতটুকু কল্যাণ প্রকাশ পেয়েছে, তা আমরা সামনে হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর জীবনীর অধীনে পড়ব।

সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের যুগের ওপর এক নজর:

সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের শাসনকাল সংক্ষিপ্ত ছিল। তিনি মাত্র দুই বছর আট মাস সময় পেয়েছিলেন। তার অবস্থান দামেস্কের পরিবর্তে বেশিরভাগ সময় ফিলিস্তিনের শহর ‘রামলা’-তে হতো। তার ভাই ওয়ালিদের খেলাফতকালে তাকে ফিলিস্তিনের প্রশাসক বানানো হলে এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার অত্যন্ত পছন্দ হয়। সে সময় রামলা একটি ছোট জনপদ ছিল। সুলাইমান এখানে নিজের অবস্থানের জন্য কিছু ইমারত নির্মাণ করান। খলিফা হওয়ার পর তিনি ‘রামলা’ শহরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ করান। এখানে কেল্লা, প্রাসাদ, সরকারি ভবন, বাগান, পুকুর ও জলাধার নির্মাণ করান। একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে এখানে আবাদ করেন। এভাবে এই জনপদটি একটি সুন্দর শহরের রূপ ধারণ করে। সুলাইমানের এখানে দীর্ঘ অবস্থানের কারণে এই শহরটি অস্থায়ী রাজধানী হওয়ার গৌরবও লাভ করে। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯৯ হিজরি।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৩৫, ৩৩৬, দার সাদির; সিরাতে উমর বিন আবদুল আজিজ লি-ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ৩৬।

[৩] মুজামুল বুলদান: ৩/৬৯ রামলা-এর অধীনে; তারিখে ইয়াকুবি, পৃ. ২২৮।

সুলাইমান বনু মারওয়ানের নেককার খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিকে উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন; তাই উলামায়ে কেরাম তাকে ‘মিফতাহুল খায়ের’ (কল্যাণের চাবিকাঠি) বলে স্মরণ করতেন। তিনি সামান্য অপরাধ বা সন্দেহবশত বন্দি ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলে অধিকাংশ কারাগার খালি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার কোমলতা ও উদারতার কারণে তাকে খুব ভালোবাসত। আখেরাতের আলোচনায় অবোরে কাঁদা ছিল তার অভ্যাস। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬৪৩ থেকে ৬৪৬; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৯, ১৭০; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯৯ হিজরি।

হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

সফর ৯৯ হিজরী... হতে... রজব ১০১ হিজরী

সেপ্টেম্বর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ... হতে... ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিষ্টাব্দ

বনু উমাইয়া তাদের সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী, শানদার এবং সামরিক ভিত্তির ওপর অত্যন্ত সুদৃঢ় সরকারের মালিক ছিল। বাহ্যত এটা সম্ভব ছিল না যে, তাদের শাসনব্যবস্থায় কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক সংস্কারমূলক আন্দোলন শক্তির জোরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। অতীতে হযরত হুসাইন (রা.) জনশক্তির মাধ্যমে সরকারকে শুরা বা পরামর্শভিত্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার যে চেষ্টা করেছিলেন, তা কুফাবাসীদের হীনম্মন্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং শাসকদের কঠোরতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) শুরা ভিত্তিক সরকার কায়েম করতে সফল হলেও বনু উমাইয়ার ক্রমাগত প্রতিরোধের কারণে নিজের সংস্কারের কোনো স্থায়ী ছাপ না রেখেই রাজনীতির দাবার ছক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এখন জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টিতে সরকারের মধ্যে সৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি সংস্কারের একটিই পথ বাকি ছিল, আর তা হলো খোদ শাসক পরিবারের মধ্য থেকেই কোনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আল্লাহর বান্দা দাঁড়িয়ে যাবেন এবং শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় খিলাফতে রাশেদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেবেন। অবশেষে প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে ঐশী ইচ্ছা এই অলৌকিক ঘটনা দেখাল এবং এই মহান কাজের জন্য “উমর দ্বিতীয়”-কে নির্বাচন করা হলো, যাকে উমর বিন খাত্তাব (রা.) স্বপ্নে দেখে চমকে জেগে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন: “আমার সন্তানদের মধ্যে সে কে হবে যার নামও হবে উমর এবং চরিত্রও হবে উমরের মতো।” [১]

উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রপৌত্র:

উমর বিন আবদুল আজীজ (রা.) ছিলেন বনু উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান বিন আল-হাকামের নাতি এবং হযরত উমর (রা.)-এর প্রপৌত্র। বনু উমাইয়া এবং ফারুকী পরিবারের এই মিলন সেই দিনগুলোতে হয়েছিল যখন হযরত উমর (রা.) দুধে পানি মেশানো নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি এক রাতে টহল দিচ্ছিলেন তখন একটি ঘর থেকে আওয়াজ এল, এক মহিলা বলছিল: “মেয়ে সকাল হতে চলেছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও।”

[১] সীরাতে উমর বিন আবদুল আজীজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ২৪

মেয়েটি উত্তর দিল: “মা! আপনি কি জানেন না যে আমিরুল মুমিনীন এটি করতে নিষেধ করেছেন?”

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল: “আমিরুল মুমিনীন এই মুহূর্তে কোথায় আছেন, তিনি আর কী জানবেন?”

মেয়েটি উত্তর দিল: “আমিরুল মুমিনীন না জানলেও আল্লাহ তো দেখছেন।”

হযরত উমর (রা.) এই ঘরটি নজরে রাখলেন এবং নিজের ছেলে আসিমকে এই মেয়ের সাথে বিবাহের উৎসাহ দিয়ে বললেন: “তুমি এই মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দাও। আমার আশা আছে যে তার গর্ভ থেকে এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যে সমগ্র আরবের ওপর শাসন করবে।”

আসিম তাকে বিবাহ করলেন। এই মহিলার গর্ভ থেকে উম্মে আসিম জন্ম নেন যার বিবাহ মারওয়ান বিন আল-হাকামের ছেলে আব্দুল আজিজের সাথে হয়। আব্দুল আজিজ একুশ বছর পর্যন্ত মিশরের গভর্নর ছিলেন। ৬৩ হিজরিতে তাদের ঘরে উমরের জন্ম হয়। [১]

শিক্ষা ও লালন-পালন:

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর লালন-পালন ও শিক্ষা অত্যন্ত সচ্ছলতার মধ্যে হয়েছিল। শৈশবেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। বারো-তেরো বছর বয়স হলে তার পিতা তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দেন। মদীনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস সালিহ বিন কায়সানকে তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি উমরের খোঁজখবর রাখতেন। একবার জানা গেল যে উমর চুল বিন্যস্ত করার ব্যস্ততার কারণে সালাতে দেরি করেছেন। তৎক্ষণাৎ মিশর থেকে একজন বার্তাবাহক পাঠানো হলো যে কিছু না বলেই উমরের চুল কেটে দিল। এই প্রশিক্ষণের প্রভাবে তিনি সুন্নতের অনুসরণ এবং ইলম ও ফজিলতে তার পুরো পরিবারের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি প্রবীণ সাহাবী যেমন সাহল বিন সাদ, সাযিব বিন ইয়াজিদ এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-এর কাছ থেকে নববী হাদীস শ্রবণ করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে উরওয়াহ বিন যুবায়ের এবং সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আনাস বিন মালিক (রা.) একবার মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন এবং উমর বিন আব্দুল আজিজের পেছনে সালাত আদায়ের সুযোগ পেয়ে বললেন: “আমি নবী আকরাম (সা.)-এর সালাতের সাথে এই যুবকের সালাতের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ সালাত আর কারো দেখিনি।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর গায়ের রং ছিল গন্দমী (শ্যামলা), চেহারা সুন্দর ও সুঠাম, দাড়ি ছিল এবং শরীর ছিল শক্তিশালী ও সুগঠিত। তবে খিলাফতের পর কঠোর পরিশ্রমের কারণে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন এবং চোখ ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। [২] ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তার জীবন বনু মারওয়ানের শাহজাদাদের মতো ছিল। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে সুবেশধারী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। অত্যন্ত দামী পোশাক এবং উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। যে গলি দিয়ে তিনি যেতেন তা দীর্ঘক্ষণ সুগন্ধিতে মৌ মৌ করত। যে পোশাক একবার ব্যবহার করতেন, দ্বিতীয়বার তার পালা আসত না। নায-নেয়ামত তার প্রকৃতি ও চলন-বলনে এক বিশেষ কোমলতা তৈরি করেছিল; তাই তার নায-আদায়ে চলার এক অনন্য ভঙ্গি ছিল। এই ভঙ্গি ‘উমরী স্টাইল’ (উমরী স্টাইল) নামে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। মদীনার শিশুরা তাকে এর মাধ্যমেই চিনত।

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৪/২৩; সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে জাওযী, পৃ. ৯

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৫/১১৫, ১১৬

...এর উদ্ধৃতি দিয়ে আনন্দিত হতেন। [১]

আপনাকে দেখে দূরদর্শী লোকেরা বলে উঠতেন যে, এই যুবক ভবিষ্যতে অসাধারণ মর্যাদা লাভ করবে। খালিদ বিন ইয়াজিদ আপনার সম্পর্কে তাঁর এক সাক্ষাতকারীকে বলেছিলেন: “যদি তুমি বেঁচে থাকো, তবে তুমি এই যুবককে হেদায়েতের ইমাম হিসেবে দেখতে পাবে।” [২]

গভর্নর থাকাকালীন সময়ে:

আপনি শুরু থেকেই শাসকদের কঠোরতা এবং স্বৈরাচারকে সমাজের জন্য মারাত্মক বিষ মনে করতেন। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যেহেতু একজন সৈনিক স্বভাবের শাসক ছিলেন; তাই তিনি অধিকাংশ প্রদেশে সামরিক মেজাজের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের কঠোরতা দেখে উমর বিন আব্দুল আজিজ বলতেন: “শামে ওয়ালিদ, ইরাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, ইয়েমেনে তার ভাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, মিশরে কুররা বিন শারিক এবং হিজাজে উসমান বিন হাইয়ান মুররি। আল্লাহর জমিন জুলুমে ভরে গেছে।” [৩]

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যখন তাঁর শাসনামলে তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারার গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি একজন আদর্শ শাসকের ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর উত্তম আচরণ ও চমৎকার চরিত্রের মাধ্যমে প্রজাদের মন জয় করে নেন। উমর বিন আব্দুল আজিজের মনে শুরু থেকেই ইসলামী সরকারের সেই নকশা গেঁথে ছিল যা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দেখা যেত, যার কাঠামো কুরআন ও সুন্নাহর নসসমূহে বিদ্যমান এবং যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সীরাত ও ইতিহাসের বর্ণনায় পড়তেন ও শুনতেন। তিনি ব্যক্তিগত শাসনের পক্ষে ছিলেন না এবং জানতেন যে, এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা বৈধতার সীমার মধ্যে থাকলেও ইসলামের বিশ্বজনীন মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না; তাই তিনি সরকারে বিজ্ঞ ও জ্ঞানী মুসলমানদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ এবং শূরা ও পরামর্শের প্রসারের প্রবক্তা ছিলেন। একারণেই গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই তিনি মদিনা মুনাওয়ারার উলামা, ফুকাহা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে বলেছিলেন: “আমি আপনাদেরকে এমন একটি কাজের জন্য কষ্ট দিয়েছি যাতে আমাকে সাহায্য করলে আপনারা সওয়াব পাবেন। আপনারা হকের সমর্থক হিসেবে গণ্য হবেন। আমি আপনাদের রায় ও পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ সম্পন্ন করব না। যখন আপনারা কাউকে জুলুম করতে দেখবেন বা আপনাদের কাছে কারো জুলুম ও অন্যায়ের খবর পৌঁছাবে, তখন আপনারা আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন।”

এই উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যে কাসিম বিন মুহাম্মদ, عروه بن زبير (উরওয়া বিন জুবায়ের), সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, আবু বকর বিন উমর বিন হাযম এবং সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিবের মতো ইলমের দিকপালরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং তাঁদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। [৪] সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো খলিফা বা আমিরের কাছে যেতেন না, কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজিজের কাছে যেতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। [৫]

মদিনায় অবস্থানকালে উমর বিন আব্দুল আজিজ মসজিদে নববীতে প্রচুর পরিমাণে জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে আসতেন এবং সেই স্থানেই বসে মুসহাফ নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করে দিতেন, আর এত কাঁদতেন যে দাড়ি ভিজে যেত। [৬]

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওযি, পৃ. ৪১; সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০১ হিজরি, জীবনী: উমর বিন আব্দুল আজিজ

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৪৬

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওযি, পৃ. ৪১; সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৭; তাবাকাত ইবনে সাদ মুতাম্মিমুত তাবিঈন, পৃ. ১২৫; তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/৩৮২, ত. সাদির

[৫] সীরাত উমর লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ২৭

[৬] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওযি, পৃ. ৪২

তিনি তাবেয়ীন কেরামের পূর্ণ সম্মান বজায় রাখতেন। এক রাতে মসজিদে নববীতে নফল নামাজের সময় অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.ও মসজিদের কাছেই কোথাও ছিলেন। তাঁর কাছে এটি অপছন্দনীয় মনে হলো। তিনি তাঁর গোলামকে বললেন: “এই তিলাওয়াতকারীকে এখান থেকে সরিয়ে দাও, তার আওয়াজ আমাদের বিরক্ত করছে।”

গোলাম তার জায়গা থেকে নড়ল না এবং হযরত উমর রহ. যথারীতি নিজের ধ্যানে তিলাওয়াতে মগ্ন রইলেন। কিছুক্ষণ পর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. গোলামকে পুনরায় বললেন: “আরে! আমি কি বলিনি যে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও?” গোলাম বলল: “হযরত! মসজিদ তো আমাদের জায়গির নয়।”

ইতিমধ্যে হযরত উমর রহ.-এর কানে এই আওয়াজ পৌঁছে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠলেন এবং মসজিদের অন্য কোণে চলে গেলেন। একবার তিনি তাঁর দূতকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। সে ভুলবশত গিয়ে বলে দিল যে, আমীর সাহেব আপনাকে ডাকছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. কোনো খলিফা বা আমীরের কাছে যাওয়া পছন্দ করতেন না, কিন্তু হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর ডাক অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলেন। তিনি চলে এলেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. তাঁকে আসতে দেখে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন: “আমরা দূতকে আপনার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে ভুলবশত আপনাকে আসার কথা বলে দিয়েছে। আল্লাহর দোহাই! আপনি আপনার জায়গায় ফিরে যান। দূত সেখানেই গিয়ে আপনার কাছ থেকে মাসআলা জেনে নেবে।” [১]

জুলুমের প্রতি অনীহা এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব:

মদীনার এই শাসনের সময় এমন দুটি ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে কোনো অপরাধের কারণে জেলে পাঠান। সে যতটুকু শাস্তির যোগ্য ছিল, ততটুকু সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও তিনি তাকে মুক্তি দেননি। তাঁর খাস খাদেম “মুজাহিম” একজন মুত্তাকী মানুষ ছিলেন যিনি প্রায়ই তাঁকে ভালো পরামর্শ দিতেন। তিনি কয়েদির সুপারিশ করে তাকে মুক্তি দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। উমর ইবনে আবদুল আজিজ অপরাধীর ওপর খুব রাগান্বিত ছিলেন, তাই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন মুজাহিম সমস্ত আদব-কায়দা একপাশে রেখে বললেন:

“উমর! আমি আপনাকে সেই রাত সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছি যা কিয়ামতে গিয়ে শেষ হবে। যার সকালে হাশরের দিন কায়েম হবে।” উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলতেন: “মুজাহিমের কথাগুলো যেন আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিল।” [২]

দ্বিতীয় ঘটনাটি ৯৩ হিজরিতে ঘটেছিল যা তাঁর হৃদয়কে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের রা.-এর সাহেবজাদা খুবাইব রহ.-এর শাস্তির ধকল সহ্যে না পেরে মৃত্যুবরণ করা। খুবাইব রহ.-এর কোনো আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে খলিফা ওয়ালিদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে একশ দোররা মেরে মাথায় বরফশীতল পানির মশক ঢেলে দেওয়া হোক এবং প্রচণ্ড শীতে মসজিদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হোক। উমর ইবনে আবদুল আজিজ এই শাস্তি তো কার্যকর করেছিলেন, কিন্তু এই নির্যাতনে খুবাইব রহ.-এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে এবং তিনি শয্যাশায়ী হন। উমর ইবনে আবদুল আজিজ এখন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি অনবরত তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকলেন।

[১] সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ২৭

[২] তারিখে দামেশক: ৫৭/৩৭৫, ৩৭৬

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬/৪৮২

যাইহোক, খুবাইব (রহ.) সুস্থ হতে পারলেন না এবং প্রকৃত অষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। এক ব্যক্তি এই দুঃখজনক সংবাদ নিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছাল, দেখল উমর বিন আবদুল আজিজ অস্থির অবস্থায় বারবার উঠছেন আর বসছেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখামাত্রই উমর বিন আবদুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন: “রোগীর কী অবস্থা?” উত্তর এল: “দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।” উমর বিন আবদুল আজিজ এ কথা শুনেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মূর্ছা যাওয়ার পর ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়তে পড়তে উঠলেন এবং গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। সারা জীবন তিনি নিজেকে খুবাইব (রহ.)-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করে আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত থাকতেন। কেউ বড় বড় কীর্তির জন্য তাঁর প্রশংসা করলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন: “খুবাইবের সাথে যা করা হয়েছে তার কী হবে?” [১]

মদিনার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর আপনি যখন সেখান থেকে রওনা হলেন, তখন দিয়ারে নববী ছেড়ে যাওয়ার কারণে আপনার হৃদয়ে শোকের এক সমুদ্র উথলে উঠছিল। আপনি ফিরে মদিনা শহরের দিকে তাকালেন এবং নিজের খাদেমকে বললেন: “মুজাহিম! আমি ভয় পাচ্ছি যে আমরা যেন ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হই যাদেরকে মদিনা বের করে ছুড়ে ফেলে দেয়।” [২]

উমর বিন আবদুল আজিজ, ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের দরবারে:

উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) দামেস্কে চলে এলেন, ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তাঁকে নিজের পারিষদদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এই সময়েও আপনি সমানভাবে সত্য কথা বলার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং এ ব্যাপারে জীবনের ঝুঁকিরও পরোয়া করেননি।

একবার আপনি ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সাথে একান্তে সাক্ষাতের সময় চাইলেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কাছে শিরকের পর রক্তপাতের চেয়ে বড় কোনো গুনাহ নেই, আপনার শাসকরা মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলে এবং কেবল অজুহাত তৈরির জন্য লিখে দেয় যে এই নিহত ব্যক্তির অপরাধ এই ছিল। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ আপনার সাথেই হবে এবং আপনারই পাকড়াও হবে, তাই সমস্ত শাসকদের লিখে দিন যে কেউ যেন কাউকে মৃত্যুদণ্ড না দেয় বরং তার অপরাধ আপনার কাছে লিখে পাঠায়, তারপর আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে তার ফয়সালা করবেন।”

ওয়ালিদের কাছে এই পরামর্শ পছন্দ হলো। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত গভর্নরদের কাছে এই নির্দেশ লিখে পাঠাল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাড়া আর কেউ এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কিন্তু হাজ্জাজের কাছে এই নির্দেশ অত্যন্ত কষ্টদায়ক মনে হলো, তার মনে হলো এই নির্দেশ বিশেষভাবে তাকেই পাঠানো হয়েছে। সে তদন্ত করে জানতে পারল যে খলিফাকে এই পরামর্শ উমর বিন আবদুল আজিজ দিয়েছেন। হাজ্জাজ ওয়ালিদকে নিজের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আশ্বস্ত করার জন্য এক চাল চালল। সে এক গ্রাম্য খারিজিকে ডেকে পাঠাল যে অত্যন্ত বদমেজাজি ও রক্ষ স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিল। হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করল: “মুয়াবিয়া সম্পর্কে তুমি কী বলো?” সে তাঁর দোষত্রুটি বর্ণনা করতে শুরু করল। হাজ্জাজ বলল: “ইয়াজিদ সম্পর্কে কী ধারণা?” সে ইয়াজিদকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল: “আবদুল মালিক সম্পর্কে কী রায়?” সে বলল: “জালেম ছিল।” হাজ্জাজ বলল: “আর ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক?”

খারিজি বলল: “এ তো সবার চেয়ে বড় জালেম যে জেনেবুঝে তোমার মতো জালেমকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।”

[১] সিরাতে উমর বিন আবদুল আজিজ লি-ইবনে জাওজি, পৃ. ৪৩, ৪৪

[২] সিরাতে উমর বিন আবদুল আজিজ লি-ইবনে আবদুল হাকাম, পৃ. ৩১, ৩২

হাজ্জাজ সেই খারিজিকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সাথে ওয়ালিদের নামে এই চিরকুট পাঠালেন:

“আমি আমার দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। আপনি আমাকে যে প্রজাদের ওপর শাসক নিযুক্ত করেছেন, আমি তাদের সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা প্রদান করি। আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করি যেন এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা না করি যে হত্যার যোগ্য নয়। এই নিন! এখন আমি আপনার কাছে একজন ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি। আমি এই ধরনের বিকৃত চিন্তাধারা পোষণকারী ব্যক্তিদের হত্যা করতাম। এখন আপনি এবং এই ব্যক্তি।”

ওয়ালিদ জনাকীর্ণ দরবারে, যেখানে উমর ইবনে আবদুল আজিজও উপস্থিত ছিলেন, সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন:

“আমার সম্পর্কে তুমি কী বলো?”

সে বলল: “জালেম, জবরদস্তিকারী।”

ওয়ালিদ বললেন: “আর আবদুল মালিক?”

খারিজি বলল: “জব্বার, বিদ্রোহী।”

ওয়ালিদ বললেন: “আর মুয়াবিয়া?”

খারিজি বলল: “জালেম।”

ওয়ালিদ তার পুলিশ অফিসার খালিদ বিন রাইয়ানকে ইশারা করলেন যে তার মাথা উড়িয়ে দাও। সে নির্দেশ পালন করল।

দরবার মূলতবি হলে ওয়ালিদ খালিদ বিন রাইয়ানকে পাঠিয়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজকে নিজের বাসভবনে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন:

“আমরা যা করেছি, তা কি ঠিক ছিল নাকি ভুল?”

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন:

“আপনি তাকে হত্যা করে ভালো করেননি। ভালো হতো যদি তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিতেন, হয় সে তওবা করত অথবা মৃত্যু তাকে গ্রাস করত।”

ওয়ালিদ বললেন: “সে জনাকীর্ণ দরবারে আমাকে এবং আমার পিতা আবদুল মালিককে গালি দিয়েছে এবং সে একজন খারিজিও ছিল। তবুও আপনি বলছেন যে আমি তাকে হত্যা করে ঠিক করিনি।”

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন:

“আল্লাহর কসম! আমি একে বৈধ মনে করি না। আপনি তাকে বন্দিও করতে পারতেন। আর যদি ক্ষমা করে দিতেন তবে তা অনেক ভালো হতো।”

ওয়ালিদ এ কথা শুনে রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন। খালিদ বিন রাইয়ান উমর ইবনে আবদুল আজিজকে বললেন:

“আপনি আমিরুল মুমিনীনকে এমন স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলেন। আমার ভয় হচ্ছিল যে আমাকে আপনার শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।”

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “যদি তোমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হতো তবে কি তুমি তা করত?”

خالد بن الوليد: “আল্লাহর কসম! আমি তেমনই করতাম।”

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।” [১]

মোদাকথা, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়ালিদের দরবারেও প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনের পরোয়া না করে সত্য কথা বলতেন।

[১] সিরাত উমর ইবনে আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদুল হাকাম, পৃ. ১১৯ থেকে ১২১।

উমর বিন আবদুল আজিজ এবং সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের সম্পর্ক:

উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এবং সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের মধ্যে কৈশোর থেকেই গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তারা দুজনেই চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাদের রুচি ও মেজাজও একই রকম ছিল; তাই তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুজনেই ইবাদতগুজার এবং আল্লাহভীরু ছিলেন। সুলাইমান স্বভাবগতভাবে আরামপ্রিয়, ভোজনরসিক এবং সাজসজ্জার অনুরাগী ছিলেন। উমর বিন আবদুল আজিজও সেই সময়ে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ পুরোপুরি উপভোগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। উমর বিন আবদুল আজিজের মধ্যে দূরদর্শিতা এবং আখেরাতের চিন্তার মাত্রা বেশি ছিল; তাই তিনি মাঝেমধ্যে সুলাইমানকে নসিহত করতেন। সুলাইমান খলিফা হওয়ার পরও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

[১]

একবার সুলাইমান বিন আবদুল মালিক এবং উমর বিন আবদুল আজিজ সফরে একসাথে ছিলেন। সেই যুগের আমিররা সফরে চমৎকার তাবু এবং ভারী আসবাবপত্রের সাথে চলাচল করতেন, খাদেমদের কাফেলা মালামাল নিয়ে আগে রওনা হতো এবং সন্ধ্যায় যেখানে যাত্রাবিরতি করতে হতো, সেখানে তাবু ও বিছানা ইত্যাদি লাগিয়ে দিত। পরে আমিররা এসে সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এক পর্যায়ে উমর বিন আবদুল আজিজ নিজের মালামাল আগে পাঠাতে পারেননি। সন্ধ্যায় যখন যাত্রাবিরতির স্থানে পৌঁছালেন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ তাবুতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করল। উমর বিন আবদুল আজিজকে কোথাও দেখা গেল না। সুলাইমান তাকে খুঁজতে বের হলেন তো দেখলেন তিনি নির্জন স্থানে একটি গাছের নিচে একা কাঁদছেন। সুলাইমান কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

“আমিরুল মুমিনিন! কিয়ামতের দিনের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে যে মালামাল আগে পাঠিয়েছে, সে তা পেয়ে গেছে। যে পাঠায়নি, সে গন্তব্যে কিছুই পায়নি।” [২] এর অর্থ ছিল যে, আখেরাতের জন্যও যদি আমরা আগে থেকে পাথেয় না পাঠাই, তবে সেখানে আমাদের কী অবস্থা হবে।

একবার হজের জন্য সুলাইমানের সাথে যাওয়া হলো। পথে বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। সুলাইমান আতঙ্কিত হয়ে বলতে লাগলেন: “উমর! এই বজ্রপাত দেখছ।”

আপনি বললেন: “এটি তো আল্লাহর রহমতের অবস্থা। যদি এটি আল্লাহর গযবের সাথে হতো তবে কী অবস্থা হতো।” [৩]

সুলাইমান আপনার চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন এবং খলিফাও ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি আপনার নসিহতগুলো প্রায়ই কোনো দ্বিধা ছাড়াই মেনে নিতেন। আপনিও নসিহতের ক্ষেত্রে হিকমত এবং স্থান-কালের বিবেচনা রাখতেন। [৪]

একবার হজের সফরের সময় সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের তন্দ্রা এসে গেল। এই সময়ে কুষ্ঠ রোগীদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল যাদের শোরগোলে সুলাইমানের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি রাগান্বিত অবস্থায় নির্দেশ দিলেন যে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক। কর্মকর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কিন্তু নির্দেশ মানা ছাড়া উপায় ছিল না। এটি দেখে হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. খলিফার কাছে গেলেন এবং তাকে শান্ত করার জন্য এদিক-সেদিকের কথা বললেন। তারপর বললেন:

“আপনি কি কখনো এই বিপদগ্রস্ত কুষ্ঠ রোগীদের চেয়েও বেশি কষ্টে কাউকে দেখেছেন? আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে রাখুন। আপনি যদি তাদের এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তবে ভালো হবে।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬৪৩ থেকে ৬৪৬

[২] সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ৩০

[৩] সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ২৭, ২৮

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৯, ত. নিয়ার

সুলাইমানের রাগ কমে গিয়েছিল, তিনি বললেন: “হ্যাঁ, তাদের এলাকা থেকে বের করে দাও।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নতুন নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন।
এভাবে সেই অসহায় মানুষগুলোর প্রাণ বেঁচে গেল। [১]

মাঝে মাঝে আপনি কঠোর মনোভাবও গ্রহণ করতেন এবং সুলাইমানের মর্যাদার বিন্দুমাত্র
তোয়াক্কা করতেন না।

উমর বিন আব্দুল আজিজের বোনদের পারিবারিক উত্তরাধিকার থেকে শরীয়ত অনুযায়ী
অংশ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আব্দুল মালিক অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যেন অংশ দেওয়া
না হয়। সুলাইমান খলিফা হলে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এই বিষয়ে তাঁর সাথে
আলোচনা করেন। সুলাইমান বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন: “খলিফা আব্দুল মালিক
এই বিষয়ে একটি অসিয়ত রেখে গেছেন যে তাদের অংশ দেওয়া হবে না।”

উমর (রহ.) নিজের অবস্থানে অটল থাকলেন, তখন সুলাইমান খাদেমকে বললেন:
“খলিফা আব্দুল মালিকের অসিয়তনামাটি একটু নিয়ে এসো।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) খোঁচা দিয়ে বললেন: “আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি
কুরআন মাজিদ আনিয়েছেন?”

এটি শুনে সুলাইমান নির্বাক হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর ছেলে আইয়ুব অহংকারের সাথে উমর
(রহ.)-কে বলতে লাগল:

“এখন আপনি এমন কথা বলছেন যে সম্ভবত আপনার শিরশ্ছেদ করা হতে পারে।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বললেন: “বৎস! যদি তুমি ক্ষমতা পাও, তবে
মুসলমানদের ওপর এর চেয়েও বড় বিপদ নেমে আসতে পারে।”

সুলাইমান যখন তাঁর ছেলেকে ধমক দিয়ে চুপ করাতে লাগলেন, তখন উমর (রহ.)
বললেন:

“সে যদি মূর্খতা দেখিয়ে থাকে, তবে আমরাও তা সহ্য করিনি।” [২]

আপনার এই উচ্চতর গুণাবলির প্রেক্ষিতেই সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মৃত্যুর পূর্বে রাজা
বিন হাইওয়াহ-এর পরামর্শে খিলাফতের জন্য আপনার নাম চূড়ান্ত করেছিলেন।

[১] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩০, ৩১

[২] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩১

দ্বিতীয় উমরের খিলাফতকাল

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর খিলাফত ৯৯ হিজরির ২২ সফর এশিয়া মাইনরের ‘দাবিক’ অঞ্চলের সামরিক শিবিরে মাগরিবের নামাজের কিছুক্ষণ আগে কার্যকর হয়েছিল। তিনি (রহ.) প্রথমে মাগরিবের নামাজ পড়ালেন। এরপর সুলাইমানের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করলেন। খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে আসার সাথে সাথেই তাঁর অন্তরের জগত বদলে গিয়েছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মতো অল্পে তুষ্ট, পরহেজগার, খোদাভীরু এবং দরিদ্রবান্ধব শাসনের একটি নমুনা আবারও বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্ববোধের গভীরতা এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, সুলাইমানের দাফন শেষ করে তিনি (রহ.) অত্যন্ত শোকাহত ছিলেন। মানুষ অবাক হচ্ছিল যে, এত বড় রাজত্ব পেয়ে খুশি হওয়ার পরিবর্তে তিনি কেন বিষণ্ণ। এই দুঃখ ও শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যের এমন একজন ব্যক্তিও নেই যার হক তার আবেদন ছাড়াই আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়নি।” [১]

তিনটি তাৎক্ষণিক নির্দেশ:

সুলাইমানের দাফন শেষ করেই তিনি কলমদানি ও কাগজ চাইলেন এবং নিজ হাতে নির্দেশনামা লিখতে শুরু করলেন। মানুষ এটি দেখে কানাকানি করতে লাগল যে, এত কিসের তাড়া ছিল, বিশ্রামস্থলে পৌঁছে আরাম করে যা খুশি করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে এই নির্দেশগুলো জারির ক্ষেত্রে এক মুহূর্তের বিলম্বও জায়েজ ছিল না।

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তিনটি পত্র লিখলেন: প্রথম পত্রটি ছিল মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের জন্য, যিনি কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) রণাঙ্গনে ইসলামি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। কয়েক মাসের অভিযানের পরও এই শহরটি জয় করা সম্ভব হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলাইমান কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি আমৃত্যু এই বাহিনীকে ফিরে আসতে দেবেন না। এখন সেখানে মুসলমানরা আবহাওয়ার তীব্রতা এবং রসদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যুবৃত্তিতে ছিল। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, বাহিনীকে ফিরিয়ে এনে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা জরুরি; তাই তিনি অবিলম্বে বাহিনীকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

তিনি দ্বিতীয় পত্রে মিশরের গভর্নর উসামা বিন জায়েদ তানুখির বরখাস্ত ও গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করলেন। এই ব্যক্তি অত্যন্ত নির্দয় ছিল এবং সামান্য অপরাধ ও সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তিতে আসামিদের হাত-পা কেটে ফেলত। মানুষ তার কঠোরতায় অতিষ্ঠ ছিল। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) নির্দেশ জারি করলেন যে, তাকে গ্রেপ্তার করে প্রতিটি সামরিক ছাউনির কারাগারে এক বছর করে রাখা হোক এবং সে হাতকড়া ও বেড়ি পরা অবস্থায় থাকবে। শুধুমাত্র নামাজ আদায়ের জন্য তাকে খোলা হবে।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬৯০; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০১ হিজরি।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

তৃতীয় আদেশনামা ছিল আফ্রিকার শাসক ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমের বরখাস্তের বিষয়ে। সেও ছিল এক দুশ্চরিত্র মানুষ, খোদাভীরু হওয়ার ভান করত এবং প্রজাদের ওপর জুলুম করত। তার অবস্থা এমন ছিল যে, কঠোর শাস্তির নির্দেশ জারির পাশাপাশি তসবীহ পাঠ করত। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এমন জালেম শাসকদের ঘোর বিরোধী ছিলেন; তাই তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারেননি যে তার কর্তৃত্বের অধীনে এমন লোক শাসনে বহাল থাকুক। [১]

সরকারি প্রটোকল গ্রহণে অস্বীকৃতি:

এই কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর আপনার খিদমতে চমৎকার রাজকীয় সওয়ারিগুলো আনা হলো। আপনি জিজ্ঞেস করলেন: “এগুলো কী?” আমীরগণ বললেন: “এগুলো একদম নতুন সওয়ারি যেগুলোতে আগে কেউ আরোহণ করেনি। নতুন খলিফা এগুলোর ওপরই সওয়ার হন।” আপনি একে অপচয় হিসেবে গণ্য করলেন এবং আপনার বিশেষ খাদেম মুজাহিমকে বললেন: “এগুলো বায়তুল মালে জমা করে দাও।” এই বলে নিজে নিজের খচ্চরের ওপর সওয়ার হলেন। [২] নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার বর্শা হাতে আপনার সাথে চলতে লাগল। আপনি বললেন: “দূরে সরে যাও! তোমাদের সাথে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একজন সাধারণ মুসলমান।” [৩]

পূর্ববর্তী খলিফার আসবাবপত্র নতুন খলিফার মালিকানাধীন হওয়ার প্রথা বিলোপ:

বাসস্থানে পৌঁছালে আপনার সামনে সেই নতুন গালিচা ও বিছানা পেশ করা হলো যা নতুন খলিফা ব্যবহার করেন। আপনি সেগুলোও বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। মূলত গত কয়েকজন খলিফার আমল থেকে এই প্রথা চলে আসছিল যে, খলিফার মৃত্যুতে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। আর যেসব জিনিস অব্যবহৃত এবং একদম নতুন, খালেসা (রাষ্ট্রীয়) অবস্থায় থাকত, সেগুলো নতুন খলিফাকে উপহার হিসেবে পেশ করা হতো। সুলাইমানের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তার পরিবারের সদস্য ও সন্তানরা তার কাপড়গুলো পরে পরে ছাড়তে শুরু করল। তার জুতো ও অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হলো। সুগন্ধির শিশিগুলো ঢালা হতে থাকল। সারা রাত এই সিলসিলা চলতে থাকল। তবুও তার অনেক আসবাবপত্র অব্যবহৃত রয়ে গেল। সকালে তারা উমর বিন আব্দুল আজিজকে আসবাবপত্রের দুটি স্তুপ দেখাল এবং বলল: “এই আসবাবপত্র আমাদের আর এগুলো আপনার।” উমর বিন আব্দুল আজিজ এই বণ্টনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল: “এগুলো ব্যবহৃত জিনিস, এগুলো সুলাইমানের সন্তানদের হক। আর এগুলো অব্যবহৃত জিনিস যা নতুন খলিফার হয়ে যায়।” আপনি এই শরিয়ত পরিপন্থী প্রথা বন্ধ করে দিয়ে বললেন: “এই জিনিসগুলো আমারও নয়, সুলাইমানেরও নয় এবং তোমাদেরও নয়।” এই বলে আওয়াজ দিলেন: “মুজাহিম! এই সব বায়তুল মালে জমা করে দাও।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর দুনিয়ার প্রতি এই অনাসক্তি দেখে রাষ্ট্রের আমীরগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন: “উমর তো পোশাক, সওয়ারি, গালিচা এবং সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন একটাই পথ আছে। তার সামনে পূর্ববর্তী খলিফার দাসীদের পেশ করি। যদি তিনি এদের পছন্দ করতে শুরু করেন তবে বুঝবে কাজ হয়ে গেছে, নতুবা কোনো আশা নেই।”

[১] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩৬, ৩৭

[২] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩৮

[৩] আখবারে আবি হাফস উমর লি-আবি বকর মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন আল-আজুরি, পৃ. ৫৫, ৫৬

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের সামনে এমন সব দাসীদের পেশ করা হলো যারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিল। আমির-ওমরাহরা যেখানেই এমন কোনো দাসীর সন্ধান পেত, তারা তার মালিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে কিনেই ছাড়ত। সে বিক্রি করতে না চাইলে তারা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিত। অতঃপর খলিফাকে খুশি করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই দাসীদের পেশ করা হতো।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ এই সমস্ত প্রথা সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি এগুলোকে কঠোরভাবে অপছন্দ করতেন; তাই দাসীদের সামনে আনা হলে তিনি প্রত্যেকের কাছে তার নিজের এবং তার আসল মালিকের (যার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল) নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের অধিকাংশই ছিল দূর-দূরান্তের শহর ও অঞ্চলের। আপনি প্রত্যেক দাসীকে তার আসল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দীনের ওপর আপনার এই দৃঢ়তা দেখে রাষ্ট্রের আমিরদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এই ব্যক্তি শরীয়তের বিষয়ে কোনো প্রকার শিথিলতায় বিশ্বাসী নন। [১]

শুধু তাই নয়, বরং আপনি আপনার ব্যক্তিগত মালিকানায় আগে থেকে থাকা দাসীদেরও বলে দিলেন:

“আমার ওপর এমন এক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, এখন আমি তোমাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দিতে পারব না। যার থাকার সে থাকুক, আর যে চলে যেতে চায় সে মুক্ত।”

তারা সবাই কাঁদতে লাগল। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আজিজ তার দায়িত্বের কারণে নিরুপায় ছিলেন। [২]

[১] সিরাতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ৩৮, ৩৯

[২] আখবারু আবি হাফস লিল আজুরি, পৃ. ৫৫

দ্বিতীয় উমরের খিলাফতের পূর্বে প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রটিসমূহ

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) যদিও বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং মহান এক সরকারের প্রধান ছিলেন, যার কোষাগার কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, যার সৌভাগ্যের শিখর আকাশচুম্বী ছিল, যার সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের বড় বড় বিরোধীদের দমন করার সক্ষমতা রাখত, যার রাজধানী ইউরোপ পর্যন্ত কর আদায় করত, যার সীমানা চীন থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিরোধীরা দীর্ঘকাল ধরে ভীত ও পরাভূত ছিল; তাই বাহ্যিকভাবে এই সরকার ছিল সুখ-শান্তির এক বাগান। কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর মতো দ্বীনের সঠিক বুঝ সম্পন্ন এবং সমাজের গভীরে দৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তির জন্য এই পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না, বরং অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল।

এটি ছিল ৯৯ হিজরি সাল। গত প্রায় চল্লিশ বছরে উম্মতের ইতিহাসে যে উত্থান-পতন উমর বিন আব্দুল আজিজের সামনে ছিল, পরবর্তী যুগকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের সেগুলোও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের এখানে একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই চল্লিশ বছরে অতিক্রান্ত খলিফাদের অধিকাংশকেই জ্ঞানী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং রণকৌশলী শাসক হিসেবে দেখা যায়। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক জ্ঞানগত দিক থেকে দুর্বল হলেও তার বিশ্বব্যাপী বিজয়সমূহ তার সাহস ও যোগ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এরপর সুলাইমানের নেকি ও মহত্ব সম্পর্কে আমরা পড়ি যে, ঐতিহাসিকগণ তাকে ‘মিফতাহুল খায়র’ (কল্যাণের চাবিকাঠি) বলে স্মরণ করেন। এই সকল খলিফাদের যুগে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক, তামাদুনিক এবং নির্মাণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কথাও সামনে আসে।

তবে এরপর যখন উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর যুগে শাসনব্যবস্থার সংস্কার এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের কাহিনী পড়া হয়, তখন মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়; কারণ যদি পূর্ববর্তী খলিফারা নেক চরিত্রের অধিকারী হতেন, তবে তাদের জুলুম-অত্যাচারের আলোচনা এবং ব্যবস্থা সংস্কারের প্রশ্নটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর যদি জুলুম প্রতিরোধ এবং এই সংস্কার প্রচেষ্টা কোনো মনগড়া বিষয় না হয়, তবে পূর্ববর্তী খলিফাদের চরিত্র সম্পর্কে কী ধারণা করা হবে?

সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে চরমপন্থা ও শিথিলতার পথ অবলম্বন করা হয়। একদল উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের অত্যন্ত নিম্নমানের, পাপিষ্ঠ, জালেম ও বর্বর, এমনকি কাফের ও মুনাফিক হিসেবে চিত্রায়িত করে। মিশরের কিছু লেখক তো এই ধারাকে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে আরেকটি দল, যারা উমাইয়াদের অন্ধ ভক্ত ও প্রশংসাকারী, তারা বলে যে এই সকল উমাইয়া ও মারওয়ানি খলিফারা আদর্শ খলিফা ছিলেন।

শাসকরা ভুলত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, তাদের যুগে কোনো জুলুম-অত্যাচার ছিল না। তাদের বাড়াবাড়ি ও দোষত্রুটি সম্বলিত সমস্ত বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য—এই চিন্তাটিও অযৌক্তিক ভক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যদি এটি মেনে নেওয়া হয়, তবে উমর ইবনে আবদুল আজিজের সেই সংস্কারগুলোর কোনো অর্থ থাকে না যা সমগ্র উম্মত স্বীকার করে এসেছে এবং যার ভিত্তিতে তাকে উম্মতের ‘মুজাদ্দিদে দ্বীন’ ও ‘সংস্কারকদের’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বনু উমাইয়ার প্রতি অতিরঞ্জিত ভক্তির ওপর ভিত্তি করে এই ভুল চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের দুর্বল নয়, বরং সহিহ সনদের বর্ণনাগুলোর ওপরও পানি ঢেলে দেওয়ার নামান্তর।

এই যুগের শাসনব্যবস্থা ও সমাজে কী ধরনের ত্রুটি ছিল?

সত্য ও ভারসাম্যের পথ অবলম্বন করে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর আলোকে এই পুরো সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শাসনব্যবস্থা ও সমাজে অবশ্যই কিছু ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছিল যার বেশিরভাগই রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি এবং আর্থিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। রাজনৈতিক দুর্বলতার সূচনা তো ইয়াজিদের যুগ থেকেই হয়ে গিয়েছিল। এই ত্রুটিগুলোই বনু মারওয়ানের যুগে বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে এবং সেই সাথে আর্থিক লেনদেনও স্বচ্ছ থাকেনি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বনু উমাইয়ার খলিফাদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল অত্যন্ত সফল ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এবং তা বাড়তে থাকে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু ৬০ হিজরিতে হয়েছিল। তার শাসনকাল কেবল বিজয়, স্থিতিশীলতা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্থানের দিক থেকেই ঈর্ষণীয় ছিল না, বরং এতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, শরিয়তের আইনের প্রাধান্য, বিবেকের স্বাধীনতা এবং হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার রক্ষার মানদণ্ডও বজায় ছিল। ইঁ্যা, যদি পূর্ববর্তী যুগগুলোর তুলনায় কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকে তবে তা হলো এই যে, তিনি মজলিসে শুরাকে সিরিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের আসহাবে সাইফ বা সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন; কারণ তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি এবং ফিতনা-ফাসাদ থেকে সুরক্ষার জন্য এটিকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। আর এই কারণেই তিনি সীমিত শূরা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইয়াজিদের উলি আহদি বা উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেছিলেন। তার এই সিদ্ধান্তে, যা বৈধতার সীমার মধ্যে ছিল, তিনি সম্পূর্ণ নেক নিয়ত ও মুখলিস ছিলেন। তার ইজতিহাদের মর্যাদা এবং সাহাবিয়াতের সম্মান তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করাকে আবশ্যিক করে। তিনি আলেমে গায়েব ছিলেন না যে সেই ফিতনাগুলো দেখে ফেলবেন যা পরবর্তীতে দেখা দিয়েছিল। তবে তার উত্তরসূরি ইয়াজিদের যুগে দুর্বলতার সূচনা হয়েছিল যার দায়ভার ইয়াজিদের ওপরই বর্তায়; কারণ সে যদি তার মহান পিতার অসিয়তগুলো পালন করে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করত এবং আকাবির ও আফাজিল বা বড় ও গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুযায়ী চলত, তবে তার শাসনকাল ফিতনার কারণ হতো না। [১] আমরা ইয়াজিদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে উপেক্ষা করলেও এই সত্য কোনোভাবেই গোপন করা যায় না যে, তার যুগে যেসব ত্রুটির সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তীতে বাড়তেই থাকে। [২]

[১] হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই অসিয়তগুলো ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’ দ্বিতীয় খণ্ডে অতিবাহিত হয়েছে। মূল রেফারেন্সের জন্য দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৬৪, ৬৫।

[২] শেখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বলেন: “নিশ্চয়ই ইসলামের অধিকাংশ বাড়াবাড়িকারী ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার যুগ থেকে (উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ এবং বনু উমাইয়ার মধ্যে আল্লাহ যাকে চেয়েছেন তারা ব্যতীত) তাদের পক্ষ থেকে বড় বড় দুঃসাহস ও বড় বড় ঘটনা যা ঘটায় তা ঘটেছে।” (উয়ুনুর রাসায়েল ওয়াল আজউবাতু আনিল মাসায়েল: ২/৮৭৫, মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ)

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার শাসনামলের ওপর এক নজর:

ইয়াজিদের শাসনামলে পরামর্শভিত্তিক শাসন (শুরা) সীমিত হয়ে পড়ে এবং স্বৈরাচারী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। ইতিহাসে এমন কোনো সামান্য ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না যে, হযরত হুসাইন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিরসনের জন্য ইয়াজিদ পরামর্শের (শুরা) কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন। বরং এটি প্রমাণিত যে, এই দুই বুজুর্গকে বায়াত গ্রহণের জন্য এতটাই বাধ্য করা হয়েছিল যে, তারা সরকারি চাপ থেকে বাঁচতে দিয়ার-এ-রাসুল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। হযরত নুমান বিন বশির, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহর মতো উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা উম্মতের ঐক্যের স্বার্থে ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চিতভাবেই এই বুজুর্গদের সাথে এমন আচরণের পক্ষে ছিলেন না। যদি ইয়াজিদ তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তবে এই ব্যক্তিবর্গ তাকে সেই পথ দেখাতেন না যা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। যদিও কিছু বিষয়ে ইয়াজিদের পরামর্শ করার কথাও বর্ণিত আছে, যেমন সে সারজুন নাসরানির সাথে পরামর্শ করে নুমান বিন বশির (রা.)-কে কুফা থেকে অপসারিত করেছিল। [১] নুমান বিন বশির (রা.)-এর পরামর্শেই সে আহলে বাইতের মহিলাদের সাথে ভালো আচরণ করেছিল [২] এবং নিজের বাহিনীর হাতে মদিনার ধ্বংসযজ্ঞের পর নুমান বিন বশির (রা.)-এর পরামর্শেই সেখানে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছিল। [৩]

শাসকদের স্বৈরাচার ও স্বৈচ্ছাচারিতা:

তবুও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইয়াজিদকে তার ভুল মতামতের ওপর অটল থাকতে দেখা যায়। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে শিকল ও বেড়ি পরিয়ে আনার শপথ করা এবং এ বিষয়ে নিজের ছেলে মুয়াবিয়াসহ সবার পরামর্শ উপেক্ষা করা এর অন্তর্ভুক্ত। মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্তে সে আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.) এবং কিছু উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাবীয়ীর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে দেয়। [৪]

এই যুগে শাসকদের জন্য জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ভালোবাসার পরিবর্তে কঠোরতা ও দাপটকে সফল শাসনের গ্যারান্টি মনে করা হতো। এজন্যই নুমান বিন বশির (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ও দূরদর্শী সাহাবীকে অপসারিত করে কুফার গভর্নর হিসেবে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে নিযুক্ত করা হয়। একইভাবে হিজাজ থেকে ওয়ালাদ বিন উতবার মতো অভিজ্ঞ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে সরিয়ে আমর বিন সাঈদকে নিযুক্ত করা হয়। মদিনাবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য হযরত নুমান বিন বশির (রা.) নিজের সেবা পেশ করেছিলেন এবং তার আশা ছিল যে, তিনি পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রক্তপাত ছাড়াই বিষয়টি সমাধান করবেন। কিন্তু ইয়াজিদ তার পরিবর্তে মুসলিম বিন উকবার মতো একজন জালেম ও নিষ্ঠুর মানুষকে পাঠায়, যে মদিনায়ে রাসুলের কোনো সম্মান না করে সেখানে রক্তপাত ও লুটতরাজের বাজার গরম করে। [৫]

সেনাপতিদের সীমাহীন ক্ষমতা:

এই যুগে গভর্নর ও সেনাপতিদের ক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জুলুম ও বাড়াবাড়িকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করা হতো। উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ, উমর বিন সাদ এবং শিমার বিন জিল জাওশান হযরত হুসাইন (রা.) এবং তার কাফেলার জন্য...

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৩৪৮, রেওয়ায়েত আম্মার বিন হাসান।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৬৫৫।

[৩] আল-মিহান লি আবিল আরব আত-তামিমী, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১৪৫, তাবাকাত বৈরুত; তাবাকাত ইবনে সাদ, মুতাম্মুস সাহাবা তাবাকা খামিসা: ২/৪৪০-৪৩; তারিখু দিমাশক: ৪৭৪/২৩।

[৫] তারিখু দিমাশক: ৪৭৮/২৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/১১।

হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে নামমাত্রও কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

মদিনা মুনাওয়ারায় লুটতরাজকারী সৈন্যরা সরকারের নাগালের বাইরে ছিল না। এই পদক্ষেপকে যদি ইয়াজিদের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও ধরে নেওয়া হয়, তবুও এ কথা নিশ্চিত যে, এই মহাপাপে শরিক ব্যক্তিদের কোনো শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের কোনো সতর্ক করার প্রমাণও নেই। এই কর্মপন্থা একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে শাসকদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী শাসকদের এই বিশ্বাস জুগিয়েছে যে, সরকারের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য যেকোনো কিছু করা যেতে পারে।

ইয়াজিদ একজন মহান সাহাবীর সন্তান হওয়ার খাতিরে আমরা মেনে নিচ্ছি যে, তার এবং তার প্রতিনিধিদের কর্মপন্থা একটি সাময়িক বিষয় ছিল, কোনো স্থায়ী নীতি ছিল না। অন্য কথায়, এগুলো ছিল কিছু ভুল পদক্ষেপ যা শাসকদের বোকামির কারণে একের পর এক সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারি অনুগতরা যখন এই ভুল পদক্ষেপগুলোর অযৌক্তিক ওকালতি শুরু করল, তখন অনেক মস্তিষ্কে ‘ভুল’ই ‘সঠিক’ এর স্থান পেয়ে গেল এবং পরবর্তীতে কিছু শাসকের যুগে সেই সঠিক ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে, যা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, কোরবানি, দয়া, কল্যাণকামিতা এবং সহমর্মিতার ওপর ভিত্তি করে ছিল, একটি পুরনো মুদ্রার মর্যাদা দেওয়া হলো।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বংশানুক্রমিক শাসনকে কোনো নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেননি, বরং তাঁর সময়ের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি ছিল তাঁর একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। তবে পরবর্তীতে ইয়াজিদ যখন তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে উত্তরাধিকারী বানালেন, তখন এই সত্য কারো কাছে গোপন রইল না যে, এখন মুসলমানদের রাজনীতিতে বংশানুক্রমিকতার উপাদান আরও দৃঢ় হতে চলেছে। এটি মুসলমানদের সৌভাগ্য ছিল যে, ইয়াজিদের পুত্র মুয়াবিয়া তাঁর পিতার সিদ্ধান্তের পরিণাম বুঝতে পেরেছিলেন এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক বিষয়গুলো শুরার (পরামর্শ সভা) হাতে ন্যস্ত করে পূর্ববর্তী ভুলের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) পুরো মুসলিম বিশ্বে কোনো জোর-জবরদস্তি ছাড়াই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে খেলাফতের প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শভাবে পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের ষড়যন্ত্র, মারওয়ান বিন আল-হাকামের খেলাফতের অবৈধ দাবি এবং বনু উমাইয়াদের কিছু আমিরের গোঁড়ামির কারণে ঐক্য ও সংহতির এই পরিবেশের পরিবর্তে খুব শীঘ্রই ফিতনা-ফাসাদের ঝড় বইতে শুরু করে, যার আঘাত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) সারা জীবন সহ্য করে গেছেন।

তলোয়ারের জোরে মুসলমানদের ওপর শাসন করার মানসিকতা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে চরম শিখরে পৌঁছেছিল, যার প্রকাশ্য নিদর্শন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিশ বছরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে দেখা গেছে। মুসলমানদের বৈধ ও প্রিয় খলিফা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) এই নিষ্ঠুরতার শিকার হন এবং তাঁর লাশের সাথে সেই আচরণই করা হয়েছিল যা হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে করা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি আব্দুল মালিক একের পর এক তাঁর সন্তানদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিকতাকে একটি নীতিগত বিষয়ের মর্যাদা দেন। অথচ যদি পারিবারিক মর্যাদাই উত্তরাধিকারের প্রধান কারণ হতে পারত, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র পরিবার এই বিষয়ের সবচেয়ে বেশি হকদার ছিল এবং সেক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) তাঁর পরে হযরত আব্বাস বা হযরত আলী (রা.)-এর মতো কোনো নিকটাত্মীয়কে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যেতেন। কিন্তু না তিনি (সা.) এটি পছন্দ করেছেন, না মুসলমানদের সামষ্টিক প্রজ্ঞা। বরং তিনি (সা.)...

ইসলামের জন্য সর্বাধিক কোরবানি, সর্বাধিক বুজুর্গি ও তাকওয়া এবং অধিক ইলম ও দূরদর্শিতার ভিত্তিতে জনমত হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য থেকেও কেউ নিজের সন্তান বরণ নিজের কোনো আত্মীয়কেও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেননি। সুতরাং বনু উমাইয়ার যুগে প্রচলিত হওয়া বংশানুক্রমিক ধারা, খিলাফতে রাশেদার সাথে কোনো মিল রাখত না।

আব্দুল মালিকের যুগে বিষয়াদির লাগাম পুরোপুরিভাবে একটি পরিবারের হাতে চলে এসেছিল এবং আল্লাহর কাছে ও বান্দাদের সামনে শাসকের জবাবদিহিতার সেই ধারণা যা খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য ছিল, তা বিস্মৃত হওয়া হয়েছিল; এজন্য খিলাফতের ওপর ব্যক্তিগত শাসনের ছাপ গভীর হতে থাকে এবং এতে বাদশাহি ও রাজতন্ত্রের অনারব বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হতে থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে আব্দুল মালিক এবং তার পুত্রদের: ওয়ালিদ ও সুলাইমানের দ্বীনদারির ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তারা সবাই সালাত ও সওমের পাবন্দ ছিলেন, সুনতি লেবাস ও অবয়বের অধিকারী ছিলেন, নাচ-গান এবং মদ ও কাবাব থেকে বিরত থাকতেন এবং জাতীয় আত্মমর্যাদা ও গায়রত দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। আমরা ‘আল-আঘানি’-এর মতো গল্প ও কাহিনীর কিতাবসমূহে সংগৃহীত অনেক যঈফ ও সনদবিহীন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে করি না, যা পড়ে এই খলিফাদের জীবনের অত্যন্ত কদর্য চিত্র সামনে আসে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, বনু মারওয়ানের শাসনামলে প্রশাসনিক ধরন ও পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা সেই পর্যায়ে ছিল না যা সাহাবীগণের যুগে ছিল।

শাসক পরিবারে যদিও মদ্যপান এবং অন্যান্য গুনাহের প্রকাশ্য প্রচলন ছিল না, কিন্তু শাহজাদা ও আমিরদের বৈধ বিলাসিতা এবং বিনোদনে অস্বাভাবিক মগ্নতা একটি বাস্তবতা। **جنانجہ** সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের দস্তুরখানের যে বিবরণ ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তা বিস্ময়কর। একইভাবে এই খলিফা ও শাহজাদাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, দাসী, জুতো এবং সওয়ারির কাহিনীগুলোও অনারব বাদশাহদের স্মৃতি তাজা করে দিত।

হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর অবমাননা ও নিন্দা:

এর পাশাপাশি একটি অনেক বড় মন্দ বিষয় সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে রাজনৈতিক গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়েছিল। যার কারণে একদিকে ইয়াজিদ, মারওয়ান এবং আব্দুল মালিকের ফজিলত ও গুণাবলির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছিল এবং অন্যদিকে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.)-কে বনু উমাইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করে তাদের ওপর নির্বিধায় গালমন্দ ও নিন্দা করা হতো যাতে মানুষ আহলে বাইত এবং স**الاداء**দের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। [১]

উমাইয়া শাসকরা গালিগালাজের এই অপবিত্র কাজের ব্যাপারে নিজেরাই স্বীকারোক্তি দিত যে, এমনটি এজন্য করা হয় যাতে মানুষ স**الاداء**দের পরিবর্তে আমাদের শাসনের যোগ্য মনে করে। একবার মারওয়ান বিন আল-হাকাম ইমাম জয়নুল আবেদিন (রা.)-কে বলেছিলেন: ‘আমাদের রক্ষাকারী আপনাদের নেতা (হযরত আলী রা.)-এর চেয়ে বড় আর কেউ ছিল না।’ এটি শুনে ইমাম জয়নুল আবেদিন (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তাহলে কেন তোমরা তাকে মিস্বরগুলোতে নিন্দার লক্ষ্যবস্তু বানাও?’ মারওয়ান বলল: ‘আমাদের শাসন এটি ছাড়া চলে না।’

[১] মারওয়ান আলী বিন আল-হুসাইনকে বলেছিলেন: আমাদের সাথীকে (উসমান রা.) রক্ষা করার ক্ষেত্রে আপনাদের সাথী (আলী রা.)-এর চেয়ে অগ্রণী আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন: তাহলে আপনারা কেন মিস্বরগুলোতে তাকে গালি দেন? সে বলল: ‘এটি ছাড়া আমাদের কাজ সোজা হয় না’। (আনসাবুল আশরাফ: ২/১৮৪, তাবা দারুল ফিকর; তারিখু দামেশক: ৪২/৪৩৮)

ইয়াজিদ মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার সামনে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ওপর যেখানে নিজের দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছিল, সেখানে এই অনুচিত অপবাদও দিয়েছিল: “নিশ্চয়ই হুসাইন আমার ওপর জুলুম করেছেন এবং আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।” সাথে এও বলেছিল: “আমার ধারণা আপনি জানতে পেরেছেন যে আমরা হুসাইনের দোষ বর্ণনা করি এবং তাদের নিন্দা করি। আল্লাহর কসম! আমরা এমনটি করি না যাতে আপনারা (সাদাতে কেরাম) প্রিয় ও সম্মানিত না থাকেন, বরং আমরা মানুষকে এটা জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা কখনোই এটা বরদাশত করব না যে কেউ এই ইখতিদারে (ক্ষমতায়) আমাদের সাথে বিবাদ করুক যার জন্য আল্লাহ আমাদের মনোনীত করেছেন এবং এই পদমর্যাদা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।” [১]

শুধু তাই নয়, বরং কিছু ধৃষ্ট শাসক প্রকাশ্যে অভিশাপ দিত এবং অন্যদেরও এর জন্য প্ররোচিত করত। ফলশ্রুতিতে মদীনার এক মারওয়ানি গভর্নর হযরত সাহল বিন সা’দ (রা.)-এর মতো প্রবীণ ও সম্মানিত সাহাবীর কাছে দাবি করেন যে তিনি যেন হযরত আলী (রা.)-কে অভিশাপ দেন। হযরত সাহল (রা.) জবাবে হযরত আলী (রা.)-এর মানাকিব (মর্যাদা) বর্ণনা করে সেই গভর্নরের দম্ভ ধুলোয় মিশিয়ে দেন। [২]

মদীনা মুনাওয়ারার অবমূল্যায়ন:

উমাইয়াদের হিজরত করে মদীনায় আসার সৌভাগ্য হয়নি, তাদের মক্কার সাথেই বেশি সম্পর্ক ছিল কারণ সেটি ছিল তাদের পৈতৃক নিবাস। অন্যদিকে তারা মদীনার অধিবাসীদের হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত মনে করত; তাই মদীনার অধিবাসীদের প্রতি তাদের মনে সেই ভালোবাসা ছিল না যা একজন মুসলমানের অন্তরে থাকা উচিত। এই গোঁড়ামির সাধারণ বহিঃপ্রকাশ এভাবে হতো যে মারওয়ান বিন হাকাম খুতবায় মক্কার ফজিলত তো বর্ণনা করত কিন্তু মদীনার ফজিলত বর্ণনা করার ইচ্ছা করত না, যদিও সে একজন আলেম ব্যক্তি ছিল। হযরত রাফে’ বিন খাদীজ (রা.) একবার এই আচরণের ওপর তাকে বললেন: “ই্যা (মদীনার ফজিলত সম্পর্কে) কিছু শুনে তো আছে।” [৩]

বাইতুল মালে অপচয়—উপদেশে ক্ষোভ:

এই যুগে কঠোরতা, নিপীড়ন এবং আর্থিক দুর্নীতির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। শাসকদের জন্য বাইতুল মাল থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে বিলাসিতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। উপদেশ দানকারীদের কখনো কখনো ধমক শুনতে হতো। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু ওয়াইল (র.) দীর্ঘ সময় ইরাকের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের সাথে ছিলেন। একবার তার কাছে সরকারি এক কর্মচারী একটি চিরকুট নিয়ে এল যে রান্নাঘরের জন্য আটশ দিরহাম দিয়ে দেওয়া হোক।

[১] আজরানা আল্লাহ ওয়া ইয়্যাকা ফিল হুসাইন বিন আলী, ফাওয়াল্লাহি লাআন কানা নাফসি... (আনসাবুল আশরাফ: ২৭৭/৩)

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭০৩, বাবু মানাকিব আলী (রা.); সহীহ মুসলিম, হা: ৬৩৮২, ফায়াইলুস সাহাবা বাবু ফায়াইলি আলী (রা.)। যেহেতু খুতবায় হযরত আলী (রা.)-এর নিন্দা করা হতো, তাই কিছু লোক খুতবা থেকে উঠে চলে যেত। এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু গভর্নর খুতবাকে ঈদের নামাজের আগে নিয়ে আসার বিদ্যাত শুরু করে যাতে মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা শুনতে হয়। ইমাম সারাখসী (র.) লিখেন: “হাত্তা আহদাসাত বানু উমাইয়্যা আল-খুতবাতা কবলাস সালাতি...” (আল-মাবসুত: ৩৭/২)

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৩৮২, কিতাবুল হাজ্জ বাবু ফাদলিল মদীনা।

আবু ওয়াইল রহমাতুল্লাহ উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে গেলেন এবং তাকে বোঝালেন যে পানাহারের ক্ষেত্রে এত অপচয় করা উচিত নয়। উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ক্ষিপ্ত হয়ে তখনই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন এবং বললেন: “চাবিগুলো রেখে দাও এবং চলে যাও।” [১]

ইবাদতে বিদআত:

শাসকরা ধর্মীয় কর্তব্যের চেয়ে রাজনৈতিক লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে বিদআত উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিলেন। মারওয়ানের ছেলে বিশর, যিনি মুসআব বিন জুবায়েরের হত্যার পর ইরাকের শাসক হয়েছিলেন, তিনি একজন সদাচারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। [২] কিন্তু শ্রোতাদের মনোযোগী রাখার জন্য তিনি জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় হাত খুব বেশি নাড়াচাড়া করতেন। অবশেষে একদিন আন্মারা বিন রুওয়াইবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে বাধ্য হলেন: “আল্লাহ এই হাত দুটির মঙ্গল না করুন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করতে দেখেছি।” [৩]

জুমুআর নামাজে বিলম্ব:

বনু মারওয়ানের কিছু আমির জুমুআর সমাবেশে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে নামাজকে এতটাই বিলম্বিত করতেন যে তা কাজা হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতো। [৪] যদিও সব জায়গায় এমনটি হতো না, বরং মদিনা মুনাওয়ারাহসহ অধিকাংশ শহর ও গ্রামে নামাজ সময়মতোই আদায় করা হতো, তবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যেমন দামেস্ক, কুফা ও বসরায় এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। [৫] এই বিলম্ব রাজনৈতিক স্বার্থে করা হতো যাতে খুতবায় অধিক সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের দীর্ঘক্ষণ ধরে সরকারি কর্মকাণ্ড এবং খলিফাদের প্রশংসা ও গুণগান শোনানো যায়। [৬]

যদি কোনো অসহায় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে শাসককে মনে করিয়ে দিতেন যে নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে, তবে তার বিপদ ঘনিয়ে আসত। ইয়াজিদ বিন নুয়ামা আদ-দাবি রহমাতুল্লাহ [৬] এই পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে বারবার হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহ-কে বলতেন: “আমরা সব বিষয়ে অসহায় হয়ে পড়েছি। এমনকি নামাজের ক্ষেত্রেও আমরা অসহায়।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১৬৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১৪৫

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২০৫২, কিতাবুল জুমুআ, বাবু তাখফিফিস সালাতি ওয়াল খুতবাহ

[৪] উসমান বিন আবি রাওয়াদ, যিনি আব্দুল আজিজ বিন আবি রাওয়াদের ভাই, তিনি বলেন: আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি: আমি দামেস্কে আনাস বিন মালিকের কাছে গেলাম, তখন তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম: আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন: আমি যা (রাসূলের যুগে) পেয়েছি তার মধ্যে এই নামাজ ছাড়া আর কিছুই চিনতে পারছি না, আর এই নামাজকেও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, হা: ৫৩০, কিতাবুল মাওয়াকিত, বাবু তাদীযিস সালাতি আন ওয়াকতিহা) হাফেজ ইবনে হাজার মুহাদ্দিসগণের শক্তিশালী সনদে বনু উমাইয়ার একাধিক শাসকের উদাহরণ পেশ করেছেন যারা খুতবা দীর্ঘ করে নামাজকে কাজা হওয়ার কাছাকাছি নিয়ে যেতেন, যার ফলে মজলিসে উপস্থিত কিছু সাহাবী ও তাবেরী ইশারায় নামাজ আদায় করতেন। কারণ তারা যদি কিয়াম, রুকু ও সিজদার সাথে নামাজ পড়তেন তবে উমাইয়া শাসকদের পক্ষ থেকে পূর্ণ বিরোধিতা গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কারণেই হাজ্জাজের পেছনে নামাজ ত্যাগ করেছিলেন। (ফাতহুল বারী: ২/১৪)

[৫] হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেন: “সতর্কবার্তা: আনাস (রা.)-এর এই উক্তিটি কেবল সিরিয়া ও বসরার শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্যথায় এই কিতাবেই সামনে আসবে যে, তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন বললেন: তোমাদের মধ্যে আমি কাতার সোজা না করা ছাড়া অন্য কোনো বিচ্যুতি দেখছি না।” (ফাতহুল বারী: ২/১৪)

ইবনুল জাওযী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: আনাস (রা.)-এর কথার বাহ্যিক দিক থেকে বোঝা যায় যে তিনি হাজ্জাজের কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করছেন। কারণ সে জুমুআর দিন আব্দুল মালিকের প্রশংসা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যস্ত থেকে নামাজকে অনেক বিলম্বিত করত। (কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহীহাইন: ৩/২৭৫, তবা দারুল ওয়াতান)

এবং এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর বক্তব্য দেখুন (ফাতহুল বারী: ২/১৮০)

[৬] তিনি বড় তাবেরী এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ তাকে সাহাবী হিসেবেও গণ্য করেছেন, তবে সঠিক মত হলো তিনি একজন তাবেরী। (তাহযীবুল কামাল: ৩২/২৫৫, ২৫৬)

হাসান বসরী (রহ.) জানতেন যে ইয়াজিদ বিন নুয়ামা শাসকদের সামনে প্রতিবাদ করতে চান, তাই তিনি বলতেন:

“তুমি কিছুই করতে পারবে না। শুধু নিজের জীবনকে শাসকদের সামনে সাঁপে দেবে।”

একবার হাজ্জাজের নায়েব, বসরার শাসক হাকাম বিন আইয়ুব জুমার খুতবা এত দীর্ঘ করলেন যে সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এল। সেদিন ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আওয়াজ দিলেন: “সালাত! সালাত!”

এতে সৈন্যরা প্রথমে তাকে ভয়ভীতি দেখাল এবং দাড়ি ও কলার ধরে পেটে তলোয়ারের হাতল দিয়ে আঘাত করল। তারপর তারা তাকে টেনে মিস্ররের কাছে নিয়ে গেল যেখানে হাকাম বিন আইয়ুব খুতবা বন্ধ করেছিলেন।

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.)-কে তার সামনে আনা হলে সে বলল:

“তুমি কি পাগল নও? আমরা কি সালাতেই মশগুল নই?” (উদ্দেশ্য ছিল যে খুতবাও সালাতের মতোই।)

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) বললেন: “আল্লাহ আমীরের কল্যাণ করুন, কুরআন মাজীদে চেয়ে উত্তম কোনো কালাম কি আছে?”

হাকাম বিন আইয়ুব বলল: “না।”

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) বললেন: “আল্লাহ আমীরের কল্যাণ করুন, যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন মাজীদ খুলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকে, তবে কি এই আমল সালাতসমূহের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?”

হাকাম বিন আইয়ুব নিরুত্তর হয়ে বলল: “আমার মনে হয় তুমি পাগল।”

এ কথা বলে সে সৈন্যদের বলল: “একে গ্রেপ্তার করো।”

এই সময়ে অধিকাংশ মুসল্লি একেবারেই চুপ ছিলেন। তবে দু-একজন লোক তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলছিলেন:

“এই লোক পাগল। সে উন্মাদ।”

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) কসম খেয়ে বলতেন যে, গ্রেপ্তারের চেয়েও বেশি কষ্ট আমাকে মানুষের আচরণ দিয়েছে।

বসরার শাসক তাকে বন্দি করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে নিম্নোক্ত পত্র লিখলেন:

“বনু দাব্বার এক ব্যক্তি জুমার খুতবার সময় দাঁড়িয়ে সালাতের জন্য আওয়াজ দিচ্ছিল। আমার সামনে কিছু ন্যায়পরায়ণ লোক সাক্ষ্য দিয়েছে যে এই লোক পাগল। তার ব্যাপারে কী হুকুম?”

হাজ্জাজ জবাবে লিখল: “যদি ন্যায়পরায়ণ লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে সে উন্মাদ, তবে তাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় তার উভয় হাত ও উভয় পা কেটে দাও, চোখ উপড়ে ফেলো এবং শূলে চড়াও।”

অবশেষে অনেক শহরবাসী হলফনামা দিল যে সে উন্মাদ। এর ফলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কিছুকাল পর ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.)-এর এক আত্মীয়ের মৃত্যু হলো। তিনি তার জানাজা ও দাফনে শরিক হলেন। দাফনের পর তিনি মানুষকে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা এবং কবর ও হাশর সম্পর্কে নসিহত করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বসরার শাসক হাকাম বিন আইয়ুবকে তার বিশেষ বর্শাধারী বাহিনীর সাথে আসতে দেখা গেল। সমস্ত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হাকাম বিন আইয়ুব তাঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়াল এবং বলল:

“অন্যান্য মানুষের মতো তুমি কেন পালালে না?”

ইয়াজিদ বিন নুয়ামা (রহ.) বললেন: “আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন! আমার আঁচল কোনো অভিযোগে কলঙ্কিত নয় এবং আমি নিশ্চিত যে আমার উপস্থিতিতে আমি নিরাপদ।”

হাকাম বিন আইয়ুব চুপ হয়ে গেল, কিন্তু তার পুলিশ অফিসার আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাব তাঁকে চিনে ফেলল এবং হঠাৎ বলে উঠল:

“আমির সাহেব! আপনি কি জানেন ইনি কে?” হাকাম বিন আইয়ুব বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল: “এ কে?”

পুলিশ অফিসার বলল: “এ তো সেই ব্যক্তি যে জুমার খুতবায় হস্তক্ষেপ করেছিল।”

এ কথা শুনেই শাসক রাগে ফেটে পড়ল এবং বলল: “ওহ! তুমি তো খুব সাহসী।”

তারপর সৈন্যদের বলল: “একে ধরো।” শাস্তি হিসেবে তাঁকে চারশ দোররা মারা হলো এবং হাজ্জাজের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার বিশেষ কারাগারে বন্দী ছিলেন যাকে “দিমাস” বলা হতো। [১]

সরকারি আনুগত্য ফরজে আইন:

বনু উমাইয়া সরকারের ধারণাগুলো শাসকদের মানসিকতা এমন করে দিয়েছিল যে, জনগণের ওপর সরকারি আনুগত্য ফরজে আইন এবং যে তা করবে না তাকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এজন্যই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলত:

“আল্লাহর কসম! আমি যদি লোকদের মসজিদের একটি দরজা দিয়ে বের হতে বলি আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ উভয়ই হালাল।” [২]

জাগির লাভের প্রতিযোগিতা, স্বজনপ্রীতি এবং বিলাসিতা:

শাহজাদা ও আমিরদের মধ্যে বড় বড় জাগির (ভূসম্পত্তি) হাসিল করার এবং এর জন্য বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করার প্রবণতাও ছিল ব্যাপক। চাপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে কিছু হাসিল করে নেওয়া এবং আপনজনদের অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ঘুষের ব্যাধিও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। শাসক পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সম্পদ এবং বিলাসিতার উপকরণের একটি বিশাল অংশ এমন ছিল যা অবৈধ উপায়ে অর্জিত এবং শরিয়তে যার কোনো অবকাশ ছিল না।

[১] হাকাম হাজ্জাজের কাছে লিখে পাঠালেন যে, জুমার দিন নামাজের সময় বনু যিব্বা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল এবং সে সবচেয়ে ভালো সাক্ষ্য দিয়েছে। হাজ্জাজ লিখে পাঠালেন যে, যদি সে সুস্থ মস্তিষ্কের হয় তবে তার হাত-পা কেটে দাও এবং চোখ উপড়ে ফেলো। হাকাম তাকে ডাকলেন, সে জানাল যে সে তার এক ভাইয়ের জানাজা শেষে আসছিল এবং সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। হাকাম চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাব তাকে চিনে ফেললেন যে ইনিই জুমার দিন কথা বলেছিলেন। হাকাম রাগান্বিত হলেন, তাকে ৪০০ দোররা মারলেন এবং হাজ্জাজের মৃত্যু পর্যন্ত দিমাস কারাগারে পাঠালেন। (মুসনাদে আবি ইয়লা: ৫৩৬/৯, দারুল মামুন... মুহাক্কিক বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।

[২] আল্লাহর কসম, আমি যদি লোকদের মসজিদের একটি দরজা দিয়ে বের হওয়ার নির্দেশ দিই আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যাবে। (সুনানে আবি দাউদ, হা: ৪৬৪১, সনদ সহিহ)।

সংক্ষেপে, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করা পর্যন্ত যে রাজনৈতিক ত্রুটিগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হতো তা নিম্নরূপ:

- বংশানুক্রমিক শাসন এবং ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র
- শুরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা
- জনগণকে নৈতিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আশ্বস্ত করার পরিবর্তে কঠোরতার সাথে অনুগত রাখার নীতি
- রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন ও পিষ্ট করাকে স্বাধীনতা মনে করা
- প্রতিনিধি ও জেনারেলদের ক্ষমতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
- রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে অতীতের মহান ব্যক্তিত্ব এমনকি কিছু বিশিষ্ট সাহাবীর প্রতিও গালিগালাজ ও কটুক্তি করা
- সুলতানর পরিবর্তে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু বিদআত চালু করা

একইভাবে আর্থিক বিষয়ে নিম্নোক্ত দুর্বলতাগুলো দেখা যায়:

- শাসক পরিবারের আয়ের কোনো হিসাব-নিকাশ না থাকা
- রাজকীয় জীবনধারা এবং বিলাসিতায় মগ্ন থাকা
- বাইতুল মালের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধের পার্থক্য না করা
- কর্মকর্তাদের নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, চাপ বা জবরদস্তির মাধ্যমে পছন্দসই জায়গির, ভবন বা দাসী লাভ করা
- অবৈধ কর আরোপ করা

সমাজে সৃষ্ট ব্যাধিগুলো:

শাসকদের জীবনের এই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোর প্রভাব পুরো সমাজের ওপর পড়ছিল; তাই জনগণের মধ্যেও ত্রুটি ও পাপাচার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই মন্দ কাজগুলো আকিদা থেকে শুরু করে আমল ও মেজাজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল।

খারেজি ও রাফেজিরা গোপনে সক্রিয় ছিল। তাদের দাওয়াত ভেতরে ভেতরে কাজ করে মানুষকে সঠিক আকিদা থেকে বিচ্যুত করছিল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে নাসিবিয়াতও ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছু লোক তাকদীরের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করাকে শখ মনে করত। [১] মদ্যপানের প্রচলন শুরু হয়েছিল। জিন্মিদের মদ কেনাবেচার যে আইনি সুবিধা ছিল, ফাসেক মুসলমানরা তার সুযোগ নিচ্ছিল এবং তাদের কাছ থেকে গোপনে কিনে মদ পান করতে শুরু করেছিল। [২] কিছু লোক গান-বাজনার অনুরাগী ছিল এবং সংগীতের মাধ্যমে বিনোদন খুঁজত। [৩] কিছু এলাকায় জাহেলি প্রথা অনুযায়ী মহিলারা জানাজার সাথে চুল এলোমেলো করে বিলাপ করতে করতে বের হতো। [৪] শরীয়ত পরিপন্থী ছবি তৈরির গুনাহও শুরু হয়েছিল। [৫]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/১৯৭, দার সাদির সংস্করণ।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৬৫, ৩৮০; সিরাত উমর লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৮৬, ৯০।

[৩] সিরাত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১১১, ১২৩।

[৪] সিরাত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৯৩, ৯৪।

[৫] সিরাত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ লি ইবনুল জাওজি, পৃ. ৯৮।

যদি সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত ত্রুটির সারসংক্ষেপ করা হয়, তবে তা হবে পাঁচটি বিষয়:

১. রাজনৈতিক ব্যবস্থা শূন্য (পরামর্শ) ভিত্তিক না হওয়া

২. দুর্নীতি

৩. জুলুম-অত্যাচার

৪. নৈতিক ও বিশ্বাসগত দুর্বলতা

৫. বিদ্রোহ এবং গুনাহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা

তাই উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর মতো জ্ঞানী, সংবেদনশীল এবং দরদী মানুষ এটি ভাবতে বাধ্য ছিলেন যে, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অবিলম্বে সংস্কার অপরিহার্য। অন্যথায় সরকারের দায়িত্ব বহন করা নিরর্থক, বরং আখেরাতের বিচারে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়।

একটি আদর্শ সরকার আত্মপ্রকাশ করে

তিন দিন চিন্তা-ভাবনার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন কী করতে হবে। তিনি নিজের সত্তা থেকেই সংস্কারের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খিলাফত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হযরত হুসাইন, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর এবং প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের মতো। যার মতে খিলাফত হলো অষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃষ্টির অধিকার রক্ষার একটি পরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠান, যার দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সম্মতি, পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতেই নিযুক্ত হওয়া উচিত। তাই প্রচলিত নিয়মের অধীনে খলিফা হওয়া সম্ভেও তাঁর মন সম্মত ছিল না।

নেতৃত্ব জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল:

অবশেষে উমর বিন আব্দুল আজিজ এই পদ থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত হলেন এবং মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন:

“হে লোকসকল! আমার ইচ্ছা এবং সাধারণ মুসলমানদের মতামত ছাড়াই খিলাফতের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তাই আমার বাইয়াতের যে জোয়াল আপনাদের ঘাড়ে রয়েছে, আমি তা নিজেই সরিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যাকে চান আপনাদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করুন।”

কিন্তু মানুষ একস্বরে বলল:

“আমরা আপনার খিলাফতে সম্মত। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করুন।”

যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে মানুষ তাঁর নেতৃত্বে সম্মত, তখন তিনি এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা মনে করে গ্রহণ করলেন। এই দায়িত্বের নাজুকতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বললেন:

“আম্মা বা’দ! হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর ওপর অবতীর্ণ কুরআন মাজীদার পর আর কোনো কিতাব আসবে না। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল এবং যা তিনি হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। আমি কেবল আল্লাহর বিধান কার্যকর করব। আমি নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করব না। আমি কেবল (শরীয়তের) অনুসরণ করব। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করার অধিকার নেই। আমি আপনাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নই। আমি একজন সাধারণ উম্মতি। হ্যাঁ, আপনাদের তুলনায় আল্লাহ আমার ওপর বেশি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।”

আমি তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি; কারণ আল্লাহর ভয় সবকিছুর বিকল্প হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর বিকল্প অন্য কিছু নেই।

হে লোকসকল! তোমাদের আমলসমূহ আখিরাতের জন্য করো। যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য আমল করে, আল্লাহ তার দুনিয়ার কাজগুলোও গুছিয়ে দেন। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধন করো। আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থাকেও সুন্দর করে দেবেন।

মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। তার আগমনের পূর্বেই তার জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এটি স্বাদসমূহকে মিটিয়ে দেওয়ার বস্তু। দেখো! আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে এমন কেউ অতিবাহিত হয়নি যে মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

মনে রেখো! এই উম্মত আল্লাহর সত্তা, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর কিতাব সম্পর্কে বিভক্ত হয়নি। বরং দিনার ও দিরহামের কারণে এতে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। মনে রেখো যে, আমি কাউকে অন্যায়ভাবে দেব না এবং কারো থেকে তার হক (অধিকার) ছিনিয়ে নেব না। হে লোকসকল! যে আল্লাহর আনুগত্য করে, তোমাদের ওপর তার আনুগত্য করা আবশ্যিক। যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তার আনুগত্যের কোনো অবকাশ নেই।

তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করো যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকি। যখন আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করতে শুরু করব, তখন আমার আনুগত্য করা তোমাদের ওপর আর আবশ্যিক থাকবে না। [১]

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর এই খুতবা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে যে, তিনি ক্ষমতার উদ্দেশ্যসমূহের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের চিন্তা ও দর্শনের সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং শাসক হিসেবে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ চালু করার অবকাশ অনুভব করতেন না, আর জনগণের জন্যও এমন কোনো নির্দেশ পালন করা সঠিক মনে করতেন না।

সংস্কারের সূচনা নিজের ঘর ও পরিবার থেকে

আপনার সংস্কারমূলক কাজের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল আপনার নিজের পরিবার, যারা দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজকীয় ও স্বাধীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। আপনাকে সর্বপ্রথম তাদেরই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই লোকেরা ছিল আপনার গোষ্ঠী বরং পরিবার। আপনার স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের প্রিয় কন্যা, যার দুই ভাই ছিলেন সাবেক খলিফা।

আপনি আপনার ঈমানি শক্তি ও খোদাপ্রদত্ত সাহসিকতাকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করলেন। একজন সত্যনিষ্ঠ ও খাঁটি সংস্কারকের মতো সংস্কারের কাজ সর্বপ্রথম নিজের সত্তা ও নিজের ঘর থেকে শুরু করলেন। সেই সমস্ত রাজকীয় জাঁকজমক খতম করে দিলেন যা পূর্ববর্তী শাসকরা অনারব বাদশাহদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শুরু করেছিলেন। তার পরিবর্তে সেই সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন গ্রহণ করলেন যা খুলাফায়ে রাশেদীনের ছিল। সেই সময় আপনার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জায়গিরগুলো ছিল অনেক বড়, যার বার্ষিক আয় ছিল ৪০ হাজার দিনার

[১] আখবার আবি হাফস উমর, পৃ. ৫৫ থেকে ৫৭

ছিল, আপনি একযোগে এই সমস্ত সম্পত্তি ও জায়গির ফেরত দিয়ে দিলেন, যা সন্দেহজনক উপায়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল। শুধুমাত্র চারশ দিনার বার্ষিক আয়ের সেই সামান্য সম্পত্তি নিজের কাছে রাখলেন যা সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত ছিল। [১]

নিজের স্ত্রীর অলঙ্কার এবং মণি-মুক্তাও বায়তুল মালে জমা করে দিলেন যাতে অন্যদের জবাবদিহিতার সময় কেউ তাদের দিকে আঙুল তুলতে না পারে। [২] বিলাসিতার নিজস্ব আসবাবপত্র যেমন কাপেট, পর্দা, মূল্যবান পোশাক, সুগন্ধি এমনকি গোলাম পর্যন্ত বিক্রি করে তার মূল্য বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। [৩]

রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ মর্যাদার অবসান:

আপনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজের জন্য কোনো বিশেষ মর্যাদা গ্রহণ করেননি। পূর্বে দরবারে খলিফার আগমনে লোকেরা আসসালামু আলাইকুম বলত এবং আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকত। আপনি সুন্নাহর অবিকল অনুসরণে সালামের সূচনা নিজেই করতে শুরু করলেন। লোকদেরকে নিজের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করে দিলেন, বললেন: “তোমরা দাঁড়ালে আমিও দাঁড়িয়ে থাকব, তোমরা বসলে আমিও বসব। সেই দিন আসতে চলেছে যখন মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে।” [৪]

অবৈধ সম্পদ ফেরত প্রদান:

এরপর আপনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করে এই দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলেন যে, অবৈধ বা সন্দেহজনক উপায়ে অর্জিত প্রতিটি জায়গির ফেরত দেওয়া হবে এবং উম্মতের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পরিবারের লোকেরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কিন্তু আপনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। আপনি মসজিদে মুসলমানদের একত্রিত করে ঘোষণা করলেন:

“বিগত খলিফাগণ আমাদের পরিবারের সদস্যদের এমন সব জায়গির ও উপহার দিয়েছিলেন যা দেওয়া বৈধ ছিল না। আমি এই জায়গিরগুলো প্রকৃত হকদারদের ফেরত দিচ্ছি এবং নিজের সত্তা ও নিজের পরিবার থেকে এর সূচনা করছি।”

এই বলে আপনি সম্পত্তির দলিলপত্র আনালেন। আপনার খাদেম মুজাহিম সেই দলিলগুলো পড়তে থাকতেন আর আপনি কাঁচি দিয়ে সেগুলো কেটে কেটে ফেলে দিতেন। সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত এই সিলসিলা চলতে থাকল এবং আপনি নিজের ও নিজের পরিবারের সমস্ত সন্দেহজনক সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দিলেন। [৫]

নিজের ও নিজের স্ত্রীর আংটিও বায়তুল মালে:

আপনার আংটিতে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দেওয়া একটি মূল্যবান পাথর বসানো ছিল যা মরক্কোর খেরাজ (কর) খাত থেকে এসেছিল। আপনি সেই পাথরটি খুলে বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। [৬] স্ত্রীর কাছে তার পিতা খলিফা আব্দুল মালিকের দেওয়া একটি অত্যন্ত মূল্যবান আংটি অবশিষ্ট ছিল। আপনি পরিষ্কার বলে দিলেন: “হয় এটি বায়তুল মালে জমা করো নতুবা আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও।”

[১] সুনান আবু দাউদ, খণ্ড: ২৯৭২, কিতাবুল খারাজ, বাবু ফি সাফায়া

[৩] আখবারু আবি حفص, পৃষ্ঠা ৫৭

[৫] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওজি, পৃষ্ঠা ১২৭

[২] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃষ্ঠা ৫৮

[৪] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃষ্ঠা ৩৯, ৪০

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩৪১/৫

অনুগত স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেই আংটিটি বাইতুল মালের জন্য দিয়ে দিলেন। [১]

আমীরদের জবাবদিহিতা:

ঐষ্টা এবং সৃষ্টির সাথে নিজের ও নিজের পরিবারের বিষয়াদি পরিষ্কার করার পর আপনি অন্যান্য আমীরদের জবাবদিহিতার দিকে মনোনিবেশ করলেন। আপনি ঘোষণা করলেন যে, শাসক পরিবারের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে প্রজাদের কারো কোনো দাবি থাকলে সে যেন তা পেশ করে। অনেক লোক উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা, আমীর এবং শাহজাদাদের বিরুদ্ধে দাবি প্রমাণ করে দিল। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ কোনো বড় ব্যক্তিত্বেরই পরোয়া করেননি। অন্যান্য শহরের কর্মকর্তাদের নামে তাগিদপূর্ণ আদেশ পাঠিয়ে সব জায়গায় আত্মসাৎকৃত সম্পদ ও জিনিসপত্র প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া শুরু করলেন। [২]

শাহজাদাকেও ছাড় দেননি:

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের এক ছেলে রুহ হিমস-এ কিছু লোকের দোকান দখল করে রেখেছিল। রুহ-এর দাবি ছিল যে, সে এই দোকানগুলো জায়গির হিসেবে পেয়েছে। দোকানের প্রকৃত মালিকরা সাক্ষ্য ও প্রমাণসহ উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর কাছে ফরিয়াদ জানাল। আপনি রুহ বিন ওয়ালিদকে নির্দেশ দিলেন যেন দোকানগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সে বলল: “আমার কাছে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের লিখিত দলিল রয়েছে।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বললেন:

“যখন দোকানগুলো এই লোকদের এবং এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, তখন খলিফা ওয়ালিদের লিখিত দলিলের আর কী গুরুত্ব থাকে?”

সভা শেষ হলে রুহ বাইরে গিয়ে সেই ফরিয়াদীদের হুমকি দিতে শুরু করল। তারা উমর বিন আব্দুল আজিজকে বিষয়টি অবহিত করল। আপনি আপনার পুলিশ অফিসার কাব বিন হামিদকে বললেন:

“রুহ-এর কাছে যাও। যদি সে দোকানগুলো তাদের হাতে তুলে দেয় তবে ভালো, অন্যথায় তার মাথা কেটে নিয়ে এসো।”

রুহ এই খবর পেয়ে গেল। এরই মধ্যে কাব বিন হামিদও পৌঁছে গেলেন এবং তলোয়ার খাপ থেকে এক বিঘত বের করে বললেন:

“তাদের দোকানের দখল তাদের দিয়ে দাও... অন্যথায়...” রুহ কাঁপতে লাগল এবং দোকানগুলো মালিকদের হাতে তুলে দিল। [৩]

ফদক সমস্যা:

ফদক ভূমির সমস্যাটিও আপনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাধান করলেন। এই ভূমির আয় নবী করীম (সা.) নিজের পরিবারের...

[১] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ ইবনুল জাওযী, পৃ. ১২৮, ১৬৭।

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/২৫২।

দ্রষ্টব্য: মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু ঐতিহাসিক এই জুলুমের ধারা আমীর মুয়াবিয়া (রা.) পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্পত্তি দখলের এই ধারা সেই যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। যদিও এই বিষয়ে প্রাচীন উৎসগুলোতে কেবল ওয়াকিদীর এই বর্ণনা পাওয়া যায়: “উমর বিন আব্দুল আজিজ মুয়াবিয়ার সময় থেকে শুরু করে নিজের খলিফা হওয়া পর্যন্ত মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার হাত থেকে অধিকারসমূহ (প্রকৃত মালিকদের) ফিরিয়ে দিতে থাকেন।” ওয়াকিদীর দুর্বলতা স্পষ্ট, এই দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে একজন সাহাবীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা জায়েয নয়, যেমনটি আমরা এই মূলনীতি শুরুতেই স্পষ্ট করেছি।

[৩] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৭, ৫৮।

প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতেন। আপনার ﷺ ইন্তেকালের পর বনু হাশিমের ধারণা ছিল যে, এই জমি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আশ্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকার জারি না হওয়ার হাদিসের প্রেক্ষিতে তা নবুওয়াত পরিবারের মধ্যে বণ্টন করেননি, বরং একে সরকারি জমি ঘোষণা করে এর কর্তৃত্ব নিজের কাছে রাখেন। তবে এর আয় আগের মতোই নবুওয়াত পরিবারের জন্য ব্যয় করতে থাকেন। পরবর্তী খলিফাগণও এই নীতি অনুসরণ করেন। তবে মারওয়ান বিন আল-হাকাম তার শাসনামলে ফাদাকের আয় নিজের পরিবারের জন্য বরাদ্দ করে দেন। এই জমিই উমর বিন আব্দুল আজিজের অংশে আসে। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এই ভুল সংশোধন করেন এবং ফাদাকের আয় খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের মতো পুনরায় বনু হাশিমের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। [১]

পরিবারের চাপ প্রত্যাখ্যান:

শাসক পরিবারের শাহজাদারা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তারা উমর বিন আব্দুল আজিজের ফুফু ফাতিমা বিনতে মারওয়ানকে তাঁর কাছে পাঠান। উমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর এই ফুফুকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। ফুফু বললেন: “আমি পরিবারের লোকদের দেখেছি যে তারা তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলছে। ভয় হচ্ছে যে কোনো দিন তারা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে না যায়।”

তিনি বললেন: “কিয়ামতের দিনের চেয়ে বড় অন্য কোনো কিছুকে যদি আমি ভয় করি, তবে আল্লাহ যেন আমাকে সেই জিনিস থেকে রক্ষা না করেন।” ফুফু এ কথা শুনে ফিরে গেলেন এবং পরিবারের লোকদের বললেন: “এসব তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পরিবার থেকে মেয়ে বিয়ে করে এনেছিলে, তাই ছেলে তার নানার মতো হয়েছে।” [২]

এরপর হিশাম বিন আব্দুল মালিক পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে কথা বললেন এবং বললেন: “যেসব কাজ আপনার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো অবশ্যই করুন; কিন্তু পূর্ববর্তী খলিফাগণ যা করে গেছেন, তা সেই অবস্থাতেই থাকতে দিন।”

তিনি উত্তর দিলেন: “যদি একটি বিষয়ে তোমার কাছে দুটি আদেশনামা আসে—একটি আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর এবং অন্যটি আব্দুল মালিকের, তবে তুমি কোনটি পালন করবে?”

হিশাম উত্তর দিলেন: “যে আদেশনামাটি আগের, আমি সেটিই পালন করব।”

তিনি বললেন: “তাহলে এই সমস্ত নথিপত্রের আগে আমার কাছে আল্লাহর কিতাব এসে পৌঁছেছে। এখন কোনো বিষয় আমার আগের সময়ের হোক বা বর্তমান সময়ের, আমি সে বিষয়ে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করব।” হিশাম নিরন্তর হয়ে ফিরে গেলেন। [৩]

[১] সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৯৭৪, কিতাবুল খারাজ; সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৮। কিছু ইতিহাসে বর্ণিত এই কথাটি সঠিক নয় যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ সাদাতদের ফাদাকের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবতা হলো, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এই জমি সরকারি জমি হিসেবেই গণ্য হতো, তবে এর আয়ের খাত সাদাতদের জন্য নির্ধারিত ছিল। উমর বিন আব্দুল আজিজ সেই পদ্ধতিই পুনরায় চালু করেন।

[২] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে জাওজি, পৃ. ১১৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০১ হিজরি।

[৩] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে জাওজি, পৃ. ১৪০।

বন্ধুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা:

উমাইয়া আমির আনবাসা বিন সাঈদ, উমর বিন আব্দুল আজিজের পুরনো বন্ধু ছিলেন। সাবেক খলিফা সুলাইমান তার জন্য বিশ হাজার দিনার প্রদানের আদেশ জারি করেছিলেন। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল, কেবল কোষাগার থেকে গ্রহণ করা বাকি ছিল, এমন সময় সুলাইমানের মৃত্যু হয়। এখন আনবাসা হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজের কাছে আসলেন এবং ঘটনা শুনিয়ে বললেন যে, এই অর্থ প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হোক।

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন: “কত টাকা?” আনবাসা বললেন: “বিশ হাজার দিনার।”

আপনি বিস্ময়ের সাথে বললেন: “বিশ হাজার দিনার!! এত টাকা দিয়ে তো চার হাজার মুসলমানের পরিবারের ভরণপোষণ হতে পারে। এত টাকা আমি একজন মানুষকে কীভাবে দিয়ে দিই। আল্লাহর কসম! আমার কাছে এর কোনো সুযোগ নেই।”

আনবাসা এটি শুনে তাকে খোঁচা দিয়ে বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! কোহে ওয়ারসের জমির কী হবে?”

এই জমি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সন্তানদের নামে ছিল। এটি শোনামাত্রই তিনি বললেন: “তুমি ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, আমি তো এটি ভুলেই গিয়েছিলাম।” এই বলে তিনি সেই জমির কাগজপত্র আনালেন এবং সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

বনু উমাইয়া পরিবারের কিছু লোক দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের আশা ছিল যে খলিফা যদি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনবাসার জন্য কোনো সুযোগ রাখেন, তবে আমাদেরও ভালো হবে। যখন আনবাসা বাইরে এসে তাদের অবস্থা শোনালেন, তখন তারা তাকে বলল: “খলিফাকে গিয়ে বলো, বাইরে আত্মীয়-স্বজনরা সমবেত হয়েছে এবং বলছে যে, হয় আমাদের সেই অনুদানগুলো চালু করুন যা আমরা আগে পেতাম, অন্যথায় আমাদের অন্য দেশে হিজরত করার অনুমতি দিন।”

আনবাসা ভেতরে এসে এই বার্তা দিলে আপনি বললেন: “তারা যেখানে যেতে চায় তাদের সেই অনুমতি আছে।” [১]

ফুফুর আবেদন প্রত্যাখ্যান:

একবার আপনার ফুফু আসলেন, দেখলেন আমিরুল মুমিনিন দস্তরখানে বসে আছেন, ছোট ছোট রুটি, জয়তুনের তেল এবং লবণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফুফু বললেন: “খাবার তো অন্তত ভালো খেয়ো।”

আপনি বললেন: “অবশ্যই করতাম, কিন্তু তার তো কোনো সুযোগই বের হয় না।”

ফুফু বললেন: “তোমার চাচা আব্দুল মালিক আমাকে পর্যাপ্ত ভাতা দিতেন। তারপর তোমার ভাই ওয়ালিদ তাতে আরও বৃদ্ধি করেছিলেন, কিন্তু তুমি তো তা পুরোপুরি বন্ধই করে দিলে।”

আপনি বললেন: “ফুফু সাহেবা! আমার চাচা আব্দুল মালিক এবং আমার ভাই ওয়ালিদ ও সুলাইমান আপনাকে যে সম্পদ থেকে দিতেন তা মুসলমানদের ছিল। সেই সম্পদ আমার নয় যে আমি তা থেকে আপনাকে দেব। হ্যাঁ! আপনি যদি চান তবে আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দিতে পারি।”

[১] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৫, ৫৬

তিনি বললেন: “তোমার ব্যক্তিগত সম্পদ কতটুকু?”

তিনি বললেন: “সেই দুইশ দিনার (বার্ষিক) বেতন যা আমি পাই।”

ফুফু বললেন: “আমি তোমার বেতন দিয়ে কী করব!”

তিনি বললেন: “এটি ছাড়া আমি অন্য কিছু মালিক নই।” ফুফু এটি শুনে ফিরে গেলেন।

[১]

উমর বিন আব্দুল আজিজের সংস্কারসমূহ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর নীতি বনু মারওয়ানের শাসনামলে তলোয়ার ও চাবুকের ভাষাকে সাধারণ করে তুলেছিল। এর ফলে নাগরিকরা ভয় ও আতঙ্কে নিমজ্জিত থাকত। সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড দমনের জন্য সন্দেহের ভিত্তিতে মানুষকে ধরা, মারধর করা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা করা শাসকের অধিকার বলে গণ্য করা হতো। আপনি এই কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিলেন। অতীতে যেসব শাসক ও কর্মকর্তা জনগণের সাথে কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিলেন, তাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করলেন। তাদের স্থলে নেককার, মুত্তাকী এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলেন। তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ পাঠালেন যে, কোনো মুসলিম বা অমুসলিম নাগরিককে সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার বা মারধর করা যাবে না। শরীয়ত বিরোধী কাউকে চাবুক মারা যাবে না। আমাকে না জানিয়ে কাউকে হত্যা করা বা হাত-পা কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে না। [২]

এটিই ছিল সেই কর্মপদ্ধতি যা নবী আকরাম (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদিন বিশ্বকে শিখিয়েছিলেন।

অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে উসওয়ায়ে হাসানা:

নবী আকরাম (সা.) কখনো সন্দেহ বা সংশয়ের ভিত্তিতে শাস্তি দিতেন না। তদন্তের জন্য নির্যাতনের পরিবর্তে তিনি জেরা (cross-question) করার মতো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। বদরের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সংখ্যা জানা অত্যন্ত জরুরি ছিল। যুদ্ধের আগে কুরাইশদের কিছু গোলাম মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। তারা তাদের মারধর করে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বন্দিরা অজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকল। নবী আকরাম (সা.) এটি দেখে মারধর করতে নিষেধ করলেন এবং তাদের কাছে প্রতিদিন জবাই করা উটের সংখ্যা জানতে চাইলেন। তারা জানাল যে নয় বা দশটি। এর মাধ্যমে আপনি (সা.) সঠিক অনুমান করলেন যে শত্রুর সংখ্যা নয়শ থেকে এক হাজারের মধ্যে। [৩]

খুলাফায়ে রাশেদিনের حُكْمٌ (কৌশল):

খিলাফতে রাশেদার যুগে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে বিদ্রোহের শাস্তি দেওয়ার নীতি ছিল না, বরং হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে অমুসলিমদের ওপরও নির্যাতন করা হতো না। যদি কখনো ভুলবশত কেউ এমনটি করে ফেলত, তবে প্রবীণ সাহাবীগণ অবিলম্বে তাকে নিষেধ করতেন। একবার সিরিয়ায় কিছু অমুসলিমকে খরাজ আদায় না করার কারণে সতর্ক করার জন্য...

[১] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৬০

[২] তারিখুত তাবারী: ৯/২৮৩

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৮২, ৬৮৩, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু আল-ওয়াইদিশ শাদীদ লিমান আযযাবান নাসা বিগাইরি হাক্ক; মুসনাদে আহমাদ, হা:

...জন্য রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।

হিশাম বিন হাকিম (রা.) যখন এটি দেখলেন, তখন তিনি একে জুলুম ও নিপীড়ন হিসেবে গণ্য করলেন এবং বললেন: “আমি নবী আকরাম (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ সেই সব লোকদের আজাব দেবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে আজাব দেয়।” এই হাদিস শোনার সাথে সাথেই শাসকরা ওই লোকদের ছেড়ে দিল। [১]

হযরত উসমান গনি (রা.) এই কারণেই ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বন্দি করে বিদ্রোহ দমনের কৌশল অবলম্বন করেননি। আর এই কারণেই হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.) আব্দুল্লাহ বিন সাবাকে সিরিয়ায় মানুষের সাথে সন্দেহজনকভাবে মেলামেশা করতে দেখেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। [২] হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর পক্ষ থেকে ফিতনাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতার এটিও একটি কারণ ছিল।

তদন্তে নির্যাতনের প্রবণতা এবং এর ক্ষয়ক্ষতি:

কিন্তু ইয়াজিদের শাসনামলে নির্যাতনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরপর আব্দুল মালিকের শাসনকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার অধীনস্থরা বিরোধীদের বেছে বেছে হত্যা করে। শাসকদের মানসিকতা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, যদি সব জায়গায় শরীয়তের নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, তবে ফিতনাবাজ উপাদানগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়; তাই জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় কৌশলের খাতিরে তাদের শরয়ী আইনের উর্ধ্বে গিয়ে পাকড়াও করা এবং শাস্তি দেওয়া সঠিক। এই চিন্তাধারার ধারক-বাহকগণ নিজেদের দৃষ্টিতে যতই নিষ্ঠাবান হোন না কেন, এই চিন্তাধারার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, মানুষের সংশোধনের চিন্তা আল্লাহর চেয়ে আমাদের বেশি এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য আমাদের কৌশল আল্লাহর পরিকল্পনার চেয়ে বেশি কার্যকর।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এই নীতির ক্ষতি সামনে এসেছিল। এভাবে যদিও বাহ্যিকভাবে ফিতনাবাজরা দমে যেত, কিন্তু যে সব নির্দোষ মানুষ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সরকারি কঠোরতার শিকার হতো, তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পরবর্তীতে ফিতনাবাজদের নতুন দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। খারেজীদের বারবার উত্থানের একটি কারণ ছিল এই প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা, অন্যথায় এই ফিতনা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত; কারণ এই গোষ্ঠীর কাছে কোনো সুদৃঢ় জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না।

শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে উসওয়াহ হাসানা অনুযায়ী উমর বিন আব্দুল আজিজের ভারসাম্য:

উমর বিন আব্দুল আজিজ এই বিষয়ে কেবল সরকারি নীতি পরিবর্তন করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অনুযায়ীই করেননি, বরং এ ব্যাপারে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মানসিকতাও ক্রমাগত তৈরি করতে থাকেন যে, প্রকৃত সাফল্য শরয়ী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তা অনুসরণের মধ্যেই নিহিত, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করার মধ্যে নয়। পূর্ববর্তী আমলের গভর্নররা কোনো দ্বিধা ছাড়াই হত্যা এবং হাত-পা কাটার দণ্ডাদেশ জারি করে দিতেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং নির্দেশ জারি করেন:

“আমাকে না জানিয়ে কাউকে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদের শাস্তি দিও না।”

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৬১৩; সুনান আবু দাউদ, হা: ৩০৪৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/২৮৩

মোসেলে ইয়াহইয়া গাসসানি নামক একজন আমির নিযুক্ত হলেন। এই শহরে চোর ও ডাকাতরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। সাধারণ মানুষের মানসিকতাও ইয়াহইয়া গাসসানির মতোই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা না হবে, ততক্ষণ এই অপরাধগুলো বন্ধ হবে না। তিনি পত্রের মাধ্যমে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আমি কি মানুষকে সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করব এবং অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি দেব? নাকি কেবল অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সুন্নাহ অনুযায়ী আচরণ করব?”

আপনি উত্তরে লিখলেন: “কেবল শরয়ি প্রমাণের ভিত্তিতে পাকড়াও করো এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করো। যদি শরয়ি আইনের মাধ্যমে মানুষের সংশোধন না হয়, তবে আল্লাহ তাদের সংশোধন না করুন।” [১]

এক প্রসঙ্গে বললেন: “যাদের সংশোধন জুলুম ছাড়া সম্ভব নয়, আল্লাহ তাদের সংশোধন না করুন। আমি মানুষের সংশোধনের জন্য নিজের দ্বীন নষ্ট করতে পারি না।” [২]

একবার খোরাসানের গভর্নর উমর বিন আব্দুল আজিজকে লিখলেন: “এখানকার মানুষের আচরণ অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তলোয়ার এবং চাবুক ছাড়া অন্য কিছু তাদের সংশোধন করতে পারবে না। আমিরুল মুমিনীন যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে এর অনুমতি দিন।”

আপনি উত্তরে লিখলেন: “তোমার এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল যে, তলোয়ার এবং চাবুক ছাড়া অন্য কিছু এই লোকদের সংশোধন করতে পারবে না। বরং ন্যায়বিচার এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা তাদের সংশোধন করতে পারে। যেখানে সম্ভব একে প্রচার করো।” [৩]

নিজের একজন প্রতিনিধিকে তিনি এই বিষয়ে নিম্নোক্ত মূলনীতি লিখে পাঠালেন:

“শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং সরকারের জুলুম-অত্যাচার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মানুষের সংশোধন হতে পারে না; তাই আমার এই নির্দেশ পৌঁছামাত্রই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও।” [৪]

রাসূলের অবমাননাকারী ব্যতীত অন্য কাউকে অবমাননা করার কারণে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না:

পূর্ববর্তী যুগের গভর্নরগণ খলিফার ব্যাপারে গালিগালাজ করার জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করাকে সঠিক মনে করতেন। মদিনার কাজী একজন খারিজিকে গ্রেপ্তার করলেন। সে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.)-কে গালি দিচ্ছিল। কাজী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে পত্র পাঠিয়ে তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি উত্তরে বললেন:

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৮/১৭৬

[২] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওজি, পৃ. ১১৭, ১১৮; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৭৮, নিজার সংস্করণ... এই বর্ণনায় ইয়াহইয়া গাসসানি বলেন যে, এই নির্দেশনার ওপর আমল করার ফলে মোসেলে এমন শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সেখানে চুরি ও সিন্ধেল চুরির ঘটনা পুরো দেশে সবচেয়ে কম হারে নেমে এসেছিল।

[৩] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হকাম, পৃ. ১০৬... এটি সেই জবাব ছিল যা নুমান বিন বশির (রা.) সন্দেহের ভিত্তিতে মুসলিম বিন আকিলের ওপর হাত তুলতে অস্বীকার করে বলেছিলেন: “আল্লাহর আনুগত্য করে দুর্বল ও অসহায় হিসেবে পরিচিত হওয়া আমার কাছে আল্লাহর নাফরমানি করে শক্তিশালী হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়।” (তারিখুত তাবারী: ৫/৩৫৮) কিন্তু নুমান বিন বশির (রা.)-এর এই পদ্ধতিকে ইয়াজিদ পছন্দ করেনি এবং তাঁকে বরখাস্ত করে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিয়োগের সময় তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিল: “যাদের ওপর সন্দেহ হয় তাদের গ্রেপ্তার করো। যার ওপর কোনো অভিযোগ থাকে তাকে পাকড়াও করো।” (তারিখুত তাবারী: ৫/৩৮১; আল-আখবারুত তিওয়াল: ২৪২/১) তখন থেকেই বনু উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সন্দেহ এবং জুলুম-অত্যাচারের প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) এই বাড়াবাড়ি রোধ করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করেছিলেন।

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৮১, নিজার সংস্করণ

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৬৮, সাদির সংস্করণ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। তোমরা এই ব্যক্তিকে বন্দি করে রাখো যাতে মুসলমানরা তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। প্রতি মাসে তাকে তওবার দাওয়াত দাও, যদি সে মেনে নেয় তবে তাকে ছেড়ে দাও।” [১]

জালিম অফিসারদের জবাবদিহিতা ও পাকড়াও:

আপনি কেবল জুলুম দূর করার ওপরই ক্ষান্ত হননি, বরং বিগত শাসনামলের সেই সমস্ত অফিসারদের কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় এনেছেন যাদের কারণে জনগণ অতিষ্ঠ ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বংশ ‘বনু আকিল’কে, যারা কঠোর অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিল, ইরাক থেকে বহিস্কার করে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দেন। [২]

খালিদ বিন রাইয়ান, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের বিশেষ উপদেষ্টা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। পুরো সালতানাতে তার দাপট বিরাজ করত। উমর বিন আব্দুল আজিজ তাকে বরখাস্ত করার সময় দুআ করেছিলেন: “হে আল্লাহ! আমি তাকে নামিয়েছি, আপনি তাকে আর উপরে উঠতে দেবেন না।” তার এই দাপট ও ভীতি এমনভাবে বিলীন হয়ে গেল যে, তার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার খবরও কারো কাছে ছিল না। [৩]

সরকারি ভীতির অবসান:

আপনি জনগণের ওপর চেপে বসা সরকারি ভীতি দূর করে শাসকদের কাছে তাদের পৌঁছানো সহজ করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি প্রদেশের শাসকদের চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পৌঁছানো বা সরকারকে ভালো পরামর্শ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো। প্রতি বছর হজের সময় ঘোষণা করা হতো যে, যে ব্যক্তি কোনো শাসকের জুলুমের খবর দেবে বা কোনো ভালো পরামর্শ দেবে তাকে একশ থেকে তিনশ দিনার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। [৪]

এভাবে আপনি তৃণমূল পর্যায়ে পরামর্শের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যার ফলে গুমোট পরিবেশ দূর হয়েছিল এবং মানুষ অনুভব করতে শুরু করেছিল যে তারা গোলাম নয়, বরং সরকারের কাজে অংশীদার।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর আস্থা:

আপনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। শহরের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের আপনি নিজেই নিয়োগ দিতেন এবং তাদের নির্দেশ দিতেন যে তারা যেন তাদের অফিসার ও উপদেষ্টাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নির্বাচন করেন। আপনি বলতেন:

“এরা সর্বোত্তম মানুষ। হকের পথ ছাড়ে না এবং বাতিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে না।” [৫]

জিম্মি ও মাওয়ালিদের ওপর রহম:

বিগত খলিফাদের যুগে মাওয়ালি এবং জিম্মিদের সাথে অন্যায় আচরণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হতো। মাওয়ালি তারা ছিল যারা নিজেরা বা যাদের বাবা-দাদা যুদ্ধবন্দী হওয়ার পর স্বাধীন হয়েছিল। প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম সমাজে তাদের

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৪৬, ১৪৭

[২] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ৩০

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ১২০, ১২১; সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ, পৃ. ৯০

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৪৬

[৫] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল আজিজ, পৃ. ১০৯

সংখ্যা লাখে লাখে ছিল। মাওয়ালিদের তিনটি প্রকার ছিল:

- যাদের আরবদের সাথে ‘ইতাক’ (অর্থাৎ কোনো আরব পরিবারের মুক্ত করা দাস) এর সম্পর্ক ছিল। তাদের ‘মাওয়ালি ইতাক’ বলা হতো।
- যাদের আরবদের সাথে ‘মুওয়ালাত’ (পারস্পরিক সহযোগিতা) এর চুক্তি ছিল। তাদের ‘মাওয়ালি মুওয়ালাত’ বলা হতো।
- সাধারণ মাওয়ালি যাদের কোনো আরব পরিবারের সাথে ‘মুওয়ালাত’ বা ‘ইতাক’ এর সম্পর্ক ছিল না এবং তারা নিজেদের সাহায্যেই জীবনযাপন করত। যেখানে তাদের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না, সেখানে তারা সম্পূর্ণভাবে সরকারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

ইসলাম মাওয়ালিদের সাথে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি। হযরত বিলাল হাবশী, হযরত যায়েদ বিন হারিসা, হযরত খাব্বাব বিন আল-আরাত এবং হযরত সালমান ফারসী মাওয়ালি হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ সারিতে গণ্য হতেন। কিন্তু বনু মারওয়ান মাওয়ালিদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল। যদিও প্রথম দুই প্রকারের মাওয়ালি তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থায় ছিল, ফলে তাদের মধ্যে ইলম ও ফজিলতে সমৃদ্ধ ব্যক্তির উন্মত্তের নেতা ও ইমাম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। যেমন মদিনায় নাফে’ মাওলা আবদুল্লাহ বিন উমর এবং রাবিয়াতুর রায় নিজ সময়ের ইমাম ছিলেন। মক্কায় মুজাহিদ বিন জাবর, আতা বিন আবি রাবাহ এবং ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস-এর মতো ফকিহদের আধিপত্য ছিল। বসরায় হাসান বসরী এবং শামে মাকহুল-এর খ্যাতি ছিল। এছাড়াও বনু উমাইয়রা তাদের কিছু মাওয়ালিকে তাদের বীরত্ব ও সেনাপতিত্বের কারণে উচ্চ সরকারি পদে, বিশেষ করে সামরিক পদে নিযুক্ত করেছিল। যেমন আমির মুয়াবিয়া-এর মাওলা নুসাইর, তার পুত্র মুসা বিন নুসাইর এবং মুসার মাওলা তারিক বিন যিয়াদ। বনু উমাইয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বে এই মাওয়ালিদের বড় ভূমিকা ছিল।

কিন্তু বনু মারওয়ান সাধারণ মাওয়ালিদের কেবল অবহেলাই করেনি বরং তাদের সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদা দিয়েছিল। বিশেষ করে ইরাকে এই গোঁড়ামি বেশি ছিল। সেখানে মাওয়ালিদের ইমামত বা সালাতের জন্য নিযুক্ত করা হতো না, বরং একে হীন কাজ মনে করা হতো। [১] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মাওয়ালিদের এক চোখে দেখতে পারত না। একবার সে মাওয়ালিদের সম্পর্কে খুতবায় বলেছিল:

“এই লোকগুলো এই যোগ্য যে তাদের খুব প্রহার করা হোক এবং তাড়িয়ে দেওয়া হোক। আল্লাহর কসম! যদি আমি লাঠি দিয়ে ইশারা করি তবে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে।” [২]

ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদের সেই অনুদান ও ভাতা দেওয়া হতো না যা অন্য মুসলমানদের দেওয়া হতো। উল্টো তাদের ওপর জিজিয়া আরোপ করা হয়েছিল এই অজুহাতে যে, এই লোকগুলো কেবল জিজিয়া থেকে বাঁচতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। [৩] যদিও ইসলাম কখনোই এই অনুমতি দেয় না যে কারো ঈমান নিয়ে সন্দেহ করা হোক এবং নওমুসলিমদের ওপর জিজিয়া বহাল রাখা হোক। প্রকৃতপক্ষে বনু মারওয়ানের এই অপকর্মের কারণ ছিল এই যে, অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করলে বায়তুল মালের আয়ে ঘাটতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল, যার একটি বড় অংশ তাদের ব্যক্তিগত ব্যয়ে খরচ হতো।

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩৬৭/৬, ত তদমুর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪৯৫/১২

[২] আনিল আমাশ কাল। সামিআতুল হাজ্জাজ ইয়াকুলু আলাল মিস্বার: হাযিহিল হামরাউ হব্বুন হব্বুন আমা ওয়াল্লাহি লা ক্বাদ ফারাআতু আসান বা’মা লা-আযিরান্নাহম কাল আমসিল যাহিব ইয়ানি আল-মাওয়ালি। (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৪, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু আল-খুলাফা, ইসনাদুহ সহিহ)

[৩] ফুতুহুল মিসর ওয়াল মাগরিব, পৃ: ১৮৭

সুতরাং যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে তার প্রতিনিধিরা লিখল যে, গ্রামীণ অঞ্চলের জিম্মিরা বিপুল সংখ্যায় মুসলমান হয়ে কুফা ও বসরার শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করছে এবং এর ফলে খরাজ ও জিজিয়ার আয় কমে যাচ্ছে, তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আদেশ জারি করলেন যে, এই লোকদের শহর থেকে বের করে দিয়ে তাদের ওপর পুনরায় জিজিয়া ধার্য করা হোক। এই আদেশ অনুযায়ী যখন তাদের বসরা ও কুফা থেকে বের করে দেওয়া হতে লাগল, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল। তারা বুঝতে পারছিল না যে কোথায় যাবে এবং কার কাছে তাদের ফরিয়াদ জানাবে। তাদের অবস্থা দেখে স্থানীয় ওলামায়ে কেরামও কেঁপে উঠেছিলেন এবং তাদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের সময় তারাও অশ্রুসিক্ত ছিলেন। [১]

এই কারণেই যখন আব্দুর রহমান বিন আশআস হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরাজ) করলেন, তখন এই ধরনের অন্যায়ের কারণে এই মাওয়ালিরা পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে সেই বিদ্রোহে শরিক হয়েছিল। [২] এই ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার পরেও বনু মারওয়ানের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং মাওয়ালিদের প্রতি অবিচার অব্যাহত ছিল।

মাওয়ালিদের ব্যাপারে শাসকদের প্রতি তাগিদপূর্ণ পত্র:

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. ক্ষমতায় এসে এই ইসলাম বিরোধী বৈষম্য দূর করেন। তিনি মাওয়ালি এবং নওমুসলিমদের সেই সমস্ত অধিকার প্রদান করেন যা সাধারণ মুসলমানদের ছিল। তিনি তার শাসকদের লিখেছিলেন:

“যেসব খ্রিস্টান, ইহুদি ও অগ্নিউপাসক আজ জিজিয়া প্রদান করছে, তাদের মধ্যে যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে, সে মুসলমানদের সাথে মিশে থাকবে, তার সেই অধিকারগুলোই থাকবে যা মুসলমানদের অধিকার এবং তার ওপর সেই দায়িত্বগুলোই অর্পিত হবে যা মুসলমানদের ওপর অর্পিত। মুসলমানদের জন্য আবশ্যিক হবে যে তারা তার সাথে মিশে থাকবে।” [৩]

আপনি আপনার শাসকদের এই নির্দেশনাও দিয়েছিলেন: “জিম্মিদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করো না।” [৪]

মিশরে ইবনে খুজামির রহ. (আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ) একজন অনেক বড় আলেম ছিলেন যিনি বংশগতভাবে মাওয়ালি ছিলেন। সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে তিনি একবার মিশরীয় প্রতিনিধি দলের সাথে দামেস্কের দরবারে এসেছিলেন। প্রতিনিধি দলের বাকি সদস্যরা সুলাইমানের প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছিল কিন্তু ইবনে খুজামির এই সময়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। যখন বাইরে বের হলেন, তখন উমর বিন আব্দুল আজিজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

“আপনি কেন নীরব ছিলেন?” তিনি বললেন: “মিথ্যা বলার ব্যাপারে আল্লাহর ভয় ছিল।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তার এই গুণটি মনে রেখেছিলেন। যখন তিনি খলিফা হলেন, তখন মিশরের বড় বড় আরব আলেমদের বাদ দিয়ে তাকেই সেখানকার কাজিউল কুজাত নিযুক্ত করলেন। [৫] হযরত হাসান বসরী রহ.-ও মাওয়ালি ছিলেন এবং ওয়ালিদের শাসনামলে হাজ্জাজের ভয়ে বারো বছর পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাকে বসরার কাজি নিযুক্ত করেছিলেন। [৬]

[৪] আল-মাওয়াযিজ ওয়াল ইতিবার বি জিকরিল খুতাবি ওয়াল আসার (আল-খুতাতুল মাকররিজি) ১৪৭/১

[৫] কিতাবুল উলাতি ওয়াল কুজাতি লিল কিন্দি, পৃ. ২৪৫

[৬] আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ: ৪৯/২

[১] তারিখুত তাবারী: ১৩৮১/৬, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৯১/৩; সন ৮১ হিজরি

[২] তারিখুত তাবারী: ১৩৮১/৬, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৯১/৩; সন ৮১ হিজরি

[৩] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৮৪

সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উচ্চতা

আল-মারওয়ানের পূর্ববর্তী শাসকরা সীমান্তের সুরক্ষা, বিজয়, শত্রুদের দমন, বাহ্যিক শান-শওকত প্রদর্শন এবং কর ও রাজস্বের প্রাচুর্যকেই শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করতেন। জনগণের পার্থিব উন্নতি এবং অধিকারের সুরক্ষা তো এক পর্যায়ে তাদের সামনে ছিল, কিন্তু মানুষের আখেরাত নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা ছিল না এবং তাদের হেদায়েত বা তদারকির সাথেও কোনো বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। এই কাজগুলোকে তারা উলামা ও মাশায়েখদের দায়িত্ব মনে করতেন।

উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মানসিকতা পরিবর্তন করেন। তিনি এই বাস্তবতা স্বীকার করান যে, সরকারের উদ্দেশ্য হলো বান্দাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সফল করা। আর যদি দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, তবে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফলে তাঁর খিলাফতকালে তিনি সরকারের স্থায়িত্ব, সম্পদ এবং অন্যান্য মুনাফার ওপর দ্বীনি উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দেন। দ্বীনি উপকারের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতির পরোয়া তিনি কখনো করেননি।

আমরা লাওল চালিয়ে নিজেদের পেট ভরব:

তাঁর সীরাত ও চরিত্র এবং তাঁর প্রতিনিধিদের আখলাক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অমুসলিম নাগরিকরা (জিম্মি) বিপুল সংখ্যায় মুসলমান হতে শুরু করেন। তাদের ওপর ধার্যকৃত শরয়ী কর “জিজিয়া” ছিল সরকারের আয়ের একটি বড় উৎস। জিম্মিদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় জিজিয়ার হারও দ্রুত কমতে থাকে, যা নিয়ে কিছু প্রদেশের গভর্নররা উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এতে খুশি ছিলেন। একজন শাসক সরকারি কোষাগার শূন্য হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলে আপনি উত্তর দিলেন:

“আমি খুব খুশি হব যদি সমস্ত অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায় এবং (জিজিয়ার অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে) আমরা ও তোমরা খেতে লাওল চালিয়ে নিজেদের পেট ভরি।” [১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদি ছিলেন, কর আদায়কারী নন:

ইয়েমেনের অমুসলিমদের কাছ থেকে খারাজের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত ছিল, ফসল বেশি হোক বা কম। আপনি যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তা নিষেধ করে নির্দেশ দিলেন যে, ফসলের অনুপাতে খারাজ ধার্য করা হোক। যদি পুরো ইয়েমেন থেকে এক মুষ্টি শস্যও আদায় হয়, তবে আমি তাতেই সন্তুষ্ট। [২] আপনার বক্তব্য ছিল: “হযরত মুহাম্মদ ﷺ হাদি ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, কর আদায়কারী হিসেবে নয়।” [৩]

কর তুলে দেওয়া হলো:

আপনি শরয়ী রাজস্ব ব্যতীত পূর্ববর্তী যুগে প্রচলিত সমস্ত ধরনের কর স্থগিত করে দেন, স্থল ও জলপথের বাণিজ্যকে উন্মুক্ত করে দেন, কাস্টম ডিউটি মাফ করে দেন এবং সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে দেন। [৪]

[১] সীরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনিল জাওযী, পৃ. ১১৯, ১২০; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৫/৩০৫, ত. আস-সাআদাহ

[২] সীরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনি আবদিল হাকাম, পৃ. ১০৮

[৩] কিতাবুল খারাজ লি ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ. ১৪৪, ত. আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়াহ

[৪] সীরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনি আবদিল হাকাম, পৃ. ৮৩, ১৪৯; উমর বিন আবদুল আজিজ মাআলিমুত তাজদীদ ওয়াল ইসলাহ লিস-সান্নাবী, পৃ. ২৭০, ২৮০

টোল ঘর বিলুপ্তি

পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে মহাসড়কগুলোতে টোল ঘর স্থাপিত ছিল, যেখান থেকে অতিক্রমকারী বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করা হতো। উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. সকল টোল ঘর বিলুপ্ত করে দেন। ফিলিস্তিনের উপকূলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ট্যাক্স আদায়ের একটি বড় টোল ঘর ছিল। উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. ফিলিস্তিনের গভর্নরকে নির্দেশ দেন যে, আপনার ওখানকার টোল ঘরটি ভেঙে ফেলুন এবং এর ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। [১]

উৎসবের সময় কর্মকর্তাদের উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ

পূর্ববর্তী যুগের শাসকরা জিন্মিদের উৎসবের সময় তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতেন। কর্মকর্তারা যখন তাদের এলাকায় যেতেন, তখন তাদের কাছ থেকে যাতায়াত খরচও নিতেন এবং তাদের মেহমানদারি গ্রহণ করতেন। কৃষকদের আয়ের ওপর কর্তনও কার্যকর ছিল। উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এই সমস্ত ধারা বন্ধ করে দেন। [২]

শাসক পরিবারের ব্যবসায় অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা

শাসক পরিবারের অনেক লোক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে বাজারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছিল। বাহ্যিকভাবে এটি কোনো অবৈধ কাজ ছিল না, কিন্তু আপনি এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন; [৩] কারণ ব্যবসায় লিপ্ত হওয়ার পর শাসকদের মনোযোগ জনকল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের আর্থিক লাভের দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে পুরো সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হতে পারে।

প্রাণীদের অধিকারের ওপর গুরুত্বারোপ

প্রাণীদের অধিকার পর্যন্ত আপনার দৃষ্টিতে ছিল। কিছু এলাকায় উটের ওপর এক হাজার রতল পর্যন্ত বোঝা চাপানো হতো। আপনি নির্দেশ দেন যে, একটি উটের ওপর ছয়শ রতলের বেশি ওজন যেন চাপানো না হয়। প্রাণীদের মুখে শত্রু লাগাম লাগানো এবং তাদের লোহা দিয়ে পেটানোর প্রথাও প্রচলিত ছিল। আপনি একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। [৪]

খলিফার সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন

খেলাফতের পর ব্যক্তিগত জীবনে আপনি এতটাই কৃচ্ছসাধন ও সরলতা অবলম্বন করেন যার উদাহরণ অন্য শাসকদের মধ্যে তো দূরের কথা, ফকির ও দরবেশদের মাঝে পাওয়াও কঠিন। আগে আপনি আরবের সবচেয়ে সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন, কিন্তু খলিফা হওয়ার পর আপনি আরাম-আয়েশের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। সরকারি কোষাগার থেকে আপনার ব্যক্তিগত আয় ছিল মাত্র এতটুকু যে, কষ্টে ঘরে দুই বেলার রুটি তৈরি হতো। আর কখনো কখনো সেই সুযোগও হতো না।

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৯৬; সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনিল জাওজি, পৃ. ১১৩

[২] সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ১৪১

[৩] সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ৮৭

[৪] সিরাত উমর বিন আবদুল আজিজ লি ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ১৪১

ঘরে পেঁয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না:

একদিন তিনি ঘরে আসলেন, তখন তাঁর কন্যারা মুখে হাত দিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করার পর জানা গেল যে, আজ ঘরে কাঁচা পেঁয়াজ ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছুই নেই। তিনি এটি দেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: “হে আমার কন্যারা! তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে তোমরা ভালো ভালো খাবার খাবে আর তোমাদের পিতাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখবে?”

তাঁর নিজের খাবারের অভ্যাস ছিল অত্যন্ত সাধারণ। ঘরে যা কিছু জুটত, তা একটি পাত্রে ঢেকে রাখা হতো। তিনি নিজের কাজ থেকে অবসর হয়ে কোনো এক সময় এসে তা খেয়ে নিতেন। [১]

হজ্জের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-অনটন:

হজ্জ এবং মদিনা যিয়ারতের তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের শাসক হওয়ার পরেও তাঁর কাছে এত টাকা ছিল না যে সফরের খরচ মেটানো যায়। একবার হজ্জের দিনগুলো আসলে তাঁর খাদেম মুজাহিম জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার কাছে কি কিছু আছে?” তিনি বললেন: “দশ-বারো দিনার।” সে বলল: “তা দিয়ে কী হবে?” পরবর্তীতে কোনো হালাল উৎস থেকে বড় অংকের অর্থ আসলো। মুজাহিম অভিনন্দন জানিয়ে মনে করিয়ে দিলেন যে এখন হজ্জের সফরের খরচ মিটে যাবে। কিন্তু তিনি সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে দিলেন এবং বললেন: “আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্পদ থেকে ফায়দা হাসিল করেছি। এখন এর ওপর মুসলমানদের হক রয়েছে।” [২]

যাও তুমি মুক্ত:

এই অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি কাউকে নিজের সাথে থাকতে বাধ্য করতেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজনে একজন গোলাম এবং একটি ঘোড়া ছিল। একদিন গোলামের কাছে তার অবস্থা জানতে চাইলে সে বলল: “দুনিয়ায় আমি, আপনি এবং এই ঘোড়া ছাড়া সবাই শান্তিতে আছে।” তিনি বললেন: “যাও, তুমি মুক্ত।” [৩]

পোশাকে সাদাসিধে ভাব:

পোশাকে তিনি এতটাই সাদাসিধে ছিলেন যে মোটা কাপড় পরিধান করতেন। তাঁর এক সঙ্গীর বক্তব্য হলো, উমর বিন আব্দুল আজিজ যখন শাহজাদা ছিলেন, তখন তিনি আমাকে নিজের পোশাকের জন্য কাপড় কিনে আনতে বললেন। আমি আটশ দিরহাম দিয়ে সবচেয়ে ভালো কাপড় কিনে আনলাম। যখন তা সেলাই করে তাঁর সামনে পেশ করা হলো, তখন তিনি তাতে হাত বুলিয়ে বললেন: “এটি কতই না খসখসে এবং শক্ত!” খলিফা হওয়ার পর একবার কাপড় আনানো হলো এবং আট দিরহাম মূল্যের কাপড় পেশ করা হলো। তিনি তা দেখে বললেন: “এটি কতই না নরম ও মসৃণ।” [৪]

জুমার সালাতের জন্যও সাধারণ পোশাক ছিল যাতে তালি লাগানো থাকত। মানুষ তাঁকে নতুন পোশাক পরার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করত, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করতেন না। [৫]

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৩, ৫৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/২৩৪

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৯

[৫] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ: ৫/৪০২

এক জোড়া পোশাকে জীবনযাপন:

শেষ জীবনে আপনার কাছে মাত্র এক জোড়া পোশাকই অবশিষ্ট ছিল। প্রতি জুমুআয় সেটি ধুয়ে পুনরায় পরিধান করতেন। কখনো কখনো পোশাক শুকাতে দেরি হওয়ার কারণে জুমুআর সালাতের জন্য বের হতেও বিলম্ব হয়ে যেত। [১]

নিজের কাজ নিজের হাতে করা:

ছোটখাটো কাজগুলো কোনো দ্বিধা ছাড়াই নিজে করে নিতেন। এক রাতে আপনি কাজ করছিলেন, এমন সময় প্রদীপ নিভে গেল। আপনি উঠে সেটি পুনরায় জ্বালাতে লাগলেন। কেউ একজন বলল: “আপনি কেন কষ্ট করলেন, আমরাই করে দিতাম।” আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “যখন আমি উঠেছিলাম তখনও উমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলাম, যখন বসেছি তখনও আমি সেই একই ব্যক্তি।” [২]

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা:

সতর্কতার অবস্থা এমন ছিল যে, বাইতুল মালের অর্থ দিয়ে কেনা প্রদীপ কেবল সরকারি কাজের সময়ই জ্বালানো হতো। যদি কখনো সরকারি আলোচনার মাঝে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করত, তবে আপনি সরকারি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালাতেন, তারপর তার সাথে কথা বলতেন। [৩] সরকারি খাতে আসা মিশক ওজন করার সময় নিজের নাক বন্ধ করে নিতেন যাতে এর অবৈধ ব্যবহারে লিপ্ত না হয়ে যান। হাতে লেগে থাকা মিশকও ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতেন। কেউ এই পর্যায়ে সতর্কতায় বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন: “মিশকের দ্বাণ নেওয়া ছাড়া এর আর কী ফায়দা আছে?” [৪]

বাইতুল মালের চুলায় নিজের জন্য পানি গরম করা থেকে বিরত থাকা:

বাইতুল মালের চুলায় গরম করা পানি ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতেন যাতে কোনো প্রকার দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে না পড়েন। আপনার গোলাম অনেক দিন ধরে বাইতুল মালের রান্নাঘর থেকে ওয়ুর পানি গরম করে নিয়ে আসত। আপনি বিষয়টি জানতে পেরে মুয়াহিমকে বললেন: “এই পরিমাণ পানি গরম করে দেখো যে কতটুকু জ্বালানি খরচ হয়। তারপর হিসাব করো যে এই সব দিনে মোট কতটুকু জ্বালানি খরচ হয়েছে। ততটুকু জ্বালানি কিনে বাইতুল মালে জমা করে দাও।” [৫]

একবার প্রচণ্ড শীতে আপনার গোসলের প্রয়োজন হলো। ঘরে গরম পানির ব্যবস্থা ছিল না। আপনি ঠান্ডা পানিতে গোসল করার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তখন আপনাকে কসম দিয়ে বলা হলো যে, নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলবেন না। বাইতুল মালের রান্নাঘর থেকে আপনার জন্য গরম পানি আনিয়ে নিচ্ছি, আপনি এর মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেবেন। আপনি পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। গোসলের পর পানি গরম করার মূল্য বাইতুল মালে জমা করে দিলেন। [৬]

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৮

[২] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৪

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৩৭

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৫

[৫] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৫

[৬] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৫, ৪৬

ব্যক্তিগত কাজে সরকারি বাহন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা:

এই সতর্কতার কারণে আপনি সরকারি বাহনকে কোনো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে দিতেন না। আপনি মধুর সাথে রুটি খেতে পছন্দ করতেন। একবার ঘরে মধু শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই যুগে ডাকের খচ্চরগুলো সরকারি কাজের জন্য বিভিন্ন শহরের মধ্যে অনবরত চলাচল করত। স্ত্রী গোলামকে পাঠিয়ে অন্য শহর থেকে মধু আনিয়ে নিলেন যা ডাকের খচ্চরের পিঠে চড়ে এসেছিল। আপনি যখন জানতে পারলেন তখন বললেন: “মুসলমানদের পশুদের কি ওমরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ক্লান্ত করা হবে?” তিনি সেই মধু বিক্রি করিয়ে তার মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দিলেন। [১]

একবার জর্ডানের শাসক আপনার কাছে খেজুরের দুটি ঝুড়ি পাঠালেন। আপনি জানতে পারলেন যে এই উপহার সরকারি ডাকের পশুদের পিঠে চড়ে পৌঁছেছে। আপনি বললেন: “মুসলমানদের ডাকের পশুদের ওপর আমার কোনো অধিকার ছিল না।” এই বলে নির্দেশ দিলেন যে, এই ঝুড়িগুলো বিক্রি করে এর মূল্য বায়তুল মালে জমা করে দেওয়া হোক। [২]

অন্যদের যুহদ ও অল্লেতুষ্টির শিক্ষা:

সরলতা ও সতর্কতা কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অন্যদেরও অত্যন্ত উপযুক্ত পন্থায় এর উপদেশ দিতেন। বনু মারওয়ান যারা আগে সরকারি কোষাগার থেকে অটেল খরচ করত, এখন তারা নিজেদের অংশ একেবারে মেপে মেপে পেতে শুরু করল এবং এই কারণে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। [৩] তাদের মধ্যেই ওমর বিন আব্দুল আজিজের শ্যালক মাসলামা বিন আব্দুল মালিকও ছিল, যে বনু মারওয়ানের অত্যন্ত সাহসী সেনাপতি ছিল, তবে পানাহারে সে ছিল অত্যন্ত অপব্যয়ী। ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাকে সংশোধন করার জন্য একদিন নিজের সাথে খাবারের দাওয়াত দিলেন। সে যখন এল, তখন আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে খাবার অনেক দেরিতে আনালেন। ততক্ষণে ক্ষুধার কারণে মাসলামার অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। খাবার ছিল কেবল ডাল ও রুটি। মাসলামা তীব্র ক্ষুধার কারণে খুব তৃপ্তির সাথে খেল। যখন সে পরিতৃপ্ত হলো, তখন আপনি বিশেষ সুস্বাদু খাবার আনালেন। মাসলামা সেগুলো দেখে বলল: “এখন তো এক লোকমা খাওয়ারও জায়গা নেই।”

আপনি বললেন: “যখন পেট এভাবেও ভরতে পারে, তবে খাবারে এমন আড়ম্বর করে জাহান্নামে যাওয়ার কী প্রয়োজন?” মাসলামা বিষয়টি বুঝতে পারল এবং নিজেকে সংশোধন করে নিল। [৪]

আপনি সরকারি কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিতেন। নায়েব ও লেখকদের নির্দেশ দিতেন: “কলমের নিব সরু রাখো। ঘন করে লেখো। একটি কাগজে অনেক কথা লিখে দাও। মুসলমানদের এমন লম্বা চওড়া খরচের প্রয়োজন নেই যা সরকারি কোষাগারের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।” [৫]

[১] আখবার আবি হাফস, পৃ. ৫৭

[২] সিরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫২

[৩] সিরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৬০

[৪] সিরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৯

[৫] তারিখুত তাবারি: ৬/৫৭১; সিরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৬১

তবে আপনি সরকারি কর্মচারীদের জন্য সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করতেন যাতে তারা কোনো অবৈধ উপায়ে উপার্জনে লিপ্ত না হয়। আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন তিনশ দিনার নির্ধারণ করেছিলেন। কেউ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল যে তাদের বেতন এত বেশি আর আপনার বেতন এত কম কেন? তখন আপনি নিজের পেট খুলে বললেন: “এই গোশত মুসলমানদের সরকারি সম্পদেই লালিত-পালিত হয়েছে। এখন আমি এতে মুসলমানদের সম্পদ পুনরায় খরচ করতে চাই না।” [১]

আপনার দাপ্তরিক জীবনের একটি দৃশ্য:

আপনি বেশিরভাগ সময় আপনার দপ্তরে বিভিন্ন শহর থেকে আসা আবেদনপত্রগুলো পড়তে, সেগুলোর ওপর ব্যবস্থা নিতে এবং ফরিয়াদিদের সাথে সাক্ষাতে অতিবাহিত করতেন। মদিনা মুনাওয়ারার এক গোলাম ইবনে জিয়াদের বর্ণনা হলো:

“আমার মনিব আমাকে কিছু প্রয়োজনে তাঁর খিদমতে দামেস্কে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর মজলিসে পৌঁছলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বললাম। বসরা থেকে আসা লোকেরা ছিল, আবেদনপত্র শোনা হচ্ছিল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা হচ্ছিল। একজন লেখক নির্দেশের উত্তর লিখছিলেন। উমর তাঁর কাজে ব্যস্ত থেকেই ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ বলছিলেন। আমি কাছে গিয়ে পুনরায় ‘আসসালামু আলাইকুম’ বললাম। তিনি বললেন: ‘আমরা শুনে নিয়েছি। পুনরায় বলার প্রয়োজন ছিল না। তুমি দরজার কাছে বসো।’ উমর (রা.) নিজের কাজ থেকে অবসর হলে সবাইকে বাইরে চলে যেতে বললেন, এমনকি খাদেমও চলে গেল। এখন তিনি নিজে আমার কাছে আসলেন এবং মদিনার পুরুষ, নারী ও অন্যান্য লোকদের অবস্থা একে একে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। তারপর মদিনায় নিজের পক্ষ থেকে পাঠানো কিছু নির্দেশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যে সেগুলো কার্যকর হয়েছে কি না।

শেষে বললেন: ‘তুমি দেখছো আমি কত বড় কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছি।’

এ কথা বলে তিনি এত কাঁদলেন যে আমারও কান্না আসতে লাগল। আমি বললাম:

‘আপনার নেক আমলের কারণে আপনার ব্যাপারে আমার কল্যাণের আশা রয়েছে।’

তিনি বললেন: ‘না, আমি তেমন নই, আমি কোথায় তেমন!’ এ কথা বলে তিনি আবার অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

আমি তাঁর কাছে কিছুদিন অবস্থান করলাম। তিনি আমার মনিবের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দিলেন। তারপর একটি চিঠি লিখলেন যে এই গোলামটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সাথে সাথেই নিজের গালিচার নিচ থেকে বিশ দিনার বের করে আমাকে দিলেন যাতে আমি সেগুলো বদলে নিই। আমি অস্বীকার করলে তিনি বললেন: ‘নিয়ে নাও। এটি আমার নিজের বেতন থেকে।’ তিনি জোরাজুরি করতে থাকলেন। অবশেষে আমাকে নিতেই হলো। আমি তাঁর চিঠি আমার মনিবকে দিলাম (মনিব বুঝতে পারলেন যে উমর এই গোলামকে কিনে মুক্ত করতে চান)। আমাকে বিক্রি করার পরিবর্তে আমার মনিব আমাকে মুক্ত করে দিলেন।“ [২]

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৫, ৪৪

[২] আখবার আব্বি হাফস, পৃ. ৬৯, ৬৮

ক্ষমতার অলিন্দে আদর্শিক ও ব্যবহারিক সংস্কারের প্রচেষ্টা

প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা আপনার সাধ্যের বাইরে ছিল। কিন্তু আপনি সেই পরিস্থিতিতেও নিজের সীমিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, যদি নিয়ত খাঁটি হয়, অন্তরে দরদ থাকে, ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতা এবং সাহস ও বীরত্বের সাথে কাজ নেওয়া হয় এবং হিকমতে আমলি বা কৌশলী কর্মপন্থা হাতছাড়া না করা হয়, তবে মানুষ যেকোনো পরিবেশে থেকেও এবং যেকোনো স্তরের ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আপনি ক্ষমতার অলিন্দের ভেতর থেকেই নেক চরিত্রের কর্মকর্তাদের একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করার নিরলস চেষ্টা করেছেন। আপনার কথোপকথন, ভাষণ এবং পত্রাবলীতে অধস্তনদের নৈতিক ও আদর্শিক প্রশিক্ষণের এই প্রচেষ্টা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আপনি আপনার পত্রাবলীতে নায়েবদের তাকওয়া এবং শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। তাদের নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি মনোযোগী করতেন এবং বলতেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য যা ছিল, সেই খিলাফতের দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। [১]

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের তাকিদ:

আপনি গভর্নরদের আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ) করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন যে, এই দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব কী এবং এটি থেকে বিরত থাকার পরিণাম কী। [২] সামরিক কর্মকর্তাদের সময়মতো সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তাদের ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর প্রতি উৎসাহিত করতেন। [৩] বিচারকদের শরয়ী শাস্তির হাকিকত বা বাস্তবতা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সতর্কতা ও পরিমিতিবোধ বজায় রাখার তাকিদ দিতেন। [৪]

পাপাচার দমনের প্রচেষ্টা:

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) রাজ্যে সৃষ্ট নৈতিক অবক্ষয়ের দিকেও মনোযোগী ছিলেন। তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতেন যেন নারীদের বিলাপ (নোহা) করা এবং জানাজায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয় এবং পর্দার ব্যবস্থা করার তাকিদ দিতেন। [৫]

নাবিজের মতো পানীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের অসতর্কতাও আপনার কাছে গোপন ছিল না। কিছু লোক নেশাজাতীয় ও মাদকদ্রব্য পান করতে শুরু করেছিল এবং কেউ কেউ তো এক ধাপ এগিয়ে মদ্যপানের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আপনি বৈধ ও অবৈধ পানীয়ের পার্থক্য স্পষ্ট করতেন এবং মদ্যপান রোধের নির্দেশ দিতেন। [৬]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পারস্পরিক মতভেদ এবং ফিরকাবন্দী:

প্রথম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই মতামতগুলো...

[১] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৮২, ৮৩

[২] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৭২, ৭৩

[৩] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে জাওজি, পৃ. ১১১, ১২৩

[৪] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে জাওজি, পৃ. ১৬৬

[৫] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে জাওজি, পৃ. ১১২, ১৪৩

[৬] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে জাওজি, পৃ. ১২২

[৭] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ, ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৯৩, ৯৪

...থেকে উৎপন্ন মতপার্থক্য উন্মতকে বহু দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। একদল হযরত আলী (রা.)-এর গুণগান বর্ণনা করার সময় হযরত তালহা, জুবায়ের এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে গালিগালাজ করত। অন্যদিকে বনু উমাইয়ার অনেক লোকের দৃষ্টিতে যেকোনো উমাইয়া শাসকের বিরোধিতা করা ব্যক্তি ছিল জবরদখলকারী, নির্ভীক ও পথভ্রষ্ট, চাই তিনি কোনো সাহাবীই হোন না কেন। ফলে এই ধরনের লোকেরা হযরত আলী (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে এই দৃষ্টিতেই দেখত এবং তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনাও ছড়িয়ে দিত।

মুহাদিসগণ হযরত আলী (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) সম্পর্কে ধারণা সংশোধন করে দিয়েছেন:

উমর ইবনে আবদুল আজিজও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার পরিবারের এই চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি মদিনা মুনাওয়ারার ইলমি পরিবেশ পেয়েছিলেন যা শাম ও ইরাকের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিল এবং যেখানে সুন্নতে নববীর সুস্রাণ প্রতিটি বাতাসে মিশে ছিল। ফলে মদিনায় তিনি এমন সব হাদিসের শাইখদের সান্নিধ্য পান যারা সুন্নতে মুতাহহারার অবিকল অনুযায়ী তার ইলমি ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, উমর ইবনে আবদুল আজিজও হযরত আলী (রা.)-এর দোষ অন্বেষণ করেন। তিনি একদিন উমর ইবনে আবদুল আজিজকে বললেন:

“আপনি কবে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা আহলে বদরের ওপর সন্তুষ্ট হওয়ার পর পুনরায় তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন?”

উমর উস্তাদের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। বললেন: “আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি এবং আপনার কাছেও ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর কসম! আমি পুনরায় এমনটি করব না।” এরপর থেকে তিনি সর্বদা হযরত আলী (রা.)-এর আলোচনা কল্যাণের সাথেই করতেন। [১]

এই মুহাদিসগণই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) সম্পর্কেও তার ধারণাকে ইতিবাচক করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো, একবার উমর ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবি মুলাইকাকে বললেন: “আমার মনে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর প্রতি কিছুটা ঘৃণা রয়েছে।” ইবনে আবি মুলাইকা তৎক্ষণাৎ বললেন: “আপনি যদি তাকে দেখতেন তবে বলতেন যে, না তার মতো দোয়া করার কেউ আছে, আর না তার মতো সালাত আদায় করার কেউ।” [২]

নিজেদের জিহ্বাকে সাহাবীদের বিরুদ্ধে কলুষিত করবেন না:

এভাবে আহলে ইলমদের সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে উমর ইবনে আবদুল আজিজের দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যপন্থী ও সঠিক হয়ে যায়। এরপর যখন তিনি খলিফা হলেন, তখন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এই ভুল আকিদা ও মতবাদ সংশোধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং সুন্নত থেকে বিচ্যুত প্রতিটি নতুন বিষয়কে সংশোধন করার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাহাবীদের পারস্পরিক বিবাদ (মুশাজারাতে সাহাবা) সম্পর্কে সমাজে ছড়িয়ে পড়া বর্ণনাগুলো যাচাই করা সহজ কাজ নয়, তাই অন্তরকে নিরাপদ রাখার সাধারণ উপায় হলো এই যে, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করা।

[১] তারিখ দামেশক: ৪৫/১৩৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/১১৭, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬৭৮, ৬৭৯। ইনি ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ হুযালী আল-মাদানী, মদিনার সাত ফকিহদের (ফুকাহায়ে সাবআ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ১০৫ হিজরিতে ইশ্তিকাল করেন, সিহাহ সিত্তায় তার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৪৭৩, ৪৭৪)

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/৩৩৫... ইনি আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা, মক্কার ফকিহদের মধ্যে গণ্য হতেন। সিহাহ সিত্তায় তার বর্ণনা রয়েছে। ১১৭ হিজরিতে তার ইশ্তিকাল হয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫/৮৯, ৯০)

সুতরাং একবার যখন তাঁকে মুশাজারা (সাহাবীদের পারস্পরিক বিবাদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন:

“এগুলো সেই রক্ত যা থেকে আল্লাহ আমাদের হাতকে বাঁচিয়েছেন। তবে আমরা কেন আমাদের জিহ্বাকে তা থেকে নিরাপদ রাখব না।” [১]

সাহাবীদের উদাহরণ চোখের মতো:

তিনি মুশাজারার প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলতেন: “সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণ চোখের মতো। চোখ যখন ব্যথা করতে শুরু করে, তখন তার চিকিৎসা হলো তাতে হাত না লাগানো।” [২]

খুতবায় হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সমালোচনার নিষেধাজ্ঞা:

বনু মারওয়ানের কিছু শাসক জুমার নামাজের খুতবায় হযরত আলী (রা.)-এর সমালোচনা করতেন, যা দ্বীনদার লোকদের খুব কষ্ট দিত। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) একটি বিশেষ ফরমানের মাধ্যমে শাসকদের এই কাজ থেকে নিষেধ করে দিলেন। [৩]

তিনি হযরত আলী (রা.)-এর ওপর সমালোচনার পরিবর্তে খুতবায় এই আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত শুরু করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [৪]

(নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচার, ইহসান এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।) [৫]

স্মরণীয় যে, যেসব বর্ণনায় হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি গালিগালাজ প্রবর্তনের বিষয়টি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে, সেগুলো গবেষণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। প্রমাণিত বিষয় হলো, বনু মারওয়ানের কিছু সংকীর্ণমনা শাসক এই কাজে লিপ্ত ছিল। তবে কিছু লোক বনু উমাইয়াদের হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি নিন্দা ও সমালোচনা করার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ কর্তৃক তা বন্ধ করার বিষয়টিকেও ইতিহাসের কিতাবসমূহে বর্ণিত একটি গল্প বলে অভিহিত করেছেন। তারা লিখেছেন যে, উমর ইবনে আব্দুল আজিজের এ ধরনের কোনো সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান নেই এবং তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর যে বর্ণনায় এমনটি বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত যয়ীফ। এরপর তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর গুণগান বর্ণনা করে নিজেদের দাবিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে এটি একেবারেই অসম্ভব যে তিনি এই প্রথা চালু করবেন। (উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, মাআলিমুত তাজদীদ ওয়াল ইসলাহ লিদ-ডক্টর আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী, পৃ. ১২৭)

এই কথা তো সঠিক যে, এই অভিযোগ হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর লাগানো যায় না, কিন্তু এই দাবি একেবারেই ভুল যে বনু উমাইয়াদের যুগে এমনটি হতোই না। হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননা করার বিষয়টি হাদীসের কিতাবসমূহের একাধিক সহীহ ও হাসান বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে। (আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের ‘ইযালায়ে শুবুহাত’ অধ্যায়ে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি)। তবে উমর ইবনে আব্দুল আজিজের এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি কেবল যয়ীফ বর্ণনায় রয়েছে, কিন্তু এই দুর্বলতা অস্বীকারের কারণ হতে পারে না। কারণ একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফার কোনো নেক কাজের প্রমাণের জন্য খুব শক্তিশালী সাক্ষ্য উপস্থাপন করা জরুরি নয়, এ বিষয়ে যয়ীফ বর্ণনাও যথেষ্ট হতে পারে। আমাদের এটি মেনে নিতে হবে যে, এই মন্দ প্রথা উমর ইবনে আব্দুল আজিজই বন্ধ করেছিলেন। যদি এটি স্বীকার না করা হয়, তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, বনু উমাইয়াদের মধ্যে প্রচলিত এই মন্দ প্রথা (যার প্রমাণ সহীহ ও হাসান বর্ণনায় রয়েছে) পরবর্তী যুগে কখন এবং কে বন্ধ করেছিলেন? উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছাড়া আর কোন শাসক ছিলেন যার দৃষ্টিতে এই মন্দ প্রথাটি ধরা পড়েছিল? যদি আমরা উমর ইবনে আব্দুল আজিজকে এই মন্দ প্রথা নির্মূলকারী হিসেবে না মানি, তবে এর অর্থ হবে বনু উমাইয়াদের পুরো যুগে এই মন্দ প্রথা একইভাবে অব্যাহত ছিল। এতে বনু উমাইয়াদের অবশিষ্ট প্রতিরক্ষাও শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের সকল খলিফা এই অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু হবেন। অথচ ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী উমর ইবনে আব্দুল আজিজের পর এই মন্দ প্রথার দৃশ্যগুলো অনুপস্থিত এবং পরবর্তী খলিফাগণ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত।

[১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩৯৪/৫

[২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ৩৯৩/৫

[৩] আল-ইনসাফ লিল-বাকিল্লানি, পৃ. ৬৬

[৪] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০

[৫] আল-আশির মিন মাশইয়াখাতিল বাগদাদিয়্যাহ লি-আবি তাহের আস-সিলাফি, পৃ. ৬২

বিগত খলিফাদের বর্ণনায় সতর্কতা:

উমর ইবনে আবদুল আজিজের সংকল্পবদ্ধ কর্মপদ্ধতি বিগত খলিফাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এই প্রশ্ন তৈরি করছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কী মতামত রাখা উচিত? তাদেরকে কি জালিম ও স্বৈরাচারী বলা হবে নাকি অন্য কিছু? আবদুল মালিকের নাতি আবদুর রহমান ইবনে সুলাইমানের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার সময় উমর ইবনে আবদুল আজিজ অত্যন্ত চমৎকারভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মত প্রদান করেন, যাতে বিগত শাসকদের চরিত্র হননও ছিল না আবার নিজের বড়ত্বও ছিল না। তিনি ওই খলিফাদেরও একটি পরীক্ষার শিকার মনে করতেন এবং নিজেকেও।

তিনি বললেন: “হে আবদুর রহমান! আমি তোমার দাদা আবদুল মালিকের সাথেও ছিলাম, তার সেবা-শুশ্রূষা ও দাফনকার্যে শরিক ছিলাম। আমি তার চেয়ে বড় দুনিয়াবি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কাউকে পাইনি। এরপর এই দায়িত্ব তোমার চাচা ওয়ালিদের ওপর এল, আমি তার সাথে ছিলাম, তার অসুস্থতায় সেবা করেছি এবং দাফনে শরিক ছিলাম। আমি দুনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী তার চেয়ে বড় কাউকে দেখিনি। এরপর এই পদ তোমার পিতা সুলাইমান পেলেন। আমি তার সাথে ছিলাম, তার অসুস্থতা ও দাফনে शामिल ছিলাম। আমি তার চেয়ে বেশি দুনিয়াকে ব্যবহারকারী আর কাউকে দেখিনি। এখন এই দুনিয়া আমার সামনে এবং আমাকে আমার দ্বীন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।” এ কথা বলে তিনি এত বেশি কাঁদলেন যে তার চিৎকার বেরিয়ে এল। [১]

সুন্নতে নববীর প্রচার ও প্রসার:

তিনি দ্বীনি ইলম প্রচারের প্রবল উদ্দীপনা রাখতেন। নিজেও অনেক বড় আলেম, ফাজিল ও ফকিহ ছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত সুন্নতে নববী লিখে জমা করার খুব একটা প্রচলন ছিল না। অধিকাংশ ভাণ্ডার মুহাদিসগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি এই আশঙ্কা অনুভব করে যে, হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর হবে না, পুরো সাম্রাজ্যের মুহাদিস ও ওলামাদের তাকিদ দিলেন যেন তারা হাদিসসমূহ লিখিতভাবে সংকলন করেন। মদিনা মুনাওয়ারার মহান মুহাদিস আবু বকর ইবনে হাজম (রহ.)-কে তিনি মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তাকে এবং ইবনে শিহাব জুহরি (রহ.)-কে বিশেষভাবে এই মহান ইলমি খিদমতের দিকে মনোনিবেশ করান এবং লিখেন যে, যদি এমনটা না হয় তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে ওলামাদের এই প্রজন্ম শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সুন্নতে নববীও দুনিয়া থেকে মিটে যাবে। [২]

মাগাজি, সিরাতে নববী এবং মানাকিবে সাহাবার দরস জারি করা:

তিনি “সিরাতে নববী”-কে একটি স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে সংকলন করতে উৎসাহিত করেন। সেই যুগে সিরাতকে “ইলমে মাগাজি” বলা হতো যার সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন আসিম ইবনে উমর। তাঁর নির্দেশে তিনি দামেস্কের জামে উমাবিতে মাগাজি, সিরাতে নববী এবং মানাকিবে সাহাবার দরস দেওয়া শুরু করেন। [৩]

[১] সিরাত উমর ইবনে আবদুল আজিজ লি-ইবনে আবদিল হাকাম, পৃ. ১৩৫

[২] উমর ইবনে আবদুল আজিজ আবু বকর ইবনে হাজমের কাছে লিখেছিলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসের মধ্যে যা আছে তা দেখো এবং তা লিখে নাও, কারণ আমি ইলম মিটে যাওয়া এবং ওলামাদের চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। আর নবী (সা.)-এর হাদিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না। তোমরা ইলম ছড়িয়ে দাও এবং (ইলমি মজলিসে) বসো যাতে যারা জানে না তারা জানতে পারে, কেননা ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যতক্ষণ না তা গোপন বিষয়ে পরিণত হয়। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম, বাবু কাইফা ইয়াকবিদুল ইলম; জামে বয়ানিল ইলম লি-ইবনে আবদিল বার, হা: ৪৩৮)

[৩] তাহজিবুত তাহজিব: ৫/৫৩, ৫৪, জীবনী: আসিম ইবনে উমর; ইনি আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা, তাকে আসিম ইবনে কাতাদাও বলা হয়।

ওলামাদের জন্য ভাতা:

আপনি আপনার গভর্নরদের প্রতি এই নির্দেশনা জারি করেছিলেন যে, তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহর সংরক্ষণ ও প্রচারে নিয়োজিত ওলামাদের জন্য প্রাদেশিক বায়তুল মাল থেকে এমন পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেন, যার ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের চিন্তা না থাকে এবং তারা একাগ্রতার সাথে নিজেদের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারেন। [১] এর পাশাপাশি আপনি ইলমি খিদমতে নিয়োজিত সেই ওলামাদের জন্য একশ দিনার (প্রায় আড়াই লক্ষ রুপি) ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে নিজেদের কাজে লিপ্ত থাকতে পারেন। [২] সেইসব ছাত্রদের জন্যও সরকারি ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন যারা দ্বীনি ইলম শিখতে মগ্ন ছিল। [৩]

দ্বীন প্রচার:

দ্বীনের দাওয়াতকে আপনি ইসলামী খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন; তাই আপনি যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন, সেখানে বহির্বিশ্বকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। হিন্দুস্তানের সাতজন রাজার কাছে আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াতী পত্র পাঠানো হয়েছিল। আপনি ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের সাথে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তারা মুসলমান হয়ে যান তবে তাদের নিজেদের সালতানাতের ওপর তাদের শাসনই বহাল রাখা হবে এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব ঠিক তেমনই হবে যা অন্য মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই রাজারা আপনার সীরাত সম্পর্কে সংবাদ পেয়েছিলেন; তাই তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের নাম আরবদের মতো রেখে নেন। একইভাবে আপনার দাওয়াতে হাবশাতেও বিভিন্ন গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়। [৪]

মরক্কোতে বারবার গোত্রের বিশাল জনসংখ্যা বসবাস করত। আপনার নায়েব ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ সেখানে অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ প্রদর্শন করেছিলেন যার ফলে বারবার গোত্রগুলো অনেক প্রভাবিত হয়েছিল। ইসমাইল বিন আব্দুল্লাহ তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এরপর হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ তাদের সরদারদের নামে নিজে একটি পত্র লিখে ইসলামের দাওয়াত দেন। এর ফলে সেখানে বারবার গোত্রগুলো দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। [৫]

মধ্য এশিয়ায় মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেছিল কিন্তু সেখানে ইসলাম পুরোপুরিভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। উমর বিন আব্দুল আজিজ সেখানকার গোত্রীয় প্রধানদের কাছেও দাওয়াতী পত্র লিখেছিলেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের খারাজ মাফ করে দেওয়া হয়েছিল। [৬]

গোত্রীয় গোঁড়ামি দূর করার চিন্তা:

বনু মারওয়ানের সরকার ছিল বিশুদ্ধ আরব উপাদানে গঠিত যার প্রশাসনিক যন্ত্রের সিংহভাগ ছিল কুরাইশদের। কুরাইশদের শাখা উপরে গিয়ে মুদারের সাথে মিলিত হতো যার আরও অনেক গোত্র পুরো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল। তাদের বিপরীতে আরবদের দ্বিতীয় বড় গোত্র ছিল রাবিআহ যাদের সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনের সাথে এবং এর ডজন ডজন উপগোত্র ইরাক, সিরিয়া ও হিজাজে বিদ্যমান ছিল।

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওয়াযী, পৃ. ১২৩

[২] আল-মা'রিফাহ ওয়াত তারিখ: ২/৩৮৪

[৩] জামিউ বায়ানিল ইলম: ১/১৪৭

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৫ ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই যে এরা কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন।

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২২৮, ২২৯

[৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪১১

ইসলাম গোত্রীয় ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল পর গোত্রীয় অভিজাত্য পুনরায় গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। যুদ্ধে নিজ নিজ গোত্রের স্লোগান দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী খলিফারা হয়তো কিছু কৌশলের কারণে এই প্রবণতাকে উপেক্ষা করে আসছিলেন, কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর দূরদর্শী দৃষ্টি দ্রুতই বুঝতে পেরেছিল যে, এই ফাটল যদি আরও গভীর হয় তবে তা সমগ্র ইসলামি বিশ্বকে বিভেদ ও গৃহযুদ্ধের আগুনে ঠেলে দেবে।

আপনি অবিলম্বে একটি ফরমান লিখে তার অনুলিপি সমগ্র ইসলামি বিশ্বে প্রচার করার নির্দেশ দেন। এতে তিনি কুরআনের আয়াত, হাদিস এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলাম-পূর্ব আরবদের অবস্থা, তাদের অনৈক্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, ইসলামের ভিত্তিতে আরব গোত্রগুলোর ঐক্য এবং বিশ্বের ওপর তাদের বিজয়ের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের পূর্ণ ঐক্য ও সংহতির নির্দেশ দেন। বিভেদ সৃষ্টিকারী গোত্রীয় স্লোগান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরিশেষে আপনি লিখেছিলেন:

“এই পত্র লেখার কারণ হলো সেই সব অজ্ঞ ও মূর্খ গ্রামবাসীদের কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া, যারা নতুন শাসক হয়েছে, যাদের আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে মৃত্যুর গোত্র এবং কেউ কেউ ইয়ামেন গোত্রের আশ্রয় নেয়। সুবহানাল্লাহ! তাদের ধ্বংস ও লাঞ্ছনার কতই না শখ! তারা কি আল্লাহর বাণী শোনেনি: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ‘নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।’

যে ব্যক্তি আমার এই পত্র পড়বে বা শুনবে, আমি তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করছি যে, সে যেন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় গ্রহণ না করে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের সাহায্যকারী মনে না করে। আমি এই বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, যাঁর কবজায় সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে এবং যিনি প্রত্যেকের ঘাড়ের শিরার চেয়েও নিকটবর্তী।“ [১]

চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য... আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা

আল্লাহর ভয়, মৃত্যুর স্মরণ, আখেরাতের চিন্তা, জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা; আপনার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক এবং আপনার চরিত্রের মূল শক্তি ছিল। এটিই সেই জিনিস যা খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে এক তীব্র দায়িত্ববোধে আচ্ছন্ন করেছিল এবং আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এটিই ছিল সেই জওহর যা এত বড় সাম্রাজ্যের সম্পদ ও অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে কোনো পার্থিব লাভের দিকে ধাবিত করতে পারেনি।

একবার সূরা আল-লাইল পাঠ করার সময় এই আয়াতে পৌঁছালেন... ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (অতঃপর আমি তোমাদেরকে এক লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি)। তখন জাহান্নামের ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সামনে পড়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। [২]

[১] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ৯০ থেকে ৯৩।

[২] সীরাত ওমর বিন আব্দুল আজিজ লিবন আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৭।

দাবেকের রাতগুলো এবং জাহান্নামের ভয়:

কখনো কখনো আপনার মনে আপনার পূর্বের সুখী জীবনের কথা ভেসে আসত যা খুব বেশি দিন আগের কথা ছিল না। যখন আখেরাতের কথা ভাবতেন, তখন তা পুনরায় ফিরে আসার ভয়ে ভীত হতেন। সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে বনু মারওয়ান ‘দাবেক’-এ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ দিন কাটিয়েছিলেন। এক রাতে আপনি আপনার স্ত্রী ফাতেমার কাঁধে হাত রেখে বললেন:

“ফাতেমা! তোমার কি দাবেকের রাতগুলোর কথা মনে আছে? তখন আমরা আজকের তুলনায় অনেক বেশি সচ্ছল ছিলাম।”

তিনি বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি যদি চান তবে আল্লাহ আমাদের এর চেয়েও অনেক বেশি সচ্ছলতা দান করেছেন।”

আপনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং এই বলতে থাকলেন:

“ফাতেমা! আমি জাহান্নামের আগুনকে ভয় পাই। আমি যদি আমার রবের অবাধ্যতা করি তবে আমি এক মহা দিবসের আজাবের ভয় করি।” [১]

মৃত্যুর পর আমাকে দেখা:

মদিনা মুনাওয়ারায় আপনার এক সাক্ষাৎপ্রার্থী দীর্ঘ সময় পর আপনার সাথে দেখা করতে এলে তিনি কেবল তাকিয়েই রয়ে গেলেন। আপনি এভাবে দেখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “আপনার শরীর এত কৃশ হয়ে গেছে, চুল পড়ে গেছে, গায়ের রঙ বদলে গেছে।”

আপনি বললেন: “আমার মৃত্যুর তিন দিন পর কবরে ঝুঁকি দিয়ে আমাকে দেখো। আমার চোখগুলো গাল বেয়ে ঝুলে পড়বে, নাক ও মুখ পুঁজ ও পোকায় ভরে যাবে। তখন তুমি আমাকে চিনতেও পারবে না।” [২]

ছুটি নিলে তো কাজ বেড়ে যাবে:

আপনি জীবনের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করে নিরন্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতেন। ছুটির কোনো প্রশ্নই ছিল না। একদিন কেউ একজন বলল: “হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি একদিন ছুটি নিন এবং কোথাও ভ্রমণে বের হোন, তবে ভালো হবে।” আপনি বললেন: “তাহলে ঐ দিনের কাজ আমার পরিবর্তে কে করবে?” বলা হলো: “পরের দিন করে নেবেন।”

আপনি বললেন: “এক দিনের কাজই আমাকে ক্লান্ত করে দেয়। দুই দিনের কাজ জমা হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে?” [৩]

জান্নাত ছাড়া আর কিছু চাই না:

একবার আপনি আপনার খাদেম মুজাহিমকে বললেন: “আল্লাহ আমাকে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বভাব দিয়েছেন। আমি যে অবস্থানেই অধিষ্ঠিত হয়েছি, তার চেয়েও উচ্চতর অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা করেছি। এখন আমি এমন এক মর্যাদায় পৌঁছেছি যার উপরে আর কোনো পদ বা মর্যাদা নেই। তাই এখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন কেবল জান্নাতেরই আকাঙ্ক্ষা করে।” [৪]

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৮, ৪৭

[২] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৩, ৫২

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৫

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি-ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৯

চোখের পানিতে উনুন নিভে গেল:

জান্নাতের আকাঙক্ষা এবং জাহান্নামের ভয়ে তাঁর কান্নার অবস্থা এমন ছিল যে তাঁর এক সমসাময়িক বলতেন:

“মনে হয় জান্নাত এবং জাহান্নাম কেবল উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এবং হাসান বসরী রহ.-এর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।” [১]

একবার কেউ তাঁকে বলল: “যদি সারা দুনিয়া জান্নাতে চলে যায় এবং আপনি জাহান্নামে যান, তবে আপনার কী লাভ? আর যদি সারা দুনিয়া জাহান্নামে যায় এবং আপনি জান্নাতে যান তবে আপনার কী ক্ষতি?”

একথা শুনে তিনি এত কাঁদলেন যে (চোখের পানিতে) সামনে রাখা জ্বলন্ত উনুন নিভে গেল। [২]

চিন্তাশীলতার চরম পর্যায়:

ঘরে তাঁর চিন্তা ও অস্থিরতার কী অবস্থা হতো! তাঁর স্ত্রী বলেন যে আমি তাঁর কামরায় গিয়ে দেখলাম তিনি জায়নামাজে বসে কাঁদছেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “আমি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বিষয়াবলি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। ভাবছি কোনো ক্ষুধার্ত ফকির আছে, কোনো অসহায় রোগী আছে, কোনো মজলুম ও বাধ্য আছে। কোনো মুজাহিদ আছে। কোনো প্রবাসী বন্দী আছে। কোনো বৃদ্ধ দুর্বল এবং কোনো পরিবার-পরিজনসহ নিঃস্ব আছে। কিয়ামতের দিন আমার রব আমাকে এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিপরীতে বাদী হবেন। ভয় হচ্ছে যে মামলা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণিত না হয়ে যায়। তাই নিজের ওপর দয়া করে কাঁদছি।” [৩]

এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে তিনি আখেরাতের চিন্তায় কতটা নিমগ্ন থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সাহল, আব্দুল মালিক এবং মুজাহিম... বিশেষ সহযোগী:

পরিবারের সেই বিরোধীদের বিপরীতে আপনার ভাই সাহল, যুবক ছেলে আব্দুল মালিক এবং আপনার খাদেম মুজাহিম যারা আপনার মতোই অত্যন্ত নেক সীরাত ও মুত্তাকী ছিলেন, সত্য ও সংকল্পের পথে আপনার সমর্থক ছিলেন। [৪]

আব্দুল মালিকের আখেরাতের চিন্তার অবস্থা এই ছিল যে খলিফা হওয়ার পর প্রথম দিন আপনি যোহরের নামাজের আগে কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করছিলেন, তখন এই যুবক এসে আপনাকে জাগিয়ে বললেন:

“আব্বাজান! আপনি কি আরাম করছেন? মানুষের ওপর হওয়া জুলুমের প্রতিকার কি করবেন না?”

আপনি বললেন: “বেটা! রাত সুলাইমানের দাফনের কারণে জেগে কেটেছে। একটু আরাম করে নিই। যোহরের পর দায়িত্বগুলো দেখব।” ছেলে বলল: “এই কথার কী গ্যারান্টি আছে যে আপনি যোহর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন?”

[১] সিফাতুস সাফওয়াহ লি ইবনিল জাওযী: ১৩৮/২

[২] আল কামিল ফিত তারিখ: ১১৯/৪

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৯৪

[৪] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫০

এটি শোনার সাথে সাথেই আপনি ছেলেকে কাছে ডেকে কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন:

“আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি আমাকে তোমার মতো ছেলে দিয়েছেন যে দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী।”

আপনি উঠে দাঁড়ালেন এবং জনসমাবেশে গিয়ে সংস্কারের ঘোষণা দিলেন। [১]

একদিন কিছু আমীর আব্দুল মালিককে বলল: “আপনার পিতা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন, আমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন, আমাদের বড়দের মন্দ বলছেন। তাঁকে বলুন যেন তিনি বিরত থাকেন। আমরা এই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারছি না।”

আব্দুল মালিক এসে তাদের বার্তা পৌঁছে দিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজের চেহারায় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠলে আব্দুল মালিক বললেন:

“আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা করছেন তা করতে থাকুন। এই লোকদের রাগ আমাদের ওপর এই কারণেই যে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।”

উমর বিন আব্দুল আজিজ খুশি হয়ে বললেন: “আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন আমার ছেলে!”

তারপর দুআ করলেন:

“আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি আমার সন্তান আব্দুল মালিক এবং আমার খাদেম মুযাহিমের মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত রেখেছেন।” [২]

খিলাফতকে শুরা ভিত্তিক পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা এবং বনু মারওয়ানের বিরোধিতা

উমর বিন আব্দুল আজিজ একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অধীনে সরকার প্রধান হয়েছিলেন। এই ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা তাঁর সাধ্যের মধ্যে ছিল না; কারণ আপনি যদি এটি ভাঙতেন তবে যে আমীর ও শাহজাদাদের শক্তিতে এই ব্যবস্থা চলছিল তারা সবার আগে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত। আপনি এই কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এর জন্য পরিবেশ অনুকূল ছিল না। আপনার এই আকুলতা আপনার নেক চরিত্রের অধিকারী পুত্র আব্দুল মালিকের কাছে গোপন ছিল না। একদিন সে বলেই ফেলল:

“আব্বাজান! আপনি এমন সব কাজ স্থগিত করে রেখেছেন যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের ধারণা ছিল যে আপনি ক্ষমতা গ্রহণের পর সেগুলোতে এক ঘন্টাও দেরি করবেন না। আমি চাই আপনি সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করুন।”

আপনি বললেন: “বেটা! তোমার রায় খুব ভালো কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এই লোকদের দ্বীনের কোনো বিষয়ে আনার সময় দুনিয়ার কিছু না কিছু সুযোগ দিয়ে তাদের মন ভুলিয়ে রাখি। ভয় পাই যে পাছে তাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া শুরু না হয়ে যায় যা আমি সহ্য করতে পারব না।” [৩]

একবার পরিবারের কিছু লোক আপনার শাসন পদ্ধতি এবং সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সমালোচনা করলে আপনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “বনু মারওয়ানকে যবেহ হতে হবে। আর এই যবেহ আমার হাতেই হবে।” [৪]

[১] সিমতুত নুজুমিল আউয়ালি: ৩/৩৭৮; সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনিল জাওযি, পৃ. ৩০১

[২] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫০-৫১

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনি আব্দুল হাকাম, পৃ. ৫৭

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৪৪, বৈরুত সংস্করণ

খিলাফতের যোগ্য, কাসিম বিন মুহাম্মদ:

“বনু মারওয়ানের যবেহ” দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য ছিল যে, খিলাফতকে বনু মারওয়ানের হাত থেকে বের করে মুসলমানদের শুরার (পরামর্শ সভা) হাতে সোপর্দ করা হবে, যেমনটি এক পর্যায়ে আপনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। বনু মারওয়ানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একত্রিত হয়ে আপনাকে কটাক্ষ করতে শুরু করল। আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন: “আল্লাহর কসম! তোমরা যদি পুনরায় এভাবে একত্রিত হও, তবে আমি আমার সওয়ারি নিয়ে সরাসরি মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যাব এবং খিলাফতকে শুরার হাতে সোপর্দ করে দেব। আমার দৃষ্টিতে নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, অর্থাৎ কাসিম বিন মুহাম্মদ।” [১]

তবে উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেননি; কারণ আপনার প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, এমন পরিস্থিতিতে রাজবংশের আমিররা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ করবে এবং উম্মাহর মধ্যে আবারও সেই ধরনের গৃহযুদ্ধ শুরু হবে যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

সহযোগীদের ইন্তেকাল:

আপনার খিলাফতের তৃতীয় বছরে প্রথমে আপনার ভাই সাহল ইন্তেকাল করেন, তারপর আব্দুল মালিক। শীঘ্রই মুজাহিমও বিদায় নেন। এই তিনজনই ছিলেন আপনার মজবুত অবলম্বন। মুজাহিমকে দাফন করার সময় আপনি বলছিলেন: “মুজাহিম! আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তুমি দুনিয়ার কাজেও আমার সর্বোত্তম সাহায্যকারী ছিলে এবং আখিরাতের বিষয়েও সর্বোত্তম পরামর্শদাতা ছিলে।” [২]

ঘরে ফিরে এসে ভালোভাবে অজু করে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করলেন এবং এই দুআ করলেন:

“ইয়া আল্লাহ! তুমি সাহল, আব্দুল মালিক এবং মুজাহিমকে তোমার কাছে ডেকে নিয়েছ। তুমি জানো তারা আমার সহযোগী ছিল। এখন তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেছে, তোমার কাছে যা আছে তার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকেও তোমার কাছে এমনভাবে ডেকে নাও যেন আমি কারো ওপর জুলুম না করি এবং কারো হক নষ্ট না করি।”

এই দুআর পর আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

[৩]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/৩৪৪, ত. সাদির

নোট: হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আপন নাতি এবং উম্মাহর উচ্চপদস্থ ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের একজন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ বিন আবি বকর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শরিক হয়েছিলেন, তবে শেষ মুহুর্তে তিনি তওবা করার তাওফিক পেয়েছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধে তিনি বন্দি হয়ে নিহত হন। তাঁর এতিম সন্তান কাসিমের লালন-পালন করেন ফুফু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যার কারণে এই কাসিম বিন মুহাম্মদ জলিলুল কদর তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য হন। সেই যুগে মদিনা মুনাওয়ারার ‘ফুকাহায়ে সাবআ’ (সাতজন ফকিহ) প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। বয়স ছিল ৭০ বা ৭২ বছর। (ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৩/৫৯, ৬০) সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলতেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত তিনজন ব্যক্তি হলেন: কাসিম বিন মুহাম্মদ, আমরা বিনতে আব্দুর রহমান। বলা হতো যে, কাসিম, রাজা বিন হাইওয়াহ এবং ইবনে সিরিন বর্ণনাগুলো ছবছ শব্দে শব্দে নকল করতেন, যেখানে হাসান বসরি, ইব্রাহিম এবং শাবি মর্মার্থ বর্ণনা করতেন। তাঁকে যারা দেখেছেন তারা বলতেন যে, তাঁর চেয়ে মেধাবী মানুষ আমরা কখনো দেখিনি। কাসিম বিন মুহাম্মদের জন্মের কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায়নি। ইন্তেকাল সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে, তবে খলিফা বিন খাইয়াতের মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে, ১০৭ হিজরির শেষের দিকে তাঁর ইন্তেকাল হয়। (তাহজিবুল কামাল: ২৩/৪৩৩ থেকে ৪৩৫)

যেহেতু তাঁর পিতার শাহাদাত ৩৮ হিজরিতে হয়েছিল, সম্ভবত তার এক-দুই বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এভাবে তাঁর বয়স ৭০-৭২ বছর হয়।

[২] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃষ্ঠা ১০৫

[৩] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃষ্ঠা ১০১

শেষ খুতবা এবং মানুষের প্রতি অনীহা

মৃত্যুর আগে জুমার দিন মসজিদে জীবনের শেষ খুতবা প্রদানকালে তিনি বলেন:

“হে লোকসকল! তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, আর তোমাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে না। তোমাদেরকে এক জায়গায় ফিরে যেতে হবে যেখানে আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। সেই ব্যক্তি ব্যর্থ ও হতভাগ্য যে আল্লাহর সেই রহমত থেকে বঞ্চিত হলো যা প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং সেই জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো যা আসমান ও জমিনের চেয়েও প্রশস্ত। শোনো! আগামী দিনে সেই ব্যক্তিই নিরাপত্তা লাভ করবে যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শঙ্কা অন্তরে রাখে, যে নশ্বর বস্তুকে অবিনশ্বর বস্তুর বিনিময়ে, অল্পকে বেশির বিনিময়ে এবং ভয়কে প্রশান্তির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। তোমরা কি চিন্তা করো না যে তোমরা সবাই মৃত ব্যক্তিদের সন্তান এবং তোমাদের জায়গায় শীঘ্রই অন্য লোক চলে আসবে? সুতরাং মৃত্যু আসার আগে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর কসম! আমি এই কথাগুলো এমন অবস্থায় বলছি যে, আমার নিজের চেয়ে বড় কোনো গুনাহগার আমার চোখে পড়ছে না। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দরবারে তওবা করছি।” [১]

সেদিন তিনি অনুভব করলেন যে কিছু লোক এই ওয়াজ ও নসিহতে বিরক্ত হচ্ছে। বিষয়টি তাঁর কাছে খুব কষ্টদায়ক মনে হলো। তিনি ঘরে ফিরে এলেন। জুমার দিন তিনি তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে কুরআন মাজিদ শুনতেন। তিনি তাদেরকে একত্রিত করলেন এবং তিলাওয়াত করতে বললেন। এক শিশু এই আয়াতগুলো পড়তে শুরু করল:

طَسْمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

“এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। তারা ঈমান আনছে না বলে সম্ভবত আপনি নিজের জীবন শেষ করে দেবেন। আমি যদি চাইতাম তবে তাদের ওপর আসমান থেকে এক বড় নিদর্শন নাজিল করতাম, ফলে তাদের ঘাড় সেই নিদর্শনের সামনে নত হয়ে যেত।” [২]

উমর বিন আব্দুল আজিজের অন্তর থেকে যেন একটি বোঝা নেমে গেল। তিনি বললেন: “আল্লাহ জালা শানুহ এই শিশুর মাধ্যমে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।” এরপর তিনি দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! আমি তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছি এবং এই লোকেরাও আমার প্রতি। সুতরাং তুমি আমাকে তাদের থেকে এবং তাদেরকে আমার থেকে স্বস্তি দান করো।” এই দোয়ার পর তাঁর আর পরবর্তী জুমা পড়ানোর সুযোগ হয়নি। [৩]

খারেজিদের সাথে মুনাজারা এবং আপনার অবকাশ প্রার্থনা

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর খিলাফতকালে পুরো মুসলিম বিশ্বে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। কোথাও কোনো বিদ্রোহ হয়নি, তবে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে ইরাকে বাসতাম নামক এক খারেজি, যে “শওজাব” উপাধিতে পরিচিত ছিল, মুষ্টিমেয় কিছু লোক জড়ো করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। খারেজিরা তাঁর সীরাত ও চরিত্রের অনুরাগী ছিল কিন্তু তাদের দাবি ছিল যে, তিনি যেন পূর্ববর্তী খলিফাদের জালেম ও স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে তাদের অভিশাপ দেন।

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৭১

[২] সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ১ থেকে ৪

[৩] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৯৯

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) চাইলে কয়েক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে বিসতামকে পিষে ফেলতে পারতেন, কিন্তু একজন দূরদর্শী ও শান্তিকামী নেতার মতো তিনি তাকে শক্তির জোরে দমন করার পরিবর্তে আলোচনার দাওয়াত দিলেন এবং বললেন:

“রক্তপাতে কী লাভ হবে? এসে আমার সাথে কথা বলো। আমি যদি হকের ওপর থাকি তবে তোমরা তা মেনে নিও। আর যদি তোমরা হকের ওপর থাকো তবে আমি আমার কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা করব।” [১]

বিসতাম দুইজন প্রতিনিধি পাঠালেন। তাদের দেহ তল্লাশি করা হলো। নিরস্ত্র অবস্থায় তারা তাঁর কাছে এলেন এবং মুখোমুখি আলোচনা করলেন। তিনি শরয়ী দলিল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে তাদের সাথে যে যুক্তি ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সাথে কথা বলেছেন, তা থেকে তাঁর ইলমী গভীরতা, বুদ্ধিমত্তা এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার আন্দাজ করা যায়।

তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন: “বলো, কোন জিনিস তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করেছে?”

তারা বলল: “আমরা আপনার ওপর কোনো অভিযোগ করছি না। আপনি ন্যায়বিচার ও ইহসানে অভ্যস্ত। শুধু একটি বিষয়ে আপনার সাথে আমাদের দ্বিমত আছে। যদি আপনি তা মেনে নেন তবে আমরা আপনার সাথে আছি, অন্যথায় নয়।”

তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে তারা বলল: “আপনার কর্মপদ্ধতি আপনার পরিবারের লোকদের থেকে আলাদা। আপনি তাদের কাজগুলোকে জুলুম হিসেবেও অভিহিত করেন। সুতরাং আপনি যদি হেদায়েতের ওপর থাকেন এবং তারা গোমরাহীর ওপর থাকে, তবে আপনি তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে তাদের ওপর লানত করুন। আপনার সাথে আমাদের ঐক্যের এটাই শর্ত।”

তিনি বললেন: “আমি জানি তোমরা দুনিয়া অন্বেষণ করতে বের হওনি। তোমরা আখেরাতেরই অন্বেষণকারী। কিন্তু তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছ। আমি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করছি, তোমরা তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী সত্য সত্য বলবে।”

“আবু বকর ও উমর (রা.) তো তোমাদেরও পূর্বসূরিদের অন্তর্ভুক্ত। তারা তোমাদের কাছেও নাজাতপ্রাপ্ত। তোমরা জানো যে, আবু বকর (রা.) তাঁর যুগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের বন্দী করেছেন এবং গনিমতের মালও গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) খলিফা হওয়ার পর সেই বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু (কাজের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও) আবু বকর (রা.) কি উমরের প্রতি বা উমর (রা.) কি আবু বকরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন? অথবা তোমরা কি তাদের দুজনের কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করো?”

তারা বলল: “জি, একেবারেই না।”

তিনি বললেন: “আচ্ছা, নাহরাওয়ানবাসীরা তোমাদের কাছে সম্মানিত ও নাজাতপ্রাপ্ত লোক ছিল। তাদের মধ্যে কুফার খারেজীরা কাউকে হয়রানি করেনি, হত্যা করেনি এবং কারো সম্পদও লুণ্ঠন করেনি। বসরার খারেজীরা যখন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করল, তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব এবং তাঁর দাসীকে হত্যা করল। আরব গোত্র বনু কুতাইয়ার ওপর হামলা করে পুরুষ, নারী ও শিশুসহ সবাইকে হত্যা করল, এমনকি শিশুদের ধরে ফুটন্ত হাঁড়িতে নিক্ষেপ করল। (কাজের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও) কুফার খারেজীরা কি বসরার খারেজীদের থেকে, অথবা বসরার খারেজীরা কি কুফার খারেজীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিল? আর তোমরা কি এই দুই দলের কোনো একটির প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করো?”

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫৫৬

তারা বলল: “জি, একদমই না।”

আপনি জিজ্ঞেস করলেন: “আচ্ছা এটা বলো, দ্বীন কি একটি নাকি দুটি?”

তারা বলল: “একটিই।”

তিনি বললেন: “এটা কি সম্ভব যে দ্বীনের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ের অনুমতি তোমরা পাবে আর আমি পাব না?”

তারা বলল: “না, এমনটা হতে পারে না।”

তিনি বললেন: “তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কর্মপদ্ধতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উভয়ের জন্য একে অপরকে ভালোবাসার অনুমতি ছিল, তোমাদের জন্য তাঁদের উভয়কে ভালোবাসার অনুমতি আছে। বসরা ও কুফার খারেজীদের রক্ত ও সম্পদের পবিত্রতার মাসআলায় পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে ভালোবাসার অনুমতি ছিল। তোমাদের জন্য এই দুই জামাতকে ভালোবাসা বৈধ। কিন্তু আমার জন্য কি এই ছাড় নেই যে, নিজের পরিবারের সাথে মতপার্থক্য হলে তাদের অভিশাপ ও তিরস্কার না করি? যদি গুনাহগারদের অভিশাপ ও তিরস্কার করা কোনো ফরজ কাজ হয়, তবে তোমরাই বলো তোমরা ফেরাউন বা হামানের ওপর কতবার লানত করেছ?”

খারেজীদের মধ্য থেকে একজন বলল: “সম্ভবত একবারও না।”

আপনি বললেন: “আসল কথা হলো তোমরা মূর্খ লোক। যা চাও তাতে ভুল করে বসো। তোমরা মানুষের সেই কথা সহ্য করে নাও যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ্য করেননি। আর সেই বিষয়গুলো সহ্য করো না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ্য করেছেন। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শাস্তির যোগ্য ছিল, তারা তোমাদের নিকট ক্ষমার যোগ্য। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষমার যোগ্য ছিল, তারা তোমাদের নিকট শাস্তির যোগ্য।”

তারা বলল: “না, আমরা তো এমন নই।”

আপনি বললেন: “এখনই তোমাদের এটি স্বীকার করতে হবে। দেখো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তিপূজকদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং কালিমা শাহাদাতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি এই কালিমা পাঠ করেছে তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে গেছে, সে মুসলমানদের সমান হয়ে গেছে। যে পাঠ করেনি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।” খারেজীরা বলল: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

তিনি বললেন: “কিন্তু আজ তোমরা মূর্তিপূজা ছেড়ে কালিমা শাহাদাত পাঠকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাদের ওপর লানত করছ, তাদের সাথে যুদ্ধ করছ, তাদের রক্ত হালাল মনে করছ। অথচ ইহুদি ও নাসারা সহ অন্যান্য সকল জাতি যারা কালিমার অস্বীকারকারী, তোমরা তাদের রক্ত হারাম মনে করছ।”

এ কথা শুনে খারেজীরা নিরুত্তর হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল:

“আমি এর চেয়ে স্পষ্ট দলিল আর কখনো শুনিনি।” সে তার মতাদর্শ থেকে তওবা করল।

দ্বিতীয়জন বলল: “আমি আমার কওমের কাছে গিয়ে এই দলিলগুলোর ব্যাপারে তাদের মতামত নিয়ে আসি। হয়তো তারা কোনো উত্তর দিতে পারবে।”

আপনি বললেন: “তোমার ইচ্ছা।” [১]

[১] সীরাত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃষ্ঠা ১১২ থেকে ১১৫।

শেষে খারিজিরা বলল: “আপনি আপনার পরে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিককে খলিফা হিসেবে বহাল রাখছেন। আসলে কেন?”

آپ نے فرمایا: “এটি আমার নয়, সুলাইমানের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিষয়।”

তারা বলল: “যদি আপনাকে কোনো আমানত সোপর্দ করা হয় এবং আপনি তা কোনো অযোগ্য ব্যক্তির কাছে রেখে দেন, তবে কি আপনি আমানতের হক আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবেন?” আপনি চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বললেন: “ঠিক আছে, আমাকে তিন দিনের অবকাশ দাও।” [১]

কিছু বর্ণনায় আছে যে, খারিজিদের বিদায় করার পর আপনি বারবার বলতে থাকলেন:

“ইয়াজিদের বিষয়টি আমাকে ধ্বংস করে দিল। এ ব্যাপারে (খারিজিদের) যুক্তির কাছে আমি হেরে গেলাম। আস্তাগফিরুল্লাহ।” [২]

শেষ দিনগুলো এবং ইন্তেকালের বিয়োগান্তক ঘটনা

আপনি খিলাফতকে শুরু ভিত্তিক ব্যবস্থায় রূপান্তর করার জন্য গুরুত্বের সাথে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েক দিন পর আপনার ইন্তেকাল হলো। এই ঘটনা ২০ রজব ১০১ হিজরির। সে সময় আপনার বয়স ছিল চল্লিশ বছরের কাছাকাছি। একটি মত হলো, অসুস্থতা স্বাভাবিক ছিল। আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর ভয়ে আপনার প্রাণ গলে গিয়েছিল। [৩] দ্বিতীয় মত হলো, আপনার নিজের পরিবারের বিরোধীরা আপনাকে বিষ প্রয়োগ করেছিল যাতে খিলাফত পরিবারের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম না হয়। [৪]

শেষ মুহূর্ত এবং সন্তানদের প্রতি অসিয়ত:

মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী দেখে আপনি উত্তরাধিকারী ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের নামে একটি অসিয়তনামা লিখিয়েছিলেন যাতে তাকে তাকিদ করেছিলেন:

“তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে এবং প্রজাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমার মতো তুমিও অল্প কদিন জীবিত থাকবে। শেষ পর্যন্ত সেই সত্তার সাথে গিয়ে মিলিত হবে যিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং খবরদার। অসতর্কতায় এমন কোনো বিচ্যুতি হওয়া থেকে বেঁচে থেকো যার ক্ষতিপূরণ তুমি করতে পারবে না।” [৫]

আপনার শ্যালক মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি শেষ সময়ে আপনার কাছে এলেন। আপনার পোশাকের জীর্ণ দশা দেখে সহ্য করতে পারলেন না। বোনের কাছে বলতে লাগলেন: “উনার কামিজ তো ধুয়ে দেওয়া করো।”

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! অন্য কোনো কামিজ নেই। আমরা এটি ধুলে তিনি কী পরবেন?” [৬]

মাসলামা আপনার অভাবের কথা চিন্তা করে একশ দিনার পেশ করলেন এবং বললেন:

“যেখানে ইচ্ছা এগুলোর অসিয়ত করে দিন।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৫৫৬/৬

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩৪৩/৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০৪/৪; সন ১০০ হিজরি

[৪] তারিখুত তাবারী: ৫৫৬/৬

যেভাবে এই মামলাটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল এবং কোনো তদন্ত করা হয়নি, তাতে এই অপরাধে বনু মারওয়ানের জড়িত থাকার সম্ভাবনা দৃঢ় হয়।

[৫] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১০৭; সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনুল জাওজি, পৃ. ৩১৮

[৬] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৪৮

আপনি বললেন: “এর চেয়ে উত্তম কথা এই হবে যে, তোমরা এই অর্থ সেখানেই ফিরিয়ে দাও যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে।”

মাসলামা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি কঠোর হৃদয়গুলোকে নরম করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের পরিবারের নাম নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।” [১]

তারপর তাঁর ঘরের অবস্থা দেখে বললেন: “আপনি আপনার সন্তানদের সম্পদ থেকে বঞ্চিতই রেখেছেন। এখন আমাকেই আপনার ঘর সম্পর্কে কোনো অসিয়ত করে দিন, যাতে আমরা আপনার ঘরের খরচ বহন করতে পারি।”

আপনি ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন:

“আমি আমার সন্তানদের কোনো হক থেকে বঞ্চিত করিনি। হ্যাঁ, অন্যায় কোনো কিছু তাদের খাওয়ানো থেকে বিরত থেকেছি। বাকি রইল সন্তানদের জন্য অসিয়তের কথা... তবে মনে রেখো! নেককার বান্দাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। আমার সন্তানরা যদি নেককার হয়, তবে আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত রাখবেন, আর যদি তারা পাপাচারী হয়, তবে তাদের পাপে আর্থিক সহযোগিতা করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।”

তারপর নিজের সন্তানদের কাছে ডাকলেন। অশ্রুসজল চোখে এবং ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন:

“সন্তানেরা! আমি তোমাদের জন্য অনেক বড় কল্যাণের জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যার সাথেই দেখা করবে, সে নিজের ওপর তোমাদের হক মনে করে তোমাদের সম্মান করবে। সন্তানেরা! আমার সামনে দুটি পথ ছিল: একটি হলো তোমাদের সম্পদশালী বানিয়ে দেওয়া এবং নিজে জাহান্নামে যাওয়া। দ্বিতীয়টি হলো তোমাদের অভাবী রাখা এবং জান্নাতে যাওয়া; তাই আমি তোমাদের অভাবী রাখাই পছন্দ করেছি। যাও! আল্লাহ তোমাদের হিফাজত করুন, তোমাদের রিজিক দান করুন।” [২]

তারপর সবাইকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: “আমি এমন এক সৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছি যারা মানুষও নয়, জিনও নয়।”

লোকজন কক্ষ থেকে বের হলে তারা আপনার তিলাওয়াত করার আওয়াজ শুনতে পেল:

[৩] ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

(সেই পরকালীন আবাস তো আমি তাদের জন্যই নির্ধারিত করি, যারা জমিনে অহংকার করতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।)

তারপর এক গভীর নীরবতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পর লোকজন ভেতরে এলে দেখল প্রথম হিজরি শতাব্দীর এই মুজাদ্দিদের রুহ নশ্বর দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে। চেহারা কাপড়ে ঢাকা ছিল, চোখ বন্ধ ছিল এবং চেহারায় প্রশান্তি ও স্থিরতার এক অদ্ভুত আভা ছিল। [৪]

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

[১] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১০৯

[২] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১০১

[৩] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৩

[৪] সীরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১০১

উমর সানির সংস্কারের প্রভাব সমাজে

উমর বিন আব্দুল আজিজের সংস্কারগুলো দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে সরকারের কোষাগার শূন্য হয়ে যাবে, কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রপ্রধানের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যার ফলে রাষ্ট্র ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। বনু মারওয়ানের আমীরগণ তাঁর পদক্ষেপগুলোর বিরোধিতা করার সময় এই মানসিকতাই পোষণ করতেন। কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজিজ জানতেন যে রাষ্ট্র ও সরকারের উন্নতি স্রষ্টার সীমার মধ্যে থেকে সৃষ্টির সেবার ওপর নির্ভরশীল। স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য জনগণের যত বেশি সেবা করা হবে, সরকার তত বেশি শক্তিশালী ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে। ফলে তাঁর সংস্কারের প্রভাব প্রথম বছর থেকেই সমাজে দৃশ্যমান হতে শুরু করে।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নির্মূল:

পুরো দেশে কোথাও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার নামনিশানাও রইল না। খারেজিরা, যারা গত অর্ধশতাব্দী ধরে পুরো মুসলিম বিশ্বের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাঁর রাজনীতির ধরন দেখে একত্রিত হলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে এই শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়। [১] মোটকথা, এই যুগে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা আদর্শিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

যাকাত গ্রহণের লোক দুস্প্রাপ্য হয়ে গেল:

মানুষ এত সচ্ছল হয়ে গিয়েছিল যে দুই বছরের মধ্যে দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল (যা বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র মহাদেশ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল)। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ যাকাত সংগ্রহের পর যখন হকদার ব্যক্তিদের সন্ধানে বের হলেন, তখন একজন ব্যক্তিকেও পেলেন না। অবশেষে তিনি যাকাতের অর্থ দিয়ে গোলাম ক্রয় করে করে মুক্ত করে দিলেন। [২]

অন্য একজন কুরাইশী বুজুর্গের বর্ণনা হলো যে, উমর বিন আব্দুল আজিজের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে মানুষ এত সচ্ছল হয়ে গিয়েছিল যে তারা যাকাত ও সদকার বড় বড় অংকের অর্থ নিয়ে আসত যাতে যেখানে উপযুক্ত মনে হয় সেখানে খরচ করা যায়, কিন্তু সরকারি কর্মকর্তারা তাদের বাধ্য হয়ে ফেরত পাঠাতেন যে আমাদের কাছেও কোনো যাকাত গ্রহণকারী পাওয়া যাচ্ছে না। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মুসলিম বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্র্যের হার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। খুঁজেও কোনো যাকাত গ্রহণকারী পাওয়া যেত না। [৩]

ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল:

শিক্ষার প্রবণতা অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। আগের তুলনায় ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর যুগের একজন শিক্ষক দাহহাক...

[১] আখবার আবি হাফস, পৃ. ৬৩, ৬৪

[২] সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ৬৫

[৩] সিরাত উমর লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১১০

বিন মুজাহিমের মক্তবে তিন হাজার শিশু ভর্তি ছিল। [১]

মানুষের মেজাজ ও প্রবণতায় পরিবর্তন:

মানুষের প্রবণতা এবং মেজাজ ও আচার-আচরণও বদলাতে শুরু করল। সেই যুগের একজন বর্ণনাকারীর বক্তব্য হলো, ওয়ালিদের যুগে যখন মানুষ একত্রিত হতো, তখন দালানকোঠা ও নির্মাণশৈলী নিয়ে আলোচনা হতো; কারণ ওয়ালিদ নির্মাণকাজের শৌখিন ছিলেন। সুলাইমানের যুগে মানুষের মজলিসগুলোতে খাওয়া-দাওয়া, স্বাদ-আহ্লাদ এবং দাসীদের নিয়ে আলোচনা হতো, কারণ সুলাইমান এসব নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু উমর বিন আবদুল আজিজের যুগে নেকি, ইবাদত, তাকওয়া এবং কল্যাণকর কাজের আলোচনা সবচেয়ে বেশি হতো। যেখানে কিছু মানুষ একত্রিত হতো, তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত: “তুমি গতকাল কতটুকু তিলাওয়াত করেছ? কুরআন মাজিদ কবে খতম করবে? রোজা কয়টি রেখেছ?” [২] এটি ছিল শাসকের মেজাজ এবং সীরাত ও চরিত্রের প্রভাব যা পুরো জাতির ওপর পড়ছিল।

কেন বৈদেশিক বিজয় হয়নি?

উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর যুগে বৈদেশিক বিজয় একেবারেই হয়নি, তবুও আপনার শাসনকাল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। আল্লাহর এই বান্দা দেখেছিলেন যে, ওয়ালিদের যুগে সিন্ধু থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী শৌর্য-বীর্যের সুউচ্চ প্রাসাদে ফাটল দেখা দিচ্ছে এবং এই প্রাসাদ মেরামত না করে একে আরও উচ্চতর করতে যাওয়া পুরো নির্মাণকে ঝুঁকির মুখে ফেলার নামান্তর; তাই উমর বিন আবদুল আজিজের নীতিতে সাম্রাজ্য বিস্তার মোটেও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তী পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, এই সিদ্ধান্তটি একদম সঠিক ছিল। সত্য কথা এই যে, উমর বিন আবদুল আজিজ যদি পনের-বিশ বছর সময় পেতেন, তবে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র বদলে যেত এবং আমাদের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু আল্লাহর হিকমত কে বুঝতে পারে? সেই যুগের রাজনীতিবিদরা এই ঐশী নেয়ামতের কদর করেনি, সম্ভবত তা আল্লাহর পছন্দ হয়নি, তাই এই মহৎ ব্যক্তিকে অল্প সময়ের পরেই ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

যা-ই হোক, আপনার যুগের সংস্কারগুলো মুসলমানদের খিলাফতে রাশেদার নমুনা দেখিয়ে তাদের মধ্যে যে নতুন প্রাণের সঞ্চারণ করেছিল, তা ক্ষমতার অলিন্দে হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কিন্তু উম্মাহর সামষ্টিক চেতনায় এর চিত্র এমনভাবে গেঁথে গেছে যে আজ পর্যন্ত তার প্রভাব অবশিষ্ট আছে এবং জাতির প্রতিটি সত্যনিষ্ঠ সংস্কারকের জন্য উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর সীরাত আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।

রোম সম্রাটও আপনার সচ্চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত:

রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক তিক্ত চলে আসছিল। তবুও রোম সম্রাট হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের সচ্চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার প্রবক্তা ছিলেন। সেই যুগের এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য যে, উমর বিন আবদুল আজিজের দূত রোমের...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬০০

ইনি দাহহাক বিন মুজাহিম, একজন বিখ্যাত মুফাসসিরও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি গর্ভে দুই বছর ছিলেন এবং দাঁতসহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১০২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] তারিখুত তাবারী: ৬/৪৯৭, তাজারিবুল উমাম লি ইবনি মিসকাওয়াইহ: ২/৪২২

সফরে গেলেন। সেখানে অবস্থানের সময় একটি দুর্গের কোণ থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ এল, দেখলেন এক অন্ধ ব্যক্তি জাঁতায় গম পেষণ করছে। দূত তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে অন্ধ ব্যক্তিটি বলল: “আমাকে অনেক আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কায়সার আমাকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল এবং অস্বীকার করলে চোখ উপড়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। আমি চোখের দৃষ্টি হারানো মেনে নিয়েছি। সে আমার চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমি তাদের বন্দিশালায় গম পেষণ করি।”

দূত দামেস্কে ফিরে এসে উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-কে এই ঘটনা শোনালেন, তখন তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ সেই বন্দীর নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে কায়সারের নামে একটি পত্র লিখলেন: “আমি খবর পেয়েছি যে, এই মুসলিম বন্দী তোমার কারাগারে আছে। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, তাকে মুক্ত করে দাও, অন্যথায় আমি তোমার দিকে এমন এক বাহিনী পাঠাব যার প্রথম অংশ তোমার সামনে থাকবে আর শেষ অংশ থাকবে আমার কাছে।”

দূত এই চিঠি নিয়ে কায়সারের কাছে পৌঁছাল। সে চিঠি পড়ে বলল: “আমরা এই নেককার ব্যক্তিকে আক্রমণের কষ্ট দেব না। আমরা বন্দীকে মুক্ত করে দেব।” দুই-চার দিন পর দূত পুনরায় কায়সারের দরবারে গেলে দেখল সে সিংহাসন থেকে নিচে বিষণ্ণ অবস্থায় বসে আছে। সে দূতকে দেখামাত্রই বলল: “খবর এসেছে যে, সেই নেককার ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন।” তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলতে লাগল: “যখন কোনো নেককার মানুষ মন্দ লোকদের মাঝে থাকে, তখন সে বেশিদিন অবস্থান করে না।”

দূত বন্দীকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরতে উদ্যত হলে কায়সার বলল: “এটা হতে পারে না যে, আমরা এই নেককার ব্যক্তির সাথে একটি ওয়াদা করব আর তাঁর মৃত্যুর পর তা থেকে ফিরে যাব।” এই বলে সে বন্দীকে মুক্ত করে দূতের সাথে পাঠিয়ে দিল। এই ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায় যে, উমর বিন আব্দুল আজিজের গুণাবলি অমুসলিম বিশ্বের ওপরও নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিল। [১] وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ (পূর্ণতা তো সেটাই যার স্বীকৃতি শত্রুরাও দেয়।)

উন্নয়নমূলক কাজ

এই সময়ে পুরো সাম্রাজ্যে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকে। কিন্তু যেহেতু হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজের সংস্কারের তুলনায় এই কাজগুলো খুব বড় কোনো গুরুত্ব রাখত না; তাই সাধারণ ইতিহাসে এগুলোর উল্লেখ খুব কম পাওয়া যায়।

[১] সীরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ লি ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৪৮।

ইবনে আব্দুল হাকামেরই একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ কায়সারের কাছে বন্দী সমস্ত মুসলিম বন্দীদের মুক্তির চুক্তি করেছিলেন এবং নিজের একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে সমস্ত বন্দীর মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে বন্দীদের নামে একটি পত্রও লিখেছিলেন, এছাড়া প্রত্যেক বন্দীর জন্য পাঁচ দিনার করেও পাঠিয়েছিলেন। (সীরাত উমর: পৃ. ১৪৪) সম্ভবত কায়সার সেই বন্দীদের মুক্তির পরও উক্ত অন্ধ বন্দীকে মুক্ত করেনি; এজন্যই উমর বিন আব্দুল আজিজকে হুমকিমূলক চিঠি লিখতে হয়েছিল।

যাইহোক, কিছু উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে:

কুরতুবা (কর্ডোবা)-র সেতু:

আন্দালুসের শাসক উমর বিন আবদুল আজিজ-এর আদেশে কুরতুবা নদীর ওপর একটি সুউচ্চ ও বিশাল সেতু নির্মাণ করিয়েছিলেন যার উচ্চতা ছিল নব্বই (৯০) ফুট, প্রস্থ ত্রিশ ফুট এবং দৈর্ঘ্য বারোশ ফুট। [১]

সরকারি আয় বৃদ্ধি পাওয়া:

আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, অবৈধ ও সন্দেহজনক আয়ের উৎসগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য অকাতরে ব্যয় করা সত্ত্বেও সরকারি কোষাগারে অর্থের পরিমাণ কখনো কম হতো না, বরং কিছু কিছু প্রদেশে আয় আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। ইরাকের রাজস্বের পরিমাণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর আমলের তুলনায় চার গুণ বেশি হয়ে গিয়েছিল; তাই আপনি বলতেন: “হাজ্জাজের না ছিল ধীনের জ্ঞান, না ছিল দুনিয়ার। সে তার জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও ইরাক থেকে দুই কোটি আশি লাখের বেশি আদায় করতে পারেনি, আর আমার সময়ে কোনো জুলুম ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই এই পরিমাণ বারো কোটি চল্লিশ লাখে পৌঁছেছে।” [২]

উমর বিন আবদুল আজিজ-এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা, একটি চিন্তার বিষয়

উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর কৃতিত্ব ছিল এই যে, তাঁর ন্যায়বিচার ও উত্তম চরিত্র দেশের অভ্যন্তরে শিয়ানে আলী, শিয়ানে মুয়াবিয়া, নাসিবী এবং খারেজীসহ সমস্ত গোষ্ঠীগত বিভেদ মিটিয়ে দিয়েছিল এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। উমর বিন আবদুল আজিজ সবার প্রিয় এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। আজও কোনো ফিরকার এমন কোনো আলেম নেই যিনি উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর উত্তম চরিত্রের সাক্ষী নন। খুঁজলেও এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে উমর বিন আবদুল আজিজ-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে না।

[১] নাফহত তীব: ১/৪৮০

গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, এই সেতুটি আজও টিকে আছে। হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম একটি সফরে এই সেতুটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি এর অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন: “আজ এটি একটি সাধারণ সেতু মনে হয় যা জরাজীর্ণ হওয়ার কারণে ভগ্নদশায় দেখা যায়, কিন্তু এক সময় এটি সারা বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ সেতু হিসেবে গণ্য হতো। আর যেহেতু সারা বিশ্বে এত মজবুত, এত প্রশস্ত এবং এত শক্তিশালী সেতু আর দ্বিতীয়টি ছিল না; তাই এটি বিশ্বের বিস্ময়গুলোর মধ্যে গণ্য হতো। মুসলমানদের আগে এখানে একটি সাধারণ ও দুর্বল সেতু ছিল। যখন হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি পেনশনে বসে কুরতুবাহর প্রয়োজনীয়তা আন্দাজ করলেন এবং আন্দালুসের গভর্নর সামহ বিন মালিক খাওলানিকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ওয়াদিউল কাবীরের ওপর একটি মজবুত সেতু নির্মাণ করেন। ফলশ্রুতিতে ১০১ হিজরিতে একজন স্থপতি আবদুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ আল-গাফেকির তত্ত্বাবধানে এই সুউচ্চ সেতুটি নির্মাণ করা হয় যার দৈর্ঘ্য ছিল আটশ হাত এবং প্রস্থ ছিল চল্লিশ গজের বেশি এবং নদীর তলদেশ থেকে ষাট হাত উঁচু ছিল। এর নিচে আঠারোটি সুন্দর খিলান নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এর ওপরে উনিশটি বুরুজ তৈরি করা হয়েছিল। সেই সময়ে সারা বিশ্বে এই সেতুর কোনো নজির ছিল না; তাই সেই যুগের একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন: ‘ইম্মা কানতারাতি কুরতুবাতি ইহদা আজায়িবিত দুনিয়া’ অর্থাৎ ‘কুরতুবাহর সেতু পৃথিবীর বিস্ময়গুলোর মধ্যে একটি বিস্ময়।’ (নাফহত তীব: ১/২৬) এই সেতুর সম্প্রসারণ ও সংস্কার বারবার হয়েছে কিন্তু মৌলিকভাবে এটি সেই সেতুই যা মুসলমানরা নির্মাণ করেছিল।” (আন্দালুসে কয়েক দিন, পৃ. ৫৯, ৬০, ৭০, দারুল উলুম করাচি, প্রকাশনা ২০০৬ খ্রি.)

[২] রওজাতুল আখইয়ার আল-মুনতাখাব মিন রাবিউল আবরার, পৃ. ৭৯; মুজামুল বুলদান: ৩/২৭৪; আল-মুনতাজাম লি-ইবনিল জাওজি: ৪/৩১০

চিন্তার বিষয় হলো, কেন ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধের পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তির বন্ধু ও শত্রু সবার কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র? এমনকি অমুসলিমরাও তাদের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান যুন-নুরাইন এবং হযরত আলী আল-মুরতাজা (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করুন, যাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা ছিলেন ইসলামী চরিত্রে ভূষিত প্রকৃত ও খাঁটি মুসলমান।

এক স্থানে অবস্থান করে পুরো বিশ্বের ওপর প্রভাব!!

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) খেলাফতের পুরো সময়টি দামেস্কে তাঁর কার্যালয়, মসজিদ এবং বাড়িতেই অতিবাহিত করেছেন। এই সময়ে তিনি কোনো সফর করেননি বা কোনো সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেননি। এক স্থানে বসেই তিনি এমন কিছু করে দেখিয়েছেন যা বর্তমান সময়ের দীর্ঘ সফর ও দূর-দূরান্ত ভ্রমণকারী রাজনীতিবিদরা এক শতাব্দীতেও করে দেখাতে পারেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি নিজের ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করা হয়, যোগ্য প্রতিনিধি ও অধস্তনদের নির্বাচন করা হয় এবং সময় নষ্ট না করে সততা, আত্ম-সমালোচনা ও খোদাভীতির সাথে কাজ করা হয়, তবে এক কোণে অবস্থান করেও পুরো বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

সংস্কার প্রচেষ্টার দুটি বৈশিষ্ট্য:

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর সংস্কার প্রচেষ্টার দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আমাদের জন্য প্রাধান্যযোগ্য: প্রথমত, তিনি সংস্কারের সূচনা করেছিলেন নিজের সত্তা এবং নিজের ঘর থেকে। দ্বিতীয়ত, তিনি বিদ্যমান সম্পদ ও ক্ষমতারই সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে ছোটেননি।

দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব সংশোধনের আবেগ পোষণকারীরা দুটি মৌলিক ভুল করে আসছেন: প্রথমটি হলো, তারা নিজের নফস এবং নিজের ঘরের সংস্কারকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। তাদের চেষ্টা থাকে যেন প্রথমে সারা বিশ্ব জুলুম-অত্যাচার, দুর্নীতি, অশ্লীলতা ও আইনহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টায় যদি নিজের ব্যক্তিগত নেক আমলে কিছু ঘাটতিও থাকে তবে সমস্যা নেই। নামাজ ছুটে যাক, চেহারা ও পোশাক সুনাত অনুযায়ী না হোক, দোয়া, জিকির ও তিলাওয়াতের জন্য মোটেও সময় না পাওয়া যাক, সামান্য সন্দেহজনক এমনকি হারাম মালও যদি ব্যবহারে আসে তবে কোনো ক্ষতি নেই। তাদের ধারণা হলো, আমলের এই ঘাটতি ব্যক্তিগত বিষয় যার ওপর কারও আপত্তি করার অধিকার নেই; মহান জাতীয় খেদমত যাই হোক না কেন, এই ছোটখাটো দুর্বলতাগুলোর ক্ষতিপূরণ করে দেবে।

এই চিন্তাধারার ফলে জাতির সামনে সংস্কারের আওয়াজ তো ওঠে, কিন্তু এর পেছনে এমন কোনো জীবন্ত বাস্তব চরিত্র থাকে না যা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ নিজেকে এই ভয়াবহ ভুল থেকে পুরোপুরি রক্ষা করেছিলেন।

দ্বিতীয় ভুলটি যা দীর্ঘকাল ধরে আজ পর্যন্ত প্রচলিত এবং নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, তা হলো সমাজ সংস্কারের দাবিদার প্রতিটি শক্তি নিজের ক্ষমতা, সম্পদ এবং প্রভাবের পরিধি বৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকে এবং একেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। যদি কেউ কোনো কর্মকর্তা হন, তবে তিনি ভাবেন যে যতক্ষণ না তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হচ্ছেন, ততক্ষণ কোনো প্রকার সংস্কার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া নিষ্ফল হবে; তাই তিনি সংস্কারের প্রচেষ্টাকে আরও পদোন্নতির ওপর নির্ভরশীল মনে করে হয় একে...

...এর জন্য প্রতিটি বৈধ ও অবৈধ কৌশল ব্যবহার করে নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট করে নেয়, যার ফলে সমাজে আরও একজন বিগড়ে যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথবা সে একেবারেই হতাশ হয়ে বসে থাকে, যেমনটি সমাজের অধিকাংশের স্বভাব। এই একই চিন্তা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এমনকি শাসকদের পর্যন্ত হয়ে থাকে।

দেশের গভর্নর এবং মন্ত্রীরা যদি পরিবর্তনের জন্য সদিচ্ছা পোষণ করেন, তবুও তারা তাদের বর্তমান ক্ষমতা, শক্তি এবং বস্তুগত ও জনবলকে সমাজের সংস্কারের জন্য অপরিপূর্ণ মনে করেন; তাই তাদের শাসনকালে তাদের প্রচেষ্টা ক্ষমতার পরিধি বাড়ানোর আইনি লড়াই লড়া, শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিরোধীদের দমন করা, বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো এবং জনবল সংগ্রহের জন্য জনগণকে মিথ্যা বিবৃতির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা এবং নিজের কৃতিত্বের গুণগান গাওয়ার মধ্যেই অতিবাহিত হয়।

সংস্কারের দাবিদার বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের সময় ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হতে থাকে। এই প্রচেষ্টাতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানরা অন্য আন্দোলন, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, তাদের লোকজনকে নিজেদের সাথে ভেড়াতে এবং তাদের প্রাপ্ত সাহায্যের সুযোগগুলো নিজেদের দিকে সরিয়ে নিতে সক্রিয় থাকেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যার ফলাফল কেবল ধ্বংস, ফিতনা-ফাসাদ এবং জনগণের প্রতিটি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতি হতাশার রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ-এর কর্মপদ্ধতি সামনে রাখলে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এখনই সুস্থ পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আমরা ক্লার্ক হই বা অফিসার। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান হই বা শিক্ষক ও প্রশিক্ষক। কোনো ছোট সংগঠনের সদস্য হই বা কোনো বড় আন্দোলনের নেতা। সেনাপতি হই বা সাধারণ সরকারি কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপ্রধান হই বা অন্য কিছু। আমরা প্রথমত আমাদের ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা সংশোধন করি এবং দ্বিতীয়ত উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি।

এটি আশ্চর্য্যে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদিন এবং সফল সংস্কারকদের সেই কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবে নেক প্রভাব সামনে স্থানান্তরিত হতে থাকে। কৃত্রিমভাবে নয় বরং প্রকৃতভাবে জনবল, আর্থিক এবং ক্ষমতার উৎস বাড়তে থাকে কিন্তু তখনও আমাদের দৃষ্টি সম্পদের ওপর নয়, বরং নিজের কর্মদক্ষতার ওপর হওয়া উচিত। প্রতি মুহূর্তের আত্ম-হিসাব কর্মদক্ষতাকে সর্বোত্তম করে তোলে এবং সর্বোত্তম কর্মদক্ষতা স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ নিজেই গ্রহণ করে নেয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে সংস্কারের ব্যবস্থা এভাবেই চলে আসছে: যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

আর ইকবালের ভাষায়:

মুহাম্মদের সাথে যদি তুমি বিশ্বস্ততা রক্ষা করো তবে আমি তোমার

এই পৃথিবী তো তুচ্ছ জিনিস, লওহ ও কলমও তোমার হবে

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর পর:

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. নিজের জীবনেও বনু উমাইয়া বংশের মধ্যে অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং নেকনাম ছিলেন এবং ইন্তেকালের...

পরে সম্মানযোগ্য হয়ে রইলেন, তাদের পরে বনু উমাইয়ার যত শাসকই এসেছেন, তারা এ নিয়ে গর্ব করতেন যে এই পরিবারে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই শাসকরা পদক্ষেপে পদক্ষেপে উমর বিন আব্দুল আজিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। শেষ পর্যন্ত কেন? সম্ভবত এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। প্রশ্ন ছিল যে, রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় শান্তিপূর্ণ ও অনুগত নাগরিকদের সম্ভৃষ্টি, শান্তি এবং নিরাপত্তা ও আস্থা বজায় রাখার গুরুত্ব বেশি, নাকি বিরোধী, অপরাধী ও বিদ্রোহী উপাদানগুলোকে নির্মূল করা বেশি জরুরি?

জনগণের ব্যাপারে উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিল একজন স্নেহশীল পিতার তার সন্তানের প্রতি ধারণার মতো। তিনি রাষ্ট্রকে নিজের ঘরের মতো এবং এর নাগরিকদের নিজের পরিবারের মতো মনে করতেন। জনগণের ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল যে, সমষ্টিগতভাবে তারা কল্যাণের দিকে ঝুঁকে থাকে; ধ্বংসাত্মক কাজ ও বিদ্রোহের দিকে তাদের প্রবণতা কেবল তখনই বাড়ে যখন তাদের প্রাপ্য অধিকার পুরোপুরি দেওয়া হয় না। তাই তিনি রাষ্ট্রের জনগণকে শান্তিপূর্ণ ও অনুগত নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে তাদের সম্ভৃষ্টি, শান্তি এবং নিরাপত্তা ও আস্থা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দিতেন। বিরোধী ও বিদ্রোহী উপাদানগুলোকে নির্মূল করা তাঁর কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব ছিল।

অন্যান্য শাসকদের চিন্তা ছিল এর থেকে ভিন্ন। বনু উমাইয়া শাসকরাও দেশ ও জাতির প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং জাতির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন, যার ফলে তাঁদের আমলে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। তবে জনগণের ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে দুট্টু শিশুদের মতো বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে থাকে। ভালো মানুষ কম হয়; তাই তাদের বিরোধিতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা ভদ্রলোকদের নিরাপত্তা ও আস্থা বজায় রাখার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। কারণ অনুগত জনগণ তো যেকোনো অবস্থাতেই অনুগত থাকবে, চাই তারা খুশি হয়ে থাকুক বা ভয়ভীতির মধ্যে থাকুক।

এ কারণেই বনু মারওয়ানের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংস্কারের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। তাঁরা তাঁর অসাধারণ সতর্কতা এবং জনগণের কল্যাণ কামনার এই ব্যাপক আয়োজনকে অতিরঞ্জিত মনে করতেন। তবে তাঁরা মৌখিক আপত্তির চেয়ে বেশি কিছু কখনো করেননি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এসব সংস্কারে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। এটিও বড় বিষয় ছিল যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে বেদখল হওয়া মেনে নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, একটি বিষয় তাঁদের জন্য একেবারেই অসহনীয় ছিল, তা হলো ক্ষমতা পরিবারের বাইরে চলে যাওয়া। যখন তাঁরা উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ ব্যাপারে প্রস্তুত দেখলেন, তখন পারিবারিক গোঁড়ামির কারণে তাঁরা তা মেনে নিতে পারেননি। কোনো বর্ণনা থেকে এটি জানা যায় না যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কে বিষ প্রয়োগ করেছিল। তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, এর আগেই উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু শুরা ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি এটিও স্পষ্ট যে, তিনি যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেন তবে তা বাস্তবায়িত হতো না; পরিবারের সদস্যরা এতে কখনোই একমত হতো না এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। সম্ভবত এ কারণেই উমর বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ পর্যন্ত এমন কোনো ঘোষণা দেননি এবং বিষক্রিয়ার পরেও তিনি চাইলে শেষ মুহূর্তে তা করতে পারতেন।

যাই হোক, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। পরবর্তী যুগে কেবল বনু মারওয়ান নয়, বরং অন্যান্য বংশ ও সালতানাতের কিছু শাসকের সীরাতেও ওপরও উমর ইবনে আব্দুল আজিজের চরিত্রের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মাহদী আব্বাসী, আল-মুহতাদী, নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এবং খলিফা জাহির বিল্লাহর জীবন এর উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি ভিন্ন কথা যে, পরবর্তীদের মধ্যে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর সমপর্যায়ের কেউ ছিলেন না।

আজ প্রত্যেক নতুন শাসক সমস্ত ত্রুটির দায় তার পূর্বসূরির ওপর চাপিয়ে দিয়ে কেবল নিজেকেই সংস্কারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত মনে করেন না, বরং ভয়াবহ অপরাধ করার ক্ষেত্রেও নিজেকে অক্ষম মনে করেন, যার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্দ কাজ বেড়েই চলেছে। উমর ইবনে আব্দুল আজিজও এমন এক সময়ে খেলাফত লাভ করেছিলেন যখন পূর্ববর্তী শাসকদের ভুলের কারণে সমাজ ধ্বংসের মুখে ছিল, কিন্তু উমর ইবনে আব্দুল আজিজ কাউকে দোষারোপ করার পরিবর্তে নেক নিয়তে সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন করে দেখিয়েছিলেন। আজও তাঁর সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার রূপরেখা থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করা যেতে পারে।

ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক (ইয়াজিদ সানি)

রজব ১০১ হিজরি... থেকে... শাবান ১০৫ হিজরি

ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রিস্টাব্দ... থেকে... জানুয়ারি ৭২৪ খ্রিস্টাব্দ

ইয়াজিদ তার বড় ভাই সুলাইমানের ওসিয়ত অনুযায়ী উমর বিন আব্দুল আজিজের পর খেলাফতের আসনে বসেন। তিনি ছিলেন আব্দুল মালিকের তৃতীয় পুত্র যিনি শাসক হয়েছিলেন। বনু উমাইয়াদের মধ্যে ইয়াজিদ নামের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা; তাই তাকে “ইয়াজিদ সানি” বলা হয়। তিনি হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজের সংস্কারগুলো বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতই তার মধ্যে সেই সাহস ও ধৈর্য ছিল না; তাই তিনি সেগুলোর পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারেননি।

অভ্যন্তরীণ বিপদসমূহ:

ইয়াজিদ সানিকে কিছু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা তিনি তৎপরতার সাথে দমন করেন।

উমর বিন আব্দুল আজিজের শেষ দিনগুলোতে খারেজিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল কিন্তু সরকারের সাথে তাদের আলোচনা চলছিল। সরকারি বাহিনী এবং খারেজিরা ইরাকে মুখোমুখি অবস্থান করছিল। এই সময়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগেই উমর বিন আব্দুল আজিজ ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। শুরুতে খারেজিরা বিজয়ী হতে থাকে কিন্তু পরিশেষে যখন রাজধানী থেকে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন, তখন খারেজিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। [১]

দ্বিতীয় ফিতনাটি ছিল ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের। তিনি ছিলেন বনু উমাইয়ার বিখ্যাত বিজেতা মুহাল্লাব বিন আবি সুফরার পুত্র এবং অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সেনাপতি। সুলাইমানের শাসনামলে তিনিই তাবারস্তান জয় করেছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ তার খেলাফতের সময় তার কাছে গনিমতের মালের খুমসের হিসাব চেয়েছিলেন যা তিনি দিতে পারেননি। এর ফলে তাকে বন্দি করা হয়। উমর বিন আব্দুল আজিজের ইন্তেকালের পর তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান এবং ইরাকে গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এখানে তার পরিবার ও ভাইদের ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল; তাই অনেক মানুষ তাদের চারপাশে সমবেত হয়। শুরুর দিকে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব সফল হন, বসরা ও কুফার ওপর তার দখল প্রতিষ্ঠিত হয়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ১০১ হিজরি।

অবশেষে দ্বিতীয় ইয়াজিদ মাসলামা বিন আব্দুল মালিককে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে তার দিকে পাঠালেন। “আনবার”-এর কাছে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুহাম্মাব পরাজিত হলেন। তিনি নিজে নিহত হন এবং তার ভাইয়েরা বেলুচিস্তানের দিকে পালিয়ে যান। এখানে তারা কান্দাবিলের শাসকের কাছে আশ্রয় নেন, তবে দ্বিতীয় ইয়াজিদ তাদের পিছু ধাওয়া করে সবাইকে হত্যা করান। [১]

তৃতীয় বিপদ ছিল মধ্য এশিয়ায় তুর্কিদের বিদ্রোহ, যার পেছনে এবারও চীনের খাকানের হাত ছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদের পক্ষ থেকে পাঠানো সেনাপতিরা এর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারায়, দ্বিতীয় ইয়াজিদ ১০৩ হিজরিতে সাঈদ বিন হুবারার মতো একজন অভিজ্ঞ আমিরকে নিযুক্ত করেন, যিনি একের পর এক যুদ্ধ করে খুজান্দ, কেশ এবং নাসাফসহ মাওয়ারাউন নাহরের সমস্ত বিপদসংকুল এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনেন। [২]

চতুর্থ বিপদ ছিল কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অধিকৃত এলাকাগুলোতে বিদ্রোহের উত্থান। এটি ছিল অত্যন্ত আকাশচুম্বী পাহাড়বেষ্টিত এক বিপজ্জনক এলাকা যেখানে অভিযান চালানো ছিল খুবই কঠিন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ জাররাহ বিন আব্দুল্লাহকে আরমেনিয়ার শাসক নিযুক্ত করে এই অভিযানের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেন। জাররাহ প্রাণপণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং পুরো এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

বহিঃস্থ অভিযানসমূহ..... ফ্রান্স আক্রমণ:

দ্বিতীয় ইয়াজিদের শাসনামলে বহিঃস্থ অভিযানও পরিচালিত হয়েছিল। আন্দালুসের ইসলামী বাহিনী স্থানীয় শাসক সামহ বিন মালিকের নেতৃত্বে ফ্রান্স আক্রমণ করে। জাবাল আল-বারানস (পীরেনিজ পর্বতমালা) অতিক্রম করে ইসলামী বাহিনী ফ্রান্সের সীমানায় প্রবেশ করে। পথে প্রথম যে রাজ্যটি পড়ে তা ছিল “নারবোন”। সামহ বিন মালিক যখন এটি অবরোধ করেন, তখন স্থানীয় অভিজাতরা বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

এখন মুসলিমরা একুইটেইন রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং এর রাজধানী “তুলুজ” অবরোধ করে। তবে এই সময়ে সেখানকার শাসক ডিউক অফ একুইটেইন, যিনি শহরের বাইরে ছিলেন, এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার জন্য পৌঁছে যান। তুমুল যুদ্ধের সময় আমির সামহ শত্রুর ব্যূহের গভীরে প্রবেশ করতে থাকেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মুসলিম প্রাণ হারান। অবশিষ্ট বাহিনী আব্দুর রহমান গাফেকির নেতৃত্বে পিছু হটে ফ্রান্সের সীমানার ভেতরে পীরেনিজ পর্বতমালার ওপর তাবু ফেলে অবস্থান নেয়।

দ্বিতীয় ইয়াজিদের শেষ দিনগুলোতে আন্দালুসের নতুন শাসক আনবাসা বিন সুহাইম পুনরায় সৈন্য পরিচালনা করেন এবং “কারকাসোন” সহ কিছু এলাকা দখল করে নেন। এছাড়া “সেপ্টিম্যানিয়া”-র পুরো এলাকা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আনবাসা এবার মধ্য ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন এবং রোন নদীর উপত্যকা অতিক্রম করে “লিয়ঁ” জয় করেন। এরপর ইসলামী বাহিনী “বারগান্ডি” এবং “অটুন”-এ বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

ফরাসিরা মুসলিমদের অগ্রযাত্রা রুখতে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে, যার ফলে মুসলিমরা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকে। এমন একটি আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টার সময় আমির আনবাসা মারাত্মকভাবে আহত হন যা প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়। তার শাহাদাতের পর মুসলিমরা পিছু হটে “নারবোন”-এ ফিরে আসে। [৪]

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৬/৫৮৪ থেকে ৬০৫

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০৪ হিজরি

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০৩ হিজরি, ১০৪ হিজরি

[৪] আত-তারিখ আল-ইসলামি আল-আম: ৩১৫ থেকে ৩১৭

এই অভিযানগুলো তখনও চলছিল যখন ১০৫ হিজরীর ২৫ শাবান ইয়াজিদ সানি ‘ক্ষয়রোগ ও যক্ষ্মা’ (دق وسل) রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [১] তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। তিনি চার বছর এক মাস শাসন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার পরে তার ভাই হিশাম এবং তারপর তার পুত্র ওয়ালিদকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছিলেন। [২]

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:

ইয়াজিদ সানির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক বর্ণনা প্রচলিত আছে যা সনদের (সূত্র) দিক থেকে অত্যন্ত সন্দেহজনক; কারণ সেগুলোর বর্ণনাকারীরা দুর্বল, মিথ্যাবাদী অথবা অজ্ঞাত। এগুলোর মধ্যে একটি বর্ণনা অনুযায়ী, ইয়াজিদ সানি চল্লিশ দিন পর্যন্ত উমর ইবনে আবদুল আজিজের অনুসরণ করেছিলেন, এরপর চল্লিশজন বৃদ্ধ তার সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ খলিফাদের কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ মাফ করে দিয়েছেন। এটি শুনে ইয়াজিদ উমর ইবনে আবদুল আজিজের সংস্কারগুলো বাতিল করে আবার পূর্ববর্তী শাসকদের নীতি গ্রহণ করেন।

সনদের দিক থেকে গুরুত্বহীন হওয়ার পাশাপাশি এই বর্ণনাটি যুক্তির (درایاً) দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ দ্বীন সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে এমন কোনো মুসলমান হিসাব মাফ হওয়ার আকিদা পোষণ করতে পারে না। তাছাড়া যদি এমনটি হতো, তবে সেই সময়ের উলামা ও ফকিহগণ সরকারের চালচলন এতটা বদলে যেতে দেখে সাথে সাথেই এই ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ করতেন।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী, ইয়াজিদ সানি তার এক দাসীর প্রেমে মগ্ন ছিলেন। দাসী মারা গেলে তিনি শোকে এতটাই ভেঙে পড়েন যে সেই আঘাতেই মারা যান। এই কাহিনীটি তাবারী মাদায়েনি থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে (بِسند منقطع) বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে বালাজুরি ‘আনসাবুল আশরাফ’-এ এটি ইবনে জাদবাহ এবং হুশাইম বিন আদির মতো পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। যাদের নামই এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে এটি একটি বানোয়াট গল্প যার কোনো ভিত্তি নেই। কিছু ঐতিহাসিক ইয়াজিদ সানিকে ভোগবিলাসী ও মদ্যপ বলেছেন। এটিও কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। যদি এমনটি হতো, তবে উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে উত্তরসূরি হিসেবে বহাল রাখতেন না।

ইঁয়া, এটি সঠিক যে কর্মদক্ষতার দিক থেকে তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো সতর্কতা ও আমানতদারিতা প্রদর্শন করতে পারেননি। স্পষ্টতই দৃঢ়তার (عزیمت) পথে চলা মানুষের সংখ্যা কম হয়। কিন্তু কেউ যদি বৈধতার সীমার মধ্যে থাকে তবে তার ওপর আপত্তি তোলা যায় না।

এটি প্রমাণিত নয় যে ইয়াজিদ সানি বা পরবর্তীতে বনু মারওয়ানের কোনো খলিফা আনুষ্ঠানিকভাবে উমর ইবনে আবদুল আজিজের সংস্কারগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্দেশ করে যে এই সংস্কারগুলো অনেকাংশেই বহাল ছিল, যেমন এই বিষয়েও সবার ঐক্যমত রয়েছে যে উমর ইবনে আবদুল আজিজ হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে কটু কথা বলার ওপর আইনত যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন তা পরবর্তীতে সর্বদা বহাল ছিল।

তবে এটি সত্য যে উমর সানির সংস্কারগুলো যে উদ্দীপনা ও আবেগের ওপর ভিত্তি করে ছিল, তা পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে ছিল না; তাই ধীরে ধীরে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগ কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় এমন কিছু ত্রুটি জেঁকে বসে যা সালতানাতের পতনের পূর্বাভাস হয়ে দাঁড়ায়। এই ত্রুটিগুলোর বর্ণনা বনু মারওয়ানের শাসনের সমাপ্তি পর্বে বিস্তারিতভাবে করা হবে।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/১৩... ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক থেকে হাদিস বর্ণনা করা বৈধ মনে করতেন। এবং সালিহ ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান সম্পর্কে (জিজ্ঞাসা করলে) তিনি বললেন: এ তার (অর্থাৎ ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া) চেয়ে উত্তম। আমি বললাম: তার থেকে কি হাদিস বর্ণনা করা যাবে? তিনি বললেন: ইঁয়া। (আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খালাল, ইবনে কুদামা, পৃ. ২৩৭)

হিশাম বিন আব্দুল মালিক

শাবান ১০৫ হিজরী ... রবিউল আখের ১২৫ হিজরী

ফেব্রুয়ারি ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ ... ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ

হিশাম বিন আব্দুল মালিক জ্ঞান ও মর্যাদা, বিচক্ষণতা ও রাজনীতি এবং সাহস ও বীরত্বে হুবহু তাঁর পিতার মতো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক স্বভাবের মানুষ। তাঁর সিংহাসন আরোহণের পর জিহাদী অভিযান ও বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনী অনবরত বের হতে থাকে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী মানুষ। বনু মারওয়ানের মধ্যে তাঁর খিলাফতের সময়কালও ছিল দীর্ঘতম। তিনি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

সিন্ধু জিহাদ:

হিশামের আমলে সিন্ধু রণাঙ্গন আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজা দাহিরের পুত্র জয় সিং উমর বিন আব্দুল আজিজের আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিশামের যুগে তিনি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সিন্ধুর গভর্নর জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে জয় সিংয়ের আক্রমণের মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে জয় সিং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং তাকে জীবিত বন্দি করা হয়। জুনাইদ তাকে হত্যা করান। এরপর জুনাইদ মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত এলাকা সম্প্রসারণের ইচ্ছা করেন এবং নতুন সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে তাদের পূর্ব দিকে রাজস্থান, রণকচ্ছ এবং গুজরাট পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন। সিন্ধুতে জুনাইদের নিয়োগ ১০৭ হিজরীতে হয়েছিল। তখন থেকে তাঁর অপসারণ (১১১ হিজরী) পর্যন্ত তিনি এখানে নিরন্তর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে মারওয়ার, উজ্জয়িনী এবং মালবসহ এক বিশাল এলাকা ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। [১]

সিন্ধুতে ইসলামী কেন্দ্র “মানসুরা” নির্মাণ:

১১১ হিজরীতে জুনাইদকে খোরাসানে পাঠানো হয়। এরপর কিছু অযোগ্য প্রতিনিধিদের কারণে সিন্ধুর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এখানকার অধিকাংশ বিজিত এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। অবশেষে হাকাম বিন আওয়ানা নামক একজন কর্মকর্তা এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পুত্র আমর বিন মুহাম্মদের সহায়তায় এখানে কিছু এলাকা পুনরায় জয় করেন এবং সিন্ধু নদের পূর্বে মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ শহর “মানসুরা” আবাদ করেন, যা পরবর্তীতে সিন্ধুতে মুসলমানদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ ৪/১৭৬; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৫

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২৬, ৪২৭

তুর্কিস্তান অভিযান

হিশামের শাসনামলের দ্বিতীয় বড় ঘটনা ছিল তুর্কিস্তান অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার ওপর চীনের খাকানের আক্রমণ। এই অঞ্চলে তখনো ইসলাম পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। চীনের প্রতিটি খাকান এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের শত বছরের পুরনো প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছিল; তাই এখানে বারবার বিদ্রোহ দেখা দিত।

১০৯ হিজরিতে হিশাম বিন আব্দুল মালিক আশরাস বিন আব্দুল্লাহকে এখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। আশরাস ছিলেন একজন বড় আলেম, বিদ্বান এবং নেককার ও সৎ মানুষ। তিনি বিদ্রোহ দমনের সর্বোত্তম উপায় হিসেবে এটাই মনে করেছিলেন যে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক দাওয়াত পৌঁছানো উচিত যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে সরকারের প্রকৃত অনুগত হিসেবে প্রমাণিত হয়। আশরাসের পাঠানো দাঈদের প্রচেষ্টায় এক বছরের মধ্যে সমরকন্দ ও এর আশপাশের মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাদের এলাকায় প্রচুর পরিমাণে নতুন মসজিদ নির্মাণ করে।

এই সময়ে সরকার একটি বড় ভুল করে বসে, আর তা হলো এই নওমুসলিমদের থেকে জিজিয়া মওকুফ করা হয়নি, যা ছিল তাদের শরয়ী অধিকার। এই পরিস্থিতির কারণে এই নওমুসলিমরা সরকারের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। অনেক সরকারি আমীরও সরকারের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করতে থাকেন, কিন্তু সরকার যখন তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেনি, তখন এই সরকারি আমীররা নওমুসলিমদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে তুর্কিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। [১]

যখন সরকারি বাহিনী এই বিদ্রোহীদের দমন করতে বের হলো, তখন বিদ্রোহী সর্দাররা সরকারের মোকাবিলায় নিজেদের শক্তি কম মনে করে চীনের খাকানের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করল। বুখারা ও সগদ-এর অনেক নওমুসলিম মুরতাদ হয়ে চীনের খাকানের সাথে যোগ দিল, যে কি না এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল এবং প্রায় পুরো মাওরাউন নাহরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল।

আশরাস এই পরিস্থিতি দেখে তার সদর দপ্তর “মার্ত” থেকে বের হলেন এবং আমু দরিয়ার তীরে এসে একের পর এক বেশ কয়েকজন সেনাপতিকে খাকানের মোকাবিলায় পাঠালেন। কয়েক মাস ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকলেও কোনো ফল আসেনি। অবশেষে আশরাস নিজেই আমু দরিয়া পার হয়ে মাওরাউন নাহরে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে বাইকান্দের দিকে অগ্রসর হন। এই অঞ্চলে পানির অভাব ছিল। প্রতিপক্ষ মুসলমানদের পথে থাকা পুকুরগুলো শুকিয়ে ফেলে এবং খালের পানি বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা বাইকান্দের কাছে পৌঁছালে তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। ওদিকে শত্রু মাথার ওপর এসে পৌঁছেছিল। তৃষ্ণার তীব্রতার কারণে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে লড়াই করার বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। অবস্থা এমন ছিল যে সবাই অস্ত্র সমর্পণ করে বন্দি হতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন আরব সর্দার হারিস বিন সুরাইজ হংকার দিয়ে বললেন:

“হে মুসলমানগণ! তৃষ্ণার্ত হয়ে মরার চেয়ে তলোয়ারের আঘাত সয়ে মরা সম্মানের এবং এতে সওয়াবও রয়েছে।”

একথা শোনার সাথে সাথে মৃতপ্রায় দেহগুলোতে প্রাণের সঞ্চারণ হলো এবং সবাই তলোয়ার উঁচিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুর্কিরা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে...

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/৫৬ থেকে ৫৯

খিলাফত বনু উমাইয়া

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

...থেকে দিশেহারা হয়ে পিছিয়ে গেল এবং মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে একটি খাল পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

এখানে সবাই তৃষ্ণা মেটাল, পশুদের পানি পান করাল, অনেক মুজাহিদ গোসলও করলেন। এরপর সতেজ হয়ে পুনরায় মোকাবিলার জন্য বের হলেন। সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই চলল। তুর্কিদের পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনীকে সহজে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। এটি দেখে ক্বাতান বিন কুতাইবা এবং আল-হাক বিন মুহাম্মদ নামক দুই আরব অফিসার বনু তামীম ও বনু কাইসের বাছাইকৃত যুবকদের একত্রিত করে তাদের থেকে মৃত্যুর বায়আত নিলেন এবং শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করলেন।

সাবিত বিন কুতনা নামক এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আওয়াজ দিলেন: “তাদের সাথে লড়াই করার আমার ভালো অভিজ্ঞতা আছে।”

এ কথা বলে তিনি সেরা অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি বলছিলেন: “আল্লাহর কসম! বনু উমাইয়া আমাকে শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পারে না।”

লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর ঠোঁটে এই দুআ ছিল:

“হে আল্লাহ! আমি গতকাল ইবনে বাসতামের মেহমান ছিলাম, আজ সন্ধ্যায় তোমার মেহমান হতে চাই। জান্নাত দান করে মেহমানদারি করো।”

সাবিতের সাথে এই যুদ্ধে সাখর বিন মুসলিম এবং আব্দুল মালিক বিন দিসার-এর মতো প্রখ্যাত গাজীরা শাহাদাত বরণ করেন। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে এই ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ হয়।

এরপর খোরাসান ও মাওয়ারাউন নাহরে মুসলিম ও খাকানের মধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ হয়। অবশেষে এই সিলসিলা একটি সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয় এবং প্রতিপক্ষ বাহিনী নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়।

দামেস্কে হিশাম বিন আব্দুল মালিক মধ্য এশিয়ার এই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি দেখলেন যে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে না, তখন তিনি আশরাস বিন আব্দুল্লাহকে অপসারিত করে ১১১ হিজরিতে সিন্ধুর গভর্নর জুনাইদ বিন আব্দুর রহমানকে এখানে নিযুক্ত করেন।

জুনাইদ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত সাহসী সেনাপতি। তিনি ‘মার্ত’ পৌছামাত্রই বাহিনী পুনর্গঠিত করেন এবং আমু দরিয়া পার হয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বিদ্রোহী ও খাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। খাকানের বাহিনী পরাজিত হয় এবং তার চাচাতো ভাই বন্দি হয়। সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমে যায়। [১]

তবে বিদ্রোহীরা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরের বছর তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং খাকান তাদের সমর্থন দেয়। বিদ্রোহের আগুন সর্বপ্রথম ‘তাখার’-এ জ্বলে ওঠে। জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান তাঁর সদরদপ্তর ‘মার্ত’ থেকে বাহিনী নিয়ে সেদিকে রওনা হলে তুর্কিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সমরকন্দের চারদিকে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। খাকান নিজেও তার পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এবং শহরের কাছে ছাউনি ফেলে।

সমরকন্দের শাসক সাওরা বিন আল-হর-এর কাছে বিদ্রোহীদের এত বড় সমাবেশের মোকাবিলা করার শক্তি ছিল না। তিনি জুনাইদ বিন আব্দুর রহমানকে সংবাদ পাঠিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৭/৬৮, ৬৯

জুনাইদ “তুখার” এর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তখনও অবসর পাননি। এই নতুন বিদ্রোহ আরও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তবে সমরকন্দ ছিল মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দু; তাই এর সুরক্ষা ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জুনাইদ অবিলম্বে তার কাছে থাকা সৈন্যবাহিনী নিয়ে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছু অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এই সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন:

“এই লড়াই তুর্কিদের বিরুদ্ধে। এর জন্য কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সংস্থান করা জরুরি। বর্তমানে আমাদের বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। তাদের একত্রিত করে তারপর সমরকন্দে পাঠানো উচিত।”

জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান এটি শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বললেন:

“এটা কীভাবে সম্ভব যে, একদিকে আমার ভাই সাওরা বিন আল-হুর বিপদে আটকা পড়ে আছে আর আমি পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকব?”

এই বলে তিনি বাহিনীকে সমরকন্দের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। এই ক্ষুদ্র বাহিনী দ্রুতগতিতে পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে সমরকন্দের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

বিদ্রোহী তুর্কি এবং চীনের খাকান যখন জানতে পারল যে জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান নিজেই সমরকন্দবাসীদের জন্য সাহায্য নিয়ে আসছেন, তখন তারা তাকে থামানোই বেশি জরুরি মনে করল এবং সমরকন্দের সামনে সামান্য কিছু সৈন্য রেখে জুনাইদের মোকাবিলা করার জন্য রওনা হলো।

জুনাইদ তখনও সমরকন্দ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল (প্রায় ৬৫ কিলোমিটার) দূরে ছিলেন, এমন সময় খাকান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে দেয়ালের মতো সামনে এসে দাঁড়াল। জুনাইদ একটি পাহাড়কে পেছনে রেখে খাকানের বাহিনীর বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করলেন এবং সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও শত্রুকে জয়ী হতে দিলেন না। তবে তিনি প্রতিপক্ষকে ময়দান থেকে সরিয়ে সমরকন্দ পৌঁছাতে সফল হতে পারলেন না। দুই দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতে থাকল এবং মুসলমানদের পাল্লা দুর্বল হতে শুরু করল।

অবশেষে জুনাইদ একজন দ্রুতগামী বার্তাবাহক পাঠিয়ে সাওরা বিন আল-হুরকে বার্তা দিলেন:

“আমরা মাত্র দুই দিনের দূরত্বে খাকানের সাথে যুদ্ধ করছি। তুমি বাহিনী নিয়ে নদীর পাড় ধরে অগ্রসর হয়ে শত্রুর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করো, তাহলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি।”

এই বার্তা পাওয়া মাত্রই সাওরা বিন আল-হুর সমরকন্দের বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু তার পক্ষ থেকে একটি বড় ভুল হলো এই যে, তিনি জুনাইদের বলে দেওয়া পথের পরিবর্তে অন্য একটি দিক দিয়ে অগ্রসর হলেন। সেই দিকে তুর্কিরা অবরোধ করে রেখেছিল। তারা সাওরা বিন আল-হুরের বাহিনীকে ঘিরে ফেলল। সাওরা তাদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, এই আক্রমণে তুর্কিদের পিছু হটতে হলো। তারা সাওরার পথ রোধ করার জন্য জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিল। অনেক মুসলমান এর কবলে পড়ে গেলেন। এবার তুর্কিরা মুসলমানদের ঘিরে ফেলে এমনভাবে পিষ্ট করল যে, বারো হাজারের মধ্যে মাত্র দুই হাজার কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে বের হতে পারল, বাকি সবাই সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন। স্বয়ং সাওরা বিন আল-হুরের ঘোড়া ভড়কে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, যার ফলে তার উরুর হাড় ভেঙে গেল। জখমের তীব্রতা এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে অবশেষে সাওরা নিজেও শাহাদাতের সুখা পান করলেন।

জুনাইদ সমরকন্দের সাহায্যকারী বাহিনীর ধ্বংস এবং সাওরাহ-এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে থাকানের বাহিনী তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল।

যুদ্ধের কোনো উপায় না দেখে জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান তার সৈন্যদের সাথে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে এলেন। তার সাথে গোলামদের একটি বড় সংখ্যা ছিল। তিনি ঘোষণা করলেন:

“যে গোলাম আজ বীরত্বের সাথে লড়াই করবে, সে মুক্ত।”

এর পরপরই মুসলমানরা শত্রুর ওপর প্রবল আক্রমণ শুরু করল। তুর্কিরাও যুদ্ধ জয়ের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। সেদিন বনু আজদ-এর আটজন পতাকাবাহী একের পর এক শহীদ হলেন, কিন্তু তারা ইসলামের পতাকাকে অবনমিত হতে দেননি। এই যুদ্ধ এতটাই তীব্র ছিল যে উভয় বাহিনী তাদের সর্বশক্তি উজাড় করে দিয়েছিল এবং সৈন্যরা লড়াই করতে করতে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তলোয়ারের আঘাতে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তারা ভোঁতা তলোয়ার ফেলে দিয়ে একে অপরের সাথে হাতাহাতি শুরু করল।

জুমার দিন শুরু হওয়া এই লড়াই শনিবার দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকে। বিপুল সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন, যাদের মধ্যে শত শত নামকরা জেনারেল, গাজী এবং মুজাহিদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অশ্বারোহী বাহিনী প্রায় পুরোটাই শেষ হয়ে গিয়েছিল; কেবল পদাতিক সৈন্যরা কিছুটা নিরাপদ ছিল।

এই পরিস্থিতিতে জুনাইদ পিছিয়ে গিয়ে পদাতিক সৈন্যদের সুসংগঠিত করলেন। এখন শত্রুর ব্যুহ ভেদ করা অথবা শহীদ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। যখন তারা তুর্কিদের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন একজন প্রবীণ মুজাহিদ জিয়াদ বিন আল-হারিস বললেন:

“এদের সাথে যুদ্ধের আমার সত্তর বছরের অভিজ্ঞতা আছে। এদেরকে কাছে আসতে দাও, তারপর একযোগে আক্রমণ করো।”

মুসলমানরা তাই করল। তুর্কিরা কাছে আসতেই তারা তাদের ব্যুহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের ব্যুহ ছিন্নভিন্ন করে ঘেরাও থেকে বেরিয়ে এল।

খাকান এই দৃশ্য দেখে বললেন:

“আরবরা যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন তারা মরার জন্যই লড়াই করে।”

জুনাইদ অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সমরকন্দের প্রবেশ করলেন। যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। খাকান চীনা বাহিনীর সাথে বাইরেই অবস্থান করছিলেন এবং যেকোনো সময় শহর অবরোধ করতে পারতেন। জুনাইদ এই বিপদের কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং তাকে উপলব্ধি করালেন যে বিলম্বের ফলে পুরো মধ্য এশিয়া মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

হিশাম এই বার্তা পাওয়া মাত্রই কুফা ও বসরার ছাউনি থেকে বিশ হাজার নতুন সৈন্য, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাথে তিনি জুনাইদকে বললেন সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের বেতন বাড়িয়ে দিতে।

সময়মতো সাহায্যকারী বাহিনী পৌঁছানোর ফলে সমরকন্দের অবস্থানরত মুসলমানদের সাহস বেড়ে গেল। অন্যদিকে খাকান এখানে অবস্থান মজবুত দেখে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বুখারার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন।

জুনাইদ এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই খাকানের পিছু নিলেন এবং পথেই তাকে ধরে ফেললেন। ১লা রমজান ১১৪ হিজরিতে কুফর ইয়াকিন নামক স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। খাকানের অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং তিনি তার অবশিষ্ট বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য বুখারার দিকে পালিয়ে যান।

ইচ্ছা স্থগিত করে ফিরে গেলেন।

খাকানকে এভাবে ব্যর্থ করে পিছু হটানো ছিল জুনাইদের এক বিশাল কৃতিত্ব। জুনাইদ বিন আবদুর রহমান ১১৬ হিজরি পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার গভর্নর ছিলেন। এরপর তাকে পদচ্যুত করা হয়। পদচ্যুতির মাত্র কয়েকদিন পরেই এই মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করেন।

১১৯ হিজরিতে চীনের খাকান আবারও মধ্য এশিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন। আমু দরিয়ার ওপারে খোরাসানের নতুন গভর্নর আসাদ বিন আবদুল্লাহ কাসরির সাথে তার মোকাবিলা হয়। খাকান এখানে আবারও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরের বছর তিনি আবারও আক্রমণ করেন, কিন্তু এই সময়ে তার বিশ্বস্ত সেনাপতি ‘কুরসুল’-এর সাথে তার বিবাদ হয়। বিষয়টি এতটাই গড়ায় যে সেই সেনাপতি বিদ্রোহ করে বসেন। এক রাতে তিনি অতর্কিত হামলা চালিয়ে খাকানকে হত্যা করেন।

‘কুরসুল’ ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক সেনাপতি, তিনি ৭২টি যুদ্ধে লড়েছিলেন; তাই তুর্কিরা তাকেই তাদের ‘খাকান’ বানিয়ে নেয়।

এই সময়ে মধ্য এশিয়ায় নসর বিন সাইয়্যার নামক একজন নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি এবং উচ্চমানের প্রশাসক। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। খলিফার অনুমতি নিয়ে তিনি নওমুসলিমদের থেকে জিজিয়া নেওয়া বন্ধ করেন। খারাজ ও কর আদায়ের দুর্নীতি দূর করেন। জুলুম-অত্যাচারের তদন্ত করে জনগণকে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করেন। এভাবে নওমুসলিমদের অভিযোগ দূর হয় এবং তারা বিদ্রোহে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে।

এরপর তিনি নতুন খাকান ‘কুরসুল’-এর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নেন এবং তার অধিকৃত এলাকাগুলোতে বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুরসুল নিজেই মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। শাশ নদীর তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে রক্তের নদী বয়ে যায়। অবশেষে ‘কুরসুল’ গ্রেপ্তার হন এবং তুর্কিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তিনি ছিলেন মুসলমানদের এক অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু; তাই তাকে হত্যা করা হয়। [১]

নসর বিন সাইয়্যার একজন আরব আমির কাসিম বিন বাখিতের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ের সুসংবাদ দামেস্কে পাঠান।

হিশাম বিন আবদুল মালিক অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে তুর্কিস্তান ফ্রন্টের খবরের অপেক্ষায় থাকতেন। কাসিম বিন বাখিত খিলাফত প্রাসাদের দরজায় এসে তাকবির ধ্বনি দেন। এরপর অনবরত তাকবির বলতে বলতে দরবারে পৌঁছান এবং উচ্চস্বরে বলেন: “আমিরুল মুমিনিনকে বিজয়ের মুবারকবাদ।”

জবাবে হিশামও তাকবির ধ্বনি দেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। [২]

‘কুরসুল’-এর পর তুর্কিদের আর কোনো নেতা অবশিষ্ট ছিল না। তারা নিজেরাও বছরের পর বছর ধরে চলা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারাও এখন আর তাদের সাথে দিচ্ছিল না; তাই তারা কিছু শর্ত পেশ করে স্থায়ী সন্ধির আবেদন জানায়। পূর্ববর্তী শাসকরা এই শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন, কিন্তু নসর বিন সাইয়্যার সেগুলো গ্রহণ করে নেন।

এভাবে দীর্ঘ সময় পর তুর্কিস্তানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৭/৮৪ থেকে ১২৬

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৭/১২৬, ১২৭

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৭/৮৪, ১২৭

জর্জিয়া এবং আরমেনিয়ার জিহাদ:

১০৬ হিজরিতে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে আরমেনিয়া এবং খাজার ভূখণ্ডে জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ হাকামি জিহাদি অভিযান পরিচালনা করেন। আল-লানের অবাধ্য গোত্রগুলো কর ও জিজিয়া দিতে সম্মত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করল।

১১২ হিজরিতে গোত্রগুলো পুনরায় বিদ্রোহ করল এবং খাকান-ই-চীনের পুত্রের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে পুরো আজারবাইজানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল। তাদের ফিতনা দমনের জন্য জাররাহ ওয়াদি-ই-সাবলানের নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করালেন যা ‘জিসরে জাররাহ’ নামে পরিচিত হলো।

এই সময়ে বিদ্রোহীরা আজারবাইজানের ইসলামী শহর ‘আরদাবিল’ অবরোধ করল। জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ এই খবর পাওয়া মাত্রই আরদাবিলের দিকে রওনা হলেন এবং সেখানে পৌঁছে অবরোধকারী বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ করলেন। এখানে অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো যাতে জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। এই ঘটনা ২৫ রমজান ১১২ হিজরির।

বিদ্রোহীরা আরদাবিল অবরোধের পর তা জয় করে নিল এবং এখানকার হাজার হাজার মুসলমান নারী-পুরুষকে বন্দী করল। তাদের সাহস এতটাই বেড়ে গেল যে ইরাকের শহর মসুলের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোও তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের কবলে চলে এল।

এদিকে হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক যখন জাররাহর শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন তিনি সাঈদ ইবনে আমর আল-হারশিকে কিছু বাছাইকৃত আরব বীরদের সাথে ডাক ঘোড়ার ওপর অভিযানের দিকে রওনা করে দিলেন। এই লোকেরা দিন-রাত সফর করে যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছাল এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করল। খাকানের পুত্র এই সময় ইসলামী শহর ‘ওয়ারজান’ অবরোধ করে রেখেছিল। হারশি দ্রুতগামী এক দূতের মাধ্যমে শহরবাসীদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আর দুই-তিন দিন আরও প্রতিরক্ষা করো, সাহায্য আসছে।

এর আগেই সেই দূত শহরে প্রবেশ করত, প্রতিপক্ষ সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে নিল। খাকানের পুত্র তাকে বাধ্য করল যেন সে শহরবাসীদের অস্ত্র সমর্পণের পরামর্শ দেয়। দূত কৌশলে তা মেনে নিল কিন্তু শহরের দেয়ালের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলল: “শহরবাসী! পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরক্ষা করো। দুই দিনের মধ্যে সাহায্য পৌঁছে যাবে।”

শত্রুরা ক্ষিপ্ত হয়ে দূতকে হত্যা করল কিন্তু সে তার কাজ করে ফেলেছিল। অবরুদ্ধ মুসলমানরা যারা আগে হতাশ হয়ে অস্ত্র সমর্পণের কথা ভাবছিল, সাহায্যের খবর পেয়ে তারা পুনরায় পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরক্ষা শুরু করল।

খাকানের পুত্র এই পরিস্থিতি দেখে আরও যুদ্ধ করা নিরর্থক মনে করল এবং ফিরে গেল। সে মুসলমান যুদ্ধবন্দী এবং গনিমতের মালের ভাণ্ডার গরুর গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। এই বন্দীদের মধ্যে সাবেক মুসলিম সেনাপতি জাররাহ ইবনে আবদুল্লাহর স্ত্রী-সন্তানরাও ছিল। এই লস্কর কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা পথ দিয়ে সফর করছিল।

এই সময়ে হারশি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলেন। কাছে পৌঁছে তিনি কিছু অশ্বারোহীকে তাদের খবর আনার জন্য পাঠালেন। তারা রাতের বেলা ফিরে এসে জানাল যে, এক জায়গায় বিদ্রোহীরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, পাহারার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। হারশি জেনারেলদের সাথে পরামর্শ করে তখনই শত্রুর তাঁবুতে শবে খুন (অতর্কিত হামলা) করার নির্দেশ দিলেন।

এই অভিযানে বিদ্রোহীরা শোচনীয়ভাবে পিছু হটে এবং অনেক মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়। একইভাবে শত্রুপক্ষের আরেকটি তাঁবুতে নৈশকালীন আক্রমণ চালানো হয়। এখান থেকে উদ্ধারকৃত বন্দীদের মধ্যে জাররাহ বিন আবদুল্লাহর পরিবারও ছিল।

খাকানের ছেলে এই অতর্কিত আক্রমণগুলোতে অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে আসে এবং সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় সুসংগঠিত করে মুসলমানদের যুদ্ধের আহ্বান জানায়। এক প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে শত্রুর সংখ্যাধিক্যের সামনে মুসলমানদের পা টলে যায়। এই দৃশ্য দেখে শত্রুর বন্দিশালায় থাকা মুসলিম নারী-পুরুষরা আতঁনাদ করতে থাকে এবং তাকবীরের ধ্বনি দিতে শুরু করে।

খুরাশি এই আতঁনাদ শুনে সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানান এবং দৃঢ়পদ হয়ে শত্রুর ওপর এমন কঠোর পাল্টা আক্রমণ করেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিপক্ষ রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা আরস নদী পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে এবং সমস্ত গনীমতের মাল ও বন্দীদের উদ্ধার করে। খাকানের ছেলে এখান থেকে পরাজিত হওয়ার কিছুদিন পর বায়লাকান নদীর তীরে পুনরায় কাতারবন্দী হয়। এখানে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুর ব্যুহ ভেঙে তাদের এতটাই পেছনে ঠেলে দেয় যে তাদের অধিকাংশ নদীতে ডুবে মারা যায়। সাঈদ খুরাশি খলিফাকে বিজয়ের সুসংবাদ লিখে পাঠান। [১]

১০৭ হিজরিতে আসাদ বিন আবদুল্লাহ জর্জিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে এই অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১১০ হিজরিতে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক পুনরায় এখানে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন এবং জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিস পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের বড় গিরিপথ যাকে “বাব” বলা হয়, সেখানে খাজারি গোত্রগুলোর এক বিশাল বাহিনীর সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা হয়। এই সময়ে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এবং চারদিকে কাদা হয়ে যায়। এই কারণে এই জিহাদকে “গাজওয়াতুত ত্বীন” বলা হয়। তিন সপ্তাহ ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ২৩শে জুমাদাল আখিরা ১১০ হিজরিতে মাসলামা প্রতিপক্ষকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

১১২ হিজরির শাওয়াল মাসে মাসলামা তুষারপাতের মৌসুমে এখানে পুনরায় আক্রমণ করেন এবং শত্রুর বেশ কিছু দুর্গ ও শহর জয় করেন। মাসলামা “বাব” গিরিপথ দিয়ে তুর্কিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটি স্থায়ী ঘাঁটি হিসেবে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এখানে একটি পৃথক সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। মাসলামার এই অভিযানগুলো ১১৪ হিজরি পর্যন্ত চলতে থাকে। [২]

হিশামের শাসনামলে আন্দালুসে উকবা বিন নাফিকের ছেলে আবদুল্লাহ বিন উকবাও খ্রিস্টান শাসকদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল যুদ্ধ করেন এবং এটি প্রমাণ করে দেন যে, যতক্ষণ মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনা থাকবে, আন্দালুসকে পুনরায় খ্রিস্টান রাজ্যে পরিণত করা যাবে না। [৩]

রোমানদের সাথে যুদ্ধ:

হিশামের শাসনামলে এশিয়া মাইনরের ফ্রন্টে রোমান বাহিনীর সাথেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। হিশামের ভাই, ছেলে এবং চাচাতো ভাইয়েরা নামকরা তলোয়ারবাজ ছিলেন। তাদের মধ্যে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক, সাঈদ বিন আব্দুল মালিক, মওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, সুলাইমান বিন হিশাম, মুহাম্মদ বিন হিশাম এবং সাঈদ বিন হিশামের নাম উল্লেখযোগ্য যারা তাঁর বিশ বছরের দীর্ঘ...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৪০ থেকে ৩৪৩।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৪৩ থেকে ৩৪৬।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৪৭।

হিশামের শাসনামলে বারবার ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় সীসা ঢালা প্রাচীর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। আমীর মুয়াবিয়া রা.-এর সময়ের মতো হিশামও রোমের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আলাদা আলাদা বাহিনী (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন) রাখার ধারা অব্যাহত রাখেন। এই যুগে মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের জিহাদী বীরত্ব রোমানদের মনে পূর্বের ন্যায় ভীতি সঞ্চার করেছিল। [১]

১১০ হিজরিতে জিহাদে হিশামের পুত্র মুয়াবিয়া এক জিহাদী অভিযানে রোমান সেনাপতি কনস্টানটাইনকে জীবিত বন্দী করেন। একই বছর হিশামের চাচাতো ভাই মারওয়ান বিন মুহাম্মদ রাশিয়ার সীমান্তে আক্রমণ করেন এবং সফলভাবে ফিরে আসেন। আর্মেনিয়া, তুর্কিস্তান, রাশিয়ার সীমান্ত এবং খাজার অঞ্চলে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের অভিযান ১২১ হিজরি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। [২]

ভূমধ্যসাগরের সিসিলি (সিকিলিয়া) দ্বীপটি দীর্ঘকাল ধরে খলিফাদের নজরে ছিল, যেখান থেকে অধিকাংশ সময় রোমান নৌবাহিনী ইসলামী উপকূলে আক্রমণ করত। তাই সিসিলি দখল করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। তবে শুরুতে এখানে কেবল অতর্কিত আক্রমণ চালানো হতো।

১১৫ হিজরিতে উবাইদাহ বিন আব্দুর রহমান আক্রমণ করেন, যা রোমানদের নৌবহরের প্রবল প্রতিরোধের কারণে সফল হতে পারেনি। পরের বছর পুনরায় আক্রমণ করা হয়। ফেরার পথে রোমান নৌবাহিনী মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলমান বেঁচে ফিরলেও অনেক বড় বড় অফিসার বন্দী হন, যাদের মধ্যে আমর বিন উসমান, সুলাইমান বিন উসমান, আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ এবং মুগীরা বিন যিয়াদ উল্লেখযোগ্য। ছয় বছর পর মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করা হয়। [৩]

১২২ হিজরিতে মরক্কোর গভর্নর ইবনে হাবহাবের নির্দেশে হাবীব বিন আবি উবাইদাহ নামক এক আমীর সিসিলি বিজয়ের জন্য বড় ধরনের আক্রমণ করেন। ইসলামী নৌবাহিনী উপকূলে মোতায়নকৃত রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে এখানকার রাজধানী সিরাকিউস (Syracuse) অবরোধ করে। শহরবাসী কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্র সমর্পণ করে এবং এখানে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হাবীব পুরো দ্বীপটি জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে আফ্রিকায় বারবার গোত্রগুলো বিদ্রোহ শুরু করায় মরক্কোর গভর্নর হাবীবকে ফিরিয়ে নেন। [৪]

বারবারদের বিদ্রোহ:

বারবারদের এই বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক, যা উমাইয়া খিলাফতের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের বিশাল সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বিদ্রোহের বড় কারণ ছিল তাঞ্জিয়ারের গভর্নর উমর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুরাদীর নওমুসলিম বারবারদের সাথে অশোভন আচরণ। তিনি নওমুসলিম বারবারদের ওপরও অবৈধ কর আরোপ করেছিলেন। বারবাররা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন মেজাজ, অজ্ঞতা এবং নৈতিক দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল। এই ভিত্তিতে...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩১৬ থেকে ৩৫৫

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৪৫

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৪৭

[৪] আল-কামিল ফিত-তারিখ, সন ১২২ হিজরি

আরব কর্মকর্তারা তাদের অসভ্য মনে করত, এর ফলে বারবাররাও আরবদের অহংকারী মনে করে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কিছু ভাষাগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক হয়ে থাকে, কিন্তু ইসলাম এগুলোর ভিত্তিতে গোঁড়ামিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘোষণা করেছে; কারণ এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে জাতিগত ঘৃণা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছিল। গোত্র, ভাষা ও বংশ নিয়ে গর্ব করা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

এই ত্রুটির কারণে অনেক বারবার মুসলিম সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দ্রুত খারেজীদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং মাইসারা নামক এক খারেজীর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। সেই সময় মরক্কোর সেনাবাহিনী সিসিলি অভিযানে গিয়েছিল। বারবাররা ময়দান খালি দেখে ১২২ হিজরির রমজান মাসে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তানজাহ দখল করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে আরবদের গণহত্যা শুরু করে দেয়। সিসিলিতে জিহাদের জন্য যাওয়া সেনাবাহিনী এই হাঙ্গামার কারণে অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে তানজাহ ফিরে আসে এবং আরব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে তানজাহর উপকণ্ঠে বারবারদের ওপর আক্রমণ চালায় কিন্তু জয়ী হতে পারেনি। কিছু দিন পর বারবাররা নিজেরাই মাইসারার কঠোর মেজাজে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে হত্যা করে এবং একজন বারবার সরদার খালিদ বিন হুমাইদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে।

আফ্রিকার গভর্নর ইবনে হাবহাব এই ফিতনা দমনের অভিযান খালিদ বিন হাবিব ফাহরির ওপর ন্যস্ত করেন। ১২২ হিজরির জিলহজ মাসে কুদর নদীর তীরে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে খালিদ বিন হাবিব এবং উসমান বিন আবি উবাইদাহসহ আরবদের বড় বড় অভিজাত ব্যক্তির নিহত হন; এজন্য এই যুদ্ধকে “মা’রাকায়ে আশরাফ” বলা হয়। আন্দালুসেও বারবার গোত্রগুলোর বড় একটি সংখ্যা ছিল। তারা মরক্কোতে বারবারদের বিদ্রোহের খবর পেলে তারাও আন্দালুসে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

হিশাম বিন আব্দুল মালিক এই তথ্যগুলো পেলে তিনি ১২৩ হিজরিতে কুলসুম বিন আইয়াদকে ত্রিশ হাজার সৈন্য দিয়ে মরক্কো থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বারবারদের দমনের জন্য পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে মিসর, তিউনিসিয়া ও লিবিয়ার শাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দেন যেন তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনী এই অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে। কুলসুম পথে পড়া শহরগুলোর সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে মরক্কো পৌঁছালে তার সৈন্য সংখ্যা ৭০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। এই বাহিনী তানজাহর কাছে বারবারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আরবরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে কিন্তু বারবারদের প্লাবনের সামনে তারা টিকতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এক-তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনী তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারায়। সেনাপতি কুলসুম বিন আইয়াদসহ বড় বড় কর্মকর্তারা এই যুদ্ধে প্রাণ হারান।

হিশাম এই দুর্ঘটনার খবর পেলে তিনি শপথ করেন যে, তিনি এই ফিতনা মিটিয়েই ছাড়বেন, চাই তাকে নিজের সন্তানাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হোক। তিনি হানজালা বিন সাফওয়ানকে আরও ত্রিশ হাজার সৈন্য দিয়ে এই অভিযানের জন্য পাঠান। হানজালা তিউনিসিয়া পৌঁছে কাইরাওয়ানকে নিজের কেন্দ্র বানান; কারণ সেই সময় বারবাররা মরক্কো ছাড়িয়ে আলজেরিয়া ও লিবিয়াও দখল করে নিয়েছিল। হানজালা কাইরাওয়ান পৌঁছামাত্রই বারবাররা দুই লক্ষরে বিভক্ত হয়ে কাইরাওয়ানের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। হানজালা একটি লক্ষরকে নিজেই তাড়িয়ে দেন এবং অন্যটির মোকাবিলায় নিজের একজন সেনাপতিকে পাঠান যিনি পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। অবশেষে বারবাররা সব দিক থেকে একত্রিত হয়ে কাইরাওয়ানের সামনে কাছাকাছি চলে আসে। তাদের সংখ্যা তিন লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হানজালা...

শহর থেকে তিন মাইল সামনে এসে তারা তাদের মুখোমুখি হলো। এটি এমন এক পরাজয়ের সুযোগ ছিল যে দামেস্কের রক্ষা পাওয়াও কঠিন মনে হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম এই সময়ে জিহাদের উৎসাহ দিয়ে সিপাহীদের উদ্বুদ্ধ করলেন। আরব মহিলারা তাদের সতীত্বের দোহাই দিয়ে আরব পুরুষদের আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করলেন। এরপর যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আরবরা জান বাজি রেখে লড়ল। তাদের বিখ্যাত তলোয়ারবাজরা এমন বীরত্বের সাথে লড়লেন যে তলোয়ারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল এবং তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে বারবারদের শোচনীয় পরাজয় হলো এবং তারা দুই লক্ষ লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে পালিয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুসলিমাকে এক কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। অন্যথায় বারবাররা আরবদের কাছ থেকে বেছে বেছে প্রতিশোধ নিত এবং তাদের সাথে খারেজিদের আধিপত্য যুক্ত হলে উম্মতে মুসলিমার কী দশা হতো তা আল্লাহই ভালো জানেন। [১]

ফ্রান্সের জিহাদ:

হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামল ফ্রান্সের জিহাদের জন্য বিখ্যাত। তিনি আব্দুর রহমান আল-গাফেকিকে আন্দালুসের গভর্নর নিযুক্ত করেন, যিনি একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সাহসী আরব সেনাপতি ছিলেন। আল-গাফেকি আন্দালুসের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উন্নত করেন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির পর ১১৪ হিজরিতে আশি হাজার অভিজ্ঞ সৈন্য নিয়ে আবারও ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন।

সেই সময়ে ফ্রান্সে দুটি বড় শক্তি ছিল: দক্ষিণে গথ বংশের ডিউক অফ অ্যাকুইটাইন (Eudes) শাসন করত, যার রাজ্যে ইয়াজিদ সানির আমলে আক্রমণ হয়েছিল। ফ্রান্সের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে ‘মেরোভিনজিয়ান’ বংশের রাজত্ব ছিল, যেখানে রাজার ক্ষমতা ছিল নামমাত্র। সর্বেসর্বা ছিলেন প্রধান সেনাপতি ‘চার্লস মার্টেল’। ফ্রান্সের এই দুই শক্তি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। ডিউক এবং চার্লস মার্টেল একে অপরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন।

আব্দুর রহমান আল-গাফেকি যখন ফ্রান্সের সীমান্তে প্রবেশ করলেন, তখন প্রথমে ডিউকের রাজ্য আক্রান্ত হলো। ডিউক পাহাড়ের পাদদেশে ব্যুহ রচনা করে অত্যন্ত প্রবল উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে তাকে পালিয়ে যেতে হলো এবং মুসলমানরা গারোন নদীর সবুজ ও শ্যামল উপত্যকাগুলো দখল করে বর্দো (Bordeaux) বন্দরে পৌঁছে গেলেন। এখানে ডিউকের প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলো।

ইসলামী বাহিনী যখন উত্তরের দিকে অগ্রসর হলো, তখন দর্দোন (Dordogne) নদীর তীরে ডিউক আবারও এক নতুন বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলেন। আব্দুর রহমান আল-গাফেকি এখানেও তাকে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। ইসলামী বাহিনী নদী পার হয়ে ‘পোয়াতিয়ে’ (Poitiers) পৌঁছাল, যেখানে ‘সেন্ট হিলারি’র বিখ্যাত গির্জাটি অবস্থিত ছিল। দুর্গের দেয়ালে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে মুসলমানরা ‘তোরস’ (Tours)-এর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। [২]

ডিউক অফ অ্যাকুইটাইন নিশ্চিত হলেন যে মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা কোনো একজন শাসক কখনোই রুখতে পারবে না এবং তিনি অবিলম্বে...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৫৩ থেকে ৩৫৬; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১৭ হিজরির ঘটনাবলী; আল-ইসতিকসা লি আখবার দুয়ালিল মাগরিবিল আকসা: খণ্ড ১, পৃ. ১৬৪ থেকে ১৭০।

[২] ‘তোরস’ ইংরেজি বানান অনুযায়ী, আর এর ফরাসি উচ্চারণ ‘তুর’।

যদি প্রতিরোধ করা না হতো, তবে পুরো ফ্রান্স তাদের পদানত হয়ে যেত। সে তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী চার্লস মার্টেলের সাথে পূর্বের শত্রুতা ভুলে গিয়ে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রার্থনা করল। মার্টেল পরিস্থিতির নাজুকতা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল। ফ্রান্সের অন্যান্য নবাবরাও তার সাথে একমত ছিলেন। সে মুসলমানদের আক্রমণকে খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব ও বিলুপ্তির প্রশ্নে পরিণত করে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোকেও মিত্র বানাল; ফলে ফ্রান্স ছাড়াও জার্মানি ও পর্তুগালের খ্রিস্টান নবাবরাও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তার কাছে পৌঁছে গেল। এভাবে মার্টেল জাতির প্রতিরক্ষার নামে একটি বিশাল ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হলো। এই বিশাল বাহিনী অগ্রসর হয়ে “টুরস”-এর উপত্যকায় পৌঁছাল যেখানে ইসলামী বাহিনী তাবু গেড়েছিল। মুসলমানরা এত বড় বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার আশা করেনি। শত্রুর বিপুল জনশক্তির বিপরীতে আট হাজার মুসলমান গণনার মধ্যেই ছিল না; তাই আপাতদৃষ্টিতে পিছু হটে যাওয়ার কৌশলই উপযুক্ত মনে হচ্ছিল, কিন্তু আবদুর রহমান আল-গাফেকি পিঠ প্রদর্শন করাকে সাহসিকতা ও বীরত্বের সেই ঐতিহ্যের পরিপন্থী মনে করলেন যা ছিল মুসলমানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া সৈন্যদের মধ্যে এই বিষয়টি নিশ্চিত ছিল যে, শত্রু সাহসী হয়ে পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং মুসলমানরা মনোবল হারিয়ে একের পর এক নিহত হতে থাকবে; তাই আল-গাফেকি আল্লাহর ওপর ভরসা করে ময়দানে অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দিলেন। ইউরোপীয় বাহিনী সংখ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও আক্রমণের সূচনা করার সাহস করতে পারল না এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় রইল। এদিকে যুদ্ধে বিলম্ব মুসলমানদের জন্য খাদ্য ও রসদ সরবরাহের ঘাটতির কারণ হতে পারত; তাই অবশেষে আবদুর রহমান আল-গাফেকি নিজেই আক্রমণের সূচনা করলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত তীব্রতার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকল, উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাল। সন্ধ্যা পর্যন্ত পাল্লা সমান ছিল।

দ্বিতীয় দিনও বিকেল পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকল। মুসলমানদের একটি বড় অংশ আহত ও ক্লান্তিতে অবসন্ন ছিল, অন্যদিকে ইউরোপীয় শিবিরে অসংখ্য সতেজ বাহিনী মজুদ ছিল। বিকেলের দিকে ডিউক অফ অ্যাকুইটেইন সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করল, যার ফলে মুসলমানদের একদিকের কাতার ভেঙে গেল। এটি দেখে ফরাসিরা জোরালো আক্রমণ শুরু করল। মুসলমানদের পা টলমল করতে দেখে আবদুর রহমান আল-গাফেকি তাদের সাহস যোগাতে নিজেই শত্রুর কাতারে ঢুকে পড়লেন এবং শরীরে অসংখ্য আঘাত সয়ে অবশেষে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর শাহাদাত মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানভাবে লড়াই চালিয়ে গেল এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল না।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীগুলো নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। মুসলিম আমিরগণ পরামর্শ করে রাতারাতি সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে গেলেন। সকালে মিত্র বাহিনী তাদের তাবুগুলো খালি দেখতে পেল; তবে তাদের ওপর মুসলমানদের বীরত্বের এমন প্রভাব ছিল যে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সাহস করল না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, এই যুদ্ধ ১৫ই শাবান ১১৪ হিজরি (৯ই অক্টোবর ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। চার্লস এই যুদ্ধে জয়লাভ করে পশ্চিমা বিশ্বের নায়ক হয়ে গেল। এই কৃতিত্বের কারণেই সে “মার্টেল” অর্থাৎ “হাতুড়ি” উপাধি লাভ করে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নিকট এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি এখানে মিত্র বাহিনী পরাজিত হতো, তবে শুধু ফ্রান্স নয় বরং আরও অনেক ইউরোপীয় দেশ দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতেই ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

তারিখ-এ-মিল্লাত

...অংশ হয়ে যেত। আব্দুর রহমান আল-গাফেকি এবং হাজার হাজার মুজাহিদের এই শাহাদাতগাহ ‘বালাতুশ শুহাদা’ নামে পরিচিত। [১]

আন্দালুসের স্থিতিশীলতা ও উন্নতি:

ফ্রান্সে অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলমানরা আন্দালুসের স্থিতিশীলতা ও উন্নতির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ১১৬ হিজরিতে এখানে উকবা বিন হাজ্জাজ নিযুক্ত হন, যিনি এই দেশের সমস্ত প্রশাসনিক দুর্বলতা দূর করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। মহাসড়কগুলোর নিরাপত্তার জন্য অশ্বারোহী পুলিশের একটি আলাদা বিভাগ চালু করেন। প্রতিটি গ্রাম ও জনপদে আদালত প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন মসজিদ ও মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। অসৎ ও খিয়ানতকারী কর্মকর্তাদের কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে বরখাস্ত করা হয়। এভাবে আন্দালুস শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতির দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের একটি আদর্শ প্রদেশে পরিণত হতে শুরু করে। [২]

আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক গোত্রপ্রীতির বৃদ্ধি:

দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময় থেকেই আরব গোত্রগুলোর মধ্যে মুদারি ও ইয়ামানি ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় ইয়াজিদ ইয়ামানি গোত্রগুলোর ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস করেন এবং এই উদ্দেশ্যে খোরাসানের শাসনভার প্রথমে তার ভাই মাসলামা এবং পরে উমর বিন হুবাইরাকে প্রদান করেন। হিশাম চেষ্টা করেছিলেন যেন সরকারি পদের ক্ষেত্রে এই দুই গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই নতুন কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ইয়ামানি গোত্রগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ইয়ামানের একটি দুর্বল গোত্র ‘কাসর’-এর সরদার খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরিকে ইরাকের এবং তার ভাই আসাদ বিন আব্দুল্লাহকে খোরাসানের শাসক নিযুক্ত করেন। এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, ইয়ামানি কর্মকর্তারা প্রাধান্য লাভ করে মুদারি কর্মকর্তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। [৩]

ফলে পনের বছর পর হিশামের অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তিনি আবারও মুদার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপরে নিয়ে আসতে শুরু করেন। তিনি ১২০ হিজরিতে খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে বরখাস্ত করে তার স্থলে মুদারি গোত্রের ইউসুফ বিন উমরকে ইরাকের শাসক নিযুক্ত করেন। একই বছর খোরাসানের শাসক আসাদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরিও ইন্তেকাল করেন। হিশাম তার স্থলে মুদার গোত্রের নাসর বিন সাইয়্যারকে ওয়ালি নিযুক্ত করেন। এতে ইয়ামানিদের মধ্যে বঞ্চণার অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকে, যার লাভা হিশামের পর বিস্ফোরিত হয়। [৪]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি, পৃ. ১৯৩, ২০৩; নাফহত তিব: ১/২৮৬ থেকে ২৯০; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইনান: ১/১৯২ থেকে ২১১।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/২২৯; আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/১০২, ১১৩ থেকে ১১৬।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৭/২৬।

নোট: খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি তার বীরত্ব, দানশীলতা এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও কিছু বিশেষ মতাদর্শের অধিকারী ছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাইন বলতেন যে: সে একজন মন্দ লোক ছিল যে হযরত আলী মুর্তজাকে গালি দিত। (তারিখে দামেশক: ১৬/৬০; মিজানুল ইতিদাল: ১/৬৩৩)।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী সে খলিফাকে নবীর ওপর প্রাধান্য দিত, কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসির রহ. একে বানোয়াট আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, এই কথাটি “আল-ইকদুল ফারিদ”-এর লেখক (□বনে আবদে রাব্বিহি) প্রচার করেছেন যিনি শিয়া মতবাদে আক্রান্ত ছিলেন, তবে আমাদের শায়খ হাফেজ যাহাবিও ধোঁকা খেয়েছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২০২, ২০৩)।

লেখক বলেছেন যে, আল-কাসরি সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনাটি সন্দেহজনক হওয়া তো গ্রহণযোগ্য, কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসিরের ইবনে আবদে রাব্বিহির ওপর শিয়া হওয়ার অভিযোগ আনা সঠিক মনে হয় না এবং হাফেজ যাহাবির মতটিই সঠিক মনে হয়; কারণ “আল-ইকদুল ফারিদ”-এ ইবনে আবদে রাব্বিহি রাফেজিদের মন্দ দিকগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। (দ্রষ্টব্য: আল-ইকদুল ফারিদ: ২/২৪৫, ২৫১)। কোনো চরমপন্থী শিয়া কেন এমন দুঃসাহস করতে যাবে?

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২০ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৯৬।

দলাদলি ও গোঁড়ামির প্রকৃত সমাধান:

এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সেটিই ছিল যা উমর বিন আবদুল আজিজ গ্রহণ করেছিলেন যে, সমস্ত গোত্রীয় গোঁড়ামিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল-এর মহব্বত ও আনুগত্যের মধ্যে দমিত করে দেওয়া হোক। হিশামের নীতি অনুযায়ী এক গোত্রকে সামনে আনা এবং অন্যকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার ফলে শক্তির ভারসাম্যে তো পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঘৃণা বজায় ছিল এবং ঘৃণার লাভা ফুটতে থাকল। হিশামের পরে আসা খলিফাগণও এর কোনো উপযুক্ত সমাধান বের করেননি যার ফলাফল পরবর্তীতে এই দাঁড়াল যে, আরবদের প্রভাব ও প্রতাপ ম্লান হয়ে গেল এবং ইসলামি রাজনীতির লাগাম অনারবদের হাতে চলে এল।

জায়েদ বিন আলী-র বিদ্রোহ ও শাহাদাত:

হিশামের যুগের একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল হযরত হুসাইন-এর নাতি জায়েদ বিন আলী-র বিদ্রোহ। তিনি হযরত জয়নুল আবেদিন-এর সাহেবজাদা এবং হযরত বাকির-এর ভাই ছিলেন। ইলম ও ফজল এবং জুহদ ও ইবাদতে তিনি তাঁর সময়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। [১]

জায়েদ বিন আলী কুফার কিছু আমিরের প্ররোচনায় ১২২ হিজরিতে খলিফা হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন যা ব্যর্থ হয় এবং জায়েদ বিন আলী এই প্রচেষ্টায় প্রাণ হারান। [২]

মাসলামা বিন আবদুল মালিকের ইন্তেকাল:

১২১ হিজরিতে হিশামের ভাই মাসলামা বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর সময়ের অনেক বড় গাজী এবং মুজাহিদ মানুষ ছিলেন। যাঁর খিদমতের ওপর শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করতে গিয়ে হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন:

“মাসলামার কীর্তিসমূহ প্রসিদ্ধ এবং তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। তাঁর জিহাদি অভিযানসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং দূরদূরান্তের স্থানে জারি ছিল। তিনি কতই না দুর্গ ও এলাকা জয় করেছেন। নিজের সংকল্প ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অনেক রাজপ্রাসাদ ও অঞ্চল পদানত করেছেন। তিনি জিহাদি অভিযান ও বিজয়ের আধিক্য, ইচ্ছাশক্তি এবং রণকুশলতার দিক থেকে তাঁর যুগে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর দৃষ্টান্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি দানশীলতা, বাগ্মিতা, অভিজাত্য, বংশমর্যাদা, দ্বীনদারি এবং পরহেজগারির গুণাবলিতেও সমৃদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।” [৩]

[১] সাদাতগণ সাধারণত সঠিক ইসলামি আকিদা ও মতাদর্শের অধিকারী বরং এর সর্বোত্তম পতাকাবাহী ছিলেন। যদি কিছু সাদাতের কোনো দ্বিমত থাকত তবে তা এতটুকুই যে, তাঁরা হযরত আলী-কে হযরত উসমান-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। জায়েদ বিন আলী-র নিকট হযরত আলী শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সমস্ত সাহাবির চেয়ে উত্তম ছিলেন। তবে বাকি সাহাবিদের মর্যাদা ও অবস্থানও নিজ নিজ স্থানে স্বীকৃত এবং সবাই নিজ নিজ স্থানে সত্যের ওপর ছিলেন। (মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন লি আবিল হাসান আল-আশআরি: ১/৬৯, আত-তানবিহ ওয়ার রাদ্দু আলা আহলিল আহওয়ালি ওয়াল বিদা লি আবিল হুসাইন আল-মালতি আল-আসকালানি, পৃ. ৩৫)

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১২২ হিজরি। জায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহের ঘটনা আমরা সামনে আব্বাসীয় আন্দোলনের অধীনে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১০৩

হিশাম বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু:

বনু মারওয়ানের শেষ মহান শাসক হিশাম বিন আব্দুল মালিক অসুস্থ হয়ে ৬ রবিউস সানি ১২৫ হিজরিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল প্রায় উনিশ বছর আট মাস। তাঁর অবস্থান দামেস্কের পরিবর্তে কিছুটা দূরে “রুসাফা” নামক শহরে ছিল। কবরও সেখানেই। [১]

সীরাত ও বৈশিষ্ট্য

হিশাম বিন আব্দুল মালিক ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ভদ্র, সাহসী, নেককার এবং পরহেজগার মানুষ ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজের সীরাত অনুসরণের চেষ্টা করতেন। মেজাজে ধৈর্য ও সহনশীলতা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। একবার কেউ তাঁকে কটু কথা শোনাতে জবাবে শুধু এতটুকু বললেন: “নিজের শাসককে এমন বলা উচিত নয়।”

এক ব্যক্তিকে অনুরূপ এক পরিস্থিতিতে জবাব দিলেন: “আমাকে এমন বলছ অথচ আমি তোমার খলিফা।”

তাঁর সর্বোচ্চ রাগের বহিঃপ্রকাশ যা বর্ণিত আছে, তা হলো এই যে, কোনো ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন: “চুপ হয়ে যাও, অন্যথায় একটি চাবুক মারব।”

খুব কমই কাউকে ধমক দিতেন। একবার কারো ওপর রাগ এসে গেল এবং কিছু অশোভন শব্দ বলে ফেললেন। সেই ব্যক্তি বলল: “আল্লাহর খলিফা হয়ে এই ধরনের শব্দ বলতে লজ্জা লাগে না?”

হিশাম এটি শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, বললেন: “আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।” সে বলল: “আমি কি এমন শব্দ বলে আপনার মতো নির্বোধ হব?”

হিশাম বললেন: “আচ্ছা এর জরিমানা নিয়ে নাও।”

সে এতেও রাজি না হলে হিশাম বললেন: “আচ্ছা তাহলে আল্লাহর জন্য মাফ করে দাও।”

সে বলল: “হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য মাফ করলাম।”

হিশাম বললেন: “আল্লাহর কসম! ভবিষ্যতে কখনো এমন ভুল করব না।” [২]

জুমার নামাজে উপস্থিত না হওয়ায় শাহজাদাকে তিরস্কার:

সন্তানদের দ্বীনি ফরজ পালনের নির্দেশ দিতেন এবং অবহেলায় যথাযথ তিরস্কার করতেন। একবার তাঁর এক ছেলে জুমার নামাজে শরিক হয়নি। হিশাম জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলল: “সওয়ারি পাওয়া যায়নি।”

হিশাম বললেন: “তবে কি পায়ে হেঁটে যেতে পারতে না?” এই বলে তিনি তার জন্য এক বছর পর্যন্ত সওয়ারি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ২০০/৭ থেকে ২০২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫১/১৩, ১৫২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫৩/১৩

সঙ্গীত থেকে বিরত থাকা - একটি কৌতুক:

গান-বাজনা এবং মদ্যপানের মতো গুনাহ থেকে তিনি কেবল নিজেকে এবং নিজের পরিবারকেই বাঁচিয়ে রাখেননি, বরং সমাজেও এই বিষয়গুলোকে বাড়তে দেননি। এই ধরনের অসার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কিত একটি কৌতুক হলো, একবার সঙ্গীতাসক্ত এক বৃদ্ধকে ধরে আনা হলো। হিশাম বললেন: “এর তানপুরাটি এর মাথার ওপর মেরেই ভেঙে ফেলো।” আদেশ পালন করা হলো এবং বৃদ্ধটি কাঁদতে শুরু করল। হিশামের খাদেম তাকে বলল: “এখন চুপ করো, ধৈর্য ধরো।” সে বলল: “পিটুনির জন্য নয়, আমি এই অবমূল্যায়নের জন্য কাঁদছি যে খলিফা বরবতকে তানপুরা বলেছেন।” [১]

জিহাদের উদ্দীপনা:

হিশামের জিহাদের প্রতি প্রবল উদ্দীপনা ছিল। তিনি সবসময় বাহিনীকে প্রস্তুত ও সক্রিয় রাখতেন। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপারে তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যুদ্ধের খবর শুনতেন। একদিন খোরাসান থেকে আসা এক অফিসার বললেন: “আমরা খবর পেয়েছি যে খাকান জোজজানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা আক্রমণ করে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছি। এরপর আমরা ধাওয়া করতে করতে খাকানের তাঁবুতে প্রবেশ করি এবং তা লুট করি।”

এ কথা শুনেই হিশাম, যিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, সোজা হয়ে বসলেন এবং ব্যাকুল হয়ে বললেন: “কী বললে! তোমরা খাকানের তাঁবুও লুট করেছ?”

অফিসার বললেন: “জি হ্যাঁ।”

হিশাম জিজ্ঞেস করলেন: “তারপর কী হলো?”

অফিসার বললেন: “শত্রুরা তাদের এলাকার দিকে ফিরে গেছে।” [২]

হিশাম এতে অত্যন্ত খুশি হলেন। [৩]

তিনি উলামাদের সাথে উঠাবসা করতেন এবং তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন, ইমাম ইবনে শিহাব আজ-জুহরি তাঁর উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

বুজুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক:

বুজুর্গদের খেদমত করাকে তিনি সৌভাগ্য মনে করতেন। সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর সাথে মাসজিদুল হারামে সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন।” তিনি বললেন: “আল্লাহর ঘরে অন্যের কাছে প্রয়োজন পেশ করতে লজ্জা বোধ হয়।”

যখন সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ. ইবাদত শেষ করে মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন হিশাম তাঁর পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন: “এখন তো আপনি মসজিদের বাইরে। এবার বলুন।” তিনি বললেন: “দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বলব নাকি আখিরাতের?” হিশাম বললেন: “দুনিয়ার।” সালেম বললেন: “আমি দুনিয়া তাঁর কাছেও চাইনি যিনি প্রকৃত মালিক, তাহলে তাঁর কাছে কী চাইব যিনি মালিকই নন।” [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/১৫৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/১২৬

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫/৭১

[৪] আল-মুনতাজাম: ৭/১১৪, ১১৫

একবার আবু হাযিম রহমাতুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো: “হযরত! এই ক্ষমতার মধ্যে থেকে নাজাতের পথ কী?” তিনি বললেন: “কোনো কিছু তখনই গ্রহণ করো যখন তা গ্রহণ করা হালাল হয়। আর তা সেই খাতেই ব্যয় করো যা ন্যায়সঙ্গত।” হিশাম বললেন: “এর পূর্ণ পাবন্দি করার শক্তি আর কার থাকতে পারে?” আবু হাযিম রহমাতুল্লাহ বললেন: “যে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়।” [১]

সেরা অডিট সিস্টেম:

হিশাম বাইতুল মালের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর যুগে আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়ের হিসাব তারিখ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়। এই রেকর্ড এতটাই মজবুত ও সঠিক ছিল যে, বহু বছর পর যখন বনু উমাইয়ার সরকারি রেকর্ড আব্বাসীয় খলিফাদের হাতে পৌঁছাল, তখন তাদের বিশেষজ্ঞরা তা পরীক্ষা করে স্বীকার করেন যে, হিশামের যুগের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার আর্থিক হিসাব আর কোথাও দেখা যায়নি। [২] এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে বাইতুল মালের আয়ে কোনো অবৈধ অর্থ অন্তর্ভুক্ত না হয়, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাজস্বের অর্থ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না চল্লিশ জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে এই অর্থ সম্পূর্ণ বৈধ ও হালাল। [৩]

সারকথা:

হিশামের যুগ বিজয়, নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতির উন্নতি এবং ন্যায়বিচারের দিক থেকে প্রশংসনীয় ছিল। তবে এই যুগে চারশ বিদ্রোহও সংঘটিত হতে থাকে। সিন্ধুতে জয় সিং বিদ্রোহ করেন, মধ্য এশিয়ায় নওমুসলিম তুর্কিরা রুখে দাঁড়ায়। আফ্রিকা ও আন্দালুসে বারবার ও খারেজিরা এক আযাব হয়ে আরবদের গণহারে হত্যা করতে উদ্যত হয়। শিয়ানে আলী এবং বনু আব্বাস তাদের গোপন সদস্য সংগ্রহ শুরু করে এবং তাদের কিছু মুরাব্বি ও নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র বিদ্রোহও করে। কিছু স্থানে বিদ্রোহের পেছনে চীনের থাকানের মতো অমুসলিম শাসকদের হাত ছিল। কিছু স্থানে প্রাদেশিক গভর্নরদের নওমুসলিম বাসিন্দাদের সাথে অশোভন আচরণও উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য কোনো শাসক হলে এতগুলো ফিতনার মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন হতো। কিন্তু হিশাম প্রতিটি স্থানে তা দমন করে ইসলামি রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন।

তবে ফিতনা ও বিদ্রোহের এই ধারাবাহিকতা এটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, পরিস্থিতি বনু মারওয়ানের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে এবং সামান্য অবহেলা ও ত্রুটির কারণে পরিস্থিতির লাগাম হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এই কারণেই হিশামের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন ক্ষমতা দুর্বল শাসকদের হাতে গেল, তখন বনু মারওয়ানের শাসন এত দ্রুত পতনের শিকার হলো যে সাত বছরের মধ্যে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল।

[১] আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ: ৬৭৯/১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: হিজরি ১২৫ সাল

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৮৫, ত নম্বর

ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক (ওয়ালিদ সানি)

রবিউল আখির ১২৫ হিজরি থেকে জমাদিউল আখির ১২৬ হিজরি

ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ

হিশামের মৃত্যুর পর তার ভাতিজা ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ খলিফা হন। বনু মারওয়ানের মধ্যে ওয়ালিদ নামে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা; এজন্য তাকে “ওয়ালিদ সানি” বলা হয়। তার বিলাসপ্রিয়তা ও দুশ্চরিত্রের কারণে কিছু ঐতিহাসিক তাকে “ওয়ালিদ ফাসিক” বলে স্মরণ করেন। তার পিতা ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক ১০৫ হিজরিতে তার মৃত্যুর আগে পর্যায়ক্রমে প্রথমে তার ভাই হিশাম এবং তারপর পুত্র ওয়ালিদের জন্য খেলাফত নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। সে সময় ওয়ালিদের বয়স ছিল প্রায় পনের বছর। [১]

পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার চাচা হিশামের খেলাফতকে মন থেকে মেনে নেননি এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। ফলে রাজনীতিতে তার কোনো অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। তার দিনরাতগুলো অনর্থক অতিবাহিত হতে থাকে।

হিশাম তাকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তার দুশ্চরিত্র বন্ধুদের তার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সংশোধন না হওয়ায় সতর্ক করার জন্য হাতখরচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওয়ালিদ সানির ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। উল্টো চাচার প্রতি তার ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। বিষয়টি এতদূর গড়াল যে, তিনি সিরিয়া ছেড়ে জর্ডানে তার ব্যক্তিগত জায়গিরে চলে যান এবং চাচার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। হিশামের সহচর ইমাম জুহরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে এই অযোগ্য ছেলের উলি আহদি (উত্তরাধিকার) বাতিল করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। অবশেষে হিশামও ভাতিজার সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে এটাই ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তার হায়াত শেষ হয়ে যায় এবং তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন যে, রাষ্ট্রের উলি আহদ হিসেবে একজন অনভিজ্ঞ, সাহসহীন ও উদাসীন ব্যক্তির নাম নির্ধারিত ছিল। [২]

হিশামের ভুল:

এটা স্বীকার করতে হবে যে, দীর্ঘ ও সফল শাসনকাল সত্ত্বেও হিশাম একটি বড় ভুল করেছিলেন যে, নিজের পরে উম্মতের নেতৃত্বের জন্য কোনো উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করেননি। যদিও এই কাজটি তার অনেক আগেই করা উচিত ছিল; কারণ মৃত্যুর কোনো...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫/৩৭১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৬০ থেকে ১৬৩; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫/৩৭১

সময় নির্ধারিত ছিল না। হিশাম এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মারা যান, তখন তার পরে শাসনের জন্য মনোনীত যুবকটি বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

এটা বোঝা কঠিন নয় যে, হিশাম ওয়ালিদের ভুল কর্মকাণ্ড দেখেও তাকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারিত করতে কেন এত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এর কারণ ছিল সেই বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থার নীতি, যা হয়তো কোথাও লিখিত ছিল না, কিন্তু এখন তা রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মর্যাদা লাভ করেছিল। ওয়ালিদকে তার পিতা উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। যদি তার উত্তরাধিকার বাতিল করা হতো, তবে ওয়ালিদের পিতার অনুগত আমীর এবং তার নিকটাত্মীয়রা বিদ্রোহে লিপ্ত হতো; কারণ তারা সবাই ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রীয় সংবিধানকেই মান্য করত। তাই হিশামের চিন্তা মনেই রয়ে গেল এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে অপসারিত করতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর যে কোনো মূল্যে কঠোর প্রয়োজন ছিল যে, সরকারের আমীররা মিলে দ্বিতীয় ওয়ালিদের উত্তরাধিকার বাতিল করে দিতেন এবং উম্মাহর কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে এই উচ্চ পদের জন্য নির্বাচন করতেন, কিন্তু বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি তার প্রভাব দেখিয়ে ছাড়ল। আমীররা দ্বিতীয় ওয়ালিদের শাসনের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে খিলাফতে রাশেদার যুগ বাদ দিলে উম্মাহর পুরো ইতিহাসের এটি একটি বড় ট্র্যাজেডি যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে নেতৃত্বের লাগাম তুলে দেওয়ার কোনো নিয়মিত পদ্ধতি তৈরি করা হয়নি। ইসলাম পরামর্শ (শুরা), সম্মতি, উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব এবং মানুষের মানসিক ঐক্যের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ব্যবস্থা দিয়েছিল, তাকে তার মূল থেকে সরিয়ে একটি সীমিত ও পারিবারিক পরামর্শ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে স্বচ্ছ ও নিরাপদ থাকেনি। এতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং ঘরোয়া স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যেহেতু এই স্বার্থগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে; তাই এই পরিবেশ উম্মাহর মধ্যে সর্বদা বিশৃঙ্খলা, বিবাদ এবং গৃহযুদ্ধের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি সামষ্টিক রাজনৈতিক সচেতনতা কাজে লাগিয়ে অন্তত ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে জন্য পারিবারিক স্বার্থকে পেছনে ফেলে কেবল উম্মাহর কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের পদ্ধতি গঠন করা হতো, তবে আমরা বনু উমাইয়া থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব আলমগীর পর্যন্ত এই ধরনের দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখতে পেতাম না যে, স্থিতিশীল ও মহিমাম্বিত সাম্রাজ্যগুলো কোনো অযোগ্য ব্যক্তির ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই কয়েক বছরের মধ্যে পতনের দিকে ধাবিত হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

ওয়ালিদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি: যোগ্য আমীরদের অপসারণ:

হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পর উম্মাহর ভালো-মন্দের ইখতিয়ার এমন এক ব্যক্তির হাতে চলে এল, যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। সে এমন এক পরিস্থিতিতে শাসনভার গ্রহণ করেছিল যখন বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সবেমাত্র দমন করা হয়েছিল। এই প্রাণান্তকর অভিযানে হিশামের মতো ইস্পাতকঠিন মানুষ এবং তার ডজন ডজন উচ্চাভিলাষী জেনারেলদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল। এখন প্রয়োজন ছিল এই শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশকে টেকসই করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কেবল এবং কেবল জাতির কল্যাণকে বিবেচনায় রাখা।

কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ালিদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘৃণার রাজনীতির খেলা শুরু করে দিল। সে তার চাচার প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ শুরু করে দিল।

...করতে গিয়ে তার সমস্ত নির্ভরযোগ্য আমীরদের এক কলমের খোঁচায় বরখাস্ত করে দিলেন। এরা সেই আমীর ছিলেন যারা বছরের পর বছর ধরে পুরো দেশ সামলে রেখেছিলেন এবং তারা রাজনীতির চড়াই-উতরাই সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এই আমীরদের ওয়ালিদ সানির প্রতি কোনো ভক্তি ছিল না, কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষা এবং খেলাফতের কেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে তারা নীরবে নিজেদের বরখাস্ত হওয়া মেনে নিলেন। তাদের মধ্যে কিছু কর্মকর্তাকে ওয়ালিদ সানি কারারুদ্ধ করলেন। কাউকে কঠোর শাস্তি দিলেন। কেউ নির্জনবাসী বা আত্মগোপন করলেন। ওয়ালিদ সানি তাদের জায়গায় অযোগ্য ও চাটুকার প্রকৃতির লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিলেন। নিজের পরে নিজের দুই ছেলেকে একে একে উত্তরাধিকারী (ওয়ালি-আহদ) নিযুক্ত করলেন। এভাবে পুরো সালতানাতের ব্যবস্থা ওলটপালট হওয়ার কারণগুলো পূর্ণ হয়ে গেল। [১]

আরব গোত্রপ্রীতির প্রসার:

সম্ভবত সালতানাত এই অবস্থায় আরও আধা শতাব্দী পার করে দিত, কিন্তু এই সময়ে ওয়ালিদ সানির কিছু কর্মকাণ্ড আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক গোত্রপ্রীতিকে আরও উসকে দিল। বনু উমাইয়ার অনুগত আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ইয়ামানি আরবদের শক্তি ছিল অনেক বেশি; তাই বনু উমাইয়া তাদের অনেক খাতির-যত্ন করত। হিশাম বিন আব্দুল মালিকও তাদের অনেক সম্মান দিয়েছিলেন।

কিন্তু ওয়ালিদ সানি ইয়ামানি গোত্রগুলোকে উপেক্ষা করে মুদারি আরবদের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করলেন। খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি ছিলেন ইয়ামানি গোত্রগুলোর একজন বিশিষ্ট নেতা, যিনি হিশামের আমলে পনেরো বছর ইরাকের গভর্নর থাকার পর পদচ্যুত এবং পরে গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই সময় কয়েক মাস কারাবাসের পর হিশামের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন এবং জিহাদের জন্য সীমান্তে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ালিদ সানি ক্ষমতা গ্রহণ করেই তাকে গ্রেফতার করে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন ওমরের হাতে সোপর্দ করলেন, যে তাকে কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করল। [২]

ওয়ালিদ সানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ:

এ ধরনের ঘটনার ফলে আরবদের মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষ বাড়তে থাকল। ইয়ামানি গোত্রগুলো ওয়ালিদ সানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং তারা ওয়ালিদ সানির চাচাতো ভাই ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল। অভিযানটি এভাবে পরিচালিত হলো যে, ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ তার দুই-আড়াইশ বিশেষ লোক নিয়ে দামেস্কে পৌঁছালেন। এক রাতে তিনি চল্লিশজন লোক নিয়ে জামে উমাবিতে এশার সালাত আদায় করলেন। এই মসজিদের মেহরাব থেকে একটি দরজা খেলাফত প্রাসাদের দিকে খুলত, যেখান দিয়ে খলিফার যাতায়াত ছিল। সমস্ত মুসল্লি চলে যাওয়ার পর ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ মসজিদের পাহারাদারদের আটক করলেন এবং মেহরাবের দিকের দরজা ভেঙে প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন এবং খুব সহজেই সরকারি কোষাগার ও প্রাসাদ দখল করে নিলেন। অনেক আমীর তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন।

ওয়ালিদ সানি অন্য একটি প্রাসাদে ছিলেন। ইয়াজিদ তাকে ঘেরাও করলেন। ওয়ালিদ প্রথমে বাইরে বেরিয়ে লড়াই করতে থাকলেন, কিন্তু যখন দেখলেন মোকাবিলা করা বৃথা, তখন প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং চিৎকার করে বললেন: “কোনো ভদ্র লোক থাকলে এসে কথা বলো।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৬৫, ১৬৬

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২৬ হিজরি

একজন আমির দরজায় গিয়ে বললেন:

“আপনার সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, কিন্তু আপনার মদ্যপান, আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা এবং ব্যভিচার আমাদের কাছে অসহ্য।”

ওয়ালিদ বললেন: “ভাই! তোমরা সীমা ছাড়িয়ে গেছ। কিছু বেশিই বলে ফেলেছ। আল্লাহ যে হালাল স্বাদগুলো দিয়েছেন তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।”

বিরোধীরা যখন তাকে হত্যা করার জন্য খিলাফত প্রাসাদে প্রবেশ করতে লাগল, তখন সে বলতে লাগল:

“উসমান (রা.) যেভাবে তিলাওয়াত করা অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন, আমি সেভাবেই মরতে চাই।”

একথা বলে সে কুরআন মাজীদ খুলল এবং তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে গেল। এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা ভেতরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করল। এই ঘটনাটি ২৭ জমাদিউল আখিরা ১২৬ হিজরির। ওয়ালিদ সানির শাসনামল এক বছর তিন মাস। তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। [১]

ওয়ালিদ সানি সম্পর্কিত সন্দেহজনক বর্ণনা:

ওয়ালিদ সানির অযোগ্যতা এবং পাপাচারের বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত। এটিও নিশ্চিত যে, বনু মারওয়ানের শাসনকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে তার ভুল সিদ্ধান্ত বরং বোকামিগুলোর বড় ভূমিকা ছিল। তবে তার মন্দ কাজগুলো সম্পর্কে কিছু বর্ণনা অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে ওয়ালিদ সানি তার জুলুম ও ভুল পদক্ষেপের কারণে অত্যন্ত কুখ্যাত হয়ে পড়েছিল এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই তার বিরুদ্ধে ছিল; তাই কিছু বিরোধী পক্ষ প্রতিশোধমূলকভাবে তার সম্পর্কে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার ঘটনাগুলো রটিয়ে দিয়েছিল। যেমন—সে কাবার ছাদে মদ্যপানের ইচ্ছা করেছিল, কুরআন মাজীদের অবমাননা করেছিল, কিছু কুফরি কবিতাও তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এটি ঠিক তেমনই যেমন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সম্পর্কে মাহরাম নারীদের সাথে ব্যভিচারের বর্ণনাগুলো প্রসিদ্ধ করা হয়েছিল। যেহেতু বিরোধিতার পরিবেশ ছিল সাধারণ এবং কুখ্যাত ব্যক্তির সম্পর্কে প্রতিটি মন্দ কথা মেনে নেওয়া হয়; তাই এই বর্ণনাগুলো কোনো দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, কিছু সতর্ক আলেম ও মুহাদ্দিস ওয়ালিদ সানি সম্পর্কে কুফর ও ধর্মহীনতার এই বর্ণনাগুলোকে সঠিক মনে করতেন না। এটি তো প্রমাণিত যে সে একজন ভোগবিলাসী ও অযোগ্য লোক ছিল এবং কিছু মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকত না। কিন্তু তার দিকে কুফর ও জিন্দিক হওয়ার সম্বন্ধ করা সঠিক নয়। তার পক্ষ থেকে তার পুত্রদের উত্তরাধিকারী ঘোষণার জন্য যে ফরমান জারি করা হয়েছিল, তার ইবারত (বাক্য) থেকে স্পষ্ট হয় যে, সে আমলি (ব্যবহারিক) ভাবে পথভ্রষ্ট থাকলেও আকিদাগতভাবে শরিয়তে মুহাম্মদিয়াকেই নাজাতের পথ মনে করত। তার একটি ফরমানে লেখা ছিল: “আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন যে পথভ্রষ্ট ও অবাধ্য হয়ে নেকি ও তাকওয়ার পথ ছেড়ে দেয়। যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, তাতে আল্লাহর আনুগত্যকে আবশ্যক করে নাও।” [২]

সে তার সহচরদের বলত: “সংগীতের শখ কামভাব বৃদ্ধি করে এবং মদের মতো প্রভাব ফেলে। যদি তোমাদের সংগীতের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় তবে নারীদের থেকে দূরে থাকো; কারণ গান হলো ব্যভিচারের মন্ত্র। আমার কাছে সংগীত প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় পানির চেয়েও বেশি সুস্বাদু, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এটাই বলছি; কারণ সত্য কথা এই যোগ্য যে তার অনুসরণ করা হোক।” [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/২৪৬; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৫/৩৭৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২৬ হিজরি

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/২২১

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২৬ হিজরি

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালিদ সানি সঙ্গীত এবং মদ্যপানের মতো কবিরা গুনাহে অবশ্যই লিপ্ত ছিল, কিন্তু সে এই বিষয়গুলোকে গুনাহ হিসেবে স্বীকার করত এবং ব্যভিচারকে এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ মনে করত। সে অবশ্যই গুনাহগার ছিল কিন্তু শরীয়ত অস্বীকারকারী বা নাস্তিক ছিল না।

আববাসীয় আমলের খলিফা মাহদীর সামনে কেউ ওয়ালিদ সানিকে যিন্দিক এবং কাফির বললে মজলিসে উপস্থিত একজন ফকিহ আবু আলা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! ওয়ালিদদের এক বন্ধু, যে তার ব্যক্তিগত মজলিসগুলোতে শরিক থাকত, আমাকে বলেছে যে, ওয়ালিদ পানাহার এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সালাতের সময় হওয়ামাত্রই পোশাক পরিবর্তন করত এবং ভালোভাবে অজু করে সালাত আদায় করত।”

একথা শুনে মাহদী এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন এবং বললেন: “আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন।” [১]

মন্দ কাজের পাশাপাশি তার মধ্যে বদান্যতার গুণটি ছিল সুস্পষ্ট। সে সৈন্য এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিল। অভাবী, অক্ষম এবং পঙ্গুদের দেখাশোনার জন্য সে প্রচুর ব্যয় করত। [২] সে নিজেও একজন সাবলীল কবি ছিল এবং কবিদের অকাতরে পুরস্কার প্রদান করত। [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন: ১২৬ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/২৮৮, ১২৫ হিজরির অধীনে।

[৩] মুরুজুয যাহাব: ৪/৫২, ৫৩; আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়াহ লি ইবনিত তিকতাকা, পৃষ্ঠা ১৩৩, তাবা দারুল কলম বৈরুত।

ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক (ইয়াজিদ আস-সালিস)

জুমাদিউল আখিরা ১২৬ হিজরি... থেকে... জিলহজ ১২৬ হিজরি

এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ... থেকে... অক্টোবর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসা তার চাচাতো ভাই ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ নেক চরিত্র, সাদাসিধে স্বভাব এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি ইয়াজিদ নামধারী তৃতীয় খলিফা ছিলেন; এজন্য তাকে ‘ইয়াজিদ আস-সালিস’ বলা হয়। তিনি ওয়ালিদের প্রবর্তিত সরকারি ব্যয়ের অপচয় বন্ধ করেন এবং বেতন কমিয়ে দেন, এই কারণে বিরোধীরা তাকে ‘ইয়াজিদ আন-নাকিস’ বলতে শুরু করে। উমাইয়াদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজের সাথে তার নাম নেওয়া হয়। [১]

তার নীতি তার প্রথম ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়, যাতে তিনি বলেছিলেন:

“যতক্ষণ পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা এবং অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ না হবে, ততক্ষণ আমি কোনো নতুন ইমারত নির্মাণ করব না এবং কোনো নতুন খাল খনন করব না। আমি অভাবীদের জন্য আমার দরজা কখনো বন্ধ করব না। তোমাদের ভাতা ও রেশন যথারীতি তোমাদের দেওয়া হবে। অধিকারের ক্ষেত্রে দূর ও নিকটের লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। আমি যা বলেছি যদি তা পালন করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যিক। যদি আমি তা না করি, তবে তোমরা আমাকে পদচ্যুত করো। যদি তোমরা কোনো নেক ও সৎ লোক পাও যে এই বিষয়গুলো মেনে চলার অঙ্গীকার করে এবং তোমরা তার হাতে বায়াত হতে চাও, তবে আমিই সবার আগে তার হাতে বায়াত হব।” [২]

ঐতিহাসিক ইবনুল তিকতাকা ইয়াজিদ আস-সালিসের এই ভাষণ উদ্ধৃত করে বলেন:

“সেই সময়ের তুলনায় এবং সেই যুগের পরিভাষায় এই বক্তব্যটি ছিল চমৎকার; কারণ সেই লোকদের কাছে নেতৃত্বের জন্য এগুলো নির্ভরযোগ্য গুণ হিসেবে গণ্য হতো। আর আজকের কথা বলতে গেলে, যদি কোনো বাদশাহ এই বলে গর্ব করেন যে তিনি কোনো খাল খনন করেননি এবং কোনো নির্মাণ কাজ করেননি এবং তার প্রজাদের আহ্বান জানান যে তারা যেন তার পরিবর্তে অন্য কাউকে নিযুক্ত করে, তবে মানুষ এমন ব্যক্তিকে নির্বোধ মনে করবে।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/১৯১, ১৯২

[২] আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়াহ লি ইবনিত তিকতাকা, পৃ. ১৩৪

“তদারককারী লোকদের পরিভাষায় এটিই উপযুক্ত ছিল যে, শাসক অন্য কারো হাতে শাসনভার অর্পণ করবেন।” [১]

ইয়াজিদ সালিহ কর্তৃক পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসা সময়ের প্রয়োজন হলেও তা ছিল মূলত বিদ্রোহ। আর বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না কেন, এর বড় ক্ষতি হলো জনগণের অন্তর থেকে শাসকদের মর্যাদা উঠে যায়। অধীনস্থ আমিরদের মধ্যেও ভবিষ্যতে শাসকদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ এবং বিদ্রোহ করার সাহস সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ওয়ালিদ সানি-এর হত্যাকাণ্ডে গোত্রীয় গোঁড়ামিও কার্যকর ছিল। ইয়াজিদ সালিহ ইয়ামেনি গোত্রগুলোর মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু হওয়া ওয়ালিদ, যিনি নিজের শাসনকালে প্রতিটি স্তরেই কুখ্যাত ছিলেন, হত্যার পর নিজের গোত্রের কাছে মজলুম হয়ে যান। ফলে অধিকাংশ কুরাইশ ও উমাইয়া নেতৃবৃন্দ নতুন শাসকের বিরুদ্ধে চলে যান। হিমস, ফিলিস্তিন এবং জর্ডানে বিদ্রোহ দেখা দেয়, যা সরকারি বাহিনী অত্যন্ত কষ্টে দমন করে।

কিন্তু এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই কিছুদিনের মধ্যে আল-জাজিরার উমাইয়া গভর্নর মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিদ্রোহ করে বসেন। ইয়াজিদ সালিহ তাকে মসুল ও আজারবাইজানের শাসনভার প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে পুনরায় আনুগত্যে রাজি করান। ইয়াজিদ সালিহ মাত্র ছয় মাস শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন এবং ২০ জিলহজ ১২৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল ৪৬ বছর। [২]

[১] আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়াহ লি ইবনিত তিকতাকা, পৃ. ১৩৪, ১৩৫।

এটিও স্পষ্ট যে, খুলাফায়ে রাশেদার পর শাসকদের মেজাজে এই পরিবর্তন উমর বিন আব্দুল আজিজের আদর্শ চরিত্রের কারণে প্রকাশ পেয়েছিল, অন্যথায় তাদের আগে বনু মারওয়ানের শাসকদের মধ্যে এই গুণাবলি ছিল না, বরং শক্তির জোরে শাসনের রূপটিই বেশি স্পষ্ট ছিল।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/১৯১, ১৯২; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২৬ হিজরি; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৮৯, তবা নজার।

ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক

যিলহজ ১২৬ হিজরী হতে সফর ১২৭ হিজরী

অক্টোবর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

ইয়াজিদ আস-সালিস (তৃতীয়)-এর পর তার ভাই ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে তার খিলাফত ছিল কেবল নামমাত্র। সাধারণত তার খিলাফতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

তিনি খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই আল-জাজিরার গভর্নর মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তার দাবি ছিল যে, ওয়ালিদ আস-সানি (দ্বিতীয়)-এর পুত্রদের মুক্তি দেওয়া হোক যাদের ইয়াজিদ আস-সালিস গ্রেপ্তার করেছিলেন। এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং মারওয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করেন। তিনি কিনাসরিন ও হিমস দখল করে সরাসরি দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন।

ইব্রাহিম সুলাইমান বিন হিশামকে এক লক্ষ সৈন্য দিয়ে মোকাবিলার জন্য পাঠান। সফর ১২৭ হিজরীতে সরকারি বাহিনী এবং মারওয়ানের সমর্থকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে সরকারি বাহিনী পরাজিত হয়।

এই সময়ে সিরীয় আমীররা একটি বোকামি করেন যে, ওয়ালিদ আস-সানি-এর গ্রেপ্তারকৃত দুই পুত্রকে হত্যা করে ফেলেন যাতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্য থেকে কারো খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

এদিকে মারওয়ান আক্রমণ চালিয়ে দামেস্কে পৌঁছে যান। ইব্রাহিম শহর থেকে পালিয়ে যান। মারওয়ান সহজেই রাজধানী দখল করে নেন। সফর ১২৭ হিজরীতে ইব্রাহিমের পদচ্যুতির ঘোষণা দেওয়া হয়। তার শাসনকাল দুই মাসও পূর্ণ করতে পারেনি।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২৬, ১২৭, ১২৭ হিজরী সংস্করণ; তারিখুল খুলাফা: পৃষ্ঠা ১৮৯।

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান (মারওয়ান সানি)

সফর ১২৭ হিজরী থেকে জিলহজ ১৩২ হিজরী

ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ (মারওয়ান সানি) একজন পরিপক্ব বয়সের, অভিজ্ঞ এবং সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি উদারতা প্রদর্শন করে পূর্ববর্তী শাসক ইবরাহিমকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং তার সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি।

মারওয়ান যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মারওয়ান পাঁচ বছর দশ মাস শাসন করেন এবং এই সময়ে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তার কঠোর পরিশ্রম ও সহনশীলতার কারণে মানুষ তাকে হিমার (গাধা)-এর সাথে তুলনা করতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে বিরোধীরা এই অশোভন শব্দটি বিদ্রূপাত্মকভাবে তার নামের অংশ বানিয়ে দেয়।

যা-ই হোক, অবনতিশীল পরিস্থিতির উত্তাল ঢেউয়ের সামনে বাঁধ দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারওয়ান বিন মুহাম্মদের মাধ্যমেই বনু উমাইয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটে। তার শাসনামলে পরিস্থিতির অবনতি এবং রাষ্ট্রের দুর্বলতার চারটি প্রধান কারণ ছিল:

- অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা যা বিদ্রোহী আমীর এবং খারেজিদের রূপে আত্মপ্রকাশ করছিল।
- ইয়ামানি ও মুদারি গোত্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা যা গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছিল।
- স্বয়ং বনু উমাইয়া পরিবার এবং বনু মারওয়ানের আমীরদের মধ্যে মতপার্থক্য ও আস্থার অভাব।
- বনু হাশিমের গোপন দাওয়াত যা দেশকে একটি বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার কথা বলতে গেলে, তাকে সর্বপ্রথম সিরিয়ার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মারওয়ান মুদারি গোত্রগুলোর সমর্থক ছিলেন, অন্যদিকে সিরিয়ায় ইয়ামানি গোত্রগুলোর আধিক্য ছিল। তারা সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে তার বাইয়াত করতে অস্বীকার করে। মারওয়ান প্রতিটি স্থানে সৈন্য পাঠিয়ে তলোয়ারের জোরে এই বিদ্রোহীদের দমন করেন।

কিছুকাল পর এই বিদ্রোহীরা খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পুত্র সুলাইমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাদের সংখ্যা ৭০ হাজারে পৌঁছে যায়। মারওয়ান খাসাফ নামক স্থানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন। [১]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৩৩৯, ১২৭ হিজরী।

কিছুকাল পরেই ইরাকে দাহহাক বিন কায়েস নামক এক বড় যুদ্ধবাজ খারেজি সর্দার বিদ্রোহ করে এবং কুফা দখল করে নেয়। বেশ কয়েক মাস ধরে সে সরকারি বাহিনীর জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সে বিজয়ী হতে হতে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। হাররান নামক স্থানে মারওয়ান নিজেই তার মোকাবিলা করেন। এই যুদ্ধে দাহহাক নিহত হয় এবং তার অবশিষ্ট বাহিনী দুই-তিনটি ছোট ছোট যুদ্ধের পর ইরাকের দিকে পিছু হটে। মারওয়ানের সেনাপতিরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং ইরাকের সর্বত্র তাদের তলোয়ারের নিচে ফেলে নির্মূল করে দেয়।

কিছুকাল পর আবু হামজা নামক আরেক খারেজি সর্দার মক্কা মোয়াজ্জমা দখল করে নেয় এবং তারপর মদিনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হয়। মদিনাবাসী বাইরে এসে তার মোকাবিলা করে কিন্তু এমন পরাজয় বরণ করে যে মদিনার সম্ভবত কোনো ঘরই নিহতদের থেকে খালি ছিল না। আবু হামজা মদিনা দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। মারওয়ান তার অগ্রযাত্রা থামানোর জন্য চার হাজার সৈন্য পাঠান যারা আবু হামজাকে পরাজিত করে হিজাজকে তাদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করে। এই অভিযানে আবু হামজাও নিহত হয়। খারেজিদের সাথে এই যুদ্ধগুলো মারওয়ানের সিংহাসন আরোহণের সাথে শুরু হয়েছিল এবং তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল। [১]

যাই হোক, এই যুদ্ধগুলো সরকারের জন্য নতুন কিছু ছিল না; কারণ পূর্ববর্তী সকল খলিফাকেই এমন অভ্যন্তরীণ অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আসল বিপদ যা বনু মারওয়ানের শিকড় কেটে ফেলেছিল, তা ছিল বনু হাশিমের আন্দোলন, যার বিবরণ বিস্তারিতভাবে সামনে পেশ করা হচ্ছে।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৩৩১ থেকে ৩৫৮, হিজরি ১২৭ থেকে ১৩০।

বনী হাশিমের দাওয়াতের ইতিবৃত্ত..... কিছু মৌলিক কথা

বনু উমাইয়ার যুগে শাসকদের জুলুম-অত্যাচার এবং ভীতি প্রদর্শনের ফলে সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ হতোদ্যম ও স্বার্থপর হয়ে পড়েছিল। যোগ্য, সত্যবাদী, আমানতদার ও মুত্তাকী ব্যক্তির দ্বারা ধীরে ধীরে সরকারি পদ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। অন্যদিকে সাধারণ জনগণও সরকারের ভালো-মন্দের সাথে সম্পর্ক রাখা বা তাদের সংশোধন করা ছেড়ে দেয়। তারা একের পর এক একই পরিবারের লোকদের সিংহাসনে আরোহণের দৃশ্য দেখার জন্য রয়ে গিয়েছিল। ইসলামের বিশাল পরামর্শভিত্তিক (শুরা) ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বনী হাশিমের কিছু লোক বনু উমাইয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করে। যেহেতু বিপুল সংখ্যক মানুষ বনু উমাইয়ার বংশানুক্রমিক শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, তাই এই আন্দোলন খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিছু লোক বনু উমাইয়া ও বনী হাশিমের মধ্যে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বিরোধ অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বনী হাশিম (অর্থাৎ বনু আব্বাস বা বনু ফাতিমা) কখনোই কোনো আন্দোলন পরিচালনা করেনি। একইভাবে তারা আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়টিও পুরোপুরি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, কোনো রক্তপাত ছাড়াই বনু আব্বাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বনু উমাইয়ার নেতাদের কোনো ক্ষতি করা হয়নি।

এটা ঠিক যে, বনী হাশিম ও বনু উমাইয়ার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কিছু কথা অতিরঞ্জন ও জালিয়াতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, একইভাবে আব্বাসী খিলাফতের বর্ণনায় বনু উমাইয়ার ওপর অত্যাচারের কাহিনীতেও নিশ্চিতভাবে কিছু অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে জালিয়াতির কারিশমা বলে অস্বীকার করাও কোনো ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি নয়। একটি বিপ্লব যা চীন সীমান্ত থেকে আন্দালুস পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল খিলাফতকে কয়েক বছরের মধ্যে গুটিয়ে দেয়, তা কোনো অসাধারণ আন্দোলন, শক্তি ও উপায়-উপকরণ, ব্যাপক জনমত গঠন এবং কঠোর সংগ্রাম ছাড়া সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বিষয়গুলো খোদ আব্বাসী খলিফাদের যুগে সংকলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। কিছু লোক বনু উমাইয়ার দোষত্রুটিগুলো পুরোপুরি অস্বীকার করে বলেন যে, তাদের যুগের সমস্ত ঘটনাবলী তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দল বনু আব্বাসের শাসনামলে সংকলিত হয়েছে; তাই তাদের বিরুদ্ধে লিখিত সমস্ত বর্ণনা মিথ্যা। প্রথমত, এই কথাটি সঠিক নয়। মানছি যে বনু উমাইয়ার কিছু দোষত্রুটি মনগড়া এবং এই কারণেই আমরা উমাইয়া যুগের ঘটনাবলীতে বর্ণনাগুলো বিশেষভাবে যাচাই-বাছাই করেছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সেই যুগের সমস্ত লেখকই কেনা গোলাম ছিলেন না যে তারা সবকিছু তাদের (আব্বাসীদের) ইচ্ছা অনুযায়ী বানিয়ে লিখতেন। যদি এমন হতো তবে আবার বনু উমাইয়ার...

খলিফাদের বিজয়সমূহ এবং তাদের কোনো গুণের উল্লেখ সেই ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে পাওয়া যায় না যা বনু আব্বাসের যুগে সংকলিত হয়েছে। বনু আব্বাসের যদি আলেমদের কলমের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকত, তবে উমর বিন আব্দুল আজিজের ব্যাপারেও দোষ-ত্রুটি বানিয়ে পেশ করা হতো। কিন্তু আমরা দেখি যে, বনু আব্বাসের যুগে সংকলিত ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে তাঁর সম্পর্কে একটিও নেতিবাচক বাক্য বর্ণিত নেই। ওয়ালিদের বিজয়সমূহ পূর্ণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে আব্দুল মালিকের রাজনৈতিক দক্ষতা এবং আত্মমর্যাদা ও বীরত্ব, সুলাইমানের আভিজাত্য ও দানশীলতা এবং হিশামের সহনশীলতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই উৎসগুলোর মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই এটি বলা সঠিক নয় যে, বনু আব্বাসের যুগের সমস্ত ঐতিহাসিক উৎস শিয়া বর্ণনায় ভরপুর।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সময়কালে তৎকালীন সময়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। তাই আব্বাসী খলিফারা তাদের যুগে সেগুলো সংকলন ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রদান করেননি। তারপর আমাদের সামনে ইতিহাসের একটি এমন বই ‘আনসাবুল আশরাফ’ বিদ্যমান রয়েছে, যা আব্বাসী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের দরবারের বিশেষ ব্যক্তি আল-বালাজুরি (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি) সংকলন করেছেন। বালাজুরি নিজে একজন আহলে সুন্নাত ঐতিহাসিক ছিলেন এবং সাবায়ি আন্দোলনের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তাই আব্বাসী আন্দোলনের অপ্রীতিকর ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ‘আনসাবুল আশরাফ’-এর ওপর অন্য যেকোনো উৎসের তুলনায় বেশি আস্থা রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ইবনে জারির তাবারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) ইতিহাস। এটিও আব্বাসী যুগে সংকলিত সবচেয়ে বিখ্যাত ইতিহাস। ইমাম তাবারি দরবারি ঐতিহাসিক ছিলেন না। সুতরাং বনু আব্বাসের গুণাবলি ও ত্রুটি উভয় বিষয়েই তারিখুত তাবারির উপকরণের ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে, যদি না কোনো বর্ণনা অনির্ভরযোগ্য হয় অথবা অন্য কোনো বর্ণনার সাথে বিরোধের কারণে সন্দেহজনক হয়ে পড়ে কিংবা অন্য কোনো শক্তিশালী প্রমাণ সেই বর্ণনাকে দুর্বল করে দেয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা উমাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে বনু হাশিমের আন্দোলন ও বিপ্লবের যে বিবরণ পেশ করছি, তাতে মূলত ‘আনসাবুল আশরাফ’ এবং ‘তারিখুত তাবারি’-র ওপর নির্ভর করা হয়েছে, যেগুলোতে এই আন্দোলনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও তৃতীয় হিজরি শতকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ‘আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া’ থেকেও কিছুটা সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এটিও আব্বাসী খলিফাদের যুগে সংকলিত একটি দলিল।

অবশিষ্ট উপকরণ হাফেজ জাহাবি (রহ.)-এর ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’ এবং ‘তারিখু দিমাশক’ থেকে নেওয়া হয়েছে। হাফেজ জাহাবি (রহ.) রিজাল শাস্ত্রের ওপর গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন একজন আলেম ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’-তে তিনি উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করেছেন। তাই এর ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে। ‘তারিখু দিমাশক’-এ সহিহ ও জয়িফ সব ধরনের উপকরণই বিদ্যমান রয়েছে; তবে আমরা সর্বত্র উদ্ধৃতি দেওয়ার নিয়ম মেনে চলেছি। তাই যদি ইলমে রিজালের বিশেষজ্ঞগণ রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো সাবায়ি বা মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীর প্রতি সন্দেহের ইঙ্গিত দেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তাদের কথার গুরুত্ব থাকবে। তবে কেবল নিজের রুচি বা প্রত্যাশার পরিপন্থী দেখে কোনো গবেষণা ছাড়াই তাকে ‘সাবায়ি প্রভাবিত’ মনে করা সঠিক হবে না।

বনু হাশিমের বিপ্লবী দাওয়াত

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুতে শিয়ানে আলীর মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে দলাদলি হয়ে গিয়েছিল। একটি দল যায়েদ বিন আলী (রা.)-এর ভক্ত ছিল। অন্যটি তাঁর ভাই হযরত বাকের (রা.)-এর অনুসারী ছিল। তাঁরা উভয়েই হযরত হুসাইন (রা.)-এর আপন নাতি এবং প্রথম সারির আলেম ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই যুগে এমন কিছু লোকও আত্মপ্রকাশ করেছিল যারা বনু ফাতিমার ভালোবাসার আড়ালে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। এই যুগের ইতিহাসে শিয়ানে আলীর একজন সমর্থক সরদার হারিস বিন শুরাইজ-এর নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যিনি ১১৬ হিজরিতে খোরাসানে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি কালো পোশাককে প্রতীক বানিয়ে মানুষকে সাদাতদের হাতে বায়াত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং উত্তর আফগানিস্তানের ফারিয়াব অঞ্চলে চার হাজার সশস্ত্র লোক একত্রিত করেছিলেন। বলখের শাসক নাসর বিন সাইয়ারকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর হারিস বিন শুরাইজের সৈন্যসংখ্যা ষাট হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল। অবশেষে বনু উমাইয়ার একজন আমির আসিম বিন আব্দুল্লাহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ১২৭ হিজরিতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। [১] এই বিদ্রোহের পেছনে বনু ফাতিমার বুজুর্গদের: হযরত মুহাম্মদ বাকের বা জাফর সাদিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কোনো হাত ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দলটি ছিল তারা যারা সাদাতদের প্রতি ভক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে এতটাই অতিরঞ্জন করত যে, হযরত আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সহ পূর্ববর্তী সকল খলিফাকে জালেম ও জবরদখলকারী সাব্যস্ত করত। এই দলের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে সচেতন বা অবচেতনভাবে সাবায়ী আন্দোলনের জন্য কাজ করছিল এবং শিয়ানে আলীর সাথে মিশে গিয়ে তাদের বারবার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উসকে দিত। এই যুগের ইতিহাসে এই দলের কোনো নেতার নাম উল্লেখ নেই। এর কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, তাদের নেতৃত্ব ছিল গোপন হাতে। তবে প্রকাশ্যভাবে এই লোকেরা সাদাত কেলামকেই নিজেদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করত।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর নাতি যায়েদ বিন আলী রাজনৈতিক দিক থেকে বনু উমাইয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, খেলাফত বনু হাশিমের বুজুর্গদের পাওয়া উচিত। তবে এটি প্রমাণিত যে, তিনি এবং সমস্ত শীর্ষস্থানীয় সাদাত চরমপন্থী শিয়াদের (সাবায়ীদের) ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বিমুখ ছিলেন। যায়েদ বিন আলী বলতেন: “আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কৃতজ্ঞ বান্দাদের ইমাম ছিলেন।” তিনি আরও বলতেন: “আবু বকর (রা.)-এর প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করা হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিমুখতা প্রকাশের সমতুল্য।” [২] হিশামের শেষ দিনগুলোতে একটি ঘটনার কারণে যায়েদ বিন আলী (রা.) হঠাৎ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

[১] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযি: ৭/১৬৯

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫/৩৯০

বিদ্রোহের কারণসমূহ:

ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছুকাল আগে ইরাকের গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরিকে বরখাস্ত করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। গ্রেফতারের পর যখন তার কাছে সরকারি কোষাগারের হিসাব চাওয়া হলো, তখন সে মিথ্যা করে বলে দিল যে, আমি হযরত যায়েদ বিন আলীর কাছে আমানত হিসেবে প্রচুর সম্পদ রেখেছি। একই ভুল তথ্য সে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের পৌত্র দাউদ বিন আলী সম্পর্কেও দিয়েছিল। খালিদ বিন আব্দুল্লাহর ছেলে ইয়াজিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে এই অভিযোগে অতিরিক্ত এই অংশটুকুও যোগ করে দিল যে, এই সাদাতগণ বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এই খবর খলিফা হিশামের কাছে পৌঁছাল। তিনি মদিনার গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যেন এই দুই ব্যক্তিকে দামেস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মদিনার গভর্নর তাঁদের ডেকে পুরো বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা কসম খেয়ে এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করলেন। গভর্নর বললেন: “আপনারা আমার কাছে সত্যবাদী। কিন্তু খলিফা আপনাদের তলব করেছেন, তাই আপনাদের সেখানে যাওয়া জরুরি।”

তাঁরা দামেস্কে পৌঁছালেন। হিশাম বিন আব্দুল মালিক তাঁদের কাছে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলেন। দাউদ বিন আলী বললেন: “বিষয়টি কেবল এতটুকুই ছিল যে, আমি খালিদ বিন আব্দুল্লাহর কাছে ইরাকে গিয়েছিলাম। সে আমাকে উপহার হিসেবে এক লক্ষ দিরহাম দিয়েছিল। সে আমানত হিসেবে কোনো সম্পদ রাখেনি।”

এবার হিশাম হযরত যায়েদ বিন আলী (রা.)-এর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন: “শুনেছি যে আপনি খেলাফত লাভ করতে চান।” যায়েদ বিন আলী (রা.) বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! আপনার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তা সঠিক নয়।” হিশাম বললেন: “আমার মনে হয় বিষয়টি এমনই।” হযরত যায়েদ বিন আলী (রা.) বললেন: “আমি কসম খেতে প্রস্তুত।” হিশাম বললেন: “কসম খেলেও বিশ্বাস করতে পারছি না।” যায়েদ বিন আলী (রা.) বললেন: “আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সম্মান কমিয়ে দেন যে তাঁর নামের কসমকে বিশ্বাস করে না।”

এ কথা শুনে হিশাম নরম হয়ে গেলেন। তিনি আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না এবং বললেন: “আপনারা যেতে পারেন।” হযরত যায়েদ বিন আলী (রা.) এই জিজ্ঞাসাবাদের কারণে অবশ্যই মনঃক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাই হিশামের কাছ থেকে বের হওয়ার সময় বললেন: “সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত যে জীবনকে প্রাধান্য দেয়।” [১]

হিশাম বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার করার জন্য তাঁদের ইরাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেখানকার গভর্নর ইউসুফ বিন ওমরকে লিখলেন: “এই ব্যক্তিরা আমার সামনে নিজেদের নির্দোষিতার সপক্ষে কসম খেয়েছেন। আমি তাঁদের কসম বিশ্বাস করে তাঁদের নির্দোষ ঘোষণা করেছি। এখন আমি তাঁদের তোমার কাছে এই জন্য পাঠাচ্ছি যেন তাঁদের খালিদ বিন আব্দুল্লাহর সামনে বসানো হয়, যাতে তাঁরা তার মুখের ওপর তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারেন।”

[১] তারিখ দামেস্ক: ১৯/৪৬৬, ৪৬৭

এই ব্যক্তির যখন কুফায় গেলেন, তখন ইউসুফ বিন উমর তাদের সম্মান ও আপ্যায়ন করলেন এবং খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে তাদের সামনে বসিয়ে বললেন:

“আমীরুল মুমিনীনের এই চিঠি বিদ্যমান আছে যে, এই ব্যক্তিদের শপথের ওপর আস্তা রেখে আমীরুল মুমিনীন তাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন যদি তোমাদের কাছে তোমাদের অভিযোগের কোনো সাক্ষী থাকে তবে পেশ করো।”

খালিদ কোনো সাক্ষী পেশ করতে পারলেন না। এভাবে পুরোপুরি প্রমাণিত হলো যে অভিযোগগুলো মিথ্যা ছিল। ইউসুফ বিন উমর খালিদ বিন আব্দুল্লাহকে তিরস্কার করলেন এবং এই ব্যক্তিদের নির্দোষ ঘোষণা করলেন।

বিষয়টি সুন্দরভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল, কিন্তু কুফার শিয়ানে আলী এই সুযোগে সাদাতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আরেকটি রক্তক্ষয়ী ইতিহাস রচনা করল। হযরত যায়েদ বিন আলী এরপরেও কয়েক সপ্তাহ কুফায় অবস্থান করেন। এই সময়ে শিয়ানে আলী তার সাথে দেখা করতে থাকে। তারা শীর্ষস্থানীয় সাদাতদের তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নেওয়ার সরকারি আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিজেদের জান ও মালের খেদমত পেশ করে এবং এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তিনি নির্দেশ দিলে সরকারের পতন ঘটানো কোনো কঠিন কাজ নয়। [১]

অধিকাংশ শিয়ানে আলী এই প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে দিয়েছিল, তবে অনিষ্টকারী শিয়া উপাদানগুলো বলল:

“আমরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, আপনি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর এর প্রতি গালিগালাজ করবেন।”

হযরত যায়েদ বিন আলী বললেন: “না, বরং আমি তো তাদের ভালোবাসি।”

চরমপন্থী শিয়া উপাদানগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং এই বলে আলাদা হয়ে গেল:

“যদি আপনার এই আকিদা হয়, তবে আমরা আপনার থেকে রফয (বিমুখতা) প্রকাশ করছি।” [২]

এভাবে রাফেযীরা প্রথমবারের মতো এত স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হলো যে তাদের দলকে বাকি শিয়ানে আলী থেকে আলাদা হতে হলো।

শিয়ানে আলী তিন দলে বিভক্ত:

এখন শিয়ানে আলীর মধ্যে তিনটি স্পষ্ট দল তৈরি হলো:

১. রাফেযী

২. যায়দিয়া

৩. শিয়ানে বনু ফাতিমা বা আলভী

১. হযরত আবু বকর ও উমর এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী এবং হযরত যায়েদ বিন আলী ও অন্যান্য শিয়ানে আলীর প্রতি বিমুখতা প্রকাশকারী দলটি ‘রাফেযী’ নামে পরিচিত হলো।

২. শিয়ানে আলীর যে সকল লোক হযরত যায়েদের সমমনা এবং তার সশস্ত্র সংগ্রামের অবস্থানের ওপর অটল থাকল তারা ‘যায়দিয়া’ নামে পরিচিত হলো। এই দলের লোক এখনো কিছু মুসলিম দেশে বিদ্যমান। শিয়া ফেরকাগুলোর মধ্যে এটি একটি মধ্যপন্থী দল, আহলে সুন্নাতের সাথে এর প্রধান মতপার্থক্য দুটি বিষয়ে: প্রথমটি হলো যায়দিয়ারা ফাসেক ও জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে। আহলে সুন্নাতের মাযহাব এটি নয়।

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/১৬৬, ১৬৭, ১৬৮

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৫/৩৯০

দ্বিতীয়ত এই যে, জাইদিয়াদের নিকট হযরত আলী (রা.) সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আহলে সুন্নাতের নিকট তাঁর স্থান হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর পরে। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন:

“এই জামাতের এই আকিদা সঠিক যে, হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আর তাদের এই আকিদা বাতিল যে, হযরত আলী (রা.) এই দুই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” [১]

৩. শিয়ানে আলীর তৃতীয় জামাত সেটি ছিল যারা হযরত বাকের এবং হযরত জাফর সাদিকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে (খুরুজ) শরিক হয়নি। এই ব্যক্তিগণ শিয়ানে বনু ফাতিমা বা আলভী নামে পরিচিত ছিলেন। রাফেজিদের থেকে তারাও অসন্তুষ্ট ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে তাদের আকিদা তাই ছিল যা হযরত জায়েদ বিন আলীর ছিল। হযরত জাফর সাদিককে কেউ একজন বলল:

“রাফেজিরা আপনার চাচা জায়েদ বিন আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে।”

তিনি বললেন: “তাদের প্রতি যারা অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে, আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের সবার চেয়ে বেশি কুরআন মাজীদে কারী, দ্বীনের ফকীহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় (সিলাহ রেহমি) অভ্যস্ত ছিলেন। এখন এমন কে আছে যে তাঁর মতো হবে।” [২]

শিয়ানে আলী জায়েদ বিন আলীকে বিদ্রোহের (খুরুজ) জন্য প্ররোচিত করে:

কুফায় কিছু দিন অতিবাহিত করে জায়েদ বিন আলী (রহ.) মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। শিয়ানে আলী তাঁর পিছু পিছু এল এবং উজাইব-এর নিকট পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত জোরাজুরির সাথে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে লাগল। তারা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল: “আপনি পুনরায় ফিরে চলুন। ইরাকের গভর্নর ইউসুফের কোনো গুরুত্ব নেই। আমরা আপনাকে কুফা দখল করে দেব।” [৩]

জায়েদ বিন আলীকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করেন:

ভাগ্যের লিখন যে, জায়েদ বিন আলী (রহ.) তাদের কথায় বিশ্বাস করে বিদ্রোহের জন্য কোমর বেঁধে নিলেন। আব্দুল্লাহ ٱ আব্বাস (রা.)-এর নাতি দাউদ বিন আলী যিনি মদিনা থেকে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন:

“এই লোকদের কথায় ধোঁকা খাবেন না। আহলে বাইতের ইতিহাসে আপনার জন্য শিক্ষার যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। আপনার প্রপিতামহ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তারা কেমন আচরণ করেছিল। হযরত হাসান (রা.)-কে আহত করেছিল। এমনকি তাঁর তাঁবু পর্যন্ত লুট করেছিল। আপনার দাদা হযরত হুসাইন (রা.)-কে কসম দিয়ে ডেকে এনেছিল এবং তাঁকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং শহীদ করে তবেই দম নিয়েছে।”

হযরত জায়েদ বিন আলী (রহ.) হয়তো তাঁর চাচাতো ভাইয়ের কথায় চিন্তা-ভাবনা করতেন কিন্তু শিয়ানে আলী যারা সাথেই বসে ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল:

“হযরত! এরা চায় আপনি যেন বিজয়ী না হন। এরা মনে করে যে সরকারের ওপর তাদের (বনু আব্বাস) অধিকার বেশি।”

দাউদ বিন আলী, জায়েদ বিন আলীকে বোঝাতে সক্ষম না হয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং জায়েদ বিন আলী কুফায় ফিরে গেলেন। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০৭/১৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৯০/৫

[৩] তারিখে দামেশক: ৪৭৮/৯

[৪] তারিখে তাবারী: ১৬৯/৭

কুফায় চল্লিশ হাজার লোক তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করল। তবে শহরের দূরদর্শী ব্যক্তির তাকে এই পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

আলীর অনুসারীদের (শিয়ান-ই-আলী) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সালামা বিন কুহাইল (রহ.), যিনি সত্যবাদী শিয়া মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য হন, তিনি আসলেন এবং বললেন:

“শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার কাছে কতজন লোক বায়াত গ্রহণ করেছে?” তিনি বললেন: “চল্লিশ হাজার।”

সালামা জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার দাদা (হযরত হসাইন রা.)-এর কাছে কতজন লোক বায়াত গ্রহণ করেছিল?” তিনি বললেন: “৮০ হাজার।”

সালামা জিজ্ঞাসা করলেন: “তাঁর সাথে অবস্থানকারী কতজন ছিল?” তিনি বললেন: “প্রায় তিনশ।”

সালামা জিজ্ঞাসা করলেন: “শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার দাদা শ্রেষ্ঠ ছিলেন নাকি আপনি?” তিনি বললেন: “আমার দাদা।”

জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার সময়কাল উত্তম নাকি আপনার দাদার সময়কাল উত্তম ছিল?” বললেন: “আমার দাদার সময়কাল।”

সালামা বললেন: “তারপরেও আপনি এই লোকদের কাছ থেকে আনুগত্যের আশা করছেন, অথচ তারা আপনার দাদার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!!”

যায়েদ বিন আলী (রহ.) বললেন: “এখন তো বায়াত হয়ে গেছে। তা আমার ওপর এবং তাদের ওপর আবশ্যিক হয়ে গেছে।”

সালামা বিন কুহাইল (রহ.) এটি শুনে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। [১]

যায়েদ বিন আলীর বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড:

অবশেষে যায়েদ বিন আলী (রহ.) কুফাবাসীদের কথার ওপর বিশ্বাস করে বিদ্রোহের ঘোষণা দিলেন।

এই যুদ্ধের সেই সমস্ত বিবরণ যা কেবল শিয়া আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত, আমরা তা উপেক্ষা করছি। এতটুকু কথা নিশ্চিত যে, যুদ্ধ কুফা শহরের ভেতরেই হয়েছিল। যখন যায়েদ বিন আলী (রহ.) সশস্ত্র হয়ে সরকারের মোকাবিলায় বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা এক হাজারও ছিল না। সরকারি বাহিনী সহজেই তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। যায়েদ বিন আলী (রহ.) এই সংঘর্ষের সময় যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন। এই ঘটনাটি ১২২ হিজরির। [২]

যায়েদ বিন আলী (রহ.)-এর হত্যাকাণ্ডে খলিফা হিশামের দুঃখ:

খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক, যিনি স্বভাবগতভাবে কোমল হৃদয়ের ছিলেন, যায়েদ বিন আলীর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন না। কুফায় যা কিছু ঘটল, খলিফা হিশামের কাছে তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। যখন তিনি যায়েদ বিন আলী (রহ.)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ পেলেন, তখন ব্যথিত হয়ে বললেন: “হায়! আমি যদি আমার সবকিছু উৎসর্গ করে তাঁকে বাঁচাতে পারতাম।” [৩]

উম্মতের আলেমদের দৃষ্টিতে যায়েদ বিন আলীর মর্যাদা:

যায়েদ বিন আলী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আহলে সুন্নাত ও আহলে তাশাইয়ু (শিয়া) সবার কাছেই সর্বসম্মত। হাফেজ জাহাবী (রহ.) বলেন:

“তিনি ইলম, পবিত্রতা ও পরহেজগারির উচ্চ মকামে ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ১৬৯/৭

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৫৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫২/১৩

[৪] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৩৮৯/৫

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন:

“তিনি নেককার আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর থেকে একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি শাহাদাত লাভ করেন যা আখিরাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।” [১]

পূর্বসূরিগণ (আসলাফ) তাঁকে এই কারণে শহীদ হিসেবে গণ্য করেছেন যে, তিনি ফকিহ ও মুজতাহিদ ছিলেন এবং তাঁর বিদ্রোহ কোনো শরয়ী ব্যাখ্যার (তাবিল) অধীনে ছিল; তাই তাঁর পদক্ষেপকে ভুল বলা সত্ত্বেও তা সওয়াবের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জাইদ বিন আলীর পর তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া সরকারের পাকড়াও থেকে বাঁচতে খোরাসানে চলে যান এবং পুনরায় বনু হাশিমের সমর্থকদের নিজের চারপাশে সমবেত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু খোরাসানের শাসক নাসর বিন সাইয়্যার তাঁকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেন। [২]

বনু হাশিমের মুরূবিগণ কি ইমামতের আকিদার কারণে বিদ্রোহ করতে থাকেন?

এই প্রশ্নটি থেকে যায় যে, শেষ পর্যন্ত হযরত জাইদের নিকট বিদ্রোহের বৈধতার কারণ কী ছিল? যেহেতু তাঁর অবস্থানের স্বপক্ষে কোনো সহিহ রেওয়ায়েতে দলিল বর্ণিত হয়নি; তাই আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই কিছু অনুমান করতে পারি। এমন মনে হয় যে, তিনি সাদাতদের (নবী বংশ) খিলাফতের অধিকতর হকদার মনে করতেন। সাদাত পরিবারের অন্য কিছু মুরূবি যেমন: মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ (রহ.)-এর পুত্র আবু হাশিম আবদুল্লাহ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর পৌত্র মুহাম্মদ বিন আলী সম্পর্কে প্রমাণিত যে, তাঁরাও একই মত পোষণ করতেন। তবে উম্মতের অধিকাংশ আলেমই এই চিন্তাধারায় বিপ্লবী সাদাতদের সমর্থন করেননি, বরং সেই যুগের সাদাতদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যেমন হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহ.) এবং হযরত জাফর সাদিক (রহ.)-এর মতো বিশিষ্ট আকাবিরগণও এ জাতীয় প্রতিটি আন্দোলন থেকে পৃথক ছিলেন।

শিয়াদের দাবি হলো, ইমামতের আকিদা উম্মতের মধ্যে শুরু থেকেই চলে আসছে এবং এই কারণেই হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর পরবর্তী সাদাত মুরূবিগণ সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ করতে থাকেন এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টাগুলো এই কথার দলিল যে, ইমামতের আকিদা দ্বীনের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং উম্মতের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকার শুধুমাত্র আহলে বাইতের।

কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নকারী কোনো ব্যক্তির কাছে এই বাস্তবতা গোপন নয় যে, ইসলামি শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো ঈমান, নেক আমল এবং তাকওয়া; বংশমর্যাদা বা পারিবারিক অভিজাত্য নয়। পারিবারিক অভিজাত্য আল্লাহর একটি অনৈচ্ছিক নেয়ামত যা অবশ্যই ইসলামে সম্মানযোগ্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের আসল মানদণ্ড হলো তাকওয়াই। সাহাবায়ে কেরামের যুগে শ্রেষ্ঠত্বের আসল মানদণ্ড ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বাধিক সান্নিধ্য ও সাহচর্য এবং ইসলামের জন্য বড় বড় কোরবানি দেওয়া। এই কারণেই কারো মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.); কারণ ইসলামের জন্য তাঁদের কোরবানি ছিল সবচেয়ে বেশি।

[১] তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবি: ৮/১০৫, ত. তাদমুরি

[২] আনসাবুল আশরাফ: ১/৪৩৭

এই যুগের মুসলমানরা যারা দ্বীনের উত্তম বুঝ রাখতেন, তারা নবীর প্রতিনিধিত্ব ও স্থলাভিষিক্তের জন্য সর্বদা এই গুণাবলিকেই বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। বংশীয় নৈকট্য এবং আত্মীয়তা তখন কোনো মানদণ্ড ছিল না, অন্যথায় হযরত আলী (রা.)-কেই প্রথম খলিফা নিযুক্ত করা হতো।

খিলাফত ও ইমামত সম্পর্কে হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস (রা.)-এর চিন্তাধারা:

কিছু লোক সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা পেশ করে দাবি করেন যে, হযরত আব্বাস এবং হযরত আলী (রা.) কেবল নিজেদের বংশের খিলাফতের প্রবক্তা ছিলেন। এই বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত আব্বাস (রা.) নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের কিছু আগে হযরত আলী (রা.)-কে জোর দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোক যে, খিলাফত কার জন্য নির্ধারিত হবে, সাদাতদের জন্য নাকি অন্যদের জন্য? যদি আমাদের জন্য নির্ধারিত হয় তবে আমরা আশ্বস্ত হব, আর যদি আপনি (সা.) এটি অন্যদের জন্য নির্ধারিত করতে চান তবে আমরা তাঁকে পরামর্শ দেব যেন তিনি এই দায়িত্ব আমাদের সোপর্দ করে যান।

কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন:

“যদি আমরা হুজুর করীম (সা.)-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি নিষেধ করে দেন, তবে পরবর্তীতে লোকেরা আমাদের কখনোই ক্ষমতা দেবে না; তাই আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এই বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করব না।” [১]

কিন্তু এই বর্ণনা থেকে এটি কোথায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমামত সম্পর্কে যে আকিদা শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেটিই হযরত আব্বাস এবং হযরত আলী (রা.)-এর আকিদা ছিল? বর্ণনার অর্থ তো পরিষ্কার। অর্থাৎ এই মহান ব্যক্তিদের নিকট একটি সম্ভাবনা ছিল যে, নবীর (সা.) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বংশীয় নৈকট্যের গুরুত্বও বিবেচনায় রাখা হবে, এবং এই ব্যক্তিগণ পূর্ণ সদিচ্ছার সাথে এটি মনে করতেন যে, খলিফা সাদাতদের মধ্য থেকে হওয়া মুসলমানদের সামষ্টিকতা এবং দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যের কারণ হতে পারে।

কিন্তু এই বর্ণনা থেকেই এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী করীম (সা.) সারা জীবনে কখনো সাদাতদের ইমামত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো ওসিয়ত করেননি, অন্যথায় হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস (রা.) এই মুহূর্তে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিতেন না, বরং হুজুর (সা.)-কে এই বিষয়টি বাস্তবায়নের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিতেন। তারা হুজুর করীম (সা.)-এর কাছে এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ এজন্যই চাননি যে, এখন পর্যন্ত সাদাতদের জন্য খিলাফতের সুযোগ রয়েছে। যদি নবী করীম (সা.) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিতেন, তবে এই সুযোগ একেবারেই শেষ হয়ে যেত।

যেহেতু হযরত আলী (রা.) দেখছিলেন যে, হুজুর করীম (সা.) সর্বদা নিজের পরিবারের সদস্যদের ত্যাগের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং পদের ক্ষেত্রে পশ্চাতে রেখেছেন; তাই তাঁর এই চিন্তা করা একেবারেই যথাযথ ছিল যে, নিজের মুখে পদ চাওয়া পাচ্ছে হুজুর করীম (সা.)-কে অসন্তুষ্ট না করে দেয়। সেই হাদিসগুলোও তাঁর সামনে ছিল যেগুলোতে পদ ও মর্যাদা প্রার্থনা করার মন্দ দিক বর্ণিত হয়েছে; তাই তিনি এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

এই বর্ণনা থেকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস (রা.)-এর নিকট সাদাতদের ক্ষমতা কোনো শরয়ী আকিদা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সাময়িক মতামত যা তারা সেই সময়ে প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তম মনে করছিলেন।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪১৮২, ৬২৬৬

এও স্পষ্ট হচ্ছে যে, হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস ওসিয়ত ও ইমামতের নয় বরং খিলাফতের প্রবক্তা ছিলেন এবং এই দুই ব্যক্তি পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যে স্থলাভিষিক্ততার বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তা খিলাফতই ছিল; কারণ পরবর্তীতে এই পদে আসীন ব্যক্তিদের খলিফা এবং আমিরুল মুমিনিন বলা হয়েছে। এমনকি হযরত আলীও ক্ষমতা গ্রহণের পর খলিফা এবং আমিরুল মুমিনিন হিসেবেই অভিহিত হতে থাকেন, ‘ইমাম’ বা ‘ওসী’ হিসেবে নয়।

হ্যাঁ, যেহেতু হাদিসের বিভিন্ন স্থানে শাসকের জন্য ‘ইমাম’ এবং শাসনের জন্য ‘ইমামত’ শব্দ এসেছে; তাই ফিকহি পরিভাষায় শাসকদের জন্য ইমাম এবং খিলাফতের জন্য ইমামত শব্দটিও প্রচলিত হয়ে গেল। তবে এটা স্পষ্ট যে, এই ইমাম এবং এই ইমামতের সাথে শিয়াদের ইমামত আকিদার কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসের মনে ইমামত আকিদার দূরতম কোনো চিন্তা না থাকার একটি বড় প্রমাণ হলো এই যে, এই ব্যক্তিবর্গ জনাব আবু বকর সিদ্দিক-এর খিলাফতের ওপর উম্মতের ইজমায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর পরে হযরত উমর-এর প্রতিও অনুগত ও সাহায্যকারী ছিলেন; তাঁরা কখনো খিলাফত বা ইমামতের দাবি করেননি। হযরত আলী প্রকাশ্যে বলতেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ شَيْئًا.

“হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শাসনের বিষয়ে আমাদের জন্য কোনো ওসিয়ত করেননি।” [১]

হযরত আলী-র ইমামতের আকিদা সাবায়িরা ছড়িয়েছে:

হযরত উসমান-এর শাহাদাতের পর পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো হযরত আলী-র খিলাফতের ওপর ঐকমত্যও ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ এবং সাহাবিয়াতের মর্যাদায় বাকি সমস্ত উম্মতের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হয়েছিল। এ ছাড়া অনেক মানুষের কাছে তাঁর খিলাফতের এই দিকটিও আনন্দদায়ক ছিল যে, প্রথমবারের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো নিকটাত্মীয় ক্ষমতা পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁদের এই আনন্দ ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু হযরত আলী-র মনে কোনো ইমামত আকিদার ধারণা ছিল না এবং তাঁর সন্তান ও সমর্থকদের মনেও ছিল না। হ্যাঁ, সাবায়িরা সেই সময় থেকেই তাঁকে ‘ওসী’ এবং ‘পূর্ববর্তী খলিফাদের জবরদখলকারী’ হওয়ার ধারণা ছড়াতে শুরু করেছিল, যদিও হযরত আলী বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি নিজের ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করে এই মতবাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, তবুও সাবায়ী গোষ্ঠী গোপনে গোপনে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। মানুষকে গোষ্ঠীগত গোঁড়ামিতে লিপ্ত করার জন্য ইমামের মাসুম এবং ওয়াজিবুল ইতাআত হওয়ার মতবাদও উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু কোনো সহিহ বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, হযরত হুসাইনসহ হযরত আলী-র কোনো ছেলের এই চিন্তা ছিল। বরং কোনো সহিহ বর্ণনা থেকে এটাও প্রমাণিত নয় যে, হযরত হুসাইনকে ইরাকে আহ্বানকারী শিয়ানে আলী এই আকিদা পোষণ করতেন।

হযরত হুসাইন যখন কারবালায় শহীদ হলেন, তখন সাবায়ী গোষ্ঠী শিয়ানে আলীর মধ্যে এই ভুল ধারণা ছড়াতে শুরু করল যে—

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ: ৭/২২৩; তারিখু দামেশক: ৩০/২৯২, সনদ হাসান।

হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর ইমামতের হক গ্রহণ করতে আসছিলেন যার কিয়াম শরয়ী দায়িত্ব ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। এভাবে এই প্রোপাগান্ডায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি:

সাদাত বংশের বড়রা, বনু আব্বাস বা আলী পরিবারের কেউ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত কোনো আকিদা পোষণ করতেন না; তাই প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে ওসিয়ত, ইমামত এবং ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার (ইসমত) প্রচার বা কোনো সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই মহান ব্যক্তিগণ সারা জীবন সুযোগ পেলেই এই ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ করতেন।

হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাহেবজাদা হযরত জয়নুল আবেদিন (রহ.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথা উল্লেখ করার সময় তাঁকে “সিদ্দিক” উপাধিতে স্মরণ করতেন। ভ্রান্ত আকিদার লোকেরা এতে অবাক হলে তিনি বলতেন: “আমি কেন তাঁকে সিদ্দিক বলব না যাকে আমার চেয়ে অনেক উত্তম ব্যক্তিগণ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাজির ও আনসারগণ সিদ্দিক বলেছেন? যে ব্যক্তি তাঁকে সিদ্দিক বলবে না, আল্লাহ তাকে সত্যবাদী করবেন না। যাও! আবু বকর ও উমরকে ভালোবাসো। তারপর এর যা কিছু দায়ভার তা আমার ঘাড়ে।” [১]

তাঁদের সামনে কেউ হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সমালোচনা করলে তাঁরা তা সহ্য করতে পারতেন না এবং তাঁদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতে নিষেধ করতেন। [২]

আপনি বলতেন যে: হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হয়েছিল। [৩]

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহ.)-এর আকিদা:

তাঁর সাহেবজাদা মুহাম্মদ বাকির (রহ.)-এর আকিদাও এটাই ছিল। এই মুহাম্মদ বাকির যিনি আবু জাফরের কুনিয়ত (উপনাম) দ্বারাও প্রসিদ্ধ, তিনি নিজেও অত্যন্ত আলেম, ফাজিল এবং ইবাদতগুজার বুজুর্গ ছিলেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর মতে: “তিনি ইলম ও আমল, সিয়াদত ও শরাফত, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তিনি ইমাম, মুজতাহিদ এবং কুরআন মাজিদ অধিক তিলাওয়াতকারী ছিলেন।” [৪]

একজন শিয়া বর্ণনাকারী ইবনে ফুজাইল অন্য একজন শিয়া বর্ণনাকারী সালিম বিন আবি হাফসা থেকে হযরত বাকির (রহ.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন: “আবু বকর ও উমর (রা.)-কে ভালোবাসো, তাঁদের শত্রুদের থেকে বিমুখতা প্রকাশ করো, কারণ তাঁরা হেদায়েতের ইমাম ছিলেন।” [৫]

একবার তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো: “আহলে বাইতের মধ্যে কি কেউ আবু বকর ও উমর (রা.)-কে গালি দেয়?” তিনি বললেন: “না, তোমরাও তাঁদের উভয়কে ভালোবাসো, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব রাখো এবং তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করো।” [৬]

মুহাম্মদ বাকির (রহ.) আরও বলতেন: “আমি আমার আহলে বাইতের মধ্যে যাকে দেখেছি, সে আবু বকর ও উমর (রা.)-কে ভালোবাসত।” [৭] বিখ্যাত শিয়া বর্ণনাকারী জাবির জু’ফী তাঁর এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন: “আওলাদে ফাতেমার এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, আবু বকর ও উমর (রা.)-এর ব্যাপারে সর্বোত্তম কথা বলা হবে।” [৮]

[১] তারিখ দামেশক: ৩৮৯/৪১; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩৯৫/৪

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০২/৪

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩২১/৫

[৪] তারিখ দামেশক: ২৮৪/৫৪; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০৬/৪

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩১৯/৫, দার সাদির

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০২/৪

[৭] তারিখ দামেশক: ২৮৫/৫৪

জনাব মুহাম্মদ বাকিরও হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ “সিদ্দিক” বলে করতেন। একবার কেউ এ বিষয়ে আপত্তি করলে তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বললেন: “হঁ্যা! তিনি সিদ্দিক, হঁ্যা! তিনি সিদ্দিক। যে ব্যক্তি তাঁকে সিদ্দিক বলবে না, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যবাদী না করুন।” [১]

শিয়া বর্ণনাকারী সালিম বিন আবি হাফসা-র প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা হলো যে, মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে এই শব্দগুলো ছিল: “হে আল্লাহ! আমি আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করি। যদি আমার অন্তরে এর বাইরে অন্য কিছু থাকে, তবে কিয়ামতের দিন আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করে।” [২] মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মহান ব্যক্তিদের সাথে তিন খলিফার পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। হযরত মুহাম্মদ বাকিরের স্ত্রী ফারওয়া বিনতে কাসিম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আপন প্রপৌত্রী। [৩]

একবার তাঁকে আয়াত ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾-এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এখানে “আল্লাঘিনা আমানু” দ্বারা কী উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ।”

প্রশ্নকারী বললেন: “লোকেরা তো বলে যে, এর দ্বারা কেবল হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বোঝানো হয়েছে।” মুহাম্মদ বাকির রাহিমাহুল্লাহ বললেন: “হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও সেই সাহাবীদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।” [৪]

শিয়া বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ জা’ফি-র বর্ণনা অনুযায়ী মুহাম্মদ বাকির রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “তরবারির হাতলে সোনা বা রূপার প্রলেপ লাগানো কি জায়েজ?” তিনি বললেন: “হঁ্যা, অবশ্যই; কারণ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর তরবারিতে প্রলেপ লাগিয়েছিলেন।” [৫]

একবার তিনি বললেন: “ইরাকের কিছু লোক আমাদের ভালোবাসার দাবিদার অথচ তারা আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর প্রতি নিন্দা ও গালিগালাজ করে এবং তারা এই দাবিও করে যে আমি তাদের এমনটি করার নির্দেশ দিয়েছি। তাদের জানিয়ে দাও যে আমি তাদের থেকে মুক্ত। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ, যদি আমি ক্ষমতা পেতাম তবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাদের রক্ত প্রবাহিত করতাম।” [৬]

হযরত মুহাম্মদ বাকির রাহিমাহুল্লাহ-এর মৃত্যু ১১৪ হিজরি বা ১১৭ হিজরিতে খলিফা হিশামের শাসনামলে হয়েছিল। তিনি বলতেন: “আমরা বনু উমাইয়া শাসকদের পেছনে তাকিয়া ছাড়াই সালাত আদায় করি এবং আমি আমার পিতা (যয়নুল আবেদিন)-এর ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনিও তাদের পেছনে তাকিয়া ছাড়াই সালাত আদায় করতেন।” [৭]

হযরত জাফর সাদিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আকিদা ও আদর্শ:

হযরত মুহাম্মদ বাকির রাহিমাহুল্লাহ-এর পুত্র হযরত জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ-ও আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর পুরোপুরি...

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/১৮৪; তারিখু দামেশক: ৫৪/২৮৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৪০৮

[২] তারিখু দামেশক: ৫৪/২৮৬

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/১৮৫; তারিখু দামেশক: ৫৪/২৯০

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৪০৬

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/১৮৫

[৬] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/১৮৪

[৭] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/২১৩, ত. সাদির

তারা আমলকারী ছিলেন। তাঁর মা ফারওয়া বিনতে কাসিম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রপৌত্রী। তাঁর নানি আসমা বিনতে আবদুর রহমান ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাতনি; এজন্যই হযরত জাফর সাদিক বলতেন: “আমি দুই দিক থেকে আবু বকরের সন্তান।”

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলতেন: “জাফর একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী।” [১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলতেন: “আমি জাফর বিন মুহাম্মদের চেয়ে বড় কোনো ফকিহ দেখিনি।” [২]

হযরত জাফর সাদিক (রহ.)-কে কেউ হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “তুমি এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ যারা জান্নাতের ফল খেয়ে নিয়েছেন।” [৩]

জাফর সাদিক (রহ.) বলতেন: “যে ব্যক্তি মনে করে যে আমি একজন মাসুম ইমাম যার আনুগত্য করা ফরজ, তবে আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, আর যে আমাকে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সাথে সম্পর্কহীন মনে করে, আমি তার থেকেও সম্পর্কহীন।” [৪]

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ এবং বনু আব্বাসের বড়দের রাজনৈতিক অবস্থান:

বনু হাশিমের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী দল হিসেবে বনু আব্বাসকে গণ্য করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা হলো বনু আব্বাসের একজন সদস্য মুহাম্মদ বিন আলী এবং তাঁর সন্তানরা ছাড়া অন্য কেউ বিদ্রোহ ও ক্ষমতা লাভের পথ বেছে নেননি।

এটি সুনিশ্চিত যে বনু আব্বাসের পূর্বপুরুষ হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এরপর তাঁর কলিজার টুকরো হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর সারা জীবন কোনো প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সর্বদা রাজনৈতিক বিবাদ থেকে দূরে থাকতেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নামে তাঁর বায়াতনামা সহিহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। [৫]

এটি প্রসিদ্ধ যে শিয়ানে আলী হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইমামতের দায়িত্ব হযরত জয়নুল আবেদিনের হাতে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অপারগতার পর হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কথাগুলো কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর বিপরীতে এটি প্রমাণিত যে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ সারা জীবন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। না তিনি ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, না ইমামতের আকিদার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল। যদি এমন হতো তবে তিনি বনু মারওয়ানের শাসন মেনে নিতেন না, অথচ তিনি আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে বায়াত করেছিলেন এবং নিম্নোক্ত পত্র পাঠিয়েছিলেন: “আমি উম্মতকে মতভেদ করতে দেখে নির্জনে চলে গিয়েছিলাম। এখন খেলাফতের বিষয়টি আপনার কাছে এসেছে এবং মানুষ আপনার কাছে বায়াত করেছে, তাই আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমি আপনার প্রতিনিধি হাজ্জাজের হাতে আপনার কাছে বায়াত করছি।” [৬]

(১) সিয়র আলামুন নুবালা: ৬/২৫৫, ২৫৮

(২) তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৯/৯১, তাদমিরি; সিয়র আলামুন নুবালা: ৬/২৫৯; শায়খ শুয়াইব আরনাউত বলেছেন: “আর তিনি যা বলেছেন তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী থেকে গৃহীত: ‘মুমিনের আত্মা জান্নাতের গাছে বুলে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ পুনরুত্থানের দিন তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেন।’ এটি ইমাম মালিক মুয়াত্তায় এবং নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। (হাশিয়া সিয়র আলামুন নুবালা: ৬/২৫৯)”

(৩) সিয়র আলামুন নুবালা: ৬/২৫৯

(৪) সহিহ বুখারি, হা: ৭২০৫

(৫) সিয়র আলামুন নুবালা: ৪/১২৮

জানা গেছে যে, এই ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের কথা শিয়াগণ ভুলভাবে আরোপ করেছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের পুত্র আলীও বনু মারওয়ান খলিফাদের অনুগত ছিলেন এবং রাজনৈতিক সংঘাত থেকে দূরে ছিলেন। উমাইয়া খলিফারা তাদের দামেস্কের শহরতলী ‘হুমাইমাহ’ গ্রামের আশেপাশে জায়গিরও দিয়েছিলেন। তাই তারা হিজাজ থেকে হিজরত করে এই গ্রামেই চলে এসেছিলেন। [১]

তিনি অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতেন, প্রতিদিন পাঁচশ নফল নামাজ পড়তেন। মুসাফিরদের মেহমানদারি করতেন, দরিদ্রদের জন্য প্রচুর ব্যয় করতেন। [২] খলিফাদের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে দামেস্ক গিয়ে খলিফাদের সাথে দেখা করতেন। একবার সকালের নাস্তায় হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে গেলেন। হিশাম তাকে আসতে দেখে উপস্থিতদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন:

“কুরাইশদের সরদারের সম্মানে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাও; এরা তারাই যারা সেখানে মাথা উঁচু করে থাকে যেখানে মানুষ মাথা নত করে।” [৩]

আলী বিন আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষে এই গ্রাম থেকেই তার পুত্র অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নাতি মুহাম্মদ বিন আলী গোপনে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। [৪]

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা... মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পুত্র আবদুল্লাহ আবু হাশিম:

মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসীকে এই পথ প্রদর্শনকারী ছিলেন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার ছোট ছেলে আবদুল্লাহ আবু হাশিম। তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বনু মারওয়ানের বিরুদ্ধে গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। [৫] যদিও তার বড় ভাই হাসান বিন মুহাম্মদ অত্যন্ত সতর্ক, মুত্তাকী এবং ইলম ও ফজিলতে ভূষিত মানুষ ছিলেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অংশ নেননি। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াও এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত ছিলেন। [৬] তবে আবদুল্লাহ আবু হাশিম তার বড়দের পদাঙ্ক ছেড়ে বিদ্রোহের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। এর প্রধান কারণ ছিল সাবায়ী আন্দোলনের প্রভাব। এই আবদুল্লাহ আবু হাশিম ছিলেন সাদাত পরিবারের প্রথম মুরগবি যার চিন্তাধারায় কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল। ইমাম বুখারী বলেন যে, এই আবদুল্লাহ সাবায়ীদের অনুসরণ করতেন। [৭] হাফেজ যাহাবী বর্ণনা করেন যে, তিনি সাবায়ীদের অনুসারী ছিলেন, সাবায়ীদের বর্ণনা সংগ্রহ করা তার শখ ছিল। [৮]

[১] সিয়র আলামুন নুবালা: ২৮৫/৫

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৮০৭৯/৪

[৩] আত-তারিখুল কাবীর: ১৮৭/৫

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৭৫/৪

[৫] সিয়র আলামুন নুবালা: ১২৯/৪

[৬] সিয়র আলামুন নুবালা: ১৩০০, ১২৯/৪

[৭] আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ, পৃ. ১৪১

[৮] সিয়র আলামুন নুবালা: ১৩০/৪

নোট: জরাহ (সমালোচনা) থাকা সত্ত্বেও এই আবদুল্লাহ মুহাদ্দিসগণের নিকট নির্ভরযোগ্য। (সুনান আত-তিরমিযী: হা: ১৭৯৪) ‘সিকাহ ওয়া কানা শীয়ান’ (নির্ভরযোগ্য এবং শিয়া ছিলেন), আস-সিকাত লিল ইজলি, পৃ. ২৭৭, ত. দারুল বায। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম মালিকসহ অনেক মুহাদ্দিস তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। খায়বারের সময় মুতআ হারাম হওয়ার হাদিসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৫৫২৩; সহীহ মুসলিম, হা: ৩৪৯৭; মুয়াত্তা মালিক, হা: ১৯৯৩; সুনান আত-তিরমিযী: হা: ১৭৯৪)। এখন কথা হলো, ইমাম বুখারী এমন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে কীভাবে বর্ণনা গ্রহণ করলেন? লেখকের মতে এর উত্তর সেটাই যা মারওয়ান বিন আল-হাকামের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মারওয়ানের বর্ণনাগুলোও ইমাম বুখারী যথাযথভাবে উদ্ধৃত করেন অর্থাৎ অন্য কোনো নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী যেমন মিসওয়াল বিন মাখরামাকে সাথে যুক্ত করে নেন। একইভাবে আবদুল্লাহ আবু হাশিমের বর্ণনা নেওয়ার সময়ও তিনি তার নির্ভরযোগ্য ভাই হাসান বিন মুহাম্মদকে সাথে যুক্ত করে নেন। এছাড়াও মনে হয় যে, সাবায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহর আকিদা পুরোপুরি তাদের মতো ছিল না, যার প্রমাণ হলো মুতআ হারাম হওয়ার বর্ণনাটি তার উদ্ধৃত করা। সম্ভবত একারণেই সতর্ক মুহাদ্দিসগণও তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা বৈধ মনে করেছেন।

তারিখ বাইয়াতে সালাফ

এটি ছিল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময়কাল। কুফার শিয়ানে আলী (আলীর অনুসারীগণ) প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন এবং তাঁকে বিপ্লবের জন্য প্ররোচিত করতেন। সাদাতদের (সৈয়দ বংশীয়) অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের এই তৎপরতা পছন্দ করতেন না; তাই হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর সাহেবজাদা যায়েদ (রা.) খলিফা ওয়ালিদের কাছে গিয়ে এই গোপন আন্দোলনের কথা জানিয়ে দেন। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক আবু হাশিমকে বন্দি করেন। পরবর্তীতে আউন বিন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া এবং হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। [১]

মোদাকথা, সাদাতদের নেতৃবৃন্দের থেকে আলাদা হয়ে এই স্বতন্ত্র চিন্তা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ আবু হাশিম সেই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হন, যিনি বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী আন্দোলনের ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ আবু হাশিমের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না; তাই ৯৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করার সময় তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর নাতি মুহাম্মদ বিন আলীর হাতে এই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব সঁপে দেন। [২]

প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ আবু হাশিমকে খলিফা ওয়ালিদ অথবা খলিফা সুলাইমান বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়েছিলেন, তবে এটি কোনো সুনিশ্চিত কথা নয়। [৩]

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অত্যন্ত তীব্রভাবে জেগে ওঠে, যার উত্তর দিতে সাধারণত ঐতিহাসিকগণ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা যেভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে আসছি এবং ইসলামী রাজনীতির যে মূলনীতিগুলো গত পৃষ্ঠাগুলোতে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছি, সেগুলোর প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা যায় না। বর্তমান যুগের তরুণ মন এর উত্তর না পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না; তাই আমরা এই জটিলতা নিরসন করা জরুরি মনে করছি।

প্রশ্নটি হলো, শেষ পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তিদের সরকার বিরোধী আন্দোলন চালানোর কী প্রয়োজন ছিল? অথচ চরম প্রয়োজন ব্যতীত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী বিদ্যমান রয়েছে। আবার যে পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের অনুমতি আছে, তাকে বনু মারওয়ানের যুগের ওপর প্রয়োগ করা কঠিন। আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, শাসকের ব্যক্তিগত পাপাচারের (ফিসক) কারণে বিদ্রোহ করা জায়েজ নয়। এটিও নিশ্চিত যে, বনু মারওয়ানের যেসব খলিফাদের যুগে এই আন্দোলন চলেছিল, তাঁদের অধিকাংশ পাপাচার ও অনাচার থেকে মুক্ত ছিলেন। তদুপরি জমহুর সাহাবী এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের নিকট বিদ্রোহের বৈধতা বা আবশ্যিকতা কুফরে বাওয়াহ (প্রকাশ্য কুফরি) করার ওপর নির্ভর করে। এদিকে এ কথাটিও স্পষ্ট যে, সেই যুগে কুফরে বাওয়াহর কোনো ঘটনা মোটেও ঘটছিল না। বনু মারওয়ানের শুরুর দিকের খলিফাগণ এবং তাঁদের কর্মচারীরা জুলুম-অত্যাচার এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনে অবশ্যই লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও কোনো কুফরে বাওয়াহ করেননি।

যদি একজন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ সানির দিকে কুফরি কাজের সাথে জড়িত থাকার দুর্বল বর্ণনাগুলোকে মেনেও নেওয়া হয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দায়িত্ব ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ পালন করে তাঁর শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

[১] আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ, পৃ. ১৭৪ থেকে ১৭৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৪/১২৯

[৩] আব্বাসী যুগের প্রাচীন উৎস “আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ”-তে এই বর্ণনাটিকে “ফাকাদ যা’আমা বা’দুন নাস” (কিছু লোক মনে করে) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ, পৃ. ১৮৮)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এদিকে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ওয়ালিদ সানির অনেক আগেই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার পুত্র আবু হাশিম আবদুল্লাহ আলভী একটি গোপন আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরি মুহাম্মদ ইবনে আলী আব্বাসী গোপনে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হন। তাছাড়া হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের মতো সতর্ক ও ধৈর্যশীল শাসকের শাসনামলে হযরত যায়েদ ইবনে আলী খুরুজ করেছিলেন। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিদের খুরুজের আসল প্রেরণা কী ছিল?

বনু হাশিমের প্রবীণদের সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক অবস্থান:

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে বিদ্যমান বনু হাশিমের প্রবীণদের অধিকাংশ কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না, বরং ইলমি, ঈমানি, আখলাকি এবং আধ্যাত্মিক খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এই ব্যক্তিরা ছিলেন ইবাদতগুজার, আলিম-ফাযিল এবং মুত্তাকি-পরহেজগার এবং আকিদা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে উম্মতের জমহুর উলামায়ে কিরামের সাথে একমত ছিলেন। এটি সত্য যে, তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি সরকার পরিবর্তন এবং সাদাতদের শাসন কামনা করতেন, যার কারণ ছিল এই যে, তাঁরা সরকারকে খিলাফতে রাশিদাহর আদলে দেখতে চাইতেন এবং তাঁদের মতে এই দায়িত্ব সাদাতগণ আরও ভালোভাবে পালন করতে পারতেন। তাছাড়া বনু উমাইয়াদের যুগে সংঘটিত কারবালার ঘটনা এবং এ জাতীয় কিছু বিয়োগান্তক ঘটনার ক্ষত তাঁদের হৃদয়ে অবশিষ্ট ছিল; তাই কিছু ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে এই প্রভাব ও চিন্তা থাকা সত্ত্বেও বনু হাশিমের প্রবীণদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কার্যত কোনো সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না।

আমাদের মতে, অধিকাংশ সাদাতদের খুরুজ থেকে বিরত থাকার বড় কারণ এটাই ছিল যে, অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতো তাঁদের কাছেও সেই শর্তাবলি পূরণ হচ্ছিল না যার ভিত্তিতে খুরুজ জায়েজ বা ওয়াজিব হয়। শর্তাবলি উপেক্ষা করে খুরুজ করা শরয়ি ওয়াইদ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর ফলে আরও বেশি ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

এটি ছিল সাদাতদের সংখ্যাগরিষ্ঠের চিন্তাধারা, তবে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনাকারী বনু হাশিমের চিন্তা ছিল কিছুটা ভিন্ন এবং তাঁদের মতাদর্শ জমহুর উম্মত থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। এই ব্যক্তিরা ইমামত সম্পর্কে রাফেজিদের মতো আকিদা পোষণ করতেন না, তবে সাবায়ী প্রোপাগান্ডা দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত ছিলেন। একইভাবে খুরুজের শর্তাবলির ব্যাপারেও তাঁদের চিন্তাধারা জমহুর উম্মত থেকে আলাদা ছিল।

আবদুল্লাহ আবু হাশিম এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী কেন আন্দোলন চালিয়েছিলেন?

আন্দোলন পরিচালনাকারী ব্যক্তিরা জানতেন যে, সাদাতদের খিলাফত শরিয়তের কোনো মৌলিক বিষয় নয়, বরং শরিয়তে বংশীয় শাসন এবং উত্তরাধিকার কোনো পছন্দনীয় বিষয়ও নয়। কিন্তু অন্যদিকে তাঁরা দেখছিলেন যে, বনু মারওয়ান তাদের বংশীয় উত্তরাধিকারী শাসনকে একটি মৌলিক বিষয়ে পরিণত করেছে এবং সাধারণ মানুষও রাজকীয় পদ্ধতির এই নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের এমন চিন্তা করা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শাসনের মানদণ্ড বংশীয় ও বংশগত মর্যাদা হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়, তবে নবী আকরাম ﷺ-এর পরিবার খিলাফতের বিষয়ের জন্য বেশি হকদার, যারা যে কোনো শাসক পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত।

এই কথাটি কেবল তাঁদের মনেই ছিল না, বরং উম্মতের সকলেই দুই আর দুই চারের মতো এই সত্যটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতেন...

এবং অনুভব করতেন; এই কারণেই হাফিজ যাহাবী (রহ.) হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে লেখেন:

“তাঁর শান ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং আল্লাহর কসম! তিনি এর যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর আভিজাত্য, নেতৃত্ব, ইলম, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতার কারণে তিনি ইমামতে উযমা (সর্বোচ্চ ইমামত)-এর হকদার ছিলেন।” [১]

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর শানে ফারাজদাকের অবিস্মরণীয় তাৎক্ষণিক কাসিদা: যদি বনু মারওয়ানের খলিফারা মানুষের দেহের ওপর রাজত্ব করত, তবে সাদাত কিরামের রাজত্ব ছিল মানুষের হৃদয়ের ওপর। মুসলিম বিশ্বে এই মহান ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অবস্থানের আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করা যেতে পারে যে, হিশাম বিন আব্দুল মালিক তাঁর ভাই ওয়ালিদের খিলাফতকালে হজের জন্য এসেছিলেন এবং তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে চাইলেন, কিন্তু ভিড়ের আধিক্যের কারণে তা করতে পারলেন না। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে ইশারায় ইস্তিলাম করলেন। এমন সময় হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখামাত্রই জনতা শ্যাওলার মতো সরে গেল এবং তাঁর জন্য পথ তৈরি হতে থাকল। তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছালেন এবং তা চুম্বন করে তাওয়াফে মশগুল হলেন। হিশাম বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “ইনি কে?”

কবি ফারাজদাক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَأْتُهُ ... وَالْيَتِي يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

“ইনি সেই সত্তা যাঁর পদস্পর্শ মক্কার মাটি চেনে... বাইতুল্লাহও তাঁকে চেনে, হারাম এবং হিল (হারামের বাইরের এলাকা) উভয়ই।”

هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمْ ... هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

“ইনি আল্লাহর সকল মনোনীত বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান... ইনি মুত্তাকী, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং মহান ব্যক্তিত্ব।”

إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا ... إِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَبِي الْكَرَمُ

“যখন কুরাইশরা তাঁকে দেখে তখন তাদের বক্তা বলে ওঠে... যে তাঁর মহত্বেরই সকল মহত্বের সমাপ্তি ঘটে।”

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضِي مِنْ مَهَابَتِهِ ... فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

“তিনি লজ্জাবশত দৃষ্টি অবনত রাখেন এবং মানুষ তাঁর গান্ধীর্যের কারণে দৃষ্টি নিচু রাখে। তাঁর সাথে কেবল তখনই কথা বলা যায় যখন তিনি হাসেন।”

هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ ... بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا

“তুমি যদি তাঁকে না চেনো তবে জেনে রাখো যে ইনি ফাতিমার সন্তান... যাঁর নানার মাধ্যমে আল্লাহর নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত হয়েছে।” [২]

সাদাত কিরাম কেন জনগণের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশা করতেন?

সমাজে সাদাত কিরামের এই জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান ও মর্যাদার পাশাপাশি কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা, হাররার ঘটনা, কাবা অবরোধ এবং

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৯৮/৪

[২] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৫১৮৫; তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ৪৩৮/৬, ত. তাদমুরী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৯১/১১

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত থেকে শুরু করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু পর্যন্ত এমন অনেক ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে জনগণের একটি বড় অংশ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। যদিও প্রতিটি শাসক এই ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিলেন না, তবে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বনু উমাইয়া একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন তাদের সরিয়ে অন্য দলকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেওয়া উচিত। সাবায়ীরা এই বিপ্লব থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে সচেষ্ট ছিল। তাদের প্রোপাগান্ডা এই ধারণাকে আরও তীব্রভাবে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এই দিকগুলো বিবেচনা করে বনু হাশিমের এই নেতৃবৃন্দ যে কোনো মূল্যে খুরুজ করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গ মনে করতেন যে, বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় যে বিচ্যুতি এসেছে তা কেবল ওয়াজ-নসিহত, শাসকের সংশোধন বা শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য কোনো বিপ্লব ঘটিয়ে পুরো পারিবারিক ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের মতে, খুরুজের বৈধতার জন্য শাসকদের জালিম বা ফাসিক হওয়া জরুরি ছিল না। বরং পূর্ববর্তী শাসকদের জুলুমের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করা সম্পূর্ণ জায়েজ ছিল; কারণ তারা সবাই একই পরিবারের শাসক হিসেবে একটিই রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিল যাদের নীতিগুলো একই রকম ছিল।

সম্ভবত এই ব্যক্তিবর্গের প্রবল আশা ছিল যে, যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন শুরু করা হয় তবে জনগণ তাদের পূর্ণ সমর্থন দেবে এবং কোনো বড় রক্তপাত ছাড়াই তাদের সরকার গঠিত হবে। আর বাস্তবতা হলো, এই প্রত্যাশা ভুল ছিল না।

হাফেজ যাহাবী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন:

“আলে আব্বাসকে মানুষ ভালোবাসত, একইভাবে আলে আলীকেও ভালোবাসত। মানুষ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা এবং আলে মারওয়ানের প্রতি ঘৃণার কারণে চাইত যে শাসনভার তাদের (বনু হাশিম) হাতে আসুক। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এই অবস্থায় ছিল, শেষ পর্যন্ত এর উপকরণসমূহ তৈরি হয়ে গেল এবং তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো যা খোরাসান থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল।” [১]

[১] কিন্তু আলে আব্বাসকে মানুষ ভালোবাসত এবং আলে আলীকেও ভালোবাসত এবং তারা চাইত যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা এবং মারওয়ান বিন হাকামের বংশধরদের প্রতি ঘৃণার কারণে শাসনভার তাদের হাতে আসুক। তারা দীর্ঘকাল এই অবস্থায় ছিল যতক্ষণ না তাদের জন্য উপকরণসমূহ অনুকূল হলো এবং তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং খোরাসান থেকে তা আত্মপ্রকাশ করল (সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৫৮)।

মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসীর আন্দোলন

মুহাম্মদ বিন আলী ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বসূরিদের রাজনীতি ত্যাগ করে আবদুল্লাহ আবু হাশিমের অনুসরণ করেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি দামেস্কের নিকটবর্তী ‘হুমায়মাহ’ গ্রামকে তাঁর বাসস্থান ও গোপন কেন্দ্র বানান। বাহ্যত তাঁর পুরো সময় ইবাদতে কাটত। এখানে তাঁর পৈতৃক বাগান ছিল যাতে পাঁচশ গাছ ছিল। মুহাম্মদ বিন আলী প্রতিদিন প্রতিটি গাছের নিচে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন।

[১]

আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ও কাঠামো

১০২ হিজরিতে তিনি বনু হাশিমের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গোপন আন্দোলন শুরু করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ মুরিদদের খোরাसानে পাঠান। যখন সেখানে সত্তর জন সমমনা লোক একত্রিত হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে বারো জন ‘দায়ী’ নিযুক্ত করা হলো। [২] প্রতিটি দায়ীর অধীনে বারো জন ‘নকীব’ নির্বাচিত হলেন। প্রতিটি নকীবের অধীনে বারো জন ‘আমিল’ কাজ করতে লাগলেন। তাদের কেউই ‘ইমাম’ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ইমামের প্রতিনিধিকে ‘দায়ী আদ-দুয়াত’ নাম দেওয়া হয়েছিল। যাদের কাছ থেকে ‘ইমাম’-এর জন্য বায়াত নেওয়া হয়েছিল তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। [৩] বায়াত গ্রহণকারীদের দায়িত্ব ছিল তাদের বার্ষিক আয়ের এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) ‘ইমাম’-কে দেওয়া। দায়ীদের মাধ্যমে এই অর্থ ইমামের কাছে পৌঁছাত এবং আন্দোলনের প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো। [৪] সরকারের পক্ষ থেকে সদস্য সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হচ্ছিল। কার জন্য বায়াত নেওয়া হচ্ছে তা গোপন রাখা হয়েছিল, যাতে সরকার কোনো দায়ীকে গ্রেপ্তার করলেও আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী না পাওয়া যায়। [৫]

খোরাसानকে কেন দাওয়াতের ময়দান বানানো হলো?

তবে মুহাম্মদ বিন আলী আগেই স্থির করেছিলেন যে খেলাফত বনু আব্বাসের কাছে আনা হবে, বনু ফাতিমার কাছে নয়; তাই তিনি খোরাसानের ওপর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন। তাঁর অভিমত ছিল যে খোরাসানীরা কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের সাথে যুক্ত নয়, এবং তাদের শূন্য মস্তিষ্ক, লোকবলের আধিক্য এবং শক্তি ও সাহসের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। ফলে খোরাसानকে বিপ্লবের দাওয়াত দেওয়া হলো।

[১] আনসাব আল-আশরাফ: ৪/৮৭।

[৪] আনসাব আল-আশরাফ: ৪/৮২।

সাধারণ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে মুহাম্মদ বিন আলী ১০০ হিজরিতে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। (তারিখ আত-তাবারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১০০) কিন্তু ইমাম তাবরী এটি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীতে ইমাম বালাজুরী একজন দায়ীর সনদে বর্ণনা করেছেন যে আন্দোলনটি সেই সময়ে শুরু হয়েছিল যখন খারিজিরা আফ্রিকার গভর্নর ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনাটি ১০২ হিজরির, অর্থাৎ ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতকালের। (সিয়ার আলাম আন-নুবালা, ৫/৫৯৩, ৫৯৪)। ১০০ হিজরিতে আন্দোলন শুরু হওয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে দূরহ; কারণ সেই সময় উমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন ছিল, যার ওপর তাঁর পুরনো শত্রুও সমুদ্র ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ বিন আলীর দাওয়াতের জন্য সাধারণ সমর্থনের কোনো আশা থাকতে পারত না।

[২] আত-তারিখ আল-ইসলামী, মাহমুদ শাকির: ৫/৪১; ৪৪; আখবার আদ-দাওলা আল-আব্বাসিয়াহ, পৃষ্ঠা ১৯১ থেকে ২২২।

[৩] আল-আলাম, জিরিকলী: ৬/২৭১।

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/২১৭।

...আসল ময়দান বানানো হয়েছিল। [১]

কেন্দ্রের জন্য ইরাককে কেন পছন্দ করা হয়েছিল?

ইরাকের মাটিও এই আন্দোলনের জন্য উর্বর ছিল কারণ সেখানে বনু উমাইয়ার বিরোধীরা এবং শিয়ানে আলী প্রচুর সংখ্যায় ছিল এবং মুহাম্মদ বিন আলী চেয়েছিলেন যে শিয়ানে আলীর সমস্ত দলকে এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ফলে ইরাকের কুফা শহরকে, যা শিয়ানে আলীর দুর্গ হওয়ার পাশাপাশি ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রেও অবস্থিত ছিল, আন্দোলনের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন আলী নিজের আবাসস্থল হুমায়মাতে রেখেছিলেন যাতে তিনি দামেস্কের এত কাছে থাকেন যে কোনো বিরোধী সরকার আন্দোলন চালাতে না পারে। তাদের কাছে কেবল বিশেষ মুরিদরাই আসতেন এবং তারাও বণিক বা হাজীদের বেশে আসতেন। এই বিশেষ মুরিদরাই কুফায় থেকে এই আন্দোলন পরিচালনা করতেন। সমস্ত নির্দেশ কুফা থেকে খোরাসানে পাঠানো হতো। আবার খোরাসানের খবর প্রথমে কুফায় আসত এবং সেখান থেকে হুমায়মায় পৌঁছে দেওয়া হতো। [২]

ইরাক ও খোরাসানের লোকদের আব্বাসী আন্দোলনে আগ্রহের কারণ:

ইরাক ও খোরাসানের অনেক লোক অনারব জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামির কারণে আরবদের শাসনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখত। তারা সরকারের পরিবর্তনের এই আন্দোলনে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিল; কারণ তাদের আশা ছিল যে এভাবে নতুন শাসন ব্যবস্থায় অনারবরাও সম্মানজনক অংশ পাবে। বিপ্লবীদের স্লোগান (বিশেষ ধ্বনি) ছিল “আর-রিদা মিন আল-ই-মুহাম্মদ” (মুহাম্মদের বংশধরদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তি)। স্পষ্টতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর ও সন্তানদের নেতৃত্ব প্রতিটি মুসলমানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রিয় বিষয়; তাই মানুষ দ্রুত এর সাথে একমত হতে থাকে। আব্বাসীয়রা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই সময়ে শিয়ানে আলীসহ প্রতিটি দলকে সাথে রাখার জন্য তারা তাদের দাওয়াতে “ইমাম” এবং “ইমামত” এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছিল। বাস্তবতা তখন উন্মোচিত হয় যখন তারা নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করার পর শিয়া আকিদার ইমামতের পরিবর্তে খলিফা এবং খেলাফতের পরিভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। সেই সময়ে ইমাম এবং ইমামতের চর্চা ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল যাতে রাফেজিদের পাশাপাশি প্রতিটি দল একে নিজেদের জন্য উপকারী মনে করে এবং সাধারণ মানুষ এই ধারণা পোষণ করে যে এই দাওয়াতের পেছনে কোনো অসাধারণ প্রতিভাধর “ইমাম” বিদ্যমান। [৩]

بنو فاطمه کو ملانے میں بھی کامیابی (বনু ফাতেমাকে সাথে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সাফল্য:)

বনু হাশিমের একটি দলও শিয়ানে আলীর সহযোগিতায় বিপ্লবের জন্য সক্রিয় ছিল। এই দলে হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদের বিশিষ্ট ব্যক্তির ছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে হযরত জয়নুল আবেদীন (রা.), তাঁর পুত্র হযরত বাকের (রা.) এবং পৌত্র হযরত জাফর সাদিক (রা.) সারা জীবন বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। তবে তাদের মধ্যে যারা বিপ্লবী চিন্তাধারা পোষণ করতেন...

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৮১/৪

[২] আত-তারিখুল ইসলামী, মাহমুদ শাকের: ৪১/৫ থেকে ৪৪

[৩] আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ, পৃ. ১৮০ থেকে ২০০; আনসাবুল আশরাফ: ৮৪/৪ থেকে ৮৭

কিছু লোকও ছিল যাদের মধ্যে মদিনা মুনাওয়ারার এক বুজুর্গ আবদুল্লাহ বিন হাসান এবং তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহিম অগ্রগণ্য ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আলী তাদের সবাইকে সাথে মিলিয়ে নিলেন। তিনি প্রতি বছর মদিনায় যেতেন যেখানে এই ব্যক্তিদের সাথে গোপন বৈঠক হতো। [১]

বনু ফাতেমা কখনোই পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে বিদ্রোহ (খুরুজ) করেনি। হযরত জয়নুল আবেদিন-এর পুত্র যায়েদ বিন আলী হিশাম বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে হঠাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হন, এর পরপরই তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া খোরাসান থেকে রুখে দাঁড়ান এবং তাঁরও একই পরিণতি হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন আলী, যিনি ১০২ হিজরিতে তাঁর আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন, ২২ বছর ধরে গোপন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং কোনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি উমাইয়া খলিফাদের সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখেন এবং যথাসম্ভব তাদের নিজের প্রতি আশ্বস্ত রাখেন। খলিফারাও তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। [২]

হিশাম বিন আবদুল মালিকের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন আলীর প্রতি সহনশীলতা:

খলিফারা মাঝে মাঝে এই দাঈদের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারতেন কিন্তু তাদের ধারণা ছিল না যে এর শিকড় কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের নিজেদের সরকারের শক্তির ওপর আস্থা ছিল। কখনো কখনো এমন দাঈদের গ্রেপ্তারও করা হতো। কিন্তু আন্দোলন সমানতালে চলতে থাকে। মুহাম্মদ বিন আলী প্রতি বছর মদিনা মুনাওয়ারায় যেতেন এবং মানুষের ওপর দুহাতে খরচ করতেন, বংশীয় আভিজাত্যের সাথে এই দানশীলতা তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। [৩] হিশাম তাঁর শেষ বছরগুলোতে কেবল এতটুকু আভাস পেয়েছিলেন যে মুহাম্মদ বিন আলী খেলাফতের আকাঙ্ক্ষী, যার ফলে তিনি তাঁকে বন্দি করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু পরে কিছু উপদেষ্টার পরামর্শে ক্ষমা করে দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। [৪] আসলে উমাইয়াদের একেবারেই ধারণা ছিল না যে তাদের রাজধানী সংলগ্ন গ্রাম থেকে একটি আন্দোলন শুরু হয়ে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুহাম্মদ বিন আলীর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা:

এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন আলী বিপ্লবের জন্য আরও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এমন সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন যখন সরকারে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং শাসককে আপনজনদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হবে। মুহাম্মদ বিন আলী বলতেন:

“বনু উমাইয়ার শাসন পতনের একটি সুযোগ তখন এসেছিল যখন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু হয়েছিল। দ্বিতীয় সুযোগটি প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষে পাওয়া গিয়েছিল। তৃতীয় সুযোগটি হলো আফ্রিকার বিদ্রোহ। এখন আমাদের সাহায্যকারীরা পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবে এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো মরক্কো পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।” [৫]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৮০ থেকে ৮৭

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৮৬

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৮২

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৮৪, ৮৬, ৮৭

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ৪/৮৫

মুহাম্মদ বিন আলীর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হলো: (১) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর জুবাইরি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু বনু উমাইয়া এবং খারেজিরা গৃহযুদ্ধ শুরু করে যা নয় বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। (২) উমর বিন আবদুল আজিজের ইন্তেকালের পরপরই ১০১ হিজরিতে একদিকে ইয়াজিদ বিন মুহান্নাব, অন্যদিকে খারেজি এবং তৃতীয় দিকে তুর্কিরা বিদ্রোহ করে মুসলিম বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়। (৩) ১২২ হিজরিতে আফ্রিকায় বারবাররা এক বিশাল বিদ্রোহ করে বনু উমাইয়াকে মারাত্মক আঘাত হানে। মুহাম্মদ বিন আলীর উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রথম দুটি সুযোগে যদি বনু হাশিম রুখে দাঁড়াত তবে তারা ক্ষমতা পেতে পারত কিন্তু তারা এই সুযোগগুলো নষ্ট করেছে। তৃতীয় সুযোগটি মুহাম্মদ বিন আলীর জীবদ্দশাতেই পাওয়া যায় যার পর তাঁর দাঈরা পুরোদমে কাজ শুরু করে দেয়। এরপর আরও সুযোগ খোদ আরবদের গৃহযুদ্ধ তৈরি করে দেয়।

আন্দোলনের স্বার্থে আকিদা ও মতাদর্শে শিথিলতা এবং অস্পষ্টতার নীতি:

মুহাম্মদ বিন আলী সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত আকিদার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে বিদ্রোহের (খুরুজ) শর্তাবলির ব্যাপারে তিনি জমহুর ওলামাদের সাথে একমত ছিলেন না; বরং তাঁর মতে শাসক নেককার হলেও বিদ্রোহের বিধান রহিত হতো না। তাঁর ধারণা মতে, বনু উমাইয়া পরিবার হিসেবেই অযোগ্য ছিল; এই কারণেই হিশাম বিন আব্দুল মালিকের মতো সজ্জন ব্যক্তির শাসনামলেও তিনি তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনি প্রত্যেক মুসলমানের মতো হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-কে সম্মান করতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করাকে কৌশলের পরিপন্থী মনে করতেন। সম্ভবত তাঁর সামনে তাঁর চাচা য়ায়েদ বিন আলীর অবস্থা বিদ্যমান ছিল, যিনি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর প্রতি ভক্তি প্রকাশের কারণে সাবায়ি গোষ্ঠীর জনবল ও প্রচারণার শক্তি হারিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন আলী সাবায়ি গোষ্ঠীকে নিজের সাথে যুক্ত রাখার জন্য একজন দুনিয়াদার রাজনীতিবিদের মতো ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং পূর্ববর্তী ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত মতামতকে অস্পষ্ট রেখেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কৌশলের খাতিরে “খলিফা” ও “খিলাফত”-এর পরিবর্তে “ইমাম” ও “ইমামত” পরিভাষা ব্যবহার করেন। একইভাবে এই প্রচারণাও চালান যে, বনু হাশিমের উপস্থিতিতে অন্য কারো ইমামতের অধিকার নেই; সুতরাং বনু উমাইয়ার সকল শাসকই জালিম ও জবরদখলকারী হিসেবে চলে আসছে। এই ভিত্তিতেই মুহাম্মদ বিন আলীর দাঈগণ বনু উমাইয়া ও বনু মারওয়ানের জুলুম-নির্যাতনকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা.)-এর কিছু হাদিসকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হতে থাকে।

রাজনৈতিক স্বার্থে দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতার বিপজ্জনক পরিণতি:

কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে দ্বীনি ব্যাখ্যায় পরিবর্তন, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন এবং অধীনস্থদের সামান্য মতাদর্শিক বিচ্যুতির সুযোগ দেওয়ার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ প্রমাণিত হলো এবং নিম্নস্তরের লোকেরা বিষয়টিকে কোথায় নিয়ে পৌঁছাল। কিছু দাঈ রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে কেবল ঐতিহাসিক বর্ণনায় কিছু সংযোজনই করেনি, বরং কিছু হাদিসও নিজেরা জাল করে নিল। বিশেষ করে সাবায়ি গোষ্ঠী, যারা এই আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, হযরত আলী (রা.)-এর অন্যান্য খলিফাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ডজন ডজন জাল হাদিস প্রচার করে দিল এবং ইরাক ও ইরানের অনেক মুর্থ লোক অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই আকিদা গ্রহণ করে নিল।

সেই যুগের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস আমাশ সুলাইমান বিন মেহরান (র.) (মৃত্যু ১২৭ হিজরি) এই সামাজিক পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে বলতেন: “আমার মোটেও প্রত্যাশা ছিল না যে, আমি এমন সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকব যখন আবু বকর ও উমর (রা.)-এর ওপর হযরত আলী (রা.)-কে প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকবে।” [১]

যেহেতু আন্দোলনের সময় পরবর্তী খলিফা কে হবেন এবং তিনি বনু হাশিমের কোন পরিবার থেকে হবেন তা নির্ধারিত ছিল না; তাই আলভী ও ফাতেমী পরিবারের ভক্তরাও এই আশায় কাজ করছিল যে খিলাফত আলী (রা.)-এর বংশধররা পাবে। তবে আব্বাসী পরিবারের বিশেষ দাঈগণ আগাম সতর্কতা হিসেবে এমন সব বর্ণনা প্রচার করছিলেন যার মাধ্যমে আব্বাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন: প্রচার করা হলো...

[১] আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ লিল ফাসাউয়ি: ২/৭৬৪, তবা মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

যেমনটি নবী আকরাম (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, একদিন খিলাফত তাঁর সন্তানদের মধ্যে আসবে। [১]

উমাইয়া যুগে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং তাদের শাসকদের মন্দ দিকগুলো বর্ণনায় অতিরঞ্জন করা হয়েছে। আমির মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর কাল্পনিক জুলুমের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। কারবালার ঘটনার খুঁটিনাটি এবং উমাইয়া শাসকদের মন্দ দিকগুলোর সাথে অত্যন্ত উস্কানিমূলক অতিরিক্ত বিষয়াদি যোগ করা হয়েছে। এই প্রোপাগান্ডা কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কিছু বড় বড় সরকারি কর্মকর্তা এবং সেনাবাহিনীর আমীররাও এই বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এতে যোগ দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে, বনু আব্বাসের এই রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে, তারা জাতীয় স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু দ্বীনি মূল্যবোধ এবং কিছু শরয়ী বিধান উপেক্ষা করাকেও মেনে নিয়েছিলেন। এভাবে তারা সেই শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করার দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেগুলোর মধ্যে তারা প্রথম দিন থেকেই নিজেরা লিপ্ত ছিলেন। এটাই কারণ যে, এই আন্দোলনে সেই যুগের মহান ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং সংস্কারকদের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই দেখা যায় না। আর এটাই কারণ যে, বনু হাশিমের অন্যান্য বুজুর্গদের বিপরীতে এই আব্বাসীয় নেতাদের কেবল রাজনীতিবিদ মনে করা হতো এবং ওলামায়ে কেরাম ইতিহাসে তাদের নামের সাথে ‘রাযিয়াল্লাহু আনহু’ বা ‘হযরত’-এর মতো আদব ব্যবহার করেননি।

শাসকদের পক্ষ থেকে আব্বাসীয় দাঈদের ধরপাকড়:

এই সময়ে শাসকদের কানে আব্বাসীয় আন্দোলনের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। গভর্নররা গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাদের তথ্যের ভিত্তিতে জায়গায় জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছিল। ইরাকের গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাসরী এই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। কোনো আব্বাসীয় দাঈ তার হাতে ধরা পড়লে তিনি সাধারণত কোনো দ্বিধা ছাড়াই তার গর্দান উড়িয়ে দিতেন। আর সেই ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান ছিল যারা দুই-তিনশ বেত্রাঘাত খেয়ে বেঁচে যেত। [২]

মুহাম্মদ বিন আলীর মৃত্যু এবং ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত হওয়া:

১২৫ হিজরিতে ৭০ বছর বয়সে মুহাম্মদ বিন আলী মৃত্যুবরণ করেন। [৩] এর আগেই তিনি তার পুত্র ইব্রাহিমকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন। ইব্রাহিম আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত করেন এবং ইরাক, খোরাসান, মিসর ও হিজাজসহ প্রতিটি প্রদেশের জন্য স্থায়ী দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। [৪]

আবু মুসলিম খোরাসানি:

এই সময়ে ইব্রাহিম আবু মুসলিম খোরাসানির মতো একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং অনুগত যুবককে পেয়ে যান, যার বাগ্মিতা, চতুরতা, সুযোগ চেনার ক্ষমতা এবং কূটকৌশলে দক্ষতা কয়েক বছরের মধ্যেই পামিরের চূড়া থেকে শুরু করে ফোরাত নদীর তীর পর্যন্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। [৫]

[১] কালুয যাহাবী: হাযাল খবর লা ইয়াসাহ্ (সিয়ার আলামুন নুবালা: ৫৮/৬)। “আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ” এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে বনু আব্বাসের ফযীলত সম্পর্কে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় যার কোনো ভিত্তি নেই।

[২] আনসাবুল আশরাফ: ১১৭/৪... ফায়দা: মুহাম্মদ বিন আলী অত্যন্ত সুন্দর এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন। তার এবং তার পিতা আলী ইবনে আব্দুল্লাহর চুল ঘন ছিল। তাদের পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর কপাল এতটাই উঁচু ছিল যে, তার মাথা তার পিতা আব্বাস (রা.)-এর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাত। এর থেকে আব্বাসীয়দের উচ্চতার আন্দাজ করা যায়। (তারিখুল ইসলাম, যাহাবী: ৪৪৩/৮)

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৮০/৪। যদিও তার মৃত্যুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ উক্তি হলো ১২২ হিজরি, কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর ১২৫ হিজরিকে সহীহ বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩১০/৯)। ওয়াক্বিদীর মতে মুহাম্মদ বিন আলীর মৃত্যু ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদে হত্যার (জমাদিউল আখিরা ১২৬ হিজরি) কিছুকাল আগে হয়েছিল। (আনসাবুল আশরাফ: ৮০/৪)

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ১১৭ থেকে ১১৪/৪।

[৫] আনসাবুল আশরাফ: ১১৭।

বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইরানি বংশোদ্ভূত আবু মুসলিম খোরাসানির আসল নাম ছিল আবদুর রহমান বিন মুসলিম। ১০০ হিজরিতে ইসফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। দেখতে খাটো গড়ন, গমের মতো গায়ের রঙ এবং নিচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করাকেই সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করতেন। [১]

১২০ হিজরিতে তিনি মুহাম্মদ বিন আলীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১২৫ হিজরিতে ইব্রাহিমের ডান হাত হিসেবে কাজ করেন এবং ১২৮ হিজরিতে খোরাসানের দাঈ নিযুক্ত হয়ে সেখানে পৌঁছান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর। তিনি খুব দ্রুত হাজার হাজার মানুষকে নিজের চারপাশে একত্রিত করে ফেলেন। এখন তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন যে কখন বনু উমাইয়ার শক্তি ভেঙে পড়বে এবং বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে। [২]

ইয়েমেনি ও মুদারি গোত্রীয় বিদ্বৈষ তুঙ্গে, মসজিদে মিস্বর আলাদা আলাদা:

আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যে, হিশাম বিন আবদুল মালিকের পর দ্বিতীয় ওয়ালিদের অযোগ্যতা পুরো দেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় ওয়ালিদকে হত্যা করে তৃতীয় ইয়াজিদ ক্ষমতায় এলেও তিনি পূর্ববর্তী প্রশাসনিক ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং দ্রুতই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ইব্রাহিম আসলেন, তারপর মারওয়ান বিন মুহাম্মদ একে এগিয়ে নিয়ে চললেন। এই রাজনৈতিক সংকটের কারণে প্রদেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বনু উমাইয়ার পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, উপটৌকন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আরব ও অনারবদের (আজম) মধ্যে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো, তা রূপ পরিবর্তন করে খোদ আরবদের নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব গোত্রগুলো একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে।

ইসলাম গোত্রীয় বিদ্বৈষ দূর করার জন্য ন্যায়বিচার, ত্যাগ এবং নিঃস্বার্থতার শিক্ষা দিয়েছে। এর পরিবর্তে যখন স্বার্থপরতা, মুনাফাখোরি এবং অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মানসিকতা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন গোত্রীয় বিদ্বৈষ নতুন রূপে ফিরে এসে সমাজকে সংঘাতপূর্ণ করে তোলে। এমনকি মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না এবং নিজের ভাইয়ের গলা কাটতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। দ্বিতীয় হিজরি শতকের শুরুর দিকে মুসলিম সমাজকে এমনই এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। যখন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন নানা ধরনের গোত্রীয় বিদ্বৈষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল খোদ আরবদের মধ্যে ইয়েমেনি ও মুদারি গোত্রীয় বিদ্বৈষ। মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী পদের অধিকারী অধিকাংশ ব্যক্তিই এই দুই গোত্রের কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

যখন এই আরব কর্মকর্তাদের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল, তখন খোদ রাজধানী দামেস্কের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ইয়েমেনি ও মুদারিরা একে অপরের সাথে সালাত আদায় করতেও রাজি ছিল না। শহরের প্রতিটি মসজিদে দুটি করে জামাত কায়েম করা হলো। জামে উমবিতে দুইজন ইমাম দুটি আলাদা মিস্বরে আলাদা খুতবা দিতেন এবং আলাদাভাবে ইমামতি করতেন। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩৪২

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৪৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৫৯

গোত্রীয় গোঁড়ামির কারণে খোরাসানে সরকারি বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ:

নতুন উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ মুদারি গোত্রগুলোর সমর্থক ছিলেন এবং ইয়েমেনি গোত্রগুলোকে দমন করতে চেয়েছিলেন। খোরাসানে তার নায়েব (প্রতিনিধি) নাসর বিন সাইয়ারও মুদারি ছিলেন। খলিফার এই পক্ষপাতিত্ব দেখে ইয়েমেনি গোত্রগুলোও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে খোরাসানের ইয়েমেনি গোত্রগুলো গভর্নরের বিরোধিতা শুরু করে। দেখতে দেখতে খোরাসানের পরিস্থিতি দামেস্কের চেয়েও বেশি খারাপ হয়ে গেল। ইয়েমেনি গোত্রগুলোর নেতা জুদাই' বিন আলী আল-কিরমানি রাবিআ গোত্রের নেতাদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এটি দেখে মুদারি গোত্রগুলো নাসর বিন সাইয়ারের চারপাশে সমবেত হলো। এভাবে সরকারি বাহিনীগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং তারা এই সুযোগই পেল না যে তারা খোরাসানে উদীয়মান তৃতীয় শক্তি আবু মুসলিম খোরাসানির কর্মকাণ্ড রোধ করতে পারে।

এই সময়ে আবু মুসলিম খোরাসানের বিভিন্ন অংশে নিজের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার পর একটি সমান্তরাল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। খোরাসানে পরস্পর যুদ্ধরত সরকারি বাহিনীর উভয় দলই নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য তার সমর্থন পেতে আগ্রহী ছিল। আবু মুসলিম উভয় পক্ষের সাথে আলাদাভাবে কথা বলে তাদের নিজের সমর্থনের আশ্বাস দিতে থাকেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধরত সরকারি বাহিনীগুলো এই বিদ্রোহীকে দমন করার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকল।

এই ঘটনা তখন আরও বেড়ে গেল যখন নাসর বিন সাইয়ার বিরোধী দলের নেতা জুদাই' বিন আলী আল-কিরমানিকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করলেন। তার ধারণা ছিল যে এভাবে বিদ্রোহের অবসান ঘটবে, কিন্তু বিদ্রোহীরা নিহতের পুত্র আলী বিন জুদাই'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে আগের চেয়েও বেশি কঠোরতা অবলম্বন করল। [১]

আবু মুসলিম যদিও সমস্ত আরবের শত্রু ছিলেন, তবে তার প্রথম লক্ষ্য ছিল মুদারি গোত্র; কারণ কুরাইশ এবং বনু উমাইয়া এরই শাখা ছিল। তার নেতা ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদও তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আরবদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক। [২] যখন কয়েক মাসের গৃহযুদ্ধের ফলে মুদারিদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন আবু মুসলিম নাসর বিন সাইয়ারের বিরোধী আরব গোত্রগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হলেন এবং প্রকাশ্যে সরকারের মোকাবিলায় নেমে এলেন।

নাসর বিন সাইয়ার সরকারি বাহিনীর দুর্বলতা দেখে বুঝতে পারলেন যে বনু উমাইয়ার শাসনের সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। তিনি অবিলম্বে খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদকে পত্রের মাধ্যমে আবু মুসলিমের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে নিচের কবিতাগুলো লিখলেন:

أرى بين الرماد وميض نار ... وأخشى أن يكون لها ضرام

আমি ছাইয়ের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছি... এবং আমি ভয় পাচ্ছি যে এটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

فإن النار بالعودين تذكى ... وإن الحرب مبدؤها كلام

নিশ্চয়ই আগুন দুটি কাঠের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে... আর যুদ্ধের সূচনা হয় কথা দিয়ে।

فقلت من التعجب ليت شعري ... أيقاظ بني أمية أم نيام

আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, হায়! আমি যদি জানতাম... বনু উমাইয়ারা কি জেগে আছে নাকি ঘুমে বিভোর?

[১] তারিখুত তারারি: ৭/৩৫৩ থেকে ৩৭১; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/৩৫৮ থেকে ৩৬০।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৪৭।

বাস্তবতা এই যে, আরবদের ভাগ্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই ঘুম এতটাই গভীর ছিল যে, বারবার নাড়া দেওয়া সত্ত্বেও আরবদের ইঁশ ফেরেনি এবং তারা পতনের খাদের কিনারায় একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল।

নসর বিন সাইয়্যারের তখন বিশাল সৈন্য সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যাতে তিনি আবু মুসলিম এবং তার সমর্থক বিদ্রোহী আরব গোত্রগুলোকে দমন করতে পারেন; কিন্তু এগুলো ছিল সেই দিন যখন মারওয়ান বিন মুহাম্মদ খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন; তাই কোথাও থেকে সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। নসর বিন সাইয়্যার একের পর এক বেশ কিছু পত্র পাঠিয়েছিলেন কিন্তু খিলাফত দরবার থেকে তিনি কোনো সাহায্য পাননি। [১]

আব্বাসী ইমাম ইব্রাহিমের গ্রেফতারি ও মৃত্যুদণ্ড:

সরকার ইমাম ইব্রাহিমের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিল যিনি সিরিয়াতেই অবস্থান করছিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে আবু মুসলিমের একটি চিঠি এবং তার জবাবে ইব্রাহিমের একটি পত্র ধরা পড়ে। এই চিঠিপত্রে খোরাসানে নিযুক্ত সমস্ত আরব সরদার ও সৈন্যদের হত্যা করার ইঙ্গিতও ছিল।

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ এই অকাট্য প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর ইব্রাহিমকে গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করেন। ইব্রাহিমকে হাজির করা হলে মারওয়ান তাকে আব্বাসী আন্দোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ইব্রাহিম অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মারওয়ান সেই চিঠিগুলো পেশ করেন। ইব্রাহিমের কাছে কোনো উত্তর ছিল না। মারওয়ান তাকে হত্যা করান। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২২৪ থেকে ২২৫

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৩৫ থেকে ৪৩৭; আনসাবুল আশরাফ: ৪/১২১, ১২২

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ-এর আবির্ভাব

ইব্রাহিমের দুই ভাই ছিলেন: আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ এবং আবু জাফর আল-মানসুর। পরবর্তীতে এরাই বনু আব্বাস খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হন। ইব্রাহিম নিহত হওয়ার সাথে সাথেই তারা দুজনেই সিরিয়া থেকে পালিয়ে ইরাকে পৌঁছে যান। এখানে তারা কুফায় তাদের সমর্থকদের কাছে আশ্রয় নেন। ওদিকে আবু মুসলিম খোরাসানি এসে পৌঁছান। এই পরামর্শ সভায় আবুল আব্বাস আস-সাফফাহকে আব্বাসীয় আন্দোলনের নতুন ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। সাফফাহ নেতৃত্ব গ্রহণ করেই আবু মুসলিমকে এই নির্দেশ দিয়ে পুনরায় খোরাসানে পাঠান যে, একটি নির্ধারিত তারিখে যেন পুরো খোরাসানের আব্বাসীয় স্বেচ্ছাসেবকরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে।

নির্ধারিত তারিখে পারস্যের সীমান্ত থেকে খোরাসানের শেষ সীমানা পর্যন্ত প্রতিটি শহরের আব্বাসীয় স্বেচ্ছাসেবকরা কালো পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে আসে। এটি এই ঘোষণার শামিল ছিল যে, আমরা বনু হাশিমের সাথে আছি। খোরাসানের গভর্নর নাসর বিন সাইয়ার এই বিপ্লব দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আরবরা ঐক্যবদ্ধ না হলে তাদের ধ্বংস নিশ্চিত। তিনি বিদ্রোহী আরব গোত্রগুলোকে সন্ধির বার্তা পাঠান এবং এই কবিতাগুলো লিখে পাঠান:

أَبْلَغُ رَيْعَةٍ فِي مَرَوْ وَأَخَوَتَهَا ... أَنْ يَغْضَبُوا قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ الْغَضَبُ

রাবিআ গোত্র এবং মার্ব শহরের তাদের মিত্রদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে, তারা যেন রাগান্বিত (সজাগ) হয় এর আগেই যে রাগ করা নিরর্থক হয়ে যায়।

بَيْنَكُمْ ... كَأَنَّ أَهْلَ الْحِجْيِ عَنْ رَأْيِكُمْ غَيْبُ مَا بِالْكُفِّ تَنْشِبُونَ الْحَرْ

তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছ... যেন তোমাদের মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই নেই।

وَتَرْكُونَ عَدُوًّا قَدْ أَحَاطَ بِكُمْ ... مِمَّنْ تَأْسَبُ لَا دِينَ وَلَا حَسَبُ

তোমরা সেই শত্রুকে ছেড়ে বসে আছ যে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে... যার কোনো দীন নেই এবং কোনো বংশীয় মর্যাদা নেই।

لَا عَرَبٌ مِثْلُكُمْ فِي النَّاسِ نَعْرِفُهُمْ ... وَلَا صَمِيمُ الْمَوَالِي إِنْ هُمْ نُسِبُوا

না এই লোকেরা তোমাদের মতো আরব যে আমরা তাদের চিনি... না তারা তাদের বংশ পরিচয়ে খাঁটি আযাদকৃত গোলাম (মাওয়ালি)।

قَوْمًا يَدِينُونَ دِينًا مَا سَمِعْتُ بِهِ ... عَنِ الرَّسُولِ وَلَا جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ

তারা এমন এক দীন মানে যা আমরা না রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি এবং না এ সম্পর্কে আসমানী কিতাবসমূহে কিছু এসেছে।

فَمَنْ يَكُنْ سَائِلٌ عَنْ أَصْلِ دِينِهِمْ ... فَإِنَّ دِينَهُمْ أَنْ تَهْلِكَ الْعَرَبُ

সুতরাং যে তাদের দ্বীনের আসল রূপ জানতে চায় সে জেনে রাখুক যে, তাদের দ্বীন কেবল এটাই যে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাক।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

এই কবিতাগুলো কাজ করল। রবীআ এবং ইয়েমেনি গোত্রগুলো মুদার গোত্রগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবু মুসলিম খোরাসানির মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিল। ব্যাপক প্রস্তুতির পর নসর বিন সাইয়ারের নেতৃত্বে আরবদের এই সম্মিলিত বাহিনী আবু মুসলিমকে দমনের জন্য ময়দানে নামল। কিন্তু আবু মুসলিমও ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। সে ইয়েমেনি গোত্রগুলোর নেতা আলী বিন জুদাইকে এই অনুশোচনামূলক বার্তা পাঠাল:

“তোমার আত্মমর্যাদার কী হলো! যে ব্যক্তি গতকাল তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল, আজ তুমি তারই পতাকাতলে যুদ্ধ করছ।”

এই বার্তা আলীকে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিল এবং সে নসর বিন সাইয়ারের সঙ্গে ত্যাগ করে চলে গেল। এভাবে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হতে হতেও হলো না। এর পরপরই ইয়েমেনি গোত্রগুলো এবং রবীআ আবু মুসলিম খোরাসানির সাথে মৈত্রী স্থাপন করল এবং নসর বিন সাইয়ার আবারও একা হয়ে গেলেন।

আবু মুসলিম খোরাসানির কাছে এখন এক লক্ষেরও বেশি সশস্ত্র লোকের শক্তি ছিল। সে কালক্ষেপণ না করে খোরাসানে উমাইয়াদের কেন্দ্র ‘মার্ত’-এর দিকে সৈন্য পাঠাল। নসর বিন সাইয়ার কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালালেন এবং আবু মুসলিম ‘মার্ত’ দখল করে সমস্ত আরব নেতাদের হত্যা করল। মার্ত দখলের পর আবু মুসলিম কোনো অসুবিধা ছাড়াই সমরকন্দ থেকে শুরু করে ইরাকের শেষ সীমানা পর্যন্ত প্রতিটি শহরে নিজের গভর্নর নিযুক্ত করল। আবু মুসলিম আরবদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত; তাই যখন সে শক্তির দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো, তখন সে তার মিত্র আরব নেতা আলী বিন জুদাইকেও মৃত্যুর ঘাটে নামাল। [১]

আবু মুসলিম খোরাসানির ‘আরব বিদ্বেষী অভিযান’ আব্বাসীয় নেতাদের নির্দেশেই শুরু হয়েছিল। এর ভয়াবহ পরিণতি শুধু উম্মতে মুসলিমাকেই নয়, বরং খোদ আব্বাসীয়দেরও ভোগ করতে হয়েছিল। এই যুগে আরব গোত্রগুলো বিপুল সংখ্যায় খোরাসান ও ইরানে বসবাস করত। এই আরব গোত্রগুলো সাহাবীগণের যুগে এখানে এসেছিল এবং প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলগুলোতে তাদের প্রভাব পড়ছিল, যার ফলে এখানকার সংস্কৃতিতে আরবের রঙ চড়তে শুরু করেছিল। যদি আবু মুসলিম খোরাসানি না আসত, তবে হয়তো আজ ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতেও আরবি ভাষা একইভাবে প্রচলিত থাকত যেমনটি ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কোতে রয়েছে। আজমি সভ্যতা দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতেই বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং পুরো ইসলামি বিশ্ব ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে একই রঙে রঞ্জিত দেখা যেত। কিন্তু আবু মুসলিম খোরাসানি আজমে বসবাসরত আরবদের এমনভাবে ধ্বংস করল যে তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক নিহত হলো এবং অসংখ্য লোক পালিয়ে ইরাক, সিরিয়া, জাজিরাতুল আরব এবং মিশরে চলে গেল। এভাবে মুমূর্ষু ইরানি ও খোরাসানি সভ্যতা পুনরায় জেগে উঠল এবং এরপর একে আর কখনো দমন করা সম্ভব হয়নি। এই আজমি সভ্যতা এবং আজমি অভিজাতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খোদ আব্বাসীয়দের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়াল এবং মামুন ও মুতাসিমের মতো খলিফাদের বিদায়ের পরপরই আজমিরা খেলাফতকে জিম্মি করে ফেলল।

মারওয়ান বিন মুহাম্মদের সৈন্য চালনা এবং শোচনীয় পরাজয়:

মারওয়ান বিন মুহাম্মদ এই সময়ে দিনের আরাম ও রাতের ঘুম হারাম করে খারেজিদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। যদি তিনি কয়েক মাস আগেও এই অভিযান থেকে অবসর পেতেন, তবে হয়তো তিনি আবু মুসলিম খোরাসানির মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত...

[১] তারিখুত তাবারী, ৭/৩৭৭ থেকে ৩৮৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৪/৩৬০ থেকে ৩৬৯।

হিজাজ ও শামের এই অবাধ্যতাকে দমন করার প্রচেষ্টা তখনই সফল হলো যখন পুরো খোরাসান, ইরান ও ইরাক মুসলিমদের দখলে চলে এসেছিল। মারওয়ান তা সত্ত্বেও সাহস হারাননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে জাজিরা ও শামের সমস্ত সামরিক শক্তি একত্রিত করে মসুলের নিকটবর্তী জাব নদীর তীরে তাঁবু ফেললেন। তার সাথে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল। অন্যদিক থেকে সাফফাহর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী তার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন। মারওয়ান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন কিন্তু একের পর এক বিজয়ের ফলে আব্বাসীয়দের মনোবল ছিল তুঙ্গে এবং অন্যদিকে ছিল ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত এক শাসক যার শাসনের পতন ও ধ্বংসের সময় ঘনি়ে এসেছিল।

ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, মারওয়ান বিন মুহাম্মদের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহস কোনো কাজে আসলো না। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তার বাহিনী রণক্ষেত্র থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার সৈন্য নদীতে ডুবে মারা গেল। ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল উমাইয়া আমির ও রাজপুত্রদের সংখ্যাই ছিল প্রায় তিনশ। তাদের মধ্যে সাবেক খলিফা ইবরাহিম বিন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকও ছিলেন। এই ঘটনাটি ১১ই জমাদিউল আখিরা ১৩২ হিজরির। [১] এভাবে জাব নদীর রক্তক্ষয়ী ঢেউয়ে উমাইয়া খিলাফতের সেই সূর্য, যা আশি বছর ধরে মধ্যগগনে প্রদীপ্ত ছিল, এমনভাবে ডুবে গেল যে তা আর কখনো উদিত হয়নি।

দামেস্কের ওপর আব্বাসীয়দের দখল এবং উমাইয়া রাজপুত্রদের গণহত্যা:

মারওয়ান পরাজিত হয়ে মসুলের দিকে পালিয়ে গেলেন কিন্তু আব্বাসীয় বাহিনী তার পিছু নিল। তিনি শামে পৌঁছালেন কিন্তু সেখানেও প্রতিটি শহরে বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল এবং উমাইয়া আমিররা আব্বাসীয়দের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিল। মারওয়ান শামকে চিরবিদায় জানিয়ে মিশরের দিকে চলে গেলেন। এদিকে রমজান ১৩২ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন আলী আব্বাসীয় বাহিনী নিয়ে উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্কের সামনে উপস্থিত হলেন এবং কোনো বিশেষ বাধা ছাড়াই তা জয় করে নিলেন। [২]

আবদুল্লাহ বিন আলী অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। দামেস্ক দখলের পর তিনি ওমর বিন আব্দুল আজিজ ব্যতীত বনু উমাইয়ার পূর্ববর্তী সমস্ত খলিফাদের কবর খুঁড়ে ফেললেন এবং তাদের অবশিষ্ট হাড়গোড় একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললেন। [৩]

এরপর তিনি দামেস্কে বনু উমাইয়ার অনেক রাজপুত্র ও কর্মকর্তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে নিজের সাথে নিলেন এবং রামাল্লা থেকে বারো মাইল দূরে নহর আবি ফুতরুস-এর তীরে শিবির স্থাপন করে নির্দেশ দিলেন যে, উমাইয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিরস্ত্র করে হাজির করা হোক। তাদের একে একে নাম ধরে ডাকা হলো। তারা আশি জনেরও বেশি লোক ছিল। আবদুল্লাহ বিন আলী তাদের হাত বেঁধে দিলেন। তারপর তার খোরাসানি সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, লাঠি ও মুণ্ডুর দিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। এমনকি তাদের একজনও জীবিত রক্ষা পেল না। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৫৪ থেকে ২৫৬; তারিখুত তাবারী, ১৩২ হিজরির ঘটনাবলি; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪০৩।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪০০ থেকে ৪০৪; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/১৮-১৯।

[৩] আনসাবুল আশরাফ লিল বালাজুরি: ৪/১০৪।

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৩/৩৩৬; ৪/১০৪।

আব্বাসীয়দের পক্ষে বর্ণিত এই বর্ণনাগুলো আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বালাজুরি বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ বর্ণনা করলে তা অতিরঞ্জিত বলে গণ্য করা হতো।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মারওয়ান বিন মুহাম্মদের পরিণতি

মারওয়ান মিশরে এই সংবাদ পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বনু আব্বাসের কাছ থেকে কোনো কোমলতার আশা তার ছিল না। তাই নীল নদ পার হয়ে আফ্রিকায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু এই সময়ে আব্বাসী সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করতে করতে কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। মারওয়ান পথে ক্লান্তি ও ঘুমে বেহাল হয়ে বুসির নামক জনপদের একটি গির্জায় বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আব্বাসী সৈন্যরা অতর্কিতে সেখানে পৌঁছে গেল এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাকে সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করল। এভাবে বনু উমাইয়া খলিফাদের এই শেষ সাহসী শাসক মাটির সাথে মিশে গেলেন। এই ঘটনাটি ২৭ জিলহজ ১৩২ হিজরির।

তার মাথা কেটে আব্বাসী নেতা আবুল আব্বাস সাফফাহর কাছে পাঠানো হলো, যিনি কাটা মাথা দেখে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করলেন এবং বললেন: “আল্লাহর অনুগ্রহ, যিনি আমাদের তোমার ওপর বিজয় দান করেছেন এবং তোমার ও তোমার পরিবারের সাথে আমাদের হিসাব চুকিয়ে দিয়েছেন।”

মারওয়ান বিন মুহাম্মদের বয়স ছিল ৫৮ বছর, পাঁচ বছর দশ মাস শাসন করেছেন যার মধ্যে তিনি একদিনও শান্তি পাননি। যদি তাকে এত ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন হতে না হতো, তবে সম্ভবত তিনি একজন মহান দিগ্বিজয়ী হিসেবে প্রমাণিত হতেন। [১]

মারওয়ানের মা কুর্দিস্তানের অধিবাসী ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও উচ্চ সাহসী নারী ছিলেন। মারওয়ানের মৃত্যুর পর তিনি পরিবারের অন্যান্য নারী ও শিশুদের সাথে আফ্রিকার জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াতেন। এই সফরে শরিক এক ব্যক্তির বক্তব্য হলো যে, পায়ে হেঁটে হেঁটে তার পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত কিন্তু ঠোঁট থেকে একবারও উফ শব্দ বের হতো না। [২]

উম্মতের মনীষীদের দৃষ্টিতে শেষ উমাইয়া খলিফা

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন:

“তিনি ফর্সা, নীল চোখ, লম্বা দাড়ি এবং বড় মাথার অধিকারী ছিলেন। উচ্চতা ছিল মাঝারি, খেজাব লাগাতেন না। হিশাম ১১৪ হিজরিতে তাকে আজারবাইজান, আল-জাজিরা এবং আর্মেনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে অনেক শহর এবং অসংখ্য দুর্গ জয় করেছিলেন। জিহাদ কখনো ছাড়তেন না। তুর্ক, খাজার এবং এসব গোত্রের বিভিন্ন দলের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত ও পদানত করেছিলেন। তিনি সাহসী, বীর, সম্মুখ সমরে লড়াকু এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ যার সঙ্গ ছেড়ে দেন, সে অসহায় হয়ে পড়ে।” [৩]

হাফেজ জাহাবি রহ. লিখেছেন: “তিনি অশ্বারোহণ, যুদ্ধকৌশল, বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।” [৪]

তার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তার গুণাবলির প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। আব্বাসী খলিফা মনসুর একবার বলেছিলেন: “আল্লাহ মারওয়ানের ভালো করুন। তিনি কতই না বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কতই না সতর্ক মানুষ ছিলেন।” তার ছেলে মাহদী বলে উঠল: “তাহলে আপনি তাকে হত্যা করলেন কেন?” মনসুর বললেন: “আল্লাহর জ্ঞান ও তকদিরে এটাই লেখা ছিল।” [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪০০ থেকে ৪০৪; আনসাবুল আশরাফ: ৯/৩২১, ৩২২, ৩২৭; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/১৮ থেকে ২০

[২] তারিখ দামেশক: ৬২/১১২, অনু: আল-হাজ্জাজ বিন কুতাইবা

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৬৩

[৪] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি: ৮/৫৩৪

[৫] তারিখ দামেশক: ৫৭/৩৩৩

বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ানের যুগের ওপর এক নজর

বনু উমাইয়ার শাসনকাল প্রায় ৮৩ বছর স্থায়ী ছিল। চব্বিশ বছর পর্যন্ত ক্ষমতা বনু উমাইয়ার সুফিয়ানি শাখার হাতে ছিল, যাতে হযরত আমীর মুয়াবিয়া, ইয়াজিদ এবং মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ খলিফা হয়েছিলেন। বনু মারওয়ানের শাসনকাল ৬৪ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত প্রায় ৬৯ বছর ছিল, যাতে আব্দুল মালিক, ওয়ালিদ, সুলাইমান, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং অন্যান্য খলিফাসহ মোট দশজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন।

বিজয়ের দিক থেকে বনু উমাইয়ার পর তাদের সমকক্ষ কোনো ইসলামী শাসন কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শুধুমাত্র ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের যুগের বিজয়গুলো দেখা হলে দেখা যায় যে, বনু আব্বাস তাদের পাঁচশ বছরের শাসনামলে এর এক-চতুর্থাংশ এলাকাও জয় করতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দিক থেকেও এটি অত্যন্ত গৌরবময় যুগ ছিল, যেমনটি বিভিন্ন খলিফাদের অবস্থার অধীনে তাদের কর্মকাণ্ডের অনেক উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে।

তবে তাদের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও বনু উমাইয়ার অধিকাংশ খলিফা রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের শরয়ী দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে মনে করতেন। এটি সেই যুগের সালতানাতগুলোর একটি সাধারণ মেজাজ ছিল যা মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং পরবর্তীতে অন্যান্য শাসক পরিবারগুলোর মধ্যেও এই মেজাজের প্রতিফলন দেখা যায়। এই খলিফারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং বিশেষ করে ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্রে শরীয়ত মুতাহহারার বিধিনিষেধগুলো যখন চাইতেন ভেঙে ফেলতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরো উমাইয়া যুগে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে সাধারণ অফিসার পর্যন্ত সকলেই ইসলামকে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বাস করতেন। যদি ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদের মতো কোনো শাসক সীমা অতিক্রম করত, তবে তার শাসনকে খোদ রাষ্ট্রের আমীররাই প্রত্যাখ্যান করতেন। দেশের আইন ইসলামীই ছিল, সাধারণ অবস্থায় সমস্ত কাজ এরই আলোতে সম্পন্ন করা হতো এবং আদালতগুলোতে এরই ভিত্তিতে ফয়সালা হতো। কিন্তু সাধারণত শাসকরা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য জায়েজ বা নাজায়েজ এর পরোয়া করতেন না। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এই মেজাজের চরম অবস্থার বিরুদ্ধে বন্ধপরিকর ছিলেন, তার প্রচেষ্টার প্রভাব পরবর্তী কয়েকজন খলিফার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে শাসকরাও মানুষ এবং তাদের থেকেও ভুল হতে পারে। সুতরাং যদি এই বিদ্যুতিগুলো ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত হয় এবং জাতির ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, তবে সেগুলো উপেক্ষা করাই সমীচীন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইতিহাসকে শাসকদের জীবনী হিসেবে সংকলন করেছেন এবং তারা কেবল শাসকদের ব্যক্তিগত অবস্থাকেই অনেক গুরুত্ব দেননি, বরং এ বিষয়ে সব ধরনের ভালো-মন্দ, আজোবাজে কথাগুলোও সংগ্রহ করে গেছেন, অথচ এর প্রয়োজন ছিল না। এই পদ্ধতির ক্ষতি এই হয়েছে যে, ইতিহাসের সঠিক মর্যাদা—যা একটি উন্মত, একটি কওম ও মিল্লাত এবং একটি সমাজের চিত্র—তা নেপথ্যে চলে গেছে এবং শাসকদের কিছু ক্রটি দেখে পুরো মুসলিম সমাজকে তার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়েছে।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বনু উমাইয়া (বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ান) রাষ্ট্রের পতনের কারণসমূহ

সাধারণ ধারণা হলো যে, বনু উমাইয়া মহান সাম্রাজ্যের পতন দ্বিতীয় ওয়ালিদের সিংহাসন আরোহণের সাথে শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ভাঙনের মূল কারণগুলো অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। নিম্নে আমরা সেই কারণগুলোর ওপর এক নজর দিচ্ছি:

- (১) এই পতনের একটি মৌলিক কারণ ছিল সরকার ও জনগণের মধ্যে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতির ওপর মানসিক ঐকমত্যের অভাব। পরামর্শভিত্তিক (শুরা) ব্যবস্থার পূর্ণ অনুসরণ না করে রাজতন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক শাসন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। শাসনক্ষমতা একটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য গোত্র ও পরিবারগুলোর মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলো শক্তি লাভ করে।
- (২) পরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কোনো সুসংগত কর্মপন্থা বা মানদণ্ড নির্ধারিত ছিল না। বরং উত্তরাধিকারের বিষয়টি নির্ধারিত নীতি হিসেবেই চলতে থাকে। এমনকি অল্পবয়স্কদেরও, যাদের যোগ্যতা সম্পর্কে তখনও কোনো ধারণা ছিল না, উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হতো। উত্তরাধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর অযোগ্য প্রমাণিত হলেও ক্ষমতা তার হাতেই থাকত।
- (৩) একের পর এক একাধিক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার প্রথাও চালু হয়েছিল। এর ফলে অনেক ত্রুটি দেখা দেয়। খোদ পরিবারের মধ্যেই ফাটল ধরতে শুরু করে; কারণ প্রথম উত্তরাধিকারী শাসক হওয়ার পর সাধারণত দ্বিতীয়জনকে অপসারণ করে নিজের সন্তানকে উত্তরাধিকারী বানাতে চাইতেন। এটি দেখে বঞ্চিত উত্তরাধিকারী বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন এবং কিছু আমীর তার সমর্থক হয়ে যেতেন। হিশামের পর দামেস্কে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি বড় কারণ ছিল এটিই।
- (৪) বনু উমাইয়ার কিছু শাসকের ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং কিছু অধীনস্থ গভর্নরের জুলুম-অত্যাচারও জনগণকে সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। বিশেষ করে ইয়াজিদের শাসনামলে সংঘটিত কারবালার ট্র্যাজেডি, হাররার ঘটনা এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) ও সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.)-এর মতো মহান ব্যক্তিদের শাহাদাত উম্মতের আলেম, ফকিহ এবং বুজুর্গদের একটি বড় অংশকে সরকারের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। এই ঘৃণা ও অস্থিরতার কারণেই আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহে বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস ও মাশায়েখ শরিক হয়েছিলেন। এই ট্র্যাজেডিগুলোর প্রভাব এক শতাব্দী পরেও বিদ্যমান ছিল যখন বনু আব্বাস বিদ্রোহ করেছিল। বনু আব্বাস জুলুমের অবসান, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং জালিমদের কর্মফল ভোগ করানোর ইশতেহার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল; তাই মানুষ তাদের এই আকর্ষণীয় স্লোগানে সাড়া দিয়েছিল।
- (৫) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদের মতো কিছু খলিফার পাপাচার ও দুশ্চরিত্রও সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

(৬) পথভ্রষ্ট দলগুলো, বিশেষ করে সাবায়িয়া এবং খারেজিরা বনু উমাইয়া খিলাফতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছিল। খারেজিরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে সরকারকে বিভিন্ন নাজুক মুহূর্তে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করত। সাবায়িয়ারা শিয়ানে আলীকে ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত উসকে দিত এবং জনগণকে শাসকদের থেকে বিমুখ করত। সাবায়িয়াদের একটি বড় অংশ মনে করত যে, শাসনের অধিকার কেবল সাদাতদের। সাবায়ি গোষ্ঠীর গোপন বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচারণামূলক ষড়যন্ত্রের কারণে অনেক শিয়াদের মধ্যে ইমামতের আকিদা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন লোকদের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়া করানোর জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন ছিল না। বনু আব্বাসের বুজুর্গরা নিজেরা এই আকিদায় বিশ্বাসী না হওয়া সত্ত্বেও নিছক রাজনৈতিক কৌশলে ‘খিলাফত’-এর লক্ষ্যকে ‘ইমামত’-এর মোড়কে পেশ করে এই পথভ্রষ্ট লোকদের নিজেদের চারপাশে একত্রিত রেখেছিলেন যাতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে সরকারের পতন ঘটানো যায়।

(৭) বনু উমাইয়া বিশুদ্ধ আরবদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে উচ্চপদ থেকে দূরে রাখা হতো। তাদের শাসননীতি যাই হোক না কেন, এর ফলে অনারবদের (আজমি) মধ্যে বঞ্চনার বোধ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই তারা শাসন পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং বনু আব্বাসকে সমর্থন দেয়। শাহ মঈনউদ্দীন নদভী (রহ.) লিখেছেন:

“আজমিদের অন্তর থেকে তাদের সাম্রাজ্য পতনের দাগ মুছে যায়নি। আর তাদের মনে আরবদের প্রতি সর্বদা প্রতিশোধের চিন্তা লালিত হতো। কিন্তু তাদের মোকাবিলায় প্রকাশ্যে দাঁড়ানোর সাহস তাদের ছিল না; তাই তারা গোপন ষড়যন্ত্র করত। আরব সরকারের ক্ষতি করে এমন প্রতিটি আন্দোলনে তারা শরিক হতো এবং তার প্রচারক হয়ে যেত। ফলে এই ধরনের অধিকাংশ আন্দোলনই অনারব ভূখণ্ড থেকে শুরু হতো এবং সেখানেই বিস্তার লাভ করত। খিলাফতের ব্যাপারে আহলে বাইত এবং আহলে বাইত বহির্ভূতদের মধ্যকার বিরোধকেও অনারবরাই সবচেয়ে বেশি উসকে দিয়েছিল এবং এই ভূখণ্ডেই তা বিকশিত হয়েছিল। ফলে আহলে বাইতের শিয়ারা আজমিদের মধ্যেই বেশি ছিল।” [১]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সকল আজমিই ইসলামের শত্রু ছিল। বরং এটি ছিল তাদের কিছু রাজনীতিবিদের বিদ্বেষপূর্ণ চিন্তা এবং তাদের অনুসারী মহলের কাজ। বাকি সাধারণ আজমিদের মধ্যে সব ধরনের লোক ছিল। তাদের একটি বড় অংশ এমন মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ছিল যারা সঠিক আকিদাপন্থী এবং উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম বুখারি থেকে শুরু করে সুলতান মাহমুদ গজনভি, সালাহউদ্দীন আইয়ুবি এবং উসমানীয় তুর্কিদের মতো আজমি মুসলমানরা ইসলামের বিভিন্ন যুগে যে খেদমত করেছেন তা একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস।

(৮) বনু উমাইয়ার আরব সরকার ইয়ামানি এবং মুদারি গোত্রগুলোর ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন এই গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠল এবং তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে গেল।

[১] তারিখ-ই-ইসলাম শাহ মঈনউদ্দীন নদভী: ৫৮৭/১।

তারেখে মিল্লাত

বনু আব্বাসের সাফল্যের কারণসমূহ

বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বনু আব্বাসের সফল হওয়া উম্মাহর ইতিহাসে বিদ্রোহের প্রথম সফল অভিজ্ঞতা ছিল। এর সাফল্যের প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

- বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে অনেক দল বিদ্রোহ করেছিল। এই দলগুলো প্রতিবারই তাড়াহুড়ে করার কারণে পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই ময়দানে নেমেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, বনু হাশিম পরিবারের মুরাব্বি হযরত যায়েদ বিন আলী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেননি। তিনি বনু উমাইয়া খলিফাদের উত্থানের যুগে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং পরাজয় বরণ করেছিলেন। তবে এই বারবার আঘাতের ফলে বনু উমাইয়ার শাসন অবচেতনভাবে কিছুটা দুর্বল হতে থাকে। এই সবকিছুর পর বনু আব্বাসের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কাজ শুরু করেন এবং সবার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে গোপনে তাদের দাওয়াত পরিচালনা করেন।
- আব্বাসী নেতাদের মধ্যে সতর্কতা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার গুণাবলী পারিবারিকভাবেই বিদ্যমান ছিল; তাই তারা শাসনের উত্থানকালে তাদের আন্দোলনকে গোপন রেখেছিলেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি না হওয়া পর্যন্ত তাদের শক্তিকে একবারও অপচয় করেননি।
- বনু আব্বাস বিদ্রোহের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছিল এবং প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ তখনই নিয়েছিল যখন শাসনব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের কারণে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং কোনো প্রকার আঘাত সহ্য করার মতো অবস্থায় ছিল না।
- বনু আব্বাস আন্দোলনের জন্য জনমানস্তু নিয়ে গবেষণা করেছিল এবং ‘দাওয়াত-এ-আলে মুহাম্মদ’-এর মতো অত্যন্ত প্রভাবশালী স্লোগান নির্ধারণ করেছিল।
- বনু উমাইয়ার শাসনামলে অনারবদের (আজমি) গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবি থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। বনু আব্বাস তাদেরকেই মনমুগ্ধকর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অনুগত করে নিজেদের সাথে যুক্ত করেছিল এবং তাদের শক্তিকে সফলভাবে ব্যবহার করেছিল।
- বনু আব্বাসের সংগঠন প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত। প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই তারা অভ্যন্তরীণভাবে প্রবেশ করেছিলেন এবং জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের মূল কেটে দিয়ে একটি অঘোষিত সমান্তরাল সরকার গঠন করেছিলেন। এই কারণেই আবু মুসলিম খোরাসানির একটি নির্দেশে পুরো খোরাসান কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।
- বনু আব্বাস হাশেমী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আত্মীয়তার কারণে বংশমর্যাদায় তারা বনু উমাইয়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন; তাই যখন সাধারণ মানুষের সামনে দুটি পারিবারিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার চূড়ান্ত মুহূর্ত এলো, তখন তারা উমাইয়াদের চেয়ে হাশেমীদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল।
- বনু আব্বাস তাদের আন্দোলনে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা অত্যন্ত সক্রিয় করেছিল, তারা শাসকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিনিয়ত খবর পেত। এর বিপরীতে বনু উমাইয়ার শেষ শাসকরা এই বিভাগের প্রতি কোনো মনোযোগ দেননি। বরং প্রাপ্ত খবরগুলোকেও তারা উপেক্ষা করেছিলেন, যার ফলে প্রতিপক্ষ আরও শক্তিশালী হতে থাকে এবং সরকারের কাছে সংকট থেকে...

মোকাবিলা করার সময় সংকীর্ণ হতে হতে অবশেষে শেষ হয়ে গেল।

বনু আব্বাসের দ্বীন ও আকিদা:

আমরা গত পৃষ্ঠাগুলোতে সাদাত কিরামের যে আকিদা দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি, তা থেকে স্পষ্ট যে আব্বাসী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও মৌলিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আকিদা ও মতাদর্শের অধিকারী ছিলেন। এর আরেকটি বড় প্রমাণ হলো, এই আন্দোলনের ফলে ক্ষমতায় আসা খলিফাগণ যারা পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেছেন, তাদের মধ্যে কেবল মামুন, মুতাসিম এবং ওয়াসিক মুতাজিলি ছিলেন, আর কেবল একজন খলিফা আন-নাসির (আন-নাসির) শিয়া ছিলেন। এক-দুজন এমন ছিলেন যারা تشيع (শিয়া মতবাদের) দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই পাঁচ-ছয়জন ছাড়া বাকি সকল আব্বাসী খলিফা আহলে সুন্নাত ছিলেন। যদি কয়েকজন খলিফা تشيع (শিয়া মতবাদ) বা اعتزال (মুতাজিলা মতবাদে) লিপ্ত হয়ে থাকেন, তবে তার দ্বারা পূর্ববর্তী আলভী বুজুর্গ ও বনু আব্বাসের বড়দের ওপর কোনো অভিযোগ আসতে পারে না। তবে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দ্বীনের কিছু স্বীকৃত মতাদর্শ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ‘সাদাত’কে খিলাফতের আসল হকদার হিসেবে প্রচার করে ‘ইমাম’ ও ‘ইমামত’-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যাতে শিয়াদের সকল দল এমনকি সাবায়িরাও তাদের সাথে থাকে। অন্যথায় বাস্তবে বনু উমাইয়ার সাথে তাদের বিরোধ আকিদাগত ছিল না, বরং নিছক রাজনৈতিক ছিল। এই কারণেই ক্ষমতা লাভের পর বনু আব্বাসের প্রথম খলিফা সাফফাহ তার প্রথম ভাষণেই সাবায়িদের থেকে স্পষ্টভাবে বিমুখতা প্রকাশ করেছিলেন। [১]

পরবর্তীতে শিয়াদের চরমপন্থী দলগুলো রাজনৈতিক মতভেদের এই অস্থায়ী সীমানার ওপর আলাদা আকিদার স্থায়ী দেয়াল নির্মাণ করে নেয়। এগুলো সেই আকিদাই ছিল যা সাবায়ি দল হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় থেকে ছড়িয়ে আসছিল। এগুলোর মধ্যে এই আকিদাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, হযরত আলী (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর وصی (ওসি/উত্তরাধিকারী), যার উপস্থিতিতে অন্য কারো খিলাফত সঠিক নয়। এই আকিদার ভিত্তিতেই প্রথম তিন খলিফাকে জবরদখলকারী ও জালেম বলা হতো।

শিয়াদের মধ্যে সাবায়িদের এই তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত এই আকিদাকে সাধারণ করে দেয়। এই তাত্ত্বিক প্রচেষ্টার সময় বনু হাশিমের বুজুর্গদের সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোকে নতুন রঙ দেওয়া হয়। এমন সব বর্ণনা এমনকি কিতাব জাল করা হয় যা থেকে এটি প্রকাশ পায় যে, এই ব্যক্তিবর্গও ইমামত আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন যে ইমামের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি শাসনের যোগ্য হতে পারে না এবং এই কারণেই বনু হাশিমের বুজুর্গরা বনু উমাইয়া ও বনু মারওয়ানের খলিফাদের বিরুদ্ধে خروج (বিদ্রোহ) করতে থাকেন।

এই প্রচেষ্টার ফলে বনু হাশিমের বুজুর্গদের চারপাশে সমবেত হওয়া অনেক লোকের বংশধর দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইমামত আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এই সময়ে যখন ঐতিহাসিকগণ উম্মাহর ইতিহাস সংক্রান্ত উপাদান সংগ্রহ করতে শুরু করেন, তখন সেই স্তূপের মধ্যে ওইসব বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যা সাবায়িরা ছড়িয়েছিল, যার মধ্যে কোথাও বড় বড় সাহাবীদের চরিত্র হনন করা হয়েছিল এবং কোথাও সাদাত কিরাম সম্পর্কে এই ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে তারা ইমামত আকিদায় বিশ্বাসী বরং এর দাওয়াত দানকারী ছিলেন এবং হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-কে জালেম ও জবরদখলকারী মনে করতেন। অথচ এই সবই পুরোপুরি মিথ্যা এবং নিছক একটি অপবাদ।

[১] তারিখুত তাবারী, ৭/৪২৫

বনু উমাইয়া যুগের তালিকা এবং জুবাইরি খিলাফতসহ

শুরু ও শেষ

নম্বর | শাসক | শাসনের শুরু ও শেষের তারিখ | পরিণতি

- ১ | আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু | জুমাদাল উলা ৪১ হিজরি থেকে রজব ৬০ হিজরি (সেপ্টেম্বর ৬৬১ খ্রি. থেকে ২১ এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ২ | ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া | রজব ৬০ হিজরি থেকে ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি (এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.-এর শেষভাগ থেকে ২২ নভেম্বর ৬৮৩ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ৩ | মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ | ১৪ রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি থেকে ২৩ রবিউস সানি (২২ নভেম্বর ৬৮৩ খ্রি. থেকে ৩১ ডিসেম্বর ৬৮৩ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ৪ | আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু | ৯ রজব ৬৪ হিজরি থেকে ১৭ জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি (১২ মার্চ ৬৮৪ খ্রি. থেকে ১৬ অক্টোবর ৬৯২ খ্রি.) | শহীদ করা হয়েছে
- ৫ | মারওয়ান বিন আল-হাকাম | জিলকদ ৬৪ হিজরি থেকে ৩ রমজান ৬৫ হিজরি (জুলাই ৬৮৪ খ্রি. থেকে ৭ মে ৬৮৫ খ্রি.) | প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত
- ৬ | আবদুল মালিক বিন মারওয়ান | ১৭ জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি থেকে ১৫ শাওয়াল ৮৬ হিজরি (১৬ অক্টোবর ৬৯২ খ্রি. থেকে ২০ অক্টোবর ৭০৫ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ৭ | ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক | ১৫ শাওয়াল ৮৬ হিজরি থেকে ১৫ রবিউল আউয়াল ৯৬ হিজরি (২০ অক্টোবর ৭০৫ খ্রি. থেকে ৯ ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ৮ | সুলাইমান বিন আবদুল মালিক | ১৫ রবিউল আউয়াল ৯৬ হিজরি থেকে ২০ সফর ৯৯ হিজরি (৯ ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রি. থেকে ১৩ অক্টোবর ৭১৭ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ৯ | উমর বিন আবদুল আজিজ | ২০ সফর ৯৯ হিজরি থেকে ২০ রজব ১০১ হিজরি (১৩ অক্টোবর ৭১৭ খ্রি. থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রি.) | বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে
- ১০ | ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক | ২০ রজব ১০১ হিজরি থেকে ২৫ শাবান ১০৫ হিজরি (১৬ ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রি. থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ৭২৪ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু
- ১১ | হিশাম বিন আবদুল মালিক | ২৫ শাবান ১০৫ হিজরি থেকে ৬ রবিউস সানি ১২৫ হিজরি (৭ ফেব্রুয়ারি ৭২৪ খ্রি. থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রি.) | স্বাভাবিক মৃত্যু

১২. ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক: ৬ রবিউল আখের ১২৫ হিজরি থেকে ২৭ জমাদিউল আখের ১২৬ হিজরি (১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রি. থেকে ১৭ এপ্রিল ৭৪৪ খ্রি.)। হত্যা করা হয়েছে।

১৩. ইয়াজিদ তৃতীয় (ইয়াজিদ সালিহ): ২৭ জমাদিউল আখের ১২৬ হিজরি থেকে ২০ জিলহজ ১২৬ হিজরি (১৭ এপ্রিল ৭৪৪ খ্রি. থেকে ১৪ অক্টোবর ৭৪৪ খ্রি.)। স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৪. ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদ: ২০ জিলহজ ১২৬ হিজরি থেকে ১৪ সফর ১২৭ হিজরি (১৪ অক্টোবর ৭৪৪ খ্রি. থেকে ২ ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রি.)। পদচ্যুত করা হয়েছে।

১৫. মারওয়ান দ্বিতীয় (মারওয়ান সানি): ১৪ সফর ১২৭ হিজরি থেকে ২৭ জিলহজ ১৩২ হিজরি (৭ ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রি. থেকে ১ আগস্ট ৭৫০ খ্রি.)। হত্যা করা হয়েছে।

বনু উমাইয়া যুগের (বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ান) সাথে জুবাইরি খেলাফতের তালিকা

অবস্থা ও বিপ্লবসমূহ

- ১. হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা.): শাসনকাল: ৪১ হিজরি থেকে ৬০ হিজরি (৬৬১ খ্রি. থেকে ৬৮০ খ্রি.)। চরিত্র: সাহাবী। বিশেষ বিপ্লব: উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা।
- ২. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া: শাসনকাল: ৬০ হিজরি থেকে ৬৪ হিজরি (৬৮০ খ্রি. থেকে ৬৮৩ খ্রি.)। চরিত্র: জালেম ও ফাসেক। বিশেষ বিপ্লব: কারবালার ট্র্যাজেডি, হাররার ট্র্যাজেডি।
- ৩. মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদ: শাসনকাল: ৬৪ হিজরি (৬৮৩ খ্রি.)। চরিত্র: নেক সীরাত। বিশেষ বিপ্লব: চল্লিশ দিন পর শূরা-এর নিকট শাসনভার হস্তান্তর।
- ৪. আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.): শাসনকাল: ৬৪ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি (৬৮৩ খ্রি. থেকে ৬৯২ খ্রি.)। চরিত্র: সাহাবী। বিশেষ বিপ্লব: বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ানের মধ্যবর্তী সময়ের বৈধ শরয়ী খলিফা।
- ৫. মারওয়ান বিন আল-হাকাম: শাসনকাল: ৬৪ হিজরি থেকে ৬৫ হিজরি (৬৮৪ খ্রি. থেকে ৬৮৫ খ্রি.)। চরিত্র: আলেম, ফাজেল কিন্তু কিছু ভুলের সাথে জড়িত। বিশেষ বিপ্লব: আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের বৈধ শরয়ী খেলাফতের বিপরীতে সিরিয়ায় বিদ্রোহী সরকার প্রতিষ্ঠা।

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

৬. আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

৭৩ হিজরি থেকে ৮৬ হিজরি, ৬৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ।

আলেম, ফাযেল, সর্বোত্তম যোগ্যতার অধিকারী কিন্তু জুলুম ও নিপীড়নে লিপ্ত। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উত্থান।

৭. ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক

৮৬ হিজরি থেকে ৯৬ হিজরি, ৭০৫ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ।

কঠোর শাসক, বিজয়ী, সিংহাসন দখলকারী। সিন্ধু, মধ্য এশিয়া এবং আন্দালুস বিজয়।

৮. সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক

৯৬ হিজরি থেকে ৯৯ হিজরি, ৭১৫ থেকে ৭১৭ খ্রিস্টাব্দ।

নেক সীরাত, কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। বিজয়ের ধারা থেমে যায়।

৯. উমর বিন আব্দুল আজিজ

৯৯ হিজরি থেকে ১০১ হিজরি, ৭১৭ থেকে ৭২০ খ্রিস্টাব্দ।

খেলাফতে রাশেদার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। শরীয়তের পুনর্জাগরণ এবং জুলুম-অত্যাচারের অবসান।

১০. ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক

১০১ হিজরি থেকে ১০৫ হিজরি, ৭২০ থেকে ৭২৩ খ্রিস্টাব্দ।

মধ্যমপন্থী। বনু আব্বাসের গোপন তৎপরতা শুরু, খারেজী ও তুর্কিদের বিদ্রোহ।

১১. হিশাম বিন আব্দুল মালিক

১০৫ হিজরি থেকে ১২৫ হিজরি, ৭২৩ থেকে ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ।

নেক সীরাত। জায়েদ বিন আলীর উত্থান। ফ্রান্সে জিহাদ। তুর্কিদের ওপর বিজয়।

১২. ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক

১২৫ হিজরি থেকে ১২৬ হিজরি, ৭৪৩ থেকে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

ফাসেক ও পাপাচারী। সরকার দুর্বল হতে শুরু করে।

১৩. ইয়াজিদ তৃতীয়

জুমাদিউল আখিরা থেকে জিলহজ ১২৬ হিজরি, এপ্রিল থেকে অক্টোবর ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

নেক সীরাত। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শাসনকাল।

১৪. ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদ

জিলহজ ১২৬ হিজরি থেকে সফর ১২৭ হিজরি, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

নামমাত্র শাসন। সরকার পতনের দিকে ধাবিত।

১৫. মারওয়ান দ্বিতীয়

১২৭ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি, ডিসেম্বর ৭৪৪ থেকে আগস্ট ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ।

নেক সীরাত, সাহসী। শেষ উমাইয়া শাসক। বনু আব্বাসের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। মারওয়ানিদের শোচনীয় পরাজয়।

পরিশিষ্ট

উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাসে

অরাজনৈতিক বরণ্য ব্যক্তিদের ভূমিকা

উম্মতে মুসলিমার একটি বৈশিষ্ট্য

আমরা উম্মতের ইতিহাসের একটি বড় পর্যায় অতিক্রম করেছি। এই প্রসঙ্গে সীরাতে নববী, সীরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং খুলাফায়ে বনু উমাইয়্যার অবস্থা আমরা এই পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি যা আমাদের নির্দেশিকা, শিক্ষা এবং সাধারণ তথ্যের জন্য যথেষ্ট। তবে এটি যেন মাথায় থাকে যে উম্মতের ইতিহাস কেবল শাসকদের অবস্থার নাম নয়। বরং এটি সেই সব ব্যক্তিদের কীর্তির সংকলন যাদের প্রচেষ্টায় উম্মতে মুসলিমা প্রতিটি ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে।

সুতরাং ইতিহাসে যেখানে শাসকদের অবস্থা এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের উল্লেখ করা জরুরি, সেখানে অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টা ও সাধনাকেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত, ইলম, তাজকিয়া ও ইসলাহ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উম্মতকে উপকৃত করেছেন এবং এর গঠন ও বিকাশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের লক্ষ্য হলো ইতিহাসের সেই প্রতিটি দিক পাঠকদের সামনে নিয়ে আসা যা থেকে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক দিক থেকে কোনো আলোকপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চাই তা শাসকদের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে। যা কিছু এই উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট, চাই তা ঐতিহাসিক রেকর্ডে সংরক্ষিত হোক, আমরা তা উদ্ধৃত করাকে জরুরি মনে করি। ইনশাআল্লাহ ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ের শেষে আমরা সেই যুগের নির্বাচিত ব্যক্তিত্বদের আলোচনা পেশ করব যাদের কীর্তিতে মুসলমানরা গর্বিত হবে।

আখেরি দ্বীন হওয়ার কারণে ইসলামের সময় কিয়ামত পর্যন্ত এবং এর পরিধি সমস্ত জাতি ও ভূখণ্ডকে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পরিবর্তনের যে ভয়াবহ ঢেউয়ের মোকাবিলা ইসলামকে করতে হয়েছে, অন্য কোনো উম্মতের ইতিহাসে বা অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে তার উদাহরণ পেশ করা যায় না। সুতরাং আল্লাহ এই দ্বীনকে এমন শক্তি দান করেছেন যে এটি প্রতিটি তুফানের মোকাবিলা করতে পারে এবং প্রতিটি প্লাবন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে। সময়ের পরিবর্তন এবং নেতিবাচক বিপ্লবের মোকাবিলায় এই দ্বীনকে সুসংহত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকভিনী ভাবে তিনটি ব্যবস্থা করেছেন:

- প্রথমত এই যে, দ্বীন ইসলামের মূল পাঠ কুরআন মাজীদকে যেকোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত করে দিয়েছেন।
- দ্বিতীয়ত এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং শরীয়তকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন যাতে দ্বীন তার সমস্ত খুঁটিনাটি সহ সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।
- তৃতীয়ত মাশিয়্যাতে ইলাহী এই ব্যবস্থা করেছে যে, এই উম্মতকে ইতিহাসের প্রতিটি মোড়ে, সমাজের প্রতিটি বিপ্লবে এবং দিনকালের আবর্তনের প্রতিটি...

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

এই পর্যায়ে এমন কর্মঠ ব্যক্তিদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যারা ইসলামের খাঁটি ও মূল শিক্ষাগুলোকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করতে থাকেন, ফলে হাজারো প্রতিকূল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পবিত্র আত্মাগুলোর বদৌলতে এই দ্বীন তার আসল রূপে সজীব ও সতেজ হয়ে চলে আসছে।

উম্মতে মুসলিমার মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বদের অস্তিত্ব মূলত আল্লাহর সৃষ্টিগত হিকমতের দাবি এবং ইসলামের এক জীবন্ত মোজেজা। এটি এই কথার প্রমাণ যে ইসলাম আল্লাহর শেষ দ্বীন, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করে। আল্লাহ এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এতে স্থান ও কালের প্রতিটি পরিবর্তন, সমাজের লাখো বিবর্তন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির অগণিত আঘাত সহ্য করে বেঁচে থাকার এবং জাতিসমূহকে চিরস্থায়ী ও উজ্জ্বল রাখার এক বিস্ময়কর সক্ষমতা রেখে দিয়েছেন।

যদি অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করা হয় তবে তাদের বিকৃতির সবচেয়ে বড় কারণ এটাই দেখা যায় যে সেখানে সংস্কারক ও মুজাদ্দিদদের চরম অভাব ছিল। খ্রিস্টধর্ম যাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাওহীদের পয়গাম পেশ করেছিলেন, সেন্ট পল (পলুস)-এর সংস্কারের নামে বিকৃতির পর তা নিজের আত্মা ও বাস্তবতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এবং ত্রিত্ববাদের আকিদা গ্রহণ করে শিরকের গোলকধাঁধায় পরিণত হয়। ইহুদি ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের কাহিনীও একই যে তাদের সংস্কারের দাবিদাররা তাদের আরও বেশি বিকৃত করে দিয়েছে।

উম্মতে মুসলিমার এটি সৌভাগ্য যে তারা প্রতিটি যুগে দ্বীনের এমন রক্ষক পেয়েছে যারা দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং ইসলামী সমাজের কিবলা ঠিক রাখার দায়িত্ব পালন করেছে। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে কখনও এমন সময় আসেনি যখন মুসলমানরা একটি উম্মত হিসেবে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমন কোনো সময় অতিবাহিত হয়নি যে তাদের সওয়াদে আজম ইসলামের নামে অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ শুরু করে দিয়েছে এবং চারদিকে গোমরাহীর ঘুটঘুটে অন্ধকার ছেয়ে গেছে।

প্রথম হিজরি শতাব্দীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ইলমি নেতৃত্ব সাহাবায়ে কেরামের কাছে ছিল। এই মহান সাহাবীদের অবস্থা উম্মতের ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে এসেছে। এর পরে যখন ইসলামের খলিফারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামী নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ ছেড়ে দিলেন, তখন মুসলমানদের সামষ্টিক বিবেক তাত্ত্বিক, ইলমি ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনার জন্য সেই নেক ও পবিত্র সত্তাদের দিকে মুখ ফেরাল যাদের ‘তাবেয়ীন কেরাম’ বলা হয়।

দ্বীনি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভাজন:

আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত এবং বনু মারওয়ানের নেতৃত্বের সাথে উম্মতের ইতিহাসে যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি এসেছে, তা ছিল এই যে উম্মতের দ্বীনি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুটি আলাদা অংশে বিভক্ত হতে শুরু করে। এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই দূরত্ব এমন এক ফাটলে পরিণত হয় যা শতাব্দীকাল পরেও পূরণ হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুরু করে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত যত সাহাবী শাসনক্ষমতা পেয়েছেন, তাদের সবাইকে নিজ যুগে এবং পরবর্তীকালেও দ্বীনি নেতা হিসেবে স্বীকার করা হতো। যেখানে রাজনৈতিকভাবে তাদের আদেশ কার্যকর হতো সেখানে হাদিস বর্ণনা এবং দ্বীনি ফতোয়ার ক্ষেত্রেও তাদের একটি নির্ভরযোগ্য অবস্থান ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী খিলাফতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে দ্বীনি নির্দেশনা একটি মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব রাখে এবং খলিফারা রাজনৈতিক...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি দ্বীনি বিষয়েও তারা উম্মতের জন্য হুজ্জাত ও দলিলের মর্যাদা রাখতেন। ইসলামী খলিফার কাজ কেবল এটাই ছিল না যে তিনি উৎপাদন থেকে রাজস্ব আদায় করবেন, গভর্নরদের নিয়োগ ও বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সীমান্ত রক্ষা করবেন। এই কাজগুলো তো অমুসলিম শাসকরাও সম্পাদন করে থাকে। ইসলামী খলিফাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি আকিদা সংশোধন, শরীয়তের বিধান কার্যকর করা, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রজাদের জন্য এক আদর্শ হতেন। মানুষ পার্থিব বিষয়ের মতো দ্বীনি বিষয়েও তাদের নেতৃত্বে কাজ সম্পাদন করত। এই কারণেই খুলাফায়ে রাশেদিন, হযরত হাসান, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কথা, কাজ ও সিদ্ধান্তগুলোকে পরবর্তী সকল যুগে ফিকহী দলিল হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর আমরা দেখি যে দ্বীনি নেতৃত্বের এই ধারা খুব দ্রুতই শাসকদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়।

এটা সত্য যে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিপরীতে আসা মারওয়ান বিন হাকাম এবং আবদুল মালিক বিন মারওয়ানও ভালো ইলমি যোগ্যতা রাখতেন, কিন্তু তাদেরকে ঈর্ষণীয় ইসলামী নেতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। বনু মারওয়ানের মধ্যে কেবল উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি একমাত্র উদাহরণ যার ফতোয়ার ওপর আস্তা রাখা হয়েছে। তাঁর পর আমরা শতাব্দীকাল পর্যন্ত এমন কোনো খলিফা দেখতে পাই না যাকে দ্বীনি নেতৃত্বে উম্মতের আস্তা নসিব হয়েছে। যদিও বনু আব্বাসের পতনের যুগ পর্যন্ত খলিফাদের মধ্যে হাদিস বর্ণনার আগ্রহ বিদ্যমান ছিল এবং কিছু খলিফা থেকে কিছু মুহাদিস বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্ণনাও নকল করেছেন, কিন্তু জমহুর উলামা কাউকে দ্বীনি নেতার মর্যাদা দেননি। স্পষ্টতই এর কারণ এটা ছিল না যে এই খলিফারা দ্বীনি ইলম থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বরং এই যুগে প্রত্যেক শাসকই তার সন্তানদের দ্বীনি ইলমে সজ্জিত করার চেষ্টা করতেন; তাই গুটিকয়েক বাদে প্রায় সবাই আলেম ও ফাজিল ছিলেন। আমলের দিক থেকেও প্রায় সবাই সওম ও সালাতের পাবন্দ এবং ইসলামী লেবাস ও চালচলনের অধিকারী ছিলেন। তবুও উম্মতের সম্মিলিত বিবেক তাদেরকে সেই মর্যাদা দেয়নি যা খুলাফায়ে রাশেদিন, হযরত হাসান, হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম নসিব করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেন?

সামান্য চিন্তা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পরবর্তী অধিকাংশ শাসক ব্যক্তিগতভাবে ইলম ও ফাজিলতে সজ্জিত হওয়া এবং আমল-ই-সালেহ এর পাবন্দি সত্ত্বেও, রাজনৈতিক প্রয়োজনের সামনে দ্বীনি স্বার্থকে কোরবানি করার অপরাধে লিপ্ত ছিলেন। চাই এই ভুল সব শাসক না-ই করে থাকুন এবং যারা করেছেন তারা হয়তো কয়েকবারই করেছেন, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা থেকে সরকার ও শাসকদের আমানত ও দিয়ানতের ওপর এমন দাগ লেগে গিয়েছিল যে মুসলমানদের সম্মিলিত বিবেক দ্বীনি দিকনির্দেশনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে মনসুর অনেক বড় ফকিহ এবং হাফিজে হাদিস ছিলেন, তার পুত্র মাহদী ইলম ও ফাজিলত, আদল ও ইনসাফ এবং আমানত ও দিয়ানতে প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু হাফিজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“আমি জানি না যে কেউ মাহদী বা তার পিতার থেকে বিধানের ব্যাপারে দলিল পেশ করেছে।” [১]

সুতরাং এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর উম্মতে মুসলিমার সম্মিলিত চেতনা দ্বীনি ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এক নতুন রূপ গ্রহণ...

[১] “মা আলিমতু আহাদান ইহতাজ্জা বিল মাহদী ওয়া লা বি আব্বিহি ফিল আহকাম।” (তারিখুল ইসলাম লিখ যাহাবী: ১০/৪৩৬, ত তদমরী)

করে নিল। তা হলো এই যে, রাজনৈতিক বিষয়াবলি শাসকদের হাতে থাকতে দেওয়া হোক এবং ধর্মীয় বিষয়ে কেবল সেই সকল উলামায়ে রাশিদীনের নিকট থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হোক যাদের আমানত ও বিশ্বস্ততার ওপর কোনো প্রকার প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই এবং যাদের চরিত্র সব দিক থেকে নিষ্কলঙ্ক।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান:

রাজনৈতিক নেতৃত্ব শাসকদের হাতে সোপর্দ করার অর্থ ছিল এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া যে, শাসকরা তরবারির জোরে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। যেহেতু নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতির উৎস ছিল সামরিক শক্তি; তাই এটিও নির্ধারিত ছিল যে শক্তি ছাড়া সরকার পতন ঘটানো, গঠন করা বা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রজাসাধারণ, যার মধ্যে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল; তাই নতুন শাসকদের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শক্তির জোরে ক্ষমতায় আসা শাসকরা বেদ্বীন ছিলেন না যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যিক হতো। দেশের আদালতগুলোতে তারা কোনো কুফরি আইন কার্যকর করেননি। আদালতে কাজী নিযুক্ত ছিলেন যারা মানুষের বিবাদ-বিসংবাদ শরীয়তের আলোকে সমাধান করতেন। ব্যক্তিগতভাবেও তাদের অধিকাংশ দ্বীনদার ছিলেন। ঘাটতি যদি থেকে থাকে তবে তা ছিল এই যে, তাদের রাজনীতি ধর্মীয় সীমানার অনুগত থাকত না। এই ভুল বনু উমাইয়ার অধিকাংশ শাসকও করে গেছেন এবং বনু আব্বাসও। উম্মাহ যদি তাদের শাসন মেনে নিয়ে থাকে তবে তা এজন্য নয় যে এই শাসন খিলাফতে রাশিদাহর মতো আদর্শ ছিল, বরং এজন্য যে জাতি অন্তত গৃহযুদ্ধ এবং ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকুক, আদালতগুলো খোলা থাকুক, জুমা, ঈদ এবং হজের সমাবেশগুলো কোনো বিরোধ ছাড়াই সম্পন্ন হতে থাকুক, সীমান্তগুলো সুরক্ষিত থাকুক এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্ভব হোক।

সুতরাং আমরা যদি আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বায়আত করতে দেখি, তবে তার অর্থ এই ছিল না যে তারা তার শাসনকে আদর্শ শাসন মনে করতেন, বরং প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিবর্গ এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন যে উম্মাহর রাজনীতির লাগাম এখন এই লোকদের হাতেই রয়েছে, এবং তাদের হাতে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমেই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব।

ধর্মীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে উম্মাহর অবস্থান:

রাজনীতি বাদ দিয়ে বাকি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে উম্মাহর জনমতের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, এ ব্যাপারে শাসকদের নিকট থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া হবে না, বরং সেই সকল আহলে ইলমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে যাদের আমানত ও বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত এবং যাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। ধর্মীয় নেতৃত্বের এই কেন্দ্রবিন্দুগুলো ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের মনোনীত আহলে ইলমগণ। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতো কয়েকজন দীর্ঘজীবী সাহাবী এবং বহু সংখ্যক বড় বড় তাবেঈঈও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে এই পদমর্যাদা তাবেঈঈদের থেকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

ধর্মীয় দিকনির্দেশনার এই কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বাহ্যত কোনো ঐক্য ছিল না, বরং সবাই নিজ নিজ অবস্থানে আলাদাভাবে কাজ করছিলেন এবং অনেক সময় দলিলের আলোকে এক ইলমি মহলের ফতোয়া অন্যটি থেকে ভিন্নও হতো। তবে যেহেতু এই সকল আলোচনা...

দলীলের উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ; তাই শাখা-প্রশাখাগত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে সমস্ত ইলমি মহল এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একই দ্বীনের ওপর অবিচল ছিলেন এবং এভাবেই উম্মতের সওয়াবে আজম দ্বীনের মূলনীতির বিচারে প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি যুগে ঐক্যবদ্ধ ছিল। পথভ্রষ্ট ফেরকাগুলো বাদ দিলে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে মুসলমানরা এক আকিদা ও এক মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাদের দ্বীনি নেতৃত্বও আজ পর্যন্ত উলামা ও ফুকাহাগণই দিয়ে আসছেন।

এর বিপরীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতেই মতভেদের শিকার হয়। বনু উমাইয়াকে হটিয়ে বনু আব্বাস ক্ষমতায় আসে কিন্তু আন্দালুস পূর্বের ন্যায় উমাইয়াদের হাতেই থেকে যায়। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে বনু আব্বাসের পতনের পর স্থানে স্থানে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা গ্রহণ করেন এবং এরপর শতাব্দীকাল ধরে তারাই উম্মতের ভাগ্যবিধাতা হয়ে থাকেন। আব্বাসী খলিফাদের মর্যাদা কেবল এতটুকুই অবশিষ্ট ছিল যে, জুমুআ ও ঈদের খুতবায় তাদের নাম নেওয়া হতো এবং সুলতানদের সিংহাসন আরোহণের সময় খলিফার পক্ষ থেকে তাদের শাসনের সনদ প্রদান করা হতো।

শাসকদের দ্বীনি নেতৃত্বের সাথে আচরণের ধরণ:

রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বীন এবং দ্বীনি নেতৃত্বের সাথে কেমন আচরণ ছিল, সে বিষয়ে শাসকদের আচরণের ধরণ নিজ নিজ সময় বা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অনেক খলিফা ও সুলতান ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি মূল্যবোধ মেনে চলার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়ও দ্বীনদারির প্রমাণ দিতেন, শাআইরে ইসলামিয়ার খেয়াল রাখতেন, জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন বরং ইমামতি করতেন, জুমুআ, ঈদাইন এবং হজ্জের নেতৃত্ব দিতেন। তাদের মধ্যে কারো কারো ভূমিকা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রেও চমৎকার ছিল। অধিকাংশ শাসক ইলম প্রচার, মসজিদ নির্মাণ এবং উলামায়ে দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদাদানে অভ্যস্ত ছিলেন। উলামা, তলাবা এবং দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ভাতা জারি করতেন। বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট মূল্যবান উপটৌকন পাঠাতেন এবং একে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। সম্ভবত এমন কোনো শাসক ছিলেন না যার দরবারে অনেক উলামা ও ফুকাহা ছিলেন না। অধিকাংশ শাসক শিক্ষা ও পাঠদান, রচনা ও সংকলন এবং ইফতা ইত্যাদির খিদমতকে সাধারণ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং এ জাতীয় অনেক খিদমতে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল।

তবে এটিও বাস্তবতা যে, দ্বীনি নেতৃত্বের দায়িত্বশীল বুজুর্গগণ তীব্র প্রয়োজন ছাড়া শাসকদের নৈকট্য গ্রহণ করা এবং তাদের থেকে সহযোগিতা নেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। তাদের অধিকাংশ স্বনির্ভর জীবন অতিবাহিত করতেন। তারা শাসকদের সহযোগিতার সুযোগে অসাধারণ ইস্তিগনা প্রদর্শন করেছেন এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত থেকে দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে উম্মতের নিকট তাদের নিরপেক্ষতা সন্দেহাতীত থাকে এবং তাদের ওপর কারো স্বার্থে দ্বীন পরিবর্তনের অপবাদ না দেওয়া যায়। দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে ক্ষমতা বনু আব্বাসের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও রাজতন্ত্রের যুগ অব্যাহত থাকে বরং আগের চেয়ে বেশি সুসংহত হয়ে যায়। এটি সেই সময় ছিল যখন মুহাদিসগণ রাবীদের যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা শুরু করেন এবং এই বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতা, সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে ইলমে রিজালকে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক সম্পদে পরিণত করেন যার নজির পৃথিবী...

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অন্য কোনো জাতির মধ্যে নেই। এই দায়িত্ব পালনকারী আলেমগণ এতই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, তারা সত্য গোপন করতেন না, এমনকি তাদের সামনে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ সম্পদ পেশ করা হলেও। আফফান বিন মুসলিম (রহ.) বসরার একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ তাকে দশ হাজার দিনার প্রস্তাব করেছিল এই শর্তে যে, তিনি যেন কোনো এক ব্যক্তিকে আদিল (নির্ভরযোগ্য) বা গায়রে আদিল (অনির্ভরযোগ্য) কিছুই না বলেন। অন্য লোকেরাও তাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনি এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করুন এবং ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই বলবেন না। কিন্তু তিনি বললেন: ‘আমি সত্য কথা গোপন করতে পারি না’। [১]

এটিও সত্য যে, রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) মধ্যে যেমন আবিদ ও যাহিদ (ইবাদতকারী ও দুনিয়াবিমুখ) লোক ছিলেন, তেমনি মারওয়ান, মনসুর এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো খলিফা ও আমীররাও ছিলেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সবার আসল রূপ উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন এবং তাদের সেই স্থানই দিয়েছেন যা ইলমি মানদণ্ডে তাদের প্রাপ্য ছিল। ইমাম ওয়াকি (রহ.) দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর একজন মহান মুহাদ্দিস ছিলেন। তার পিতা একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন, কিন্তু একই সাথে তিনি সরকারি কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। এ কারণে ইমাম ওয়াকি (রহ.) যখন তার (পিতার) কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন, তখন কেবল তার একার বর্ণনা আনতেন না, বরং সমর্থন হিসেবে অন্য কোনো মুহাদ্দিসের সনদও সাথে যুক্ত করে দিতেন। এটি ছিল দ্বীনি বিষয়গুলোকে সরকারি পদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করার চূড়ান্ত পর্যায়। [২]

দ্বীনি নেতৃবৃন্দ যদি কখনো শাসকের নিকটবর্তী হতেন অথবা কখনো দ্বীনি ও জাতীয় প্রয়োজনে বিচার বিভাগ বা দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতেন, তবুও তারা দ্বীনি স্বার্থের বিপরীতে সরকারি উদ্দেশ্যের কোনো পরোয়া করতেন না। উম্মতের সামষ্টিক চেতনা কেবল সেই সকল উলামায়ে রাসিখীনের (সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম) ওপরই আস্তা রেখেছে যারা দরবার থেকে দূরে থেকেছেন অথবা শাসকদের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও দ্বীনি বিষয়ে কোনো আপস করতে প্রস্তুত হননি। যে অবস্থানকে তারা সত্য মনে করেছেন, তার জন্য চাবুকের আঘাত সয়েছেন, কারাবরণের কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো শাসকদের সাথে আপসকামিতায় লিপ্ত হননি। এটাই ছিল উলামায়ে হকের দায়িত্ব এবং এটাই ছিল তাদের মর্যাদার অনুকূল চরিত্র। এর বিপরীতে আলেমদের মধ্যে যারা সরকারি স্বার্থের কারণে মানসিক নমনীয়তা দেখিয়েছেন, তারা তৎক্ষণাৎ উম্মতের আস্তা হারিয়েছেন। বরং বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ শাসকের অন্তরেও সেই সকল আলেমের প্রতি বেশি সম্মান ছিল যারা সরকারি সহযোগিতা থেকে বিমুখ এবং দরবার থেকে দূরে থাকতেন। যে সকল আলেম ব্যক্তিগত স্বার্থ যেমন—মোট অংকের বেতন এবং পদমর্যাদা ও খ্যাতির জন্য শাসকদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতেন, খোদ সরকারি মহলেও তাদের কোনো সম্মান অবশিষ্ট থাকত না।

নিচে আমরা এমন কিছু মহান তাবেয়ীর কথা উল্লেখ করছি যারা দ্বীনি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভক্তির সময় দ্বীনি নির্দেশনার শূন্যতা পূরণ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ ঈমানি শক্তি, ইলমি যোগ্যতা, বাগ্মিতা ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে মুসলমানদের সঠিক আদর্শ ও সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল রেখেছিলেন। তারা উম্মতকে সামষ্টিকভাবে আকিদাগত বিভ্রান্তির আবর্তে পড়া এবং বস্তুবাদী পক্ষিলতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের অধিকাংশ ছিলেন এমন যারা সরকারি পদমর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতেন, তবে সরকারি পদে থেকে দ্বীনের খিদমত করার কিছু উদাহরণও বিদ্যমান রয়েছে, কারণ এর বৈধতা ছিল।

[১] আস-সিকাত লিল ইজলি: ১৪০/২, ত: আদ-দার

[২] তাহযীবুত তাহযীব: ১৩০/১১

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামি বিশ্বের সেই বরণ্য ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ‘সায়িদ্দুত তাবায়ীন’ (তাবেয়ীদের সরদার) বলা হয়। তাঁর সত্তা ইলম ও আমল, শরীয়তের গুরুত্ব প্রদান, সুন্নাহর অনুসরণ, সাহসিকতা ও সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা এবং চরিত্র ও শিষ্টাচারের এমন এক পুষ্পগুচ্ছ ছিল, যার সুগন্ধি আজও সুবাস ছড়াচ্ছে।

জন্ম..... ইলম অর্জন:

তাঁর জন্ম ১৫ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। সারা জীবন রাসুলের জনপদেই (মদিনায়) কাটিয়েছেন। এখানে হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত উম্মে সালামা, হযরত আবু মুসা আশআরী, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো মহান সাহাবায়ে কেরামের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের থেকে নবুওয়াতের ইলম সংগ্রহ করেন।

তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাতা ছিলেন। এই বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাঁর সাথে অসাধারণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বলা হয় যে, তাঁর চেয়ে বেশি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইলম আর কেউ অর্জন করেনি। [১]

মদিনার মুফতি:

সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি মদিনা মুনাওয়ারার মুফতি হিসেবে গণ্য হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বিচার বিভাগীয় ফয়সালা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। [২]

হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন মদিনার শাসক নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোনো ফয়সালা করতেন না। অন্যান্য উলামায়ে কেরাম উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে আসতেন, কিন্তু তিনি নিজে সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে উপস্থিত হতেন। একবার কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে তিনি খাদেমকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সে তাঁকে ডেকে আনল।

তাঁকে দেখে উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লজ্জিত হলেন এবং বললেন: “খাদেমের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে আপনার মজলিসে গিয়ে আপনার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে।” [৩]

[১] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/২১৮-২১৯

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১২০, ত. সাদির

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/২২৪-২২৫

স্মৃতির পূর্ণতা এবং বিনয়ের চরম সীমা:

স্মৃতির অবস্থা এমন ছিল যে, যা একবার শুনে নিতেন তা বছরের পর বছর হুবহু মনে থাকত। এই জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আল্লাহর দরবারে নিজেকে একটি মাছির চেয়েও বেশি তুচ্ছ মনে করতেন। [১]

শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা:

সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-এর স্বভাবে নির্লিপ্ততা, আত্মমর্যাদা এবং শাসকদের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা মিশে ছিল। অন্যান্য জ্ঞানীদের মতো বায়তুল মাল থেকে তাঁর ভাতাও বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তিনি তা কখনো গ্রহণ করেননি। যখন তাঁকে নিজের হক গ্রহণ করতে বলা হতো, তখন তিনি অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সাথে বলতেন: “আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।” [২]

হাররার ঘটনা:

তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে ইয়াজিদ ও আব্দুল মালিকের মতো শাসকদের শাসনকালও দেখেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল হাররার ঘটনা, যা ইয়াজিদের শাসনামলে সংঘটিত হয়েছিল। সিরীয় সেনাপতি মুসলিম বিন উকবা এই অভিযানে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, বরং শহরের ভেতরেও মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর সে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে অবমাননাকর শর্তে বায়াত নেওয়ার চেষ্টা করে এবং যারা অস্বীকার করে তাদের হত্যা করে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-ও ছিলেন, যদিও তিনি যুদ্ধে শরিক ছিলেন না, কিন্তু মুসলিম বিন উকবা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। লোকজন এই বলে তাঁর প্রাণ রক্ষা করে যে, তিনি একজন পাগল ব্যক্তি। [৩]

এই ধরনের ঘটনার কারণে সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) শাসকদের প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, সারাজীবনের জন্য তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেন। যদিও পরবর্তী অধিকাংশ খলিফা ও শাসক তাঁকে অনেক সম্মান করতেন, কিন্তু তিনি তাদের মোটেও গুরুত্ব দিতেন না এবং তাদের চাটুকারিতা বা মোসাহেবি তো দূরের কথা, কখনো তাদের পাশে বসাও পছন্দ করতেন না।

আব্দুল মালিক এবং সাইদ বিন মুসাইয়িব:

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ৭৫ হিজরিতে হজের সময় মদিনায় আসেন। [৪] একদিন দুপুরে তিনি কিছু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন যার ফলে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটছিল। তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন: “দেখো, আমাদের মসজিদে কোনো নতুন ওয়ায়েজ (উপদেশদাতা) এসেছে।” খাদেম গিয়ে দেখল যে, মসজিদে নববীতে সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) তাঁর হালকায় (পাঠদান চক্রে) দরস দিচ্ছেন। খাদেম হালকার কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে তাঁকে সাথে আসার জন্য বলে ফিরে এল। কিছুদূর গিয়ে যখন দেখল যে সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) তার পেছনে আসছেন না, তখন সে আবার ফিরে এল। দেখল তিনি আগের মতোই দরস দিচ্ছেন। খাদেম কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল: “আপনি কি আমাকে দেখেননি?”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২২৪, ২২৫।

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২৩৯ সহিহ সনদসহ; তাযকিরাতুল হুফফাজ লিয যাহাবি: ১/৪৫।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২২৬।

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ২৭২।

...ইঙ্গিত করছিলেন।

সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন: “কী কাজ?” খাদেম বলল: “আমীরুল মুমিনীন ডাকছেন।”

সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন: “তিনি কি আমার নাম নিয়ে ডেকেছেন?”
খাদেম বলল: “না, তিনি বলেছিলেন যে দেখো মসজিদে আমাদের কোনো নতুন ওয়ায়েজ আছে কি না। আমি এখানে আপনি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি।” তিনি অবহেলার সাথে বললেন: “যাও আমীরুল মুমিনীনকে বলে দাও যে আমি তাদের ওয়ায়েজদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

খাদেম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে গেল যে আমার মনে হয় এই বৃদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।

সে আব্দুল মালিকের কাছে গিয়ে এই ঘটনা শোনা, তখন সে বলল: “ইনি সাইদ বিন মুসাইয়িবই হতে পারেন—তাকে থাকতে দাও।” [১]

আব্দুল মালিক যাই হোক তাঁকে মান্য করতেন; তাই মদিনা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারাদারকে বললেন: “সাইদকে ডেকে আনো, তবে তাঁকে বিরক্ত করো না।”

সে গিয়ে বলল: “আমীরুল মুমিনীন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান।”

তিনি বললেন: “আমীরুল মুমিনীনের আমার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমারও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। যদি তাঁর আমার সাথে কোনো কাজ থাকে তবে তাও পূর্ণ হবে না।” পাহারাদার আব্দুল মালিককে এই উত্তর পৌঁছে দিল, সে বলল: “আবার যাও—তাকে বিরক্ত করো না, বলো যে আমীরুল মুমিনীন শুধু কথা বলতে চান।”

পাহারাদার গিয়ে এই কথা বলল। সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) আবারও একই উত্তর দিলেন।
পাহারাদার রাগান্বিত হয়ে গেল। বলল: “যদি আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে হাত থামিয়ে রাখার পূর্ব নির্দেশ না দেওয়া থাকত, তবে এইবার আমি তোমার মাথা কেটে নিয়ে যেতাম। আমীরুল মুমিনীন তোমার সাথে কথা বলতে চান আর তুমি সামনে থেকে এমন উত্তর দিচ্ছ।”

সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) সেই সময় চাদর জড়িয়ে উবু হয়ে বসে ছিলেন। তিনি একইভাবে নির্লিপ্তভাবে বললেন:

“যদি আমীরুল মুমিনীন আমার সাথে ভালো কিছু করতে চান তবে তা তোমার ভাগ্য, আর যদি তিনি অন্য কোনো আচরণ করতে চান তবে আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে আমার বসার ভঙ্গিও পরিবর্তন করব না, তিনি যা করতে চান করে নিন।”

পাহারাদার আব্দুল মালিকের কাছে গিয়ে এই উত্তর দিলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল:

“আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন—তিনি অবিচলতা অবলম্বন করেছেন।” [২]

সরকারি প্রতাপের মোকাবিলা:

সাইদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) তাঁর অনমনীয় আচরণের কারণে কিছু কর্মকর্তার জুলুমের শিকারও হয়েছিলেন। যদিও এই বিষয়ে অধিকাংশ বর্ণনা যা ওয়াকিদি ইত্যাদি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কিছুটা অতিরঞ্জন মনে হয়। তবে সহীহ সনদ থেকে এতটুকু প্রমাণিত যে...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২২৬

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১২৯

মদিনায় বনু মারওয়ানের গভর্নর হিশাম বিন ইসমাইল আপনাকে একশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। [১]

এই শাস্তি এই কারণে দেওয়া হয়েছিল যে, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ৮৪ হিজরিতে তাঁর পুত্র ওয়ালিদ এবং সুলাইমানের জন্য উত্তরাধিকারের বায়াত নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ. বলেছিলেন যে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত একই সময়ে দুই ব্যক্তির বায়াত গ্রহণ করতে পারি না। অর্থাৎ তাঁর মতে খলিফার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারীর বায়াত নেওয়া জায়েজ ছিল না। সম্ভবত তাঁর সামনে সেই হাদিসটি ছিল যাতে একই সময়ে দুই শাসকের বায়াত নিতে নিষেধ করা হয়েছে। [২]

যখন খবর ছড়িয়ে পড়ল যে উত্তরাধিকারের বায়াত নেওয়া হবে, তখন সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ.-এর বন্ধুরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি তাঁর অনমনীয় অবস্থানের কারণে রাজকীয় রোষের মুখে পড়বেন। তাই এক বন্ধু তাঁকে বললেন:

“আপনি অন্য কোথাও চলে যান, কারণ এখানে আপনি গভর্নর হিশাম বিন ইসমাইলের নজরে আছেন।”

তিনি বললেন: “আমি এই শহর ছাড়তে পারব না যেখানে আমি চল্লিশ বছর ধরে আছি।”

বন্ধু বললেন: “তাহলে উমরাহ করতে চলে যান।”

সাঈদ রহ. বললেন: “আমি কি আমার অর্থ এমন কিছুতে ব্যয় করব এবং আমার শরীরকে এমন পরিশ্রমে ক্লান্ত করব যাতে নিয়তের সৌন্দর্য নেই?” (অর্থাৎ উমরাহ করতে হলে তা খাঁটি ইবাদতের জন্য হওয়া উচিত, কোনো বিপদ থেকে পালানোর জন্য নয়।)

বন্ধু বললেন: “তাহলে বায়াতই করে নিন।”

সাঈদ রহ. বললেন: “যদি তোমার অন্তর অন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তবে আমি কী করতে পারি।”

অবশেষে হিশাম বিন ইসমাইল উত্তরাধিকারের বায়াত নেওয়ার জন্য লোকদের একত্রিত করলেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব বায়াত করতে অস্বীকার করলেন। [৩] যখন গভর্নর বেশি চাপ দিলেন তখন তিনি বললেন:

“যদি আব্দুল মালিক চায় যে আমি ওয়ালিদের বায়াত করি, তবে সে নিজে পদত্যাগ করুক।”

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৭০, সনদ মুত্তাসিল সহিহ।

রাবিদের অবস্থা: আবু নুয়াইম (৩৩৮ হি. বা ৪৩০ হি.) সিকাহ এবং ইমাম। দ্রষ্টব্য: আলামুন নুবালা: ১৭/৪৬৩; আবু বকর বিন মালিক আল-কাতিয়ি (মৃ. ৩৬৮ হি.) সাদুক। তাবাকাতুল হানাবিলা: ইবনুল আবি ইয়ালা: ২/৮; আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাকরিবুত তাহজিব: পৃ. ৩০৫; শায়খুল বিন ফাররুখ সাদুক ওয়াহি, মুসলিমের রাবি। তাকরিবুত তাহজিব: পৃ. ২৮৩; সালাম বিন মিসকিন সিকাহ কিন্তু কাদারিয়া মতবাদের অভিযুক্ত, বুখারি ও মুসলিমের রাবি। তাকরিবুত তাহজিব: পৃ. ২৭০; ইমরান বিন আব্দুল্লাহ আল-খুজায়ি সাদুক, বুখারির রাবি। তাকরিবুত তাহজিব: পৃ. ৫৯।

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৭০, সনদ মুত্তাসিল সহিহ।

[৩] হাদিসে এসেছে: আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন: যখন দুই খলিফার বায়াত নেওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে পরের জনকে হত্যা করো। (মুসলিম, খণ্ড: ৪৯০৫, কিতাবুল ইমারা)। তবে অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেরির মতে উত্তরাধিকারের বায়াত জায়েজ ছিল, কারণ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যে একজন খলিফার উপস্থিতিতে নিজেই খেলাফতের দাবিদার হয়ে যায়, এই নির্দেশের উদ্দেশ্য উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা রোধ করা। উত্তরাধিকারীর বায়াত নেওয়ায় বিশৃঙ্খলা নয় বরং ঐক্য রয়েছে।

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৭০, ১৭১।

হিশাম বিন ইসমাইল বললেন: “ঠিক আছে! নির্জনতার ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষের সামনে আমার কাছে এই দরজা দিয়ে আসেন এবং চুপচাপ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, যাতে অন্তত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা মনে করে যে আপনি বায়আত গ্রহণ করেছেন।”

আপনি এটিও অস্বীকার করলেন এবং বললেন: “আমি নিজের কারণে কাউকে ধোঁকায় ফেলব না।” [১]

হিশাম মিথ্যা অভ্যুহাত মনে করে শাস্তি হিসেবে তাঁকে চাবুক মারলেন। এছাড়া তাঁর দরস (শিক্ষাদান) এর মজলিসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। [২]

আব্দুল মালিক যখন এই পদক্ষেপের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি গভর্নরের কাছে এক তিরস্কারমূলক পত্র পাঠালেন যাতে লেখা ছিল:

“তোমার উচিত ছিল সাঈদ বিন মুসাইয়িবকে মারধর করার পরিবর্তে তাঁর সাথে সদয় আচরণ করা। আমরা জানি তাঁর পক্ষ থেকে বিরোধিতার কোনো আশঙ্কা নেই।”

আব্দুল মালিক সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-কেও একটি চিঠি লিখলেন যাতে এই পদক্ষেপের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করা হয়েছিল।

সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) চিঠিটি পড়ে বললেন: “আমার এবং জালিমদের মাঝে আল্লাহই ফয়সালা করবেন।” [৩]

এটি হযরত সাঈদ (রহ.)-এর সতর্কতা ছিল যে, শাসকদের কঠোরতার শিকার হয়েও কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের নাম নিয়ে বদদোয়া করেননি।

কিছু সঙ্গী বলতেন যে আপনি বনু উমাইয়ার জন্য বদদোয়া করুন। কিন্তু আপনি শুধু এই দোয়া করতেন: “হে আল্লাহ! আপনার দ্বীনকে মর্যাদা দান করুন, আপনার নেক বান্দাদের বিজয়ী করুন এবং আপনার শত্রুদের লাঞ্ছিত করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে নিরাপত্তা দান করুন।” [৪]

কন্যার জন্য শাহজাদার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান:

আমির ও শাসকদের প্রতি তাঁর অমুখাপেক্ষিতার অবস্থা এমন ছিল যে, আব্দুল মালিক তাঁর ছেলের জন্য তাঁর কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই মেয়েটি চরিত্র ও রূপ, ইলমি ও আমলি পূর্ণতা এবং বংশীয় আভিজাত্যে অনন্য ছিল। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) চাইলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে শাসকের বৈবাহিক আত্মীয় হতে পারতেন, কিন্তু আপনি চরম নির্লিপ্ততার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এর পরিবর্তে আপনি একজন দরিদ্র আলেম কাসীর বিন আবি ওয়াদাআ-কে এই প্রস্তাব দিলেন যিনি পরবর্তীতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হয়েছিলেন। তিনি নিজেই এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন:

আমার স্ত্রীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। এই কারণে আমি বেশ কয়েকদিন সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতে পারিনি। যখন গেলাম, তিনি অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঘটনা শোনাতে তিনি বললেন: “আমাকে খবর দিতে পারতেন। আমিও জানাজায় আসতাম।” তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: “নিকাহর জন্য অন্য কোনো নারী খুঁজেছেন কি?”

আমি বললাম: “আমি একজন দরিদ্র মানুষ, মাত্র দুই-তিন দিরহামের মালিক, কে আমাকে মেয়ে দেবে?”

তিনি বললেন: “আমি।”

আমি অবাক হয়ে বললাম: “আপনি বিয়ে দেবেন?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৯, ২৯০

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১২৫, ১২৬

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৭০, ১৭১, ১৭২

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫/১২৮

তারপর সেই মজলিসেই সেই সময়েই তিনি নিজের মেয়ের সাথে আমার নিকাহ পড়িয়ে দিলেন। আমি ঘরে ফিরলাম, খুশিতে আত্মহারা ছিলাম কিন্তু চিন্তিত ছিলাম যে ঘর সাজানোর জন্য এখন কার কাছে ঋণ চাইব? মাগরিবের নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলাম। দিনে রোজা রেখেছিলাম। রাতের খাবার যা ছিল জয়তুনের তেল এবং রুটি, তা খেতে লাগলাম। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

জিজ্ঞেস করলাম: “কে?”

উত্তর এলো: “সাইদ!”

আমার মন সাইদ নামের প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে গেল কিন্তু এই খেয়াল আসেনি যে তিনি সাইদ বিন মুসাইয়িব হবেন; কারণ চল্লিশ বছর ধরে তিনি নিজের ঘর থেকে মসজিদ ছাড়া আর কোথাও যাননি। দরজা খুললাম তো সাইদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আরজ করলাম: “হযরত! আপনি কেন কষ্ট করলেন? আমাকে ডেকে পাঠাতেন!!”

তিনি বললেন: “না! তোমার হক ছিল যে আমি তোমার কাছে আসব। তুমি একা মানুষ ছিলে, এখন বিয়ে করেছ। আমার ভালো লাগেনি যে তুমি রাত একা কাটাও। এই তোমার স্ত্রী আমার সাথে এসেছে।”

আমি দেখলাম তো তাঁর সাহেবজাদী চাদরে আবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি মেয়ের হাত ধরে তাকে দরজা দিয়ে ভেতরে দিলেন এবং কপাট বন্ধ করে চলে গেলেন। মেয়েটি লজ্জা ও শরমের কারণে একপাশে পড়ে গেল। আমি দ্রুত চেরাগের ওপর একটি পাত্র রেখে দিলাম যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। তারপর ছাদে উঠে প্রতিবেশীদের ডাক দিলাম। তারা এল এবং জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী হয়েছে? আমি ঘটনা শুনিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে আমার মা-ও চলে এলেন এবং এই ঘটনা শুনে বললেন: “যদি মেয়েটিকে স্পর্শ করো তবে আমি তোমার মুখও দেখব না। আমি তিন দিনে তাকে প্রস্তুত করে তারপর তোমার কাছে পাঠাব।”

তিন দিন পর বিদায় হলো। আমি মেয়েটিকে দেখলাম তো অত্যন্ত রূপবতী ও সুন্দরী, কুরআন পাকের হাফেজা, সুন্নাহর আলেমা এবং স্বামীর হকের পূর্ণ খেয়াল রাখার মতো ছিল।

এক মাস পর আমি সাইদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি পাঠ দান করছিলেন, যখন অবসর হলেন এবং সব লোক চলে গেল তখন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: “তাকে কেমন পেলেন?”

আমি বললাম: “এমন চমৎকার যে বন্ধু খুশি হবে আর শত্রুর অন্তর জ্বলবে।”

বললেন: “যদি তার থেকে কোনো অভিযোগ থাকে তবে লাঠি দিয়ে খবর নিও।”

আমি ঘরে ফিরলাম তো সাইদ বিন মুসাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেছন থেকে বিশ হাজার দিরহামের হাদিয়া পাঠালেন। [১]

এই ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায় যে এই মহান ব্যক্তিদের নিকট দুনিয়াবি সম্পদ ও পদের কোনো মর্যাদা ছিল না। অন্যথায় কে হবে যে নিজের মেয়ের জন্য শাহজাদার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে একজন দরিদ্র আলেমকে প্রাধান্য দেবে।

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৬৭, ১৬৮

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের প্রতি নির্লিপ্ততার ঘটনা:

ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকই একমাত্র শাসক ছিলেন না যার প্রতি তাঁর আচরণ ছিল নির্লিপ্ত। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক খলিফা হওয়ার পর মদিনায় এসে দেখলেন সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) মসজিদে একটি হালকায় বসে হাদিসের দরস দিচ্ছেন।

ওয়ালিদ জিজ্ঞেস করলেন: “এই ভদ্রলোক কে?”

বলা হলো: “সাঈদ বিন মুসাইয়িব।”

ওয়ালিদ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সাঈদ (রহ.) দরস শেষ করে যখন বসলেন, তখন তিনি এক খাদেমকে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্য।

খাদেম গিয়ে এই নির্দেশ শোনাল। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) বললেন: “তোমার হয়তো নাম বুঝতে ভুল হয়েছে। খলিফা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে ডেকেছেন।”

খাদেম ফিরে এসে এই উত্তর শোনাল। ওয়ালিদ রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! তিনি মদিনার মুফতি, কুরাইশদের সরদার এবং আপনার পিতার বন্ধু। তাঁর আগে কোনো শাসকই তাঁর কাছ থেকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশা করেননি।”

এ কথা শুনে ওয়ালিদ তাঁকে তলব করার ইচ্ছা থেকে বিরত হলেন। [১]

সালাত সংশোধন করে দেওয়ায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কৃতজ্ঞ:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জুলুম-অত্যাচার সুবিদিত এবং তার ধৃষ্টতার ঘটনাবলি সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তবে তিনিও সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাঁকে সম্মান করতেন। এর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর কারণেই হাজ্জাজের সালাত সংশোধন হয়েছিল। একবার কেউ সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল:

“হাজ্জাজ আপনাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয় না, শহর থেকেও বের করে দেয় না এবং কোনো কষ্টও দেয় না। এর কারণ কী?”

তিনি বললেন: “আমি তো অন্য কোনো কারণ জানি না। হ্যাঁ, একবার আমি তাঁর পিতার সাথে সালাত আদায় করতে এসেছিলাম। তখন দেখলাম সে (হাজ্জাজ) রুকু ও সিজদা ঠিকমতো করছে না। আমি তাকে সতর্ক করার জন্য এক মুষ্টি কক্ষর ছুঁড়ে মারলাম। বলা হয় যে, এরপর থেকে সে তার সালাত সংশোধন করে নিয়েছিল।” [২]

তিনি বলতেন: “যখনই জালেমদের সমর্থকদের ওপর তোমাদের দৃষ্টি পড়বে, তখন (অন্তত) অন্তর থেকে তাদের ঘৃণা করো। অন্যথায় আশঙ্কা আছে যে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে।” [৩]

স্বপ্নের ব্যাখ্যার পারদর্শিতা:

আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এই বিদ্যা আপনি হযরত আসমা (রাযি.)-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন এবং তিনি তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর কাছ থেকে। একবার এক ব্যক্তি এসে বলল: “আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি আব্দুল মালিক...”

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৩০/৫

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১২৯/৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২২২/৪

বিন মারওয়ানকে আছাড় দিয়েছেন এবং তাকে উপুড় করে তার পিঠে চারটি পেরেক গেঁথে দিয়েছেন।

আপনি তৎক্ষণাৎ বললেন: “এই স্বপ্ন তুমি দেখনি।” সে বলল: “আমিই দেখেছি।”

আপনি বললেন: “যতক্ষণ না তুমি আমাকে স্বপ্নদ্রষ্টার নাম বলবে, আমি এর ব্যাখ্যা দেব না।”

অবশেষে সেই ব্যক্তি বলল: “এই স্বপ্ন আবদুল্লাহ বিন জুবারের (রা.) দেখেছেন এবং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।”

আপনি বললেন: “এর ব্যাখ্যা হলো, আবদুল মালিক ইবনে জুবারের (রা.)-কে হত্যা করবে। এরপর আবদুল মালিকের চার পুত্র খলিফা হবে।” [১]

এক ব্যক্তি স্বপ্ন বর্ণনা করল যে, আমি ছায়া থেকে রোদে চলে গিয়েছি। আপনি বললেন: “যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তুমি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।” সে বলল: “আসলে আমি দেখিনি যে আমাকে ছায়া থেকে রোদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

আপনি বললেন: “তাহলে তোমাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হবে।” এমনই হলো। সেই ব্যক্তি কোনো এক যুদ্ধে কাফেরদের হাতে বন্দী হলো। তাকে কাফের হতে বাধ্য করা হলো। পরে সে মুক্তি পেয়ে ফিরে এল এবং লোকদের এই ঘটনা শোনা। [২]

এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে, সে আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আপনি বললেন: “তুমি সমুদ্র ভ্রমণ করবে, তারপর শীঘ্রই মারা যাবে।” এমনই হলো। [৩]

তাকওয়া, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মমর্যাদা:

তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত কখনো জামাতে সালাত ফউত হয়নি। প্রায়ই আজানের আগেই মসজিদে উপস্থিত থাকতেন। একবার তিনি নিজেই বললেন:

“ত্রিশ বছর ধরে এমন কখনো হয়নি যে, আজানের আগে আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম না।” [৪]

আত্ম-জিজ্ঞাসার গভীরতা এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, ৮৩ বছর বয়সেও আপনি নিজের নফসের অনিষ্ট থেকে ভয় পেতেন। প্রায়ই বলতেন: “আমার নিজের নফসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় হলো নারীদের ফিতনায় পড়ে যাওয়া।”

কেউ একজন বলল: “আপনার মতো ব্যক্তির তো নারীদের প্রতি কোনো ঝোঁক নেই, আর নারীদেরও আপনার মতো ব্যক্তির প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না। তবে এই ভয় কিসের?”

আপনি বললেন: “হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও কথা সেটাই যা আমি বলছি।” [৫]

হালাল উপার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ:

তিনি স্বাবলম্বী হওয়াকে দ্বীনদারির অংশ এবং হালাল রিজিককে আগাগোড়া কল্যাণকর মনে করতেন। তিনি বলতেন:

“সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে সত্যের পথে ব্যয় করার জন্য এবং অন্যের কাছে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য হালাল সম্পদ...”

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১২৩/৫

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১২৫/৫

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১২৪/৫, ১২৫

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১৬২/২, ১৬৩

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৩৬/৫; হিলয়াতুল আউলিয়া: ১৬৬/২

...না খায়।

কিন্তু এর পাশাপাশি আপনি তাওয়াক্কুল এবং ইস্তিগনা (অমুখাপেক্ষিতা)-তেও পরিপূর্ণ ছিলেন। আপনি বলতেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে অমুখাপেক্ষী থাকে, অন্যরা অভাবী হয়ে তার কাছে আসে।” [১]

আসল ইবাদত হলো মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা:

আপনি অধিক যিকির এবং দীর্ঘ নফল ইবাদতের চেয়ে এই বিষয়ের ওপর বেশি জোর দিতেন যে, মানুষ যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। একবার তাঁর খাদেম বলল: “আমার মতে ঐসব লোক সবচেয়ে বেশি নেককার যারা যোহরের সালাত আদায় করে আসর পর্যন্ত মসজিদে বসে ইবাদত করতে থাকে।” আপনি বললেন: “আসল ইবাদত এটি নয়। বরং আসল ইবাদত হলো আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা করা এবং ঐসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকা যেগুলোকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন।” [২]

আপনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন:

আপনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (যার দোয়া কবুল হয়) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আপনার বদদোয়া দ্রুত কার্যকর হতো। এক ব্যক্তি হযরত আলী, তালহা এবং যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নিন্দা করছিল। আপনি তাকে নিষেধ করলেন কিন্তু সে মানল না। আপনি বললেন: “যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমার মুখ কালো করে দিন।” এই বদদোয়ার প্রভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই তার পুরো মুখ কালো হয়ে গেল। শরীরের বাকি অংশ আগের মতোই ফর্সা রয়ে গেল। [৩]

ওফাত:

আপনার ওফাত ৯৩ হিজরীতে হয়। ওফাতের আগে এমন কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে উঠে দাঁড়ানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় সালাত আদায় করতেন। বারবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এই সময়ে নাফে (রহ.) এসে তাঁর চারপাই (বিছানা) কিবলামুখী করে দিলেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন জিজ্ঞেস করলেন: “আমার চারপাই কিবলামুখী কে করেছে, নাফে কি?” লোকেরা ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বলতে লাগলেন: “যদি আমি আহলে কিবলা এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত না হতাম, তবে চারপাই কিবলামুখী করে দিলে কী লাভ হতো!!” [৪]

আপনি উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু অর্থ রেখে যাচ্ছিলেন। এই বিষয়ে বললেন:

“হে আল্লাহ! তুমি জানো আমি কেবল আমার দ্বীন এবং সম্মান বাঁচানোর জন্য এই সম্পদ কাছে রেখেছিলাম।” [৫]

শেষ অসিয়ত হিসেবে বললেন: “আমার জানাজায় যেন কোনো বিলাপকারী সাথে না যায় এবং সুগন্ধির ধোঁয়া যেন না দেওয়া হয়। দাফন-কাফনে যেন তাড়াহুড়ো করা হয়। যদি আল্লাহর কাছে আমার জন্য কল্যাণ থাকে তবে সেই জায়গাটি আমার জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে।” আরও বললেন: “আমার জানাজার ঘোষণা যেন না দেওয়া হয়। কেবল চারজন মানুষই যথেষ্ট যারা আমাকে আমার রবের কাছে পৌঁছে দেবে।” [৬]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২ / ১৭৩

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২ / ১৭৩

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫ / ১৩৫

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৫ / ১৩৬

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪ / ২৫৫, ২৫৬

হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রহ.

সাঈদ বিন জুবায়ের রহ.-ও প্রথম হিজরি শতাব্দীর সেই সকল ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত যারা ইলম ও আমলের জগতের বাদশাহ হিসেবে গণ্য হন। ইমাম নববী রহ. লিখেছেন যে, সাঈদ তাবেরীদের বড় ইমামদের মধ্যে ছিলেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, যুহুদ ও ইবাদত এবং সত্যবাদিতা ও সততার ময়দানে তিনি প্রথম সারির বীর পুরুষ ছিলেন। [১]

শিক্ষা ও লালন-পালন:

সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. বংশগতভাবে মাওয়ালি অর্থাৎ অনারব গোলামের বংশধর ছিলেন, কিন্তু বড় বড় আরব মাশায়েখগণ আপনার থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। তাঁর শিক্ষা ও লালন-পালনের সময়ে বড় বড় সাহাবীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো উম্মতের স্তম্ভগণ বিদ্যমান ছিলেন। সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. তাঁদের থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিনি বিশেষভাবে ফয়েজ হাসিল করেছেন। এই দরসগাহে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আদব, বালাগাত এবং ইতিহাসসহ সকল ইলম ও ফনের সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতো। সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. এই সমস্ত ইলমকে নিজের প্রাণের সম্বল বানিয়ে নিয়েছিলেন। [২]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইলমি মজলিসে যে সকল সওয়াল-জওয়াব হতো, সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. সেগুলো মুখস্থ করতেন এবং নিজের কাগজে লিখেও নিতেন। কখনো কখনো প্রশ্নের আধিক্য এত বেশি হতো যে, সাঈদ বিন জুবায়ের রহ.-এর সমস্ত কাগজ ভরে যেত এবং তাঁর হাতের তালুতে লেখার উপক্রম হতো। [৩]

ইলমি মাকাম:

আপনি প্রথমে হিজাজে বসবাস করতেন। এরপর ইরাকে চলে আসেন। এখানে কিছুকাল পারস্য ও ইসফাহানে অতিবাহিত করেন। পরিশেষে কুফায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় ইরাকে মাওয়ালিদের না ইমাম নিযুক্ত করা হতো, না কাজী। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে জামে মসজিদের ইমাম এবং পরবর্তীতে কুফার কাজী নিযুক্ত করে দেন। [৪]

তিনি প্রখ্যাত হাফেজ ও ক্বারী ছিলেন। কিরাত ও তাফসিরের ইলম আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শিখেছিলেন। এছাড়া মিনহাল বিন আমর এবং আবু বকর বিন আবিল আলা-এর মতো প্রখ্যাত ক্বারীগণের নিকট থেকে তাজবিদ শিখেছিলেন। [৫]

[১] তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন-নববী: ১/২১৬

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৭

[৩] ওফয়াতুল আ'যান: ২/৩৭২-৩৭৩

[৪] ওফয়াতুল আ'যান: ২/৩৭১

[৫] ওফয়াতুল আ'যান: ২/৩৭১

তিনি প্রচুর তিলাওয়াত করতেন এবং প্রায়ই দুই রাতে পুরো কুরআন খতম করতেন। একবার তিনি বাইতুল্লাহতে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে এক রাকাতে পুরো কুরআন খতম করলেন। [১]

তিনি সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত পছন্দ করতেন কিন্তু গান গেয়ে কুরআন পড়া কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। [২]

রমজানুল মুবারকে তিনি যখন তারাবিহর ইমামতি করতেন তখন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এক রাতে তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর কিরাত শোনাতেন। পরবর্তী রাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কিরাত অনুসরণ করতেন। এভাবে প্রতিদিন সমস্ত প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির কিরাতগুলো পরিবর্তন করে করে এমন দক্ষতার সাথে কুরআন মাজীদ শোনাতেন যে শ্রোতারা বিমোহিত হয়ে যেতেন। [৩]

আয়াতের শানে নুযূল এবং তাফসীরের ওপর তাঁর এমন দক্ষতা ছিল যে, যখন তাঁর সামনে কোনো আয়াত পড়া হতো, তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রেক্ষাপট, শানে নুযূল, তাফসীর এবং মর্মার্থ সম্পর্কে অবহিত করতেন। [৪] হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যেতে পারে যে, কোনো কোনো সময় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) নিজের উপস্থিতিতে তাঁকে হাদীস শোনানোর নির্দেশ দিতেন। [৫]

ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষাও তিনি বেশিরভাগ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর পর তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর সান্নিধ্যে থাকেন এবং বিশেষভাবে তাঁর কাছ থেকে ইফতা ও বিচারকার্য শেখেন। এভাবে তিনি যৌবনেই তাঁর সময়ের ইসলামের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। [৬] ফিকহ শাস্ত্রে এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন যে কুফার কাজী নিযুক্ত হন। স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) তাঁর ফতোয়ার ওপর আস্থা রাখতেন। যদি কুফা থেকে কেউ তাঁর কাছে মক্কায়ে এসে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করত, তবে ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন:

“তোমাদের ওখানে কি সাঈদ বিন জুবায়ের নেই?” [৭]

গণিত এবং মিরাসের (উত্তরাধিকার) মাসআলার ওপর তাঁর এমন দখল ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এই ধরনের মাসআলা জিজ্ঞাসাকারীদের বলতেন:

“সাঈদ বিন জুবায়েরের কাছে যাও। তিনি বলে দেবেন।” [৮]

যখন তিনি মদীনায় আসতেন, তখন এখানকার উলামা ও তালিবে ইলমরাও তাঁর কাছ থেকে মিরাস শিখতেন। হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর মতো ইলমের আধার বলতেন: “যখন সাঈদ (রা.) আমাদের এখান দিয়ে যেতেন, তখন আমরা তাঁকে মিরাসের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতাম।” [৯]

তাঁর ওয়াজে অনেক প্রভাব ছিল। প্রতিদিন ফজর ও আসরের পর তিনি ওয়াজ করতেন। [১০]

ইবাদত ও রিয়াযত:

সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) কেবল আলেমই ছিলেন না, বরং অনেক বড় ওলী এবং আবেদ ও যাহেদও ছিলেন। আল্লাহর স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তায় তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। [১১]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩২৪

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৬২

[৩] ওফায়াতুল আ'য়ান: ২/৩৭১

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৬০

[৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৬

[৬] কিতাবুয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃ. ৩০০

[৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৭

[৮] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৮

[৯] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৮

[১০] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৯

[১১] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৫৮

প্রতি বছর তিনি একবার হজ এবং একবার উমরার জন্য যেতেন। সাধারণত কুফা থেকেই ইহরাম বেঁধে রওনা হতেন। এভাবে বছরে তাঁর পাঁচ-ছয় মাস সফরেই কেটে যেত। [১]

রমজান মাসে ইবাদত অনেক বেড়ে যেত। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময় তিলাওয়াতে কাটত। কোনো কোনো সময় এক বৈঠকেই কুরআন মাজীদ খতম করে দিতেন। নিজের মহল্লার মসজিদে ইতিকাফও করতেন। [২]

তাঁর দুআ বা বদদুআ সাথে সাথেই কবুল হতো। তাঁর ঘরে একটি মোরগ ছিল যার ডাকে তিনি সাহরির সময় জাগ্রত হতেন। একবার মোরগটি ডাকল না এবং তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারলেন না। এতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং মোরগটির ব্যাপারে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: “আল্লাহ একে বোবা করে দিন, এর কী হয়েছে?” এর পর মোরগটি সত্যিই বোবা হয়ে গেল। এটি দেখে তাঁর মা বললেন: “বৎস! ভবিষ্যতে কখনো কাউকে বদদুআ দিও না।” [৩] তিনি এই উপদেশটি গ্রহণ করলেন এবং সারাজীবন কাউকে বদদুআ দেননি।

বিদ্রোহে অংশগ্রহণ এবং মৃত্যুদণ্ড:

সাইদ বিন জুবায়ের রহমাতুল্লাহ হাজ্জাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণের সাথে মিলে আব্দুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহে শরিক হয়েছিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর তিনি কয়েক বছর হিজাজে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশেষে গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। তাঁকে হাজ্জাজের কাছে ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের পর শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনা ৯৫ হিজরীর শাবান মাসের। মৃত্যুদণ্ডের আগে তিনি হাজ্জাজের ব্যাপারে বলেছিলেন যে, আল্লাহ যেন তাকে আর কারো ওপর কর্তৃত্ব না দেন। এমনটিই হয়েছিল এবং হাজ্জাজ মাত্র কয়েক দিন পর অসুস্থ হয়ে মারা যায়। [৪]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩২৫

[২] ওফয়াতুল আয়ান: ২/৩৭১; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৬/২৬১

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৪/২৭৪

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৪৬৫ থেকে ৪৭০

ইমাম আমির বিন শাহাহিল আশ-শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

আমির বিন শাহাহিল আশ-শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উমাইয়া যুগের সেই সকল আলেম ও গুণীজনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্ব স্বীকার করত। তাঁর সম্পর্ক ছিল ইয়েমেনের আরব গোত্র হিমইয়ারের একটি শাখা “বনু শা'ব” এর সাথে। তিনি হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল ১৯ হিজরি বলা হয়। তিনি হালকা-পাতলা ও ছিপছিপে গড়নের ছিলেন। [১]

ইলমি মাকাম:

শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ কমবেশি পাঁচশত সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলমি ফায়দা হাসিল করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত আবু মুসা আশ'আরী, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত উম্মে সালামা, হযরত মায়মুনা, হযরত আসমা বিনতে উমাইস, হযরত আদি বিন হাতিম, হযরত উসামা বিন যায়েদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত ইমরান বিন হুসাইন, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত মুগীরা বিন শু'বা, হযরত হাসান বিন আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মুতী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো মহান ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর অবস্থান ছিল কুফায়, তবে ইরাকে মুখতার সাকাফীর সময়ে তিনি সাময়িকভাবে মদিনায় চলে এসেছিলেন। এখানে তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সান্নিধ্যে আট মাস পর্যন্ত ইলমি ফায়দা হাসিল করেছিলেন। [২]

মেহনত ও সাধনা..... স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা:

ইলম অর্জনের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি এত ইলম কীভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন: “বিপদ-আপদ ভুলে গিয়ে, শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়ে, গাধার মতো ধৈর্য ধারণ করে এবং কাকের মতো ভোরে জাগ্রত হয়ে।” [৩] এভাবে তিনি তাঁর সময়ের এত বড় আল্লামা হয়ে উঠেছিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমের আলেমদের ইলমকে সংরক্ষিত করে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, গত বিশ বছরে এমন কোনো হাদিস শুনি নি যা আমার আগে থেকেই মুখস্থ ছিল না। [৪]

তিনি কুরআন মাজিদের এত উচ্চপর্যায়ের স্বাক্ষরী ছিলেন যে, তাঁকে “যায়ীমুল কুররা” (বড় স্বাক্ষরী সাহেব) বলা হতো। [৫] তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল সমকালীন বিস্ময়গুলোর অন্যতম। কোনো কিছু লিখে রাখার প্রয়োজন কখনো পড়েনি। যা শুনতেন তা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ হয়ে যেত।

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২৪৬, ২৪৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২৯৭, ৩০১

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০১

[৫] তায়কিরাতুল হুফফাজ: ১/৬৭

মনে থাকত। তিনি নিজেই বলতেন যে, আমার কখনো কোনো রেওয়ায়াত লেখার প্রয়োজন হয়নি। যে রেওয়ায়াত শুনতাম তা সাথে সাথেই মুখস্থ হয়ে যেত, কখনো বর্ণনাকারীকে তা পুনরাবৃত্তি করতে বলিনি। [১]

اخلاق اور مزاج (চরিত্র ও মেজাজ):

চরিত্র ও উদারতার অবস্থা এমন ছিল যে, বংশের কোনো ব্যক্তি ঋণী অবস্থায় মারা গেলে তিনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। সারা জীবনে কখনো কোনো গোলাম বা খাদেমের ওপর হাত তোলেননি। যুহুদ ও অল্লেতুষ্টি এমন ছিল যে, মানুষ যেসব জিনিসের দিকে পছন্দ ও ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাত, আপনি সেগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকানোও পছন্দ করতেন না। [২]

স্বভাবগতভাবে তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন, তবে ইলমি আলোচনার সময় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যেতেন। ইলমের অধিকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর এতই সচেতনতা ছিল যে, কখনো কখনো বলে উঠতেন: “হায়! যদি এত ইলম অর্জন না করতাম!!” [৩]

এমনটি বলার কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর সময়ের নেতা ছিলেন; যা কিছু শিখেছেন তার ওপর আমল করা, মূর্খদের সচেতন করা এবং ভুল থেকে বিরত রাখা তাঁর দায়িত্ব ছিল। আবার ইলমের কারণে মানুষ অহংকার, রিয়া এবং দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা লাভের মোহে লিপ্ত হতে পারে। তাই এই মহান ব্যক্তিগণ নিজেদের ইলমি মাকাম নিয়ে নিজেরাই ভীত থাকতেন যে, পাছে আল্লাহর কাছে পাকড়াও না হতে হয়।

হাদিস ও আকিদা সংরক্ষণে শু'বী রহ.-এর অসাধারণ প্রচেষ্টা):

শু'বী রহ. এমন এক যুগে উম্মতের ইলমি রাহবার হয়েছিলেন যখন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লাগাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবয়ীদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছিল। তিনি আলী রা.-এর যুগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফিতনা এবং পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া বহু দুর্ঘটনা ও গৃহযুদ্ধ নিজের চোখে দেখেছিলেন। এই বিশৃঙ্খলাগুলোর প্রধান কেন্দ্র ছিল ইরাক, যেখানে তিনি বসবাস করতেন। এখানে একদিকে শিয়ানে আলী, সাদাতদের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রশংসা ও গুণকীর্তনে অতিরঞ্জন করতে শুরু করেছিল, অন্যদিকে খারেজি এবং শামের নাসিবরা এই মহান ব্যক্তিদের নিন্দায় কোনো কমতি রাখছিল না। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির এই পরিবেশে প্রতিটি চিন্তাধারা তাদের বিরোধীদের বিপক্ষে নানা ধরনের ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা সংগ্রহ বা তৈরি করে নিজেদের অবস্থানের পক্ষে দলিল সরবরাহ করছিল। সাবায়ী গোষ্ঠী প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়ে তাশাইয়ু-এর মধ্যে ফাটল ধরাচ্ছিল এবং একে ধীরে ধীরে রাফয-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আবু সাখর খুযাইঈ (কাসীর ইজ্জাহ মৃত্যু ১০৮ হি.)-এর মতো কিছু কবিও তাদের কবিতার মাধ্যমে এ ধরনের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করছিল। [৪] এভাবে ইসলামের সমান্তরালে এক ভিন্ন ইসলাম অস্তিত্ব লাভ করছিল।

শু'বী রহ. কুফার সেই যুগও দেখেছিলেন যখন এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ছাত্রদের ফিকহী দক্ষতার জয়জয়কার ছিল, যাদের কারণে মসজিদগুলো এমনভাবে আবাদ ছিল যে এই মহান ব্যক্তিগণ ‘মসজিদের প্রদীপ’ বলে অভিহিত হতেন। এরপর তিনি সেই যুগও দেখেন যখন আলী রা.-এর এখানে আগমনের পর তাঁর ছাত্ররাও হাদিস ও ফিকহের মজলিসগুলোকে সম্মানিত করেছিলেন। [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২৯৭-৩০১

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ১/১০১

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/২৯৯

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০৯

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০২

শাবী রহ. তাদের মধ্য থেকে বহু ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শাবী রহ. ঐ সকল সুস্বদর্শী হাদীস বিশারদ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ‘রিজালুল হাদীস’ (হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা) যাচাই করার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। এজন্য তিনি মর্যাদার পার্থক্য পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেন। শাবী রহ. প্রথমে শিয়ানে আলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদের চরমপন্থী লোকদের অতিরঞ্জিত কথাবার্তা দেখলেন, তখন তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং তাদের ভুলভ্রান্তি ও মূর্থতা প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা করেননি। [১]

শিয়ানে আলীর মধ্যে যেখানে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিত্বরূপ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেখানে এমন কিছু লোকও ছিল যারা তাকওয়া ও ইবাদতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেও দ্বীনি বুঝ ও ফিকহী প্রজ্ঞার বিচারে কোনো গণনার মধ্যেই ছিল না। যেমন ইমাম শাবী রহ. হযরত আলী রা.-এর একজন সঙ্গী সা’সাআ বিন সুহান রহ. সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলতেন: “তিনি খতীব অবশ্যই ছিলেন কিন্তু ফকীহ ছিলেন না।”

কিছু এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা স্বভাবগতভাবে চরমপন্থী ও সংকীর্ণমনা ছিল কিন্তু হযরত আলী রা.-এর মজলিসে উঠাবসার কারণে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার তাবিঈ গণ্য করা হতো, যেমনটি ইবনে সাবুর। শাবী রহ. তার সম্পর্কে নিজের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন: “আমি ইবনে সাবুরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, সে না ফকীহ ছিল, আর না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ ছিল।”

হযরত আলী রা.-এর শাহাদাতের পর তাদের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধকারী সাবায়ীরাও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন আকিদা ও মিথ্যা বর্ণনা প্রচার করতে শুরু করে। শাবী রহ. এমন লোকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন রশীদ হিজরীও ছিল যে আহলে বাইতের প্রেমিক হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। শাবী রহ. যখন তার খ্যাতির কথা শুনলেন, তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করলেন। রশীদ হিজরী এই সাক্ষাতে দাবি করল যে, সে হযরত আলী রা.-এর সাথে কয়েক দিন আগে মদীনায় সাক্ষাৎ করেছে। তিনি জীবিত আছেন এবং তিনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। রশীদ হিজরীর বক্তব্য ছিল যে, এই কথাগুলো আলে মুহাম্মদের রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। শাবী রহ. রশীদ হিজরীর এই আজোবাজে কথার ওপর অভিশাপ দিতে দিতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। পরবর্তীতে সরকার রশীদ হিজরীকে এই ধরনের দাবির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। [২]

শাবী রহ.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই ছিল যে, তিনি আকিদা ও মতাদর্শের এই পরিবর্তনকে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন এবং এই স্রোতের সামনে বাঁধ নির্মাণে কোনো দ্বিধা করেননি।

এই যুগে আহলে তাশাইয়ু’র একটি নতুন দল ‘কাইসানিয়া’ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটি এমন একটি বিষয় ছিল যার ভিত্তি কে স্থাপন করেছিল—কেউ বলে এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল মুখতার সাকাফী। কেউ বলে হযরত আলী রা.-এর এক আযাদকৃত গোলাম কাইসান এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আবার কেউ কেউ একে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার দিকে সম্বন্ধ করে। [৩]

এই দলের লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত। শাবী রহ. প্রকাশ্যে বলতেন যে, এই চিন্তাধারার ধারক-বাহকগণ সুন্নাহর বিরোধী। [৪]

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৬/২৪৮

[২] সিয়র আলামুন নুবালা, ৪/৩০০-৩০৯

[৩] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল লিশ শাহরাস্তানি, ১/১৪৭, ত. মুয়াসসাসাতুল হালাবি।

আহলে তাশাইয়ু’র মধ্যে সাবাইয়্যাহর পর এটিই ছিল প্রথম বিচ্যুত দল। ইসনা আশারিয়া ও ইসমাইলিয়া ইত্যাদি অনেক পরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

[৪] সিয়র আলামুন নুবালা, ৪/৩০০

তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)-এর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারীরা হযরত আলী (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করতে শুরু করেছিল। সঠিক আকিদাবিশিষ্ট লোকদের মধ্যেও কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। শাবি (রহ.) এই মতবাদগুলোর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সাহাবী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদার স্তর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন: “আমি পাঁচশ’রও বেশি সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তারা সবাই আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.)-এর এই ক্রমবিন্যাসের প্রবক্তা ছিলেন।” [১]

তিনি আরও বলতেন: “এই উম্মতের মধ্যে কারো সম্পর্কে এত বেশি মিথ্যা তৈরি করা হয়নি, যতটা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে করা হয়েছে।” [২]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান: একবার বড় বড় আলেমদের এক মজলিসে হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর এক নাতি আসলেন। শাবি (রহ.) তৎক্ষণাৎ একটি বালিশ আনিয়ে তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসালেন। কেউ জিজ্ঞেস করল: “এত বড় বড় মাশায়েখের উপস্থিতিতে একজন বালকের প্রতি এত সম্মান কেন?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দাদাকে বালিশ পেশ করেছিলেন।” [৩]

শাবি (রহ.) হাদীসের যে খেদমত করেছেন তার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যায় যে, ইমাম আবু হানিফা, আসিম আল-আহওয়াল, ইবনে আবি লায়লা, আতা বিন সাযিব এবং আবু বকর আল-হুজালীর মতো ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৪]

তাঁর হাদীস পাঠদানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বর্ণনাগুলো মুখে শোনাতেন এবং মুখস্থ করার ওপর জোর দিতেন। তিনি লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না; এজন্য তাঁর সকল ছাত্রই হাদীস মুখস্থকারী (হাফেজ) ছিলেন। সাধারণ উস্তাদগণ কোনো বিশেষ ক্রমবিন্যাস ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করতেন, কিন্তু শাবি (রহ.)-এর একটি বিশেষ নতুনত্ব ছিল এই যে, তিনি প্রতিটি বিষয় ও মাসআলা সম্পর্কিত হাদীসগুলো আলাদা আলাদা বর্ণনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলতেন: “এগুলো তালাক সম্পর্কিত বর্ণনা।” এরপর সেই মাসআলা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো শুনিয়ে যেতেন। বর্ণনার এই পদ্ধতিই পরবর্তীতে হাদীসের কিতাবসমূহে অধ্যায় ও শিরোনামের ভিত্তি স্থাপন করে। [৫]

রাফেজীদের পরিচয়... শাবি (রহ.)-এর দূরদর্শিতার কারিশমা:

সেই যুগে রাফয (রাফেজী মতবাদ) তার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। রাফেজীরা আকিদার ক্ষেত্রে সাধারণ তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ) থেকে আলাদা ছিল। সাধারণ শিয়াদের আকিদা প্রায় তা-ই ছিল যা জমহুর উম্মতের স্বীকৃত আকিদা। বিশেষ করে কুফার অসংখ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিস এই ধরনের তাশাইয়ু-এর অনুসারী ছিলেন। তারা সবাই আবু বকর ও উমর (রা.) সহ সকল সাহাবীর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা রাখতেন। ইবনে আবদে রাব্বিহি লেখেন: “শিয়া ছিল সেই সব লোক যারা হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর প্রাধান্য দিত এবং আবু বকর ও উমর (রা.)-কে ভালোবাসত।” [৬]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলতেন:

“আমি কুফায় যে মুহাদ্দিসের কাছ থেকেই হাদীস লিখেছি, তিনি আবু বকর ও উমর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা ছিলেন।” [৭]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩০১/৪

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৯৭/৪

[৩] মুজাম ইবনুল আরাবী: ১৭২/১

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩০৭/৪

[৫] তাদরীবুর রাবী, পৃ. ৯৪

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩০৯/৪

[৭] আল-ইকদুল ফারিদ: ২৪৫/২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মকর-রফয (প্রতারণা ও রাফেযী মতবাদ) গোপনে আহলে তাশাইয়ু-কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছিল। শা'বী (রহ.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি রাফেযীদের একটি আলাদা দল ও ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাদের গোপন আকিদা সম্পর্কে এই প্রাথমিক যুগেই এমন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা অবাক করার মতো। তিনি এই দল সম্পর্কে নিজের অভিমত অত্যন্ত জোরালোভাবে এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

“রাফেযীরা এই উম্মতের ইহুদি। রাফেযীদের ইসলামের সাথে ঠিক তেমনই বিদ্বেষ রয়েছে যেমন ইহুদিদের খ্রিস্টধর্মের সাথে। রাফেযীরা কোনো আগ্রহ বা আল্লাহর ভয়ের কারণে নয়, বরং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও অবাধ্যতার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের স্বভাব ইহুদিদের মতোই। ইহুদিরা বলেছিল যে, শাসন ক্ষমতা কেবল দাউদ-এর বংশধরদের হক; রাফেযীরা বলেছে যে, শাসন ক্ষমতা কেবল আলী ইবনে আবি তালিবের বংশধরদের হক। ইহুদিরা বলেছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ না আসা পর্যন্ত জিহাদ রহিত; রাফেযীরা বলে যে, ইমাম মুনতাজার (প্রতীক্ষিত ইমাম) না আসা পর্যন্ত জিহাদ নিষিদ্ধ। ইহুদিরা তারকারাজি উদিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করে; রাফেযীরাও তাই করে। ইহুদিরা প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে এবং রাফেযীদের আকিদাও এটাই। ইহুদিরা তাওরাত বিকৃত করেছে; রাফেযীরা কুরআনকে বিকৃত বলে ঘোষণা করেছে। ইহুদিরা জিবরাঈলকে ঘৃণা করে এবং বলে: তিনি আমাদের শত্রু। রাফেযীরা বলে: জিবরাঈল মুহাম্মদের পরিবর্তে আলীর ওপর ওহী নাযিল করে ভুল করেছেন। ইহুদিরা উটের গোশত খায় না এবং রাফেযীরাও খায় না। তবে ইহুদি ও নাসারারা রাফেযীদের চেয়েও উত্তম; কারণ যদি ইহুদিদের জিজ্ঞাসা করা হয়: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা? তারা বলবে: মুসার সাথীরা। যদি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসা করা হয়: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা? তারা বলবে: ঈসার সাথীরা। কিন্তু রাফেযীদের জিজ্ঞাসা করো: তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম লোক কারা? তারা বলবে: মুহাম্মদের সাথীরা।” [১]

সরকারি মহলে শা'বী (রহ.)-এর মর্যাদা:

সরকারি মহলে তাঁর অনেক সম্মান ছিল। হাজ্জাজের সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি তাঁকে কিছু ইলমী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং সঠিক উত্তর পেয়ে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে শা'ব ও হামদান গোত্রের ভাতার তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিলেন এবং একটি সম্মানজনক বেতন নির্ধারণ করে দিলেন। [২]

ইলম ও আমলের পাশাপাশি তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং বাকপটুতাও প্রসিদ্ধ ছিল। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁর এতটাই ভক্ত ছিলেন যে, একবার রোম সম্রাটের কাছে তাঁকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। রোম সম্রাট তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফেরার সময় একটি বন্ধ চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে তাঁর বাদশাহর কাছে পৌঁছে দিতে বললেন।

শা'বী (রহ.) আব্দুল মালিকের কাছে দামেস্কে আসলেন এবং খামটি তাঁর হাতে দিলেন। আব্দুল মালিক চিঠিটি পড়ে বললেন:

“আপনি কি জানেন সম্রাট কী লিখেছেন?”

[১] শারহ্ উসূলিল ই'তিকাদ লি আবিল কাসিম আল-লালকাসি, খণ্ড: ২৮২৩; আল-ইকদুল ফারিদ: ২৪৯/২

[২] সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ৩০৪/৪

শাবী (রহ.) বললেন: “তিনি কী লিখেছেন হে আমিরুল মুমিনীন?”

আবদুল মালিক বললেন: “তিনি আমাকে লিখেছেন যে, আমি তোমার জাতির ব্যাপারে বিস্মিত। তিনি তোমার পরিবর্তে তোমার দূতকে কেন খলিফা হিসেবে নির্বাচন করলেন না?”

শাবী (রহ.) বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! তিনি আপনাকে দেখেননি, তাই তিনি এমনটি লিখেছেন।”

আবদুল মালিক বললেন: “শাবী! কায়সার আমাকে তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিলেন।”

এই কথা কায়সার পর্যন্ত পৌঁছালে তিনি বললেন: “সত্যিই আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল।” [১]

খুরুজে অংশগ্রহণ, আত্মগোপন এবং প্রাণভিক্ষা:

শাবী (রহ.) এই সম্মান ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এটি ছিল আবদুর রহমান বিন আশআসের বিদ্রোহ (খুরুজ), যাতে শাবী (রহ.) এবং সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) সহ অসংখ্য আলেম ও ক্বারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু কুফার অধিকাংশ ক্বারী এতে শরিক ছিলেন, তাই শায়খুল কুররা হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শাবী (রহ.) এই ভিড়ে शामिल হয়ে যান।

পরাজয়ের পর শাবী (রহ.) দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময়ে হাজ্জাজ খোরাসান ও তুর্কিস্তানে কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে জিহাদী বাহিনী প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, যে বিদ্রোহী কুতাইবার বাহিনীতে যোগ দেবে, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। শাবী (রহ.) একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কুতাইবার বাহিনীতে যোগ দেন এবং দীর্ঘকাল অজ্ঞাতনামা হিসেবে জিহাদী দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ফারগানা অভিযানের পর কুতাইবা যখন বিজয়ের সংবাদ লিখে হাজ্জাজের কাছে পাঠাতে চাইলেন, তখন কোনো উপযুক্ত লেখক খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শাবী (রহ.) নিজের সেবা পেশ করলেন। কুতাইবা যখন তার নাম জিজ্ঞেস করলেন, তখন শাবী (রহ.) বললেন:

“এটি জিজ্ঞেস করবেন না, এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন।”

কুতাইবাও আর জোরাজুরি করলেন না এবং তাকে দিয়ে বিজয়ের সংবাদ লিখিয়ে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ লেখার ধরন দেখেই বুঝে ফেললেন যে এটি শাবী (রহ.)-এর কথা। তিনি তৎক্ষণাৎ কুতাইবাকে লিখলেন:

“আমার এই চিঠি পড়ার সাথে সাথেই জেনে রেখো যে তোমার চিঠি লেখক ব্যক্তিটি শাবী। যদি সে তোমার হাত থেকে ফসকে যায় তবে আমি তোমার হাত-পা কেটে ফেলব এবং তোমাকে বরখাস্ত করব।”

কুতাইবা তাকে হাজ্জাজের চিঠির ব্যাপারে অবহিত করে বললেন: “আমি এর আগে আপনাকে চিনতাম না। আপনি যেখানে ইচ্ছা চলে যান। আমি হাজ্জাজের সামনে যেকোনো কসমও খেয়ে নেব।”

শাবী (রহ.) বললেন: “আমার মতো মানুষ আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না।”

কুতাইবা বললেন: “আপনি ভালো বোঝেন।”

অবশেষে কুতাইবা তাকে বন্দী করে ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে হাজ্জাজ ওয়াসিতে অবস্থান করছিলেন। ওয়াসিতের বাইরে শাবী (রহ.)-কে...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০৪

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

একজন উমাইয়া অফিসার ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিম, যিনি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি তাদের বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন যে হাজ্জাজের মুখোমুখি কীভাবে হতে হবে। দুজনেই নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিলেন যে হাজ্জাজের সামনে কী কী বলা হবে।

কুতাইবার নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়াসিতের কাছে তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো এবং এই অবস্থায় হাজ্জাজের সামনে আনা হলো। হাজ্জাজ দেখামাত্রই বললেন: “না মারহাবা, না খোশ আমদেদ! আমি তোমার বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি, শহরের ইমাম বানিয়েছি, দূত হিসেবে খলিফার কাছে পাঠিয়েছি। তবুও তুমি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে।”

শা’বী রহ. চুপচাপ শুনতে থাকলেন। হাজ্জাজ যখন মনের ঝাল মিটিয়ে নিলেন, তখন বললেন: “এখন তুমি বলো।”

শা’বী রহ. বললেন: “আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে রাখুন। আপনি যা বলেছেন তা একদম সঠিক। আপনি এমনই করেছেন। কিন্তু আমরাও আপনার থেকে আলাদা হয়ে কখনো শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। আমি অনুতপ্ত এবং সেই সত্য পথ চিনে নিয়েছি যা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলাম। আমি আমার ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমের সামনে এর প্রকাশ ঘটিয়ে নিরাপত্তার আবেদন করেছিলাম।”

হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমের দিকে ফিরলেন এবং বললেন: “তুমি আমাকে জানাওনি কেন?”

তিনি বললেন: “জি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম।”

হাজ্জাজ শা’বীকে জিজ্ঞেস করলেন: “কিন্তু তুমি আল্লাহর শত্রুর সাথে দিলে কেন?”

শা’বী রহ. অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ আরবিতে বললেন: “আমাদের বক্ষ ছিল অনুর্বর এবং বাসস্থান প্রতিকূল। ভয় ছিল আমাদের পোশাক ও বিছানা এবং ফিতনা আমাদের গ্রাস করে নিয়েছিল। আমরা না নিষ্পাপ পরহেজগার, না শক্তিশালী পাপাচারী। এখন সময় এসেছে যে আপনি রক্ত মাফ করে তওবার সুযোগ দিন।”

হাজ্জাজ এই অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যগুলো শুনে অভিভূত হয়ে উঠলেন, বললেন:

“ওহ! তোমার পিতার কল্যাণ হোক! ঠিক আছে। আচ্ছা! আমি মাফ করলাম। তুমি যেতে পারো।” [১]

ওফাত:

আপনি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর মতো নেককার শাসকের সময়কালও পেয়েছেন এবং এই শেষ বয়সে বার্ধক্য সত্ত্বেও কুফার কাজী ছিলেন। ইলম ও ফজিলতের এই ইমাম ১০৪ হিজরিতে কুফায় ইন্তেকাল করেন। বয়স আশি বছরের কাছাকাছি ছিল। [২]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩০৪, ৩০৫; আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ: ৬/২৪৯; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২৮৮।

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ১০৪ হিজরি; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৩১৮।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম হিজরী শতাব্দীর সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি এমন এক সময়ে—যখন উমাইয়া খলিফাদের বিজয়সমূহ তুঙ্গে ছিল এবং চারদিক থেকে ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ইসলামী বিশ্বের দিকে ধাবিত হচ্ছিল—মুসলমানদেরকে বস্তুবাদের প্লাবন, নৈতিক অবক্ষয়ের গহ্বর এবং আকিদাগত ক্রটির জালে আটকা পড়া এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে মত্ত হয়ে অভ্যন্তরীণ আমল থেকে বিমুখ হওয়া থেকে বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খানদান ও নসব

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াসার নামক এক মুক্ত দাসের পুত্র ছিলেন, যিনি হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইরাক থেকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে এসেছিলেন। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ছিলেন এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সময়ে ২১ হিজরীতে হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম হয়। তিনি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে লালিত-পালিত হন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে দিয়ে ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ করাতেন এবং শিক্ষার জন্য বড় বড় সাহাবীদের মজলিসে পাঠাতেন। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দ্বীনি প্রজ্ঞা এবং জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তার দোয়া দিয়েছিলেন। [১] চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। [২]

যৌবনকাল ও জ্ঞান অর্জন

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় যখন তিনি যুবক ছিলেন, তখন বসরায় চলে আসেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, সুঠামদেহী এবং দীর্ঘকায় ছিলেন। তিনি সুন্দর পোশাকের প্রতি খেয়াল রাখতেন। সাধারণত কালো পাগড়ি বাঁধতেন। শীতকালে সবুজ জুব্বা এবং ডোরাকাটা চাদর পরতেন। গ্রীষ্মকালে সুতি কুর্তা, সালোয়ার এবং ইয়েমেনি চাদর পরিধান করতেন। তিনি বলতেন:

‘মুমিন তার পোশাকের মাধ্যমে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করে।’ [৩]

এর অর্থ এই ছিল যে, মুমিনের উচিত নয় অকারণে নিম্নমানের ও জীর্ণ পোশাক পরে নিজেকে অভাবী ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী হিসেবে প্রকাশ করা, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত পোশাক ব্যবহার করা উচিত যাতে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জিহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং পূর্ব সীমান্তের জিহাদী অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। [৪]

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭৭

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭২

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৬৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭৫

মুহাম্মাব বিন আবি সাফরা-র মতো প্রখ্যাত ইসলামী সেনাপতিদের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল। মুহাম্মাব যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন, তখন হযরত হাসান বসরী (রহ.) সাথে থাকতেন। কঠিনতম যুদ্ধগুলোতে তাঁকে প্রথম সারিতে রাখা হতো। [১]

তিনি বেশিরভাগ ইলমী ফায়দা ইমরান বিন হুসাইন, মুগীরা বিন শু'বা, আবদুর রহমান বিন সামুরা, সামুরা বিন জুনদুব, নুমান বিন বশীর এবং আনাস বিন মালিক (রাযি.)-দের থেকে লাভ করেছেন। সাধারণত তাঁকে হযরত আলী (রাযি.)-এর ছাত্র মনে করা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের মতে, হযরত আলী (রাযি.) থেকে তাঁর সরাসরি ইলম অর্জন প্রমাণিত নয়। তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর বাণী ও হাদীসসমূহ অন্যদের থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। [২]

মুসলিম বিশ্বে তাঁর মর্যাদা:

হাসান বসরী (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের আধ্যাত্মিকতা, ঈমানী অবস্থা, অভ্যন্তরীণ নূর, জ্ঞান ও মর্যাদা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এবং তাফসীর ও হাদীসের ইলমের বিশাল সমুদ্র এবং আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ছায়াদানকারী বৃক্ষে পরিণত হয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের ইলমী, আমলী এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর কারণে তিনি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হতে থাকেন। তাঁর ভক্ত-অনুরাগীদের বলয় পুরো ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

মক্কা ও মদীনা প্রতিটি যুগে গুণী ও পূর্ণতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বাইরের কোনো ব্যক্তিত্ব এখানকার আলেমদের খুব কমই প্রভাবিত করতে পারত, কিন্তু হাসান বসরী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হারামের মুরুব্বীরাও স্বীকার করতেন এবং তাঁর ওয়াজ শুনে বলতেন: “আমরা ইতিপূর্বে এমন ব্যক্তি দেখিনি।” [৩]

তাঁর ইলমের প্রশস্ততা এমন ছিল যে, দশ দশ বছর তাঁর মজলিস ও মাহফিলে বসা ব্যক্তিদের বক্তব্য ছিল যে, আমরা প্রতিদিন তাঁর থেকে নতুন কোনো না কোনো কথা শুনতাম। [৪]

হযরত জাফর সাদিক (রহ.) বলতেন: “হাসান বসরীর কথা আশ্বিয়ায়ে কেরামের কথার সদৃশ।” [৫]

দীর্ঘকাল তিনি বসরার মুফতী ছিলেন। তাঁর ফয়সালা ও মতামতের ওপর সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ আস্থা ছিল। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-কে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন: “হাসানকে জিজ্ঞাসা করো। তাঁর মনে আছে, আমরা ভুলে গেছি।”

উন্মত্তের সামনে আসা সমস্যা হোক বা মানুষের ব্যক্তিগত বিবাদ, তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান এবং সর্বোত্তম মতামত পেশ করতেন। বসরার একজন প্রবীণ মুরুব্বী আবু কাতাদা আল-আদভী (রহ.) বলতেন: “এই উস্তাদের আঁচল আঁকড়ে ধরে থাকো; কারণ আমি তাঁর চেয়ে বেশি হযরত উমর (রাযি.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দূরদর্শিতা সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।” [৬]

[১] আল-মা'রিফাত ওয়াত তারিখ: ৫৯৬/২, সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৭৯/৪

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৬৬/৪

[৩] তারিখ-ই-দাওয়াত ওয়া আজীমত: ৫৭/১, বরাতে দাইরাতুল মাআরিফ বুস্তানী: ৪৪/৭

[৪] তারিখ-ই-দাওয়াত ওয়া আজীমত: ৫৯/১, বরাতে দাইরাতুল মাআরিফ বুস্তানী: ৪৪/৭

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৮৫/৪

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৭৩/৪

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই যুগের একজন মুহাদিস আইয়ুব সাখতিয়ানী (রহ.) বলতেন:

“যদি তোমরা হাসানের কাছে বসতে, তবে বলতে যে, আমি তার আগে এমন কোনো ফকিহ দেখিনি।” [১]

চরিত্র ও আচরণ:

তার জীবন সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। চলন-বলন, জীবনযাপন, মেজাজ ও অভ্যাস, চরিত্র এবং ওয়াজ ও নসিহতে তাদেরই প্রতিফলন দেখা যেত। আবু বুরদাহ (রহ.) বলতেন:

“আমি তার চেয়ে বেশি রাসূলের সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।” [২]

তাবাকাত-এর লেখক মুহাম্মদ বিন সাদ (রহ.) তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন:

“তিনি ছিলেন গুণাবলির আধার, আলেম, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, ফকিহ এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তার কথা দলিল হিসেবে গণ্য হতো। তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার, প্রাঞ্জলভাষী এবং অত্যন্ত সুশ্রী।” [৩]

বক্তব্যের শক্তি এবং দাওয়াতি ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা:

সকলেই একমত ছিলেন যে তিনি ছিলেন বক্তব্যের সিংহ। তার বক্তব্যের শক্তি এমন ছিল যে বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চেয়েও বেশি বাগ্মী মনে করতেন, যাকে সেই যুগের সবচেয়ে বড় খতিব গণ্য করা হতো। তিনি যা বলতেন তা অন্তর থেকে আসত এবং সরাসরি অন্তরে প্রভাব ফেলত। তার শব্দগুলো ছিল সুস্থ বিবেকের সম্পূর্ণ অনুকূল। তার কথায় মধুর মতো মিষ্টতা ছিল। তার কথাবার্তা ছিল অন্তরের মলম এবং অসুস্থ আত্মার চিকিৎসা। [৪]

বস্তুবাদ ও অর্থের লালসার নিন্দা:

ওয়াজ ও নসিহতের সময় প্রতিটি বাক্যে আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজ করত। রাসূলুল্লাহ (সা.), সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামতের আলোচনা করার সময় তিনি প্রায়ই অশ্রুসিক্ত হতেন। তিনি ইতিহাস ও সমাজে আসা উত্থান-পতন এবং পরিবর্তনের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখতেন। তিনি ফারুকী যুগে চোখ খুলেছিলেন যখন ইসলামের মুজাহিদরা বাতিলের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিল। উসমান গনি (রা.)-এর যুগে বিজয়াভিযান এবং ধন-সম্পদের সেই প্রাচুর্য তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে সতর্ক করে বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি যে, তোমাদের জন্য দুনিয়াকে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল, অতঃপর তোমরা দুনিয়ার লালসা করতে শুরু করবে যেমন তারা করেছিল এবং এরপর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল।” [৫]

সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র আত্মাসমূহ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৮৫/৪

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৭২/৪

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৭২/৪

[৪] মুজামুল উদাবা লিল হামাভী: ২১১৩/৫, দারুল গারব আল ইসলামী

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৪০১৫, কিতাবুল মাগাযী

সমাজে আসা বস্তুবাদের এই ফিতনা থেকে সমাজ প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি। হাসান বসরী রহ. এই সমাজেরই একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি এই পরিবর্তনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুভব করতেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রায়ই সম্পদের লালসা এবং অর্থের মোহের কঠোর নিন্দা করতেন। তিনি কসম খেয়ে বলতেন: “যে ব্যক্তিই দিরহামকে সম্মান করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।” [১] তিনি বলতেন: “দিনার ও দিরহাম কতই না মন্দ সাথী। যতক্ষণ না তারা আলাদা হয়, ততক্ষণ তারা তোমাকে কোনো উপকার পৌঁছাতে পারে না।” [২]

আখিরাতের চিন্তার গুরুত্ব:

তাঁর মতে দুনিয়ার ভালোবাসার চিকিৎসা ছিল মানুষকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বারবার কিয়ামত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করা। নশ্বর দুনিয়ার পরিবর্তে চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যায় এবং নফস বস্তুবাদের পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার দিকে ধাবিত হয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রায়ই আখিরাতের কথা এমনভাবে আলোচনা করতেন যে মানুষ অশ্রুসিক্ত না হয়ে থাকতে পারত না। তিনি ঈমান ও ইয়াকিনের সাথে কুরআন মাজীদ পড়ার ওপর জোর দিতেন এবং একে আখিরাতের চিন্তার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি বলতেন: “হে আদম সন্তান! যদি তুমি কুরআন মাজীদ পড়ো এবং এর ওপর ঈমান রাখো, তবে দুনিয়াতে তোমার দুঃখ বেড়ে যাবে, তোমার ভয় বেড়ে যাবে এবং তোমার কান্নাকাটি বৃদ্ধি পাবে।” [৩]

এটি কেবল তাঁর মুখের কথাই ছিল না, বরং তাঁর অবস্থাও ছিল এমন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির বলতেন যে, তিনি প্রায়ই আখিরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ওপর এমন গভীর গান্ধীর্ষ ছেয়ে থাকত যেন এইমাত্র কোনো বিপদ নেমে এসেছে। [৪]

মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা:

তাঁর মজলিসে মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রচুর আলোচনা হতো। তিনি বলতেন: “মৃত্যু দুনিয়াকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। এটি এখানে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য খুশির কোনো সুযোগই রাখেনি।” [৫] তিনি বলতেন: “হে আদম সন্তান! তুমি তো দিনসমূহের সমষ্টি মাত্র। যখনই একটি দিন অতিবাহিত হয়, তখন তোমার জীবনের একটি অংশও অতিবাহিত হয়ে যায়।” [৬] কখনো অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলতেন: “জান্নাত কোনো উন্মত্তের জন্য এমনভাবে সজ্জিত হয়নি যেমনটি এই উন্মত্তের জন্য হয়েছে, তবুও তুমি এর কোনো প্রেমিক দেখতে পাবে না।” [৭]

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওবার ওপর জোর দেওয়া:

তিনি প্রায়ই তাওবার গুরুত্বের ওপর জোর দিতেন এবং এতে দেরি করার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন: “হে আদম সন্তান! গুনাহ বর্জন করার কষ্ট তাওবা করার কষ্টের চেয়ে কম। তুমি কী জানো যে তুমি এমন কোনো কবির গুনাহ করে বসবে যার পর তাওবা করার সুযোগই আর মিলবে না?” [৮]

[১] কিতাবুয যুহদ লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, পৃ. ২১৯

[৩] কিতাবুয যুহদ, লিল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২১১

[৫] কিতাবুয যুহদ, লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, পৃ. ২০৯

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭৮

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭৬

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৩৩, ১৩৪

[৬] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৪৮

[৮] কিতাবুয যুহদ, লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, পৃ. ২২৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

গুনাহের কারণে তিনি নিজেও কম্পিত ও ভীত থাকতেন এবং অন্যদেরকেও তা থেকে ভয় দেখাতেন। তিনি বলতেন: “আমরা হাসি এবং ভুলে যাই যে, আল্লাহ আমাদের এই সব কাজের খবর রাখেন।” [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা:

হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূলের একনিষ্ঠ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর নিকট বস্তুবাদিতা এবং নফসের দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় ছিল রাসূলের সীরাত থেকে আলো গ্রহণ করা। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল যেন উম্মতের সাথে মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাবত ও আকিদতের সম্পর্ক এমন মজবুত হয় যে, প্রতিটি সম্পর্কের ওপর এই আবেগই প্রবল থাকে। তিনি মানুষকে সীরাতের ঘটনাবলী প্রচুর শোনাতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহে খেজুর গাছের কাণ্ডের কান্নাকাটির ঘটনাটি তিনি প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করতেন এবং কখনো না কেঁদে তা শেষ করতে পারতেন না। এরপর বলতেন: “হে আল্লাহর বান্দারা! একটি খেজুরের কাণ্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে কাঁদত। তোমাদের তো তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদা উচিত।” [২]

ফারাযদাকের তওবা:

তাঁর দাওয়াতি ও সংশোধনমূলক আবেগের বহিঃপ্রকাশ চলাফেরার সময়ও হতো। তিনি একটি জানাজায় শরিক ছিলেন। বিখ্যাত কবি ফারাযদাকও তাঁর সাথে হাঁটছিলেন। সে বলতে লাগল: “হযরত! মানুষ আমাদের একসাথে দেখে এটাই ভাবছে যে, বসরার সর্বোত্তম ব্যক্তি বসরার নিকৃষ্টতম মানুষের সাথে আছে।”

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “না না! না আমি সবার চেয়ে উত্তম, আর না তুমি সবার চেয়ে অধম। বসরায় কত মুশরিক আছে যাদের চেয়ে তুমি উত্তম, আর জীর্ণ চাদরে আবৃত কত বৃদ্ধ এমন আছেন যারা হাসান অপেক্ষা উত্তম। তবে ভালো কথা, এটা বলো যে তুমি মৃত্যুর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?”

সে বলল: “আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রবক্তা।”

তিনি বললেন: “কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সাথে কিছু শর্তও আরোপিত হয়।”

ফারাযদাক বলল: “তবে কি এর কোনো পথ আছে?”

তিনি বললেন: “কেন নয়?”

ফারাযদাক বলল: “পবিত্রা নারীদের সম্পর্কে যে কবিতা রচনা করেছি, সেগুলোর কী হবে?”

তিনি বললেন: “তওবা করে নাও এবং অঙ্গীকার করো যে ভবিষ্যতে আর এমন করবে না।”

ফারাযদাক তৎক্ষণাৎ বলল: “অঙ্গীকার করছি যে আর কখনো করব না।”

কিছুদিন পর ফারাযদাক ইন্তেকাল করল। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল:

“তোমার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?” সে উত্তর দিল: “হাসান বসরীর সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম, তার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” [৩]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৩৪

[২] মুসনাদে ইবনুল জাদ, হা: ৩২১৯; আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা: ১৪০৮

[৩] আল-কামিল ফিল লুগাত ওয়াল আদব লিল মুবাররাদ: ১/১০১; আমালিল ঝালি: ২/৩০৮; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৮৪

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার ওপর গুরুত্বারোপ:

এই যুগে মুসলিম বিশ্বে বস্তুবাদের ফিতনার সাথে সাথে সেই আকিদাগত মন্দ বিষয়গুলোরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল যার কারণ ছিল আত্মপূজা এবং পূর্বসূরিদের প্রতি অনীহা। এর মধ্যে সাবায়ী, নাসিবী, খারেজী সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ফিতনাগুলো মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মস্তিষ্কে মারাত্মক আক্রমণ করেছিল। যদি হাসান বসরী (রহ.)-এর মতো উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী না হতেন, তবে গোমরাহির এই তুফান মুসলমানদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিত।

হাসান বসরী (রহ.) সমাজের এই পরিবর্তনগুলোর ওপর দৃষ্টি রেখে নিজের ওয়াজ ও খুতবার মাধ্যমে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পূর্ণ দরদ দিয়ে উম্মতের সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। তিনি যে অঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে বসবাস করতেন, তা ছিল ফিতনার কেন্দ্র। কুফায় সাবায়ী এবং বসরায় খারেজীরা অত্যন্ত তৎপর ছিল। হাসান বসরী (রহ.)-এর মতো বুজুর্গদের সুন্দর প্রচেষ্টার বদৌলতে মুসলিম বিশ্বের এই কেন্দ্রীয় শহরগুলোর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ সঠিক দ্বীনের ওপর অটল এবং পূর্বসূরিদের সাথে যুক্ত থাকে। তিনি সাহাবায়ে কেরামের আশেক ছিলেন এবং তাদের আকিদাগত মন্দ বিষয়গুলো থেকে বাঁচার মাধ্যম হিসেবে মনে করতেন যে, সাহাবায়ে কেরামের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা হোক। তিনি উম্মতকে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করতেন। তাঁর স্মৃতিতে প্রবীণ সাহাবী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কতই না চমৎকার স্মৃতি সজীব ছিল। তিনি নিজের শৈশব ও কৈশোরে দেখা সাহাবায়ে কেরামের যুগের একেকটি দৃশ্য বর্ণনা করতেন। কখনো বলতেন: “আমি উম্মাহাতুল মুমিনীনদের হজরাগুলোতে যেতাম, তখন আমার হাত ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যেত, সে সময় আমি প্রায় বালগ হওয়ার কাছাকাছি ছিলাম।” [১] কখনো বলতেন: “আমি হযরত উসমান (রা.)-কে মসজিদে ঘুমানো অবস্থায় দেখেছি, মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে জাগ্রত করলে আমি দেখলাম তাঁর শরীরে কাঁকরের দাগ পড়ে গিয়েছিল।” [২]

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাঙ্গামা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং এই ঘটনার কিছু বিবরণ অত্যন্ত দুঃখের সাথে শোনাতে। বলতেন: “যখন মসজিদে নববীতে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-কে জুমার নামাজে বাধা দিল, তখন তারা এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করল যে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। হযরত উসমান (রা.) বেহঁশ হয়ে গেলেন এবং লোকজন তাঁকে কাঁধে করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল।” [৩]

তিনি বলতেন: “যখন হযরত উসমান (রা.) শহীদ হন, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।” [৪]

একবার সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার সাথে নিজের যুগের মুসলমানদের তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

“তাঁরা আল্লাহর সামনে বিনম্র হয়ে থাকতেন; তারপর নিজেদের চেহারা ধুলোয় মিশিয়ে দিতেন এবং সিজদায় পড়ে যেতেন। আপন রবের ভয়ে তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো। শেষ পর্যন্ত এমন কোনো কথা তো ছিলই, যার কারণে তাঁরা রাতগুলো নিঘুম কাটিয়ে দিতেন। কোনো কথা তো ছিলই, যার কারণে তাঁরা দিনে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৬৯

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৬৮

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৬৮

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৬৯

তারপর বললেন: ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহর সেই বান্দারা সত্যবাদী ও সুদৃঢ় প্রমাণিত হয়েছেন। যা মুখে বলেছেন, তা পালন করেছেন। কিন্তু তোমরা কেবল কামনায় মগ্ন আছ। হে লোকসকল! এই কামনা থেকে বিরত থাকো; কারণ আল্লাহ তাআলা কেবল কামনার বিনিময়ে দুনিয়া থেকেও কিছু দেন না, আর আখিরাত থেকেও না।’ [১]

তিনি সাহাবীগণকে মুমিনের গুণাবলির আদর্শ মনে করতেন এবং বলতেন:

‘মুমিন আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য চায় না। মজলিসে গান্ধীর্ষপূর্ণ, নির্জনে কৃতজ্ঞ, জীবিকায় তুষ্ট, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় শোকরকারী, বিপদে ধৈর্যধারণকারী, গাফেলদের মাঝে থাকলে জিকিরে এবং জিকিরকারীদের মাঝে থাকলে ইস্তিগফারে মগ্ন থাকে। এই ছিল সাহাবীগণের শান। যতক্ষণ তারা দুনিয়ায় ছিলেন, এই শানেই বেঁচে ছিলেন। যখন চলে গেলেন, তখন এই শান-শওকতের সাথেই গেলেন। হে মুসলমানগণ! তোমাদের পূর্বসূরিদের আদর্শ তো এই ছিল। যখন তোমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের আচরণ বদলে দিলে, তখন আল্লাহও তাঁর আচরণ বদলে দিলেন।’ [২]

তিনি সাহাবীগণকে স্মরণ করে বলতেন:

‘আমি এমন সব লোক দেখেছি এবং তাদের কারো কারো সাহচর্য পেয়েছি যাদের দুনিয়ার কোনো কিছু আসাতে আনন্দ হতো না এবং এর কোনো কিছু চলে যাওয়াতে দুঃখ হতো না। দুনিয়া তাদের দৃষ্টিতে মাটির চেয়েও মূল্যহীন ছিল। সেই লোকগুলো পঞ্চাশ-ষাট বছর এমনভাবে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন যে, না তাদের জন্য কোনো জোড়া কাপড় ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল, না তাদের জন্য কোনো হাঁড়ি চুলায় চড়ানো হয়েছিল। তাদের এবং মাটির মাঝে কোনো কিছুই আড়াল হতো না, তারা কখনো ঘরে ফরমায়েশ করে কোনো খাবার রান্না করাননি। যখন রাত আসত তখন সেই মহান ব্যক্তির সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন, চেহারা সিজদাহর জায়গায় রাখতেন, তাদের চোখের পানি গাল বেয়ে পড়ত। সেই মহান ব্যক্তির আল্লাহর কাছে নিজেদের ঘাড় (জাহান্নাম থেকে) মুক্তির প্রার্থনা করতেন। যখন তারা কোনো নেক কাজ করতেন তখন তার কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হতেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন তিনি তা কবুল করে নেন। যখন তাদের দ্বারা কোনো মন্দ কাজ হয়ে যেত তখন ব্যথিত হয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতেন। তারা এমনই ছিলেন এবং এমনই রয়ে গেছেন। আল্লাহর কসম! তারা গুনাহ থেকে মাসুম ছিলেন না কিন্তু তারা ইস্তিগফারের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছেন। হে লোকসকল! তোমাদের অবস্থা এই যে তোমাদের বয়স কমে যাচ্ছে, আমলনামা লিপিবদ্ধ হচ্ছে, আর আল্লাহর কসম! মৃত্যু তোমাদের ঘাড় পর্যন্ত চলে এসেছে এবং জাহান্নাম তোমাদের সামনে। সুতরাং তোমরা যেকোনো দিন আল্লাহর ফয়সালা আসার অপেক্ষায় থাকো।’ [৩]

[১] মুখতাসার কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী, পৃ. ৪৩

[২] তারিখ দাওয়াত ও আযীমত: ১/৫৯ বরাতে আল-হাসান আল-বাসরী লি-ইবনুল জাওযী, পৃ. ৬৯-৭০ এবং দেখুন “আল-ইয়াকীন” লি-ইবনু আবী আদ-দুনিয়া, পৃ. ৪৭

[৩] মুখতাসার কিয়ামুল লাইল, আল-ফাছ মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী ওয়া ইখতাসারাছল মাকরীযী, পৃ. ৪৭

তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলতেন:

“হে আদম সন্তান, তোমার জন্য আফসোস! তোমার কি আল্লাহর সাথে মোকাবিলা করার শক্তি আছে? আমি সত্তর জন বদরী সাহাবীকে দেখেছি যাদের পোশাক ছিল কেবল পশমের। তোমরা যদি তাদের দেখতে তবে বলতে যে এরা পাগল। আর তারা যদি তোমাদের ভালো লোকদের দেখতেন তবে বলতেন যে এরা হতভাগ্য, আর তোমাদের মন্দ লোকদের দেখলে বলতেন: এদের আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর কোনো ঈমানই নেই। আল্লাহর কসম! আমি এমন সব ব্যক্তিত্ব দেখেছি যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া পায়ের ধুলোর সমানও ছিল না। তাদের কাছে সন্ধ্যার সময় কেবল এতটুকু খাবার থাকত যা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের পেট ভরানো যায়। কিন্তু তারা বলতেন: আমি এই সব নিজে কীভাবে খাব? অর্ধেক খাব আর অর্ধেক সদকা করব, হয়তো অন্য কেউ আমাদের চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত।” [১]

নিফাক সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত:

তিনি ইলমি মহলে প্রচলিত এই ধারণার প্রতিবাদ করতেন যে ‘নিফাক’ কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি এই সত্যটি স্পষ্ট করতেন যে, যেভাবে কুফর ও শিরক এবং অন্যান্য আকিদাগত ব্যাধি প্রতিটি যুগে বিদ্যমান ছিল, তেমনি নিফাকের ব্যাধিও প্রতিটি সমাজে জন্ম নিতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া প্রবৃত্তিপূজাকে তিনি গোপন মুনাফেকি বলে অভিহিত করতেন। তিনি তাঁর ওয়াজ-নসিহতে প্রায়ই কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতেন:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [২]

“তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?”

তারপর এর তাফসীর করতে গিয়ে বলতেন:

“এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুনাফেক। আর মুনাফেক সেই ব্যক্তি যার যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা হয়, সে তার পেছনে পড়ে যায়।” [৩]

তাঁর মতে মুনাফেকরা কেবল বিদ্যমানই ছিল না বরং সমাজে পুরোপুরি সক্রিয় ও তৎপর ছিল। কেউ জিজ্ঞেস করল:

“মুনাফেক কি এখনও আছে?”

তিনি বললেন: “যদি তারা বসরার অলিগলি থেকে বেরিয়ে যায় তবে অবশ্যই আমার কাছে এই অলিগলিগুলো জনশূন্য মনে হবে।” [৪]

মানুষের তিন প্রকার:

তিনি তাঁর সমাজের মানুষের খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতেন। একবার বললেন:

“মানুষ তিন প্রকার: মুমিন, কাফের এবং মুনাফেক। মুমিনের ব্যাপার হলো, সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র আনুগত্যে অবিচল থাকে। আর কাফেরের কথা হলো, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন যেমনটি তোমরা দেখছ। আর মুনাফেকদের কথা হলো, তারা এখানে-সেখানে ঘরবাড়ি, কক্ষ এবং পথেঘাটে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।”

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৩৪

[২] সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত: ২৩

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৫৭০, ৫৭১

[৪] সিফাতুন নিফাক, আবু বকর আল-ফিরইয়াবি, পৃষ্ঠা ১৪৪

আল্লাহর কসম! তারা তাদের রবকে চিনতে পারেনি। বরং মন্দ কাজের মাধ্যমে তাদের রবের অবাধ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। জুলুম প্রকাশ পেয়েছে। ইলম কমে গেছে। সুন্নাত পরিত্যক্ত হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই মুনাফিকরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। তারা না ইহুদি-নাসারা, না অগ্নিপূজক যে তাদের (ইসলামি আমল না করার ক্ষেত্রে) অক্ষম মনে করা হবে। [১]

আপনার নিকট আমলহীনতা ছিল নিফাক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ। আপনি বলতেন:

“মুমিন তার দ্বীন মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করেনি বরং দ্বীন তার কাছে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র পক্ষ থেকে এসেছে, ফলে সে তা কবুল করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে মুনাফিক মানুষকে তো জবান দিয়ে দিয়েছে (মৌখিকভাবে ঈমান প্রকাশ করেছে) কিন্তু আল্লাহ তার অন্তরকে (হক কবুল করা থেকে) এবং (বাহ্যিককে) আমল থেকে বিরত রেখেছেন।” [২]

রক্তপিপাসু মুনাফিক এবং ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার পূজারী মুনাফিক:

আপনার বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুসলিম সমাজে বিদ্যমান মুনাফিকরা ছিল দুই প্রকার: একদল তারা যারা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ মনে করত। দ্বিতীয় দল তারা যারা ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার পূজারী ছিল। আপনি বলতেন:

“মুনাফিক দুই প্রকারের লোক যারা ইসলামি সমাজে প্রকাশ পেয়েছে: একদল তারা যাদের দৃষ্টিভঙ্গি মন্দ এবং সে মনে করে যে জান্নাত কেবল সেই পাবে যার দৃষ্টিভঙ্গি তার মতো, ফলে এই লোকেরা মুসলমানদের ওপর তলোয়ার উন্মুক্ত করেছে, তাদের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং তাদের সম্মানকে হালাল করে নিয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই সব লোক যারা দুনিয়ার পূজারী। এরই খাতিরে তারা রাগান্বিত হয়, এর জন্যই যুদ্ধ করে এবং এরই অন্বেষণ করে।” [৩]

শাসকদের মধ্যে নিফাকের ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত:

আপনি উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদের মধ্যেও নিফাক স্পষ্টভাবে দেখতেন এবং অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতেন:

“আল্লাহর শান যে এই উম্মতকে কেমন কেমন মুনাফিকদের পাল্লায় পড়তে হয়েছে, যারা এর ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে এবং যারা এর ওপর নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।” [৪]

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য:

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি বলতেন:

“মুমিন জানে যে আল্লাহ যা বলেছেন, তা তেমনই। মুমিন আমলের ক্ষেত্রেও সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকে এবং ভয়ের ক্ষেত্রেও। যদি সে পাহাড় সমপরিমাণ সদকাও করে দেয় তবুও সে ভয়হীন হয় না। তার নেকি ও কল্যাণ যত বৃদ্ধি পায়, ভয়ও তত বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক বলে: মানুষ অনেক বেশি। আমারও মাগফিরাত হয়ে যাবে। আমার কোনো পরোয়া নেই। অতঃপর সে মন্দ আমল করে আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে।” [৫]

[১] সিফাতুন নিফাক ওয়া যাম্মুল মুনাফিকীন লিল ফিরইয়াবি, পৃ. ৯১ সহিহ সনদসহ

[২] সিলাতুন নিফাক ওয়া যাম্মুল মুনাফিকীন লিল ফিরইয়াবি, পৃ. ৯১ সহিহ সনদসহ

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ সহিহ সনদসহ

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ সহিহ সনদসহ

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/১৫৩

তারিখে মিল্লাত

অংশ: দ্বিতীয়

আহলুল ইলমের জন্য তাজকিয়ায়ে নফস এবং ইসলাহে বাতিনের ওপর জোর:

হাসান বসরী তাজকিয়ায়ে নফস এবং ইসলাহে বাতিনের ওপর খুব জোর দিতেন। বাতেনী অসুস্থতা: অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা এবং রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদত কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয় বরং আহলুল ইলম ও ফজলদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। তাঁর মতে প্রকৃত আলেম ও ফকিহ তিনিই ছিলেন যিনি বাতেনী ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, ইবাদতকারী, দুনিয়াত্যাগী এবং মুত্তাকী হতেন। তিনি বলতেন:

“ফকিহ তো সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত, নিজের গুনাহের ওপর দৃষ্টি রাখে এবং আপন রবের ইবাদত নিয়মিতভাবে করে।” [১]

তিনি বলতেন: “যখন মানুষ ইলম অর্জন করে, তখন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার খুশু (বিনয়), দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তার জিহ্বা এবং তার দৃষ্টির মাধ্যমে।” [২]

আহলুল ইলমের দুনিয়া অন্বেষণের ওপর আক্ষেপ প্রকাশ:

দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উমারাদের (শাসকদের) সামনে হাত পাততে দেখে তাঁর খুব আত্মমর্যাদাবোধে লাগত এবং এই আচরণের ওপর তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন। একবার কিছু কারীকে গভর্নর ইবনে হুবারার দরজার চৌকাঠে অপেক্ষমাণ বসে থাকতে দেখে রাগান্বিত হয়ে বললেন:

“তোমরা কি এই নাপাক লোকদের কাছে যেতে চাও? তোমাদের তাদের সাথে সাক্ষাৎ কোনো নেক ও সালেহ লোকের সাথে সাক্ষাতের মতো হবে না। আল্লাহ তোমাদের লাঞ্ছিত করুন। তোমরা তো কারীদের বেইজ্জত করে দিলে। যদি তোমরা তাদের দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকতে, তবে এই লোকেরা তোমাদের দ্বীনি খিদমতে আগ্রহ দেখাত। কিন্তু যেহেতু তোমরা তাদের দুনিয়ার পেছনে পড়েছ, তাই এই লোকেরা তোমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে।” [৩]

আমরাজে বাতেনার চিকিৎসার বিশেষ মজলিস:

হাসান বসরী রহ. এই আমরাজে বাতেনার চিকিৎসার জন্য বিশেষ মজলিস বা বৈঠকের আয়োজন করতেন। এই দিক থেকে তাঁকে তাজকিয়ায়ে বাতিনের শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর একজন বুজুর্গ আবু সাঈদ আল-আরাবীর বর্ণনা হলো:

“হাসান বসরী রহ.-এর একটি মজলিস ঘরে হতো এবং একটি মসজিদে। মসজিদের মজলিসে তিনি হাদিস, তাফসির, ফিকহ এবং সমস্ত ইলম শিক্ষা দিতেন। সেখানে কিছু লোক তাঁর কাছ থেকে হাদিসের বর্ণনা শোনার জন্য আসত, কেউ কুরআন মাজিদ ও তাফসির শেখার জন্য, কেউ বালাগাত ও আরবিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য। ঘরের মজলিসে তাঁর বিশেষ সঙ্গীরা থাকতেন যেমন আমর বিন উবাইদ, আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ, সালেহ আল-মুররী। তাঁরা সবাই জুহদ ও ইবাদতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সাথে মজলিসে হাসান বসরী রহ. জুহদ ও ইবাদত এবং বাতেনী অবস্থা নিয়ে কথা বলতেন। এই সময়ে যদি অন্য কেউ অন্য কোনো মাসআলা উত্থাপন করত তবে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলতেন:

“এই নির্জন মজলিস আমাদের এই ভাইদের সাথে আলোচনার জন্য খাস।” [৪]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১৪৭/২; কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃ. ২১৬

[২] কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃ. ২১১

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৫৭৯/৪

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৫৮৬/৪

বেপরোয়া সত্যবাদিতা

তাঁর প্রচেষ্টা কেবল মসজিদ ও মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি শাসকদের ভুলত্রুটির ওপরও সমালোচনা করতেন। কোনো পার্থিব প্রলোভন বা ভয় তাঁকে সত্য কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারত না। তাঁর বসরায় অবস্থানকালে একাধিকবার ইরাকিরা খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। জবাবে শাসকরাও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে বিদ্রোহীরা বিজয়ী হতো, তারা জনগণকে নিজেদের সাথে যোগ দিতে প্ররোচিত করত। আবার যেখানে শাসকদের নিয়ন্ত্রণ চলত, তারা মানুষকে নিজেদের কাতারে লড়াই করতে বাধ্য করত। এমন পরিস্থিতিতে হাসান বসরী রহ.-এর কথা ও কাজ ছিল এই যে, এই মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে কোনো পক্ষকেই সমর্থন দেওয়া যাবে না। তাঁর এই অভিমত শুনে এক শামী (সিরীয়) ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসল: “আমীরুল মুমিনীনের সাথেও কি থাকা যাবে না?”

আপনি পূর্ণ জোশের সাথে হাত উঁচিয়ে বললেন: “হ্যাঁ! না আমীরুল মুমিনীনের সাথে, না আমীরুল মুমিনীনের সাথে।” [১]

এই সত্যবাদিতার কারণে হাজ্জাজ আপনার বিরোধী ছিল এবং আপনি তার ভয়ে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আত্মগোপনেও ছিলেন। [২] এই সময়ে তাঁর প্রিয় কন্যার ইন্তেকাল হলে তিনি তার জানাজার নামাজও পড়তে পারেননি, বরং মুহাম্মদ বিন সিরীনকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি পড়িয়ে দেন। [৩]

জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে সঠিক কৌশল

এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও হাসান বসরী রহ. বলতেন:

“আল্লাহর কসম! আল্লাহ হাজ্জাজকে তোমাদের ওপর আজাব হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তলোয়ার দিয়ে আল্লাহর আজাবের মোকাবিলা করো না। বরং তোমাদের ওপর আবশ্যিক হলো ধৈর্য ও বিনয় অবলম্বন করা।” [৪]

আপনি মানুষকে জালেমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন:

“যদি মানুষ শাসকের পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার ওপর সবর করত, তবে খুব শীঘ্রই তাদের ওপর থেকে কষ্ট দূর করে দেওয়া হতো। কিন্তু তারা অধৈর্য হয়ে তলোয়ার তুলে নেয়, ফলে তাদের শাসকদের হাতেই সোপর্দ করে দেওয়া হয়। তারপর আল্লাহর কসম! তারা একদিনের জন্যেও কল্যাণ লাভ করতে পারে না।” [৫]

জীবনের শেষ সময়ে শাসকদের নিকট আপনার মর্যাদা ও অবস্থান

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর আপনি আত্মগোপন ত্যাগ করেন। আপনার জীবনের এই শেষ পনেরো বছর আপনি এমনভাবে কাটিয়েছেন যে, কেবল বড় বড় ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণই নন, বরং খলিফারাও আপনার দিকে রুজু করতেন এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতেন। উমাইয়া সেনাপতি মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বসরার কোনো এক নাগরিকের কাছে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলেছিল:

“আমি তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর মজলিসে শরিক হই। তাঁর জাহির (প্রকাশ্য) ও বাতিন (অপ্রকাশ্য) অভিন্ন হওয়া এবং কথা...”

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৯৪/৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬১০/৪, তাবাকাত ইবনে সাদ: ২০৪/৭

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৬৪/৭ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারীদের সূত্রে সহিহ সনদে

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৫২/১২

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৬৪/৭ যয়িফ সনদে

তারিখ-এ-মিল্লাত-এ-ইসলামিয়া

কথা ও কাজের মিলের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। যদি তারা কোনো কাজের কথা বলেন, তবে তা পূর্ণ করেই ছাড়েন। যদি তারা অন্যদের কোনো কাজের আদেশ দেন, তবে নিজেরা তা পালনে সবার অগ্রগামী থাকেন। যদি তারা কোনো কাজ থেকে অন্যদের নিষেধ করেন, তবে নিজেরা তা থেকে সবার চেয়ে বেশি বিরত থাকেন। আমি তাদের দেখেছি মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে, অথচ মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী।“

মাসলামাহ বললেন: “যথেষ্ট! যথেষ্ট! যে জাতির মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকে, তারা পথভ্রষ্ট হতে পারে না।” [১]

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর নামে ঐতিহাসিক পত্র: ন্যায়পরায়ণ ইমামের গুণাবলি

উমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-কে বসরার কাজী নিযুক্ত করলেন [২] এবং নিজের শাসনকার্যের জন্য তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতে থাকলেন। একটি পত্রে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর কাছে ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। [৩] হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর উত্তরটি এমন ছিল যে, বড় বড় চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের বাণীতেও এর কোনো নজির পাওয়া যায় না। বিশ্বের কোনো জাতির সাহিত্যে ন্যায়পরায়ণ শাসকের এমন সংজ্ঞা বা এমন উপদেশনামা নেই। এই বাণীর প্রতিটি পঙ্ক্তি হৃদয়কে নাড়া দেয়। আপনি লিখেছিলেন:

“হে আমিরুল মুমিনিন! জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ ইমামকে প্রতিটি বিদ্যুতি রোধকারী, প্রতিটি সীমালঙ্ঘনকারীর সংশোধনকারী, প্রতিটি ফাসাদের সংস্কারক, প্রতিটি দুর্বলের শক্তি এবং প্রতিটি মজলুম ও ফরিয়াদির আশ্রয়ের মাধ্যম বানিয়েছেন।

হে আমিরুল মুমিনিন! ন্যায়পরায়ণ ইমাম সেই রাখালের মতো, যে তার উটগুলোর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, যে তাদের জন্য সর্বোত্তম চারণভূমি খুঁজে বেড়ায়, তাদের ধ্বংসের উপত্যকা থেকে রক্ষা করে, হিংস্র প্রাণীদের থেকে হেফাযত করে এবং শীত ও গরমের তীব্রতা থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখে।

হে আমিরুল মুমিনিন! ন্যায়পরায়ণ ইমাম সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল পিতার মতো, যে তাদের শৈশবে তাদের জন্য উপার্জন করে খাওয়ায়, তাদের কিশোর বয়সে শিক্ষা দান করে, নিজের জীবদ্দশায় তাদের জন্য উপার্জন করে এবং নিজের মৃত্যুর পর তাদের জন্য সঞ্চয় রেখে যায়।

হে আমিরুল মুমিনিন! ন্যায়পরায়ণ ইমাম মমতাময়ী মায়ের মতো, যে তার সন্তানের জন্য অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়। গর্ভধারণের সময় সে তাদের কষ্ট সহ্য করে, কষ্টে তাদের জন্ম দেয়। শৈশবে তাদের লালন-পালন করে। তাদের জাগরণে সে জেগে থাকে এবং তাদের শান্তিতে সে প্রশান্তি পায়। কখনো তাদের দুধ পান করায়, আবার কখনো দুধ ছাড়ায়। তাদের সুস্থতায় সে আনন্দিত হয় এবং তাদের কষ্টে সে ব্যথিত হয়।“

[১] আখবারুল কুদাত লিল ওয়াকি: ২/১২

[২] আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ: ২/৪৯

[৩] হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর উত্তর থেকে বোঝা যায় যে, এই সময় পর্যন্ত ইরাকে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর সংস্কারের প্রভাব প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই হযরত হাসান বসরী (রহ.)-কে পত্র পাঠিয়ে দিকনির্দেশনা চেয়েছিলেন এবং তিনি উত্তরে এই বিস্তারিত উপদেশনামা লিখে পাঠিয়েছিলেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আমিরুল মুমিনীন! ইমামে আদিলের মর্যাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে হৃদপিণ্ডের মতো। হৃদপিণ্ড ঠিক থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ঠিক থাকে, আর তা নষ্ট হয়ে গেলে এগুলোও নষ্ট হয়ে যায়।

আমিরুল মুমিনীন! ইমামে আদিল আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি আল্লাহর কালাম শুনে তাদের শোনান। আল্লাহর (হুকুম) দেখেন এবং তাদের দেখান। তিনি আল্লাহর অনুগত থাকেন এবং তাদের অনুগত রাখেন। অতএব আমিরুল মুমিনীন! আপনি আল্লাহর দেওয়া মালিকানায় সেই গোলামের মতো হবেন না যাকে তার মনিব আমানত সোপর্দ করেছে, নিজের সম্পদ ও সন্তানাদি তার হেফাজতে দিয়েছে কিন্তু সে সম্পদে খিয়ানত করে এবং সন্তানদের সাথে অবহেলা করে, ফলে সে মনিবের পরিবারকে নিঃস্ব এবং তার সম্পদ ধ্বংস করে দেয়।

আমিরুল মুমিনীন! মনে রাখবেন! আল্লাহ কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন যাতে মন্দ ও নির্লজ্জ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যায়। অতএব কী অবস্থা হবে যদি সেই সীমার রক্ষকই তা লঙ্ঘন করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবনের জন্য কিসাসের বিধান নাযিল করেছেন, অতএব কী অবস্থা হবে যদি বান্দাদের সেই ব্যক্তিই হত্যা করে যার জিন্মায় তাদের কিসাস গ্রহণ করা ছিল?

আমিরুল মুমিনীন! আপনি মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবন এবং সেই সময়ে আপনার সাথী ও সাহায্যকারীদের অভাবের কথা স্মরণ রাখুন এবং কিয়ামতের ভয়াবহ সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

আমিরুল মুমিনীন! জেনে রাখুন যে আপনি যে ঘরে আছেন, আপনার জন্য তা ছাড়াও একটি ঘর রয়েছে, যাতে আপনাকে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে। আপনার বন্ধুরা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একটি গর্তে আপনাকে একাকী ফেলে রেখে যাবে। অতএব আপনি সেই জিনিস প্রস্তুত রাখুন যা সেই দিন আপনার সাথী হবে যখন মানুষ তার ভাই, তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী এবং তার সন্তান থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

আমিরুল মুমিনীন! সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন কবরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ পাবে এবং অন্তরে যা আছে তা সামনে চলে আসবে। রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। আমলনামা কোনো ছোট-বড় বিষয় গণনা করা ছাড়া ছাড়বে না।

আমিরুল মুমিনীন! এখন মৃত্যুর আগে এবং আশা শেষ হওয়ার আগে আপনার হাতে সময় আছে। আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর বান্দাদের ওপর মূর্খদের মতো হুকুম চালাবেন না। তাদের জালিমদের পথে নিয়ে যাবেন না। দুর্বলদের ওপর অহংকারী লোকদের চাপিয়ে দেবেন না; কারণ এই লোকেরা কোনো মুমিনের ব্যাপারে না তো আত্মীয়তার তোয়াক্কা করে, না কোনো অঙ্গীকারের। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আপনি নিজের গুনাহের সাথে তাদের গুনাহের বোঝাও বহন করবেন। নিজের বোঝার সাথে তাদের বোঝাও আপনাকে বইতে হবে। আপনাকে সেই সব লোক ধোঁকায় না ফেলুক যারা এমন আনন্দ উপভোগ করছে যা আপনার বিপদের কারণ হবে। তারা দুনিয়ার এমন মজা লুটছে যার কারণে আপনি আখিরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। নিজের আজকের ক্ষমতা দেখবেন না বরং নিজের সেই সময়ের ইখতিয়ারকে দেখুন...

দেখুন, যখন আপনি মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পড়বেন, আপনাকে ফেরেশতা, নবী এবং রাসূলদের সমাবেশে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে, যখন সমস্ত চেহারা সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী (হাইয়ুল কাইয়ুম) সত্তার সামনে অবনত থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে তেমন নসিহত করতে পারিনি যেমনটি আমার পূর্বের বুদ্ধিমান ব্যক্তির করতেন, তবে আমি আপনার প্রতি মমতা ও শুভকামনায় কোনো কমতি রাখিনি। আমার পত্রটিকে সেই বন্ধুর সেবা-শুশ্রূষা মনে করবেন যে তিতা ওষুধ পান করায়; কারণ এতেই সুস্থতা ও কল্যাণের আশা থাকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। [১]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. হাসান বসরী রহ.-এর এই পত্রটিকে প্রাণের কবজ (হিরজে জান) বানিয়ে রেখেছিলেন এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমাম প্রকৃতপক্ষে কেমন হয়। উমর বিন আব্দুল আজিজের হাতে সংঘটিত বিপ্লবের পেছনে হাসান বসরী রহ.-এর যে ইলমি ও ফিকরি প্রচেষ্টা এবং হৃদয়ের ব্যথা কাজ করছিল, উল্লিখিত পত্রটি তার এক স্পষ্ট প্রমাণ।

ওফাত:

হাসান বসরী রহ. ষাট বছর পর্যন্ত সংশোধন ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করার পর ১১০ হিজরির রজব মাসে ওফাত লাভ করেন। আপনার বয়স ছিল ৮৮ বছর। ওফাতের আগে বেহঁশ অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এরপর কিছুটা সুস্থ বোধ করলে বললেন:

“তোমরা আমাকে জাগিয়ে দিলে, আমি তো বাগান ও নহরসমূহে এবং সম্মানের স্থানে ছিলাম।”

কিছুক্ষণ পর আপনি প্রকৃত স্রষ্টার কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। জুমার নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত হয় যাতে এত বেশি ভিড় ছিল যে শহরের অলিগলি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বসরার ইতিহাসে প্রথমবার এমনটি ঘটেছিল যে সেদিন জামে মসজিদে আসরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়নি; কারণ শহরের সমস্ত মানুষ দাফনে শরিক হওয়ার জন্য কবরস্থানে চলে গিয়েছিল। [২]

তঁার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা:

হাসান বসরী রহ.-এর খোদাপ্রদত্ত জনপ্রিয়তার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যায় যে, মুসলমান তো বটেই, অমুসলিমরাও তাঁর গুণাবলির স্বীকৃতি দিয়ে আসছিল। তাঁর ব্যাপকতা বর্ণনা করতে গিয়ে তৃতীয় হিজরি শতকের একজন অমুসলিম ঐতিহাসিক সাবিত বিন কুররা বলেন যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের একজন যারা অন্য জাতিদের জন্য ঈর্ষণীয়। সাবিত বিন কুররা লেখেন:

“তিনি ইলম ও তাকওয়া, যুহদ ও পরহেজগারি, পবিত্র স্বভাব ও কোমল হৃদয়, লিলাহিয়াত ও মার্জিত মেজাজ, ফিকহ ও মারিফাত এবং فحاحة (বাগ্মিতা) ও বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র)-এর দিক থেকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন... তাঁর বাহ্যিক রূপ তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থার হুবহু অনুরূপ ছিল। তিনি সাতটি দশক এমনভাবে কাটিয়েছেন যে কখনো তাঁর মুখ থেকে কোনো কুরুচিপূর্ণ শব্দ শোনা যায়নি। তাঁর ওপর কোনো অশালীনতার অভিযোগ পর্যন্ত ওঠেনি। তিনি সুস্থ স্বভাবের, সুদর্শন এবং সম্মানিত ছিলেন। তাঁর মজলিস...”

[১] আল-ইকদুল ফারিদ ৬/৯-১০০, আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়া ৩/১৮৫-১৮৬, ত: দার সাদির

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা ৪/৫৮৭

সেখানে সব ধরনের মানুষ ছিল এবং প্রত্যেকেই তাঁর থেকে উপকৃত হতো। কেউ হাদিস শুনছে, কেউ তাফসির শিখছে, কেউ ফিকহের দরসে বসে আছে, কেউ আরবি ভাষার (সূক্ষ্মতা) জানছে, কেউ তাঁর বাণীসমূহ লিখে নিচ্ছে, কেউ ফতোয়া নিচ্ছে, কেউ মামলা সমাধান এবং কাজীর দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কেউ ওয়াজ শুনছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন এক বিশাল উত্তাল সমুদ্র, অথবা এক প্রদীপ যা আলো ছড়াচ্ছে। শাসকদের সামনে দ্ব্যর্থহীন কথা, সর্বোত্তম শব্দ এবং খোলা মনে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং সত্যের বাণী সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বাগ্মিতায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মতো ছিলেন, অথচ দ্বীনের রঙ, ইলমের জৌলুস এবং তাকওয়ার কোমলতা ছিল এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি কারো নিন্দার পরোয়া করতেন না, কোনো চাকচিক্যময় বস্তু তাঁকে আল্লাহ থেকে গাফেল করতে পারত না। কাতাদার মতো মুফাসসির, আমর ইবনে উবাইদ এবং ওয়াসিল বিন আতার মতো তার্কিক, ইবনে আবি ইসহাকের মতো ব্যাকরণবিদ এবং ফারকাদের মতো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির। তাঁর আসনের নিচে বসতেন। কে আছে তাঁর মতো? আর কে আছে যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে? [১]

[১] মুজামুল উদাবা লিল হামাভি ২১১৩/৫

হযরত মুহাম্মদ বিন সিরিন রহ.

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. সেই যুগের বড় আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের ইলমি ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টায় দুনিয়া আজও উপকৃত হচ্ছে।

বংশ, শৈশব এবং ইলম অর্জনের সময়কাল:

আপনিও এক গোলাম পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু উম্মতের সরদার হিসেবে গণ্য হয়েছেন। আপনার মা সাফিয়া, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত দাসী ছিলেন। পিতা সিরিন হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইরাক থেকে মদিনায় নিয়ে আসা বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই গোলামরা প্রকৃতপক্ষে হাজারো স্বাধীন মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কারণ তারা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অংশে এসেছিলেন। এই ঘরেই মুহাম্মদ বিন সিরিন রহ.-এর জন্ম ৩৩ হিজরিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ সাহচর্য এবং অন্যান্য সাহাবীদের ফয়েজ তাকে ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক বানিয়ে দিয়েছিল। তিনি সেই সাহাবায়ে কেরামদের থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন যাদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আদি বিন হাতেম এবং ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

ইলমি যোগ্যতা:

তিনি মেধা ও মুখস্থ শক্তির দিক থেকে ইতিহাসের গুটিকয়েক আদর্শ ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্য হন। তিনি হাদীসের বড় হাফেজ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শব্দে শব্দে মুখস্থ রাখতেন। এক অক্ষরও এদিক-সেদিক হতো না।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা থেকে বসরায় স্থানান্তরিত হলে তিনিও তার সাথে চলে আসেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময় বসরায় অতিবাহিত হয়। তার ইলমি গভীরতা ও ফিকহী প্রজ্ঞা দিন দিন প্রকাশ পেতে থাকে। বলা হতো যে, বসরায় তার চেয়ে বড় ফকীহ আর কেউ নেই। [২]

তিনি গণিতে পারদর্শী ছিলেন। ফিকহী বিষয়ে বিশেষ করে মিরাসের মাসআলায় তার অসাধারণ দখল ছিল। মিরাসের কঠিন থেকে কঠিন মাসআলা তিনি নিমিষেই সমাধান করে ফেলতেন। [৩]

হাসান বসরী রহ.-এর মতো তিনিও সমাজে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মনে আসা কুপ্রবৃত্তির প্রভাব নিয়ে শঙ্কিত থাকতেন। আপনি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করতেন এবং একে দ্বীন থেকে বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য করতেন। আপনি বিপদ অনুভব করতেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর নফসের খুশিকে প্রাধান্য...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬০৬, ৬০৭, নম্বর ৯২২

[২] আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী: ১/৯০

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/১৯৬

...দিয়ে থাকেন, তারা যেকোনো সময় দ্বীন থেকে বের হয়ে যেতে পারে। আপনি বলতেন:

“নফসের গোলামরাই ইরতিদাদের দিকে সবার আগে ধাবিত হয়।” [১]

হাদিসের মূলনীতি সংকলন:

আপনি রাসুলের হাদিসের জন্য সনদের তাহকিকের (অনুসন্ধান) গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এবং এই বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক মূলনীতি পেশ করেছেন।

হাদিস বিশারদদের নিকট আপনার এই উক্তিটি একটি ভিত্তির মর্যাদা রাখে:

“إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.”

“নিশ্চয়ই এই ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং তোমরা দেখো যে, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।” [২]

আপনি এমন রাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ মনে করতেন না যারা কোনো বিদআত, আদর্শিক বিচ্যুতি বা নফসের পূজায় লিপ্ত ছিল। আপনি বলতেন: “আমরা এমন লোকদের থেকে বর্ণনা শুনতে চাই না। তারা যেন সম্মান লাভ না করে।”

আহলে তাশাইয়ুর বিপরীতে আপনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমানতদারি ও বিশ্বস্ততাকে সন্দেহাতীত মনে করতেন এবং বলতেন: “রাসুলের হাদিসের ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না।” [৩]

তাকওয়া ও পরহেজগারি:

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রা.)-এর তাকওয়া ও পরহেজগারি এমন পর্যায়ের ছিল যে বলা হতো: “তাঁকে যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা করে নাও। তিনি সবার চেয়ে বেশি মুত্তাকি এবং নফসের ওপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণকারী প্রমাণিত হবেন।” [৪]

আপনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিলেন। একদিন পর একদিন রোজা রাখা আপনার রুটিন ছিল। [৫] সব সময় আল্লাহর জিকির করতে থাকতেন। ব্যবসা ছিল আপনার পেশা। বাজারে প্রায়ই যাতায়াত হতো। বাজার দিয়ে যাওয়ার সময়ও মুখে আল্লাহর জিকির থাকত। [৬]

নাজায়েষ মুনাফা থেকে বাঁচতে মূল পুঁজি নষ্ট করে দেওয়া:

আপনি ব্যবসা করতেন। এতে শুধু অবৈধ মুনাফাখোরিই নয় বরং সন্দেহজনক লাভ থেকেও বেঁচে থাকতেন। গ্রাহকদের লোকসান থেকে বাঁচাতে নিজে বড় ধরনের লোকসান সহ্য করে নিতেন। [৭] একবার আপনার জলপাই তেলের একটি পাত্র থেকে মরা হুঁদুর বের হলো। কোন পাত্র থেকে বের হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। আপনি সেই সমস্ত তেল ফেলে দিলেন। অথচ সেই তেল আপনি চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়ে কিনেছিলেন। যখন সময়মতো তা পরিশোধ করা সম্ভব হলো না, তখন পাওনাদাররা মামলা করে দিল যার ফলে আপনাকে কিছুকাল জেলেও থাকতে হয়েছিল। কিন্তু মানুষকে হারাম খাইয়ে মুনাফা অর্জন করা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। [৮]

[১] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬১০

[২] মুকাদ্দিমা সহিহ মুসলিম, পৃ. ১১

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬১২

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/১৯১

[৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/২০০

[৬] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬১০

[৭] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/১৯৮-১৯৯

[৮] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬০৯-৬১৩

শাস্তি সহ্য করা। সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অসহনীয়:

জেলে আপনার পরহেজগারি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। জেলখানার দারোগা আপনার ভক্ত ছিল। সে আপনাকে বলত: “আপনাকে অনুমতি দেওয়া হলো, রাতে চুপিসারে বাড়ি চলে যান। সকালে ফিরে আসবেন।” আপনি জবাবে বলতেন: “আল্লাহর কসম! আমি সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় তোমার সঙ্গী হব না।” [১]

নিজের কঠোর আত্ম-সমালোচনা:

আপনি ওয়াজ ও বক্তৃতায় অভ্যস্ত ছিলেন না, বরং তার চেয়ে বেশি নিজের আমলের মাধ্যমে মানুষের সামনে একজন ভালো মুসলমানের নমুনা পেশ করতেন। নিজেকে সবসময় একজন সাধারণ মানুষ মনে করতেন। নিজের কঠোর আত্ম-সমালোচনা করতেন। নিজের ভুলত্রুটির ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখতেন। ভুলচুক হলে সাথে সাথে তার প্রতিকার করতেন। মুখ থেকে বের হওয়া একটি ভুল শব্দের জন্যও সবার সামনে নিজের হিসাব নিতেন। একবার কোনো এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: “ঐ কালো ব্যক্তিটি!” তারপর হঠাৎ চমকে উঠলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে বললেন: “ইন্না লিল্লাহ! আমি তো তার গিবত করে ফেললাম।” [২]

ব্যবসায় লোকসান হওয়ার কারণে জীবনের একটি সময় আপনি চরম অর্থকষ্টে কাটিয়েছেন। আপনি এর কারণ নিয়ে চিন্তা করলে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করতেন। অনেক বছর আগে আপনি এক ব্যক্তিকে তার দারিদ্র্যের কারণে লজ্জা দিয়েছিলেন। এই কথা যখনই মনে পড়ত, আপনি লজ্জিত হতেন। একবার বললেন: “ত্রিশ বছর আগে আমি একটি গুনাহ করেছিলাম, আজ আমার এই দারিদ্র্য তারই শাস্তি।” [৩]

আপনার এই কথা আবু সুলাইমান দারানি-র কাছে পৌঁছালে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন: “নিশ্চয়ই এই মহান ব্যক্তিদের গুনাহ অনেক কম ছিল, তাই কোনো বিপদ আসলে তারা বুঝতে পারতেন যে এটি কিসের শাস্তি। আজ আমাদের গুনাহ এত বেশি যে, আমরা বুঝতেই পারি না কোন বিপদ কোন গুনাহের শাস্তি।” [৪]

সদাচার ও সুন্দর পোশাক:

আপনার মেজাজে বিন্দুমাত্র রুক্ষতা ছিল না। অত্যন্ত হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। কথায় কথায় হাসতেন ও মুচকি হাসতেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হতেন না। যখন আল্লাহ ও রাসুল-এর কথা আসত বা কোনো দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন আপনার চেহারার রং বদলে যেত, আদব, সম্মান ও গান্ধীর্যের অবস্থা ছেয়ে যেত। তখন মনে হতো, এটি সেই ব্যক্তিই নন যাকে কিছুক্ষণ আগে হাসিখুশি দেখা যাচ্ছিল। [৫] আপনি মেহেদির খিজাব লাগাতেন, সাদা ইমামার সাথে সুন্দর ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতেন। পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও মর্যাদাপূর্ণ। নিজের মায়ের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর সাথে সবসময় খুব নিচু স্বরে কথা বলতেন। তাঁর জন্য সর্বোত্তম ও নরম কাপড় পছন্দ করে নিয়ে আসতেন। [৬]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৬১৬, ৬১৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৬১৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৬১৩

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/২৭৬

[৫] আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ: ২/৬৪

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৬১৯

মাহদী বিন মাইমুন (রহ.) বলেন: “আমি মুহাম্মদ ইবনে সিরিনকে দেখেছি যে তিনি মানুষকে কথা শোনাচ্ছেন, কবিতা আবৃত্তি করছেন এবং হাসছেন, কিন্তু যখনই হাদিস শরিফ শোনাতে শুরু করতেন, তখনই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতেন।” [১]

এভাবে নিজের আমলের মাধ্যমে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন এবং পরিমিত মেজাজের নমুনা পেশ করে এটি বুঝিয়ে দিতেন যে, হাসাহাসি ও কথাবার্তা বলা দ্বীনের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়, আর না এতে পরহেজগারি ও তাকওয়ার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে। তবে আল্লাহ ও রাসুলের আলোচনা এবং দ্বীনি বিষয়ে আদব, সম্মান ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা জরুরি।

শাসকদের থেকে নির্লিপ্ততা

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) স্বাবলম্বী থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। হাসান বসরী (রহ.) শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের ভুলত্রুটির সমালোচনাও করতেন। কিন্তু ইবনে সিরিন (রহ.) শাসকদের থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতেন। তিনি তাদের সমর্থনও করতেন না, আবার বিরোধিতাও করতেন না। প্রশংসাও করতেন না, নিন্দাও করতেন না। [২] শাসকদের উপহার গ্রহণ করা থেকেও কঠোরভাবে বিরত থাকতেন। এতে কোনো ভালো বা মন্দ শাসকের ব্যতিক্রম ছিল না। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর মতো ন্যায়পরায়ণ খলিফা উপহার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেটিও গ্রহণ করেননি। [৩]

স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইমাম

যে বিষয়টি তাঁকে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি দান করেছে, তা হলো স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞানে তাঁর দক্ষতা। এটি ছিল একটি খোদাপ্রদত্ত নেয়ামত, যা সম্ভবত অন্য কারো ভাগ্যে এত বিপুল পরিমাণে জোটেনি। এই বিদ্যায় তিনি প্রবাদতুল্য ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ “তাবিরুল রুয়া” প্রতিটি যুগে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে আছে। এটি ইসলামি সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি।

তিনি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর স্বপ্নগুলোর এমন যথাযথ ও সঠিক ব্যাখ্যা বের করতেন যে মানুষ অবাক হয়ে যেত। এক ব্যক্তি খারেজিদের সাথে উঠাবসা শুরু করেছিল। সে এসে তাঁর কাছে আরজ করল: “আমি স্বপ্নে দেখেছি যে কিছু লোক হজুর আকরাম (সা.)-এর জানাজা নিয়ে যাচ্ছে এবং আমি তাদের সাথে আছি।” তিনি বললেন: “তুমি এমন লোকদের সাথে মিশেছ যারা হজুর (সা.)-এর দ্বীনকে দাফন করেছে।” [৪]

এক ব্যক্তি এসে বলল: “আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমার হাতে পানির একটি পেয়ালা আছে। তারপর পেয়ালাটি ভেঙে যায় এবং পানি রয়ে যায়।” তিনি বললেন: “তোমার স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। সন্তান বেঁচে থাকবে এবং স্ত্রী মারা যাবে।” ঠিক তেমনই হলো যেমনটি তিনি বলেছিলেন। [৫]

স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিদ্যায় তাঁর ইলমি স্মারক “তাবিরুল আহলাম” প্রতিটি যুগে সুপরিচিত ও সমাদৃত হয়ে আছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এটি ইসলামি কুতুবখানাগুলোতে বিদ্যমান হিজরি প্রথম শতাব্দীর হাতেগোনা কয়েকটি রচনার মধ্যে একটি।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬১২

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬১৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬১৫

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬১৭

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৬১৭

দুঃখজনক মৃত্যু:

আপনি নিজের মৃত্যুর আন্দাজ একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকেও করে নিয়েছিলেন। আপনি দেখেছিলেন যে, জাওয়া নক্ষত্র সুরাইয়া নক্ষত্রকে অতিক্রম করে গেছে। জাগ্রত হয়ে আপনি নিজের অসিয়তনামা লেখাতে শুরু করলেন এবং বললেন: “হাসান বসরী আমার আগে মৃত্যুবরণ করবেন। তারপর তাঁর পেছনে আমিও চলে যাব। তাঁর মাকাম আমার চেয়ে উর্ধ্ব।” [১]

এমনটাই হলো। রজব মাসে হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন এবং এর তিন মাস দশ দিন পর ১১০ হিজরির শাওয়াল মাসে মুহাম্মদ বিন সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুবরণ করেন। [২] [৩]

শোক ও অসিয়ত:

এটি ছিল তাঁর শেষ অসিয়ত:

“আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো। নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুল ﷺ-এর আনুগত্য করো। হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন পছন্দ করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমাদের আনসার ভাইদের এবং মুক্ত করা দাসদের খেয়াল রাখা ছেড়ে না। পবিত্রতা ব্যভিচারের চেয়ে উত্তম এবং সত্যবাদিতা মিথ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” [৪]

আপনার মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখল যে আপনার সম্পর্কে বলা হচ্ছে: “তিনি এমন এক স্থানে আছেন যেখানে তিনি যা চান এবং যা আকাঙ্ক্ষা করেন তা-ই তাঁদের জন্য সহজলভ্য।”

এক ব্যক্তি স্বয়ং ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাঁর ও হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি বললেন: “তিনি আমার চেয়ে সত্তর গুণ উচ্চ মর্যাদায় আছেন।”

সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: “কেন? আমরা তো আপনাকে বেশি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করতাম।”

আপনি উত্তর দিলেন: “তাঁর ভয় এবং শোকের কারণে।” [৪]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/২৭৭

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬২১

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/২০৫

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৪/৬২২

ইসলামি বিশ্বে ধর্মীয় মতভেদ এবং উম্মাহর আলেমদের ভূমিকা

বনু উমাইয়াদের পতনের যুগ পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বে ধর্মীয় মতভেদ বেশ গভীর হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ মতভেদের ভিত্তি ছিল কিছু প্রশ্ন, যা সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা এবং তাঁদের যুগে সংঘটিত রাজনৈতিক বিরোধের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এটি তো সবাই জানেন যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতভেদ ছিল না। এই বাস্তবতাও নিজ স্থানে প্রমাণিত যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভূমিকাকে একটি ষড়যন্ত্রের অধীনে বিতর্কিত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছিল। এখান থেকেই মুসলমানদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক মতভেদগুলোর জন্ম হয়, যার ফলে জুমাল এবং সিফফিনের মতো ট্র্যাজেডিগুলো সংঘটিত হয়, যেগুলোর ব্যাপারে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অনেক প্রশ্ন জন্ম নেয়। যেমন—জঙ্গ জুমাল ও সিফফিন এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে কোন পক্ষ হকের ওপর ছিল? কোনো পক্ষের হক বা বাতিলের ওপর হওয়ার দলিল কী? যদি কোনো পক্ষ নিরপেক্ষ থেকে থাকে, তবে কেন? তার কাছে কী দলিল ছিল?

নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সংঘটিত মতভেদগুলো কখনোই আকিদাগত প্রকৃতির ছিল না; তবে বিভিন্ন মহলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পরবর্তীতে নিজ নিজ মহলের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য ধর্মীয় ভিত্তিও তালাশ করেছেন। এই তালাশে কিছু লোক মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং কেবল কুরআন মাজিদ ও সহিহ হাদিসকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন। এই লোকেরা রাজনৈতিক মতভেদের ব্যাপারে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল ছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক কুফা থেকে হোক বা দামেস্ক থেকে, ইয়েমেন থেকে হোক বা হিজাজ থেকে, তাঁদের মতভেদ একটি সীমার বাইরে বাড়েনি। এরাই ছিলেন উম্মাহর সওয়াদে আজম, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে বিশিষ্ট হয়েছেন।

তবে কিছু লোক নিজ নিজ দলকে ধর্মীয় ভিত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বরং জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা নিজ জামায়াতের সমর্থন এবং বিরোধী পক্ষের নিন্দায় কেবল দুর্বল কথারই আশ্রয় নেননি, বরং স্বরচিত বর্ণনাও আম (প্রচার) করেছেন। অতঃপর ভিন্নমতাবলম্বী দলগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কেবল তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এগুলোর কারণে রক্তপাতের ঘটনাও ঘটেছিল, যার ফলে অনেক মানুষের মধ্যে মধ্যপন্থার স্থলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং তাঁরা এক পক্ষের সমর্থন ও অন্য পক্ষের নিন্দায় সীমা লঙ্ঘনে লিপ্ত হন। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো পরবর্তীতে আলাদা আলাদা ধর্মীয় ফেরকায় পরিণত হতে থাকে। কেউ শিয়ানে আলী হলেন, কেউ শিয়ানে উসমান এবং শিয়ানে মুয়াবিয়া। কিছু পথভ্রষ্ট ফেরকা নিজেদের কোনো সাহাবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করত না, বরং নিজেদের মতামতের ওপর অটল ছিল, যেমন খারেজি। শিয়াদের মধ্যে চরমপন্থী লোকেরা আকিদাগত বিষয়েও কিতাব ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত ছিল, যেমন সাবায়ি সম্প্রদায়, যাদের সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন স্থানে বলেছি যে, তাদের ভিত্তি আব্দুল্লাহ বিন সাবা ইহুদি স্থাপন করেছিল। সাবায়িদের ছাড়াও কিছু ফেরকা ইহুদিরা এক

সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছিল যেমন জাহমিয়া। কিছু দল উপদলের ওপর খ্রিস্টধর্মের প্রভাবও দেখা যায় যেমন ‘কাদারিয়া ফেরকা’র প্রতিষ্ঠাতা সানউইয়া আগে খ্রিস্টান ছিল। ইরাক ছিল এ ধরনের মতভেদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র; কারণ জুমাল, সিফফিন, নাহরাওয়ান, কারবালা এবং দাইরুল জামাজিমের মতো বড় বড় যুদ্ধ ও বিপ্লব এখানেই সংঘটিত হয়েছিল; তাই এখানে সবসময় এক দল সত্যের ওপর এবং অন্য দল বাতিলের ওপর হওয়ার বিতর্ক চলতেই থাকত। খোদ ইরাকবাসীদের স্বভাবও ছিল নিত্যনতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করা এবং বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়া; তাই অধিকাংশ নতুন ফেরকা এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে। এমনকি উমাইয়া যুগেই এখানে কিছু নবুওয়াতের দাবিদার পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছিল। কুফার গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি এক নবুওয়াতের দাবিদারকে গ্রেফতার করে তার কাছে নবুওয়াতের প্রমাণ চাইলে সে দাবি করল যে তার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। এরপর সে এই ছন্দ শোনাল:

“ইন্না আতাইনাকাল জামাহির, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ালা তুজাহির, ওয়ালা তুতি কুল্লা কাফিরিন ওয়া ফাজির।”

(আমরা তোমাকে বড় বড় জিনিস দিয়েছি, সুতরাং তুমি তোমার রবের সালাত আদায় করো এবং প্রকাশ্য অবাধ্যতা করো না আর কোনো কাফির ও পাপাচারীর অনুসরণ করো না।)

গভর্নর তাকে শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন। যখন তাকে হত্যা করা হচ্ছিল তখন সে বলছিল:

“ইন্না আতাইনাকাল আমুদ, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা আলা উদ, ফাতানা যামিনুন আন লা তাউদ।”

(আমরা তোমাকে এই খুঁটি দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো কাঠের ওপর। আমি জিন্মাদার যে তুমি আর ফিরে আসবে না।)

এই গভর্নরের আমলেই মুগিরা নামক এক ব্যক্তি ধরা পড়ে যে মৃতদের জীবিত করার দাবিদার ছিল। গভর্নর তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেন। [১] মোদাকথা, এমন লোকের অভাব ছিল না যারা ইরাক ও খোরাসানের পরিবেশে ধর্মহীনতার আন্দোলনের বিস্তারের সুযোগ দেখে ময়দানে নামতে থাকত। তবে বেশি বিকশিত হওয়া ফেরকা ছিল হাতেগোনা কয়েকটি।

অধিকাংশ ফেরকার সূচনা হয়েছিল সাহাবীদের মধ্যকার মতবিরোধ (মুশাজারাতে সাহাবা) নিয়ে মন্তব্য করার মাধ্যমে। গৃহযুদ্ধের পর যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন প্রতিটি দলের লোক নিজ নিজ জায়গায় এই বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো স্মরণ করে অস্থির হতো এবং নিজ নিজ বুদ্ধি দিয়ে সেগুলোর বিশ্লেষণ করত। ইরাক ও শামে চলমান বিতর্কগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল—যদি আমরা মতবিরোধে সত্যের ওপর থাকতাম তবে অন্য পক্ষকে কী বলব? যদি আমরা হকের ওপর না থাকতাম এবং আমরা অন্যায় রক্তপাতে হাত রঞ্জিত করে থাকতাম তবে আমাদের অবস্থান কী? কুরআনের এই আয়াতের অর্থ কী হবে যাতে বলা হয়েছে: “ওয়া মাই ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআন্মিদান ফাজাযাউহু জাহান্নামু খালিদান ফিহা”

(আর যে কেউ কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।) [২]

মানুষ এই বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করল। এরপর প্রতিটি মত থেকে অনেকগুলো উপ-ফলাফল বের হলো এবং তারা সেগুলোর ওপরও অটল থাকতে লাগল। তাদের বিরোধীরা তাদের বিশ্লেষণকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মত নিয়ে এলো। এমন পরিস্থিতিতে কোনো তৃতীয় দল দাঁড়িয়ে গেল এবং উভয় পক্ষকে চরমপন্থী আখ্যা দিয়ে একটি নতুন এবং তাদের দৃষ্টিতে ‘মধ্যপন্থী’ মত পেশ করল। যে মতের ওপর কিছু লোক একত্রিত হয়ে গেল তা একটি স্বতন্ত্র ফেরকায় পরিণত হলো। এভাবে নিম্নোক্ত ফেরকাগুলো আত্মপ্রকাশ করল:

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/২২০, ১২৬ হিজরীর অধীনে।

[২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

(১) শিয়া

যেহেতু শিয়ানে আলী নিজেদেরকে হকের ওপর মনে করত, তাই তাদের চরমপন্থী লোকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, জঙ্গ জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধীরা অন্যায় হত্যার অপরাধী হয়েছে। তাই তারা কেবল কবির গুনাহের অপরাধীই ছিল না, বরং উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী জাহান্নামীও ছিল; তাদের থেকে বর্ণিত কোনো হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। শিয়া মতবাদে চরমপন্থার এটিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। যেহেতু সাবায়ী গোষ্ঠী শিয়ানে আলীর সাথে মিশে হযরত আলী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওসী (উত্তরাধিকারী) হিসেবে প্রচার করছিল, তাই চরমপন্থী শিয়ারাও এই কথাকে নিজেদের আকিদা বানিয়ে নেয়। এই আকিদার কারণে কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়, যেমন—ইমামের নির্ধারণ শরীয়ত অনুযায়ী কীভাবে হয়? ইমামের অনুসরণ না করার হুকুম কী? এসবের উত্তরের মাধ্যমে তাদের গোমরাহি (পথভ্রষ্টতা) আরও তীব্রতর হতে থাকে। এমনকি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ শিয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ নতুন কিছু মতবাদের ধারক হয়ে ওঠে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- “ইমামত” একটি বিশেষ পদ যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আলী (রা.)-এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছিল। তিনি ইমাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওসী ছিলেন। তিনি উম্মতের মধ্যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর বিরোধীদের হাশর কাফেরদের সাথে হবে।
- হযরত আলী (রা.)-এর সন্তানাদি ব্যতীত অন্য কারো ইমামতের কোনো অধিকার নেই।
- ইমাম মাসুম (নিষ্পাপ) এবং মুফতারিযুত তাআহ (যাঁর আনুগত্য ফরজ) হন, তাঁর আনুগত্য ঠিক সেভাবেই ফরজ যেভাবে নবীর আনুগত্য ফরজ।

শিয়া মুতাকাদিমীন এবং শিয়া তাফযিলিয়াকে বাদ দিলে শিয়াদের বাকি সব গোষ্ঠী এই আকিদাগুলোর ওপর একমত ছিল।

এর পর কিছু বিষয়ে তাদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিছু শিয়া বলত যে, যেহেতু হযরত আলী (রা.) পূর্ববর্তী খলিফাদের শাসন মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের হাতে বায়াত করে তাঁদের পেছনে নামাজ পড়তেন, তাই আমরা আমাদের ইমামের কাজের ওপর আপত্তি করতে পারি না। কিছু গোষ্ঠী বলত যে, হযরত আলী (রা.)-এর আগে আসা তিন খলিফা—আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)—গাসিব (জবরদখলকারী) ও জালেম ছিলেন। তাঁদেরকে খলিফা হিসেবে মান্যকারীরাও পথভ্রষ্ট ছিল; কারণ তারা রাসূলের ওসিয়ত অস্বীকার করে হকদারকে ইমামত ও খেলাফত প্রদান করেনি। কিছু গোষ্ঠী এর চেয়েও বাড়াবাড়ি করে পূর্ববর্তী খলিফাদের এবং তাঁদেরকে খলিফা হিসেবে মান্যকারীদের কাফের সাব্যস্ত করত।

তবে যায়দিয়া সম্প্রদায় বলত যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির (আফযাল) উপস্থিতিতে কম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির (মাফযুল) শাসন বৈধ। সুতরাং হযরত আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী খলিফাদের শাসন বৈধ ছিল এবং তাঁদের কাফের বলা জায়েজ নয়। সেই সাথে তাদের অবস্থান ছিল এই যে, ইমাম ফাতেমা (রা.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে হতে হবে, তবে শর্ত হলো তিনি জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে ইমামতের দাবি নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন এবং বিদ্রোহ করবেন।

[১]

[১] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: ১১০/১, তাহকিক: ১২১, তাবা: মুয়াসসাসাতুল হালাবি।

এখানে আমরা এই যুগের শিয়াদের প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মতপার্থক্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। পরবর্তীতে যখন এই চরমপন্থা তীব্র আকার ধারণ করল এবং হযরত আলী (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে ইমামতের ধারা নিয়ে শিয়াদের মধ্যে উপদল সৃষ্টি হলো, তখন তাদের গতিপথ ভিন্ন হয়ে গেল। কেউ হযরত হাসান (রা.)-কে, কেউ হযরত হুসাইন (রা.)-কে এবং কেউ হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (রহ.)-কে ইমাম হিসেবে হকদার মনে করত। এরপর প্রতিটি ইমামের ইস্তিকালের পর তাঁর সন্তানদের মধ্যে কে ইমাম হবেন—এই প্রশ্নে নতুন নতুন উপদল তৈরি হতে থাকল এবং শিয়াদের অনেকগুলো ফেরকা বা দল সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্য থেকে যারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তাদের আকিদা ও বিশ্বাস যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

(২) নওয়াসিব

শিয়ানে মুয়াবিয়া, শিয়ানে আলীর পক্ষ থেকে লাগানো অন্যায় রক্তপাতের অভিযোগ গ্রহণ করত না বরং তাদের চরমপন্থী লোকেরা উল্টো হযরত আলী رضی اللہ عنہ-কে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধী ও গুনাহগার বলত। তারপর তারা শিয়ানে আলীর প্রত্যেক নেতার নিন্দা শুরু করে দিল এবং শিয়াদের চোখে খটকা লাগে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশংসা করাকে অভ্যাসে পরিণত করল। এই লোকেরা নাসেবি নামে পরিচিত হলো। এই জেদ থেকেই তারা একদিকে হযরত আলী رضی اللہ عنہ এবং সাদাতদের বিরোধিতা শুরু করল এবং অন্যদিকে হযরত মুয়াবিয়া رضی اللہ عنہ-এর সমর্থনে জাল বর্ণনা তৈরি করে তাকে হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রচার করল। মারওয়ান ও ইয়াজিদদের জাল ফজিলত ও গুণাবলিও প্রচার করা হলো এবং তাদেরকে হযরত হাসান ও হুসাইন رضی اللہ عنہما-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের رضی اللہ عنہ-এর বিপরীতে হকপন্থী বলা হলো। নাসেবিদের গোঁড়ামির অবস্থা এমন ছিল যে, তারা বনু উমাইয়ার জালেম আমিরদের প্রকাশ্য মন্দ কাজগুলো মানতেও অস্বীকার করত। উদাহরণস্বরূপ, ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমকে জানানো হলো যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কবর থেকে চিৎকার করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিম বিচলিত হয়ে হাজ্জাজের কবরে গেল। সেখানে এই শব্দ নিজে শুনে অত্যন্ত ভক্তির সাথে বলতে লাগল: “আবু মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আপনি আপনার জীবনেও তাহাজ্জুদ নামাজ ছাড়েননি এবং মৃত্যুর পরেও না।” [১]

নাসেবিদের সবচেয়ে চরমপন্থী দল ছিল “ইয়াজিদি”। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল আদি বিন মুসাফির নামক এক উমাইয়া ব্যক্তি, যে ৬৩২ হিজরিতে আব্বাসীয়দের হাতে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর উত্তর ইরাকের পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করেছিল। সে বনু হাশিমের শত্রুতা এবং উমাইয়াদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রিত করার জন্য ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়াকে এক পবিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রচার করতে শুরু করল এবং বলল যে, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সেই সুফিয়ানি যার ভবিষ্যদ্বাণী হাদিসে রয়েছে এবং সে খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূত হয়ে একে ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। শিয়াদের জেদবশত অনেক লোক এই অবস্থান গ্রহণ করে নিল। [২]

সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি—হাদিস অস্বীকার বা জাল হাদিস তৈরি:

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে নাসেবি হোক বা শিয়া, তাদের সমস্ত মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জমহুর মুসলিমিনের মতো কুরআন ও হাদিসকে মূল শরয়ি উৎস হিসেবে মর্যাদা দিত এবং এই কারণেই যখন সুন্নাহ বিশেষজ্ঞ আলেমদের সাথে তাদের বিতর্ক হতো, তখন তাদের সাধারণত নিরুত্তর হতে হতো; কারণ তারা যেসব শরয়ি উৎস মানত, সেগুলো বিতর্কিত বিষয়গুলোতে তাদের সমর্থন করত না। এর ফলাফল এই হলো যে, ধীরে ধীরে শিয়া ও নাসেবিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তাদের স্বঘোষিত মতাদর্শের ভুল স্পষ্ট হতে লাগল এবং তাদের একটি বিশাল অংশ যাদের মধ্যে জেদ বা একগুঁয়েমি ছিল না, তারা জমহুর মুসলিমিনের সাথে মিশে গেল। কিন্তু উভয় পক্ষেই এমন লোকও ছিল যারা কোনোভাবেই তাদের আলাদা পরিচয় ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না এবং তাদের স্বঘোষিত মতাদর্শ ত্যাগ করা তাদের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, চাই তা কুরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধেই কেন না হোক।

[১] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ৫/৭

[২] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/৩৭১, ৩৭২

এসব লোক জেনে-বুঝে এমন এক দিকে অগ্রসর হতে থাকে যেখানে গিয়ে জমহুর মুসলিমদের সাথে মিলনের কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে। কুরআন মাজীদকে সরাসরি অস্বীকার করা তো অত্যন্ত কঠিন ছিল; তাই চরমপন্থী শিয়া (রাফেজি) এবং চরমপন্থী নাসিবি (ইয়াজিদি) উভয়ই জমহুর মুসলিমদের থেকে বিচ্যুতি অবলম্বনের জন্য সুন্নতে রাসূলকে অস্বীকার করে দেয়। তবে এই বিচ্যুতির ক্ষেত্রে রাফেজি এবং ইয়াজিদিদের কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। রাফেজিরা এই কাজটি অত্যন্ত চাতুর্য ও ধূর্ততার সাথে করেছে এবং সুন্নাহর প্রচলিত উৎস, হাদীস বর্ণনা ও সনদের বিপরীতে নিজেদের উৎস, নিজেদের বর্ণনা ও নিজেদের সনদ তৈরি করে নিয়েছে এবং কুরআন মাজীদকেও বিকৃত বলে ঘোষণা করেছে। (এই কাজটি হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা বনু আব্বাসের পতন যুগের ঘটনাবলীতে বর্ণনা করব।)

ইয়াজিদিরা এই কাজটি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সহজ বরং বোকামিপূর্ণ পন্থায় করেছে এবং কোনো বিকল্প পেশ না করেই হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে দিয়েছে। তারা সুন্নতে নববী থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণের প্রবক্তা রইল না বরং কেবল কুরআন মাজীদের ওপর নির্ভর করল। এরপর তাদের মূর্খ নেতারা কুরআনের তাফসীরও নিজেদের ইচ্ছামতো এমন ভুলভাবে করল যে, তারা দ্বীনের স্বীকৃত বিষয়গুলো অস্বীকারকারী হয়ে গেল এবং কুরআনেও বিকৃতি করতে থাকল। পরিশেষে তারা কুরআন থেকেও বঞ্চিত হয়ে পুরোপুরি বেদ্বীন হয়ে গেল।

এই বিচ্যুতির সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, ইয়াজিদিয়া ফেরকার নিকট ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসা ছিল ঈমানের মানদণ্ড এবং তাকে লানত করা ছিল কুফর। তাদের নিকট কারবালার ট্র্যাজেডি থেকে ইয়াজিদ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল। তর্কের খাতিরে যদি সে জড়িতও থাকত, তবুও তাকে লানত করার কোনো সুযোগ ছিল না। এই সীমা পর্যন্ত তো জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতও প্রবক্তা ছিলেন যে, সতর্কতা হিসেবে ইয়াজিদের ওপর লানত না করা হয়। কিন্তু উন্মত থেকে ইয়াজিদিদের বিচ্যুতি ছিল এই বিষয়ে যে, তারা ইয়াজিদের প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের আলামত এবং তাকে লানত দেওয়াকে কুফর বলে ঘোষণা করত। নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই কথাটি উদ্ভাবন করল যে, লানত করা এমন এক জঘন্য কাজ যা কাফেরদের ওপরও জায়েজ নয়। পরবর্তীতে যখন তাদের সামনে এই মাসআলা আসল যে, কুরআন মাজীদে শয়তানের ওপর লানত করা হয়েছে, তখন ইয়াজিদিদের কিছু চরমপন্থী এই অবস্থান গ্রহণ করল যে, কুরআন মাজীদে যেখানে যেখানে ইবলিস বা কাফেরদের ওপর লানত করা হয়েছে তা পরবর্তী লোকদের সংযোজন, আল্লাহ এমন জঘন্য কালাম থেকে পবিত্র। ফলে এই পর্যায়ে এসে ইয়াজিদিরা ইবলিসের ওপরও লানত করাকে নাজায়েজ ঘোষণা করল এবং এখানেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজেদের ধর্মকে পাকাপোক্ত করার জন্য কুরআন পাকের কপিগুলো থেকে লানত শব্দগুলো মুছে দিল। স্বাভাবিকভাবেই এখানে এসে এই ফেরকা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, পরবর্তী ধাপে তাদের কিছু লোক ইবলিসকে এক পবিত্র সত্তা হিসেবে মেনে নিল, তাদের বক্তব্য ছিল যে ইবলিস ছিল খাঁটি মুওয়াহহিদ যে আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করে তাওহীদের আকিদার ওপর দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। আল্লাহ তাকে তাড়িয়ে দেননি, বরং ইয়াজিদি জামাতের দিকনির্দেশনার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। শতাব্দীকাল ধরে এই ফেরকা নীরবে লালিত হতে থাকে এবং এর নেতারা আত্মগোপনে থাকে। বনু আব্বাসের চরম পতনের যুগে তাদের কিছু নেতা প্রসিদ্ধও হয় যাদের মধ্যে শামসুদ্দিন আবু মুহাম্মদ (মৃত্যু ৫৯১ হিজরি), শেখ ফখরুদ্দিন (মৃত্যু ৬৫৫ হিজরি), জয়নুদ্দিন ইউসুফ (৭২৫ হিজরি) এবং শেখ ইজ্জুদ্দিন (মৃত্যু ৭৩১ হিজরি) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [১]

[১] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/৩৭২ থেকে ৩৭৬।

ইয়েজিদি ফিরকার লোকেরা এখনও ইরাক ও সিরিয়ায় পাওয়া যায়। এই লোকেরা ইয়েজিদ এবং ইবলিসের ফজিলত বর্ণনা করে এবং বলে যে ইবলিস ছিল ‘তাউসুল মালাইকা’। [১] যাই হোক, ইয়েজিদি ফিরকা সাধারণ মুসলিমদের থেকে অনেক দূরে একটি অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির মধ্যে সংকুচিত হয়ে গেছে এবং তাদের শয়তানি চিন্তাধারা উন্মত্তের মধ্যে কখনোই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অন্যদিকে সেই নাসিবির যারা কুরআন ও সুন্নাহর প্রবক্তা ছিল, তাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হাদিস দেখার পর হয় তাদের ভুল মতবাদ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে অথবা হাদিস অস্বীকারকারী হয়ে দীনহীনতার পথে পা বাড়তে হয়েছে। যেহেতু সেই যুগে হাদিস অস্বীকারকে সুন্দর আবরণে উপস্থাপন করার মতো কোনো প্রাচ্যবিদ উপস্থিত ছিল না; তাই হাদিস অস্বীকারের গর্তে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস খুব কম লোকই করেছিল। এভাবে ধীরে ধীরে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ নাসিবির প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। [২]

(৩) খারিজি

শিয়া ও নাসিবিদের বিশ্বাসগত দ্বন্দের মাঝে খারিজির নিজাদের পক্ষ থেকে এই ফয়সালা জারি করে যে, জামাল ও সিফফিন ইত্যাদিতে উভয় পক্ষই অপরাধী ছিল। উভয় পক্ষই অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে যা কবির গুনাহ। যেহেতু কুরআন মাজিদ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলেছে; তাই উভয় পক্ষই জাহান্নামী। তাদের মধ্যে যে কাউকে সমর্থনকারীরাও পথভ্রষ্ট।

এরপর তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলল যে, যেহেতু চিরকাল জাহান্নামে থাকা কাফেরদের শাস্তি; তাই এই লোকেরা কাফেরও বটে।

পরবর্তী পর্যায়ে তারা এও বলে দিল যে, শুধু ইচ্ছাকৃত হত্যা নয় বরং প্রতিটি কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের এবং নিশ্চিত জাহান্নামী।

খারিজিদের মতবাদ কুরআনের আয়াতের আক্ষরিক অর্থ থেকে নেওয়া হয়েছিল। সুন্নাহ ও ফিকহের সাথে তাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিল না।

উগ্র মেজাজ ও স্বভাবের কারণে খারিজির প্রতিটি সরকারের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং শাসকরাও তাদের দমনে কোনো ক্রটি রাখেনি। এভাবে ধীরে ধীরে খারিজিদের পরিধি অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। খারিজিদের আকিদার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

- হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) সত্যের ওপর ছিলেন।

[১] ইউটিউবে ইয়েজিদি ফিরকার কিছু জাহেল নেতাদের বক্তব্য দেখা যেতে পারে যেখানে ইবলিসের প্রশংসা করা হচ্ছে। সিরিয়ার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধে অনেক ইয়েজিদি গৃহহীন হয়েছে। জাতিসংঘ তাদের সুরক্ষায় অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয়। এটি ইউটিউবেও ইয়েজিদ সম্পর্কে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে কুর্দিস্তান ও আর্মেনিয়াতেও ‘ইয়েজিদি’ ধর্মের অনুসারী রয়েছে কিন্তু তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। এই লোকেরা পারস্যের মানবি ধর্মের একটি নতুন রূপ, তাদের সম্পর্ক ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার সাথে নয় বরং ‘ইয়াজদান’ অর্থাৎ পারসিকদের মতে ‘কল্যাণের ঐশ্বর’র সাথে। (উর্দু দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়া, নিবন্ধ: ইয়েজিদি)

[২] প্রায় একশ বছর আগে প্রাচ্যবিদ এবং সিরিয়ার খ্রিস্টান লেখক ও সেকুলার অধ্যাপকরা নাসিবি ফিরকাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা শুরু করেন এবং ইয়েজিদের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির মাধ্যমে এই ফিরকাবাজির বীজ বপনের চেষ্টা করেন। এই অপকর্মে ফরাসি মিশনারি হেনরি ল্যামেস (মৃত্যু ১৯৩৭ খ্রি.) অগ্রগণ্য ছিলেন যিনি মিশনারিদের সাময়িকী ‘আল-মুশির’-এর সম্পাদকও ছিলেন। মুসলমানদের বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য তিনি ইয়েজিদের সমর্থনে ‘খিলাফতে ইয়েজিদ’ লেখেন যা আপাতদৃষ্টিতে গবেষণামূলক মনে হলেও বাস্তবে মৃত নাসিবি আকিদাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি ষড়যন্ত্র ছিল। ১৯৬৯ সালে বাগদাদের শারায় রশিদে ‘দাওয়াতুল মারসিয়া আল-ইয়াজিদীয়া’ নামক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যবিদ ফিলিপ হিট্টি (মৃত্যু ১৯৭৮ খ্রি.) ‘হিস্টি অব দ্য আরব’-এ ইয়েজিদকে একজন বীর হিসেবে উপস্থাপন করেন। এই বইগুলো উপমহাদেশেও ইয়েজিদ সমর্থনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে এবং মাহমুদ আব্বাসি একটি নতুন চিন্তাধারা তৈরি করেন যা ‘ইয়েজিদিদের’ মতো ইয়েজিদের ভালোবাসাকে ঈমানের আলামত মনে করে এবং ইয়েজিদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা শোনা ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বোধ করে।

তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা

- হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের শুরুতেও হকের ওপর ছিলেন, শেষে তিনি শরীয়ত ও ইনসাফের পথ ছেড়ে দেন। তিনি পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর হত্যাকারী সঠিক ছিল।
- হযরত আলী (রা.) প্রথমে ঠিক ছিলেন, যখন তিনি গায়রুন্নাহর ফয়সালা মেনে নিতে সম্মতি প্রকাশ করেন তখন তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে যান।
- সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, সালিশির উভয় হাকাম (আবু মুসা আশআরী এবং আমর ইবনুল আস (রা.)), হাকাম নিয়োগকারীগণ (হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)) এবং তাদের ফয়সালায় সম্মত (অর্থাৎ উভয় পক্ষের সকল) লোক গুনাহগার ছিল।
- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের (রা.) সহ জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারী সকল লোক গুনাহগার ছিল।
- কবির গুনাহ কুফরেরই একটি রূপ বরং এর সমার্থক। সুতরাং যদি কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা না করে তবে সে কাফের হয়ে যায়। (এজন্যই খারেজীরা অধিকাংশ সাহাবীকে কেবল পথভ্রষ্টই বলত না বরং কাফেরও বলত, তদুপরি তাদের ওপর লানত পাঠাতে এবং তাদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করতেও দ্বিধাবোধ করত না।)
- সাধারণ মুসলমানরা কাফের; কারণ তারা গুনাহ থেকে পবিত্র নয় এবং তারা হযরত উসমান ও আলী (রা.)-কে নিজেদের নেতা মনে করে।
- সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। বান্দার তৈরি করা কোনো আইন বা বিধান গ্রহণযোগ্য নয়।
- খলিফা কুরাইশ বংশীয় হওয়া শর্ত নয়। যেকোনো বর্ণ ও বংশের লোক খলিফা হতে পারে যদি সে নেক ও সালেহ হয়।
- খলিফার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব যতক্ষণ তিনি দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণ করেন। যদি তিনি নেকি ও তাকওয়া থেকে সামান্যও বিচ্যুত হন তবে তাকে পদচ্যুত করা অথবা তার বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলে যুদ্ধ করা ফরজ।
- ইসলামী ফিকহের উৎস কেবল কুরআন মাজীদ। হাদীস এবং ইজমা দলিল নয়।

খারেজীদের প্রধান দলসমূহ:

খারেজীদের দলগুলোর মধ্যে কিছু আদর্শিক মতপার্থক্যও ছিল। তাদের প্রধান দলগুলো নিম্নরূপ ছিল:

নাজদিয়া:

জাজিরাতুল আরবের সাথে সম্পৃক্ত তাদের একটি বড় দল যারা “নাজদিয়া” নামে পরিচিত ছিল, তারা এই অবস্থান পোষণ করত যে খিলাফত ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয়। মুসলমানদের উচিত তারা নিজ নিজ অবস্থানে শরীয়ত অনুযায়ী চলবে এবং অন্যদের হক আদায় করবে। হ্যাঁ, যদি তারা নিজেরা কোনো প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিজেদের শাসক নির্বাচন করতে চায় তবে তার অনুমতি রয়েছে।

আযারেকা:

ইরাকে সক্রিয় দল যারা “আযারেকা” নামে পরিচিত ছিল, তারা মনে করত যে তারা ব্যতীত সকল কালিমা পাঠকারী মুশরিক। তাদের পেছনে নামাজ জায়েজ নয় এবং তাদের বিয়ে-শাদীতে বা শোকে অংশগ্রহণ করাও জায়েজ নয়। তাদের নারী-পুরুষ ও শিশু সবাই হত্যাযোগ্য। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা জায়েজ। এই খারেজীরা তাদের সেইসব সাথীদেরও কাফের বলত যারা তাদের সাথে যুদ্ধে বের হতো না। তাদের নিকট বিরোধীদের সাথে অসততা, খিয়ানত এবং প্রতারণা করা জায়েজ ছিল। মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা বেশি ছিল।

ইবাদিয়া:

খাওয়ারিজদের মধ্যপন্থী দল ছিল “ইবাদিয়া”। তারা অন্যান্য মুসলমানদের সতর্কতামূলকভাবে মুশরিক নয় বরং “গাইরে মুমিন” (অ-মুমিন) গণ্য করত, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করত, তাদের সাথে বিবাহ ও উত্তরাধিকার বৈধ মনে করত, তাদের এলাকাকে দারুল হারব নয় বরং দারুল তাওহীদ হিসেবে মর্যাদা দিত। তবে তাদের সরকারগুলোর রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রগুলোকে তারা এই নিরাপত্তা থেকে ব্যতিক্রম মনে করত। মুসলমানদের সাথে প্রতারণা এবং তাদের ওপর লুকিয়ে আক্রমণ করা তাদের নিকট সঠিক ছিল না, তবে প্রকাশ্য লড়াই বৈধ ছিল। [১]

(২) মুরজিয়া

সাহাবায়ে কেরামের যুগের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী এই বিবাদগুলোকে একটি ফিতনা মনে করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। অনেক লোক এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সত্যের ওপর কে আছে? তাই তারা বিরত ছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও লড়াই থেকে বিরক্ত ছিলেন কিন্তু বিবাদমান পক্ষগুলোর কাউকে মন্দ বলতেন না বরং সকল বড়দের সম্মান করতেন। এটি কিছু সতর্ক সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাযহাব ছিল যা নিজ স্থানে সঠিক ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক নিরপেক্ষতাকে একটি স্থায়ী মতবাদে পরিণত করে এতে কঠোরতা অবলম্বন করে। এরপর এই অবস্থানের শাখা-প্রশাখা বের করে প্রতিটি শাখার পক্ষে দলিল খুঁজতে থাকে। এই লোকেরা মুরজিয়া নামে পরিচিত হয়।

মুরজিয়া ফেরকার সূচনা একজন হাশেমী বুজুর্গ হযরত হাসান বিন মুহাম্মদ রহ. থেকে হয়েছিল যিনি হযরত আলী রা.-এর নাতি এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পুত্র ছিলেন। তাঁকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং আলেম ও ফাজিল ব্যক্তিত্ব হিসেবে মানা হয়। যেহেতু একদিকে খাওয়ারিজরা হযরত আবু বকর ও উমর রা.-এর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করত এবং হযরত উসমান ও আলী রা. থেকে বিমুখ ছিল। অন্যদিকে সাবায়ীরা হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রা. থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে হযরত আলী রা.-এর মর্যাদাকে সীমার বাইরে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন অবস্থায় হযরত হাসান বিন মুহাম্মদ রহ. মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ দূর করার জন্য কৌশল হিসেবে একটি নতুন অবস্থান গ্রহণ করেন। [২]

এই অবস্থানের প্রকাশ প্রথমবার এভাবে হয়েছিল যে, তাঁর মজলিসে কিছু সহচর হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রা. সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন এবং সীমার বাইরে চলে যান। হাসান বিন মুহাম্মদ রহ. কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এরপর বললেন:

“আমি তোমাদের কথা শুনলাম। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো এটাই মনে হয় যে, হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত তালহা এবং হযরত জুবায়ের রা.-এর বিষয়টি স্থগিত রাখা হোক। না তাদের সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ করা হোক, না তাদের বিরোধিতা করা হোক।”

হাসান বিন মুহাম্মদ রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত কিছু লোক এই উক্তির জোরেশোরে প্রচার শুরু করে দেয়। [৩]

[১] খাওয়ারিজদের দলগুলোর ইতিহাসের জন্য দেখুন:

আল-ফারুকু বাইনাল ফিরাক, ইমাম আব্দুল কাহের আল-ইসফারাইনি: ১/৫৫ থেকে ৮৩; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: ১/১১৪ থেকে ১৩৭, তাবা মুআসাসাতুল হালাবি।

[২] তারিখুল ইসলাম, যাহাবি: ৬/৩৩১, ৩৩২, তাহকিক তাদমুরি।

[৩] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৮০, ৩৮১।

হাসান বিন মুহাম্মদ রহ. এই বিষয়ে একটি রিসালাও লিখেছিলেন এবং তা নিজের মজলিসগুলোতে শোনাতে শুরু করেন। এতে বলা হয়েছিল:

“আমরা আমাদের সমর্থন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে সম্পৃক্ত করি এবং আমাদের ইমামদের প্রতি সন্তুষ্ট: আবু বকর ও উমর, যেন তাঁদের আনুগত্য করা হয়। আমরা এই বিষয়ে অসন্তুষ্ট যে তাঁদের অবাধ্যতা করা হোক। আমরা ফেরকাবন্দি দূর করছি; কারণ আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো লড়াই ছিল না। তাঁদের ব্যাপারে দাবির ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ ছিল না। তাঁদের বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইরজা (আলোচনা থেকে নির্লিপ্ত থাকা) সেই বিষয়ে যা মানুষের কাছে গোপন এবং যারা এর সংঘটনের সময় উপস্থিত ছিল না। সুতরাং যে আমাদের ইরজাকে ভুল বলবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে এই ইরজা কবে থেকে প্রমাণিত, তবে আমরা বলব যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে। যখন ফেরাউন তাঁকে বলেছিল: **فَأَبَالُ الْقُرُونِ** (পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?) তখন মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: **قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ** (তাদের অবস্থা আমার রবের কাছে কিতাবে সংরক্ষিত আছে)।” [১]

যেহেতু এটি হৃদয়স্পর্শী কথা ছিল; তাই অনেক মানুষ এটি পছন্দ করেছিল, কিন্তু যেহেতু এটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল; তাই এটি একটি নতুন ফেরকার ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। হাসান বিন মুহাম্মদ রহ.-এর এই অবস্থানের ওপর তাঁর পিতা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রহ. অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন। একবার রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেন এবং বলেন: “তুমি কি তোমার দাদা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথেও সম্পৃক্ততা প্রকাশ করবে না?” [২]

শেষ বয়সে যখন হাসান বিন মুহাম্মদ রহ. নিজে দেখলেন যে তাঁর অবস্থানের কারণে উম্মত ঐক্যবদ্ধ হয়নি বরং বিভিন্ন মতাদর্শী দলগুলোর মধ্যে একটি নতুন দলের সংযোজন হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। এই উক্তির প্রচার এবং রিসালা লেখার ওপর আফসোস করে তিনি বলতেন: “হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম।” [৩]

যেভাবে তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ) উন্নতি করতে করতে বিভিন্ন ফেরকায় রূপান্তরিত হয়ে গোমরাহিতে পরিণত হয়েছে, একইভাবে ‘ইরজা’ও পরবর্তী প্রজন্মে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র ফেরকায় পরিণত হয়। [৪] মুরজিয়াদের অনুসারীরা শুধু এতটুকু বলত যে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিবাদ (মুশাজারাতে সাহাবা) সম্পর্কে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি।

[১] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ৬/৩৩৩, ত. তাদমুরি

[২] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৮১

[৩] তারিখে দামেশক: ১৩/৩৮০, ৩৮১

[৪] নোট: হাসান বিন মুহাম্মদের মৃত্যু ১০১ হিজরিতে হয়েছে (তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত পৃ. ৩২৫)। যেভাবে শিয়া আকিদায় বিচ্যুতি সামান্য ছিল এবং তাঁদের গোমরাহ মনে করা যেত না; একইভাবে হাসান বিন মুহাম্মদের একক মতটিও সামান্য ছিল, যার নজির প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল; তাই তাঁকে সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

[৫] وهو اول من وضع الارجاء: الثقات للعجلي: ১ / ৩০০, هو اول) কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর আকিদা পরবর্তী মুরজিয়াদের মতো ছিল না। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: “সেই ইরজা যার ব্যাপারে হাসান বিন মুহাম্মদ কথা বলেছিলেন, তা সেটি নয় যার ওপর আহলে সুন্নাত দোষারোপ করে যা ইমানের সাথে সম্পর্কিত।” এরপর হাসান বিন মুহাম্মদের রিসালার উল্লিখিত ইবারত (যা আমরা মূল পাঠে উদ্ধৃত করেছি) পেশ করে বলেন: “সুতরাং হাসানের কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ফিতনার সময় পরস্পর লড়াইকারী উভয় দলের মধ্যে কোনো একজনকে চূড়ান্তভাবে সঠিক বা ভুল হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ফয়সালা না করা এবং তাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা; আর ইমান সংক্রান্ত যে ইরজা রয়েছে, হাসান বিন মুহাম্মদ তা করেননি; তাই তাঁর ওপর কোনো দোষ নেই।” (তহজিবুত তহজিব: ২/৩২৯, ত. হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য)

তাওযীহ আস-সুন্নাহ

করেন না, আর না কাউকে প্রশংসিত করেন যার আল্লাহ নিন্দা করেছেন। এই সবই হলো সেই সব কথা যা সহীহ মাযহাবের পরিপন্থী।

মুরজিয়ারা এই অবস্থানে ছিল যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের নিকট ঈমানের মধ্যে আমলের কোনো অংশ নেই। তাদের মতে গুনাহ ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না। মুমিন জাহান্নামে যাবে না, যদিও সে কোনো নেক আমল না করে থাকে। তাদের নিকট জান্নাতে যাওয়ার জন্য কেবল ঈমানই যথেষ্ট। অথচ কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক। ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়, বরং এটি অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সমষ্টি।

তাদের কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত বলেছে যে, যে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে গুনাহগার সেও জান্নাতি। তারা আরও বাড়াবাড়ি করে বলেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুখে কুফরি কথা বলে বা মূর্তিকে সেজদা করে, তবুও সে মুমিন থাকে যতক্ষণ না তার অন্তরে কুফর বদ্ধমূল হয়। মুরজিয়াদের এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা নফসের খাহেশাত বা প্রবৃত্তির পূজার পথ খুলে দিয়েছিল। তাই দুর্বল ঈমানের লোকেরা একে সানন্দে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী ও পাপাচারের পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং এমনকি মানুষের জান-মালের অধিকার হরণ করাকেও তারা হালকা মনে করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে মুরজিয়াদের মধ্যেও অনেক উপদল তৈরি হয়েছিল। তবে তাদের সবার মধ্যে অভিন্ন বিষয় ছিল এই যে, তারা ঈমানকে কেবল মৌখিক স্বীকৃতি মনে করত এবং আমলকে অপ্রয়োজনীয় মনে করত।

৫. মুতাজিলা

খারেজী ও মুরজিয়াদের মতামতের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে কিছু লোক নিজেদেরকে ‘ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ’ হিসেবে জাহির করতে গিয়ে এক নতুন মতবাদ বের করে। তারা বলে যে, কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিনও নয় আবার কাফেরও নয়; বরং সে ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি এক অবস্থানে থাকে। এই মতবাদের প্রবর্তক ছিল বসরার দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি: ওয়াসিল বিন আতা (৮০-১৩১ হি.) এবং আমর বিন উবাইদ (মৃত্যু ১৪৪ হি.)। তারা উভয়েই ইমাম হাসান বসরী (রহ.)-এর ছাত্র ছিল।

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ২৬৩৮, কিতাবুল ঈমান, বাব: মান ইয়ামুতু ওয়া হয়্যা ইয়াশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

[২] মুরজিয়া নামকরণের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে: ১. ইরজা, যার অর্থ হলো পিছিয়ে দেওয়া বা বিলম্বিত করা। এই লোকগুলো আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছিল (বা গুনাহগার মুমিনদের বিষয়টি বিলম্বিত করত)। এজন্যই তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। আল-তাবসীর ফিদ-দীন লিল-ইসফাহানী, পৃ: ৯৭। ২. রাজা, যার অর্থ হলো আশা করা। মুরজিয়ারাও অতিরিক্ত আশার কারণে এক ভ্রান্তিতে লিপ্ত ফেরকা ছিল যারা সব ধরনের পাপাচার সত্ত্বেও জান্নাতের আশা রাখত। আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত: ২৫৭/২৪।

[৩] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: ১৩৯/১; ১৪৫, ত: মুয়াসসাসাতুল হলাবি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

একদিন হাসান বসরী (রা.)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুললেন:

“হযরত! খারেজী জামাত কবিরা গুনাহকারীদের কাফের বলে গণ্য করে, আর মুরজিয়া জামাত কবিরা গুনাহকারীদের ক্ষেত্রে ‘ইরজা’-এর প্রবক্তা এবং তারা বলে যে, কুফরের সাথে যেমন নেক আমল কোনো উপকারে আসে না, তেমনি ঈমানের সাথে গুনাহ কোনো ক্ষতি করে না। তো এই বিষয়ে আমরা কী আকিদা পোষণ করব?”

হাসান বসরী (রা.) প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই ওয়াসিল বিন আতা দাঁড়িয়ে বললেন:

“আমার মতে কবিরা গুনাহকারী নিরঙ্কুশভাবে কাফেরও নয়, আবার নিরঙ্কুশভাবে মুমিনও নয়। বরং সে এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে, সে মুমিনও নয় আবার কাফেরও নয়।”

এই কথা বলে সে মসজিদের একটি খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং সমমনা লোকদের নিজের চারপাশে জড়ো করতে লাগল।

ওয়াসিলের এই কথাগুলো শুনে হাসান বসরী (রা.) বললেন: “ই’তাযালা আন্না ওয়াসিল” (ওয়াসিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে)। [১]

ফলে এই লোকেরা ‘মুতাযিলা’ নামে পরিচিতি লাভ করল। ওয়াসিলের চিন্তাধারা আমর বিন উবাইদেরও পছন্দ হলো এবং উভয়ের প্রচেষ্টায় একটি স্থায়ী ফেরকা বা দল আত্মপ্রকাশ করল।

এই লোকেরা নিজেদের ‘আসহাবুল আদল ওয়াত তাওহীদ’ বলত। মুরজিয়াদের বিপরীতে তারা এই প্রচার চালাল যে, ঈমানের সাথে নেক আমল এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য যে আমল ছাড়া ঈমানও কবুল হয় না। তবে এমন গুনাহগারকে কাফের বলা হবে না, বরং সে মুমিন ও কাফেরের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে। অবশ্য যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় এবং তওবা ছাড়া মারা যায়, সে নিশ্চিত জাহান্নামী, তার হাশর কাফেরদের সাথে হবে এবং সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। [২]

মুতাযিলারা রাজনৈতিক মূলনীতির ক্ষেত্রেও সওয়াদে আজম (মূলধারা)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করল। তাদের বক্তব্য ছিল যে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফ বর্জনকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি তা করার সামর্থ্য থাকে। কিছু রাজনৈতিক মতাদর্শে মুতাযিলাদের নিজেদের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল। কিছু মুতাযিলা আলেম খারেজীদের মতো বলতেন যে, খলিফা কুরাইশ বংশীয় হওয়া জরুরি নয়। বরং কোনো দুর্বল গোত্র থেকে খলিফা নিযুক্ত করা উত্তম যাতে প্রয়োজন পড়লে তাকে অপসারণ করা সহজ হয়। কারো কারো মতে ইমাম বা খলিফা নিয়োগ করা অপ্রয়োজনীয় ছিল, এটি উম্মতের দায়িত্ব ছিল যে তারা নিজেরাই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

মুতাযিলারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতপার্থক্য সম্পর্কেও নির্ভীকভাবে মতামত পেশ করেছে। কেউ কেউ হযরত উসমান (রা.)-এর ওপরও সমালোচনা করেছেন। আমর বিন উবাইদ বলতেন যে, জঙ্গ জামাল ও সিফফিনে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষই ফাসেক ছিল। ওয়াসিল বিন আতার মত ছিল যে, কোনো এক পক্ষ ফাসেক ছিল কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সেটি কোনটি! তাই তিনি বলতেন যে, হযরত আলী (রা.), জুবায়ের (রা.) এবং তালহা (রা.) যদি আমার সামনে এক মুষ্টি শাকসবজি সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেন, তবে আমি তা গ্রহণ করব না। [৩]

[১] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল লিশ শাহরাস্তানি: ১/৪৩, ৪৮

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/১০৪, ১০৫

[৩] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন লিল আশআরি: ১/২১২; আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল লি ইবনে হাজম: ৪/১৪৮, ৪৯; আল-ফারক বাইনাল ফিরাক: ৯৪, ৯৫

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

কারণ এই ব্যক্তিদের ফাসেক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। [১] (নাউযুবিল্লাহ)

৬. জাবরিয়া

প্রথম হিজরি শতাব্দীতে আহলে শাম এবং আহলে ইরাকের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে আদর্শিক সংঘাত চলছিল। আহলে শামের সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল কলঙ্কের সেই দাগগুলো, যা কারবালা, হাররার ঘটনা এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের মতো বেশ কিছু বিয়োগান্তক ঘটনার আকারে তাদের আঁচলে লেগেছিল এবং কোনোভাবেই তা মুছে ফেলা যাচ্ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে শামের কিছু যুক্তিবাদী অতীতের বিবাদগুলো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ‘জবর’ (অদৃষ্টবাদ)-এর তত্ত্ব পেশ করে, যার সারকথা ছিল এই যে, মানুষ একেবারেই নিরুপায়। সবকিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ; তাই জামাল, সিফফিন, কারবালা, হাররার ঘটনা এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতসহ কোনো বিয়োগান্তক ঘটনার দায়ভার কোনো মানুষের ওপর বর্তায় না।

এই দলটি জাবরিয়া নামে পরিচিত হয়। এই দলের বক্তব্য ছিল যে, মানুষ তাকদিরের কাছে এতটাই বাধ্য যে তার ইখতিয়ারে কিছুই নেই। যখন জাহমিয়া দল শক্তিশালী হয়ে উঠল, তখন জাবরিয়া দলও এরই অংশ হয়ে গেল। (জাহমিয়ার আলোচনা সামনে আসছে)। [২]

৭. কাদারিয়া

শামের যুক্তিবাদীদের এই ধৃষ্টতার প্রতিবাদে ইরাকের এক ব্যক্তি সুসন (সুনসুইয়া) আওয়াজ তুললেন। তিনি আগে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। জাবরিয়াদের মতো তিনিও ‘তাকদির’-এর মতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়কে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে শুরু করেন, যদিও এই বিষয়টিকে আলোচনার আওতায় আনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নিষেধ করেছিলেন। সুসন চিন্তা-ভাবনার পর নিজেই এই ফয়সালা দিয়ে দিলেন যে, তাকদির বলতে কিছু নেই, বরং মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন এবং নিজের সমস্ত কাজের জন্য নিজেই দায়ী।

বসরার একজন আলেম মাবাদ জুহানি (মৃত্যু ৮০ হিজরি) তার কথায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে তাকদিরের আকিদা নিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। মাবাদ জুহানি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে জামাজিমের যুদ্ধেও শরিক হয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এর আগেই গাইলান কাদারি নামক এক ফিতনাবাজ ব্যক্তি তার কাছ থেকে এই চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এগুলো আরও জোরেশোরে প্রচার করতে শুরু করেন।

উমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন জানতে পারলেন যে গাইলান তাকদির অস্বীকারকারী, তখন তাকে তলব করলেন এবং বোঝালেন। সে তাঁর সামনে তওবা করার ঘোষণা দিল। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর পুনরায় এই ভ্রান্ত আকিদা প্রচার শুরু করে দিল। অবশেষে খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

গাইলানের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়া ব্যক্তির বেশিরভাগই ছিল যুক্তিবাদী, যারা তাকদিরের বিষয়টিকে একটি গাণিতিক প্রশ্নের...

[১] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক: ৯৯, ১০০; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল লিশ শাহরাস্তানি: ৪৯/১।

নোট: মুতাজিলারা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আরও অনেক নতুন সূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেছিল, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় পর্যন্ত ওইসব বিতর্ক শুরু হয়নি, বরং তখন মুতাজিলা দল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তাই আমরা এর ওপরই ক্ষান্ত হচ্ছি।

[২] ইতিকাদাতুল মুসলিমিন ওয়াল মুশারিকিন, ফখর উদ্দিন রাজি: ৬৮/১; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী, পৃ. ৩৪।

...ভাবে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এই লোকেরা ‘কাদরিয়া’ নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে তারা অন্যান্য যুক্তিবাদী দলগুলোর সাথে মিশে যায়। [১]

(৮) জাহমিয়া

যেভাবে শিয়া ফিরকার ভিত্তি আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক এক ইহুদি স্থাপন করেছিল, ঠিক তেমনি জাহমি মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিল তালুত নামক এক ইহুদি। এই ব্যক্তি ছিল লাবিদ বিন আসম ইহুদির ভাগ্নে। [২] তালুত কিছু নতুন আকিদা পেশ করেছিল, যেমন— আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। তার ছাত্র বায়ান বিন সামআন এই কথাগুলো সামনে ছড়িয়ে দেয়।

দামেস্কের এক ব্যক্তি জা’দ বিন দিরহাম তার বিশেষ মুরিদ হয় এবং সে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে এই আকিদাগুলোকে নতুন কিছু সংযোজনসহ একটি ইসলামি চিন্তাধারা হিসেবে পেশ করে। সে বড় বড় ফিরকাগুলোর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে দ্বীনের মূলনীতিগুলো পরিবর্তন করে দেয় এবং প্রকাশ করে যে, নসুস (অকাট্য প্রমাণ)-এর ওপর ভরসা করে কোনো আলোচিত সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাই প্রতিটি আলোচনাকে যৌক্তিক প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল করা উচিত, অর্থাৎ যা কিছু বিবেকের পরিপন্থী তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

উন্মত্তের মধ্যে সেই ছিল প্রথম ব্যক্তি যে কুরআন মাজিদ মাখলুক (সৃষ্ট) হওয়ার বিতর্ক শুরু করেছিল। সে এমন প্রতিটি আকিদাকে অস্বীকার করত যা বিবেকের কাছে কঠিন মনে হতো। ফলে সে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-কে খলিল বানানো এবং মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথোপকথন করার বিষয়টিও অস্বীকার করে বসে, যদিও এই ঘটনাগুলোর বর্ণনা কুরআন মাজিদে রয়েছে।

জা’দ বিন দিরহামের চিন্তাধারা যখন প্রসিদ্ধি লাভ করল, তখন সরকার তাকে খুঁজতে শুরু করল। সে দামেস্ক থেকে পালিয়ে ইরাকে চলে যায়। এখানে সে অনেক ছাত্র তৈরি করে। অবশেষে ইরাকের গভর্নর খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি তাকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। [৩]

জা’দের ছাত্রদের মধ্যে সমরকন্দের একজন চিন্তাবিদ জাহম বিন সাফওয়ান এই ফিরকাকে একটি সুসংগঠিত রূপ দেয়, তাই এই ফিরকাটি তার দিকেই সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ‘জাহমিয়া’ নামে পরিচিত হয়। জাহম ছিল একজন যুক্তিবাদী সাহিত্যিক ও তর্কিক। সে শেষ উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী হারিস বিন শুরাইজের বাহিনীতে কাজি হিসেবে নিযুক্ত ছিল। তার উস্তাদ জা’দের মতো জাহম বিন সাফওয়ানও কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কিত অনেক নসুসকে বিবেকের পরিপন্থী বলে সেগুলো অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলার মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলাকেও সে অসম্ভব বলত। মোটকথা, সে আল্লাহ তাআলার অনেক গুণাবলি অস্বীকার করেছিল। সে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার করত এবং মানুষকে উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মতো সম্পূর্ণ বাধ্য (মাজবুর-এ-মাহজ) বলে গণ্য করত। সে আল্লাহর ইলমের চিরস্থায়ী হওয়া এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অবিনশ্বর হওয়ারও অস্বীকারকারী ছিল। তার ফিতনা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের গভর্নর নাসর বিন সাইয়্যার তাকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেন। জাহম বিন সাফওয়ানের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা দ্বারা মুতাজিলা আলেমরা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা অনেক মতবাদে তার অনুসরণ করেন। [৪]

[১] আল-আলাম লিয়-যিরকলি: ৭/২৬৪, ২৬৫; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১৮৬, ১৮৭

[২] লাবিদ ছিল সেই হতভাগা ইহুদি যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর জাদু করার ষড়যন্ত্র করেছিল। (সহিহ আল-বুখারি, হা: ৫৭৬৫, কিতাবুত তিব্ব, অধ্যায়: জাদু কি বের করা হবে?)

[৩] তারিখু দামেশক: ৭২/৯৯, ১০০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/১৪৮, ১৪৯; সন ১২৪ হিজরি ও ১২৬ হিজরি

[৪] আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত লিস-সাফাদি: ১১/১৬০, ১৬১

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অস্বীকার করাকে ‘তাতিল’ বলা হয়। এটি ছিল জাহমের মতবাদ। এর খণ্ডন করতে গিয়ে খোরাসানের একজন মুফাসসির মুকাতিল বিন সুলাইমান এত কঠোরতা প্রদর্শন করেন যে, আল্লাহর গুণাবলিকে বান্দাদের গুণাবলির মতো দেখা ও বোঝা প্রসিদ্ধ করে দেন। এভাবে আল্লাহর ‘তাজসিম’ (সাকারত্ব)-এর আকিদা জন্ম নেয় এবং কিছু লোক মনে করতে শুরু করে যে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহও আমাদের মতো জিহ্বা, কান ও চোখ ব্যবহার করেন। [১]

আলোচনার সারকথা হলো এই যে, ফিরকাবন্দির সমস্ত ধারার মূল ভিত্তি ছিল আটটি চিন্তাধারা:

- ১. শিয়া
- ২. খারেজি
- ৩. নাওয়াসিব
- ৪. মুরজিয়া
- ৫. মুতাজিলা
- ৬. জাবরিয়া
- ৭. কাদরিয়া
- ৮. জাহমিয়া

এদের মধ্যে প্রথম চারটি একে অপরের প্রতিক্রিয়া ও জেদের বশবর্তী হয়ে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, আর শেষ চারটি আকল বা যুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। এই চিন্তাধারাগুলো থেকেই পরবর্তীতে আরও বিশদভাবে বহু ফিরকার জন্ম হয়।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বতন্ত্র দল:

এই ভিন্নমতাবলম্বী ও চরমপন্থী দলগুলোর মাঝে উন্মত্তে মুসলিমার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেই আকিদা ও মতাদর্শের ওপর অটল ছিল যা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত ছিল এবং যা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেরীন এবং উলামা ও ফুকাহাগণ নিজ নিজ মজলিসে বর্ণনা করে আসছিলেন। অধিকাংশ পথভ্রষ্ট ফিরকার মূল দলিল ছিল জাল বর্ণনা অথবা যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদি। কুরআন মাজীদের নসূস (সুস্পষ্ট বাণীসমূহ) তাদের পক্ষে যেত না। তবে বাতিলপন্থীরা কুরআনকে সরাসরি অস্বীকার করার সাহস পেত না, বরং আয়াতসমূহের অপব্যখ্যা (তাবিল) করত। তারা হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমায়ি (ঐক্যবদ্ধ) সিদ্ধান্তসমূহকে খোলাখুলি অস্বীকার করত।

সুতরাং হক ও বাতিলের মধ্যে বড় পার্থক্য এই প্রকাশ পেল যে, আহলে হক:

- ১. সহীহ হাদিস অর্থাৎ সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন এবং
- ২. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা মেনে নিতেন।

পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা: (১) জাল বর্ণনা অথবা যুক্তির শিকলে বন্দি ছিল। (২) প্রতিটি বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা করত।

নজেদের এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানার জন্য উন্মত্তে মুসলিমার সওয়াবে আজম (বৃহত্তর জনগোষ্ঠী), যারা মুসলিম বিশ্বের ৯০ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত ছিল, এমন একটি শিরোনাম গ্রহণ করল যাতে পার্থক্যের মূল ভিত্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই সহীহ হাদিসের ওপর আমলকারীদের জন্য ‘সুন্নাহ’ শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে আরও স্পষ্টতার সাথে ‘আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত’ হয়ে যায়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে আরব বিশ্বে ‘আস-সুন্নাহ’ এবং অনারব বিশ্বে ‘সুন্নি’ বলা হয়। উমর বিন আব্দুল আজিজ-এর কিছু চিঠিপত্রে ‘আহলে সুন্নাহ’ শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে। [২] আহলে সুন্নাহ এবং অন্যান্য দলগুলোর অবস্থানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাহের রায় বা অভিমত ছিল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি (ইফরাত ও তাফরিত) থেকে মুক্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহের হুবহু অনুসারী।

[১] তাজকিরাতুল হুফফাজ লিখ-মাহাবি: ১/ ১১২, সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৭/ ২০২, ২০৩

[২] সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ, পৃ. ৮৫

তারীখে সুন্নাত মুসলিমা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাসরুফ বিন আল-আজদা রহ. (মৃত্যু ৬৩ হি.) বলতেন:

“حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة”

“আবু বকর ও উমর রা.-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আহলে সুন্নাতের নিদর্শন।” [১]

অনুরূপ কথা প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম শাবী রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [২]

ইমাম শাবী রহ. আরও বলতেন:

“উম্মত চারটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে: একদল যারা হযরত আলী রা.-এর অনুরাগী এবং হযরত উসমান রা.-এর বিরোধী। দ্বিতীয় দল যারা হযরত উসমান রা.-এর অনুরাগী এবং হযরত আলী রা.-এর বিরোধী। তৃতীয় দল যারা উভয়কে ভালোবাসে। চতুর্থ দল যারা উভয়ের বিরোধী।” [৩]

ইমাম শাবী রহ. মানুষকে নসিহত করতেন:

“নেককার মুসলমান এবং বনু হাশিমকে ভালোবাসো, কিন্তু শিয়া হয়ো না। নিজের ইলম সম্পর্কে ভালো আশা রাখো, কিন্তু মুরজিয়া হয়ো না। জেনে রেখো, নেকি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক এবং মন্দ নিজের নফসের পক্ষ থেকে, কিন্তু কাদারিয়া হয়ো না। আর যাকে (ভালো) আমল করতে দেখবে, তাকে ভালোবাসো।” [৪]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন:

“السنة أن تفضل الشيخين وتحب الختين وترى المسح على الخفين”

“আহলে সুন্নাত হওয়ার আলামত হলো তুমি শায়খাইনকে (হযরত আবু বকর ও উমর রা.) শ্রেষ্ঠ মনে করবে, দুই জামাতাকে (হযরত উসমান ও আলী রা.) ভালোবাসবে এবং মোজার ওপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করবে।” [৫]

উম্মতের এই সর্বসম্মত আকিদা ও রাসূলের দ্বীন এখন পর্যন্ত কোনো স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি আকারে বিন্যস্ত ছিল না। বরং উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ পদ্ধতিতে কুরআনের নস, হাদীসের বর্ণনা এবং সাহাবায়ে কেরামের আছারের আলোকে এই বিষয়গুলো যথাসময়ে বর্ণনা করতেন। দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুতে যখন আকিদাগত ও তাত্ত্বিক ফিতনা ছড়িয়ে পড়ল, তখন এটি জরুরি হয়ে পড়ল যে, উম্মতের সেই সর্বসম্মত আকিদা যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং যার ওপর সাহাবা ও তাবিঈনের ইজমা রয়েছে, তা স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করে পেশ করা হোক। এই মহান কাজ যে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, তিনি হলেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.।

[১] আল-মা'রিফাতু ওয়াত-তারিখ লিল-ফাসাউয়ি: ৩/৮১২

[২] সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ৪/৩০৮

[৩] সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ৪/৩১০

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৬/২৪৮

[৫] তুহফাতুল ফুকাহা, আস-সামারকান্দি: ৩/৩৬৮; আল-বাদায়িউ ওয়াস-সানায়িউ লিল-কাসানি: ৫/১১৯, ১১৭; আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ: ১/১১৪; আল-বাহরুর রায়িক: ১/১৭৩। মোজার ওপর মাসাহ করাকে আহলে সুন্নাতের বিশেষ আলামত হিসেবে এ কারণে গণ্য করা হয়েছে যে, রাফেজিরা এটি অস্বীকার করে। বর্তমানে এই সুন্নাতের ওপর আমলকারী লোক খুব কম। এটি আমল করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি সুন্নাতকে জীবিত করার একটি মাধ্যম।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি..... এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির আসল নাম ছিল নুমান বিন সাবিত। তাঁর পরিবার কাবুলে বসবাস করত। তাঁর দাদার নাম ছিল জুতী বা জুতী। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে কোনো এক যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁকে কুফায় আনা হয়। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বনী তাইমুল্লাহর ‘ওয়ালা’ (সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা)-তে ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁদের এমন সম্পর্ক ছিল যে, তাঁরা প্রায়ই তাঁর খিদমতে উপটোকন পাঠাতেন। ইমাম সাহেবের পিতা জনাব সাবিতও শৈশবে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হতেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর জন্য বরকতের দুআ করেছিলেন। এই কুফাতেই ইমাম আবু হানিফা ৮০ হিজরিতে (৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের খিলাফতকাল ছিল এবং ইরাকের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। যখন হাজ্জাজের মৃত্যু হয়, তখন ইমাম সাহেবের বয়স ছিল পনেরো বছর। তিনি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ থেকে শুরু করে উমাইয়া বংশের ৫২টি বসন্ত (বছর) দেখেছিলেন। ১৮ বছর বনু আব্বাসের যুগে অতিবাহিত করেন এবং অবশেষে মনসুর আব্বাসীর আমলে ১৫০ হিজরিতে (৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [১]

তাঁর যুগের অস্থিরতা:

তাঁর সত্তর বছরের জীবনে তিনি ইসলামি বিশ্বে বড় বড় বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছেন। হাজ্জাজের যুগের জুলুম-নির্যাতন দেখেছেন এবং ওয়ালিদের বিজয় অভিযানের বীরত্বগাথা শুনেছেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতময় যুগ যৌবনকালে দেখেছেন। এরপর ইরাকে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব, খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরী, নাসর বিন সাইয়্যার এবং ইয়াজিদ বিন উমর বিন হুবায়রার মতো নামী-দামী আমিরদের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছেন। আব্বাসী আন্দোলন তাঁর চোখের সামনেই দানা বেঁধেছিল। কুফা ছিল এর একটি বড় কেন্দ্র। বাগদাদ নির্মাণের আগে কুফাই ছিল বনু আব্বাসের বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। এই শহরটি বিভিন্ন ফিকহি মাযহাব, কিরাআতের পার্থক্য এবং আকিদাগত বিতর্কেরও ময়দান ছিল। এটি ছিল উমাইয়া খিলাফতের চরম উন্নতির যুগ। এই সময়ে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জনে মশগুল ছিলেন। তিনি কিরাআত, হাদিস, তাফসির, নাহ্ব, আদব এবং সেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যা একজন তালিবে ইলমের জন্য জরুরি বলে বিবেচিত হতো। [২]

আকিদাগত বিতর্ক ও মুনাজারায় পারদর্শিতা:

যেহেতু সেই যুগে আকিদাগত ফিতনা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তাই সমাজের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তাঁর আগ্রহ ইলমুল আকিদা, বাতিল মতবাদ খণ্ডন এবং মুনাজারার (বিতর্ক) দিকে ধাবিত হয়। যৌবনেই তিনি এই বিদ্যায় এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন।

[১] মানাকিব আবি হানিফা মক্কি: ১/৩৪ থেকে ৩৬; আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ: ১/২৭; তবাকাত মুহাম্মদ বিন কুতুব খানা; আবু হানিফা হায়াতুল ওয়া আসরুল - মুহাম্মদ আবু জাহরা, পৃ. ৩৬ থেকে ৪০।

[২] মানাকিব আবি হানিফা, কুরদরী: ১/৬৫, ৬৬।

ছিলেন। ইমাম সাহেব দীর্ঘকাল এই সকল বিতর্ক ও মুনাজারায় লিপ্ত ছিলেন। কুফা ছাড়াও ধর্মীয় মতভেদের অন্য কেন্দ্র ছিল বসরা। ইমাম সাহেব সেখানে বছবার গিয়েছেন এবং সেখানে অবস্থান করে খারিজি ও অন্যান্য ফেরকাগুলোর সাথে মুনাজারা করতে থাকেন।

[১]

জুফার ইবনে হুজাইল (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সাহেব (রহ.) নিজেই বলতেন:

“আমি আকিদাগত বিতর্কে এমন এক উচ্চস্থান লাভ করেছিলাম যে, আমার দিকে আগুল দিয়ে ইশারা করা হতো।” [২]

এটা স্পষ্ট যে, মুনাজারা করার জন্য বিভিন্ন মাযহাবের মতভেদ সম্পর্কে জ্ঞানের পাশাপাশি মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং যৌক্তিক প্রমাণের অসাধারণ যোগ্যতা থাকা আবশ্যিক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মুনাজারার ব্যস্ততা থেকে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, তিনি শুরু থেকেই এই গুণাবলীতে উচ্চ পর্যায়ের অধিকারী ছিলেন; এজন্যই আলী ইবনে আসিম (রহ.) বলতেন:

“যদি সমস্ত পৃথিবীবাসীর আকল এক পাল্লায় রাখা হয় এবং আবু হানিফার আকল অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে তাঁর আকলই সবার চেয়ে ভারী হবে।” [৩]

তাঁর মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধি:

দুটি ঘটনা থেকে তাঁর মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধির আন্দাজ করা যেতে পারে:

কুফায় এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.)-কে ইহুদি বলে গণ্য করত। ইমাম সাহেব (রহ.) যখন তা জানতে পারলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করলেন এবং বললেন: “আমি তোমার মেয়ের জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।” সে বলল: “কার প্রস্তাব?”

ইমাম সাহেব বললেন: “এমন এক ব্যক্তির, যে অত্যন্ত ভদ্র, সম্পদশালী ও দানশীল, হাফেজে কুরআন এবং তাহাজ্জুদ গুজার। আল্লাহর ভয়ে সে প্রচুর কান্নাকাটি করে।” সে খুশি হয়ে বলল: “আমি তো এর চেয়ে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্তাবেও রাজি আছি।”

ইমাম সাহেব বললেন: “কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি দোষ আছে। সে ইহুদি।”

লোকটি রেগে গিয়ে বলল: “সুবহানাল্লাহ! আপনি আমার মেয়েকে একজন ইহুদির কাছে বিয়ে দিতে চান?”

[১] মানাকিব আবি হানিফা, মক্কি: ৫৯/১

[২] “كنت انظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار الي فيه بالاصابع” (মানাকিব আবি হানিফা মক্কি: ৫৫/১)

সতর্কবার্তা: উল্লিখিত বর্ণনায় ইমাম সাহেবের মুনাজারার দক্ষতাকে “ইলমে কালামে পারদর্শিতা” হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর কিছু লোক এখান থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম সাহেব নিশ্চয়ই দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন; কারণ এগুলো ছাড়া “ইলমে কালামে” প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইমাম সাহেবের মুনাজারার দক্ষতাকে “ইলমে কালামে পারদর্শিতা” নাম দেওয়া বর্ণনার ভুল। কারণ ইমাম সাহেবের যুগে মুনাজারা এবং আকিদাগত বিতর্ক অবশ্যই হতো, কিন্তু “ইলমে কালাম”-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং সেই সময়ে ইসলামি বিশ্বে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের কোনো নামনিশানাও ছিল না। আলেমদের কাছে এটি গোপন নয় যে, দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের কিতাবসমূহ প্রথমবার বনু আব্বাসীয় যুগে অনুদিত হয় এবং সেগুলো থেকে সৃষ্ট বিদ্যাত্মকসমূহ খণ্ডন করার জন্য মুনাজির আলেমগণ “ইলমে কালাম” উদ্ভাবন করেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মানাকিব বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর দিকে ইলমে কালামের সম্পৃক্ততাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং লিখেছেন: “وجد علم الكلام؟ وهل كان في ذلك لم الوقت وجد علم الكلام؟” (সেই যুগে ইলমে কালামের অস্তিত্বই বা কোথায় ছিল?) সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪০১/৬। প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেব তাঁর সহজাত মেধা এবং চিন্তাশীল উপস্থিত বুদ্ধির জোরে মুনাজারা করতেন। এই খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের কিতাবসমূহের মুখাপেক্ষী ছিল না।

সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনাটি মূলত রেওয়য়াত বিল মানা (মমার্থ বর্ণনা)। এখানে “আহকাম”-এর পরিবর্তে “আকিদাগত মাসায়েল”-এর অর্থ প্রকাশকারী অন্য কোনো শব্দ ছিল, যাকে পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী তাঁর যুগের পরিভাষা অনুযায়ী “আল-কালাম” হিসেবে অভিহিত করেছেন।

[৩] আখবারু আবি হানিফা লিস-সাইমারি, পৃ. ২৩, ৪২, ১০২; আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃ. ২৫

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “তাহলে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে কোনো ইহুদির কাছে বিয়ে দিতেন?”

সেই ব্যক্তি নিজের আকিদার ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং তখনই তওবা করে নিল। [১]

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, দাহহাক নামক একজন খারেজী সর্দার কুফার আশেপাশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। একবার সে কুফার জামে মসজিদে ঢুকে পড়ল এবং ইমাম সাহেবের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিল এবং বলল: “আপনি তাহকীমকে (সালিশি) জায়েজ মনে করেন, এ থেকে তওবা করুন।” [২]

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “তোমার উদ্দেশ্য কি আমাকে হত্যা করা, নাকি আলোচনা করা?”

সে বলল: “আলোচনা করা।”

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “যদি আমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে ফয়সালা না হয়, তবে কে ফয়সালা করবে?”

সে বলল: “আপনি যাকে ইচ্ছা নিযুক্ত করুন।”

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি দাহহাকের সাথীদের মধ্য থেকে একজনকে বললেন:

“তুমি মাঝখানে বসো, যদি আমরা একমত হতে না পারি তবে তুমি ফয়সালা করবে।”

এরপর দাহহাককে বললেন: “তুমি কি এতে রাজি?”

সে বলল: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “এটাই তো তাহকীম (সালিশি) যা তুমি নিজেই জায়েজ বলে মেনে নিলে।” [৩]

দাহহাক নিরন্তর হয়ে গেল।

ফিকহ শাস্ত্রে আগ্রহ

দীর্ঘদিন পর তাঁর মন ধর্মীয় বিতর্ক থেকে সরে গেল, এর কারণ ছিল এই যে, তাঁকে একটি ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি তার উত্তর দিতে পারেননি। তখন তিনি পূর্ণ মনোযোগের সাথে ফিকহ শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এটি ১০২ হিজরীর ঘটনা যখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর। [৪]

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে ফকীহদের দুটি শ্রেণী ছিল: একদল যারা হাদীসের বাহ্যিক শব্দের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিতেন। অন্যদল যারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের করতেন। তাঁদেরকে ‘আহলে রায়’ বলা হতো। ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধুমাত্র হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর নির্ভর করতে আগ্রহী ছিলেন না বরং এর গভীর পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইতেন; তাই তাঁর ঝোঁক স্বাভাবিকভাবেই আহলে রায়ের দিকে হয়ে গেল।

কুফা ছিল আহলে রায়ের একটি বড় কেন্দ্র। এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর কাছ থেকে ফিকহ ও ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে কাজী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.), আলকামা (মৃ. ৮২ হি.) এবং মাসরুক (মৃ. ৮৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন।

[১] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃ. ৩৫

[২] খারেজীরা হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সালিশিকে কুফর বলত।

[৩] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ লি-তাকিউদ্দীন আত-তামিমী: ১/৪৮

[৪] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ: ১/২৫, ২৬

তারীখে সুনাত মুস্তাকিল্লা

মাসরুকের পর ইব্রাহিম নাখয়ী রহ. (মৃত্যু ৯৫ হিজরি) ফিকহের এই মজলিসকে সজীব রাখেন। এরপর তাঁর ছাত্র হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান রহ. এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং দীর্ঘ ১৮ বছর পর্যন্ত তাঁর মজলিসে ফিকহি মাসায়েল শিখতে থাকেন। তবে তিনি অন্যান্য আলেমদের থেকেও ফয়েজ হাসিল করেছেন, আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যিয়ারত করেছেন, প্রতি বছর হজের জন্য গিয়ে হিজাজের মুহাদিস ও ফকিহদের থেকে নিয়মিত উপকৃত হতেন। ফলে তাঁর উস্তাদদের মধ্যে নাফে মাওলা ইবনে উমর, হিশাম বিন উরওয়া, সিমাক বিন হারব, আতা বিন আবি রাবাহ এবং আলকামা বিন মারসাদ রহ.-এর মতো ইলমের পাহাড়তুল্য ব্যক্তিত্বরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

দরস ও ইফতার মসনদে:

১২০ হিজরিতে হযরত হাম্মাদ রহ.-এর ইন্তেকালের পর শহরের ফকিহদের পীড়াপীড়িতে ইমাম আবু হানিফা রহ. ফিকহ পাঠদানের মসনদ গ্রহণ করেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজের ইলমি যোগ্যতার মাধ্যমে উপকৃত করতে শুরু করেন। এটি ছিল বনু উমাইয়ার বিখ্যাত খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামল। শান্তি ও শৃঙ্খলার এই যুগে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইলমি কাজ করার চমৎকার সুযোগ পান এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আরব, মধ্য এশিয়া, খোরাসান ও আফ্রিকায় তাঁর ফিকহি জ্ঞানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। [২] বনু উমাইয়ার শেষ সময়টি ছিল অত্যন্ত উত্তাল, খলিফারা ছিলেন দুর্বল এবং শাসকরা ছিল উদাসীন, জনগণ শাসকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং স্থানে স্থানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। ইয়াজিদ বিন উমর বিন হবায়রা কুফার গভর্নর হলে তিনি জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রভাবশালী আলেমদের জায়গির ও পদের লোভ দেখিয়ে নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতো জাহিদ ও মুত্তাকি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা কোনো সহজ কাজ ছিল না; তাই তাঁকে ‘কাযিউল কুযাত’ (প্রধান বিচারপতি) পদের প্রস্তাব দিয়ে বশ করার চেষ্টা করা হয়। ইমাম সাহেব রহ. তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফলস্বরূপ সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে প্রতিদিন দশটি করে বেত্রাঘাত করা হতো যাতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু ইমাম সাহেব নিজের অবস্থানে অটল থাকেন। একশ দশটি বেত্রাঘাতের পর শাসকদের জুলুম হার মেনে নেয় এবং ইমাম সাহেব রহ. মুক্তি পান। [৩]

জীবিকা নির্বাহ, আমানতদারি এবং লেনদেনে ব্যবহারিক দক্ষতা:

জীবিকা নির্বাহের জন্য আপনি আপনার পৈত্রিক পেশা ব্যবসা বেছে নিয়েছিলেন। আপনি ‘খায’ নামক এক বিশেষ ধরনের কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আপনার একটি কারখানা ছিল যেখানে এই কাপড় তৈরি হতো এবং তা কেবল কুফায় নয় বরং দূর-দূরান্তের শহরগুলোতেও বিক্রি হতো। [৪] ইমাম সাহেব রহ.-এর আমানতদারি ও সততার ওপর আস্থার কারণে মানুষ আপনার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে আমানত রাখত, এভাবে এই স্থানটি ব্যবহারিক দিক থেকে একটি ব্যাংকের মর্যাদা লাভ করেছিল যেখানে ইমাম সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের সময় পঞ্চাশ হাজার দিরহাম (প্রায় সোয়া কোটি টাকা) আমানত গচ্ছিত ছিল। [৫]

[১] তারিখ বাগদাদ লিল খতিব: ১৩/৩২৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আখবারু আবি হানিফা লিস-সাইমারি, পৃ. ২৬

[৩] তারিখ বাগদাদ: ১৩/৩২৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৪] মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান লিশ-শাইখ আব্দুল্লাহ ইয়াফেয়ী: ১/২৯২, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৫] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃ. ৩৩... এটি আবু আব্দুর রহমান আল-মাসউদির বর্ণনা। অন্যদিকে মুয়াফফাক মক্কি অন্য একটি সনদের মাধ্যমে এই পরিমাণ পাঁচ কোটি দিরহাম (পঞ্চাশ আলফ আলফ) উল্লেখ করেছেন। (মানাকিব আবি হানিফা মক্কি: ১/২৬০) এই পরিমাণ বর্তমান সময়ের হিসেবে প্রায় সাড়ে বারোশ কোটি টাকার সমান হবে।

তারিখ-এ-মিল্লাত

অর্থনীতি, ব্যবসা এবং অর্থব্যবস্থার এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কারণে ইমাম সাহেব শরীয়তের আইনের লেনদেন সংক্রান্ত শাখাগুলোতে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সেই গভীরতা এবং উপলব্ধির সেই উচ্চতা লাভ করেছিলেন যা কেবল জ্ঞান অর্জন এবং মুখস্থ করার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।

চরিত্র ও গুণাবলি:

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও দৃষ্টি নন্দন। তিনি মার্জিত ও পবিত্র পোশাক পরিধান করতেন যা থেকে সুগন্ধি আসত। [১] সহনশীলতা, নির্ভীকতা এবং উচ্চ সাহসিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, বড় থেকে বড় আকস্মিক বিপদেও তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তিতে কোনো পার্থক্য আসত না। একবার পাঠদানকালে ঘরের ছাদ থেকে একটি সাপ সরাসরি তাঁর কোলে এসে পড়ল। মজলিসে উপস্থিত অধিকাংশ লোক এটি দেখামাত্রই পালিয়ে গেল কিন্তু ইমাম সাহেব (রহ.) অত্যন্ত নিশ্চিত্তে সাপটিকে ঝেড়ে একপাশে ফেলে দিলেন এবং নিজের জায়গা থেকে নড়লেনও না। [২]

ইমাম সাহেব (রহ.) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নেককার, পরহেজগার এবং দানশীল মানুষ ছিলেন। আলেম ও ছাত্রদের ওপর তিনি নিজের সম্পদ মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। তাঁর অনেক ছাত্রের সমস্ত খরচ তিনি নিজেই বহন করতেন। তাঁর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ঘরের পুরো ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন; কারণ তাঁর মা দরিদ্রের কারণে তাঁকে কোনো কায়িক শ্রমে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। [৩]

তিনি তাঁর ব্যবসার মুনাফার একটি বিশেষ অংশ এজন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সারা বছর তিনি সেই অংশ থেকে আলেম ও ছাত্রদের নিয়মিত অনুদান দিতেন এবং বছরের শেষে যা অবশিষ্ট থাকত তা তাঁদের মধ্যেই বণ্টন করে দিতেন এবং বলতেন:

“এটি আপনাদের প্রয়োজনে ব্যয় করুন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন না। আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু দিচ্ছি না। এটি কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি আপনাদের জন্যই আমাকে দিয়েছেন।” [৪]

তিনি নিজের সন্তানদের শিক্ষকদেরও বড় বড় উপহার দিতেন। যখন তাঁর ছেলে হাম্মাদ সূরা ফাতিহা শেষ করলেন, তখন ইমাম সাহেব (রহ.) তাঁর শিক্ষককে পাঁচশ দিরহাম (প্রায় সোয়া লাখ টাকা) উপহার দিয়েছিলেন। [৫]

তাঁর তাকওয়া, খোদাভীতি এবং যুহুদ ও ইখলাসের ঘটনা প্রচুর। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইবাদত ও রিয়াযতে এমন মাকামে ছিলেন যে, আলেম ও ফকীহগণ তো দূরের কথা, দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ এবং খানকার জন্য উৎসর্গিত সুফীরাও তাঁর সমপর্যায় পৌঁছাতে পারতেন না। তাঁকে কুফার সবচেয়ে বড় আবেদ বলা হতো। ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নফল রোজা রেখেছেন। রাতে একদমই ঘুমাতে না। পুরো রাত নফল নামাজ, জিকির ও তিলাওয়াত এবং দোয়া ও মোনাজাতে অতিবাহিত হতো। [৬] চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি এশার অজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। [৭] বিশ্রামের সময় ছিল কেবল জোহর থেকে আসর পর্যন্ত। [৮]

[১] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ১৫, ১৬

[২] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ১৮

[৩] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ৬২

[৪] তারিখ বাগদাদ: ৩৫৮/১৩

[৫] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ১৮

[৬] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ২১; তারিখ বাগদাদ: ৪৫১, ৪৫২/১৩

[৭] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ২১; তারিখ বাগদাদ: ৪৫৩/১৩

[৮] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ২১

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ছিল তাঁর আত্মার খোরাক এবং তাঁর সবচেয়ে বড় আমল। কখনো এক এবং কখনো দুই রাকাআতে পুরো কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এভাবে প্রতি রাতে তিনি এক খতম কুরআন করতেন। কুফার নিজের নির্জন ইবাদতখানায় তিনি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত সাত হাজার বার কুরআন খতম করেছিলেন [১]। রমজানুল মুবারকে প্রতিদিন দুইবার কুরআন খতম করতেন। তিলাওয়াতের সময় যখন আযাব ও শাস্তির আয়াত আসত, তখন তা বারবার পড়তেন এবং রোনাজারি করতেন। তাঁর কান্নাকাটি ও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এত উচ্চ হতো যে শ্রবণকারীদের মনে দয়া হতো। একবার “بَلِّ السَّاعَةَ” আয়াতটি পড়তে পড়তে ভোর করে দিলেন যে তা পড়তে পড়তেই সকাল হয়ে গেল [২]।

তিনি তাঁর ব্যবসায়িক জীবনেও অত্যন্ত পরহেজগারির পরিচয় দিতেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির। তাঁর দোকানে মাল বিক্রি করতে আসত এবং নিজেদের মালের দাম কম বললে ইমাম সাহেব নিজেই তাদের বলতেন যে, আপনাদের মালের দাম আরও বেশি। তারপর তিনি তাদের উপযুক্ত দাম দিতেন [৩]।

আল্লাহ তাঁকে যে অসাধারণ উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, তা শতাব্দীকালে খুব কম লোকই লাভ করে; শুধু সাধারণ মানুষই নয় বরং আলেমদের মাঝেও তাঁর বিরোধীর সংখ্যা কম ছিল না। কেউ তাঁকে হাদীস অস্বীকারকারী বলত, কেউ মুরজিয়া বলত। কিন্তু অধিকাংশ সমসাময়িক আলেম, বিশেষ করে যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন, তারা সর্বদা তাঁর গুণাবলি স্মরণ করতেন। ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা-র সামনে কেউ তাঁর সমালোচনা করলে তিনি বলতেন: “কখনোই নয়, তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি নফল নামাজ আদায়কারী, সবচেয়ে বড় আমানতদার এবং সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী” [৪]।

হারুনুর রশীদ একবার কাজী আবু ইউসুফ-এর কাছে তাঁর অভ্যাস ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে কঠোরভাবে বেঁচে চলতেন, দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকতেন এবং অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। সর্বদা গভীর চিন্তা ও গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। যদি কেউ কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করত এবং তিনি তা জানতেন, তবে উত্তর দিতেন। তিনি নিজের নফস ও দ্বীনকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট থাকতেন, মানুষের থেকে দূরে থেকে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো কারো মন্দ আলোচনা করতেন না” [৫]।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন:

“আমি আবু হানিফা-র চেয়ে বেশি পরহেজগার মানুষ আর কাউকে দেখিনি। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আর কী-ই বা বলা যেতে পারে...”

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৩/৩৫৩; মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিব্বিহি লিয়-যাহাবি, পৃ. ২১

[২] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিব্বিহি লিয়-যাহাবি: ২৩। শিবলী নোমানী ‘সীরাতুন নুমান’ (পৃ. ৬৯, ৭৮)-এ ইমাম আবু হানিফার ইবাদত ও রিয়াযত সংক্রান্ত এই বর্ণনাগুলোকে উপকথা বলে অভিহিত করেছেন কারণ এগুলো বর্ণনার পরিপন্থী। এটা বোঝা মুশকিল যে এর মধ্যে কোনটি অসম্ভব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। হাফেজ যাহাবি তাঁর ইবাদত ও রিয়াযতের এই বর্ণনাগুলো এমন শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন যে এই ঘটনাগুলো তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যদি আমরা সেই যুগের ইবাদতকারীদের আমাদের সময়ের সাথে তুলনা করি, তবে আমাদের অধিকাংশ সালাফে সালেহীনের বর্ণনা অস্বীকার করতে হবে।

[৩] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিব্বিহি, পৃ. ২৮

[৪] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিব্বিহি, পৃ. ১৭

[৫] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিব্বিহি, পৃ. ১৭

দুনিয়া ও এর সম্পদ তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল কিন্তু তিনি পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন। তিনি কখনো সেই
পদগুলোকে গুরুত্বের যোগ্য মনে করেননি যেগুলোর পেছনে মানুষ দৌড়ায়। [১]
হাসান বিন যিয়াদ রহ. বলতেন: “ইমাম সাহেব কখনো কোনো আমির বা শাসকের উপহার
গ্রহণ করেননি।” [২]

কাজী ইবনে শুবরুমাহ রহ. বলতেন:

“তিনি দুনিয়া থেকে পালিয়েছেন আর দুনিয়া তাঁর পেছনে দৌড়েছে। আমরা দুনিয়ার পেছনে
দৌড়েছি আর দুনিয়া আমাদের থেকে পালিয়ে গেছে।” [৩]

খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর বনু উমাইয়ার ক্ষমতায় গ্রহণ লেগে যায়
এবং উমাইয়া সালতানাত দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু
হানিফা রহ.-এর দরসের মসনদের জ্যোতি বিকিরণে কোনো পার্থক্য আসেনি। তিনি টানা
ত্রিশ বছর পর্যন্ত দরসে ফিকহ, নতুন মাসআলাসমূহের উদ্ভাবন এবং সঙ্গীদের নিয়ে সেই
মহান কাজ করেছেন যা হানাফি ফিকহের ভিত্তি তৈরি করেছে। এই ফিকহি কাজের ওপর
আমরা আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের যুগে আলোকপাত করব। এখানে ইমাম সাহেব রহ.-
এর সেই কীর্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে যার সম্পর্ক উসুলুদ্দীন এবং আকিদার সাথে।

উসুলুদ্দীন এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর খিদমতসমূহ:

যেমনটি বলা হয়েছে যে, আকিদা ও মতাদর্শের ব্যাপারে জমহুর উম্মতের মাযহাব নির্ধারিত
ছিল এবং ইমাম ও ফকিহগণ নিজ নিজ বলয়ে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের সাথে সেগুলোর
ব্যখ্যা করতেন, তবে সেগুলোকে এখন পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ রূপে পেশ করা হয়নি।
ইমাম সাহেব রহ. সর্বপ্রথম ‘আল-ফিকহুল আকবার’-এ উম্মতের সাওয়াদে আযমের
নির্ধারিত ও সর্বসম্মত আকিদাসমূহ সংকলন করেন। সেই যুগে আকিদা, আমল এবং
আহকাম সবকিছুর ওপরই ফিকহ শব্দটির প্রয়োগ হতো, তবে এর মধ্যে আকিদার অংশকে
‘আল-ফিকহুল আকবার’ বলা হতো। এই রচনার নামকরণের কারণ এটাই; কেননা এতে
আকিদার বর্ণনা ছিল। [৪]

‘আল-ফিকহুল আকবার’ এবং একইভাবে ইমাম সাহেব থেকে বর্ণিত ‘আল-ফিকহুল
আবসাত’ মূলত সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর যা বিভ্রান্ত দলগুলোর নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের
কারণে সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থাপিত হচ্ছিল।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল ঈমান কাকে বলে? ঈমানের সংজ্ঞা কী? এই
প্রশ্ন থেকে আরও অনেক প্রশ্ন জন্ম নিত, যেমন ঈমান ও কুফরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য
কী? গুনাহের প্রভাব ঈমানের ওপর কী পড়ে? এর ফলে কি মানুষ ঈমান থেকে বের হয়ে
যায় কি না? যদি না হয়, তবে কি ফাসিক ও ফাজির শাসকদের ইমামতিতে জুমার নামাজ,
দুই ঈদের নামাজ এবং জিহাদ সঠিক...

[১] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, পৃ. ২৫

[২] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, পৃ. ৭৬

[৩] মুহাদারাতুল উদাবা, রাগেব আসফাহানি, ১ পৃ. ৬১৫, ত. শারিকাহ দারুল আরকাম বৈরুত

[৪] আল-ফিকহুল আকবার-এর কিছু অংশকে আধুনিক যুগের কিছু গবেষক পরবর্তী সংযোজন বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো ‘আল-ফিকহুল
আকবার’-এর অধিকাংশ বিষয়বস্তুর সমর্থন ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত ইলমে আকিদার অন্যান্য বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। যেমন ইমাম সাহেব থেকে
আবু মুতি বলখি রহ.-এর বর্ণিত ‘আল-ফিকহুল আবসাত’ এবং একইভাবে ইমাম তহাবি রহ.-এর ‘আল-আকিদাতুত তহাবিয়াহ’ যাতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ‘আল-ফিকহুল আকবার’-এর সম্বন্ধ ইমাম আবু
হানিফা রহ.-এর দিকে হওয়া একেবারেই সঠিক। এছাড়া এখানে আমরা সেই সর্বসম্মত বর্ণনাগুলোই উদ্ধৃত করছি যা অন্যান্য উৎসেও বিদ্যমান রয়েছে।

হবে? তাকদির সম্পর্কে সঠিক অবস্থান কী? মানুষ কি বাধ্য নাকি ইচ্ছাশক্তির অধিকারী? এই প্রশ্নগুলো এমন ছিল যা কেবল খারিজি, মুতাজিলা এবং মুরজিয়াদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং এগুলোর সম্পর্ক ছিল পুরো ইসলামি সমাজের অধিকারের সাথে; কারণ কাউকে ঈমান থেকে বহির্ভূত মনে করার ক্ষেত্রে তার অধিকারের মানদণ্ডও বদলে যেত এবং যদি এই বিষয়টি সামষ্টিকভাবে প্রয়োগ করা হতো তবে পুরো সমাজের প্রকৃতিই বদলে যেত।

ইমাম সাহেব (রহ.) এই বিতর্কগুলোর জবাবে সওয়াবে আজমের মাযহাব এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাসের নাম।” [১]

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যেসব বিষয়ের স্বীকৃতি ও বিশ্বাস জরুরি সেগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, মৃত্যুর পরের জীবন, ভালো-মন্দের তাকদির আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়া, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ, আমল ওজন করা এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করেন।

এরপর আল্লাহর একত্ববাদ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি একক, অদ্বিতীয় ও লা-শারিক, তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান থেকে পবিত্র, তাঁর সদৃশ কেউ নেই, তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সহকারে অনাদি ও অনন্ত। [২]

আল্লাহর কালাম, দেখা এবং শোনার গুণাবলি বর্ণনায় তিনি স্পষ্ট করেন যে, তাঁর শোনা, দেখা এবং কথা বলা আমাদের মতো নয় বরং তা তাঁর শানের উপযোগী। [৩]

হুজুর আকরাম (সা.) সম্পর্কে ইসলামি আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে আশ্বিয়ায়ে কেরামের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন:

“তিনি আল্লাহর হাবিব, বান্দা ও রাসূল, তাঁর মনোনীত, পবিত্র ও মুত্তাকি, যিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি, চোখের পলক ফেলার সমপরিমাণ সময়ও কখনো শিরক করেননি। কখনো কোনো ছোট বা বড় গুনাহে লিপ্ত হননি।” [৪]

একইভাবে অন্যান্য আশ্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে তিনি বলেন:

“সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম সগিরা ও কবির গুনাহ থেকে পবিত্র।” [৫]

ঈমান, ইসলাম এবং দ্বীনের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

“ইসলাম হলো নিজেকে সাঁপে দেওয়া এবং আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার নাম। শাব্দিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু অস্তিত্বের দিক থেকে ঈমান ছাড়া ইসলাম হতে পারে না, আবার ইসলাম ছাড়াও ঈমান হতে পারে না। এই দুটি একই জিনিসের দুটি দিকের মতো। দ্বীন শব্দটি ইসলাম, ঈমান এবং শরয়ি বিধানের সমষ্টির ওপর প্রয়োগ হয়।” [৬]

[১] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৫৫, ত. মাকতাবাতুল ফুরকান, আমিরাত।

[২] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ২৬।

[৩] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৩৭।

[৪] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৫ থেকে ২০।

[৫] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৫৭।

[৬] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৩৯।

প্রশ্ন হলো, কোনো গুনাহগারকে কি কাফির বলা হবে যেমনটি খারিজিরা বলে থাকে? এ বিষয়ে ইমাম সাহেব বলেন:

“আমরা কোনো মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির সাব্যস্ত করি না, যদিও সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। শর্ত হলো সে যেন গুনাহকে হালাল মনে না করে। আমরা তার থেকে ঈমানের উপাধি ছিনিয়ে নিই না, বরং তাকে প্রকৃত মুমিন মনে করি। আমাদের নিকট এটা সম্ভব যে, একজন ব্যক্তি মুমিন ও ফাসিক হতে পারে, কিন্তু কাফির নয়।” [১]

গুনাহগার মুসলিমের পরকালীন পরিণাম সম্পর্কে তিনি পথভ্রষ্ট দলগুলোর বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ভিত্তিক মতামতের খণ্ডন করে জমহুর উন্মতের মাযহাব এভাবে বর্ণনা করেন:

“আমরা এটা বলি না যে, মুমিনের জন্য গুনাহ ক্ষতিকর নয়, আর আমরা এটাও বলি না যে, গুনাহগার মুমিন জাহান্নামে যাবে না। আবার আমরা এরও প্রবক্তা নই যে, সে যদি ফাসিক হয় তবে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।” [২]

তিনি আরও বলেন:

“আমরা মুরজিয়াদের মতো এটাও বলি না যে, আমাদের নেক আমলগুলো কবুল হয়ে যাবে এবং আমাদের গুনাহ অবশ্যই মাফ করে দেওয়া হবে।” [৩]

এর পাশাপাশি নাজাতের শর্তাবলি উল্লেখ করে তিনি কথাটি এভাবে পূর্ণ করেন:

“বরং আমরা বলি যে, যে ব্যক্তি সমস্ত শর্তাবলি মেনে নেক আমল করবে যা আমল নষ্টকারী ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত হবে, অতঃপর কুফর, ইরতিদাদ এবং মন্দ আচরণের মাধ্যমে তা নষ্ট করবে না, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ সেই আমল নষ্ট করবেন না বরং তা কবুল করবেন এবং তার ওপর আজ্র ও সওয়াব দান করবেন।” [৪]

তিনি স্পষ্ট করেন যে, গুনাহগার মুমিনদের ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহর ইখতিয়ারে। তিনি বলেন:

“শিরক ও কুফর ব্যতীত অন্য গুনাহে লিপ্ত কোনো মুসলিম যদি তওবা না করে ঈমানি অবস্থায় মারা যায়, তবে সে আল্লাহর নিকট মুমিন হিসেবেই গণ্য হবে। তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে তাকে জাহান্নামের আজাব দিতে পারেন, আর চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং একেবারেই আজাব না দিতে পারেন।” [৫]

তাকদির সম্পর্কে তিনি লেখেন:

“আল্লাহ অনাদিকাল থেকেই বস্তুসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেই সেগুলো সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি সেগুলোর তাকদির নির্ধারণ করেছেন ও ফয়সালা করে দিয়েছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর কাজা ও কদরের অনুযায়ী এবং তাঁর নিকট লাওহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে।” [৬]

সমাজে একটি বড় প্রশ্ন ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে যে, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? কার মর্যাদা কার চেয়ে কম বা বেশি ছিল? তাঁদের সবার খিলাফত কি সঠিক ছিল নাকি এক-দুজনের? কেউ কেউ তিন খলিফাকে...

[১] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৩

[২] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৫

[৩] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৭

[৪] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৭

[৫] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৯

[৬] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ২৯

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

তাদেরকে খলিফা হিসেবে মান্যকারীদের ঈমান সঠিক কি না, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

এটি কোনো গৌণ বিতর্ক ছিল না, বরং এর প্রভাব সরাসরি আকিদার ওপর ছিল; কারণ এর ফলে এই প্রশ্ন দেখা দিত যে, ইসলামি আকিদায় খলিফা ও খেলাফতের কোনো গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে কি না? আর যদি থাকে, তবে খলিফা নিয়োগের সাংবিধানিক ও শরয়ি পদ্ধতি কি সেটাই, যার মাধ্যমে এই ব্যক্তিবর্গ খেলাফতের আসনে আসীন হয়েছিলেন? এই বিষয়গুলো অস্পষ্ট থাকার ফলে কেবল খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বহু সামষ্টিক সিদ্ধান্ত ও ফতোয়ার মর্যাদাই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ত না, বরং ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক উৎস কুরআন মাজীদেবিশুদ্ধতার ওপরও প্রশ্ন আসত, যা এই ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানেই সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছিল; এবং সরকারিভাবে এর পাণ্ডুলিপিগুলো পুরো মুসলিম বিশ্বে প্রচার করা হয়েছিল।

ইমাম সাহেব (রহ.) এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব এভাবে পেশ করেছেন:

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, তারপর উমর বিন আল-খাত্তাব, তারপর উসমান বিন আফফান, তারপর আলী ইবনে আবি তালিব (রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাসিন)। আল্লাহ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তারা ইবাদতগুজার ও সত্যপন্থী ছিলেন এবং সত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। আমরা তাদের সবাইকে ভালোবাসি।” [১]

একইভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, যাদের অধিকাংশকে রাফেযিরা এই কারণে পথভ্রষ্ট ও ইসলামের বহির্ভূত বলত যে, তারা হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপস্থিতিতে খুলাফায়ে সালাসার বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। এই বিতর্কও কেবল ঐতিহাসিক ছিল না, বরং এর কারণে সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে বর্ণিত পুরো দ্বীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ত। ইমাম সাহেব (রহ.) এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে স্পষ্ট করেছেন:

“আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের কেবল কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি।” [২]

‘আল-ফিকহুল আবসাত’-এ একটি প্রশ্নের উত্তরে ইমাম সাহেব (রহ.) বলেন:

“সাহাবীদের কারো প্রতি বিরাগ প্রকাশ করো না, একজনকে ছেড়ে অন্যজনের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করো না।” [৩]

রাফেযিরা প্রচার করত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কেবল একজন কন্যা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), বাকি কন্যারা হযরত খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পূর্ববর্তী স্বামীদের সন্তান ছিলেন। ইমাম সাহেব (রহ.) এ বিষয়েও প্রকৃত অবস্থা আকিদার অধীনে বর্ণনা করেছেন; কারণ রাফেযিরা এই ঐতিহাসিক ভুল তথ্যকে ইমামতের আকিদা প্রচারের জন্য ব্যবহার করত। ইমাম সাহেব (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন:

“ফাতিমা, যয়নব, রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহুনা)—এরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ছিলেন।” [৪]

জাহমিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা জাহম বিন সাফওয়ানের আকিদার ওপর ইমাম সাহেব (রহ.) প্রকাশ্যে তার কুফরের ফতোয়া দিয়েছিলেন। [৫] আপনি এই...

[১] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪১

[২] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৪৩

[৩] আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৭৮, ৮২

[৪] আল-ফিকহুল আকবার, পৃ. ৭০

[৫] ঈযাহদ দালীল ফী কাতয়ি হুজাজি আহলিত তা’তীল লি-বদরুদ্দীন আল-কিনানী, পৃ. ৩৫; তারীখে বাগদাদ: ১৩/২৭৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ফিরকার আকিদা খণ্ডন করে তিনি বলতেন:

“আল্লাহ সৃষ্টির কাউকে কুফরের ওপর বাধ্য করেননি এবং ঈমানের ওপরও না, কাউকে মুমিন বানাননি এবং কাফিরও না। তাদের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন; ঈমান আনা এবং কুফর করা বান্দাদের কাজ।” [১]

জাহম বিন সাফওয়ান জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন না। ইমাম সাহেব রহ. এ বিষয়ে সঠিক আকিদা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“জান্নাত ও জাহান্নাম কখনো ধ্বংস হবে না।” [২]

খাওয়ারিজ ও মুতাজিলাদের মতে ফাসিক ব্যক্তির ইমামত ও খিলাফত, তার পেছনে সালাত এবং তার নেতৃত্বে জিহাদ কোনোটিই জায়েজ ছিল না, বরং এমন শাসকদের বিরুদ্ধে খুরুজ করা জরুরি ছিল। ইমাম আবু হানিফা রহ. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ বিষয়ে সওয়াদে আজমের মাযহাব এভাবে পেশ করেছেন:

“প্রত্যেক নেককার ও বদকার কালিমা পাঠকারীর পেছনে সালাত জায়েজ।” [৩]

এর অর্থ হলো ফাসিক ইমাম ও শাসকদের ইমামত ও শাসন যদিও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য ও প্রশংসনীয় নয়, তবে বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে একে একটি জাগতিক বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। এমন শাসকদের ইত্তাদায় সালাতও জায়েজ হবে এবং একইভাবে তাদের শাসনও। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং জমহুর ফুকাহাদের মাযহাব ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে খুরুজের অবৈধতার ওপর অটল রয়েছে। ‘আল-ফিকহুল আবসাত’-এ এর আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর সংকলক ইমাম সাহেব রহ.-এর ছাত্র আবু মুতি বলখি রহ., যিনি এতে ইমাম সাহেব রহ.-এর কাছ থেকে সরাসরি শোনা আকিদাগত মাসায়েলগুলো একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন:

আমি (ইমাম সাহেব রহ.-কে) জিজ্ঞাসা করলাম:

“আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। মানুষ তার চারপাশে একত্রিত হয় এবং এরপর সে সরকারের বিরুদ্ধে খুরুজ করে। আপনি কি একে জায়েজ মনে করেন?”

তিনি বললেন: “না।”

আমি বললাম: “কেন? আল্লাহ তো সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে বলেছেন এবং এটি একটি আবশ্যকীয় ফরিজা।”

তিনি বললেন: “কথাটি এমনই, তবে এমনটি করলে সংশোধনের পরিবর্তে ফাসাদ বৃদ্ধি পায়, রক্তপাত, মানহানি এবং লুটতরাজ ব্যাপক হয়ে যায়।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আমরা কি বিদ্রোহীদের সাথে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করব?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ! সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো, যদি তারা মেনে নেয় তবে ভালো, অন্যথায় ফিয়ায়ে আদিল (অর্থাৎ শাসকের অনুগত দল)-এর সাথে হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করো, যদিও শাসক জালিমই কেন না হোক।” [৪]

[১] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৩৩

[২] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৬৩

[৩] আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ৪৫

[৪] আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ১০৮

রাজনৈতিক বিষয়ে ইমাম সাহেব (রহ.)-এর গভীর দৃষ্টি এবং শরয়ি দলিলের ওপর তাঁর প্রজ্ঞার প্রমাণ সেই ঘটনা থেকেও পাওয়া যায়, যা উমাইয়া শাসনের শেষ দিনগুলোতে ঘটেছিল। এই সময়ে খারেজিদের জোর কমে আসছিল। তাদের একটি ছোট দল অবশিষ্ট ছিল যারা সরকারের সাথে এই শর্তে সন্ধি করতে চেয়েছিল যে, তাদের পূর্বের সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হোক। কুফার গভর্নর ইবনে হুবায়রা এ বিষয়ে ফকিহদের পরামর্শ চাইলেন।

কাজী ইবনে শুবরুমা (রহ.) বললেন: “তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি জায়েজ নয়; কেন তাদের আরও জান-মালের ক্ষতির সুযোগ করে দেওয়া হবে?”

কাজী ইবনে আবি লায়লা (রহ.) এর বিপরীতে বললেন: “তাদের সাথে সব অবস্থাতেই সন্ধি জায়েজ।”

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উভয় মতকেই ভুল আখ্যা দিয়ে বললেন: “খারেজিরা ফিতনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করার আগে যে জান-মালের ক্ষতি করেছে, তার কি বিচার করা হবে? তার ক্ষমার শর্তে সন্ধি জায়েজ হবে না। তবে বিদ্রোহ ও গোলযোগের অবস্থায় যে জান-মালের ক্ষতি হয়েছে, তার কোনো জরিমানা হবে না, তার ক্ষমার শর্তে সন্ধি জায়েজ।”

ইবনে হুবায়রা এই ফতোয়াকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে লিপিবদ্ধ করালেন। [১]

সংক্ষেপে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিভিন্ন ফেরকার আকিদা ও মতবাদের উপস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী অবস্থান পেশ করেছেন যা কেবল চরমপন্থা ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিল না বরং দল-উপদল ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষারও নিশ্চয়তা ছিল। এটি সমাজকে মন্দ ও পাপাচার থেকে সাহসের সাথে রুখে দিয়ে একটি আদর্শ রূপ দেওয়ারও মাধ্যম ছিল। [২]

‘সওয়াদে আজম’-এর আকিদা ও মতবাদ সম্বলিত এই দলিল পেশ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এটি প্রমাণ করেছেন যে, মুসলিম উম্মাহ অসংখ্য আকিদাগত ফিতনার উপস্থিতিতেও আজও সেই দ্বীনের ওপরই বিশ্বাস রাখে যা রাসূল (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। সোয়া একশ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা মুনাওয়ারার সেই সমাজের ওপরই পূর্ণ আস্থা রাখে যা রাসূল (সা.) কয়েম করেছিলেন এবং যাকে সাহাবায়ে কেরাম লালন-পালন করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর পর প্রথম সারির সেই চার সাহাবী যাদের হাতে একে একে উম্মতের নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছিল, উম্মত নিঃসন্দেহে তাঁদেরকে সত্যের ওপর মনে করে এবং তাঁদের অনুসরণকারী সাহাবী ও তাবয়ীদের ওপরও আস্থা রাখে। এই ব্যক্তিবর্গ ইবাদত ও রাজনৈতিক বিষয়ে ঐকমত্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে যে ফয়সালাগুলো করেছেন তা সবই সঠিক ছিল। এভাবে দ্বীনের সেই সমস্ত জ্ঞান যা সেই সমাজের ব্যক্তিদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে, উম্মত তা সানন্দে গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার নয়।

[১] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ: ১/৪৮।

[২] ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে এই ধারণা যে, তিনি ফাসেক ও জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে আলবীদের আন্দোলনের সাথে কার্যত সহযোগিতা করেছিলেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ কিন্তু গবেষণার পরিপন্থী বিষয়। আমরা তৃতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে এই বিষয়ের হাকিকত স্পষ্ট করব।

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

বনু মারওয়ান যুগ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির এক বালক

৭৩ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি

৬৯২ খ্রি. থেকে ৭৫০ খ্রি.

প্রথম হিজরি শতাব্দী

৭৩ হিজরি ৬৯২ খ্রি. ৬৯৩ খ্রি.

- আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খিলাফতের সূচনা ১৭ জুমাদাল উলা (১৬ অক্টোবর ৬৯২ খ্রি.)
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হিজাজের গভর্নর নিযুক্ত
- হাজ্জাজের নির্দেশে কাবার পুনর্নির্মাণ জিলহজ (মে ৬৯৩ খ্রি.)
- খারেজি আবু ফুদাইকের হত্যা

৭৪ হিজরি ৬৯৩ খ্রি.

- আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল ১লা মহররম (১২ মে ৬৯৩ খ্রি.)
- আফ্রিকায় হাসান বিন নুমানের নিয়োগ এবং নতুন বিজয়ের সূচনা
- খুরাসানে রতবিলের বিদ্রোহ
- উহদ যুদ্ধের জখমের কারণে রাফে বিন খাদিজ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত
- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল (জুলাই ৬৯৩ খ্রি.)
- হযরত সালামা বিন আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল রবিউস সানি (আগস্ট ৬৯৩ খ্রি.)

৭৫ হিজরি ৬৯৪ খ্রি. ৬৯৫ খ্রি.

- হযরত ইরবায় বিন সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল শাবান (নভেম্বর ৬৯৪ খ্রি.)
- ইরাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিয়োগ রমজান (ডিসেম্বর ৬৯৪ খ্রি.)
- মুহাম্মদ বিন মারওয়ানের রোমান সীমান্তে জিহাদ
- সিলি বিন আশয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু সিজিস্তানের জিহাদে শহীদ
- ইসলামি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টাকশাল স্থাপন, মুদ্রা তৈরি
- কুফার ইমারতে হাজ্জাজের নিয়োগ জিলহজ (এপ্রিল ৬৯৫ খ্রি.)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

৭৬ হিজরি ৬৯৫ খ্রি.

- মুহাম্মদ বিন মারওয়ানের মালাতিয়া আক্রমণ
- প্রথম ইসলামি মুদ্রা প্রচলন
- ইরাকে খারিজিদের বিদ্রোহ রবিউল আউয়াল (জুলাই ৬৯৫ খ্রি.)
- শাবিব খারিজির সাথে যুদ্ধ - শাবিব কুফায় প্রবেশ করেন জমাদিউল আখিরা (অক্টোবর ৬৯৫ খ্রি.)

৭৭ হিজরি ৬৯৬ খ্রি.

- শাবিব খারিজির মৃত্যু
- ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের রোমান সীমান্ত মাসিসা আক্রমণ জমাদিউল উলা (আগস্ট ৬৯৬ খ্রি.)

৭৮ হিজরি ৬৯৭ খ্রি.

- মুহাম্মদ বিন আবি ফখরের এশিয়া মাইনরের ‘আজকাল’ দখল
- মুসা বিন নুসাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান
- জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল
- কাজী শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল, বয়স ১০০ বছর রবিউল আউয়াল (মে ৬৯৭ খ্রি.)

৭৯ হিজরি ৬৯৮ খ্রি.

- খারিজি নেতা কাতারি বিন ফুজাআ নিহত রজব (সেপ্টেম্বর ৬৯৮ খ্রি.)
- সিরিয়ায় প্লেগ মহামারি শাওয়াল (ডিসেম্বর ৬৯৮ খ্রি.)
- হাসান বিন নুমানের বিজয় সম্পন্ন - আফ্রিকান রানীর মৃত্যু

- ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মালাতিয়া রণাঙ্গনে

৮০ হিজরি ৬৯৯ খ্রি.

- আব্দুর রহমান বিন আশআসের খোরাসানে নিয়োগ
- মক্কায় বন্যা, আব্দুল মালিকের নির্দেশে প্রতিরক্ষামূলক বাঁধ নির্মাণ
- জুনাদা বিন আবি উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল
- আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল রবিউল আখির (জুন ৬৯৯ খ্রি.)
- আফ্রিকার আমির হাসান বিন নুমানের ইন্তেকাল
- ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম জমাদিউল আখিরা (আগস্ট ৬৯৯ খ্রি.)

৮১ হিজরি ৭০০-৭০১ খ্রি.

- আব্দুর রহমান বিন আশআসের হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
- মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রহ.-এর মৃত্যু মহররম (মার্চ ৭০০ খ্রি.)
- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মুক্তদাস ইকরিমাহ-এর মৃত্যু জুমাদাল আখিরাহ (জুলাই ৭০০ খ্রি.)
- ইবনে আশআসের বসরা দখল ১০ জিলহজ (২৪ জানুয়ারি ৭০১ খ্রি.)

৮২ হিজরি ৭০১-৭০২ খ্রি.

- বসরার নিকটবর্তী জাবিয়াতে ইবনে আশআস এবং সরকারি বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ মহররমের শুরু (ফেব্রুয়ারি ৭০১ খ্রি.)
- বসরার নিকটবর্তী জুহরুল মিরবাদে ইবনে আশআস এবং সরকারি বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সফরের শুরু (মার্চ ৭০১ খ্রি.)
- খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যু, ইসলামি ইতিহাসের প্রথম রসায়নবিদ
- মুহাম্মাব বিন আবি সুফরার মৃত্যু, বয়স ৭৫ বছর জিলহজ (জানুয়ারি ৭০২ খ্রি.)
- সিসিলিতে (সিকিলিয়া) মুসলমানদের আক্রমণ

৮৩ হিজরি ৭০২ খ্রি.

- ওয়াসিত শহর নির্মাণ রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ৭০২ খ্রি.)
- কুফার নিকটবর্তী দাইরুল জামাজিমে হাজ্জাজ এবং ইবনে আশআসের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা রবিউস সানি (মে ৭০২ খ্রি.)
- দাইরুল জামাজিমে ইবনে আশআসের পরাজয় ১৪ জুমাদাল আখিরাহ (১৪ জুলাই ৭০২ খ্রি.)
- বসরার নিকটবর্তী দুজাইলে ইবনে আশআসের নতুন ব্যুহ রচনা এবং পরাজয় শাবান (সেপ্টেম্বর ৭০২ খ্রি.)

৮৪ হিজরি ৭০৩ খ্রি.

- মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর হাতে মরক্কো বিজয়
- উমাইয়া আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালিকের হাতে মাসিসাহ বিজয় রজব (জুলাই ৭০৩ খ্রি.)

৮৫ হিজরি ৭০৪ খ্রি.

- ইসলামি ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ ইমাম হযরত আমর বিন সালামাহ রা.-এর মৃত্যু
- রতবিলের হাতে আব্দুর রহমান বিন আশআসের হত্যাকাণ্ড
- নতুন শহর আরদাবিল নির্মাণ জুমাদাল উলা (মে ৭০৪ খ্রি.)
- আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ানের মৃত্যু জুমাদাল উলা (মে ৭০৪ খ্রি.)
- আব্দুল মালিকের পুত্রদের: ওয়ালিদ এবং সুলাইমানের উত্তরাধিকার ঘোষণা
- কুতাইবা বিন মুসলিমের খোরাসানে নিয়োগ

৮৬ হিজরী ৭০৫ খ্রি.

- হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা.)-এর ইন্তেকাল সফর (ফেব্রুয়ারি ৭০৫ খ্রি.)
- আরজানুর রুম বিজয় জুমাদাল উলা (এপ্রিল ৭০৫ খ্রি.)
- আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের ইন্তেকাল ১৫ শাওয়াল (২০ অক্টোবর ৭০৫ খ্রি.)
- ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের খিলাফতের সূচনা ১৫ শাওয়াল (২০ অক্টোবর ৭০৫ খ্রি.)
- আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রা.)-এর ইন্তেকাল, কুফায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী জিলকদ (অক্টোবর ৭০৫ খ্রি.)

৮৭ হিজরী ৭০৫-৭০৬ খ্রি.

- মদিনা মুনাওয়ারায় গভর্নর হিসেবে উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর নিয়োগ জুমাদাল উলা (এপ্রিল ৭০৬ খ্রি.)
- দামেস্কের জামে উমাবীর নির্মাণ কাজ শুরু রজব (জুন ৭০৬ খ্রি.)

• কুতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক বায়কান্দ দখল

৮৮ হিজরী ৭০৬-৭০৭ খ্রি.

- মধ্য এশিয়ায় চীনের খাকান এবং কুতাইবা বিন মুসলিমের যুদ্ধ
- মুসলিম বিশ্বের মহাসড়কগুলোতে মাইলফলক স্থাপন
- মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজের সূচনা, উম্মাহাতুল মুমিনীনদের হজরাসমূহ ভেঙে ফেলা
- সিরিয়ার সর্বশেষ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন বুসর মাযিনী (রা.)-এর ইন্তেকাল
- ফারগানা ও সগদ বিজয়

৮৯ হিজরী ৭০৭-৭০৮ খ্রি.

• বুখারায় কুতাইবার প্রথম আক্রমণ

৯০ হিজরী ৭০৮-৭০৯ খ্রি.

- কুতাইবা বিন মুসলিমের হাতে বুখারা বিজয়
- তালকান বিজয় জুমাদাল উলা (মার্চ ৭০৯ খ্রি.)

৯১ হিজরী ৭০৯-৭১০ খ্রি.

- কুতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক ফারিয়াব, বলখ, বাদগিস, সামানগান এবং খুলম দখল
- মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ সম্পন্ন
- মদিনা মুনাওয়ারার সর্বশেষ আনসারী সাহাবী সাহল বিন সাদ (রা.)-এর ইন্তেকাল
- হাসান বিন হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর ইন্তেকাল

৯২ হিজরী ৭১০-৭১১ খ্রিষ্টাব্দ

- মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধুতে আগমন জমাদিউল আখিরা (মার্চ ৭১১ খ্রি.)
- তারিক বিন যিয়াদের নৌবহর আন্দালুসে নোঙর ফেলে ৫ রজব (২৮ এপ্রিল ৭১১ খ্রি.)
- সিন্ধুর চূড়ান্ত যুদ্ধ - রাজা দাহির নিহত ১০ রমজান (১ জুলাই ৭১১ খ্রি.)
- আন্দালুসের রাজা রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ৫ শাওয়াল (২৬ জুলাই ৭১১ খ্রি.)
- জামে উমাবী দামেস্কের নির্মাণ সম্পন্ন

৯৩ হিজরী ৭১১-৭১২ খ্রিষ্টাব্দ

- কুতাইবা বিন মুসলিমের খোয়ারিজম ও সমরকন্দ দখল
- আন্দালুসের রাজধানী তলেদোর (তলাইতলা) ওপর দখল রবিউল আখির (জানুয়ারি ৭১২ খ্রি.)
- হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর ইন্তেকাল শাবান (মে ৭১২ খ্রি.)

৯৪ হিজরী ৭১২-৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ

- কুতাইবা বিন মুসলিমের হাতে তাশখন্দ, ফারগানা ও কাশগরের সীমান্ত বিজয়, ইসলামী সীমান্ত চীন পর্যন্ত বিস্তৃত
- হযরত উরওয়াহ বিন যুবাইর (রা.)-এর ইন্তেকাল সফর (নভেম্বর ৭১২ খ্রি.)
- হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রা.)-এর ইন্তেকাল জমাদিউল আখিরা (মার্চ ৭১৩ খ্রি.)
- হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর ইন্তেকাল শাওয়াল (জুন ৭১৩ খ্রি.)

৯৫ হিজরী ৭১৩-৭১৪ খ্রিষ্টাব্দ

- সাঈদ বিন জুবাইর (রা.)-এর শাহাদাত শাবান (এপ্রিল ৭১৪ খ্রি.)
- হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ইন্তেকাল ২৫ রমজান (১৫ জুন ৭১৪ খ্রি.)
- ইব্রাহিম নাখয়ী (রা.)-এর ইন্তেকাল

৯৬ হিজরী ৭১৪-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ

- ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল ১৫ রবিউল আউয়াল (৯ ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রি.)
- সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের খিলাফতের সূচনা ১৫ রবিউল আউয়াল (৯ ডিসেম্বর ৭১৪ খ্রি.)
- কুতাইবা বিন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড যিলহজ (আগস্ট ৭১৫ খ্রি.)

৯৭ হিজরী ৭১৫-৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ

- মুসা বিন নুসাইর (রা.)-এর ইন্তেকাল যিলকদ (জুন ৭১৬ খ্রি.)

৯৮ হিজরি ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ

- মুহাম্মদ বিন কাসিমের হত্যা
- আবদুল্লাহ বিন হাশিমের ইন্তেকাল, বনু হাশিমের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা
- সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের দাবিক-এ অবস্থান এবং মাসলামার কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ

৯৯ হিজরি ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ

- সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু ২০ সফর (১৩ অক্টোবর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর খিলাফতের সূচনা ২০ সফর (১৩ অক্টোবর ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

১০০ হিজরি ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বিশ্বের শেষ সাহাবী আবু তুফাইল আমির বিন ওয়াসিলা রা.-এর মক্কায় ইন্তেকাল
- মুসলিম বিন ইয়াসার রহ.-এর ইন্তেকাল; মহান তাবিঈ, ইবাদতকারী ও পরহেজগার
- রিবঈ বিন হিরাশ রহ.-এর ইন্তেকাল; মহান তাবিঈ, হাদিস বর্ণনাকারী

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী

১০১ হিজরি ৭১৯ খ্রি. - ৭২০ খ্রি.

- উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর ইন্তেকাল ২০ রজব (১৬ ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রি.)
- দ্বিতীয় ইয়াজিদের খিলাফতের সূচনা ২০ রজব (১৬ ফেব্রুয়ারি ৭২০ খ্রি.)

১০২ হিজরি ৭২০ খ্রি.

- ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের হত্যাকাণ্ড
- আফ্রিকার গভর্নর ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমের হত্যাকাণ্ড
- মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসী হাশেমি খিলাফতের জন্য আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন

১০৩ হিজরি ৭২১ খ্রি.

- ইয়াজিদ বিন আসম রহ.-এর ইন্তেকাল, উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রা.-এর ভাগ্নে
- আতা বিন ইয়াসার রহ.-এর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল (আগস্ট ৭২১ খ্রি.)
- মধ্য এশিয়ার বিদ্রোহ দমন

১০৪ হিজরি ৭২২ খ্রি. - ৭২৩ খ্রি.

- ফ্রান্সে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা
- ইমাম শাবী রহ.-এর ইন্তেকাল জুমাদাল আখিরা (নভেম্বর ৭২২ খ্রি.)
- আবু বুরদাহ রহ. বিন আবু মুসা আশআরী রা.-এর ইন্তেকাল জিলহজ (মে ৭২৩ খ্রি.)

১০৫ হিজরি ৭২৩ খ্রি. - ৭২৪ খ্রি.

- কবি ফারাযদাকের ইন্তেকাল সফর (জুলাই ৭২৩ খ্রি.)
- ফাতিমা বিনতে হুসাইন রা.-এর ইন্তেকাল রবিউস সানি (সেপ্টেম্বর ৭২৩ খ্রি.)
- দ্বিতীয় ইয়াজিদের ইন্তেকাল ২৫ শাবান (৭ ফেব্রুয়ারি ৭২৪ খ্রি.)
- হিশাম বিন আব্দুল মালিকের খিলাফতের সূচনা ২৫ শাবান (৭ ফেব্রুয়ারি ৭২৪ খ্রি.)

১০৬ হিজরি..... ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ

- আরমিনিয়ায় জরাহ বিন আবদুল্লাহর বিজয়সমূহ..... মহররম (মে ৭২৪ খ্রি.)
- ইরাকে খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাসরির নিয়োগ
- মদিনার ফকিহ সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর (রহ.)-এর ইন্তেকাল
- তাউস বিন কায়সান (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... রবিউস সানি (আগস্ট ৭২৪ খ্রি.)

১০৭ হিজরি..... ৭২৫-৭২৬ খ্রিষ্টাব্দ

- সিন্ধুতে জুনাইদ বিন আবদুর রহমানের বিজয়সমূহ
- আসাদ বিন আবদুল্লাহর গরজিস্তান আক্রমণ
- মদিনার সাত ফকিহর অন্যতম সুলাইমান বিন ইয়াসার (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... জিলকদ (মার্চ ৭২৬ খ্রি.)
- হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাতি কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... জিলহজ (এপ্রিল ৭২৬ খ্রি.)

১০৮ হিজরি..... ৭২৬-৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাম তাফসির মুহাম্মদ বিন কাব কুরাজি (রহ.)-এর ইন্তেকাল
- মাসলামা বিন আবদুল মালিকের হাতে কায়সারিয়া বিজয়

১০৯ হিজরি..... ৭২৭-৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ

- আবদুল্লাহ বিন উকবা ফিহরির নৌ জিহাদ
- মুয়াবিয়া বিন হিশামের রোম ভূখণ্ডে জিহাদ, তিবাহ দুর্গ বিজয়
- মাসলামা বিন আবদুল মালিকের আজারবাইজানে বিজয়সমূহ
- আফ্রিকার গভর্নর বিশর বিন সাফওয়ানের সিসিলিতে অভিযান এবং কায়রোয়ানে ফেরার পথে ইন্তেকাল

১১০ হিজরি..... ৭২৮-৭২৯ খ্রিষ্টাব্দ

- মাসলামা বিন আবদুল মালিকের তিবলিস অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা, গাজওয়াতুত ত্বীন-এ বিজয়..... ২৩ জমাদিউল আখিরা (২/৩ অক্টোবর ৭২৮ খ্রি.)
- হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... রজব (অক্টোবর ৭২৮ খ্রি.)
- ইবনে সিরিন (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... শাওয়াল (ডিসেম্বর ৭২৮ খ্রি.)

১১১ হিজরি..... ৭২৯-৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ

- জুনাইদ বিন আবদুর রহমানের সিন্ধুর শাসনভার থেকে অপসারণ
- মধ্য এশিয়ায় খাকানে চীনের মোকাবিলায় জুনাইদের বিজয়

১১২ হিজরী ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ

- আজারবাইজানে খাকান চীনের পুত্রের বিদ্রোহ
- জাররাহ বিন আব্দুল্লাহর শাহাদাত ২২ রমজান (৭ ডিসেম্বর ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
- মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের জর্জিয়ায় পুনরায় সৈন্য পরিচালনা এবং দরবান্দ গিরিপথে দুর্গের সংস্কার শাওয়াল (ডিসেম্বর ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

১১৩ হিজরী ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দ

- রোমানদের সাথে জিহাদে আব্দুল ওয়াহাব বিন বখত শহীদ
- আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-গাফেকী রহ.-এর আফ্রিকায় জিহাদের সময় শাহাদাত
- হযরত মাকহুল রহ.-এর ইন্তেকাল, সিরিয়ার মুহাদিস জমাদিউল আখিরা (আগস্ট ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দ)
- ওয়াহাব বিন মুনাবিহ রহ.-এর ইন্তেকাল, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিক

১১৪ হিজরী ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ

- আব্দুর রহমান আল-গাফেকীর বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধে শাহাদাত ১৫ শাবান (৯ অক্টোবর)
- মক্কার মুহাদিস আতা বিন আবি রাবাহ রহ.-এর ইন্তেকাল
- মারওয়ান বিন মুহাম্মদের রোমান সীমান্তে আক্রমণ
- মুয়াবিয়া বিন হিশামের অভিযানে রোমান সেনাপতি কনস্টানটাইন বন্দি
- হযরত মুহাম্মদ বাকের বিন জয়নুল আবেদিন রহ.-এর ইন্তেকাল, ইসনা আশারিয়ার পঞ্চম ইমাম

১১৫ হিজরী ৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দ

- সিসিলিতে উবায়দা বিন আব্দুর রহমানের আক্রমণ
- সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী
- খোরাসানে দুর্ভিক্ষ

১১৬ হিজরী ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

- সিসিলিতে উবায়দা বিন আব্দুর রহমানের দ্বিতীয় আক্রমণ
- জুনাইদ বিন আব্দুর রহমানের খোরাসান থেকে অপসারণ ও মৃত্যু
- আন্দালুসে উকবা বিন হাজ্জাজের নিয়োগ ও উন্নয়নমূলক কাজ

১১৭ হিজরী ৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দ

- মুয়াবিয়া বিন হিশাম এবং সুলাইমান বিন হিশাম রোমান ভূখণ্ডে অভিযানে ব্যস্ত
- মারওয়ান বিন মুহাম্মদের আরমেনিয়ায় বিজয়সমূহ

- খুরাসানে বনু আব্বাসের দাঈদের গ্রেফতারি
- ফাতিমা বিনতে হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল
- সুকাইনা বিনতে হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল... ৫ রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ৭৩৫ খ্রি.)
- আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল

১১৮ হিজরি ৭৩৬ খ্রি.

- হুমায়মায় আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল, বয়স ৭৮ বছর
- জর্ডানের কাজী উবাদাহ বিন নিসি রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল

১১৯ হিজরি ৭৩৭ খ্রি.

- আসাদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরির হাতে চীনের খাকানের পরাজয়
- বাহলুল খারেজির আবির্ভাব, গ্রেফতারি ও হত্যা

১২০ হিজরি ৭৩৮ খ্রি.

- আসাদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরির ইন্তেকাল
- খালিদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি পদচ্যুত
- ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিক্ষকতার আসনে আসীন হওয়া ও ফতোয়া প্রদান

১২১ হিজরি ৭৩৮ খ্রি.

- মাসলামা বিন আব্দুল মালিকের ইন্তেকাল
- মা-ওয়ারাউন নাহরে নাসর বিন সাইয়ারের জিহাদি অভিযানসমূহ
- ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ বিন আশাজ রোম ভূখণ্ডে জিহাদে শহীদ

১২২ হিজরি ৭৩৯, ৭৪০ খ্রি.

- সিজিলিয়ায় হাবিব বিন আবি ফাহরার আক্রমণ এবং সিরাকিউস অবরোধ
- য়ায়েদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহার বিদ্রোহ ও শাহাদাতের ঘটনা... সফর (জানুয়ারি ৭৪০ খ্রি.)
- আইয়াস বিন মুয়াবিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল, বসরার কাজী, প্রখর বুদ্ধিমত্তায় প্রবাদতুল্য
- রোম ভূখণ্ডের বিখ্যাত গাজী আব্দুল্লাহ আল-বাত্তালের শাহাদাত

১২৩ হিজরি ৭৪০ খ্রি.

- আফ্রিকায় বারবারদের বিদ্রোহ, উমাইয়াদের পিছু হটা
- আন্দালুসের আমির উকবা বিন হাজ্জাজের ইন্তেকাল

- মালিক বিন দিনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু

১২৩ হিজরী..... ৭৪১-৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ

- আফ্রিকায় উমাইয়া বাহিনীর তিন লক্ষ বারবারদের সাথে যুদ্ধ ও বিজয়
- মদিনার মুহাদিস মুহাম্মদ বিন মুসলিম ইবনে শিহাব জুহরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, বয়স ৭২ বছর..... ১৭ রমজান (১৫ জুন ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ)

১২৫ হিজরী..... ৭৪২-৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ

- হিশাম বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু..... ৬ রবিউস সানি (১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন আলীর মৃত্যু
- ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদের খিলাফতের সূচনা..... ৬ রবিউস সানি (১৮ ফেব্রুয়ারি ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১২৬ হিজরী..... ৭৪৩-৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

- ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদের হত্যাকাণ্ড..... ২৭ জমাদিউল আখিরা (১৭ এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদের খিলাফতের সূচনা..... ২৭ জমাদিউল আখিরা (১৭ এপ্রিল ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদের ইন্তেকাল..... ২০ জিলহজ (৪ অক্টোবর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদের খিলাফতের সূচনা..... ২০ জিলহজ (৪ অক্টোবর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১২৭ হিজরী..... ৭৪৪-৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ

- ইব্রাহিম বিন ওয়ালিদের পদচ্যুতি..... ১৪ সফর (৭ ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- মারওয়ান বিন মুহাম্মদের খিলাফতের সূচনা..... ১৪ সফর (৭ ডিসেম্বর ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১২৮ হিজরী..... ৭৪৫-৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দ

- আলভী দাঈ হারিস বিন সুরাইজের হত্যাকাণ্ড..... ২৮ জমাদিউল আখিরা (মার্চ ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- জাহম বিন সাফওয়ানের গ্রেফতারি ও হত্যাকাণ্ড..... রজব (এপ্রিল ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- খোরাসানে আবু মুসলিম খোরাসানির নিযুক্তি
- ইমামুল কুররা আসিম বিন আবি আল-নাজুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু
- শিয়া বর্ণনাকারী জাবির বিন ইয়াজিদ জু'ফি-এর মৃত্যু

১২৯ হিজরী..... ৭৪৬-৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

- খোরাসানে আবু মুসলিম খোরাসানির প্রকাশ্য দাওয়াত..... রমজান (মে ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- মদিনার মুহাদিস ওয়াহাব বিন কায়সান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু
- ইয়ামামার নির্ভরযোগ্য মুহাদিস ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু

- ইয়াহইয়া বিন ইয়ামুর নাহভী, আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালীর ছাত্রের মৃত্যু

১৩০ হিজরী ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ

- মদীনার নিকট আবু হামজা খারেজী এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ২৩ মহররম (৩ অক্টোবর ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- আবু হামজা খারেজী কর্তৃক মদীনা দখল ১৩ সফর (২২ অক্টোবর ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- আবু হামজা খারেজীর হত্যাকাণ্ড
- আবু মুসলিম খোরাসানী কর্তৃক মার্ব দখল, খোরাসানের শাসক নাসর বিন সাইয়ারের পলায়ন
- ইয়াজিদ বিন কাকা আল-কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবদুল্লাহ বিন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাওলা-এর মৃত্যু

১৩১ হিজরী ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ - ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ

- খোরাসানের গভর্নর নাসর বিন সাইয়ারের মৃত্যু, বয়স ৮৫ বছর ১২ রবিউল আউয়াল (৮ নভেম্বর ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- পারস্য ও ইরাকের বড় অংশের ওপর আব্বাসী দাঈদের দখল

১৩২ হিজরী ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ

- কুফায় সাফফাহর খিলাফত ঘোষণা ১২ রবিউল আউয়াল (২৯ অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)
- জাবের যুদ্ধ, শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের পরাজয় ১১ জমাদিউল আখিরা (১৯ জানুয়ারি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
- উমাইয়া রাজধানী দামেস্কের ওপর আব্বাসীদের দখল রমজান (এপ্রিল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
- মারওয়ান বিন মুহাম্মদের হত্যাকাণ্ড ২৭ জিলহজ (৬ আগস্ট ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
- নহর আবি ফুতরাসে উমাইয়া বংশীয় আমিরদের হত্যাকাণ্ড

বনু মারওয়ানের খিলাফত - শিক্ষা ও উপদেশ

- ১. মুসলমানদের সফলতা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। যে যে যুগে মুসলমানরা এই মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল, তারা সফল ও উন্নত ছিল; যখনই তারা এই মূলনীতি থেকে যেটুকু বিচ্যুত হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তারা পতন ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।
- ২. নববী সাহচর্য এবং সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য এক বিশেষ প্রভাব রাখত; তাই সেই যুগে যেমন মহান ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল, পরবর্তী যুগের মানুষ সেই মাকামে পৌঁছাতে পারে না।
- ৩. প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে জিকির ও ইবাদত, দোয়া ও মুনাজাত, আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা, দ্বীনি আত্মমর্যাদা ও উদ্দীপনা, দানশীলতা এবং উচ্চতর নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত সাধারণ ছিল। এমনকি যাদেরকে সাধারণত নিষ্ঠুর ও নির্দয় মনে করা হতো, তারাও এই গুণাবলি থেকে একেবারে শূন্য ছিলেন না। অথচ বর্তমানে দ্বীনদার লোকেরাও এই গুণাবলি থেকে শূন্য হয়ে পড়ছে। সালাতগুলো প্রাণহীন, অন্তর অনুভূতিহীন এবং চোখগুলো শুষ্ক। সম্ভবত এটিই সেই যুগ যার সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, মুসল্লি ভর্তি মসজিদে খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায়কারী একজনও থাকবে না। [১]
- ৪. হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে উম্মতকে পুনরায় শূরা-ভিত্তিক রাজনীতি এবং খিলাফতে রাশেদার মানে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং এই মহান ব্যক্তিদের বেদনাদায়ক পরিণতির পর বনু উমাইয়াদের শাসন সামরিক শক্তির মাধ্যমে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনে যেমন গুণাবলি ছিল, তেমনি ত্রুটিও ছিল। এর কোনো কোনো শাসক খুব ভালো ছিলেন, কেউ গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং কেউ অযোগ্য ছিলেন। তবে এই দুর্বলতাগুলো রাজনৈতিক পর্যায় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বনু উমাইয়াদের যুগ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এই মতপার্থক্য রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যেই ছিল।

কিন্তু বনু হাশিমের বিপ্লবী আন্দোলনের সময় বনু উমাইয়াদের পরাস্ত করার জন্য এই মতপার্থক্যকে আকিদাগত মতপার্থক্য বানিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হিসেবে সাব্যস্ত করার এবং নেতৃত্বকে সাদাতদের জন্য নির্দিষ্ট করার জন্য জাল রেওয়ায়েত তৈরি করে। আলভী ও আব্বাসী নেতৃবৃন্দ নিজেরা এমন আকিদা পোষণ না করলেও রাজনৈতিক স্বার্থে এই কথাগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে দেন। এই ভুলের কারণে উম্মতের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছড়িয়ে পড়ে তা কেবল রাজনৈতিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ধীরে ধীরে আকিদার বিষয়ে পরিণত হয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সময়ের সাথে সাথে মিটে যায়, কিন্তু আকিদাগত মতপার্থক্য তৈরি হলে তা আর কারো চেষ্টায় মেটে না; ফলে উম্মত আজ পর্যন্ত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে আসছে।

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ২৬৫৩, আবওয়াবুল ইলম, বাব ফি যাহাবিল ইলম।

(৫) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি অনেক ফিতনা থেকে হেফাজতের কারণ ছিল। ১০০ হিজরিতে শেষ সাহাবী হযরত আবু তুফায়েল (রা.)-এর ইন্তেকালের পর আলভী ও উমাইয়াদের মধ্যে সংঘাতের যুগ শুরু হয় এবং তিন দশক রক্তপাতের পর উম্মতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের কিছু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন, উম্মত এ ধরনের সর্বগ্রাসী সংকট থেকে সুরক্ষিত ছিল। জানা গেল যে, বড়দের উপস্থিতি অত্যন্ত বরকতময় এবং তাদের বিদায় ফিতনা আগমনের ইঙ্গিত দেয়।

(৬) মুসলমানদের মধ্যে আমরা যে দুর্বলতাগুলো বারবার লক্ষ্য করি এবং যা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা সমাজের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলো মানবিক দুর্বলতা যা কখনো কখনো মানুষের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। যেমন: অসহিষ্ণুতা, নিজের মতের ওপর জেদ, পরামর্শকে গুরুত্ব না দেওয়া, অদূরদর্শিতা, প্রতিটি সমস্যার সমাধান শক্তিতে খোঁজা, গৃহযুদ্ধ, গোপন ষড়যন্ত্র, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে এই মানবিক দুর্বলতাগুলো সমাজের ওপর আক্রমণ করে আসছে। এলাকা, বংশ এবং পরিবারের দিক থেকে মানুষের মধ্যে এই মন্দগুলোর বিস্তার একরকম থাকে না। কোনো গোত্র বা পরিবারে একটি মন্দ প্রবল থাকে তো অন্যটিতে অন্যটি। ইসলামী শিক্ষা থেকে আলো গ্রহণ না করা এই মন্দগুলোর লালনপালনের কারণ এবং এগুলোই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৭) যদি মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, তবে সে স্বল্প সময়ে অবিস্মরণীয় কীর্তি সম্পাদন করতে পারে এবং একটি বিগড়ে যাওয়া ব্যবস্থাকে অনেকাংশে সংশোধন করতে পারে। ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর আড়াই বছরের শাসনকাল এর সাক্ষ্য দেয়।

(৮) ইসলামের প্রথম হিজরি শতাব্দীতে বিজয়ের যে জোয়ার ছিল, তা আর কখনো সেভাবে জাগ্রত হতে পারেনি। যে ঐক্য ও সংহতি তখন নসিব হয়েছিল, তা আর দ্বিতীয়বার হয়নি। অভ্যন্তরীণ ফিতনা এবং গৃহযুদ্ধ মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ক্রমাগত নষ্ট করতে থাকে। সেই গুণাবলিও আর অবশিষ্ট থাকেনি যা সাহাবী ও তাবেরীদের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যা দেখে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতো। এজন্য প্রথম হিজরি শতাব্দীর পর ইসলামি বিশ্বের ভৌগোলিক সীমানা আর বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি।

(৯) রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয়; এটি কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব। সাধারণ মানুষ ভেড়ার পালের মতো হয়। তাদের যেরকম প্ররোচিত করা হয়, সেদিকেই তারা চলতে শুরু করে। নেতৃত্বের হুক কেবল উচ্চমর্যাদার ব্যক্তিরাই আদায় করতে পারেন। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেবল তাদেরই করা উচিত যারা ঈমানি ও নৈতিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত, দ্বীনি ইলম, তাকওয়া এবং ইখলাসের সম্পদে সমৃদ্ধ। হিন্মত ও দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, পরিস্থিতি অনুধাবন এবং শৃঙ্খলাবোধের গুণাবলিতে ভূষিত। এজন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, দ্বীনের এই বিষয়টি কতদিন পর্যন্ত সঠিক থাকবে? তিনি বলেছিলেন:

بَقَائُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِهِ أُمَّتُكُمْ.

“তোমরা এই দ্বীনের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত অটল থাকবে যতক্ষণ তোমাদের নেতারা এর ওপর অটল থাকবে।” [১]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮৩৪, কিতাবুল মানাকিব, বাব আইয়ামুল জাহিলিয়াহ।

সুতরাং যদি এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদটি অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে চলে যায়, তবে জাতির নৌকা যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সকলে এবং বনু উমাইয়ার অধিকাংশ খলিফা নেতৃত্বের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিলেন; তাই উম্মত উন্নতির দিকে ধাবিত ছিল। কিন্তু যখন হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পর খলিফাগণ কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীতে দুর্বল প্রমাণিত হলেন, তখন ফিতনা ও ফাসাদের দরজা খুলে গেল।

- ১০. আব্দুর রহমান বিন আশআস যখন বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে খুরাজ করলেন, তখন তার প্রধান কারণ ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে উত্তেজনা। হাজ্জাজের ওপর অসন্তুষ্ট অনেক সৈন্য এবং পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের এক বিশাল জনশ্রোত ইবনে আশআসের চারপাশে সমবেত হয় এবং সাঈদ বিন জুবায়ের ও ইমাম শাবী-র মতো ব্যক্তিরাও এই আন্দোলনে শরিক হয়ে যান। এই সময়ে আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে হাজ্জাজকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয় যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং ইবনে আশআস তা গ্রহণ করতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সব লোকদের মতামত জয়ী হলো যারা বনু উমাইয়ার খেলাফতের সমূলে বিনাশ চেয়েছিল। ফলে খলিফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যার পরিণতি ইবনে আশআসের পরাজয় এবং হাজার হাজার মানুষের হত্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

এই ঘটনা এবং এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক ঘটনা প্রমাণ করে যে, কোনো গণআন্দোলন শুরু করা কোনো খেলা নয়, বরং এর জন্য অত্যন্ত সতর্কতা, চিন্তা-ভাবনা, পরামর্শ, দূরদর্শিতা এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আন্দোলনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ততটা কঠিন নয়, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং আন্দোলনের গতিপথ সঠিক দিকে বজায় রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় সাঈদ বিন জুবায়ের এবং ইমাম শাবী-র মতো ইলমধারী ব্যক্তির সারিতে উপস্থিত থাকলেও আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে; কারণ সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যাওয়ার পর আন্দোলনের লাগাম নেতাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ সেই আন্দোলনকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করে। যেহেতু তাদের মতামত অগভীর হয়; তাই এ ধরনের আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হয়ে আক্ষেপজনক পরিণতির মাধ্যমে শেষ হয়।

- ১১. গণবিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা প্রকৃতপক্ষে অস্থিরতা ও উত্তেজনার চরম সীমার লক্ষণ। সাধারণত এ ধরনের আন্দোলন তখনই গড়ে ওঠে যখন মানুষ তাদের অধিকার পায় না। যদি শাসকগণ ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কাজ করেন, তবে এ ধরনের আন্দোলনের কোনো ভিত্তিই থাকবে না। এমতাবস্থায় যদি কিছু অনিষ্টকারী ব্যক্তি অকারণে মানুষকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টাও করে, তবে তারা ব্যর্থ হবে। কিন্তু যখন মানুষ নিজেদের অধিকার হরণ হওয়ার কারণে আগে থেকেই শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তখন তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করানো কোনো কঠিন কাজ হয় না। সুতরাং শাসকরা যদি চান যে, আল্লাহ ক্ষমতারূপে তাদের যে নেয়ামত দান করেছেন তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হোক, তবে তাদের সবার আগে জনগণের কষ্টের অনুভূতি লালন করতে হবে। নাগরিকদের অবিচার ও জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং তাদের সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সরকারের টেকসই ও স্থিতিশীল হওয়ার নিশ্চয়তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত

১৩২ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ

আবুল আব্বাস সাফফাহ

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ

রবিউল আউয়াল ১৩২ হিজরি... থেকে... জিলহজ ১৩৬ হিজরি

অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ... থেকে... জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা সাফফাহ-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ। উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স চব্বিশ বছরের বেশি ছিল না। উম্মাহর বিগত ইতিহাসে এত অল্পবয়সী কোনো যুবক কখনো ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করেনি। সাফফাহ-এর সাথে বনু উমাইয়াদেরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল; কারণ তার মা প্রথমে আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের বিবাহে ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তিনি মুহাম্মদ বিন আলীর (সাফফাহ-এর পিতা) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। [১] আল্লামা সুয়ুতী রহমাতুল্লাহ সাফফাহ সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি অত্যন্ত দানশীল মানুষ ছিলেন। যে ওয়াদাই করতেন তা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে সামান্য দেরি না করে পূরণ করতেন। নিজের মজলিস থেকে ওঠার আগেই প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।” [২]

আব্বাসীয় বংশের ফাতেমি মুরূবিদদের সাথে প্রতারণা:

বিপ্লবে বনু আব্বাসের সফলতার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, তারা সাধারণ মুসলমানদের এই বিশ্বাস জুগিয়েছিল যে আমরা রাসুলের পরিবারের সদস্য; তাই পুরোপুরি কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করব। মুসলমানরা এই আশ্বাসের ওপরই তাদের সাথ দিয়েছিল এবং নববী পরিবারের ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছিল। আন্দোলনের স্লোগান “আর-রিদা মিন আলি মুহাম্মদ”-এর অর্থ এটাই ছিল। আন্দোলনের সময় “খানদানে রিসালাত” (রাসুলের পরিবার) শব্দটির অর্থ ছিল ব্যাপক এবং বনু আব্বাস বা বনু ফাতেমার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বনু আব্বাস একা এই আন্দোলনে সফল হতে পারত না; তাই তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে বনু ফাতেমার কিছু মুরূবিদকে নিজেদের সাথে রেখেছিল যাদের মধ্যে হযরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি আবদুল্লাহ বিন হাসান এবং তার পুত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যাদেরকে তাদের নেকি ও পরহেজগারির কারণে “নাফসে জাকিয়া” উপাধিতে স্মরণ করা হতো।

[১] মুরূজুজ জাহাব: ৪/৯৭

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৯২, ত. নিয়ার

তবে আল্লামা সুয়ুতী ইহাও লিখেছেন: “সাফফাহ রক্তপাতেও দ্রুতগামী ছিলেন, ফলে পূর্ব ও পশ্চিমে তার গভর্নরগণও তার অনুসরণ করেছিল, এর পাশাপাশি তিনি সম্পদের ক্ষেত্রে দানশীলও ছিলেন।” তারিখ পৃ. ১৯৩

বিপ্লব যখন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, তখন এটিও নির্ধারিত ছিল না যে বিপ্লবের সফলতার ক্ষেত্রে কোন পরিবার থেকে খলিফা নির্বাচন করা হবে? বনু ফাতেমা থেকে নাকি বনু আব্বাস থেকে? এভাবে এই আন্দোলন সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভ করেছিল। যখন মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসনামলে বনু উমাইয়া শাসন মাত্র কয়েক দিনের মেহমান বলে মনে হচ্ছিল, তখন ১৩০ হিজরির হাজার দিনগুলোতে মক্কা মুয়াজ্জামায় বনু হাশিমের রাজনৈতিক নেতাদের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সাফফাহর বড় ভাই আবু জাফর মনসুরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই মজলিসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, সফলতার পর হযরত হাসান (রা.)-এর প্রপৌত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ নফস জাকিয়াকে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। [১]

তবে বনু মারওয়ানের শাসন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বনু আব্বাস এই প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল। রবিউল আউয়াল ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয় বিজয়ীরা কুফায় প্রবেশ করেন। মানুষ ঈদের দিনের মতো বলমলে পোশাক পরে আনন্দ করতে করতে অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। পরের দিন ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার তাদের নেতা আবুল আব্বাস সাফফাহর খেলাফতের ঘোষণা দেওয়া হয়। [২]

সাফফাহর প্রথম ভাষণ—সাবায়ীদের ওপর আঘাত—ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিশ্রুতি:

জুমার সালাতের সমাবেশে সাফফাহ মানুষের কাছ থেকে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তার প্রথম ভাষণ দেন। প্রাথমিক কয়েকটি বাক্যের পর তিনি স্পষ্টভাবে সেই সাবায়ীদের ওপর আঘাত করেন যারা শিয়ানে বনু ফাতেমার ‘ইমামত’ কায়েম করতে চেয়েছিল। সাফফাহ বলেন:

“এই পথভ্রষ্ট সাবায়ীরা মনে করে যে নেতৃত্ব, শাসন এবং খেলাফত আমাদের (বনু আব্বাস) ব্যতীত অন্য লোকদের (বনু ফাতেমা) অধিকার। তাদের (সাবায়ীদের) চেহারা লাঞ্চিত হোক! কেন এবং কীভাবে? আল্লাহ তাআলা তো আমাদের মাধ্যমেই মানুষকে পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত দিয়েছেন, আমাদের মাধ্যমে মুখতার পর দূরদর্শিতা দিয়েছেন, আমাদের মাধ্যমে তাদের ধ্বংসের পর মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের পর ভাই ভাই হয়ে গেছে, যার ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনন্দিত হয়েছেন।”

এরপর তিনি তার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন:

“হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর শাসনভার তাঁর সাহাবীদের হাতে আসে। তাঁরা পরামর্শের (শুরা) ভিত্তিতে ন্যায়ের সাথে কার্যাবলি পরিচালনা করতেন, তাঁরা অন্যান্য জাতিসমূহকে পদানত করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল সেখানে ব্যয় করেছেন এবং অবশিষ্ট অংশ হকদারদের দিয়েছেন, নিজেরা দুনিয়া থেকে খালি পেটে চলে গেছেন। অবশেষে বনু হারব এবং বনু মারওয়ান এসে শাসনের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তা একে অপরের হাতে হস্তান্তর করতে থাকে। তারা জুলুম ও নির্যাতনের বাজার গরম করে তোলে। যখন তারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করল, তখন আল্লাহ আমাদের মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন এবং আমাদের আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। আমি আশা করি যে পরিবার থেকে তোমরা কল্যাণ ও সংশোধন পেয়েছ, তা থেকে কখনো জুলুম ও ফাসাদ পাবে না।” [৩]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/২৩৫, ২৩৬; তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম লি ইবনে মিসকাওয়াইহ: ৩/৩৭৯

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪২৫, তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪০৯

[৩] তারিখুত তাবারী: ৭/৪২৫, ৪২৬

সাফফাহর চাচা দাউদ বিন আলীর ভাষণ। কিতাবুল্লাহ এবং সীরাতে নববীর ওপর চলার অঙ্গীকার:

এরপর সাফফাহর চাচা দাউদ বিন আলী ভাষণ দেন এবং বলেন:

“আল্লাহর কসম! আমরা এই বিপ্লব এজন্য আনিনি যে খাল খনন করব এবং দুর্গ নির্মাণ করব। আমাদের রুখে দাঁড়ানোর কারণ এই ছিল যে, যখন বনু উমাইয়া আমাদের অধিকার খর্ব করল, আমাদের চাচাতো ভাইদের (আলাউয়ীদের) ওপর জুলুম করল, তখন আমাদের মধ্যে তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং আমরা সেই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারিনি। একইভাবে তোমাদের সাথে তাদের দুর্ব্যবহার, জুলুম এবং অবমাননাকর আচরণের কারণে আমরা বিছানায় শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম না।”

“বনু উমাইয়া তোমাদের সাথে যে আচরণ করেছে এবং যেভাবে তোমাদের লাঞ্ছিত করেছে এবং তোমাদের রাজস্বের ওপর দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে, তার কারণে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত ছিলাম।”

“এখন আমরা তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ, তাঁর পরিবার এবং হযরত আব্বাস (রা.)-এর জামানত দিচ্ছি যে, আমরা সমাজে আল্লাহর বিধান কার্যকর করব, কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করব এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের সাথে সীরাতে নববী অনুযায়ী আচরণ করব।”

“আল্লাহ তোমাদের সেই দৃশ্য দেখিয়েছেন যার জন্য তোমরা আগ্রহী ছিলে এবং অপেক্ষা করছিলে। এখন একজন হাশেমী তোমাদের খলিফা, যার কারণে তোমরা সফল হয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সিরিয়াবাসীদের ওপর বিজয়ী করেছেন, তোমাদের রাজত্ব দান করেছেন, ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদের এমন একজন শাসক দান করেছেন যিনি ন্যায়বিচার ও দূরদর্শিতা উভয় গুণে গুণান্বিত। এজন্য তোমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তোমরা আমাদের আনুগত্যকে নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নাও। নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো ধোঁকা বা প্রতারণা করো না; কারণ আমাদের শাসন মূলত তোমাদেরই শাসন। প্রতিটি পরিবারের একটি শহর থাকে এবং আমরা তোমাদের (কুফাবাসীদের) আমাদের শহর মনে করি।”

ভাষণের শেষে তিনি বলেন:

“মনে রেখো! এই ক্ষমতা এখন আর আমাদের থেকে কোথাও যাবে না, যতক্ষণ না আমাদের শেষ খলিফা স্বয়ং একে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের কাছে সোপর্দ করেন।” [১]

ধারণা করা যেতে পারে যে, সাময়িক সাফল্য এবং ক্ষমতার পথে সাময়িক বিজয় অনেক বুদ্ধিমান মানুষকেও কেমন সব আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত করে দেয় এবং তাদের মতামতকে কতটা অনুমাননির্ভর করে তোলে। প্রত্যেকেই জানে যে বনু আব্বাসের খেলাফতও শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছিল এবং তাও বনু উমাইয়ার চেয়ে অনেক বেশি করুণভাবে।

সাফফাহর দরবারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কথোপকথন:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বনু উমাইয়ার শেষ দিনগুলোতে ইরাকের পরিস্থিতির অবনতি, অশান্তি এবং শাসকদের কঠোরতার কারণে হিজাজে চলে...

[১] তারিখ তাবারী: ৭/৪২৫ থেকে ৪২৭; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩২ হিজরী।

গিয়েছিলেন। তবে সাফফাহর খিলাফত ঘোষণার সময় তিনি কুফায় উপস্থিত ছিলেন। [১]

সাফফাহ নিজের খিলাফতের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে বায়াত গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁদের ডেকে বললেন:

“আল্লাহর অনুগ্রহে ক্ষমতা তোমাদের নবীর আহলে বায়তের নিকট পৌঁছেছে। আল্লাহ সত্যকে বিজয়ী করেছেন। আপনারা উলামায়ে কেরাম, সত্যের সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রথম সারির দায়িত্বশীল। আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে আপনারা যতটুকু চাইবেন, তা দিয়ে আপনাদের সম্মান, মর্যাদা ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হবে। আপনারা আপনাদের খলিফার নিকট এমনভাবে বায়াত গ্রহণ করুন যা আপনাদের পক্ষেও দলিল হয় এবং (বিদ্রোহের ক্ষেত্রে) আপনাদের বিরুদ্ধেও; এমন বায়াত যা আপনাদের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হয়। আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন না যে আপনাদের কোনো খলিফা নেই, অন্যথায় আপনারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের পক্ষে কোনো দলিল নেই।”

উলামায়ে কেরাম ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কাজী ইবনে আবি লায়লা রহ. এবং কাজী ইবনে শুবরুমা রহ.-এর মতো প্রবীণ ফকীহগণও ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও ইমাম সাহেবের দিকে তাকালেন। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, এই উভয় ব্যক্তি বনু উমাইয়ার কাজী এবং সরকারি কর্মচারী হিসেবে চলে আসছিলেন; তাই তাঁদের জন্য একটি নতুন সরকারের বায়াত গ্রহণে অগ্রণী হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পূর্ববর্তী সরকারের সাথে চাকুরির কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাই তিনি তুলনামূলকভাবে স্বাধীনভাবে এবং উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ইমাম সাহেব রহ. মজলিসের উলামাদের দৃষ্টি বুঝতে পেরে বললেন:

“আপনারা কি পছন্দ করেন যে আমি নিজের এবং আপনাদের পক্ষ থেকে কথা বলি?”

সবাই ইতিবাচক উত্তর দিলে ইমাম সাহেব রহ. বললেন:

“আল্লাহর প্রশংসা, যিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়দের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছেন, আমাদের জুলুমের অন্ধকার থেকে বের করেছেন এবং আমাদের মুখে সত্য জারি করেছেন। আমরা আল্লাহর নির্দেশে আপনার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত আনুগত্যের বায়াত করছি। আল্লাহ এই পদমর্যাদাকে কিয়ামত পর্যন্ত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়দের থেকে বিলুপ্ত না করুন।”

সাফফাহ এই বাক্যগুলো শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন: “আপনার মতো ব্যক্তিকে উলামাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন।” তাঁরা আপনাকে প্রতিনিধি বানিয়ে ভালো করেছেন এবং আপনি কথার উদ্দেশ্য খুব ভালোভাবে আদায় করেছেন। [২]

[১] ইমাম সাহেবের জীবনীকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া যুগে গভর্নর ইবনে হুবায়রার জুলুম-নির্যাতনের পর তিনি কুফা ছেড়ে হিজাজে চলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়েও ঐক্যমত রয়েছে যে, তিনি মনসুর আব্বাসীর যুগে পুনরায় কুফায় ফিরে এসেছিলেন। তবে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাফফাহর বায়াতের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, বরং এই বায়াত গ্রহণে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর অর্থ হলো মনসুরের যুগের আগেও তিনি অন্তত একবার কুফায় অবশ্যই এসেছিলেন। উভয় ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বলা যেতে পারে যে, ইমাম সাহেব বনু উমাইয়ার শেষ এবং বনু আব্বাসের শুরুর দিকের অস্থিরতার সময় কোথাও স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি। যদিও তিনি হিজাজে চলে গিয়েছিলেন, তবে মাঝেমধ্যে সাময়িকভাবে কুফায় আসতেন। কুফায় পুনরায় স্থায়ীভাবে বসবাস তিনি মনসুরের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুরু করেন। যুক্তিও এটাই বলে; কারণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় মানুষ কোথাও স্থায়ীভাবে থিতু হতে পারে না এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক জায়গায় থিতু হয়। শেখ মুহাম্মদ আবু জাহরা মরহুম তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ “আবু হানিফা, হায়াত ও আসর” (পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭)-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত ও গবেষণামূলক কাজ করেছেন। সেটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

[২] মানাকিব আবি হানিফা কুরদরি: ২০০, ১৯৯/১।

সাফফাহ-এর অর্থ:

সাধারণত মনে করা হয় যে, “সাফফাহ” শব্দের অর্থ “রক্তপিপাসু” এবং আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতাকে লোকেরা তার জুলুম ও নির্যাতনের কারণে এই উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়টি গবেষণার পরিপন্থী। সাফফাহ নিজের জন্য এই উপাধিটি নিজেই পছন্দ করেছিলেন; কারণ তিনি ছিলেন দানশীল ও উদার। কিন্তু যেহেতু তিনি একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাই বিরোধীরা একে নেতিবাচক অর্থে বেশি প্রচার করেছে। [১]

আনবারে রাজধানী:

যেহেতু বনু আব্বাসের সমর্থকদের বড় একটি অংশ ইরাক ও খোরাসানে ছিল; তাই রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে সাফফাহ ১৩২ হিজরিতে ইরাকের “আনবার” নামক একটি শহরকে নিজের রাজধানী বানান, যা ফোরাতে নদীর উত্তর-পূর্বে বর্তমান বাগদাদ থেকে ৬৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। [২]

দানশীলতা:

সাফফাহ-এর দানশীলতা ও বদান্যতা সুপরিচিত। তিনি যখন দান করতে শুরু করতেন, তখন তার হাত থামানো যেত না। বনু উমাইয়া আমলের ধন-ভাণ্ডার তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাদাতদের (নবী বংশধরদের) প্রচুর দান করতেন, তারা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নিয়ে থাকুক বা না থাকুক। হযরত জয়নুল আবেদিনের নাতি উবাইদুল্লাহ আল-আরাজকে মাদায়েনে এত বড় একটি জায়গির দিয়েছিলেন যার বার্ষিক আয় ছিল ৮০ হাজার দিনার। [৩]

একটি কৌতুক:

সাধারণ মানুষের প্রতিও তার দয়ার হাত প্রসারিত ছিল। সেই সময়ের বিখ্যাত রসিক কবি আবু দুলামাহ তার কাছে এলে সাফফাহ বললেন: “কোনো প্রয়োজন থাকলে বলো।” সে বলল: “শুধু একটি শিকারি কুকুর দিন।”

সাফফাহ বললেন: “তাকে একটি শিকারি কুকুর দিয়ে দেওয়া হোক।”

[১] অভিধানে সাফফাহ-এর একাধিক অর্থ উল্লেখ রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি হলো: الرجل المعطاء (অত্যধিক দানকারী ব্যক্তি), قادر على الكرم (বাকপটু ব্যক্তি), اول خلفاء بني عباس برئيس للعرب (আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা, আরবদের একজন প্রধান)। “অত্যধিক দানকারী ব্যক্তি, বাকপটু মানুষ, প্রথম আব্বাসীয় খলিফার উপাধি, একজন আরব প্রধান।” (তাজুল আরুস: ৬/৪৭৯; ত: দারুল হিদায়াহ)। যদিও সাফফাহ-এর একটি অর্থ রক্তপাতকারীও বটে, তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই উপাধিটি তিনি নিজেই নিজেকে দিয়েছিলেন এবং তা-ও তার প্রথম খুতবায়, এমন এক সময়ে যখন তিনি মানুষকে তার সদাচরণের আশা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “أفلهزدكم في اعطيكم مائة درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبير” “আমি তোমাদের বেতনে একশ দিরহাম বৃদ্ধি করে দিয়েছি। সুতরাং (তা গ্রহণের জন্য) প্রস্তুত হও; কারণ আমি অকাতরে দানকারী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী।” (তারিখে তাবারী: ৭/২৪৬)। এখানে তিনি নিজের দুটি গুণ বর্ণনা করেছেন: একটি দানশীলতা, অন্যটি কঠোরতা। প্রথম গুণের জন্য “আস-সাফফাহ আল-মুবীহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এমন দাতা যে সবকিছু নিয়ে যাওয়া বৈধ করে দেয়। দ্বিতীয় গুণ “আস-সা-ইর আল-মুবীর” বলেছেন অর্থাৎ শত্রুদের থেকে কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এখানে “সাফফাহ” দানশীল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর সাফফাহ-এর খিলাফতের শুরুতে নিম্নোক্ত শিরোনাম দিয়েছেন: “ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد” (আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ সাফফাহ-এর ক্ষমতার বিবরণ এবং তার শাসনকালে তার উত্তম চরিত্র ও পূর্ণ ইনসাফের সেই ঘটনাবলি যা নির্ভরযোগ্য)। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৭৫)। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাফফাহ তেমন জালিম ও দুশ্চরিত্র ছিলেন না যেমনটা সাধারণত মনে করা হয়, বরং তার চরিত্রে গুণাবলিই প্রবল ছিল। হ্যাঁ, কিছুটা কঠোরতা অবশ্যই ছিল।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩৪ হিজরি।

[৩] উমদাতুত তালিব লি ইবনে আনবাহ জামালুদ্দিন আল-হুসাইনি, পৃ. ৩১৮... এই পরিমাণ বর্তমানে প্রায় বিশ কোটি টাকার সমান।

আবু দুলামা বললেন: “একটি সওয়ারিও প্রয়োজন যাতে আমি তাতে চড়ে শিকারে যেতে পারি।”

সাফফাহ বললেন: “তাকে একটি সওয়ারি দিয়ে দেওয়া হোক।”

আবু দুলামা বললেন: “একটি শিকারি কুকুরও প্রয়োজন যে আমার সাথে গিয়ে শিকার করবে।”

সাফফাহ বললেন: “তাকে একটি কুকুরও দিয়ে দেওয়া হোক।”

আবু দুলামা বললেন: “একজন খাদেমও প্রয়োজন যে শিকার করা গোশত রান্না করে খাওয়াবে।”

সাফফাহ বললেন: “তাকে একজন খাদেমও দিয়ে দেওয়া হোক।”

আবু দুলামা বললেন: “আপনার এই খাদেমরা থাকবে কোথায়? একটি ঘরও তো প্রয়োজন।”

সাফফাহ বললেন: “একটি ঘরও তাদের নামে করে দেওয়া হোক।”

আবু দুলামা বললেন: “যদি এই লোকদের কোনো জীবিকা না থাকে তবে জীবনযাপন কীভাবে হবে?”

সাফফাহ বললেন: “একশ একর উর্বর জমি এবং একশ একর অনাবাদী জমি তার নামে করে দাও।”

আবু দুলামা মুখ বাঁকিয়ে বললেন: “অনাবাদী জমি? আমি বনু আসাদের মরুভূমির পাঁচশ একর অনাবাদী জমি আপনার নামে করছি।”

সাফফাহ হেসে উঠলেন এবং বললেন: “সবটুকু উর্বর জমিই তাকে দিয়ে দাও।” [১]

মোটকথা সাফফাহ দানশীল ও উদারমনা ছিলেন। তবে তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী এবং আবু মুসলিম খোরাসানি কঠোর স্বভাবের লোক ছিলেন। বনু উমাইয়াদের হত্যাকাণ্ডে এই দুজনেই বেশি লিপ্ত ছিলেন। সাফফাহর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।

বনু উমাইয়ার ওপর জুলুম

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নতুন শাসক পরিবার সাধারণ জনগণের সাথে ইনসাফ, ন্যায়বিচার, দানশীলতা ও উদারতার আচরণ করেছিল, কিন্তু অন্যদিকে বনু উমাইয়াদেরকে নির্দয় প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। অনেক শাহজাদা, আমীর এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়েছিল। এই জুলুম থেকে বাঁচতে অনেকে উমাইয়া ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পলাতক উমাইয়া শাহজাদাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল, যিনি আন্দালুসে গিয়ে সেখানে উমাইয়া সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। [২]

নিহত শাহজাদা ও আমীরদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আবদুল মালিক, ইসহাক বিন আবদুল্লাহ, আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নাতি উমর বিন ইয়াজিদের ছেলে এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর নাতি উমর বিন আবি সালামাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একইভাবে সাজিদ বিন আস (রা.)-এর পাঁচ প্রপৌত্র: ইমরান বিন মুসা, আইয়ুব বিন মুসা, ইয়াহইয়া বিন উমাইয়া, ইসমাইল বিন উমাইয়া এবং আবদুল্লাহ বিন আনবাসাকে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ বিন আনবাসার দুই ছেলে: ইয়াদ এবং মুহাম্মদও একই পরিণতির শিকার হন। মৃত্যুদণ্ডের এই কার্যক্রম সাফফাহর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী এবং দাউদ বিন আলীর হাতে সম্পন্ন হয়েছিল। [৩]

বনু আব্বাসের বিপ্লবী নেতারা বনু উমাইয়া সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতেন, তা নিচের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়:

[১] আল-আঘানি লি-আবীল ফরাজ আল-ইসফাহানি: ১০/৩০

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৪৩, ৪৫৯

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১১০

শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের হত্যার পর তার স্ত্রী ও কন্যাদের মিশর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে সাফফাহর চাচা সালিহের কাছে পাঠানো হয়। যখন এই বন্দী মহিলারা দয়ার আবেদন করলেন, তখন সালিহ বললেন:

“তোমাদের পিতা মারওয়ান কি আমার ভতিজা ইবরাহিমকে হত্যা করায়নি? হিশাম বিন আব্দুল মালিক কি যায়েদ বিন আলীকে কুফায় শূলে চড়ায়নি? ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ কি ইয়াহইয়া বিন যায়েদকে খোরাসানে হত্যা করায়নি? উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ কি মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করেনি? ইয়াজিদ কি হযরত হুসাইন (রা.) এবং আহলে বাইতকে হত্যা করায়নি? তবে আমি কেন তোমাদের ক্ষমা করব?”

মারওয়ানের বড় মেয়ে বললেন: “আপনার ক্ষমার আঁচল আমাদের জন্য প্রশস্ত হওয়া উচিত।”

সালিহ বললেন: “সেটি ভিন্ন কথা। আর যদি চাও তবে আমার ছেলে ফদলের সাথে তোমার বিয়ে করিয়ে দিতে পারি।”

বিনতে মারওয়ান বললেন: “এটি কি বিয়ের কোনো সময়? বরং আপনি আমাদের আমাদের শহরে পাঠিয়ে দিন।”

সালিহ তাদের আবেদন পূরণ করলেন। [১]

এ থেকে এটিও জানা যায় যে, শত্রুতা ও বিদ্বেষের পরিবেশেও ক্ষমা ও দয়ার ঘটনা ঘটতে থাকত। উমাইয়া আমলের কিছু নামী আমীর যেমন মুহাম্মদ বিন আশআসকে এই শর্তে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি কখনও কোনো জনসভায় ভাষণ দেবেন না এবং নিজের তলোয়ারকে জিহাদের জন্য ওয়াকফ রাখবেন। মুহাম্মদ বিন আশআস তেমনই করেছিলেন এবং আব্বাসী সরকারের সেনাপতি হিসেবে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। [২]

আব্বাসী দরবারের আলেম বালাযুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বনু উমাইয়ার সাথে আচরণের ব্যাপারে খোদ আব্বাসী আমীরদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেউ কেউ তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন এবং কেউ কেউ কঠোরতা করতে চেয়েছেন। সাফফাহর চাচা সুলাইমান বিন আলী বসরার শাসক ছিলেন, তিনি সেখানে বনু উমাইয়াকে কোনো ক্ষতি পৌঁছাননি। খলিফা সাফফাহ নির্দেশ দিলেন যে, বসরার উমাইয়াদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করো। সুলাইমান বিন আলী শহরের উমাইয়াদের একত্রিত করে এই নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বললেন:

“যদি আমি আমিরুল মুমিনীনকে লিখি যে এই লোকদের কাছে কিছুই নেই, তবে তিনি অন্য কাউকে নিযুক্ত করবেন যে তোমাদের থেকে জোরপূর্বক কেড়ে নেবে। এর চেয়ে ভালো এটাই যে তোমরা নিজেরাই একটি উপযুক্ত পরিমাণ আমার কাছে হস্তান্তর করো যাতে খলিফার কোনো ভুল ধারণা না হয়।”

বনু উমাইয়ার আমীরগণ আটশ একর জমি হস্তান্তর করলেন এবং বাকি ধন-সম্পদ নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন।

উমাইয়া আমীর মুসলিম বিন হারব বসরায় অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সওয়ার হতেন, কোনো বাধা-বিপত্তি ছিল না। একবার সাফফাহর চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী তাকে দেখে সুলাইমানকে জিজ্ঞেস করলেন: “এই লোকেরা কি এখনও এই সচ্ছলতার সাথে বেঁচে আছে?”

সুলাইমান বললেন: “আমি তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ দেখি না। সত্যনিষ্ঠা আমাকে এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত রেখেছে।”

আব্দুল্লাহ বিন আলী বললেন: “আমি হলে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়তাম।” [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর: ১৩২ হিজরি

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৯১/৪

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪৫৮/৭

কিছু উমাইয়া আমিরকে উচ্চ পদে আসীন করা হয়েছিল। যেমন: ইয়াকুব বিন দাউদ মাহদী আব্বাসীর শাসনামলে উজিরের পদ লাভ করেন। [১] রাবী বিন ইউনুস উমাইয়া তিন খলিফা: অর্থাৎ মনসুর, মাহদী এবং হাদীর শাসনামলে আব্বাসীয়দের হাজিব ছিলেন। [২] তার পুত্র ফজল, হারুন এবং মামুনের শাসনামলে হাজিব ছিলেন। [৩] এভাবে সালতানাতের এই কেন্দ্রীয় পদটি প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পর্যন্ত উমাইয়া আমিরদের কাছে ছিল।

ইবনে হুবায়রাকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর মৃত্যুদণ্ড:

তবে বনু উমাইয়ার কিছু আমিরের সাথে সাফফাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গও করেছিলেন। এমন কিছু আমিরকে সুযোগ পাওয়া মাত্রই হত্যা করিয়েছিলেন যারা সন্ধি করেছিলেন। ইবনে হুবায়রা (ইয়াজিদ বিন উমর) আরবদের একজন প্রখ্যাত অশ্বারোহী এবং উমাইয়া ক্ষমতার স্তম্ভ ছিলেন। তিনি ওয়াসিতে কেল্লাবন্দী হয়ে আব্বাসীয়দের মোকাবিলা করতে থাকেন। সাফফাহ তার ভাই মনসুরকে তাকে দমনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনে হুবায়রা এগারো মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে মারওয়ান বিন মুহাম্মদের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তার সাহস ভেঙে যায়। এদিকে মনসুরের প্রতিনিধি হাসান বিন কাহতাবাহ তার কাছে পৌঁছে বললেন: “এখন ঘাড় উঁচু করে রাখার কী ফায়দা! এখন তো এমন কেউ বাকি নেই যে আমিরুল মুমিনীনের অনুগত হয়নি। তোমাকে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তির সাথে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে তুমি এবং তোমার সবকিছু নিরাপদ থাকবে।”

পরের দিন খাজিম বিন খুজাইমা এবং হারিস বিন নওফলের মতো শীর্ষস্থানীয় সরকারি আমিরগণ একে একে ইবনে হুবায়রার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রত্যেকেই তাকে এই নিশ্চয়তা দেন যে তিনি যেভাবে চান, সে অনুযায়ী তার সাথে লিখিত চুক্তি করা হবে। অবশেষে ইবনে হুবায়রা তাদের ওয়াদার ওপর বিশ্বাস করে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এরপর মনসুরের তাঁবুতে উপস্থিত হন। মনসুর তখন ভালো আচরণ করেন এবং বলেন: “আমরা বনু হাশিম। বড়দের ক্ষমা করি এবং গুণীজনদের খেয়াল রাখি। তুমি আমাদের কাছে সাধারণ মানুষের মতো নও। আমিরুল মুমিনীনের তোমার মতো লোকদের সাথে সদাচরণে অনেক বেশি আগ্রহ রয়েছে। তোমার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নিশ্চিত এবং আনন্দিত থাকো।”

ইবনে হুবায়রা এই সদাচরণ দেখে একটি ভালো পরামর্শ দিয়ে বললেন: “আমির! আপনাদের শাসন নতুন। মানুষকে এর মিষ্টতায় অভ্যস্ত করুন। এর তিক্ততা আত্মদান করাবেন না যাতে তারা আপনাদের অনুরাগী হয়।”

বাহ্যিকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু দুই সপ্তাহও পার হয়নি যে মনসুর ইবনে হুবায়রা এবং তার বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীকে হঠাৎ প্রতারণার মাধ্যমে গ্রেপ্তার করেন এবং চুক্তির তোয়াক্কা না করে সবাইকে হত্যা করিয়ে দেন। এটি ১৩২ হিজরির ঘটনা। [৪]

আব্বাসীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক স্তম্ভ আবু সালামা উজির-এ-আলে মুহাম্মদের হত্যাকাণ্ড:

শুধু তাই নয়, বরং আব্বাসীয় আন্দোলনের সেই একনিষ্ঠ প্রাণ উৎসর্গকারীরাও সাফফাহর তলোয়ার থেকে রেহাই পাননি যাদের আনুগত্যের ওপর পরবর্তীতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো দাগ পড়ে গেল। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আবু সালামা আল-খল্লালের হত্যাকাণ্ড। এই ব্যক্তি কুফার সবচেয়ে ধনী অভিজাতদের...

[১] তারিখুত তাবারী: ১৮৩/৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৩৫/৭

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৯৭/১৩

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪০০ থেকে ৪০২; আনসাবুল আশরাফ: ১৪৫/৪ থেকে ১৫২; তারিখুত তাবারী: ৪৫০/৭ থেকে ৪৫৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৮০/১৩, ২৮১; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯/৫ থেকে ৩৩

তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন। সাদাতদের ক্ষমতার জন্য তিনি অকাতরে নিজের সম্পদ ব্যয় করেন এবং এভাবে বিপ্লবের সাফল্যে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেন। সাফফাহ তার মর্যাদা, যোগ্যতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের কারণে তাকে নিজের উজির বানিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপের একটি উদ্দেশ্য এও ছিল যাতে অনারব প্রজাসাধারণ এবং ইরাকবাসীদের আস্থা বজায় থাকে।

আবু সালামাহ ছিলেন ইসলামী ইতিহাসে উজির পদ লাভকারী প্রথম ব্যক্তি। তার উপাধি ছিল ‘উজির-এ-আলে মুহাম্মদ’। তিনি এই কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, বনু আব্বাস বনু ফাতিমাকে উপেক্ষা করে চুক্তির পরিপন্থী নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সাফফাহ তার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতেন এবং তার আশঙ্কা ছিল যে আবু সালামাহ হয়তো বনু ফাতিমার সাথে গিয়ে যোগ দেবেন; তাই তিনি সুযোগ পাওয়া মাত্রই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেবল এই চিন্তায় বিরত ছিলেন যে পাছে খোরাসানবাসীরা তার প্রতিশোধ নিতে ফুঁসে না ওঠে। যখন আবু মুসলিম খোরাসানি খোরাসান ও ইরাকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং সাফফাহ সবদিক থেকে নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি আবু সালামাহরূপী কাঁটা উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৩২ হিজরিতে তার নির্দেশে আবু মুসলিম নিজের লোক পাঠিয়ে তার এই পুরনো সাহায্যকারীকে হত্যা করলেন। [১]

এভাবে বনু আব্বাস শুরু থেকেই প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে এই বিষয়টি ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। হাতেগোনা কয়েকজন অসাধারণ মুত্তাকি ও পরহেজগার খলিফা ছাড়া অধিকাংশ খলিফাই এই ধরনের ভুল রাজনৈতিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বিদ্রোহসমূহ:

আব্বাসীয়দের এই আচরণ খুব দ্রুতই সাধারণ মানুষের আশায় পানি ঢেলে দিল। কেবল আরবরাই তাদের ওপর হতাশ হয়নি, বরং অনারব বিশ্বেরও অনেক গোত্র ও শ্রেণি তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এই কারণেই সাফফাহর ক্ষমতা পুরোপুরি সুসংহত হওয়ার আগেই মুসলিম বিশ্বে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের একটি ধারা শুরু হয়ে যায়, যা সাফফাহর মৃত্যুর পর তার ভাই আবু জাফর মনসুরের আমলেও অব্যাহত থাকে। বনু আব্বাসের প্রতীক ছিল কালো পাগড়ি ও কালো পোশাক। এর বিপরীতে বিদ্রোহকারীরা সাদা পোশাককে নিজেদের পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে। যেখানেই বিদ্রোহ হতো, মানুষ সাদা পোশাক পরে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসত। [২]

প্রথম বড় বিদ্রোহটি ১৩২ হিজরিতে সিরিয়ার কিনাসরিন অঞ্চলে আবু আল-ওয়ারদ নামক একজন আমির করেন। এরপর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন সাবেক উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার প্রপৌত্র আবু মুহাম্মদ সুফিয়ানি। তবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিনাসরিনের বিদ্রোহীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আল-জাজিরায় বক্কার বিন মুসলিম এবং ইসহাক বিন মুসলিম নামক দুই প্রভাবশালী ভাই ষাট হাজার লোক নিয়ে বিদ্রোহ করেন। সাফফাহ তার ভাই আবু জাফর মনসুর এবং চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীকে পাঠিয়ে অতি কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করেন। [৩]

একই বছর দ্বিতীয় বড় বিদ্রোহটি হয় মোসেলে, যা সাফফাহর ভাই ইয়াহইয়া অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করেন। [৪] প্রতিটি বিশৃঙ্খলার বিপরীতে বনু আব্বাসের কাছে একটাই জবাব ছিল যে, বিশৃঙ্খলাকারীদের তছনছ করে দেওয়া হোক; তবে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের ঝড়...

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৪৯, ৪৫০; আনসাবুল আশরাফ: ৪/১৫৪, ১৫৭; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/২৮

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৪৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৭৬

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৭৬, ২৭৭, ২৭৮

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/৩৩, ৩৪

তারা বিক্ষিপ্ত হতে থাকলেন। ১৩৪ হিজরিতে বাসসাম বিন ইবরাহিম খোরাসানে, শায়বান ইয়াশকারি ওমানে এবং মানসুর বিন জুমহর সিন্ধুতে বিদ্রোহ করেন, পরের বছর যিয়াদ বিন সালেহ মধ্য এশিয়ায় বিদ্রোহ করেন। [১]

খোরাসানের বিদ্রোহী নেতা শারিক বিন শায়খ প্রকাশ্যে বলেছিলেন: “আমরা এই শর্তে আলে মুহাম্মাদের সাথে দেইনি যে তারা রক্তপাত করবে এবং অন্যায় পথ অবলম্বন করবে।” ত্রিশ হাজার লোক তার সাথে যোগ দেয়। এই অভিযান আবু মুসলিম খোরাসানির ওপর ন্যস্ত করা হয়, অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও বিদ্রোহীদের শক্তি চূর্ণ করে তাদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করা হয়। [২]

ইমাম ইবরাহিম বিন মায়মুনের হত্যাকাণ্ড:

সেই সকল ইলমি ব্যক্তিত্বকেও রেহাই দেওয়া হয়নি যারা প্রথমে বিপ্লবের সাথে একমত ছিলেন এবং পরবর্তীতে বিপ্লবী নেতাদের ভুলত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন। ইমাম ইবরাহিম বিন মায়মুন আস-সায়িগ খোরাসানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসায়ি তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর তাকওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, ইলমি খিদমতের পাশাপাশি তিনি কামারের কাজ করতেন এবং তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজের সময় আযানের শব্দ শোনামাত্রই হাতের হাতিয়ার রেখে দিতেন এবং সালাতের জন্য চলে যেতেন। তিনি আব্বাসীয় আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং আবু মুসলিম খোরাসানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তিনি আব্বাসীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর পুরোপুরি আমল করার এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার দাবি জানাতে শুরু করেন, তখন আবু মুসলিম খোরাসানি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁকে এমনভাবে আঘাত করা হয়েছিল যে সামান্য প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিন দিন পর্যন্ত ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং তিনি পড়ে পড়ে কাতরাতে থাকেন। [৩] ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যখন তাঁর হত্যাকাণ্ডের খবর পান, তখন তিনি এত বেশি কাঁদেন যে মনে হচ্ছিল যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। [৪]

আবু মুসলিমের মর্যাদা বিড়ালের সমান—মানসুরের অভিমত:

নিজের শাসনের পূর্ণ স্থিতিশীলতার পর সাফফাহ চেয়েছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানিকেও সরিয়ে দিতে; কারণ ভয় ছিল যে সে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অনারবদের আধিপত্য কায়েম না করে ফেলে। কিন্তু আবু মুসলিমের উপকারের কারণে তিনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাচ্ছিলেন। সাফফাহর ভাই মানসুরের দ্ব্যর্থহীন অভিমত ছিল যে, আবু মুসলিম গাদ্দারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; সুতরাং তাকে শেষ করতে মোটেও দেরি করা উচিত নয়। সাফফাহ যখন বললেন: “আমাদের ওপর তার অনেক বড় বড় এহসান রয়েছে। তার মর্যাদাও তুমি জানো।” তখন মানসুর উত্তর দিলেন: “এই সবকিছু আমাদের কারণেই হয়েছে। আল্লাহর কসম! আবু মুসলিমের জায়গায় কোনো বিড়ালকেও যদি এই কাজগুলোর জন্য পাঠানো হতো, তবে সেও তা করে ফেলত।” [৫]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৪, হিজরি ১৩৩ সন

[৩] তাহযীবুল কামাল: ২/২২৩, ২২৪; ইকমালু তাহযীবিল কামাল: ১/৩০৪

[৪] আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ: ১/৭৩

[৫] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৬৮, ৪৬৯

তবে সাফফাহ এর সুযোগ পাননি এবং এই কাজটি মনসুর সম্পন্ন করেন।

সাফফাহর মৃত্যু ও শাসনকালের বৈশিষ্ট্য:

সাফফাহ চার বছর নয় মাস শাসন করার পর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩৬ হিজরির ১১ই জিলহজ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। তাঁর শাসনের অধিকাংশ সময় বনু উমাইয়া এবং তাদের অনুগতদের নির্মূল করতেই ব্যয় হয়েছিল। [১]

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এই সময়কাল সংক্ষিপ্ত ছিল, তবুও তিনি কিছু নতুন কাজ করে দেখিয়েছেন। এর আগে মুসলিম সরকারগুলোতে বিজারাত (মন্ত্রিত্ব) পদটি কখনোই ছিল না। দরবারে কয়েকজন বিশেষ উপদেষ্টা ও প্রশাসক থাকতেন। সাফফাহ তাঁর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা আবু সালামাকে পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে ‘উজির’ হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই পদের মর্যাদা ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ের ‘প্রধানমন্ত্রী’র মতো। পার্থক্য হলো, প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রতিনিধি হন, আর এই উজির ছিলেন খলিফার প্রতিনিধি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শতাব্দীকাল ধরে ইসলামি সরকারগুলোতে বিজারাতের এই একটি পদই প্রচলিত ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইত্যাদির কোনো বিভাজন ছিল না।

সাফফাহর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজধানী সিরিয়া থেকে ইরাকে স্থানান্তর করা। এটি ছিল তাঁর দূরদর্শিতা যে, তিনি ইরাকে বনু হাশিমের পূর্ববর্তী রাজধানী কুফাকে নির্বাচন না করে বরং ‘আনবার’কে কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন; কারণ কুফাবাসীদের ইতিহাস তাঁর সামনে ছিল। তাঁর উত্তরসূরি মনসুরও প্রায় নয় বছর ‘আনবার’-এ অবস্থান করেছিলেন।

স্বভাবগত দিক থেকে আবুল আব্বাস শত্রুদের জন্য যেমন কোষমুক্ত তলোয়ার ছিলেন, তেমনি বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের ওপর তাঁর চমৎকার দখল ছিল। তিনি কবিদের পাশে বসিয়ে তাঁদের কবিতা শুনতেন এবং তাঁদের প্রচুর পুরস্কৃত করতেন।

বনু হাশিমের ফাতেমি শাখার মুরূবিদের তিনি শাসনক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখলেও তাঁদের পেছনে অত্যন্ত মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন, যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন এবং কোনো বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে না পড়েন। [২]

সাফফাহ কিছু নির্মাণকাজও করিয়েছিলেন। কুফা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতিটি মনজিলে মাইলফলক স্থাপন করিয়েছিলেন। রাতে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য এই মহাসড়কে আলোকসম্ভবও নির্মাণ করা হয়েছিল। [৩]

□□□

কিছু বিদআতের নিরসন

এতে কোনো □□□□□ নেই যে, বনু আব্বাসের শাসনের সূচনাও কোনো আদর্শ পদ্ধতিতে হয়নি এবং ক্ষমতা সুসংহত করার পরও কিছু বিষয়ে তাঁরা বনু উমাইয়ার সমকক্ষ হতে পারেননি; বরং তুলনা করলে শাসন পরিচালনা, স্থিতিশীলতা এবং বিজয়ের দিক থেকে বনু উমাইয়াদের যুগই শ্রেয় মনে হতে থাকে। তবে বনু আব্বাস এসেই এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যার জন্য তাঁদের যত প্রশংসাই করা হোক না কেন, তা কম হবে। এই পদক্ষেপগুলো ছিল কিছু বিলুপ্ত সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২৯৭

[২] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ৩৩৬ থেকে ৩৩৮

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩৬ হিজরি সাল

দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দেওয়ার সুন্নাত:

সুন্নাত হলো জুমার ও দুই ঈদের খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ছিল। [১] কিন্তু বনু মারওয়ান এর বিপরীতে বসে খুতবা দিত। [২] আবুল আব্বাস সাফফাহ এই বিদআতের অবসান ঘটান এবং দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এতে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। [৩]

দুই ঈদের নামাজের পর খুতবা দেওয়ার সুন্নাত:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা অনুযায়ী ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজের খুতবা নামাজের পরে হতো। কিন্তু বনু মারওয়ানের খলিফা ও আমীরগণ দুই ঈদের খুতবা নামাজের আগেই দিয়ে দিতেন, যাতে জনসমাবেশ বাধ্য হয়ে তাদের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে পায়। এই বিদআতের সূচনা করেছিলেন মারওয়ান বিন আল-হাকাম এবং আবু সাঈদ খুদরী-এর মতো ফকীহ সাহাবীদের বোঝানো সত্ত্বেও সে এই বিদআত ত্যাগ করেনি, বরং তাদের বিদ্রূপাত্মক উত্তর দিয়েছিল:

[১] মুসনাদে শাফেয়ী, পৃ. ৬৬

[২] সর্বপ্রথম বসে খুতবা দেওয়া শুরু করেছিলেন হযরত মুয়াবিয়া। ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেন:

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং আবু বকর, উমর ও উসমান মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে জুমার দুটি খুতবা দিতেন এবং উভয়ের মাঝে বসে বিরতি নিতেন।

অবশেষে মুয়াবিয়া প্রথম খুতবায় বসলেন এবং বসে খুতবা দিলেন, আর দ্বিতীয় খুতবা দাঁড়িয়ে দিলেন। (মুসনাদে শাফেয়ী, পৃ. ৬৬)

হযরত মুয়াবিয়া-এর বসে খুতবা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই কারণ তাঁর ওজর (অক্ষমতা) ছিল। তিনি অত্যন্ত স্থূলকায় হয়ে গিয়েছিলেন এবং শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট অনুভব করতেন।

শাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সর্বপ্রথম বসে খুতবা দিয়েছেন মুয়াবিয়া, যখন তাঁর মেদ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পেট বড় হয়ে গিয়েছিল। (তারিখে দামেশক: ৫৯/২০২)

দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া শাফেয়ীদের নিকট ওয়াজিব এবং হানাফীদের নিকট সুন্নাত। ওজরের কারণে বসে খুতবা দেওয়া যেতে পারে, তবে একে নিয়মে পরিণত করা ভুল।

বনু মারওয়ান কোনো ওজর ছাড়াই স্থায়ীভাবে এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। সাহাবায়ে কেবাম এই নতুন রীতির সূচনায় প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু কোনো কর্ণপাত করা হয়নি।

একবার উমতী গভর্নর আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকাম বসে খুতবা দিচ্ছিল, তখন কাব বিন উজরা তাকে দেখে বললেন:

“انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا” (এই খবীসকে দেখো, সে বসে খুতবা দিচ্ছে!)

অতঃপর তিনি সূরা জুমার আয়াত: “وتركوك دأباً” (তারা আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছেড়ে গেল) পাঠ করলেন, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

(সহীহ মুসলিম, হা: ২০৩৮, কিতাবুল জুমা, পরিচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: واذا رأوا نجارة)

কাব বিন উজরা যখন আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকামকে বাধা দিয়েছিলেন, তখন এই রীতি কেবল দু-একজন শাসকের মধ্যেই ছিল; কারণ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ‘উমদাতুল কারী’ গ্রন্থে কাব বিন উজরা-এর এই বর্ণনাটি ইবনে খুজাইমার বরাতেও উল্লেখ করেছেন, যার অনুযায়ী কাব বিন উজরা সেই সময় এটিও বলেছিলেন:

“ما رأيت كال يوم قط امام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس” (আমি আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এমন কোনো ইমাম দেখিনি যে বসে খুতবা দেয়।)

(উমদাতুল কারী: ৬/২১৯, তাবা দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি)

সারকথা, সেই যুগে এই বিদআত দু-একজন গভর্নর শুরু করেছিলেন, তবে পরবর্তীতে বনু মারওয়ান এই রীতিকে তাদের স্থায়ী ঐতিহ্যে পরিণত করে।

দ্রষ্টব্য: আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকামের সম্বন্ধ তার মায়ের দিকে, তার আসল নাম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়াহ। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ৩৮০)

উম্মুল হাকাম আবু সুফিয়ান-এর কন্যা ছিলেন, অর্থাৎ আব্দুর রহমান হযরত মুয়াবিয়া-এর ভাগ্নে ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া তাকে ৫৮ হিজরীতে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। (তারিখে তাবারী: ১২/৩১২)

আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকামের কুফার ওপর শাসনকাল সংক্ষিপ্ত ছিল; কারণ সে একজন জিম্মিকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, যার ফলে হযরত মুয়াবিয়া তাকে পদচ্যুত করেন। (আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, রেওয়ায়েত ইবনুহু আব্দুল্লাহ: ২/৪৬৪, তাবা দারুল খানি)

[৩] মিরআতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান লিসিবতি ইবনিল জাওশী: ১২/১৫, তাবা আর-রিসালাতুল আলামিয়াহ; আল-ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত লিস সাফাদী: ১৭/২৩২

“قَدْ تَرِكَ مَا تَعْلَمُ” (যা তুমি জানো, তা পরিত্যক্ত হয়েছে)। [১]

বনু আব্বাস ক্ষমতা গ্রহণ করে বনু মারওয়ানের এই পুরনো বিদআতের অবসান ঘটায় এবং পুনরায় ঈদের নামাজের পর খুতবা দেওয়ার সুন্নাত চালু করে। [২] যেহেতু দুই-তিন প্রজন্ম ধরে ঈদের খুতবা নামাজের আগে হয়ে আসছিল, তাই সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ সেটিকেই সুন্নাত মনে করতে শুরু করেছিল। ফলে চারদিকে এই কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, বনু আব্বাস সুন্নাতের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে। অথচ তারা একটি বিদআতের অবসান ঘটিয়েছিল। যাই হোক, ধীরে ধীরে উলামা ও ফকীহদের তাত্ত্বিক প্রচেষ্টায় মানুষ নিশ্চিত হয় যে, সুন্নাত সেটিই যার ওপর তারা আমল করছে।

মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বনু আব্বাসের যুগকে এই দিক থেকে পছন্দ করতেন যে, নামাজে প্রচলিত কিছু বিদআত শেষ হয়েছিল এবং সেগুলোর স্থলে সুন্নাত পুনর্জীবিত হয়েছিল। এই কারণেই একবার হারুনুর রশীদ কুফার বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু বকর বিন আইয়াশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: “আপনি বনু উমাইয়াদের যুগও দেখেছেন এবং আমাদেরটিও। বলুন তো আমাদের মধ্যে কে উত্তম?”

আবু বকর বিন আইয়াশ (রহ.) উত্তর দিলেন:

“তারা নামাজের অধিক পাবন্দ (নিষ্ঠাবান) ছিল এবং তারা মানুষের জন্য অধিক উপকারী ছিল।” [৩]

হারুনুর রশীদ এই ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরের জন্য তাকে ছয় হাজার দিনার পুরস্কার দেন। [৪]

আবু বকর বিন আইয়াশ (রহ.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ এবং উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের দিক থেকে বনু উমাইয়ারা অগ্রগামী ছিল, যখন সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে বনু আব্বাস তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। তবে মনে রাখা দরকার যে, বনু আব্বাসের এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদা বজায় থাকেনি। কিছু খলিফা, যেমন মামুন এবং মুতাসিমের যুগে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু বিদআতের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৯৫৬, কিতাবুল জুমুআহ, বাবু খুরুজিল মুসাল্লা বি-গাইরি মিম্বার; সহীহ মুসলিম, হা: ২০৯০, কিতাব সালাতিল ঈদাইন; হা: ১৮৬, কিতাবুল ঈমান, বাবুনাহয়ি আনিল মুনকার মিনাল ঈমান।

ইবনে হাজম বলেন: বনু উমাইয়ারা নামাজের আগে খুতবা দেওয়া এবং আজান ও ইকামতের বিদআত চালু করেছিল। (আল-মুহাল্লা বিল আসার: ২৯৯/৩)

[২] আমাদের মধ্যে কেউ ঈদের নামাজের আগে খুতবা দেওয়ার প্রবক্তা নয়। এটি করা সুন্নাতের পরিপন্থী। যদি খুতবা নামাজের আগে দেওয়া হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা পুনরায় দিতে হবে, চাই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হোক না কেন। ইমাম মালিকের মতে, নামাজের পর পুনরায় খুতবা দেওয়া হবে যদি বেশি সময় অতিবাহিত না হয়। হানাফীদের মতে, ঈদের খুতবা নামাজের পরে দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ নামাজের আগে খুতবা দেয় তবে তা মাকরুহ হবে কিন্তু তা পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আল-ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাতাহ লিশ-শাইখ আব্দুর রহমান আল-জাযীরি: ৩২২/১, ত: আল-ইলমিয়াহ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খুতবা নামাজের পরেই ছিল, যতক্ষণ না বনু উমাইয়ারা খুতবাকে নামাজের আগে নিয়ে আসে। কারণ তারা তাদের খুতবায় এমন কথা বলত যা মানুষের জন্য শোনা হালাল ছিল না, তাই মানুষ নামাজ শেষ করে খুতবা না শুনেই চলে যেত, ফলে তারা খুতবাকে নামাজের আগে নিয়ে আসে যাতে মানুষ তা শুনতে বাধ্য হয়। (আল-মাবসুত লিস-সারখাসি: ৩৭/২)

যদি নামাজের আগে খুতবা দেওয়া হয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে কিন্তু তা করা মন্দ কাজ এবং নামাজের পর তা পুনরায় দেওয়া হবে না। (আল-জাওহরাতুন নাইয়্যিরাহ আলা মুখতাসারিল কুদুরী: ৯৪/১)

যদি নামাজের আগে খুতবা দেওয়া হয় তবে আমি মনে করি নামাজের পর খুতবা পুনরায় দেওয়া উচিত। (কিতাবুল উম্ম লিশ-শাফেয়ী: ২৭০/১)

যদি নামাজের আগে খুতবা দেওয়া হয় তবে জমহুর উলামাদের মতে তা ধর্তব্য হবে না। (আল-মুবাদি' ফী শারহিল মুকনি': ১৮৯/২)

[৩] বনু আব্বাস যখন খুতবার আগে নামাজ শুরু করল, তখন মানুষ চলে যেতে লাগল এবং তারা বলছিল: সুন্নাত বদলে গেছে, ঈদের দিনের সুন্নাত বদলে গেছে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫৬/৯)

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪৯৮/৮

বনু উমাইয়ার ওপর নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত কিছু বর্ণনার পর্যালোচনা

আব্বাসীয় বিপ্লব সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল; তাই এতে ব্যাপক রক্তপাত ঘটেছিল। একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত সরকারের তখত উল্টে দেওয়ার সময় যদি এই পরিমাণ অন্যায় রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে তা পার্থিব রাজনীতির বিচারে একটি সাধারণ বিষয়। হ্যাঁ, ইসলামি মূল্যবোধ অন্যায়ভাবে এত রক্তপাতের অনুমতি কখনোই দেয় না। কিন্তু বিপ্লবের উত্তাপ এবং প্রতিশোধ ও ক্ষমতার জোশ ও উন্মাদনার মধ্যেও ইসলামি দাবিগুলো মনে রাখা ইতিহাসে খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে; তাই বনু আব্বাসও এই বিপ্লবে নিজেদের হাতকে অন্যায় রক্তপাত থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তবে এ বিষয়ে যেখানে কিছু বর্ণনা বাস্তবসম্মত, সেখানে কিছু বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

এগুলোর মধ্যে একটি বিখ্যাত কাহিনী হলো, সাফফাহ-এর চাচা আবদুল্লাহ বনু উমাইয়ার ৮০ বা ৯০ জন আমিরকে নিজের সাথে দস্তুরখানে বসিয়ে রেখেছিলেন, এমন সময় একজন কবি এসে বনু উমাইয়ার জুলুম সম্পর্কে কিছু উস্কানিমূলক কবিতা শুনিতে দিলেন। যা শুনেই আবদুল্লাহ বনু উমাইয়ার সেই আমিরদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করালেন এবং এরপর সেই মুমূর্ষু ও ছটফট করতে থাকা মানুষদের ওপর দস্তুরখান বিছিয়ে খাবার খেলেন এবং বললেন: “আজ হুসাইন ইবনে আলীর প্রতিশোধ নেওয়া হলো।” [১]

এই ধরনের একটি ঘটনা সাফফাহ-এর দিকেও নিসবত করা হয় যে, সে বনু উমাইয়ার আমিরদের হত্যা করিয়ে তাদের লাশের ওপর বসে খাবার খেয়েছিল এবং বলেছিল: “খাবারে এমন স্বাদ আগে কখনো পাইনি।” এরপর তার নির্দেশে লোকেরা লাশগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল এবং সেগুলোকে রাস্তায় ফেলে দিল যাতে মানুষ তাদের ওপর অভিশাপ দিতে দিতে অতিক্রম করে। কুকুরগুলো সেই লাশগুলোকে ছিঁড়ে খেতে থাকল। যখন সেগুলো পচে গলে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল, তখন সেগুলোকে কোনো গর্তে ফেলে দেওয়া হলো। [২]

এই বর্ণনাগুলো অতিরঞ্জিত। এই ঘটনাগুলোকে এই ঢঙে আবুল ফারাজ ইসফাহানি ‘আল-আগানি’-তে এবং ইয়াকুবি তার ইতিহাসে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ শিয়া মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা শিয়া সরকার কায়েম করতে চেয়েছিলেন; তাই যেভাবে তারা বনু উমাইয়া সম্পর্কে অনেক মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা ছড়িয়েছেন, তেমনিভাবে বনু আব্বাসকে কলঙ্কিত করতে এবং মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিতেও লিপ্ত ছিলেন।

সঠিক কথা এতটুকুই যে, আবদুল্লাহ ইবনে আলী নহরে আবি ফিতরাসের তীরে আশিরও বেশি উমাইয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন, যেমনটি স্বয়ং আব্বাসীয় আমলের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক আল-বালায়ুরীর ‘তারিখ আনসাবুল আশরাফ’-এ বর্ণিত হয়েছে। [৩]

[১] তারিখ ইয়াকুবি, পৃ. ২৫১

[২] আল-আগানি লি-আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানি: ৪/৩৪৬, ৩৪৭, তাবা দারুল ফিকর

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৯/৩৩১, ৩৩২, তাবা দারুল ফিকর

লাশের ওপর দস্তুরখান বিছিয়ে খাবার খাওয়ার বিষয়টি না আব্দুল্লাহ বিন আলী সম্পর্কে প্রমাণিত, আর না সাফফাহ সম্পর্কে।

একটি কাহিনী এমনও আছে যে, সাফফাহর ভাই ইয়াহইয়া যখন মোসেলবাসীদের বিদ্রোহ দমন করতে যান, তখন সেখানে তাঁর বাহিনীর হাতে এগারো হাজার আমানপ্রাপ্ত (নিরাপত্তা প্রাপ্ত) আশ্রয়প্রার্থীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, নারী ও শিশুদের গণহত্যা করা হয় এবং বাহিনীর হাবশী সৈন্যেরা মোসেলের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন (ধর্ষণ) চালায়।

কিন্তু এই কাহিনী কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় বিদ্যমান নেই। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী কেবল ইবনুল আসীর (রহ.) এটি বর্ণনা করেছেন, তবে কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি; বরং শুরুতে এই শিরোনাম দিয়েছেন: ‘মোসেলে ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদের শাসনকাল এবং তাতে যা বলা হয়েছে তার বর্ণনা’। এখানে ‘যা বলা হয়েছে’ (মা কীলা) শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ভিত্তিহীন কথাগুলো বর্ণনা করে দিয়েছেন। [১]

এই ধরনের কাহিনী শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন এবং মোসেলে নিহতের সংখ্যা ১৮ হাজার উল্লেখ করে দাবি করেছেন যে, তাদের রক্তে দজলা নদী লাল হয়ে গিয়েছিল। [২]

বনু উমাইয়ার খলিফাদের লাশের অবমাননা করার কাহিনীগুলোও ইয়াকুবী অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সাফফাহ আব্দুল্লাহ বিন আলীকে লিখেছিলেন যে, বনু উমাইয়ার কাছ থেকে যেভাবে চাও তোমার প্রতিশোধ নাও। যেহেতু উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক সাফফাহর পিতা মুহাম্মাদ বিন আলীকে ষাটটি বেত্রাঘাত করেছিলেন; তাই আব্দুল্লাহ বিন আলী হিশামের লাশ কবর থেকে বের করান এবং প্রতিটি বেত্রাঘাতের বদলে তাকে দুটি করে বেত্রাঘাত করেন, এমনকি পুরো লাশ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। [৩]

অথচ হিশাম বিন আব্দুল মালিক সাদাত বংশের সকল মুরুব্বীদের সম্মান করতেন। কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নেই যে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আলীর ওপর জুলুম করেছিলেন। কেবল একবার তিনি তাঁকে বন্দী করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু পরে ক্ষমা করে দেন। [৪]

শিয়া বর্ণনাকারীদের বক্তব্য হলো, আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক জয় করে সেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে হত্যা করে এবং জামে মাসজিদে উমাবীতে সত্তর দিন পর্যন্ত আব্বাসীয় বাহিনীর ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। [৫]

কিন্তু তারিখুত তাবারী, আল-কামিল ফিত তারিখ, তারিখু ইবনে খালদুন এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সহ আহলে সুন্নাতের কোনো ঐতিহাসিক উৎসে এই বর্ণনা পাওয়া যায়নি; তাই এই বর্ণনাটি অত্যন্ত সন্দেহজনক।

আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা আন্দালুসে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ছাড়া বাকি সবাইকে তলোয়ারের নিচে ফেলে দেওয়ার (হত্যার) কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনো সূত্র দেননি। [৬] ইবনে খালদুন (রহ.)-ও এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়া বসরার সুলাইমান বিন আলীর নির্দেশে বনু উমাইয়ার গণহত্যা এবং তাদের লাশ টেনে নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলার ঘটনাগুলোও উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এই সবই ‘কীলা’ (বলা হয়েছে) শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন: ওয়াল্লাহু আ’লামু বি-সিহহাতি যালিক (আল্লাহই ভালো জানেন এগুলো সঠিক কি না)। [৭] এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.)-এর মনেও এই ঘটনাগুলোর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩২ হিজরী

[২] তারিখু ইয়াকুবী, পৃ. ২৫৪

[৩] তারিখু ইয়াকুবী: ২/২৫৪

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৮৫/৪

[৫] তারিখু ইয়াকুবী, পৃ. ২৫৪

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩২ হিজরী

[৭] তারিখু ইবনে খালদুন: ১৬৯/৩

সারকথা হলো, প্রাচীন উৎসগুলোতে শিয়া ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা এই অতিরঞ্জিত কথাগুলো বর্ণনা করতে দেখি না। খলিফা বিন খাইয়াত, ইমাম তাবারী এবং হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. উল্লিখিত নির্যাতনের কোনো বর্ণনা দেননি। আল্লামা ইবনে আসীর রহ. এগুলো বর্ণনা করেছেন তবে কোনো রেফারেন্স ছাড়াই। আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. এগুলো সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বালাজুরি বর্ণনা করেছেন যে, দামেস্ক দখলের পর উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. ব্যতীত সমস্ত উমাইয়া খলিফাদের কবর খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। [১] ইমাম তাবারী এবং বালাজুরি রহ. এই বর্ণনার ব্যাপারেও একমত যে, আব্দুল্লাহ বিন আলী নহরে আবি ফিতরাসে উমাইয়া আমিরদের হত্যা করেছিলেন। [২] হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেছেন যে, সাফফাহর চাচা দাউদ মক্কা ও মদিনায় বনু উমাইয়াদের হত্যা করেছিলেন। [৩] এখন প্রশ্ন হলো, তারা কতজন ছিলেন?

ইমাম খলিফা বিন খাইয়াত এবং ইমাম বালাজুরি রহ.-এর বর্ণনা থেকে এর স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায় যে, দামেস্ক বিজয়ের সময় উমাইয়া আমিরদের মধ্য থেকে ওয়ালিদ বিন মুয়াবিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল, অন্যদিকে মারওয়ানের নাতি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের প্রপৌত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল জব্বারকে গ্রেপ্তার করে শূলে চড়ানো হয়েছিল। এ ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন আলী বনু উমাইয়ার আশি জনেরও বেশি লোককে হত্যা করিয়েছিলেন। [৪] এতে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তরবারির জোরে অর্জিত এই বিপ্লবে জুলুম-নির্যাতন হয়েছিল এবং অনেক মানুষকে সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছিল, তবে এই বিষয়ে অতিরঞ্জিত বর্ণনাগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত। যতটুকু কথা বর্ণনা ও যুক্তির (রেওয়ায়েত ও দেওয়ায়েত) মাধ্যমে প্রমাণিত, তাকে সেই সীমা পর্যন্তই রাখা উচিত।

আব্বাসী খলিফাদের ওপর একটি আপত্তি:

সমস্ত আব্বাসী খলিফাদের ওপর অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আপত্তি করা হয় যে, তারা আরবদের পরিবর্তে অনারবদের (আজমিদের) ওপর ভরসা করেছিলেন। তাদের গাফিলতির কারণে ইরানিরা সমস্ত বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে, যার ফলে বিভিন্ন ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে এবং খেলাফত দুর্বল হতে থাকে।

কিন্তু এই আপত্তিটি একেবারেই ভাসাভাসা। প্রথম কথা হলো, বনু আব্বাসের খলিফাদের দরবার থেকে আরবরা কখনোই বিতাড়িত হয়নি। যেকোনো খলিফার নায়েব এবং শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নাম ও বংশ পরিচয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা স্বয়ং বনু আব্বাসেরই ছিল এবং এটা স্পষ্ট যে তারা সবাই আরব ছিলেন। তবে অনারব রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল যা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। বাস্তবতা হলো, কোনো আব্বাসী খলিফার পক্ষেই আরবদের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা সম্ভব ছিল না; কারণ সেই সময় পর্যন্ত ইসলাম এত দূর-দূরান্তের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আরবরা মুসলিম জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি পদগুলো যদি কেবল আরবদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হতো, তবে তা অন্য সমস্ত জাতির শোষণের সমতুল্য হতো, যা সমৃদ্ধির পরিবর্তে গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এটি একটি কৃত্রিম বিষয় হতো যা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারত না। এই নীতিটি এক প্রকার গোত্রীয় আধিপত্য হতো যা ইসলামী সাম্যেরও পরিপন্থী ছিল এবং প্রজ্ঞা ও রাজনীতিরও; তাই আব্বাসী খলিফারা আরবদের আগের মতো আধিপত্য ফিরিয়ে দিতে চাইলেও তা সম্ভব ছিল না।

[১] আনসাবুল আশরাফ লিল বালাজুরি: ১০৪/৪

[২] তারিখুত তাবারী: ৪৪২/৭; আনসাবুল আশরাফ লিল বালাজুরি: ১০৪/৪

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৮৬/১৩; হিজরি ১৩৩ সাল। এ ছাড়া হাফিজ জাহাবী ইমাম আওজায়ী (মৃত্যু ১৫৭ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আলী সিরিয়ায় বনু উমাইয়ার সত্তার জনেরও বেশি আমিরকে হাতুড়ি ও লাঠি দিয়ে হত্যা করেছিলেন এবং এরপর ইমাম আওজায়ী থেকে এর বৈধতা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২৪/৭)

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪০৩, ৪০৪; আনসাবুল আশরাফ: ৩৩২, ৩২৬/৯

আব্বাসীয় আন্দোলনের সাফল্য এবং একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন:

আপাতদৃষ্টিতে আব্বাসীয় নেতৃবৃন্দ সফল হয়েছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের পরিবারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বনু আব্বাসের রাজনীতির ধরণ অন্তত “ক্ষমতা হস্তান্তরের” পর্যায়ে অনুকরণীয় বলা যায় না; কারণ এর ফলে উম্মাহর মধ্যে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল, বিভ্রান্ত দলগুলোর সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের কারণে ভ্রান্ত বিশ্বাস, নীতিহীনতা ও আইনহীনতা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং রক্তপাত অব্যাহত ছিল। এগুলোর কোনোটিই ঈর্ষণীয় বা অনুকরণীয় নয়।

হ্যাঁ! আব্বাসীয় খলিফাদের অনেক কীর্তি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তাদের উত্থানের যুগটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সভ্যতা এবং সামাজিক দিক থেকে মুসলমানদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য হয়। পতনের যুগেও এই খিলাফতের বরকত ছিল যে, মুসলমানরা বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার শিকার হওয়া সত্ত্বেও কোনো না কোনো স্তরে একটি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিল।

এই কারণেই আব্বাসীয় বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “খিলাফত বনু আব্বাসের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত, কিন্তু আল্লাহর কসম! যেভাবে এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, তা আমাদের কাছে অপছন্দনীয়; কারণ এতে রক্তপাত, কারাবরণ এবং লুটতরাজ হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জানমাল রক্ষা করা সত্ত্বেও একটি জালেম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এমন সরকারকে ন্যায়পরায়ণ বলা যায় না যার উপস্থিতিতে হারাম কাজ সংঘটিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ইনসাফ কোথায়? এটি তো একটি খোরাসানি ও আজমি স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। হায়! এই রাতটিও গত রাতের মতোই (অন্ধকার) প্রমাণিত হলো।” [১]

সত্য এই যে, বনু উমাইয়া শাসকদের ভুলের জবাবে বনু আব্বাস পাল্টা জবাব হিসেবে দ্বীন-বহির্ভূত রাজনীতির পথ অবলম্বন করে এত বড় ভুল করেছিল যে, বছরের পর বছরের সেই সমস্ত সংগ্রাম, সেই সমস্ত পরিশ্রম এবং মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের সেই সমস্ত ব্যবহার উম্মাহর লাভ-ক্ষতির বিচারে সম্পূর্ণ বৃথা গেল, যার মাধ্যমে এক পরিবার অন্য পরিবারের ওপর বিজয়ী হয়েছিল।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৫৮

আবু জাফর আল-মানসুর

عبدالله بن محمد

যিলহজ ১৩৬ হিজরী..... থেকে..... যিলহজ ১৫৮ হিজরী

জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ..... থেকে..... অক্টোবর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

সফফাহ-এর পর তার বড় ভাই আবু জাফর আল-মানসুর ৪১ বছর বয়সে খলিফা হন। তিনি ছিলেন গন্দমী বর্ণের, দীর্ঘদেহী, পাতলা দাড়ি এবং লম্বা জুলফি বিশিষ্ট যুবক। শরীর ছিল দোহারা ও পাতলা। বড় বড় চোখে সংকল্পের বিদ্যুৎ চমকাত। তিনি তার যৌবনকালে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। [১]

তিনি পুরো বাইশ বছর শাসন করেন এবং সমস্ত বিদ্রোহী ও বিরোধীদের দমন করে আব্বাসীয় খিলাফতকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তিনি অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন যার মধ্যে সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল ‘দারুল খিলাফত’ বাগদাদ নির্মাণ। মানসুর ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি পুরো মুসলিম বিশ্বে কেন্দ্রীয় খিলাফতের নিয়ন্ত্রণ মজবুত রাখার জন্য অনেক রাজনৈতিক কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি কাউকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো কোনো প্রদেশের নিরঙ্কুশ শাসক হতে দেননি, বরং গভর্নরদের ক্ষমতা সীমিত রাখেন এবং তাদের দ্রুত পরিবর্তন করতেন। তিনি খলিফার আধ্যাত্মিক মর্যাদা জাগ্রত করে মুসলমানদের অন্তরকে কেন্দ্রীয় খিলাফতের প্রতি অনুগত করার চেষ্টাও করেন এবং এক পর্যায়ে এতে সাফল্য লাভ করেন। বনু আব্বাসে মানসুরের মর্যাদা ঠিক তেমনই ছিল যেমন বনু উমাইয়াতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ছিল। আব্বাসীয় বংশের শাসনকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা ছিল তারই।

বিরোধীদের অবসান..... চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর সাথে সংঘাত:

মানসুর ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সফফাহ-এর সাফল্যে আবদুল্লাহ বিন আলীর বড় হাত ছিল; তিনিই জাব-এর যুদ্ধে শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান সানিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন এবং উমাইয়াদের...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪৫৯/১৩, তরজমা: আবু জাফর আল-মানসুর, সন ১৫৮ হিজরী।

নোট: সফফাহ এবং মানসুর উভয়ের আসল নাম আবদুল্লাহ ছিল, তারা বৈমাত্রের ভাই ছিলেন। মানসুর সফফাহ থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। সফফাহ-এর মারীতা বিনতে উবায়দুল্লাহ হারিসী, মানসুরের মা সালামা বারবেরী ছিলেন। (আত-তারীখুল ইসলামী, মাহমুদ শাকের: ৬৬/৫, ৯২) সম্ভবত খাঁটি আরব হওয়ার কারণে সফফাহ আগে শাসনভার পেয়েছিলেন।

সিরিয়ার কেন্দ্র জয় করেছিলেন। তার সেবার বিনিময়ে সাফফাহ তাকে ওয়াদা করেছিলেন যে, তার পরে খেলাফত তাকে অর্পণ করবেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তার ভাই আবু জাফর মনসুরের জন্য খেলাফতের ওসিয়ত করে যান। আবদুল্লাহ বিন আলী ভাতিজাদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। মনসুরের সিংহাসন আরোহণের খবর শোনামাত্রই তিনি বায়াত হতে অস্বীকার করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে আল-জাজিরার হাররান অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

মনসুর তার চাচার মোকাবিলা করার জন্য আবারও পুরনো অনুগত আবু মুসলিম খোরাসানিকে পরীক্ষা করলেন। আবু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন আলীকে পরাজিত করেন এবং তিনি পালিয়ে গিয়ে বসরায় তার ভাই সুলাইমান বিন আলীর কাছে আত্মগোপন করেন। মনসুর তাকে হত্যা করতে বন্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু সুলাইমান বিন আলী এসে তার প্রাণভিক্ষার জন্য জোরালো সুপারিশ করেন।

অবশেষে মনসুর রাজি হলেন। আবদুল্লাহ বিন আলীকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। নয় বছর পর কারাগারের গরাদের পেছনেই তার আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হলো। [১] এটি ছিল সেই ব্যক্তির পরিণতি, যে বংশীয় গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে অন্য বংশের নিরপরাধ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের বংশের হাতেই অপমানজনক মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হলো।

আবু মুসলিম খোরাসানির পরিণতি:

আবু মুসলিম খোরাসানি তার রাজনীতি, ধূর্ততা এবং চতুরতার মাধ্যমে বনু আব্বাসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর বিরোধীদের বেছে বেছে নির্মূল করেছিলেন; তাই তিনি পুরো সাম্রাজ্যের ওপর নিজের একচেটিয়া অধিকার মনে করতেন এবং খলিফাকে নিজের মুখাপেক্ষী ভাবতেন। সাফফাহর শাসনামলের শেষ পর্যন্ত তিনি খোরাসানেই অবস্থান করেন এবং এক অর্থে সেখানে তিনি নিজের একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেকোনো বড় পদক্ষেপের জন্য তিনি খলিফাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির ইরাকে এসে সাফফাহর কাছে ব্যক্তিগতভাবে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আবু মুসলিম নিজেকে সাফফাহর অভিভাবক মনে করতেন; তাই তিনি তার কাছে উপস্থিত হওয়াও পছন্দ করেননি। অবশেষে সাফফাহ তার ভাই মনসুরকে খোরাসানে তার কাছে পাঠান যাতে তার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়াত গ্রহণ করা যায়। মনসুর সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে অনুভব করলেন যে, আবু মুসলিমের অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি ফিরে এসে সাফফাহকে পরামর্শ দিলেন যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তাকে খতম করে দেওয়া উচিত। সাফফাহ এই পরামর্শের সাথে একমত হলেন, কিন্তু তিনি এই কাজের জন্য উপযুক্ত সুযোগ পাননি।

খোরাসানে সুলাইমান বিন কাসীর আব্বাসী খেলাফতের একজন বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যিনি বিপ্লবের সাফল্যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আবু মুসলিম কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করিয়েছিলেন। মনসুর এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে সাফফাহকে বললেন:

“আপনি যদি আবু মুসলিমকে ছেড়ে দেন, তবে আপনি খলিফা থাকতে পারবেন না; কারণ সে যা চায় তাই করে ফেলে।” [২]

এদিকে আবু মুসলিমও সাফফাহ ও মনসুরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন; তাই তিনি খোরাসান ছাড়াও সিরিয়া ও হিজাজের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেন। যাতে খলিফারা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলেও করতে না পারেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩০৩ থেকে ৩০৬, আনসাবুল আশরাফ: ৪/১১৬ থেকে ১১৩

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫/২৯, ১৩৬ হিজরির অধীনে

তারিখ উম্মতে মুসলিম

ইচ্ছাশক্তি এবং লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অবগত ছিল; তাই তার খলিফা হওয়াতে সে মোটেও খুশি হয়নি। সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নররা মনসুরের সিংহাসন আরোহণে তাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আবু মুসলিম এইটুকু কষ্টও করেননি। অবশেষে মনসুরের পক্ষ থেকে তাকে একটি তিরস্কারমূলক পত্র লেখা হলে তখন সে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দনের বার্তা পাঠায়। মনসুর এই সংবাদও পান যে, আবু মুসলিম তার পত্রগুলোকে অবজ্ঞার সাথে একপাশে ছুড়ে ফেলে বিদ্রপাত্মক অউহাসি দেয়। এখন মনসুর নিশ্চিত হলেন যে সে বিদ্রোহ করতে উদ্যত। [১]

এই সময়ে আবু মুসলিম মনসুরের আদেশে আল-জাজিরায় গিয়ে আবদুল্লাহ বিন আলীকে দমন করেন যাতে এই উছলায় সিরিয়া এবং এর আশপাশের অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু মনসুর তার স্বৈরাচারী হওয়ার পথ রুদ্ধ করার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন আলীকে পরাজিত করে আবু মুসলিম বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেছিলেন। মনসুর একজন কর্মকর্তা পাঠালেন যাতে তিনি আবু মুসলিমের কাছ থেকে গনিমতের মালের হিসাব গ্রহণ করেন। আবু মুসলিম এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন:

“প্রাণ নেওয়ার ব্যাপারে আমার ওপর আস্তা আছে আর সম্পদের ব্যাপারে নেই।” [২]

তিনি মনসুরকে পরিস্কারভাবে লিখে দিলেন:

“আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষাকারী খলিফার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু খলিফা আমাকে কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করেছেন এবং কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে আমার তলোয়ারকে কোষমুক্ত করিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি দয়া-মায়্যা ত্যাগ করি, ওজর কবুল না করি, কারো বিচ্যুতি ক্ষমা না করি। সুতরাং আমি আপনার সালতানাতের খাতিরে এই সবকিছু করেছি। কিন্তু এখন আল্লাহ আমাকে তাওবা করার তাওফিক দিয়েছেন। এখন যদি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন তবে তা তাঁর মেহেরবানি। আর যদি শাস্তি দেন তবে আমার মন্দ আমল এরই যোগ্য।” [৩]

মনসুর এবং আবু মুসলিমের মধ্যে উত্তেজনা ও অনাস্থার এই পরিবেশ বাড়তে থাকে। অবশেষে মনসুর দূত পাঠিয়ে আবু মুসলিমকে মানাতে এবং নিজের কাছে ডাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবু মুসলিমের উপদেষ্টারা তাকে বোঝালেন যে, মনসুরের কাছে যাওয়ার অর্থ হলো নিজের মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়া; খোরাসানে সেনাবাহিনী এবং জনগণ সবাই আমাদের আপন। মনসুর যদি আমাদের বহাল থাকতে দেন তবে ঠিক আছে, অন্যথায় আমরা তার মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট।

মনসুরও দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। আবু মুসলিম যদি ধূর্তদের ধূর্ত হয়ে থাকেন, তবে মনসুরও সাধারণ কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি আবু মুসলিমকে বশ করার জন্য ত্রিমুখী চাল চালতে শুরু করলেন। ওই সময় আবু মুসলিম আল-জাজিরায় অবস্থান করছিলেন; মনসুর চেয়েছিলেন তিনি যেন কোনোভাবেই খোরাসানে ফিরে যেতে না পারেন। এজন্য তাকে সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর নিযুক্তির ফরমান লিখে পাঠালেন। আবু মুসলিম বুঝে ফেললেন যে, এটি তাকে খোরাসানের মুকুটহীন বাদশাহি থেকে বঞ্চিত করার একটি চাল। তিনি এই আদেশনামা প্রত্যাখ্যান করে খোরাসানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেখানে তিনি আবু দাউদ নামক এক ব্যক্তিকে নায়েব বানিয়ে এসেছিলেন। এদিকে মনসুর দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে আবু দাউদকে প্রস্তাব দিলেন যে, যদি তিনি আবু মুসলিমকে খোরাসানে ফিরে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেন, তবে বিনিময়ে তাকেই খোরাসানের গভর্নর বানিয়ে দেওয়া হবে।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/৩০৬

[২] তারিখুত তাবারি: ৭/৪৮২, ৪৮৩

[৩] তারিখুত তাবারি: ৭/৪৮৩, ৪৮৪; আনসাবুল আশরাফ: ৪/২০৩, ২০৪

আবু দাউদের জন্য এই প্রলোভন ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তিনি তাঁর মনিব আবু মুসলিমের কাছে বার্তা পাঠালেন:

“আহলে বাইতের খলিফাদের ওপর অসন্তুষ্ট থাকা সমীচীন নয়। আপনি তাঁদের ইচ্ছা ব্যতীত খোরাসানে ফিরে আসবেন না। প্রথমে তাঁদের কাছে গিয়ে মিটমাট ও সমঝোতা করে নিন।”

আবু মুসলিম তখন ইরাকের সীমান্তবর্তী শহর হুলওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই চিঠি পাওয়ার পর তিনি খোরাসানের সফর স্থগিত করলেন এবং চিন্তায় মগ্ন হলেন।

অবশেষে তিনি অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর ডান হাত (প্রধান সহযোগী) আবু ইসহাককে মনসুরের কাছে পাঠালেন যাতে খিলাফত দরবারের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায়। আবু ইসহাক যখন রাজধানী পৌঁছালেন, তখন মনসুরের নির্দেশে রাষ্ট্রের সকল আমীরগণ তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দিলেন। স্বয়ং মনসুর তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে এত সম্মান ও মর্যাদা দিলেন যে আবু ইসহাকের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এরপর মনসুর তাঁকে বললেন যে, কোনোভাবে আবু মুসলিমকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো, বিনিময়ে তোমাকে খোরাসানের শাসনভার দিয়ে দেওয়া হবে।

আবু ইসহাক প্ররোচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হুলওয়ানে ফিরে গেলেন এবং নিজের সম্মান ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আবু মুসলিমকে আশ্বস্ত করলেন যে, মনসুর আপনার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর সম্পর্কে আপনার সমস্ত সন্দেহ ভিত্তিহীন। তাঁর কাছে অবশ্যই যাওয়া উচিত যাতে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আবু ইসহাকের ওপর আবু মুসলিমের অগাধ আস্থা ছিল; তাই এসব কথায় বিশ্বাস করে তিনি খোরাসানের সফর ত্যাগ করে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মাদায়েনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যেখানে মনসুর তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন।

মনসুর তাঁকে আরও নিশ্চিত করার জন্য আরেকটি চাল চাললেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা পথে আবু মুসলিমের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন: “আমি চাই খলিফা আমাকে ‘কাসকার’-এর শাসনভার দান করুন; কারণ আজকাল সেখানকার উৎপাদন অনেক বেশি। আপনি যদি খলিফার সাথে সাক্ষাতের সময় আমার জন্য সুপারিশ করেন তবে কাজ হয়ে যাবে।”

আবু মুসলিম এটি শুনে খুব খুশি হলেন এবং ভাবলেন যে মনসুরের কাছে তাঁর এখনও অনেক ঊঁচু মর্যাদা রয়েছে।

সেই আমীর আরও বললেন: “আজকাল খলিফা তাঁর উজির আবু আইয়ুবের ওপরও কিছুটা অসন্তুষ্ট। আপনি সুপারিশ করলে আবু আইয়ুবের প্রতি খলিফার অসন্তুষ্টিও দূর হতে পারে।”

একথা শুনে আবু মুসলিমের অবশিষ্ট সন্দেহটুকুও দূর হয়ে গেল। তিনি পূর্ণ নিশ্চিত্তে সফর করে মাদায়েন পৌঁছালেন। এখানে সকল আমীর ও কর্মকর্তাগণ তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দিলেন। মনসুরও খুব খাতির-যত্ন করলেন এবং পরের দিন বিশেষ সাক্ষাতের সময় দিলেন। মনসুর এবং তাঁর উজির আবু আইয়ুব আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে এই সাক্ষাতেই আবু মুসলিমকে খতম করে দেওয়া হবে।

পরের দিন যখন আবু মুসলিম মনসুরের খাস কামরায় সাক্ষাতের জন্য পৌঁছালেন, তখন পর্দার আড়ালে তলোয়ারধারী সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন মনসুর আবু মুসলিমকে তাঁর ধৃষ্টতাগুলো একে একে মনে করিয়ে দিতে শুরু করলেন।

আবু মুসলিম তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকলেন। যখন মনসুরের রাগ তবুও থামল না, তখন আবু মুসলিম বললেন:

“আমীরুল মুমিনীন! আমি ভেবেছিলাম যে আপনার অসন্তুষ্টি দূর হয়ে গেছে এবং আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।”

মনসুর বললেন: “আল্লাহর কসম! আমার রাগ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।”

আবু মুসলিমের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল যে তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এবং এখন মৃত্যু তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে শেষ চেষ্টা হিসেবে বলল: “আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার সালতানাতের জন্য যা কিছু করেছি তা সারা দুনিয়া জানে।”

মনসুর বললেন: “আমরা যা কিছু পেয়েছি তা আমাদের নসীব এবং আমাদের সৌভাগ্য। তুমি যে কাজ করেছ তা তো কোনো হাবশী দাসীও করতে পারত।”

এ কথা বলে তিনি তালি বাজালেন। জল্লাদরা তৎক্ষণাৎ ভেতরে এল এবং তলোয়ার উঁচিয়ে আবু মুসলিম খোরাসানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যখন তার ওপর তলোয়ারের প্রথম আঘাত লাগল, তখন সে কাতরাতে কাতরাতে বলল:

“আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আমার শত্রুদের দমনের জন্য জীবিত থাকতে দিন।”

মনসুর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন: “তোর চেয়ে বড় আমার শত্রু আর কে হতে পারে।”

পরের মুহূর্তেই সৈন্যরা আবু মুসলিমের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তারপর লাশ দজলা নদীর ঢেউয়ের বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনাটি ১৩৭ হিজরীর ২৬ শাবানের। আবু মুসলিমের বয়স ছিল ৩৮ বছর। [১]

এভাবে দ্বিতীয় হিজরী শতকের এই তুখোড় রাজনীতিবিদ, যার বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক দক্ষতা কয়েক বছরের মধ্যে উমাইয়া শাসনকে ধ্বংস করে তাদের লাশের ওপর আববাসীয়দের ক্ষমতার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, সরকারি প্রাসাদে মাত্র পাঁচ বছর কাটিয়ে এক শিক্ষণীয় পরিণতির সম্মুখীন হলো। সে অন্যদের সাথে যা করেছিল, তার সাথেও ঠিক তেমনটিই ঘটল।

আবু মুসলিম খোরাসানীর হত্যাকাণ্ডে খোদ বনু আব্বাসের অনেক শীর্ষস্থানীয় আমীর দুঃখিত হলেন। ঈসা বিন মুসা আববাসী, যাকে সাফফাহ মনসুরের পর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন, এই খবর শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন:

“আমীরুল মুমিনীন! আপনি জানতেন যে ইমাম ইবরাহীম তার ব্যাপারে সদাচরণের অসিয়ত করেছিলেন! আপনি জানেন সে আমাদের কতটা আনুগত্য করেছে, কতটা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল!!”

মনসুর অবহেলার সাথে বললেন: “হে সরল মানুষ! যমীনের বুকে এর চেয়ে বড় আমাদের শত্রু আর কেউ ছিল না। সে বেঁচে থাকতে তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব চলত না। এখন আল্লাহ তোমাদের দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন।” [২]

আবু মুসলিমকে খতম করে মনসুর একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় এই পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন এবং বলেন:

“হে লোকসকল! আমরা না তোমাদের অধিকার ভুলেছি, না তোমাদের সাথে সদাচরণের কথা বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু যে আমাদের থেকে এই ক্ষমতার পোশাক ছিনিয়ে নিতে চাইবে, তাকে তলোয়ার দিয়ে জবাব দেওয়া হবে। আবু মুসলিমও আমাদের কাছে এই কথার ওপর বায়আত করেছিল”

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৮৫, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/৩১০ থেকে ৩১৩, আনসাবুল আশরাফ: ২/২০৩ থেকে ২১০

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৪৯২

“যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার রক্ত হালাল হবে। সে আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অবাধ্যতা করেছে এবং অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছে। আমরা তার ব্যাপারে সেই নির্দেশই জারি করেছি যা সে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অন্যদের জন্য জারি করত। সে শুরুতে ভালো ছিল এবং শেষে খারাপ হয়েছে। তার অধিকারগুলো আমাদের তার ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।” [১]

কিছু লোক আবু মুসলিম খোরাসানিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতিয়ার বা ভ্রান্ত আকিদার মানুষ বলে থাকে, কিন্তু হাফিজ ইবনে কাসির রহ. এই কথাগুলোকে সন্দেহজনক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানির চরিত্রের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“কিছু লোক তার ইসলামকে সন্দেহজনক বলে অভিহিত করেছে এবং তার ওপর ধর্মহীনতার অভিযোগ এনেছে, কিন্তু আমি তাদের উল্লিখিত অভিযোগগুলোর কোনো দলিল পাইনি। বরং এর বিপরীতে এমন বর্ণনা পাওয়া গেছে যে, সে নিজের গুনাহের কারণে আল্লাহকে ভয় করত এবং আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সে যে রক্তপাত করেছিল, তা থেকে তওবা করার দাবিদার ছিল। তার অবস্থার প্রকৃত হাকিকত আল্লাহই ভালো জানেন।” [২]

হাফিজ ইবনে কাসির রহ. সতর্ক অবস্থান এই জন্যই গ্রহণ করেছেন যে, তিনি আবু মুসলিমের কোনো কুফরি কথা বা কাজ পাননি। তবে পরবর্তীতে আবু মুসলিমের অনুসারীরা যেভাবে জিন্দিকি (ধর্মদ্রোহী) আন্দোলনগুলো চালিয়েছে এবং ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক আকিদা ও মতাদর্শ প্রচার করেছে, সেগুলো বিবেচনা করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আকবর শাহ নজীবাবাদীর একটি বিশ্লেষণও উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে হচ্ছে। তিনি মনসুর এবং তার উত্তরসূরিদের যুগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনগুলোর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“এরা সবাই আবু মুসলিমের জামাতের লোক ছিল। আর এগুলো ছিল আবু মুসলিমেরই অদ্ভুত সব দাওয়াত ও তাবলিগের কারিশমা। সে যে স্তরের এবং যে ধরনের মানুষ দেখত, তাদের অবস্থা অনুযায়ী নিজের দাওয়াতের রঙ পরিবর্তন করে তাদের সামনে পেশ করত। এই সমস্ত ফেরকা ছিল আহলে বাইতের দাওয়াতকে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালার ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল।” [৩]

পাঠকগণ! এই নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনগুলোর পর্যালোচনা আমরা পরবর্তী পণ্ডিতগণুলোতে করছি।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩২৩, ৩২৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩২৪

[৩] তারিখ-ই-ইসলাম, নজীবাবাদী: ২/৬৮

বিশ্বাসগত ফিতনাসমূহ

মনসুরের যুগে আমরা বিশ্বাসগত ফিতনার একটি নতুন ঢেউ উঠতে দেখি, যার শিকার মূলত অনারবরাই (আহল-এ-আজম) হয়েছিল। এই পরিবর্তনের পেছনে একগুচ্ছ কারণ সক্রিয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অনারবদের মধ্যে অনেকেই বংশীয় অহংকার ও গর্বে লিপ্ত ছিল এবং তারা আরবদের তুচ্ছজ্ঞান করত। হিজরি প্রথম শতাব্দীতে যখন তারা আরবদের কাছে পরাজিত হয়, তখন শুরুতে তারা চরম হীনম্মন্যতা বোধ করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায়বিচার, সাহাবী ও তাবেরীদের উত্তম চরিত্র এবং উম্মতের আলেমদের উজ্জ্বল ভূমিকা তাদের মন জয় করে নেয়। তারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইসলামী সমাজে এমনভাবে মিশে যায় যে তারা পূর্ণ সমতা লাভ করে। কিন্তু উমাইয়া খিলাফতের সময় আরব ও অনারবদের মধ্যকার পার্থক্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এরপর যখন আব্বাসী আন্দোলন শুরু হয়, তখন আরব ও অনারবদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায়।

উমাইয়াদের আস্থা ছিল আরবদের ওপর এবং আব্বাসীদের জনশক্তির মূল ভিত্তি ছিল অনারবরা। অনারবদের একটি বড় অংশ এই প্রত্যাশায় আব্বাসীদের পক্ষ নিয়েছিল যে, যখন আমাদের সাহায্যে নতুন সরকার গঠিত হবে, তখন দেশের শাসনভার আমাদের হাতে থাকবে। তাদের এই প্রত্যাশা এক পর্যায়ে পূরণও হয়েছিল এবং উমাইয়া আমলের বিপরীতে আব্বাসী আমলে অনারব আমিররা দিন দিন উন্নতি লাভ করতে থাকে। সরকারি নীতি পরিবর্তনের পেছনে সক্রিয় মূল চিন্তাটি ইতিবাচক ও সঠিক ছিল যে, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সকল মুসলমান অধিকার ও উন্নতির সুযোগের ক্ষেত্রে সমান। নিশ্চিতভাবেই মুসলিম অনারবদের অধিকার ছিল যে তাদের জন্য উন্নতির পথ উন্মুক্ত রাখা হবে। কিন্তু যা ঘটেছিল তা হলো, কিছু চরমপন্থী অনারব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ইসলামী সমতার সীমা লঙ্ঘন করে আরবদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোকে তাদের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয় এবং এভাবে মুসলিম বিশ্বে ‘শুউবিয়া আন্দোলন’ জন্ম নেয়, যার ভিত্তি ছিল বংশীয় বিদ্বেষ।

ঘৃণার এই ঢেউয়ের পেছনে অনারব গোঁড়ামি ছাড়াও খ্রিস্টধর্ম ও রাফেজি মতাদর্শও সক্রিয় ছিল এবং বাড়তে বাড়তে আরবদের প্রতি এই ঘৃণা অনারব ‘জিন্দিকতা’ অর্থাৎ পূর্ণ ধর্মহীনতার রূপ ধারণ করে। ‘জিন্দিকতা’ শব্দটি অগ্নিপূজকদের নেতা ‘জরথুষ্ট্র’-এর ধর্মীয় গ্রন্থ ‘জেন্দ আবেস্তা’-এর সাথে সম্পর্কিত; কারণ এই মতাদর্শের প্রচারকারীরা অন্তরে অগ্নিপূজক ছিল এবং তারা মানুষকে যুহদ ও ইবাদতের বেশে ধীরে ধীরে ‘জেন্দ আবেস্তা’-এর শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করত। পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে বিকৃত করার জন্য তারা মিথ্যা হাদীস জাল করে প্রচার করত। এমনই একজন দাজ্জাল ছিল ইবনে আবিল আওজা, যাকে মনসুরের গভর্নর মুহাম্মদ বিন সুলাইমান মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে সে নিজে শপথ করে বলেছিল: ‘আমি চার হাজার [হাদীস জাল করেছি]।’

...নিজে হাদিস জাল করে ছড়িয়েছে যাতে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয়েছে। আমি তোমাদের রোজার দিনগুলোতে বসে পানাহার করতাম এবং যে দিনগুলোতে তোমাদের নিকট রোজা রাখা হারাম ছিল, সে দিনগুলোতে আমি রোজা রাখতাম। [১]

এমন কিছু যিন্দিক বিদ্রোহী আন্দোলনও গড়ে তুলেছিল যা আবু মুসলিম খোরাসানির হত্যার কিছুকাল পরেই শুরু হয়েছিল।

সানবাজ মজুসির বিদ্রোহ:

আবু মুসলিমের হত্যার কয়েক সপ্তাহ পর তার এক মজুসি ভক্ত সানবাজ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে আবু মুসলিমের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং ইসফাহান থেকে রে (বর্তমান তেহরান) পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেয়। সে আরবদের ঘোর শত্রু ছিল, তাদের ধরে ধরে অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করত। সে দাইলামের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মজুসি বংশোদ্ভূত আমিরদের কাছে বার্তা পাঠায় যে, আরবদের শাসন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের সাথে যোগ দাও। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মজুসি তার চারপাশে সমবেত হয়।

মনসুরের শাসনামল প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং রাজনীতির নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে মোটেও প্রশংসনীয় নয়। তবে তার একটি গুণের কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সে সঠিক আকিদার মুসলিম ছিল এবং মুসলিম সমাজে কোনো আকিদাগত বিচ্যুতি বা ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দিত না।

সে এ জাতীয় সকল আন্দোলনকে অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করে। সে সানবাজের বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য পাঠায়। সানবাজ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। হামাদানের কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সরকারি বাহিনী তাকে পরাজিত করে, তার ষাট হাজার ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। সে নিজে গ্রেফতার হয় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। [২]

রাওয়ান্দী আন্দোলন:

কিছুকাল পর একই অঞ্চল থেকে আরও একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে যাকে ‘রাওয়ান্দী আন্দোলন’ বলা হতো; কারণ এর কেন্দ্র ছিল ইসফাহানের পার্শ্ববর্তী একটি জনপদ ‘রাওয়ান্দ’। ইরানি সাম্রাজ্যে যেভাবে কিসরাকে খোদায়ী শক্তি ও ক্ষমতার আধার এবং পবিত্র সত্তা মনে করে তার ইবাদত করা হতো, ঠিক তেমনি এই লোকগুলোও মুসলিম শাসকদের মধ্যে খোদার হুলুল (অনুপ্রবেশ) করার ভ্রান্ত আকিদা ছড়াচ্ছিল। তাদের মতবাদ ছিল এই যে, ঈসা ইবনে মারিয়ামের রুহ হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের মধ্যে হুলুল করেছিল, তাঁর পর তাঁর বংশধরদের সকল ইমামের মধ্যে এই রুহ একইভাবে অনুপ্রবেশ করতে থাকে এবং একজনের থেকে অন্যজনে স্থানান্তরিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রপৌত্র ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদের মধ্যে চলে আসে।

এই লোকগুলো নিজেদের আবু মুসলিম খোরাসানির মুরিদ বলে দাবি করত। তাদের বক্তব্য ছিল যে, আবু মুসলিম নিহত হননি বরং যখন তাঁর ওপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, তখন তিনি ইসমে আজম পাঠ করে বেঁচে যান এবং একটি কবুতরের রূপ ধারণ করে উড়ে যান। অচিরেই তিনি ফিরে আসবেন। এই আকিদাটি পারস্যের পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছিল; কারণ পারস্যবাসীরা তাদের বিজয়ীদের সম্পর্কে এমন অনেক গল্প শোনাত যে, তারা মরেও মরেনি বরং অন্য কোনো রূপ ধারণ করেছে এবং শীঘ্রই তাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তাদের মধ্যে কিছু লোকের মূর্খতা...

[১] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযি: ১৮৫/৮, হিজরি ১৫৫ সাল।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/২২৬, ২৭; আনসাবুল আশরাফ: ৯/২৪৬, ২৪৭। নোট: সানবাজ-কে সানফাজ এবং সিন্দবাদও লেখা হয়েছে।

এখানে তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা উচ্চস্থান থেকে ঝাঁপ দিত যাতে তাদের ইমামের অনুসরণে উড়তে পারে। এটি ভিন্ন কথা যে তাদের মধ্যে কেউ জীবিত বাঁচতে পারত না। হওয়া তো উচিত ছিল এই যে, আবু মুসলিমের এই মুরিদরা খলিফা মনসুরের ঘোর বিরোধী হতো, কিন্তু এর বিপরীতে তারা মনসুরকেও “মঘহারে খোদা” বলে তার ইবাদতের দাওয়াত দিত। যারা অস্বীকার করত, তারা তাদের হত্যা করতেও দ্বিধা করত না। তাদের স্লোগান ছিল: “আনতা আনতা” (তুমিই তুমি)। অর্থাৎ তুমিই খোদা। (নাউযুবিল্লাহ)।

স্পষ্ট যে, এই ফেরকার দাওয়াতদানকারীরা ইসলামের রূপ বিকৃত করতে চেয়েছিল। মনসুরের প্রতি তাদের কোনো ভক্তি ছিল না, না ছিল সাদাতদের প্রতি। তারা তাদের নাম ব্যবহার করে একটি আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করতে এবং ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল।

মনসুর এই লোকদের মিথ্যা ভক্তি ও কুচিন্তাকে চরম ঘৃণার চোখে দেখেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ১৩১ হিজরিতে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু এই কু-আকিদাহ সম্পন্ন লোকদের শক্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা কুফার জেল ভেঙে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে যায়।

মনসুর তখন সেখানেই রাজপ্রাসাদে ছিলেন। এই লোকেরা তার খোদায়ীর স্লোগান দিতে দিতে প্রাসাদ তাওয়াফ করতে শুরু করে। মনসুর জোশে উদ্বেলিত হয়ে তখনই পদব্রজে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। প্রচণ্ড লড়াইয়ে তিনি নিজেই বিপদের মুখে পড়ে যান। এই সময়ে মা’ন বিন যায়দাহ নামক একজন পলাতক আমির হঠাৎ সামনে এসে অসাধারণ আত্মত্যাগের পরিচয় দেন এবং মনসুরকে রক্ষার জন্য তার ডানে-বামে লড়তে থাকেন। তার বীরত্ব এবং মনসুরের দৃঢ়তার কারণে এই কু-আকিদাহ সম্পন্ন লোকেরা পরাজিত হয় এবং প্রায় সকলেই নিহত হয়। [১]

মা’ন বিন যায়দাহর হত্যা:

মা’ন বিন যায়দাহ আরব গোত্র বনু শায়বানের একজন বিখ্যাত সর্দার ছিলেন। বনু উমাইয়াদের যুগে তার অনেক মান-মর্যাদা ছিল এবং তিনি মোসেলের উমাইয়া শাসক ইয়াযিদ বিন হুবায়রার ডান হাত ছিলেন। যিনি উমাইয়া খিলাফতের পতন হওয়া সত্ত্বেও মোসেলকে আব্বাসীয়দের হাতে তুলে দেননি এবং দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থেকে আব্বাসীয়দের মোকাবিলা করতে থাকেন। আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মা’ন বিন যায়দাহও অগ্রণী ছিলেন। মোসেলের ওপর আব্বাসীয়দের দখলের পর ইয়াযিদ বিন হুবায়রাকে হত্যা করা হয়, আর মা’ন বিন যায়দাহ আত্মগোপন করেন। মনসুর তাকে খোঁজার জন্য আকাশ-পাতাল এক করে ফেলেন এবং তার খবর দাতার জন্য বড় অংকের পুরস্কারও ঘোষণা করেন, তা সত্ত্বেও তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

রাওয়ান্দিয়া ফেরকার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে মা’ন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে মনসুরকে রক্ষায় জীবনের ঝুঁকি নেন। তিনি তখন বর্ম পরিহিত ছিলেন; তাই মনসুর তাকে চিনতে পারেননি।

লড়াইয়ের পর মনসুর জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কে?”

মা’ন বিন যায়দাহ মুখ থেকে নেকাব সরিয়ে বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! আপনার কাঙ্ক্ষিত অপরাধী মা’ন।”

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৩/ ৩৩৬, ৩৩৭; আনসাবুল আশরাফ: ৪/ ৪৩৫, ৪৩৬; তারিখুত তাবারী: ৮/ ৮৩, ১৫৮ হিজরির অধীনে।

মনসুর তার অনুগ্রহ স্বীকার করে তাকে কেবল ক্ষমা করেননি বরং তাকে প্রথমে ইয়েমেন এবং পরে সিজিস্তানের শাসক নিযুক্ত করেন। মা'ন বিন যায়দাহর দানশীলতা ও বীরত্ব প্রবাদতুল্য ছিল। আরবি সাহিত্যে তার আভিজাত্য ও উদারতার অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে। মা'ন সিজিস্তানে অত্যন্ত ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করছিলেন, এমন সময় যরঞ্জ জেলার খারিজিরা হঠাৎ আক্রমণ করে খঞ্জর দিয়ে তার পেট চিরে ফেলে। মা'ন জখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইন্তেকাল করেন। এটি ১৫১ হিজরির ঘটনা। [১]

উস্তাদসিস-এর ফিতনা:

১৫০ হিজরিতে খোরাसानে উস্তাদসিস নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে কুফরি আকিদা প্রচার করে লাখ লাখ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। তার কর্মীরা মহাসড়কগুলো দখল করে মুসলিমদের কাফেলা লুট করত এবং সরকারি কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিত। খুব দ্রুত সে তিন লাখ সশস্ত্র লোক সংগ্রহ করে ফেলে এবং এক বিশাল ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

অবশেষে মনসুর তার পুত্র মাহদীকে তার মোকাবিলায় পাঠান। মাহদী এই অভিযানে একজন সত্যনিষ্ঠ হাশেমি মুজাহিদ হওয়ার প্রমাণ দেন এবং বেশ কিছু প্রাণপণ যুদ্ধের পর অবশেষে উস্তাদসিসকে শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেন। এই যুদ্ধে সত্তর হাজার ভ্রান্ত আকিদার লোক নিহত এবং চৌদ্দ হাজার বন্দি হয়। এভাবে এই বিশাল ফিতনা প্রশমিত হয়। [২]

আফ্রিকায় খারিজিদের উত্থান:

১৫৩ হিজরিতে আফ্রিকায় ইবাদি খারিজিরা বিদ্রোহ করে এবং ব্যাপক শক্তি অর্জন করে। মনসুরের শাসকরা তাদের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন। এটি দেখে ১৫৩ হিজরিতে মনসুর এক বিশাল ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং ইরাক ও খোরাसानে বিদ্রোহের আশঙ্কা উপেক্ষা করে সিরিয়া সফর করেন, বাইতুল মুকাদদাসে হাজিরা দেন এবং আফ্রিকায় সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা নিজে তৈরি করে ইয়াজিদ বিন আবি হাতিমের নেতৃত্বে খারিজিদের মোকাবিলায় সেনাবাহিনী পাঠান। অবশেষে ১৫৫ হিজরিতে ইয়াজিদ বিন আবি হাতিমের হাতে খারিজিরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

মনসুর পরবর্তীতে এই ঘটনাগুলো স্মরণ করে বলতেন:

“আমি অনেকবার ভুল করেছি কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। একবার তখন যখন আমি আবু মুসলিমকে হত্যা করিয়েছিলাম, সেই সময় আমার চারপাশে এমন লোক ছিল যারা আমার আনুগত্যের ওপর তার আনুগত্যকে প্রাধান্য দিত। তারা যদি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তবে আমি শেষ হয়ে যেতাম। দ্বিতীয়বার তখন যখন আমি রাওয়ান্দিদের সাথে যুদ্ধ করতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম, যদি কোনো তীর আমাকে বিদ্ধ করত তবে আমার গল্প সেখানেই শেষ হয়ে যেত। তৃতীয়বার সেই সময় যখন আমি (খারিজিদের সাথে যুদ্ধ করতে) সিরিয়া চলে গিয়েছিলাম, যদি পেছনে ইরাকে দুটি তলোয়ার একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো তবে খিলাফত সেখানেই খতম হয়ে যেত।” [৪]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/৯৭, ৯৮; ওফায়াতুল আইয়ান: ৫/২৪৪, দার সাদির সংস্করণ; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৫১ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৪১৪।

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ১/১৬৭, ১৭০, ১৭২।

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৪/২০৮।

মনসুর আব্বাসীর যুগে ফিকহ সংকলন

মনসুরের যুগে একদিকে কুফায় ইমাম আবু হানিফা রহ. (৮০ হিজরী - ১৫০ হিজরী) এবং অন্যদিকে মদিনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালিক বিন আনাস রহ. (৯৩ হিজরী - ১৭৯ হিজরী) ইসলামী ফিকহ সংকলন করে উম্মতের এক মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। নিচে এই মহান ব্যক্তিদের ফিকহী খেদমতসমূহের পর্যালোচনা করা হলো।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকহী খেদমতসমূহ:

ইমাম আবু হানিফা রহ. উমাইয়া বংশের শেষ দিনগুলোতে ইরাকের পরিস্থিতির অবনতি, অশান্তি এবং শাসকদের কঠোরতার কারণে কুফা ও হিজাজের মধ্যে যাতায়াত করতেন। সাফফাহ-এর যুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল; কারণ তখন পর্যন্ত সরকার স্থিতিশীল হয়নি এবং যেকোনো সময় বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার ভয় ছিল।

মনসুর আব্বাসীর যুগে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ইমাম সাহেব ফিরে এলেন এবং কুফায় পুনরায় বসবাস শুরু করলেন। এই সময়ে তাঁর ইলমী ব্যক্তিত্বের খ্যাতি আলেম ও সাধারণ মানুষের গণ্ডি পেরিয়ে খেলাফতের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সেই দিনগুলোতে খলিফা মনসুর ইবনে আবি লায়লা এবং ইবনে শুবরুমা রহ.-কে জাকাত, সদকা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু বিধান সংকলন করে পেশ করার নির্দেশ দেন। এই ব্যক্তিগণ দীর্ঘ সময়ের কঠোর পরিশ্রমের পর যা লিখেছিলেন, মনসুর তা পছন্দ করেননি। এমন পরিস্থিতিতে কেউ মনসুরকে জানালেন যে, কুফায় নুমান নামে একজন আলেম আছেন যিনি এই কাজ করতে পারেন। মনসুর তাঁকে ডেকে এনে কিছু প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর থেকে তাঁর ইলমী গভীরতার আন্দাজ করে কাঙ্ক্ষিত মাসআলাসমূহ সংকলনের কাজ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর জিম্মায় অর্পণ করলেন এবং তাঁকে দুই মাস সময় দিলেন। ইমাম সাহেব মাত্র দুই দিনে এই বিধানসমূহের সংকলন লিখে পেশ করলেন, যার বিন্যাসের সৌন্দর্য এবং মাসআলাসমূহের নির্ভুলতা ও স্পষ্টতা দেখে মনসুর অবাক হয়ে গেলেন। পুরস্কার হিসেবে ১০ হাজার দিরহাম পেশ করলেন। ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন; কারণ পদমর্যাদা এবং সরকারি নির্দেশনা থেকে দূরে থেকেই তিনি তাঁর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফিকহ সংকলনের কাজে একাগ্র থাকতে পারতেন। [১]

হাদিসের খেদমত এবং কিতাবুল আসার:

আকিদা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের রচনা ‘আল-ফিকহুল আকবার’ সম্পর্কে আমরা উমাইয়া যুগের আলোচনায় বিস্তারিত কথা বলেছি। ইমাম সাহেব একইভাবে ইলমে হাদিসের এই মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তিনি আহকাম বা বিধান সংক্রান্ত এমন সব রেওয়াজেত নির্বাচন করেছেন যা সনদের দিক থেকে সহীহ এবং যেগুলোর বিষয়বস্তুর ওপর উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল চলে আসছে। এই সংকলনটিকে ‘কিতাবুল আসার’

[১] মানাকিব আবি হানিফা, কারদারী, ২/ ১৪, ১৫ ... ইমাম সাহেবের ফিকহ সংকলনের খেদমত সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করব।

নাম দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত উম্মতের কাছে ফিকহি বর্ণনার প্রাচীনতম সংকলিত সংগ্রহ এটিই, যা দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সংকলন করেছেন। এই কিতাবটি ফিকহি অধ্যায় অনুযায়ী গঠিত প্রথম নমুনা ছিল, যা ইমাম মালিক (রহ.) সহ পরবর্তী সকল হাদিস সংকলকগণ অনুসরণ করেছেন। ইমাম সুয়ুতী (রহ.) বর্ণনা করেন: “ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি শরীয়তের ইলম সংকলন করেছেন এবং একে অধ্যায় আকারে পেশ করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তায় তাঁরই অনুসরণ করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর কেউ অগ্রগামী হতে পারেননি। সাহাবী এবং তাবিঈগণ শরীয়তের ইলমকে কিতাব ও অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করেননি, বরং তাঁরা নিজেদের স্মৃতির ওপর নির্ভর করতেন।” [১]

কিতাবুল আছারের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

কিতাবুল আছারের সনদসমূহ এতটাই সহীহ যে কোনোভাবেই মুয়াত্তা মালিক এবং সহীহ বুখারী থেকে কম নয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী (রহ.)-এর মতে: “মুয়াত্তার সাথে কিতাবুল আছারের সেই সম্পর্কই রয়েছে যা সহীহ মুসলিমের সাথে সহীহ বুখারীর রয়েছে।”

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগ পর্যন্ত ইলমে হাদিসের সনদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। (দুই-তিন প্রজন্ম পর যখন সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম সংকলিত হয়, তখন রাবী এবং সূত্রের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে লাখে পৌঁছেছিল)। ইমাম সাহেব (রহ.) এই চল্লিশ হাজার সনদ থেকে সহীহ সনদগুলোকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। [২]

ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মতে হালাল ও হারামের বিধান সম্বলিত (অ-পুনরাবৃত্ত) বর্ণনার সংখ্যা ৪৮০০। [৩] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর মতে এগুলোর মধ্যে সহীহ বর্ণনার সংখ্যা নয়শ। [৪] যেখানে কোনো কোনো ব্যক্তি এই সংখ্যা আটশ বলেছেন। [৫]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই আটশ বা নয়শ থেকে এমন সব বর্ণনা নির্বাচন করেছেন যা উম্মতের আমলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ‘তাওয়াতুরে আমলী’ (ব্যবহারিক নিরবচ্ছিন্নতা)-এর শক্তিও লাভ করেছে। এটি ছিল তাঁর সতর্কতার চরম পর্যায় যে, মানুষকে মতভেদ এবং মানসিক উদ্বিগ্ন থেকে বাঁচানোর জন্য বর্ণনার এত বড় সমুদ্র থেকে অনন্য মুক্তা বের করে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

ইমাম সাহেব (রহ.) নিজে বলতেন: “আমার কাছে বর্ণনার সিঁদুক ভর্তি রয়েছে, কিন্তু আমি সেগুলো থেকে অল্প কিছু বর্ণনা বেছে নিয়েছি যাতে সেগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করা যায়।” [৬]

হাদিস বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শর্তাবলি:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস বর্ণনায় কতটা সতর্ক ছিলেন, তার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, তিনি কোনো বর্ণনা কবুল করার জন্য এমন সব শর্তারোপ করতেন যা ইমাম মুসলিম এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-ও করেননি। যেমন:

[১] তাবিঈজুস সহীফা বি মানাকিবি আবি হানিফা লিল ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতী, পৃ. ১১৯

[২] মানাকিবে আবি হানিফা মুওয়াফফাক মক্কী: ১/৬৯, হাদিসের সূত্রের সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: তাওজিহুল আফকার লিল আমীর আস-সানআনী: ১/৬০ থেকে ৬৪

[৩] রিসালা ইমাম আবি দাউদ আস-সিজিস্তানী, পৃ. ৩৫

[৪] রিসালা ইমাম আবি দাউদ আস-সিজিস্তানী: পৃ. ২৬

[৫] তাওজিহুল আফকার লিল আমীর ইয়ামানী আস-সানআনী: ১/৬৭

[৬] মানাকিবে আবি হানিফা মুওয়াফফাক মক্কী: ১/৯৫, ৯৬

- ১. ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট এই শর্তও ছিল যে, রাবী বর্ণনাটিকে কেবল লিখে নকল করবেন না, বরং তিনি সেটির হাফেজও হবেন এবং তা বুঝবেনও। [১]
- ২. একটি শর্ত ছিল যে, মুত্তাকী লোকদের একটি জামাত এই বর্ণনাটি সাহাবী থেকে ধারাবাহিকভাবে নকল করে আসছে। [২]

ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে বলতেন:

“আমি আল্লাহর কিতাব থেকে দলিল গ্রহণ করি, যদি না পাই তবে সেই সব সুন্নাহ ও আসার থেকে গ্রহণ করি যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে নকল করেছেন। তারপরও যদি না পাই তবে সাহাবায়ে কেরামের কথা থেকে গ্রহণ করি।” [৩]

- ৩. ইমাম সাহেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনের হাদীসসমূহকে অগ্রাধিকার দিতেন। সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“ইমাম আবু হানিফা সেই সব হাদীসই গ্রহণ করতেন যা তাঁর নিকট সহীহ হতো এবং যা নির্ভরযোগ্য রাবীরা নকল করতেন এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনের আমল হতো।” [৪]

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সহপাঠী ইমাম মিসআর বিন কিদাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“আমি তাঁর সাথে হাদীস শিখতে শুরু করলাম তো তিনি আমার থেকে অগ্রগামী থাকলেন। তারপর আমরা যুহদ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলাম তো সেখানেও তিনি আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। এরপর আমরা ফিকহ শিখতে শুরু করলাম তো তাতে তাঁর এমন সব কামালত প্রকাশ পেল যা তোমরা জানোই।” [৫]

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ওয়াকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“ইমাম আবু হানিফার বর্ণনায় যেমন সতর্কতা দেখা গেছে, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায়নি।” [৬]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া বিন ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: “আবু হানিফা এই সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম।” [৭]

মুহাদ্দিসীন এবং রাবীদের যাচাই-বাছাইয়ের বিশেষজ্ঞ ফন-এ-রিজালের ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাজীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“ইমাম আবু হানিফা নির্ভরযোগ্য এবং তিনি সেই হাদীসই নকল করেন যা তাঁর মুখস্থ থাকে এবং কেবল তা থেকেই নকল করেন যা তাঁর হিফজে থাকে।” [৮]

একই যুগে জারহ ও তাদীল-এর আরেকজন ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“আল্লাহর কসম! আমরা আবু হানিফার ফতোয়ার চেয়ে উত্তম ফতোয়া শুনিনি। আমরা তাদের অধিকাংশের ওপর আমল করছি।” [৯]

আলী বিন আসিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন: “যদি আবু হানিফার ইলমের ওজন সারা দুনিয়ার ইলমের সাথে করা হয়, তবে তা ভারী হয়ে যাবে।” [১০]

[১] আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ লিল খতীব আল-বাগদাদী, ১/২৩১; তাওযীহল আফকার লি-মাআনী তানকীহিল আনযার লিল আমীর ইযযুদ্দীন সানআনী, পৃ. ৯১

[২] মীযানুশ শা’রানী, ১/৬২

[৩] আমি আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি, যা তাতে না পাই তা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ এবং তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ আসারসমূহ থেকে গ্রহণ করি যা নির্ভরযোগ্যদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যদের হাতে পৌঁছেছে, আর যদি তাও না পাই তবে তাঁর সাহাবীদের কথা গ্রহণ করি। (মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, লিয-যাহাবী, পৃ. ৩৪); আল-ইনতিকাহ ফী ফাদলিস সালাসাতি আইশ্মাতিল ফুকাহা, লি-ইবনে আবদিল বার, পৃ. ১৪৩

[৪] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, লিয-যাহাবী, পৃ. ৪৩

[৫] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, লিয-যাহাবী, পৃ. ৩২

[৬] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, লিয-যাহাবী, পৃ. ৩২

[৭] মানাকিব আবি হানিফা মুওয়াফফাক মাক্কী, ১/১৯৭

[৮] তারিখ বাগদাদ, ১৩/৪১৯

[৯] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-যাহাবী, পৃ. ৩২

[১০] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-যাহাবী, পৃ. ৩২

কুফার বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফস বিন গিয়াস (রহ.) বলেন:

“আবু হানিফার বাণীসমূহ চুল থেকেও সূক্ষ্ম। কেবল একজন মুখই তাঁর নিন্দা করতে পারে।” [১]

হাফিজ সামআনী (রহ.) লিখেন:

“তিনি জ্ঞান অর্জনে এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি।” [২]

সনদের আলোচনা ছাড়াও কিতাবুল আছারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি ইলমি মারকাজের (জ্ঞানকেন্দ্রের) সাহাবী ও তাবিঈদের থেকে বর্ণনা নেওয়া হয়েছে। মুয়াত্তা মালিকে এই গুণটি নেই। এতে অধিকাংশ বর্ণনাই মদীনার উলামায়ে কেরামের। [৩]

কিতাবুল আছারে হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রাযি.)—সবার বর্ণনাই একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিদ্যমান। এটি সেই কিতাব যার ওপর মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তেরো শতাব্দী ধরে আমল করে আসছে এবং এটিই হানাফী ফিকহের ভিত্তি। [৪]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিতাবুল আছারে ফিকহের বিশুদ্ধতম বর্ণনাগুলো সংকলন করে উম্মতের ওপর যে মহান ইহসান করেছেন, উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে ঋণমুক্ত হতে পারবে না। এই সংকলনটি ইমাম সাহেবের জীবদ্দশাতেই ইসলামি দেশগুলোতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ইলম অন্বেষণকারীরা এর অনুলিপি তৈরি করে মূল্যবান মুক্তার মতো নিজেদের কাছে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। আদালতের বিচারকগণও একে অপরিহার্য মনে করতেন এবং এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন, যার ফলে তাঁদের জন্য শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। যেখানে অন্যান্য ইমামগণ...

[১] মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-যাহাবী, পৃ. ৩২

[২] আল-আনসাব লিস-সামআনী: ৫/৬, ত. দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া দাক্ষিণাত্য

[৩] যেসব মহান সাহাবীর ফতোয়ার মাধ্যমে উম্মত শরীয়তের ইলম লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রাযি.)। তাঁদের মধ্যে প্রথম চারজন সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর ইলম কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম মক্কায় এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর ও হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রাযি.)-এর ইলম মদীনায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সব জায়গার মানুষ এই সাহাবীদের ফতোয়া অনুযায়ী শরীয়তের ওপর আমল করত। যেহেতু এই ফতোয়াগুলোতে কখনো কখনো মতভেদও হতো, তাই কুফাবাসী, মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের আলাদা আলাদা ফিকহী বলয় আত্মপ্রকাশ করে। (ইলামুল মুওয়াক্কিঈন লি ইবনিল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ: ১/৮)

[৪] ইমাম মালিক (রহ.) যেহেতু সারা জীবন মদীনাতেই ছিলেন, তাই তিনি মুয়াত্তায় অধিকাংশ মদীনী সাহাবী ও তাবিঈদের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। বাইরের শায়খদের থেকে খুব কম বর্ণনাই নিয়েছেন; যেমন: মুয়াত্তায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.)-এর মাত্র ৩টি বর্ণনা রয়েছে। হারুনুর রশীদ যখন ইমাম মালিক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি হযরত আলী ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের এত কম বর্ণনা কেন নিয়েছেন? তখন তাঁর উত্তর ছিল: “এই ব্যক্তিবর্গ আমার শহরে ছিলেন না এবং তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়নি।” (আল-মুসাফফা শাহ ওয়ালিউল্লাহ: ১/১৫)

[৫] মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক ব্যক্তি কিতাবুল আছারকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচনা বলে মনে করেন, যদিও এটি একটি প্রসিদ্ধ ভুল ধারণা। কিতাবুল আছার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে একাধিক ছাত্র বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যে পাণ্ডুলিপিটি বর্ণনা করেছেন, সেটি এ কারণে বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এতে ব্যাখ্যামূলক ও স্পষ্টীকরণমূলক বাক্য যোগ করেছিলেন, ঠিক যেমনটি তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালিক বর্ণনা করার সময় ব্যাখ্যামূলক সংযোজন করেছিলেন। যেভাবে মুয়াত্তার সেই পাণ্ডুলিপিটি ‘মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ’ (রহ.) নামে পরিচিতি লাভ করে, একইভাবে কিতাবুল আছারের এই পাণ্ডুলিপিটিও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নামে পরিচিত হয়ে যায়, অথচ অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত বা দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। যদি সেই সব পাণ্ডুলিপি প্রসিদ্ধ হতো, তবে এটি বোঝা খুব সহজ হতো যে মূল কিতাবটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরই ছিল যা বিভিন্ন ছাত্ররা বর্ণনা করছিলেন, যেমনটি মুয়াত্তা ইমাম মালিকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর পাণ্ডুলিপি ছাড়াও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে। তাই একে কেউ ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর রচনা মনে করে না। যা-ই হোক, কিতাবুল আছারের অন্যান্য পাণ্ডুলিপিও এক সময় প্রচলিত ছিল যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অন্যান্য ছাত্ররা বর্ণনা করেছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম যুফার (রহ.)-এর কিতাবুল আছারের পাণ্ডুলিপি এক সময় উলামায়ে কেরামের নিকট সুপরিচিত ছিল। (আল-ইকমাল লি ইবনি মাকুলা, বাবুন্ নাজসিনী ওয়াল হুসাইনী: ৩/১৩৯; মারিফাতুল উলুমিল হাদীস হাকিম নিশাপুরী, পৃ. ১৬৪) একটি পাণ্ডুলিপি ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রহ.)-এর ছিল যা তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সরাসরি শুনে বর্ণনা করেছিলেন। (লিসানুল মীযান: ৫/৩১)

এবং তাঁর ছাত্ররাও এই বিন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; এবং ফিকহী বর্ণনার সংকলন তৈরি করেছিলেন। ইমাম সাহেব (রহ.) ফিকহকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন, আজ পর্যন্ত ফিকহী গ্রন্থসমূহ সেই অনুযায়ী সংকলিত হয়ে আসছে, যাতে সর্বপ্রথম ইবাদত অর্থাৎ পবিত্রতা, সালাত, জাকাত, সওম এবং হজের মাসআলাসমূহ বর্ণনা করা হয়, এরপর মুয়ামালাত (নিকাহ ও তালাক, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি) উল্লেখ করা হয়, তারপর উকুবাৎ (হুদুদ, কিসাস ইত্যাদি) আলোচনা করা হয় এবং শেষে অসিয়ত ও মিরাসের মাসআলাসমূহ বর্ণনা করা হয়।

ফিকহ সংকলন: সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং মহানতম কীর্তি:

এক দীর্ঘ সময় ধরে শক্তির জোরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া এবং ইলম ও ফযিলত সম্পন্ন ব্যক্তিদের কোনো ক্ষমতামূলক মজলিসে শূরা না থাকার কারণে মুসলমানদের কাছে এমন কোনো ঐক্যবদ্ধ আইনি প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধান করতে পারত। বিগত এক শতাব্দীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা চারদিকে বিস্তৃত হয়েছিল; এবং অনেক নতুন জাতি ইসলামে দাখিল হয়েছিল। বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, অপরাধ ও শাস্তি, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, জিহাদ, বিদ্রোহী, জিম্মি এবং হারবি কাফিরদের সাথে লেনদেন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ ডজন ডজন এমন বিষয় ছিল যেখানে মুসলমানদের সামষ্টিক সাংবিধানিক নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে খলিফাদের অবস্থান ধর্মীয় নেতার মতো ছিল না বরং তারা ছিলেন নিছক রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা; তাই মানুষের কাছে এসব সমস্যায় নিজ নিজ এলাকার উলামা ও ফুকাহাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। প্রয়োজনে শাসকরাও তাঁদের সাথেই যোগাযোগ করতেন।

কিন্তু প্রথমত, এত বৈচিত্র্যময় সমস্যা সমাধান করা প্রতিটি মুফতি, কাজি বা ফকিহর সাধ্যের অতীত ছিল। দ্বিতীয়ত, ফুকাহাদের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবেই পরস্পরবিরোধী ফতোয়ার এক বিশাল স্তূপ জমা হচ্ছিল, কিন্তু উম্মাহ এমন কোনো নির্দেশনা পাচ্ছিল না যাতে সাধারণ মানুষ ও শাসক সবার জন্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সমস্যার কোনো স্থায়ী কর্মপন্থা থাকত যা সবার জন্য সন্তোষজনক হতো। সেই যুগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আইন সংকলন করে এই বিশৃঙ্খলা দূর করা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য উলামা ও গুণীজনরাও তা অনুভব করছিলেন। ডক্টর হামিদউল্লাহ মরহুম লিখেছেন:

“তাঁর সমসাময়িক ইবনুল মুকাফফা তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে একটি বেদনাদায়ক পুস্তিকায় (আস-সাহাবাহ) সরকারকে এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কাজিদের তৈরি আইন, নিয়োগ এবং ফতোয়ার মধ্যে বৈপরীত্য ও মতপার্থক্যের আধিক্য এত বেশি হয়ে গেছে যে, কোনো বিষয়ে সঠিক ইসলামি বিধান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর প্রয়োজন হলো বিভিন্ন মতসমূহ যাচাই-বাছাই করে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং খলিফার নির্দেশে তা পালন করা বাধ্যতামূলক করা।” [১]

কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, মনসুর যদি এমন কোনো গবেষণা মজলিস গঠন করেও দিতেন, তবে তার সিদ্ধান্তসমূহকে আন্তরিক আগ্রহের সাথে কেবল তারাই...

[১] ইমাম আবু হানিফা কি তাদউইনে কানুন-এ-ইসলামি, ডক্টর হামিদউল্লাহ: পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

গ্রহণ করতেন যাদের শাসকের প্রতি ধর্মীয় ভক্তি ছিল, যদিও বনু আব্বাসের মধ্যে এমন লোক খুঁজে পাওয়াও কঠিন ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানিফা রহ. নিজ উদ্যোগে এই অভাব পূরণের প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শী আলেমদের সহযোগিতায় এমন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন, যা উদ্ভূত শরয়ি মাসআলাগুলোকে প্রতিটি দিক থেকে পূর্ণ গুরুত্ব ও গভীরতার সাথে পর্যালোচনা করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করত। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানের সংকলিত ইসলামি আইনসমূহ তাদের গবেষণার মান এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করবে এবং এগুলোর সংকলকদের মর্যাদা ও অবস্থানের নৈতিক প্রভাব উন্নততর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে।

আলেমদের এই মজলিসের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর চল্লিশজন ছাত্র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম জুফার, হাসান বিন যিয়াদ, আসাদ বিন আমর, ইউসুফ বিন খালিদ সামতি, ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া বিন যায়িদাহ, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, ওয়াকি বিন আল-জাররাহ এবং হাফস বিন গিয়াস রহ. উল্লেখযোগ্য। [১] তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকা এবং নিজ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মুহাদিস ও ফকিহ হিসেবে গণ্য হতেন। এই ব্যক্তিবর্গ কেবল দীর্ঘ বছর ধরে ইমাম সাহেবের নিকট ফিকহ, ইফতা এবং মাসআলা উদ্ভাবনের প্রশিক্ষণই গ্রহণ করেননি, বরং তাদের অধিকাংশের কোনো না কোনো জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এভাবে ফকিহদের এই মজলিসে তাফসির, হাদিস, সিরাত, বালাগাত ও বয়ান, لغت (অভিধান) ও সাহিত্য, সরফ ও নাহ, কিয়াস এবং গণিতসহ বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [২]

এই মজলিসের গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে মুয়াফফাক মাক্কি রহ. নিজের সনদসহ বর্ণনা করেন:

“ইমাম সাহেব রহ. তাঁর মাযহাব তাদের (ছাত্রদের) পরামর্শের ভিত্তিতে সংকলন করেছেন। দ্বীনের জন্য সর্বাধিক আত্মত্যাগের জজবা এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের জন্য চরম আন্তরিকতার কারণে তিনি এই কাজ ছাত্রদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে করা পছন্দ করেননি। তিনি একটি একটি করে মাসআলা তাদের সামনে পেশ করতেন এবং এর বিভিন্ন দিক তাদের সামনে তুলে ধরতেন। ছাত্রদের মনে যে জ্ঞান ও চিন্তা থাকত, তা তিনি শুনতেন এবং নিজের মতামতও ব্যক্ত করতেন। এমনকি কখনো কখনো একটি মাত্র মাসআলার গবেষণায় এক মাসেরও বেশি সময় লেগে যেত। যখন কোনো মাসআলা চূড়ান্ত হয়ে যেত, তখন কাজী আবু ইউসুফ রহ. তা লিখে নিতেন।” [৩]

عبدالله بن مبارک রহ. বলেন যে, একবার তিন দিন পর্যন্ত একটি মাসআলার ওপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সবাই মিলে যখন “আল্লাহ আকবার” ধ্বনি দিলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এই আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। [৪]

[১] ইমাম তহাবি বলেন: ইবনে আবি লাওর আমার নিকট লিখেছেন, তিনি সালমান বিন ইমরান থেকে, তিনি আসাদ বিন আল-ফুরাত থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আবু হানিফার যে সকল সাথী কিতাবসমূহ সংকলন করেছেন তারা ছিলেন চল্লিশজন। অগ্রগণ্য দশজনের মধ্যে ছিলেন আবু ইউসুফ, জুফার, আসাদ বিন আমর, ইউসুফ বিন খালিদ আস-সামতি এবং ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া আয-যায়িদাহ, যিনি ত্রিশ বছর ধরে তাদের জন্য এগুলো লিখতেন। আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ: ২/২১২।

[২] মানাকিব আবি হানিফা মাক্কি: ২/১৩৩... কিছু ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদকেও এই মজলিসে গণ্য করেন কিন্তু এটি সঠিক নয়। ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের সময় ইমাম মুহাম্মদের বয়স ছিল ১৮ বছর, তিনি তখন ফকিহদের মধ্যে গণ্য হতেন না, তবে এই দরসগাহে অবশ্যই ছিলেন। প্রবল ধারণা এই যে, তিনি ছাত্রদের বাইরে ফাতাওয়া নকলকারী লেখকদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কারণ তাঁর কাছে ইমাম সাহেবের ইলমের অনুলিপি অনেক বেশি ছিল।

[৩] মানাকিব আবি হানিফা মাক্কি: ২/১৩৩, ১৩৪।

[৪] মানাকিব আবি হানিফা মাক্কি: ২/৫১।

যদি কখনো কোনো সমস্যার সমাধান কোনোভাবেই না বের হতো, তবে ইমাম সাহেব (রহ.) বলতেন: “আমার কোনো গুনাহের কারণে সমস্যার সমাধান বুঝে আসছে না।” এই বলে তিনি সালাত, দুআ এবং তওবা ও ইস্তিগফারে মশগুল হয়ে যেতেন যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান মাথায় আসত এবং তিনি বলতেন: “মনে হচ্ছে আমার তওবা কবুল হয়েছে।”

ফুদাইল বিন আইয়াজ (রহ.) এই অবস্থা শুনে অঝোরে কাঁদতেন এবং বলতেন: “আবু হানিফার গুনাহ কম, তাই তিনি সময়মতো সতর্ক হয়ে যান, অন্যথায় মানুষ তো পরোয়াও করে না।” [১]

আল্লামা কারদরি (রহ.) লিখেন: “তাঁর ছাত্ররা প্রতিটি মাসআলার ওপর ভরপুর বিতর্ক করতেন এবং প্রতিটি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলতেন। এই সময়ে ইমাম সাহেব নিরবে তাঁদের বিতর্ক শুনতেন। তারপর যখন ইমাম সাহেব আলোচ্য মাসআলার ওপর আলোচনা শুরু করতেন, তখন মজলিসে এমন নীরবতা নেমে আসত যেন সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।” [২]

এই মজলিসে শুধু ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে উদ্ভূত সমস্যার ওপরই বিতর্ক হতো না, বরং কিছু বিষয়ের সম্ভাব্য রূপ নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করে সেগুলোর ব্যাপারেও মতামত পেশ করা হতো, যাতে পরবর্তীতে যদি এমন কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে ইসলামি আইনে আগে থেকেই তার সমাধান বিদ্যমান থাকে। [৩]

বিতর্ক মজলিসের কার্যক্রম চলাকালীন ইমাম সাহেব (রহ.) যা বলতেন, তা সাথে সাথে লিখে নেওয়া হতো এবং ইমাম সাহেব (রহ.) পরবর্তীতে সংশোধনের জন্য তা গুরুত্বের সাথে শুনতেন। [৪]

এই গবেষণাগুলোকে আলাদা আলাদা শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করার কাজও ইমাম সাহেব (রহ.) অনেকখানি করিয়ে দিয়েছিলেন। [৫]

একবার কেউ ইমাম সাহেব (রহ.)-কে একটি বিশেষ মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত একমত হতে পারেননি, আপনি কীভাবে একটি চূড়ান্ত মতামত প্রতিষ্ঠা করলেন? তিনি বললেন: “তুমি কী মনে করো আমি এমনিতেই এই মতামত দিয়েছি? আমি বিশ বছর ধরে এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করেছি। এর নজির ও প্রমাণাদি দেখেছি এবং প্রত্যেক সাহাবীর বক্তব্যকে স্বীকৃত মূলনীতিগুলোর ওপর যাচাই করেছি।” [৬]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’-কেও একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং ‘কিতাবুস সিয়ার’-এর মাসআলাগুলো পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, যাতে যুদ্ধ ও শান্তি এবং দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিধানাবলি ছিল।

[১] মানাকিব আবি হানিফা, মক্কি: ১৮১/১, উকুদুল জুমান, পৃ. ২২৮

[২] হানাফি ফিকহ সংকলনের এমন উদাহরণ কম নয়। ইলম অন্বেষণকারীরা এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত।

[৩] মানাকিব আবি হানিফা, কারদরি: ১০৯/২

[৪] মানাকিব আবি হানিফা, কারদরি: ১০৮/২

[৫] আবু হানিফা একে সংকলন করেছেন এবং একে বিভিন্ন অধ্যায় ও সুবিন্যস্ত কিতাব হিসেবে বিন্যাস করেছেন। (মানাকিব আবি হানিফা, মুওয়াফফাক মক্কি: ১৩৬/২)

[৬] মানাকিব আবি হানিফা, কারদরি: ১৫১, ১৫০/১

এই নতুন বিষয়টি দেখে কিছু ফকীহ বিস্মিতও হয়েছিলেন; এই কারণেই ইমাম আওয়াঈ (রহ.) এর প্রতিবাদ করেছিলেন, যার জবাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ‘আর-রাদু আলা সিয়ারিল আওয়াঈ’ নামক একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

ফিকহ সংকলনের এই কাজ ১২০ হিজরিতে শুরু হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে কুফা থেকে অনুপস্থিতির কিছু সময় বাদ দিলে ১৫০ হিজরি পর্যন্ত ২২ বছর অব্যাহত ছিল। নিজের ছাত্র এবং সমসাময়িক আলেমদের জামাতের সাথে ইমাম সাহেব প্রতিটি মাসআলার জন্য প্রথমে কিতাবুল্লাহ, তারপর সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.), এরপর আসারুস সাহাবা এবং সবশেষে কিয়াসের দিকে মনোনিবেশ করতেন। হাদীসের মান (যেমন সহীহ, হাসান, যঈফ, মুতাওয়াতির, মশহুর, খবরে ওয়াহিদ ইত্যাদি) যাচাই করার পাশাপাশি তাঁরা এটাও দেখতেন যে, এই বিষয়ে নবী করীম (সা.)-এর আমলসমূহের মধ্যে সর্বশেষ আমল কোনটি ছিল। ১৫০ হিজরি পর্যন্ত তৈরিকৃত ফিকহী ধারার সংখ্যা ছিল ৮৩ হাজার, যার মধ্যে ৩৮ হাজার মাসআলা ইবাদত সংক্রান্ত এবং ৪৫ হাজার মাসআলা মুআমালাত (লেনদেন) ও উকুবাত (দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত ছিল। [১]

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত ছিল। কারাবন্দী অবস্থায়ও এই কাজ থেমে থাকেনি [২] এবং ইমাম সাহেব যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, তখন ফিকহের এমন এক বিশাল ভাণ্ডার সংকলিত হয়ে গিয়েছিল যা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর যুগে তাঁর সংকলিত ফিকহ সেই উচ্চতর আইনি মর্যাদা পায়নি যা তার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টার ফলে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি অঞ্চলের জন্য শরয়ী বিধানের একটি সংকলিত ভাণ্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যা কাজে লাগিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কলমে ‘কিতাবুল খারাজ’ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর হাতে ‘আল-জামি আস-সগীর’, ‘আল-জামি আল-কাবীর’, ‘আস-সিয়ার আস-সগীর’, ‘আস-সিয়ার আল-কাবীর’, ‘আল-মাবসূত’ এবং ‘আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা’-এর মতো মহান গ্রন্থসমূহ সামনে আসে।

যখনই আহনাফদের এই ইলমী ভাণ্ডার জনসমক্ষে এল, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, কাজী ও মুফতী, আমীর ও খলীফা—সকলেই তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য হলেন; কারণ এটি ছিল এমন এক সম্পদ যার প্রয়োজনীয়তা উম্মাহর দীর্ঘকাল ধরে ছিল এবং সর্বত্র এর তীব্র চাহিদা ছিল। এই সামষ্টিক গবেষণা ও আইন সংকলনের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ব্যক্তিগতভাবে ফতোয়া প্রদানকারী ফকীহ ও মুজতাহিদদের মতামত গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে লাগল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর এই কীর্তি ছিল এমন এক বিপ্লবী পদক্ষেপ যাকে ভবিষ্যতের প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি বলা যেতে পারে। অর্ধশতাব্দীও পার হয়নি যে, এটি রাষ্ট্রের সরকারি আইনের মর্যাদা লাভ করল এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ, কাজীগণ ও মুফতীগণ এর আলোকে ফয়সালা করতে শুরু করলেন। [৩]

[১] মানাকিব আবি হানীফা, কারদারী, ২/১৪৭; ইমাম আবু হানীফা কী কানুন তদভীন-এ ইসলামী, ডক্টর হামীদুল্লাহ, পৃ. ৪৯।

[২] প্রাচীন উৎসগুলোতে এমন কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়; এই কারণেই আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) লিখেছেন: “কারাবন্দী অবস্থায়ও এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এই সময়েই আপনার থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।” যা শিবলী নোমানীর ‘সীরাতুন নুমান’, পৃ. ৬৪-এ রয়েছে।

[৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ওফাতুল আইয়ান: ৫/৪০৯ থেকে ৪১২, এছাড়া “মানাকিব আবি হানীফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-যাহাবী” এবং “আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ”-তে ইমাম সাহেবের ছাত্রদের জীবনী দেখুন।

ইমাম মালিক বিন আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুয়াত্তা

ইমাম মালিক বিন আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজাজের ফকিহে আজম ছিলেন। মনসুরের শাসনামলে তিনি সহিহ হাদিসসমূহ, সাহাবায়ে কেরামের আসার এবং আহলে মদিনার আমল সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করে ইসলামি ফিকহের একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত কিতাব “মুয়াত্তা” সংকলন করেন, যা বিশুদ্ধতা ও মানের দিক থেকে “কিতাবুল আসার” এবং “সহিহ বুখারি ও মুসলিম” থেকে কম নয়। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উম্মতের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এই সংকলনটি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, মদিনার সাহাবীদের অধিকাংশ সহিহ ফিকহি বর্ণনাগুলো একটি সুশৃঙ্খল ধারায় সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

যখন মুয়াত্তা সম্পন্ন হলো এবং এই মহান ইলমি কীর্তির খ্যাতি সরকারি মহলে পৌঁছাল, তখন খলিফা মনসুর হজের সময় ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ করে এই দ্বীনি খিদমতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেই সাথে এটি পুরো মুসলিম বিশ্বে কার্যকর করার প্রস্তাব দেন। সহিহ সনদ অনুযায়ী ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করতেন:

“আবু জাফর (মনসুর) একবার আমাকে বললেন: ভূপৃষ্ঠে আপনার চেয়ে বড় কোনো আলেম কি আছে?”

আমি বললাম: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

আবু জাফর বললেন: “আমাকে তাদের নাম বলুন।”

আমি বললাম: “আমার সবার নাম মনে নেই।”

আবু জাফর বললেন: “আপনি জানেন, বনু উমাইয়াদের যুগে আমিও এই ইলম অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। ইরাকবাসীদের (বর্ণনার ওপর আমার ভরসা নেই; কারণ তারা) মিথ্যা ও অসত্য বলায় অভ্যস্ত। সিরি়াবাসীরা মুজাহিদ লোক, ইলমের সাথে তাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, হিজাজবাসীদের মধ্যে ইলম অবশিষ্ট আছে এবং আপনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম। আপনি আমিরুল মুমিনীনের (অর্থাৎ আমার) কথা প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমার ইচ্ছা হলো ইলমকে (ফিকহকে) একটি নির্দিষ্ট ধারায় নির্ধারণ করে দেব। আমি এটিই সেনাপতি ও কাজীদের কাছে লিখে পাঠাব। যে অবাধ্যতা করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেব।”

আমি (ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বললাম: “হে আমিরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উম্মতের মাঝে ছিলেন এবং তিনি বাহিনী পাঠাতেন এবং নিজেও (জিহাদের জন্য) বের হতেন, খুব বেশি এলাকা বিজয় হয়নি এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল। এরপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং তিনিও খুব বেশি এলাকা বিজয় করেননি এমন সময় ইন্তেকাল করলেন। এরপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হলেন এবং অনেক দেশ বিজয় করলেন। তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন যে, দূর-দূরান্তের এলাকাগুলোতে সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হোক। ফলে মানুষ এই মহান ব্যক্তিদের ইলম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বর্ণনা করে আসছে, এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছেছে।”

এখন যদি আপনি এই লোকদের তাদের পরিচিত পদ্ধতি থেকে সরানোর চেষ্টা করেন, তবে তারা এই চেষ্টাকে কুফর মনে করবে। আপনার উচিত প্রতিটি অঞ্চলের লোকদের তাদের নিজস্ব (ফেকহি) জ্ঞানের ওপর থাকতে দেওয়া। হ্যাঁ, নিজের জন্য আপনি এই জ্ঞান (মুয়াত্তা) পছন্দ করে নিন।

মনসুর বললেন:

“আপনি অনেক দূরের কথা ভেবেছেন। ঠিক আছে, এই জ্ঞান মুহাম্মদ (উত্তরাধিকারী মাহদী বিন মনসুর)-এর জন্য লিখে দিন।” [১]

কিছু বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুয়াত্তা সংকলন মনসুরের অনুরোধে হয়েছিল, যেমনটি আল্লামা ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুকাদ্দিমায়ে তারিখে লিখেছেন। এই বর্ণনা অনুযায়ী, মনসুর যখন হজে যান, তখন তিনি ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন: “আপনি এমন একটি কিতাব রচনা করুন যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হতে পারে। যাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাযহাবের মতো শিথিলতা না থাকে, আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তিগুলোর মতো কঠোরতাও না থাকে। মানুষের জন্য মাসআলাগুলো অত্যন্ত সহজ করে উপস্থাপন করুন।” [২]

কিছু বর্ণনায় এর বিপরীতে রয়েছে যে, মুয়াত্তা সংকলন মনসুরের পুত্র মাহদীর অনুরোধে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “হে আবু আবদুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কিতাব লিখে দিন যাতে আমি উম্মতকে তার ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে পারি।” [৩]

প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ মুয়াত্তা বেশ কয়েকবার সংকলন করা হয়েছিল। একে আরও উন্নত আঙ্গিকে সংকলন করার ক্ষেত্রে মনসুর এবং পরবর্তীতে মাহদীর ইঙ্গিতও शामिल থাকতে পারে। আতীক আল-যুবাইরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনা হলো যে, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন প্রথমবার এটি সংকলন করেন, তখন এটি দশ হাজার হাদিসের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এরপর প্রতি বছর তিনি এটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং বর্ণনাগুলো কমাতে থাকতেন। [৪]

এটিও প্রমাণিত যে, প্রতি বছর বিভিন্ন ছাত্র মুয়াত্তা শ্রবণ করতেন এবং প্রতিবারই এতে পার্থক্য থাকত। এই কারণেই মুয়াত্তা রিওয়ায়াতে ইয়াহইয়া, মুয়াত্তা রিওয়ায়াতে আবু মুসআব এবং মুয়াত্তা রিওয়ায়াতে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে ১৭২৭টি, দ্বিতীয়টিতে ৩০৬৯টি এবং তৃতীয়টিতে মাত্র ১০০৮টি বর্ণনা রয়েছে।

সমস্ত বর্ণনার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন যা তার ছাত্ররা শ্রবণ করতেন এবং নকল করতেন। খলিফা মনসুর ইসলামি ফিকহকে হাদিসের আলোকে সংকলন করাতে আগ্রহী ছিলেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশ্চিতভাবেই মুসলমানদের এই প্রয়োজনীয়তা তার চেয়েও বেশি অনুভব করতেন; কারণ তিনি নিজেই এই শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন এবং নিজের জ্ঞানকে সংরক্ষিত ও...

[১] আল-জারহ ওয়াত তা'দীল লি ইবনি আবি হাতিম, পৃ. ১২৯, হাজ্জাজ আস-সাইদানানী থেকে বর্ণিত সনদে, তিনি উতবা বিন হাম্মাদ থেকে, তিনি মালিক বিন আনাস থেকে... মাইদানী লিখেছেন এবং উতবা বিন হাম্মাদ ‘সদুক’ (সত্যবাদী), যেমনটি ইবনে হাজার আত-তাকরীব-এ বলেছেন। ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আজমী মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এর মুকাদ্দিমায় এর সংকলনের কারণের অধীনে এই সহীহ বর্ণনার সমর্থনে আরও বেশ কিছু যযীফ বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন, যা যা-ই হোক সমর্থনের ফায়দা দেয়।

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ১৮ (তারিখে ইবনে খালদুন, প্রথম খণ্ড)।

[৩] আল-ইনতিকা ফী ফাদায়িলিস সালাসাতি আল-আইম্মাতিল ফুকাহা লি ইবনি আবদিল বার: ৪০/১।

[৪] আদ-দীবাজুল মুয়াহহাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ানি উলামাইল মাযহাব লি ইবনি ফারহন: ১১৯/১, তবা' দারুত তুরাস, কায়রো।

এটি সংকলন করার চিন্তা সবচেয়ে বেশি তাদেরই হতে পারত। মুয়াত্তা সংকলনের প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা। তবে সেই সময়ে এই সংকলনটি এতটা খ্যাতি লাভ করেনি এবং এটি পরিমার্জনের পর্যায়ে ছিল। মনসুরের অনুরোধে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সংকলনটি পুনরায় বিন্যস্ত করেন এবং কঠোরতা বা শিথিলতা সম্বলিত কিছু সন্দেহজনক বর্ণনা বাদ দেন। এরপর মাহদীর অনুরোধে এতে আরও যাচাই-বাছাই করেন। মনসুর এবং মাহদী এই ইলমি খিদমতের উৎসাহ প্রদান করেন এবং একে পুরো মুসলিম বিশ্বের আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির দূরদর্শিতা, নিঃস্বার্থতা এবং উদারতা ছিল এমন যে তিনি সরকারকে এই পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখেন যাতে উম্মতের জন্য প্রশস্ততা তৈরি হয় এবং আলেমদের মতপার্থক্য যে রহমত তা প্রমাণিত থাকে।

আলবিগণের বিদ্রোহ

মনসুরকে তার শাসনকালে একটি অত্যন্ত নাজুক ও কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি ছিল কিছু ফাতেমি ব্যক্তির বিদ্রোহ, যার ফলে ইরাক ও হিজাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল যে বনু আব্বাসের শাসন মাত্র কয়েক দিনের মেহমান। ফাতেমি পরিবারের এই বুজুর্গগণ তাদের অনুসারীদের নিয়ে বিপ্লবে বনু আব্বাসের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু যখন প্রত্যাশার বিপরীতে শাসনের সমস্ত পদে আব্বাসীয়রা আসীন হলেন এবং বনু হাশিমের অন্যান্য পরিবারগুলোকে কেবল পুরোপুরি বঞ্চিতই করা হলো না, বরং ভবিষ্যতের শাসনও একটি নির্দিষ্ট পরিবারের জন্য খাস করে নেওয়া হলো, তখন ফাতেমিগণ অত্যন্ত হতাশ হলেন। তারা বনু আব্বাসের শাসনকে সেই চোখেই দেখতে শুরু করলেন যেভাবে বনু উমাইয়ার শাসনকে দেখতেন। তাদের নিকট এখন জরুরি ছিল যে আরেকটি বিপ্লব ঘটিয়ে ফাতেমি পরিবারের শাসন কায়েম করা; কারণ তাদের নিকট আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিবারের তুলনায় হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পরিবারের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশি ছিল।

عبدالله بن حسن مثنى رحمه الله (আবদুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

এই পরিবারের একজন সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন আবদুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আপন নাতি। ৯০ বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছিলেন। তিনি তার সময়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মুহাদ্দিসগণ তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ওমর বিন আবদুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সময়ে তাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। [১]

উমাইয়া খলিফাদের সাথে তাদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। তার বোন জয়নব, যিনি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতনি এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দৌহিত্রী ছিলেন, উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ও ইবাদতগুজার মানুষ ছিলেন। আকিদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে একমত ছিলেন। চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করতেন। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বললেন: “হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মোজার ওপর মাসেহ করতেন, যে ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করল সে একটি মজবুত হাতল ধারণ করল।”

সাফফাহ খলিফা হলে তিনি তার সাথে দেখা করতে ‘আনবার’ যান। সাফফাহ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন, তার দুই ছেলে: মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমের অবস্থাও জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কোথায়? তিনি বললেন: “তারা গ্রামে আছে। তারা নির্জনতা পছন্দ করে।”

সাফফাহ মধ্যরাত পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন। তারপর বনু উমাইয়ার কোষাগার থেকে প্রাপ্ত একটি সিন্দুক খুলে দেখান যা দুর্লভ ও মূল্যবান জহরত দিয়ে পূর্ণ ছিল। সাফফাহ অর্ধেক জহরত তাকে দিয়ে দেন। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৩৮১; নাসাব কুরাইশ লিজ জুবাইরি: ৫৩, ত ত দারুল মাআরিফ কায়রো

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: আল-কিসমুল মুতাম্মিম: ১/২৫২

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন যে, সাফফাহ তাকে দশ লক্ষ দিরহামের একটি বিশাল উপটোকন পেশ করেছিলেন। [১]

মুহাম্মদ নফস জাকিয়ার পক্ষ থেকে মাহদী হওয়ার দাবি:

সাফফাহর অনুগ্রহের কারণে ফাতেমী বুজুর্গরা তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মনসুর তেমন উদারমনা ছিলেন না। তিনি ফাতেমীদের দান-অনুদান ও আর্থিক অনুগ্রহের কথা মনে রাখেননি বরং তাদের নিজের ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করতেন। যদিও শুরুতে তিনি বনু ফাতেমার একজন বুজুর্গ হাসান বিন জায়েদ ইবনে হাসানকে, যিনি হযরত হাসান (রা.)-এর নাতি ছিলেন, মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু পরে তাকে বরখাস্ত করে কারারুদ্ধ করেন। [২]

এসব কারণে ফাতেমী ব্যক্তিবর্গ মনসুরের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। তারা গোপনে মানুষের কাছে নিজেদের বায়াতের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.)-এর দুই পুত্র। বড়জন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এবং ছোটজন ইব্রাহিম বিন আবদুল্লাহ। উভয়েই ইলম ও ফজল, পরহেজগারি ও আমানতদারির দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষ করে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর প্রভাব ছিল অনেক বেশি। তার পবিত্র স্বভাবের কারণে তাকে ‘নফস জাকিয়া’ বলা হতো।

তাদের অনুসারীদের দাবি ছিল যে, আন্দোলনের সময় বর্তমান খলিফা মনসুরসহ সাদাতদের (সৈয়দদের) সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নফস জাকিয়ার খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন; সুতরাং অন্য কারো খেলাফতের দাবি করা বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

এই গোপন আন্দোলনে তারা ‘মাহদী’ উপাধি গ্রহণ করেন। মাহদীর অনেক আলামত তাদের মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। নাম মুহাম্মদ এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ ছিল, সৈয়দ ছিলেন, কথা বলার সময় তোতলাতেন এবং যখন ভালোভাবে কথা বলতে পারতেন না তখন নিজের বুকে হাত চাপড়াতেন। [৩]

তাদের ভক্তরা প্রচার করে দিয়েছিল যে, ইনিই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের সেই ব্যক্তি যিনি দুনিয়াকে জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করবেন। কিন্তু বাস্তবে এই কথা সঠিক ছিল না। হতে পারে এটি একটি রাজনৈতিক চাল ছিল, অথবা এটাও সম্ভব যে নফস জাকিয়া মাহদী সম্পর্কিত হাদিসগুলো দেখে নিজের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আরও অনেক লোক এসেছেন যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা ভুল বোঝাবুঝির বশবর্তী হয়ে নিজেদের মাহদী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

যেহেতু আব্বাসীয় খেলাফতের গত বিশ বছরে সংঘটিত রক্তপাত, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বারবার লঙ্ঘনের কারণে উম্মতের একটি বড় অংশ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল; তাই ফাতেমী ব্যক্তিবর্গের এই আন্দোলন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে হিজাজ ও ইরাকে হাজার হাজার মানুষ তাদের হাতে বায়াত হওয়ার অঙ্গীকার করে। হিজাজে সাহাবায়ে কেরামের বংশধরদের অনেক পরিবার এই আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়। হযরত আলী, হযরত জাফর, হযরত জুবায়ের এবং হযরত উমর (রা.)-এর বংশধরদের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের সহানুভূতি ও সেবা এই আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করেন। [৪]

মনসুর যখন এই আন্দোলনের খবর পেলেন, তখন তিনি এই আন্দোলনের নেতাদের অর্থাৎ নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিমকে গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৮১/১৩

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবর: ১৯৪/১

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫৬৩/৭

[৪] তারিখুন নাযারি: ৫৬১/৫৫৯/৭

করিয়ে। এই দুজনেই হিজাজের গ্রামীণ এলাকায় আত্মগোপন করলেন। [১]

পিতার ওসিয়ত - আত্মগোপন ও অনুসন্ধান:

আত্মগোপনের পূর্বে যখন এই পিতা শেষবারের মতো সাক্ষাতের জন্য আসলেন, তখন বিজ্ঞ পিতা ওসিয়ত করে বললেন:

“হে বৎস! কারো কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থেকো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরবতাকে নিজের সুরক্ষার মাধ্যম বানাও; কারণ যেখানে কথা বলার প্রয়োজন নেই, সেখানে সব অবস্থাতেই নীরবতা উত্তম। কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন মানুষের সঠিক পদক্ষেপও বৃথা যায় এবং ভুল পদক্ষেপ মারাত্মক ক্ষতি করে। সবচেয়ে বড় ভুল হলো এই যে, মানুষ সুযোগ আসার আগেই তাড়াহুড়ো করে এবং সুযোগ পেলে অলসতা করে। যেভাবে সতর্ক শত্রুর থেকে বেঁচে থাকা উচিত, তেমনিভাবে নির্বোধ বন্ধুর থেকেও দূরে থাকা উচিত।”

পিতার কাছ থেকে এই নির্দেশনা নেওয়ার পর উভয় ভাই আত্মগোপন করলেন। কখনো তারা হিজাজে থাকতেন, কখনো ইয়েমেন বা ইরাকে, আবার কখনো অন্য কোনো প্রদেশে। যেহেতু তাদের মর্যাদা ও সম্মান সর্বত্র ছিল, তাই তারা আশ্রয় পেতেন এবং কেউ তাদের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে প্রস্তুত ছিল না। মনসুরের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল। তিনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিজাজে পৌঁছালেন। তার ধারণা ছিল যে উভয় ভাই হিজাজেই কোথাও লুকিয়ে আছেন। তিনি নিজের গোয়েন্দাদের ওই এলাকায় ছড়িয়ে দিলেন যারা জুতা বিক্রেতা, আতর বিক্রেতা এবং অন্যান্য জিনিস বিক্রির ছদ্মবেশে খবর সংগ্রহ করতে থাকল কিন্তু ব্যর্থ হলো।

অবশেষে এক গোয়েন্দাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে নফস জকিয়ার পিতা আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। গোয়েন্দা নিজেকে আন্দোলনের অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করল এবং ওই অর্থ উপটোকন হিসেবে আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.)-এর হাতে তুলে দিল। তিনি তা গ্রহণ করলেন। শীঘ্রই নফস জকিয়ার অবস্থান জানা গেল যে তিনি ‘জুনাইনা’ নামক স্থানে লুকিয়ে আছেন। গোয়েন্দা নফস জকিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাকে ধরে ফেলা হলো এবং এভাবে মনসুরের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.)-কে মদিনা থেকে গ্রেফতার করে সেখানেই বন্দি করে দিলেন। যখন এতেও কাজ হলো না, তখন হিজাজ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি রিয়াহ বিন উসমান মুররিকে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। এই ব্যক্তি ‘ওয়াকআয়ে হাররা’-র অপরাধী মুসলিম বিন উকব্বার আত্মীয় ছিল। সে এখানে বনু ফাতেমার ওপর চরম কঠোরতা শুরু করল। আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.)-এর আরও এক ছেলে হাসানসহ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হলো। [২]

গ্রেফতারি ও নির্যাতন:

১৪৪ হিজরিতে মনসুর যখন হজের জন্য আসলেন, তখন তিনি আবারও অত্যন্ত কঠোরভাবে বনু ফাতেমার আত্মগোপনকারী ব্যক্তিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করলেন। হযরত উসমান গনি (রা.)-এর প্রপৌত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহও এই তদন্তের আওতায় আসলেন; কারণ তিনি ইব্রাহিম বিন আবদুল্লাহর শ্বশুর ছিলেন। তিনি মুখ না খোলায় মনসুর তাকে ষাটটি বেত্রাঘাত করালেন। তিনি প্রতিবাদ করলে তাকে আরও দেড়শ বেত্রাঘাত করা হলো। [৩]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৮৩/৩, দারুল ফিকর

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৮৮/৩, ৮৯, ৯১

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৮৯/৩

তবুও যখন কোনো ফল হলো না, তখন মনসুর অতিষ্ঠ হয়ে তার চাচা ঈসা বিন আলীকে পাঠিয়ে আবদুল্লাহ বিন হাসানকে এই প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি যা চান জামিন হিসেবে নিতে পারেন, শুধু তার ছেলেদের উপস্থিত করে দিন। নফস জাকিয়া সেই দিনগুলোতে কোহ-এ রেদওয়ায় আত্মগোপন করে ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.) বললেন: “আমি এই প্রস্তাবের উত্তর তখনই দেব যখন আমিরুল মুমিনিন মনসুর নিজে আমার সাথে কথা বলবেন।”

মনসুর নিজে কথা বলতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন:

“তিনি তার কথাবার্তা দিয়ে আমার ওপর তেমন জাদু করে দেবেন যেমনটা অন্যদের ওপর করেন।”

ইরাকে ফিরে যাওয়ার সময় মনসুর আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.) এবং তার বড় ছেলে হাসানকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং কুফার সরকারি কর্মকর্তাদের এলাকা “হাশমিয়া”-র কারাগারে বন্দি করে দিলেন। আবদুল্লাহ বিন হাসান (রা.) ৯২ বছর বয়সে এই বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, একইভাবে হাসান বিন আবদুল্লাহও কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। [১]

নফস জাকিয়ার বিদ্রোহ:

নফস জাকিয়া এ পর্যন্ত গোপনে আন্দোলন চালিয়ে ইসলামি বিশ্বে জনমত গঠন করছিলেন। পরিকল্পনা ছিল যে, সবার ঐক্য অর্জনের পর সব জায়গায় একই দিনে বিদ্রোহ করা হবে যাতে সরকার অসহায় হয়ে পড়ে। কয়েক বছরের গোপন আন্দোলনের পর তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, পুরো ইসলামি বিশ্বের মানুষ তার সাথে আছে এবং এই আন্দোলন সফল হবে। ফলে যখন তিনি পিতা ও ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেলেন, তখন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না এবং ২ জমাদি আল-আখিরা ১৪৫ হিজরিতে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এসে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘোষণা দিলেন।

তিনি শুরুতে মাত্র দেড়শ লোক নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালেন এবং কারাগার ভেঙে নিজের বন্দিদের মুক্ত করে নিলেন। এরপর মদিনার সরকারি গভর্নর রিয়াহ বিন উসমানের প্রাসাদে আক্রমণ করলেন এবং ঘোষণা করালেন: “কাউকে যেন হত্যা না করা হয়।” রিয়াহ বিন উসমানকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং কোনো রক্তপাত ছাড়াই মদিনায় নফস জাকিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। পরের দিন নফস জাকিয়া মদিনাবাসীদের থেকে বায়আত গ্রহণ করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন:

“হে মদিনাবাসী! আমি তোমাদের শহর থেকে বিদ্রোহের সূচনা এই জন্য করিনি যে তোমাদের মাধ্যমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করব; কারণ অন্য শহরের লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে তোমরা আমাদের স্বজন এবং আমার নানার আনসার; তাই আমি তোমাদের পছন্দ করেছি। আল্লাহর কসম! পৃথিবীর যে কোনো শহরে যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা হচ্ছে, সেখানে আমার আহ্বানকারীরা মানুষের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে নিয়েছে।” [২]

এরপর নফস জাকিয়ার আদেশে আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)-এর পৌত্র হাসান বিন মুয়াবিয়া কিছু সমর্থকদের নিয়ে মক্কায় পৌঁছালেন এবং সেখান থেকে আব্বাসীয় গভর্নরকে বিতাড়িত করে মানুষের কাছ থেকে নফস জাকিয়ার জন্য বায়আত গ্রহণ করলেন। [৩]

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৮৯/২, ত. দারুল ফিকর

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৯৩/৩

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৯২/৩, ৯৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মনসুর ও নফস-এ-জাকিয়ার মধ্যে পত্রালাপ:

মনসুরের সংবাদবাহক দিনরাত সফর করে নয় দিনে হিজাজ থেকে আশ্বারে পৌঁছে এই সংবাদ দিল। মনসুর তৎক্ষণাৎ নফস-এ-জাকিয়াকে এই পত্র লিখলেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (৩৪) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (৩৩) عَذَابٌ عَظِيمٌ

(নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব। তবে যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগে তওবা করবে, তবে জেনে রেখো যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।) [১]

যদি তোমরা তওবা করো এবং আমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তোমাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসো, তবে আমি তোমাদের, তোমাদের সন্তানদের, তোমাদের ভাইদের, তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং তোমাদের অনুসারীদের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা দিচ্ছি। [২]

তাবারির বর্ণনায় এই সংযোজন রয়েছে:

“তোমাদের পরিবারের যারা বন্দী আছে আমি তাদের মুক্তি দেব। তোমরা যে শহরে ইচ্ছা বসবাস করতে পারো। তোমাদের সাথীদের সাথেও পরবর্তীতে কখনো কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আমি তোমাকে অতিরিক্ত এক লক্ষ দিরহাম দেব। এ ছাড়া নিজের প্রয়োজনের জন্য যা চাও তা চাইতে পারো। যদি তুমি নিজের সন্তুষ্টি চাও তবে তোমার নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যা চাও লিখিত চুক্তি করে নিতে পারো।” [৩]

নফস-এ-জাকিয়া এর জবাবে লিখলেন:

تَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَّبِيِّ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (২) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (১) طسم إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي (৩) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ (৪) نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا (৫) أُمَمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (৬) يَحْذَرُونَ

[১] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৩-৩৪

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৩/৯৫, দারুল ফিকর

[৩] তারিখুত তাবারি, ঘটনা: ১৪৫ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

(এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমরা আপনাকে মুসা ও ফেরাউনের কিছু সংবাদ যথাযথভাবে শুনিয়ে দিচ্ছি এমন কওমের জন্য যারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, সে তাদের পুত্রদের যবেহ করত এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা চাইলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে যাদেরকে যমীনে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে ইমাম (নেতা) বানিয়ে দিতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে। আর তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তাদের পক্ষ থেকে তা দেখিয়ে দিতে যা থেকে তারা ভয় পাচ্ছিল।) [১]

আল্লাহ আমাদের মনোনীত করেছেন এবং আমাদের এই মর্যাদা দান করেছেন যে আমরা আদমের সন্তান। নবীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.), পূর্ববর্তীদের মধ্যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণকারী (হযরত আলী রা.), পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.), প্রথম কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে প্রথম (হযরত খাদিজা রা. ও হযরত আলী রা.), রাসুলের কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান সাইয়েদা ফাতিমাতুয যাহরা (রা.), এবং জান্নাতের যুবকদের সরদার হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)। হাশেম ছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদের পিতা (দাদা এবং নানাও ছিলেন)। একইভাবে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন হযরত হাসান (রা.)-এর বংশধরদের পিতা। সুতরাং বনু হাশেমের মধ্যে আমরা পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে বংশমর্যাদার বিচারে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যাদের বংশে জাহেলিয়াতের কোনো প্রভাব নেই। জান্নাতে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মানুষ (রাসূলুল্লাহ সা.) এবং জাহান্নামে সবচেয়ে কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তি (আবু তালিব) একই ব্যক্তির (আবু তালিব) সন্তান।

যদি তোমরা আমাদের আনুগত্য করো, তবে আমরা তোমাদের জন্য তেমনই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যেমনটি তোমরা দিয়েছিলে। নিঃসন্দেহে আমরা ওয়াদা পালনে তোমাদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তোমরা কেমন নিরাপত্তা দিচ্ছ? যেমনটি তোমরা ইবনে হুযায়রাকে দিয়েছিলে? নাকি যেমনটি তোমরা তোমাদের চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলীকে দিয়েছিলে? [২]

মনসুর যখন এই চিঠি পেলেন, তখন তিনি তার উজির আবু আইয়ুবের কাছে জবাব লেখার অনুমতি চাইলেন। মনসুর বললেন: “থাকতে দাও। সে বংশমর্যাদা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর গর্ব করেছে, তাই আমি নিজেই এর জবাব লিখব।” [৩]

এরপর মনসুর তার পরিবারের ফযীলত সম্বলিত নিম্নোক্ত দীর্ঘ চিঠি লিখলেন:

“তোমার চিঠি পাওয়া গেল। জানা গেল যে তোমার গর্বের ভিত্তি হলো নারীরা যাদের মাধ্যমে বংশ প্রমাণিত হয়, যাতে এভাবে তুমি মূর্খ ও সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে পারো। আল্লাহ নারীদের (সম্পর্ককে) পুরুষদের আত্মীয়তার সম্পর্কের মতো করেননি। আল্লাহ চাচাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তাকে পিতার আগে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী হলো:”

[১] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১ থেকে ৬।

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৯৬/২, ৯৮। তাবারীর বর্ণনায় এই শব্দগুলো রয়েছে: “নাকি সেই নিরাপত্তা যা তোমরা আবু মুসলিম খুরাসানীকে দিয়েছিলে?”

[৩] তারিখুত তাবারী: হিজরী ১৪৫ সাল।

তারিখ মিলাতে মুসলিমা

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

(তারা বলল: আমরা আপনার মাবুদের ইবাদত করব এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের; আর তিনি একমাত্র মাবুদ, এবং আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।) [১]

সুতরাং আল্লাহ ইয়াকুবের চাচা ইসমাইলকে তাঁর পিতা বলেছেন।

আর যখন আল্লাহ হজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করলেন তখন তাঁর চারজন চাচা ছিলেন। আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং সতর্ক করলেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন অস্বীকার করলেন এবং দুইজন কবুল করলেন। কবুলকারীদের মধ্যে একজন আমার দাদা (আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। অস্বীকারকারীদের মধ্যে একজন তোমার দাদা (আবু তালিব) ছিল; এই কারণেই আল্লাহ সেই দুই অস্বীকারকারীর (আবু লাহাব ও আবু তালিব) উত্তরাধিকার ও আত্মীয়তাকে আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেছেন।

তোমার দাবি হলো যে, তুমি কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপাচারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। অথচ আল্লাহর সাথে কুফরি করা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। আর আল্লাহর সামান্য আযাবও হালকা নয়। পাপাচারীদের মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। আল্লাহর ওপর ঈমান রাখা কোনো মুমিন জাহান্নামীদের সন্তান হওয়ার ওপর গর্ব করতে পারে না।

তুমি যা লিখেছ যে, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাশেমের সাথে এবং হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুল মুত্তালিবের সাথে দ্বিগুণ বংশীয় সম্পর্ক লাভ করেছিলেন, তার উত্তর হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদি ও অন্ত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর তো হাশেম ও আব্দুল মুত্তালিবের সাথে দ্বিগুণ বংশীয় সম্পর্ক ছিল না। (সুতরাং দ্বিগুণ বংশীয় সম্পর্ক গর্বের বিষয় নয়। যদি হতো তবে হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তা লাভ করতেন।)

তুমি লিখেছ যে, তোমার বংশে অনারবদের কোনো সংমিশ্রণ নেই, তোমার পরিবারে কোনো দাসীর সন্তান নেই। এটা তো তুমি সমগ্র মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির সন্তানের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে বসলে; কারণ হজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক পুত্র ইব্রাহিম দাসী মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত ছিলেন। তোমার পরিবারে আলী বিন হুসাইন (হযরত জয়নুল আবেদিন)-এর চেয়ে উত্তম কেউ নেই, অথচ তিনি একজন দাসীর পুত্র ছিলেন এবং তিনি তোমার দাদা হাসান (আল-মুসান্না) বিন হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উত্তম ছিলেন। জয়নুল আবেদিনের পর তোমাদের মধ্যে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন আলী থেকে উত্তম কেউ ছিল না। তিনিও একজন দাসীর পুত্র ছিলেন।

তোমার এই কথা বলাও ভুল যে তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুত্র; কারণ কুরআন মাজীদ বলে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।) [২]

হ্যাঁ! তুমি তাঁর সম্মানিতা কন্যার পুত্র অবশ্যই, কিন্তু এই সম্পর্ক না উত্তরাধিকারের অধিকার রাখে, না ক্ষমতা হস্তান্তরের। যখন নারী নামাজে ইমামতি করতে পারে না, তখন তাঁর মাধ্যমে নেতৃত্ব ও ইমামতির ক্ষমতার উত্তরাধিকার কীভাবে সামনে...

[১] সূরা আল-বাকার, আয়াত: ১৩৩

[২] সূরা আল-আহজাব, আয়াত: ৪০

হতে পারে। তোমরা হযরত আলী (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেছ, অথচ নবী করীম (সা.) তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে (হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)) নামাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। [১]

হযরত হাসান (রা.) যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে কাপড় ও দিরহামের বিনিময়ে খেলাফত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সুতরাং খেলাফতে যদি তোমাদের কোনো অধিকার থেকে থাকে, তবে তোমরা তা বিক্রি করে দিয়েছ এবং তার বিনিময় গ্রহণ করেছ।

এরপর তোমরা বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে। তারা তোমাদের হত্যা করল, শূলে চড়াল এবং শহর থেকে নির্বাসিত করল। (এটি জায়েদ বিন আলীর হত্যা ও শূলে চড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত) শেষ পর্যন্ত আমরা বিদ্রোহ করলাম এবং তোমাদের প্রতিশোধ নিলাম। তোমাদের রক্তের বদলা নিলাম। তোমাদের এই ভূমি ও শহরগুলোর উত্তরাধিকারী বানালাম। তোমাদের বড়দের মর্যাদা ও সম্মান দান করলাম। এখন তোমরা এই বিষয়গুলোকেই আমাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে চাও। সম্ভবত তোমাদের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমরা তোমাদের পিতা (আলী (রা.))-এর প্রশংসা এই কারণে করি যে তিনি হযরত আব্বাস (রা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ বিষয়টি এমন নয়। তোমরা জানো যে, জাহেলিয়াত যুগে আমাদের বংশের (বনু হাশিম) শ্রেষ্ঠত্ব ছিল হাজীদের পানি পান করানোর কারণে। এই সম্মান তাঁর ভাইদের মধ্যে কেবল হযরত আব্বাস (রা.)-ই লাভ করেছিলেন। তোমাদের পিতা (আলী (রা.)) এই বিষয়ে উমর (রা.)-এর সাথে বিতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের পক্ষেই ফয়সালা দিয়েছিলেন। [২]

যখন মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন উমর ফারুক (রা.) আমাদের দাদার অসীলাতেই আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। [৩] অথচ তোমাদের পিতা জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর অসীলা গ্রহণ করেননি।

অতঃপর যখন নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকাল হলো, তখন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রা.) ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না। সুতরাং নবী (সা.)-এর উত্তরাধিকার তাঁর দিকেই স্থানান্তরিত হলো এবং খেলাফত তাঁর সন্তানদের মধ্যে চলে এল। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোনো মর্যাদা ও সম্মান নেই যার উত্তরাধিকারী হযরত আব্বাস (রা.) হননি। তিনি না থাকলে আবু তালিব ও আকীল না খেয়ে মারা যেতেন। তিনি তোমাদের সম্মান রক্ষা করেছেন। তোমাদের ভরণপোষণ করতে থাকেন। আকীল যখন বন্দী হলেন, তখন তিনি মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। আমরা জাহেলিয়াত যুগেও তোমাদের পরিবারের ভরণপোষণ করেছি, তোমাদের ইজ্জত রক্ষা করেছি। আমরা খাতামুন আন্সিয়া (সা.)-এর মিরাসের উত্তরাধিকারীও হয়েছি। তোমাদের প্রতিশোধও আমরা নিয়েছি এবং যা তোমরা অর্জন করতে পারোনি, তা আমরা অর্জন করে দেখিয়েছি।

[১] আনসাবুল আশরাফ-এ এই কিতাব আমাদের পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, দেখুন: ২/৯৮, ১০৭; পরবর্তী অংশ তারিখুত তাবারী থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ১০১০, কিতাবুল ইস্তিসকা।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭৪৬, কিতাব ফাযায়িলু আসহাবিন নবী (সা.)।

এই পত্রালাপের অবশিষ্ট অংশ তাবারী ৫ম খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠার ঘটনাবলীতে বর্ণিত আছে। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই পত্রগুলো মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ বিন বশীর থেকে নকল করেছেন। তাঁর পিতা বশীর এই পত্রগুলোকে সঠিক বলে গণ্য করতেন। তবে আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু কুরূচিপূর্ণ অংশ বাদ দিয়েছি যেগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ ছিল যে তা কোনো সংকীর্ণমণা বর্ণনাকারীর সংযোজন হতে পারে।

এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনসুর হযরত আব্বাস (রা.)-কে হযরত আলী (রা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার যে অবস্থান পেশ করেছেন, তা আহলে সুন্নাতের ইজমা বা সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী। আহলে সুন্নাতের ইজমা হলো খুলাফায়ে রাশেদীন সমস্ত সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মনসুরের এই পত্র ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না বরং তাঁর নিজস্ব পারিবারিক অবস্থানের ওকালতি করছে, যাতে বিদ্রূপ, মন্দ কথা এবং সংকীর্ণতা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

মোটের ওপর উভয় পক্ষ দীর্ঘ পত্রালাপের মাধ্যমে নিজ নিজ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পূর্ণ চেষ্টা করেছে এবং প্রত্যেকেই এই দাবি করেছে যে, বংশীয় মর্যাদার ভিত্তিতে খিলাফতের প্রকৃত হকদার তারাই। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মীমাংসার কোনো পথ তৈরি হলো না।

নফস জাকিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান:

অবশেষে মনসুর নফস জাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন নফস জাকিয়ার প্রাণহানি ছাড়াই যেন সমস্যার সমাধান হয়ে যায়; কারণ নফস জাকিয়ার সাথে তার নিজ পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। নফস জাকিয়ার ছয় ছেলে এবং দুই মেয়ে ফাতিমা ও জয়নব ছিল, যাদের মধ্যে জয়নব সাবেক আব্বাসি খলিফা সাফফাহ-এর স্ত্রী ছিলেন। সাফফাহ-এর মৃত্যুর পর তার বিবাহ মনসুরের চাচা ঈসা বিন আলীর সাথে হয়েছিল। [১]

এছাড়া মনসুর নবীর শহরে রক্তপাত মোটেও পছন্দ করতেন না; তাই ঈসা বিন মুসাকে সেনাবাহিনীর কমান্ড দিয়ে বললেন:

“তুমি আল্লাহর হারামে যাচ্ছ। যেখানে তিনটি শ্রেণী রয়েছে: এক কুরাইশ যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয়। দ্বিতীয় মুহাজির ও আনসার। তৃতীয় সেই সব ব্যবসায়ী যারা রওজা আতহার এবং মসজিদে হারামের আশেপাশে বসতি স্থাপন করেছে। যখন মুহাম্মদ নফস জাকিয়া নিহত হবেন তখন তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে নেবে, কোনো পলায়নকারীর পিছু নেবে না, কোনো আহত ব্যক্তিকে আঘাত করবে না, কোনো পাখিকে পর্যন্ত জবাই করবে না। যদি মুহাম্মদ নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন তবে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দেবে। এই কথাগুলো কি তুমি ভালোভাবে বুঝেছ?”

ঈসা ইতিবাচক উত্তর দিলেন। মনসুর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন যে নির্দেশনাবলী বুঝেছ কি না। ঈসা তিনবার আশ্বস্ত করার পর তিনি বললেন: “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে।”

অবশেষে ঈসা বিন মুসা চার হাজার সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হিজাজে পৌঁছালেন। তার সাথে হুমাইদ বিন কাহতাবা এবং কাসির বিন হুসাইনের মতো প্রখ্যাত আব্বাসি জেনারেলরা ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু জেনারেল এমন ছিলেন যারা কোনো এক সময় নফস জাকিয়ার হাতে বায়আত করেছিলেন কিন্তু এখন পরীক্ষার চরম মুহূর্তে তারা সরকারের সাথে ছিলেন। তবে নফস জাকিয়ার বিশ্বাস ছিল যে, অনেক আব্বাসি অফিসার যুদ্ধের সময় তার সাথে যোগ দেবেন। [২]

নফস জাকিয়া মোকাবিলার জন্য মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করিয়েছিলেন। বলা হয় যে, এটি সেই পরিখা ছিল যা খন্দকের যুদ্ধে খনন করা হয়েছিল। [৩] তবে এখনো প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে পারেনি এবং কোনো বড় বাহিনীও একত্রিত হয়নি, এরই মধ্যে ১২ রমজান ১৪৫ হিজরিতে আব্বাসি বাহিনী এসে পৌঁছাল। ঈসা বিন মুসা মদিনাবাসীদের মুহাম্মদ নফস জাকিয়ার সঙ্গ ত্যাগ করার বিনিময়ে নিরাপত্তার প্রস্তাব দিলেন। [৪]

মদিনাবাসীদের একটি বড় অংশ যুদ্ধের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পাহাড়ের দিকে চলে গেল। নফস জাকিয়া চেষ্টা করলেন যেন তারা ফিরে আসে কিন্তু তা নিষ্ফল হলো। [৫]

[১] নাসাব কুরাইশ লিজ জুবাইরি, পৃ. ৫৫

[২] আনসাবুল আশরাফ: ১০৩/৩, ত. দারুল ফিকর

[৩] তারিখুত তাবারি: ৫৮২/৭

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ১০৫/৩

[৫] তারিখুত তাবারি: ৫৮৩/৭

এর পর নফস জাকিয়া নিজেও বুঝতে পারলেন যে বিজয় অত্যন্ত কঠিন; তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন: “হে লোকসকল! শত্রু বিশাল বাহিনী নিয়ে মাথার ওপর এসে পৌঁছেছে। আমি তোমাদের বায়আত থেকে মুক্ত করছি। যে থাকতে চায়, সে থাকুক। যে চলে যেতে চায়, সে চলে যাক।”

লোকেরাও যুদ্ধে কোনো সফলতার ব্যাপারে আশাহত ছিল। কেবল বায়আতের বাধ্যবাধকতার কারণে তারা তাঁর চারপাশে সমবেত ছিল। এই ঘোষণা শোনামাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নফস জাকিয়ার চারপাশে অল্প কিছু লোক রয়ে গেল। [১]

এমন পরিস্থিতিতে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন হিজাজ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম বিশ্বের কোনো জনবহুল শহরকে সামরিক কেন্দ্র বানান, তা ছাড়া আব্বাসীয়দের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু নফস জাকিয়া নবী আকরাম ﷺ-এর সেই বাণীকে সামনে রেখে যাতে মদিনাকে ‘দিরউন হাসিনাহ’ (মজবুত বর্ম) বলা হয়েছে, মদিনাকেই ঘাঁটি বানানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। [২]

আলোচনার ব্যর্থ চেষ্টা

যুদ্ধের আগে ঈসা বিন মুসা দূত পাঠিয়ে নফস জাকিয়াকে প্রাণের নিরাপত্তার প্রস্তাব দেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। [৩]

নফস জাকিয়া ফাতেমি বা আলবিদের একক নেতা ছিলেন না। সাদাতদের অনেক লোক তাঁর সাথে সম্পর্কহীন ছিল বরং অনেকে আব্বাসীয়দের সমর্থক ছিল যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঈসার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈসা তাদের মধ্য থেকে দশজন হাশেমি ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল বানিয়ে নফস জাকিয়ার কাছে সন্ধির আলোচনার জন্য পাঠালেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন:

- হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... কাসেম বিন হাসান বিন যায়েদ... নফস জাকিয়ার চাচাতো ভাই
- হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... আবদুল্লাহ বিন হুসাইন আল-আসগার বিন আলী জয়নুল আবেদিন
- হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... উমর বিন মুহাম্মদ বিন উমর
- হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর
- আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পৌত্র... আবদুল্লাহ বিন ইসমাইল
- আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... আবুল কারাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আলী
- আকিল বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র... মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু তালিব

কিন্তু এই ব্যক্তিদের নফস জাকিয়ার সমর্থকরা পথেই আটকে দিল এবং বলল: “রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানরা আমাদের সাথে আছেন এবং আমরা তাঁদের সাথে।”

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রপৌত্র কাসেম বিন মুহাম্মদ বললেন: “আমিও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান। এই প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ লোকও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তান। আমরা তোমাদের কিতাব...”

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/৫৮২, ৫৮৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৫৮০, ৫৮১

[৩] তারিখুত তাবারী: ৭/৫৮৪, ৫৮৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

“ভয়াবহতা এবং রক্তপাত থেকে বাঁচার দাওয়াত দিতে এসেছি।” কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়নি এবং তাদেরও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। [১]

অবশেষে ১৫ই রমজান উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। আব্বাসী সেনাপতি ঈসা বিন মুসা যুদ্ধের আগে নফস জাকিয়াকে ডেকে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন-এর নির্দেশ হলো যে, আমি আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার আগে যুদ্ধ শুরু না করি। আপনাকে, আপনার পরিবারের সদস্যদের, সন্তানদের এবং সঙ্গীদের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান এবং ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।”

নফস জাকিয়া কোনো সমঝোতা গ্রহণ করেননি। [২]

চূড়ান্ত যুদ্ধ - নফস জাকিয়ার শাহাদাত:

অবশেষে যুদ্ধ শুরু হলো এবং সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকল। আব্বাসীরা এত প্রবলভাবে তীর নিক্ষেপ করল যে, মুহাম্মদ নফস জাকিয়ার অধিকাংশ সঙ্গী আহত হলেন, অনেকে পালিয়ে গেলেন। ঈসা বিন মুসা যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে স্থানে স্থানে পতাকা স্থাপন করে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর কাছে এসে দাঁড়াবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এভাবে অনেক লোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গেল। জোহর নাগাদ বোঝা যাচ্ছিল যে, সরকারি বাহিনীর মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন। মিসওয়াল বিন মাখরামার নাতি আবদুল্লাহ বিন জাফর নফস জাকিয়াকে মক্কায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তিনি বললেন:

“আমি যদি অদৃশ্য হয়ে যাই, তবে মদিনাবাসীদের সাথে সেই আচরণই করা হবে যা হাররাবাসীদের সাথে করা হয়েছিল।”

জোহরের পর নফস জাকিয়া নিজে সরাসরি যুদ্ধে শরিক হলেন। তার বিপরীতে আব্বাসী আমীর হুমাইদ বিন কাহতাবা-র বাহিনী ছিল। যুদ্ধের আগে নফস জাকিয়া বলছিলেন:

“হুমাইদ বিন কাহতাবা আমার কাছে বায়াতবদ্ধ। আমাকে দেখামাত্রই সে আমার সাথে যোগ দেবে।”

কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। হুমাইদ বিন কাহতাবা পূর্ণ শক্তিতে তার মোকাবিলা করতে থাকল। আব্বাসীদের চাপ বাড়তে থাকল এবং নফস জাকিয়ার সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। সেই সময় কেউ একজন বললেন: “আপনি ইরাকে আপনার ভাই ইব্রাহিমের কাছে চলে যান।”

নফস জাকিয়া ততক্ষণে নিজের অদূরদর্শিতা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বললেন:

“আমি মদিনাবাসীদের দ্বিতীয় কোনো পরীক্ষায় ফেলতে চাই না; একবার বিদ্রোহ করে, দ্বিতীয়বার পালিয়ে গিয়ে।”

তার ধারণা একদম সঠিক ছিল যে, তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সরকারি বাহিনীর সাধারণ জনগণকে ধরপাকড় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি যদি বেঁচে পালিয়ে যেতেন তবে তাকে সাহায্য ও সহযোগিতার সন্দেহে মদিনার হয়তো কোনো ঘরই রাজকীয় রোযানল থেকে রক্ষা পেত না।

নফস জাকিয়া আসর পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গীকে নিয়ে ময়দানে অটল থাকলেন এবং নিজ হাতে প্রতিপক্ষের বারোজন লোককে হত্যা করলেন। তার সঙ্গীরা একে একে তার ডানে-বামে লুটিয়ে পড়তে থাকলেন। অবশেষে একজন তীরন্দাজ তাকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাল। সেই সাথে এক ব্যক্তি পেছন থেকে আক্রমণ করে বর্শা শরীরের এপার-ওপার করে দিল। তার পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই লড়াই শেষ হয়ে গেল। তার দেহ সারা রাত ময়দানে পড়ে থাকল। সেই রাতে অত্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হলো যার ফলে পুরো মদিনা জলমগ্ন হয়ে গেল।

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৫৮৯/৭

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৫৮৬/৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

পরের দিন নিহতের বোন ঈসা বিন মুসার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে লাশ দাফন করেন। তবে সরকারি কর্মকর্তারা এর আগেই মাথা কেটে মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এভাবে বিদ্রোহের আরও একটি বেদনাদায়ক গল্পের সমাপ্তি ঘটল। [১]

নফস জাকিয়ার বয়স ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর, গায়ের রং ছিল শ্যামলা। মাথার চুলে মেহেদি লাগাতেন। [২]

নফস জাকিয়ার বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে সাহস ও বীরত্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান দখল করে আছে, তবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে স্বীকার করতে হবে যে, এর দ্বারা উম্মাহর কোনো উপকার হয়নি। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার লক্ষণগুলো শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল। আন্দোলনে পরিকল্পনা ও কৌশলের অভাব পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। বিদ্রোহের সময় নফস জাকিয়া বলতেন:

“আমি এমন সময়ে বিদ্রোহ করেছি যখন কুফা, বসরা, মসুল, ওয়াসিত এবং আল-জাজিরাবাসীরা আমার বায়আত গ্রহণ করেছে এবং তারা আমার সাথে ওয়াদা করেছে যে, আমি যে রাতে বিদ্রোহ করব, সেই রাতেই তারা সবাই বিদ্রোহ করবে।” [৩]

কিন্তু তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো এবং মানুষ তাঁকে মোটেও সেভাবে সঙ্গ দেয়নি যেমনটি তিনি আশা করেছিলেন।

ইব্রাহিমের সাথে যুদ্ধ:

নফস জাকিয়ার অল্পবয়সী এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছোট ভাই ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ তখন ইরাকে আত্মগোপনে ছিলেন এবং সেখানে গোপনে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যখন নফস জাকিয়ার বিদ্রোহের খবর ইরাকে পৌঁছাল এবং মনসুর তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাল, তখন ইব্রাহিমের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও অবিলম্বে বিদ্রোহ শুরু করুন, অন্যথায় কেউ খবর দিয়ে দেবে এবং আপনি ধরা পড়ে যাবেন। ইব্রাহিমের নিজের মত তখন বিদ্রোহ করার ছিল না, কিন্তু এই পরামর্শ মেনে নিয়ে তিনি বসরায় বিদ্রোহের ঘোষণা দিলেন। সেই সময় তাঁর সাথে মাত্র ৪৫ জন লোক ছিল। তবে তাঁর বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মানুষ দলে দলে তাঁর চারপাশে জমা হতে লাগল। বসরা ও এর আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলো সাদা পোশাক পরিধান করে সরকারের আনুগত্য ত্যাগের ঘোষণা দিল এবং বসরার সরকারি ভবনগুলো দখল করে আব্বাসীয় কর্মকর্তাদের বের করে দিল। [৪]

ঈদুল ফিতরের দিন যখন ইব্রাহিম ঈদের নামাজের খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন হিজাজ থেকে নফস জাকিয়ার নিহত হওয়ার খবর এল। এতে আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে মনসুরের বিরুদ্ধে আরও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এই লোকেরা গুসকার, আহওয়াজ এবং ওয়াসিতও দখল করে নিল এবং আব্বাসীয়দের সাথে একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। [৫]

মনসুর এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেই সময় তাঁর অধিকাংশ সেনাবাহিনী দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে ব্যস্ত ছিল। তাঁর ছেলে মাহদী ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে “রে” এর রণাঙ্গনে ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আশআস চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আফ্রিকায় মোতায়েন ছিলেন। বাকি সেনাবাহিনী ঈসা বিন মুসার সাথে হিজাজে গিয়েছিল। রাজধানী হাশেমিয়ায় মাত্র দুই হাজার সৈন্য ছিল। যদি প্রতিপক্ষ আক্রমণ করে বসত, তবে পরাজয় ছিল নিশ্চিত। মনসুর বিরোধীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য রাতে ছাউনিতে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে...

[১] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১০৬ থেকে ১০৯

[২] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১১৩

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১১৩

[৪] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১১৬, ১২২, ১২৩

[৫] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪২২; আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৩২

তারিখে মিলাতে মুসলিমা

...আদেশ দিলেন যাতে দূর থেকে মনে হয় যে শিবিরটি সৈন্যে পরিপূর্ণ। একই সাথে তিনি ঈসা বিন মুসাকে কোনো বিলম্ব ছাড়াই অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে আসার নির্দেশ পাঠালেন এবং অন্যান্য স্থান থেকেও জরুরি সাহায্য তলব করলেন। মনে হয় যে আলবীদের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা দুর্বল ছিল, যদি তারা মনসুরের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারত তবে রাজধানীর ওপর আক্রমণ করার এটিই ছিল সর্বোত্তম সুযোগ।

নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে মনসুর সিদ্ধান্ত নিলেন যে হিজাজগামী বাহিনীর ফিরে আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখা হবে। যখন জানা গেল যে ঈসা বিন মুসা হিজাজ অভিযানে সফল হয়ে ফিরে আসছেন, তখন মনসুর একটি ফরমান পাঠিয়ে তাকেই ইব্রাহিমকে দমনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ততক্ষণে পনেরো হাজার সৈন্যের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। [১] আব্বাসীয় বাহিনীর প্রস্তুতির খবর পাওয়া মাত্রই ইব্রাহিম এগারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বসরা থেকে যাত্রা শুরু করলেন। এই বাহিনীতে সাতশ অশ্বারোহী ছিল এবং বাকি সবাই ছিল পদাতিক। জায়েদ বিন আলীর অনুসারীরাও তাদের সাথে ছিল যাদের জাইদি বলা হয়। অধিকাংশ ছিল সাধারণ মানুষ যাদের যুদ্ধের কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বাহিনীর লক্ষ্য ছিল কুফার দিকে যাতে চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে কুফাবাসীদের সাথে নেওয়া যায়। যদি ঈসা বিন মুসার হিজাজ থেকে কুফায় পৌঁছাতে দেরি হতো, তবে ইব্রাহিমের কুফা দখল করা নিশ্চিত ছিল। মনসুর এই বিপদের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন, তিনি ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কুফাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে সরাসরি প্রতিপক্ষ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে, তাই ঈসা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন এবং কুফা থেকে ষোল মাইল দূরে ‘বাখামরা’ নামক স্থানে ইব্রাহিমের বাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

এই পর্যায়ে কিছু অভিজ্ঞ লোক সতর্কতার খাতিরে ইব্রাহিমকে পরামর্শ দিলেন যে শিবিরের চারপাশে পরিখা খনন করে ব্যুহ রচনা করে মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু ইব্রাহিম তা পছন্দ করেননি। কিছু লোক বলল: “আমাদের শত্রুর ওপর অতর্কিত নৈশ হামলা চালানো উচিত।” ইব্রাহিম এই পরামর্শও প্রত্যাখ্যান করলেন। কিছু সঙ্গী মত দিলেন: “আমাদের বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে যুদ্ধ করা উচিত যাতে বাহিনীর এক অংশ পরাজিত হলেও বাকি অংশ নিরাপদ থাকে।”

ইব্রাহিম এই মতটিও গ্রহণ করেননি এবং এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সিসা ঢালা প্রাচীর।” [২]

পরিশেষে আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ সারি তৈরি করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে ইব্রাহিম সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর জোরালো আক্রমণ চালালেন। এই আক্রমণাত্মক হামলায় আব্বাসীয় সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ল, তাদের সারিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল, ঈসা বিন মুসা এবং বড় বড় জেনারেলরা মুখ ফিরিয়ে পালাতে শুরু করলেন। তবে এরই মধ্যে আব্বাসীয়দের একজন আমির যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে অবস্থিত খাল পার হয়ে ইব্রাহিমের বাহিনীর ওপর পেছন থেকে আক্রমণ করে বসলেন। এই আকস্মিক বিপদে ইব্রাহিমের সমর্থকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ওদিকে ঈসা বিন মুসাও ফিরে এসে আক্রমণ চালালেন। উভয় দিক থেকে আক্রমণের মুখে পড়ে ইব্রাহিমের স্বেচ্ছাসেবকরা মারাত্মকভাবে ফেঁসে গেল। ঈসা বিন মুসা ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপদ।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩৭৬

[২] সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৪

অনেক মানুষ হতাশার মধ্যে জীবন বাঁচানোকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তবে ইব্রাহিম এবং তাঁর সাথে কিছু যায়দি স্বেচ্ছাসেবক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লড়াইয়ে অটল ছিলেন। ইব্রাহিম তাঁর বর্ম খুলে ফেলেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। অবশেষে একটি তীর এসে তাঁকে বিদ্ধ করে। ক্ষতটি এতটাই মারাত্মক ছিল যে তিনি সেখানেই প্রাণ হারান। আব্বাসীয় সৈন্যরা তাঁর মাথা কেটে মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এই ঘটনাটি ২৫ ফিলকদ ১৪৫ হিজরির। [১]

মনসুরের দুঃখ ও শোক:

যখন ইব্রাহিমের মাথা মনসুরের সামনে রাখা হলো, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন:

“আল্লাহর কসম! আমার কাছে এটি করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। কিন্তু তুমি আমার কারণে পরীক্ষায় পড়েছিলে আর আমি তোমার কারণে।”

কিছুক্ষণ পর দরবারীরা এল, প্রত্যেকে মনসুরকে মোবারকবাদ জানাল এবং ইব্রাহিমকে গালিগালাজ করল। মনসুর নির্লিপ্ত হয়ে বসে রইলেন। তাঁর চেহারার রঙ বদলাতে থাকল। একজন বুদ্ধিমান উপদেষ্টা জাফর বিন হানযালা বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং সালামের পর বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ আপনার চাচাতো ভাইয়ের বিপদে আপনার সওয়াব বৃদ্ধি করুন এবং আপনার হকের ব্যাপারে তিনি যে ভুল করেছেন তা ক্ষমা করুন।”

মনসুর প্রথমবারের মতো মাথা তুলে সালামের উত্তর দিলেন এবং তাঁকে স্বাগত জানালেন। এটি দেখে বাকি দরবারীরাও একইভাবে মনসুরের কাছে শোক প্রকাশ করল। [২]

যদিও এই লড়াইয়ে কুফাবাসীরা নিজেরা অংশ নেয়নি, কিন্তু মনসুর জানতেন যে কুফা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর বিশাল এক জনগোষ্ঠী ইব্রাহিমের সমর্থক ছিল এবং তাদের উৎসাহেই ইব্রাহিম বসরাকে কেন্দ্র বানিয়েছিলেন; তাই মনসুর কুফাবাসীদের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি কুফার অলিগলিতে ইব্রাহিমের মাথার প্রদর্শনী করান। এরপর এক জনসভায় কুফাবাসীদের গালিগালাজ করে মনের ঝাল মেটালেন। বিদ্রোহের কেন্দ্রীয় নেতারা তো শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অন্যান্য সমর্থকদেরও খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। সিন্ধু পর্যন্ত এমন ব্যক্তিদের পশ্চাদ্ধাবন করা হলো। যারা আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিল না, তাদের গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। [৩]

তবে যারা বিশৃঙ্খলা ত্যাগ করে নিরাপত্তা চেয়েছিল, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হলো। স্বয়ং মুহাম্মদ নাফসে জাকিয়া ও ইব্রাহিমের আপন ভাই মুসা বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর বাগদাদে এসে মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করলে মনসুর তাঁর খুব খাতির-যত্ন করলেন এবং ধন-সম্পদ দান করলেন। মুসা এরপর বাগদাদেই বসবাস শুরু করেন। [৪]

শিক্ষণীয় বিষয়:

যদি দেখা যায়, তবে এই রক্তপাতের জন্য মনসুর একাই দায়ী ছিলেন না বরং যারা বিদ্রোহ করেছিল তারাও এতে অংশীদার ছিল; কারণ একটি সরকার যেমনই হোক না কেন, তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিজের জায়গায় ছিল, কিন্তু সেই ত্রুটিগুলোর সমাধান সশস্ত্র আন্দোলন চালানো ছিল না। অতীতে এ জাতীয় আন্দোলন থেকে কিছুই অর্জিত হয়নি এবং এখনও কোনো ফলাফল আসার ছিল না। বিশেষ করে এই কারণে যে এই আন্দোলনের আসল...

[১] তারিখুত তাবারী: ৭/৬৩৯ থেকে ৬৪৮; আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৩৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৪৫ হিজরি।

[২] তারিখুত তাবারী: ৭/৬৪৮, ৬৪৯।

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৩/১৩১।

[৪] তারিখু বাগদাদ: ১৩/২৭, ত. আস-সাদ্দ।

লক্ষ্য ছিল এক পরিবারকে সরিয়ে অন্য পরিবারকে ক্ষমতায় আনা। সুতরাং যদি পরিবার পরিবর্তন হয়েও যেত, তবুও ত্রুটিগুলো দূর হওয়ার খুব একটা আশা ছিল না, যেমনটি উমাইয়াদের পরিবর্তে আব্বাসীয়দের আসার ফলে কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসেনি।

এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিতে সেই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের (খুরাজ) কোনো সুযোগ ছিল না, যেমনটি আমরা একাধিকবার স্পষ্ট করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনার আলোকে মুসলমানদের কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার সুযোগ তখনই তৈরি হয় যখন শাসকগণ ইসলামী নিদর্শনসমূহকে পদদলিত করে এবং প্রকাশ্য কুফরে লিপ্ত হয়। স্পষ্টতই ইয়াজিদের যুগে এমনটি ছিল না, না মনসুরের যুগে। সুতরাং এই বিদ্রোহকে কোনোভাবেই উন্মত্তের জন্য সঠিক বা ফলপ্রসূ বলা যায় না।

আমাদের কাছে এই যুক্তিরও কোনো অবকাশ নেই যে, নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিম শাসকের ফাসেকির কারণে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো অবস্থান বর্ণিত নেই, আর না মনসুরের ফাসেক ও ফাজেল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে মনসুরের নামে নফস জাকিয়ার চিঠিপত্র এই মৌলিক মতপার্থক্যের বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট করে দেয় যে, এটি ছিল পারিবারিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। নিশ্চিতভাবেই এই ব্যক্তিবর্গ এই তাত্ত্বিক ভুলের শিকার হয়েছিলেন যে, বনু ফাতেমার উপস্থিতিতে অন্য কারো খিলাফতের অধিকার নেই। যদিও এটি সেই ইমামতের আকিদা নয় যা পরবর্তীতে আহলে তাশাইয়ু'র (শিয়াদের) কিছু দল গ্রহণ করেছিল, যাতে ইমামদের মনোনীত মনে করা হয় এবং তাদের কেবল নবীদের সমতুল্যই নয় বরং তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

নফস জাকিয়ার আন্দোলনের আকিদাগত প্রভাব:

এই বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না যে, ধর্মের নামে পরিচালিত ধর্মীয় আন্দোলন এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থে খাঁটি ইসলাম থেকে সামান্য বিচ্যুতিকেও সুযোগ দেওয়া হয়, তবে পরবর্তীতে তা বড় ধরনের ভ্রান্ত আকিদা প্রসারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের আন্দোলন যখন বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন কেবল উন্মত্তের রক্তই বৃথা যায় না, বরং এর পরবর্তী প্রভাব হিসেবে সাধারণত কিছু নতুন আকিদাগত ফিতনাও জন্ম নিতে শুরু করে। কারণ আন্দোলনের কর্মীরা তাদের সমর্থকদের হতাশা দূর করার জন্য নতুন নতুন কথা, বর্ণনা, স্বপ্ন এবং কাহিনী তৈরি করে নেয়। এই আন্দোলন তখন নতুন নতুন বিশ্বাসের ওপর ভর করে ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে এবং এভাবেই একটি নতুন ধর্ম অস্তিত্ব লাভ করে। নফস জাকিয়ার হত্যার পর ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। তার কিছু ভক্ত অনুরাগী, যারা মূলত রাফেজি ছিল, তারা প্রচার করে দিল যে তিনি নিহত হননি বরং অদৃশ্য হয়ে গেছেন। যুদ্ধের ময়দানে যে ব্যক্তি মনসুরের বাহিনীর হয়ে তাকে হত্যা করেছিল, তার নাম ছিল কোনো এক শয়তান। নফস জাকিয়ার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে এই লোকেরা একটি স্বতন্ত্র রাফেজি দল ‘মাহদিয়া’ হয়ে গেল, যাদের আকিদা ছিল যে নফস জাকিয়া মাহদি রূপে অদৃশ্যের পর্দা থেকে পুনরায় আবির্ভূত হবেন এবং সারা দুনিয়ায় রাজত্ব করবেন। [১]

[১] নিশ্চয়ই মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল্লাহর কসম নিহত হননি এবং তিনি মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তিনি হাজার পাহাড়ের নজদ অঞ্চলে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে বের হওয়ার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। যখন তিনি বের হবেন তখন রুকন ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করা হবে। তিনি মৃতদের জীবিত করবেন। তাদের মধ্যে সতেরো জন এমন ব্যক্তি থাকবেন যাদের প্রত্যেককে ইসমে আজমের একটি করে অক্ষর দেওয়া হবে। তারা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করবেন। তাদের ধারণা মতে, মদিনায় ঈসা বিন মুসা যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তার সদৃশ কোনো ব্যক্তি। এই কারণে তাদের ‘মুহাম্মাদিয়া’ বলা হয়। তারা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান এবং জাবের বিন ইয়াজিদ জু'ফির অপেক্ষায় ছিল। জাবের এই মতবাদের ওপর ছিলেন এবং বলতেন যে কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে মৃতদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে। (আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, আবু মনসুর আল-ইসফারাইনি, পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৪)

ফাতেমীয়দের বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হতে থাকল?

আমরা নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের বিদ্রোহের আগে এবং পরেও ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রে বনু ফাতেমার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে দেখি। এই ব্যক্তিদের সাহস ও বীরত্বের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তবে ইতিহাসের বিগত পাতাগুলো পড়লে এ কথা কারো কাছে গোপন থাকবে না যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌশল, কর্মপন্থা এবং পরিকল্পনার দিক থেকে এই ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা দুর্বল ছিল।

ইতিহাসের এই ধারাবাহিক এবং একই ধরনের ঘটনাবলি নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাও জানা যায় যে, বনু ফাতেমাকে শাসনক্ষমতা না দেওয়া আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ছিল, যার মধ্যে কোনো এক বড় হিকমত লুকায়িত ছিল। একটি বড় হিকমত এই দেখা যায় যে, যদি উম্মতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আল-ই-রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকত, তবে এর ফলে স্বয়ং সেই অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সত্যতা সন্দেহজনক হতে পারত যারা যেকোনো যুগে সত্যের সন্ধানে বের হয়। যখন তারা দেখত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর জানবাজ সাথীদের দীর্ঘ প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের ক্ষমতা এবং সম্পদ ও উপায়ের কর্তৃত্ব কেবল আপনার ﷺ সন্তানদের কাছেই রয়ে গেছে, তখন তাদের মনে তীব্র সন্দেহ হতে পারত যে, ইসলামের দাওয়াতের এই সমস্ত মেহনত কোথাও নিজের বংশধরদের ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির জন্য তো ছিল না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার কাছে স্বয়ং ইসলামের সত্যতা সন্দেহজনক হয়ে পড়ত। সুতরাং তাকভীনি হিকমত এর মধ্যেই ছিল যে, এমন সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখা হবে না।

যদিও পরবর্তীতে বনু আব্বাস শাসনক্ষমতা পেয়েছিল এবং তারা অবশ্যই হাশেমী ছিল, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাছাড়া আব্বাসী খিলাফত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মধ্যে এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের ব্যবধান ছিল; তাই এখানে এই সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগ্রাম নিজের পরিবারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ছিল।

বনু ফাতেমার বিদ্রোহ - ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব?

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রহ.) সেই সময়ে উম্মতের শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বনু ফাতেমার বিদ্রোহের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান কী ছিল? এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সাধারণত এটি প্রসিদ্ধ যে, এই উভয় ব্যক্তিত্বই এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কেবল আর্থিক সহায়তাই করেননি, বরং তিনি নিজেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ওজরের কারণে যেতে পারেননি। মদিনায় ইমাম মালিক (রহ.)-ও মানুষকে এই আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন, তবে যুদ্ধের সময় তিনি ঘরেই অবস্থান করেন।

অন্যদিকে এটিও দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাসের বিরুদ্ধে বনু ফাতেমার কোনো বিদ্রোহই সেই শর্তাবলি পূরণ করেনি যা জমহুর আহলে সুন্নাতে উলামাদের নিকট বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যিক। (অর্থাৎ কুফরে বাওয়াহ বা প্রকাশ্য কুফরির শর্ত বনু উমাইয়ার যুগেও পূর্ণ হয়নি এবং মানসুর ও পরবর্তী আব্বাসী খলিফাদের যুগেও নয়)। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফিকহি মাযহাব, তাঁদের সংকলিত মাযহাব এবং তাঁদের থেকে বর্ণিত ফিকহি রেওয়ায়েতসমূহ যা তাঁদের ছাত্ররা সনদ ও মতন বা পাঠের বিশুদ্ধতার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে সংগ্রহ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, এই মহান ব্যক্তিবর্গ কুফরে বাওয়াহ ব্যতীত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবক্তা ছিলেন না। হানাফিদের মহান ফকীহ ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন:

“আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না যদিও তারা জুলুম করে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করি না এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেই না।” [১]

এই ফিকহি রেওয়ায়েতসমূহের সনদের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। এরপর যদি এগুলোর সূত্রের আধিক্য এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মতের জমহুর উলামাদের এই মাযহাবের ওপর ঐকমত্য বিবেচনা করা হয়, তবে এই মহান ব্যক্তিবর্গের মাযহাব একটি মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত) হাকিকত বা বাস্তবতায় পরিণত হয়। সুতরাং, যদি কিছু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত আমাদের এটি বলে যে, এই ব্যক্তিবর্গ তাঁদের নিজেদের ফতোয়া ও মাযহাবের বিরুদ্ধে আমল করছিলেন (অর্থাৎ শর্তাবলি না থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহের সমর্থন করছিলেন), তবে এই ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহ অবশ্যই তদন্তের দাবি রাখে। আমাদের দেখতে হবে এগুলোর সনদ কেমন, সেগুলো কি সহিহ নাকি জয়িফ? যদি সনদ জয়িফ হয়, তবে এই ধরনের রেওয়ায়েতসমূহকে সম্পূর্ণ অসার গণ্য করা হবে; কারণ সহিহ রেওয়ায়েতসমূহের বিপরীতে জয়িফ উপাদান দ্বারা দলিল পেশ করা সম্ভব নয়। [২]

[১] ولا نرى الخروج على ائمتنا و ولاية امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم (আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৬৮)

[২] যেখানে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর দিকে বনু হাশেমের বিদ্রোহের সমর্থনের রেওয়ায়েতসমূহ সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে, সেখান থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, সেগুলোর মধ্যে একটিও সহিহ বা হাসান নয়। এই বিস্তারিত আলোচনা এই অংশের শেষ অধ্যায়ে “গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির উত্তর”-এর অধীনে দেখা যেতে পারে।

নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের বিদ্রোহের পরবর্তী প্রভাব

নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঠিক তেমনই হয়েছিল যেমনটি হয়েছিল জায়েদ বিন আলী (রা.)-এর আন্দোলনের। অন্য কথায়, হযরত হাসান (রা.)-এর সন্তানদের পরিণতি কারবালার শহীদদের চেয়ে মোটেও ভিন্ন ছিল না। তাদের কেউ কেউ রণক্ষেত্রে নিহত হন এবং কেউ কেউ কারাগারের দেয়ালের আড়ালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যদিও মনসুর একজন শাসক হিসেবে এই আন্দোলন দমনে নিজেকে সঠিক মনে করতেন, কিন্তু এই পদক্ষেপের কারণে আব্বাসীয় পরিবার উমাইয়াদের চেয়েও অনেক বেশি বদনাম কুড়িয়েছিল। উমাইয়াদের কেউ এই অপবাদ দিতে পারত না যে তারা সাদাতদের প্রতি ভালোবাসার স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধেই তলোয়ার চালিয়েছিল। কিন্তু আব্বাসীয়রা এই অভিযোগ থেকে রেহাই পায়নি যে, যে পরিবারের নেতৃত্বের স্লোগান দিয়ে তারা শাসনের পথ সুগম করেছিল, ক্ষমতা লাভের পর তাদেরই রক্ত ঝরাতে তারা কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। সুতরাং আব্বাসীয় খিলাফতের পনেরো বছরও পার হতে না হতেই এর আঁচলে ঠিক তেমনই দাগ লেগে গেল যেমনটি কারবালার ঘটনার মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের পোশাকে লেগেছিল।

এটি ছিল সেই সন্ধিক্ষণ যেখানে উম্মাহর একটি অংশের আব্বাসীয় খিলাফতের ওপর থেকে আস্থা উঠে যায়, বিশেষ করে নফস জাকিয়া, ইব্রাহিম এবং তাদের মতাদর্শের অনুসারীরা আব্বাসীয়দের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েন। দিন দিন তাদের কেন্দ্রবিমুখ চিন্তা আরও দৃঢ় হতে থাকে। মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই চিন্তা বংশপরম্পরায় লালিত ও প্রসারিত হতে থাকে। এই ঘৃণাকে পুঁজি করে গোপনে সাদাতদের জন্য পৃথক ক্ষমতার চিন্তা আরও বিকশিত হতে থাকে, যার ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে আব্বাসীয় খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আন্দোলনগুলো ক্রমাগত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। খিলাফতের কেন্দ্রের নিকটবর্তী প্রদেশগুলোতে এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে কিছু রাজনীতিবিদ দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এ জাতীয় আন্দোলনের বীজ বপন করতে শুরু করেন। যতক্ষণ আব্বাসীয়দের উত্থান ছিল, ততক্ষণ এই আন্দোলনগুলো দমিত ছিল; কিন্তু যখনই তাদের শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করল, কিছু আলভী তাদের সমর্থকদের সহায়তায় ইয়েমেনে জায়েদিয়া রাষ্ট্র এবং মরক্কোতে ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। একইভাবে কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সাদাতদের নাম ব্যবহার করে খাঁটি রাফেজি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়, যেমন বাহরাইনে কারামিতা, আফ্রিকায় বনু উবাইদ এবং ইরানে বনু বুয়াইহ। এই কেন্দ্রবিমুখ আন্দোলনগুলোই বিশ্বজনীন খিলাফত একটি সীমিত গণ্ডিতে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জমহুর সাদাত এবং রাফেজিদের আকিদার পার্থক্য:

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিদ্রোহের আন্দোলনের কিছু নেতা হাশেমি বংশোদ্ভূত না হওয়া সত্ত্বেও...

শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আলী (রা.)-এর বংশধর বা ফাতিমা (রা.)-এর বংশধর হওয়ার দাবি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল গোঁড়া রাফেযী, যাদের আকিদা সাধারণ সাদাত (সৈয়দ) এবং উম্মাহর সাধারণ আকিদা থেকে ভিন্ন ছিল। কিছু সাদাতের বিদ্রোহ সাধারণত সরকারি জুলুমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, কখনো কোনো ফিকহি ও ইজতিহাদি ভুলের কারণে, কখনো পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করার কারণে এবং কখনো কখনো নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো নতুন আকিদা বা ধর্ম গ্রহণ করার কোনো ভূমিকা বা তা প্রচলিত করার কোনো আবেগ কাজ করেনি। এই সাদাতদের মধ্যে কেউ নিজেকে ‘ইমামে মাসুম’ (নিষ্পাপ ইমাম) বলতেন না। এই শব্দটি রাফেযীরা তাদের আন্দোলনের সময় জনপ্রিয় করেছিল, যার পেছনে ইমামের ‘মুফতারিযুত তাআ’ (যার আনুগত্য করা ফরজ) হওয়ার আকিদা কাজ করছিল। অথচ সম্মানিত সাদাতগণ নিজেরা এই আকিদার প্রতিবাদ করতেন।

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহ.)-এর আপন ভাই উমর বিন আলী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

هَلْ فِيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنْسَانٌ مُفْتَرِضٌ طَاعَتُهُ؟

(আপনাদের আহলে বাইতগণের মধ্যে কি এমন কোনো মানুষ আছেন যার আনুগত্য করা ফরজ?)

তিনি উত্তর দিলেন: “না, আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। যে ব্যক্তি এ কথা বলে সে চরম মিথ্যাবাদী।” [১]

রাফেযীদের মধ্যে প্রচলিত ভুল আকিদা থেকে সাধারণ সাদাতগণ যে মুক্ত, তার প্রমাণ আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে অনেক জায়গায় দিয়েছি। কিন্তু যদি কারো কিতাবি জগতে গবেষণার সুযোগ না থাকে, তবে তার এই বাস্তব সত্যটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, রাফেযীদের আকিদা অন্যান্য মুসলমানদের নিকট নিঃসন্দেহে ভুল, বরং তাদের কিছু বিষয় তো যিন্দিকি ও কুফর। এই বিষয়টিও নিশ্চিত যে, মুসলিম সমাজে ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করাকে সহ্য করা হয়নি। উলামা ও ফুকাহাগণ প্রতিটি যুগে এমন আকিদা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছেন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছেন। শাসকরাও কখনো এমন লোকদের ছাড় দেননি। সুতরাং এটি কীভাবে সম্ভব ছিল যে, এই সাদাতগণ নিজেদেরকে নবীদের মতো মাসুম, মুফতারিযুত তাআ এবং হালাল-হারামের ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বলে দাবি করবেন, কুরআন মাজিদকে বিকৃত বলবেন, তিন খলিফাকে জবরদখলকারী এবং অধিকাংশ সাহাবীকে বেদ্বীন ও মুরতাদ বলবেন, আর তবুও তাদের বিরুদ্ধে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হবে না? যদি এমনটিই হতো, তবে উলামাগণ কেন চুপ ছিলেন? কেউ কেন তাদের কুফর বা গোমরাহির ফতোয়া দেননি?

এর বিপরীতে মুহাদ্দিসগণ তাদের থেকে পূর্ণ আস্থার সাথে দ্বীনি বর্ণনাগুলো নকল করতে থাকেন। খলিফাগণ তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে থাকেন, তাদের জায়গির এবং ধন-সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করতে থাকেন। আমরা এমনকি এটিও দেখি যে, আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশিদ, যিনি খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্টির) মাসআলায় অত্যন্ত কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি হযরত আলী আর-রিযা (রহ.)-কে নিজের জামাতা এবং উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। যদি এই সাদাতদের আকিদা অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন হতো, তবে মামুনুর রশিদ কি তার জামাতার আকিদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? আর যদি অবগত থাকতেন, তবে শেষ পর্যন্ত আদালতে তাদের আকিদা ও ধর্মের ওপর জেরা কেন করা হয়নি? স্পষ্টতই শরীয়তের মানদণ্ড সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা এবং সাদাতদের জন্য আলাদা নয়। যদি এমনটি হতো, তবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) চুরির একটি মামলার ফয়সালা করার সময়...

[১] নাসাব কুরাইশ লিজ-যুবাইরি, পৃ. ৬২

হয়ে কখনোই এটি বলতেন না: “আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাতও কেটে দিতাম।” [১]

সুতরাং যদি শরয়ী আইন সবার জন্য এক হয়, তবে কেন এমন নাস্তিক্যবাদী আকিদা প্রচারের ক্ষেত্রে সাদাতদের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল? ভ্রান্ত আকিদা থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের এত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেওয়া হলো? অন্তত তাদের বিচারিক তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তো নেওয়া যেত। এটি বলা ভিত্তিহীন হবে যে, খলিফারা বাহ্যিকভাবে এই ব্যক্তিদের সম্মান করতেন এবং গোপনে তারাই কিছু সাদাতকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিলেন; কারণ যদি সত্যিই এই ব্যক্তির ভ্রান্ত আকিদার হতেন অথবা তাদের ওপর ভ্রান্ত আকিদার কেবল অভিযোগও থাকত, তবে খলিফাদের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পথ হতো তাদের আদালতে হাজির করা, যাতে করে সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যেত। ঐতিহাসিক বাস্তবতা এটাই যে, খলিফারা ভ্রান্ত আকিদার লোকদের গোপনে হত্যা করার পরিবর্তে আদালতে ডেকে তদন্ত করতেন, অপরাধ প্রমাণিত হলে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হতো। না মানলে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হতো যাতে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বনু উমাইয়া হোক বা বনু আব্বাস, প্রতিটি সরকারই এমন লোকদের সর্বদা প্রকাশ্যে শাস্তি দিয়েছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের দামেস্কের মিথ্যাবাদী হারিস বিন সাঈদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাকে শূলে চড়ানো এবং আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজে বের হওয়া এবং তাদের নেতাদের হত্যা করার কথা আপনারা গত পৃষ্ঠাগুলোতে পড়েছেন। পরবর্তী খলিফাদের মনসুর হাল্লাজকে ‘আনা আল-হক’ বলার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা সবারই জানা। মোটকথা, ইসলামী সমাজে ভ্রান্ত আকিদার প্রচার না উলামায়ে কেরাম সহ্য করতেন, না শাসকরা। মাহমুদ গজনভীর কারামাতি নেতাদের হত্যা করা, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সোহরাওয়ার্দী নামক যিনদীককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবং সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমীর বাতেনী সম্প্রদায়ের নাস্তিকদের হত্যা করানো এমন ঐতিহাসিক সত্য যার ওপর সবার ঐক্যমত রয়েছে।

ইসলামী সমাজে নবী ব্যতীত অন্য কারো মাসুমিয়াত-এর আকিদা কখনোই সহনীয় ছিল না। একইভাবে সাহাবায়ে কেরামের ওপর তাবাররাবাজি কখনোই বরদাশত করা হয়নি। কারণ মাসুমিয়াতের আকিদা খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করার নামান্তর এবং সাহাবায়ে কেরামের ওপর তাবাররাবাজি দ্বীনের মাধ্যমগুলোর প্রতি অনাস্ত্রার প্রমাণ। সুতরাং যদি সাদাতদের এমন ভুল আকিদার সাথে সত্যিই কোনো সম্পর্ক থাকত, তবে ইসলামী সমাজে তাদের এই সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব হতো না।

এই ব্যাখ্যার পর আরেকটি পয়েন্ট লক্ষ্য করুন। এটি প্রমাণিত যে, সাদাতদের মধ্য থেকে যখনই কেউ বিদ্রোহের আন্দোলন চালিয়েছে, তখন সাদাতদের অধিকাংশ মুরূবি তা থেকে দূরে থেকেছেন। যদি নিজেদের বাইয়াতের দাওয়াত দানকারী ব্যক্তির ‘আকিদায়ে ইমামত’-এর প্রবক্তা এবং স্বয়ং ‘امام معصوم’ (ইমামে মাসুম) ও ‘مفترض’ (মুফতারিজুত তাআ) হতেন, তবে এমন পরিস্থিতিতে সাদাতদের অন্যান্য মুরূবিদের সম্পর্কে কী বলা হবে? তারা সেই সময়ে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন সেই ইমামতের দাবিদারের বাইয়াত থেকে দূরে থাকলেন? যদি ইমামতের দাবিদারের ইমামত ফরজ হতো, তবে সমস্ত সাদাত কেন বাইয়াত করলেন না? আর বাইয়াত না করার কারণে ইমামতের দাবিদার কেন তাদের পথভ্রষ্ট ও কাফের ঘোষণা করলেন না? আর যদি তার দাবি মিথ্যা হতো, তবে অন্যান্য সাদাত কেন তাকে পথভ্রষ্ট ও মিথ্যাবাদী বললেন না?

যদি ইমামত আলে হুসাইনের জন্য নির্দিষ্ট হয় যেমনটি কিছু রাফেযী সম্প্রদায় বলে থাকে, তবে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি...

[১] আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদ-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (সহীহ বুখারী, হা: ৩৪৭৫; সুনানে নাসাঈ, হা: ৪৯০১, মুসনাদে সহীহ)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

জয়নুল আবেদিন (মৃ. ৯৪ হি.) কেন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রাযি.)-এর পুত্র আবু হাশিম আবদুল্লাহর ইমামতের দাওয়াতকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেননি?

যখন হযরত জয়নুল আবেদিন (রাযি.)-এর পুত্র যায়েদ বিন আলী (রাযি.) ১২২ হিজরিতে খুরুজ করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর পৌত্র মুহাম্মদ বিন আলীও সেই সময় গোপনে নিজের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। যদি বাস্তবে ‘মানসাবে ইমামতে মাসুমা’-এর কোনো অস্তিত্ব থাকত, তবে এই দুই দাবিদারের একজনের উচিত ছিল অন্যজনের হাতে বায়াত গ্রহণ করা, অন্যথায় অন্যজনকে অবশ্যই ইমামতের মিথ্যা দাবিদার বলা উচিত ছিল। একইভাবে যখন মুহাম্মদ নাফসে জাকিয়া নিজের বায়াতের দাওয়াত দেন, তখন হযরত জাফর আস-সাদিক (মৃ. ১৪৮ হি.) জীবিত ছিলেন। তিনি হয়তো নাফসে জাকিয়ার হাতে বায়াত গ্রহণ করে তাঁর সাথী হতেন অথবা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে নিজের ইমামতের অধিকার জাহির করতেন। কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি।

এখন এমন ধারণা করা সম্ভব নয় যে, এই মহান ব্যক্তিদের একে অপরের আন্দোলন এবং বায়াত গ্রহণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না; কারণ যে আন্দোলনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছিল, খোদ সাদাত বংশের মুরূবিরা তা থেকে কীভাবে অনবগত থাকতে পারেন!!

এই অজুহাতও পেশ করা যাবে না যে, এই মহান ব্যক্তির একে অপরকে পথভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী এবং ইমামত অস্বীকারকারী তো বলেছিলেন কিন্তু আমাদের পর্যন্ত সেই বিবরণ পৌঁছায়নি; কারণ এই মহান ব্যক্তির ছিলেন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং, যদি তাঁরা একে অপরকে ইমামত অস্বীকারকারী এবং মিথ্যা দাবিদার বলতেন, তবে এই খণ্ডনমূলক বক্তব্যগুলো অবশ্যই প্রসিদ্ধ হতো। বিশেষ করে এই কারণে যে, এই খুরুজগুলো ছিল খলিফাদের বিরোধিতায়, তাই খলিফারা এই খণ্ডনমূলক বক্তব্যগুলোকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে অবশ্যই প্রচার করতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা দেখি যে, এই মহান ব্যক্তির যেখানেই একে অপরের উল্লেখ করেছেন, অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে করেছেন। হযরত জাফর সাদিক (রাযি.) তাঁর চাচা যায়েদ বিন আলী (রাযি.)-এর উল্লেখ এভাবে করতেন:

“আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের সবার চেয়ে বেশি কুরআন মাজীদে কারী, দ্বীনের ফকিহ এবং সিলাহ রেহমি-তে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁর মতো আর কে আছে।” [১]

এই সত্যগুলো উচ্চস্বরে বলছে যে, সাদাত বংশীয়দের খুরুজ কোনোভাবেই ইমামত আকিদার কারিশমা ছিল না, বরং এর কারণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছিল। কখনো এই খুরুজ কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়েছে, কখনো কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কখনো অন্য কোনো কারণে।

হ্যাঁ! পরবর্তীতে রাফেজিদের খুরুজের পেছনে নতুন পথভ্রষ্ট আকিদা প্রচলিত করার উদ্দীপনা অবশ্যই কার্যকর ছিল, কিন্তু সেই বাতিল আকিদাগুলোর সাথে সাদাত বংশের মহান ব্যক্তিদের কী-ই বা সম্পর্ক!!

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৫/৩৯০, ত. আর-রিসালাহ।

সাদাতদের বিদ্রোহের আন্দোলনসমূহ..... সারকথা

- সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্বাস রযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঝাঁক এই দিকে ছিল যে, উম্মতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন তাঁদের নসীব হয়। তিনি চেয়েছিলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে এই বিষয়ে অসিয়ত করিয়ে নেওয়া হোক, কিন্তু হযরত আলী রযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে একমত হননি। [১] পরবর্তীতে সাদাতদের আরও কিছু বুজুর্গের ঝাঁকও এই দিকে ছিল। এই মহান ব্যক্তিদের মুখলিসানা রায় ছিল যে, বনু হাশিমের নেতৃত্বে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অধিকতর উত্তম পদ্ধতিতে সম্ভব। এই রায়ের পেছনে উম্মতের কল্যাণকামিতার জযবা কার্যকর ছিল, সম্পদ ও পদের মোহ নয়।
- যখন উম্মত দ্বীনি মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাদাত ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের একের পর এক খলিফা নির্বাচন করল, তখন সাদাতগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ঝাঁক বা রায়কে পেছনে ফেলে দিয়ে ঐসব খলিফাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না নিজে উম্মতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাদাতদের হাতে সোপর্দ করেছেন, না এমন কোনো অসিয়ত করেছেন, না সাদাতদের এমন কোনো অসিয়ত সম্পর্কে জানা ছিল, আর না তাঁরা কখনো এমন কোনো অসিয়তের দাবি করেছেন। ইমামতের আকিদার সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।
- অসিয়তের অপপ্রচার সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন সাবা করেছিল এবং হযরত আলী রযিয়াল্লাহু আনহু-কে নবীর ওসী এবং অন্যান্য খলিফাদেরকে জবরদখলকারী সাব্যস্ত করেছিল। তবে হযরত আলী রযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাহেবজাদাদের অন্যান্য খলিফাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে তাঁদের অনুগত থাকা এবং সাবায়ী মতাদর্শের নিন্দা করা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইমামত ও অসিয়তের আকিদা নিছক একটি অপপ্রচার ছিল।
- প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত শিয়ানে আলী-দের মধ্যে অনেক লোক সাবায়ী অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সাদাতদের জন্য নির্দিষ্ট মনে করতে শুরু করেছিল।
- বনু উমাইয়ার যুগে সাদাতদের বুজুর্গগণ: হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া, হযরত আলী বিন হুসাইন (যয়নুল আবেদীন), হযরত মুহাম্মদ বাকের, জাফর সাদিক রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁদের সন্তানগণ কখনো বিদ্রোহের চেষ্টা করেননি। এটাও প্রমাণিত নয় যে, তাঁরা অন্যদেরকে গোপনে এর জন্য প্রস্তুত করেছেন অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এই বুজুর্গ সাদাতগণ আকিদা-বিশ্বাস এবং উসূল ও ফুরূ-তে জমহুর উম্মতের সাথে একমত ছিলেন।
- সাদাতদের প্রথম ব্যক্তি যিনি আদর্শিক বিচ্যুতির শিকার হয়ে বিদ্রোহের পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন মুহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পুত্র আবু হাশিম আব্দুল্লাহ। তিনি সাবায়ী বর্ণনাগুলো পড়তে এবং সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন, যেমনটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ “আত-তারীখুল কাবীর”-এ নকল করেছেন। সম্ভবত এই বর্ণনাগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি তাঁর বড়দের রায় ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। [২]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৪৭, বাব: মারযুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ওফাতুহ।

[২] আত-তারীখুল কাবীর: ৫/১৮৭; আরও দেখুন: সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/১৩০।

তারিখে মিল্লাত

- আবু হাশিমের পর আব্বাসীয় পরিবারের একজন সদস্য মুহাম্মদ বিন আলী (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পৌত্র) এবং ফাতেমী পরিবারের একজন সদস্য যায়েদ বিন আলী (হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পৌত্র) ও এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন।
- এই ব্যক্তিবর্গের চিন্তাগত পরিবর্তন কুফর, বিদআত বা গোমরাহীর পর্যায় পর্যন্ত ছিল না, বরং তা এই পর্যায় পর্যন্ত ছিল যে, পূর্বে সাদাতদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারণা কিছু হাশেমী মুরুব্বীদের অন্তরে একটি আকাঙ্ক্ষা বা স্বাভাবিক প্রবণতার স্তরে ছিল, কেউ বিদ্রোহকে (খুরুজ) বৈধ মনে করত না। এখন এই কয়েকজন ব্যক্তির নিকট এই স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে একটি সংকল্প ও দৃঢ় ইচ্ছার রূপ ধারণ করল এবং এই ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহকে বৈধ বরং জরুরি মনে করতে লাগলেন। তবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে তাঁরা পূর্ববর্তী খলিফাদের গালিগালাজ করেছেন অথবা ইমামত ও ওসিয়তের আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।
- যায়েদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি সাময়িক অসন্তুষ্টির কারণে কুফাবাসীদের প্ররোচনায় পড়ে কোনো বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহ করেন, কুফাবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং যায়েদ বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।
- মুহাম্মদ বিন আলী এবং তাঁর পুত্রগণ দীর্ঘ বছরের গোপন প্রস্তুতির পর খোরাসানী গোত্রগুলোর সাহায্যে উমাইয়া খলিফা মারওয়ান সানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেই সময় বনু উমাইয়া তাদের অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই এই আন্দোলন সফল হয় এবং মুহাম্মদ বিন আলীর বংশধরগণ উম্মাহর রাজনীতির লাগাম হাতে তুলে নেন। এই শাসনব্যবস্থা আব্বাসীয় খিলাফত নামে পরিচিত হয়।
- ফাতেমী মুরুব্বীদের মধ্যে হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পৌত্র আবদুল্লাহ বিন হাসান মুসান্না এবং তাঁর দুই পুত্র: মুহাম্মদ নাফসে জাকিয়া ও ইবরাহিমের জমহুর উম্মাহর চিন্তাধারার সাথে এই পর্যায় পর্যন্ত মতভেদ ছিল যে, তাঁরাও খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে সঠিক মনে করতেন। অধিকন্তু তাঁরা খিলাফতের ওপর বনু আব্বাসের তুলনায় বনু ফাতেমার অধিকার বেশি মনে করতেন। ওসিয়ত ও ইমামতের আকিদার সাথে তাঁদেরও কোনো সম্পর্ক ছিল না।
- এই আকাবির সাদাতদের পরবর্তীতে প্রচলিত কুফরি আকিদা থেকে মুক্ত থাকার একটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, জমহুর মুহাদ্দিসগণ তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদেরকে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) মনে করতেন। বিচারক বা খলিফাদের মধ্যে কেউ তাঁদেরকে কখনো ভ্রান্ত আকিদার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেননি, অথচ সেই যুগের বিচারক বা খলিফাগণ এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দিতেন না।
- নাফসে জাকিয়া এবং ইবরাহিমের এই ভুল ধারণা ছিল যে, উম্মাহর সওয়াদে আজম তাঁদের সাথে রয়েছে, যদিও বাস্তবে তা ছিল না। এই বিদ্রোহের ফলে তাঁদের পরিবার কারাবরণ ও নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাঁরাও পরাজিত হন। তাঁরা উভয়েই তাঁদের অনেক সঙ্গীসহ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁদের এই রাজনৈতিক ভুল ক্ষমা করুন এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।
- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক বা আহলে সুন্নাতের কোনো বড় ইমাম বা ফকিহ এই বিদ্রোহের আন্দোলনগুলোর সাথে একমত ছিলেন বলে প্রমাণিত নয়।
- স্বয়ং সাদাত, বনু হাশেম, বনু ফাতেমা এবং আলভী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশ মুরুব্বী এই আন্দোলনগুলো থেকে দূরে ছিলেন।

বাগদাদ নির্মাণ

মনসুর আব্বাসীর চিরস্মরণীয় কীর্তি হলো নতুন রাজধানী বাগদাদ নির্মাণ। এর আগে আব্বাসী খলিফার অবস্থান ছিল কুফার নিকটবর্তী নতুন মহল্লা “হাশেমিয়া”-তে। সেখানে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধের পর মনসুর যথাযথভাবে অনুভব করেন যে, এই স্থানটি নিরাপদ নয়। ফলে তিনি মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রের উপযোগী একটি স্থায়ী রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। যথেষ্ট অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার পর সাসানীয় সম্রাটদের রাজধানী মাদায়েনের দক্ষিণে “বাগদাদ” নামক জনপদটি তার কাছে উপযুক্ত মনে হয়। এটি দজলা নদীর তীরে একটি জায়গির ছিল যেখানে ফলের বাগান ছিল। কিসরা তার কোনো এক খাদেমকে এই জায়গির দান করেছিলেন, সেই সূত্রে এর নাম “বাগদাদ” (দানকৃত বাগান) হয়ে গিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে শব্দটি সংক্ষিপ্ত হয়ে “বাগদাদ” হয়ে যায়। ইরানি সম্রাটদের যুগে এখানে একটি বাজারও বসত। এই স্থানটি সর্বপ্রথম মুসান্না বিন হারিসা (রা.) জয় করেছিলেন।

রাজধানী হিসেবে এই স্থানটি নির্বাচন করার বেশ কিছু কারণ ছিল:

- এক. এর আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত মনোরম।
- দুই. এর চারদিকে খালের একটি জাল বিছানো ছিল। শত্রুর আক্রমণের সময় খালের পুলগুলো ভেঙে দিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা সহজেই রোধ করা যেত। দজলা নদীর মাধ্যমে আল-জাজিরা এবং আমেনিয়া পর্যন্ত সাহায্য ও রসদ আনানো যেত। এই নদীটিই সামনে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে বিদেশের সাথে বাণিজ্যের পথ সুগম ছিল। পশ্চিমে ফোরাতে নদীও খুব বেশি দূরে ছিল না যার মাধ্যমে সিরিয়া ও মিশরের সেনাবাহিনী অনায়াসে পৌঁছাতে পারত। ফোরাতে নদীর বেশ কিছু খাল এখানে আসত যা দ্বারা একটি বিশাল এলাকা সেচ করা হতো।

মনসুর গ্রীষ্মকালে নিজে এই স্থানে আসেন এবং এক রাত অতিবাহিত করেন। সেখানে তার খুব প্রশান্তির ঘুম হয়। মশা তাকে বিরক্ত করেনি এবং গরমও লাগেনি। সব দিক থেকে এই স্থানটিকে সর্বোত্তম মনে করে তিনি এখানেই নতুন শহর গড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অবশেষে ১৪৫ হিজরিতে এখানে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এর আগে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের নামকরা আমীর এবং উলামা ও ফুজলাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথম ইট খলিফা মনসুর নিজে এই বলে স্থাপন করেন:

“আল্লাহর নামে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পৃথিবী আল্লাহরই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী দান করেন এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।”

এখন পুরোদমে নির্মাণ অভিযান শুরু হলো। শত শত ইঞ্জিনিয়ার এবং হাজার হাজার শ্রমিক দিনরাত কাজ করতে থাকেন। শহরের প্রাচীরের প্রস্থ নিচে ৭৫ ফুট এবং উপরে ৩০ ফুট রাখা হয়। একইভাবে পরিখাও অনেক গভীর রাখা হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই কাজ এত বিশাল ছিল যে তা সম্পন্ন হতে চার বছর সময় লাগে। মাঝখানে নফসে জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের বিদ্রোহের কারণে কিছু...

খিলাফতে বনু আব্বাস

সময়ের জন্য কাজ বন্ধও হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের পর কাজ পুনরায় খুব দ্রুতগতিতে শুরু করা হলো। সরকারি ইমারতসমূহ, রাস্তাঘাট, বাগান এবং পুল ইত্যাদি তৈরি করা হলো।

মনসুর নিজেই নির্মাণের পরিকল্পনা করতেন। নির্মাণ কাজ চলাকালীনই ১৪৬ হিজরির সফর মাসে তিনি হাশিমিয়া থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হন। তিনি নিজের মিতব্যয়ী স্বভাব সত্ত্বেও বাগদাদ নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন। তবুও তিনি প্রতিটি পয়সার হিসাব নিজে রাখতেন। আরবিতে পয়সাকে ‘দানিক’ বলা হয়; এজন্যই মনসুর ‘দাওয়ানিগি’ উপনামে পরিচিত হন।

বাগদাদের নকশা বৃত্তাকার ছিল। শহরের প্রাচীরের চারটি দরজা ছিল এবং প্রতি দুই দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল এক মাইল। শহরের ঠিক মাঝখানে খিলাফত প্রাসাদ ছিল; সম্ভবত এটি এভাবে প্রকাশ করার জন্য ছিল যে খলিফার সাথে সমস্ত শহরবাসীর সমান সম্পর্ক রয়েছে। খিলাফত প্রাসাদের চারপাশে শাহজাদাদের মহল, জামে মসজিদ, উমারা ও উজিরদের হাবেলি এবং খিদমতগার কর্মীদের আবাসস্থল ছিল, যার মধ্যে দেহরক্ষী সিপাহি, গোলাম এবং খাজা-সারাদের সবার আলাদা আলাদা মহল ছিল। খলিফার প্রাসাদ যা সরকারি কাজের কেন্দ্রীয় দপ্তরও ছিল, ‘কাসরুজ জাহাব’ নামে পরিচিত ছিল।

নির্মাণ কাজ ১৪৯ হিজরিতে সম্পন্ন হয় এবং এতে সরকারি কোষাগার থেকে দুই কোটি দিরহাম (প্রায় পাঁচ আরব টাকা) খরচ হয়। শহরের নাম ‘মদিনাতুস সালাম’ (শান্তির শহর) রাখা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ একে ইসলামি খিলাফতের কেন্দ্র হওয়ার কারণে ‘মদিনাতুল ইসলাম’ বলত।

সাধারণ জনগণকে সেনাবাহিনীর সাথে মেলামেশা থেকে বাঁচাতে মনসুর বাগদাদের পূর্বে আলাদা একটি সামরিক জোন নির্মাণ করান যা ‘রুসাফা’ নামে পরিচিত হয়। এখানে ঘোড়সওয়ারি এবং যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলনের জন্য প্রশস্ত ময়দান ছিল, অফিসার এবং সৈন্যদের আবাসস্থল ছিল। রুসাফার জামে মসজিদ আলাদা ছিল। একইভাবে একটি মজবুত প্রাচীর এবং পরিখার মাধ্যমে একে সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

বাগদাদের নির্মাণ ও উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, দক্ষ কারিগর এবং শ্রমিকরা উন্নত জীবনযাত্রার সন্ধানে এখানে আসতে থাকে। উলামা ও ফুজলাও খুব দ্রুতগতিতে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরাও দলে দলে এদিকে মুখ ফেরায়।

পরবর্তী বছরগুলোতে এখানে অসংখ্য জাঁকজমকপূর্ণ ইমারত নির্মিত হয়। দরবারি উমারাদের নিজস্ব আবাসস্থলগুলোও ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ যে মানুষ দেখে অবাক হয়ে যেত। আমির ঈসা বিন আলীর মহল, যা দজলা নদীর তীরে ছিল, চার হাজার মানুষের সংকুলান রাখত। শহরের সবচেয়ে উঁচু ইমারত ছিল ‘কুব্বাতুল খাদরা’। এখান থেকে পুরো শহরের দৃশ্য দেখা যেত; ইমারতটির জাঁকজমকপূর্ণ সবুজ গম্বুজ ৮০ গজ উঁচু ছিল এবং মাইলের পর মাইল দূর থেকে দেখা যেত। একে ‘শহরের মুকুট’ এবং ‘বাগদাদের পতাকা’ও বলা হতো। এখানে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের অবস্থান করানো হতো।

যখন শহর খুব জনাকীর্ণ হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোতে ভিড়ের কারণে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়ল, তখন খলিফা ও উমারাগণ নিজেদের আবাসস্থল...

দজলা নদীর পশ্চিম তীরে বসতিগুলো নির্মিত হয়েছিল। এখানে নির্মিত খিলাফত প্রাসাদকে ‘কাসরুল খুলদ’ বলা হতো।

শহরের বাজারগুলোতে প্রতিদিন ডজন ডজন কাফেলা আসত এবং অন্যান্য শহরের জন্য বাণিজ্যিক পণ্য পাঠানো হতো। এই ভিড়ের কারণে চলাচলের পথগুলো বন্ধ হয়ে যেত এবং পথচারীদের অনেক অসুবিধা হতো, তাই ১৫৭ হিজরিতে মনসুর বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর জন্য শহরের দক্ষিণে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেন। সমস্ত বাজার সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই এলাকাটি ‘কারখ’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাগদাদের নির্মাণ ও আবাদের উপকারিতা তো ছিলই, তবে একটি ক্ষতি এই হয়েছিল যে, ধীরে ধীরে কুফার বিশিষ্ট আলেম, ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণ বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়ে যান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পর কুফার ফিকহী আসনটি সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। কুফায় শিয়ানে আলীকে বিভ্রান্তকারী অপশক্তিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও সেখানে হক্কানী আলেমগণ বিদ্যমান ছিলেন, তবে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে কুফা স্পষ্টভাবে রাফেযী মতবাদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে বাগদাদের জৌলুস দিন দিন বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিকগণ একে ‘জান্নাতুল আরয’ এবং ‘কুব্বাতুল ইসলাম’ বলে স্মরণ করতেন। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরটি ক্রমাগত আবাদ হতে থাকে। অবশেষে ৬৫৬ হিজরিতে হালাকু খান একে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। [১]

[১] বাগদাদের নির্মাণ, গঠন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। লেখক নিম্নোক্ত উৎসগুলোর সারসংক্ষেপ পেশ করেছেন:

(১) তারিখ বাগদাদ লিল-খতিব আল-বাগদাদী, ১/৮৭ থেকে ১১৫।

(২) তারিখ আত-তাবারী, ৭/৬১৪ থেকে ৬১৮।

(৩) কিতাবুল বুলদান লিল-ইয়াকুবী, পৃ: ১৩০৫ থেকে ৫৫।

(৪) মু’জামুল বুলদান, ভুক্তি: বাগদাদ।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কারাবরণ ও পরকালীন সফর

মনসুরের যুগে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম সাহেব ইবরাহীমের খুরুজের (বিদ্রোহ) সময় সরকারি নীতিমালার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে মনসুরের সামনে পেশ করা হয়। [১]

মনসুর তাঁকে কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) পদের প্রস্তাব দেন। ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মনসুর কসম খেলেন যে, আপনাকে সরকারি চাকরি গ্রহণ করতেই হবে। ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও কসম খেলেন যে, আমি কোনো পদ গ্রহণ করব না। এর ওপর মনসুর তাঁকে বাগদাদ দ্বীপের নির্মাণ কাজ তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। [২]

কাযী পদের প্রস্তাব দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, মনসুরের আশঙ্কা ছিল ইমাম সাহেবের সমালোচনা যেন জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, যদিও ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য এমন ছিল না। সম্ভবত হিংসুকরা মনসুরকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, ইমাম সাহেব বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষক। এমতাবস্থায় মনসুরের নিকট সর্বোত্তম পথ ছিল এই যে, ইমাম সাহেব কাযী পদ গ্রহণ করে নিন, যাতে যদি তাঁর দিকে বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা ভুলভাবে আরোপ করা হয়ে থাকে তবে তার নিরসন হয় এবং সরকারি কাতারে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের ভিত্তি মজবুত হয়। কিন্তু সরকারি পদ গ্রহণ করা যেহেতু ইমাম সাহেবের জীবন দর্শনের পরিপন্থী ছিল; তাই তিনি তা অস্বীকার করেন। সম্ভবত এই অস্বীকার মনসুরের মনে এই বিশ্বাস জন্মানোর কারণ হয়েছিল যে, তাঁর ব্যাপারে বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত তথ্যগুলো সঠিক। ফলে সে তাঁকে হেফাজতে রাখে। এই সময়ে বাগদাদ নির্মাণাধীন ছিল। মনসুর ইমাম সাহেবকে সেখানে নির্মাণ কাজ তদারকি এবং ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব অর্পণ করেন। [৩]

কিছু ইতিহাসের শব্দাবলী থেকে ভ্রম সৃষ্টি হয় যে, তাঁকে কেবল ইট গণনার কাজ দেওয়া হয়েছিল [৪], কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন ছিল না। এই বিষয়ে তারিখুত তাবারীর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে প্রকৃত সত্যের ওপর আলোকপাত হয়:

“মনসুর ইমাম সাহেবকে শহর নির্মাণ, ইট তৈরি, সেগুলো গণনা এবং লোকদের কাজে লাগানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। মনসুর এটি এই জন্য করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কসম পূর্ণ করতে পারেন। বর্ণনাকারী (সুলাইমান বিন মুজালিদ) বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এমনকি তিনি শহরের প্রাচীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে অবসর হন যা পরিখার সাথে মিলিত ছিল।” [৫]

[১] আখবারু আবি হানীফা: ৯২/১, ৯৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৬১৯/৭, ১৪৫ হিজরির অধীনে

[৩] তারিখুত তাবারী: ৬১৯/৭

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ১৪৫

[৫] “তিনি শহর নির্মাণের তদারকি, ইট তৈরি ও গণনা এবং লোকদের কাজে লাগানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মনসুর এটি কেবল এই জন্য করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কসম থেকে মুক্ত হতে পারেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ইমাম আবু হানীফা এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন যতক্ষণ না তিনি পরিখা সংলগ্ন শহরের প্রাচীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন।” (তারিখুত তাবারী: ৬১৯/৭, ১৪৫ হিজরির অধীনে)

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইমাম সাহেব [রহ.] ইট গণনার তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত ছিলেন না, বরং তিনি নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং লোক নিয়োগের দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল।

তারিখ তাবারির অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইমাম সাহেব [রহ.] স্বেচ্ছায় এই সেবা প্রদান করেছিলেন যাতে মনসুরের শপথ পূর্ণ হয়ে যায়। এই বর্ণনায় রয়েছে:

“মনসুর শপথ করেছিলেন যে, তিনি তাঁকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বেন না যতক্ষণ না তিনি তাঁর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানিফা যখন এ কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি একটি বাঁশ আনিয়ে নিলেন এবং ইট প্রস্তুতকারী এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে ইট গণনা করলেন। ইমাম আবু হানিফা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বাঁশ দিয়ে ইট গণনা করেছিলেন। এভাবে তিনি আবু জাফর মনসুরের শপথ পূর্ণ করে দিলেন।”

লক্ষ্য করুন যে মনসুর বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! আবু হানিফা অবশ্যই তাঁর চাকরি করবেন।” এতে ‘কাজা’ (বিচারকের দায়িত্ব) শব্দটি ছিল না। [১] অর্থাৎ তাঁকে যে কোনো উপায়ে সরকারি কর্মচারী হতে হবে। ইমাম সাহেব [রহ.] এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে একটি সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করলেন এবং ইট গণনা করে দিলেন যাতে খলিফার শপথ পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁকে কাজা বা বিচারকের পদের জন্য বাধ্য না করা হয়। এরপর মনসুর তাঁকে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান এবং হিসাব-নিকাশের মতো দায়িত্বও অর্পণ করেন।

১৪৯ হিজরিতে বাগদাদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ইমাম সাহেব [রহ.] বাড়িতে যাতায়াতের জন্য স্বাধীন ছিলেন না, বরং তাঁর অবস্থান ছিল কারাগারে। ১৫০ হিজরিতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। [২] কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। [৩] ইমাম সাহেব [রহ.] সারা জীবন সরকারি পদ থেকে দূরে ছিলেন। এটি ছিল তাঁর অটল সিদ্ধান্ত। তিনি উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় সরকারের আমলেই এই সংকল্পে অটল ছিলেন।

এই সিদ্ধান্তের একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে এই ধারণা সঠিক নয় যে, ইমাম সাহেব এই সরকারগুলোকে পুরোপুরি জুলুম ও অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে সেগুলোতে যে কোনো ধরনের চাকরি করাকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করতেন। কারণ যদি তাঁর এই মত হতো, তবে ইমাম সাহেবের ছাত্রদের চেয়ে বেশি এ বিষয়ে কে অবগত হতে পারত? আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায়ই তাঁর ছাত্র জুফার বিন হুজাইল [রহ.] আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে বসরার কাজি ছিলেন। ইমাম সাহেব [রহ.] তাঁকে এই দায়িত্ব পালন থেকে নিষেধ করেননি, বরং এই কাজে তাঁর সাফল্যের জন্য চিন্তিত থাকতেন। [৪] একইভাবে ইমাম আবু ইউসুফ [রহ.] হারুনুর রশিদের আমলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) হয়েছিলেন। ইমাম সাহেবের আরেক ছাত্র আসাদ বিন ফুরাত [রহ.] আব্বাসীয় আমলে উত্তর আফ্রিকার কাজি এবং সেনাপতি ছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাজা বা বিচারকের পদ গ্রহণ করা শরিয়ত অনুযায়ী নাজায়েজ ছিল না। বরং ইমাম সাহেবের কাজা থেকে বিরত থাকা ছিল সতর্কতামূলক।

[১] “তিনি শপথ করলেন যে, তিনি কাজ না করা পর্যন্ত তাঁকে ছাড়বেন না। আবু হানিফাকে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি একটি বাঁশ চাইলেন এবং এক ব্যক্তির তৈরি করা ইটগুলো গণনা করলেন। আবু হানিফাই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বাঁশ দিয়ে ইট গণনা করেছিলেন এবং এভাবে আবু জাফরকে তাঁর শপথ থেকে মুক্ত করেছিলেন।” (তারিখ আত-তাবারি: ৭/৬১৯, ১৪৫ হিজরির ঘটনাবলি)

[২] আখবারু আবি হানিফা: ১/৯২, ৯৩; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৬/৪০২

[৩] আখবারু আবি হানিফা: ১/৯২, ৯৩

[৪] আল-ইনতিকাহ ফি ফাদাইলিল সালাসাতি আইম্মাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দুল বার: ১/১৭৩

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কাজীর পদ গ্রহণ না করার কারণসমূহ:

এখন কথা হলো, কেন এই পর্যায়ে সতর্কতা ছিল? এর একটি কারণ ছিল ইমাম সাহেবের স্বভাবজাত অমুখাপেক্ষিতা (ইস্তিগনা), দ্বিতীয়ত তাঁর এই আশঙ্কা ছিল যে, সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি সরকারি প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না এবং কোনো এক পর্যায়ে তাকে নিজের গবেষণার (তাহকীক) বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে বাধ্য করা হবে অথবা তার কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা করা হবে। স্পষ্টতই ইমাম সাহেবের মতো একজন ব্যক্তি এমন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারতেন না। ফলে মনসুর যখন ইমাম সাহেবকে ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করলেন, তখন ইমাম সাহেব সরাসরি অস্বীকার করে বললেন:

“এমনটি হতে পারে না; কারণ আপনি যদি আমাকে আপনার ঘনিষ্ঠ করেন তবে আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন। আর যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন তবে আমাকে ব্যথিত করবেন। আপনার কাছে এমন কিছু নেই যার আমি প্রত্যাশা করি। আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যা হারিয়ে যাওয়ার ভয় আমার আছে। আপনার কাছে যারা আসা-যাওয়া করে তারা আপনার জন্য যথেষ্ট, তাদের উপস্থিতিতে আপনার অন্য কারো প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়।” [১]

ফিকহ সংকলনের জন্য একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তা:

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর এই উত্তরের ওপর চিন্তা করলে অমুখাপেক্ষিতার প্রকাশ এবং ফিতনার ভয়ের পাশাপাশি এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর কাছে নিজের অরাজনৈতিক বিশুদ্ধ ইলমি ও ফিকহি ব্যস্ততাগুলো অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যেগুলোকে তিনি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতেন। সেগুলো থাকা অবস্থায় তিনি অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, কাজীর পদের জন্য আরও অনেক যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিল যাদের মনসুরের কাছে আসা-যাওয়াও ছিল। ইমাম সাহেব যে কাজ করছিলেন তা কাজীর পদের চেয়ে অনেক উচ্চতর পর্যায়ে ছিল। সুতরাং ইমাম সাহেবের সরকারি পদ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিবর্তে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ সময় নষ্ট করার নামান্তর ছিল। সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ফিকহ সংকলনের জন্য যে একাগ্রতা প্রয়োজন ছিল তা আর নসিব হতো না। সেই সময়, যার প্রতিটি মুহূর্ত উম্মতের আমানত ছিল, তা দুটি দায়িত্বের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যেত। এতে জীবনের উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বড় মানুষরা বড় উদ্দেশ্যের জন্য অনেক বৈধ বিষয় থেকেও বেঁচে থাকেন; কারণ সেগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটায়।

পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা:

এই অনুমানও করা যেতে পারে যে, ইমাম সাহেব (রহ.) নিজেকে যেকোনো ধরনের পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন; কারণ তিনি ফিকহ সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন যেখানে ইবাদত থেকে শুরু করে রাজনীতি পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া এবং বিন্যস্ত করা হচ্ছিল। এই কাজ কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য নয়, বরং পুরো উম্মতের স্বার্থে হচ্ছিল। যে যুগে ইমাম সাহেব পর্যালোচনা ও সংকলনের কাজ করছিলেন, তা ছিল উম্মতের দুটি বড় শ্রেণির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সময়। ১২০ হিজরি থেকে ১৫০ হিজরি পর্যন্ত এই সময়ের প্রাথমিক বারো বছর ছিল উমাইয়াদের শাসনকাল, যাতে তাদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়রা তুফান সৃষ্টি করে রেখেছিল।

[১] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়াহ: ২/৫০৭, ত: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা; এবং বর্ণনাটি এর সনদসহ দেখুন মানাকিবে আবি হানিফা লিল মুয়াফফাক আল-মাক্কি-তে।

তারপর ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় এলে প্রায় পনের বছর পর্যন্ত তাদের ক্রমাগত বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মোদাকথা, সে সময় রাজনৈতিক মতপার্থক্য চরম সীমায় পৌঁছেছিল। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা সঠিক আকিদাবিশ্বাসের অধিকারী ছিল, তারা রাজনৈতিকভাবে দলাদলির শিকার ছিল। কিছু লোক সরকারের সমর্থক ছিল এবং কিছু বিরোধী দলের। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেব যদি কোনো সরকারি পদে থাকতেন, তবে তাঁর সংকলিত ফিকহি মতামত ও ফতোয়াগুলো হয়তো সরকার সমর্থক মহলে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতো, কিন্তু সরকার বিরোধী মহলে সেগুলোকে সর্বদা সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে দেখা হতো। এভাবে সেই উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো যার জন্য তিনি দিন-রাত এক করে দিয়েছিলেন।

যা-ই হোক, মনসুরের কারাগারে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু ছিল এমন এক ট্রাজেডি যার কলঙ্ক মনসুরের অনেক গুণকে ম্লান করে দেয় এবং তার দোষগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। হায়! যদি এমনটি না হতো, কিন্তু তবুদিরে এটাই লেখা ছিল যে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ-এর মৃত্যু এভাবে বন্দি অবস্থায় হবে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে মনসুরের রাজনীতি

অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নিষ্পন্ন করার পাশাপাশি মনসুর এক মুহূর্তের জন্যও বৈদেশিক শক্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ থেকে বেখবর ছিলেন না। তাদের সাথেও সন্ধি বা যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতেন।

আন্দালুস এবং আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া

আন্দালুসের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা বনু উমাইয়া খিলাফতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদ এটি জয় করেছিলেন। বনু উমাইয়ার পতনের সাথে সাথে আন্দালুসেও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। যখন ১৩২ হিজরিতে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেন এবং বনু উমাইয়ার জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে বনু উমাইয়ার একজন রাজপুত্র আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া, যিনি উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পৌত্র ছিলেন, প্রাণ বাঁচাতে আফ্রিকায় পৌঁছে যান এবং বেশ কয়েক বছর আত্মগোপনে থাকেন। সেই সময় পর্যন্ত আন্দালুসে বনু আব্বাসের দখল সুসংহত হয়নি, বরং সেখানে বনু উমাইয়ার সমর্থকদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বিদ্যমান ছিল। তাই আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসের কিছু আমিরের সাথে গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে তাদের নিজের সমর্থক বানান এবং এরপর ১৩৮ হিজরিতে (৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসে পৌঁছে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় শাসক ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহরি, যিনি কর্ডোভা, টলেডো এবং সেভিলের মতো কেন্দ্রীয় শহরগুলোর শাসক ছিলেন, তার মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হন। এভাবে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া পুরো আন্দালুস দখল করে নেন। [১]

আল্লাহর শোকর যে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে:

মনসুর অন্যান্য অভিযানে ব্যস্ততা এবং আন্দালুসের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এই ক্ষতির প্রতিকার করতে পারেননি। তবে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ১৪৬ হিজরিতে (৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি আফ্রিকার শাসক আলা বিন মুগীসকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে আবদুর রহমানের মোকাবিলায় পাঠান। কিন্তু আবদুর রহমান মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গীকে নিয়ে আব্বাসীয়দের কয়েক গুণ বড় বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং আলা বিন মুগীসসহ বেশ কয়েকজন আব্বাসীয় কর্মকর্তার কর্তৃত্ব মস্তক আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

এই দৃশ্য দেখে মনসুরের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে: “আল্লাহর শোকর যে আমার এবং আবদুর রহমানের মাঝে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে।” [২]

[১] নাফহত তীব: ১/৩২৭ থেকে ৩৩০; আল-ইকদুল ফারিদ: ৫/২২৯, ২৩০

[২] নাফহত তীব: ১/৩৩২

এর পর আব্বাসীয়দের সমুদ্র পার হয়ে আন্দালুস আক্রমণের সাহস হয়নি। তবে মনসুর দ্বিতীয় কৌশল অবলম্বন করেন এবং ফ্রান্সের শাসকদের আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে উস্কানি দেন।

আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সময় উত্তর আন্দালুস ও দক্ষিণ ফ্রান্সে খ্রিস্টানদের শক্তি সুসংহত হচ্ছিল। দক্ষিণ ফ্রান্স, যা আন্দালুসের প্রথম মুসলিম বিজয়ীরা জয় করেছিলেন, চল্লিশ বছর পর পুনরায় খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। ফ্রান্সের শাসক শার্লম্যান আগে থেকেই আন্দালুস আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মনসুরের পক্ষ থেকে সমর্থন পেয়ে তিনি আরও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আন্দালুস আক্রমণ করেন। তবে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া তাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। এই বীরত্ব দেখে মনসুরও প্রশংসা না করে পারলেন না। তিনি বললেন:

“আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া কুরাইশদের বাজপাখি, যে তার বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বর্ষার ফলক ও তলোয়ারের ধার থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে; জনশূন্য মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে; সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে; এমনকি একটি অপরিচিত দেশে একাকী প্রবেশ করে শহরগুলো জয় করেছে; সেনাবাহিনী গঠন করেছে এবং নিজের বিচক্ষণতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে হারানো রাজত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছে।”

এর পর মনসুর আন্দালুসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন এবং নিঃসন্দেহে সেই সময়ের জন্য এটিই ছিল সর্বোত্তম। [১]

রোমান সাম্রাজ্য:

মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। এর আগে হযরত উসমান গনি (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের আমলে কায়সারের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সফলতা আসেনি। বিনিময়ে রোমান শাসকরাও মুসলিম বিশ্বের ওপর হামলার সুযোগ খুঁজত।

মনসুরের খিলাফতের প্রথম দিকে ১৩৭ হিজরিতে কায়সার কনস্টান্টিন চতুর্থ সিরিয়ার উপকূল ও এশিয়া মাইনরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযানে রোমানরা এশিয়া মাইনরের মালাতিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়।

মনসুর এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সালিহ বিন আলীকে সীমান্তে পাঠান। ওদিকে কনস্টান্টিন চতুর্থ এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। ১৩৮ হিজরিতে এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী এলাকা ‘দাবিক’-এর উপত্যকায় এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কনস্টান্টিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটে কনস্টান্টিনোপলে চলে যান। মুসলমানরা তাদের এলাকা পুনরুদ্ধার করে, তবে রোমানরা যাওয়ার সময় মালাতিয়া ধ্বংস করে দিয়ে যায়।

এর পর মনসুর প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সেখানে নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর ধারা শুরু করেন। প্রতি বছর বড় বড় সেনাপতিদের নেতৃত্বে রোমানদের দুর্গে আক্রমণ চালানো হতো। রোমানদের পরবর্তী বহু বছর পর্যন্ত আর কোনো আক্রমণের সাহস হয়নি। বরং মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে তারা এই আশঙ্কায় থাকত যে যেকোনো সময় কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণ হতে পারে। [২]

[১] আল-ইকদ আল-ফারিদ, ৫ / ৬৩০

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪১৮, ৪৬৭, ৪৯৭

বলা হয় যে, ১৫৫ হিজরিতে রোমান সাম্রাজ্য বার্ষিক কর প্রদানের শর্ত মেনে নিয়ে মনসুরের সাথে সন্ধি করেছিল। কিন্তু এটি সঠিক নয়। মনসুরের মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত ছিল। ১৫৮ হিজরিতে যখন তার ইন্তেকাল হয়, তখন ময়ূফ বিন ইয়াহইয়ার নেতৃত্বে রোমান সীমান্তে অতর্কিত আক্রমণ অভিযানগুলো চলছিল। [১]

মনসুরের মৃত্যু:

মনসুর বেশ কয়েক বছর ধরে বদহজমের সমস্যায় ভুগছিলেন। এর জন্য তিনি নিয়মিতভাবে হজমের ইউনানি ওষুধ ব্যবহার করতেন। ১৫৮ হিজরিতে হজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে অসুস্থতা অনেক বেড়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে হজের তিন দিন আগে ৬ই জিলহজ ১৫৮ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। মক্কার কবরস্থান “জান্নাতুল মুয়াল্লা”-তে তাকে দাফন করা হয়। তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি তার পুত্র মাহদীকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। [২]

তার শেষ কথাগুলো ছিল: “হে আল্লাহ! যদিও আমি অনেক বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করেছি, কিন্তু তোমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়ে আনুগত্য করেছি, অর্থাৎ সত্য অন্তরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য দিয়েছি।”

এরপর এই দোয়া করেন: “হে আল্লাহ! তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎকে বরকতময় করে দাও।”

এই কথাগুলোর সাথেই তার রুহ কবজ হয়ে যায়।

তার আংটিতে খোদাই করা ছিল: “اللَّهُ ثِقَّةٌ عَبْدُ اللَّهِ وَبِهِ يَوْمِنُ” (আবদুল্লাহর আল্লাহর ওপরই ভরসা এবং তাঁর ওপরই ঈমান রয়েছে।) [৩]

মনসুরের চরিত্রের ওপর এক নজর

একজন শাসক হিসেবে মনসুরের জীবন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা থেকে বহু দূরে ছিলেন। খিলাফত প্রাসাদে তার বাসস্থান ছিল একটি সাধারণ সীমানা প্রাচীরের ভেতরে, যাতে একটি কক্ষ, একটি আঙিনা এবং একটি ছাউনি ছিল। কক্ষের একটি বিছানা এবং একটি লেপই ছিল তার শয়ন সামগ্রী। [৪]

দৈনন্দিন রুটিন ও ব্যস্ততা:

তার অভ্যাস ছিল যে, প্রতিদিন রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে ফজরের আজান পর্যন্ত নফল নামাজ এবং জিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফজরের নামাজ সবার সাথে জামাতের সাথে আদায় করতেন। এর পরপরই তার দরবার বসে যেত। জোহর পর্যন্ত দরবারে প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ, আদেশ জারি এবং অন্যান্য সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। জোহরের নামাজ আদায় করে ঘরে চলে যেতেন এবং খাবার শেষ করে আসর পর্যন্ত বিশ্রাম নিতেন। আসরের নামাজের পর থেকে এশা পর্যন্ত সময় পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া এবং অসাধারণ প্রকৃতির কাজগুলো সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো।

[১] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ৪২৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৮৭২

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৮/৬৩/৮০০

[৪] তারিখ আত-তাবারী: ৮/৫৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৪৫৮

এশার সালাত আদায় করে তিনি সারা দেশ থেকে আসা ডাক (চিঠিপত্র) অধ্যয়ন করতেন এবং উত্তর লিখিয়ে দিতেন। এরপর কিছুক্ষণ শিশুদের সাথে গল্পগুজব করতেন এবং মধ্যরাতের আগেই ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়তেন। [১]

কঠোর পরিশ্রম ও কর্মশক্তি:

এতসব বহুমুখী ব্যস্ততা ও অভিযানের পাশাপাশি তিনি তাঁর খিলাফতকালে পাঁচবার হজের সফর করেছেন। প্রথম হজ ১৪০ হিজরিতে, দ্বিতীয়টি ১৪৪ হিজরিতে, তৃতীয়টি ১৪৭ হিজরিতে এবং চতুর্থটি ১৫২ হিজরিতে। পঞ্চম সফরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভ্রমণ ও বিনোদন তিনি নিজে পছন্দ করতেন না এবং তাঁর কোনো প্রতিনিধিকেও এর অনুমতি দিতেন না। একবার এক শাসকের ব্যাপারে তিনি জানতে পারলেন যে, সে শিকারে যায় এবং এই উদ্দেশ্যে সে কুকুর ও বাজপাখি প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে। মনসুর তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করলেন এবং তাঁর আদেশে কঠোর তিরস্কারমূলক বাক্যের পর তাকে লিখলেন:

“আমরা তোমাকে মুসলমানদের সেবা করার জন্য নিযুক্ত করেছি, পশুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য নয়।” [২]

বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদ থেকে বিমুখতা:

বিলাসিতার উপকরণ থেকে তাঁর বিমুখতা এমন ছিল যে, তিনি সংগীতের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রগুলোর নাম পর্যন্ত জানতেন না। একদিন তিনি কোথাও থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি একজন কর্মকর্তাকে পাঠালেন বিষয়টি দেখে আসার জন্য। সে গিয়ে দেখল এক গোলাম তানপুরা বাজাতে মগ্ন। সে এসে মনসুরকে খবর দিল। মনসুর জিজ্ঞেস করলেন: “এই তানপুরা কী?”

কর্মকর্তা যখন এর আকৃতি ও রূপ বর্ণনা করল, তখন মনসুর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি এটি কীভাবে জানলে?”

কর্মকর্তা বলল: “আমি যখন খোঁরাসান গিয়েছিলাম, তখন সেখানে এই জিনিসটি দেখেছিলাম।”

মনসুর তখনই সেই কর্মকর্তার সাথে সেখানে পৌঁছালেন যেখানে গোলাম তানপুরা দিয়ে মন ভোলাচ্ছিল। মনসুরকে দেখে তার চারপাশে সমবেত লোকজন পালিয়ে গেল। গোলাম ধরা পড়ল। মনসুর নির্দেশ দিলেন যে, তানপুরাটি তার মাথার ওপর মেরেই ভেঙে ফেলা হোক। এরপর কর্মকর্তাকে বললেন, এই গোলামকে এখনই বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাও। [৩]

মনসুরের দৃষ্টিতে শাসনের মূলনীতি:

মনসুর বলতেন যে, শাসকের সিংহাসন চারটি স্তম্ভের ওপর টিকে থাকে। যদি এগুলোর মধ্যে একটি স্তম্ভও দুর্বল হয়ে যায়, তবে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে:

- প্রথম স্তম্ভ: বিচার বিভাগ, যা আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়নে কোনো তিরস্কারের পরোয়া করবে না।
- দ্বিতীয় স্তম্ভ: পুলিশ কর্মকর্তা, যারা দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।
- তৃতীয় স্তম্ভ: রাজস্ব কর্মকর্তা, যারা প্রজাদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম ছাড়াই কর আদায় করবে।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৪৬৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৪৯৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/৬৩

চতুর্থ স্তম্ভ: একজন উত্তম সংবাদবাহক যে সবার সংবাদ সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়। [১]

এই উক্তি থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে মনসুরের অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির আন্দাজ করা যায়।

রাজনীতি একটি শিল্প:

তিনি রাজনীতিকে রীতিমতো একটি শিল্প হিসেবে দেখতেন এবং শিখতেন। এই বিষয়ে তিনি এমনকি তাঁর বিরোধীদের থেকেও উপকৃত হতেন। একবার তিনি একজন উমাইয়া আমিরকে গ্রেফতার করার পর তাকে প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “বনু উমাইয়ার শাসনের তত্ত্বগুলো কীভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল?” সে উত্তর দিল: “সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার প্রতি অবহেলার কারণে।” মনসুর জিজ্ঞাসা করলেন: “এমন কোনো শত্রু বস্তু কি ছিল যা বিপদের সময় তাদের সবচেয়ে বেশি কাজে এসেছিল?” সে বলল: “হীরা-জহরত!” মনসুর প্রশ্ন করলেন: “তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত কারা আনুগত্য বজায় রেখেছিল?” অফিসার বলল: “তাদের মুক্ত করা দাসরা!!” মনসুরের ইচ্ছা ছিল যে তিনি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থায় নিজের পরিবারের লোকদের নিয়োগ করবেন, কিন্তু এই আলোচনার পর তিনি এই বিভাগটি তাঁর মাওয়ালিদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। [২]

বুদ্ধিমত্তা ও সংবেদনশীলতা:

তাঁর বুদ্ধিমত্তার আন্দাজ করার জন্য এই ঘটনাই যথেষ্ট যে, যখন তিনি খলিফা হওয়ার পর প্রথমবার মদিনা মুনাওয়ারায় গেলেন, তখন শহরটিকে পরিবর্তিত অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁর হাজিব রবিকে বললেন: “আমার জন্য এমন একজন লোক খুঁজে আনো যে আমাকে শহরের অলিগলি চিনিয়ে দেবে, কারণ আমি দীর্ঘ সময় পর এখানে এসেছি।” রবি মদিনার এক চতুর যুবককে নিয়ে এল যে শহরের প্রতিটি কোণার ইতিহাস জানত। মনসুর তার নির্দেশনায় মদিনায় ঘুরে বেড়াতেন। যুবকটি রাজকীয় আদব-কায়দা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল। সে নিজে থেকে কথা বলা শুরু করত না। মনসুর নিজে কোনো জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তথ্য প্রদান করত। মনসুর খুশি হয়ে হাজিবকে বললেন তাকে পুরস্কারে ভূষিত করতে। হাজিবের আদেশ পালনে দেরি হয়ে গেল। কিছু দিন কেটে গেল। একদিন একটি মহল্লায় ভ্রমণের সময় যুবকটি একটি বাড়ির দিকে ইশারা করে নিজে থেকেই বলল: “আমিরুল মুমিনিন! এটি সেই ঘর যার সম্পর্কে কবি আহওয়াস বলে গেছেন:”

يَا بَيْتَ عَاتِكَةِ الَّتِي أُتَعَزَّلُ ... حَذَرَ الْعِدَى وَبِهِ الْفُؤَادُ مُؤَكَّلُ

“হে আতিকার সেই ঘর, যেখান থেকে আমি শত্রুদের ভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি... কিন্তু হৃদয় তাতেই আটকে আছে।”

إِنِّي لَأَمْنُحُكَ الصُّدُودَ وَإِنِّي ... قَسَمًا إِلَيْكَ مَعَ الصُّدُودِ لَأَمِيلُ

“আমি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সংকল্প করি, কিন্তু আল্লাহর কসম, তা সত্ত্বেও আমি তোমার দিকেই ঝুঁকে থাকি।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৯৭/৮

[২] তারিখুত তাবারী: ৮০/৮

কথাটি সামান্য ছিল কিন্তু মনসুর ভাবতে লাগলেন যে, আজ এই যুবক অভ্যাসের বিরুদ্ধে কথা বলায় কেন অগ্রণী হলো। তিনি সেই অসম্পূর্ণ কবির পুরো কবিতাটি মনে মনে আওড়াতে শুরু করলেন এবং প্রতিটি পঙক্তির ওপর চিন্তা করতে থাকলেন। অবশেষে এই পঙক্তিটি সামনে এলো:

وَأَرَاكَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ وَبَعْضُهُمْ ... مَذِقُ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ

“আমি দেখছি যে আপনি যা বলেন তা করেন, কিন্তু কিছু লোক কেবল জিহ্বার স্বাদ নেয় (অর্থাৎ কেবল মুখে বলে)। তারা যা বলে তা করে না।”

মনসুর এটি পড়ামাত্রই চমকে উঠলেন এবং রবি হাজিবকে বললেন:

“আরে! তুমি কি সেই যুবককে সেই পুরস্কার দিয়েছ যার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম?”

রবি লজ্জিত হয়ে বললেন: “কোনো কারণে দেরি হয়ে গেছে।” মনসুর যুবককে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করালেন। [১]

এর থেকে মনসুরের মেধার তীক্ষ্ণতা আন্দাজ করা যায়। হাজারো সমস্যার বোঝা, প্রতি মুহূর্তে নিত্যনতুন ব্যস্ততা এবং হাঙ্গামা সত্ত্বেও একটি সামান্য বিষয়ের ওপর এত গভীর চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ সঠিক সিদ্ধান্ত বের করে নেওয়া অত্যন্ত নিপুণতার বিষয়।

অপ্রাপ্তির আক্ষেপ

মনসুরের জীবনের প্রাথমিক পঁচিশ-ত্রিশ বছর হাদীসের একজন ছাত্র হিসেবে অতিবাহিত হয়েছিল এবং সেই সময় সম্ভবত তার মনেও ছিল না যে, ভবিষ্যতে তাকে এত বড় সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেই সময় তার আকাঙ্ক্ষা ছিল একজন মুহাদ্দিস হওয়ার। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে নামার পর তিনি ইলমি খিদমতের সুযোগ পাননি। তবুও তার সেই আকাঙ্ক্ষা তখনও অবশিষ্ট ছিল। একবার পৃথিবীর এই সবচেয়ে বড় শাসকের কাছে জানতে চাওয়া হলো:

“দুনিয়ার এমন কোনো স্বাদ কি এখনও বাকি আছে যা থেকে আপনি বঞ্চিত?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ! একটি বিষয় ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “সেটি কী?”

তিনি বললেন: “এই আকাঙ্ক্ষা যে, ছাত্ররা তাদের উস্তাদের মতো আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করবে।”

একথা শোনামাত্রই আমীর ও উজিররা দ্রুত চারদিকে জমা হয়ে গেলেন এবং ছাত্রদের মতো গোল হয়ে বসে বলতে লাগলেন:

“আমীরুল মুমিনীন! আমাদের হাদীস ইমলা (লিখন) করিয়ে দিন!!” মনসুর তাদের দিকে এক পলক তাকালেন এবং বললেন:

لَسْتُ بِهِمْ! إِنَّمَا هُمُ الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، الْمَشَقَّةُ أَرْجُلُهُمْ، الطَّوِيلَةُ شُعُورُهُمْ، بُرْدُ الْآفَاقِ، وَنَقْلَةُ الْحَدِيثِ

“তোমরা তাদের মতো কোথায়! হাদীসের ছাত্র তো তারা যাদের কাপড় ময়লা থাকে, পা ফেটে যায়, চুল লম্বা হয়ে যায়, যারা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসে এবং হাদীস বর্ণনা করে। [২]”

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ২৯৭/২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৪৬৮/১৩, হিজরি ১৫৮ সাল

বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জনসমূহ:

মনসুরের যুগে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকগণ সমবেত হতেন। তাদের মধ্যে বিদেশি ভাষার বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। সরকার তাদের সকলের পৃষ্ঠপোষকতা করত। এই যুগে অন্যান্য জাতির কিছু বিখ্যাত বই আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। যেমন হাকীম ইবনুল মুকাফফা ফারসি গল্পের বিখ্যাত বই “কালিলা ওয়া দিমনা” আরবিতে রূপান্তর করেন। একইভাবে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের ওপর একটি বই “কিতাবুল হিন্দ” নামে অনুবাদ করা হয়। গণিতে ইউক্লিডের বিখ্যাত রচনার অনুবাদ হয়। এই যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক হুনাইন বিন ইসহাক হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের কিছু চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বইকে আরবির রূপ দান করেন। [১]

মনসুর এবং আবদুল মালিকের মধ্যে সাদৃশ্য:

মনসুর অনেক দিক থেকে উমাইয়া আবদুল মালিকের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়, যেমন:

- আবদুল মালিকও বনু মারওয়ানের দ্বিতীয় শাসক ছিলেন। মনসুর বনু আব্বাসের দ্বিতীয় শাসক ছিলেন।
- আবদুল মালিকও আলেম, ফাজিল এবং হাদিস বিশারদ ছিলেন। মনসুরও আলেম, ফাজিল এবং হাদিস বিশারদ ছিলেন।
- আবদুল মালিক প্রতিটি বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে বনু মারওয়ানের টালমাটাল সরকারকে প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করেছিলেন। মনসুরও প্রতিটি বিরোধীকে দমন করে বনু আব্বাসের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন।
- আবদুল মালিকের মোকাবিলা হয়েছিল মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সাথে। যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং সাঈদ বিন জুবায়েরের মতো ব্যক্তিত্বরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মনসুরের মোকাবিলা হয়েছিল নাফসে জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের সাথে।
- আবদুল মালিককেও কিছু জিন্দিক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি তাদের দমন করে শান্ত করেছিলেন। মনসুরকেও কিছু মুরতাদ এবং ধর্মহীন গোষ্ঠীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি তাদের ধ্বংস করতে কোনো ত্রুটি রাখেননি।
- আবদুল মালিক এত মিতব্যয়ী ছিলেন যে তিনি কৃপণ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। মনসুরও মিতব্যয়িতা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতার কারণে কৃপণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- আবদুল মালিক প্রথমে সিরিয়ার বিদ্রোহী শাসক এবং পরে খলিফা হিসেবে সর্বমোট ২১ বছর শাসন করেছিলেন। মনসুর ২২ বছর শাসন করেছিলেন।
- আবদুল মালিক তার ডান হাত উমর বিন সাঈদকে হত্যা করেছিলেন। মনসুর তার ডান হাত আবু মুসলিম খোরাসানিকে হত্যা করেছিলেন।

উভয়ের চরিত্র ও আচরণের মধ্যে বড় পার্থক্য কেবল এটাই দেখা যায় যে, মনসুর মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার পরও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হত্যা করিয়েছেন। যেখানে আবদুল মালিক (উমর বিন সাঈদের ঘটনা ছাড়া) কোথাও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধী হিসেবে প্রতীয়মান হন না।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, আলী ইব্রাহিম হাসান, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

সুসংহত সরকার প্রতিষ্ঠা, মনসুরের কৃতিত্ব:

মনসুর আব্বাসীয় সরকারকে এমন মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন যে, প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসীয় রাষ্ট্রের সৌভাগ্য ও উত্থানে কোনো গ্রহণ লাগেনি। এরপর যখন পতনের যুগ শুরু হয়, সেটিও এত দীর্ঘ ছিল যে, নানা ধরনের দুর্ঘটনা ও সংকটের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফত আরও চার শতাব্দী পর্যন্ত কোনো না কোনোভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

কেবল আন্দালুস এমন একটি প্রদেশ ছিল যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং সেখানে বনু উমাইয়া তাদের সুসংহত সরকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। একইভাবে আফ্রিকাতেও বনু আব্বাসের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হতে পারেনি, যার ফলে মরক্কোতে খারিজি সুফরিয়া বনু মিদরার রাষ্ট্র এবং আলজেরিয়ায় খারিজি ইবাদিয়া রুস্তমীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নেয়। [১]

[১] মুজায আত-তারিখ আল-ইসলামি, পৃ. ২০০

আল-মাহদী বিন মনসুর

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ

জিলহজ ১৫৮ হিজরি হতে মহররম ১৬৯ হিজরি

অক্টোবর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে আগস্ট ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

মনসুর তার শাসনকালে সমস্ত বিরোধীদের নির্মূল করেছিলেন; তাই তার উত্তরাধিকারী মাহদী একটি শক্তিশালী ও সুসংহত রাজত্ব লাভ করেন। মাহদী এগারো বছর শাসন করেন এবং এই সময়ে রোমানদের সাথে যুদ্ধ ছাড়া সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। মাহদীর জন্ম ১২১ হিজরিতে হয়েছিল। মনসুর এই আশায় তার নাম মুহাম্মদ রেখেছিলেন যে, সম্ভবত তিনিই সেই মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ অর্থাৎ মাহদী হবেন যার উল্লেখ কিছু হাদিসে এসেছে। (মনসুরের আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ)। তার সেই আশা পূর্ণ হয়নি, তবে তিনি মাহদী উপাধিতেই বিখ্যাত হয়ে যান। [১]

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:

মাহদী একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কুরআন মাজীদ ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এর পাশাপাশি আরবি সাহিত্য ও কবিতার প্রতিও তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হাজার হাজার কবিতা তার মুখস্থ ছিল। তার মজলিসে আলেম, গুণীজন ও কবিদের ভিড় লেগে থাকত। আবুল আতাহিয়া ও আবু নুওয়াসের মতো বিখ্যাত কবিরা তার সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

তিনি লজ্জা, হায়া, উদারতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মানুষের ফরিয়াদ শোনার জন্য তিনি উন্মুক্ত আদালত বসাতেন। মজলুমদের ন্যায়বিচার প্রদান করতেন এবং জুলুম প্রতিরোধ করতেন। তার পরহেজগারির অবস্থা এমন ছিল যে তিনি কখনো নাবীষ স্পর্শও করেননি, যদিও উমাইয়া ও আব্বাসীয় দরবারে নাবীষ পান করা একটি পরিচিত বিষয় ছিল। [২] তার খোদাভীতির আন্দাজ এখান থেকে করা যায় যে, একবার এক প্রচণ্ড ঝড় এল। মাহদী এটি দেখে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগলেন: “হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! শত্রু জাতিগুলোকে আমাদের ওপর আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দেবেন না। হে আল্লাহ! যদি আমার গুনাহের কারণে এটি এসে থাকে, তবে আমার কপাল উপস্থিত।” কিছুক্ষণ পরই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং ঝড়ের কোনো চিহ্নও রইল না। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৬/৫৪১

[২] তারিখ ইয়াকুবি: ২৭০ হতে ২৭৩; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ২/৮ হতে ১০; তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২০১ হতে ২০৬

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/১৭৫

তিনি ক্ষমা ও সহনশীলতায় অভ্যস্ত, দূরদর্শী এবং জনগণের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কৌশলগত কারণে তিনি মানুষের কেবল ভুলই নয়, বরং তাদের অপকর্মগুলোও ক্ষমা করে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে একটি জুতো দিয়ে বলল যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতো। মাহদী সেটি চুম্বন করলেন, চোখে লাগালেন এবং সেই ব্যক্তিকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বিদায় করলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন: “আমি জানি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই জুতো পরা তো দূরের কথা, হয়তো দেখেনওনি। কিন্তু আমি যদি এই লোকটিকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতাম, তবে সে মানুষের কাছে বলে বেড়াত যে আমি খলিফাকে বরকতময় জুতো পেশ করেছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ মানুষ তার কথা বিশ্বাস করত; কারণ সাধারণ মানুষ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি রাখে এবং এই ধরনের কথা দ্রুত বিশ্বাস করে নেয়। আমরা দশ হাজার দিরহাম দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি, তাই এটি একটি লাভজনক কাজ হয়েছে।” [১]

রাজনীতির ধরণ

বনু উমাইয়াদের শেষ এবং বনু আব্বাসের প্রথম দিকের খলিফাদের আমলে বন্ধুদেরও শত্রু বানানোর উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু মাহদীর রাজনীতির ধরণ ছিল শত্রুদেরও বন্ধু বানানো। সাফফাহ এবং মনসুরের যুগে বনু উমাইয়া এবং বনু ফাতিমার শীর্ষস্থানীয় আমীর ও তাদের অনুসারীদের নির্বিচারে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। মাহদী এর বিপরীতে কারাগারের দরজাগুলো খুলে দেন। খোরাসানের বিখ্যাত উমাইয়া আমীর নসর বিন সাইয়ারের লেখক দাউদের ছেলেরা কারাগারে ছিল। মাহদী তাদের মুক্ত করে দেন এবং তাদের মধ্যে একজন যোগ্য ব্যক্তি ইয়াকুব বিন দাউদকে আব্বাসী রাষ্ট্রের উজির নিযুক্ত করেন। নফস-এ-জাকিয়ার ভাই ইব্রাহিম মনসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেরাও কারাগারে ছিল। মনসুর তাদেরও মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে হাসান বিন ইব্রাহিমকে কেবল নিজের ঘনিষ্ঠই করেননি বরং নিজের ভাই হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। হযরত হাসান (রা.)-এর নাতি আবু মুহাম্মদ হাসান বিন যায়েদও মনসুরের আমল থেকে কারাগারে ছিলেন। মাহদী তাকেও মুক্তি দিয়ে নিজের সহচর বানিয়েছিলেন। তিনি ৮৫ বছর বয়সে ১৬৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় তিনি মাহদীর সাথে মক্কার সফরে যাচ্ছিলেন। এই সদ্যবহারের মাধ্যমে মাহদী বনু উমাইয়া এবং বনু ফাতিমা উভয় পরিবারের মন জয় করে নিয়েছিলেন। [২]

খায়জুরান এবং মারিয়া বিনতে মারওয়ান... মানবিক সহমর্মিতার একটি শিক্ষণীয় ঘটনা:

মাহদীর চরিত্র ও সদ্যবহারের প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী খায়জুরান এবং একজন উমাইয়া রাজকুমারী মারিয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। খায়জুরান ছিলেন একজন দাসী, যিনি তাঁর গুণাবলীর কারণে মাহদীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। খলিফা হওয়ার দ্বিতীয় বছরে মাহদী তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। তিনি মাহদীর দুই পুত্র: হারুন এবং হাদির মা ছিলেন। একদিন এই রানী খায়জুরান হারেমের আঙিনায় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ডানে-বামে গালিচা বিছানো ছিল, যার ওপর রাজকুমারীরা [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৪৯, ১৬৯ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৬৬ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫৯ হিজরি, আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১/১৯৪

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/১২১

তকিয়া লাগিয়ে বসে ছিলেন। কিনারায় দাসীরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় দরজায় এক নিঃশ্ব ও জরাজীর্ণ নারী এল এবং খায়জুরানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। প্রাসাদের পরিচারিকা নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি কেবল রানীকেই বলতে পারি। খায়জুরান তাকে ভেতরে ডাকলেন। জীর্ণ পোশাক পরিহিত এক সুন্দরী ও মর্যাদাবান নারী ভেতরে প্রবেশ করল, সে কার্পেটের কিনারায় এসে থামল, ক্ষীণ কণ্ঠে সালাম দিল এবং বলল: “হে আমিরুল মুমিনিনের স্ত্রী! আমার নাম মাজিয়া। আমি শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের কন্যা। কালের আবর্তনে আমি ধ্বংস হয়ে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। আজ এমন কেউ নেই যে আমার পর্দা রক্ষা করবে।”

এ কথা শুনে খায়জুরানের চোখে পানি চলে এল। কিন্তু পাশে বসা এক রাজকুমারী জয়নব বিনতে সুলাইমানের পুরনো তিক্ত কথা মনে পড়ে গেল, সে দ্রুত খায়জুরানকে বলল:

“হে আমিরুল মুমিনিনের স্ত্রী! আল্লাহ না করুন যে আপনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।”

তারপর সে মাজিয়াকে ধমক দিয়ে বলল:

“আচ্ছা, তাহলে তুমিই সেই মাজিয়া। আল্লাহ তোমার ভালো না করুন। তুমি সব সময় এই অবস্থাতেই থাকো যে অবস্থায় আছ। আল্লাহর শুকরিয়া যে তিনি তোমার নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। ভুলে গেছ যে হাররানে আমরা তোমার কাছে এসেছিলাম, আমরা এভাবেই কার্পেটের ওপর দাসী ও সখীদের ভিড়ে বসে ছিলাম। আমি কাকুতি-মিনতি করে ফরিয়াদ করেছিলাম যে, তুমি ইমাম ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ [১]-এর লাশ খলিফা মারওয়ানের কাছ থেকে আমাদের পাইয়ে দাও যাতে তা ছিন্নভিন্ন না করা হয় এবং কাফন-দাফনের জন্য আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখন তুমি আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলে এবং আমাদের গালিগালাজ করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলে। আমি বাধ্য হয়ে মারওয়ানের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার তুলনায় সে ভালো ব্যবহার করেছিল। সে বলেছিল যে, আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুতে দুঃখিত এবং তার লাশের অবমাননা আমার আদেশে হয়নি, আর আমি কীভাবে আমার চাচাতো ভাইয়ের লাশের অবমাননা করতে পারি। তারপর সে আমাকে ইখতিয়ার দিল যে, চাইলে আমি সেখানেই কাফন-দাফন করাতে পারি অথবা চাইলে লাশ সাথে নিয়ে যেতে পারি। আমি লাশ সাথে নিয়ে যাওয়া পছন্দ করলাম এবং মারওয়ান তা সাথে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিল। সেদিন তুমি যে আচরণ করেছিলে, তার বদলে আজ তুমিও একইভাবে বেরিয়ে যাও!”

এ কথা শুনে মাজিয়া তিক্তভাবে হেসে উঠল এবং বলল:

“বিনতে সুলাইমান! সম্ভবত আমার মতো দুর্ব্যবহার গ্রহণ করা তোমার কাছে ভালো লেগেছে। ভাতিজি! তুমি আমার পরিণতির মধ্যে কোন কল্যাণ দেখলে যে আজ চাও আল্লাহ তোমার সাথেও তেমনটিই করুন যেমনটি আমার সাথে করেছেন। আমি তোমার পরিবারের সাথে যা করেছি, তার বদলে আজ আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে তোমার দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। আল্লাহ তোমাকে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন, তার শুকরিয়া কি তুমি এভাবেই আদায় করবে?”

তারপর সে রানী খায়জুরানের দিকে তাকিয়ে বলল: “জয়নব যা বলেছে সত্য বলেছে, আমার সেই আচরণই আমার এই অবস্থা করেছে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।”

[১] আব্বাসীয় দাওয়াতের নেতা, সাফফাহর বড় ভাই, যিনি শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের শাসনামলে বিদ্রোহের প্রস্তুতির কারণে নিহত হয়েছিলেন।

এক মুহূর্তের নীরবতার পর মারিয়া আসসালামু আলাইকুম বলে ফেরার জন্য ঘুরলেন। রানী খায়জুরান এটা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি রাজকুমারী জয়নাবকে ধমক দিয়ে বললেন: “তোমাকে কিছু বলার অধিকার ছিল না, সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল।”

এ কথা বলে তিনি মারিয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু মারিয়া পিছিয়ে গিয়ে বললেন: “আমার অবস্থা এর যোগ্য নয়।”

রানী খায়জুরান দাসীদের নির্দেশ দিলেন তাকে গোসলখানায় নিয়ে যেতে। দাসীরা তাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে সুন্দর পোশাকে নিয়ে এল। খায়জুরান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন। ইতিমধ্যে দস্তুরখান বিছানো হলো। খায়জুরান তাকে ভালোভাবে খাওয়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: “বলো, তোমার ঘরে আর কে আছে?”

তিনি বললেন: “আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, পৃথিবীর বুকে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই।”

খায়জুরান তৎক্ষণাৎ বললেন: “তাহলে আমার সাথে চলো। প্রাসাদের যে অংশ তোমার পছন্দ হয় তা বেছে নাও। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তুমি আমার সাথেই থাকবে।”

খায়জুরান মারিয়াকে নিজের সাথে রাখলেন। তাকে একটি ভালো ঘর এবং সমস্ত আসবাবপত্র দিয়ে দিলেন। তার নামে একটি বিশাল অংকের অর্থও লিখে দিলেন।

মাহদী যখন দরবার থেকে ফিরলেন এবং এই ঘটনা শুনলেন, তখন তিনি খুশি হলেন এবং রাজকুমারী জয়নাবকে তিরস্কার করে বললেন:

“আল্লাহকে ভয় করো! তাঁর নেয়ামতের কি এভাবেই শুকরিয়া আদায় করা হয়? যদি আমার হৃদয়ে তোমার সম্মান না থাকত, তবে আমি সারাজীবন তোমার সাথে কথা বলতাম না।” তারপর তিনি একজন খাদেমের মাধ্যমে মারিয়ার জন্য দিরহামের থলি পাঠালেন এবং সাথে এই বার্তা দিলেন:

“আপনার এখানে আগমনে আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছি যা আগে কখনো হয়নি। আমি আপনার ভাই। আপনার যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে অবিলম্বে জানাবেন, তা পূরণ করা আমার দায়িত্ব।” [১]

হযরত মুসা কাজিম রহ.-এর সম্মান:

আব্বাসীয় এবং বনু ফাতেমার মধ্যকার টানাপোড়েনের কারণে সন্দেহের ভিত্তিতে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত জাফর সাদিক রহ.-এর সাহেবজাদা মুসা ইবনে জাফর রহ. (১২৮হি.-১৮৩হি.)-ও ছিলেন, যিনি ‘মুসা কাজিম’ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

মাহদী একবার নামাজ পড়ছিলেন, তখন তেলাওয়াতের সময় এই আয়াতটি তাঁর মুখে এল:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ

(তবে কি তোমাদের থেকে এমনটি আশা করা যায় যে, যদি তোমরা শাসনক্ষমতা লাভ করো, তবে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?) [২]

মাহদী কেঁপে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করেই তৎক্ষণাৎ মুসা কাজিম রহ.-কে জেলখানা থেকে ডেকে পাঠালেন এবং এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যে তিনি কখনো বিদ্রোহ করবেন না। এরপর তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে মুক্তি দিলেন। মুসা কাজিম রহ. সারাজীবন আব্বাসীয়দের কাছে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। [৩]

[১] তারিখ দামেশক: ১২৬/৭০

[২] সূরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আয়াত: ২২

[৩] তারিখুত তাবারী: ১৭৭/৮

বৈদেশিক অভিযান..... রোমানদের সাথে যুদ্ধ

মাহদীর যুগ ছিল শান্তিপূর্ণ। তিনি নিজেও স্বভাবগতভাবে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত অপছন্দ করতেন; তাই তিনি বৈদেশিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়াদের নতুন সমান্তরাল ইসলামী রাষ্ট্রকে তিনি মোটেও বিরক্ত করেননি। তাছাড়া আন্দালুসের আমীরগণ খেলাফতের দাবি করেননি বরং তারা কেবল ‘আমীর’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তবে জ্ঞান-গরিমা ও উচ্চতর নৈতিকতায় ভূষিত হওয়ার অর্থ ভীরুতা নয়; তাই মাহদী একজন তলোয়ার চালকও ছিলেন। তাঁর যুগে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত ছিল। রোমানরা মনসুরের যুগে মুসলিম বিশ্বের ওপর জল ও স্থলপথে আক্রমণ শুরু করেছিল, যা প্রতিরোধের জন্য প্রতি বছর সায়েফা বাহিনী সীমান্তে পাঠানো হতো।

মাহদীর খেলাফতের তৃতীয় বছর ১৬১ হিজরিতে রোমান জেনারেল মাইকেল প্যাট্রিক উত্তর সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের উপকূলে আক্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চৌকি দখল করে নেন। [১]

আব্বাস বিন মুহাম্মদ এবং সালেম বারনাসি একের পর এক তাঁর মোকাবিলায় যান কিন্তু রোমানদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ থামানো সম্ভব হয়নি। সুমামা বিন ওয়ালিদ দাবিক পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করেন কিন্তু রোমানদের সামনে কোনো অগ্রগতি হয়নি। [২]

১৬৩ হিজরিতে হাসান বিন কাহতাবা-র মতো একজন অভিজ্ঞ আমীর এই অভিযানে নিযুক্ত হন, তিনি ৮০ হাজার পেশাদার সৈন্য নিয়ে মাইকেলকে ধাওয়া করেন। রোমানরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাদের অনেক চৌকি জয় করা হয় এবং প্রচুর সৈন্য বন্দি হয়। তবে তাদের শক্তি পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়নি। [৩]

অবশেষে পরের বছর (১৬৪ হিজরিতে) মাহদী এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং বাগদাদে শাহজাদা মুসা আল-হাদীকে নায়েব নিযুক্ত করে নিজে সশরীরে বাহিনীর সাথে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন। এখানে আরমেনিয়ায় একটি নতুন শহর ‘মাহদিয়া’র ভিত্তি স্থাপন করে তিনি তাঁর পুত্র হারুনুর রশীদের নেতৃত্বে বাহিনীকে সামনে এগিয়ে দেন। হারুনুর রশীদ রোমানদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অবশেষে রোমানরা অনেক শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করে।

তবে হারুন ফিরে আসার পর রোমানরা সন্ধির শর্তাবলী উপেক্ষা করে এবং মাইকেল ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামী সীমান্তে এক বিশাল আক্রমণ চালায়। এদিক থেকে আব্বাসীয় সেনাপতি আব্দুল কাবীর মোকাবিলার জন্য বের হন কিন্তু এত বড় বাহিনীর সামনে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেননি। যখন তিনি পরাজয়ের খবর নিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন, তখন মাহদী তাঁর কোমল স্বভাবের...

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪৩৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬২ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬১ হিজরি; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪৩৭

যদিও তিনি এতটাই রাগান্বিত হয়েছিলেন যে তাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন, তবুও সঙ্গীদের সুপারিশে তার প্রাণ রক্ষা পায়।

মাহদী তার পরে হারুন আল-রশিদের নেতৃত্বে একটি অসাধারণ বাহিনী সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন যাতে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ছিল। এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) এবং এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ দিরহাম ব্যয় করা হয়েছিল। (আজকের হিসেবে এটি তিন আরব ৩৫ কোটি রুপি হয়)।

এই বিশাল বাহিনী এশিয়া মাইনরে রোমানদের চৌকিগুলো তখনই করে দেয় এবং তাদের জায়গায় জায়গায় পরাজিত করে। এই লড়াইগুলোতে ৫৪ হাজার রোমান নিহত এবং ৫ হাজারেরও বেশি বন্দি হয়। বিজয় অর্জন করতে করতে ইসলামী বাহিনী কনস্টান্টিনোপল প্রণালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেই সময় কনস্টান্টিনোপলে কায়সার লিওন বিন কনস্টান্টিন-এর বিধবা স্ত্রী ‘আইরিন’ শাসন করছিলেন। তিনি যখন সিংহাসন পতনের আশঙ্কা দেখলেন, তখন বার্ষিক সত্তর হাজার দীনার প্রদানের শর্তে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করলেন। এটি ১৬৫ হিজরীর ঘটনা। এক বছর পর হারুন আল-রশিদ বিজয়ী বেশে ফিরে এলে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আনন্দ উদযাপিত হয় এবং সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হয়। [১]

জিন্দিকদের ফিতনা এবং মাহদীর ভূমিকা

মাহদীর শাসনামল যদিও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে নিরাপদ ছিল, তবে তাকে তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্রন্টে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা জিন্দিক ও নাস্তিকতার ফিতনার মোকাবিলা করতে হয়েছিল, যা আব্বাসী যুগের অন্যতম বিপজ্জনক ফিতনা ছিল। এই তুফানের কিছু ঝাপটা মনসুরও সহ্য করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি যে, নাস্তিকতা ও জিন্দিকদের এই আন্দোলন অনারবরা ইসলামের বিরুদ্ধে এই কারণে শুরু করেছিল যে, তারা একে আরবদের নিয়ে আসা একটি দ্বীন মনে করত যাদের তারা সবসময় তুচ্ছজ্ঞান করত। আবু মুসলিম খোরাসানির প্রতারণামূলক দাওয়াত এবং ইসলামের ভুল পরিচিতি ছাড়াও জাহম বিন সাফওয়ানের মতো যুক্তিবাদীদের চিন্তাধারা এই নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনগুলোকে রসদ জুগিয়েছিল।

মুকান্নার ফিতনা:

মাহদীর যুগের সবচেয়ে বড় জিন্দিক ছিল “মুকান্না”। সে ছিল একজন খোরাসানি ব্যক্তি যে ছিল একচোখা এবং অত্যন্ত কুৎসিত। নিজের কুৎসিত চেহারা লুকানোর জন্য সে সোনার একটি মুখোশ ব্যবহার করত; এই কারণে তাকে মুকান্না (মুখোশধারী) বলা হতো। সে ট্রান্সঅক্সিয়ানার “কিশ” অঞ্চলের একটি দুর্গে বাস করত। মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য সে একটি কৃত্রিম চাঁদ তৈরি করেছিল যা দুই মাসের দূরত্ব থেকে দেখা যেত। এই চাঁদ সন্ধ্যায় একটি কূপ থেকে উদ্ভিত হতো এবং ভোরে তাতে অদৃশ্য হয়ে যেত।

ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ছিল জাদু বা তার জাদুকরী কোনো কারিশমা। একটি মত হলো মুকান্না একজন বিজ্ঞানী ছিল এবং এটি ছিল একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল। যাই হোক, এই কারিশমা দেখে মুর্থদের একটি বড় অংশ তার অনুসারী হয়ে যায়।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৬৩ হিজরী, ১৬৪ হিজরী, ১৬৫ হিজরী; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: ১৬৩ হিজরী, ১৬৪ হিজরী, ১৬৫ হিজরী।

এর ভক্তির সুযোগ নিয়ে মুকান্না আবু মুসলিম খুরাসানিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল (নাউযুবিল্লাহ) এবং হিন্দুদের মতো আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ (হলুল) করার মতবাদ পেশ করল। তার বক্তব্য ছিল: “আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর দেহে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এরপর তিনি একে একে হযরত নূহ (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে করতে আবু মুসলিম খুরাসানির দেহে প্রকাশ পান। এখন তিনি আমার দেহে প্রবেশ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)”

ফলে অনারবরা তাকে স্রষ্টা মেনে নিয়ে তাকে সিজদা করতে শুরু করল।

মুকান্নার আবির্ভাব মাহদীর শাসনের প্রাথমিক বছরগুলোতে হয়েছিল। মাহদীর নির্দেশে ১৬৩ হিজরিতে সরকারি বাহিনী তার দুর্গ ঘেরাও করে। মুকান্না পালানোর পথ বন্ধ দেখে নিজের পরিবারের নারীদেরসহ বিষ পান করে আত্মহত্যা করল। সরকারি সৈন্যরা তার মাথা কেটে মাহদীর কাছে পাঠিয়ে দিল। [১]

শুউবিয়া আন্দোলনের কণ্টকাকীর্ণ বন:

কিন্তু এই ধরনের প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহিতার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক আন্দোলন ছিল সেটি, যা ভেতরে ভেতরে চলছিল এবং যার কোনো নির্দিষ্ট একজন নেতা ছিল না। এটি ছিল মুসলিম বিশ্বে জন্ম নেওয়া “শুউবিয়া আন্দোলন”, যার ভিত্তি ছিল জাতিগত বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের জন্য এক পর্যায়ে আব্বাসীয়রা নিজেরাই দায়ী ছিল; কারণ গোপন দাওয়াতের যুগে তাদের ইমাম ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ তাকিদ দিয়েছিলেন যেন আরবদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। [২]

এটি ভিন্ন কথা যে, বনু আব্বাস ক্ষমতা লাভের পর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো তাদের সমর্থক আরবদের, বিশেষ করে নিজেদের পরিবারকে দিয়েছিল, কিন্তু আরব ও অনারবদের মধ্যে বিদ্বেষের যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত অঙ্কুরিত হলো এবং ধীরে ধীরে একটি কণ্টকাকীর্ণ বনে পরিণত হলো যাতে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ কেউ শুধু আরবদের সমালোচনা ও নিন্দার লক্ষ্যবস্তু বানাত, আবার কেউ কেউ ইসলামি আকিদা ও শরিয়তের বিধানগুলো নিয়েও উপহাস করত। তারা ইসলামের প্রতি এই কারণে অসন্তুষ্ট ছিল যে, এই ধর্ম আরবরা নিয়ে এসেছিল। তারা প্রাচীন ইরানি দার্শনিক, মানি, মাজদাক এবং জরথুষ্ট্রের শিক্ষাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছিল। আল-জাহিজ লিখেছেন: “অধিকাংশ লোক যারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়েছে, তাদের মধ্যে এই ব্যাধি শুউবিয়াতের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে, যার কারণে এমন বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে যে তা হত্যা ও যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই ধরনের লোক যখন কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, তখন তার পরিবারের সদস্যদের, তার ভাষাকে এবং তার দেশকেও ঘৃণা করে এবং তার শত্রুকে ভালোবাসতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা এমন হলো যে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল; কারণ এটি আনয়নকারী ছিল আরবরা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে ইমাম ও আদর্শও তারাই।” [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৬৩ হিজরি; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ৯/২; আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল লিশ-শাহরাস্তানি: ১৫৪/১, তবা মুআসসাসাতুল হালাবি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ২৪৭/১৩, ১২৯ হিজরির অধীনে।

[৩] আল-হায়াওয়ান: ১৩১/৭, তবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক আবু উবাইদাহ বসরী (১১০ হিজরি - ২১০ হিজরি) এই আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যিনি তাঁর শতবর্ষী জীবনে ২০০-এর বেশি পুস্তিকা লিখেছিলেন যার মধ্যে অনেকগুলোই ছিল আরবদের নিন্দায়। তাঁর রচিত “কিতাবুল মাসালিব”-এ বিভিন্ন স্থানে সম্মানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্বদের অবমাননা পাওয়া যায়। তাঁর পুস্তিকা “ফাযায়েল-ই ফারস” অনারবদের শ্রেষ্ঠত্বে ভরপুর ছিল। এভাবে তিনি ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়েছিলেন। এই আবু উবাইদাহ ধর্মীয় জ্ঞানে এতটাই দুর্বল ছিলেন যে কুরআন মাজীদও তাজবিদ সহকারে পড়তে পারতেন না। সেই যুগের কোনো ভদ্র ব্যক্তি তাঁর ভাষা ও লেখনী থেকে নিরাপদ ছিলেন না; তাই যখন তিনি মারা যান, তাঁর জানাজায় কাঁধ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। প্রখ্যাত কবি “আবু নুওয়াস” আবু উবাইদাহর ছাত্র ছিলেন এবং কোনো না কোনোভাবে এই ধরনের চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন যদিও তিনি যিনদিক ছিলেন না। [১]

আব্বাসীয় যুগে এই আন্দোলনের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন একজন অনারব, আল্লান আশ-শুউবি, যিনি আরব গোত্রগুলোর নিন্দায় অনেক পুস্তিকা লিখেছিলেন যেমন: মাসালিব-ই কুরাইশ, মাসালিব-ই ফাযারাহ, মাসালিব-ই ইয়ামান, মাসালিব-ই আবদিল কায়েস, মাসালিব-ই আসাদ, মাসালিব-ই হুযাইল ইত্যাদি। এই ধরনের বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি ছিল। এই তালিকায় আবু হুসাইন আসফাহানির নাম রয়েছে যিনি “মাসালিব-ই সাকিফ” লিখেছিলেন। [২] ঐতিহাসিক হাইসাম বিন আদি যিনি “মাসালিব-ই রাবিআহ” লিখেছিলেন, তিনি এই আন্দোলনের দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। [৩]

এগুলো ছিল সমস্ত শুউবিদের কর্মকাণ্ড, যেখানে চরমপন্থী শুউবিরা কেবল আরবদেরই নয়, ইসলামকেও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাত এবং ইসলামের হারাম করা বিষয়গুলোকে হালাল মনে করত। মাহদী আব্বাসীর দরবারি কাজী শারিক বলতেন: “মদ্যপান, ব্যভিচার এবং ঘুষ গ্রহণ যিনদিক হওয়ার প্রকাশ্য লক্ষণ।” [৪]

সেই যুগের একজন যিনদিক ইয়াযিদ বিন আন-বায় ইসলামের এই নিদর্শনগুলোর উপহাস করত। মক্কায় মানুষকে তাওয়াফ করতে দেখে সে বলত: “এই লোকদের এমন বলদ মনে হয় যারা খামারে ফসল মাড়াই করছে।” [৫]

ইউনুস বিন আবি ফারওয়াহ সেই যুগের একজন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি আব্বাসীয় দরবারে এতটাই সম্মানিত ছিলেন যে মানসুর আব্বাসীর যুগে হাজিব পদটি তাঁর ছেলে রবী-এর কাছে ছিল। এই ইউনুস ব্যক্তিগত জীবনে যিনদিক এবং মদ্যপ ছিলেন। সীমা এতটাই ছাড়িয়েছিল যে তিনি ইসলামের নিন্দায় একটি বই লিখে রোমান সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর যিনদিক হওয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে মানসুর তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেন, তিনি পালিয়ে মিশরে চলে যান এবং সেখানেই আত্মগোপন অবস্থায় ১৫০ হিজরিতে মারা যান। [৬]

এই ধরনের বইয়ের মাধ্যমে যিনদিক ও ধর্মহীনতার প্রভাব কয়েক বছরের মধ্যে ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কত মানুষকেই না গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিছু লোক অপরাধ স্বীকার করে তওবা করেছিল যেমন দাউদ বিন রুহ, ইসমাইল বিন সুলাইমান, মুহাম্মদ বিন তাইফুর এবং মুহাম্মদ বিন আবি আইয়ুব। তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। [৭] অনেক তওবা করেনি যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

(৪) আর-রাসায়েল লিল জাহিজ: ১/১২৭; আল-আলাম লিয় যিরিকলি: ৮/৩৬৮, ৩৬৯

(৫) হাদিয়াতুল আরিফিন লিল বানি: ২/৫১১, ত. দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি

(৬) তারিখুত তাবারী: ৮/১৯০

(৭) তারিখুত তাবারী: ১৬৬ হিজরি

(১) আল-ফিহরিস্ত লি ইবনিন নাদিম: ১/৭৬, ৭৭, ত. দারুল মা’রিফাহ বৈরুত; আবজাদুল উলুম লিল কানুজি: ১/৫৮১, ৫৮২। বলা হয় যে পরবর্তীতে আবু নুওয়াস তওবা করেছিলেন।

(২) আল-ফিহরিস্ত লি ইবনিন নাদিম: ১/১২৫, ১২৬

(৩) আল-ইকদুল ফারিদ: ২/৫২

তল্লাশিতে নাস্তিকতা ভিত্তিক কত বই উদ্ধার করা হয়েছিল যা মাহদী নিজের হাতে টুকরো টুকরো করেছিলেন। [১]

আব্বাসী যুগের একজন ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত লেখক, সাহিত্যিক এবং কবিদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই লোকেরা বুজরজমেহরের প্রজ্ঞা, আরদাশিরের ঘটনাবলী এবং ইবনে মুকাফফার সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত। তারা মাজদাকের বইকে জ্ঞানের উৎস এবং ‘কালিলা ওয়া দিমনা’কে প্রজ্ঞার দলিল হিসেবে গণ্য করে। তিনি লেখেন:

“এই লোকেরা শুরুতে কুরআন মাজীদে বিন্যাস নিয়ে আপত্তি তোলে, বলে যে এতে বৈপরীত্য রয়েছে। তারা বর্ণনা ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং হাদীসের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে। যদি তাদের সামনে সাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয় তবে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা এই বিষয়টি এড়িয়ে যায়। কাজী শুরাইহের কথা উঠলে তারা তাঁর ওপর অপবাদ আরোপ করে। হাসান বসরীর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের কাছে তা অসহ্য লাগে। শুবীর প্রশংসা করা হলে তারা তাঁকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে। সাঈদ বিন জুবায়েরকে তারা মূর্খ বলে, ইবরাহীম নাখয়ীকে তুচ্ছ মনে করে। কিন্তু আরদাশির বাবকান, নওশেরওয়ান এবং আল-সাসানের কথা উল্লেখ করার সময় এই লোকেরা তাদের রাজনীতি ও বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করে। যদি গোয়েন্দাদের ভয় থাকে অথবা মুসলমানরা তাদের খোঁজ নিতে শুরু করে, তবে তারা তৎক্ষণাৎ হাদীস উল্লেখ করতে থাকে এবং তারপর যুক্তিনির্ভর দলিলে চলে আসে; এই বিতর্কে তারা কুরআন মাজীদে মুহকাম আয়াতের ওপর মানসুখকে প্রাধান্য দেয়, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তা অস্বীকার করে এবং বিদ্যমান বস্তুকে অদৃশ্যের সাথে তুলনা করে। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কুরআন মাজীদকে রাতের সঙ্গী বানায়, তাফসীর জানে, ফিকহ ও দ্বীনের ইলমকে আদর্শ মনে করে কিংবা সুন্নাহ ও নিদর্শনসমূহ মুখস্থ করে। যদি তাদের মধ্যে কেউ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অবগতও থাকে, তবে সেই জ্ঞান হবে সামান্য এবং কোনো মাধ্যমহীন। যদি তাদের মধ্যে কেউ হাদীস সংগ্রহ করতে এবং ফিকহের কিতাব পড়তে শুরু করে, তবে তার সঙ্গীদের কাছে তা অসহ্য লাগে, তারা তাকে অসুস্থ মনে করে এবং বলে যে এখন সে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।” [২]

যিন্দিকদের দমনের জন্য স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা:

মাহদী শুউবি আন্দোলন এবং যিন্দিকদের এই ভয়াবহ ফলাফল দেখে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি এই ফিতনা নির্মূলে নিজের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তিনি উমর কালওয়াযী নামক এক আমীরের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কাজ ছিল এমন ধর্মহীনদের খুঁজে বের করা এবং তাদের শাস্তি দেওয়া। যখন এই বিভাগ কাজ শুরু করল, তখন খোদ মাহদীর নিজের লেখক ইয়াজিদ বিন ফায়যের বিরুদ্ধেও এমন প্রমাণ পাওয়া গেল। যখন তাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তখন সে এই মতাদর্শগুলো স্বীকার করল; তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো যেখান থেকে সে পালিয়ে গেল এবং আর কখনো ধরা পড়ল না। [৩]

ইয়াকুব বিন ফজল নামক এক ব্যক্তি এতটাই কলুষিত ছিল যে সে নিজের মেয়ের সাথে যৌন লালসা চরিতার্থ করত। তাকে যখন মাহদীর সামনে আনা হলো, তখন সে বলল: “আমি কেবল আপনার সামনেই এই বিষয়গুলো স্বীকার করছি। কিন্তু আপনি যদি জনসমক্ষে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে চান, তবে আমি কখনোই তা করব না, এমনকি আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও।”

[১] তারিখুত তাবারী: হিজরী ১৬৩ সাল

[২] আর-রাসায়েল লিল জাহিজ, পৃষ্ঠা ১৯২ থেকে ১৯৪

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/১৬৫, ১৬৭ হিজরীর অধীনে

মাহদী বললেন: “তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যদি তোমার খাতিরে আসমানের দরজাও খুলে যেত, তবুও তোমার সেই দ্বীনের ওপরই থাকা উচিত ছিল যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিয়ে এসেছেন।”

মাহদী তাকে তওবার সুযোগ দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলেন এবং হাদিকে তাকিদ করে দিলেন যে, যদি সে তওবা না করে তবে তাকে জীবিত ছেড়ে না। হাদি তার খেলাফতকালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। [১]

যিনদীকদের এই ধরপাকড়ে কিছু সন্দেহভাজন এবং কিছু নির্দোষ লোকও লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল; কারণ এ ধরনের লোকদের সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হতো এবং অনেক সময় অকাট্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাদের শাস্তি দেওয়া হতো।

এ ধরনের লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন জন্মগত অন্ধ কবি বাশার বিন বুরদ, যাকে ১৬৭ হিজরিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তার বয়স ছিল ৯০ বছরের বেশি। কেউ কেউ বলতেন যে তিনি যিনদীক ছিলেন না, বরং তিনি মাহদীর নিন্দা করেছিলেন, যার ফলে উজিররা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে যিনদীক হিসেবে প্রচার করে এবং মাহদীকে তার বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায়। [২]

তবে সাধারণত অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া হতো না। প্রখ্যাত কবি আবু নুওয়াসকে (১৩০ হি. থেকে ১৯৫ হি.) যখন মুক্তচিন্তার কারণে যিনদীক বলা হলো, তখন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো এবং যখন তিনি আশ্বস্ত করলেন যে তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সাতা আদায়কারী, হারামকে হালাল মনে করেন না বা যিনদীক নন, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। [৩]

একইভাবে দি’বিল নামক এক বিখ্যাত রাফেযী কবি, যার কটু কথা ও নিন্দায় দুনিয়া অতিষ্ঠ ছিল, সে ছিল এক বড় যিনদীক। কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য ছিল না; তাই বেশ কয়েকজন আব্বাসী খলিফার যুগ পার করে তিনি ২৪৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। দি’বিল বলতেন:

“পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের শূল বয়ে বেড়াচ্ছি যে, কে আছে যে আমাকে শূলে চড়াবে।” [৪]

রাফেযীবাদ ও যিনদীকবাদের মধ্যে বিশেষ মিল ছিল। আবু হাশিম নুমাইরিও ছিল এমনই একজন যিনদীক রাফেযী, সে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এবং সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দিকা ও সাইয়েদা হাফসা (রা.) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতা বলত। সে নির্দিষ্টায় মদ পান করত এবং হিন্দুদের মতো পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখত।

একবার সে কারো কাছে ঋণ চাইল এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল: “পরের জন্মে ঋণ শোধ করে দেব।”

সেই ব্যক্তি বলল: “আমি এই শর্তে দেব যদি তুমি গ্যারান্টি দাও যে তুমি মানুষ হিসেবে পুনর্জন্ম নেবে; কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে তোমার পরবর্তী জন্ম কুকুর বা শূকরের আকৃতিতে হবে।”

যখন তার মৃত্যুর সময় এল তখন চেহারা কুচকুচে কালো হয়ে গেল, তার প্রতিটি রং থেকে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। কখনো সে বলত: “হে খোদা! আলে মুহাম্মদের প্রতি ভালোবাসার এই প্রতিদান!”... কখনো চিৎকার করত: “আমিরুল মুমিনীন! আপনার আশিকের সাথে এমন আচরণ কেন?” [৫]

[১] তারিখুত তাবারী: ১৯০/৮, সন ১৬৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ১৬৭ হি.; তারিখে বাগদাদ: ১১৬/৭; ওফায়াতুল আইয়ান লি ইবনে খাল্লিকান: ২৭৩/১

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৯৫ হি. এর অধীনে; আল-আ’লাম যিরিকলী: ২২৫/২

[৪] তারিখে বাগদাদ: ৩৭৯/৮ ইলমিয়াহ সংস্করণ; ওফায়াতুল আইয়ান: ২৬৯/২; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩৫২/১; আল-আ’লাম যিরিকলী: ৩২৯/২

[৫] আল-মুনতামাম লি ইবনিল জাওযী, পৃ. ৪১৯

জিন্দিকদের নির্মূল করার জন্য মাহদীর ওসিয়ত:

এগুলো ছিল জিন্দিকিয়াতের কিছু নমুনা যার আলামত বিশেষ করে অনারব দেশগুলোতে প্রকাশ পেয়েছিল। মাহদী এই ফিতনা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন; তাই তিনি তাঁর পুত্র ও স্ত্রীভাষিক্ত মুসা আল-হাদীকে ওসিয়ত করে বলেছিলেন:

“মানির অনুসারীদের দমনে কোনো ত্রুটি করো না। এই লোকেরা প্রথমে সাধারণ মানুষকে প্রকাশ্য ভালো কাজের দাওয়াত দেয় যেমন অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকা, দুনিয়াতে অল্পে তুষ্টি এবং আখেরাতের জন্য আমল করা। তারপর তারা তাদের শিক্ষা দেয় যে গোশত খাওয়া হারাম, পানি স্পর্শ করা (গোসল করা) নিষিদ্ধ এবং কোনো প্রাণীকে হত্যা করা গুনাহ। তারপর তারা তাদের দুই খোদার আকিদার দিকে নিয়ে যায়। ধীরে ধীরে তারা বোন ও কন্যাদের সাথে বিবাহ এবং প্রস্রাব দিয়ে গোসল করা হালাল করে দেয়। এই লোকেরা শিশুদের অপহরণ করে যাতে তাদের লালন-পালন করে বিভ্রান্ত করতে পারে।” [১]

হাদী এই ওসিয়তের ওপর আমল করেন এবং তাঁর শাসনামলে অনেক বড় বড় জিন্দিককে খুঁজে বের করে মৃত্যুদণ্ড দেন। [২]

নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ:

মাহদী তাঁর পিতার বিপরীত অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন। তাঁর দরবার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যেত না। তিনি একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ যুগ পেয়েছিলেন; তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনোযোগ নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের দিকে ছিল। হারামাইন শরীফাইনের খিদমত এবং মক্কা ও মদীনার হারামের সম্প্রসারণ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। সেই সময় পর্যন্ত কাবা শরীফ মসজিদুল হারামের ঠিক মাঝখানে ছিল না। মাহদী নতুন নকশা অনুযায়ী এমনভাবে সম্প্রসারণ করান যে কাবা শরীফ একেবারে মাঝখানে চলে আসে।

সেই সময় পর্যন্ত পুরনো গিলাফ না সরিয়ে কাবার ওপর নতুন গিলাফ পরানো হতো। বছরের পর বছর ধরে কাবার ইমারত গিলাফের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। আশঙ্কা ছিল যে সেগুলোর ওজনে ইমারত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মাহদী যখন জানতে পারলেন, তিনি পুরনো গিলাফগুলো সরিয়ে ফেললেন এবং নতুন সুসজ্জিত ও মূল্যবান গিলাফ চড়ালেন। তিনি মসজিদে নববীও সম্প্রসারণ করেন, সেখানে মার্বেল পাথরের স্তম্ভ লাগান এবং অলঙ্করণের কাজ করে একে অত্যন্ত সুন্দর রূপ দেন।

মনসুরের আমলে বাগদাদ দজলা নদীর পশ্চিমে নির্মিত হয়েছিল। মাহদী নদীর পূর্ব তীরে পুরনো সরকারি বাসভবন এবং কুঠি নির্মাণ করান। নতুন খিলাফত প্রাসাদও এখানেই নির্মিত হয়। এভাবে দজলা নদী শহরের ঠিক মাঝখানে চলে আসে এবং এতে শহরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। তবে এর একটি অসুবিধা ছিল যে প্রবল বৃষ্টিতে নদীর প্লাবনে জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৮/২২০। মানি প্রাচীন ইরানি যুগের একজন ব্যক্তি ছিল যে সাসানি রাজা শাপুরের আমলে আবির্ভূত হয়েছিল। সে নবুওয়াতের দাবি করেছিল। তার অনুসারীদের আকিদা অত্যন্ত ভ্রান্ত ছিল। দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে অনেক জিন্দিক তার চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৮/১৯০, ১৬৯ হিজরি।

বসরার জামে মসজিদে সম্প্রসারণ ও অলঙ্করণের কাজ করালেন। পুরো রাজ্যের সমস্ত জামে মসজিদের মিম্বর পরিবর্তন করে নতুন মিম্বর স্থাপন করালেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন যে, কোনো মিম্বর যেন মসজিদে নববীর মিম্বরের চেয়ে উঁচু না হয়। হাজীদের কাফেলাগুলোকে সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলেন, তাদের যাতায়াতের পথে স্থানে স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করালেন। মাইলফলক স্থাপন করলেন এবং জলাধার তৈরি করালেন যাতে কোথাও পানি সংগ্রহে কষ্ট না হয়। বিগত যুগগুলোতে বন্দীদের পানাহারের দায়িত্ব তাদের পরিবারের ওপর ন্যস্ত ছিল, তারা বাড়ি থেকে তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। মাহদী একে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং জেলখানাগুলোতেই খাবার রান্না করে বন্দীদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা শুরু করলেন। কুষ্ঠ ও শ্বেতী রোগীদের ঘরে বসে খরচ পাঠানো এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করাকে সরকারি পলিসির অংশ হিসেবে নির্ধারণ করলেন। মোটকথা, তিনি জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে অকাতরে ব্যয় করলেন। মনসুর বাইশ বছরে যা কিছু জমা করেছিলেন, মাহদী এগারো বছরে তার সবটুকুই খরচ করে ফেললেন। [১]

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, একবার বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ এসে মাহদীর সামনে চাবিগুলো রেখে বললেন: “এই চাবিগুলোর এখন আর কী প্রয়োজন? বায়তুল মাল তো খালি হয়ে গেছে।”

তবে শীঘ্রই রাজস্ব খাতে একটি বড় অংকের অর্থ চলে এল এবং কোষাধ্যক্ষ তা বায়তুল মালে জমা করলেন। এটি দেখে মাহদী বললেন: “যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, সেই অনুযায়ী সম্পদ চলেই আসে।”

কোষাধ্যক্ষ বললেন: “যদি কোনো আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আপনার কাছে রাজস্বের জন্য অপেক্ষা করার সময় কোথায় থাকবে?” [২]

উত্তরাধিকার

বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি হলো এই যে, সিংহাসনের স্বাদ আস্বাদন করার পর অধিকাংশ শাসক পূর্বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে শাসনক্ষমতাকে নিজের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন, যার ফলে খোদ শাসক পরিবারের মধ্যেই ফাটল ধরে। বনু মারওয়ানের শাসন দুর্বল হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল এটিই। বনু আব্বাসও একই পথে চলছিল। মনসুরের আমল থেকেই এই পারিবারিক বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সাফফাহ তার পরে তার ভাই মনসুর এবং তারপর তার চাচাতো ভাই ঈসা বিন মুসাকে পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও এর স্থিতিশীলতায় ঈসা বিন মুসা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই বিচারে তিনি নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু মনসুর সাফফাহর ওসিয়তের বিরুদ্ধে ঈসা বিন মুসাকে উত্তরাধিকার থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, এরপর তার ছেলে মাহদী খলিফা হবেন এবং মাহদীর পর ঈসা বিন মুসা।

মাহদীর মতো সচ্চরিত্রবান শাসকও এই ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারেননি। তিনি ঈসা বিন মুসাকে আরও একবার উত্তরাধিকার থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং নিজের দুই ছেলে: হাদী ও হারুনুর রশীদকে একের পর এক উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

[১] তারিখ ইয়াকুবি, পৃ. ২৭০ থেকে ২৭৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/ ৫৪১ থেকে ৫৪৯; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২০১ থেকে ২০৬, ত. নিয়ার।

[২] মুরুজুয যাহাব: ৪/ ১৬৯, ১৭০, ত. জামিয়াতুল লুবনানিয়াহ; তারিখুত তাবারী: ৮/ ১৭২ থেকে ১৮৬।

ঈসা বিন মুসা থেকে তালকের শপথ নেওয়া হয়েছিল যে তিনি পদত্যাগ করবেন। এই ঘটনা ১৬০ হিজরির। ঈসা বিন মুসা সারা জীবন মদিনায় ছিলেন, এমনকি ১৬৭ হিজরিতে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। [১]

মৃত্যুর পয়গাম:

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণত নেককার লোকদের তাদের ডাক আসার আগে কিছু ইশারা দেওয়া হয় যাতে তারা শেষ সময়ের আগে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে নিতে পারে। মাহদির সাথেও এমনটিই হয়েছিল।

তিনি বৈধ বিনোদন বিশেষ করে শিকারের খুব ভক্ত ছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁর সঙ্গী ও খাদেমদের নিয়ে জঙ্গলে যেতেন, শিকার করতেন এবং বাজপাখি সাথে থাকত। দিন গড়িয়ে গেলে ফিরে আসতেন। ভালোমতো খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন। একদিন তিনি খাওয়া শেষ করে নিজের কামরায় যাওয়ার সময় খাদেমদের বলে দিলেন যে কেউ যেন এদিকে না আসে; যতক্ষণ না আমি নিজে জেগে উঠি কেউ যেন আমাকে না জাগায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত আকৃতির বৃদ্ধ লোক তাঁর কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে:

كَأَنِّي بِهَذَا الْقَصْرِ قَدْ بَادَ أَهْلُهُ ... وَأَوْحَشَ مِنْهُ رُبْعَهُ وَمَنَازِلَهُ

“মনে হচ্ছে এই প্রাসাদটি আমার সামনে আছে যার বাসিন্দারা বিলীন হয়ে গেছে। এর আঙিনা ও ঘরগুলো জনশূন্য ও বিরান হয়ে গেছে।”

وَصَارَ عَمِيدُ الْقَوْمِ مِنْ بَعْدِ بَهْجَةٍ ... وَمُلْكٍ إِلَى قَبْرِ عَلَيْهِ جَنَادِلُهُ

“কওমের নেতা তার আনন্দ ও রাজত্বের পর এমন কবরে চলে গেছে যার ওপর পাথরের ফলক লাগানো হয়েছে।”

وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ذِكْرُهُ وَحَدِيثُهُ ... يُنَادِي بِلَيْلٍ مُعْوَلَاتٍ حَلَالِلُهُ

“তার স্মৃতি ও কথা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাতে তার স্ত্রীরা উচ্চস্বরে তার জন্য বিলাপ করছে।”

تَزَوَّدَ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ رَاحِلٌ ... وَقَدْ أَزِفَ الْأَمْرُ الَّذِي أَنْتَ نَازِلُهُ

“দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো, কারণ তুমি প্রস্থান করতে যাচ্ছ... সেই বিপদ ঘনিযে এসেছে যা তোমার ওপর আপতিত হবে।”

تَزَوَّدَ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ... وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ فَمَا أَنْتَ قَائِلُهُ

“দুনিয়া থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো, কারণ তুমি মৃত... তোমার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন তুমি কী বলবে?”

মাহদির মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হলো:

أَقُولُ بِأَنَّ اللَّهَ حَقُّ شَهَادَتِهِ ... فَذَاكَ لَهُ قَوْلٌ لَيْسَ تُحْصِي فَضَائِلُهُ

“আমি বলব যে আল্লাহ সত্য, আমি তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছি... এটি এমন কথা যার ফজিলত অগণিত।”

তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি চোখের আড়াল হয়ে গেল। মাহদি ঘাবড়ে গিয়ে বাইরে এলেন এবং খাদেমদের জিজ্ঞেস করলেন:

“তোমরা কি কাউকে দেখেছ যে আমার কাছে এসেছিল?”

কিন্তু খাদেমরা কাউকে দেখেনি। সেই রহস্যময় ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কিছুই জানত না। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/১৬০, ১৬৭ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৫৫১, ৫৫০; তারিখুত তাবারী: ৮/১৭৬।

মাহদীর মৃত্যু:

এই ঘটনার প্রায় দশ দিন পর তিনি শিকার করতে মাসাবযান-এর দিকে বের হলেন, যা কুফার নিকটবর্তী মরুভূমির পাশে একটি সবুজ পাহাড়ি এলাকা। এখানে শিকারের সময় তিনি একটি হরিণকে তাড়া করছিলেন, শিকারি কুকুরগুলো হরিণের পেছনে ছিল এবং মাহদী ঘোড়ার পিঠে দ্রুতগতিতে আসছিলেন। হরিণটি একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাহদীও সেটিকে তাড়া করতে করতে ধ্বংসস্তূপে প্রবেশ করতে লাগলেন, কিন্তু দরজার সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হলেন এবং কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হলো। এই ঘটনাটি ২২ মহরম ১৬৯ হিজরির।

তাকে সেই শিকারগাহেই একটি আখরোট গাছের নিচে দাফন করা হলো যা তার প্রিয় বসার স্থান ছিল। কিছুকাল পর বৃষ্টি ও ঝড়ে জনশূন্য প্রান্তরে নির্মিত সেই কাঁচা কবরটি মুছে গেল, এর ওপর কবি বকর বিন রাবাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন:

أَلَا رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ عَلَى رِمَّةٍ رَمَتْ بِمَاسَبَدَانٍ

“হ্যাঁ! রহমানের রহমত প্রতিটি মুহূর্তে বর্ষিত হোক... সেই অস্থিগুলোর ওপর যা মাসাবযানে নাম-নিশানহীন হয়ে গেছে।”

لَقَدْ غَيَّبَ الْقَبْرُ الَّذِي تَمَّ سُودُّدًا وَكَفَّيْنِ بِالْمَعْرُوفِ تَبْتَدِرَانِ

“এই কবর এমন এক ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে... যে ছিল পূর্ণাঙ্গ নেতা এবং যার দুই হাত দ্রুততার সাথে দান-সদকা করত।”

মাহদী ৪৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং দশ বছরের কিছু বেশি সময় শাসন করেছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, গন্দমি (শ্যামলা) গায়ের রঙ এবং কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী একজন মর্যাদাবান মানুষ, যার উত্তম চরিত্র তাকে প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৫৫১, ৫৫২; তারিখুত তাবারী: ৮/১৭০ থেকে ১৭২; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪৪৩ থেকে ৪৪৫।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

আল-হাদি বিন মাহদি

মুসা বিন মুহাম্মদ

মহরম ১৬৯ হিজরি ... থেকে ... রবিউল আউয়াল ১৭০ হিজরি

জুলাই ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ ... থেকে ... সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ

মাহদির উত্তরসূরি মুসা হাদি ১৪৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাইশ বছর বয়সে খেলাফতের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়। তিনি তার পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী যিনদিকদের অনুসরণ অব্যাহত রাখেন এবং তাদের বেছে বেছে নির্মূল করার চেষ্টা করেন। হাদি খেলাফতের পদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য প্রথমবারের মতো প্রাসাদের বাইরে বের হওয়ার সময় হাতে তলোয়ার, বর্শাধারী এবং তীরন্দাজ দেহরক্ষী সাথে রাখার প্রথা শুরু করেন। পরবর্তীতে অধিকাংশ খলিফা ও সুলতানগণ একে নিয়মে পরিণত করেন। এর আগে খলিফারা সাধারণ ব্যবস্থাপনায় যাতায়াত করতেন। [১]

হুসাইন বিন আলীর বিদ্রোহ:

হাদির শাসনকাল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল না। বর্ণনাকারী সবদিকেই শান্তি ও স্বস্তি লিখেছিলেন। তবে এই শান্তিপূর্ণ সময়েই এমন একটি ঘটনা ঘটে যার নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে আব্বাসীয় খেলাফতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। হাদির খেলাফতের শুরুতে মদিনা মুনাওয়ারায় একজন ফাতেমি বুজুর্গ হুসাইন বিন আলী বিদ্রোহ করেন, যিনি হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। তার বংশপরম্পরা হলো হুসাইন বিন আলী বিন হাসান বিন হাসান বিন হাসান বিন আলী। ঘটনাটি ছিল এমন যে, মদিনার গভর্নর খলিফাকে সিংহাসন আরোহণের অভিনন্দন জানাতে বাগদাদ গিয়েছিলেন। পেছনে কিছু লোক হুসাইন বিন আলীর চারপাশে সমবেত হয়ে তাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে শুরু করে। তারা কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং সাদাতদের নেতৃত্বের সম্মতিতে তার কাছে বায়াত গ্রহণ করে এবং মসজিদে নববীকে কেন্দ্র বানিয়ে সাধারণ মুসল্লিদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। কারাগার ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করে দেয়। মদিনাবাসী এই বিদ্রোহে কোনো আগ্রহ দেখায়নি; তাই হুসাইন বিন আলী এরপর মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিকে হাদি বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজধানী থেকে একটি বিশাল বাহিনী পাঠান। বিদ্রোহের সময়কাল প্রায় নয় মাস ছিল। হাজার কয়েক দিন আগে মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে “ফাখ” নামক স্থানে সরকারি বাহিনী এবং হুসাইন বিন আলীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যাতে হুসাইন বিন আলীসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাদাত নিহত হন। [২]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২০৭-২০৮

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৫৩ থেকে ৫৫৭; তারিখুত তাবারী: ৮/১৯৩ থেকে ২০৩

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল পর এই দুঃখজনক ঘটনার অত্যন্ত ক্ষতিকর ফলাফল প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিছু সাদাত এবং তাদের অনুসারীরা আরব উপদ্বীপকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে আফ্রিকায় চলে যান, তাদের মধ্যে নফস জাকিয়ার ভাই ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বারবার উপজাতিরা তাঁর চারপাশে সমবেত হয়। তিন বছর পর ১৭২ হিজরীর রমজান মাসে ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ আফ্রিকান উপজাতিদের কাছ থেকে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে এই সরকার শক্তিশালী হয়ে ‘দৌলতে ইদ্রিসিয়া’য় পরিণত হয় যা আব্বাসীয় খেলাফতের সমান্তরালে চলতে থাকে। পরবর্তী শতাব্দীতে এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাফেজি মতবাদের পতাকাবাহী বনু উবাইদ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যা তিন শতাব্দী ধরে আব্বাসীয় খেলাফতের মোকাবিলা করেছিল। [১]

হাদির একটি অনুপযুক্ত পরিকল্পনা যা পূর্ণ হতে পারেনি:

হাদি অল্পবয়সী এবং অনভিজ্ঞ ছিলেন, একারণে তাঁর মা রানী খায়জুরান, যিনি রাজনীতিতে পারদর্শী ছিলেন, সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। হাদির অদূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই তিনি চেষ্টা শুরু করেন যে, তাঁর ভাই হারুনকে পরিবর্তে তাঁর নাবালক পুত্র জাফরের জন্য উত্তরাধিকার (উলি আহদ) পদটি নির্ধারণ করে দেবেন। হাদি নিজে বাইশ বছর বয়সী ছিলেন। ধারণা করা যেতে পারে তাঁর ছেলে কত অল্পবয়সী হবে। এটি ছিল একটি অত্যন্ত অযৌক্তিক চিন্তা যা বংশপরম্পরার ব্যাধির ফসল ছিল, যা বাস্তবায়িত হলে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের পতন তখনই শুরু হতে পারত। হাদির মা রানী খায়জুরান এই চিন্তার সাথে একমত ছিলেন না। এই মতভেদের কারণে মা ও ছেলের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, হাদি তাঁর মাকে রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। খায়জুরান অসন্তুষ্ট হয়ে আলাদা প্রাসাদে চলে যান।

হারুনও একারণে শুরুতে মনঃক্ষুব্ধ ছিলেন কিন্তু পরে হাদির সাথে একমত হন। হাদি তাঁকে সরকারের অর্ধেক আয় প্রদান করেন। তবে হারুনকে পদত্যাগ এবং জাফরের উত্তরাধিকার ঘোষণার আগেই ১৭০ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল রাতে হাদি প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান। একই রাতে হারুনকে রশিদের ঘরে মামুনের জন্ম হয় যিনি বনু আব্বাসের একজন বিখ্যাত খলিফা হন। এই দিক থেকে এই রাতটি ইতিহাসের এক অদ্ভুত রাত ছিল যে, একজন খলিফা বিদায় নিলেন, দ্বিতীয়জন সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং তৃতীয়জন জন্মগ্রহণ করলেন।

হাদি মাত্র এক বছর দুই মাস ক্ষমতার আসনে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁর পেটে একটি ফোঁড়া হয়েছিল যা প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়। [২] এটাও বলা হয় যে, হাদির মৃত্যুতে খায়জুরানের হাত ছিল; কারণ তিনি হারুনকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন যার জন্য হাদি রাজি ছিলেন না। [৩] হতে পারে এমনটি ঘটেছিল। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আবার মায়ের পক্ষে নিজের ছেলেকে হত্যা করানো অসম্ভব না হলেও সুদূরপর্যন্ত অবশ্যই, বিশেষ করে এজন্য যে হাদি এবং হারুন উভয়েই খায়জুরানের আপন ছেলে ছিলেন। যদি হাদি সৎ ছেলে হতেন তবে কথা ভিন্ন ছিল। আবার হারুন নিজেই নিজের অপসারণে রাজি ছিলেন, তাই খায়জুরানের হাদিকে হত্যা করানোর প্রয়োজন ছিল না। তবে রাজনৈতিক খেলা অনেক সময় সম্পর্কের উর্ধ্বে চলে যায়; তাই নিশ্চিতভাবে এই বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যানও করা যায় না।

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ২৭৯/১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৫৬/১৩

[৩] কারণ এই বর্ণনাটি দুর্বল সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাবারী একে কিছু অস্পষ্ট লোকের বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন অর্থাৎ মূল বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.)-ও একে “ইউকাল” (বলা হয়) শব্দের সাথে উল্লেখ করেছেন।

তারিখে মিল্লাত

খিলাফত

আর-রশীদ বিন মাহদী

হারুন বিন মুহাম্মদ

রবিউল আউয়াল ১৭০ হিজরী ... হতে ... জুমাদিউল আখিরা ১৯৩ হিজরী

সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ ... হতে ... এপ্রিল ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ

আববাসীয় খিলাফতে হারুন আর-রশীদকে মনসুরের পর সবচেয়ে প্রভাবশালী, সফল এবং শক্তিশালী শাসকের মর্যাদা দেওয়া হয়। তাঁর যুগে বাগদাদ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, তামাদুনিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছিল যে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো একে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখত। হারুন শাসনের জন্য ২৩ বছরের এক দীর্ঘ সময় পেয়েছিলেন। এই সময়কাল ছিল সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার। ন্যায় ও ইনসাফের ব্যাপক প্রচলন ছিল। অভ্যন্তরীণ শত্রুরা যেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠত, দ্রুতই তাদের দমন করা হতো। রোমান সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। উলামা, ফুকাহা এবং মাশায়েখদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সরকারের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মজলিসগুলোর ফয়েজ ছিল সর্বজনীন। সাদাতদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হতো। অমুসলিম দেশগুলো বাগদাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিল।

হারুন আর-রশীদেদে সীরাত:

হারুন ১৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি খিলাফতের মসনদে বসেন। তিনি ইলম ও আমল, ইবাদত ও রিয়াযত, বীরত্ব ও দানশীলতা, ক্ষমা ও মার্জনা, সচেতনতা ও প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মতো গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি আয়েশ করে বসে থাকার অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি অশ্বারোহণ এবং মুজাহিদসুলভ জীবনের অনুরাগী ছিলেন। বাগদাদের মতো জমকালো এবং জাঁকজমকপূর্ণ শহরে তিনি শান্তি পেতেন না; তাই প্রাথমিক কিছু সময় বাদে তিনি বাগদাদকে নিজের স্থায়ী ঠিকানা বানাননি। কখনো তিনি রাক্কায় থাকতেন, কখনো বাগদাদে। তাঁর ২৩ বছরের শাসনকালে মাত্র চারটি বছর এমন কেটেছে যা সফর থেকে মুক্ত ছিল। প্রায় প্রতি বছরই তিনি একটি দীর্ঘ সফর করতেন যা জিহাদ, হজ্জ অথবা বিদ্রোহ দমনের জন্য হতো। হজের সফর তিনি পায়ে হেঁটে সম্পন্ন করতেন, যাতে উলামা, মাশায়েখ এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একটি বিশাল দল সফরসঙ্গী হতো, যাঁদের খরচ হারুন নিজেই বহন করতেন। তিনি প্রতিদিন নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন। তিনি যখনই হজে যেতেন, একশ জন উলামা ও ফুকাহা এবং তাঁদের সন্তানদের সাথে নিয়ে যেতেন। যে বছর তিনি নিজে হজে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না, সে বছর তিনশ জন আলেম ও গুণী ব্যক্তিকে পূর্ণ খরচ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ হজ করাতেন। তিনি একজন দয়ালু এবং উদার মনের মানুষ ছিলেন। ইবাদত ও রিয়াযতের অবস্থা এমন ছিল যে, সারাদিন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রাতে প্রতিদিন একশ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৯/২৯

আলেম, ফযীলাতধারী এবং কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর দান-দাক্ষিণ্য এতো বেশি ছিল যে, চারদিক থেকে কলম সৈনিক, ইলম অন্বেষণকারী এবং বাগ্মী ব্যক্তির বাগদাদে আসতে শুরু করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শায়বানী (রহ.), আবুল আতাহিয়া, আব্বাস বিন আহনাফ, আসমায়ি, মারওয়ান বিন আবি হাফসা, ইব্রাহিম মাওসিলি, ইসহাক মাওসিলি এবং ওয়াকিদির মতো খ্যাতিমান ব্যক্তির তাঁর দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইমাম মালিক বিন Anas (রহ.) এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.)-এর মতো ফকীহ, ফুযাইল বিন আইয়ায (রহ.) এবং রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর মতো আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তিত্ব, খলিল বিন আহমদ (রহ.) এবং সিবওয়াইহ-এর মতো ভাষাবিদ এবং ইমাম কিসায়ি (রহ.)-এর মতো কিরাত ইমামগণ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। জাহিজ বলতেন:

“হারুনুর রশিদের কাছে এমন সব ব্যক্তি একত্রিত হয়েছিলেন যা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর উজির ছিলেন বারমাকির। তাঁর কাজী ছিলেন আবু ইউসুফ। তাঁর কবি ছিলেন উমর বিন আবি হাফসা। তাঁর সহচর ছিলেন আব্বাস বিন মুহাম্মদ। তাঁর হাজিব (দ্বাররক্ষী) ছিলেন ফজল বিন রবি। তাঁর গায়ক ছিলেন ইব্রাহিম মাওসিলি এবং তাঁর রানী ছিলেন জুবায়দা খাতুন।” [১]

বারমাকিদের উত্থান এবং খায়জুরানের মৃত্যু:

হারুনুর রশিদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা পারস্যের বারমাকি পরিবারের দরবারে হয়েছিল, তাই পারস্যবাসীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। এজন্যই তাঁর যুগে পারস্যবাসীরা দরবারে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। সেনাবাহিনীর অনেক বড় বড় জেনারেল পারস্যের ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনেও আরবের সাদাসিধে ভাব বিলুপ্ত হতে থাকে এবং পারস্যের সংস্কৃতির গভীর ছাপ পড়তে শুরু করে। কলম (প্রশাসন), মন্ত্রণালয় এবং অর্থভাণ্ডার বারমাকি পরিবারের হাতেই ছিল।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নারীদের সীমিত অংশগ্রহণ মাহদীর আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী রানী খায়জুরান ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ। এই খায়জুরান তাঁর পুত্র হাদীর আমলেও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে শরিক ছিলেন। হারুনুর রশিদের যুগেও এই প্রবণতা বজায় থাকে বরং এতে আরও বৃদ্ধি ঘটে। খায়জুরান ছিলেন তাঁর মা এবং জুবায়দা খাতুন ছিলেন তাঁর স্ত্রী। উভয়েই অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে শরিক ছিলেন। [২]

হারুনের খিলাফতের চতুর্থ বছর ১৭৩ হিজরিতে খায়জুরান ইন্তেকাল করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণের সমস্ত প্রতিনিধিত্ব জুবায়দা খাতুন করেন। তবে এই প্রতিনিধিত্ব দরবারে বসা বা শাসন করার পর্যায়ে ছিল না। নারীদের কাজের পরিধি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন উত্তরাধিকারী নিয়োগে পরামর্শ দেওয়া এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। [৩]

অনারবদের (আজম) ক্ষমতার অংশীদারিত্ব - রাজনৈতিক বিপ্লব:

উম্মাহর ইতিহাসে হারুনুর রশিদের যুগ একটি বৈপ্লবিক মোড় হিসেবে গণ্য হয়। এই বিপ্লব অনারবদের ক্ষমতার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। হারুন পরিস্থিতির নাড়ি নক্ষত্র বুঝে অনারবদের রাজনৈতিক বিষয়ে পূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রদান করেন...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১১, মিসর।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, আলী ইব্রাহিম হাসান, পৃ. ৩৭১-৩৭২।

[৩] তারিখ তাবারী, সন ১৭৩ হিজরি।

...একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করেছে এবং ইসলামী সাম্য ও এর বিশ্বজনীন মেজাজের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেছে। এটি ছিল সেই সময় যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী জনবসতিতে আরবরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল এবং অনারবরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছিল। নওমুসলিম অ-আরব জাতিগুলোর ইসলাম গ্রহণের কারণে এটি ছিল একটি স্বাভাবিক বিপ্লব, যার ভবিষ্যদ্বাণী কিতাব ও সুন্নাহতে বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا ذَٰلِكَ فَضْلُ (٧) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) (২) مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (৪) اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

তিনিই আল্লাহ যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত... তিনি তাদের ওপর আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং এর আগে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল। আর অন্য কিছু লোকও আছে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তিনি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটি আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন এবং আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল। [১]

এই বরকতময় আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বলছে যে, ইসলামের প্রথম সম্বোধিত ও আহ্বানকারী ছিল আরবের যাযাবররা, কিন্তু তাদের পরে আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহ এভাবে প্রকাশ করবেন যে, অ-আরব জাতিগুলোও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। যদিও আয়াতের তাফসীরে অনেক বক্তব্য রয়েছে, তবে গবেষক মুফাসসিরগণ এর এই মর্মই বুঝেছেন। [২]

সহীহ হাদীস থেকেও এই অর্থই প্রকাশ পায়। যখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এই আয়াতে পরবর্তীতে আগমনকারীদের দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه-এর ওপর হাত রেখে বললেন: “যদি দ্বীন সুরাইয়া নক্ষত্রেও (ছায়াপথে) থাকত, তবে তাঁর কওমের লোকেরা সেখানে গিয়েও তা অর্জন করত।” [৩]

এতে কার সন্দেহ থাকতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত ছিল সারা বিশ্ব ও সমস্ত জাতির জন্য এবং আরব ও অনারবসহ সকলেই তাঁর উম্মত। তাই এই দ্বীন তার প্রাণশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এমনকি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানদের সামগ্রিক জনবসতিতে অ-আরবরা সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করে এবং আরব গোত্রগুলো মুসলমানদের এই সমুদ্রে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্মানিত ও সক্রিয় গোষ্ঠী হিসেবে রয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে হারুনুর রশীদের অনারব মুসলমানদের সরকারে শরিক করা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল না, বরং এই পদক্ষেপ ছিল সেই সময়ের প্রয়োজন; কারণ আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠাও অনারবদের সমর্থনে হয়েছিল এবং তখনও তা বড়লাংশে তাদের শক্তির ওপরই টিকে ছিল।

[১] সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ২-৪

[২] তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল্লামা মাহমুদ আলুসী, সূরা আল-জুমুআহর অধীনে

[৩] সহীহ মুসলিম: ৬৬৬১, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফাযলে ফারিস; সুন্নাতে তিরমিযী: ৩৩১০

মনসুর ও মাহদী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো আরব অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন, যার ফলে আজমদের (অনারবদের) মধ্যে যে বঞ্চনার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল, তার ফল কেবল ক্রমাগত বিদ্রোহের রূপেই প্রকাশ পায়নি, বরং যিন্দিক ও ধর্মত্যাগের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার একটি কারণ এটিও ছিল যে, আজমদের ফিতনা তাদের বারবার এই কথা স্মরণ করিয়ে দিত যে, আরবরা তাদের সরকারে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর অংশীদারিত্বহীন শাসন চালিয়ে যাওয়া যে উত্তেজনার জন্ম দেয়, তা কারো অজানা নয়। তাই হারুন আজমদের বঞ্চনার অনুভূতি দূর করেন এবং তাদের খোলা মনে শাসনব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

কিছু সমালোচক হারুনুর রশীদের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে একে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কথা নিজ জায়গায় সঠিক যে, আজমদের প্রভাবে খিলাফতের বিষয়ে অনেক সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যখন এই লোকেরা খলিফাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল, তখন সাম্রাজ্যের শান-শওকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তবে এই পরিস্থিতির আরেকটি দিকও রয়েছে আর তা হলো, বনু আব্বাসের এই সহনশীলতাই তাদের খিলাফতকে দুর্বলতা সত্ত্বেও পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছিল। এর বিপরীতে বনু উমাইয়া সমাজে সৃষ্ট স্বাভাবিক পরিবর্তনের চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে হঠাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল, যদিও তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক। যদি বনু আব্বাস অনারব জাতিগুলোর সাথে সহনশীল আচরণ না করত, তবে তারা খুব শীঘ্রই সম্মিলিতভাবে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতো এবং বনু আব্বাস হয়তো দুই শতাব্দীও পূর্ণ করতে পারত না।

অভ্যন্তরীণ অভিযানসমূহ

সরকারি স্থিতিশীলতা, জনপ্রিয়তা এবং ন্যায়বিচারের খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও হারুনকে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই অভ্যন্তরীণ অভিযানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

বিদ্রোহসমূহ:

হারুনের যুগে আজমি রাজনীতিবিদ ও জেনারেলদের উত্থান ঘটলে এই পরিবর্তন কিছু আরব অভিজাতদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে হারুনকে তাদের বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে হয়।

১৭৮ হিজরিতে মিশরে এই ধরনের একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় যেখানে কায়েস ও কুদাআ গোত্রের আরবদের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী, যাদের ‘হাউফ’ বলা হতো, আব্বাসীয় গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। হারুন হারসামা বিন আয়ানকে পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

একই বছর আফ্রিকায় দ্বিতীয় বিদ্রোহটি ঘটে যেখানে আবদুওয়াইহ নামক এক জেনারেল বিদ্রোহ করেন। উজির ইয়াহইয়া বারমাকি একজন বিশ্বস্ত জেনারেল পাঠিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই বিদ্রোহীকে শান্ত করেন এবং তাকে পুরস্কার ও পদমর্যাদা দিয়ে বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। [১]

[১] তারিখুত তাবারী, ১৭৮ হিজরি।

১৭৮ হিজরিতে একজন খারিজি সরদার ওয়ালিদ বিন তরীফ, যার সম্পর্ক ছিল বনু তাগলিব গোত্রের সাথে, আল-জাজিরায় বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করেন এবং একাধিকবার সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করেন। তার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তিনি দজলা নদী পার হয়ে নসিবাইন এবং আজারবাইজান পর্যন্ত পৌঁছে যান। তার গতিরোধ করার জন্য এই উভয় অঞ্চলের গভর্নররা নিহত হন। ওয়ালিদ বিন তরীফ সেখানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। অবশেষে হারুনুর রশিদের জেনারেল ইয়াজিদ শায়বানি তার সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হঠাৎ আক্রমণ করে ওয়ালিদ বিন তরীফকে হত্যা করেন। এরপর তার বোন ফারওয়াহ খারিজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শীঘ্রই তার অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়। এশিয়ায় এটিই ছিল খারিজিদের শেষ বিদ্রোহ। এরপর তাদের জোর চিরতরে ভেঙে যায়। তবে তাদের কিছু অবশিষ্টাংশ আফ্রিকায় টিকে থাকে। বিশেষ করে ইবাদিয়া এবং সুফরিয়া ফিরকা সেখানে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে থাকে। [১]

ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ হাশেমীর বিদ্রোহ:

হারুনুর রশিদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল দুই আলাভী ভাইয়ের অস্তিত্ব। এক ভাই ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ উত্তর ইরানের সবচেয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা দাইলামের একটি আকাশচুম্বী দুর্গকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করেন। দ্বিতীয় ভাই ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ উত্তর আফ্রিকায় বারবার উপজাতিদের নিজের চারপাশে একত্রিত করেন। এই দুজনেই ছিলেন নফস-এ-জাকিয়ার আপন ভাই।

হারুনুর রশিদ ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহর মোকাবিলা করার জন্য ফজল বারকিকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠান। তিনি তার দুর্গ ঘেরাও করেন। ইয়াহইয়া যখন দেখলেন কোনো উপায় নেই, তখন তিনি হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার (আমান) গ্যারান্টি পাওয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হন। হারুনুর রশিদ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিপত্র (আমান নামা) লিখে পাঠান এবং ইয়াহইয়া অস্ত্র সমর্পণ করেন। এভাবে এই অভিযান কোনো রক্তপাত ছাড়াই সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে বাগদাদে আনা হলে হারুনুর রশিদসহ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির তাকে চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা জানান। হারুনুর রশিদের নির্দেশে উজির ও আমিররা স্বয়ং ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহর সেবা করতেন। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এটা দেখে ঈর্ষান্বিত হন। তারা মিথ্যা অভিযোগ করে হারুনুর রশিদকে এতটাই উত্তেজিত করেন যে তিনি ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহকে জাফর বারকির হাতে সোপর্দ করে বন্দি করে দেন। [২]

১৮৩ হিজরিতে তুর্কিস্তানের খাকান খাজারের পাহাড়ি গিরিপথ অতিক্রম করে আজারবাইজান এবং আরমেনিয়ায় আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের কারণ ছিল হারুনুর রশিদের উজির ফজল বিন ইয়াহইয়া খাকানের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খাকান তা গ্রহণ করে তার মেয়েকে বিদায় দেন। তিনি জাঁকজমক ও লোকলস্কর নিয়ে পথে ছিলেন যে, সীমান্ত এলাকা বারদা’আ-তে হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে। খাকান একে মুসলমানদের ষড়যন্ত্র মনে করেন এবং আক্রমণ করেন। তিনি সীমান্ত এলাকাগুলো থেকে প্রায় এক লক্ষ মুসলমানকে বন্দি করেন। হারুনুর রশিদ প্রেরিত বাহিনী সেখানে পৌঁছায় এবং তারা বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর খাকানকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর পাহাড়ি গিরিপথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে তুর্কিরা সেখান থেকে আর অনুপ্রবেশ করতে না পারে। [৩]

[১] তারিখ তাবারী: ১৭৮ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/২১৬।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৮১।

[৩] আল-ফখরি ফি খবর মান গাবার: ১/২২১।

বিশ্বব্যাপী খেলাফতের বিলুপ্তির সূচনা

হারুনুর রশীদের যুগ কেবল বনু আব্বাসের নয় বরং ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু অন্যদিকে এই সত্যও রয়েছে যে, এই উন্নতির যুগেই বিশ্বব্যাপী খেলাফতের বিলুপ্তি ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল।

পুরো মুসলিম বিশ্বে একজন খলিফার কর্তৃত্ব কেবল খুলাফায়ে রাশেদীন বা বনু উমাইয়াদের ভাগ্যে জুটেছিল। বনু আব্বাসের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ছয় বছর পর অর্থাৎ ১৩৮ হিজরিতে আন্দালুস তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে খেলাফতের সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পামির পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মনসুর ও মাহদীর যুগেও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু হারুনুর রশীদের যুগে আফ্রিকা দ্রুত খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে এবং মিশর ছাড়া আর কোনো প্রদেশ খেলাফতের অধীনে থাকেনি। প্রথমে মরক্কো এবং আলজেরিয়ায় ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর তিউনিসিয়া এবং লিবিয়ায় স্বায়ত্তশাসিত আগলাবি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা:

ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নফস-ই-জাকিয়ার ভাই ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ ছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে ১৭২ হিজরিতে বারবার উপজাতিদের সহায়তায় মরক্কোতে এই স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ ১৭৭ হিজরি পর্যন্ত শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ইদ্রিসিয়া বংশের শাসনের ধারা চলতে থাকে। মরক্কো এবং আলজেরিয়ার এলাকা তাদের অধীনে ছিল। এই সরকার একদিকে আব্বাসীয়দের বিরোধী ছিল, অন্যদিকে আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের সাথেও তাদের বিরোধ চলছিল। প্রায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত বনু ইদ্রিস স্বাধীন ছিল। এরপর শিয়া গোষ্ঠী বনু উবাইদ তাদের ওপর বিজয় লাভ করে তাদের অনুগত করে নেয়। এই পতনের অবস্থায় প্রায় আধা শতাব্দী অতিবাহিত করার পর বনু ইদ্রিসের কার্যত সমাপ্তি ঘটে। [১]

আফ্রিকান উপজাতিদের বিদ্রোহ এবং আগলাবি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা:

১৮১ হিজরি থেকে ১৮৪ হিজরি পর্যন্ত হারুনুর রশীদকে আফ্রিকায় বারবার উপজাতিদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তাদের দমনের জন্য হারুন প্রথমে বিখ্যাত জেনারেল হারসামা বিন আয়ানকে পাঠান কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। এরপর হারুন ইব্রাহিম বিন আগলাবকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে স্থায়ীভাবে আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শহর কায়রোয়ানে নিযুক্ত করেন যাতে তিনি বারবারদের পরাজিত করেন এবং নবগঠিত ইদ্রিসিয়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আব্বাসীয় অধিকৃত অঞ্চলের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করেন।

ইব্রাহিম বিন আগলাব এই বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পর সেখানে নিজের একটি স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই রাষ্ট্র আব্বাসীয়দের অনুগত হিসেবে কাজ করে আসছিল, কিন্তু যখন দেখল যে

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭২, ১৭৭। এবং কিছু ইতিহাসে বনু ইদ্রিস আরও দুই শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আব্বাসীয়দের আফ্রিকায় কোনো জোর ছিল না, তাই তারা স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করে দিল। এই সরকার দাওলাতে আগলাবা নামে পরিচিত হয় এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল টিকে থাকার পর ২৯৬ হিজরিতে বনু উবাইদের হাতে বিলুপ্ত হয়। [১]

খেলাফতের কেন্দ্র থেকে এই প্রদেশগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হয়নি। যদিও সেই সময় খেলাফতের সামরিক শক্তি বিরোধীদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। একইভাবে অর্থনৈতিক শক্তিও তুঙ্গে ছিল। সুতরাং এই এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু হারুন কখনোই এই দিকে সৈন্য পরিচালনা করেননি, বরং নিজের প্রতিরক্ষা মজবুত রাখাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এটি কোনো অবহেলা বা অজ্ঞতা ছিল না, বরং এর পেছনে একটি গভীর কৌশল কাজ করছিল। তা হলো, এর মাধ্যমে বনু আব্বাস আন্দালুসের উমাইয়াদের সুযোগসন্ধানী তৎপরতা থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু বনু আব্বাস তলোয়ারের জোরে বনু উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাই তাদের মনে সব সময় এই ভয় কাজ করত যে, উমাইয়ারা শক্তি সঞ্চয় করে প্রতিশোধ নিতে পারে। বনু উমাইয়াদের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি আন্দালুসে পুঞ্জীভূত ছিল এবং নির্মাণ ও উন্নয়নের দিক থেকে তাদের শাসন ছিল তুঙ্গে। এর শান-শওকত দেখে মনসুরের মতো দৃঢ়সংকল্প শাসকও শুকরিয়া আদায় করতেন যে, আমাদের এবং তাদের মাঝখানে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে। কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা অতিক্রম করে বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া উমাইয়া অশ্বারোহীদের জন্য কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না; তাই আব্বাসীয়দের দৃষ্টিতে আন্দালুস এবং আব্বাসীয় খেলাফতের মাঝখানে এমন একটি রাষ্ট্রের আড়াল থাকা জরুরি ছিল যা উমাইয়াদের বিরোধী হবে; এই কারণে হারুনুর রশিদ এবং তাঁর উত্তরসূরিদের কেউ দাওলাতে ইদারিসাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেননি।

তবে দাওলাতে ইদারিসা ফাতেমি হওয়ার কারণে আব্বাসীয়দেরও বিরোধী ছিল এবং এর বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা এই কারণে খুব উজ্জ্বল ছিল যে, সাধারণ মানুষ ফাতেমি বংশকে খুব মান্য করত; তাই এই আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল যে, এই ফাতেমিরাই হয়তো পুরো আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়বে এবং এরপর আব্বাসীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে; তাই জরুরি ছিল যে, খোদ ফাতেমিদের এই শাসনাধীন এলাকা এবং বনু আব্বাসের শাসনভুক্ত এলাকার মাঝখানে আরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিভাজক রেখা হিসেবে বিদ্যমান থাকুক, যা আব্বাসীয়দের বন্ধু হবে।

ফলশ্রুতিতে যখন ইব্রাহিম বিন আগলাব তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় নিজের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করলেন, তখন আব্বাসীয়দের এই প্রয়োজনটি আপনাআপনিই পূরণ হয়ে গেল; তাই তারা দাওলাতে আগলাবাকে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য জরুরি মনে করে টিকে থাকতে দিল।

যা-ই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই সরকারগুলোর প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্বব্যাপী খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হারুনুর রশিদ যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের মাত্র দুটি সরকার ছিল: আব্বাসীয় খেলাফত এবং আন্দালুস আমিরাত। এখন তাঁর ইন্তেকালের সময় মুসলিম বিশ্ব চার ভাগে বিভক্ত ছিল। এটি সত্য যে সেই সময় এবং এর পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফতই ছিল মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় অংশ, কিন্তু পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে তা সংকুচিত হয়ে একটি বামনাকৃতি সরকারে পরিণত হয় যা স্বায়ত্তশাসিত সুলতানদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮, ২৫০

বারমাকিদের উত্থান ও পতন

হারুনুর রশীদের যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর অধ্যায় হলো বারমাকি বংশের উত্থান ও পতন। এটি সেই বংশ যারা আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব এবং উন্নতির সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই বংশের দাপট ছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ এই লোকগুলো এমনভাবে নাম-নিশানাহীন হয়ে গেল যে দুনিয়া তাদের খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বারমাকি কারা ছিল?

বারমাকি বংশ বংশগতভাবে অগ্নিপূজক ছিল। তাদের কেন্দ্র ছিল খোরাসানের বিখ্যাত শহর বলখ। খোরাসানি অগ্নিপূজকদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কেন্দ্র অর্থাৎ অগ্নিমন্দির এখানেই ছিল যাকে “নওবাহার” বলা হতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যখন ইরান ও খোরাসানের অধিকাংশ শহর বিজিত হলো, তখন অগ্নিপূজকদের কাছে বলখের অগ্নিমন্দিরের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল এবং তারা চারদিক থেকে এখানে সমবেত হতে লাগল। এই অগ্নিমন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিল “জামাস”। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময়ে কুতাইবা বিন মুসলিম বলখও জয় করেন। সেই সময় পর্যন্ত “জামাস” মারা গিয়েছিল। তার ছেলে হেকিম বারমাক, যে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিল, ৮৬ হিজরিতে দামেস্কে আসে। [১]

হেকিম বারমাকের দক্ষতা ও বিচক্ষণতার কারণে উমাইয়া খলিফা ও শাহজাদারা তার মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে শুরু করেন। [২]

তারপর তার মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পেল যে ইরাকের গভর্নর আসাদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরি তাকে বলখে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হেকিম বারমাক বলখকে নতুন করে নির্মাণ করে এক শানদার শহরে পরিণত করেন। [৩] বারমাকি বংশ এই বারমাকের দিকেই সম্পর্কিত।

হেকিম বারমাকের ইসলাম গ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাহ্যিকভাবে সে তার পৈতৃক ধর্মেই অটল ছিল। [৪]

খালিদ বারমাকি, আবু মুসলিম খোরাসানির ডান হাত:

খালিদ বারমাকি এই বারমাকের ছেলে ছিল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ এবং একজন দক্ষ সংগঠক ছিল। ৯০ হিজরিতে তার জন্ম হয়। যখন আব্বাসীয় আন্দোলন শুরু হলো, তখন সে ইমাম ইব্রাহিম আব্বাসীর দাঈ এবং আবু মুসলিম খোরাসানির ডান হাত হয়ে গেল। আব্বাসীয় আন্দোলনের বারোজন নকীবের পর যে ২১ জন শীর্ষস্থানীয় দাঈর মর্যাদা ছিল, খালিদ বারমাকি তাদের মধ্যে একজন ছিল। সে ‘দাওয়াত-এ-আলে মুহাম্মদ’ নিয়ে ইরাক, ইরান ও খোরাসানের প্রতিটি জনপদে যেত। সন্দেহ এড়ানোর জন্য সে সাথে গবাদি পশু রাখত এবং নিজেকে পশু ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিত।

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: سنة ১৮৬ هـ আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ২৯৫/২; জাওয়াহিরুল খুলাফা লিত-তানিদি, (علام الناس بما وقع للبرامكة مع بني عباس)، ص ১৬৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৪২৫/৬; ১৪২৬ হিজরি; আস-সিরাতুল হালাবিয়াহ: ১০৫/১; বুগইয়াতুত তালাব লি ইবনিল আদিম: ৩০১৯/৭-৩০২০, ত: দারুল ফিকর

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪১/৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: سنة ১০৭ هـ

[৪] এর থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে বনু আব্বাসের যুগেও দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য উন্নতির দরজা পুরোপুরি উন্মুক্ত ছিল, এতে আরব-অনারব এবং মুসলিম-অমুসলিমের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। রাজনীতি ও প্রশাসনিক বিষয়ে তাদের মেধা ও যোগ্যতাই ছিল নেতৃত্বের মাপকাঠি।

...অনেকবার সে ধরা পড়েছিল কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে মুক্তি পেয়ে যায়। এভাবে সে আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পূর্ণাঙ্গভাবে शामिल ছিল। এই সেবার বিনিময়ে সাফাহ আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরপরই তাকে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। [১]

খালিদ বারমাকীর মন্ত্রিত্বকাল

যখন সাফাহ তার প্রথম উজির আবু সালামাকে হত্যা করালেন, তখন আবু মুসলিম নতুন উজির হিসেবে খালিদ বারমাকীর নাম প্রস্তাব করেন। ফলে খালিদ বারমাকী আবু আব্বাসের উজির অর্থাৎ পুরো সাম্রাজ্যের প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত হন। মনসুরের শাসনামলেও তিনি কিছুকাল এই পদে বহাল ছিলেন। যখন মনসুর আবু মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা করানোর পর আশঙ্কা বোধ করলেন যে খালিদ বারমাকীও কোনো গোলমাল করতে পারেন; কারণ তিনি আবু মুসলিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু খালিদ বারমাকীর কোনো কর্মকাণ্ডই সন্দেহজনক ছিল না; তাই মনসুর তাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে কেবল মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করেন এবং তাবারস্তানের মতো দূরবর্তী অঞ্চলে তাকে নিযুক্ত করেন।

খালিদ বারমাকী আবু মুসলিমের পরিণতি দেখার পর অস্বাভাবিক মাত্রায় সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে মনসুরের হারানো বিশ্বাস পুনরায় অর্জন করে নেন। সাত বছর পর মনসুর তাকে মসুলের শাসক নিযুক্ত করেন। এরপর আরও আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে নিজের উত্তরাধিকারী মাহদীর গৃহশিক্ষক (আতালিক) নিযুক্ত করেন। [২]

পারস্যের আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা

বিভিন্ন আলামত ও লক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবু মুসলিম খুরাসানী যেভাবে পারস্যের আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তেমনি তার সমমনা খালিদ বারমাকীও একই লক্ষ্য সামনে রেখেছিলেন এবং এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল; কারণ তিনি সেই অগ্নিউপাসক (মাজুসি) ধর্মগুরুদের বংশধর ছিলেন যারা এক সময় অতুলনীয় শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন। খালিদ ইসলাম গ্রহণ করার পরও নিজের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ববোধ করতেন। জিন্মি অগ্নিউপাসকদের তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। তারা তাদের উৎসব ‘নওরোজ’-এ তাকে উপহার দিত এবং কবিরা তার প্রশংসায় কাসিদা পাঠ করত।

যখন বাগদাদ নির্মাণের সময় খলিফা মনসুর আব্বাসীয়কে পরামর্শ দেওয়া হলো যে, কিসরার রাজপ্রাসাদ ভেঙে বাগদাদের নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হোক যাতে ব্যয়ের বোঝা কমানো যায়, তখন খালিদ বারমাকী অত্যন্ত চতুরতার সাথে এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: “কিসরার প্রাসাদ ইসলামের একটি নিদর্শন। এটি দেখলে বিশ্বাস জন্মে যে মুসলমানদের সাথে আসমানি সাহায্য ছিল বলেই তারা এমন এক বিশাল শক্তির ওপর বিজয়ী হতে পেরেছে।” খালিদের এই ধরনের কথার কারণে কিছু মানুষের সন্দেহ ছিল যে তিনি ভেতর থেকে অগ্নিউপাসক। [৩]

যা-ই হোক, খালিদ বারমাকী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং আবু মুসলিমের চেয়েও অনেক গভীর পরিকল্পনার সাথে এক এক কদম সামনে বাড়ছিলেন, তাই মানুষের কানাঘুষা তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

[১] বুগইয়াতুত তালাব লি ইবনিল আদিম: ৭/৩০৬ থেকে ৩০২২, ত. দারুল ফিকর; আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়াহ, পৃ. ২৪০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩০ হিজরি, ১৩২ হিজরি।

[২] আল-আলাম লিয যিরিকলি: ২/২৯৫।

[৩] আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়াহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়াহ লি ইবনি তিকতাকা, পৃ. ১৫৪, ত. দারুল কলাম আল-আরাবি; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/২২৯।

খলিফাদের সাথে দুগ্ধ-সম্পর্ক:

মনসুরের শাসনামলে সে মাহদীর গৃহশিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। মাহদী খায়জুরানকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, যার গর্ভে ১৪৮ হিজরিতে হারুনুর রশিদের জন্ম হয়। সেই দিনগুলোতে খালেদের পুত্র ইয়াহইয়ার ঘরে একটি সন্তান জন্ম নেয় যার নাম রাখা হয় ফজল। খালেদ বারমাকি শিক্ষক হওয়ার সুবাদে মাহদীর কাছে অনুরোধ করেন যে, পারস্পরিক ভালোবাসা আরও সুদৃঢ় করার জন্য আমার নাতি ফজল এবং আপনার পুত্র হারুনকে একে অপরের দুগ্ধ-ভাই বানিয়ে দেওয়া হোক। মাহদী তার শিক্ষকের এই প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন। মাহদীর স্ত্রী খায়জুরান ফজল বিন ইয়াহইয়াকে দুগ্ধ পান করান এবং ইয়াহইয়া বারমাকির স্ত্রী হারুনুর রশিদকে। এভাবে ভবিষ্যতের খলিফা এবং বারমাকি বংশধররা দুগ্ধ-সম্পর্কীয় আত্মীয় হয়ে যান। [১]

শিক্ষক ও শিক্ষকের পুত্রের সাথে সম্পর্ক:

১৫৯ হিজরিতে মাহদী খলিফা হলে খালেদ বারমাকি শিক্ষক হিসেবে এবং তার পুত্র ইয়াহইয়া বারমাকি শিক্ষকের পুত্র হিসেবে আরও বেশি সম্মান লাভ করেন। অবশেষে ১৬৫ হিজরিতে খালেদ বারমাকি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৭৫ বছর। তার জীবনের বড় অংশ রাজনৈতিক বিপ্লব দেখা এবং সরকার গঠনের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি তার অভিজ্ঞতাগুলো তার পুত্র ইয়াহইয়া বারমাকির কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, যার বয়স পিতার মৃত্যুর সময় প্রায় ৫০ বছর ছিল। [২]

হারুন ইয়াহইয়া বারমাকিকে পিতা বলে ডাকতেন:

ইয়াহইয়ার জন্য পথ একদম মসৃণ ছিল। তিনি মাহদীর বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। মাহদী পূর্ণ আস্থার সাথে তার পুত্র হারুনের লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তারই ওপর অর্পণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি হারুনের দুগ্ধ-পিতা ছিলেন, তাই হারুন তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন এবং সর্বদা তাকে “ইয়া আবাতি” (হে আমার প্রিয় পিতা) বলে সম্বোধন করতেন। [৩]

হারুনের ক্ষমতার জন্য ইয়াহইয়া বারমাকির প্রচেষ্টা:

হারুনের খলিফা হওয়া প্রকৃতপক্ষে ইয়াহইয়ার শাসক হওয়ারই নামান্তর ছিল, আর এটাই ছিল বারমাকিদের আকাঙ্ক্ষা। তাই মাহদীর পর হাদি খলিফা হয়ে যখন হারুনের উত্তরাধিকার (উলি-অহদি) বাতিল করে নিজের পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকারী বানানোর ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ইয়াহইয়া বারমাকির আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভাটা পড়তে শুরু করল। তিনি আশ্রয় চেষ্টি করলেন যাতে কোনো প্রকার বিবাদ ছাড়াই হাদির এই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যায়; এজন্য তিনি হাদিকে বললেন:

“যদি আপনি মানুষকে শপথ ভঙ্গ করার অনুমতি দেন, তবে তাদের দৃষ্টিতে শপথের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। ভালো হবে যদি আপনি আপনার ভাইয়ের উত্তরাধিকার বহাল রাখেন; এরপর জাফরের উত্তরাধিকারের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন।” [৪]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন ৩/২৮০, আখবারুল বারমাকি।

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার ১/১৮৮।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা ৯/৬০, জীবনী: জাফর বারমাকি।

[৪] তারিখুত তাবারি ৮/২০৯।

হারুনের প্রতি ইয়াহইয়ার এই একনিষ্ঠতা হাদির পছন্দ হয়নি এবং তিনি ইয়াহইয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

হারুন খলিফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম ইয়াহইয়া বারমাকিকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেন। এরপর পরবর্তী বছর খিলাফতের মোহর এবং ব্যক্তিগত আংটিও তাকে প্রদান করেন। [১]

ইয়াহইয়া বারমাকি অত্যন্ত প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সরকারি ব্যয়, অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি, নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা পর্যন্ত সকল দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। একই সাথে তিনি হারুনের মাতা রানী খায়জুরানের আস্থাও বজায় রাখেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ইয়াহইয়া প্রতিটি কাজে তার পরামর্শ নিতেন। খায়জুরানের মৃত্যুর পর সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইয়াহইয়া বারমাকির হাতে চলে আসে। [২]

জাফর বিন ইয়াহইয়া বারমাকির ক্ষমতা:

ইয়াহইয়া হারুনের মনে কোনো অবিশ্বাস সৃষ্টি না করেই তার চার তরুণ পুত্র: ফজল, জাফর, মুহাম্মদ এবং মুসাকে রাষ্ট্রীয় কাজে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই চারজনের মধ্যে প্রথম দুইজন অর্থাৎ ফজল ও জাফর মেধা ও যোগ্যতায় ছিলেন অসাধারণ। ১৭৪ হিজরিতে ইয়াহইয়ার বার্ষিক্যের কারণে এই দুইজনই অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা করতে শুরু করেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইয়াহইয়ার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার ধারা অব্যাহত থাকে।

জাফর বারমাকি বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং বাগ্মিতায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ছিলেন হারুনের রশিদের বাল্যবন্ধু। তাদের দুজনের মধ্যে আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। সফরে হোক বা আবাসে, হারুন তাকে সর্বদা সাথে রাখতেন। জাফর প্রতিটি পদের জন্য যোগ্য ছিলেন। তাকে মিশরের গভর্নরও নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু হারুন তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না, তাই জাফর বাগদাদে অবস্থান করেই তার প্রতিনিধির মাধ্যমে মিশরের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১৮০ হিজরিতে সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে জাফরই সেখানে গিয়ে তা দমন করেন। জাফর খিলাফত প্রাসাদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং হারুনের সরকারি মোহরের রক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। রাজধানী শহরের শাসন ও প্রশাসনের প্রধানও ছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে হারুনের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা এতটাই গভীর হয় যে, হারুন তাকে খিলাফতের উজির নিযুক্ত করেন। এভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের শাসনব্যবস্থা অনেকাংশেই তার হাতে চলে আসে।

জাফর তার মন্ত্রিত্বকালে এমন মর্যাদা লাভ করেছিলেন যা তার পূর্বপুরুষদের ভাগ্যেও জোটেনি। ঐতিহাসিকরা বলেন:

“হারুনের নিকট তিনি মর্যাদা, ক্ষমতার প্রয়োগ এবং মহত্ত্ব ও অবস্থানের দিক থেকে এককভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।” [৩]

ফজল বিন ইয়াহইয়া বারমাকির কীর্তিসমূহ:

ফজল বারমাকি দানশীলতা ও নেক কাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হারুনের দুধভাই। ১৭৬ হিজরিতে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ ফজলই দমন করেছিলেন। হারুন ১৭৮ হিজরিতে তাকে খোরাসান, তাবারস্তান, রে এবং হামাদানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৬১; আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, আলী ইব্রাহিম হাসান, পৃ. ৩৭৭

[২] তারিখ ইবনে খালদুন ৩/২৮০, বাব আখবারুল বারমিকা; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৬২

[৩] তারিখ বাগদাদ, খতিব বাগদাদি: ৭/১৯৭, ত ত আল-ইলমিয়াহ

তার প্রশাসনিক দক্ষতার অবস্থা এমন ছিল যে, সে সেখানে পাঁচ লক্ষ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সরকারি বাহিনী প্রস্তুত করেছিল যাকে “আল-আব্বাসিয়া” বলা হতো। এর আগে মুসলমানদের ইতিহাসে এত বড় বাহিনী নিয়োগ করা হয়নি। সে সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন করে অল্প সময়ের মধ্যেই খোরাসানের শান্তি ও শৃঙ্খলা ঈষণীয় করে তুলেছিল। সে সেখানে স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং মুসাফিরখানা তৈরি করেছিল। দুই বছর পর যখন সে বাগদাদে ফিরে এল, তখন হারুন আল-রশিদ এই কৃতিত্বের জন্য তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, শহরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং পনের লক্ষ দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন। এরপর তাকে রাষ্ট্রের উজির নিযুক্ত করা হয়।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বারমাকি সাহস ও উদ্দীপনায় অনন্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হাজিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার অনুমতি ছাড়া কেউ হারুন আল-রশিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত না। মুসা বারমাকি বীরত্ব ও সাহসিকতায় অতুলনীয় বিবেচিত হতেন। হারুনের এই সব ভাইদের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল, যার সুযোগ নিয়ে তারা বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং সমমনা সঙ্গীদের নিয়োগ দিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এই লোকেরাই অধিকাংশ দপ্তরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। [১]

বারমাকিদের শান-শওকত ও ক্ষমতা:

এটি ছিল বারমাকি বংশের উত্থানের সময়। রাজকীয় কোষাগার তাদের কাছে ছিল, তারা তা অকাতরে ব্যয় করত। প্রশাসনিক গুণাবলি ছাড়াও তাদের উদারতা ও দানশীলতা সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের অনুরাগী করে তুলেছিল। দূর-দুরান্ত থেকে মানুষ দলে দলে তাদের চারপাশে সমবেত হতো। তাদের প্রাসাদের দরজায় সাক্ষাৎপ্রার্থী, অভাবী এবং ফরিয়াদিদের ভিড় লেগে থাকত। সাহিত্যিক ও কবিরা তাদের অনুগ্রহে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের জিহ্বা ও কলমকে তাদের প্রশংসায় নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের প্রশংসামূলক কবিতা (কাসিদা) ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আয়-ব্যয়ের সমস্ত ক্ষমতা জাফর বারমাকির হাতে ছিল। কখনো কখনো হারুন আল-রশিদের খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে তাকে জাফরের কাছে বলতে হতো। সেনাবাহিনী ব্যতীত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে বারমাকি পরিবারের সদস্যদের এমন প্রবল একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, অন্য কারো সেই সব বিভাগে প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল না। লেখালেখি, হিসাব-নিকাশ, কোষাগার এবং সম্পদের সমস্ত কর্তৃত্ব একটি পরিবারের হাতেই ছিল। শুধুমাত্র খিলাফত প্রাসাদে বারমাকি পরিবারের পঁচিশজন আমির নিযুক্ত ছিলেন, যারা দাপ্তরিক কাজ থেকে শুরু করে সামরিক বিষয়াদি পর্যন্ত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন।

বারমাকিদের প্রাসাদের শান-শওকত, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাদের মজলিসের সাজসজ্জা অনারব (আজম) রাজাদের স্মৃতিকে সজীব করে তুলেছিল। জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের বিশাল ভিড় তাদের চারপাশে সমবেত থাকত। খলিফার প্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশি কর্মতৎপরতা বারমাকিদের প্রাসাদে দেখা যেত। মানুষ হারুনের চেয়ে বারমাকিদের কাছ থেকে অনেক বেশি দানশীলতা ও উদারতার আশা করত এবং খিলাফত প্রাসাদ ছেড়ে বারমাকিদের চৌকাঠে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। [২]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন ৩/২৮০, বাব আখবারুল বারামিকা; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৯৫।

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ২১, ২২ (তারিখ ইবনে খালদুন প্রথম খণ্ড)।

হারুন কেন বারমাকিদের এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন?

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারুন কেন বারমাকিদের এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন? এটি কি কোনো প্রশাসনিক প্রয়োজন ছিল, নাকি নিজের দায়িত্ব থেকে পলায়ন এবং আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হওয়ার জন্য অবসরের পথ খোঁজা ছিল?

উর্দু ও ফারসি ভাষার কিছু ইতিহাসবিদ নিঃসন্দেহে এই ধারণা দিয়েছেন যে, বারমাকিদের উত্থানের সময় হারুনুর রশীদেদের অবস্থান ছিল কেবল একজন আনুষ্ঠানিক শাসকের মতো এবং স্তুতিমূলক কবিতা শোনা ও উদ্দেশ্যহীন কাজ ছাড়া তাঁর আর কোনো ব্যস্ততা ছিল না। যদিও এই বিষয়টি গবেষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যদিও বারমাকিদের উত্থান একটি ঐতিহাসিক সত্য এবং তাদের ব্যাপক ক্ষমতাও একটি বাস্তবতা। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, খলিফা ক্ষমতাহীন ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন আর সবকিছুই কেবল বারমাকিদের হাতে ছিল। যদি সত্যিই এমন হতো, তবে বারমাকিদের মাত্র এক রাতে নির্মূল করা সম্ভব হতো না; বরং অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অত্যন্ত কষ্টে এই উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জিত হতো।

সঠিক কথা হলো, হারুনুর রশীদ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তিনি বারমাকিদের দুটি কারণে ক্ষমতা দিয়েছিলেন: একটি এই কৌশলের অধীনে যে, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে অনারবদের (আজমিদের) যতটা সম্ভব সম্পৃক্ত রেখে ইসলামী সহনশীলতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং ইসলামী খিলাফতের ওপর লেগে থাকা ‘আরব খিলাফতের’ ছাপ দূর করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় কৌশলটি ছিল এই যে, তিনি নিজেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের জন্য অবসর রাখতে চেয়েছিলেন।

সুতরাং বারমাকিদের সঠিক অবস্থান ছিল এই যে, তারা স্থায়ীভাবে সমস্ত দাপ্তরিক বিষয়ের দায়িত্বশীল এবং হারুনুর রশীদেদের উপদেষ্টা ছিলেন। কোষাগার এবং আয়-ব্যয় বিভাগ নিঃসন্দেহে তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এছাড়া খিলাফত প্রাসাদ এবং বাগদাদ শহরের প্রশাসনিক ও পৌর বিষয়গুলো তাদের কাছে ছিল। এগুলো ছিল তাদের স্থায়ী কাজ। এগুলো ছাড়াও হারুন সাময়িকভাবে তাদের যে অভিযান বা দায়িত্ব অর্পণ করতেন, তারা তা সম্পন্ন করতেন। মাঝেমধ্যে তাদের কাউকে মিসর, খোরাসান বা অন্য কোনো প্রদেশের গভর্নর করা হতো, তবে তা ছিল একটি সাময়িক পদ যা খুব দ্রুত পরিবর্তন করে দেওয়া হতো। এটি সত্য যে, তিনি ইয়াহইয়া বারমাকিকে মন্ত্রণালয় দেওয়ার সময় বলেছিলেন:

“আমি প্রজাদের বিষয়াদি আপনার ওপর ন্যস্ত করেছি। আমার ঘাড় থেকে আপনার ঘাড়ে অর্পণ করেছি। আপনি যাকে ইচ্ছা নিয়োগ দিন এবং যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করুন।” [১]

কিন্তু এর অর্থ ছিল বিশেষ বিভাগগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা। এই বিভাগগুলো সেগুলোই ছিল যেগুলোর সম্পর্ক জনস্বার্থ এবং প্রজাদের প্রয়োজনের সাথে ছিল। ঐতিহাসিক রেকর্ডে কোথাও এটি উল্লেখ নেই যে, গভর্নর এবং সামরিক জেনারেলদের নিয়োগ ও বরখাস্তও বারমাকিরা করছিলেন। ব্যবহারিক দিক থেকে পুরো দেশে কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খলিফার হাতেই ছিল যেমন...

[১] “إِذْ قَدْ فُوضَتْ إِلَيْكَ أَمْرُ الرِّعْيَةِ وَخُلِعْتَ ذَلِكَ مِنْ عُنُقِي وَجُعِلَتْهُ فِي عُنُقِكَ، فَوَلَّيْتُ مِنْ رَأْيِي وَأَعْزَلْتُ مِنْ رَأْيِي” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৫৬২)। হারুনের শব্দ “আমরুর রাইয়্যাহ” থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইয়াহইয়াকে প্রজাদের দেখাশোনার বিষয়াদি অর্পণ করা হয়েছিল, সমস্ত ক্ষমতা নয়।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে এই নিয়মই চলে আসছিল। হ্যাঁ, হারুন গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ব্যাপারে বারমাকিদের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে হারুনের অধীনে ছিল। বিদ্রোহ দমন বা জিহাদসহ সমস্ত সামরিক অভিযান তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হতো। হারুন নিজেকে এ ধরনের অভিযানের জন্য অবসর রাখতে চাইতেন। যুবরাজ থাকাকালীন সময় থেকেই তিনি সৈনিক পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রায়শই জিহাদের জন্য বের হতেন। খলিফা হওয়ার পরেও তিনি অশ্বারোহণ ও মুজাহিদসুলভ জীবন পছন্দ করতেন এবং উলামা ও ফুকাহাদের সাথে উঠাবসা তাঁর প্রিয় ছিল। দাপ্তরিক কাজে জড়িয়ে পড়া এবং হিসাব-নিকাশের জট খোলা তাঁর স্বভাবজাত ছিল না; তাই তিনি এ জাতীয় সমস্ত কাজ বারমাকিদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন, যারা নিঃসন্দেহে এই বিভাগগুলোতে দক্ষ ছিল। তিনি নিজে কখনো জিহাদের জন্য বের হতেন, কখনো বিদ্রোহ দমনের জন্য, কখনো হজ ও উমরার জন্য, আবার কখনো কোনো প্রদেশের বিষয়াদি দেখার জন্য। আমাদের এই বিশ্লেষণের সত্যতা হারুনের সেই সফরগুলো থেকে প্রমাণিত হতে পারে যা তিনি তাঁর খিলাফতকালে করেছিলেন। চব্বিশ বছরের খিলাফতকালে মাত্র চার বছর বাদে কোনো বছরই সফর বা অভিযান থেকে খালি ছিল না। এক ঝলক দেখে নিন:

- ১৭০ হিজরি বাগদাদের বাইরে ঈসা আবাদে খিলাফতের বায়আত। হজ সফর।
এরপর জিহাদ সফর।
- ১৭১ হিজরি নতুন শহর গড়ার জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে সফর।
- ১৭২ হিজরি সফরহীন।
- ১৭৩ হিজরি হজ সফর।
- ১৭৪ হিজরি হজ সফর।
- ১৭৫ হিজরি হজ সফর [১]
- ১৭৬ হিজরি হজ থেকে ফেরার পথে বসরা সফর।
- ১৭৭ হিজরি হজ সফর।
- ১৭৮ হিজরি সফরহীন।
- ১৭৯ হিজরি উমরা সফর হজ পালন মদিনায় অবস্থান।
- ১৮০ হিজরি পুনরায় মক্কায় আগমন। বসরা সফর। সিরিয়া সফর রাক্কায় অবস্থান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত।
- ১৮১ হিজরি হজ সফর একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই বছর এশিয়া মাইনরে জিহাদি সফরও করেছিলেন।
- ১৮২ হিজরি হজ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং রাক্কায় অবস্থান।
- ১৮৩ হিজরি সফরহীন।
- ১৮৪ হিজরি রাক্কা থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন।
- ১৮৫ হিজরি সফরহীন।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪৪৯ অনুযায়ী টানা তিন বছর হজ সফর হয়েছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- ১৮৬ হিজরী: হজ সফর।
- ১৮৭ হিজরী: হজ থেকে ফেরার পথে হীরায় অবস্থান, তারপর নৌকায় করে ফোরাত নদী হয়ে আনবার আগমন। তারপর জিহাদের জন্য এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা।
- ১৮৮ হিজরী: শেষ হজ সফর।
- ১৮৯ হিজরী: হজ থেকে ফেরার পথে ‘রানা’ অভিমুখে যাত্রা। সেখানে আলী বিন ঈসা-র সাথে সাক্ষাৎ। ২৭ জিলহজ বাগদাদ আগমন। তারপর বাগদাদ থেকে রাক্কার দিকে যাত্রা।
- ১৯০ হিজরী: রজব মাসে জিহাদের জন্য এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা। বছরের শেষ দিকে প্রত্যাবর্তন।
- ১৯১ হিজরী: রোমানদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে পুনরায় এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা।
- ১৯২ হিজরী: রবিউল আউয়াল মাসে রাক্কা থেকে নৌকায় করে বাগদাদ আগমন। শাবান মাসে খোরাসান সফর।
- ১৯৩ হিজরী: সফর চলাকালীন ইন্তেকাল। [১]

সারকথা হারুনুর রশীদ পুরোপুরি সক্রিয় ও কর্মতৎপর ছিলেন। বারমাকিদের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান কোনো অলসতার কারণে ছিল না, বরং ইসলামী উদারতার নমুনা পেশ করা এবং নিজেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য ছিল।

হারুনের ভুলের উপলব্ধি:

যাইহোক, হারুনের রাজনৈতিক ভুল ছিল এই যে, তিনি বারমাকিদের কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বারমাকির সুযোগের সদ্যবহার করে ক্ষমতার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি, নিজেদের পরিবারকে দেশের দণ্ডমুণ্ডকর্তা বানিয়ে ফেলেছিল এবং তারা এটা ভাবেনি যে, তারা যদি রাজনীতিতে আবু মুসলিম খোরাসানির শিষ্য হয়, তবে হারুনও তো মনসুরের মতো রাজনীতিবিদের সন্তান; সুতরাং পাশা উল্টে যেতে পারে এবং পদমর্যাদার উত্থান পতনের কারণও হতে পারে। হারুনুর রশীদের মতো বিচক্ষণ মানুষ নিজের ভুলের ফলাফল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের ওপর হাত দেননি। কিন্তু একদিন হঠাৎ বিপ্লব এসে গেল। হারুন যে পরিমাণ আস্থা ও দ্রুততার সাথে বারমাকিদের নেতৃত্ব ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তার চেয়েও দ্রুততার সাথে ১৮৭ হিজরীতে হঠাৎ তাদের ক্ষমতাহীন করে দিলেন।

[১] হারুনের সফর সংক্রান্ত এই সমস্ত তথ্য ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বারমাকিদের কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন জাগে যে, শেষ পর্যন্ত বারমাকিদের কী অপরাধ ছিল যে তাদের হঠাৎ সুউচ্চ মর্যাদা থেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলো। এ বিষয়ে বিভিন্ন অনুমান করা হয়েছে, তবে গবেষণালব্ধ কথা হলো এই যে, এই পটপরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের আমিরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফসল ছিল।

রবি হাজিবের পরিবার:

আব্বাসীয় যুগে মন্ত্রিত্ব, অভিজাত্য এবং প্রশাসনিক বিষয়ে আরেকটি পরিবার বারমাকিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এটি ছিল রবি ইবনে ইউনুসের পরিবার, যারা যদিও বারমাকিদের মতো উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারেনি, তবে তারা অবশ্যই সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

রবি ইবনে ইউনুস উমাইয়া আমলের সেই কর্মকর্তাদের বংশধর ছিলেন যাদের বংশধারা হযরত উসমান গনি (রা.)-এর গোলামদের সাথে গিয়ে মিলেছিল। রবি, খলিফা মনসুরের হাজিব অর্থাৎ তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা এবং তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। [১]

পদলিপ্সা এবং এর জন্য অন্যদের নিচে নামানো তার স্বভাবজাত ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিরও তার নিপীড়ন থেকে নিরাপদ ছিলেন না। সে জানত যে ইমাম আবু হানিফা শাসকদের কঠোরতা এবং জনগণের ওপর ধরপাকড়ের বিরোধী ছিলেন। তাই একবার সে ইমাম সাহেবকে ফাঁসানোর জন্য সবার সামনে তাঁকে জিজ্ঞেস করল: “আমিরুল মুমিনীন আমাদের লোকদের হত্যা করার এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন, তবে তাঁর নির্দেশ পালনে আমার কি কোনো গুনাহ হবে?”

ইমাম সাহেব (রহ.) তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন এবং নিজেকে বাঁচিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলেন: “আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশগুলো কি সঠিক (হক) হয় নাকি হয় না?” রবি এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না যে, “জি, সঠিক হয়।” ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন: “যখন তিনি হকের নির্দেশ দেন, তখন তা পালন করলে সওয়াবই হবে।” [২]

এই ঘটনা থেকে রবি হাজিবের স্বভাবের আন্দাজ করা যায় যে, সে কীভাবে অন্যদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে, এমনকি তাদের বিরাগভাজন করে বধ্যভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেও দ্বিধা করত না।

সাফফাহর আমলে বারমাকিদের দাদা খালিদ বারমাকির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু মনসুরের আমলে রবির পাল্লা ভারী হতে থাকে। আবু মুসলিমের হত্যার পর মনসুর সতর্কতা হিসেবে খালিদ বারমাকিকেও মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করেছিলেন এবং রবিকে ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিলেন। ১৫৩ হিজরিতে মনসুর রবিকে উজির বানিয়ে দেন। এটি আলাদা কথা যে, সে তার পূর্বের উপাধি ‘হাজিব’ নামেই পরিচিত ছিল। মনসুরের মৃত্যু...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/৩৩৫, ৩৩৬

[২] আখবারু আবি হানিফা লিস-সাইমারি, পৃ. ৭০

সেই সময় রবি বিন ইউনুস রাজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন; তাই তিনি খলিফা মাহদীর বায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন। [১] মাহদীর শাসনামলেও তিনিই ছিলেন প্রকৃত প্রধান নিয়ন্ত্রক। যদিও উজিরের পদ অন্যদের কাছে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মাহদীর ওপর রবির প্রভাব এতটাই ছিল যে তিনি যখন চাইতেন উজিরদের অপদস্থ করতেন। মাহদীর প্রথম উজির ছিলেন আবু উবায়দুল্লাহ, যিনি সব দিক থেকে যোগ্য, আমানতদার এবং সরকারের অনুগত ছিলেন। কিন্তু রবি মাহদীকে তার প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিলেন যে তিনি তাকে বরখাস্ত করে ছাড়েন। যদিও এরপরও রবি উজিরের পদ পাননি, তবুও মাহদীর কাছে তার আস্থা আরও বেড়ে গিয়েছিল। [২]

মাহদীর মৃত্যুর পর খলিফা হাদীর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে উজিরের পদ ছিল ইব্রাহিম বিন জাকওয়ানের কাছে এবং রবি যথারীতি হাজিব ও সালতানাতে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বহাল ছিলেন। এই যুগে আমরা ইয়াহইয়া বারমাকীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে দেখি; কারণ তিনি খলিফা হাদীর শিক্ষক এবং যুবরাজ হারুনের দুধ-পিতা ছিলেন। যদিও রবি ইয়াহইয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন এবং তার প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতেন, তবে তা ছিল কেবল এই কারণে যে তিনি নিজের এবং তার সন্তানদের মর্যাদা সুরক্ষিত ও সমুন্নত রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি পছন্দ করতেন না যে খলিফার কাছে অন্য কেউ তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করুক। [৩] রবি তার সন্তানদের জন্য উচ্চ পদমর্যাদা চাইতেন। একবার তিনি মনসুরের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যেন তিনি তার ছেলেকে নিজের প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ করে নেন। [৪]

ফজল বিন রবি

রবির মৃত্যুর পর তার ছেলে ফজল বিন রবিও শীঘ্রই সক্রিয় হয়ে ওঠেন, কিন্তু হারুনের শাসনামলে অধিকাংশ ক্ষমতা বারমাকীদের হাতে চলে যায়। ফজল বিন রবি তার পিতার প্রত্যাশা অনুযায়ী বারমাকীদের বিরুদ্ধে কোনো উন্নতি করতে পারেননি। বারমাকীরা তাকে কোনো পদ পেতে দেয়নি এবং সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছিল। এই পরিস্থিতিতে ফজল বিন রবি বারমাকীদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন। [৫]

দীর্ঘ বছর পর ফজল বিন রবির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় যখন ১৭৯ হিজরিতে হারুনুর রশিদ তাকে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বারমাকীর স্থলে হাজিব নিযুক্ত করেন। [৬] এভাবে ফজল বিন রবি হারুনের সাথে বসার সুযোগ পান। তবে তার পক্ষে বারমাকীদের বিরুদ্ধে হারুনের কান ভারী করা সম্ভব ছিল না; কারণ বারমাকীরা তাদের হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার রাখতেন এবং কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ দিতেন না। হারুনেরও তাদের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ফজল বিন রবি তাদের তুলনায় কোনো গুরুত্বই রাখতেন না। বারমাকীরা ফজল বিন রবির মতো আমিরদের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করে দিতেন।

এই বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, একবার ফজল বিন রবি জনগণের দশটি আবেদন নিয়ে উজিরের দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে ইয়াহইয়া বারমাকীর নির্দেশ অনুযায়ী আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য জাফর বারমাকীর মোহর প্রয়োজন ছিল। ফজল বিন রবির আবেদনগুলো না দেখেই ফেরত দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফিরে আসেন যাতে অশুভ পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

[১] তারিখুত তাবারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১২, ১১৬, ১৫৮ হিজরির অধীনে।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪৪৭; তারিখুত তাবারী, বছর ১৫৮ হিজরি, ১৫৯ হিজরি।

[৩] ওফায়াতুল আইয়ান, ২৭/৪, ফজল বিন রবি।

[৪] তারিখুত তাবারী, ১৩৯/৮, বছর ১৬১ হিজরি।

[৫] ওফায়াতুল আইয়ান, ২৯৪/২।

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ৪৬৫; তারিখুত তাবারী, বছর ১৭৯ হিজরি।

তারিখে মিল্লাত

ছিল। এ কথা শুনে ইয়াহইয়া বারমাকি তাকে ডাকলেন এবং আবেদনগুলো মঞ্জুর করে নিলেন। [১]

যদিও ফজল বিন রবি সেই সময় বারমাকিদের সম্মান-মর্যাদা ও ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারতেন না, তবুও তিনি সুযোগের সন্ধানে ছিলেন যে, কখন হারুনের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার এবং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

বারমাকিদের সম্পর্কে হারুনের সন্দেহ ও সংশয়:

এদিকে জাফর বারমাকিকে অসাধারণ ক্ষমতা অর্পণ করার কয়েক বছর পর হারুনকেও বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও সংশয় ঘিরে ধরতে শুরু করে; কারণ বারমাকিরা যে ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, তাতে তারা বনু আব্বাসের জন্য চরম বিপদের কারণও হতে পারত। হারুন দেখছিলেন যে, বারমাকিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপারিসীম এবং তাদের সম্পদ ধারণাতীত।

হারুন অধিকাংশ সময় সফরে থাকতেন। যে গ্রাম, জায়গির বা বাগানের পাশ দিয়ে তিনি যেতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন যে এটি কার মালিকানাধীন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উত্তর পাওয়া যেত: ‘জাফর বারমাকির।’ [২]

জাফর বারমাকি তার নতুন বাসভবনের জন্য বিশ লক্ষ দিরহাম (প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা) ব্যয় করেছিলেন। হারুনের কাছে এই অপচয় এবং রাজকীয় ব্যয়গুলো মাঝে মাঝে অসহনীয় মনে হতো। [৩]

তার মনে বারমাকিদের সম্পর্কে অদ্ভুত সব চিন্তা আসত। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দীর্ঘ সময় ধরে হারুন পরস্পরবিরোধী মানসিক অবস্থা ও প্রবণতায় লিপ্ত ছিলেন। একদিকে বারমাকিদের সাথে গভীর সম্পর্ক, তাদের প্রশংসনীয় সেবা, ওস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্ক, দুগ্ধ-সম্পর্ক (রেজায়ি), বছরের পর বছরের বন্ধুত্ব, স্বাভাবিক ভালোবাসা এবং চমৎকার সাহচর্য... অন্যদিকে বংশগত ক্ষমতা হঠাৎ ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়, কারাবরণের কষ্টের আশঙ্কা, জনগণের মাঝে নিজের হীনম্মন্যতা এবং নিজের অধীনস্থদের অধিক জনপ্রিয়তার অনুভূতি।

কোনো কোনো সহচরের কথাবার্তা তার এই আশঙ্কাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিত। জাতির কিছু আলেমও হারুনকে সতর্ক করতেন যে, তিনি বারমাকিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে নিজের দুনিয়া ও আখেরাত নষ্ট করছেন। বাগদাদের নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন লাইস রহ. (মৃত্যু ২৫১ হিজরি) তার এক পত্রে লিখেছিলেন:

“আপনি নিজের এবং আল্লাহর মাঝে বারমাকিকে আড়াল বানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু কাল যখন আপনি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবেন, তখন সে আপনার কোনো কাজে আসবে না। যখন আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনি তাঁর বান্দাদের এবং তাঁর শহরগুলোকে কীভাবে পরিচালনা করেছেন? তখন কি আপনি জবাবে বলবেন যে, আমি বান্দাদের বিষয়াদি ইয়াহইয়া বারমাকির হাতে সোপর্দ করে রেখেছিলাম? এই জবাব কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে!!”

হারুন সেই সময় বারমাকিদের ভালোবাসায় অভিভূত হয়ে পত্রটি ইয়াহইয়া বারমাকির হাতে তুলে দেন এবং যখন ইয়াহইয়া নিজের কর্মকাণ্ডকে সন্দেহমুক্ত প্রমাণের জন্য মুহাম্মদ বিন লাইসের ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন হারুন কোনো কিছু চিন্তা না করেই মুহাম্মদ বিন লাইসকে...

[১] শাজারাতুজ জাহাব: ২/২১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮৭ হিজরি

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/২৯১

জেলে নিক্ষেপ করিয়ে দিলেন। [১]

কিন্তু অন্য সময়ে যখন মুহাম্মদ বিন লাইসের মতো লোকদের কথা তার মনে প্রতিধ্বনিত হতো, তখন সে বারমাকিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করত। এমন পরিস্থিতিতে তার দুধ-পিতা ইয়াহইয়া বারমাকিও যখন তার অভ্যাস অনুযায়ী অনুমতি ছাড়াই দরবারে চলে আসত, তখন হারুন বিরক্তি প্রকাশ করত। আবার নিজের এই আচরণের জন্য নিজেই লজ্জিত হতো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত। [২]

বারমাকিরা কি সত্যিই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল?

ইতিহাসে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বারমাকিরা সত্যিই বিদ্রোহের কোনো পরিকল্পনা করছিল কি না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তারা জ্যোতিষী ও মজুসিদের (অগ্নিউপাসক) প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছিল; এই কারণেই জাফর বারমাকি একজন মজুসি ফজল বিন সাহলকে যুবরাজ মামুনের রশিদের খাস খাদেম নিযুক্ত করেছিল, যে হারুনের মৃত্যুর পর আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী উজির হয়েছিল।

এই দিকগুলো বিবেচনা করেই হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) এক জায়গায় লিখেছেন:

“বলা হয়েছে যে, বারমাকিরা হারুনের খিলাফত খতম করার এবং জিন্দিকপনা (ধর্মহীনতা) প্রকাশ করার সংকল্প করেছিল।” [৩]

তবে ইতিহাসের পাতাগুলো তাদের ষড়যন্ত্রের কোনো অকাট্য প্রমাণ দিতে অক্ষম। সম্ভবত বারমাকিরা এতটাই চতুর ছিল যে তারা কোনো প্রমাণ হাতে লাগতে দেয়নি।

হারুনের সন্দেহের প্রথম প্রধান কারণ:

এমনিতে হারুনের শাসনামলে বারমাকিরা যে ক্ষমতা ভোগ করত তা রাজত্বের চেয়ে কম ছিল না; তাই তাদের খিলাফতের মসনদ দখল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা সরকারকে ধর্মহীনতার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই শেষ দিনগুলোতে হারুন বারমাকিদের চরম সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। আমরা হারুনের মতো একজন সতর্ক, দয়ালু ও উদার মানুষের এই সন্দেহগুলোকে উপেক্ষা করতে পারি না এবং বুঝতে পারি যে ভেতরে ভেতরে কোনো খিচুড়ি পাকছিল যা হারুনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনুভব করে নিয়েছিল।

কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন যে বারমাকিরা সমস্ত বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখছে; তাই তিনি তার সন্দেহ এক মুহূর্তের জন্যও বারমাকি বা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে প্রকাশ হতে দেননি; ফলে বারমাকিরা তার মানসিক টানাপোড়েন সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি। যদি কখনো তারা সতর্ক হতে শুরু করত, তবে হারুন তৎক্ষণাৎ দয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিতেন। তার আশঙ্কা ছিল যে, বারমাকিরা যদি এই অবিশ্বাসের কথা টের পেয়ে যায়, তবে তারা সরাসরি পদক্ষেপ নিতে অগ্রণী হবে।

ইয়াহইয়া এবং তার ছেলেদের ওপর তার অনুগ্রহ একইভাবে অব্যাহত ছিল, তবে জাফর বারমাকি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে হারুন কিছুটা বদলে গেছেন; কারণ তার সিরিয়াস কথাগুলোকে এখন হারুন ঠাট্টায় উড়িয়ে দিতেন এবং তার ঠাট্টার বিষয়ে সিরিয়াস হয়ে যেতেন। [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/২৮৮

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৮৭ হিজরি

[৩] তারিখুত তাবারী: ৮/২৮৭

[৪] তারিখুত তাবারী: ৮/২৯১, ২৯২

হারুনের সন্দেহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

হারুনের সন্দেহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সেই সব অভিযোগ যা বারমাকিদের বিরোধীদের পক্ষ থেকে হারুনের কাছে পৌঁছাত। যদিও এই বিরোধীরা সংখ্যায় অল্পই ছিল।

ফজল বিন রবী’র পর বারমাকিদের দ্বিতীয় বড় বিরোধী ছিল আলী বিন ঈসা বিন মাহান। সে মনসুর, মাহদী এবং হাদীর শাসনামলে প্রাসাদের দারোগা ছিল। সে খলিফাদের একনিষ্ঠ অনুগত ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিল। মনসুরের মৃত্যুর পর সকল আমীরদের কাছ থেকে মাহদীর বায়াত গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সরকারের বিরোধীদের দমন করতে এবং বিশেষ করে যিনদীকদের নির্মূল করতে সে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। হারুন ১৮০ হিজরিতে তাকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন ইয়াহইয়া বারমাকি। সম্ভবত এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যেখানে হারুন কোনো বিষয়ে তার মতের সাথে একমত হননি। কিছুকাল পর যখন আলী বিন ঈসা রাজস্ব বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠালেন, তখন হারুন ইয়াহইয়া বারমাকিকে বললেন: “এ সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তুমি পরামর্শ দিয়েছিলে যে তাকে শাসক না বানাতে; আমরা তোমার মতের সাথে একমত হইনি বলেই এতে বরকত হয়েছে।”

ইয়াহইয়া বারমাকি জবাবে অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, রাজস্বের এই বিশাল পরিমাণ কেবল জনগণের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

এরপর খোরাসান থেকে জনগণের ওপর আলী বিন ঈসার জুলুম ও নির্যাতনের অভিযোগ সম্বলিত চিঠি খেলাফতের কেন্দ্রে পৌঁছাতে শুরু করল। এটিও রটানো হলো যে আলী বিন ঈসা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত। আপাতদৃষ্টিতে জনগণের ওপর বাড়াবাড়ির কিছু অভিযোগ সঠিক ছিল; কারণ আলী বিন ঈসার মেজাজ ছিল কঠোর, কিন্তু মনে হয় যে বারমাকির বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরছিলেন; কারণ চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ প্রতিটি বিভাগ তাদের হাতেই ছিল। সম্ভবত এই কারণেই হারুন এই চিঠিগুলো পড়ে ইয়াহইয়া বারমাকি’র পরামর্শের বিপরীতে আলী বিন ঈসাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করেননি, বরং প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য নিজেই খোরাসানের কেন্দ্র “মার্ত”-এর দিকে রওনা হলেন, সেই সাথে আলী বিন ঈসাকে লিখে দিলেন যেন সে সাক্ষাতের জন্য মার্ত থেকে রওনা হয়। এটি ১৮৩ হিজরির ঘটনা।

হারুন ‘রে’ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যখন আলী বিন ঈসা এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে হারুনকে অত্যন্ত মূল্যবান উপটোকন পেশ করল এবং সমস্ত অভিযোগের ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করল। এটি প্রমাণিত হলো যে তার সম্পর্কে বিদ্রোহী মনোভাবের তথ্যগুলো মিথ্যা।

হারুন কেবল তাকে খোরাসানের শাসনভারেই বহাল রাখলেন না, বরং সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে বিদায় জানাতে তার সাথে পায়ে হেঁটে চললেন।

এরপর ১৮৬ হিজরিতে আলী বিন ঈসা আবুল খাসীব নামক এক সরকার বিরোধী আমীরকে দমন করে হারুনের প্রতি তার আনুগত্যের প্রমাণ দিল। [১]

যেহেতু আলী বিন ঈসার সাথে বারমাকিদের এখন শত্রুতা তৈরি হয়েছিল; তাই সে তাদের কোনো দুর্বলতা জানতে পারলেই হারুনুর রশীদকে খবর পৌঁছে দিত। একদিন সে খবর পেল যে ইয়াহইয়া বারমাকি’র ছেলে মুসা খোরাসানে বিদ্রোহ ঘটাতে যাচ্ছে; কারণ সেখানে এই পরিবারের...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৮/১১২, ১১৩, ১৭৭, ১৮৯, ২৬৬, ৩১৭, ৩১৫, ৩১৬, ২৭০, ২৭৫।

...এই খবর হারুনকে দিয়ে দিলেন। আলী ইবনে ঈসা এই খবর হারুনকে দিয়ে দিলেন।

আল্লাহ ভালো জানেন এই তথ্য সঠিক ছিল কি ভুল। কিন্তু হারুন, যিনি আগে থেকেই সন্দেহ ও সংশয়ে ঘেরা ছিলেন, এটি শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য মুসা বারমাকিকে খুঁজতে পাঠালেন, তখন জানা গেল যে তিনি নিখোঁজ। যদিও বারমাকিদের সমর্থকরা বলছিল যে তিনি কোনো পাওনাদারের ভয়ে আত্মগোপন করেছেন, কিন্তু বারমাকিদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কোনো সদস্যের ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং তারপর পাওনাদারদের ভয়ে লুকিয়ে থাকা বোধগম্য ছিল না; তাই হারুনের বিশ্বাস ছিল যে মুসা বারমাকি বিদ্রোহ উস্কে দিতে খোঁজা গিয়েছেন।

পরে মুসা ধরা পড়লেন। যদিও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবুও হারুন সতর্কতামূলকভাবে তাকে নজরবন্দি করে রাখেন। এরপর যখন তার মা অর্থাৎ হারুনের দুধ-মা সুপারিশ করতে এলেন, তখন হারুন বাধ্য হলেন এবং মুসা বারমাকিকে ক্ষমা করে দিলেন। [১]

তবে হারুন এমন গাফেল ছিলেন না যে এই ঘটনার পরেও বারমাকিদের ওপর আগের মতোই আস্থা বজায় রাখবেন। প্রকৃতপক্ষে এরপর তার বিশ্বাস পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছিল। এরপর যেকোনো ঘটনাই তাকে বারমাকিদের নির্মূল করতে বাধ্য করতে পারত। কিছুদিন পর এমনই একটি ঘটনা ঘটল, যার পর হারুনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ হাশেমিকে হারুন জাফর বারমাকির তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন; কারণ হারুন তার পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা করতেন। জাফর বারমাকি তাকে গোপনে মুক্তি দিয়ে দেন। হারুন টেরই পাননি যে কী ঘটে গেছে। ভাগ্যের পরিহাস যে, এক মুসাফির সেই হাশেমিকে কোনো এক সরাইখানায় দেখে ফেলেন এবং চিনে ফেলেন। তিনি দ্রুত বাগদাদে এলেন, খিলাফত প্রাসাদে পৌঁছালেন এবং দারোয়ানকে বললেন যে খলিফাকে বলুন আমি একটি উপদেশ দিতে চাই।

হারুন তখন ইয়াহইয়া বারমাকি এবং সালতানাতের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথনে মগ্ন ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে আলাদা ডেকে নিয়ে ঘটনাটি জিজ্ঞেস করলেন। যখন তিনি জানালেন যে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ হাশেমিকে মুক্ত অবস্থায় দেখা গেছে, তখন হারুন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি হাশেমির চেহারা ও আকৃতি এবং বেশভূষা থেকে শুরু করে আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। সংবাদদাতা সঠিক উত্তর দিলে হারুন শুধু নিশ্চিতই হলেন না, বরং জাফর বারমাকির এই দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

হারুন তৎকালীন সময়ের একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ছিলেন, সেই মুহূর্তে সতর্কভাবে প্রকাশ করে বারমাকিদের সচেতন করে দেওয়ার ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি। তাদের লোক প্রাসাদের প্রতিটি কোণায় উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি সংবাদদাতাকে বললেন: “যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে গিয়ে তোমাকে কোনো কষ্ট সহ্য করতে হয়, তবে কি তা করবে?”

তিনি বললেন: “মনেপ্রাণে।”

হারুন তাকে দুই হাজার দিনারের একটি খলি পুরস্কার হিসেবে দিলেন এবং বললেন: “এটি তোমার চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখো।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/২৯৩

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

তারপর আওয়াজ দিয়ে গোলামদের ডাকলেন। প্রথমে সেই সংবাদদাতাকে শুইয়ে দিলেন, তারপর কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বললেন: “একে ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও এবং ঘোষণা করে দাও যে, যে কেউ আমিরুল মুমিনিনের বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তার এই শাস্তিই হবে।” গোলামরা আদেশ পালন করল।

এদিকে ফজল বিন রাবিও জানতে পেরেছিলেন যে জাফর বারমাকি হাশেমি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনিও গিয়ে হারুনুর রশিদকে সংবাদ দিলেন। হারুন এখানেও কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন: “তোমার এতে কী? হতে পারে জাফর আমার ইচ্ছাতেই তাকে মুক্তি দিয়েছে।” [১]

হারুনের উদ্দেশ্য ছিল কেবল এটাই যে, বারমাকিরা যেন বুঝতে না পারে যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগে বিশ্বাস করা হয়েছে। পরের দিন তিনি জাফর বারমাকিকে নাস্তার জন্য ডাকলেন এবং কথার ছলে হাশেমি বন্দির অবস্থা জানতে চাইলেন।

জাফর বললেন: “সে আগের মতোই কারাগারে পড়ে আছে।”

হারুন বললেন: “আমার মাথার কসম খেয়ে বলো।”

জাফর বুঝতে পারলেন যে হারুন সত্য জেনে গেছেন এবং এখন মিথ্যা বলা মারাত্মক হবে। তিনি বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে সে মৃতপ্রায়। তার থেকে কোনো বিপদ নেই।”

হারুন নিশ্চিত মনে বললেন: “তুমি যা করেছ ভালোই করেছ।”

এরপর এদিক-সেদিকের কথা বলে জাফরকে বিদায় দিলেন। যখন সে দূরে চলে গেল, তখন হারুন তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: “আমি যদি তাকে হত্যা না করাই, তবে আল্লাহ যেন আমাকে কুফরি অবস্থায় ইসলামের তলোয়ার দিয়ে ধ্বংস করেন।”

কিন্তু হারুন তখন কিছুই করলেন না। বারমাকিদের তিনি একদম নিশ্চিত রাখলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে ‘সব ঠিক আছে’ এমন ভাব দেখিয়ে সব শাহজাদাসহ হাজার জন্য চলে গেলেন। এটি ১৮৬ হিজরির ঘটনা। [২]

উত্তরাধিকার ঘোষণা:

হাজার সময় তিনি সেখানে সাধারণ সমাবেশে তাঁর পুত্রদের উত্তরাধিকারের ক্রম এভাবে নির্ধারণ করলেন যে, প্রথমে আমিনুর রশিদ শাসক হবেন, তারপর মামুনুর রশিদ। এরপর যদি মামুন রাজি থাকেন তবে তৃতীয় পুত্র কাসিমুর রশিদ উত্তরাধিকারী হবেন।

উত্তরাধিকারের এই ক্রমে হারুনের স্ত্রী জুবাইদা খাতুনের জেদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্যথায় রাজনীতির মূলনীতির দাবি ছিল যে কেবল বড় ছেলে মামুনকে উত্তরাধিকারী করা হোক, যার বয়স তখন ছিল সতেরো বছর। তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায়ও ছিলেন অসাধারণ। হারুন নিজেও তাকেই পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এক দাসীর গর্ভজাত; তাই জুবাইদা খাতুন তাঁর নিজের ছেলে মুহাম্মদ আমিনুর রশিদকে উত্তরাধিকারী করার জন্য জেদ ধরেছিলেন। হারুন জুবাইদাকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি; তাই তিনি এই কৌশল বের করলেন যে প্রথমে আমিন এবং তারপর মামুন পর্যায়ক্রমে...

[১] তারিখ আল-তাবারী: ৮/২৯০, ২৯১, ২৮৯

[২] তারিখ আল-তাবারী: ৮/২৮৯

উত্তরাধিকারী হবেন এবং মামুন চাইলে তার পরে কাসেমকে উত্তরাধিকারী করতে পারেন। হারুনের যেহেতু এই আশঙ্কাও ছিল যে, আমিন খলিফা হওয়ার পর বাকি ভাইদের সাথে অবিচার না করে; তাই উত্তরাধিকারের বায়আত নেওয়ার সাথে সাথেই তিনি সাম্রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দিলেন: বাগদাদ, ইরাক এবং সিরিয়া আমিন আল-রশিদের নামে করে দিলেন। মামুনকে খোরাসান ও পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর এবং কাসেমকে আল-জাজিরা ও উত্তর ও পশ্চিমদিকের প্রদেশগুলোর আজীবন শাসক বানিয়ে দিলেন যাতে প্রথম উত্তরাধিকারী শাসক হওয়ার পর অন্য ভাইদের সেখান থেকে অপসারিত করতে না পারে। মজার ব্যাপার হলো, হারুনের চতুর্থ পুত্র মুতাসিমকে উত্তরাধিকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যার বয়স তখন ছিল ছয় বছর। সে অল্পবয়সী এবং লেখাপড়ায় অত্যন্ত স্কলবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল; তাই তাকে কোনো যোগ্য মনে করা হয়নি। কিন্তু আল্লাহর মহিমা যে, পরবর্তীতে মুতাসিম কেবল বনু আব্বাসের একজন অত্যন্ত নামী খলিফাই হননি, বরং ভবিষ্যতে আব্বাসীয় খিলাফত তার বংশধরদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছিল।

উত্তরসূরি নিয়োগ এবং সাম্রাজ্য বিভাজন সংক্রান্ত হারুনের সিদ্ধান্ত তার দৃষ্টিতে যতই দূরদর্শী হোক না কেন, বাস্তবতা হলো এর পরিণাম ভালো হয়নি। বিজ্ঞজনরা তখনই বলেছিলেন যে, সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, যার খেসারত প্রজাদের দিতে হবে। [১]

নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্য বিভাজনের ফলে যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল, তা হারুনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বাস্তবে রূপ নেয় এবং বিশ্ব দেখল যে, আমিন ও মামুনের মধ্যে প্রথমে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং তারপর পারস্পরিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

বারামিকাদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা:

উত্তরাধিকার এবং সাম্রাজ্য বিভাজনের ঘোষণার পর ১৮৭ হিজরির শুরুতে হারুন হজ থেকে ফেরার পথে রওয়ানা হলে জাফরের হত্যা এবং বাকি বারামিকাদের বন্দি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন, তা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে তিনি মাথার ওপর বিদ্রোহের তলোয়ার ঝুলতে দেখছেন। কেউ ভাবতে পারত না যে, কেন্দ্রে এত বড় বিপ্লবের সংকল্প করা ব্যক্তি শাহজাদাদের নিয়ে তিন-চার মাস হজের সফরে থাকতে পারেন এবং সেখানে নিশ্চিন্তে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব শাহজাদাদের হাতে অর্পণ করতে ব্যস্ত থাকতে পারেন; তাই বারামিকাদের কল্পনাতেও ছিল না যে কী হতে চলেছে।

বারামিকাদের নির্মূল করা অত্যন্ত নাজুক বিষয় ছিল। এতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল: প্রথমত, বারামিকারা যেন টের না পায়। দ্বিতীয়ত, এই অভিযানে অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকদের কাজে লাগানো। অভিযানের পরিকল্পনায় ফজল বিন রবি এবং তার ছেলে আব্বাস, ফজল অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বারামিকা পরিবারের চিরশত্রু ছিলেন। হারসামা বিন আয়ান এবং তার খাস খাদেম মাসরুর কবির ছাড়া বাগদাদের অন্য কোনো অফিসারের ওপর হারুনের বিশ্বাস ছিল না যে তারা বারামিকাদের ওপর হাত তোলার সাহস করবে।

হারুন মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে ফোরাত নদীতে পৌঁছালেন এবং এখান থেকে নৌকায় ভ্রমণ করে বাগদাদের পথ ধরলেন। এর থেকে

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১৭, ত. মাকতাবা নিযার।

এর আগে তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা সিন্দী বিন শাহককে একটি চিঠি পাঠিয়ে একদল সৈন্যসহ অবিলম্বে নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সিন্দী বিন শাহক ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছালেন। হারুন তখন নৌকায় বসা ছিলেন। ফজল বিন রবী’র ছেলে আব্বাস তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হারুন সিন্দী বিন শাহককে নৌকায় ডেকে নির্জনে সাক্ষাৎ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি জানো আমি তোমাকে কেন ডেকেছি?”

সে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে হারুন বললেন: “এটি এমন এক কাজ যে, যদি আমার জামাও এ সম্পর্কে জেনে যায়, তবে আমি তাকেও ফোরাত নদীতে ফেলে দেব।” এরপর হারুন তাকে অবিলম্বে বাগদাদ পৌঁছে সৈন্যদল নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: “বিউগল বাজার সাথে সাথেই বারমাকিদের প্রাসাদগুলো ঘেরাও করে ফেলবে।” [১]

এবার হারুন বাগদাদে পৌঁছালেন। তিনি বারমাকিদের বিন্দুমাত্র সতর্ক হতে দেননি। সন্ধ্যার শুরুতে জাফর বারমাকিকে সাথে নিয়ে পানাহার করে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিদায় দিলেন। এরপর তার বাড়িতে উপহারও পাঠালেন।

এটি ছিল ১৮৭ হিজরির ১লা সফরের রাত। কেউ জানত না যে এটিই বারমাকিদের বিস্ময়কর জাঁকজমক এবং চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যের শেষ বলক। রাতের কোনো এক প্রহরে বিউগল বেজে উঠল এবং বিশেষ বাহিনী বারমাকিদের প্রাসাদগুলো ঘিরে ফেলল। হারসামা বিন আয়ুন জাফর বারমাকির বাসভবনে প্রবেশ করে তাকে গ্রেপ্তার করল। তাকে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো।

পরিবারের প্রধান ইয়াহইয়া বারমাকিকে তার বাকি ছেলেদেরসহ কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। ইয়াহইয়া বারমাকি এবং তার ছেলে ফজল কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে মুহাম্মদ এবং মুসাকে পরবর্তীতে হারুনের ছেলে আমিন মুক্তি দেন এবং তাদের বাকি জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত হয়। [২]

এটি ছিল সেই পরিবারের উত্থান ও পতনের কাহিনী যাদের হাতে অর্ধশতাব্দী ধরে বনু আব্বাসের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অনেক পাতা লেখা হয়েছিল, কিন্তু এর পরিণতি এমন হলো যে শিক্ষা গ্রহণকারীও থমকে যায়।

বারমাকিদের হত্যাকাণ্ড, সঠিক না ভুল?

আমরা অনুমান নির্ভরতা এড়িয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ বিষয়টি গবেষণামূলকভাবে উপস্থাপন করেছি। এটি পড়ে যে কেউ আন্দাজ করতে পারেন যে:

- ১. হারুনের বারমাকিদের বিদ্রোহের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।
- ২. যদিও আপাতদৃষ্টিতে বারমাকির খলিফার অনুগত ছিল, কিন্তু হারুনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত পদক্ষেপ এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও নিপুণতার সাথে তাদের দমন করা এটিই প্রকাশ করছে যে, তার কাছে বারমাকিদের ষড়যন্ত্রের কিছু অকাট্য তথ্য ছিল।

এটি তো বিষয়ের সেই দিক ছিল যা আমরা হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি।

মগর এই বিষয়ের আরেকটি দিকও আছে। আমাদের ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে সেটিও উপেক্ষা করা উচিত নয়। তা হলো, যদি বারমাকিদের কোনো প্রকাশ্য পদক্ষেপ সমালোচনার যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তা ছিল এই যে তারা আজমিদের (অনারবদের) প্রাধান্য দিচ্ছিল। বারমাকিদের পক্ষ থেকে খলিফা...

[১] তারিখ আত-তবারী: ৮/২৯৮

[২] তারিখ আত-তবারী ৮/২৯৬ থেকে ২৯৭

সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করার মাত্র একটি ঘটনাই পাওয়া যায়, আর তা হলো ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ হাশেমীর মুক্তি। যেখানে অনারবদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগের কথা আসে, সেখানে এটি কেবল বারমাকিদের দোষ ছিল না, বরং এতে খলিফাদের সম্মতি অথবা অন্তত নীরবতা অবশ্যই शामिल ছিল। যদি খলিফারা অনারবদের নিয়োগ অপছন্দ করতেন, তবে তারা বারমাকিদের নিষেধ করতে পারতেন। তারা চাইলে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেবল আরবদেরই রাখতে পারতেন; কারণ তাদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়নি। মনসুর, মাহদী বা হারুন অনেকবার নিজেরাই বারমাকিদের বিভিন্ন পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন অথবা তাদের বদলি করেছেন।

এমতাবস্থায় বারমাকিদের সাথে যা ঘটেছে, তাতে যদি খোদ আব্বাসীয় যুগের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন, তবে তা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। মানলাম যে, হারুন নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে বারমাকিদের কোনো বিদ্রোহী ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু শাস্তি দেওয়ার আইনি পদ্ধতি ছিল তাদের গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা এবং তাদের অপরাধের প্রমাণ পেশ করা, যাতে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কারো মনে তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে। এতেই খিলাফতের পদের মর্যাদার সুরক্ষা এবং খলিফার নিজের সুনাম নিহিত ছিল। বিচারবহির্ভূত শাস্তি সবসময় সরকারকে কলঙ্কিত করে, অভিযুক্তকে নয়।

আমাদের এই বিষয়ের এই দিকটিও সামনে রাখা উচিত যে, বারমাকিদের বিরোধী আমীরগণ এই পটপরিবর্তনে সমানভাবে অংশীদার ছিলেন। যেমন অধিকাংশ ঐতিহাসিক বারমাকিদের ধ্বংসের জন্য ফজল বিন রবি’কে দায়ী করেছেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “সে বারমাকিদের অপছন্দ করত; তাই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে।” [১]

আল্লামা মাকরিজি (রহ.) ফজল বিন রবি’ এবং বারমাকিদের মধ্যকার উত্তেজনার কথা উল্লেখ করে লিখেন: “বারমাকিদের ধ্বংস তার হাতেই এসেছিল।” [২]

আলী বিন ঈসার এতে যে ভূমিকা ছিল, তা উপরে বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। আব্বাসীয় রাষ্ট্রের কাতিব ইসমাইল বিন সবিহ-এরও এতে যথেষ্ট বড় অংশ ছিল। সেই যুগের একজন জ্ঞানীর বক্তব্য ছিল: “যখন আল্লাহ কোনো জাতির ধ্বংস এবং তাদের সমৃদ্ধির পতনের ফয়সালা করেন, তখন তিনি তার কারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন। বারমাকিদের পতনের কারণসমূহ ছিল এই যে, তারা ফজল বিন রবি’-এর মর্যাদা কমিয়েছিল, ফজল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, সে খলিফার কাছে বসার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল, সে খলিফাকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল এবং কাতিব ইসমাইল বিন সবিহ খলিফাকে এর জন্য প্ররোচিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার ছিল তা-ই হলো।” [৩]

একটি ভিত্তিহীন গল্প এবং তার বাস্তবতা:

বারমাকিদের ধ্বংস সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনার রস আশ্বাদনের জন্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কিছু গল্প বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ গল্প হলো এই যে, হারুনুর রশীদ এবং জাফর বারমাকি প্রতিদিন একসাথে বসে মদ্যপান করতেন এবং আনন্দ-উল্লাসের সেই আসরে হারুনুর রশীদের বোন আব্বাসাও শরিক হতেন। ধীরে ধীরে জাফর ও আব্বাসার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

[১] সিয়রু আলামিন নুবাল: ১০৯/১০

[২] শাযারাতুয যাহাব: ২১/২

[৩] ওফয়াতুল আইয়ান: ৩৭/১, ত ত দার সাদির

হারুন যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি জাফর ও আব্বাসার বিবাহ করিয়ে দিলেন যাতে জাফরের জন্য আব্বাসাকে দেখা শরীয়তসম্মত হয়। সাথে সাথে হারুন শর্ত জুড়ে দিলেন যে তারা দুজনে কখনো নির্জনে মিলিত হবে না এবং একে অপরকে দেখা বা কথা বলা ছাড়া আর কিছু করবে না। পরবর্তীতে জাফর ও আব্বাসা এই শর্তে অটল থাকতে পারেননি এবং নির্জনে মিলিত হন। হারুন যখন এটি জানতে পারলেন তখন রাগে ফেটে পড়লেন এবং পুরো বারমাকি পরিবারকে তার প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানালেন।

এই গল্পটি হারুনুর রশিদের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে তৈরি করা হয়েছে এবং তারিখ-ই-তাবারিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গবেষণার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। সনদের দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল কারণ জাহির বিন হারব নামক এক অজ্ঞাত বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন। যুক্তিগতভাবে এটি নিম্নলিখিত কারণে অগ্রহণযোগ্য:

১. হারুনুর রশিদ একজন মুত্তাকী এবং তাহাজ্জুদ গুজার খলিফা ছিলেন, তার কাছ থেকে এমন আশা করা যায় না যে তিনি মদ ও কাবাবে মগ্ন হয়ে রাত কাটাবেন। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) বলেন:

“হারুনুর রশিদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকা তার সমসাময়িকদের মধ্যে একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। এটি প্রমাণিত যে যখন তিনি কবি আবু নুয়াসকে মদ্যপানের কথা জানতে পারেন, তখন তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দী করে রাখেন যতক্ষণ না সে তওবা করে। হ্যাঁ! তিনি আহলে ইরাকের মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী নাবীয পান করতেন। যেখানে মদ্যপানের প্রশ্ন আসে, সেখানে হারুনের ওপর অপবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। না এমন ভিত্তিহীন খবরে বিশ্বাস করা উচিত। হারুন এমন ব্যক্তি ছিলেন না যে কবির গুনাহের মতো এমন বড় গুনাহে লিপ্ত হবেন।” [১]

২. হারুনের বোন আব্বাসা একজন পর্দানশীন হাশেমী নারী ছিলেন, বর্তমান যুগের কোনো “সোসাইটি গার্ল” ছিলেন না। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন যাদের ইন্তেকাল হয়ে এক শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল। এটি পুরো পরিবার এমনকি আব্বাসার বাবা ও দাদা মাহদী ও মনসুরও ব্যক্তিগত জীবনে পরহেজগার, ইবাদতগুজার এবং আমোদ-প্রমোদ থেকে দূরে ছিলেন। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) আব্বাসার অভিজাত্য ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ করে বলেন:

“যদি এই পরিবার (বনী হাশেম) থেকেই পবিত্রতা উঠে যায় তবে তা আর কোথায় পাওয়া যাবে? যদি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা তার আপন কেন্দ্র থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে আর কোথায় এবং কীভাবে পাওয়া যাবে?” [২]

এটিও মনে রাখা উচিত যে আব্বাসা বিবাহিত ছিলেন। তার প্রথম বিবাহ হারুন বিন মুহাম্মদের সাথে হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ইব্রাহিম বিন সালেহর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যিনি সিরিয়ার গভর্নর এবং হারুনুর রশিদের চাচাতো ভাই ছিলেন। [৩]

৩. জাফর বারমাকিও অভ্যাস ও চরিত্রের দিক থেকে দ্বীনদার ও পরহেজগার ছিলেন। তিনি কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং ওলামা ও ফুকহাদের সাথে তার উঠাবসা ছিল। [৪] ধারণা করা যায় না যে তিনি এমন নিচু কাজে লিপ্ত হবেন।

[১] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ২৫

[২] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ২১

[৩] আনসাবুল আশরাফ: ৬৩/২

[৪] তারিখ-ই-বাগদাদ: ৫২/৭

এই কাহিনীতে এই বিষয়টিও অসম্ভব যে, হারুন একদিকে শরীয়তের এতই পরোয়া করেন যে জাফরের জন্য আব্বাসাকে দেখা জায়েজ মনে করেন এবং একে শরীয়তসম্মত করার জন্য উভয়ের বিবাহ করিয়ে দেন। কিন্তু অন্যদিকে মদ্যপানের আসর জমানোর সময় শরীয়ত লঙ্ঘনের কোনো পরোয়া করেন না, অথচ মদ হলো সকল অনিষ্টের মূল (উম্মুল খাবায়েস)।

এই সমস্ত বিষয় বাদ দিলেও, বর্তমানের এই অধঃপতিত যুগেও এটি অকল্পনীয় যে, কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুদের সাথে মদ্যপান করার সময় নিজের বোনকেও সাথে বসাবে। শরীফ পরিবারগুলো তো আজও মদ স্পর্শ করে না। কিন্তু কোনো মদ্যপ ব্যক্তিও কি এমন অবস্থায় বোনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে? আর কোনো বোন কি তাকে এমন অবস্থায় দেখতে পারে? কেবল ঘোরতর ধর্মহীন, হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, লজ্জা-শরমহীন এবং বংশগতভাবে অত্যন্ত নিচু স্তরের লোকেরাই এমন জঘন্য কাজ করতে পারে।

সেই যুগ ধর্মীয় মূল্যবোধের এমন অবক্ষয় থেকে মুক্ত ছিল। শাসক পরিবারগুলোর শিষ্টাচার ছিল অনুকরণীয়। স্মরণীয় যে, সেই যুগের মুসলিম আমীর ও নবাবদের মধ্যেও শরাফত, দ্বীনদারি এবং গান্ধীর্ষের এই নিদর্শনগুলো বিদ্যমান ছিল এবং তাদের সন্তানদের মধ্যেও আজও তা দেখা যায়। তদুপরি বনু আব্বাস পরিবার ছিল আরব ও হাশেমী, যাদের আত্মমর্যাদা ও বীরত্ব একটি ঐতিহাসিক সত্য; তাই তাদের সম্পর্কে এমন নিচু চরিত্রের কল্পনা করা কঠিন।

বারমাকিদের পর:

বারমাকিদের পর তাদের হিংসুকদেরও খুব বেশিদিন উন্নতি করার সুযোগ মেলেনি। খোরাসানের গভর্নর আলী বিন ঈসা কিছুকাল পরেই জনগণের ওপর জুলুমের অভিযোগে হারুনের অসন্তুষ্টির শিকার হন। ১৯২ হিজরিতে হারুন তাকে কেবল বরখাস্তই করেননি, বরং তাকে কারাবরণ করতে হয় এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [১]

ফজল বিন রাবী কিছুকাল উন্নতির পথে অগ্রসর ছিলেন। বারমাকিদের পতনের পর ছয় বছর পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। হারুনের পর তিনি আমিন আল-রশিদের দক্ষিণহস্ত হয়ে আরও তিন বছর বিলাসিতায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু এরপর মামুনের ক্ষমতা তাকে ঘরছাড়া করে দেয়। তিনি দীর্ঘকাল আত্মগোপনে ছিলেন। অবশেষে মামুন তাকে প্রাণভিক্ষা দেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে ৩০৮ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [২]

তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বারমাকিদের পরেও হারুনের নীতিতে আরব ও অনারবদের (আজম) প্রতি সহনশীলতা বজায় ছিল এবং তিনি সবার প্রতি সমান আচরণের নীতিতে অটল ছিলেন। বারমাকিদের সাথে তার দ্বন্দ্বের অর্থ এই ছিল না যে, তিনি অনারব মুসলিমদের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। অনারব মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এই বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হারুন এতে কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। তবে কোনো একটি পরিবারকে অসীম ক্ষমতা দেওয়ার ভুল তিনি দ্বিতীয়বার করেননি।

[১] তারিখ আত-তাবারী: ৮/৩২৭, ৩২৫, ২৯১ হিজরির অধীনে।

[২] ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/৩৭ থেকে ৩৯।

বৈদেশিক অভিযানসমূহ

রোমানদের সাথে যুদ্ধসমূহ:

ইসলামি বিশ্বের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের সংঘাত অধিকাংশ সময় চলতেই থাকত। মাহদীর যুগে যখন হারুন শাহজাদা ছিলেন, রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল যার নেতৃত্ব হারুন নিজেই দিচ্ছিলেন। এই বাহিনী খলিজে বসফরাস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় রোমের শাসনভার রানী আইরিন-এর হাতে ছিল, যিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে হারুন আল-রশিদের খেলাফতের সতেরোতম বছরে অর্থাৎ ১৮৭ হিজরিতে এই সন্ধি ভেঙে যায়। আইরিন, যিনি হারুনের সাথে সন্ধি করেছিলেন, রোমান জেনারেলদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সিংহাসনচ্যুত হন। বিদ্রোহী জেনারেলদের সর্দার ছিলেন একজন সামরিক অফিসার নকফুর, যিনি আগে কর আদায়কারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি সিংহাসন দখল করার সাথে সাথেই মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং দাবি করেন যে সন্ধির সময় যে অর্থ আদায় করা হয়েছিল তা ফেরত দেওয়া হোক। তিনি তার চিঠিতে লিখেছিলেন:

“রোমের রাজা নকফুরের পক্ষ থেকে আরবদের রাজা হারুনের নামে! এর আগে রানী তোমাকে দাবার কিস্তি মনে করে নিজেকে বোড়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন। এটি তার দুর্বলতা ছিল যে তিনি তোমাকে কর দিতেন। অথচ উচিত ছিল যে তুমি তাকে কর দিতে। কিন্তু নারীদের সহজাত দুর্বলতা এবং বোকামির কারণে তিনি তা সহ্য করে আসছিলেন।

আমার এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই গত বছরগুলোতে নেওয়া কর ফেরত দাও এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের জীবনের নিরাপত্তার জামানত হিসেবে কর দিতে থাকো। অন্যথায় তলোয়ার ফয়সালা করবে।”

যখন এই চিঠি খেলাফতের দরবারে পৌঁছাল, তখন কারো সাহস ছিল না যে তা পড়ে শোনায়। হারুন নির্দেশ দিলেন যেন তা পড়ে শোনানো হয়। চিঠির শব্দগুলো শোনার সাথে সাথে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। চোখে রক্ত নেমে এল। দরবারীরা এই অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁপছিলেন যে কারো কথা বলার সাহস ছিল না। হারুনকে শান্ত দেখে এবং তার মেজাজ বুঝে দরবারীরা ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক সরে গেলেন। উজির ও জ্ঞানী ব্যক্তির সবারই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন, খলিফাকে কী পরামর্শ দেবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না।

হারুন চিঠিটি নিজের হাতে নিলেন এবং তার উল্টো পিঠে এই উত্তর লিখে দিলেন:

“হারুন আল-রশিদের পক্ষ থেকে রোমান কুকুর নকফুরের নামে! হে কাফেরের সন্তান! আমি তোমার চিঠি পড়েছি। তুমি এর জবাব নিজের চোখে দেখবে, শোনার প্রয়োজন হবে না।”

এই কথা বলে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন এখনই যুদ্ধের জন্য যাত্রা করা হয়। সেই দিনই সৈন্যবাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনরের দিকে রওনা হলেন এবং রোমানদের জনপদগুলো জয় করতে করতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ‘হিরাক্লিয়া’ (Heraclea) দখল করে নিলেন। নকফুর দমে গিয়ে পূর্বের চুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং জিজিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করল। [১]

[১] তারিখ আল-তাবারী, ৮/৩০৭-৩০৮, ১৮৭ হিজরির অধীনে।

হারুনের প্রত্যাবর্তনের পর চুক্তির পুনরায় লঙ্ঘন করা হয়। এরপর বাগদাদে পৌঁছানোর সাথে সাথেই রোমানরা ইসলামি সীমান্তে ঢুকে পড়ে; কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে হারুন এত দ্রুত পুনরায় ফিরে আসতে পারবেন না। তারা হারকাল পুনরায় দখল করে নেয় এবং আনাতোলিয়ার দক্ষিণ পর্যন্ত হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করে দেয়। হারুনকে এই খবর দেওয়ার সাহস কারো ছিল না। অবশেষে আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ তামি এবং আবুল আতাহিয়া দরবারে কাসিদা পাঠের সময় কবিতার মাধ্যমে এই খবর শুনিয়ে দেন। আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ বলেন:

نَقَضَ الَّذِي أُعْطِيَهِ نَقْفُورٌ فَعَلَيْهِ دَائِرَةُ الْبَوَارِ تَدُورُ

“নিকফুর আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলেছে। সুতরাং তার ওপর ধ্বংস নেমে আসতে চলেছে।”

হারুন এটি শোনার সাথে সাথেই কোনো বিলম্ব না করে তার পুত্র কাসিমকে একটি বাহিনী দিয়ে দাবিকের সীমান্তে পাঠিয়ে দেন এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য ইব্রাহিম বিন জিবরিলকে নিকফুরের দিকে প্রেরণ করেন। ওদিক থেকে নিকফুরও অগ্রসর হন কিন্তু হঠাৎ তাকে কোনো অস্বাভাবিক সমস্যার কারণে পিছু হটতে হয়। মুসলমানরা পেছন থেকে তার ওপর আক্রমণ করতে থাকে। এই লড়াইগুলোতে চল্লিশ হাজার রোমান নিহত হয় এবং তাদের চার হাজার পশু হস্তগত হয়। [১]

হারুন নিজে একটি অত্যন্ত বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি এত বড় বাহিনী নিয়ে জিহাদের জন্য বের হন যে মুসলমানদের ইতিহাসে এর উদাহরণ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সেই বাহিনীতে এক লক্ষ ৩৫ হাজার পেশাদার সৈন্য এবং বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও খাদেম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হারুন ২০ রজব ১৯০ হিজরিতে নিকফুরের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সীমান্তে পৌঁছান। এখানে তিনি বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাদের বিভিন্ন দিকে বিজয়ের জন্য ছড়িয়ে দেন। দাউদ বিন ঈসাকে সত্তর হাজার সৈন্য দিয়ে রোমান অধিকৃত অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। মা’ন বিন জায়েদার পুত্র শরাহিল ‘হুসন সাকাল’ এবং ‘দাব্বা’র দিকে অগ্রসর হন এবং সেগুলো জয় করে তবেই ক্ষান্ত হন। রমজান মাস ১৯০ হিজরিতে হারুন নিজে হারকাল (হারকুলিস) অবরোধ করেন। এক মাস পর তা জয় করে সমস্ত নারী ও পুরুষকে বন্দি করে নেন এবং এই আশঙ্কায় শহরের প্রাচীর ও দুর্গ ভেঙে ফেলেন যাতে রোমানরা পুনরায় দখল করে একে নিজেদের ঘাঁটি বানাতে না পারে। এই লড়াইগুলোতে দশ হাজার শত্রু গ্রেফতার এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থান বিজিত হয়।

এরই মধ্যে হারুনের নৌবাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার জেনারেল হামিদ বিন মাযুফ সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে সাইপ্রাসের প্রধান যাজকসহ ষোল হাজার রোমান বন্দি হয়। অবশেষে কায়সার-ই-নিকফুর অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। সেই সাথে একজন বন্দি মেয়ের মুক্তির আবেদন জানান যে কায়সারের পুত্রের বাগদত্তা ছিল।

হারুন চিন্তাভাবনার পর তিনটি শর্ত পেশ করেন:

- ১. আমাদের প্রত্যাবর্তনের পর হারকাল শহরে রোমানরা পুনরায় বসতি স্থাপন করবে না।
- ২. প্রতি ব্যক্তি তিন লক্ষ দিনার প্রদান করা হবে।
- ৩. পঞ্চাশ হাজার দিনার বার্ষিক প্রদান করা হবে।

[১] তারিখুত তাবারী: ৩১৩/৮; সন ১৮৮ হিজরি।

কায়সার শর্তগুলো মেনে নিলেন। হারুন কাঙ্ক্ষিত মেয়েটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [১]

হারুনের প্রত্যাবর্তনের পর রোমান সর্দাররা আবারও মাঝে মাঝে সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে, যার জন্য হারুনকে ১৯১ হিজরিতে হারসামা বিন আয়ান এবং মাসরুর খাদিমের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য সীমান্তে পাঠাতে হয়। হারুন নিজেও তাদের পেছনে রওনা হন এবং “হাদাস” নামক স্থানে অবস্থান করে তাদের সাহায্য করতে থাকেন। এই অভিযানে সীমান্তে অবস্থিত সমস্ত গির্জা ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং পুরো মুসলিম বিশ্বে জিম্মিদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা তাদের পোশাক ও বেশভূষা মুসলমানদের থেকে আলাদা রাখে। [২]

১৯২ হিজরিতে সাবিত বিন নাসরকে এই রণাঙ্গনে পাঠানো হয়, যিনি মাতুরা নামক শহরটি জয় করেন। একই বছর রোমানদের সাথে বন্দি বিনিময় হয়। হারুন একজন মুসলিম বন্দিকেও রোমানদের কাছে থাকতে দেননি, যার ফলে কবিরাত্তার প্রশংসায় কাসিদা পাঠ করেন। [৩]

সৌভাগ্যবশত পরের বছর ১৯৩ হিজরিতে কায়সার নকফুর মারা যান। যুদ্ধে লাগা কিছু ক্ষত তাঁর জন্য প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়। তিনি ছিলেন একজন ধূর্ত ও কুপ্রকৃতির মানুষ, যিনি বহু বছর ধরে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। [৪]

তাঁর মৃত্যুর পর বহু বছর শান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও জিহাদের ধারা বছরের পর বছর বন্ধ থাকে। ইমাম তাবারির মতে, ১৯২ হিজরির পর ২১৫ হিজরি পর্যন্ত আর কোনো অভিযান পাঠানো হয়নি। [৫]

আন্দালুস ও ফ্রান্স:

আন্দালুস ছিল একটি ইসলামি দেশ যেখানে উমাইয়া আমিরদের স্বায়ত্তশাসিত শাসন ছিল। হারুন পূর্ববর্তী আব্বাসীয় খলিফাদের মতো আন্দালুসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি বজায় রাখেন। তবে হারুন তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য এটি প্রয়োজনীয় মনে করতেন যে, আন্দালুসের সরকার যেন শক্তিশালী না হয় এবং তাদের মনে যেন আব্বাসীয়দের প্রতি ভয় অবশ্যই থাকে; এই কারণেই তিনি ইসলামি আন্দালুসের সবচেয়ে বড় শত্রু ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেন এবং আব্বাসীয় রাষ্ট্রের মধ্যে দূতদের যাতায়াত এবং উপহারের আদান-প্রদান নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। হারুনুর রশিদ শার্লিমেনকে একটি প্রশিক্ষিত হাতি পাঠিয়েছিলেন। একটি অদ্ভুত ও চমৎকার ঘড়িও দিয়েছিলেন, যে সম্পর্কে ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে তারা মনে করত যে এটি জাদু দিয়ে চলে।

শার্লিমেন হারুনের উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রস্তাব করেন যে, ফ্রান্স ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো হোক এবং ইউরোপীয়দের তাদের দেশে প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে সহায়তা করা হোক। সেই সাথে এই দাবিও করেন যে, ইউরোপীয়দের বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারতের সুযোগ দেওয়া হোক। হারুনুর রশিদ কেবল এই সমস্ত দাবিই মেনে নেননি, বরং শার্লিমেনের ইচ্ছায় সম্মানস্বরূপ বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবিও তাঁর কাছে পেশ করেন।

[১] তারিখুত তাবারি: ৮/৩২০, ৩২১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৬০৪, ৬০৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৯১ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৯১ হিজরি, ১৯২

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৯৩ হিজরি

[৫] তারিখুত তাবারি: ৮/৩৩৭

এই পদক্ষেপটি সেই সময়ে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর মনে না হলেও ভবিষ্যতে এর প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক হয়েছিল। এরপর ফ্রান্স নিজেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উত্তরাধিকারী মনে করতে শুরু করে। দীর্ঘকাল ধরে অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশের কাফেলাগুলো ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনায় বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারতের জন্য আসতে থাকে।

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে যখন ক্রুসেড শুরু হয়, তখন তাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল ফ্রান্সেরই। ক্রুসেডের নেতৃত্বও ফ্রান্স লাভ করে; কারণ বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবিকাঠি থাকার কারণে তারা কুদসের ওপর নিজেদের অধিকার দাবি করে আসছিল। [১]

হারুনের শেষ অভিযানসমূহ - আলী বিন ঈসার ঘটনা - রাফে বিন লাইসের বিদ্রোহ

হারুনের রশীদের জীবনের শেষ বছরগুলোও হাস্যময় ভরপুর ছিল। ১৮৮ হিজরি থেকে ১৯২ হিজরি পর্যন্ত তাঁর বাহিনী বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। হারুনকে নিজে খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল; কারণ সেখানে রাফে বিন লাইস নামক এক বিদ্রোহী আমির বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে এই পুরো অঞ্চলটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

রাফের বিদ্রোহের কারণ ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। সে ধন-সম্পদ ও পদের লোভী ছিল; তাই সে সমরকন্দের প্রধান ইবনে আশআসের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, যে নিজেও একজন অত্যন্ত ধনী নারী ছিল। ইবনে আশআস সেই সময় বাগদাদে ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে তাঁর স্ত্রীর কোনো খোঁজখবর নেননি; তাই নারীটিও তাঁর স্বামীর ওপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং রাফেকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই কাজের কোনো আইনি পথ দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে রাফের মাথায় এক শয়তানি বুদ্ধি এল। সে নারীটিকে বলল যে সে যেন মুরতাদ হয়ে যায়। এতে তার বিবাহ ভেঙে যাবে। এরপর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে। এভাবে তাদের দুজনের বিয়ে হতে পারে। [২]

নারীটি এই কৌশল অবলম্বন করল, যার পর রাফে বিন লাইস তাকে বিয়ে করল। তার স্বামী যখন এটি জানতে পারল, তখন সে হারুনের রশীদের কাছে অভিযোগ করল। হারুন খোরাসানের শাসক আলী বিন ঈসাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে রাফেকে গ্রেপ্তার করে তালাক দিতে বাধ্য করে এবং এরপর তাকে গাধার পিঠে বসিয়ে পুরো শহরে অপমানিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

আলী বিন ঈসা এই শাস্তি কার্যকর করলেন। রাফে কিছুকাল সমরকন্দের কারাগারে বন্দি ছিল। এরপর কোনো এক সুযোগে সে পালিয়ে গেল। শীঘ্রই সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ করল; এবং সমরকন্দের গভর্নর সুলাইমান বিন হামিদকে হত্যা করে শহর দখল করে নিল। কিছু লোকের ধারণা যে, রাফে বিন লাইস বারমাকিদের দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিল এবং তাদের নির্দেশেই বিদ্রোহের প্রস্তুতি...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, আলী ইব্রাহিম হাসান, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

[২] বিবাহ বিচ্ছেদের এই কৌশল ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাফে বিন লাইসই উদ্ভাবন করেছিল। এই কৌশলের ব্যাপারে হানাফি ফকিহদের ফতোয়া হলো, যে নারী এই ধরনের পথ অবলম্বন করবে তার নতুন বিবাহ কার্যকর হবে না, বরং তাকে পূর্বের স্বামীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য করা হবে। (ফাতাওয়া শামি ৩/১৯৭)

করছিল কিন্তু আমরা এর সাথে বারমাকিদের সম্পর্কের কোনো প্রমাণ পাইনি। ইতিহাসের বইগুলো থেকে জানা যায় যে, সে নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেছিল।

হারুন আলী বিন ঈসাকে রাফে-এর দমনের নির্দেশ দিলেন। সে তার ছেলেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রাফে-এর বিরুদ্ধে পাঠাল কিন্তু সে সফল হয়নি এবং যুদ্ধে নিহত হয়। আলী বিন ঈসা এই সংবাদ শুনে নিজের কেন্দ্র বলখ ছেড়ে মার্ভের দিকে রওনা হলেন যাতে রাফে সেখানে দখল করতে না পারে।

তার চলে যাওয়ার পরপরই একটি নতুন সমস্যা দেখা দিল। তা হলো, আলী বিন ঈসার নিহত ছেলে অটেল সম্পদ জমা করে বলখের একটি বাগানে পুঁতে রেখেছিল যার খবর তার বাবারও জানা ছিল না। কেবল একজন বিশেষ দাসী এই রহস্য সম্পর্কে জানত। সে রহস্য ফাঁস করে দিল। ফলে বলখের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে সেই সমস্ত সম্পদ বের করে নিলেন এবং এই ভেবে যে এটি জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে কর আরোপ করে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা জনগণের মধ্যেই বিলিয়ে দিলেন।

এই বিষয়টি হারুনুর রশীদের কাছে পৌঁছালে তিনি আলী বিন ঈসার ওপর অসন্তুষ্ট ও সন্দিহান হয়ে পড়লেন। কারণ কয়েক দিন আগেই তার একটি আবেদন এসেছিল যাতে রাফে-এর সাথে যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য আমাদের এমনকি নিজেদের নারীদের অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। হারুন এই বিষয়টিতেও অসন্তুষ্ট হলেন যে, আলী বিন ঈসা তাকে না জানিয়ে কেন বলখ থেকে মার্ভে গেলেন।

এসব কারণে হারুন হারসামা বিন আয়ানকে আলী বিন ঈসার বরখাস্ত ও গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে খোরাসানে পাঠালেন। হারসামা হারুনুর বাতলে দেওয়া কৌশল অনুযায়ী আলী বিন ঈসার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করলেন যেন তিনি তার আবেদনের জবাবে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এসেছেন। সাক্ষাতের সময় তিনি হঠাৎ আলী বিন ঈসাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন যার পরিমাণ ছিল সর্বমোট ৮১ (একশি) কোটি দিরহাম।

যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে আলী বিন ঈসা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না কিন্তু তার উগ্র মেজাজ এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যায় কঠোরতার কারণে মানুষ অতিষ্ঠ ছিল; তাই তার বরখাস্তের সংবাদে খোরাসানের মানুষ হারসামাকে ধন্যবাদ জানায় এবং খলিফার জন্য অনেক দোয়া করে।

হারসামা এরপর রাফে বিন লাইসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। রাফের কাছে বেশি সৈন্য ছিল না; তাই সে সমরকন্দে অবস্থান গ্রহণ করল। হারসামা শহরটি অবরোধ করলেন। যেহেতু প্রাচীর খুব মজবুত ছিল; তাই কয়েক মাস অবরোধ সত্ত্বেও কোনো সাফল্য আসেনি। [১]

হারুনুর মৃত্যু:

১৯২ হিজরির শাবান মাসের শেষে হারুন নিজেই এই অভিযানের জন্য রওনা হলেন। মামুনুর রশীদও তার সাথে ছিলেন। হারুন গত কয়েক বছর ধরে বেশিরভাগ সময় সফরেই কাটাচ্ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ পাননি। শরীর ক্রমাগত...

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৩১৯ থেকে ৩৩০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৯১ হিজরি, ১৯২ হিজরি, ১৯৩ হিজরি।

চলছিল। মধ্য এশিয়ার পথে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাকে সমরকন্দের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তুসে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ে নতুন বছর ১৯৩ হিজরী শুরু হয়।

সমরকন্দের প্রাচীরের আড়ালে রাফে বিন লাইস সরকারি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল। তার ভাই বশির বিন লাইস গ্রেফতার হয়। তাকে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যিনি সুস্থ হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে তুসে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো গুনছিলেন। একজন বিদ্রোহীকে সামনে পেয়ে হারুনের রাগ চরমে পৌঁছায়। তিনি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।

৩ জমাদি আল-আখির ১৯৩ হিজরীতে হারুন আল-রশিদ ৪৫ বছর বয়সে প্রাণ সঁপে দেন। মৃত্যুর আগে নিজের কবর খনন করিয়ে কিছুক্ষণ তার পাশে বসে থাকেন। তারপর তার ওপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়। তার শেষ কথাগুলো ছিল: “হে সেই সত্তা যার কখনো মৃত্যু হবে না, তার ওপর রহম করুন যে মারা যাচ্ছে।” [১]

হারুন হজের সময় প্রায়ই এই দোয়া করতেন: “হে সেই সত্তা যার দরবারে সমস্ত মানুষ নিজ নিজ ভাষায় নিজ নিজ প্রয়োজন পেশ করছে, আমার আকুতি হলো, যখন আপনি আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেবেন এবং যখন আমাকে কবরে রাখা হবে এবং যখন আপন-পর সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, তখন সেই সময়ে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।” [২]

আশা করা যায় যে আল্লাহ তাআলা তার সাথে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করেছেন।

হারুনের যুগ ও চরিত্রের ওপর মন্তব্য

বনু আব্বাসে হারুনের অবস্থান ছিল ঠিক তেমন, যেমন বনু উমাইয়ায় ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ছিল। তার মধ্যে তার পিতা মাহদী এবং দাদা মনসুরের স্বভাবের সমন্বয় ঘটেছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার দাদা মনসুরের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন এবং তার চরিত্র ও আচরণ অনুসরণের চেষ্টা করতেন। তবে মনসুর যতটা মিতব্যয়ী স্বভাবের এবং কঠোর হস্তের অধিকারী ছিলেন, হারুন ততটাই দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। হ্যাঁ, বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার সময় তাকে হুবহু মনসুরের প্রতিচ্ছবি মনে হতো।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও কাগজ তৈরির বিপ্লব:

হারুন আল-রশিদের শাসনামল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির স্বর্ণযুগ। ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত আলেম, মুজতাহিদ, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্ব কাগজ তৈরির শিল্প তার যুগেই লাভ করে। যদিও চীনারা ১০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাগজ আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু এই শিল্প বিশ্বের দৃষ্টি থেকে গোপন ছিল। এই শিল্পের কিছু কারিগর তুর্কিস্তানের সমরকন্দ শহরে বিদ্যমান ছিল। মুসলমানরা যখন ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খ্রি.) সমরকন্দ জয় করে, তখন তারা এই কারিগরদের কাছ থেকে এই শিল্প শিখে নেয়, যাতে তুলা এবং অন্যান্য বাকলযুক্ত উদ্ভিদ থেকে একটি মণ্ড তৈরি করা হয়। তারপর এই মণ্ড শুকিয়ে পাতলা স্তর তৈরি করা হয়।

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৩৩০ থেকে ৩৪০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৯৩ হিজরী।

[২] তারিখুত তাবারী: ৮/৩৫৫।

৯৩ হিজরি থেকে ১৭৯ হিজরি পর্যন্ত মুসলমানরা এই শিল্পকে উন্নত করতে থাকে, এমনকি ১৭৯ হিজরিতে (৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে) হারুনুর রশিদের উজির ফজল বিন ইয়াহইয়া বাগদাদে কাগজের প্রথম কারখানা স্থাপন করেন। এভাবে লেখা এবং জ্ঞান সংরক্ষণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় এবং ইসলামি বিশ্বে একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সূচিত হয়। [১]

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:

এই যুগে আব্বাসীয় খিলাফত সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সরকার হিসেবে স্বীকৃত ছিল। রোমের মতো বিশাল সাম্রাজ্য তাকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিল। ফ্রান্সের বাদশাহ হারুনকে উপহার পাঠাতেন। আন্দালুস, মরক্কো এবং তিউনিসিয়া ছাড়া সমগ্র ইসলামি বিশ্ব তার অধীনে ছিল। সাধারণ মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল, জীবনের প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ্য তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল। কোনো লুটতরাজ বা করের বোঝা ছিল না, বরং সরকার মুক্তহস্তে তাদের ওপর ব্যয় করত। হারুনের মৃত্যুর সময় সরকারি কোষাগারে নয় কোটি পঁচিশ হাজার দিনার মূল্যের সম্পদ পৌঁছেছিল। [২]

তার যুগে আব্বাসীয় খিলাফত উন্নতির শিখরে ছিল। আলভী এবং খারেজীদের বিদ্রোহের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনো বিদ্রোহী তার মোকাবিলায় সফল হতে পারেনি। পরিস্থিতির ওপর তার মজবুত নিয়ন্ত্রণ ছিল, এর আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যেতে পারে যে, তিনি সতেরো বছর পর্যন্ত বারমাকিদেরকে রাষ্ট্রের স্তম্ভ বানিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু যখন তাদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন, তখন চোখের পলকে তাদের থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিলেন এবং এত বড় বিপ্লব সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয়নি।

হারুনের সীরাত, আল্লামা সুয়ুতির জবানিতে:

আল্লামা সুয়ুতি হারুনের গুণাবলি ও সীরাত সম্পর্কে লেখেন:

“তিনি ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘকায়, সুদর্শন, আকর্ষণীয় এবং বাগ্মী মানুষ। জ্ঞান ও আদব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নিজের খিলাফত আমলে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন একশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন, কোনো বিশেষ ওজর ছাড়া তা ছাড়তেন না। নিজের পকেট থেকে প্রতিদিন এক হাজার দিরহাম সদকা করতেন। আলেম ও জ্ঞানীদের ভালোবাসতেন এবং ইসলামের নিদর্শনাবলির সম্মান করতেন। দ্বীনি বিষয়ে কুতর্ক এবং শরয়ী নসের বিপরীতে অপব্যথ্যাকে ঘৃণা করতেন। তিনি বিশর মারীসিকে ঘৃণা করতেন।”

[১] কিসসাতুল হাযারাহ, উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট, অনুবাদ: ডক্টর জাকি নাজিব: ১৩/১৬৯, ১৭০, দারুল জীল। বাকি দুনিয়া কাগজ তৈরি মুসলমানদের থেকেই শিখেছে। বাগদাদে কাগজের কারখানা স্থাপনের কয়েকশ বছর পর পুরো ইসলামি বিশ্বে কাগজের ব্যবহার সাধারণ হয়ে যায়। ১৮৩ হিজরি (৮০০ খ্রিস্টাব্দ) নাগাদ মিশরেও কাগজ তৈরির কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রগুলো কেবল বাকি ইসলামি বিশ্ব নয় বরং ইউরোপীয় দেশগুলোতেও কাগজ রপ্তানি করত। ৩৩৮ হিজরি আগে আন্দালুসে কাগজ আমদানি করা হতো। ৩৩৮ হিজরিতে (৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) আন্দালুসীয়রা নিজেরাই কাগজ তৈরি শুরু করে। ধীরে ধীরে বাকি ইউরোপও এর থেকে উপকৃত হতে শুরু করে। ৫৯৩ হিজরিতে (১১০০ খ্রিস্টাব্দে) কাগজের শিল্প সিসিলিতে পৌঁছায়। এর দুই বছর পর সিসিলিতেও এই শিল্প সমাপ্ত হয়ে যায় (সেই সময় সিসিলিতে মুসলমানদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল)। ৫৬৯ হিজরিতে (১১৫২ খ্রিস্টাব্দে) স্পেনে প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সাথে সাথে ইউরোপীয়রা এই শিল্প শেখে। ৬২৫ হিজরিতে (১২২৮ খ্রিস্টাব্দে) জার্মানিতে, ৭০৯ হিজরিতে (১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে) ব্রিটেনে কাগজ তৈরির কাজ শুরু হয়। (কিসসাতুল হাযারাহ: ১৩/১৭০)

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১৮। হারুনুর রশিদ নয় কোটি পঁচিশ হাজার দিনার এবং আসবাবপত্র, অলঙ্কার ও গবাদি পশু রেখে গিয়েছিলেন যার মূল্য ছিল দশ কোটি পঁচিশ হাজার দিনার। আজকের হিসেবে এর মূল্য প্রায় ৫ বিলিয়ন ২৫ কোটি রুপি বা প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের সমান।

জানা গেল যে সে কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) মনে করে, তখন তিনি বললেন: যদি সে আমার হাতে পড়ে তবে আমি তার ঘাড় উড়িয়ে দেব। তিনি নিজের বাড়াবাড়ি ও গুনাহের জন্য কাঁদতেন, বিশেষ করে যখন তাঁকে কোনো নসিহত করা হতো। তিনি প্রশংসা ও স্তুতি পছন্দ করতেন এবং এর জন্য মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করতেন। [১]

ইশক-এ-নববী:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর গভীর মহব্বত ছিল। যখনই তাঁর নাম শুনতেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন: “সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাইয়্যিদি”। হারামাইন শরিফাইনের হেফাজত ও খিদমতের খুব খেয়াল রাখতেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল মিশরে একটি বড় শহর নির্মাণ করে লোহিত সাগরকে (বাহরে কুলজুম) ভূমধ্যসাগরের (বাহরে রুম) সাথে যুক্ত করে দেওয়া, যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যাতায়াত সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যখন ইয়াহইয়া বারমাকি তাঁকে এই পরিকল্পনার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেন যে, এর ফলে রোমান নৌবাহিনী হিজাজ পর্যন্ত পৌঁছে হারামাইন শরিফাইন ধ্বংস করতে পারে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। [২]

আবু মুয়াবিয়া (রহ.) একবার এই হাদিস শোনালেন যে, আদম (আ.) ও মুসা (আ.)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। এক ব্যক্তি মাঝখানে বলে উঠল যে, এই দুই মহান ব্যক্তির সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল? এ কথা শুনেই হারুন রাগে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং বললেন: “আমার তলোয়ার আনো; জিন্দিক! নবী (সা.)-এর হাদিসের ওপর আপত্তি করে!!” আবু মুয়াবিয়া (রহ.) অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন।

অত্যন্ত সাহসী মানুষ এবং জিহাদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এক মুহাদিস এই নববী বাণী শোনালেন: “আমার পছন্দ যে আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।” হারুন এটি শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

[৩]

সাহাবায়ে কেরামের আদব ও ইহতিরাম:

সাহাবায়ে কেরামের অত্যন্ত আদব ও ইহতিরাম করতেন। একবার তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন, এক চাটুকার বলে উঠল: “আমিরুল মুমিনীন প্রজাদের সাথে এত ভালো ব্যবহার করেছেন যে মানুষ উমর বিন খাত্তাব (রা.) ও উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-কে ভুলে গেছে।” এটি শুনে হারুন রাগান্বিত হলেন, খেজুরের দানা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন: “কী বলছ! উমর বিন আব্দুল আজিজ সম্পর্কে তো আমরা চুপ থাকতে পারি, কিন্তু তুমি কি মনে করো যে উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর ব্যাপারে এই ধৃষ্টতা আমরা সহ্য করব?” [৪]

আকিদাগতভাবে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন। ওলামাদের সাথে মৌলিক ও আকিদাগত বিষয়ে আলোচনা করতেন। যখন অকাট্য দলিল পেশ করা হতো তখন আনন্দ প্রকাশ করতেন। একবার মুসআব বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন:

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১০

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১৬... গত শতাব্দীতে এই জায়গায় সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১০

[৪] তারিখুত তাবারি: ৮/৩৫৩, ৩৫৪

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মর্যাদা কী ছিল?”

তিনি বললেন: “মৃত্যুর পর তাঁদের যে মর্যাদা, জীবিতকালেও তাই ছিল।”

এই উত্তর শুনে হারুন অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন: “আপনি প্রশ্নের যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন।”

একবার তাঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হলো: “হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে গালিগালাজকারীদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?”

মুসআব বললেন: “এটি দেখে নেওয়াই যথেষ্ট যে, যারা তাঁর ওপর আপত্তি তুলেছিল তারা অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে খারেজি, রাফেজি এবং বিদআতিরা রয়েছে। আর যারা তাঁর সাথী ছিল তারা একটিই জামাত—আহলুস সুন্নাহ।”

হারুন খুশি হয়ে বললেন: “এরপর এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই।” [১]

উলামা ও মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক:

উলামাদের তিনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদেরকে প্রচুর দান-দক্ষিণা দিতেন। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে এক লক্ষ দিরহাম উপহার প্রদান করেন। আবু মুয়াবিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন অন্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। হারুন তাঁকে দাওয়াত করলেন। খাওয়ার পর তিনি নিজে তাঁর হাত ধুইয়ে দিলেন এবং বললেন: “আপনার ইলমের সম্মানে আমি এমনটি করছি।”

একবার ইবনে সাম্মাক ওয়ায়েজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কাছে গেলেন। হারুন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁর সাথে আচরণ করলেন। ইবনে সাম্মাক বললেন: “এই উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও আপনার বিনয় প্রকাশ করা এই খিলাফতের চেয়েও বড় মর্যাদা।” এরপর কিছু নসিহত করলেন, তখন হারুন কাঁদতে লাগলেন।

হারুন ফুযাইল বিন আইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘরে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে নসিহত গ্রহণ করতেন। একবার ফুযাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “হে সুন্দর চেহারার অধিকারী! এই উম্মত সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।” হারুনের ওপর কান্নার এমন অবস্থা তৈরি হলো যে তাঁর চিৎকার বেরিয়ে এল।

ফুযাইল বিন আইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার মক্কায ছিলেন, তখন হারুন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন: “লোকেরা তাঁকে অপছন্দ করে, কিন্তু দুনিয়াতে আমার কাছে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ নেই। তিনি যখন মারা যাবেন, তখন তোমরা বড় বড় বিপদ-আপদ দেখতে পাবে।” [২]

কোমল হৃদয়:

হারুন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। সাধারণত নসিহতের কথা শুনে, দোয়ার সময় এবং কবুলিয়তের স্থানগুলোতে অব্যাহত কাঁদতেন। সেই যুগের উলামারা বলতেন যে, ফুযাইল এবং হারুনের চেয়ে বেশি ক্রন্দনকারী আর কাউকে দেখা যায়নি। [৩]

ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ খুরাসানির বর্ণনা যে, আমি আমার পিতার সাথে হজে গেলাম, তখন আরাফাতের ময়দানে হারুনুর রশিদকে খালি মাথায়, খালি পায়ে, হাত প্রসারিত করে, কাঁকরের ওপর দাঁড়িয়ে, থরথর করে কাঁপতে এবং কাকুতি-মিনতি করতে দেখলাম, তিনি বলছিলেন:

“হে আল্লাহ! তুমি তো তুমিই আর আমি তো আমিই। তুমি বারবার ক্ষমাশীল আর আমি বারবার গুনাহগার। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও।” [৪]

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৩৫৩, ৩৫৪

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১১

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১১

[৪] ফাযায়িল বাতিনিয়া, ইমাম গাজালী, পৃ. ২১৮

হজ করার জন্য তিনি যখন হারাম শরীফ ও আরাফাতে যেতেন, তখন অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করতেন। কাবা শরীফে এভাবে দোয়া করতেন:

“হে সেই সত্তা, যিনি যাক্বাকারীদের প্রয়োজনের মালিক, যিনি নীরব আত্মাদের মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত; আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আপনার অনুগ্রহ অগণিত, আপনার রহমত প্রশস্ত; আপনি হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত নাযিল করুন এবং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দিন।”

তিনি আরও দোয়া করতেন:

“হে সেই সত্তা, বান্দাদের গুনাহ যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, যাকে ক্ষমা করে দিলে কোনো ঘাটতি হয় না; যিনি জমিনকে বিছিয়েছেন এবং আসমানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি নিজের জন্য সুন্দর সুন্দর নাম নির্ধারণ করেছেন, আপনি হযরত মুহাম্মদ-এর ওপর রহমত নাযিল করুন এবং আমার সমস্ত কাজ সহজ করে দিন।” [১]

রাজত্বের মূল্য এক পেয়ালা পানি:

একবার ইবনে সাম্মাক খলিফা হারুনুর রশীদের কাছে আসলেন। হারুনুর রশীদের পিপাসা লাগলে তিনি পানি চাইলেন এবং পান করতে লাগলেন। ইবনে সাম্মাক বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! একটু থামুন এবং চিন্তা করে বলুন যে, যদি এই অবস্থায় আপনি পানি না পেতেন, তবে তা পাওয়ার জন্য আপনি কী দিতে পারতেন?”

হারুন বললেন: “অর্ধেক রাজত্ব।”

ইবনে সাম্মাক বললেন:

“আর যদি পান করার পর এর নির্গমন পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তা চালু করার জন্য আপনি কী দেবেন?”

হারুন বললেন: “বাকি অর্ধেক রাজত্ব।”

ইবনে সাম্মাক বললেন:

“তবে যে রাজত্বের মূল্য মাত্র এক পেয়ালা পানি, তা নিয়ে লোভ করার কী আছে?” [২]

একথা শুনে হারুন কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে গেলেন।

বদান্যতা:

হারুনুর রশীদ প্রশংসা ও স্তুতি পছন্দ করতেন এবং এর বিনিময়ে মুক্তহস্তে পুরস্কার দিতেন। তিনি নিজেও কবিতা বলতেন। আবান বিন আবি হাফসার কাসিদা শুনে তিনি এত খুশি হলেন যে তাকে পাঁচ হাজার দিনার, খেলাত, রাজকীয় ঘোড়া এবং দশজন রোমান গোলাম দান করলেন। ইসহাক মওসিলিকে দুই লক্ষ দিরহাম দিলেন। আসমায়ীর একটি প্রশংসামূলক কবিতার জন্য তাকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা: ৩৫১/৮ থেকে ৩৬৪ পর্যন্ত, হারুনুর রশীদের কিছু গোপন বিষয়ের অধীনে।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩৫৭/৮।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২১১।

কিছু মানবিক দুর্বলতা এবং সেগুলোর বশবর্তী হয়ে নেওয়া কিছু আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত বাদ দিলে, সামগ্রিকভাবে হারুন আল-রশিদ ছিলেন আব্বাসীয় যুগের মুকুটমণি। তাঁর জীবন ছিল গুণাবলির এক অনন্য নিদর্শন এবং তাঁর জীবনকাহিনী ছিল সাফল্যে ভরপুর।

হানাফী ফিকহের উত্থান:

হারুন আল-রশিদের শাসনামলে হানাফী ফিকহ অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। এর আগে চতুর্থ আব্বাসীয় খলিফা হাদীর আমলে ইমাম আবু ইউসুফ যখন কাজী নিযুক্ত হন, তখন হানাফী ফিকহ আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতসমূহে পরিচিতি লাভ করে। এটি ১৬৫ হিজরীর ঘটনা। এরপর ১৭০ হিজরীতে খলিফা হারুন আল-রশিদ ইমাম আবু ইউসুফকে ‘কাজীউল কুজাত’ (প্রধান বিচারপতি) পদে ভূষিত করেন। এর আগে ইসলামি বিশ্বে এই পদের অস্তিত্ব ছিল না। কাজীউল কুজাতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং সমস্ত শহরের কাজীগণ তাঁর অধীনে বিবেচিত হতেন। ইমাম আবু ইউসুফ হানাফী ফিকহ অনুযায়ী ফয়সালা করতেন, ফলে হানাফী ফিকহ উচ্চ আদালতের সাধারণ সংবিধানে পরিণত হয়। [১]

তখন থেকে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত (প্রায় ৪৯১ বছর পর্যন্ত) আব্বাসীয় শাসনামলে মূলত হানাফী ফিকহেরই প্রচলন ছিল, যদিও কিছু ফকীহ হাম্বলী, শাফেয়ী এবং মালেকী ফিকহের ওপরও ফতোয়া দিতেন এবং মাঝেমাঝে মুতাজিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের আলেমগণও বিচার বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন, তবে সেই সময়গুলো সাময়িক প্রমাণিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের বিচার বিভাগে হানাফী ফিকহেরই প্রাধান্য ছিল।

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৬/৩৭৯ থেকে ৩৮২, ২/৫১৩, ৫১৪; আল-ইবার ফী খবর মান গাবার: ১/২১৯; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৬/৪০০ থেকে ৪০৫।

আমিন বিন আল-রশীদ

মুহাম্মদ বিন হারুন

জুমাদিউল আখিরা ১৯৩ হিজরি থেকে মহররম ১৯৮ হিজরি

এপ্রিল ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অক্টোবর ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ

হারুনের মৃত্যুর পর তার ওসিয়ত অনুযায়ী তার মেজ ছেলে আমিন আল-রশীদ বাগদাদে খেলাফতের মসনদে আসীন হন। মামুন আল-রশীদ, যিনি পিতার সাথে খোরাসানের সফরে ছিলেন, সেখানেই অবস্থান করেন কারণ এটাই ছিল তার এলাকা। তার উজির ফজল বিন সাহল এবং তার বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহের বিন হুসাইন ও হারসামা বিন আয়ান তার সাথে ছিলেন।

আমিন আল-রশীদ দায়িত্ববোধহীন, অনভিজ্ঞ এবং তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। শিকার, খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদে তার শখ ছিল। রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাই বাগদাদে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি উজির ফজল বিন রাবির হাতে চলে আসে। আমিনের তার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ফজল বিন রাবির পর ইসমাইল বিন সবিহ তার কাতিব এবং উমর আলী বিন ঈসা ও আবদুর রহমান বিন জাবলা তার দক্ষ সামরিক জেনারেল ছিলেন।

ফজল বিন রাবি জানতেন যে আমিনের তুলনায় মামুন অনেক বেশি বুদ্ধিমান; তাই যদি কাল খেলাফত তার হাতে চলে যায় তবে আমার ক্ষমতা ও মর্যাদা কমে যাবে; তাই তিনি আমিন আল-রশীদকে প্ররোচিত করলেন যেন তিনি মামুনকে উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের ছেলে মুসাকে এই সম্মান প্রদান করেন। এই ভুল পরিকল্পনা আমিনের পছন্দ হলো। তিনি মামুনকে উত্তরাধিকার এবং খোরাসানের শাসনভার থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশনামা লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ইসমাইল বিন সবিহ বললেন: “এভাবে সে সতর্ক হয়ে যাবে। উপযুক্ত হবে যে চিঠিতে তাকে শুধু এই আমন্ত্রণ জানানো হোক যে সে বাগদাদে এসে রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য করুক।” [১]

আমিন মামুনকে চিঠিতে এটাই লিখে পাঠালেন। মামুন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন যে কী করবেন। তার উজির ফজল বিন সাহল বললেন: “আপনি নিজের জায়গায় অটল থাকুন। ঝুঁকি নেবেন না। আপনি সহজেই এটা করতে পারেন।” মামুন বললেন: “কীভাবে সম্ভব যে আমি এখানে বসে আমিনের বিরোধিতা করি। অধিকাংশ সৈন্য তার। সমস্ত কোষাগার তার কাছে।” ফজল বিন সাহল বললেন: “সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশঙ্কা আছে যে আমিন আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। আপনি আপনার সেনাবাহিনীর সাথে থাকুন। যদি কোনো বিরোধিতা সামনে আসে তবে আপনি মোকাবিলা করতে পারবেন।”

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৩৬৯ ও ৩৭২।

এই পরামর্শ অনুযায়ী মামুন আমিনের কাছে বাগদাদে আসতে অস্বীকার করলেন এবং ফিরতি চিঠিতে লিখলেন:

“আমিরুল মুমিনিন! আমি আপনার অধীনস্থ ও সাহায্যকারী, কিন্তু মরহুম খলিফা আমাকে এই সীমান্তে মোতায়ন করেছিলেন যাতে আমি শত্রুদের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারি। এটি আপনার খিদমতে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। ভালো হয় যদি আপনি আমাকে উপস্থিত হওয়া থেকে অক্ষম মনে করেন।” [১]

মামুনের রশিদের খিলাফত ঘোষণা:

১৯৫ হিজরির সফর মাসের শেষের দিকে আমিন একতরফাভাবে বাগদাদে মামুনের বরখাস্ত এবং তার পুত্র মুসার উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে নতুন যুবরাজকে ‘নাতিক বিল হক’ উপাধি দেওয়া হয়। (যদিও এই যুবরাজের সিংহাসন আরোহণ কখনোই সম্ভব হয়নি।)

মামুনের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত এমন এক দ্বন্দ্বের সূচনা করে যা মুসলিম বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়। মামুনের সমর্থক খোরাসানি গোত্রগুলো এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যদিকে আরব গোত্রগুলো আমিনের চারপাশে সমবেত হয়। আমিনের কাছে মামুন এখন একজন বিদ্রোহী ছিলেন। তাকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে তিনি যেন সামরিক অভিযান চালিয়ে মামুনের এলাকাগুলো দখল করে নেন। আমিন আলী বিন ঈসাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। যুদ্ধের আগুন জ্বলতে দেখে বাগদাদের একজন কবি বলেন:

أَضَاعَ الْخِلَافَةَ غِشُّ الْوَزِيرِ وَفَسَقُ الْإِمَامِ وَجَهْلُ الْمَشِيرِ

(উজিরের অসাধুতা, শাসকের পথভ্রষ্টতা এবং উপদেষ্টার অজ্ঞতা খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছে।)

আমরা এ থেকে আন্দাজ করতে পারি যে, অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত একদম সঠিক হয়। তারা যেসব কাজের ক্ষতি খোলা চোখে দেখতে পায়, শাসকরা তা মোটেও দেখতে পান না; কারণ সাধারণত ব্যক্তিগত স্বার্থ, ধন-সম্পদ ও পদের লোভ এবং প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা তাদের অন্ধ করে দেয়।

আলী বিন ঈসা পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হলেন। তার আক্রমণের খবর শুনে মামুন তৎক্ষণাৎ তাহির বিন হুসাইনকে সীমান্তে পাঠালেন। ১৯৫ হিজরির শাবান মাসে রে-এর কাছে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আলী বিন ঈসা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং তিনি নিজে নিহত হন। বাগদাদের সাধারণ কর্মকর্তারা মামুনকে পছন্দ করতেন; তাই পরাজয়ের পর তারা তাহিরের সাথে যোগ দেন।

বিজয়ের পর তাহির মামুনকে নিম্নোক্ত চিঠি লিখলেন: “আলী বিন ঈসার মাথা আমার সামনে আছে। তার আংটি আমার আঙুলে। তার বাহিনী আমার অধীনস্থ। ওয়াসসালাম।” এই বিজয়ের পর মামুন উপদেষ্টাদের পরামর্শে নিজের খিলাফত ঘোষণা করেন এবং খোরাসান ও ইরানের সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। [২]

আমিনের উদাসীনতা:

আমিনের উদাসীনতা এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, যখন তাকে আলী বিন ঈসার পরাজয়ের খবর দেওয়া হলো, তখন তিনি...

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৩৭৪ থেকে ৩৮৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৮/৪৩০ থেকে ৪৩৯

দজলার তীরে নিজের গোলামের সাথে মাছ শিকার করছিলেন। তাকে খবর দিতে আসা ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বললেন:

“চুপ থাকো! আমার গোলাম সকাল থেকে দুটি মাছ ধরেছে এবং আমার হাতে একটিও লাগেনি।” [১]

অন্যদিকে তাহির বিন হুসাইন একে একে আমীনুর রশীদের এলাকাগুলো দখল করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি উত্তরের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ইরান জয় করলেন। তারপর দক্ষিণের ইরাকি প্রদেশগুলোর দিকে অগ্রসর হলেন: আহওয়াজ, ওয়াসিত এবং মাদায়েন জয় করলেন। ১৯৬ হিজরিতে তার বিজয় অভিযান চলতে থাকে, এমনকি তার বাহিনী বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। [২]

বাগদাদ অবরোধ:

১৯৭ হিজরিতে মামুন বাগদাদ অবরোধের পরিকল্পনা করেন। শহরের পূর্ব দিকে হারসামা এবং পশ্চিম দিকে তাহির বিন হুসাইন ঘিরে ফেললেন। বাগদাদ নির্মাণের পর এটিই ছিল প্রথমবার যখন শহরটি অবরোধের সম্মুখীন হলো। বছরের পর বছর ধরে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনকারী শহরবাসী এই আক্রমণে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমীনুর রশীদের পক্ষ নিলেন এবং বীরত্বের সাথে প্রাচীরের ওপর থেকে লড়াই করতে থাকলেন। উভয় পক্ষ থেকে মিনজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ চলতে থাকল। সংঘর্ষ এবং রসদ সরবরাহে লুটতরাজ চলতে থাকল। ধীরে ধীরে বাগদাদে খাদ্যের অভাব দেখা দিল, মানুষ ক্ষুধার শিকার হতে লাগল। প্রতিটি জিনিসের দাম চারগুণ বেড়ে গেল। আমীন নাগরিকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজের কোষাগার অকাতরে ব্যয় করতে থাকলেন। যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন প্রাসাদে থাকা সোনা-রূপার বাসনপত্র পর্যন্ত বিক্রি করে দিলেন।

এই সময়ে শহরের প্রাচীরও অনেক জায়গায় ধসে পড়েছিল। পাথর বর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগে অনেক ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অসংখ্য সরকারি রেকর্ড পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। শহরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আর অবশিষ্ট ছিল ছিল না। গুপ্তা ও বখাটেরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াত এবং যাকে ইচ্ছা লুট করত। অবরোধের এই অবস্থায় ১৯৭ হিজরি অতিবাহিত হলো এবং নতুন বছর শুরু হলো।

আমীনুর রশীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি এই পরিস্থিতিতেও খেলাধুলায় মগ্ন ছিলেন। এটি দেখে সাধারণ মানুষ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল এবং শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির এই কেন্দ্রের এই অবস্থা দেখে কবির শোকগাথা গাইতে বাধ্য হলেন। একজন কবি বলেছেন:

بَكَيْتُ دَمًا عَلَى بَغْدَادَ لَمَّا ... فَقَدْتُ غَضَارَةَ الْعَيْشِ الْأَنْيَقِ

(আমি বাগদাদের জন্য রক্তাশ্রু বিসর্জন দিতে লাগলাম, যখন তার মনোরম ও নির্মল জীবন হারিয়ে গেল।)

تَبَدَّلْنَا هُمُومًا مِنْ سُرُورٍ ... وَمِنْ سَعَةِ تَبَدَّلْنَا بِضِيقِ

(সুখের বদলে আমরা দুঃখের সম্মুখীন হলাম... প্রশস্ততার জায়গায় সংকীর্ণতা চলে এল।)

أَصَابَتْهَا مِنَ الْحُسَادِ عَيْنٌ ... فَأَفْنَتْ أَهْلَهَا بِالْمَنْجَنِيقِ

(বাগদাদকে হিংসুকদের নজর লেগে গেল, যা তার অধিবাসীদের মিনজানিক দিয়ে ধ্বংস করে দিল।)

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬২/১৪

[২] তারিখুত তাবারী: ৪৪৪৫৪৩২/৮

যদি কখনো কোনো সমস্যার সমাধান কোনোভাবে না বের হতো, তবে ইমাম সাহেব (রহ.)

বলতেন:

“আমার কোনো গুনাহের কারণে সমস্যার সমাধান বুঝে আসছে না।”

একথা বলে তিনি সালাত, দুআ এবং তওবা ও ইস্তিগফারে মশগুল হয়ে যেতেন যতক্ষণ না

সমস্যার সমাধান মাথায় আসত এবং তিনি বলতেন:

“মনে হচ্ছে আমার তওবা কবুল হয়েছে।”

ফুযাইল বিন আইয়ায (রহ.) এই অবস্থা শুনে অঝোরে কাঁদতেন:

“আবু হানিফার গুনাহ কম, তাই তিনি সময়মতো সতর্ক হয়ে যান, অন্যথায় মানুষ তো পরোয়াই করে না।” [১]

আল্লামা কারদারী (রহ.) লিখেন:

“তাঁর ছাত্ররা প্রতিটি মাসআলার ওপর ভরপুর বিতর্ক করতেন এবং প্রতিটি বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলতেন। এই সময়ে ইমাম সাহেব নিরব থেকে তাঁদের বিতর্ক শুনতেন। তারপর যখন ইমাম সাহেব আলোচ্য মাসআলার ওপর আলোচনা শুরু করতেন, তখন মজলিসে এমন নিস্তব্ধতা নেমে আসত যেন সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।” [২]

এই মজলিসে শুধু ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে উদ্ভূত মাসআলা নিয়েই বিতর্ক হতো না, বরং কিছু বিষয়ের সম্ভাব্য রূপ নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করে সে সম্পর্কেও মতামত পেশ করা হতো, যাতে পরবর্তীতে যদি এমন কোনো মাসআলা সামনে আসে তবে ইসলামি আইনে আগে থেকেই তার সমাধান বিদ্যমান থাকে। [৩]

বিতর্ক মজলিসের কার্যক্রম চলাকালীন ইমাম সাহেব (রহ.) যা বলতেন, তা সাথে সাথে লিখে নেওয়া হতো এবং ইমাম সাহেব (রহ.) পরবর্তীতে সংশোধনের জন্য তা গুরুত্বের সাথে শুনতেন। [৪]

এই গবেষণাগুলোকে আলাদা আলাদা শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করার কাজও ইমাম সাহেব (রহ.) বড় পরিসরে করিয়েছিলেন। [৫]

একবার কেউ ইমাম সাহেব (রহ.)-কে একটি বিশেষ মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত একমত হতে পারেননি, আপনি কীভাবে একটি চূড়ান্ত রায় কয়েম করলেন?

তিনি বললেন: “তুমি কী মনে করো আমি এমনিতেই এই রায় কয়েম করেছি? আমি বিশ বছর ধরে এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করেছি। এর নজির ও প্রমাণাদি দেখেছি এবং প্রতিটি সাহাবীর বক্তব্যকে স্বীকৃত মূলনীতির ওপর যাচাই করেছি।” [৬]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক”-কেও একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান হিসেবে গণ্য করেছেন এবং “কিতাবুস সিয়ার”-এর মাসআলাগুলো পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, যাতে যুদ্ধ ও শান্তি এবং দেশসমূহের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক বিধানাবলি ছিল।

[১] মানাকিব আবি হানিফা, মক্কী: ১৮১/১, উকুদুল জুমান, পৃ. ২২৮

[২] মানাকিব আবি হানিফা, কারদারী: ১০৮/২

[৩] হানাফী ফিকহের প্রাচীন ভাণ্ডারে এমন উদাহরণের অভাব নেই। আলেম সমাজ এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত।

[৪] মানাকিব আবি হানিফা, কারদারী: ১০৯/২

[৫] আবু হানিফা এটি সংকলন করেছেন এবং একে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল কিতাব হিসেবে তৈরি করেছেন (মানাকিব আবি হানিফা, মুয়াফফাক মক্কী: ১৩৬/২)

[৬] মানাকিব আবি হানিফা, কারদারী: ১৫৬, ১৫০/১

এই নতুন জিনিসটি দেখে কিছু ফকীহ বিস্মিতও হয়েছিলেন; এই কারণেই ইমাম আওয়ামী (রহ.) এর প্রতিবাদ করেছিলেন, যার জবাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) “আর-রাদু আলা সিয়ারিল আওয়ামী” নামক একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

ফিকহ সংকলনের এই কাজ ১২০ হিজরিতে শুরু হয়েছিল এবং মাঝখানে কুফা থেকে অনুপস্থিতির কিছু সময় বাদ দিলে ১৫০ হিজরি পর্যন্ত ৩০ বছর অব্যাহত ছিল। নিজের ছাত্র এবং সমসাময়িক আলেমদের জামাতের সাথে ইমাম সাহেব প্রতিটি মাসআলার জন্য প্রথমে কিতাবুল্লাহ, তারপর সুন্নতে রাসুলুল্লাহ (সা.), এরপর আসার-এ-সাহাবা এবং সবশেষে কিয়াসের দিকে মনোনিবেশ করতেন। হাদিসের মর্যাদা (যেমন সহীহ, হাসান, যঈফ, মুতাওয়াতির, মশহুর, খবর-এ-ওয়াহিদ ইত্যাদি) যাচাই করার পাশাপাশি তিনি এটাও দেখতেন যে, এই বিষয়ে নবী আকরাম (সা.)-এর ওফাতের আগে শেষ আমল কী ছিল। ১৫০ হিজরি পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত ফিকহি ধারার সংখ্যা ছিল ৮৩ হাজার, যার মধ্যে ৩৮ হাজার মাসআলা ইবাদত এবং ৪৫ হাজার মাসআলা মুয়ামালাত ও উকুবাত (দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত ছিল। [১]

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত ছিল। কারাবন্দী থাকাকালীনও এই কাজ থামেনি [২] এবং ইমাম সাহেব যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, তখন ফিকহের এমন এক বিশাল ভাণ্ডার সংকলিত হয়ে গিয়েছিল যা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের নির্দেশনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর যুগে তাঁর সংকলিত ফিকহ সেই উচ্চতর আইনি মর্যাদা পায়নি যা তার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টার ফলে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি অঞ্চলের জন্য শরয়ী বিধানের একটি সংকলিত ভাণ্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা কাজে লাগিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কলমে “কিতাবুল খারাজ” এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর হাতে “আল-জামেউস সাগীর”, “আল-জামেউল কাবীর”, “আস-সিয়ারুস সাগীর”, “আস-সিয়ারুল কাবীর”, “আল-মাবসূত” এবং “আল-হুজ্জাতু আলা আহলিল মাদীনাহ”-এর মতো মহান গ্রন্থসমূহ সামনে আসে।

যখনই আহনাফদের এই ইলমি ভাণ্ডার জনসমক্ষে এল, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, কাজী ও মুফতি, আমির ও খলিফাগণও তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য হলেন; কারণ এটি এমন এক সম্পদ ছিল যার প্রয়োজন উম্মতের দীর্ঘকাল ধরে ছিল এবং সর্বত্র এর তীব্র চাহিদা ছিল। এই সম্মিলিত গবেষণা ও আইন সংকলনের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ব্যক্তিগতভাবে ফতোয়া প্রদানকারী ফকীহ ও মুজতাহিদদের মতামত গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে লাগল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই কীর্তি ছিল এমন এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যাকে ভবিষ্যতের প্রতিটি ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি বলা যেতে পারে। অর্ধ শতাব্দীও পার হয়নি যে, এটি রাষ্ট্রের সরকারি আইনের মর্যাদা লাভ করল এবং অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক, কাজী ও মুফতিগণ এর অনুযায়ী ফয়সালা করতে শুরু করলেন। [৩]

[১] মানাকিব আবি হানিফা, কারদারি: ৪৪৪/২; ইমাম আবু হানিফা কি কানুন-এ-তাদউইন-এ-ইসলামি, ডক্টর হামিদুল্লাহ, পৃ. ৪৯।

[২] প্রাচীন উৎসগুলোতে এর স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলি একে সমর্থন করে; এই কারণেই আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) লিখেছেন: “কারাবন্দী থাকাকালীনও দরস প্রদানের ধারা অব্যাহত ছিল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এই সময়েই আপনার নিকট থেকে কিতাব ফয়জ করেছিলেন।” (সীরাতুন নোমান, শিবলী নোমানী, পৃ. ৬৪)।

[৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ওফাতুল আইয়ান: ৪০৯/৫ থেকে ৪১২, এছাড়া “মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-মাহাবি” এবং “আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ”-তে ইমাম সাহেবের ছাত্রদের জীবনী দেখুন।

“আমি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, যদি আমিন কোনোভাবে এই অসহায়ত্ব ও নিরুপায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে যায়, তবে ফিতনার অবসান হবে না; বরং এদিক-সেদিকের স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাকে ব্যবহার করে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে হিসেবে কাজ করতে থাকবে। আমি তার সাথে কোনো প্রকার অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি করিনি; তাই আমার লোকেরা তাকে ধরে ফেলে এবং প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল তাকে হত্যা করে কৃতিত্ব অর্জন করা। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে আল্লাহ, রাসূল এবং খলিফার সমর্থনের হক আদায় করে দিয়েছে।” [১]

মামুন আমিনের মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন। তিনি স্বভাবগতভাবেই ক্ষমা ও মার্জনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি চাননি যে বিষয়টি তার হত্যা পর্যন্ত গড়াক, তবুও তিনি এ বিষয়ে তাহের বিন হুসাইনের কাছে কোনো জবাবদিহি চাননি। [২]

আমিনুর রশিদের রাজনৈতিক ভুলসমূহ:

আমিনুর রশিদের মৃত্যু এবং তার শাসনের অবসানের সাথে সাথেই আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমিনের এই পরিণতি ছিল তার কিছু গুরুতর ভুলের স্বাভাবিক ফলাফল। তিনি অকারণে তার ভাইয়ের শাসন ক্ষমতা খতম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এর পরিণাম সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেননি। লোক চেনা, পদাধিকারী নির্বাচন এবং তাদের অভিযানে পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি ক্রমাগত ভুল করতে থাকেন। তিনি ফজল বিন রাবি’র মতামতের ওপর আস্থা রেখে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, যদিও এই ব্যক্তিটি ছিল মতলববাজ ও স্বার্থান্বেষী, আব্বাসীয়দের লাভ-ক্ষতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। মামুনের কাছ থেকে খোরাসানের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি আলী বিন ঈসাকে পাঠিয়েছিলেন যাকে খোরাসানবাসী অপছন্দ করত; তাই খোরাসানীরা আলী বিন ঈসার বিরুদ্ধে তাহের বিন হুসাইনের চারপাশে সমবেত হলো। বাগদাদ রক্ষায় তিনি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি বরং এই নাজুক পরিস্থিতিতেও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিলেন, যার ফলে শহরের ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে, জনগণ হতাশ হয় এবং খোদ তার অফিসাররা প্রতিপক্ষের সাথে গিয়ে যোগ দেয়।

রোমান সাম্রাজ্য:

হারুনের জীবদ্দশায় রোমানদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু আমিন ও মামুনের বিবাদের সময় জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের সৌভাগ্য ছিল যে, এই সময়ে রোমান সাম্রাজ্য তীব্র রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত থাকার কারণে কোনো আক্রমণ করতে পারেনি, অন্যথায় মুসলমানদের চরম ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যে বছর হারুনের মৃত্যু হয়, সেই বছরই রোমান সম্রাট “নিকফোর” নয় বছর শাসনের পর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তার পরিবর্তে তার পুত্র সিংহাসনে বসেন কিন্তু দুই মাস পর তিনিও মারা যান। এখন তার ভগ্নিপতি “মাইকেল বিন জর্জিস” ক্ষমতার মসনদে বসেন কিন্তু পরের বছর ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে আমিরদের বিদ্রোহের কারণে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় এবং সম্রাট লিও সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ডামাডোল রোমকে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেয়নি। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ৮/৪৭৮ থেকে ৪৯৮, ১৯৮ হিজরীর অধীনে।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২২১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/১০৬।

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ১/২৮৭।

মামুন বিন আল-রশীদ

আবদুল্লাহ বিন হারুন

মহররম ১৭০ হিজরী হতে রজব ২১৮ হিজরী

অক্টোবর ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে আগস্ট ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ

মামুন আল-রশীদ আব্বাসীয় খিলাফতের অত্যন্ত নামকরা খলিফা ছিলেন। যদিও তাঁর শাসনকাল রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখে না; কারণ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো বড় কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তবে জ্ঞান ও সাহিত্য, মেধা ও প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, চরিত্র, আচার-আচরণ এবং বিভিন্ন শিল্পকলায় পারদর্শিতার দিক থেকে তিনি ইতিহাসের এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার উদাহরণ শাসকদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর স্মরণশক্তি এমন ছিল যে, কোনো জিনিস একবার পড়লে বা শুনলে তা সারাজীবনের জন্য তাঁর মনে গেঁথে যেত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এমন ছিল যে, তিনি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও বুঝে নিতেন। প্রকৃতপক্ষে মামুনের যোগ্যতা জ্ঞান ও সাহিত্যের উচ্চমানের সেবার জন্য উপযুক্ত ছিল, রাজনীতির জন্য নয়; কিন্তু নিয়তি তাঁকে খিলাফতের মসনদে বসিয়েছিল। তিনি ১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি সেই রাত ছিল যে রাতে খলিফা হাদী মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মামুনের পিতা হারুন খিলাফতের মসনদে বসেছিলেন [১]।

প্রাথমিক অবস্থা..... চরিত্র ও যোগ্যতা:

মামুনের মা ছিলেন মারাজিল নাম্নী এক দাসী, যিনি তাঁর জন্মের কয়েক দিন পরেই মারা যান। এভাবে মামুন মায়ের মমতা পাননি [২]। যখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর হলো, তখন তাঁর পিতা তাঁর মেধা ও চতুরতা আঁচ করতে পেরে বড় বড় আলেমদের কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু করান। ইমামুল কিরাত হযরত কিসায়ী (রহ.) তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হন। মামুন তাঁর কাছে পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করেন। ইমাম কিসায়ী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল যে তিনি মাথা নিচু করে বসে থাকতেন। যদি মামুন সঠিক পড়তেন তবে তিনি চুপ থাকতেন। ভুল করলে তিনি মাথা তুলে তাকাতেন। মামুন তা বুঝে নিতেন এবং সংশোধন করে নিতেন। একবার তিনি এই আয়াতটি পড়ছিলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো?) [৩]

ইমাম কিসায়ী (রহ.) আয়াতটি শোনামাত্রই হঠাৎ মাথা তুললেন। মামুন ভাবলেন হয়তো ভুল হয়েছে। তিনি মনোযোগ দিয়ে আয়াতটি পুনরায় পড়লেন কিন্তু দেখলেন যে প্রথমবারও তিনি একইভাবে পড়েছিলেন। ইমাম কিসায়ী (রহ.) তখনও মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে কিরাতে কোনো ভুল ছিল না।

[১] তারিখুত তাবারী: ১৭০ হিজরী; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/২৭৩।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/২৭৪।

[৩] সূরা আস-সাফ, আয়াত: ২।

শিক্ষক চলে যাওয়ার সাথে সাথেই মামুন বাবার কাছে গিয়ে বললেন:

“আপনি যদি আমার শিক্ষককে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করুন।”

হারুন বললেন: “হ্যাঁ! তিনি স্বামী সাহেবদের জন্য কিছু ভাতা নির্ধারণ করার কথা বলেছিলেন। আমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তিনি কি তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন?”

মামুন বললেন: “না।” তারপর পাঠের ঘটনাটি শুনিয়া বললেন: “শিক্ষকের দৃষ্টি এই আয়াতের ওপর পড়া অকারণে হতে পারে না।”

হারুন শিশুর এই বুদ্ধিমত্তায় আনন্দিত হলেন। [১]

এই সময়েই মামুন কুরআন মাজীদ হিফজ করেন যা ছিল অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। [২] কুরআন হিফজ করার পর ইমাম কাসায়ী (রহ.)-এর নিকট থেকেই নাহ্, আদব এবং আরবি শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন।

আল্লামা ইয়াজিদী তাঁর নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্বভাবগতভাবে কঠোর ছিলেন। একবার তিনি এলে মামুনের উপস্থিতি হতে দেহি হয়ে গেল। আল্লামা ইয়াজিদীর কাছে এটি অপছন্দনীয় মনে হলো। তিনি ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল: “আপনার অনুপস্থিতিতে সাহেবজাদা আমাদের অনেক বিরক্ত করেন।”

কিছুক্ষণ পর মামুন এসে পৌঁছালেন। আল্লামা ইয়াজিদী দেখা মাত্রই সজোরে সাতটি বেত্রাঘাত করলেন। মামুন কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় খাদেমরা ঘোষণা করল: “রাষ্ট্রের উজির জাফর বারমাকি আসছেন।”

মামুন দ্রুত চোখের পানি মুছে কার্পেটের ওপর বসে পড়লেন। জাফর বারমাকি এসে মামুনের সাথে কিছু কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। এই সময়ে আল্লামা ইয়াজিদী ঘাবড়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উজির চলে যাওয়ার পর ইয়াজিদী এসে মামুনকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি উজিরের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করোনি তো?”

মামুন বললেন: “আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি জাফরের কাছে কেন অভিযোগ করব, আমি তো খলিফার কাছেও কিছু বলব না। আমি কি জানি না যে শিক্ষা ও আদব শেখার মধ্যে আমারই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।” [৩]

মামুনের আদব বা শিষ্টাচারের এই ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য যে, একবার জুবাইদা খাতুন এবং হারুনের মধ্যে আমিন ও মামুনের যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। হারুন মামুনের প্রশংসা করছিলেন আর জুবাইদা তাঁর পুত্র আমিনের।

অবশেষে হারুন পরীক্ষার জন্য একজন গোলামকে ডাকলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমিন ও মামুনের কাছে পর্যায়ক্রমে যাও এবং জিজ্ঞাসা করো:

“যদি খলিফা ইন্তেকাল করেন এবং আপনি খেলাফত লাভ করেন, তবে আমাদের মতো উৎসর্গিত প্রাণদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে?”

গোলাম প্রথমে আমিনের কাছে গিয়ে এই প্রশ্ন করল। সে সরলভাবে বলল যে, তোমাকে এত এত জায়গির ও সম্পদ দিয়ে দেব। এবার গোলাম গিয়ে একই প্রশ্ন মামুনকে করল। মামুন কলমদানি তুলে গোলামের মুখে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন:

“বেয়াদব! আমিরা মুমিনীন না থাকলে আমরা বেঁচে থেকে কী করব? তাঁর ওপর কি আমরা উৎসর্গিত হব না?”

[১] আল-মুখতার মিন নাওয়াদিরিল আখবার লিল আনবারি, পৃ. ২২-২৩, ত. দার কানান বাগদাদ

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৩১

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৩০-২৩১

তামাম এসে হারুন ও জুবাইদাকে উভয় শাহজাদার উত্তর শোনালেন, যা থেকে প্রমাণিত হলো যে মামুন আদব, আখলাক এবং বুঝ ও বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে। [১]

মামুন হশাইম, হাজ্জাজ আওয়ার, আব্বাদ বিন আওয়াম এবং ইউসুফ বিন আতিয়্যার মতো মুহাদিসগণের নিকট হাদিস পড়েছিলেন।

হারুনের রশিদের যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদিস ও ফকিহ ছিলেন ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করতেন। হারুনের ইচ্ছা ছিল যে তিনি বাগদাদে তশরিফ আনবেন এবং শাহজাদাদেরকে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ‘মুয়াত্তা’ পড়াবেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওজর পেশ করলেন এবং জবাবে বলে পাঠালেন: “এই ইলম আপনাদের ঘর থেকেই এসেছে। যদি আপনারা নিজেই এর সম্মান না করেন, তবে আর কে করবে?” [২]

হারুন এরপর মদিনায় হাজির হলেন এবং শাহজাদাদেরকে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মুয়াত্তা পড়ালেন। [৩] আল্লামা সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, মামুন ইমাম মালিকের নিকট যে পাণ্ডুলিপি থেকে মুয়াত্তা পড়েছিলেন, তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিশরের কুতুবখানায় সংরক্ষিত ছিল। [৪]

হাদিস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করুন যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে এল এবং দরবারে নৈকট্য লাভের জন্য বলল: “আমি একজন মুহাদিস এবং সারা জীবন এই শাস্ত্রেই ব্যয় করেছি।”

মামুন একটি মাসআলা পেশ করে সে সম্পর্কিত হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে একটি হাদিসও শোনাতে পারল না। এবার মামুন সেই মাসআলায় সনদসহ বেশ কিছু হাদিস শুনিয়ে দিলেন। এরপর তাকে অন্য একটি মাসআলা সম্পর্কে হাদিস জিজ্ঞাসা করলেন। সে চুপ থাকল। মামুন এই বিষয়েও সনদসহ বেশ কিছু হাদিস শুনিয়ে দিলেন। এরপর বললেন: “লোকেরা তিন দিন হাদিস পড়ে মনে করে যে মুহাদিস হয়ে গেছে। চলো, একে তিন দিরহাম দিয়ে দাও।” [৫]

একবার এক মহিলা এসে অভিযোগ করল যে, আমার ভাই ছয়শ আশরাফি রেখে মারা গেছে, কিন্তু ওয়ারিশরা আমাকে মাত্র একটি আশরাফি দিয়েছে। মামুন এক মুহুর্তেই হিসাব কষে নিলেন এবং বললেন: “যদি আমার আন্দাজ সঠিক হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী তোমার অংশে একটিই আসে।” উপস্থিতরা অবাক হয়ে গেলেন। উলামায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন: “আমিরুল মুমিনীন! তা কীভাবে?” মামুন বললেন: “মরহমের দুই মেয়ে থাকবে।” মহিলাটি ইতিবাচক উত্তর দিলে মামুন বললেন: “দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশ আশরাফি তারা পেয়েছে।” এরপর বললেন: “মা-ও জীবিত থাকবেন।” মহিলাটি স্বীকার করলে মামুন বললেন: “ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ একশ আশরাফি তিনি পেয়েছেন।” এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: “তার স্ত্রীও থাকবে।” মহিলাটি বলল: “জি হ্যাঁ।” মামুন বললেন: “তবে বাকি একশ আশরাফির আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ১২ তাকে দেওয়া হয়েছে। এবার সত্যি বলো যে, তোমার কি বারোজন ভাই আছে?” মহিলাটি বলল: “জি হ্যাঁ।” মামুন বললেন: “দুইটি করে আশরাফি তারা পেয়েছে। ফলে তোমার জন্য বাকি একটিই রয়ে গেছে।” [৬]

[১] আল-ফাওয়ারি ফিজ জুরারি লি-ইবনি আদিম, পৃ. ৮৩, ত. দারুল হিদায়াহ

[২] আল-মামুন আল-আব্বাসি লি-মাআলি, পৃ. ১৭, ১৮; হাওয়াল: আল-হিকাম ওয়াল আদাব লিল ইয়াকুত আল-মুসতাসিমি, পৃ. ৭১

[৩] তারিখুল খুলাফা লিস সুয়ুতী, পৃ. ২১৭, ত. নিযার

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৪২

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৩১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ২১৮ হিজরি

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের খুব শৌখিন ছিলেন, কখনো কখনো রমজান মাসে প্রতিদিন একবার খতম করতেন। আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) বলেন যে, বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় আলেম ও বিদ্বান ব্যক্তি আর কেউ অতিবাহিত হননি। মামুন ইসলামে প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তবে কবিতা, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। [১]

খিলাফতের সূচনা এবং ফজল বিন সহল পরিবারের আধিপত্য:

মামুনের খিলাফতের সূচনা আমিনের হত্যার পর ২৬ মহররম ১৯৮ হিজরিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি মামুনের নয় বরং তাঁর উজির ফজল বিন সহলের শাসন ছিল। ফজলের ভাই হাসানও শাসনে সমান অংশীদার ছিলেন। ফজলের জন্ম ১৪৭ হিজরিতে এবং হাসানের জন্ম ১৬১ হিজরিতে হয়েছিল। তাঁদের পিতা সহল মজুসি (অগ্নিপূজক) ছিলেন এবং এই দুই ভাইও যৌবনকাল পর্যন্ত সেই ধর্মের অনুসারী ছিলেন।

মামুন যখন শিশু ছিলেন, তখন হারুনুর রশিদের তাঁর জন্য একজন খাদেমের প্রয়োজন দেখা দেয়। জাফর বারমাকি ফজল বিন সহলকে পেশ করেন। হারুন তাকে দেখার জন্য কাছে ডাকলেন। ফজল বিন সহল হারুনের সামনে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। হারুন কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “আমিরুল মুমিনীন! গোলামের সৌভাগ্য যে তার অন্তরে তার প্রভুর প্রতি ভীতি সঞ্চার হয়েছে।” হারুন এই উত্তরে খুশি হলেন এবং তাকে মামুনের সেবায় নিয়োজিত করলেন। খুব দ্রুতই তিনি মামুনের মন জয় করে নিলেন। ১৯০ হিজরিতে যখন মামুনের বয়স ২০ বছর, ফজল বিন সহল তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দেন এবং শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। সেই সময় ফজল বিন সহলের বয়স ছিল ৩৯ বছর। এখন তিনি মামুনের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। হারুনের মৃত্যুর পর তিনি মামুনকে পুরোপুরি নিজের কবজায় নিয়ে নেন। [২]

বাস্তবতা এই যে, বারমাকিরা হারুনুর রশিদকে যেভাবে বশ করতে পারেনি, ফজল বিন সহল মামুনকে তার চেয়ে বেশি ঘেরাও করে রেখেছিলেন। হারুন সবদিকে নজর রাখতেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতেন। অন্যদিকে মামুন রাজনৈতিক বিষয় থেকে বিমুখ ছিলেন। শাসনের সর্বসর্বা ছিলেন ফজল বিন সহলই। তাঁকে “ঘুর রিয়াসাতাইন” উপাধি দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কলম ও তলোয়ারের অধিকারী। অন্য কথায়, রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই তাঁর হাতে ছিল।

মামুনের খলিফা হওয়ার পরও ফজল বিন সহল তাঁকে বাগদাদ যেতে বাধা দেন; কারণ বাগদাদে বনু আব্বাস এবং অন্যান্য আরব আমিররা মজুসি বংশের একজন শিয়াকে শাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দিতেন না। তবে খোরাসানে, যেখানে সবাই আজমি (অনারব) ছিল, ফজল বিন সহল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। তাই মামুনের প্রস্তাব অনুযায়ী বাগদাদ জয় করার পরও তিনি সেখানে যাননি বরং খোরাসানের কেন্দ্র ‘মার্ভ’-এই অবস্থান করেন। এরপর ফজল বিন সহল নিজের আধিপত্যের জন্য মামুনের জেনারেলদের শাসনের বাইরে রাখার চেষ্টা শুরু করেন; যাতে তারা সালতানাতের প্রকৃত অবস্থা মামুনের সামনে তুলে ধরে ফজল বিন সহলের জাল থেকে বের করে আনতে না পারে।

ফজল বিন সহল প্রথমে মামুনকে তাহির বিন হুসাইনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করেন। তিনি মামুনকে মনে করিয়ে দেন যে তাহির...

[১] তারিখুল খুলাফা, ২২৬।

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ১৪৯/৫ এবং ওফয়াতুল আয়ান: ৪১/৪।

আমিনের কেবল গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, হত্যার নয়। সেই সময় মামুন এই অভিযোগটি না শোনার ভান করলেন, কিন্তু তিনি অবশ্যই এটি অনুভব করেছিলেন যে তাহেরের কেন্দ্রের কোনো পদে থাকা উচিত নয়। ফলে তিনি তাহের বিন হুসাইনকে এই মর্মে আদেশ লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন বাগদাদ এবং ইরাক ও শামের বিজিত এলাকা ফজল বিন সহলের ভাই হাসান বিন সহলের নিকট হস্তান্তর করেন এবং নিজে শামের সীমান্তবর্তী শহর রাক্কায় চলে যান এবং আল-জাজিরার শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহের বিন হুসাইন অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন, কিন্তু তিনি আদেশ পালনার্থে রাক্কায় চলে গেলেন এবং কার্যত একজন নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।

হাসান বিন সহল বাগদাদে পৌঁছে নিজের পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এভাবে এই দুই পারস্য বংশোদ্ভূত ভাই ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং মামুনকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে থাকলেন। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০৯/১৪

ফিতনা-ফাসাদ এবং বিদ্রোহের আন্দোলনসমূহ

সিরিয়ার বিদ্রোহীদের দমন:

আমিনুর রশীদের শাসনামলে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার বংশধরদের মধ্য থেকে আবু আল-উমাইতির সুফিয়ানি নামক এক নেতা বিদ্রোহ করে দামেস্কসহ সিরিয়ার একটি বড় অংশ দখল করে নিয়েছিলেন। আমিন তার দুর্বলতা ও উদাসীনতার কারণে তার আধিপত্য খতম করতে পারেননি, কিন্তু মামুন সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। মামুনের অনুগত একজন আরব আমির ইবনে বাইহাস কিলাবি গোত্রগুলোকে একত্রিত করে সুফিয়ানিকে বিতাড়িত করেন এবং এভাবে সিরিয়া পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। [১]

সাদাতদের বিদ্রোহসমূহ:

বনু হাশিমের সাদাতদের মধ্যে অনেকেই আব্বাসীয়দের শাসনকে মনেপ্রাণে মেনে নেননি। এদিকে বাগদাদে মামুনের অনুপস্থিতি এবং প্রশাসনিক বিষয়ে হাসান বিন সহলের মতো শিয়াদের আধিপত্যের কারণে বনী ফাতিমার কিছু শিয়া অনুসারীদের মনে হলো যে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নেন “আবু আল-সরায়া” নামক একজন আরব সর্দার। তার আসল নাম ছিল “সারী বিন মনসুর শায়বানী”। প্রথমে তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন, পরে লুটতরাজ শুরু করেন এবং ডাকাত হয়ে যান। কুফা তখন শিয়াদের দুর্গে পরিণত হয়েছিল। সেখানে “ইবনে তাবাতাবা” উপাধিতে পরিচিত মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম নামক একজন ফাতেমী বুজুর্গ ছিলেন, যার বেশ ভালো অনুসারী ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ছিলেন হযরত হাসান (রা.)-এর প্রপৌত্র।

আবু আল-সরায়া বিদ্রোহের একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি ইবনে তাবাতাবার আস্থা অর্জন করেন এবং “আল-রিদা মিন আল-ই-মুহাম্মদ” এবং কিতাব ও সুন্নাহ বাস্তবায়নের স্লোগান তুলে একই সাথে বেশ কয়েকটি স্থানে বিদ্রোহ শুরু করিয়ে দেন। প্রতিটি স্থানে আলাদা আলাদা সাদাতদের ব্যবহার করা হয় এবং ইবনে তাবাতাবাকে এই পুরো আন্দোলনের প্রধান হিসেবে পরিচিত করানো হয়। ১০ই জমাদিউল আখিরা ১৯৯ হিজরিতে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া হয়, শিয়ারা ইবনে তাবাতাবার হাতে বায়াত গ্রহণ করে কুফা দখল করে নেয়। আব্বাসীয়দের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগান ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অন্যান্য প্রদেশে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একাধিক সাদাতকে দাঁড় করানো হয়। এভাবে ইরাক ও পারস্য থেকে শুরু করে হিজাজ ও ইয়েমেন পর্যন্ত সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

২৯শে জমাদিউল আখিরা বাগদাদ থেকে দশ হাজার সরকারি সৈন্য কুফায় পৌঁছায়, কিন্তু আবু আল-সরায়া তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। যেহেতু ইবনে তাবাতাবার উপস্থিতিতে আবু আল-সরায়া তার ক্ষমতার লালসা পূরণ করতে পারছিলেন না; তাই বিজয়ের পরপরই তিনি বিষ প্রয়োগ করে ইবনে তাবাতাবাকে হত্যা করেন এবং নামমাত্র আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ নামক এক নাবালক ছেলেকে সামনে রেখে...

[১] আল-মাআরিফি খাইরুন্ন মিন খবর: ১/২৫৬

...সেখান থেকে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল। প্রসিদ্ধ ছিল যে, এই বালক হযরত জয়নুল আবেদিন-এর প্রপৌত্র। এর আড়ালে আবুল সারায়ী আন্দোলনের প্রধান হয়ে গেল এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ওয়াসিত ও মাদায়েন দখল করে ইরাকে নিজের শাসন জারি করল। তার দুইজন নায়েব ছিল: একজন হুসাইন আফতাস এবং দ্বিতীয়জন য়ায়েদ আন-নার। ঐতিহাসিকদের মতে, য়ায়েদ আন-নার হযরত জাফর সাদিক-এর ভাই এবং হুসাইন আফতাস হযরত জয়নুল আবেদিন-এর প্রপৌত্র। (আল্লাহু আলাম)

আলাউয়ীদের এই আন্দোলনগুলোর সাথে পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর পার্থক্য:

আলাউয়ীদের এই আন্দোলন যা মামুনের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা এই দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন ছিল যে, পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর অধিকাংশ নেতা ইলম ও আমল এবং পরহেযগারী ও তাকওয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের সাদাত এবং সঠিক আকিদাপন্থী হওয়া স্বীকৃত ও নিশ্চিত ছিল। তারা কোথাও লুটতরাজ, রক্তপাত এবং জুলুম-নির্যাতন করেননি। তাদের সমর্থকদের মধ্যে মধ্যপন্থী শিয়া এবং রাফেযীরা মিশ্রিত ছিল। কিন্তু মামুনের যুগ থেকে শুরু হওয়া সাদাতদের আন্দোলনগুলো যা পরবর্তী শতাব্দীতেও চলতে থাকে, তা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। তাদের অধিকাংশ নেতা ইলম ও ফযিলত অথবা যুহদ ও ইবাদতে পরিচিত ছিলেন না। তাদের সাদাত হওয়া প্রসিদ্ধ অবশ্যই ছিল কিন্তু তা তাওয়াতুর (অকাট্য ধারাবাহিকতা) পর্যন্ত নয়। এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, কেউ কেউ নিজেকে ভুলভাবে সাদাত হিসেবে প্রসিদ্ধ করেছে অথবা কারো সম্পর্কে কোনো বর্ণনাকারী ভুল তথ্য দিয়েছে। তাদের কারো কারো চরিত্র ছিল অত্যন্ত জঘন্য। কারো কারো ব্যাপারে ভ্রান্ত আকিদার সন্দেহও হয়। তাদের অধিকাংশ যেখানেই দখল করেছে সেখানে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে কোনো কমতি রাখেনি। তাদের সমর্থকদের মধ্যে বড় একটি সংখ্যা ছিল রাফেযীদের। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাদের নিকট সাধারণ মুসলিমদের জান ও মাল মূল্যহীন ছিল যেমনটি রাফেযীদের আকিদা; এজন্যই সব জায়গায় নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। মোটকথা, দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষ এবং তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুতে সাদাতদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত আন্দোলনগুলো রাফেযীদের হাতে এসে অত্যন্ত সহিংস রূপ ধারণ করেছিল। তাদের এবং সাধারণ বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট ছিল না বরং ফিতনা ও ফাসাদের ক্ষেত্রে তারা সাধারণ বিদ্রোহীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

য়ায়েদ আন-নার বসরায় বনু আব্বাস এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ করিয়েছিলেন। আগুন লাগানোর কর্মকাণ্ড এত অধিক পরিমাণে করেছিলেন যে, তার নামই ‘য়ায়েদ আন-নার’ পড়ে গিয়েছিল। [১]

যাইহোক, কিছুদিন পর সরকারি বাহিনী হারসামা বিন আয়ুন-এর নেতৃত্বে এসে পৌঁছাল। ১৬ মহররম ২০০ হিজরিতে হারসামা কুফায় আক্রমণ করে আবুল সারায়ী এবং তার দলকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করল। এরপর পিছু ধাওয়া করে আবুল সারায়ী এবং আন্দোলনের নামমাত্র নেতা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদকে ধরে ফেলা হলো। আবুল সারায়ীকে হাসান বিন সাহল-এর কাছে আনা হলো, যে তার শিরশ্ছেদ করাল এবং দেহ দুই টুকরো করে বাগদাদের পুলে ঝুলিয়ে দিল। [২]

আন্দোলনের দ্বিতীয় নেতা য়ায়েদ আন-নারকে গ্রেপ্তার করে মামুনুর রশিদের সামনে পেশ করা হলো। মামুন তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১৮/১৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১৪/১৪

এবং হযরত আলী রেযা (রহ.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যিনি যায়েদ আন-নারের ওপর এতটাই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে সারাজীবন তার সাথে কথা বলেননি।

এর আগে আন্দোলনের একজন দাঈ হুসাইন আফতাস ‘রেযায়ে আলে মুহাম্মদ’-এর দাওয়াত নিয়ে হজের মৌসুমে মক্কায় পৌঁছেছিলেন। আব্বাসীয় আমীররা ভয়ে হিজাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং হজের কার্যাদি কোনো ইমাম ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছিল। হুসাইন আফতাস মক্কায় যা করেছিলেন তা মানুষ চরম ঘৃণার চোখে দেখেছিল। তিনি মসজিদে হারামে গিয়ে বললেন:

“আমরা কাবাকে বনু আব্বাসের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করব।”

এই বলে তিনি কাবার মূল্যবান গিলাফ খুলে ফেললেন এবং তাকে একটি সাধারণ হলুদ গিলাফ পরিয়ে দিলেন যার ওপর আবুল সারায়ার নাম খোদাই করা ছিল।

ইবনে আফতাস পরবর্তীতে যা করেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কাবার গিলাফ পরিবর্তন করাও ছিল লুটপাটের একটি বাহানা মাত্র। তিনি কাবার ধনভাণ্ডার এবং ওয়াকফকৃত সম্পদও লুট করে নিলেন। কাবায় এই ধনভাণ্ডার দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত ছিল। আফতাস বললেন:

“কাবার এগুলোর কী প্রয়োজন? আমরা এগুলো দিয়ে আমাদের যুদ্ধে সাহায্য নেব।”

এরপর থেকে কাবার জন্য ধনভাণ্ডার রাখার প্রথা শেষ হয়ে গেল। [১]

আফতাস মসজিদে হারামের কোণায় কোণায় তল্লাশি চালালেন, কিছু জায়গায় বনু আব্বাসের ধনভাণ্ডার পুঁতে রাখা ছিল। খনন করে সেগুলো বের করলেন। এরপর হারামের স্তম্ভগুলোতে লাগানো সোনা চৈঁছে চৈঁছে তুলে নিলেন। তারপর মসজিদের জানালা ও জালিগুলো উপড়ে ফেলে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিলেন। যাদেরকে হাতের নাগালে পেলেন তাদের মারধর করে তাদের ধন-সম্পদ দখল করে নিলেন। মানুষ এই চরম অরাজকতা দেখে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল। [২]

আশঙ্কা ছিল যে এখন হয়তো মদিনাতুর রাসুলেরও একই অবস্থা হবে। কিন্তু এরই মধ্যে ইরাক থেকে খবর এল যে, মামুনের সেনাপতি হারসামা বিন আয়ুন আবুল সারায়াকে পরাজিত করেছেন এবং তার বাহিনীকে নির্মূল করা হয়েছে।

হুসাইন আফতাস যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মক্কায় অবস্থানরত মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিকের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন আলেম, ফাযেল ব্যক্তি এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। হুসাইন আফতাস তাঁকে প্ররোচিত করলেন যে, আবুল সারায়ার মৃত্যু এবং মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদের গ্রেপ্তারের পর সমস্ত মুসলমান আপনার কাছে বায়আত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। আপনি তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করুন। মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক প্রথমে অস্বীকার করলেন কিন্তু পরে তাঁর ছেলে আলীর পীড়াপীড়িতে বায়আত গ্রহণ করলেন এবং এই আন্দোলনের নতুন আমীর হলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে আলীও ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে হুসাইন আফতাসের সাথে মিলে মক্কায় এমন তাগুব চালাল যে নারী ও শিশুদের সম্মান পর্যন্ত নিরাপদ থাকল না। মানুষ ‘আল-আমান ওয়াল হাফিজ’ বলে চিৎকার করতে বাধ্য হলো।

এই সময়ে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য আব্বাসীয় বাহিনী চলে এল। মক্কায় ইমামতের দাবিদার মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক ক্ষমা চাইলেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জুহাইনায় পুনরায় একটি দল গঠন করলেন এবং মদিনা দখল...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪৪০/১, মুকাদ্দিমা; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৩, ১১০/১৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৩, ১১০/১৪। শিয়া ঐতিহাসিকরাও এটি স্বীকার করেছেন। ওয়াহিদ মাল আল-কাবা, উমদাতুত তালিব: ৩৩৮/১

করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তারা পরাজিত হন এবং যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি ওজর পেশ করে বললেন: “আমাকে আমিরুল মুমিনিন মামুনের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দেওয়া হয়েছিল; তাই আমি বিদ্রোহে উদ্যত হয়েছিলাম।” তিনি আব্বাসীয়দের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন এবং বায়আত নবায়ন করলেন। তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তিনি মামুনের সাথেই থাকলেন এবং ২০৩ হিজরিতে তার মৃত্যু হলে মামুন নিজেই তার জানাজার নামাজ পড়ান। [১]

এই সময়ে ইয়ামেনে ইব্রাহিম বিন মুসা বিদ্রোহ করেন। ঐতিহাসিকগণ এই ব্যক্তিকে হযরত জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি এবং হযরত মুসা কাজিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে বলে উল্লেখ করেন। তিনি ইয়ামেনে আব্বাসীয় এবং তাদের সমর্থকদের এত অধিক পরিমাণে হত্যা করেন এবং এমন লুটতরাজ চালান যে তার উপাধিই হয়ে যায় ‘জাজ্জার’ (কসাই)। কিছুকাল পর ইব্রাহিম জাজ্জারের এক ছেলে জাফরও বিদ্রোহ করেন। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মামুন এখানেও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে ২০৭ হিজরিতে জনৈক আলভী ভাগ্যসন্ধানী আব্দুর রহমান বিন আহমদ ইয়ামেনে বিদ্রোহ করেন। তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর মামুন যথারীতি ভালো ব্যবহার করেন এবং বাগদাদে ডেকে এনে দরবারে স্থান দেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন যে, এখন থেকে আলভীরা আব্বাসীয়দের কালো দরবারি পোশাক পরিধান করবে। [২]

এটা স্পষ্ট যে, এই ব্যক্তিদের আন্দোলনগুলো ক্ষমতা দখলের তাড়াহুড়ো ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যাতে মুসলমানদের কোনো ফায়দা ছিল না বরং ক্ষতি ছিল সীমাহীন। [৩]

হারসামা বিন আয়ান হত্যা:

১৯৯ হিজরিতে বিদ্রোহের এই ঢেউ যে দ্রুতগতিতে উঠেছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যে আব্বাসীয় রাষ্ট্র মাত্র কয়েক দিনের মেহমান। কিন্তু মামুনের সেনাপতিদের তৎপরতা ও নিপুণতার বদৌলতে দুই বছরের মধ্যে এর শিখা নিভিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে এ কথা সন্দেহাতীত যে, এই অভিযানের সাফল্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল হারসামা বিন আয়ানের। অন্যদিকে...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৩০৫, ৩০৬; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০৪ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/১১৫, ১৬১।

[৩] মামুনের আমলের এই আন্দোলনগুলোর কিছু নেতার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, তারা সাদাত হওয়ার মিথ্যা দাবি করেননি তো? তবে তাদের বংশপরিচয় জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই যুগের সকল ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহীদের ফাতেমি বা আলভী হিসেবেই গণ্য করেছেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জায়েদ আন-নার বসরায়, হুসাইন আফতাস মক্কায়ে এবং ইব্রাহিম জাজ্জার ইয়ামেনে যা কিছু করেছেন তা সাদাতদের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বিদ্রোহের এই ঢেউয়ে শরিক নেতাদের বংশপরিচয় ঐতিহাসিকগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন:

- কুফার প্রথম প্রধান: ইবনে তাবাতাবা মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন হাসান বিন হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব।
- দ্বিতীয় প্রধান: মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন জায়েদ বিন আলী জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।
- তৃতীয় প্রধান: মুহাম্মদ বিন জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলী জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।
- মদিনার প্রধান: হুসাইন আফতাস বিন হাসান বিন আলী বিন আলী জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।
- বসরার প্রধান: জায়েদ আন-নার বিন মুসা কাজিম বিন জাফর সাদিক বিন মুহাম্মদ বাকির বিন আলী জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।
- মক্কার প্রথম ইমামতের দাবিদার: ইব্রাহিম জাজ্জার বিন মুসা কাজিম বিন জাফর সাদিক বিন মুহাম্মদ বাকির বিন আলী জয়নুল আবেদিন বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব।
- মক্কার দ্বিতীয় ইমামতের দাবিদার: ইব্রাহিম জাজ্জারের পুত্র জাফর।
- ইয়ামেনের তৃতীয় ইমামতের দাবিদার: আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর বিন আলী বিন আবি তালিব।

সন্দেহ করা হয় যে, এই বিদ্রোহগুলোর পেছনে শিয়া উজির ফজল বিন সহলের গোপন হাত ছিল; কারণ যখন হারসামা বিন আয়ান এই বিদ্রোহীদের দমন করার পর বিস্তারিত বিবরণ শোনানোর জন্য মামুনের কাছে যেতে চাইলেন, তখন ফজল বিন সহল তাকে আদেশ পাঠালেন যে, তিনি যেন ‘মরভ’-এ না আসেন এবং তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। হারসামার কাছে এমন কিছু তথ্য ছিল যা মামুনকে জানানো অত্যন্ত জরুরি ছিল। এটা স্পষ্ট যে, এই তথ্যগুলো ফজল বিন সহলের বিরুদ্ধে ছিল, তাই ফজল বিন সহল এটা সহ্য করতে পারছিলেন না যে হারসামা মামুনের সাথে দেখা করুক। কিন্তু হারসামা যেকোনোভাবেই ফজল বিন সহলের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মরভ-এ পৌঁছে গেলেন।

ফজল বিন সহল যখন হারসামার আগমনের খবর পেলেন, তখন তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। তিনি হারসামার দরবারে উপস্থিত হওয়ার আগেই মামুনের মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুললেন এই বলে যে, হারসামাই বিদ্রোহীদের উস্কানি দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এই কথা যদিও বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল, কিন্তু মামুনের ফজল বিন সহলের ওপর এতটাই আস্থা ছিল যে তিনি কোনো প্রমাণ ছাড়াই তা বিশ্বাস করে নিলেন। এদিকে হারসামার আন্দাজ ছিল যে ফজল বিন সহল তার পথ আটকানোর চেষ্টা করবেন; তাই তিনি নাকাড়া ও তবল বাজাতে বাজাতে শহরে প্রবেশ করলেন যাতে মামুন তার আগমনের খবর পেয়ে যান এবং তিনি তাকে অবিলম্বে দরবারে ডেকে নেন।

যখন মামুন নাকাড়ার আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন: “এই ধুমধাম করে কে আসছে?” তখন ফজল বিন সহলের নিযুক্ত কর্মচারীরা বলল: “এ হলো হারসামা, যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গর্জন করতে করতে আসছে।” মামুন আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। হারসামা যখন দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন মামুন তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বললেন: “তুমিই কুফায় আলবীদের বিদ্রোহ করার সুযোগ দিয়েছ। আবুল সারায়াকেও তুমিই প্রশ্রয় দিয়েছ।” এই বলে তিনি হারসামাকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পর ফজল বিন সহল মামুনকে না জানিয়েই তাকে জেলে হত্যা করালেন। [১]

মামুনের এই আচরণ প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় দুর্বল ছিলেন। হারসামা মামুনের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাকে হত্যা করিয়ে মামুন নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছিলেন। মামুন যদি কান কথা না শুনে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে হারসামার বক্তব্য শুনতেন, তবে অবশ্যই ভালো হতো।

মামুনের অনুপস্থিতিতে বাগদাদের অবস্থা:

বাগদাদ থেকে মামুনের দীর্ঘ অনুপস্থিতি ক্রমাগত অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ফজল ভ্রাতৃত্ব তাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর রেখেছিলেন। এদিকে ২০১ হিজরিতে বাগদাদ এক নতুন ফিতনার সম্মুখীন হয়। বাগদাদের উজির হাসান বিন সহল তখন এখানে উপস্থিত ছিলেন না। অব্যবস্থাপনা চরমে পৌঁছেছিল এবং গুপ্তা ও লুটেরারা জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল এবং কোথাও কোনো প্রতিকার পাওয়া গেল না। জনগণ মামুন থেকে নিরাশ হয়ে তার চাচা মনসুর বিন...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/১১৫

মেহদীকে খলিফা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। তবে জনগণের ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে তিনি নায়েবে সুলতান হতে রাজি হন। এই সময়ে ডাকাত ও দস্যুদের দমনের জন্য জনগণ খালিদ বিন দিরইউশ এবং সাহল বিন সালামাহ নামক দুই সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে নিজেদের একটি সশস্ত্র দল গঠন করে অপরাধীদের পিছু ধাওয়া শুরু করে। একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস নসর বিন মালিকও মানুষকে সংগঠিত করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই অস্থায়ী ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় ছিল যতক্ষণ না উজির ফজল বিন সাহল বৈদেশিক বিষয়াদি সম্পন্ন করে বাগদাদে ফিরে আসেন। তাঁর আগমনের পর প্রশাসনিক বিষয়গুলো স্বাভাবিক হয়ে যায়। মনসুর বিন মেহদী এবং তাঁর সমর্থকরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখে শান্ত হয়ে যান। [১]

আলী রেযা (রহ.)-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার সিদ্ধান্ত, আব্বাসীয়দের প্রতিক্রিয়া এবং মামুনের বাগদাদ সফর:

এই সময়ে মামুনুর রশীদ, যিনি দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে মাৰ্ভে অবস্থান করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জট খুলতে ব্যস্ত ছিলেন, এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আব্বাসীয় বংশের হাত থেকে খেলাফত আলবীয়দের হাতে তুলে দেবেন। তিনি পুরো মুসলিম বিশ্বে বনু আব্বাসের আদমশুমারি করান এবং তারপর তাদের সবাইকে নিজের কাছে ডাকেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার। মামুন চেয়েছিলেন তাদের উপস্থিতিতে খেলাফতের এই সমস্যার সমাধান করা হোক।

নতুন হিজরি শতাব্দীর শুরুতে মামুন হযরত আলী রেযা বিন মুসা কাযিম (রহ.)-কে, যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে পাঠদান ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন, নিজের কাছে খোরাসানে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী (ওয়ালী আহদ) হিসেবে ঘোষণা করেন।

মামুনের বক্তব্য ছিল যে, এই সময়ে বনু হাশিমের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পরহেযগারী এবং বংশমর্যাদার দিক থেকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; তাই তিনিই সরকারের প্রকৃত হকদার। সেই সাথে তিনি আব্বাসীয়দের প্রতীক অর্থাৎ কালো পোশাক নিষিদ্ধ করেন এবং আলবীয়দের প্রতীক পুরো মুসলিম বিশ্বে সরকারিভাবে চালু করার নির্দেশ দেন। [২]

ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এখানে বড় বিস্ময় জাগে যে, মামুন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কীভাবে নিলেন? এ বিষয়ে সাধারণ ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, মামুনুর রশীদ সাদাতদের খুব ভালোবাসতেন; তাই তিনি তাদের ক্রমাগত বিদ্রোহ ক্ষমা করে আসছিলেন এবং শত্রুতার বদলে অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। আর এই কারণেই তিনি ক্ষমতা সাদাতদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন; কারণ তাঁর মতে এই রেযারেষি শেষ করার এটাই একমাত্র উপায় ছিল যে আব্বাসীয়রা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবে।

মামুনের এই প্রবণতা বা তাঁর সদিচ্ছাকে আমরা অস্বীকার করি না, তবে আমাদের ধারণা হলো মামুনের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর শিয়া উজির ফজল বিন সাহলের। এই সময়ে মামুন এই অশুভ উজিরের প্রতিটি কথায় চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতেন। এটা অসম্ভব নয় যে, যখন ফজল দেখলেন আলবীয়দের সাম্প্রতিক বিদ্রোহগুলো (যার নেপথ্যে তাঁরই হাত ছিল বলে মনে হয়) ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তিনি কৌশল পরিবর্তন করে মামুনকে স্বেচ্ছায় আলবীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ দেখিয়েছেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/১৮৮, ৩১০।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/১১৯; তারিখ বাগদাদ: ১৯/১৩৫; তরজমা আলী রেযা, তাবা' আল-ইলমিয়াহ।

কারণ যাই হোক না কেন, পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই প্রমাণ করে দিল যে, মামুন এই সিদ্ধান্তটি মুসলিম বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি সামনে রেখে নেননি। যদি তার পরিস্থিতির সঠিক জ্ঞান থাকত, তবে তিনি বুঝতে পারতেন যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার নয়। আর যদি এটি জোরপূর্বক কার্যকর করা হতো, তবে এর ফলে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিভেদের নতুন দ্বার উন্মোচিত হতো; কারণ প্রথমত আব্বাসীয়রা এটি মেনে নেওয়ার মতো ছিল না, দ্বিতীয়ত আলবীদেব মধ্যও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী অনেক ব্যক্তি আলী রেজা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর নিজেদের অগ্রাধিকার দিতেন।

শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল যার আশঙ্কা ছিল। আব্বাসীয়দের কেন্দ্র বাগদাদে অধিকাংশ আমীর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেন। এর একটি কারণ ছিল এই যে, তারা হারসামার হত্যার কারণে উত্তেজিত ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, আব্বাসীয় আমীররা আলবীদেব অধীনতা পছন্দ করতেন না। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, শিয়া ফজল বিন সহলের আধিপত্য তাদের কাছে একেবারেই অসহনীয় ছিল। তারা জানতেন যে আলবীদেব নামে ফজল বিন সহলই শাসন করবেন; তাই তারা প্রকাশ্যে বলতেন যে, আমরা একজন অগ্নিউপাসক-পুত্রের দাসত্ব করতে পারি না।

ফলে বাগদাদের আমীররা ২৫ জিলহজ ২০১ হিজরিতে এক সমাবেশে মামুনের বায়আত বাতিল করে তার চাচা ইব্রাহিম বিন মাহদীর হাতে বায়আত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১লা মহররম ২০২ হিজরিতে ইব্রাহিম নতুন আব্বাসীয় খলিফা হিসেবে বায়আত গ্রহণ করেন।

কিন্তু বাগদাদে মামুনের অনুগতরাও উপস্থিত ছিলেন যারা হাসান বিন সহলের নেতৃত্বে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং পুরো শহরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই ধারা ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে যার ফলে বাগদাদবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এদিকে মাৰ্ভে মামুনুর রশিদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সংক্রান্ত কাজে মগ্ন ছিলেন, তার কানে খবরও ছিল না যে দেশে কী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। ফজল বিন সহল ইচ্ছাকৃতভাবে মামুনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর রেখেছিলেন। বাকি দরবারীদের এই সাহস ছিল না যে মামুনকে সত্য জানিয়ে উজিরের সাথে শত্রুতা করবেন; কারণ তারা হারসামা এবং তাহের বিন হুসাইনের পরিণতি দেখে ফেলেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে স্বয়ং ইমাম আলী রেজা বিন মুসা কাজিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক অসাধারণ পদক্ষেপ নিলেন। তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত বংশমর্যাদার অধিকারী ও সঠিক আকিদার সাইয়েদ, বিজ্ঞ আলেম এবং দেশ ও জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি মামুনের শাসনামলে চলমান সাদাতদের কোনো বিদ্রোহী আন্দোলন পছন্দ করেননি। নিজের উত্তরাধিকার (উলি আহদি) এবং শাসনের প্রতিও তার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি মামুনকে প্রকৃত পরিস্থিতি জানিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করলেন। তিনি জানতেন যে এর ফলে ফজল বিন সহলের সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে এবং সে তার প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, এতে তার নিজের উত্তরাধিকারের বিষয়টিও প্রজ্ঞার পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হবে এবং মামুনকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। তবুও মিল্লাতের কল্যাণের স্বার্থে তিনি নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিলেন এবং সুযোগ বুঝে মামুনকে জানালেন যে দেশের পরিস্থিতি কতটা নাজুক, বাগদাদে কয়েক মাস ধরে কেমন গৃহযুদ্ধ চলছে এবং কীভাবে তার উত্তরাধিকারকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

মামুন হতবাক হয়ে গেলেন। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে ফজল বিন সহল মিথ্যাভাবে “সব ঠিক আছে” বলে জপ করে যাচ্ছিলেন। তিনি কয়েকজন নির্ভরযোগ্য আমীরকে ডেকে সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। সবাই প্রাণের নিরাপত্তা চাইলেন; কারণ যুর-রিয়াসাতাইন থেকে সবাই ভীত ছিলেন। মামুন নিজ হাতে তাদের দলিল লিখে দিলেন যে যুর-রিয়াসাতাইন তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তখন আমিরগণ কেবল এই সংবাদগুলোর সত্যতা নিশ্চিতই করেননি বরং এও বলেছিলেন: “ফজল বিন সাহল আপনার প্রত্যেক সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে, যারা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, অকারণে হত্যা করিয়েছে। তাহির বিন হুসাইন আপনার শাসনের পথ সুগম করেছিলেন, তাকেও অকারণে পত্র পাঠিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে।”

এখন মামুনের চোখ খুলল। তিনি অন্ধ ছিলেন না যে আলো আসার পরও কিছু দেখতে পাবেন না। পরিস্থিতির এই রূপ সামনে আসায় শিয়া উজিরের সেই জাদু যা বছরের পর বছর ধরে আচ্ছন্ন ছিল, তা হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই আমিরগণ পরামর্শ দিলেন যে, বাগদাদকে কেন্দ্র বানাতে এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মামুন এই পরামর্শ গ্রহণ করে কোনো বিলম্ব ছাড়াই বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এটি ছিল এক বিশাল শোভাযাত্রা যা সরকারি কোষাগার, দপ্তর এবং সমস্ত আসবাবপত্রসহ মঞ্জিলে মঞ্জিলে দীর্ঘ অবস্থানের মাধ্যমে বাগদাদ যাচ্ছিল। ফজল বিন সাহল এবং আলী রেজা (রা.)-সহ সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাথে ছিলেন। ফজল বিন সাহল মনে মনে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হতে চলেছিল। তিনি মামুনকে সত্য জানানো আমিরদের খুঁজে বের করে প্রত্যেককে শাস্তি দিলেন। কাউকে চাবুক মারলেন, কারও দাড়ি উপড়ে ফেললেন। হযরত আলী রেজা (রা.) ব্যতীত যার ওপরই তার হাত চলল, তাকে অপমান করতে কোনো ক্রটি রাখলেন না। হযরত আলী রেজা (রা.) মামুনকে এই বাড়াবাড়ির কথা জানালে তিনি বললেন: “আমি গাফেল নই। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।”

মামুনের জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। তাকে একই সাথে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। ফজল বিন সাহল রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং সমস্ত ক্রটির জন্য দায়ী ছিলেন। তার অবসান জরুরি ছিল। কিন্তু তার ভাই হাসান বিন সাহল বাগদাদের বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করছিলেন, তাকে অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো এবং নিজের অনুগত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্যথায় বাগদাদ পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যেত। ইব্রাহিম বিন মাহদীর অবসানের জন্য আলবীদের সাথে রাখা অথবা অন্তত তাদের বিদ্রোহ থেকে রেহাই পাওয়া জরুরি ছিল। এর জন্য হযরত আলী রেজা (রা.)-এর আন্তরিক সহানুভূতি বজায় রাখা বরং তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা জরুরি ছিল। মামুন এই সমস্ত কাজ সেই বছর ২০২ হিজরিতে মার্চ থেকে বাগদাদ সফরের সময় বিভিন্ন শহরে অবস্থানের সময় সম্পন্ন করেন।

সারাখসে অবস্থানের সময় উজির যুর-রিয়াসাতাইন ফজল বিন সাহলের ওপর হঠাৎ প্রাণঘাতী হামলা হয় এবং তিনি নিহত হন। মামুন হামলাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এই কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন। এভাবে একজন বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকে তার জান বাঁচল। এটি বোঝা মোটেও কঠিন নয় যে, মামুন যুর-রিয়াসাতাইনের চালের জবাব তার নিজস্ব কায়দাতেই দিয়েছিলেন।

তার ভাই হাসান বিন সাহলকে বাগদাদে নিজের সমর্থক হিসেবে ইব্রাহিম বিন মাহদীর সামনে টিকিয়ে রাখা জরুরি ছিল; তাই মামুন প্রথমে পত্র পাঠিয়ে তার ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। এরপর ভাইয়ের স্লামাভিষিক্ত হিসেবে তাকে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উজির বানানোর ঘোষণা দেন। এরপর হাসান বিন সাহলের কন্যা বুরানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার সাথে শ্বশুর ও জামাতার সম্পর্কও স্থাপন করেন। অন্যদিকে হযরত আলী রেজা (রা.)-এর বিবাহ নিজের কন্যার সাথে দিয়ে তাকে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২৫/১৪

আলী রেজা রহ.-এর মৃত্যু:

২০২ হিজরিতে শুরু হওয়া এই সফর ২০৩ হিজরিতেও অব্যাহত ছিল। মামুন ইরানে প্রবেশ করেন। তুসে পৌঁছালে দীর্ঘ অবস্থান করেন। এখানে তিনি তাঁর পিতার কবরে উপস্থিত হন। এখনও সফর শুরু হয়নি; ঘটনা হলো হযরত আলী রেজা অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ করেই তিনি মারা যান। তিনি আঙুর খেয়েছিলেন যা অসুস্থতার কারণ হয়েছিল। মামুন অত্যন্ত শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তাঁর পিতা হারুনুর রশিদের পাশে দাফন করেন। [১]

আলী রেজা ১৪৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সময়ের বিখ্যাত আলেম, আবেদ, জাহিদ এবং চিকিৎসক ছিলেন। মামুনের তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি ও আন্তরিক ভালোবাসা ছিল।

শিয়া ঐতিহাসিকরা মামুনের বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ এনেছেন, কিন্তু এটি সঠিক নয়। মামুনের জীবন এর সাক্ষী যে তিনি বিদ্রোহকারীদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের ওপর বিজয় লাভের পর তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছেন। বিরোধীদের সাথে ভালো ব্যবহারকারী ব্যক্তি আলী রেজার মতো মহৎ ব্যক্তির ওপর কেন জুলুম করবেন? মামুন তাঁর শেষ অসিয়তেও তাঁর উত্তরসূরিদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন; তাঁদেরকে সহচর বানাতে এবং তাঁদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [২] এটি কি সম্ভব যে তিনি আলবীদের ওপর জুলুম করবেন এবং তাও আবার নির্দোষ ব্যক্তির ওপর? [৩]

তবে এটি সত্য যে আলী রেজার মৃত্যুতে মামুনের এই রাজনৈতিক সুবিধা হয়েছিল যে বাগদাদের যে আব্বাসীয়রা আলী রেজার মনোনয়নের বিরোধী ছিল, তারা শান্ত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে মামুন বাগদাদবাসীদের নামে তাঁর পত্রে আলী রেজার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশের পর লিখেছিলেন:

“আপনারা আমার ওপর এই কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন যে আমি হযরত আলী রেজাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি। এখন দেখুন তিনি ইন্তেকাল করেছেন; অতএব এখন আনুগত্য গ্রহণ করুন।” [৪]

বাগদাদে মামুনের সিংহাসন আরোহণ:

বাগদাদে এরপরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ইব্রাহিম বিন মাহদী এবং মামুনের সমর্থকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। তবে মামুন যখন বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছালেন, তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম বিন মাহদীর সাথে অল্প কিছু লোক রয়ে গেল। মামুন তখন হামাদান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁকে খবর দেওয়া হলো যে বাগদাদে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৬/১৪

[২] তারিখ তাবারী: ২১৮ হিজরি

[৩] আমরা সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করছি না। তবে ঐতিহাসিক রেকর্ডে এমন কোনো দুর্বল বর্ণনাও পাওয়া যায় না যাতে মামুনের ওপর হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তবে প্রবল ধারণা এই যে এটি ফজল বিন সহল বা তাঁর বংশধরদের কাজ হবে; কারণ ফজল বিন সহলের আসল রূপ সামনে আনা এবং মামুনকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল হযরত আলী রেজার। সুতরাং হযরত আলী রেজার সাথে যদি কারো শত্রুতা থেকে থাকে, তবে তা ফজল বিন সহল পরিবারের গোষ্ঠীরই হতে পারে। অথবা এমন আব্বাসীয় আমিররা এই ষড়যন্ত্র করতে পারে যারা হযরত আলী রেজার উত্তরাধিকারী হওয়াতে খুশি ছিলেন না।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৬/১৪

এসেছেন।

বাগদাদে পৌঁছানোর আগে মামুন তাহির বিন হুসাইনকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে ১৬ সফর ২০৪ হিজরিতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বাগদাদে প্রবেশ করেন। খলিফা হওয়ার ছয় বছর পর তিনি রাজধানী খিলাফতের আসনে বসেন। [১]

প্রায় এক শতাব্দী ধরে বনু আব্বাস কালো পোশাক, কালো পাগড়ি এবং কালো পতাকাকে নিজেদের প্রতীক বানিয়ে রেখেছিল। আলবীরা সাদা কাপড়, সাদা পাগড়ি এবং সাদা পতাকা গ্রহণ করেছিল। মামুন আলবী ও আব্বাসীদের মধ্যে ঐক্যের পথ বের করার জন্য এই নতুনত্ব অবলম্বন করেন যে, এই উভয় রঙের পরিবর্তে সবুজ কাপড় এবং সবুজ পতাকার প্রচলন শুরু করেন। এর একটি কারণ এটিও ছিল যে, হযরত আলী রেযা সবুজ পোশাক ব্যবহার করতেন। মামুন শুরুতে এই বিষয়ে এতটাই কঠোরতা অবলম্বন করেন যে, কালো কাপড় দেখামাত্রই তা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ জারি করেন। এক মাস পর্যন্ত এই কঠোরতা বজায় থাকে, কিন্তু যেহেতু আব্বাসীরা কালো রঙই পছন্দ করত, তাই তাহির বিন হুসাইনের পরামর্শে তিনি কালো রঙের অনুমতি দিয়ে দেন এবং দরবারীরা পূর্বের নিয়ম গ্রহণ করে নেয়। [২]

খুরাসানে তাহির বিন হুসাইনের নিয়োগ:

তাহির বিন হুসাইন মামুনের সরকার গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। মামুন দীর্ঘ সময় তাকে দূরে রাখার পর এখন পুনরায় নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিলেন। তাহির ‘যুল ইয়ামিনাইন’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন এবং চারদিকে তার সম্মান ও মর্যাদার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মামুন তাকে সাথে বসিয়ে প্রায়ই গল্পগুজব করতেন, কিন্তু যখনই তিনি তাহিরকে দেখতেন, তার মনে পড়ে যেত যে, এরই হাতে তার ভাই আমিনের অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যু হয়েছিল। এমন অবস্থায় মামুনের রক্ত টগবগ করে উঠত, কিন্তু তিনি তাহিরের সেবার কথা চিন্তা করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতেন।

শীঘ্রই তাহির মামুনের এই অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যান। তিনি নিজেকে সম্ভাব্য রাজকীয় রোষানল থেকে বাঁচানোর কৌশল চিন্তা করেন এবং নিজের কিছু অনুগত আর্মীরদের মাধ্যমে মামুনকে বিশ্বাস করান যে, এই মুহূর্তে খুরাসানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেখানে তাহিরের নিয়োগ জরুরি। মামুন রাজি হয়ে যান এবং ২০৫ হিজরিতে তিনি খুরাসানের শাসনভার তাহির বিন হুসাইনের নামে করে দেন। [৩]

তাহির সেই বছরই খুরাসানের কেন্দ্র মার্ভে পৌঁছান এবং এরপর সারাজীবনে পুনরায় মামুনের কাছে আসার ঝুঁকি নেননি। এটি ছিল অত্যন্ত বিশাল এক সুবাহদারি (প্রদেশ) যা ইরাকের সীমান্ত থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাই এখানে এসে যদি তাহিরের মনে স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা আসত তবে তা অস্বাভাবিক ছিল না। তবে ২০৭ হিজরিতে তাহিরের হঠাৎ মৃত্যু হয়। বলা হয় যে, তিনি জুমার খুতবায় মামুনের নাম উল্লেখ করেননি। পরদিন সকালে তাকে তার শয়নকক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা যে, মামুন কোনো গোপন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যে, যদি তাহিরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রবণতা অনুভূত হয় তবে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। [৪][৫]

[১] ইব্রাহিম বিন মাহদী এক বছর এগারো মাস বিদ্রোহী আচরণের পর আত্মগোপন করেন। ছয় বছর আত্মগোপনে থাকার পর যখন তিনি সামনে আসেন, তখন মামুন তাকে ক্ষমা করে দেন।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪/১২৭, ১৩১, ১২৮

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪/১৩১

[৪] তারিখুত তাবারী: ২০৫ হিজরি

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০৫ হিজরি

তাহির বিন হুসাইনের উপদেশনামা:

তাহির বিন হুসাইন ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ। তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আন্দাজ সেই পত্র থেকে পাওয়া যায় যা তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে রক্কার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার সময় লিখেছিলেন। এই পত্রটি প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি চমৎকার পাঠ্য। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

- বিচারের ক্ষেত্রে সম্পর্ককে কখনো বিবেচনায় আনবে না।
- দ্বীনের আলিমগণ, আল্লাহর কিতাব এবং যারা তা অনুসরণ করে তাদের অনুসরণ করবে।
- কল্যাণের প্রচার এবং মন্দের প্রতিরোধ কেবল সেই করতে পারে যাকে দ্বীনের মারিফাত নসিব হয়েছে।
- সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে; কারণ এর চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছু নেই।
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। নিজের অধীনস্থদের গুনাহ থেকে বাঁচানোর এর চেয়ে উত্তম আর কোনো উপায় নেই।
- প্রতিটি কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তোমার সম্মান সমুন্নত থাকবে।
- কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে পদ থেকে বরখাস্ত করবে না।
- শয়তানকে কখনো নিজের ওপর সওয়ার হতে দেবে না, অন্যথায় তোমার জীবন তিক্ত হয়ে যাবে।
- হুসনে যন-এর মধ্যে শক্তি ও প্রশান্তি রয়েছে। এর মাধ্যমে সকল কাঙ্ক্ষিত কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়, মানুষের হৃদয়গুলো যুক্ত থাকে এবং শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়।
- হুসনে যন-এর কারণে কাজের দায়িত্ব পুরোপুরি অন্যের ওপর ছেড়ে দেবে না, বরং কর্মকর্তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে এবং প্রজাদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত থাকবে।
- অপরাধীকে শাস্তি অবশ্যই দেবে, অন্যথায় তোমার সুনামের হানি ঘটবে।
- যখন কারো সাথে কল্যাণের ওয়াদা করবে, তখন তা অবশ্যই পূরণ করবে।
- চোগলখোরদের নিজের থেকে দূরে রাখবে।
- মিথ্যাবাদীদের নিজের কাছে স্থান দেবে না, অন্যথায় তোমার বিষয়াদি বিগড়ে যেতে শুরু করবে।
- রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। গান্ধীর্ষ ও ধৈর্যকে আঁকড়ে ধরবে।
- কখনো বলবে না যে আমি যা চাই তা-ই করতে পারি, এতে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।
- মনে রেখো, রাজত্ব আল্লাহর। তিনি যাকে চান দান করেন, যার থেকে চান ছিনিয়ে নেন।
- টাকা-পয়সা কোষাগারে জমা করে রাখলে তা অকেজো হয়ে যায়। তা প্রজাদের অধিকার এবং সমৃদ্ধির জন্য ব্যয় করবে।
- বিশ্বাসঘাতককে কখনো আশ্রয় দেবে না। সৃঞ (সাহায্যপ্রার্থী)-কে রক্ষা জবাব দেবে না। হাসি-ঠাট্টার বিষয়ের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না।
- কৃপণদের কখনো পরামর্শদাতা বানাবে না; প্রজাদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করার সবচেয়ে বড় কারণ হলো কৃপণতা।

- সেনাবাহিনীর দপ্তর ও হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে থাকা। তাদের বেতন যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা।
- আল্লাহর হুদুদ অবিলম্বে কার্যকর করা, শত্রুর সাথেও ইনসাফ করা, প্রতিটি বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।
- এমন লোকদের কর্মকর্তা নিয়োগ করা যারা অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।
- প্রতিটি জেলায় একজন সংবাদদাতা নিয়োগ রাখা যে তোমাকে পরিস্থিতির খবর দিতে থাকবে।
- প্রতিটি কাজে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করা। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে না রাখা।
- শরীফ ও মার্জিত লোকদের বিশেষ খেয়াল রাখা।
- দুর্বল ও মজলুমদের অবস্থা নিজে অবগত হওয়া; কারণ অনেক মজলুম জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে পারে না।
- যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। শহীদদের বিধবা ও এতিমদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।
- অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য সরকারি খরচ নির্ধারণ করা। অন্ধ, হাফেজ ও ক্বারিদের ভাতা বেশি রাখা।
- হাসপাতাল স্থাপন করা এবং সেখানে চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগ করা। রোগীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত ব্যয় করা।
- যখন জনগণকে অধিকার দেওয়া হয় এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়, তখন তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকে না বরং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করে; এ কারণে শাসক ক্রমাগত এ ধরনের আবেদনের সম্মুখীন হওয়ার ফলে সংকীর্ণমনা ও বদমেজাজি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইনসাফ করে সে তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ যে খ্যাতির জন্য তা করে। অতএব, মানুষের প্রশ্নের উত্তর নম্রতার সাথে দেওয়া এবং তাদের ওপর অনুগ্রহ না জাহির করে দয়া করা।
- তোমার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হবে সেই ব্যক্তি যে নির্জনে তোমার দোষ তোমার কাছে বর্ণনা করবে।
- অধীনস্থ কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারণ করে তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত বিষয় ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ফয়সালা করা। হারাম মাল জমা না করা, আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় না করা। বর্তমান ও অতীত জাতিসমূহ এবং শাসকদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকা। এই নসিহতনামা মাঝে মাঝে দেখতে থাকা।

তাহির বিন হুসাইনের এই চিঠি দেখে মামুনুর রশীদ বলে উঠলেন: “সে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো বিষয়ই বাকি রাখেনি।” [১]

এরপর এর অনুলিপি তৈরি করে পুরো মুসলিম বিশ্বের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা এটি নিজেদের সামনে রাখে।

খুরাসান ও ইয়েমেনের নতুন সরকারসমূহ। দৌলতে তাহিরিয়া। দৌলতে জিয়াদিয়া:

২০৫ হিজরিতে যখন তাহির বিন হুসাইন ইন্তেকাল করেন, তখন মামুন তার সেবার কথা বিবেচনা করে খুরাসানের শাসনভার তার পুত্র তালহার হাতে অর্পণ করেন। এরপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খুরাসানের শাসন তাহির বিন হুসাইনের বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে যা “দৌলতে তাহিরিয়া খুরাসান” নামে পরিচিত হয়। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০৬ হিজরি।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ৫৬৬/২।

একইভাবে ২০৩ হিজরিতে ইয়েমেনের শাসনভার মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম যিয়াদিকে দেওয়া হয়। এই প্রদেশের শাসন ক্ষমতা পরবর্তীতে বংশপরম্পরায় এই পরিবারের মধ্যেই চলতে থাকে এবং এই অঞ্চলটিও পরবর্তীতে স্বায়ত্তশাসিত হয়ে যায়। তিউনিসিয়ায় স্বায়ত্তশাসিত আগলাবি রাষ্ট্র আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই তিনটি রাষ্ট্র অর্থাৎ: খোরাসান, ইয়েমেন এবং তিউনিসিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত ছিল যে, সেখান থেকে খেরাজের কিছু অর্থ বাগদাদে পাঠানো হতো এবং খুতবায় খলিফার নাম পাঠ করা হতো। বাকি বিষয়গুলোতে এই দেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত ছিল।

বুরানের সাথে বিবাহ:

মামুন ২০৩ হিজরিতে বাগদাদে এসেছিলেন। এরপর নিজের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে শাসন করেন। রমজান ২১০ হিজরিতে তিনি উজির হাসান বিন সহলের কন্যা বুরানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বুরানের আসল নাম ছিল খাদিজা। বিবাহের সময় তার বয়স ছিল ২০ বছর এবং মামুনের ৪০ বছর। বিবাহটি এমন ধুমধাম করে হয়েছিল যে দুনিয়া অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলা হয় যে, কোনো বিবাহে এত সম্পদ ব্যয় করা হয়নি। কনে মামুনের সাথে এসে বসলে এক হাজার হীরায় পূর্ণ একটি থালা তার কোলে উপুড় করে দেওয়া হয়, এই জহরতগুলোর মূল্য ছিল কল্পনাতিত।

বর ও কনের বিশেষ মেহমানদের ওপর মিশক মাখানো গুলি (ছোট বল) ছিটানো হয়েছিল। প্রতিটি গুলির ভেতরে পুরস্কারের টিকিট ছিল। কোনোটিতে গোলাম ও বাঁদিদের, কোনোটিতে সওয়ারির এবং কোনোটিতে জায়গিরের। সাধারণ বরযাত্রীদের ওপর আশরাফি ও দিরহামের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। মিশকের শিশি এবং আশ্বরের কৌটা ছিটানো হয়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এই বিবাহে সর্বমোট পাঁচ কোটি দিরহাম (প্রায় বারোশ পঞ্চাশ কোটি টাকা) ব্যয় করা হয়েছিল। [১]

এই অনুষ্ঠানে মামুন ও বুরানকে একের পর এক অত্যন্ত মূল্যবান উপহার দেওয়া হয়েছিল। বিবাহে অংশগ্রহণকারী এক দরিদ্র সাহিত্যিকও উপহার হিসেবে দুটি থলি পেশ করেন। একটিতে লবণ ছিল এবং অন্যটিতে সাবান। মামুন সেটিও সমাদরের সাথে গ্রহণ করেন এবং উভয় থলি আশরাফি দিয়ে পূর্ণ করে সেই সাহিত্যিকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। [২]

কবিগণ বর-কনের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন। ইবনে হাযেম বাহেলি নামক এক কৌতুকপ্রিয় কবি বলেন:

بَارَكَ اللهُ لِلْحَسَنِ وَلِبُورَانَ فِي الْخَتَنِ

‘আল্লাহ হাসানকে বরকত দিন, এবং শ্বশুরবাড়িতে বুরানকেও।’

يَا بَنَ هَارُونَ قَدْ ظَفَرْتَ وَلَكِنْ يَبْتَ مَنْ؟

‘হে হারুনের পুত্র! তুমি মেয়ে তো পেলে, কিন্তু কার মেয়ে?’

অন্য কোনো বাদশাহ হলে হয়তো এমন কবির শিরশ্ছেদ করে দিতেন, কিন্তু মামুন এই কবিতা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন; কারণ এতে বোঝা যাচ্ছিল না যে এটি প্রশংসা নাকি বিদ্রূপ। [৩]

[১] তারিখুত তাবারী: ২১০ হিজরি

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৬৬/১৭

[৩] মুরুজুয যাহাব: ৩২৮/৪, ত. জামেয়া লুবনানিয়া; ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২৮৯/১

নোট: কিছু কিতাবে কবিতার দ্বিতীয় চরণে “ইয়া ইবনে হারুন” এর স্থলে “ইয়া ইমামাল হুদা” রয়েছে যা নিশ্চিতভাবেই ভুল; কারণ এতে কবিতার হৃদ ভেঙে যায়।

আহমদ বিন আবি খালিদের উজিরত্ব:

মামুনের বাগদাদে আসার কিছুকাল পরেই হাসান বিন সাহল কোনো এক মানসিক রোগে আক্রান্ত হন; তাই তিনি একজন সম্মানিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো গুরুত্ব ছিল না। উজিরত্বের পদ আহমদ বিন আবি খালিদকে দেওয়া হয় এবং তিনিই খেলাফতের বিষয়াবলীতে মামুনের ডান হাত হয়ে ছিলেন। এই কয়েক বছরে ইরাক, আল-জাজিরা, মিশর এবং আফ্রিকান অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে কিছু বিদ্রোহও হয়েছিল কিন্তু সেগুলোকে দ্রুত দমন করা হয়। [১]

বাবক খুররামি:

জাবিদান নামক এক মজুসি প্রাচীন মাজদাকি ধর্মে কিছু পরিবর্তন করে একটি নতুন ধর্ম শুরু করেছিলেন যার মতে মানুষ মারা যায় না বরং নতুন নতুন রূপে জন্ম নিতে থাকে; তাই এই ব্যক্তি নিজের নাম জাবিদান অর্থাৎ চিরস্থায়ী রেখেছিলেন। মামুনের যুগে বাবক নামক এক বিদ্রোহী দাবি করেছিল যে জাবিদানের আত্মা তার ভেতরে প্রবেশ করেছে। সে মাজদাকি আকিদা প্রচার করতে শুরু করে যাতে সে আনন্দ ও উল্লাসে মত্ত থাকার জন্য প্রতিটি হারাম জিনিসকে হালাল করে দিয়েছিল; তাই তার অনুসারীরা খুররামি নামে পরিচিত হয় এবং এ কারণেই বাবক “বাবক খুররামি” নামে খ্যাতি লাভ করে।

বাবক উত্তর ইরানের মাজান্দারান অঞ্চলের আকাশচুম্বী পাহাড়গুলোকে কেন্দ্র বানিয়ে তার আশেপাশের মুসলিম জনপদগুলোতে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। তার এই দুর্ধর্ষ বাহিনী আব্বাসীয় বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। তার ফিতনা ২০১ হিজরিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর ২০৭ হিজরি, ২০৯ হিজরি এবং ২১২ হিজরিতে আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার গভর্নরগণ এবং মামুনের নামকরা সেনাপতিরা তার বিরুদ্ধে বারবার অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু দুর্গম পাহাড়ি পথ এবং প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিরোধের কারণে প্রতিবারই ব্যর্থ হতে হয়। অনেক দক্ষ অফিসার এবং অসংখ্য সৈন্য এই অভিযানে প্রাণ হারান। [২]

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার

যদিও মামুনের বাগদাদে এসেও পুরোপুরি মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়নি বরং রাজনৈতিক জটিলতাগুলো তাকে সবসময় নিজের দিকে মনোযোগী করে রাখত। তবুও এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তাফসির ও হাদিসসহ ধর্মীয় জ্ঞানসমূহ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু নতুন কিছু শেখার জন্য তার মস্তিষ্কে অনেক জায়গা ছিল। আপনারা পড়েছেন যে মনসুর আব্বাসীর যুগে “কালিলা ওয়া দিমনা”র মতো কিছু অনারব বই আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। হারুনুর রশিদের যুগে বাগদাদে “বায়তুল হিকমাহ” নামে একটি নিয়মিত অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[১] তারিখুত তাবারি: সানা ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩ হিজরি।

[২] তারিখুত তাবারি: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সানা ২০১, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১২ হিজরি।

মামুনুর রশীদ এই ধারাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং প্রতিটি জাতি ও ধর্মের কিতাব আনিয়ে সেগুলোর অনুবাদ করাতে শুরু করেন। রোম সাম্রাজ্যের সাথে সন্ধি ছিল। মামুন কায়সার-ই-রোমকে বার্তা পাঠান যে এরিস্টটলের কিতাবগুলো সংগ্রহ করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। রোমে পাদ্রিদের আধিপত্য ছিল এবং দার্শনিকরা নামহীন ছিল। দীর্ঘকাল ধরে পাদ্রিরা দর্শনের শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল; কারণ এতে ধর্মীয় আকিদায় ফাটল ধরার আশঙ্কা ছিল। যাই হোক, কায়সার মামুনের বার্তা উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি দর্শনের কিতাবগুলো তালাশ করতে শুরু করলেন। একজন পাদ্রি জানালেন যে গ্রিসে একটি ভবন আছে যা কনস্টানটাইনের সময় থেকে তালাবদ্ধ এবং প্রতিটি নতুন শাসক এতে আরও একটি তালা লাগিয়ে দেন। কনস্টানটাইন সব জায়গা থেকে দর্শনের কিতাব সংগ্রহ করে সেখানে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে এই জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং খ্রিস্টান ধর্মে যুক্তিবাদী আপত্তি উত্থাপনকারী কেউ না থাকে।

পাদ্রির নির্দেশনায় সেই ভবনটি খোলা হলে অনেক কিতাব সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তবে কায়সার শঙ্কিত ছিলেন যে মুসলমানদের কাছে এই জ্ঞান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষতি না হয়।

তিনি যখন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন একজন পাদ্রি বললেন: “এতে কোনো ক্ষতি নেই। যদি দর্শনের জ্ঞান মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা তাদের ধর্মীয় প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে দেবে; কারণ এই জ্ঞান যে জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, সেখানে ধর্ম জরাজীর্ণ অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।” কায়সার আশ্বস্ত হয়ে পাঁচটি উটের বোঝার সমান কিতাব মামুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [১]

কুতুবে ফালাসাফার তালাশ:

মামুন শুধু এতেই ক্ষান্ত হননি বরং বাইতুল হিকমাহর কর্মকর্তাদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন মাতার, ইউহান্না বিন বতরিক এবং সালমাকে রোমে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা নিজেরাও সেখান থেকে দর্শনের কিতাব খুঁজে নিয়ে আসেন। এছাড়া দূর-দূরান্তের দেশগুলোতেও দূত পাঠিয়েছিলেন যাতে যেভাবে সম্ভব দার্শনিকদের রচনাবলি সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। এই অভিযানের জন্য মামুন কোষাগারের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং লাখ লাখ দিরহাম ও দিনার পানির মতো খরচ করেছিলেন। [২]

কুতুবে ফালাসাফার তরজমা:

কিতাবের একটি বিশাল ভাণ্ডার জমা হওয়ার পর তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অনুবাদক ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দি (মৃত্যু ২৬০ হিজরি)-কে অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইয়াকুব বিন ইসহাক ‘ফিলসুফুল আরব’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত আশ’আস বিন কায়স (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইসলামি, গ্রিক এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগ্রাহক ছিলেন। বলা হয় যে ইসলামের ইতিহাসে এই সময় পর্যন্ত তিনি ছাড়া অন্য কেউ ‘ফিলসুফ’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হননি। তিনি বিভিন্ন ভাষার যুক্তিবাদী জ্ঞানকে অত্যন্ত চমৎকার শৈলীতে আরবি রূপ দান করেন। তার কৃতিত্ব এই ছিল যে তিনি কেবল আক্ষরিক অনুবাদ করেননি বরং এই বিদ্যায় বিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়ে কিতাবগুলোকে সহজ করার পাশাপাশি জটিল বাক্যগুলোকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তুলেছিলেন। তিনি নিজেও একজন গ্রন্থকার ছিলেন। চিকিৎসা, দর্শন...

[১] আখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা লিল কিফতি, পৃ. ৩০, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[২] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা লি ইবনে আবি উসাইবিয়াহ, পৃ. ২৬০, ত. দার মাকতাবাতুল হায়াত বৈরুত; তাবাকাতুল উমাম লি ইবনুস সাঈদ আল-আন্দালুসি, পৃ. ১৮।

যুক্তিবিদ্যা, গণিত এবং ভূগোলসহ বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর দুইশ’রও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া ‘ইসবাতুত তাওহীদ’ এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক রিসালা (পুস্তিকা) লিখেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মাসকুয়াহ, নাফতুয়াহ, সানুবরী এবং আহমদ বিন তৈয়ব বিখ্যাত। [১]

এই দিনগুলোতে কুস্তা বিন লুকা নামক একজন খ্রিস্টান দার্শনিক মুসলিম বিশ্বে রোম থেকে অনেক বই খুঁজে নিয়ে আসেন। মামুন তাকেও বাইতুল হিকমাহ-তে অনুবাদের কাজে নিযুক্ত করেন। অনুবাদের কাজের জন্য তাঁর মাসিক বেতন ছিল পাঁচশ দিনার। [২]

দরবারে খিলাফতের সাথে যুক্ত তরুণ খ্রিস্টান চিকিৎসক হুনাইন বিন ইসহাক (১৯৩ হিজরী - ২৬০ হিজরী) ইউরোপ এবং গ্রিস পর্যন্ত সফর করেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করে গ্রিকদের কাছ থেকে দর্শন ও হিকমতের অনেক বই সংগ্রহ করে আনেন। আব্বাসী দরবারে এই সেবার জন্য তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদান করা হয় এবং তাঁকে হেকিমদের বই অনুবাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। [৩] মামুন প্রতিটি অনূদিত রিসালার ওজনের সমান স্বর্ণ তাঁকে পুরস্কার হিসেবে দিতেন। [৪] তিনি প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক জালিনুসের প্রায় চল্লিশটি রিসালা অনুবাদ করেন। [৫]

আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন:

“এটা বলা প্রায় সঠিক যে, গ্রিস, ইতালি, সিসিলি এবং আলেকজান্দ্রিয়ার এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না যা অনুবাদের মাধ্যমে আরবি ভাষায় স্থানান্তরিত হয়নি। এই কারণেই আব্বাসী রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক খ্যাতির প্রতিধ্বনি আজও শোনা যাচ্ছে।” [৬]

মামুনের নিজে দর্শন শেখার আগ্রহ:

যে বই-ই অনূদিত হতো মামুন তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। যে বিষয়গুলো বুঝতে পারতেন না, তা সেই বিষয়ের ওস্তাদদের কাছ থেকে শিখতেন এবং তাঁদেরকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিতেন। গ্রিসে ‘লিও’ নামক একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। মামুন গ্রিসের রাজাকে লিখেছিলেন যেন তাঁকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনি তাঁর কাছ থেকে হিকমত শিখতে পারেন। বিনিময়ে তিনি পাঁচ টন স্বর্ণ এবং স্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। [৭]

একজন ভারতীয় হেকিম তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, নওশিরওয়ানের কিসরার প্রাচীন প্রাসাদে একজন উজিরের একটি বিরল রচনা রয়েছে যা একটি সিন্দুকে তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। মামুন তৎক্ষণাৎ সেই সিন্দুকটি খুঁজে বের করান। তার মধ্যে স্বর্ণ সংক্রান্ত একটি রিসালা পাওয়া যায়। মামুন সেটি অনুবাদ করান। তা শোনার পর তিনি বলে ওঠেন: “আল্লাহর কসম! একেই বলে কালাম (বাণী)।” [৮]

[১] আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হকামা, পৃ. ২৭৩ থেকে ২৮০; উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা, পৃ. ২৮৫ থেকে ২৮৯।

[২] আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হকামা, পৃ. ১৯৯।

[৩] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা লি-ইবনি আবি উসাইবিয়াহ, পৃ. ২৬০। এই পরিমাণ আজকের হিসেবে বারো হাজার রুপিও বেশি।

[৪] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা লি-ইবনি আবি উসাইবিয়াহ, পৃ. ২৬০; আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হকামা, পৃ. ৩০।

[৫] হুনাইন আরবি, গ্রিক, সিরিয়াক, ফারসি এবং ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অনুবাদের কাজ ছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর প্রায় ৭০টি গ্রন্থ রচনা করেন। (আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হকামা, পৃ. ১৩৬, ১৪৩; আল-আলাম জিরিকলি: ২৮৭/২)।

[৬] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা লি-ইবনি আবি উসাইবিয়াহ, পৃ. ২৬০; তাবাকাতুল আতিব্বা, পৃ. ১৬৫, বাব হুনাইন বিন ইসহাক, পাণ্ডুলিপি। (৭) আল-মামুন আজ-শিবলী নোমানী, পৃ. ১২৫।

[৭] আল-মামুন আজ-শিবলী নোমানী, পৃ. ১৩১, বরাত চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া ৩৪৭/১... কারণ তিনি চাননি যে সেই দার্শনিককে বাগদাদে পাঠানো হোক।

[৮] আল-মামুন আজ-শিবলী নোমানী, পৃ. ১২৫, বরাত ওয়াসাতুস সুলুক।

বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কারনামা:

অনুবাদ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে কাজ হয়েছে। মামুনের দারুল তরজমার একজন সদস্য এবং বিখ্যাত মুসলিম হেকিম মুহাম্মদ বিন মুসা আল-খাওয়ারিজমি এই যুগে গণিতশাস্ত্রে “আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা”-র মতো এক অতুলনীয় কিতাব রচনা করেন যাতে বীজগণিতের মৌলিক নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে আল-খাওয়ারিজমি “আল-জাবর” (বীজগণিত)-এর উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য হন।

আল-খাওয়ারিজমি জ্যোতির্বিজ্ঞানেও কাজ করেছেন এবং গ্রিসের প্রাচীন পঞ্জিকাগুলোকে সামনে রেখে একটি সর্বোত্তম পঞ্জিকা বিন্যাস করেছেন যার নির্ভুলতা এবং গবেষণার মান পূর্ববর্তী সকল পঞ্জিকাকে লান করে দিয়েছে। [১]

মামুনের নির্দেশে ভূ-পৃষ্ঠের পরিমাপ করা হয়েছিল এবং প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের এই উক্তির বাস্তব সত্যতা পাওয়া গিয়েছিল যে পৃথিবীর পরিধি ২৪ হাজার মাইল। [২] এই যুগেই শামাসিয়া নামক স্থানে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মানমন্দির (মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিরল জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছিল। ইয়াহইয়া বিন আবি মানসুর, খালিদ বিন আব্দুল মালিক এবং আব্বাস বিন সাঈদকে এখানে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এই মানমন্দিরের মাধ্যমে নক্ষত্র ও গ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হতো এবং অনেক নতুন গবেষণা সামনে এসেছে। [৩]

আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক ছিলেন জিবরাঈল ইবনে বখতিশু নামক একজন খ্রিস্টান। [৪] তিনি বারমাকি, হারুনুর রশিদ এবং মামুনের বিশেষ চিকিৎসক ছিলেন। আমীন তার পরামর্শ ছাড়া কিছুই খেতেন বা পান করতেন না। মামুনের যুগে তার মর্যাদা এমন ছিল যে যখনই দরবারে খেলাফতে কাউকে কোনো পদে নিযুক্ত করা হতো, তখন সে নিজের দায়িত্ব গ্রহণের আগে জিবরাঈলের কাছে উপস্থিত হতো। মামুন তাকে পিতার মর্যাদা দিতেন। তার কাছে সম্পদের এত প্রাচুর্য ছিল যে তালিবিদের মধ্যেও এর উদাহরণ পাওয়া যেত না। [৫] তার পুত্র বখতিশুও অনেক উন্নতি লাভ করেছিলেন। তিনি ধন-সম্পদ এবং শান-শওকতে আব্বাসীয় খলিফাদের সমকক্ষ মনে করা হতো। তার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দক্ষ গ্রিক পণ্ডিতরা গ্রিক কিতাবসমূহ অনুবাদ করতেন। [৬]

নহ, আদব, কবিতা ও ইতিহাসের কাজ:

নহ ও আদবের কাজও অব্যাহত ছিল। ফারা (নাহবিদ) যিনি নিজের যুগের ইমামে আরবিয়াত (আরবি ভাষার ইমাম) ছিলেন, তাকে নাহ শাস্ত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রচুর ভৃত্য ও সহকারী প্রদান করা হয়েছিল। ফারা সকাল থেকে এশা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। শুধু নামাজের সময় তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো যে নামাজের সময় হয়েছে। দুই বছরের নিরলস পরিশ্রমে তিনি যে শাহকার (মাস্টারপিস) পেশ করেন তা “কিতাবুল হুদুদ” নামে প্রসিদ্ধ হয়। এরপর তিনি ইলমে তাফসিরে “আল-মাআনি” রচনা করেন।

[১] আখবারুল উলামা বি আখবারিল হকামা, পৃ. ২১৬, ২০৫

[২] কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, ১/৯০৬, ৯০৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[৩] বখতিশু মূলত সিরিয়াক ভাষার শব্দ ‘বখত’ এবং ‘ইশু’-এর সমষ্টি। ‘বখত’-এর অর্থ বান্দা এবং ‘ইশু’-এর অর্থ হযরত ঈসা। সুতরাং বখতিশু ‘আব্দুল মাসীহ’-এর সমার্থক। (উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা, ইবনে আবি উসাইবিয়া, পৃ. ১৮৬)

[৪] ওফয়াতুল আইয়ান, ৫/১৬২, ১৬৩, ত. দার সাদির

[৫] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা, ইবনে আবি উসাইবিয়া, পৃ. ১৮৭ থেকে ১৯০

[৬] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা, ইবনে আবি উসাইবিয়া, পৃ. ২০১

যাতে কেবল কুরআন মাজীদেব অলঙ্কার ও শৈলী নিয়ে আলোচনা করা হয়নি, বরং ফকীহ ও মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনাও করা হয়েছিল। ‘আল-মাআনি’ সংকলনে ইমাম ফাররার সহকারীদের সংখ্যা গণনা করা হলে দেখা যায় যে, কেবল তাঁর সহকারী কাজীদের সংখ্যাই ছিল আশি। [১]

মামুনের মাতৃভাষা ছিল ফারসি; তাই ইসলামী ইতিহাসে তিনিই প্রথম ফারসি কাব্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন এবং নিজের দরবারে অনারব কবিদের স্থান দেন, যাদের মধ্যে আব্বাস মারওয়াযী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। আব্বাসই প্রথম খিলাফতের দরবারে ফারসি কাসিদা রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন, অন্যথায় এর আগে অনারব কবিরাজ কেবল আরবি কালাম পেশ করতেন। [২]

বাগদাদের কাজী মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী (১৩০ হিজরী - ২০৭ হিজরী) ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় এবং বিশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণনার সংকলন তৈরি করেন, যা থেকে পরবর্তীতে সকল ঐতিহাসিকগণ উপকৃত হয়েছেন। [৩]

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকারিতা:

মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদের যে ধারা শুরু করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে এর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বে প্রজ্ঞার বিভিন্ন শাখা উন্নতি লাভ করেছে। এই বইগুলো থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, স্থাপত্যকলা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। মুসলিম মনীষীগণ এই জ্ঞানগুলোকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি বরং পূর্ণ গবেষণার সাথে এগুলোর ওপর কাজ করেছেন। তাঁরা তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক দর্শনের পরিবর্তে ব্যবহারিক প্রবণতাকে জনপ্রিয় করেন এবং “থিওরি”কে “প্র্যাকটিক্যাল”-এর মাধ্যমে যাচাই করার ভিত্তি স্থাপন করেন। এভাবে তাঁরা নতুন নতুন সংযোজনের মাধ্যমে এই শিল্পগুলোকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেন। কাজী ইবনে সাঈদ আন্দালুসী লিখেছেন:

“মামুনের যুগে জ্ঞান ও শিল্পের অধিকারীরা দার্শনিকদের কিতাবসমূহের ওপর দক্ষতা অর্জন করেন এবং তাঁদের পরবর্তীদের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস ও এর মূলনীতি নির্ধারণ করে দেন। এমনকি আব্বাসীয় খিলাফত রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের সমতুল্য হয়ে ওঠে।” [৪]

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষতি:

কিন্তু গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বড় অংশ ছিল নিছক দার্শনিক বিতর্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্ম আলোচনার ওপর ভিত্তি করে। এই বিতর্কগুলোতে লিপ্ত হওয়ার ফলে একটি বড় ক্ষতি এই হয়েছিল যে, কিছু আলেম কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ আকিদাগত বিষয়গুলোকে যুক্তির কষ্টিপাথরে...

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ১৭৭/৬, ১৭৮, অনু: আবু যাকারিয়া আল-ফাররার... ‘আল-মাআনি’ ‘মাআনী আল-কুরআন’ নামে তিন খণ্ডে ‘দারুল মিসরিয়্যাহ মিসর’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

[২] আল-মামুন: শিবলী নোমানী, পৃ. ১৩১, ১৩২ বরাতে মাজমাউল ফুসাহ: আব্বাস মারওয়াযীর অধীনে।

[৩] বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার কারণে ওয়াকিদীর সনদগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সেগুলোতে কিছু বর্ণনা সন্দেহজনক। এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, মামুনের সাথে ওয়াকিদীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। আবার ওয়াকিদীর বিশেষ ঝোঁক ছিল শিয়া মতবাদের দিকে। ওয়াকিদী নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, আমি মদীনায় কাপড় সেলাইয়ের কাজ করতাম এবং এক বর্ণনামতে গমের ব্যবসা করতাম। মানুষের কাছে এক হাজার দিনার ঋণগ্রস্ত ছিলাম। আদায়ের কোনো পথ ছিল না। তাই বাগদাদে চলে এলাম। ইয়াহইয়া বারমাকী আমাকে দুই হাজার দিরহাম দিলেন। আমি ঋণ পরিশোধ করলাম। এরপর বারমাকীদের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেলাম। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৪৬৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১১।

এর অর্থ এই নয় যে, আব্বাস তাকে কেবল রুটি-রুজির জন্য বাগদাদের কাজী বানিয়েছিলেন। সেই যুগে অনেক বড় বড় আলেম কোনো না কোনো পেশার সাথে যুক্ত থেকে হালাল রিযিক উপার্জন করতেন। ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও সাধারণ নীতি ও শর্ত সাপেক্ষে উপকৃত হয়েছেন। ওয়াকিদীর বর্ণনার গুরুত্ব প্রথম দুই শতাব্দীর ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত বেশি। ‘মুতালআ ও তাহকীক কে উসুল’ শিরোনামে ভূমিকা ও টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

[৪] তাবাকাতুল উমাম, পৃ. ৪৮, ৪৯।

পরীক্ষা করার চেষ্টা শুরু করলেন এবং যেখানে কোনো আকিদাগত মাসআলা এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে দেখলেন না, তারা তা অস্বীকার করলেন অথবা এমন ব্যাখ্যা শুরু করলেন যা আসলাফ (পূর্বসূরিদের) থেকে বর্ণিত নয়। এমন আলেমগণ মামুনের দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং মামুন তাদের সাথে সব ধরনের মাসআলায় উন্মুক্ত বিতর্ক করতেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, মঙ্গলবার দিনটি মামুনের প্রাসাদে বিতর্কের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ‘দারুল মুনাজারা’ নামে একটি বিশেষ কক্ষ ছিল যেখানে মানুষ সমবেত হতো। পানীয় ও ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। দরবারী, আলেম এবং প্রতিটি ধর্ম ও জাতির বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। খলিফা নিজে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেকেরই পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত এই মজলিস চলত। জোহরের আগে বিভিন্ন ধরনের খাবার আনা হতো। ভরপুর আপ্যায়ন উপভোগ করার পর উপস্থিতরা বিদায় নিতেন। [১]

এই উন্মুক্ত বিতর্কগুলোতে মাঝে মাঝে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপিত হতো যা আসলাফদের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত ছিল। মামুন সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হতেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, কিছু আকিদার ক্ষেত্রে তিনিও আসলাফদের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্ত চিন্তার শিকার হলেন। তাকে ই’তিযাল (মু’তাজিলা মতবাদ)-এর দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হাত ছিল বিশর বিন গিয়াস আল-মারীসী নামক এক মু’তাজিলা তর্কিকের। এই ব্যক্তি কুফার এক ইহুদির ছেলে ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় আহলে সুন্নাত আলেমদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে আকলি (যৌক্তিক) বিজ্ঞান ও আকিদাগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। নতুন নতুন মতামত পেশ করতে থাকেন এবং মানুষকে ফিতনায় লিপ্ত করতে শুরু করেন। তার বক্তব্য ছিল যে, সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করা কুফরি নয়, বরং কুফরির আলামত। মামুন তাকে এতোটা সম্মান দিয়েছিলেন যে তাকে নিজের শায়খ মেনে নিয়েছিলেন। এছাড়া মু’তাজিলাদের একটি দলও মামুনের চারপাশে সমবেত ছিল যাদের মধ্যে কাজী আহমদ বিন আবি দাউদ, আবদুল্লাহ বিন তাহের এবং ইসহাক বিন ইবরাহিম অগ্রগণ্য ছিলেন। ইসহাক বিন ইবরাহিমের ওপর মামুনের আস্থা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকেই বাগদাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। [২]

আবু সায়েদ আন্দালুসি ‘তাবাকাতুল উমাম’ গ্রন্থে লিখেন:

“মামুন রোমান সম্রাটদের কাছে গ্রিক দার্শনিকদের বইপত্রের ফরমায়েশ পাঠান, তারা প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, ইউক্লিড এবং টলেমি প্রমুখের বই উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। মামুন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সেগুলোর অনুবাদ করান এবং মানুষকে সেগুলো অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেন এবং সেগুলোর জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা দেন। তার যুগে এই বইগুলোর প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায় এবং দর্শনের চরম উন্নতি ঘটে। মামুনের কদরদানির বদৌলতে মেধাবী ও যোগ্য যুবক এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এই শিল্পগুলোতে দক্ষতা অর্জন করেন; কারণ মামুন এমন ব্যক্তিদের নির্জনে ডাকতেন এবং তাদের সাথে ইলমি আলোচনা করতেন।” [৩]

এই গ্রিক দর্শন যার প্রবর্তক ছিলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক গোমরাহির গোলকধাঁধা যার ওপর ইউরোপের অদূরদর্শী

[১] মুরুজুয যাহাব: ৪/৩৬৮, আবু খিলাফাতিল মামুন, ত. জামিয়াতুল লুবনানিয়াহ

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/২১৭, ২২৭, ২৩৪

[৩] তাবাকাতুল উমাম, পৃ. ৪৮

...মুগ্ধ ছিলেন। যদিও এই দর্শনে পদার্থবিজ্ঞান এবং সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক দরকারী বিষয়ও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এর যে অংশটি ইলাহিয়াত (ধর্মতত্ত্ব) এর ওপর ভিত্তি করে ছিল, তা শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এটা স্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে নগণ্য সৃষ্টি তার নিছক বুদ্ধি দিয়ে যে অনুমান করবে, তা ত্রুটিপূর্ণই হবে। যদি এই ত্রুটিপূর্ণ অনুমানগুলোকে “নিশ্চিত জ্ঞান”-এর মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে এর চেয়ে বড় গোমরাহি আর কী হতে পারে? স্রষ্টা এবং তাঁর অদৃশ্যের ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কেবল সেটাই হতে পারে যা তাঁর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। এই জ্ঞান মুসলমানদের কাছে কুরআন ও হাদীসের আকারে বিদ্যমান ছিল; তাই মুসলমানদের দার্শনিক ইলাহিয়াতের দিকে মনোনিবেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন দার্শনিকদের কিতাবসমূহ আরবি ও ফারসিতে অনূদিত হলো, তখন দেখতে দেখতে মুসলিম আলেম সমাজের একটি বড় অংশ গ্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা গেল।

এরা ছিল সেই সব লোক যারা আগে থেকেই যুক্তিবাদী এবং প্রতিটি নতুন আওয়াজের দ্বারা প্রভাবিত হতে অভ্যস্ত ছিল। তারা আসলাফদের অনুসরণের পরিবর্তে স্থায়ী মতামতের (খোদরায়ী) রোগে আক্রান্ত ছিল। তাদের জ্ঞানের পরিধি অবশ্যই বিস্তৃত ছিল কিন্তু গভীরতার অভাব ছিল। এমন আলেমগণ দর্শনকে লুফে নিলেন এবং এর প্রতি এমনভাবে আসক্ত হলেন যে, দ্বীনের সুদৃঢ় আকিদাহসমূহকেও বুদ্ধির ভিত্তিতে যাচাই করা, পরিমাপ করা এবং প্রমাণ করা শুরু করে দিলেন এবং রুইয়াতে বারী, ইস্তোয়া আলাল আরশ, কালামে ইলাহী এবং তাকদীরের মতো নাজুক বিষয়গুলোকেও যুক্তির আওতায় নিয়ে এলেন। এই দলটিই “মুতাযিলা” নামে পরিচিত হলো।

মামুন কীভাবে ভ্রান্ত চিন্তার শিকার হলেন?

যেহেতু খলিফা মামুনের রশীদ নিজে দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সেই সাথে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করার প্রবল আগ্রহও ছিল; তাই তিনি মুতাযিলা গোষ্ঠীকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন; কারণ তিনি মনে করতেন যে, দ্বীন প্রচারের জন্য এই পদ্ধতিই উত্তম এবং এই ব্যাখ্যাগুলোই প্রতিটি জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

মামুনের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শীঘ্রই মুতাযিলারা খিলাফতের দরবারে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হলো। মামুনের উত্তরসূরি মুতাসিমের যুগে প্রখ্যাত মুতাযিলা আলেম কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদ বাগদাদের কাজীউল কুজাত হয়ে গেলেন। তারা খালকে কুরআন আকিদাহকে (অর্থাৎ আল্লাহর কালাম সৃষ্ট) তাদের দলের শ্লোগান বানিয়ে নিলেন এবং এর বিরোধিতা পোষণকারীদের ওপর চরম কঠোরতা শুরু করলেন। সুদৃঢ় আকিদাহর অধিকারী আলেমগণ যারা বুদ্ধির পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসের ওপর আস্তা রাখতেন, তারা এই যুগে সরকারের জুলুম-নিপীড়নের শিকারে পরিণত হন। [১]

উচ্চপদগুলোতে মুতাযিলাদের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে সাধারণভাবে এটি মনে করা হতে লাগল যে, মুতাযিলা চিন্তাধারার লোকেরা অধিক চতুর, বিচক্ষণ এবং সত্য সন্ধানী হয় এবং তাদের গবেষণাগুলো নিরপেক্ষ ও অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের তুলনায় ফকীহ ও মুহাদিসদের রক্ষণশীল, বর্তমান যুগের চাহিদার সাথে অপরিচিত এবং সমসাময়িক প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞ বলে গণ্য করা হতে লাগল।

মামুনের আকিদাহগত গোমরাহির শিকার হওয়া কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়। জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সাথে যদি...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১১/১৬৯ থেকে ১৭১; আল-আলাম যিরিকলি: ১/১২৭

আসলাফদের ওপর আস্তা না থাকলে যেকোনো মানুষ সুদূরপ্রসারী গোমরাহির শিকার হতে পারে।

মামুনের আকিদাগত বিচ্যুতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: এক, তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)। দুই, ইতিযাল (মুতাযিলা মতবাদ)। তাশাইয়ুর প্রতি ঝাঁকের কারণ একেবারেই স্পষ্ট। সে মায়ের দিক থেকে পারস্যদেশীয় ছিল এবং পারস্যবাসীরা শুরু থেকেই তাশাইয়ুর প্রতি অনুরাগী ছিল। তারপর ফজল বিন সহলের মতো শিয়া তার খাস খাদেম ছিল, যে পরবর্তীতে তার উজির হয়েছিল। সে মামুনের মন-মগজের ওপর যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা কম ছিল না।

ইতিযালের প্রতি ঝাঁকের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বারমাকি পরিবারের প্রভাবের কারণে, যারা শাহজাদাদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। এই লোকেরা হিকমত ও শিল্পকলায় পারদর্শী এবং যুক্তিবাদী ছিল। এ ধরনের লোকদের সাহচর্য মামুনকেও শৈশব থেকেই যুক্তিবাদী করে তুলেছিল। এই কারণেই সে প্রতিটি ধর্ম ও ফেরকার জ্ঞানীদের সাথে রাখতে শুরু করে। তার দরবারে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু ও মজুসি সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর যখন সে গ্রিস ও পারস্যের দর্শন ও হিকমতের কিতাবসমূহ পেল, তখন সে সেগুলোর দিওয়ানা হয়ে গেল। যুক্তিবাদিতার ব্যাপক প্রসারের ফলে কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব নেপথ্যে চলে গেল এবং শরয়ি দলিলের ক্ষেত্রে মনগড়া যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার দ্বার উন্মোচিত হলো। এভাবে “মুতাযিলা ফেরকা” অসাধারণ শক্তি লাভ করল এবং দেখতে দেখতে তারা মামুনের চিন্তা-চেতনায় ও শাসনের সর্বক্ষেত্রে ছেয়ে গেল।

এরপর যদি মামুনের মধ্যে আহলে সুন্নাহের কোনো প্রভাব অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে তা ছিল কেবল তার বাপ-দাদার স্মৃতি অথবা সেই মুহাদিসগণের বরকত, যাদের থেকে সে কখনো উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু এটা স্বাভাবিক বিষয় যে, পরবর্তী সাহচর্য যদি বিপরীত হয়, তবে তা প্রথম সাহচর্যের প্রভাবকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করে দেয়। মামুন কুরআন ও হাদিসের হাফেজ আগে হয়েছিল এবং দর্শনের ছাত্র পরে। এই দ্বিতীয় বিষয়টি ইসলামি ইলমের ওপর প্রবল হয়ে গেল এবং সে কুরআন ও সুন্নাহকেও যুক্তিবাদিতার অনুগামী করে তুলল। যদি কোনো সুনির্ধারিত ইসলামি মাসআলাও তার যুক্তিতে না আসত, তবে সে তা অস্বীকার করত। ধর্মীয় বিষয়ে মামুনের স্বভাবের আন্দাজ দুটি ঘটনা থেকে করা যেতে পারে।

২১২ হিজরিতে সে পুরো সাম্রাজ্যে এই আদেশ জারি করল যে, প্রত্যেক নামাজের সালাম ফেরানোর পর মানুষ দাঁড়িয়ে তিনবার উচ্চস্বরে তাকবির ধ্বনি দেবে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, মামুন কোন দলিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিদআত শুরু করেছিল, তবে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ছিল যে, সম্ভবত সে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত সেই হাদিসটি দেখে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিল, যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে নামাজের পর উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির হতো। [১]

এই হাদিস আগেও ওলামায়ে কেরামের সামনে ছিল, কিন্তু কেউ এর এমন অর্থ বোঝেননি; বরং আইম্মায়ে আরবাআসহ উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম অন্যান্য হাদিস দেখে বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্থায়ী আমল ছিল নামাজের পর নিচু স্বরে জিকির ও দোয়া করা। কখনো কখনো আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে এটা শেখানোর জন্য যে কী কী জিকির মাসনুন, উচ্চস্বরেও অজিফা পাঠ করতেন। কিন্তু মামুন একটি হাদিস দেখে বাকি সবকিছু ভুলে গেল এবং জিকিরের অর্থও সে উচ্চস্বরে তাকবির গ্রহণ করল এবং তা সরকারিভাবে কার্যকর করে দিল। [২]

[১] ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, ফরজ নামাজ শেষে মানুষের উচ্চস্বরে জিকির করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে প্রচলিত ছিল। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৪১, কিতাবুল আযান, বাব: নামাজের পর জিকির)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২০/১১৭

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, একবার শিয়া আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে মুতআ জায়েজ। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর এই উক্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, “রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর (রা.)-এর যুগে দুটি মুতআ হালাল ছিল, আমি সেগুলোকে হারাম করছি।” তিনি প্রকাশ্যে বলতেন: “যাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) হালাল করেছেন, উমর কে যে তাকে হারাম করবে?”

কারো সাহস ছিল না যে মামুনের এই ঔদ্ধত্যের সামনে সত্য কথা বলে। এমন পরিস্থিতিতে দরবারের বিখ্যাত আলেম কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রহ.) (১৫৯ হি. - ২৪২ হি.) আসলেন। তিনি এই নির্দেশের কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন: “ইসলামে একটি ফাটল দেখা দিয়েছে।”

মামুন জিজ্ঞেস করলেন: “সেটি কী?” তিনি বললেন: “যিনা হালাল করে দেওয়া হয়েছে।”

মামুন জিজ্ঞেস করলেন: “তা কীভাবে?” কাজী সাহেব বলতে লাগলেন: “মুতআ তো যিনাই, তাই না?”

মামুন বললেন: “এর দলিল?” কাজী সাহেব (রহ.) এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمِنْ ابْتَغَىٰ
[১] وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

তারপর জিজ্ঞেস করলেন: “যে মহিলার সাথে মুতআ করা হয়, সে কি দাসী?” মামুন বললেন: “না।”

কাজী সাহেব (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন: “সে কি শরয়ী স্ত্রী এবং সে কি মিরাসে (উত্তরাধিকারে) অংশ পায়?”

মামুন আবারও নেতিবাচক উত্তর দিলেন। কাজী সাহেব (রহ.) বললেন:

“তাহলে যারা এগুলি ছাড়া কামতৃপ্তির জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজবে, তারা তো সীমা লঙ্ঘনকারীই হলো।”

এরপর তিনি মুতআ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাঠ করে শোনালেন যা ইমাম যুহরী (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ (রহ.)-এর দুই সাহেবজাদা আবদুল্লাহ ও হাসান থেকে, এবং তাঁরা তাঁদের পিতা (মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ রহ.) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে খায়বরের দিন ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মুতআ হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

মামুন বিস্মিত হয়ে আলেমদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: “এই হাদীসটি কি সহীহ?”

সবাই যখন এর সত্যতা নিশ্চিত করলেন, তখন মামুন ইস্তিগফার পড়তে লাগলেন এবং মুতআ বৈধতার সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। [২]

[১] অনুবাদ: আর তারা সেই লোক যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী, নিজেদের স্ত্রী... অথবা তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ব্যতীত। এক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনো নিন্দা নেই। অতঃপর যারা এগুলি ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজবে, তারাই হলো সীমা লঙ্ঘনকারী। - আল-মুমিনুন, আয়াত: ৫ থেকে ৭।

[২] ওফায়াতুল আ'যান: ৬/১৫০ অনুবাদ: ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম। উল্লিখিত হাদীসটি নিম্নরূপ: ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ও হাসান থেকে, তাঁরা মুহাম্মদ ইবনে আলীর দুই পুত্র, তাঁরা তাঁদের পিতা থেকে, তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বরের দিন মহিলাদের মুতআ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৪২১৬) তবে শব্দগুলো ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হা: ৩৪৯৭)

ইমাম তিরমিযী এই বর্ণনার পর বর্ণনাকারীদের ওপরও আলোকপাত করেছেন। যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ও হাসান থেকে, তাঁরা মুহাম্মদ ইবনে আলীর দুই পুত্র, তাঁরা তাঁদের পিতা থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বরের সময় মহিলাদের মুতআ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করেছেন। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-মাখযুমী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ও হাসান থেকে, তাঁরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহর দুই পুত্র এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের উপনাম আবু হাশিম। যুহরী বলেন: তাঁদের দুজনের মধ্যে হাসান ইবনে মুহাম্মদ অধিক পছন্দনীয় ছিলেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী ইবনে উয়ায়না থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের দুজনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ অধিক পছন্দনীয় ছিলেন: এটি একটি সহীহ হাদীস। (হা: ১৭৯১)

এই ঘটনাগুলো থেকে এটি বোঝা যেতে পারে যে মামুন প্রকৃতপক্ষে রাফেজি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আধুনিকমনা ও মুক্তচিন্তার মুসলিম, যিনি কোনো বিষয় বুঝতে পারলে তা মেনে নিতেন। কখনো সেই বিষয়টি সঠিক হতো, আবার কখনো তা সম্পূর্ণ ভুল হতো।

মামুনের শুরু করা বিদআতসমূহ:

শিয়া মতবাদ ও যুক্তিবাদিতার এই ঝাঁকের কারণেই ২১১ হিজরিতে মামুনের মাধ্যমে সেই অনিষ্টের প্রকাশ ঘটে যা তার সমস্ত গুণাবলিকে লান করে দেয়। ২১১ হিজরিতে তিনি শিয়াদের কিছু আকিদা প্রচার করতে শুরু করেন এবং এই ফরমান জারি করেন:

“রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হলেন হযরত আলী (রা.)। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেওয়া হোক।” [১]

পরের বছর তিনি কুরআন সৃষ্টির আকিদাও প্রচার করতে শুরু করেন, অর্থাৎ কুরআন মাজিদ আল্লাহর সৃষ্টি।

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন:

“মামুন দুটি বিপজ্জনক বিদআত শুরু করেছিলেন যা একটির চেয়ে অন্যটি বড় ছিল: এক, কুরআন মাজিদকে সৃষ্টি বলা। দুই, হযরত আলী (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর সমস্ত মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা। এই উভয় বিষয়ে তিনি চরম ভুল করেছেন এবং মহাপাপে লিপ্ত হয়েছেন।” [২]

এটা তো স্পষ্ট যে মামুন রাফেজি ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি সাহাবীদের গালিগালাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপরও তিনি সমালোচনা করতেন না। শুধু বলতেন যে, তাঁর প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই। বাকি সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁর আকিদা তাঁর নিজের নিচের কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়:

আমার দ্বীন যার ওপর আমি অবিচল হয়েছি... এবং যার জন্য আমি আগামীকাল কোনো ওজর পেশ করব না।

তা হলো নবী ﷺ-এর পর আলী (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা রাখা... এবং আমি সিদ্দিক ও উমর (রা.)-কে মন্দ বলি না।

অতঃপর উসমান বিন আফফান (রা.) নেককারদের সাথে জান্নাতে আছেন, তিনি ধৈর্য ধারণ করে শহীদ হয়েছেন।

আমি জুবায়ের ও তালহা (রা.)-কেও মন্দ বলি না, যদিও কেউ বলে যে তারা উভয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

আয়েশা (রা.) উম্মুল মুমিনীন, আমি তাঁকে তিরস্কার করি না। যে ব্যক্তি তাঁর ওপর অপবাদ দেয়, আমরা তার থেকে দায়মুক্ত। [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬৭

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/১৮৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/২২২

উদ্দেশ্য হলো, মামুন নিজের পক্ষ থেকে এক ধরনের সতর্ক শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন যাতে আহলে সুন্নাতও অসন্তুষ্ট না হয় এবং শিয়াদেরও সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও আকিদাগত বিষয়ে এই বিচ্যুতিও অনেক বড় বিভ্রান্তি ছিল; এজন্যই হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) মামুনের উল্লিখিত আকিদা উল্লেখ করে বলেছেন যে, মামুন এই আকিদা গ্রহণ করেছিলেন যা সমস্ত সাহাবীর এমনকি হযরত আলী (রা.)-এরও পরিপন্থী ছিল, যিনি বলতেন যে, “যে ব্যক্তি আমাকে আবু বকর ও উমর (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেবে আমি তাকে চাবুক মারার শাস্তি দেব।” [১]

কুরআন সৃষ্টির (খালকে কুরআন) মাসআলায় মামুনের কঠোরতা:

যাইহোক, মামুন শিয়া মতবাদের ওপর ভিত্তি করে আকিদা জনসাধারণের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। এর বিপরীতে কুরআন সৃষ্টির মাসআলায় তিনি এতটাই কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন যে বিস্ময় জাগে। সাধারণ অবস্থায় তিনি দলীল মেনে নিতেন, কিন্তু এখানে তিনি নিজের মতের সাথে একমত না পোষণকারীদের জন্য আগুনের শিখা হয়ে যেতেন।

কাজী ইয়াহইয়া বিন আকসাম (রহ.) তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মুতআ-এর মাসআলায় তাঁর দলীল শুনে নিজের মত পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু কুরআন সৃষ্টির মাসআলায় তিনি তাঁর একটি কথাও শোনেনি বরং তাঁর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। [২]

তিনি বাগদাদের সমস্ত কাজীদের একত্রিত করে নিজের মাযহাব শুনিয়ে বললেন:

“যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। সে বিচার বিভাগীয় ও সরকারি চাকরির যোগ্য থাকবে না।”

এরপর তিনি বড় বড় আলেমদের একত্রিত করলেন এবং তাদের নিজের আকিদার অনুসারী করতে চাইলেন। মুতাজিলা আলেমদের ছাড়া আর কেউ এই আকিদার প্রবক্তা ছিল না, কিন্তু মামুনের চরম স্বৈরাচারী অবস্থা দেখে কারো সাহস হয়নি যে এর প্রতিবাদ করে।

কুরআন সৃষ্টির মাসআলায় মামুনের কঠোরতা দিন দিন বাড়তে থাকে। কোনো আলেমই বাকি ছিলেন না যাকে হকের জন্য চাবুক মারা, কারাবরণ এবং শৃঙ্খলিত হওয়ার মুসিবত ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। এমনকি রোমানদের আক্রমণের কারণে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। [৩]

রোমানদের সাথে জিহাদ:

মামুনুর রশীদের সিংহাসন আরোহণের সময় কায়সার লিওন ক্ষমতায় ছিলেন। সাড়ে সাত বছর শাসনের পর এক বিদ্রোহে তিনি নিহত হন এবং তাঁর স্থলে প্রাক্তন কায়সার মাইকেল, যিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সন্ন্যাস জীবন যাপন করছিলেন, পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। কায়সার মাইকেল একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন; তাই তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু যখন ২১৪ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পুত্র থিওফিলাস সিংহাসনে আরোহণ করেই যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন। স্থানীয় গভর্নররা যথাসম্ভব সীমান্ত রক্ষা করতে থাকেন কিন্তু বিপদ বাড়তেই থাকে।

অবশেষে মামুনুর রশীদ ২রা মহরম ২১৫ হিজরিতে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সীমান্ত রক্ষার জন্য বাগদাদ থেকে বের হন। তিনি জানতেন না যে এখন আর তাঁর রাজধানী অভিমুখে ফিরে আসা নসিব হবে না। তিনি মসুল হয়ে তিন মাসের সফরের পর...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/২২২

[২] তারিখুত তাবারী: ৮/৬৩১ থেকে ৬৪২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/২৩১

জমাদিউল আউয়াল মাসে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর তারতুসে পৌঁছে গেলেন যেখানে রোমানরা আক্রমণ করছিল। তাদের পিছু হটিয়ে মামুন আন্তাকিয়া এবং তারপর এশিয়া মাইনরের রোমান শহর: মাসিসা এবং মালাতিয়া পর্যন্ত গেলেন। রোমানরা নতি স্বীকার করে সন্ধি করে নিল। মামুন সতর্কতা হিসেবে সরাসরি বাগদাদে ফিরে না গিয়ে বরং দামেস্কে অবস্থান করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন।

তাঁর প্রত্যাশা অনুযায়ী রোমানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পুনরায় উপকূলে আক্রমণ করল এবং তারতুসে ১৬০০ মুসলমানকে তলোয়ারের নিচে ফেলে (শহীদ) করল। এটি ২১৬ হিজরির ঘটনা। মামুন খবর শোনামাত্রই পাল্টা আক্রমণ করলেন। একদিক থেকে তিনি নিজে সসৈন্যে অভিযান চালিয়ে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করলেন। অন্যদিকে অন্য একজন সেনাপতিকে পাঠালেন যিনি তুয়ানার অনেক জনপদ জয় করে নিলেন। তৃতীয় দিক থেকে মামুনের ভাই আবু ইসহাক মুতাসিম অগ্রসর হলেন এবং রোমানদের ত্রিশটি দুর্গ জয় করে নিলেন। [১]

জুবাইদা খাতুনের ইন্তেকাল। জুবাইদার সীরাত ও চরিত্র। নহরে জুবাইদা:

মামুন যখন এই অভিযানগুলোতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন জমাদিউল আউয়াল ২১৬ হিজরিতে তাঁর সৎ মা জুবাইদা খাতুন বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। আমিনের হত্যাকাণ্ড এবং মামুনের বাগদাদে সিংহাসন আরোহণের পর তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত মহব্বত ও স্নেহের সাথে আচরণ করতেন। তিনি বলতেন: “যদি এক ছেলেকে হারিয়ে থাকি, তবে অন্যজনকে পেয়েছি।”

তিনি খলিফা মনসুরের পুত্র জাফরের নয়নের মণি ছিলেন। আসল নাম ছিল উম্মুল আজিজ। শৈশবে দাদা তাঁর সাথে খেলতেন এবং “জুবাইদা জুবাইদা” বলে ডাকতেন। এই নামই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। হারুনুর রশিদ ১৬৫ হিজরিতে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি এমন প্রিয়তমা রানী ছিলেন যে হারুন সারা জীবনে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করেননি। তিনি অত্যন্ত উচ্চবংশীয় এবং মুত্তাকী নারী ছিলেন। তাঁর একশজন দাসী ছিল যারা সকলেই কুরআন মাজীদে হাফেজা ছিল। তাদের কাজ ছিল অনবরত তিলাওয়াত করা, জেনানা মহলে তাদের তিলাওয়াতের হালকা গুঞ্জন সব সময় শোনা যেত। [২]

জুবাইদা খাতুনের সেই কীর্তি যা তাঁকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, তা হলো নহরে জুবাইদা। প্রাচীনকাল থেকেই মক্কায় পানির প্রচণ্ড অভাব ছিল। বিশেষ করে হজের সময় হাজীদের পানির জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। কখনো এমনও হতো যে এক মটকা পানি এক এক দিনারে বিক্রি হতে শুরু করত। ১৮৬ হিজরিতে জুবাইদা খাতুন হজের জন্য গেলে নিজের চোখে মানুষের এই কষ্ট দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি স্থপতিদের ডাকলেন এবং বললেন যে কোনোভাবেই হোক মক্কাবাসীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করো এবং তাদের জন্য পানির ঝরনা খুঁজে বের করো।

তারা অনেক প্রচেষ্টার পর একটি ঝরনা তায়েফের নিকটবর্তী ওয়াদিয়ে হনাইনের কুহে তাদ-এ এবং দ্বিতীয়টি কুহে কারায় খুঁজে পেলেন যার পানি ওয়াদিয়ে নুমানকে সিক্ত করত। কিন্তু এই ঝরনাগুলোর পানি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ছিল। পথে পাহাড় এবং পাথুরে এলাকা ছিল যেখানে খনন কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল। তারপর মক্কা পর্যন্ত মরুভূমি এলাকা ছিল যেখানে পানি মাটিতে শোষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল; তাই বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ করার পর বললেন: “এতে প্রচুর খরচ হবে।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: বছর ২১৫ হি. ২১৬ হি.; আল-ইবার ফি খবর মান গবার: ১/২৫৯ থেকে ২৭০

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/২০৪

জুবাইদা বললেন: “যদি কোদালের প্রতিটি আঘাতের বিনিময়ে একটি আশরাফি দিতে হয়, তবে আমি তা দিতে প্রস্তুত।”

অবশেষে কাজ শুরু হলো। এটি ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ—জমিন খনন করা। হাজার হাজার শ্রমিক এতে নিয়োজিত হলো। খালের তলদেশ ও পাড় অত্যন্ত মজবুত করে তৈরি করা হলো এবং তাতে এমন মশলা (উপাদান) লাগানো হলো যাতে পানি বালুময় মাটিতে শোষিত না হয়। খালটিকে উপরে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল যাতে মরুভূমির ধূলিঝড় থেকে উড়ে আসা বালি খালে না পড়ে।

মিনার দক্ষিণ মরুভূমিতে একটি বিশাল কূপ ‘বির-এ-জুবাইদা’ তৈরি করা হয়েছিল যাতে বৃষ্টির দিনে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পানি নষ্ট না হয়। এই পানিকে সাত মাইল দীর্ঘ কারিজের (ভূগর্ভস্থ নালা) মাধ্যমে খাল পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খালের পানি আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরা পর্যন্ত, তারপর মুজদালিফা ও মিনা পর্যন্ত পৌঁছানো হলো। এরপর সেখান থেকে একটি ছোট খাল মক্কা শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এই মহান প্রকল্পে সতেরো লক্ষ দিনার ব্যয় হয়েছিল। ওজনের দিক থেকে এটি পাঁচ হাজার নয়শ পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনা হয়। (আজকের দিনে এর মূল্য প্রায় ২৪.২৫ বিলিয়ন রুপি হবে)।

জুবাইদা তার সমস্ত কোষাগার এই কাজের ব্যবস্থাপকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে তারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই খরচ করতে পারে। এটি এত বড় প্রকল্প ছিল যে অর্থের কোনো অভাব হয়নি। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন জুবাইদাকে হিসাবের খাতা দেওয়া হলো, তখন তিনি দজলা নদীর তীরে বসে ছিলেন। তিনি না পড়েই হিসাবের খাতাটি নদীতে ফেলে দিলেন এবং বললেন:

“হিসাবকে হিসাবের দিনের জন্য থাকতে দাও। যা খরচ হয়েছে, তা হয়েছে।”

হাজি এবং মক্কাবাসীদের জন্য পানির প্রাচুর্য দেখে তারা জুবাইদাকে এত দোয়া দিলেন যে সম্ভবত তা-ই কবুল হয়েছে। এই খালের নাম ‘নহরুল মুশাশ’ রাখা হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত একে ‘নহরে জুবাইদা’ বলেই ডাকেন, যা এই পুণ্যবতী নারীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার প্রমাণ।

জুবাইদার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

“আপনার সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?”

তিনি উত্তর দিলেন: “আল্লাহ কোদালের সেই প্রথম আঘাতের বিনিময়েই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা খাল খননের জন্য করা হয়েছিল।” [১]

আজও এই খাল বিদ্যমান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে এর পানি এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত হিসেবে প্রমাণিত হয়।

মামুনের মিশর সফর এবং বিদ্রোহীদের দমন:

রোম সীমান্তে যুদ্ধ চলছিল। মামুনের অভিযানের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত কায়সার কৌশলগত কারণে ক্ষমা চাইলেন, তখন মামুন ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। আসলে তার যুদ্ধের বিরতি প্রয়োজন ছিল; কারণ মিশরে আব্দুস ফিহরি নামক এক নেতা বিদ্রোহ করে আব্বাসীয়দের সেখান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। সেখানে গিয়ে খবর নেওয়া জরুরি ছিল।

তাই মামুন যুদ্ধ বিরতির পর বাগদাদে না গিয়ে দামেস্কে কিছুদিন অবস্থান করলেন এবং ২১৬ হিজরির জিলহজ মাসে মিশরের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিদ্রোহী নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

[১] ওফায়াতুল আ'য়ান: ২/৩১৪; আ'লামুয যারকালি: ৩/১৪২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১৬ হিজরি।

মামুনকে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধরত দেখে রোমানরা পুনরায় আক্রমণ করল। মামুন ২১৮ হিজরিতে মিসর থেকে সিরিয়ায় ফিরে এসে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেন। কায়সার “তুয়াইল” নিজেই মোকাবিলায় ছিলেন কিন্তু মামুনের সামনে টিকতে পারলেন না এবং পিছু হটে আবারও সন্ধির আবেদন করলেন। মামুন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জবাবে লিখলেন:

“এখন সন্ধির কেবল একটিই পথ আছে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।”

সেই সাথে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে রোমানদের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে একটি বিশাল বাহিনী রাখা হবে এবং তাদের জন্য একটি সুউচ্চ সেনানিবাস নির্মাণ করা হবে। এশিয়া মাইনরের তুয়ানা নামক স্থানে মামুনের ভাই আব্বাসের তত্ত্বাবধানে এই পরিকল্পনা শুরু হয়। সেনানিবাসের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল এক মাইল করে। দূর-দূরান্তের শহরগুলো থেকে অসংখ্য স্থপতি ও শ্রমিক এই কাজে শরিক হন। প্রাচীরের ভেতরের দিকে তিন দিকে একটি করে দুর্গ তৈরি করা হয়। [১]

মাসআলা খালকে কুরআন - ইমাম আহমদ বিন হাম্বল-এর গ্রেফতারি

রোমানদের সাথে মামুনের আলোচনা চলছিল। তিনি উপকূলীয় শহর তুয়াসে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধবিরতির বিষয়গুলো তখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই সময়ে হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, যতক্ষণ না তিনি মুসলিম উম্মাহর ওপর খালকে কুরআন-এর আকিদা জোরপূর্বক চাপিয়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি তার ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না। এই চিন্তা আসতেই তিনি বাগদাদের গভর্নর ইসহাক বিন ইব্রাহিমের নামে একটি বিস্তারিত ফরমান পাঠান যাতে সাধারণ মুসলমান বিশেষ করে মুহাদ্দিসগণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছিল। কুরআন সৃষ্টির আকিদা না মানার কারণে তাদের পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্টতম লোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সেই সাথে বাগদাদের গভর্নরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যে সকল আলেম এই আকিদা গ্রহণ করবেন না তাদের পদ থেকে অপসারিত করে খলিফাকে অবহিত করতে হবে।

এই ফরমান মামুনের মৃত্যুর চার মাস আগে পাঠানো হয়েছিল। প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে এর অনুলিপি পাঠিয়ে বাধ্য করা হয়েছিল যেন তারা নিজ নিজ প্রদেশের কাজীদের আকিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং যারা অস্বীকার করবে তাদের পদচ্যুত করা হয়।

এরপর মামুন বাগদাদের শাসককে আরও একটি পত্র পাঠান যাতে বলা হয়েছিল যে, কাজীদের পাশাপাশি অন্যান্য বিখ্যাত আলেমদেরও একত্রিত করে তাদের আকিদা জিজ্ঞাসা করা হোক এবং তাদের উত্তরগুলো খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

ইসহাক বিন ইব্রাহিম বিখ্যাত আলেমদের ডেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কেউ বললেন যে এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। কেউ অস্পষ্ট কথা বললেন। কেউ প্রাণ বাঁচানোর জন্য সমর্থন দিলেন। কেউ অস্বীকার করলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের সম্পর্ক মুহাদ্দিস ও ফকিহদের স্তরের সাথে ছিল। তিনি মুতাজিলাদের দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলোর প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন। আপনার অবস্থান ছিল এই যে, কালামুল্লাহ, রুইয়াতে বারি এবং এই জাতীয় মাসআলাগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা সেটিই যা আসলাফ থেকে চলে আসছে। সেটির ওপরই সামগ্রিক ঈমান রাখা জরুরি। এর বাইরে গিয়ে...

[১] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: সন ২১৭ হি. - ২১৮ হি.

দার্শনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়; তাই তাদের উত্তর ছিল:

“কুরআন আল্লাহর কালাম। আমি এ ছাড়া আর কিছুই বলি না।”

বিশর বিন আল-ওয়ালিদ (রহ.)-ও একই উত্তর দিয়েছিলেন। মামুন যখন তাদের উত্তরগুলো পড়ল, তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সমর্থনকারী এক-দুজন আলেম ছাড়া বাকি প্রত্যেক আলেমকে সে ঘুষখোর, দুনিয়াপুজারী, নির্বোধ, রিয়াকার, চোর এবং মিথ্যাবাদী বলে গালি দিল। ইব্রাহিম বিন মাহদী (রহ.) এবং বিশর বিন আল-ওয়ালিদ (রহ.) নামক দুইজন আলেম সম্পর্কে সে লিখল যে, এই দুইজন যদি তওবা না করে তবে তাদের মাথা কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে লিখল: “তার আকিদা মূর্খতার প্রমাণ। তাকে এর পরিণাম ভোগ করতে হবে।”

এরপর মামুন এই আলেমদের গ্রেফতার করে শিকলবদ্ধ অবস্থায় তারসূস সীমান্তে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিল যাতে যুক্তি-তর্ক শেষ করে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে পারে। এই কঠোরতা বড় বড় আলেমদের ভীত করে তুলল। অধিকাংশ আলেম অনিচ্ছাসত্ত্বেও মামুনের সমর্থন করে দিলেন। বাগদাদের আলেমদের মধ্যে কেবল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং মুহাম্মদ বিন নুহ (রহ.) অবিচল থাকলেন। মামুনের নির্দেশ অনুযায়ী এই দুইজনকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় একই উটের পিঠে বসিয়ে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময় সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে এক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দেখা যাক কী ফলাফল আসে। যদি এই দুই ব্যক্তিও নতি স্বীকার করতেন, তবে উম্মতের জন্য আল্লাহই ভরসা ছিলেন। শহরের মানুষ তো দূরের কথা, গ্রামবাসীরাও সেই আকিদা থেকে সরে আসতে প্রস্তুত ছিল না যা আসলাফ (পূর্বসূরি) থেকে বর্ণিত হয়ে আসছিল, কিন্তু এই সঠিক আকিদার টিকে থাকা আলেমদের দৃঢ়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এই ব্যক্তিবর্গ যখন রাহবা পৌঁছালেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন আমির নামক এক আরব বেদুইন এসে দেখা করল। সে আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে বলল:

“জাতির প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছ। জাতির জন্য যেন অমঙ্গলজনক প্রমাণিত না হও। আজ তুমি উম্মতের নেতা। সতর্ক থেকে যে, তুমি যদি এই ভুল আকিদা মেনে নাও তবে বাকি লোকেরাও তা মেনে নেবে। যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে নিজের কথায় অটল থেকে, কারণ তোমার এবং জান্নাতের মাঝে কেবল নিহত হওয়ার অপেক্ষা। আর যদি নিহত না-ও হও, তবুও তো মৃত্যুবরণ করবেই। কিন্তু যদি অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করো তবে সুখ্যাতি নসিব হবে।”

ইমাম আহমদ (রহ.) বলতেন: “তার কথা আমার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে দিল যে আমি সরকারের অবস্থান মেনে নেব না।”

মামুনের ছাউনি থেকে একদিনের দূরত্ব বাকি থাকতে একজন সরকারি কর্মচারী কাঁদতে কাঁদতে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর কাছে এল এবং বলল:

“আমার কত কষ্ট হচ্ছে যে মামুন একটি একেবারে নতুন তলোয়ার তৈরি করে এবং চামড়ার একটি একেবারে নতুন বিছানা পেতে বসে আছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আত্মীয়তার কসম খেয়ে বলছে যে, যদি আপনি আকিদা পরিবর্তন না করেন তবে সে এই তলোয়ার দিয়েই আপনাকে মেরে ফেলবে।”

ইমাম আহমদ (রহ.) এটি শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি তুলে মোনাজাত করলেন:

“হে রব! তোমার ধৈর্য এই ফাসিককে এতটাই ধোঁকায় ফেলেছে যে সে তোমার বন্ধুদের চাবুক এবং হত্যার হুমকি দিচ্ছে। হে আল্লাহ! যদি তোমার কালাম মাখলুক না হয় তবে আমাদের মামুনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো।”

এখনও সুবহে সাদিক উদিত হয়নি এমন সময় মামুনের মৃত্যুর খবর চলে এল। সরকারি কর্মকর্তারা ইমাম আহমদ এবং মুহাম্মদ বিন...

নূহ রহমাতুল্লাহকে নৌকায় অন্য বন্দীদের সাথে ফেরত পাঠিয়ে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। একইভাবে তাদের পায়ে বেড়ি লাগানো ছিল। সফরের কষ্টের কারণে মুহাম্মদ বিন নূহ রহমাতুল্লাহ পথেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ ২১৮ হিজরির রমজান মাসে বাগদাদে পৌঁছান, সফরের কঠিন বিপদ সহ্য করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৫৭ বছর ছিল। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। সেখানেও তাঁকে দুই-দুইটি বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি বন্দীদের নামাজ পড়াতেন। [১]

মামুনের মৃত্যু কীভাবে হলো?

মামুনের মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয় যে, ১৩ই জমাদিউল আখিরাতে তাঁকে কিছু তাজা পছন্দের খেজুর পেশ করা হয়েছিল। মামুন তা তৃপ্তি সহকারে খেলেন, তারপর ফোরাত নদীর ঠান্ডা পানি পান করলেন। যখন মজলিস শেষ হলো, তখন মামুনের শরীরে জ্বর অনুভূত হলো। এই জ্বর বাড়তেই থাকল। অবশেষে অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ল এবং মৃত্যুর ছায়া চোখের সামনে দুলতে লাগল। মামুন জীবনের ৪৮টি বসন্ত দেখেছিলেন। তাঁর ছেলে আব্বাস তাঁর সাথে ছিল, তিনি চাইলে তাকে উত্তরাধিকারী বানাতে পারতেন—সে সব দিক থেকেই যোগ্য ছিল। কিন্তু মামুন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাঁর ভাই আবু ইসহাককে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তিনিই আবুল ইসহাক মুতাসিম বিল্লাহ উপাধিতে পরিচিত হন। মামুন তাঁর শেষ মুহূর্তে তাঁকে আল্লাহকে ভয় করতে, প্রজাদের খেয়াল রাখতে, দুর্বলদের প্রতি নরম হতে এবং সঙ্গীদের ভুল ক্ষমা করতে ও আলবীদের সাথে ভালো ব্যবহারের অসিয়ত করেন।

আকিদায়ে ‘খালকে কুরআন’-এর ওপর তাঁর শেষ পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এ বিষয়ে তাঁর কঠোরতা অবশিষ্ট ছিল; তাই তিনি উত্তরাধিকারীকে অসিয়ত করে বললেন: “কুরআন সম্পর্কে আমার যে আকিদা, তুমিও তা-ই রাখবে। মানুষকে এর দিকেই আহ্বান করবে।”

তিনি তাকে তাকিদ দিলেন যে মুতাজিলা আলেম আবদুল্লাহ বিন তাহের, আহমদ বিন আবি দাউদ এবং ইসহাক বিন ইব্রাহিমকে যেন নিজের কাছে রাখেন এবং কাজী ইয়াহইয়া বিন আকসামের মতো ব্যক্তিদের যেন কাছে না ঘেঁষেন। এই অসিয়তগুলোর পর তাঁর ওপর মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হলো এবং কিছুক্ষণ পর তাঁর রুহ উড়ে গেল। এই ঘটনা ১৮ই রজব ২১৮ হিজরির। মামুন সাড়ে আট বছর শাসন করেছিলেন। [২]

মামুনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা:

মামুন নতুনত্ব পছন্দ করতেন এবং এই বৈশিষ্ট্য তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায়ও ফুটে ওঠে। তিনি অধিকাংশ রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি নরম ও ক্ষমাশীল ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে তিনি রাজনৈতিক নৈতিকতার পরিধি বিস্তৃত করে নিতেন। তাঁর মতে শাসকদের জন্য এমন অনেক কিছু জায়েজ ছিল যা সাধারণ নিয়ম ও আইনের দৃষ্টিতে অনুচিত ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। এই কারণেই আমরা দেখি যে মামুন যেখানে অনেক বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীদের ক্ষমা করেছেন, সেখানে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচরদের অত্যন্ত নিরবে হত্যা করিয়েছেন।

মামুনের এই রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তাধারা সবকিছুর চেয়ে বেশি তাঁর নিজের একটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়।

[১] তারিখুত তাবারী: সন ২১৮ হিজরি, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯৭/১৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩১/১৪

তিনি একবার তাঁর সহচর কাজী আহমদ বিন আবি দুওয়াদকে বলেছিলেন:

“শাসক মাঝে মাঝে তাঁর বিশেষ সদস্যদের সাথে যা করেন, সে সম্পর্কে জনগণ কখনোই ন্যায্যসঙ্গত মতামত পোষণ করতে পারে না। তারা দেখে যে উজির বা নায়েবে সুলতান এত বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন যে তাঁর বোঝার ভার থেকে শাসকের ঘাড় কখনোই মুক্ত হতে পারে না। ফলে তারা অনায়াসেই এই মত পোষণ করে যে, শাসক যা কিছু করেছেন তা কেবল হিংসা বা মেজাজের কারণে করেছেন; তারা জানে না যে ওই সদস্যদের কিছু কর্মকাণ্ড তাদের নিজেদের ঘর ধ্বংস করারই নামান্তর ছিল। এখন শাসক দুটি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে যান: না তিনি এই রহস্য জনগণের কাছে প্রকাশ করতে পারেন, না তিনি সেই উজির বা নায়েবে সুলতানকে ক্ষমা করতে পারেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা বাহ্যত নেওয়া উচিত নয়। শাসক জানেন যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিশিষ্ট ব্যক্তিরও তাঁকে নিরপরাধ মনে করবেন না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কারও সমালোচনার পরোয়া করা হয় না।” [১]

মামুনী যুগের ওপর একটি পর্যালোচনা

পরবর্তী যুগের কিছু ঐতিহাসিক মামুনকে ইসলামী খিলাফতের আদর্শ, সফলতম এবং সর্বগুণসম্পন্ন শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মামুন একজন মহান শাসক ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে অনেক গুণাবলি একত্রিত হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর যুগ খুব একটা সফল ছিল না এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁর সময়কাল মুসলমানদের জন্য ছিল পুরোপুরি এক পরীক্ষার সময়।

ত্রুটিসমূহ:

আমরা মামুনকে একজন প্রখ্যাত শাসক হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর খ্যাতির কারণ হলো তাঁর ইলমী ও কারিগরি দক্ষতা এবং চারিত্রিক গুণাবলি। শাসক হওয়ার আগে এবং শাসনের সময়ও তাঁর মনোযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইলমী, কারিগরি ও সাহিত্যিক বিষয়ের ওপর ছিল। তাঁর যুগে উদ্ভূত রাজনৈতিক বিষয়গুলো তিনি দূরদর্শিতার সাথে সমাধান করেননি।

তিনি ইরাক ও সিরিয়া জয় করার পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজে বাগদাদের দিকে যাননি, বরং খোরাसानে অবস্থান করছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো তিনি তাঁর উজির ফজল বিন সাহল যুর-রিয়াসাতাইনের ওপর ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। তাঁরই ভাই হাসান বিন সাহল ইরাক ও সিরিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা উভয়ই পারস্য বংশোদ্ভূত এবং ধর্মীয়ভাবে শিয়া ছিলেন। তাঁরা উভয়ই আব্বাসীয় খিলাফতকে পারস্যবাসীদের ধাঁচে...

[১] আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন লিল-জাহিজ, পৃষ্ঠা ৪৫৫, হিজরি: ২৭৬/৩।

যদি একদিক থেকে দেখা হয়, তবে মামুনের এই চিন্তাধারা শাসকের জন্য আইন থেকে মুক্তির পথ খুলে দেয়, কিন্তু অন্যদিক থেকে এটি শাসকের কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ যা মামুনের আগে কারও থেকে বর্ণিত হয়নি। বিজ্ঞজনরা চিন্তা করলে দেখবেন যে, এই বিষয়গুলো অনেকটা সেই ধরনের যাতে ফকিহগণ ‘তাকওয়া’ এবং ‘রিয়া’ (লৌকিকতা)-র পার্থক্য বিবেচনায় রাখেন। অর্থাৎ যদি এই বিষয়টি সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতে আনা হয়, তবে কোনো বিচারকই অভিযুক্তকে খালাস করতে পারবেন না; তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদ দিয়ে সম্ভব যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা—যা তাঁর এবং তাঁর বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ—সে কারণে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত না করেন। সুতরাং কেবল ন্যায়পরায়ণ ও আদিল শাসককেই কোনো বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে; অজ্ঞ ও জালিম শাসকরা এই দিকটিকে দলিল বানিয়ে তাদের জুলুম, দুর্নীতি ও আইনহীনতাকে বৈধ ঘোষণা করতে পারে না।

পরিচালিত করলেন। এর ফলে একদিকে আরবদের মধ্যে সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হলো, অন্যদিকে আলবীয়দের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে আবারও দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সাহস সঞ্চার হতে লাগল। এভাবে আব্বাসীয় রাষ্ট্র একদিকে আরবদের অসন্তুষ্টির শিকার হলো, অন্যদিকে আলবীয়দের বিদ্রোহের কবলে পড়ল। এর পাশাপাশি তৃতীয় দিক থেকে বাইজেন্টাইন রোমানরাও সীমান্তে আক্রমণ অব্যাহত রাখল। যদিও মুসলমানরা সফলভাবে নিজেদের প্রতিরক্ষা করেছিল, তবে মামুনের শাসনের শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষগুলোর কোনো চূড়ান্ত ফলাফল আসেনি।

প্রকৃতপক্ষে মামুন একজন শাসকের চেয়ে একজন দার্শনিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, যিনি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতেন। এটি সেই চিন্তাধারারই একটি কারিশমা ছিল যে, তিনি আলবীয়দের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের খিলাফত দিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, যদিও এই ইচ্ছা বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি এবং এর বাস্তবায়ন সম্ভবও ছিল না; কারণ বনু আব্বাস কখনোই এই বিপ্লব মেনে নিতে পারত না।

এটিও তাঁর দার্শনিক মেজাজের প্রভাব ছিল যে, শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘকাল ধরে আকিদাগত বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন। কখনো তিনি শিয়া মতবাদের দিকে পা বাড়িয়েছেন, কখনো মুতাজিলা মতবাদের দিকে। তিনি অবশ্যই বিশ্বের অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, কিন্তু পূর্বসূরিদের (আসলাফ) ওপর আস্তা থেকে বঞ্চিত এবং ফিকহী দূরদর্শিতা থেকে শূন্য ছিলেন। তাঁর স্বভাবে পরিপক্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে যুবকদের মতো এক ধরনের তড়িঘড়ি করার প্রবণতা ছিল, যারা প্রতিটি নতুন কথা খুব দ্রুত গ্রহণ করে এবং তার দাওয়াত দিতে শুরু করে। এটি ছিল তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক, যার কারণে তিনি খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্টির) মাসআলায় চরমপন্থী ভূমিকা পালন করেন এবং উন্মতকে এক বিশাল ফিতনায় লিপ্ত করেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মামুন একদিকে এতটাই যুক্তিবাদী ছিলেন যে শরয়ী দলিলগুলোকেও (নুসুস) ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতেন এবং যাচাই করতেন। অন্যদিকে তিনি এতটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন যে জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করতেন। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী, মামুনই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি প্রাচীন অনারব রাজাদের মতো দরবারে জ্যোতিষী রেখেছিলেন এবং তাদের পরামর্শকে গুরুত্বযোগ্য মনে করতেন।

[১]

এজন্য ইমাম বাইহাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“মামুনের আগে বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাসের মধ্যে এমন কোনো খলিফা অতিবাহিত হননি যিনি পূর্বসূরিদের আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, যতক্ষণ না মামুন খলিফা হলেন এবং এই লোকেরা (শিয়া ও মুতাজিলা) তাঁর চারপাশে সমবেত হলো এবং তাঁকে সত্য পথ থেকে বাতিলের দিকে ঘুরিয়ে দিল।” [২]

গুণাবলি:

এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত দানশীল, দয়ালু, অমায়িক এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ন্যায়ের উন্মুক্ত আদালত বসাতেন যেখানে যে কেউ এসে নিজের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করতে পারত।

একবার এক বৃদ্ধা উপস্থিত হয়ে তাঁর ছেলে আব্বাসের জুলুমের অভিযোগ করলেন। আব্বাস মামুনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মামুন উজির আহমদ বিন আবি খালিদকে নির্দেশ দিলেন যেন আব্বাসকে ফরিয়াদি মহিলার সাথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। মহিলা বলতে শুরু করলেন...

[১] তারিখ মুখতাসারুদ দুওয়াল লি ইবনিল ইবরি, পৃ. ১৭৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৯৬

যে আব্বাস তার জমি দখল করে নিয়েছে। আব্বাস যখন নিজের সাফাই পেশ করতে শুরু করল, তখন মহিলাটি উচ্চস্বরে নিজের অবস্থান বর্ণনা করতে লাগল। আব্বাসের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো তার কণ্ঠস্বরের নিচে চাপা পড়ে গেল। আহমদ বিন আবি খালিদ মহিলাটিকে থামাতে চাইলে মামুন তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: “চুপ থাকো। সত্য এই মহিলাকে বাকশক্তি দান করেছে এবং মিথ্যা আব্বাসকে বোবা করে দিয়েছে।” এই বলে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, মহিলার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং আব্বাস তাকে দশ হাজার দিরহাম জরিমানা প্রদান করুক।

একবার তিনি তার এক আমিরকে চিঠিতে লিখেছিলেন: “এটি কোনো সৌজন্যের বিষয় নয় যে, তুমি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করবে অথচ তোমার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পরার মতো কাপড়ও নেই এবং তোমার প্রতিবেশীর ঘরে অনাহার চলছে।”

যুহদ ও অন্তরের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি বলতেন: “যদি মানুষ জানতে পারত যে ক্ষমা করার মধ্যে আমি কী পরিমাণ আনন্দ পাই, তবে তারা জেনে-বুঝে আমার অবাধ্যতা করত।”

তিনি স্বভাবগতভাবে হাসিখুশি এবং অমায়িক ছিলেন। কেউ তাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেও তিনি পরোয়া করতেন না। একবার তিনি সঙ্গীদের নিয়ে দজলা নদীর দৃশ্য দেখছিলেন। এক মাঝি তাকে দেখে তার সঙ্গীদের বলতে লাগল: “মামুনকে দেখছ? যখন থেকে সে তার ভাই আমিনকে হত্যা করিয়েছে, তখন থেকে সে আমার চোখে নিচে নেমে গেছে।” এই আওয়াজ মামুনের কানে পৌঁছাল। তিনি মুচকি হেসে তার সঙ্গীদের বললেন: “এমন কোনো উপায় বলা যাতে আমি এই মহান ব্যক্তির দৃষ্টিতে পুনরায় মর্যাদা ফিরে পেতে পারি।”

তিনি বনু হাশিমের ঐতিহ্যবাহী আত্মমর্যাদা ও বীরত্বে ভূষিত ছিলেন। ইসলামি সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি সদাপ্রস্তুত থাকতেন; এজন্য তিনি নিজেই কায়সারের মোকাবিলায় বের হয়েছিলেন এবং এই জিহাদের সফরেই তার মৃত্যু হয়। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪ / ২২৩, ২২৪

মুতাসিম বিল্লাহ বিন আল-রশিদ

আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন হারুন, আল-মুতাসিম

রজব ২১৮ হিজরি... থেকে... রবিউল আউয়াল ২২৭ হিজরি

আগস্ট ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ... থেকে... ডিসেম্বর ৮৪১ খ্রিস্টাব্দ

মুতাসিম বিল্লাহর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ। তিনি ১৮০ হিজরিতে মারদাহ নামক এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মামুনের মৃত্যুর পর তার অসিয়ত অনুযায়ী তিনি ‘মুতাসিম বিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করে খলিফা হন। তিনি ইসলামি ইতিহাসের প্রথম শাসক যিনি এই ধরনের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে সমস্ত খলিফারা তাদের আসল নাম বা কুনিয়াত (ডাকনাম) দ্বারা পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে শুধু প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফাই এই ধরনের উপাধি গ্রহণ করেননি, বরং অন্যান্য অনেক সরকার ও সালতানাতও এই প্রথা অনুসরণ করেছিল। [১]

পড়াশোনায় অনভিজ্ঞ... শারীরিক শক্তিতে অনন্য:

তার পূর্বপুরুষদের বিপরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। শৈশব থেকেই তিনি লেখাপড়া থেকে দূরে থাকতেন। হারুন আল-রশিদ তার অন্যান্য ছেলেদের মতো তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি কোনোভাবেই পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হননি। অবশেষে হারুন একজন শিক্ষিত গোলামকে তার সঙ্গী করে দেন যাতে সে বন্ধুত্বের ছলে তাকে কিছু লেখাপড়া শেখাতে পারে। একদিন সেই গোলাম মারা গেল। পিতা আফসোস করে বললেন: “আরে মুহাম্মদ! শুনলাম তোমার গোলাম মারা গেছে!”

তিনি উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ! সে মারা গেছে আর আমি পড়াশোনা থেকে মুক্তি পেয়েছি।”

হারুন অবাক হয়ে বললেন: “তুমি পড়াশোনায় এতই বিরক্ত!!” তারপর অধস্তনদের বললেন: “তাকে ছেড়ে দাও। তাকে কেউ পড়াতে পারবে না।” এত দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর শুধু এটুকুই হয়েছিল যে, তিনি ঠেকে ঠেকে কোনো ইবারত (পাঠ্য) পড়তে পারতেন। [২] এরপর মুতাসিমের সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয় যাতে তিনি পূর্ণতা অর্জন করেন। শারীরিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী ছিলেন। শরীরের কঠোরতা এমন ছিল যে তাতে দাঁত বসানো যেত না। তিনি শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী মানুষের কবজি দুই আঙুলে চেপে ভেঙে দিতে পারতেন। [৩]

সিংহাসন আরোহণ:

মামুনের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীর কিছু আমির মামুনের ছেলে আব্বাসের হাতে বায়আত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলে দেন যে, আমি আমার চাচার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি। এভাবে কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই মুতাসিমের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৩

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৩

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৪

...সব লোক তরতুসের রণাঙ্গনে ছিল এবং যুদ্ধবিরতি হয়ে গিয়েছিল। মুতাসিম সকল আমীর ও সেনাবাহিনীর সাথে রমজান ২১৮ হিজরিতে বাগদাদে পৌঁছালেন এবং নিজের পারিবারিক সিংহাসন গ্রহণ করলেন। [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলভীর বিদ্রোহ:

মুতাসিমকে প্রথম যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা ছিল সাদাত বংশের একজন সদস্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিদ্রোহ, যিনি হযরত জয়নুল আবেদিনের বংশধর ছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে সবসময় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। খোরাসানের এক মিষ্টভাষী হাজি মদিনায় এসে তাঁর মুরিদ হয়ে যান এবং তাঁকে খিলাফতের সর্বোত্তম হকদার সাব্যস্ত করে খিলাফতের দাবির জন্য প্ররোচিত করেন। আরও অনেক খোরাসানি তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নিজেদের সাথে খোরাসানের শহর জুযজানে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা লোকবল সংগ্রহ করে বিদ্রোহ করেন, তবে খোরাসানের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন তাহিরের কর্মকর্তারা বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। মুতাসিম তাঁকে কারাদণ্ড দেন। কিছুকাল পর ঈদুল ফিতরের দিন গ্রহরীদের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে তিনি ভেন্টিলেটরে দড়ি ঝুলিয়ে পালিয়ে যান। মুতাসিম তাঁর সন্ধানদাতার জন্য এক লক্ষ দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেন কিন্তু এরপর আর কখনও তাঁর কোনো নাম-নিশানা পাওয়া যায়নি। [২]

তুর্কি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি:

মুতাসিমের শাসনামলে শাসনব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তা হলো, তিনি প্রথমবারের মতো ইরানি কর্মকর্তা ও আরব আমীরদের বাদ দিয়ে তুর্কিদের ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেন এবং শাসনের ভার তাদের কাঁধেই অর্পণ করেন। মূলত মুতাসিম ক্ষমতার অলিন্দে বছরের পর বছর ধরে চলা ফারসি ও আরব আমীরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে অতিষ্ঠ ছিলেন। এর সমাধান তিনি এটাই মনে করেছিলেন যে, এই উভয় শ্রেণিকে উপেক্ষা করে কোনো তৃতীয় প্রজন্মের লোকদের সামনে নিয়ে আসা। মুতাসিম ইরানি ও খোরাসানিদের ওপর ভরসা করতেন না; কারণ তিনি তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে আসছিলেন। তিনি জানতেন যে, আলভীসহ সমস্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইরানি ও খোরাসানি উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবতাও এটাই ছিল যে, ফারসি রাষ্ট্রযন্ত্রের সদস্যরা প্রাকৃতিকভাবেই রাজনৈতিক আঁতাত তৈরিতে পারদর্শী ছিল। তাদের বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দক্ষতা তাদের শান্ত হয়ে বসে থাকতে দিত না এবং এ কারণেই মাহদীর যুগ থেকে শুরু করে মামুন পর্যন্ত প্রত্যেক ফারসি উজির খিলাফতের দরবারকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন একজন সৈনিকসুলভ, আত্মমর্যাদাশীল ও স্বাধীনচেতা মানুষ। কারও হাতের পুতুল হয়ে থাকা তাঁর জন্য অসহনীয় ছিল। যারা স্বভাবগতভাবে ধূর্ত ও প্রতারক, তাদের প্রতিও তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল। অধিকাংশ ফারসি আমীর এই মানসিকতারই ছিলেন; তাই মুতাসিম তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাদের পরিবর্তে তিনি তুর্কি গোলামদের পছন্দ করতেন যারা ছিল সাহসী, উৎসর্গীকৃত এবং জানবাজ। তাদের জন্মভূমি ছিল তুর্কিস্তান অর্থাৎ মধ্য এশিয়া, যেখানে সমরকন্দ, বুখারা ও অন্যান্য শহর বিজয়ের সময় হাজার হাজার মানুষকে গোলাম বানানো হয়েছিল। এই লোকেরা গোলামদের বাজারে বিক্রি হতো এবং আমীররা তাদের ব্যক্তিগত সেবার জন্য লুফে নিতেন। মুতাসিমের নিজের লালন-পালনও সামরিক পরিবেশে হয়েছিল যেখানে তুর্কিদের বড় সংখ্যা ছিল; তাই তুর্কিদের সাথে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। মুতাসিমের আগে তুর্কিদের মর্যাদা গোলাম, খাদেম ও সৈনিকের চেয়ে বেশি ছিল না।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ২১৮ হিজরি, আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ৩৩/২

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ২১৯ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ২১৯ হিজরি

কিন্তু মুতাসিম তাদের সামনে এগিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েক ডজনকে তিনি দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কয়েক ডজনকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং তাদের পদোন্নতি দিতে থাকেন। তাঁর ব্যক্তিগত তুর্কি দাসের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশি। এই লোকেরা যুদ্ধের সময় প্রথম সারিতে লড়াই করত এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনক সব দায়িত্ব পালন করত। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সব জায়গায় তুর্কিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [১]

এখান থেকে ইতিহাস এক নতুন মোড় নেয়। পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব তুর্কিদের হাতে চলে যায়। মুতাসিমের পর বনু আব্বাসের পরবর্তী বেশ কয়েকজন খলিফা তুর্কি আমিরদের শক্তিতে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং খলিফারা যত দুর্বল হতে থাকেন, তুর্কি আমিরদের আধিপত্য তত বাড়তে থাকে, এমনকি আব্বাসীয় খিলাফত তুর্কিদের অনুগত হয়ে পড়ে।

এরপর এই তুর্কিদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো মুসলিম বিশ্বে বড় বড় স্বায়ত্তশাসিত সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে। সেলজুক, মুঘল এবং খাওয়ারিজম শাহী সুলতানরা সবাই তুর্কি ছিলেন। একইভাবে ছয় শতাব্দী ধরে টিকে থাকা উসমানীয় খিলাফত এবং মিশরের মামলুক সুলতানরাও তুর্কি ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোর এই বিপ্লবের ভিত্তি মুতাসিমের আমলে তুর্কিদের পদোন্নতি দেওয়ার মাধ্যমেই স্থাপিত হয়েছিল।

নতুন শহর..... সামারা:

বাগদাদে তুর্কিদের আধিক্যের কারণে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হতে শুরু করে; কারণ এই লোকেরা ছিল সৈনিক স্বভাবের এবং কঠোর মেজাজের। তারা শহরে দ্রুতগতিতে ঘোড়া দৌড়াত। মুতাসিম এটা পছন্দ করতেন না যে সরকারি কর্মচারীদের কারণে জনগণের কোনো কষ্ট বা সমস্যা হোক। ফলে ২২১ হিজরিতে তিনি বাগদাদ থেকে ১২৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে দজলা নদীর তীরে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন যার নাম প্রস্তাব করেন “সুররা মান রাআ”। এর অর্থ হলো, যে দেখবে সে খুশি হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এই শব্দটিই সংক্ষিপ্ত হয়ে “সামারা” হয়ে যায়।

মুতাসিম এই শহরকেই রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে আবাসিক বাড়িঘর, বাজার, সরকারি ভবন, প্রাসাদ এবং বাগান তৈরি করা হয় এবং শীঘ্রই এর সৌন্দর্য ও জৌলুস অনেক প্রাচীন শহরকে ছাড়িয়ে যায়।

মুতাসিমের পর আরও সাতজন আব্বাসীয় খলিফা: ওয়াসিক, মুতাওয়াক্কিল, মুনতাসির, মুসতাইন, মুতায়, মুহতাদি এবং মুতামিদ এই শহরকেই খিলাফতের কেন্দ্র হিসেবে বজায় রাখেন। সামারা বাগদাদের পর আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর যা আজ পর্যন্ত আবাদ রয়েছে। [২]

বাবাক খুররামির পতন:

মুতাসিম বিল্লাহর আমলে বেশ কিছু বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য তাঁর পদচুম্বন করে। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তাঁকে বাবাক খুররামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। উত্তর ইরানে জন্ম নেওয়া এই দাজ্জালের ফিতনা তখন পুরো ইরানে ছড়িয়ে পড়েছিল; হামদান, ইসফাহান এবং মাসবাজানের হাজার হাজার মানুষ তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এই ফেরকার যোদ্ধারা লাল পোশাক পরিধান করত যারা “মুহাম্মির” নামে পরিচিত ছিল। হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.)-এর মতে, বাবাক ছিল অনেক বড় জিন্দিক বরং শয়তানে রাজিম।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৪৪

[২] আল-বুলদান লিল ইয়াকুবি, পৃ. ৫২ থেকে ১৬২; মুজামুল বুলদান: ১৭৪/৩ বর্তমানে সামারার জনসংখ্যা তিন লাখের বেশি। ইসনা আশারিয়াদের দুই ইমাম আলী হাদি এবং হাসান আসকারির মাজার এখানেই অবস্থিত। তাদের বিশ্বাস যে, দ্বাদশ ইমাম “মাহদী মুনতাজার”-এর আত্মপ্রকাশ এখান থেকেই একটি গুহা থেকে হবে।

প্রকৃতপক্ষে তার বিদ্রোহ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না বরং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল; তাই তার প্রতি কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না।

মুতাসিম সিংহাসনে আরোহণের পরপরই ২১৮ হিজরির জিলকদ মাসে বাবক খুররমির মোকাবিলা করার জন্য উত্তর ইরানে সেনাবাহিনী পাঠানো শুরু করেন। তিন বছর পর্যন্ত এখানে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে বাবকের অনুসারীরা এশিয়া মাইনরের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়, তবে বাবক ধরা পড়েনি। প্রতিটি পরাজয়ের পর সে তার অনুসারীদের সংগঠিত করে পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসত। তার ফিতনা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কিছু আব্বাসীয় শাসক খলিফাকে ছেড়ে তার অনুগত হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে মুতাসিম তার তুণীর থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী তীরটি ব্যবহার করলেন। তিনি ছিলেন তার তুর্কি সেনাপতি আফশিন হায়দার। মুতাসিম তাকে এক বিশাল বাহিনীর সাথে রণক্ষেত্রে পাঠান। সেই সাথে যুদ্ধের খরচের জন্য তিন কোটি দিরহাম (প্রায় সাড়ে সাতশ কোটি টাকা) প্রদান করেন যাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বাবকের সমর্থকরা চারদিক থেকে গুটিয়ে গিয়ে বরফাবৃত পাহাড়ে আত্মগোপন করতে শুরু করে। বাবক “বারজান্দ”-এর উপত্যকায় তার মূল বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিল। এখানে কয়েক মাস ধরে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। মুতাসিম অনবরত সাহায্য পাঠাতে থাকেন, এমনকি আব্বাসীয় খিলাফতের সমস্ত দুর্গের রক্ষী সৈন্যদেরও এই রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তুষারপাত শুরু হলে যুদ্ধ থেমে যায়।

বসন্তকাল আসতেই আফশিন চূড়ান্ত আক্রমণ করেন এবং ২২২ হিজরির রমজান মাসে বাবকের প্রাচীরবেষ্টিত কেন্দ্র “বারজান্দ”-এ পৌঁছে যান। তুমুল যুদ্ধের পর ২০শে রমজান আব্বাসীয় সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে। বাবক প্রাণ বাঁচাতে এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর দিকে পালিয়ে যায়। আব্বাসীয় বাহিনী বাবকের রাজধানী থেকে ৭৬০০ থেকে ৭০০ মুসলিম বন্দীকে উদ্ধার করে।

আফশিন যেকোনো মূল্যে এই ফিতনা নির্মূল করার সংকল্প করেছিলেন; তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, বাবককে যে ধরতে পারবে সে দশ লক্ষ দিরহাম পুরস্কার পাবে। এটি এত বড় অংকের অর্থ ছিল যে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সবাই বাবকের সন্ধানে নেমে পড়ল। বাবক এক পাদ্রীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল এবং মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। পাদ্রী যখন এত বড় পুরস্কারের খবর পেলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলিম কর্মকর্তাদের সংবাদ দিয়ে বাবককে গ্রেপ্তার করিয়ে দিলেন। আফশিন বাবককে শিকলবন্দী করে রাজধানী সামারার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বাবকের ফিতনা ২০ বছর ধরে চলছিল এবং কেউ তাকে দমনে সক্ষম হয়নি। এই সময়ের মধ্যে সে দুই লক্ষ ৫৫ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। তার জুলুম ও অত্যাচারে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব অতিষ্ঠ ছিল। তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করা ছিল আফশিনের এক বিশাল কৃতিত্ব এবং মুসলমানদের জন্য এক বড় বিজয়। সামারায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা শহর থেকে কয়েক মাইল বাইরে এসে বিজয়ী সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানান।

মুতাসিম আফশিনের সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাকে একটি বহুমূল্য মুকুট পরিয়ে দেন এবং দুই কোটি দিরহামের মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করেন। বাবকের হাত-পা কেটে তার লাশ শূলে চড়ানো হয়। তার ভাইকেও, যে তার মতোই ফিতনাবাজ ছিল, বাগদাদে শূলে চড়ানো হয়। সমস্ত প্রদেশে এই সুসংবাদ ঘোষণা করা হয় এবং সর্বত্র মুসলমানরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দ প্রকাশ করে। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২৩৯ থেকে ২৪৯

রোমীয়দের সাথে জিহাদ

মুতাসিমের সবচেয়ে বড় কীর্তি যার কারণে ইতিহাসে তার নাম অমর হয়ে আছে, তা হলো রোমীয়দের বিরুদ্ধে তার সেই প্রলয়ঙ্করী আক্রমণ যা কায়সারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল।

রোমের কায়সার তুফায়েল ছিল একজন ভীরা, নীচ ও সংকীর্ণমনা মানুষ এবং মুসলমানদের উত্থান দেখে সে ঈর্ষায় জ্বলত। মামুনুর রশীদের যুগে তাকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে সম্ভবত সে সারাজীবন ইসলামী সীমান্ত অতিক্রম করার সাহস করত না। তাকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিল বাবক খুররামি। আফশিনের সাথে যুদ্ধের সময় সে কায়সারকে এই বার্তা পাঠিয়েছিল যে মুসলমানদের সমস্ত শক্তি আমার বিরুদ্ধে নিয়োজিত এবং তাদের দুর্গগুলো একদম খালি। আপনি যদি সফল আক্রমণ করতে চান তবে এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবেন না।

কায়সার কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে ২২৩ হিজরিতে ইসলামী সীমান্তে আক্রমণ চালায়। বাবকের অবশিষ্ট ও পলাতক খুররামিরাও তার সাথে যোগ দেয়। মালতিয়া শহর এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়। এখানে কায়সার হাজার হাজার নারী-পুরুষকে বন্দী করে এবং তাদের ওপর এমন জুলুম চালায় যে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। নাক-কান কেটে চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয় এবং চোখ গরম শলাকা দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়। এই বন্দীদের মধ্যে একজন হাশেমি নারীও ছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন: “ওয়া মুতাসিমাহ...” (হায় মুতাসিম!)

কারাগার থেকে পালিয়ে আসা এক ব্যক্তি মুতাসিম বিল্লাহর কাছে এই করুণ আত্ননাদ পৌঁছে দেন। তিনি তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই খবর শুনে তিনি আত্মমর্যাদাবোধ ও জোশে অস্থির হয়ে পড়লেন; “লাববাইক...” বলতে বলতে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে এলেন এবং ডাক দিলেন: “আন-নাফির আন-নাফির” (চলো জিহাদের জন্য, চলো জিহাদের জন্য)।

দেখতে দেখতেই সেনাপতিগণ, সৈন্যদল এবং ছাউনিতে বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। মুতাসিম নিজের জীবন ও মরণ বাজি রেখে লড়তে যাচ্ছিলেন। তিনি তার সমস্ত সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করলেন: এক-তৃতীয়াংশ নিজের সন্তানদের নামে, এক-তৃতীয়াংশ গোলামদের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলেন। [১]

জবাব তুমি নিজেই দেখে নেবে:

এই সময়ে কায়সারের দূত এসে পৌঁছাল যে দম্ভভরে মুসলমানদের কঠোর হুমকি দিচ্ছিল। মুতাসিম তার জবাবে শুধু এতটুকু লিখিয়েছিলেন: “আমি তোমার চিঠি পড়েছি, তোমার কথা শুনেছি, জবাব তুমি নিজেই দেখে নেবে। অচিরেই কাফেররা তাদের পরিণাম জানতে পারবে।” [২]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২২৩ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪/২৮৫।

বাহিনীর যাত্রা এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ:

২ জুমাদিউল উলা ২২৩ হিজরিতে বাহিনী রওনা হলো। প্রখ্যাত তুর্কি সেনাপতি আফশিন, ইতাক এবং আশনাস বাহিনীর পৃথক পৃথক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন। পথে সংবাদ পাওয়া গেল যে কায়সার অগ্রসর হয়ে ইসলামী শহর ‘জাবাতরা’ অবরোধ করেছে। বাহিনী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকল। জাবাতরা পর্যন্ত পৌঁছাতে কয়েক সপ্তাহের পথ ছিল। মুতাসিম কয়েকজন সেনাপতিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দলের সাথে জাবাতরার অবরুদ্ধদের সাহায্যের জন্য আগে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন এই বাহিনী সেখানে পৌঁছাল, কায়সার ততক্ষণে সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে এবং শহর ধ্বংস করে আঙ্কারার (আঙ্গোরা) দিকে চলে গিয়েছিল। সেনাপতিরা ফিরে এসে মুতাসিমকে এই সংবাদ দিলেন।

মুতাসিম কায়সারের দেওয়া আঘাতের প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি এক অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। এক অংশ আফশিনের অধীনে আরমেনিয়ার দিকে পাঠানো হলো যাতে কায়সারকে বিভ্রান্তিতে রাখা যায়। দ্বিতীয় অংশ আশনাসের নেতৃত্বে আঙ্কারার দিকে পাঠানো হলো যাতে কায়সার যখন আফশিনকে বাধা দেওয়ার জন্য আরমেনিয়ার সীমান্তের দিকে যাবে, তখন আঙ্কারা দখল করে নেওয়া যায়। তৃতীয় অংশ নিজের অধীনে রাখলেন এবং সিদ্ধান্ত হলো যে আলাদা আলাদা এলাকা জয় করে এই তিন বাহিনী আঙ্কারায় মিলিত হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কায়সার যখন পশ্চিম দিক থেকে আফশিনের অভিযানের সংবাদ পেলেন, তখন আঙ্কারা থেকে আরমেনিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। এর ফলে আশনাসের বাহিনী আঙ্কারায় পৌঁছে গেল এবং তা অবরোধ করল। ওদিকে কায়সার ও আফশিনের বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো এবং কায়সার শোচনীয় পরাজয় বরণ করে আঙ্কারার দিকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই আশনাস তা দখল করে নিয়েছিলেন। কায়সার সব দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে আন্মুরিয়ার দিকে মুখ ফেরালেন এবং সেখানে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

আন্মুরিয়া বহু শতাব্দী ধরে এশিয়া মাইনরে রোমানদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। কনস্টান্টিনোপলের পর বাইজেন্টাইনরা একে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি মনে করত, যেখান থেকে পুরো অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হতো। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এটি কখনো জয় করা সম্ভব হয়নি।

ইসলামী বাহিনী সব দিক থেকে সমবেত হয়ে আঙ্কারায় একত্রিত হলো এবং শাবান ২২৩ হিজরিতে মুতাসিম তাদের সবার নেতৃত্ব দিয়ে আন্মুরিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। কায়সার ভীত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন এবং নিজের এক প্রতিনিধিকে শহরের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

৬ রমজান ইসলামী বাহিনী এখানে পৌঁছে কঠোর অবরোধ শুরু করল। ৫৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ ও যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে মুসলমানরা পাথর নিক্ষেপ করে শহরের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিলেন এবং পরিখা মাটি ভর্তি বস্তা দিয়ে ভরাট করে দিলেন। আফশিন ও আশনাস দুই দিন পর্যন্ত শহরের প্রাচীরে আক্রমণ চালিয়ে গেলেন। তৃতীয় দিন মুতাসিম নিজেই ময়দানে নামলেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর শহরটি জয় করলেন। এই যুদ্ধে ৩০ হাজার শত্রু সৈন্য নিহত হলো এবং ৩০ হাজার বন্দি করা হলো। প্রচুর গনিমত হস্তগত হলো যা বাহিনী পাঁচ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করতে থাকল।

কুফার আগে মুতাসিম আন্মুরিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই শহর জনশূন্য পড়ে ছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদক্ষেপ ছিল অপরিহার্য; কারণ এখানে চারদিকে রোমানদেরই বসতি ছিল। মুসলমানরা এখানে অবস্থান করলে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতো।

যদি এটি ধ্বংস না করা হতো, তবে মুসলমানদের ফিরে আসার পর রোমানরা এটিকে পুনরায় তাদের ঘাঁটিতে পরিণত করত। এছাড়া রোমানরা দুটি ইসলামি শহরকে ধূলিসাৎ করে জনবসতির অনুপযুক্ত করে দিয়েছিল; তাই মুতাসিমও এখানে অনুরূপ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি মনে করেছিলেন যাতে প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে এ ধরনের পাশবিক কর্মকাণ্ডের আগে নিজের পরিণতির কথা ভেবে নেয়।

মুতাসিম আম্মুরিয়ার ফটক উপড়ে বাগদাদে নিয়ে যান যেখানে এটি খিলাফত প্রাসাদের সীমানা প্রাচীরে স্থাপন করা হয়েছিল। অষ্টম হিজরি শতাব্দীর ঐতিহাসিক হাফিজ ইবনে কাসির (রহ.) বলতেন যে: এখন পর্যন্ত এই দরজাটি খিলাফত প্রাসাদে স্থাপিত রয়েছে। [১]

তুর্কিদের বিদ্রোহ:

তুর্কি সরদাররা ছিলেন মুতাসিমের ডান হাত। তারা সবাই ছিলেন নওমুসলিম, তাদের পৈতৃক ধর্ম ছিল মাজুসিয়াত। ইসলাম গ্রহণ করার এবং খিলাফত দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাদের অনেক সরদার নিজেদের বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ অভ্যন্তরীণভাবে তখনও মাজুসি ছিলেন এবং ব্যক্তিগত মজলিসগুলোতে জরথুষ্ট্রের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প ব্যক্ত করতেন।

মুতাসিম তুর্কিদের অপারিসীম শক্তি ও উন্নতি প্রদান করে একটি রাজনৈতিক ভুল করেছিলেন। রাজনীতির মূলনীতি এবং ইসলামি সাম্য—উভয়েরই দাবি ছিল যে, ক্ষমতার অলিন্দে আরব, ইরানি এবং তুর্কিদের এমন এক অনুপাতে স্থান দেওয়া যাতে কেউ কারো ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। ইরানিদের ব্যাপারে তার নীতি সঠিক ছিল; কারণ যদি তাদের আধিপত্য এভাবেই বাড়তে থাকত, তবে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য অল্প কয়েক দিনের মেহমান হতো। তবে তিনি যেভাবে দুই-তিন বছরের মধ্যে তুর্কিদের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন, তাও কোনো ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল ছিল না।

তুর্কিরা যদি স্বাভাবিকভাবে পর্যায়ক্রমে উপরে আসত তবে তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। এটি ইসলামি সাম্যের দাবি ছিল যে প্রতিটি জাতিকে উন্নতির সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ছিল প্রতিটি জাতিকে ইসলামি চেতনা ও সচেতনতা, বিশুদ্ধ আকিদা, দ্বীনি ইলম এবং আখলাক ও আদব দ্বারা সমৃদ্ধ করা। তুর্কিরা এসব বিষয়ে আরব ও খোরাসানিদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। যদিও তুর্কিস্তানে ইসলাম প্রচারের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে ইসলামি প্রভাব হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক বা মিসরের মতো গভীর হয়নি। এর কারণ ছিল এই যে, এই অঞ্চলে সাধারণত তুর্কি সরদাররাই স্বায়ত্তশাসিত নবাবদের মতো শাসন করত এবং সরকার তাদের কাছ থেকে খরাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত।

যখন এ ধরনের অর্ধ-প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে হঠাৎ খিলাফতের লাগাম চলে এল, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

এ ধরনের তুর্কি সরদারদের মধ্যে মুতাসিমের সবচেয়ে খ্যাতিমান জেনারেল আফশিনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইভাবে আফশিনের ডান হাত মাজিয়ারও একই ধারণা পোষণ করত। বাবাক খুররমির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুতাসিম আফশিনের ওপর অত্যধিক আস্থা রেখে তাকে অটেল সম্পদ এবং অপরিমিত রসদ পাঠাতে থাকেন। আফশিন প্রয়োজন অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে খরচ করে বাকি সরঞ্জাম...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪/২৮৫

সে মধ্য এশিয়ায় তার পৈতৃক শহর “উশরুসানা”-তে সরঞ্জাম ও সম্পদ স্থানান্তর করতে থাকে যাতে ভবিষ্যতে সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করতে পারে। মুতাসিম এই তৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু কৌশলগত কারণে তিনি নীরব ছিলেন; কারণ আফশিন বাবকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বাবকের পর রোমানদের সাথে যুদ্ধেও আফশিনকে কাজে লাগানো জরুরি ছিল; তাই মুতাসিম তাকে টিল দিতে থাকেন।

এই সময়ে আফশিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সে তার বিশ্বস্ত তুর্কি জেনারেল মাজিয়ারকে, যে তাবারস্তানের শাসক ছিল, একটি গোপন পত্র পাঠিয়ে বিদ্রোহে উস্কানি দেয় এবং লেখে:

“এই মুহূর্তে আমার এবং তোমার ছাড়া জরথুস্ত্রীয় ধর্মের কোনো সমর্থক নেই। তোমার কাছে সেনাবাহিনীর একটি বিশাল অংশ রয়েছে। তুমি বিদ্রোহ করে দাও। সরকার তোমার মোকাবিলায় আমাকেই পাঠাবে। আমি বাকি সেনাবাহিনী নিয়ে তোমার সাথে যোগ দেব। সাহস করলে অনারব রাজাদের ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।”

মাজিয়ার এই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল। মুতাসিম খবর পেয়ে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান কিন্তু আফশিনের পরিবর্তে এই অভিযানের দায়িত্ব অন্য এক জেনারেল আবদুল্লাহ বিন তাহিরকে অর্পণ করেন। এভাবে আফশিনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। মাজিয়ার পরাজিত হয়ে গ্রেপ্তার হলে তার কাছ থেকে আফশিনের সেই চিঠিটিও উদ্ধার করা হয় যাতে তাকে বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। এটি ২২৪ হিজরির ঘটনা। মুতাসিম তা সত্ত্বেও নীরবতার কৌশল অবলম্বন করেন।

এরপর আরও দু-একটি এমন ঘটনা ঘটে যার ফলে মুতাসিম আফশিনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হন। আফশিনও মুতাসিমের মনোভাব বুঝতে পারে এবং ধরা পড়ার আগেই নিজের দেশ তুর্কিস্তানের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য এক তুর্কি সর্দার আইতাখ বিষয়টি জানতে পারেন এবং তিনি মুতাসিমকে সময়মতো সংবাদ দিয়ে আফশিনকে গ্রেপ্তার করান।

মুতাসিম খিলাফতের উজির এবং রাষ্ট্রের আমিরদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করে তাদের আফশিনের মামলার তদন্তের নির্দেশ দেন। এই লোকেরা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে। এসব প্রমাণ এবং স্বয়ং আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে খিলাফতের তখত উল্টে দিয়ে পুনরায় মজুসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ফলে শাবান ২২৬ হিজরিতে আফশিনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর ইসহাক বিন ইয়াহইয়াকে নতুন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। [১]

[১] তারিখ আত-তাবারী: সন ২২৪ হিজরি, ২২৫ হিজরি, ২২৬ হিজরি।

‘খালকে কুরআন’ মাসআলায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের অবিচলতা

মামুন মৃত্যুর সময় মুতাসিমকে ‘খালকে কুরআন’ মাসআলাটি জোরপূর্বক মানিয়ে নেওয়ার অসিয়ত করে গিয়েছিলেন; তাই মুতাসিম ক্ষমতা গ্রহণের পর সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেন এবং মামুনের চেয়েও অনেক বেশি চরমপন্থার প্রমাণ দেন। মামুনের মুতাজিলা শায়খ বিশর বিন গিয়াস ইন্তেকাল করেছিলেন। মুতাসিম মুতাজিলাদের অন্য এক নেতা আহমাদ বিন আবি দুয়াদকে সেই একই মান-মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাকে ইসলামি খিলাফতের প্রধান বিচারপতি (কাযিউল কুযাত) নিযুক্ত করেন।

মামুন যেসব আলেমকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন নূহ (রহ.) ছাড়া বাকি সবাই কৌশলগত কারণে সরকারের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন। মামুনের মৃত্যুর পর ঐ আলেমদের বাগদাদে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুহাম্মাদ বিন নূহ (রহ.) পথেই ইন্তেকাল করেন এবং ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে বাগদাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এখন মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে কেবল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-ই অবশিষ্ট ছিলেন, যিনি অবিচলতা ও দৃঢ়তার এক নতুন অধ্যায় রচনা করে সাহাবী, তাবয়ী এবং পূর্বসূরিদের (আসলাফ) আদর্শ ও পথ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বর্ণনা করছিলেন। তিনি কোনো শাস্তিতে ভীত ছিলেন না এবং কোনো আপস করতেও প্রস্তুত ছিলেন না।

জন্ম ও শিক্ষা:

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) ১৬৪ হিজরীর (৭৮০ খ্রি.) রবিউস সানি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আপনার প্রাথমিক শিক্ষা ও লালন-পালন মুসলিম বিশ্বের খিলাফতের কেন্দ্র ‘মদিনাতুল ইসলাম বাগদাদে’ সম্পন্ন হয়। আপনার পিতা মুহাম্মাদ বিন হাম্বল একজন সৈনিক ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বল অল্পবয়সী থাকতেই পিতার মৃত্যু হয়। মুসলিম বিশ্বের এই দুর্লভ রত্ন এতিম অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং আল্লাহ প্রদত্ত আশ্রয় ও একাগ্রতার কারণে ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কাযী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর দরসে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহ.)-এর মতো মহান মুহাদ্দিসের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে নববী উত্তরাধিকারের এক বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করেন।

পাঁচবার মক্কা মুকাররমায় গিয়ে সেখানকার আলেমদের কাছ থেকে উপকৃত হন এবং প্রতিবারই হজ্জের সৌভাগ্য অর্জন করে ফিরে আসেন। মদিনা মুনাওয়ারার আলেমদের থেকেও ফয়েজ লাভ করেন। মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক (রহ.)-এর খ্যাতি শুনে ইয়েমেনের রাজধানী সানআ গিয়ে তাঁর কাছ থেকেও ইলমী রত্নরাজি সংগ্রহ করেন। বসরার শায়খ আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং কুফার ওকী’ বিন জাররাহ (রহ.) আপনার বিশিষ্ট উস্তাদদের মধ্যে গণ্য হন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৯৫ হিজরীতে বাগদাদে আসলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁর থেকেও জ্ঞান আহরণ করেন। [১]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১১/১৭৭, ২০০, ভ: আর-রিসালাহ।

বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ এবং তার মোকাবিলা:

যখন মামুন এবং পরবর্তীতে মুতাসিম ‘খালকে কুরআন’ (কুরআন সৃষ্টির) মাসআলায় আলেমদের জোরপূর্বক নিজেদের অনুসারী করার চেষ্টা করল, তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বুঝতে পারলেন যে, বিভ্রান্তির এই তুফান যা স্বয়ং আব্বাসীয় খিলাফত পৃষ্ঠপোষকতা করছে, নিজের জীবন বাজি রেখে তা প্রতিহত করা জরুরি। অন্যথায় প্রকৃত ও সত্য ইসলামের নাম-নিশানা মুছে যাবে। ফলে তিনি পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে ফরজে কিফায়া আদায় করে সরকার ও মুতাজিলাদের অবস্থানের এমন তীব্র প্রতিবাদ করলেন যে, খিলাফতের প্রাসাদের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল এবং সত্যের প্রতিধ্বনিতে পূর্ব ও পশ্চিমে এক প্রকার ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সংকল্পের দাস্তান, তাঁর নিজের জবানিতে:

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) প্রায় আড়াই বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। এই সময়ে তাঁকে বারবার ভয়ভীতি দেখিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে যেন তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং কুরআন মাজীদকে মাখলুক (সৃষ্ট) বলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব চরম দৃঢ়তার সাথে সত্যের ওপর অটল থাকেন। অবশেষে ২২১ হিজরির রমজান মাসের শেষ দিকে মুতাসিম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে দরবারে তলব করল।

ইমাম সাহেব (রহ.) এই ঘটনার বিবরণ নিজেই এভাবে শোনাতেন:

“যখন মুতাসিম আমাকে ডাকল, তখন আমার পায়ে আরও বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো। আমি সেগুলোর ওজনের কারণে হাঁটতে পারছিলাম না। আমি সেগুলো ইজারবন্দের সাথে বেঁধে হাতে ধরে নিলাম। যখন আমরা ‘বাবুল হিমতান’-এ পৌঁছালাম, তখন আমার জন্য সওয়ারি আনা হলো এবং আরোহণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। পায়ে ছিল ভারী বেড়ি। আমি আরোহণের চেষ্টায় কয়েকবার উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেলাম। কোনোভাবে সওয়ার হয়ে মুতাসিমের প্রাসাদে পৌঁছালাম। আমাকে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তখন মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আলোর জন্য কোনো প্রদীপও ছিল না। আমি সালাতের জন্য তায়াম্মুম করতে চাইলাম এবং হাত বাড়াতেই পানির একটি পেয়ালা ও তশতরি রাখা পেলাম। আমি অজু করে সালাত আদায় করলাম।”

পরের দিন মুতাসিমের দূত এল এবং আমাকে দরবারে নিয়ে গেল। সেখানে মুতাসিমের সাথে কাজী ইবনে আবি দুয়াদ এবং তাদের সমর্থক দরবারীদের বড় একটি দল উপস্থিত ছিল। আবু আবদুর রহমান শাফেয়ীও উপস্থিত ছিলেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই দুই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। আমি আবু আবদুর রহমান শাফেয়ীকে বললাম: “ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে মাসাহ সম্পর্কে আপনার কিছু মনে আছে কি?” এটি শুনে ইবনে আবি দুয়াদ বলল: “দেখুন! এই লোকটির গর্দান যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, অথচ সে ফিকহী মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে?”

মুতাসিম বলল: “তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” সে আমাকে ক্রমাগত সামনে ডাকতে থাকল। এমনকি আমি তার একেবারে কাছে চলে গেলাম। আমি বেড়ির ওজনে নাজেহাল ছিলাম। সে বলল: “বসে পড়ো।”

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম: “আমাকে কিছু বলার অনুমতি আছে কি?”

সে বলল: “বলো কী বলতে চাও।”

আমি বললাম: “আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ কিসের দাওয়াত দিয়েছেন?”

সে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর।”

আমি বললাম: “আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।”

তারপর আমি বললাম: “আপনার প্রপিতামহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলো, তখন তিনি ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা কি জানো ঈমান কী?

তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি ﷺ বললেন: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং গনীমতের মাল থেকে খুমুস বের করা।”

মুতাসিম বলল: “আপনি যদি পূর্ববর্তী খলিফার হাতে না আসতেন, তবে আমি আপনাকে কিছুই বলতাম না।”

তারপর আবদুর রহমান বিন ইসহাককে বলল: “আমি কি তোমাকে বলিনি যে এই পরীক্ষা শেষ করে দাও?”

আমি বললাম: “আল্লাহ্ আকবার! অর্থাৎ এই মাসআলায় মুসলমানদের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে।”

খলিফা উপস্থিতদের বললেন: “তার সাথে বিতর্ক করো।”

আবদুর রহমান বিন ইসহাক বলল: “আপনি কুরআন সম্পর্কে কী বলেন?”

আমি বললাম: “আপনি আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) সম্পর্কে কী বলেন?”

সে চুপ থাকল। আমি বললাম: “আমীরুল মুমিনীন! কুরআন আল্লাহর ইলমের অংশ। যে ব্যক্তি বলল যে কুরআন আল্লাহর মাখলুক, সে আল্লাহর সাথে কুফরি করল।”

মুতাসিম নীরব থাকল। দরবারীরা বলতে লাগল:

“আমীরুল মুমিনীন! সে আপনাকে কাফের সাব্যস্ত করেছে এবং আমাদেরকেও।”

মুতাসিম কোনো ভ্রক্ষেপ করল না। এবার আবদুর রহমান বিন ইসহাক বলল: “যখন কুরআন ছিল না তখনও আল্লাহ বিদ্যমান ছিলেন।”

আমি বললাম: “আল্লাহ কি তাঁর ইলম (জ্ঞান) গুণ ব্যতিরেকে বিদ্যমান ছিলেন?”

সে চুপ হয়ে গেল। এখন একজন এদিক থেকে কথা বলত আর আমি জবাব দিতাম। অন্যজন ওদিক থেকে কথা বলত আমি তাকেও জবাব দিতাম। খলিফা আমাকে বলতেন:

“আহমদ! আপনি কী বলেন?”

আমি বলতাম: “আপনি কুরআন ও হাদীস থেকে আমাকে কোনো দলীল এনে দিন, আমি মেনে নেব।”

আহমদ বিন আবি দুয়াদ বলতে লাগল: “তুমি কি কুরআন বা হাদীস ছাড়া আর কোনো কথা বলবে না?”

আমি বললাম: “ইসলামের ভিত্তি কি এগুলোর ওপরই নয়?”

মুতাসিম বলত: “যদি সে আমার কথা মেনে নেয়, তবে আমি নিজ হাতে তাকে মুক্ত করে দেব এবং আমার সেনাবাহিনীসহ তার...”

“দরজায় হাজিরা দিতাম।”

তারপর সে বলল: “আহমদ! আমি আপনার সাথে নশ্রতা প্রদর্শন করছি। আপনার প্রতি আমার তেমন মমতা রয়েছে যেমন আমার ছেলে হারুনের প্রতি।” [১]

এখন আপনি কী বলেন?”

আমি আবার বললাম: “কুরআন ও হাদিস থেকে আমাকে কোনো দলিল দিন। আমি মেনে নেব।”

আহমদ বিন আবি দুয়াদ বলল: “আমিরুল মুমিনিन! এ পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী বিদআতি। আপনার কাছে কাজি ও ফকিহগণ উপস্থিত আছেন, তাদের জিজ্ঞেস করুন।” মুতাসিম তাদের জিজ্ঞেস করত। তারা তাই বলত যা ইবনে আবি দুয়াদ বলত।

অনেক সময় পার হয়ে গেল। অবশেষে মুতাসিম ক্লান্ত হয়ে গেল এবং আমাকে আবার সেই জায়গায় বন্দি করে দেওয়া হলো। পরের দিন আমাকে আবার ডাকা হলো এবং মুনাজারা চলতে থাকল। আমি সবাইকে উত্তর দিতে থাকলাম। এমনকি জোহরের সময় হয়ে গেল। মুতাসিম বিরক্ত হয়ে গেল এবং নির্দেশ দিল যে এদের নিয়ে যাও। তৃতীয় রাতে আমি বুঝতে পারলাম যে আগামীকাল অবশ্যই কিছু ঘটবে। আমি রশি আনিয়া আমার বেড়িগুলো শক্ত করে বেঁধে নিলাম এবং ইজারবন্দ খুব কষে নিলাম যাতে আগামীকাল শাস্তির সময় কোথাও উলঙ্গ না হয়ে যাই।

তৃতীয় দিন আমাকে আবার ডাকা হলো। আমি বারান্দাগুলো অতিক্রম করে দরবারে পৌঁছালাম। দেখলাম কিছু লোক তলোয়ার উঁচিয়ে এবং চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গত দুই দিনের অনেক উপস্থিত ব্যক্তি আজ ছিল না। যখন আমি মুতাসিমের কাছে পৌঁছালাম, সে বলল: “বসে পড়ুন।” তারপর উপস্থিতদের বলল: “এঁর সাথে মুনাজারা করো।”

লোকেরা বিতর্ক করতে লাগল। আমি একে একে সবাইকে উত্তর দিতে থাকলাম। আমার কণ্ঠস্বর সবার ওপর প্রবল ছিল। যখন সবাই চুপ হয়ে যেত, তখন আহমদ বিন আবি দুয়াদ কথা বলতে শুরু করত। সে তাদের সবার চেয়ে বেশি জাহেল ছিল। এই লোকদের সুনান ও আসার সম্পর্কে বেশি জ্ঞান ছিল না। তারা হাদিস অস্বীকার করত এবং সেগুলো থেকে দলিল পেশ করার বিরোধিতা করত। আমি যখন আখেরাতে আল্লাহর দিদার সংক্রান্ত (সহিহ) হাদিস শোনালাম, তখন তারা সেটিকে জয়িফ বলতে লাগল এবং এর সনদ ও রাবিদের ওপর আপত্তি করতে লাগল।

মুতাসিম আমাকে বলত: “আহমদ! মেনে নিন, আমি আপনাকে নৈকট্যশীল বানিয়ে নেব। আপনি দরবারে স্থান পাবেন।”

আমি আবার বলতাম: “কুরআন ও হাদিস থেকে আমাকে কোনো দলিল দিন। আমি মেনে নেব।”

যখন অনেক দেরি হয়ে গেল, তখন আমাকে আলাদা করে দেওয়া হলো। আর খলিফা উপস্থিতদের সাথে কিছু বলতে লাগল।

তারপর আমাকে ডেকে বলল: “আহমদ! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আমার কথা মেনে নিন। আমি নিজেই আপনাকে মুক্ত করে দেব।”

আমি সেই একই উত্তর দিলাম। মুতাসিমের দরবারিরা বলল:

“আমিরুল মুমিনিন! এ কাফের, হেদায়েতহীন এবং পথভ্রষ্টতা বিস্তারকারী লোক।”

বাগদাদের শাসক ইসহাক বিন ইব্রাহিম বলল: “এটি রাজনীতির পরিপন্থী হবে যে আপনি একে ছেড়ে দেবেন। লোকে বলবে যে একজন লোককে দুইজন খলিফা কাবু করতে পারল না।”

[১] হারুন মুতাসিমের উত্তরাধিকারী ছিল যে তার পরে ওয়াসিক বিল্লাহ উপাধি নিয়ে খলিফা হয়েছিল।

এটি শুনে মুতাসিম উত্তেজিত হয়ে পড়ল যদিও সে খুব নরম স্বভাবের মানুষ ছিল। সে চিৎকার করে বলল: “ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও।”

এই বলে সে সিংহাসনে বসে পড়ল। জল্লাদ এবং চাবুক মারার লোকদের ডাকল। আমাকে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। আমার কাপড় খুলে ফেলা হলো। আমার পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র চুল সেলাই করা ছিল। সেই পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হলো। শুধু লুঙ্গি অবশিষ্ট রইল। আমাকে টিকটিকির (শাস্তি প্রদানের কাঠামোর) সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। আমি বললাম:

“আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান হলো যে, কারো রক্ত হালাল নয় কেবল সে ছাড়া যে কাউকে হত্যা করে অথবা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে অথবা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়। আমি এগুলোর কোনোটিই করিনি। এটিও নববী ফরমান যে, যখন মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তখন তাদের জান ও মাল সংরক্ষিত। সুতরাং আপনি কেন আমার রক্ত ঝরাতে চান? আমীরুল মুমিনীন! আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করুন যে, সেখানে আপনি ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবেন যেভাবে আমাকে এখানে দাঁড় করানো হয়েছে।”

মুতাসিমের ইচ্ছা পরিবর্তন হতে লাগল কিন্তু দরবারীরা অনবরত বলতে লাগল: “আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কাফের, হেদায়াতহীন এবং গোমরাহি বিস্তারকারী।”

তখন মুতাসিম নির্দেশ দিল এবং আমাকে দুই স্তম্ভের মাঝখানে একটি চেয়ারের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। [১] চাবুক মারার লোকেরা চাবুক নিয়ে চলে এল। এক ব্যক্তি পূর্ণ শক্তিতে আমাকে দুটি চাবুক মারত। মুতাসিম বলত: “তোর হাত ভেঙে যাক, আরও জোরে মার।”

উজাইফ নামক এক ব্যক্তি আমাকে তার তলোয়ারের হাতল দিয়ে গুঁতো দিত এবং বলত: “তুমি কি এই সবার ওপর বিজয়ী হতে চেয়েছিলে!!” তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি সামনে আসত এবং দুটি চাবুক মারত। ১৯টি চাবুকের পর মুতাসিম আমার কাছে এল এবং বলল: “কেন নিজের জীবনের পেছনে পড়ে আছ। আল্লাহর কসম! আমি তোমার ব্যাপারে খুব চিন্তিত।”

কিন্তু আমি কোনো কথা গ্রহণ করছিলাম না। কেউ বলত: “আল্লাহর বান্দা! খলিফা তোমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।” কেউ বলত: “আমীরুল মুমিনীন! আপনি রোজা রেখেছেন এবং রোদে দাঁড়িয়ে আছেন।” মুতাসিম পুনরায় আমার সাথে কথা বলত। আমি সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করতাম। সে পুনরায় জল্লাদকে নির্দেশ দিত যে পূর্ণ শক্তিতে চাবুক মারো। এই সময়ে আমি বেহঁশ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে দেখলাম বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন বলল: “আমরা তোমাকে উপুড় করে ফেলে দিয়েছিলাম। পা দিয়ে মাড়িয়েছিলাম।” আমি বললাম: “আমি কিছুই জানি না।” [২]

[১] এটি ছিল রমজান মাস এবং দুপুরের তপ্ত দিন। ইমাম সাহেব নিয়মিত রোজা রাখছিলেন, তৃষ্ণায় অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও পানি পান করতেন না। অন্য কেউ বলল যে, এমন অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য সুযোগ বের করা যায়। কিন্তু তিনি এই কথার প্রতি ঞ্ক্ষিপ করেননি। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ১১০/১৮, তাযকিরাতুল হুফফাজ)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/ ৪০০ থেকে ৪০৫

দরবারের এই পরিবেশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুতাসিম ব্যক্তিগতভাবে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুতাজিলি কাজী ইবনে আবি দুয়াদ তাকে ক্রমাগত প্ররোচিত করতে থাকেন এবং তার আত্মমর্যাদায় আঘাত করে বলতে থাকেন যে, মানুষ কী বলবে: খলিফা তার ভাইয়ের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এভাবে মুতাসিমকে রাগান্বিত করা হয়। ইমাম সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, মুতাসিম যখন রাগান্বিত হতেন, তখন তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেন; সেই অবস্থায় তিনি কাউকে হত্যা করালেও তার পরোয়া করতেন না। [১]

সম্ভবত এই অবস্থাতেই তিনি ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওপর শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুতাজিলি আলেম এবং তাদের চাটুকার কর্মকর্তারা তো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন; তাই মন ভরে শাস্তি দেওয়া হলো। মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বলেন যে, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে যে চাবুক মারা হয়েছিল, তার একটি চাবুক যদি কোনো হাতিকে মারা হতো, তবে সে চিৎকার করে পালিয়ে যেত। [২]

আবুল হাইসামের জন্য দুআ:

শাস্তি কার্যকর হওয়ার আগে আল্লাহর ইচ্ছায় ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কানে আবুল হাইসাম নামক এক অপরাধী ব্যক্তির মুখ থেকে এমন কিছু বাক্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যা তাকে দৃঢ়তার পাহাড়ে পরিণত করেছিল। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাহেবজাদা বলেন যে, আমার পিতা প্রায়ই বলতেন: “আল্লাহ আবুল হাইসামের ওপর রহম করুন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ তাকে মার্জনা করুন।”

একবার আমি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম: “এই আবুল হাইসাম কে ছিলেন?”

তিনি বললেন: “তুমি আবুল হাইসামকে চেনো না?” আমি যখন অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম, তখন তিনি বললেন:

“যখন আমাকে চাবুক মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন কেউ একজন আমার কাপড় টেনে ধরল। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম একজন যুবক, সে বলল: আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বললাম: না। সে বলল: আমি কুখ্যাত চোর ও বদমাশ আবুল হাইসাম। আমার নাম সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ আছে। আমাকে বিভিন্ন সময়ে এ পর্যন্ত আঠারো শ চাবুক মারা হয়েছে। এই সব আমি শয়তানের আনুগত্যে নিছক দুনিয়ার জন্য সহ্য করেছি। আপনি আল্লাহর আনুগত্যে দ্বীনের জন্য যা-ই হোক তা সহ্য করুন।” [৩]

এই বাক্যগুলো ইমাম সাহেবের সাহস ও সহনশীলতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল।

হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “এই ঘটনাটি ২৫ রমজান ২২১ হিজরি (১১ সেপ্টেম্বর ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর। ইমাম সাহেবকে ত্রিশটিরও বেশি চাবুক মারা হয়েছিল। এক বর্ণনা মতে ৮০টি চাবুক মারা হয়েছিল। এই চাবুকগুলো ছিল অত্যন্ত তীব্র আঘাতের।” [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৪৪

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ১১২/১৮ - লা-উমরি

নোট: বর্ণিত আছে যে, শাস্তি চলাকালীন ইমাম সাহেবের ইজারবন্দ (পায়জামার ফিতা) ছিঁড়ে যেতে শুরু করলে তিনি দুআ করেন: “হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যের ওপর থাকি তবে আমার পর্দা উন্মোচিত হতে দেবেন না।” আল্লাহর নির্দেশে তখনই ইজারবন্দ জোড়া লেগে গেল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪০৪/১৪
কিছু লোক সনদের দুর্বলতা দেখে এই ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন এবং যুক্তির খাতিরেও একে অসম্ভব বলেছেন, কিন্তু একে কারামত হিসেবে মানতে অসুবিধা কোথায়? অন্যান্য ওলি-আউলিয়াদের জন্য এর চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্যজনক কারামত স্বীকৃত হয়েছে। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো ওলির জন্য এমন সাধারণ কারামত প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব কী?

[৩] সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওযী: ৩৪৭/১

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪০৩-৪০৪/১৪

ইমাম সাহেব রহ.-এর সম্মান ও মর্যাদা:

শান্তির পর ইমাম সাহেব রহ.-কে তুলে উজির ইসহাক বিন ইব্রাহিমের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি রক্তে রঞ্জিত ছিলেন। তিনি রোজা রেখেছিলেন। লোকজনের ভয় ছিল যে তিনি হয়তো বাঁচবেন না; তাই ইফতার করানোর জন্য তারা পানি ও সুরুয়া পেশ করল। ইমাম সাহেব রহ. তা অস্বীকার করলেন। তিনি ওই অবস্থাতেই জামাতের সাথে যোহরের নামাজ আদায় করলেন। এরপর একজন শল্যচিকিৎসক উপস্থিত হলো। চাবুকের আঘাতে জায়গায় জায়গায় গোশত ফেটে পচে গিয়েছিল, সে নশতর চালিয়ে সেই গোশত আলাদা করল। [১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. সেই দিনগুলোতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ওই ঘটনার কথা স্মরণ করতেন যখন উমাইয়া গভর্নর ইয়াজিদ বিন হুবায়রা তাঁকে একশ চাবুক মেরেছিল কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন। ইমাম আহমদ রহ. এই ঘটনা স্মরণ করে অব্বোরে কাঁদতেন। [২]

যা-ই হোক, কষ্টের সেই দিনগুলোর পর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা স্বস্তির পথ খুলে দিলেন। ইমাম আহমদ রহ. আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের মধ্যে বিশিষ্টতম বুজুর্গ ছিলেন। আপনার গান্ধীর্ষ, মর্যাদা ও পরহেজগারীকে আপন-পর সবাই স্বীকার করত। দরবারেও আপনার সম্মান ছিল। এমন নেককার ব্যক্তির ওপর জুলুম করার কারণে খোদ মুতাসিমও অনুতপ্ত হলো। সে তাঁকে মুক্ত করে দিল এবং ইসহাক বিন ইব্রাহিমের ওপর দায়িত্ব দিল যেন সে তাঁর সবরকম খেয়াল রাখে। প্রতিদিন সে উজিরের কাছে ইমাম সাহেবের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করত। ইমাম সাহেব সুস্থ হয়ে উঠলে মানুষের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তাঁর মুক্তি ও আরোগ্য লাভ ছিল হকের বিজয় এবং বাতিলের পরাজয়। খোদ মুতাসিম তাঁর সুস্থতায় আনন্দ প্রকাশ করল। ইমাম সাহেব খলিফাসহ সেই সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত উদার মনে ক্ষমা করে দিলেন যাদের কাছ থেকে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। [৩]

ইমাম আহমদ রহ.-এর উচ্চসাহস ও দৃঢ়তা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং উম্মতকে এক ভয়াবহ আকিদাগত বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করল। তবে শাসক শ্রেণিতে মুতাজিলা মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল, যার আলোচনা সামনে আসবে।

মুতাসিমের মৃত্যু:

মুতাসিম বিল্লাহ ৮ বছর ৮ মাস শাসন করার পর তাঁর রাজধানী সামাররায় ১৮ রবিউল আউয়াল ২২৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। উলামায়ে কেরাম লেখেন যে, যদি তাঁর আঁচলে ‘খালকে কুরআন’ মাসআলা ও সহিংসতার দাগ না থাকত, তবে তিনি বনু আব্বাসের সবচেয়ে মহিমাম্বিত খলিফা হিসেবে গণ্য হতেন। তিনি সমস্ত বিরোধীদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিলেন। [৪]

কৃষিকাজে আগ্রহ:

যেহেতু তিনি নিজে শিক্ষিত ছিলেন না, তাই তাঁর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো উন্নতি হয়নি; তবে সামরিক বিভাগ ও কৃষি উন্নয়নের...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৪, ৩০৫।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৩০৪, ৩০৫।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২৮২, ২৮৩।

[৪] তারিখ বাগদাদ: ১৩/৩২৮, ত. ইলমিয়াহ; ওফায়াতুল আইয়ান: ৫/৪০৭, ত. দার সাদির।

সে এটিকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। কৃষি সম্পর্কে সে বলত:

“জমি আবাদ করার অনেক উপকারিতা রয়েছে: মানুষ এর কারণেই বেঁচে থাকে। এ থেকে খরাজ পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পশুরা খাদ্য পায়। পণ্য সম্ভা হয়ে যায়। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতি উন্নতি লাভ করে।”

সে তার প্রতিনিধিদের বলে রেখেছিল: “যদি এমন কোনো জমি থাকে যেখানে দশ দিরহাম খরচ করে এক বছর পর এগারো দিরহাম পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই সেখানে চাষাবাদ শুরু করে দাও।” [১]

মু'তাসিম এবং আট সংখ্যাটি

মু'তাসিমের জীবনে আট সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। ঐতিহাসিকগণ এর নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো পেশ করেছেন:

- সে বনু আব্বাসের অষ্টম খলিফা ছিল।
- সে হযরত আব্বাস (রা.)-এর অষ্টম বংশধর ছিল।
- সে তার পিতার অষ্টম পুত্র ছিল।
- সে ৪৮ বছর বয়স পেয়েছিল।
- সে ২১৮ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করে।
- সে আট বছর আট মাস এবং আট দিন শাসন করেছিল।
- তার আটজন পুত্র ছিল।
- তার আটজন কন্যাও ছিল।
- সে আটজন শত্রুকে হত্যা করেছিল।
- সে আটটি বিজয় অর্জন করেছিল। [২]

আব্বাসীয় সরকার কতটুকু ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী ছিল?

মামুনুর রশিদ এবং মু'তাসিম বিল্লাহ ভুল আকিদা পোষণকারী এবং গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের আসনে আসীন থাকা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় যে, আব্বাসীয় সরকার কতটুকু ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, আব্বাসীয় খিলাফতের ইসলামী সীমানার অনুসারী হওয়া শাসকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সরকারি নীতিমালায় শাসকের সঠিক আকিদা সম্পন্ন হওয়াও শর্ত ছিল না। যদি আব্বাসীয় সংবিধানে এই ধারা থাকত, তবে মামুনুর রশিদ বা মু'তাসিম বিল্লাহ ভ্রান্ত আকিদায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই অপসারিত হতেন।

[১] মুরুজুজ জাহাব: ৪/৩৪৪, ৩৪৫, ত. আল-জামিআতুল লুবনানিয়্যাহ

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৯, ত. নিয়ার

মুতাসিমের পর ওয়াসিকও মুতাজিলা ছিল। সেও তার জীবন পূর্ণ করে বিদায় নিল। আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ যুগে খলিফা আন-নাসির ইসনা আশারি ছিল, কিন্তু সে ৪৭ বছর খলিফা ছিল এবং প্রচলিত রাজনীতির কোনো নীতিকে ভিত্তি করে তাকে পদচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। খিলাফতের দরবারে এমন কোনো বিধিবিধান ছিল না যার অধীনে দরবারীরা এই ভ্রান্ত আকিদার খলিফাদের পদচ্যুত করতে পারত।

ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্য হলো “ইমামতে কুবরা”। যেভাবে “ইমামতে সুগরা” অর্থাৎ নামাজের ইমামতিতে ইমামের সঠিক আকিদা সম্পন্ন হওয়া শর্ত, তেমনি জাতির রাজনৈতিক ইমামতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের সঠিক আকিদা সম্পন্ন হওয়াও প্রথম শর্ত। সুতরাং আব্বাসীয় শাসনামলে মামুন, মুতাসিম, ওয়াসিক এবং নাসিরের মতো উদাহরণগুলো এটা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট যে, আব্বাসীয় খিলাফত বাহ্যিকভাবে খিলাফত হলেও বাস্তবে তা ছিল “রাজতন্ত্র”, যা অন্যান্য রাজতন্ত্রের মতো শক্তি, স্বৈরাচারিতা, বংশপরম্পরা এবং পারিবারিক সম্মানের মতো নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও আদালতগুলোতে ইসলামি ফিকহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণ ইসলামি রাজনীতির মৌলিক নীতিগুলোরও অনুসারী ছিল না।

অতএব নবী আকরাম ﷺ-এর এই মোবারক বাণীটি একদম সত্য:

“আমার পরে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, এরপর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।” [১]

[১] আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র হবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৯৪৩, ত: আর-রিসালাহ, মাজমাউজ জাওয়াইদ: ২২৯/১)। এই হাদিসটি সনদের দিক থেকে সহিহ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে আপত্তিসমূহের জবাবের অধীনে করেছি।

আল-ওয়াসিক বিল্লাহ বিন মুতাসিম

হারুন বিন মুহাম্মদ

রবিউল আউয়াল ২২৭ হিজরি থেকে জিলহজ ২৩২ হিজরি

ডিসেম্বর ৮৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্ট ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ

মুতাসিমের পর তার ওসিয়ত অনুযায়ী তার পুত্র হারুন ‘আল-ওয়াসিক বিল্লাহ’ উপাধি ধারণ করে খলিফা হন। তিনি কারাতীস নামক এক রোমান দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার খেলাফতের সময়কাল বৈদেশিক বিপদ থেকে নিরাপদ ছিল; কারণ ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী কায়সার তুফিল বারো বছর শাসনের পর সেই বছরই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তুফিলের পুত্র ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক; তাই তার স্ত্রী শাসনভার গ্রহণ করেন। ফলে বছরের পর বছর রোমানদের পক্ষ থেকে ইসলামি সীমান্তে কোনো আক্রমণ হয়নি। [১]

ওয়াসিকের শাসনামলেও তুর্কি আমিরগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন। সেনাপতি আশনাস ওয়াসিকের আমলে অনেক উন্নতি করেন। ওয়াসিকের পক্ষ থেকে তাকে হীরাখচিত মুকুট পরানো হয়েছিল এবং সরকারের নায়েব (প্রতিনিধি) হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তবে শেষ দিকে ওয়াসিক সতর্কতামূলকভাবে তার ক্ষমতা কমিয়ে দেন, যার পর ২৩০ হিজরিতে আশনাসের মৃত্যু হয়। [২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর আত্মগোপন:

মুতাসিমের শেষ বছরগুলোতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হাদিসের মজলিস এবং মসজিদে আকবাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ওয়াসিক আসার সাথে সাথেই পরিস্থিতির বেড়াজাল সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে শহর ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়, যার পর তিনি ওয়াসিকের মৃত্যু পর্যন্ত আত্মগোপনে জীবন অতিবাহিত করেন। [৩]

আহমদ বিন নাসরের বিদ্রোহ এবং পরিণতি:

ওয়াসিকের আমলের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হলো আহমদ বিন নাসর (রহ.)-এর বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড। তিনি ইরাকের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ইবাদতগুজার ও পরহেজগার বুজুর্গ ছিলেন। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যখন কিছু লোক উলামা, মাশায়েখ এবং দ্বীনের বুজুর্গদের আনন্দদায়ক আশা দেখিয়ে খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দাঁড় করিয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে উলামাদের দাঁড় করানোর পেছনে একনিষ্ঠ কিন্তু নির্বোধ বন্ধুরা থাকত। তারা সেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল যা কোনো আন্দোলন বা বিপ্লবের সাফল্যের জন্য

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৮৯

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬২

[৩] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ১৮/১১৬, তাদমুরি

অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আন্দোলন উসকে দেওয়ার পেছনে ষড়যন্ত্রকারী ও ধূর্ত লোক ছিল যাদের আসল লক্ষ্য ছিল অন্য কিছু; এজন্যই এ ধরনের আন্দোলনগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল ভিত্তির ওপর শুরু করা হতো যাতে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় যা ওলামায়ে কেরামের সামনে পেশ করা হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই ওলামায়ে কেরাম এবং বুজুর্গানে দ্বীনই বিপদের লক্ষ্যবস্তু হতেন এবং তাদের পবিত্র রক্তের ছিটেফোঁটায় ইতিহাসের পাতা রঞ্জিত হতে থাকে।

আহমদ বিন নসর (রহ.)-ও এমনই একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন একটি ইলমি পরিবারের প্রদীপ। তাঁর পিতা নসর বিন মালিক (রহ.) বাগদাদের সেই সব হাদিসের উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের কাছে ছাত্ররা ভিড় জমাত। এর পাশাপাশি তিনি সর্বদা মন্দ কাজ বর্জন, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য সচেতন থাকতেন। ২০১ হিজরিতে যখন খলিফা মামুনের বাগদাদ থেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে শহরে গুণ্ডামি ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন নসর বিন মালিক (রহ.) মানুষের কাছ থেকে নিজের আনুগত্যের বায়আত নিয়ে শহরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং গুণ্ডামি নির্মূল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই সংস্কারমূলক ও দাওয়াতি স্পৃহা আহমদ বিন নসর (রহ.) উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি বাগদাদকে সব ধরনের পাপাচার থেকে মুক্ত করে একটি আদর্শ ইসলামি সমাজে পরিণত করার প্রবল উদ্দীপনা রাখতেন। তাঁর বক্তব্য ও ভাষণ থেকে এই বার্তাই পাওয়া যেত যে, মুসলমানরা যেন পুরোপুরি মুসলমান হয়ে যায় এবং শাসক থেকে শুরু করে একজন রাখাল পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি শতভাগ শরিয়ত পালন করতে শুরু করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের এই আবেগ ধারণকারী একজন আলেম আকিদাগত কোনো বিষয়ে কীভাবে চুপ থাকতে পারেন; তাই আহমদ বিন নসর (রহ.) ‘খালকে কুরআন’ (কুরআন সৃষ্টির) মাসআলা নিয়েও ভাষণ দিতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন: “কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) নয়। এটি আল্লাহর কালাম যা নাজিল করা হয়েছে।” তাঁর গুণাবলি এবং সত্যবাদিতা তাঁকে শহরের দ্বীনদার মানুষের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল।

ওয়াসিক বিল্লাহ ‘খালকে কুরআন’ মাসআলায় মামুন ও মুতাসিমের চেয়েও অনেক বেশি উগ্র ছিল। সে আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর এই কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁর ওপর আঘাত হানার উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছিল।

সেই দিনগুলোতে আহমদ বিন নসরের চারপাশে উৎসর্গিত প্রাণ মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে আবু হারুন এবং তালিব নামক দুই নাগরিক অগ্রণী ছিলেন। তারা মন্দ কাজ বর্জন এবং আকিদা সংস্কারের এই আন্দোলনকে একটি নিয়মিত বিপ্লবী জামাতের রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। একজন শহরের পূর্ব জেলায় মানুষের কাছ থেকে আহমদ বিন নসরের জন্য বায়আত নিতে শুরু করেন এবং অন্যজন শহরের পশ্চিম জেলায়। সেই সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) জীবিত ছিলেন এবং বাগদাদেই ছিলেন। ‘খালকে কুরআন’ মাসআলায় তাঁর দৃঢ়তা কারো অজানা ছিল না। ইলমের দিক থেকেও তিনি আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে এমন কোনো আন্দোলন পরিচালনা করেননি এবং অন্যদেরও নিজের চারপাশে সমবেত হতে দেননি, এমনকি আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর এই আন্দোলনের সাথেও কোনো সম্পর্ক রাখেননি।

১লা শাবান ২৩১ হিজরিতে আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর জন্য সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং শাসকের বিদআতি হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (খুরুজ) করার জন্য হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে গোপনে নিয়মিত বায়আত নেওয়া হলো। কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য আবু হারুন এবং তালিব প্রত্যেককে একটি করে দিনার হাদিয়া প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, ৩রা শাবান রাতে শহরের প্রতিটি মহল্লায়...

ঢোল ও দামামা বাজানো হবে, এই শব্দ শোনামাত্রই আন্দোলনের সকল কর্মী একযোগে একত্রিত হয়ে আক্রমণ শুরু করবে। আন্দোলনটি যে কতটা অগভীর ও ভাসাভাসাভাবে পরিচালিত হচ্ছিল তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। যদি আবু হারুন এবং তালিব নিজেরা কারো চর না হয়ে থাকেন এবং আহমদ বিন নসরকে ফাঁসানোর সংকল্প না করে থাকেন, তবে তাদের বুদ্ধিহীন বলে মেনে নিতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম সরকার, যাকে নফস জাকিয়ার মতো উচ্চবংশীয় সাদাত এবং বারমাকিদের মতো রাজনীতিবিদরা নাড়াতে পারেননি, তা রাতারাতি কীভাবে ফেলে দেওয়া সম্ভব ছিল। প্রতিপক্ষের শক্তি, সম্পদের অনুপাত এবং পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি উপেক্ষা করে যে আন্দোলনই চালানো হবে তার পরিণতি হবে শিক্ষণীয় ও ভয়াবহ।

আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল যে, তা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল। তাদের কর্মীদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব ধরনের লোকই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে দুজন মদ্যপও ছিল। আবু হারুনের দেওয়া দিনার দিয়ে তারা মদ কিনেছিল। ২রা শাবান রাতে তারা মদ্যপান শেষ করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মনে করল যে আজ ৩রা শাবান। তারা নিজ মহল্লায় ঢোল বাজাতে শুরু করল। অন্য কর্মীরা এই শব্দ শুনে থমকে গেল কিন্তু কেউ বাইরে বের হলো না। ইতিমধ্যে পুলিশ সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। তারা অভিযান চালিয়ে দুই মদ্যপকে ধরে ফেলল। তাদের মারধর করে মাঝরাতে এই হট্টগলের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা দুজন পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আহমদ বিন নসর গ্রেপ্তার হলেন। বাগদাদের নায়েবে হাকেম মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম যখন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন আহমদ বিন নসর (রহ.) নিজের সংকল্পের কথা স্বীকার করে নিলেন।

আন্দোলনের ২৭ জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকেও ধরা হলো যাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হলো। তাদের মধ্যে আবু হারুন এবং তালিবের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তাদের গ্রেপ্তারের কোনো উল্লেখ নেই, না আছে সাজা পাওয়ার কোনো কথা।

যখন আহমদ বিন নসর (রহ.)-কে খলিফার কাছে সামাররায় পাঠানো হলো, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তাকে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলেন না, বরং সরাসরি আকিদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, সম্ভবত আহমদ বিন নসরের আন্দোলন ছিল তাকে ফাঁসানোর একটি ফাঁদ, যাতে তাকে সঠিক আকিদা বর্ণনা করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। যখন তাকে রশি দিয়ে বেঁধে চামড়ার মেঝেতে দরবারে দাঁড় করানো হলো, তখন খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: “কুরআন কি মাখলুক (সৃষ্ট)?”

তিনি বললেন: “কুরআন আল্লাহর কালাম।” খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন: “আল্লাহর দিদার (দর্শন) সম্পর্কে তুমি কী বলো?”

তিনি বললেন: “আল্লাহর ইরশাদ হলো: **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ**”

“সেদিন কিছু চেহারা হবে সজীব ও উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” [১]

এবং হাদিসে আছে যে, তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখবে যেমন কোনো ভিড় ছাড়াই চাঁদকে দেখতে পাও। [২]

ওয়াসিক রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তুমি ধ্বংস হও। আমি কি আমার রবকে এমন বিশ্বাস করে কাফের হয়ে যাব না?”

তারপর তিনি দরবারীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে কী শাস্তি দেওয়া যায়।

[১] সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ২২, ২৩

[২] ইমাকুম সাতারাওনা রাব্বাকুম কামা তারাওনা হাযাল কামারা লা তুদাম্মুনা ফী রু'য়াতিহি। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭৪৩৪, কিতাবুত তাফসীর)

পশ্চিম বাগদাদের কাজী আবদুর রহমান বিন ইসহাক বললেন: “তার রক্ত হালাল।”

কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদ কিছুটা নমনীয়তা দেখিয়ে বললেন: “সে তো কাফের, তবে তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। সম্ভবত তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।” আবু আবদুল্লাহ আরমানি বলল: “আমীরুল মুমিনীন! আমাকে তার রক্ত পান করতে দিন।” ওয়াসিক বললেন: “এমনই হবে।”

তিনি আমার বিন মা’দী কারিবের সেই বিশ্ববিখ্যাত তলোয়ার ‘সামসামাহ’ হাতে নিলেন যা বনু আব্বাসীয় খলিফাদের কাছে বংশপরম্পরায় চলে আসছিল। তিনি এর তিনটি আঘাতে আহমদ বিন নসরকে হত্যা করলেন। এই দুঃখজনক ঘটনাটি ২৯ শাবান ২৩১ হিজরির। হত্যার পর আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বাগদাদে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো এবং সাথে একটি ফলক টাঙিয়ে দেওয়া হলো যাতে লেখা ছিল: “এটি কাফের মুশরিক আহমদ বিন নসরের মাথা, যাকে ওয়াসিক বিল্লাহ অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের পর হত্যা করেছেন।” [১]

আহমদ বিন নসর (রহ.)-এর পক্ষ থেকে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভুল হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জালিম শাসকের সামনে যে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে সঠিক আকিদা বর্ণনা করেছেন, তা ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তাঁর শাহাদাতের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু নিদর্শনও দেখা গিয়েছিল যার মাধ্যমে সত্যপন্থীদের সত্যতা এবং বিদআতিদের মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। ওয়াসিকের ভাই মুতাওয়াক্কিলের ঝোঁক আহলে সুন্নাতের প্রতি ছিল, তাই আহমদ বিন নসরের হত্যাকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি একবার দরবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি আলেমদের আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আহমদ বিন নসরের হত্যা কীভাবে বৈধ ছিল? জবাবে একজন উজির বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! ওয়াসিক তাকে কুফরির কারণে হত্যা করেছিলেন। যদি তা না হয় তবে আল্লাহ আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারুন।” একজন নামী আমির বললেন: “যদি সে কুফরির কারণে নিহত না হয়ে থাকে তবে আল্লাহ যেন আমাকে টুকরো টুকরো করে দেন।” কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদ বললেন: “যদি তাকে কুফরির ওপর হত্যা করা হয়ে থাকে তবে আল্লাহ যেন আমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করেন।”

তাদের প্রত্যেকের সাথেই তেমনটিই ঘটল। সেই উজির আগুনে পুড়ে মারা গেল। সেই আমির শত্রুদের হাতে বন্দি হলো এবং তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো। কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন এবং জীবনের শেষ সময়টুকু পঙ্গু অবস্থায় কাটালেন। [২]

রোমানদের সাথে বন্দি বিনিময়:

এই সময়ে ওয়াসিক বিল্লাহ রোমান সাম্রাজ্যের সাথে গত কয়েক বছরের যুদ্ধে বন্দি হওয়া মুসলমানদের মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১০ মহররম ২৩১ হিজরিতে তারতুস থেকে কিছুটা দূরে সালুকিয়ার নাহরে লাবেস-এ বন্দি বিনিময় শুরু হয়। এখানে ওয়াসিক আবারও আকিদাগত বিষয়ে অস্বাভাবিক কঠোরতা প্রদর্শন করেন। তাঁর নির্দেশ ছিল যে, যে বন্দি মুতাজিলাদের আকিদা স্বীকার করে বলবে যে কুরআন মাখলুক এবং আখিরাতে আল্লাহর দিদার হবে না, তাকে গ্রহণ করা হবে। আর যে এটি বলতে অস্বীকার করবে, তাকে পুনরায় রোমানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এভাবে চার হাজার ৬৩ জন বন্দি মুক্ত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যান। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩১০ থেকে ৩১৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৩১৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৩১০

ইমাম আবু আব্দুর রহমান আল-আযদি (রহ.)-এর সত্যবাদিতা... ওয়াসিক বিল্লাহর চিন্তাধারায় পরিবর্তন:

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর দৃঢ়তা ও কুরবানির কারণে সাধারণ মানুষ সঠিক আকিদা এবং ঈমান ও বিশ্বাসের ওপর অটল ছিল। যদিও শাসকদের চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন আসছিল না, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যখন হেদায়েতের ফয়সালা করে, তখন তিনি এমন বান্দাদের মনোনীত করেন যাদের খ্যাতি নেই, কিন্তু তাদের সাহস, প্রজ্ঞা এবং সত্যবাদিতা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে ওয়াসিক বিল্লাহর চিন্তাধারায়ও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছিল, যার কৃতিত্ব একজন অখ্যাত আলেমের। তিনি ছিলেন আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-আযদি (রহ.)। তিনি ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর উস্তাদ ছিলেন। তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন, কিন্তু দুনিয়াবাসীর কাছে তেমন পরিচিত ছিলেন না। তিনি সিরিয়ার মাসিসা নামক জনপদের বাসিন্দা ছিলেন, যা আনতাকিয়ার উত্তরে এশিয়া মাইনরের সীমান্তে অবস্থিত। ‘খালকে কুরআন’ (কুরআন সৃষ্টির আকিদা) অস্বীকার করার অপরাধে তাকে দীর্ঘকাল বন্দি রাখা হয়েছিল।

একদিন ওয়াসিকের মনে হলো: “সেই শায়খকে আমার কাছে নিয়ে এসো।”

তাকে শিকল পরা অবস্থায় দরবারে পেশ করা হলো। তিনি দীর্ঘকায়, সুশ্রী এবং অত্যন্ত নূরানি চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাকে দেখামাত্রই ওয়াসিকের চোখে শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠল। আবু আব্দুর রহমান (রহ.) এসেই বললেন, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।” ওয়াসিক কোনো উত্তর দিলেন না।

আবু আব্দুর রহমান (রহ.) বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি আমার সাথে সেই আদব অনুযায়ী আচরণ করেননি যার নির্দেশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী হলো:

‘আর যখন তোমাদের অভিবাদন জানানো হয়, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা সেটিই ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।’ [১]

এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও সালামের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।”

তখন ওয়াসিক বললেন: “ওয়া আলাইকুমুস সালাম।” তারপর বললেন: “হে শায়খ! কাজী আহমদ বিন আবি দুওয়াদ যা জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর দিন।”

এরপর কাজীকে বললেন: “তাকে প্রশ্ন করো।”

আবু আব্দুর রহমান (রহ.) বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি একজন কয়েদি, শিকলে বন্দি। কারাগারে আমি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতাম। আমাকে ওযুর জন্য পানি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। আপনি আমার শিকল খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিন এবং আমার জন্য পানি আনার আদেশ দিন যাতে আমি পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করতে পারি। এরপর আপনি অবশ্যই প্রশ্ন করবেন।”

ওয়াসিকের নির্দেশে পানি আনা হলো। তিনি ওযু করে সালাত শেষ করলে ওয়াসিক কাজী ইবনে আবি দুওয়াদকে বললেন: “এখন তাকে প্রশ্ন করো।”

[১] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৬

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “কাজী সাহেব বিতর্কের ক্ষেত্রে দুর্বল, সাধারণ এবং অকর্মণ্য প্রমাণিত হন।”

ওয়াসিক রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তুমি কাজী সাহেব সম্পর্কে বলছ যে তিনি বিতর্কে দুর্বল ও অকর্মণ্য?”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “আমীরুল মুমিনীন, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা থেকে কাজ নিন। আমাকে কি তার সাথে কথা বলার অনুমতি দেবেন?”

ওয়াসিক বললেন: “হ্যাঁ, অনুমতি দেওয়া হলো।”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “আমি প্রশ্ন করব। তাকে বলুন উত্তর দিতে।”

ওয়াসিক বললেন: “ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করুন।”

আবু আবদুর রহমান রহ. কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন?”

কাজী বললেন: “এই কথার দিকে যে কুরআন মাখলুক।”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “আপনি মানুষকে যে কথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন যে কুরআন মাখলুক, এটি কি দ্বীনের এমন অংশ যার ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না?”

কাজী সাহেব বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

আবু আবদুর রহমান রহ. জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি যে জিনিসের প্রচার করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সেটির দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন?”

কাজী বললেন: “না।”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর তাবলীগ করেছিলেন?”

কাজী বললেন: “না।”

আবু আবদুর রহমান রহ. জানতে চাইলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর দাওয়াত দিয়েছিলেন?”

কাজী বললেন: “না।”

আবু আবদুর রহমান রহ. প্রশ্ন করলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর প্রচার করেছিলেন?”

কাজী বললেন: “না।”

আবু আবদুর রহমান রহ. জিজ্ঞেস করলেন: “তাদের পর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর দিকে ডেকেছিলেন?”

কাজী বললেন: “না।”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “তাহলে এটি এমন এক কথা যার দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মধ্যে কেউ দাওয়াত দেননি, আর আপনি এর দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন? এখন বলুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর কি এই আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না?”

কাজী বললেন: “জ্ঞান তো ছিল।”

আবু আবদুর রহমান রহ. বললেন: “আপনি বলছেন যে তাদের জ্ঞান ছিল অথচ তারা চুপ ছিলেন। তাহলে আপনি কেন এমন জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছেন...”

...যার দাওয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ দেননি এবং মানুষকে এর বাইরে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তো আমাদের, আপনার এবং সকল মুসলমানদের জন্য অবকাশ রয়েছে যে আমরা এ বিষয়ে নীরব থাকি। আর যদি আপনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর এই আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না কিন্তু আমার জ্ঞান আছে, তবে আমি বলব: হে আহমক ইবনে আহমক! এটা কীভাবে হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের একটি আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না আর আপনি এবং আপনার সাথীরা সে সম্পর্কে অবগত?”

কাজী আহমদ বিন আবি দাউদ চুপ হয়ে গেলেন। ওয়াসিকও হতভম্ব হয়ে রইলেন।

আবু আবদুর রহমান (রহ.) বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! এটি একটি কথা হলো।”

তারপর কাজীকে বললেন: “আমাকে বলুন যে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন: **الْيَوْمَ اكْتُبُ لَكُمْ دِينَكُمْ** [১] (আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম)”

কিন্তু আপনি বলছেন যে দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না যতক্ষণ না আপনার ‘খালকে কুরআন’ (কুরআন সৃষ্টির) আকিদাকে গ্রহণ করা হবে। এখন আল্লাহ সত্য বলছেন যিনি দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ বলছেন, নাকি আপনি সত্য বলছেন যিনি দ্বীনকে অপূর্ণাঙ্গ বলছেন?”

কাজী ইবনে আবি দাউদ এবারও কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

আবু আবদুর রহমান (রহ.) বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! এই দুটি কথা হলো।”

দরবারে নিস্তন্ধতা ছেয়ে গেল। শায়খ কিছুক্ষণ বিরতির পর কাজী সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন:

“আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** [২] (হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন।)”

তো আপনার এই আকিদা যার দাওয়াত আপনি মানুষকে দিচ্ছেন, তা কি সেই সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন?”

কাজী সাহেব এবারও কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। বুজুর্গ বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! এই তিনটি কথা হলো।”

তারপর বললেন: “আচ্ছা এটা বলুন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই আকিদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকত যার প্রচার আপনি করছেন, তবে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করার অবকাশ ছিল কি ছিল না?”

কাজী বললেন: “হ্যাঁ, তাঁর জন্য এর অবকাশ ছিল।”

আবু আবদুর রহমান (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন: “আর একইভাবে কি হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-এর জন্যও ছিল?” কাজী বললেন: “হ্যাঁ, তাঁদের জন্যও অবকাশ ছিল।”

আবু আবদুর রহমান (রহ.) ওয়াসিকের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন! যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের জন্য অবকাশ ছিল, আর তারপরও আমাদের জন্য তাতে অবকাশ না থাকে, তবে আল্লাহ যেন আমাদের কখনো প্রশস্ততা দান না করেন।”

[১] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩

[২] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬৭

ওয়াসিকও বলে উঠলেন: “হ্যাঁ! যে জিনিসের প্রশস্ততা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের জন্য ছিল আর আমাদের জন্য না হয়, তবে আল্লাহ আমাদের কখনো প্রশস্ততা দান না করুন।” তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন: “তাঁর শিকলগুলো খুলে দেওয়া হোক।”

যখন সৈন্যেরা শিকল খোলার জন্য এগিয়ে এল, তখন আবু আবদুর রহমান (রা.) শিকলগুলোকে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ওয়াসিক সৈন্যদের বললেন: “থেমে যাও।” তারপর আবু আবদুর রহমান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি এগুলোকে কেন নিজের দিকে টানছেন?”

তিনি বললেন: “আমি চাই যে যখন আমি মারা যাব, তখন যেন এই ওসিয়ত করে যাই যে, এই শিকলগুলো আমার সাথে আমার কাফন ও শরীরের মাঝখানে রেখে দেওয়া হয়। তারপর কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর দরবারে বলব: হে আমার রব! এই বান্দাকে জিজ্ঞেস করুন যে, সে কেন আমাকে বন্দি করেছিল এবং কেন আমাকে ধরে এনে আমার পরিবার-পরিজনকে পেরেশান করেছিল।”

এ কথা শুনে ওয়াসিকের মন ভরে এল এবং তিনি অবোরে কাঁদতে লাগলেন। শামী বুজুর্গও কাঁদছিলেন এবং দরবারের এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যার কান্নার হেঁচকি ওঠেনি। যখন চোখের পানি থামল, তখন ওয়াসিক ধরা গলায় বললেন: “শাইখ! আমাকে ক্ষমা করে দিন।”

আবু আবদুর রহমান (রা.) বললেন: “আমি তো তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের সম্মানে আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম যখন আমাকে ঘর থেকে বের করা হয়েছিল।”

ওয়াসিকের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন: “আপনি আমাদের কাছেই থাকুন। আমি খুশি হব।”

আবু আবদুর রহমান (রা.) বললেন: “আমার সীমান্তে থাকা বেশি উপকারী, আমি বৃদ্ধও বটে। আমার কিছু প্রয়োজনও আছে।”

ওয়াসিক বললেন: “আপনি যা চান চাইতে পারেন।”

তিনি বললেন: “আমাকে সেই জায়গায় যেতে দিন যেখান থেকে এই জালেম আমাকে বের করেছিল।”

ওয়াসিক কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদকে বললেন: “এই বুজুর্গকে পথের খরচ দিয়ে বিদায় করে দাও।” ওয়াসিক তাঁকে ধন-সম্পদ পেশ করলেন কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ না করে বিদায় নিলেন।

এই পুরো ঘটনাটি ওয়াসিকের পুত্র মুহতাদী বর্ণনা করেছেন, যিনি সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে খলিফাও হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: “আমি সেই মজলিসেই ভুল আকিদা থেকে তওবা করে নিয়েছিলাম এবং আমার বিশ্বাস যে ওয়াসিকও তাঁর মত থেকে ফিরে এসেছিলেন।” [১]

এভাবে হক্কানী ওলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টা সফল হলো, তাঁদের দাওয়াত সরকারি দফতর এবং রাজপ্রাসাদের উচ্চকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আব্বাসী শাহজাদা, উজির এবং আমিররা দলে দলে ভুল আকিদা থেকে তওবা করতে লাগলেন। তাঁরা সবাই দেখছিলেন যে, মুতাজিলা আলেমদের কাছে কেবল শব্দই আছে, অন্যদিকে হাকিকতের আলোও রয়েছে এবং চরিত্রের সেই উচ্চতাও রয়েছে যার সামনে অন্তর আপনা-আপনিই নত হতে চায়।

[১] কিতাবুল ইতিসাম লিশ-শাতিবি, ১/৩০৮ থেকে ৩১১, দার ইবনে আফফান সংস্করণ; আশ-শরীয়াহ লিল-আজুরি: ১/৪৫৩, দারুল ওয়াতান সংস্করণ; আল-ইসামী এই ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেছেন: উল্লিখিত শাইখ হলেন আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-আজাদি, যিনি আবু দাউদ ও নাসায়ীর উস্তাদ। বাসতুন নুজুমিল আউয়ালি লিল-ইসামী: ৩/৪৫৯-৪৬০।

ওয়াসিকের মৃত্যু:

ওয়াসিক ইস্তিসকা (জলোদর) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অনেক চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু কোনো উপশম হয়নি। অবশেষে ২৪ জিলহজ ২৩২ হিজরিতে তাঁর আত্মা দেহত্যাগ করে। ওয়াসিক বিল্লাহ ১৯৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ বছর নয় মাস শাসন করেন এবং ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

তাঁর শাসনামল সাধারণত শান্ত ও নিরাপদ ছিল। তাঁর অবস্থান ছিল সামাররায় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সাদাতে বনু ফাতিমা এবং আলবীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে ধন-সম্পদ দিয়ে এত বেশি ধন্য করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সময় এই পরিবারের এমন কোনো সদস্য ছিল না যে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয়নি। [২]

তবে হক্কানি উলামাদের জন্য ওয়াসিকের প্রাথমিক পাঁচ বছর ছিল কঠিন পরীক্ষার। তাঁদের এক বিশাল অংশকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং কাউকে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অনেকে এমন ছিলেন যারা বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কারাগারেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৩২৫, ৩২৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৩৩০

আল-মুতাওয়াঙ্কিল আলাল্লাহ

জাফর বিন মুহাম্মদ আল-মু’তাসিম

জিলহজ ২৩২ হিজরি হতে শাওয়াল ২৪৭ হিজরি

আগস্ট ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

ওয়াসিকের ইন্তেকালের পর তার ভাই জাফর বিন মু’তাসিম ‘আল-মুতাওয়াঙ্কিল আলাল্লাহ’ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু আমির পূর্ববর্তী খলিফার পুত্র মুহাম্মদের হাতে বায়াত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু তুর্কি অফিসাররা মুতাওয়াঙ্কিলের সমর্থক ছিলেন; তাই কারো টু শব্দ করার সাহস হয়নি। মুতাওয়াঙ্কিলের বায়াত গ্রহণে আব্বাসীয় বংশের আটজন শাহজাদা শরিক হয়েছিলেন, অর্থাৎ: মনসুর বিন মাহদী, আব্বাস বিন হাদী, আবু আহমদ বিন হারুনুর রশীদ, আবদুল্লাহ বিন আমিনুর রশীদ, মুসা বিন মামুন, আহমদ বিন মু’তাসিম, মুহাম্মদ বিন ওয়াসিক এবং মুতাওয়াঙ্কিলের নিজের পুত্র মুনতাসির। [১] মুতাওয়াঙ্কিল ২০৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ফকিহ ও মুহাদিসগণের প্রতি তার গভীর ভক্তি ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার জন্মের এক বছর আগে ২০৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে তাকে স্মরণ করে বলতেন: “হায়! আমি যদি তার যুগ পেতাম, তার সাথে সাক্ষাৎ করতাম এবং তার কাছ থেকে দ্বীনের ইলম শিখতাম।” [২]

সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন এবং বিদআতের অবসান

মুতাওয়াঙ্কিল মু’তাজিলা, দার্শনিক এবং শিয়াদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের নির্দেশে তাশাইয়ু (শিয়াবাদ) এবং ইতিজাল (মু’তাজিলাবাদ) এর বিরোধিতার কারণে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তি দেন। এবং সমস্ত প্রদেশে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, সুন্নতে নববীর প্রচার-প্রসার করতে হবে এবং আহলে সুন্নাতকে সমর্থন করতে হবে। [৩] তিনি ‘কুরআন মাখলুক’ (সৃষ্ট) হওয়ার আকিদার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং মু’তাজিলা ও দার্শনিক মতবাদ খণ্ডনের জন্য মুহাদিসগণকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদা ও মূল্যবান উপটৌকন প্রদান করেন। [৪] এভাবে সরকারি পর্যায়ে ইতিজাল ও দর্শনের পরাজয় ঘটে। যদিও ইলমি মজলিসগুলোতে এই মতবাদগুলো অবশিষ্ট ছিল, তবে সেগুলোর শোরগোল ও প্রভাব কমে গিয়েছিল।

মু’তাসিম ও ওয়াসিকের যুগে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ফতোয়া প্রদান ও দরসের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল; মুতাওয়াঙ্কিল সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কোনো ত্রুটি রাখেননি। [৫] তিনি মু’তাজিলাদের নেতা প্রধান বিচারপতি আহমদ বিন আবি দুয়াদকে বরখাস্ত করে আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম ইয়াহইয়া বিন আকসাম (রহ.)-কে প্রধান বিচারপতি (কাযিউল কুযাত) নিযুক্ত করেন। [৬]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৫

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৬

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩৬/১২

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩৬/১২

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/৩৫০

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩৬/১২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/৩৫০

কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদ গত যুগে সত্যপন্থী আলেমদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিলেন। এখন কর্মফলের যুগে প্রথমে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এরপর তাকে পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় [১]। তারপর তার সম্পদ ও জায়গির বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর তার ছেলে আবুল ওয়ালিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফিলহজ ২৩৯ হিজরিতে আবুল ওয়ালিদ মারা যান। মহরম ২৪০ হিজরিতে ইবনে আবি দুয়াদও মৃত্যুবরণ করেন [২]।

মুতাওয়াক্কিল সরকারি পর্যায় থেকে বিদআতি ও ভ্রান্ত আকিদার লোকদের বেছে বেছে বের করে দেন। মিসরের কাজী ইবনে আবি লাইস জাহমিয়া আকিদা পোষণ করতেন এবং জনগণের ওপর জুলুম করতেন। তাকে বরখাস্ত করে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হয় এবং তার সমস্ত জুলুমের হিসাব নেওয়া হয় [৩]।

তার স্থলে বিখ্যাত মালিকি ফকিহ ও মুহাদ্দিস হারিস বিন মিসকিন আল-উমাবি রহমাতুল্লাহ (১৫৪ হি. - ২৫০ হি.)-কে কাজী নিযুক্ত করা হয়, যিনি মামুনুর রশিদের সময় থেকে কারাগারে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করছিলেন [৪]।

মুতাওয়াক্কিলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি পুরো মুসলিম বিশ্বে সুন্নাহর পুনর্জাগরণে উৎসাহ প্রদান করেন। মুহাদ্দিসদের নির্দেশ দেন যেন তারা কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম হওয়ার আকিদা প্রচার করেন এবং এর মাখলুক হওয়ার আধুনিক চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করেন, আর আখিরাতে আল্লাহর দিদার সংক্রান্ত সহিহ হাদিসসমূহ বর্ণনা করেন। এভাবে আলেম ও মুহাদ্দিসদের মজলিসগুলো আবার আগের মতো আবাদ হয়ে ওঠে যেমন হারুনুর রশিদের সময় এবং তার আগে ছিল। আবু বকর বিন আবি শাইবা রহমাতুল্লাহ রুসাফার জামে মসজিদে এবং তার ভাই উসমান বিন আবি শাইবা রহমাতুল্লাহ জামে মানসুরে হাদিসের দরস দিতেন, তখন শ্রোতাদের ভিড় ত্রিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেত [৫]।

কারবালায় হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজারে জিয়ারতকারীরা বিভিন্ন ধরনের বিদআত করত। ২৩৬ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল সেখানে জিয়ারতকারীদের আসার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পাশাপাশি সমাধিটিও গুঁড়িয়ে দেন। এই পদক্ষেপ মুতাওয়াক্কিলের সুনামের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং কেবল শিয়া নয়, বরং সুন্নি আলেমগণও এই কঠোরতাকে অপছন্দ করেন [৬]।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৩৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৪৯; আত-তাবাকাতুস সানিয়াহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়াহ, পৃ. ৯০, ৯১

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৩

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৫৪, ৫৫, ত-রিসালাহ

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫২

[৬] তারিখুত তাবারী: ২৩৬ হিজরি

হাফেজ যাহাবি রহমাতুল্লাহও মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে লিখেছেন ‘ফিহি নাসবুন ওয়ানহিরায়ফ’ (তার মধ্যে কিছুটা নাসিবিয়াত ও বিচ্যুতি ছিল)। তারিখে মিরে ইসলাম, পৃ. ১২/৪৫৫। কিছু ব্যক্তি মুতাওয়াক্কিলের দিকে সমাধি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পদক্ষেপের সম্পৃক্ততাকে সন্দেহজনক আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তাবারী এটি কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন; তিনি তো ২২৬ হিজরিতে তাবারিস্থানে ছিলেন এবং মাত্র ১২ বছর বয়সী ছিলেন, তাই তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন না। যদিও এটি কোনো অকাট্য খণ্ডন হতে পারে না। ইমাম তাবারীর জীবনী থেকে স্পষ্ট যে, তিনি ৩১০ হিজরিতে (সমাধি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাঁচ বছর পর যোলো বছর বয়সে) বাগদাদে পৌঁছেছিলেন এবং এখানকার মুহাদ্দিসদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। (মুজামুল উদাবা: ১৮/৫৬) এটি মুতাওয়াক্কিলেরই যুগ ছিল। জ্ঞানার্জনের সফরের পর তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাসও করেছিলেন। সমাধির অবমাননার এই ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে বারবার শুনে থাকবেন। যদি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমাধির অবমাননা কেবল একটি গল্প হতো, তবে ইমাম তাবারী অবশ্যই সে সম্পর্কে অবগত হতেন। পরবর্তীতে আল্লামা ইবনুল জাওজি ‘আল-মুনতাজাম’-এ, হাফেজ যাহাবি ‘তারিখুল ইসলাম’-এ এবং হাফেজ ইবনে কাসির ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’-তে এই দুই ঘটনাটি একইভাবে বর্ণনা করেছেন। এই তিনজনই সমালোচনা ও গবেষণায় প্রসিদ্ধ, কিন্তু তারা এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটা সম্ভব যে, ঘটনার কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে (যেমন সমাধি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে লাঙল চালানো এবং সেখানে চাষাবাদ করা, মাকাতিলুত তালিবিন-এ ইসফাহানি এই বিষয়ে আরও কিছু বিবরণ দিয়েছেন) অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণনার মূলনীতি অনুযায়ী মূল ঘটনাটি প্রমাণিত হয়ে যায় এবং এটি অস্বীকার করা পক্ষপাতদুষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে রাখতে হবে যে, এখানে আমরা মূল ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি, সমাধির নির্মাণ বা ধ্বংসের ফিকহি দিক নিয়ে নয়।

জিহাদি অভিযানসমূহ:

মুতাওয়াঙ্কিলের যুগে আবারও সীমান্তে রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। এই ধারার সূচনা হয়েছিল ২৩৮ হিজরিতে যখন রোমান নৌবাহিনী মিশরের দামিয়াত শহরে আক্রমণ করে অনেক মুসলমানকে বন্দী করেছিল। রোমান রানী তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এদিকে মুতাওয়াঙ্কিলের নায়েব আলী বিন ইয়াহইয়া সমুদ্রে পাল্টা আক্রমণ করেন এবং রোমানদের জাহাজ থেকে অনেক লোককে বন্দী করেন। বাধ্য হয়ে রোমান সরকার বন্দী বিনিময়ে সম্মত হয় এবং এভাবে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা হয়।

কিছুকাল পর রোমান নৌবাহিনী উপকূলে আবারও একই ধরনের আক্রমণ চালায় এবং অনেক নাগরিককে বন্দী করে নিয়ে যায়। মুতাওয়াঙ্কিল প্রথমে আলী বিন ইয়াহইয়াকে পাল্টা ব্যবস্থার নির্দেশ দেন এবং এরপর ২৪৪ হিজরিতে স্বয়ং রাজধানী সামাররা থেকে বের হন এবং সৈন্যসামন্তসহ সিরিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। সমস্ত সরকারি দপ্তর এবং সালতানাতের অবশিষ্টাংশকেও দামেস্কে ডেকে আনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এখন থেকে বনু উমাইয়াদের মতো দামেস্কেই রাজধানী করা হবে। তবে দুই মাস পর সিরিয়ায় একটি মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে খলিফাকে ইরাকে ফিরে আসতে হয়। এই সময়ে নৌবাহিনী সমানভাবে সক্রিয় ছিল এবং আমির বুগা আল-কাবিরের নেতৃত্বে রোমান অধিকৃত অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ২৪৫ হিজরিতেও সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতি, রোমানদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং পাল্টা আক্রমণের ধারা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ২৪৬ হিজরিতে মুতাওয়াঙ্কিল বিভিন্ন দিক থেকে রোমান অধিকৃত অঞ্চলের দিকে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, যার ফলে ভীত হয়ে রোমানরা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দৃঢ় অঙ্গীকার ও চুক্তি করে, যার পর বন্দী বিনিময় হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

চরিত্র ও নৈতিকতা:

মুতাওয়াঙ্কিল সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি সত্যবাদিতার কদর করতেন। একবার তিনি দরবারে এলে দরবারীরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেবল একজন মেহমান আলেম আহমদ বিন মুয়াদদাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বসে রইলেন। মুতাওয়াঙ্কিল উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন: “তাঁর কী হয়েছে, তিনি কি বায়াত করেননি?” উজির মেহমানকে তিরস্কার থেকে বাঁচাতে বললেন: “তিনি বায়াত করেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল।” এটি শুনে আহমদ বিন মুয়াদদাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “আমার দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে চাই। আপনি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ শোনেননি যে, যে ব্যক্তি এটি পছন্দ করে যে মানুষ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে।” [২] মুতাওয়াঙ্কিল এই সত্যবাদিতায় এতই খুশি হলেন যে তখত থেকে নেমে আহমদ বিন মুয়াদদাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে এসে বসলেন। [৩] মুতাওয়াঙ্কিল অত্যন্ত দানশীল মানুষ ছিলেন। বলা হতো যে কবিদের তিনি যতটুকু পুরস্কৃত করেছেন তার উদাহরণ অতীতে কোথাও পাওয়া যায় না।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৪৪ হিজরি থেকে ২৪৬ হিজরি।

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৫২২৯, বাব ফি কিয়ামির রাজুলি লির রাজুল।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৬।

মারওয়ান বিন আবি আল-জানুবকে একটি কাসিদার জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার দিরহাম দেওয়া হয়েছিল। আলী বিন জাহম থেকে কিছু কবিতা শুনে তাকে এমন দুটি মুক্তা দিয়েছিলেন যার নজির সারা বিশ্বে ছিল না। [১]

মুতাওয়াঙ্কিল নির্মাণ কাজও করিয়েছিলেন; যেমন: ২৩৫ হিজরিতে দুই লক্ষ দিনার খরচ করে ‘জাফরিয়া’ নামক একটি নতুন শহর আবাদ করেছিলেন। [২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মৃত্যু:

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উম্মতের ইলমি ও আকিদাগত খেদমত করে গেছেন। মুতাসিম এবং তার উত্তরসূরি ওয়াসিক তাঁর সামনেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। অবশেষে খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের যুগে ১২ই রবিউল আউয়াল ২৪১ হিজরি (৩০ জুলাই ৮৫৫ খ্রি.) তারিখে ইসলামি জগতের এই সূর্য বাগদাদের মাটিতে অস্তমিত হয়। তাঁকে শহীদদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। [৩]

আলী বিন মাদিনী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এই অতুলনীয় দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কতই না চমৎকার বলেছেন:

“আল্লাহ তা’আলা এই দ্বীনের মর্যাদা ও সম্মানের কাজ দুইজন ব্যক্তির মাধ্যমে এমনভাবে নিয়েছেন যে, (নিজ নিজ যুগে) তৃতীয় কেউ তাদের সাথে শরীক ছিল না। ফিতনা-এ-ইরতিদাদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং ফিতনা-এ-খালকে কুরআনের সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)।” [৪]

ইসহাক বিন রাহওয়াই বলতেন:

“যদি ইমাম আহমদ না হতেন এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি না নিতেন, তবে ইসলাম মিটে যেত।” [৫]

আলম-এ-ইসলামকে মুতাজিলাদের বিভ্রান্তিকর তৎপরতা থেকে রক্ষা করা ছাড়াও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ইলমি কীর্তিসমূহের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তাঁর ফিকহি দক্ষতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, তাঁকে এই উম্মতের চারজন ইমাম ও মুজতাহিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর পরে ‘মুজতাহিদে মুতলাক’-এর মর্যাদা আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। তাঁর ফতোয়াসমূহ তাঁর ফিকহি উচ্চমর্যাদার সুস্পষ্ট দলিল।

ইবনে আকিল বলেন:

“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁর অগ্রাধিকারসমূহকে (তরজিহাত) হাদীসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেছেন যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) অনেক ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের বড়দের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন।” [৬]

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.):

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত বড় কাজ করেছেন এবং ‘মুসনাদে আহমদ’ সংকলন করেছেন। এটি বর্ণানুক্রমিক (হরুফে তাহাজ্জি) হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের নামের বিন্যাস অনুযায়ী সাড়ে সাতাশ হাজার হাদীসের একটি বিশাল সংকলন।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ২৪৫ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৪১৯ থেকে ৪২৩

[৪] তারিখ বাগদাদ, খতিব বাগদাদি, ৪/১৮৪, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৫] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি, ১৮, পৃ. ৭১, কুদসি

[৬] সিয়রুু আলামিন নুবালা, ১১/২২৬

মুসনাদে আহমদে প্রত্যেক সাহাবী থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। মুসনাদে আহমদ থেকে ফিকহী বিধান খুঁজে বের করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত; কারণ এতে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস নেই। একই বিষয়ের অনেক হাদীস বারবার এসেছে। তবে আলাদা আলাদা সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস জানার জন্য মুসনাদে আহমদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য উৎস আর পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলতেন:

“আমি মুসনাদকে সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস (অর্থাৎ সূত্র ও সনদ) থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেছি।”

তিনি মুসনাদকে একটি মৌলিক ইসলামী উৎসের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো হাদীস নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। যদি হাদীসটি এতে পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়।

ইমাম আহমদ (রহ.) এই মানদণ্ডে মুসনাদকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজ করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়; ফলে এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রায় দুইশ সাহাবী কিরামের বর্ণনা, যা বুখারী ও মুসলিম-এ রয়েছে, মুসনাদে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও মুসনাদে আহমদ শরীয়তের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী; কারণ এটি এমন একজন ফকীহ ও মুজতাহিদের ইলমী শাহকার, যার ওপর পুরো উম্মতের আস্থা রয়েছে। [১]

উত্তরাধিকার ও হত্যাকাণ্ড

২৩৫ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল তাঁর তিন পুত্র: মুনতাসির, মুতায এবং মুআইয়্যাদকে একের পর এক উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। অতীতেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাপনা এবং গৃহযুদ্ধের কারণ হয়েছিল। এবার এই সিদ্ধান্তের খেসারত মুতাওয়াক্কিলকে নিজেকেই দিতে হলো। উত্তরাধিকারের এই বিন্যাস ঠিক করার কয়েক বছর পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পুনর্বিবেচনা করেন। আসলে মুনতাসির তাঁর দাদার মতো মুতাযিলা এবং শিয়া উলামাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাঁর পিতার ধর্মীয় নীতি অপছন্দ করতেন। মুতাওয়াক্কিলও তাঁর পুত্রের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন; তাই তিনি তাকে সরিয়ে মুতাযকে প্রথম উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

মুনতাসির এটি সহ্য করতে পারেননি। তিনি কিছু তুর্কী আমীরকে সাথে নিয়ে মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ৫ শাওয়াল ২৪৭ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল তাঁর উযীর ফাতহ বিন খাকানের সাথে বসে ছিলেন এমতাবস্থায় পাঁচজন তুর্কী আমীর উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁরা মুতাওয়াক্কিল এবং ফাতহ বিন খাকান উভয়কেই হত্যা করেন। এভাবে ইসলামী ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো যে, ক্ষমতার লোভে পুত্র তার পিতার রক্তে হাত রাঙালো।

মুতাওয়াক্কিলের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি চৌদ্দ বছর দশ মাস শাসন করেন। মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে অনেক ভূমিকম্প, আসমানী বিপদ এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রকাশ পায়। সম্ভবত এগুলো এই ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, খিলাফতে ইসলামিয়ার ওপর এক দীর্ঘ পতনের যুগ শুরু হতে যাচ্ছে, যার শেষে উম্মত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। [২]

[১] ফাতহুল মুগীস: ১/১১৮; তাদরীবুর রাবী: ১/১৮৮, ১৮৯।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ২৪৭ হিজরী।

সুসংবাদ

মুতাওয়াঙ্কিলকে মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখলেন এবং অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন:

“আল্লাহ সুন্নাতকে জীবিত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” [১]

সেই যুগের বসরার কাজী ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ তাইমী (রহ.)-এর উক্তি হলো:

“তিনজন খলিফা এক মহান কীর্তি স্থাপন করেছেন: একজন হযরত আবু বকর (রা.), যিনি ইরতিদাদের ফিতনা দমন করেছেন। দ্বিতীয়জন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.), যিনি উম্মতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং এর সংস্কার করেছেন। তৃতীয়জন মুতাওয়াঙ্কিল, যিনি বিদআত মিটিয়ে সুন্নাতকে জীবিত করেছেন।” [২]

মিথ্যা বর্ণনা:

যেহেতু মুতাওয়াঙ্কিল সুন্নাতের সমর্থক এবং বিদআত ও রাফয থেকে বিমুখ ছিলেন; তাই শিয়া ঐতিহাসিকরা তার চরিত্র হননে কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাকে ভোগবিলাসী, কামুক, গান-বাজনা ও মদ-কাবাবে অভ্যস্ত এবং জালিম ও স্বৈরাচারী হিসেবে প্রসিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা হলো তিনি এই ধরনের নিচু কাজ থেকে দূরে ছিলেন। মাকবারায়ে হুসাইন ধ্বংস করা ছাড়া তার ওপর লাগানো অধিকাংশ অভিযোগই প্রোপাগান্ডা বলে মনে হয়। গবেষকদের মতে তিনি জালিম ও স্বৈরাচারী ছিলেন না বরং সাধারণত কোমলতা ও দয়ার অভ্যস্ত ছিলেন। মুতাওয়াঙ্কিল এই বাস্তবতা ভালোভাবেই জানতেন যে, জোরপূর্বক করানো আনুগত্য স্থায়ী হয় না। আসল সমর্থন হলো তা যা জনগণের মন জয় করে অর্জন করা হয়। নিজের এই নীতি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেন: “পূর্ববর্তী খলিফারা জনগণের ওপর কঠোরতা করতেন যাতে তাদের অনুগত রাখা যায়, আমি তাদের সাথে কোমলতা প্রদর্শন করি যাতে তারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার কথা মানে।” [৩]

খতমে কুরআনের অনুষ্ঠান:

মুতাওয়াঙ্কিল ইলম এবং উলামাদের বড় কদরদান ছিলেন। তার পুত্র মুতায যখন কুরআন মাজীদ হিফজ সম্পন্ন করল, তখন সেই খুশিতে এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো যাতে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক বিশাল সংখ্যা অংশগ্রহণ করল। যখন শাহজাদা এসে মিস্বরে বসলেন এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন, তখন উপস্থিতদের ওপর এক লক্ষ দিনার মূল্যের হীরা, এক লক্ষ আশরাফী এবং দশ লক্ষ দিরহামের বৃষ্টি বর্ষণ করা হলো। খেলাত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য পুরস্কারের কোনো হিসাবই ছিল না। শাহজাদার মা এবং তার উস্তাদ মুহাম্মদ বিন ইমরান (রহ.)-কে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হলো এবং তাদের হীরা-জহরত ও সোনা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হলো। [৪]

আসল সুখী কে?:

মুতাওয়াঙ্কিলের দূরদর্শিতার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যায় যে, তিনি হুকুমতের শান-শওকতকে বড় কিছু মনে করতেন না।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫৮

[২] তারিখে বাগদাদ: ৭/১৭৯, ১৮০, ত. ইলমিয়াহ

[৩] তারিখুল খুলাফা: পৃ. ২৫৬

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৭০৫

তাঁর মতে প্রকৃত ঈর্ষণীয় জীবন ছিল সাধারণ মানুষের। শাসন ও রাজনীতির ঝামেলাগুলোকে তিনি পুরোপুরি ফিতনা এবং মাথাব্যথা মনে করতেন। একবার তাঁর উজির ফাতহ বিন খাকান তাঁকে চিন্তিত দেখে বললেন:

“আপনার চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদার অধিকারী পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তবে এই চিন্তা কিসের?”

মুতাওয়াঙ্কিল উত্তর দিলেন: “আমার চেয়ে অনেক বেশি সুখী সেই ব্যক্তি যার একটি প্রশস্ত ঘর আছে, একজন নেককার স্ত্রী আছে এবং তার জীবিকা সহজলভ্য। সে আমাদের চেনে না যে আমরা তাকে কষ্ট দেব, আর সে আমাদের মুখাপেক্ষীও নয় যে আমরা তাকে তুচ্ছজ্ঞান করব।” [১]

উত্থান যুগের শেষ খলিফা:

মুতাওয়াঙ্কিল আব্বাসীয়দের উত্থান যুগের শেষ খলিফা ছিলেন। তাঁর অবস্থা পড়ার মাধ্যমে আমরা উম্মাহর ইতিহাসের একটি বড় পর্যায় অর্থাৎ ‘বনু আব্বাসের উত্থান যুগ’-এর অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছি।

এরপর আব্বাসীয় খিলাফত অত্যন্ত দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয় এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত শাসকরা সবদিকে একাধিপত্য কায়েম করে নেয়। বাতিল দলগুলো তাদের দাঈদের ছড়িয়ে দেয় এবং জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ শুরু হয়। বহিঃশক্তিগুলো মুসলমানদের দুর্বল দেখে একের পর এক আক্রমণ শুরু করে এবং অতীতের বিপরীতে তারা অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে। মুতাওয়াঙ্কিলের মৃত্যু পর্যন্ত ইরাক, পারস্য, সিন্ধু, সিরিয়া, আল-জাজিরা, হিজাজ, মিশর, আজারবাইজান, মাওয়ারাননহর এবং এশিয়া মাইনরের বিজিত শহরগুলো সরাসরি খিলাফত দরবারের অধীনে ছিল, যেখানে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চলের ওপর প্রভাবশালী তাহিরি রাজবংশ এবং তিউনিসিয়ায় আগলাবি রাজবংশ খিলাফত দরবারের অধীনস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। মুতাওয়াঙ্কিলের পরেও কিছুকাল এই ভৌগোলিক অবস্থা বজায় ছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই এর অধিকাংশ এলাকা খিলাফত থেকে স্বাধীন হয়ে যায় এবং সেগুলোর ওপর আব্বাসীয় খিলাফতের বিরোধীরা দখলদারিত্ব কায়েম করে।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৬৫৭

নোট: ফাতহ বিন খাকান মুতাওয়াঙ্কিলের উজির ছিলেন এবং তাঁর সাথেই নিহত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি এবং জীবনীকার ছিলেন। ‘কালাইদুল উকিয়ান’ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা যা আজও বিদ্যমান। এতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী হৃদয় ও অন্তর্মিলযুক্ত গদ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং আবাসীয় খিলাফত

আবাসীয়দের উত্থানকালেই ইসলামী ইতিহাসে এই বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল যে, একটি ঐক্যবদ্ধ ও বিশাল রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সরকারগুলোর মধ্যে কিছু আবাসীয় খিলাফতের অনুগত ছিল, যেমন তাহিরি রাষ্ট্র এবং আগলাবি রাষ্ট্র। কিছু সরকার ছিল বিরোধী, যেমন ইদ্রিসি রাষ্ট্র এবং আন্দালুস আমিরাত। এরপর ইসলামী ইতিহাসের অবশিষ্ট বারো শতাব্দীতে সমস্ত মুসলিম দেশ কখনো একটি খিলাফত বা একটি সরকারের অধীনে আসতে পারেনি। এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ ও উৎস কী ছিল? এটি কি মুসলমানদের দুর্বলতা ছিল নাকি শত্রুদের ষড়যন্ত্র? পরিস্থিতির চাপ ছিল নাকি তৎকালীন রাজনীতির দাবিও ছিল? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ফিকহী ও ঐতিহাসিক উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট গবেষণার দাবি রাখে। তবে আমরা এখানে সংক্ষেপে এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণনা করব।

ইতিহাসের শিক্ষা হলো এই যে, একটি বিশাল এবং বিশ্বজনীন ধরনের সরকার গঠন করা এবং তারপর তা টিকিয়ে রাখা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন:

- ১. জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চেতনা বিদ্যমান থাকে।
- ২. শৃঙ্খলা চমৎকার হয়।
- ৩. কেন্দ্রের সামরিক শক্তি পরিপূর্ণ থাকে।
- ৪. আর্থিক অবস্থা মজবুত হয়।

উমাইয়া হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সময় পর্যন্ত এই নিয়ামতগুলো অনেকাংশে বিদ্যমান ছিল, তাই খিলাফত বিশ্বজনীন ছিল। কিন্তু হিশামের পর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়, বিভেদের সুপ্ত স্ফুলিঙ্গগুলো জ্বলে উঠে ঐক্য ও সংহতির পরিবেশকে ছাই করে দেয়, আরব গোত্রগুলোর গৃহযুদ্ধ সামরিক শক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেয়; ফলে দেখতে দেখতে উমাইয়া সরকার অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়।

বনু আব্বাসের উত্থানকালেও আমরা এই উদাহরণগুলোর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। সাফফাহ এবং মনসুর ছিলেন শক্তি ও প্রতাপের প্রতীক, অন্যদিকে মাহদী এবং হারুনুর রশীদ শক্তির পাশাপাশি জনগণের ভালোবাসায়ও সিক্ত ছিলেন। মানুষ সাধারণভাবে শান্তি-নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার লাভ করত। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। এই বিষয়গুলো বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বড় বড় জায়গির লাভ, উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে পদোন্নতি এবং অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ আহরণের এক অপছন্দনীয় রুচি তৈরি করে দিয়েছিল। এই ধরনের প্রবণতা পদলিপ্সা, কেন্দ্রবিমুখতা, হাস্পাসা এবং বিদ্রোহের জন্ম দেয়। কিছু ধর্মীয় লোক এবং আলভী ব্যক্তিবর্গ নেক নিয়তেও এ জাতীয় প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসেন। এভাবে বারবার সংঘটিত বিদ্রোহ এবং তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিল যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা এখন আর এই যোগ্য নয় যে তারা একটি বিশ্বজনীন খিলাফতের ভার বহন করতে পারে।

এটা স্পষ্ট ছিল যে, এই পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির বাঁধন সামান্য শিথিল হতেই আবাসীয় খিলাফতের সেই পরিণতিই হতো যা বনু উমাইয়ার হয়েছিল, এবং এক শতাব্দীর মধ্যেই তাই হলো যে, মুসলিম বিশ্বে প্রায় এক ডজন সরকার গঠিত হয়ে গেল।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বনু আব্বাসের যুগে যতক্ষণ পর্যন্ত আঞ্চলিক সরকারগুলো গঠিত হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক সরকার গঠনের আশ্রয় চেষ্টা বারবার হতে থাকে। খেলাফতের এমন দাবিদারদের মধ্যে হাশেমী ব্যক্তিবর্গই শীর্ষে ছিলেন। আমরা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতের অধীনে বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, বনু হাশেমের সাথে শিয়াদের ইমামত সংক্রান্ত আকিদার কোনো সম্পর্ক ছিল না, বরং তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি যখনই ইমামতের দাবি করে বিদ্রোহ (খুরুজ) করেছেন, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের যুগে প্রায় ৬৫টি এমন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, যার মধ্যে ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনো আন্দোলন সফল হয়নি। স্বয়ং ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন হাশেমী বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অসাধারণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মরক্কো ও আলজেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত তার রাজ্যটি সোয়া শতাব্দী পর মাত্র কয়েকটি দুর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য ১৩৮ হিজরিতে গঠিত আন্দালুসের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রটি এর প্রতিষ্ঠা থেকে পতন পর্যন্ত একটি পৃথক রাষ্ট্রের রূপেই বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয়, বরং বনু আব্বাসের পতনের যুগে আমির আব্দুর রহমান তৃতীয় আন্দালুসে পৃথক খেলাফতের ভিত্তিও স্থাপন করেছিলেন।

এমতাবস্থায় আব্বাসী খলিফাদের কাছে এই সরকারগুলোকে মেনে নেওয়া এবং তাদের সাথে যথাযথ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা অথবা অন্ততপক্ষে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। যদি স্বাধীন শাসকদের যেকোনো মূল্যে অনুগত করার চেষ্টা করা হতো, তবে শত্রুতা কখনো শেষ হতো না এবং রক্তপাত সর্বদা চলতেই থাকত। এই সংঘাতের ফলে স্বয়ং খেলাফতও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারত।

ফকীহ-এ-শাম, ইমাম আওযাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৮৮ হি. হতে ১৫৭ হি.)

ইমাম আওযাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের একজন মহান ফকীহ ছিলেন। তিনি ৮৮ হিজরিতে বালবাকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবদুর রহমান বিন আমর। দামেস্কের একটি শহরতলী “আওযা” এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে “আওযাঈ” বলা হতো। ইমাম আবু যুরআ দিমাস্কি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, তিনি বংশগতভাবে সিন্ধি ছিলেন, সেখানকার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সিরিয়ায় এসেছিলেন এবং “আওযা”-তে অবস্থান করেছিলেন। [১]

তিনি সাহাবায়ে কেরামের যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর শৈশব পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন, তখন আরবের একজন প্রধান (রইস) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্য শিশুরা ভয়ে পালিয়ে গেলেও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই প্রধান ব্যক্তি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তাঁকে ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করে ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে ইয়ামামায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর যোগ্যতায় ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও সন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে ধন্য করার পর বসরায় পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে তিনি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খিদমতে যান, যিনি তখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কয়েকদিন পর মুহাম্মদ বিন সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। [২]

এরপর তিনি নাফে মাওলা উমর, আমর বিন শুআইব, আলকামা বিন মারসাদ, মায়মুন বিন মাহরান, ইবনুল মুনকাদির এবং ইবনে শিহাব যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। যখন তিনি শিক্ষকতার আসনে বসলেন, তখন ইমাম মালিক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, আবু ইসহাক আল-ফাযারী, বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদ, বাকিয়্যাহ বিন মুসলিম এবং ইয়াহইয়া আল-কাত্তান-এর মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁর ছাত্রদলের অন্তর্ভুক্ত হন। [৩]

তিনি ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি অনেক বড় আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। তাঁর রাতগুলো নফল নামাজে কুরআন তিলাওয়াত এবং কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো। তাঁর সিজদাহর স্থান চোখের পানিতে ভিজে যেত। [৪]

১৫০ হিজরিতে তাঁর সাথে হজের সফরকারী একজন হাজির বর্ণনা হলো যে, সফর চলাকালীন তিনি তাঁকে দিন বা রাতে কখনো ঘুমাতে দেখেননি। তিনি নামাজ পড়তে থাকতেন। যখন ঘুম আসত, তখন উটের জিনের সাথে হেলান দিতেন। [৫]

তাঁর ওয়াজ ও বাণীসমূহ আত্মশুদ্ধি এবং আখেরাতের চিন্তার শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে ছিল। একবার ওয়াজ করার সময় তিনি বললেন:

[১] আল-আলাম যিরিকলী: ৩/৩২০, মাশাহীর উলামাউল আমসার লি-ইবনে হিব্বান, পৃ. ২৮৫ (যদিও মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর আসল সম্পর্ক ছিল “হামদান” গোত্রের শাখা “আওযা” এর সাথে। (তাবাকাত ইবনে সা’দ: ৭/৪৮৮, ত. সাদির)

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১১০, ১১১

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১২০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১০৮

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১১৯

ফকীহ শাম, ইমাম আওয়াঈ রহমাতুল্লাহ (৮৮ হি. হতে ১৫৭ হি.)

ইমাম আওয়াঈ রহমাতুল্লাহ দ্বিতীয় হিজরি শতকে ইসলামি বিশ্বের একজন মহান ফকীহ ছিলেন। তিনি ৮৮ হিজরিতে বালবাকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবদুর রহমান বিন আমর। দামেস্কের একটি শহরতলী ‘আওয়া’ এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে ‘আওয়াঈ’ বলা হতো। ইমাম আবু যুরআ দামেশকী রহমাতুল্লাহ বলেন যে, তিনি বংশগতভাবে সিক্কি ছিলেন, সেখানকার বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি শামে এসেছিলেন এবং ‘আওয়া’ তে অবস্থান করেছিলেন। [১]

তিনি সাহাবীদের যুগ পেয়েছিলেন যদিও তাঁদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর শৈশব পিতৃহীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন এমন সময় আরবের এক প্রধানের সেখান দিয়ে যাতায়াত হলো। অন্য শিশুরা ভয়ে পালিয়ে গেলেও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই প্রধান অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তাঁকে ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত করে ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর রহমাতুল্লাহ-এর নিকট ইয়ামামায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর যোগ্যতায় ইয়াহইয়া বিন আবি কাসীর রহমাতুল্লাহ-ও সন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের ইলম দ্বারা তাঁকে উপকৃত করার পর তাঁকে বসরায় পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে তিনি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন সিরীন রহমাতুল্লাহ-এর খিদমতে গেলেন যিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কয়েক দিন পর মুহাম্মদ বিন সিরীন রহমাতুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। [২]

এরপর তিনি নাফে মাওলা উমর, আমর বিন শুআইব, আলকামা বিন মারসাদ, মাইমুন বিন মাহরান, ইবনুল মুনকাদির এবং ইবনে শিহাব যুহরীর মতো ব্যক্তিত্বদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। যখন তিনি দরসের মসনদে বসলেন, তখন ইমাম মালিক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, আবু ইসহাক আল-ফাযারী, বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদ, বাকিয়্যাহ বিন মুসলিম এবং ইয়াহইয়া কাত্তানের মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁর ছাত্রদলে অন্তর্ভুক্ত হন। [৩]

তিনি ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি বড় আবেদ ও যাহেদও ছিলেন। তাঁর রাত নফল নামাজে কুরআন তিলাওয়াত ও কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো। তাঁর সিজদাহর স্থান চোখের পানিতে ভিজে যেত। [৪]

১৫০ হিজরিতে তাঁর সাথে হজ্জের সফরকারী এক হাজীর বর্ণনা হলো যে, সফর চলাকালীন তাঁকে দিন বা রাতে কখনো ঘুমাতে দেখা যায়নি। তিনি নামাজ পড়তে থাকতেন। যখন ঘুম আসত তখন উটের জিনের সাথে হেলান দিতেন। [৫]

তাঁর ওয়াজ ও বাণীসমূহ আত্মশুদ্ধি ও আখিরাতে চিন্তার শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে হতো। একবার ওয়াজ চলাকালীন তিনি বললেন:

[১] আল-আলাম যিরিকলী: ৩/ ৩২০; মাশাহীর উলামাউল আমসার লি-ইবনে হিব্বান, পৃ. ২৮৫। যদিও মুহাম্মদ বিন সা’দ-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর সম্পর্ক ছিল হামদান গোত্রের শাখা ‘আওয়া’ এর সাথে। (তাবাকাত ইবনে সা’দ: ৭/ ৪৮৮, ত. সাদির)

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/ ১০৭, ১১১

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/ ১২০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/ ১০৮

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/ ১১৯

“হে লোকসকল! আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যা তিনি প্রজ্বলিত করেছেন, যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তোমরা এমন এক স্বদেশে আছো যেখানে অবস্থানের সময়কাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তোমরা প্রস্থানকারী। তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে যারা দুনিয়ার চাকচিক্য দেখেছিল। তারা তোমাদের চেয়ে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, তোমাদের চেয়ে অধিক সুঠামদেহী এবং তোমাদের চেয়ে অধিক অট্টালিকা নির্মাণকারী ছিল। তারা পাহাড় বিদীর্ণ করেছিল এবং দেশসমূহে রাজত্ব করেছিল। তারা প্রভাবশালী এবং কঠোর পাকড়াওকারী ছিল। তাদের দেহ ছিল শুভের ন্যায়, কিন্তু দিন ও রাত অতিবাহিত হতে থাকল যতক্ষণ না তাদের আয়ু শেষ হয়ে গেল, তাদের চিহ্নসমূহ মুছে গেল, আবাসস্থলগুলো উজাড় হয়ে গেল এবং তাদের আলোচনাও বিস্মৃত হয়ে গেল।” [১]

তিনি বলতেন: “ইলম তাই যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত। যা তাঁদের থেকে বর্ণিত নয়, তা ইলম নয়।”

তিনি বলতেন: “উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মহব্বত কেবল সেই সব মানুষের অন্তরেই একত্রিত হয় যারা মুমিন।” [২]

একবার বললেন: “আল্লাহ যখন কোনো জাতির অমঙ্গল চান, তখন তাদের জন্য বাদানুবাদের দরজা খুলে দেন এবং তাদের আমল থেকে বিরত রাখেন।” [৩]

তাঁর এই বাণীও রয়েছে: “মুমিন কম কথা বলে এবং বেশি আমল করে। মুনাফিক বেশি কথা বলে এবং কম আমল করে।”

তিনি বলতেন: “যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে, তার থেকে তাকওয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়।”

তাঁর বক্তব্য ছিল: “যে ব্যক্তি আলেমদের বিরল ও বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহের অনুসরণ করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।” [৪]

তিনি বলতেন: “যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে, তার জন্য অল্প জিনিসই যথেষ্ট হয়ে যায়।” [৫]

তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়ন, মাঝারি উচ্চতা ও গন্দমী বর্ণের মানুষ। দাড়িতে মেহেদি লাগাতেন। আপাদমস্তক গান্ধীর্যপূর্ণ ছিলেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। কথা বললে মুক্তো ঝরতো। তাঁকে যারা দেখতেন তারা বলতেন:

“তাঁদের থেকে কখনো কোনো নিরর্থক শব্দ শোনা যায়নি, ঠিক ততটুকুই বলতেন যতটুকু শ্রোতাদের প্রয়োজন হতো। কখনো তাঁকে অট্টহাসি দিতে দেখা যায়নি। যখন তিনি আখিরাতে আলোচনা করতেন, তখন মজলিসে এমন কেউ থাকতো না যার ওপর ক্রন্দন ও কোমলতা আচ্ছন্ন হতো না।” [৬]

তিনি শাসকদের সামনে সত্য কথা বলতে কোনো কিছু পরোয়া করতেন না। তিনি নিজের চোখে বনু উমাইয়ার পরাজয় এবং বনু আব্বাসের বিজয়ের দৃশ্য দেখেছিলেন। যখন আবুল আব্বাস সাফফাহ-এর চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী দামেস্ক দখল করে উমাইয়া আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্মমভাবে হত্যা করেন, তখন ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানেই ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আলী এই ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে বৈধতার ফতোয়া নেওয়ার জন্য তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। সে সময় সে নিজে একটি সিংহাসনে বসে ছিল। তার ডানে-বামে সশস্ত্র ব্যক্তিদের চারটি দল ছিল। একটি দল নগ্ন তলোয়ার উঁচিয়ে ছিল।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১১৭/৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২১/৭

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২২/৭

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১১০, ১১১/৭

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২০/৭

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২৫/৭

তাওয়াহীহে মিল্লাতে মুসলিমা

দ্বিতীয় দলটি কুঠার হাতে ছিল। তৃতীয় দলের কাছে বড় বড় লাঠি ছিল। চতুর্থ দলের হাতে হাতুড়ি ছিল। দুইজন সৈন্য ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বাহু ধরে ফেলল এবং তাঁকে আবদুল্লাহ বিন আলীর সামনে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে দিল।

আবদুল্লাহ বিন আলী জিজ্ঞেস করলেন: “তুমিই কি আবদুর রহমান বিন আমর আওয়ামী?”

তিনি বললেন: “আল্লাহ আমিরকে শান্তিতে রাখুন। আমিই সেই।”

আবদুল্লাহ বিন আলী প্রশ্ন করলেন: “বনু উমাইয়াদের রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে তুমি কী বলো?”

ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “আপনার এবং বনু উমাইয়াদের মধ্যে কিছু অঙ্গীকার ও চুক্তি ছিল।”

আবদুল্লাহ বিন আলী রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি আমাকে এবং তাদেরকে এমন লোক মনে করো যাদের মধ্যে কোনো চুক্তি নেই।”

ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে, আমি তাঁর মতো এমন মুখফোড় মানুষ কখনো দেখিনি। আমার নফস তখন নিহত হওয়া পছন্দ করছিল না, কিন্তু আমি আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি সত্যই বলব। আমি নিজেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত করে নিলাম এবং উত্তর দিলাম: “তাদের রক্ত আপনার জন্য হারাম।”

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বিন আলীর চোখ লাল হয়ে গেল। রগগুলো ফুলে উঠল। তিনি চিৎকার করে বললেন: “তুমি ধ্বংস হও! কেন শুনি?”

তিনি বললেন: “কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল নয়।” [১]

আবদুল্লাহ বিন আলী বললেন: “তোমার সর্বনাশ হোক! দ্বীনি দিক থেকে খিলাফত কি আমাদের অধিকার নয়?”

ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করলেন: “তা কীভাবে?”

আবদুল্লাহ বিন আলী বললেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য খিলাফতের ওসিয়ত করেননি?”

ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “যদি এই ওসিয়ত করা হতো, তবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাকামাইন নিযুক্ত করতে রাজি হতেন না।”

অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ বিন আলী বললেন: “আমাকে খিলাফত সম্পর্কে বলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের সম্পর্কে ওসিয়ত করেছিলেন?”

ইমাম আওয়ামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন: “যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করতেন, তবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কাউকে সেই ওসিয়তের লঙ্ঘন করতে দিতেন না।”

আবদুল্লাহ বিন আলী জিজ্ঞেস করলেন: “বনু উমাইয়াদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে তুমি কী বলো?”

[১] পূর্ণ হাদিসটি হলো: ‘লা ইয়াহিল্লু দামু ইমরিইন মুসলিমিন ইল্লা বি ইহদা সালাসিন: আস-সায়্যিবুয যানি, ওয়ান-নাফসু বিন-নাফসি, ওয়াত-তারিকু লি-দীনিহিল মুফারিকু লিল-জামাআহ।’ “তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত (ঝরানো) বৈধ নয়: বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে, প্রাণের বদলে প্রাণ এবং যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন ত্যাগ করে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়)।” (সহীহ বুখারী, বাবুত দিয়াত)

তিনি বললেন: “যদি সেই ধন-সম্পদ তাদের কাছে হালাল উপায়ে থেকে থাকে, তবে তা তোমাদের জন্য হারাম। আর যদি তাদের কাছে হারাম উপায়ে থেকে থাকে, তবে তা তোমাদের জন্য আরও বেশি হারাম।”

আবদুল্লাহ বিন আলী চুপ হয়ে গেল কিন্তু সে রাগে ফুঁসছিল। সে হাত দিয়ে সৈন্যদের ইশারা করল যেন তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইমাম আওজায়ী রহ. বলেন যে, ফিরে আসার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহুর্তে আমার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। আমি ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একজন অশ্বারোহী দ্রুত আমার পিছু নিল। আমি মনে মনে বললাম, সে আমার মাথা কাটতে এসেছে। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে শেষ সালাতের জন্য তাকবীর বলে দিলাম। অশ্বারোহী অপেক্ষা করতে লাগল। যখন আমি সালাম ফেরালাম, তখন সে সালাম করল এবং স্বর্ণমুদ্রার একটি খলি পেশ করে বলল: এটি আমীর আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। ইমাম আওজায়ী রহ. বলেন যে, বাড়ি পৌঁছানোর আগেই আমি সেই সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে দিয়েছিলাম। [১]

মোটকথা, ভয় ও আতঙ্কের এমন পরিবেশও তাঁকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। একবার খলিফা মনসুর তাঁকে লিখলেন যে আমাকে কোনো নসিহত লিখে পাঠান। ইমাম আওজায়ী রহ. উত্তর দিলেন:

“আমি আপনাকে তাকওয়া এবং বিনয়ী হওয়ার ওসিয়ত করছি। আল্লাহ যেদিন অহংকারী লোকদের লাঞ্ছিত করবেন, সেদিন তিনি আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। মনে রাখবেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আত্মীয়তার কারণে আপনার ওপর আল্লাহর হুক এবং তাঁর আনুগত্য আরও বেশি ওয়াজিব হয়ে যায়।” [২]

ইমাম আওজায়ী রহ. জীবনের অধিকাংশ সময় বৈরুতে কাটিয়েছেন এবং সেখানেই ১৫৭ হিজরির সফর মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর যুগে সিরিয়াবাসীদের ফিকহী ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বাদশাহদের চেয়ে কম ছিল না। সেই যুগের কিছু ফকিহ বলতেন যে তিনি খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। [৩] তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর ফতোয়ার সংখ্যা সত্তর হাজার পর্যন্ত বলা হয়। [৪]

ইমাম আওজায়ী রহ. মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) রেওয়ায়েত এবং সিরিয়াবাসীদের মারাসিল থেকেও দলিল গ্রহণ করতেন; এই কারণে আইন্ম্যায়ে আরবা’র ফিকহের সামনে তাঁর ফিকহের প্রদীপ বেশিদিন জ্বলতে পারেনি। যদিও আমীর আবদুর রহমান আউয়ালের যুগ পর্যন্ত আন্দালুসে তাঁরই ফিকহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু হিশাম আর-রাজির যুগে সেখানে মালেকী ফিকহের প্রচলন শুরু হয়। ফিকহে আওজায়ী ধীরে ধীরে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে ইলমি আলোচনায় এখনও ইমাম আওজায়ী রহ.-এর উক্তি ও ফতোয়াসমূহ উল্লেখ করা হয়। [৫]

[১] তারিখু দামেশক: ৩৫/৭৯, ৩৫/২১২, সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১২৪, ১২৫, ১২৮, ১২৯। এই ঘটনাটি তিনটি ভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যেগুলোকে লেখক একটি প্রেক্ষাপটে একত্রিত করেছেন। একটি রেওয়ায়েত ইয়াকুব বিন শায়বার, দ্বিতীয়টি সুলাইমান বিন আবদুর রহমানের। তৃতীয় রেওয়ায়েতটি হাকিমের। হাফেজ যাহাবী এবং আল্লামা ইবনে আসাকির এগুলোকে নিজ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১২৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১১৩

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১১১

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১১৪, ১১৭

ইমাম দারুল হিজরাহ..... মালিক বিন আনাস রহমাতুল্লাহ (৯৩ হি. - ১৭৯ হি.)

ইমাম মালিক বিন আনাস রহমাতুল্লাহ ইমাম দারুল হিজরাহ উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি ৯৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি সেই বছর ছিল যে বছর হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। [১] ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ তাবা-তাবেয়ী স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা অনেক। শুধু মুয়াত্তার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ১১০ জন। [২] তাঁর ইলমি মজলিস অত্যন্ত গাভীর্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ হতো। বড় বড় ওলামা ও ফকিহগণ এতে শরিক হতেন। [৩]

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ-এর যৌবনকাল রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত অস্থিরতাপূর্ণ ছিল। বনু উমাইয়াদের খেলাফত যা দীর্ঘকাল ধরে পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, দেখতে দেখতে তা শেষ হয়ে গেল এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর বনু আব্বাস ক্ষমতায় এলো। বনু আব্বাসের শুরুর দিকে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ-এর বয়স ৪০ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়েই মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁর দরসের মজলিস চতুর্দিকে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দুনিয়ার কোণায় কোণায় থেকে জ্ঞানপিপাসুরা দলে দলে আসতে শুরু করে। [৪] ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ-এর দ্বীনি দৃঢ়তা এই পর্যায়ের ছিল যে, কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইজতিহাদের আলোকে যে অবস্থানকে সত্য মনে করতেন, তার ওপর অটল থাকতেন। মনসুর আব্বাসীর প্রতাপ ও দাপটে বড় বড় আমীররা কাঁপতেন। সাক্ষাতের সময় তারা তাঁর হস্তচুম্বন করতেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ-এর সাথে দেখা হলে তিনি হস্তচুম্বনের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করতেন। [৫] বড় থেকে বড় জালেমও তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে সরাতে পারত না। নফস জাকিয়ার বিদ্রোহের দিনগুলোতে তিনি তালাকের মাসআলায় একটি হাদিস শুনিয়েছিলেন। হিংসুকরা মদিনার গভর্নর জাফর বিন সুলাইমানকে প্ররোচিত করে যে, ইমাম মালিক এই হাদিস শুনিয়ে এটি প্রমাণ করতে চান যে, শাসকদের বায়াতের কোনো গুরুত্ব নেই। জাফর বিন সুলাইমান এটি শুনে ইমাম মালিককে ডেকে পাঠান এবং কাপড় খুলে চাবুক মারার শাস্তি দেন। এই নির্যাতনে তাঁর কাঁধ স্থানচ্যুত হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেননি। [৬] ইমাম সাহেবের উদারতা ও প্রশস্ত হৃদয়ের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি বলতেন:

“আমি এই লোকদের প্রত্যেককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আত্মীয়তার খাতিরে ক্ষমা করে দিয়েছি।” [৭]

দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়ে হকের ওপর এই অতুলনীয় অটলতার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৪/৭-৮।

[২] মুকাদ্দিমা মুয়াত্তা মালিক, পৃ. ২৮, মুহাম্মদ মোস্তফা আল-আজমি। একটি মত অনুযায়ী ইমাম মালিকের উস্তাদ ও শায়খদের সংখ্যা ৯০০-এর কম নয়, যার মধ্যে ৩০০ তাবেয়ী এবং ৬০০ তাবা-তাবেয়ী ছিলেন।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/৮।

[৪] ওফায়াতুল আইয়ান: ৪/১৩৫।

[৫] আল-ইনতিকা ফি ফাদায়িলিস সালাসাতি আইম্মাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দুল বার, পৃ. ৪২।

[৬] আল-ইনতিকা ফি ফাদায়িলিস সালাসাতি আইম্মাতিল ফুকাহা, ইবনে আব্দুল বার, পৃ. ১১।

[৭] ওফায়াতুল আইয়ান: ৪/১৩৭।

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শাস্তি প্রদানকারী জাফর বিন সুলাইমান বনু আব্বাস থেকে ছিলেন। খানদানে নবুওয়াতের সাথে আত্মীয়তার কথা বিবেচনা করে ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

...এর দরজা খুলে দিলেন, সমগ্র ইসলামি বিশ্বে তাঁর দৃঢ়তা এবং মহত্ত্ব ও চরিত্রের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। [১]

বনু আব্বাসের তৃতীয় খলিফা মাহদী তাঁর পুত্র হারুনুর রশীদ এবং মুসা আল-হাদীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে মাহদী তাঁদেরকে মদিনায় তাঁর অবস্থানস্থলে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তিনি (ইমাম মালিক) অস্বীকার করেন। মাহদী কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইমাম মালিক (রহ.) বলে পাঠালেন: “আমিরুল মুমিনীন! ইলমের অধিকারীদের কাছে উপস্থিত হতে হয়।”

মাহদী বললেন: “সত্য বলেছেন” এবং শাহজাদাদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) তাঁদের শিক্ষা দান করেন। [২]

সে দিনগুলোতে বনু উমাইয়া বংশের অবশিষ্ট সাহসী ব্যক্তির আন্দালুসকে আব্বাসীয় শাসকদের কজা থেকে মুক্ত করে সেখানে স্বায়ত্তশাসিত সরকার কায়েম করেছিল। বনু উমাইয়া বংশের আসল জন্মভূমি ছিল হিজাজ এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল সিরিয়া; তাই হিজাজি ও শামি ফিকহের সাথে তাঁদের অধিক সামঞ্জস্য ছিল। কিছুকাল আগে ইমাম আওয়ামী (রহ.) এই চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় ফকিহ হিসেবে গণ্য হতেন এবং তাঁর পর এখন ইমাম মালিক (রহ.)-এর খ্যাতি ছিল। ফিকহি শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি যখন আব্বাসীয় শাসকদের জুলুম ও নির্যাতনের মোকাবিলায় ইমাম মালিক (রহ.)-এর দৃঢ়তার খবরও আন্দালুসে পৌঁছাল, তখন সেখানকার শাসকরা যারা আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। বিশেষ করে আমির হিশাম আর-রাযীর ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ল যে, তিনি মূল্যবান উপটোকনসহ অনেক দূত ইমাম মালিক (রহ.)-এর খিদমতে পাঠালেন যাতে আপনি স্পেনে এসে আমাদের চক্ষু শীতল করেন। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.) মদিনা মুনাওয়ারায় সমাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখতেন; তাই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অবশেষে হিশাম আর-রাযী আন্দালুসকে মালিকি ইলমে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্দালুসের সেরা মেধাবীদের ইমাম মালিকের খিদমতে ফিকহ অর্জনের জন্য পাঠালেন, যাদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার নাম বিশিষ্ট। ইমাম মালিক (রহ.) তাঁদের বিশেষ মনোযোগের সাথে পড়ালেন। বছরের পর বছর পরিশ্রমের পর যখন এই ব্যক্তির মালিকি ফিকহের ভাণ্ডার নিয়ে আন্দালুসে ফিরে এলেন, তখন আমির হিশাম আর-রাযী তাঁদের বিচার বিভাগ ও সরকারের উচ্চ পদে আসীন করলেন। [৩]

আন্দালুসের আদালতগুলোতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর সংকলন ‘মুয়াত্তা’ মৌলিক মর্যাদা লাভ করে। ধীরে ধীরে আন্দালুসের মুসলমানরা পুরোপুরি মালিকি ফিকহের রঙে রঞ্জিত হয়ে গেল। যেহেতু আন্দালুস এবং উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি অধিকাংশ যুগে একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করত; তাই পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মালিকি ফিকহ উত্তর আফ্রিকা বিশেষ করে আলজেরিয়া এবং মরক্কোতেও সাধারণ হয়ে গেল এবং এই এলাকাগুলো যাদেরকে ইসলামি বিশ্বের ‘মাগরিব’ বলা হয়, মালিকি ফিকহ অনুসরণকারীদের দ্বারা আবাদ হয়ে গেল। [৪]

ইমাম মালিক (রহ.) খলিফা হারুনুর রশীদের যুগে ১৪ই রবিউল আউয়াল ১৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আজও আলজেরিয়া, মরক্কো, সুদান এবং অন্যান্য মুসলিম আফ্রিকান দেশগুলোতে তাঁর ফিকহের অনুসারীরা সংখ্যাগুরু। [৫]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৪/১৩৭, আল্লাহ দার সাদির

[২] নাফহত তীব: ২/৯ থেকে ১২; তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস, ড. খলিল ইব্রাহিম আল-সামাররাঈ, পৃ. ১১১

[৩] তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস, ড. খলিল ইব্রাহিম আল-সামাররাঈ, পৃ. ১১২

[৪] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি: ১৭৯ হিজরি

[৫] হাফেজ যাহাবি এবং আল্লামা ইবনুল আসিরের বক্তব্য হলো, পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর পূর্বে আফ্রিকার আহলে সুন্নাতরা বেশিরভাগই হানাফি মাযহাব অনুসরণ করত। সেখানে মালিকি ফিকহের প্রাধান্য পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে মুইয বিন বাদিসের অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলে হয়েছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮/১৪০, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৯০৫)

প্রথম প্রধান বিচারপতি... ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৯৩ হি.-১৮২ হি.)

ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সবচেয়ে মেধাবী, যোগ্য এবং গর্ব করার মতো ছাত্র ছিলেন। তিনি ৯৩ হিজরিতে (৭১৩ খ্রি.) কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম। তিনি হযরত সাদ বিন হাব্বাহ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন, যিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। [১] শৈশব থেকেই তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর পিতা তাঁকে শৈশবেই কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করেছিলেন। আবু ইউসুফ ঘর থেকে কাজের জন্য বের হতেন, কিন্তু পথে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির দরস দেখে সেখানে থেমে যেতেন। পিতা যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে অভিযোগ করলেন। ইমাম সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন এবং কিশোর আবু ইউসুফের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। [২]

ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। জ্ঞান অর্জনে তিনি এমন সাধনা করেছিলেন যে বড় বড় ব্যক্তির অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর ওপর মায়ের সেবা এবং পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্বও ছিল, কিন্তু এই বাধ্যবাধকতাগুলো তাঁর জ্ঞানচর্চায় কখনো বাধা হতে পারেনি। তাঁর এই বিস্ময়কর পরিশ্রম, সাধনা এবং নিয়মানুবর্তিতা তাঁকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল যে তাঁর শিক্ষকও তাঁর জন্য গর্ব করতেন। [৩]

একবার ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় আলেম। [৪] এই কারণেই ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন এবং ফিকহ মজলিসের জৌলুস আরও বৃদ্ধি পায়। [৫] খলিফা মনসুরের পর যখন মাহদির শাসনকাল আসে, যিনি একজন দানশীল, ধৈর্যশীল এবং উদার মানুষ ছিলেন, তখন ইসলামি বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ ছিল। সরকার জ্ঞান ও গুণীজনদের কদর করছিল। আলেম ও বিচারকদের সরকারি চাপ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সেই দিনগুলোতে ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বাগদাদের পূর্ব জেলার বিচারকের (কাজী) পদ প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেহেতু এখন বিচার বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার হয়েছিল, তাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই পদ গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে চলে আসেন। [৬]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩/৩৭৮, ৩৭৯... মা'দান বিন হাব্বাহ-কে সাদ বিন হাব্বাহ-ও বলা হয়। তিনি আনসারদের মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাব্বাহ তাঁর মা এবং মা'দান তাঁর পিতা। গাজওয়ায়ে খন্দকের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আত-তবাকাতুল কুবরা: ৬/৫২১, দার সাদির।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ৬/৩৮০... একটি বর্ণনা অনুযায়ী অভিযোগকারী তাঁর পিতা ছিলেন না বরং তাঁর মা ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী আবু ইউসুফ এতিম ছিলেন এবং তাঁর মা অভিযোগ করেছিলেন। ইমাম সাহেব জবাব দিয়েছিলেন: “সে ফালুদা এবং পেস্তা তেলের সাথে রুটি খাচ্ছে।” অর্থাৎ এমন জ্ঞান অর্জন করছে যা তাকে এই নেয়ামতগুলো দান করবে। মানাকিব আবি হানিফা লি-মুয়াফফাক মাক্কি: ২/২১৩।

[৩] মানাকিব আবি হানিফা, মুয়াফফাক মাক্কি: ১/২১৫।

[৪] ওফায়াতুল আইয়ান: ১৪/২৪৯।

[৫] ওফায়াতুল আইয়ান: ৬/৩৭৯।

[৬] আত-তবাকাতুল কুবরা: ৭/৩৩০, দার সাদির; আখবারুল কুজাত লি-ইবনুল হাইয়ান আল-বাগদাদি: ৩/২৫৬।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর কাজীর পদ গ্রহণ করা ছিল ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সেই ইলমি ও বিপ্লবী সংগ্রামের পূর্ণতার জন্য, যা দীর্ঘকাল ধরে সরকার ও পদমর্যাদা থেকে দূরে থেকে ইসলামী বিধানের ফিকহি সংকলনের আকারে অব্যাহত ছিল। এই ইলমি মিশনের প্রভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শুধু ফকিহ ও কাজীরাই নন, বরং শাসক ও রাজপুত্ররাও এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অতএব সেই সময় এসে গিয়েছিল যখন ইসলামী বিধান ও আইনের এই সুবিন্যস্ত রূপকে আদালতগুলোতে প্রচলিত করা প্রয়োজন ছিল। এটি ছাড়া মুতাজিলা, যিনদিক এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলগুলোর প্রভাব খর্ব করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ফলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বিচার বিভাগের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার খিদমত পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। কাজীর পদ গ্রহণের একটি ফায়দা এই হয়েছিল যে, তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিমণ্ডল থেকে অনেক বেশি প্রশস্ত এমন একটি ময়দান পেয়ে গেলেন যেখানে প্রতিনিয়ত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও শাসকদের বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হতে হতো। এই পরিস্থিতিতে তিনি ভালো সুযোগ পেলেন যে, তিনি ইসলামী ফিকহকে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করে এমন একটি ব্যবস্থা বিন্যস্ত করতে পারেন যা তাত্ত্বিকের চেয়ে বেশি ব্যবহারিক হবে, যেমনটি খোদ ইসলামের মেজাজ।

এই সময়ে তিনি এই সুযোগও পেলেন যে, খেলাফত ব্যবস্থা যা উমাইয়া আমল থেকে স্বেরাচারী শাসনের আদলে চলছিল, তাকে একটি সুশৃঙ্খল সংবিধানের অধীনে আনার চেষ্টা করবেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি “কিতাবুল খারাজ”-এর আকারে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ আইনের একটি খসড়া রচনা করেন, যাতে খারাজ ও কর ছাড়াও ইসলামী সরকারের ধারণা, খলিফার দায়িত্ব, প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য, অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার, বিচার বিভাগের ক্ষমতা, কারাগার সংস্কার, জুলুম প্রতিরোধ, বায়তুল মালের গঠন, আয় ও ব্যয়সহ অসংখ্য আইনি দিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

তাঁর ইলমি খিদমত দেখে ইয়াহইয়া বারমাকি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: “আবু ইউসুফ যখন আমাদের কাছে এসেছিলেন তখন ফিকহের প্রচলন খুব কম ছিল। তিনি...”

(১) কিতাবুল খারাজের পর আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে এই ধাঁচের আরও অনেক বই লেখা হয়েছিল যেগুলোর কলেবর ও বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনেক বিস্তৃত। যেমন: আবু উবাইদ কাসিম বিন সালামের ‘কিতাবুল আমওয়াল’, আল-মাওয়াদী’র ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ’, ইমামুল হারামাইনের ‘আল-গিয়াসি’ এবং নিজামুল মুলক তুসীর ‘সিয়ারুল মুলুক’ ইত্যাদি। এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটি বিষয় সাধারণ যে, এগুলোতে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা খুলাফায়ে রাশেদীনের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যেগুলোর দিকে ফিরে আসা ছাড়া ‘খেলাফত’ থেকে ‘রাজতন্ত্রের’ তকমা দূর করা সম্ভব নয়। এই বিষয়বস্তুগুলোতে মুসলিম প্রধান নির্বাচনের জন্য এমন কোনো পরামর্শমূলক মূলনীতির দাওয়াত দেওয়া হয়নি যাতে জাতির উলামা, ফুকাহা এবং ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিবেচনা করা হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সরকারগুলোর অসমাপ্ত গল্পের বিষয়ে কোনো কোনো পূর্বসূরির লেখায় এমন ধারণা পাওয়া যায় যেন তারা একে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে এই অর্থ বের করা ভুল হবে যে, এই ব্যক্তিবর্গ ইসলামী সরকারের আসল ও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং তাদের কাছে এই রাজকীয় সরকারগুলোই আদর্শ ইসলামী সরকার ছিল এবং তাদের কাছে ইসলামী সরকারের ধারণা কেবল সেই বিষয় ও শিরোনামগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যা তারা তাদের বইগুলোতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আসল কথা হলো, এই বইগুলো শাসকদের সামনে পেশ করে তাদের মাধ্যমেই দেশের শাসনব্যবস্থা উন্নত করার আশা করা হয়েছিল। সেই যুগে শাসনের উত্তরাধিকার পদ্ধতি এমন একটি মৌলিক বিষয়ের রূপ ধারণ করেছিল যে, তাতে পরিবর্তনের কোনো আওয়াজ শাসকদের জন্য একেবারেই অসহ্য ছিল এবং তারা এতে যেকোনো পরিবর্তনকে বিদ্রোহের প্রকাশ্য দাওয়াত হিসেবেই গণ্য করত। তাদের লেখনীর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শাসকরা এই বইটিকে ভুল মনে করে মিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে—কিছু স্বেরাচারী শাসকের অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহী আচরণ অবলম্বন করা এবং রক্তপাতের একটি নতুন ধারা শুরু হওয়ার চেয়ে—ইসলামী সরকারের সেই সর্বোচ্চ রূপরেখা যা শাসকদের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তা তাদের সামনে পেশ করাকে তারা অনেক বেশি উত্তম ও উপযুক্ত মনে করেছেন। চাইলে একে ‘ইসলামী রূপরেখা’ থেকে ‘বৈধতার স্তর’ পর্যন্তই হোক এবং ইসলামী সরকারের কেবল আবশ্যিক উদ্দেশ্যগুলোই পূরণ করুক। এমন একটি ব্যবস্থা পেশ করা যা সব দিক থেকে স্পষ্ট হোক এবং যা ছাড়া কোনো গতান্তর না থাকে, এই বুজুর্গদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। ইসলামী সরকারের মৌলিক মূলনীতিসমূহ তো কিতাব ও সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীতে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে তা সবারই জানা ছিল। কিন্তু যখন শাসকরা জেনেশুনে সেগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন তাদের এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো মনে করিয়ে দেওয়া নিরর্থক ছিল। সিয়াসাতে শারইয়্যাহ (শরয়ী রাজনীতি) নিয়ে কাজ করা বুজুর্গগণ নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এই বইগুলো লিখেছিলেন।

তিনি তাঁর ফিকহ দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। [১]

মাহদীর পর হাদী যখন শাসনের বাগডোর হাতে নিলেন, তখন তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-কে পুরো বাগদাদের কাজী নিযুক্ত করেন। [২]

হাদীর ইন্তেকালের পর ১৭০ হিজরিতে (৭৮৬ খ্রি.) হারুনুর রশীদের শাসনকাল শুরু হলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-কে খিলাফতের অধীনস্থ সকল দেশের ‘কাজীউল কুজাত’ (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ‘কাজীউল কুজাত’ উপাধি লাভ করেন। [৩]

কাজীউল কুজাত হওয়ার পর সমস্ত প্রদেশের কাজীদের নিয়োগের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়, যার ফলে হানাফী ফকীহগণ সামনে আসার অধিক সুযোগ পান এবং তাঁদের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো আব্বাসী খিলাফতে হানাফী ফিকহ প্রচলিত হতে থাকে। [৪]

কিছু লোক এই আপত্তি করেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যেহেতু একটি সরকারি পদের সাথে যুক্ত ছিলেন; তাই তিনি যে ফিকহ প্রচার করেছেন, তাতে নিজস্ব কোনো বিশেষ গুণ ছিল না, কিংবা তা কোনো স্বাধীন গবেষণার ফলও ছিল না, বরং আব্বাসীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে তা প্রচলিত করেছিল এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তাদের হাতিয়ার হিসেবে এই কাজ করেছিলেন।

এই আপত্তিটি এ কারণে ভিত্তিহীন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর সীরাত ও চরিত্রের ওপর অন্য মাযহাবের উলামা, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণও কোনো আঙুল তোলেননি, বরং সকলেই তাঁর নেকি, সত্যবাদিতা এবং ন্যায়বিচারের প্রশংসা করেছেন। [৫]

তাছাড়া ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, কাজী হওয়ার পর তিনি কোনো অবস্থাতেই সরকারি চাপ গ্রহণ করেননি। খলিফা হাদীর আমলে যখন তিনি কেবল বাগদাদের পূর্ব জেলার কাজী ছিলেন, তখন তিনি একটি মামলায় হাদীর বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছিলেন। [৬]

আসামী যত বড় পদাধিকারীই হোক না কেন, তাকে ফরিয়াদীর সাথে ন্যায়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো।

হারুনুর রশীদের আমলে এক বৃদ্ধ খ্রিস্টান তাঁর বিরুদ্ধে একটি বাগানের দাবি নিয়ে মামলা দায়ের করে। কাজী আবু ইউসুফ খলিফাকে দরবারে ডেকে তাঁর আরজি শোনেন। যেহেতু বাদীর কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না; তাই কাজী সাহেব খলিফাকে এই দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য শপথ করান। এই সময় হারুন তাঁর সিংহাসনেই বসে ছিলেন।

কাজী সাহেব মৃত্যু পর্যন্ত এই জন্য আফসোস করতেন যে, তিনি এই মামলার শুনানিতে খলিফাকে কেন সেই খ্রিস্টানের সমান করে দাঁড় করাননি। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলছিলেন: “হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, এই একটি ঘটনা ছাড়া আমি কখনো উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ত্যাগ করিনি। তুমি আমার এই বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও।” [৭]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৫৩৭, ত. আর-রিসালাহ।

[২] যখন মুসা (হাদী) খলিফা হলেন এবং বাগদাদে আসলেন, তখন আবু ইউসুফ পুরো বাগদাদের কাজী ছিলেন। আখবারুল কুজাত লি ইবনে হাইয়ান: ৩/২৫৬।

[৩] আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি লিস-সাইমারি, পৃ. ৯৭; তারিখু বাগদাদ: ১৬/৩৫৯, ত. বাশার।

[৪] যখন আবু ইউসুফ কাজীউল কুজাত নিযুক্ত হলেন, তখন কাজীরা তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োগ পেতেন। ফলে সুদূর পূর্ব থেকে আফ্রিকার শেষ সীমানা পর্যন্ত কোনো শহরের কাজী তাঁর সাথী ও তাঁর মাযহাবের অনুসারী ব্যতীত অন্য কেউ নিযুক্ত হতেন না। (জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস লিল হুমাঈদি, পৃ. ৩৮৩; নাফহত তীব: ২/১০)।

[৫] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর নিকট থেকেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন তাঁকে আসহাবে রায়ের মধ্যে “আসবাতু ফিল হাদীস” (হাদীসের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য) বলতেন। ইমাম মুযানী তাঁকে “আন্তবাউ লিল হাদীস” (হাদীসের অধিক অনুসারী) বলতেন। মানাকিবু আবি হানিফা ওয়া সাহিবিহি লিয-যাহাবি, পৃ. ৩৪-৩৫; ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে হিব্বান তাঁকে ‘সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য) হিসেবে গণ্য করেছেন। মিয়ানুল ইতিদাল: ৪/৫১৮।

[৬] মানাকিবু আবি হানিফা লিল কারদারি: ২/১২৮।

[৭] আল-মাবসুত লিস-সারখাসি: ১৬/৬১, ত. দারুল মা’রিফাহ; মানাকিবু আবি হানিফা লিল মাক্বি: ২/২৯৩, ২৯৪।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

হারুনুর রশীদকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কাজী আবু ইউসুফকে এত উঁচু মর্যাদা কেন দিয়েছেন?

হারুন উত্তর দিলেন: “আমি তাকে ইলমের যে কোনো বিষয়েই পরীক্ষা করেছি, তাকে পূর্ণ পেয়েছি। অধিকন্তু তিনি একজন সত্যের সাক্ষী এবং মজবুত চরিত্রের মানুষ। তার মতো আর কেউ থাকলে আমাকে এনে দেখাও।” [১]

এটিও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কাজী আবু ইউসুফের সওয়ারি রাজপ্রাসাদের দেওয়ানে খাস-এর পর্দা পর্যন্ত যেত (যেখানে উজিরকেও পায়ে হেঁটে যেতে হতো)। যখন তিনি আসতেন, খলিফা নিজে এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম করতেন। [২]

হারুনুর রশীদের গভর্নর আলী বিন ঈসাকে কাজী আবু ইউসুফ এই ভিত্তিতে অযোগ্য সাক্ষী গণ্য করেছিলেন যে, তিনি জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন না। আলী বিন ঈসা এতে লজ্জিত হয়ে নিজের বাড়ির সাথে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। [৩]

হারুনের একজন সেনাপতিকে তিনি এই কারণে অযোগ্য সাক্ষী ঘোষণা করেছিলেন যে, সে নিজেকে খলিফার গোলাম বলত। ইমাম আবু ইউসুফের বক্তব্য ছিল যে, যদি সে এই কথায় সত্যবাদী হয় (অর্থাৎ সত্যিই গোলাম হয়), তবে গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি সে কেবল খলিফার তোষামোদ করার জন্য মিথ্যা বলে থাকে, তবে স্পষ্ট যে মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। [৪]

এমন নিরপেক্ষ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির সম্পর্কে কে কল্পনা করতে পারে যে তিনি কারো রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করবেন!!

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) শাসকদের সংশোধনের জন্যও সচেতন ছিলেন। তিনি “কিতাবুল খারাজ”-এর শুরুতে হারুনুর রশীদকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন, তার প্রতিটি শব্দ থেকে বোঝা যায় যে তিনি আদল ও ইনসারের দায়িত্বের পাশাপাশি শাসন ও শাসকদের সংশোধনের জন্যও অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং এই সিলসিলায় নসিহত ও উপদেশের প্রতিটি উপযুক্ত সুযোগ ব্যবহার করতেন। “কিতাবুল খারাজ”-এর শুরুতে তিনি বলেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যার সওয়াব অনেক মহান এবং আজাব অত্যন্ত কঠোর। যখন আল্লাহ আপনাকে এর দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, তখন আপনি দিনরাত পরিশ্রম করে সেই লোকদের অধিকারের ভিত্তি মজবুত করুন যাদের আপনি আমানতদার। সেই ইমারত কখনো স্থায়ী হয় না যা তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। আল্লাহ নির্মাতাদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের ওপর ধূলিসাৎ করে ছেড়ে দেন।

আপনি এই দায়িত্ব নষ্ট করবেন না যা এই উম্মতের ব্যাপারে আপনার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আমল করার শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। যদি তা করেন তবে ক্ষতি হবে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু চলে আসে। সুতরাং মৃত্যুর আগে আমল করে নিন। মৃত্যুর পর আমলের কোনো সুযোগ নেই। কিয়ামত...”

[১] মানকিব আবি হানিফা লিল মাক্বি: ২৩২/২

[২] মানকিব আবি হানিফা লিল মাক্বি: ২২৬/২, ২২৭

[৩] মানকিব আবি হানিফা লিল মাক্বি: ২৪০/২

[৪] মানকিব আবি হানিফা লিল মাক্বি: ২৪০/২

সেই বাদশাহই ভাগ্যবান প্রমাণিত হবেন যিনি জনগণকে সুখে রাখার চেষ্টা করেছেন। সাবধান! কোনো বিষয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না, অন্যথায় জনগণও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। সাবধান! কোনো বিষয়ে নফসের আকাঙ্ক্ষা ও রাগকে শামিল হতে দেবেন না। যখন দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে, তখন দ্বীনের দিকটি গ্রহণ করুন এবং দুনিয়াকে ছেড়ে দিন। [১]

১৭ বছর পর্যন্ত বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালনের পর কাজী সাহেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর ওপর বারবার কান্নার ভাব প্রবল হচ্ছিল। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় এল, তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন:

“হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো, আমি কারো ওপর জুলুম করিনি; তোমার বান্দাদের ওপর জেনে-বুঝে কোনো ভুল হুকুম চাপিয়ে দিইনি। আমি তোমার কুরআন এবং তোমার নবী (সা.)-এর সুন্নাহকে সামনে রেখে ইজতিহাদ করেছি। যখন কোনো সমস্যা সমাধান হয়নি, তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে আমার ও তোমার মাঝে (সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর) মাধ্যম বানিয়েছি, কারণ তিনি তোমার আহকাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন এবং তোমার ইলমের গণ্ডি থেকে কখনো বের হতেন না। হে আল্লাহ! তুমি জানো যে আমি সত্য বলছি, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।”

এই কথা বলতে বলতে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এটি ১লা রবিউল আখের ১৮২ হিজরি (২২ মে ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)-এর ঘটনা। [২]

কাজী আবু ইউসুফ (রহ.)-এর প্রচেষ্টায় ইসলামি ফিকহ পূর্ব ও পশ্চিমে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, পরবর্তীতে মুতাজিলা ও শিয়াদের দীর্ঘদিনের প্রভাবও তা মুছে ফেলতে পারেনি।

মামুনুর রশিদের আমলে তাঁর শিয়া উজির ফজল বিন সাহল কাউকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আদালত থেকে হানাফি ফিকহ বিলুপ্ত করা হোক। ফজল বিন সাহল যখন তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে এ বিষয়ে মতামত চাইলেন, তখন তাঁরা বললেন:

“এই কথা চলবে না। সারা দেশ বিগড়ে যাবে। যে আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছে সে নির্বোধ।”

ফজল বিন সাহল তাঁদের মতামতের গুরুত্ব স্বীকার করে বললেন:

“আমারও মনে হয় আমিরাুল মুমিনীনও এটি পছন্দ করবেন না এবং আমি নিজেও এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত অপছন্দ করি।” [৩]

যদিও মামুনের দরবারে শিয়া মতবাদ ও মুতাজিলাদের প্রাধান্য ছিল, তবুও এই লোকেরা বুঝতেন যে হানাফি ফিকহ যেভাবে মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, অন্য কোনো ফিকহ তার সমকক্ষ হতে পারে না এবং কাজীদের জন্য হানাফি ফিকহ সামনে রেখে মামলার ফয়সালা করা যতটা সহজ, অন্য কোনো ফিকহে সেই সুবিধা নেই।

মোটকথা, হানাফি ফিকহের উপযোগিতা ব্যবহারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এই মহান অবদানকে কখনোই বিস্মৃত হওয়া যাবে না, যা তিনি একজন ফকিহ, মুফতি এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে পেশ করেছেন।

[১] আল-খারাজ, পৃষ্ঠা ১০-১৩, তাবা মাকতাবাতুল আজহারিয়া।

[২] মানাকিব আবু হানিফা লিল মাক্বি: ১৫৮/১৫৭/২।

[৩] মানাকিব আবু হানিফা লিল মাক্বি: ২৪২/২।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ (১৩২ হিজরী - ১৮৯ হিজরী)

হানাফী ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, এর বাস্তবায়নের কৃতিত্ব কাজী আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর হাতে সম্পন্ন হয়েছে, আর একে ব্যাপকতা, সূক্ষ্মতা ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণের মহান কাজ ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান রাহিমাহুল্লাহ পূর্ণতা দান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ ১৩২ হিজরীতে (৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) ওয়াসিত (ইরাক)-এ জন্মগ্রহণ করেন, পরবর্তীতে আপনার পরিবার কুফায় চলে আসে। [১]

১৪৬ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর ছিল, তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ-এর দরসে যুক্ত হন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ফিকহ শাস্ত্রের জন্য কুরআন মাজীদে গভীর জ্ঞান থাকাকে ভিত্তি মনে করতেন এবং তাঁর দরসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কুরআন মাজীদ হিফজ করে আসা শর্ত ছিল। ইমাম মুহাম্মদ হাফেজ ছিলেন না। এই শর্ত শোনার পর তিনি কুরআন মাজীদ হিফজ করতে মনোনিবেশ করেন এবং মাত্র এক সপ্তাহে কুরআন হিফজ সম্পন্ন করে দরসে অংশগ্রহণের যোগ্য হয়ে ওঠেন। এ থেকে তাঁর অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির আন্দাজ করা যায়। তিনি চার বছর পর্যন্ত ইমামে আজম রাহিমাহুল্লাহ থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার আয়ত্ত্ব করে নিয়েছিলেন। [২]

১৫০ হিজরীতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেন, যার পর ইমাম মুহাম্মদ তাঁর উত্তরসূরি ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর থেকে উপকৃত হন, এভাবে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পন্ন করেন। [৩]

যদিও ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজম এবং কাজী আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ-এর মজলিসে থেকে কুরআনী ইলম এবং হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তবুও তাঁর ইলমী তৃষ্ণা বাকি ছিল। ফলে তিনি বসরা, মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং সিরিয়ার অন্যান্য মুহাদিসদের থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ইমাম আওয়ায়ী, ইমাম সাওরী এবং ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো মুহাদিস ও ফকীহদের ইলম নিজের হৃদয়ে সঞ্চয় করেন। [৪]

হাদিস, ফিকহ এবং তাফসীর ছাড়াও নাহ্ব, আদব এবং লুগাতের ইমামদের থেকেও প্রচুর উপকৃত হন। তিনি বলতেন: “পিতার উত্তরাধিকার থেকে ত্রিশ হাজার দিরহাম পেয়েছিলাম, যার অর্ধেক আমি নাহ্ব ও কবিতার পেছনে এবং অর্ধেক ফিকহ ও হাদিসের পেছনে ব্যয় করেছি।” [৫]

ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তিন বছর পর্যন্ত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কিতাব মুয়াত্তা অক্ষরে অক্ষরে শোনেন ও মুখস্থ করেন। [৬] এরপর এই কিতাবটি তিনি উস্তাদের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তথ্যের সাথে নিজে লেখেন। এভাবে এটি...

[১] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ: ১/৫২৬, প্রকাশনী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা

[২] আবু হানিফা থেকে কিছু ফিকহ গ্রহণ করেছেন এবং কাজী আবু ইউসুফের কাছে ফিকহ সম্পন্ন করেছেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/১৩৪, প্রকাশনী: আর-রিসালাহ

[৩] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ: ১/৫২৬

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/১৩৫, প্রকাশনী: আর-রিসালাহ

[৫] মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা লিল-কারদারী: ২/১৫৪-১৫৫

[৬] মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা লিল-কারদারী: ২/১৫৫

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

একটি স্বতন্ত্র সংকলন হয়ে ওঠে যা ‘মুয়াত্তা মুহাম্মদ’ নামে প্রসিদ্ধ এবং হাদিসের ভাণ্ডারে এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ‘কিতাবুল আসার’-কেও নিজের ব্যাখ্যাসহ সংকলন করেন এবং একে আরও বেশি ফলপ্রসূ করে তোলেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর উস্তাদদের ইলম প্রচার ও সংরক্ষণের কাজকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর দরসের মজলিসও সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার অর্জন করেন। তিনি বলতেন: “আমি ইমাম মুহাম্মদ থেকে এত বেশি কিছু লিখে নিয়েছি যা বহন করার জন্য একটি উটের প্রয়োজন।” [১]

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ‘আল-মাবসুত’, ‘আল-মুয়াত্তা’, ‘আল-জামি আস-সাগির’ এবং ‘আল-জামি আল-কাবির’-এর মতো অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত কিতাব রচনা করেন এবং এগুলোতে হানাফি ফিকহকে পূর্ণ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং দলিল-প্রমাণের সাথে সংরক্ষিত করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর এই কিতাবগুলো এতই ব্যাপক, সুবিন্যস্ত, যুক্তিপূর্ণ এবং বিস্তারিত যে এগুলো পড়ার সময় মানুষ নিজেকে ইলমের সমুদ্রে ডুবন্ত অনুভব করে এবং হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে ইসলামের সত্যতা ও পূর্ণাঙ্গতার অনুভূতি দৃঢ় হতে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) লেখালেখির কাজে রাতের অধিকাংশ সময় জেগে কাটাতেন। তাঁর চারদিকে পাণ্ডুলিপি ও কাগজের স্তুপ থাকত। তাঁর দশজন সুশিক্ষিত দাসী ইবারত পড়ে শোনানো, অনুলিপি করা এবং সংশোধন করার কাজে তাঁর সাথে থাকত। কেউ জিজ্ঞেস করত যে আপনি ঘুমান না কেন? তিনি বলতেন: “মানুষ আমাদের ওপর ভরসা করে ঘুমাচ্ছে যে যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেবে, মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করে নেব। আমরাও যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে দ্বীনের ইলম নষ্ট হয়ে যাবে।” [২]

যখন তিনি ‘আস-সিয়ার আল-কাবির’-এর মতো মহান কিতাব রচনা করেন, যা জিহাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াবলি এবং ইসলামি সরকারের যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই কিতাবটি এর বিশালতার কারণে বলদ গাড়িতে করে খলিফার প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। [৩]

হারুনুর রশিদ যখন বাগদাদ ছেড়ে সিরিয়ার ‘রাক্কা’ শহরকে নিজের রাজধানী বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সেখানকার কাজি পদের জন্য তাঁর দৃষ্টি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ওপর পড়ল। কিন্তু যখন তাঁকে কাজি পদের প্রস্তাব দেওয়া হলো, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। হারুনুর রশিদ তাঁকে বন্দি করলেন এবং কঠোর নজরদারিতে রাখলেন। [৪]

অবশেষে ইমাম মুহাম্মদ এই শর্তে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন যে, কোনো বিষয়েই শাসকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না।

রাক্কার কাজি হওয়ার পর তাঁর উপস্থিতিতে এমন একটি ঘটনা সামনে এল যেখানে হারুন শরিয়ত লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছিলেন। একবার হারুনুর রশিদ বনু তাগলিবের এক খ্রিস্টানের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করে দরবারিদের বলছিলেন: “তাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভেঙে তাদের ফেরত দিয়ে দাও।”

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সেই চুক্তিপত্র দেখে বললেন: “হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে এই চুক্তি করেছিলেন। এটি ভাঙার কোনো অবকাশ নেই।” হারুন নিজের পক্ষ থেকে কিছু যুক্তি পেশ করলেন কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন। [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ৯/১৩৫, ত. আল-রিসালাহ।

[২] মানাকিব আবি হানিফা লিল-কারদারি: ২/১৬২।

[৩] শারহুস সিয়ারিল কাবির লিস-সারাখসি: ১/৪০৩।

[৪] মানাকিব আবি হানিফা লিল-কারদারি: ২/১৬২।

[৫] মানাকিব আবি হানিফা লিল-কারদারি: ২/১৬২।

একবার এক বিদ্রোহীকে বিদ্রোহের সন্দেহে বন্দী করে হারুনুর কাছে আনা হলো, যার কাছে সরকারের একটি নিরাপত্তা পত্র (আমান নামা) বিদ্যমান ছিল। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই নিরাপত্তা পত্রটি পড়ে বললেন: “এই নিরাপত্তা পত্রটি সঠিক এবং এই ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম।”

এতে দরবারের একজন আলেম আবুল বাখতারি মাঝখানে এসে সেই নিরাপত্তা পত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং হারুনকে বললেন: “নিরাপত্তা পত্রটি বাতিল হয়ে গেছে। বন্দীকে হত্যা করে দিন। এর রক্তের জন্য আমি দায়ী।”

হারুনুর রশিদ তখন মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি দোয়াত তুলে ইমাম মুহাম্মদের মাথায় আঘাত করলেন। এই ব্যবহারে ইমাম মুহাম্মদ মজলিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ি পৌঁছে কাঁদতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: “নিজের ত্রুটির জন্য কাঁদছি। আমার আবুল বাখতারিকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, তুমি কোন দলিলের ভিত্তিতে এই কথা বললে। আমার উচিত ছিল তাদের ওপর হুজ্জত কায়েম করা, চাই আমি নিহতই হতাম।” [১]

পরে হারুন নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদকে আগের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী করলেন এবং ‘কাযিউল কুযাত’ পদ প্রদান করলেন। ১৮৯ হিজরিতে হারুনুর রশিদ কিছু রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য ‘রে’ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানকেও সাথে নিলেন। রে-এর একটি গ্রাম ‘আরনাবুইয়াহ’-তে পৌঁছে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলো। তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। একই দিনে সেই কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত ক্বারী এবং ভাষাবিদ ইমাম কিসায়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল হয়। হারুনুর রশিদ ‘আরনাবুইয়াহ’-এর মাটিতে তাঁদের উভয়ের দাফন সম্পন্ন করার পর বললেন: “আজ আমরা ফিকহ এবং নাছ উভয়কেই দাফন করে দিলাম।” [২]

ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও নিজের রচনাবলির মাধ্যমে জীবিত আছেন। শুধু হানাফি ওলামায়ে কেরামই নন, বরং প্রতিটি মাযহাবের মুজতাহিদ, ফকীহ, আলেম এবং বুদ্ধিজীবীরা তাঁর ইলমি ভাণ্ডার থেকে ভরপুর ফায়দা হাসিল করেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি এত সূক্ষ্ম মাসআলার জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করেছেন? তখন তাঁর উত্তর ছিল: “ইমাম মুহাম্মদের রচনাবলি থেকে।” [৩]

একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাব ‘আল-মাবসুত’ অধ্যয়ন করলে তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস জন্মে এবং তিনি এই বলে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন যে, যখন মুসলমানদের ছোট মুহাম্মদ (ইমাম মুহাম্মদ)-এর ইলমের এই অবস্থা, তখন বড় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শান কেমন হবে! [৪]

আজ পর্যন্ত উম্মতের ওলামায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হচ্ছেন। ইসলামী ফিকহের বসন্তকাল সর্বদা ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

[১] আখবারু আবি হানিফা লিস-সাইমারি, পৃ. ১২৬, ১২৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৯/১৩৬, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আখবারু আবি হানিফা লিস-সাইমারি, পৃ. ১৩১

[৪] কাশফুয যুনুন: ২/১৫৮৬, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৫০ হি. - ২০৪ হি.)

যে বছর ইজতিহাদের সূর্য হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেই বছরই হাদিস ও ফিকহের বাগানকে সিক্ত করার জন্য সেই মহান ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে আগমন করলেন যাকে আমরা “ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফিঈ” নামে চিনি।

ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বংশগতভাবে কুরাইশ ছিলেন। ১৫০ হিজরিতে ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন যা বাইতুল মুকাদাসের নিকটবর্তী। শৈশবেই পিতার ছায়া মাথার ওপর থেকে সরে গিয়েছিল, কিন্তু মা দারিদ্র্য সত্ত্বেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর শিক্ষা ও লালন-পালন করেন। তাঁর বয়স যখন দুই বছর, তখন তাঁর মহীয়সী মা এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে নিয়ে প্রথমে হিজাজ এবং পরে ইয়ামেনে চলে আসেন। দশ বছর এখানে কাটানোর পর মক্কা মুকাররমায় বসবাস শুরু করেন। [১]

ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান, চতুর ও দূরদর্শী ছিলেন। পড়াশোনার প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে সাত বছর বয়সে পুরো কালামুল্লাহ মুখস্থ করে ফেলেন। [২] এরপর তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সময়টি ছিল তাঁর চরম দারিদ্র্য ও অনাহারের। তাঁর একমাত্র অভিভাবক ছিলেন তাঁর মা, যাঁর কাছে এতটুকু টাকাও ছিল না যে ছেলেকে লেখার জন্য কাগজ কিনে দেবেন। ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি চওড়া হাড় কুড়িয়ে রাখতেন এবং সেগুলোর ওপর পাঠ লিখে সংরক্ষণ করতেন। [৩]

এই সময়েই তিনি তীরন্দাজির অনুশীলন শুরু করেন এবং এই বিদ্যায় এত দক্ষতা অর্জন করেন যে দশটির মধ্যে নয়টি তীরই একদম সঠিক লক্ষ্যে বিদ্ধ হতো। [৪] আরবি অভিধান এবং কবিতা মুখস্থ করার নেশাও পেয়ে বসেছিল। নিজেও অত্যন্ত চমৎকার কবিতা বলতে শুরু করেন। [৫]

দশ বছর বয়সে তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালিকও মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। [৬] এরপর মক্কার ফকিহ মুসলিম বিন খালিদ জানজি রহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে থেকে ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। [৭] পনেরো বছর বয়সে তাঁর উস্তাদ তাঁকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিয়ে দেন। [৮]

২৩ বছর বয়সে “ইমাম দারুল হিজরাহ” ইমাম মালিক বিন আনাস রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট সরাসরি মুয়াত্তা পড়ার জন্য মদিনা মুনাওয়ারার সফর করেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির জল্পরি চোখ এই হীরার সঠিক মূল্য বুঝতে পেরেছিল এবং বিশেষ মনোযোগ ও ভালোবাসার সাথে পড়িয়েছিলেন। ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে মুয়াত্তা মুখস্থ শুনিয়ে কয়েক দিনেই তা সম্পন্ন করেন। [৯]

এরপর তিনি তাঁর কাছ থেকে সময়ে সময়ে জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে মায়ের দেখাশোনার জন্য মক্কা মুকাররমা এবং অন্যান্য আলেমদের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য শহরগুলোতেও যাতায়াত করতেন। [১০] ইয়ামেনের ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের থেকেও উপকৃত হন। [১১]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/৫, ৬, ত-আর রিসালাহ

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/১১

[৩] তারিখ বাগদাদ: ২/৬০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/৭

[৫] তারিখ বাগদাদ: ২/৬০, ত-দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৬] তারিখ বাগদাদ: ২/৫৮

[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/৬

[৮] আল-ইমাম আশ-শাফিঈ লি-আবি জাহরাহ, পৃ. ২১

[৯] তারিখ বাগদাদ: ২/৬১

[১০] তারিখ বাগদাদ: ২/৬২

[১১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/৭

১৭৯ হিজরিতে ইমাম মালিক (রহ.) ইন্তেকাল করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) পুনরায় মক্কায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এখন তাঁর জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন দেখা দিল। ভাগ্যের ব্যাপার হলো, ইয়েমেনের আব্বাসীয় গভর্নর ঐ দিনগুলোতে মক্কায় এসেছিলেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর জ্ঞান ও ফযিলতের কথা শুনে তাঁকে সাথে নিয়ে যান এবং ইয়েমেনের নাজরান জেলার আমিল (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। [১] ইমাম শাফিঈ (রহ.) অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নীতিপরায়ণতায় ঐসব লোক অসন্তুষ্ট হলো যারা ঘুষ ও তোষামোদির মাধ্যমে নিজেদের কাজ হাসিল করতে অভ্যস্ত ছিল। এমন হিংসুকরা ইয়েমেনের গভর্নরের কান ভারী করে ইমাম শাফিঈ (রহ.)-কে পদচ্যুত করাল। [২]

আব্বাসীয়রা সবসময় আলবীদের বিদ্রোহের ভয়ে তটস্থ থাকত। ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর বংশীয় ধারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মিলিত ছিল। আহলে বাইতের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ও ভক্তি ছিল। এই কারণে কিছু লোক তাঁকে শিয়া মতবাদে অভিযুক্ত করত। এমন লোকদের জন্য তিনি এই কবিতাটি বলেছিলেন:

ইন কানা রাফদান হবু আলি মুহাম্মাদিন ফালইয়াশহাদিস সাক্বালানি আন্নি রাফিদি

(যদি আলে মুহাম্মাদের ভালোবাসা রাফেযিয়াত হয়, তবে জিন ও ইনসান সাক্কী থাকুক যে আমি রাফেযি।) [৩]

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর এই কথাগুলোকে পূঁজি করে হিংসুকরা রটিয়ে দিল যে, তিনি আলবীদের সমর্থক এবং তাদের বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক। এই সংবাদ খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে পৌঁছানো হলো। সেখান থেকে ইমাম শাফিঈ (রহ.)-সহ সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে “রাব্বাহ” পৌঁছানোর নির্দেশ জারি হলো। ইমাম শাফিঈ (রহ.) (সম্ভবত ঐ দিনগুলোতে মায়ের সাথে দেখা করতে ইয়েমেন থেকে) মক্কায় এসেছিলেন। তাঁকে সেখান থেকেই হেফাজতে নিয়ে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [৪]

এটি ১৮৪ হিজরির ঘটনা। ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর বয়স তখন ৩৪ বছর ছিল। এই পরীক্ষা তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। হারুনুর রশিদ ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মজবুত দলিলের সাথে ঐসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। হারুনের দরবারে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-ও উপস্থিত ছিলেন। হারুন তাঁর কাছে ইমাম শাফিঈ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যদিও এর আগে এই দুই বুজুর্গের মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ হয়নি, তবে গায়েবানা পরিচয় ছিল। তাই ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বললেন: “তিনি অনেক বড় আলেম। তাঁর ওপর যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা তাঁর শানের সাথে মানানসই নয়।” হারুনুর রশিদ বললেন: “ঠিক আছে, তবে আপনি তাঁকে নিজের কাছে রাখুন।”

এভাবে ইমাম শাফিঈ (রহ.) কেবল মুক্তিই পেলেন না, বরং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগও পেয়ে গেলেন। [৫] এক আন্দাজ অনুযায়ী তিনি প্রায় দুই বছর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কাছে অবস্থান করেন এবং আহনাফদের ইলম, মূলনীতি ও ফতোয়া আয়ত্ত করেন।

[১] তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ লিস সুবকি: ১/২১৬

[২] আল-ইনতিকাহ ফি ফাযাইলিল সালাসাতি আইম্মাতিল ফুকাহা, পৃ. ৯১

[৩] আল-ইনতিকাহ ফি ফাযাইলিল সালাসাতি আইম্মাতিল ফুকাহা, পৃ. ৯৮; আল-ইমামুশ শাফিঈ, আবু জাহরা, পৃ. ২৪, ২৩

[৪] আল-ইমামুশ শাফিঈ, আবু জাহরা, পৃ. ২২

[৫] তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ লিস সুবকি: ১/২২২

[৬] হাফেজ ইবনে কাসির ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈর এই সাক্ষাতের সাল ১৮৪ হিজরির পরিবর্তে ১৮৯ হিজরি উল্লেখ করেছেন: “আমি বলছি, তিনি ১৮৯ হিজরিতে বাগদাদে এসেছিলেন এবং রশিদ তাঁকে মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কাছে থাকাকালীন দুই হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১০/৫০)। যদি এটি সঠিক হয় তবে ইমাম শাফিঈর বাগদাদে আগমন তিনবার প্রমাণিত হয়: প্রথমবার ১৮৪ হিজরি, দ্বিতীয়বার ১৯৫ হিজরি এবং তৃতীয়বার ১৯৮ হিজরি।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

...সেখান থেকে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসেন। [১]

এখন তাঁর কাছে উম্মতের উভয় স্তরের অর্থাৎ ফুকাহায়ে মুহাদিসীন এবং উলামায়ে হাদীসের ইলম একত্রিত হয়েছিল। তিনি উভয়টি থেকে কাজ নিয়ে অ-নাস মাসআলা সমাধানের জন্য নতুন ফিকহী মূলনীতি প্রণয়ন করেন এবং শাফেয়ী ফিকহের ভিত্তি স্থাপন করেন, যাতে একদিকে হিজাযবাসীদের হাদীস জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ছিল এবং অন্যদিকে ইরাকবাসীদের মতো কিয়াস ও ইস্তিহ্বাতের মূলনীতিও কার্যকর ছিল। ইমাম শাফেয়ী রহ. মক্কায় অবস্থান করে নয় বছর পর্যন্ত এই ফিকহের মূলনীতি ও বিধিবিধানের ওপর কাজ করেন। [২]

হারুনুর রশীদের মৃত্যুর দুই বছর পর আমীনুর রশীদের খিলাফতকালে ইমাম শাফেয়ী রহ. বাগদাদে যান। এটি ১৯৫ হিজরীর ঘটনা। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। বাগদাদে তাঁর ইলমের ব্যাপক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্ররা সবদিক থেকে ছুটে আসে। যদি সেখানে দীর্ঘ অবস্থানের সুযোগ মিলত তবে কোনো সন্দেহ নেই যে ইরাক থেকে খোরাসান পর্যন্ত তাঁর ফিকহ ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে ইমাম শাফেয়ী রহ. দুই বছর পর হিজাযে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। এটি সেই সময় ছিল যখন আমীনুর রশীদের সাথে মামুনের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবত এই বিশৃঙ্খলার কারণেই ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে তাঁর এই দুই বছরের অবস্থান পূর্বদিকের প্রদেশগুলোতে শাফেয়ী উলামাদের একটি বলয় তৈরি করে দিয়েছিল যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। [৩]

আমীনুর রশীদের হত্যা এবং মামুনের বিজয়ের পর ১৯৮ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী রহ. দ্বিতীয়বার বাগদাদে যান। কিন্তু যেহেতু মামুনুর রশীদের রাজধানী ছিল খোরাসান, তাই বাগদাদে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল; ফলে সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর ইমাম শাফেয়ী রহ. মিশরের গভর্নরের আমন্ত্রণে মিশরে চলে যান। [৪]

মিশরে অবস্থানের সময় ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ‘কিতাবুল উম্ম’, ‘আল-আমালী আল-কুবরা’, ‘মুখতাসারুল মুযানী’, ‘মুখতাসারুল রাবী’ এবং ‘আস-সুনান’ রচনা করেন, যার সমষ্টি হাজার হাজার পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই সমস্ত কাজ মাত্র চার বছরে সম্পন্ন হয়। এর আগে ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে মালিকী ফকীহদের মধ্যে গণ্য করা হতো, কিন্তু মিশরে আসার পর তিনি অনেক মাসআলায় ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে উসুলী মতভেদ করেন এবং শাফেয়ী ফিকহকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে তাঁর ফিকহের একটি আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫]

[১] ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর দরসে তিনি অংশগ্রহণ করতেন, তবে তা কেবল অন্ধ অনুকরণ ছিল না বরং ফিকহী সূক্ষ্মতাগুলো বোঝার জন্য তিনি হিজাযী ও ইরাকী ফিকহের তুলনা করতেন; এজন্য তিনি হিজাযবাসীদের পক্ষাবলম্বনও করতেন। কিছু মাসআলায় তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর সাথে মুনাজারাও করেছেন। দ্রষ্টব্য: কিতাবুল উম্ম ৭/৩৫০, আল-মা’রিফাহ।

তবে এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর হারুনুর রশীদের কাছে যাওয়ার এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর সাথে বাহাস ও মুনাজারার একটি দীর্ঘ বর্ণনা ‘তারীখে বাগদাদ’ (২/৪৬১)-এ বর্ণিত আছে যা ইমাম শাফেয়ীর নিজের জবানীতে বর্ণিত। এর সাথে ইমাম শাফেয়ীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত ‘জুযউ রিহলাতিশ শাফেয়ী’ নামক একটি অংশও রয়েছে যার বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-বালতী একজন মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত। এতে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে অত্যন্ত খারাপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই কথাগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন যা ইতিহাসের মুতাওয়্যাতুর বর্ণনার পরিপন্থী। হাফেজ যাহাবী রহ. একে বানোয়াট ও মিথ্যা বলেছেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর জীবনের ঘটনাবলী প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন কিন্তু এই সফরনামাকে জেনেবুঝে বর্জন করেছেন। তিনি বলেন: “سمعتنا جزءاً من رحلة الشافعي فلم اسق منه شيئاً لانه باطل لمن تأمله” (সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৮০-৯১)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (১০/৫১)-তে হাফেজ যাহাবী রহ. বলেছেন যে এই বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকী রহ. ‘মানাকিবুল ইমাম আশ-শাফেয়ী’ (১/১৩০)-তে মুসনাদ হিসেবে এবং ইমাম রাযী রহ. ‘মানাকিবুল ইমাম আশ-শাফেয়ী’ (পৃষ্ঠা ৪৩)-তে মুসনাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ‘তাওয়ালিল তাসীস’ (পৃষ্ঠা ৭৯)-এ বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে এই সফরনামা একেবারেই ভিত্তিহীন।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/১০, আল-ইমামুশ শাফেয়ী, আবু যাহরা, পৃষ্ঠা ১৭।

[৩] আল-ইমামুশ শাফেয়ী, আবু যাহরা, পৃষ্ঠা ২৬।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৫০, আল-ইমামুশ শাফেয়ী, আবু যাহরা, পৃষ্ঠা ২৫।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৫৫, আল-ইমামুশ শাফেয়ী, আবু যাহরা, পৃষ্ঠা ২৭।

ইমাম শাফিঈ রহ. চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। সেই যুগে অধিকাংশ বড় চিকিৎসক ছিলেন ইহুদি বা খ্রিস্টান। মুসলমানরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিতেন না। ইমাম শাফিঈ রহ. এই পরিস্থিতির ওপর দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন:

• ضَيَعُوا ثُلُثَ الْعِلْمِ وَوَكَّلُوهُ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

(মুসলমানরা ইলমের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট করে দিয়েছে এবং তা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে।)

তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এমনকি এও বলতেন:

• لَا أَعْلَمُ عِلْمًا بَعْدَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَنْبَلَ مِنَ الطِّبِّ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ غَلَبُونَا عَلَيْهِ.

(আমি হালাল ও হারামের পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ইলম জানি না। কিন্তু আহলে কিতাবরা এই ময়দানে আমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে।) [১]

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর এই উৎসাহ প্রদান বৃথা যায়নি এবং আমরা পরবর্তী যুগের মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সারির চিকিৎসকদের আত্মপ্রকাশ করতে দেখি, যারা বিশ্বের সমস্ত জাতিকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের জ্ঞান আহরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নিরন্তর পরিশ্রম, বিশ্রামহীনতা এবং অসুস্থতার কারণে ইমাম শাফিঈ রহ. অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, অবশেষে ৩০ রজব ২০৪ হিজরি (২০ জানুয়ারি ৮২০ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে তিনি ৫৪ বছর বয়সে তাঁর প্রাণ সৃষ্টিকর্তার নিকট সোপর্দ করেন। [২]

মিশরে ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর কয়েক বছরের অবস্থানের সময় বড় বড় প্রখ্যাত ছাত্র তৈরি করেছিলেন, যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইয়াকুব আল-বুয়াইতি, রাবি বিন সুলাইমান এবং আবু ইবরাহিম আল-মুজানি রহ. প্রসিদ্ধ। মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট আলেম ও ফকিহগণ তাঁর সান্নিধ্যে চলে আসেন। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর ইন্তেকালের পরও এই ছাত্রদের মাধ্যমে শাফিঈ ফিকহের আদলে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট শিক্ষার প্রচার অব্যাহত থাকে এবং মানুষ মূর্খতার অন্ধকার থেকে বেঁচে ইলমের আলোয় আসতে থাকে।

ধীরে ধীরে মিশরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি এবং তাঁর মাযহাবের প্রতি অনুরাগ এমনভাবে মিশে যায় যে, শতাব্দীকাল পরে উদ্ভূত বিভ্রান্তিকর আন্দোলনগুলোর মধ্যেও তাদের ঈমান টলেনি। রাফেজিদের উবাইদি খিলাফতের তিনশ বছরের শাসনকালও তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। পরবর্তীতে ইমাম গাজালি, শেখ আল-মাওয়াদি, ইমামুল হারামাইন, ইমাম নববী এবং ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম রহ.-এর মতো শাফিঈ আলেমগণ যুগে যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে ঈমানি, ইলমি এবং আমলি তরবিয়তের ফসল বপন করতে থাকেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/৫৭

[২] মুজামুল উদাবা: ৬/২৪১৪, তাবা দারুল গারব আল-ইসলামি বৈরুত

আহলে সাইফ ও কলম

এই যুগের প্রখ্যাত আলেমদের খেদমত পর্যালোচনা করার সময় আমাদের এটা ভাবা উচিত নয় যে, এই বুজুর্গদের খেদমতের পরিধি কেবল দরস-তাদরিস (পাঠদান), তাসনিফ-তালিফ (রচনা ও সংকলন) এবং ইফতা ও কাজা (ফতোয়া ও বিচারকার্য) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল; বরং কিছু প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আলেম ও লেখক হওয়ার পাশাপাশি আহলে সাইফ (তলোয়ারের অধিকারী) ও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন কমবীর পুরুষও ছিলেন যারা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার জন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং গোমরাহির অন্ধকার দূর করে ঈমানের আলো প্রজ্বলিত করার জন্য মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী আসাদ বিন ফুরাত এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারকের নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল।

কাজী আসাদ বিন ফুরাত (১৪২ হিজরী - ২১৩ হিজরী)

কাজী আসাদ বিন ফুরাত রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী ইতিহাসের সেই মহান ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত যারা একই সাথে উচ্চপদস্থ ফকীহ, ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিস, ন্যায়পরায়ণ কাজী এবং মহান মর্যাদার অধিকারী মুজাহিদ ছিলেন। তিনি ১৪২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি মুজাহিদ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দুই বছর, তখন তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে আফ্রিকা অভিযুক্ত ইসলামী লস্করের (বাহিনী) সাথে शामिल হন। [১]

আসাদ বিন ফুরাতের শৈশব এখানেই কাটে, তিনি উত্তর আফ্রিকার আলেমদের কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। বিজ্ঞ আলেম হওয়ার পরও ১৭২ হিজরীতে ইলমের তৃষ্ণা তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে যায়, যেখানে তিনি ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে ফিকহী ব্যাখ্যাসহ মুয়াত্তা-এর হাদিসসমূহ শ্রবণ করেন। তবুও তাঁর ইলমী পিপাসা মেটেনি। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতি নিয়ে তিনি কুফায় চলে আসেন এবং ইমাম আবু হানিফার উত্তরসূরি ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে ফিকহে হানাফীর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। [২]

সমসাময়িক তিন মহান ইমামের নিকট থেকে ফয়েজ (উপকার) লাভ করে ইমাম আসাদ বিন ফুরাত ‘মাজমাউল বিহার’ (সমুদ্রসমূহের সঙ্গমস্থল) হয়ে উঠেছিলেন। ইলম অন্বেষণকারীরা তাঁর দিকে ছুটে আসতেন এবং বড় বড় আলেমগণ তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকে নিজেদের জন্য সম্মানের বিষয় মনে করতেন।

ইরাক থেকে তিনি মিশরে পৌঁছান এবং সেখানে ফিকহে মালিকীর ওপর ‘আল-আসাদিয়্যাহ’ সংকলন করেন, যার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ অনুলিপি ‘আল-মুদাওওয়ানা তুল কুবরা’ নামে সর্বজনবিদিত, যা ইমাম সাহনুন সংকলন করেছিলেন এবং যাকে ফিকহে মালিকীর সর্বপ্রথম ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে গণ্য করা হয়। [৩] ১৮১ হিজরীতে তিনি নিজ দেশ কায়রোয়ান (তিউনিসিয়া) ফিরে আসেন এবং সেখানে ইলমের আলো ছড়াতে থাকেন। [৪]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/২২৬।

[২] তারিখুল ইসলাম লিখ-যাহাবী: ১৫/৬৬, ৬৭; তাদমুর; আল-আলাম যিরিকলী: ১/২৯৮, ২৯৯।

[৩] তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক লিল-কাজী ইয়াদ: ৩/২৯৬, মাকতাবাতুল ফাদালা; আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ লি-ইমাদ আলী জুমুআহ, পৃ. ১৭৪।

[৪] আদ-দীবাজুল মুযাহাব ফী মা’রিফতি আয়ানি উলামাইল মাযহাব লি-ইবনু ফারহন আল-ইয়া’মুরী, পৃ. ৯৮।

এটি খলিফা মামুনুর রশিদের খিলাফতের সময় ছিল, তবে তিউনিসিয়া আব্বাসীয় খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্বায়ত্তশাসিত দেশে পরিণত হয়েছিল। এখানকার সরকারকে আঘলাবি রাষ্ট্র বলা হতো। এখানকার শাসক জিয়াদাতুল্লাহ বিন ইব্রাহিম ইমাম আসাদ বিন ফুরাতের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন; তাই তিনি ২০৩ হিজরিতে তাকে কায়রোয়ানের কাজি নিযুক্ত করেন। তিনি তার দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করেন।

[১]

মালিকি ও হানাফি উভয় ধারার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে উভয় শ্রেণির ফকিহগণ তার ফতোয়ার ওপর আস্থা রাখতেন। যদিও তিনি মূলত মালিকি ছিলেন, তবে হানাফিদের ফিকহি রুচি তার ওপর প্রবল ছিল। তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে হানাফি ফিকহের দূরদর্শিতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত; তাই বলা হতো যে, তার ওপর ‘আসহাবুর রায়’-এর জ্ঞান প্রবল হয়ে উঠেছে।

[২]

সিকিলিয়া (সিসিলি) বিজয়:

সিকিলিয়া (সিসিলি) ভূমধ্যসাগরের একটি বিখ্যাত ও বড় দ্বীপ। এটি ত্রিভুজাকৃতির এবং ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইল। সাহাবায়ে কেরাম رضى الله عنهم এর যুগে এটি রোমান বাইজেন্টাইন শাসকদের দখলে ছিল এবং এই দ্বীপের জলদস্যু স্বভাবের খ্রিস্টানরা প্রায়ই মুসলিম অধিকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণ করত।

এটি জয় করার চিন্তা সর্বপ্রথম হযরত আমির মুয়াবিয়া رضى الله عنه এর মনে আসে। সে সময় তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। তিনি ৩৩ হিজরিতে হযরত উসমান গনি رضى الله عنه এর অনুমতি নিয়ে ৩০০টি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী সিকিলিয়া বিজয়ের জন্য পাঠান। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলমানদের পিছু হটতে হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন খলিফা এটি জয় করার জন্য বাহিনী পাঠান কিন্তু সফলতা আসেনি। [৩]

কাজি আসাদ বিন ফুরাত رحمه الله দীর্ঘকাল ধরে ভূমধ্যসাগরের এই উর্বর ও শ্যামল দ্বীপটিকে ইসলামি ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং গত দেড়শ বছর ধরে এই বিষয়ে পরিচালিত অসম্পূর্ণ অভিযানগুলো সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই সিলসিলায় তিনি কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিতে থাকতেন। অবশেষে কাজি আসাদ বিন ফুরাতের পরামর্শে শাসক জিয়াদাতুল্লাহ সিকিলিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু পরামর্শ সভায় যুদ্ধ পরিকল্পনা কাজি আসাদ বিন ফুরাতের মতানুসারে নির্ধারিত হয়েছিল; তাই জিয়াদাতুল্লাহর কাছে বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য তার চেয়ে যোগ্য আর কোনো ব্যক্তিত্ব নজরে আসেনি। [৪]

যখন তিনি কাজি সাহেবকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন, তখন কাজি সাহেব বিস্মিত হলেন; কারণ কাজি পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া তার পছন্দ ছিল না। তবে গভর্নর তাকে আশ্বস্ত করে বললেন: “আপনি কাজি পদেও বহাল থাকবেন এবং বাহিনীর নেতৃত্বও আপনার হাতে থাকবে। আপনাকে ‘কাজি আমির’ বলা হবে।” [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৯৮/৬

[২] ওয়া গালাবা আলাইহি ইলমুর রায়, (সিয়রু আলামিন নুবালা: ২২৫/১০)

[৩] নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব লিন নুওয়াইরি: ২১/২৪ থেকে ৫৭; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: সন ৮৯ হিজরি

[৪] লাইলাতুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১০২/১

[৫] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৬৮/১৫, ৬৯, ত তাদমুরি

মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস

আফ্রিকায় আসাদ বিন ফুরাতের আগে কেউ এই দুটি পদে একসাথে অধিষ্ঠিত হননি। ১৫ রবিউল আউয়াল ২১২ হিজরিতে কাজী আসাদ বিন ফুরাত (রহ.) ৭০০টি জাহাজের একটি বহর নিয়ে কায়রাওয়ানের উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগরে অবতরণ করেন। বহরে ৭০০ অশ্বারোহী এবং ১০ হাজার পদাতিক মুজাহিদ ছিল। তিন দিনের সমুদ্র যাত্রার পর ১৮ রবিউল আউয়াল ইসলামী বাহিনী সিসিলির উপকূলীয় শহর ‘মাজারা’-র উপকূলে নোঙর ফেলে। এদিকে সিসিলির খ্রিস্টান শাসক রোমান সম্রাট এবং ভেনিসের রাজার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন, ফলে দেড় লক্ষ রোমান সৈন্য দশ হাজার মুসলমানের সাথে যুদ্ধের জন্য ময়দানে এসে হাজির হয়। এখন একজন মুসলমানের বিপরীতে পনেরো জন করে খ্রিস্টান ছিল, এই দৃশ্য দেখে অনেক মুসলমান ঘাবড়ে যেতে লাগলেন।

কাজী আসাদ বিন ফুরাত (রহ.) এই বিচলিত হৃদয়ের সামনে মুসলমানদের সমাবেশের দিকে তাকালেন এবং তাদের সাহস জোগানোর জন্য এমন সুমধুর কণ্ঠে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করলেন যে সবার অন্তর ঈমানের জোশ এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এরপর কাজী সাহেব একটি উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিলেন যাতে মুজাহিদদের আহ্বান জানিয়ে বললেন:

“হে মুজাহিদগণ! এরা সেই সব আজমি (অনারব) পলাতক যারা উপকূলে দস্যুবৃত্তি করত এবং এখানে এসে লুকিয়ে জড়ো হয়েছে। এরা তো তোমাদেরই পলাতক গোলাম। সাবধান! তাদের দেখে ভীত হয়ো না।”

এরপর তিনি সূরা ইয়াসিনের আয়াত ও অংশসমূহ পাঠ করতে করতে রোমান বাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন, মুজাহিদরাও তলোয়ার কোষমুক্ত করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং লাশের স্তুপ জমিয়ে দিলেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে রোমানরা ইসলামী বাহিনীর সেনাপতিকে শহীদ করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কাজী সাহেবের কাজ শেষ হয়ে গেলেই মুসলমানরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাজী সাহেবকে রক্ষা করলেন; তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারাত্মকভাবে ঘেরাও হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। এই সময়ে তিনি বেশ কিছু মারাত্মক আঘাত পান, যে হাতে বাহিনীর পতাকা ছিল তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি পতাকাটি পড়ে যেতে দেননি। তাদের সাহস ও দৃঢ়তার ফলে অবশেষে মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং দ্বীপের একটি বড় অংশ বিজিত হয়। [১] কিছুকাল পর কাজী সাহেব আরও অগ্রসর হন এবং ‘সিরাকিউস’ অবরোধ করেন। এখানেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় যাতে কাজী সাহেব গুরুতর আহত হন। অবশেষে সেই ক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রবিউস সানি ২১৩ হিজরিতে (জুলাই ৮২৮ খ্রি.) শাহাদাত বরণ করেন এবং এই দ্বীপেই সমাহিত হন। [২]

মুসলিম উম্মাহর ওপর কাজী আসাদ বিন ফুরাতের এক বিশাল অবদান ছিল যে তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিসিলির মতো অপরাজেয় ইউরোপীয় ঘাঁটিটি ইসলামী বিশ্বের জন্য জয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর পরে মুসলমানরা তাঁর দেওয়া এই উপহারটি প্রায় তিন শতাব্দী ধরে রক্ষা করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিলাসিতা, পারস্পরিক বিভেদ এবং গৃহযুদ্ধ শত্রুদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়।

[১] নেহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব লিন নুওয়াইরি, ২৪/৩৫৫-৩৫৬, কায়রো সংস্করণ; আল-মা’রিফাতুল ইলমিয়াহ বিমান ইয়াসতাহিক্কুল কাদা ওয়াল মানসাব (তারিখ কুদাতুল আন্দালুস) আবুল হাসান আল-মালিকি, পৃ. ৫৪

[২] নেহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব: ২৪/৩৫৭

সুতরাং খ্রিস্টানরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে ৪৮২ হিজরিতে পুনরায় সিসিলি দখল করে নেয় এবং এভাবেই ভূমধ্যসাগরের এই ত্রিভুজাকৃতির বিশাল দ্বীপ থেকে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব মুছে যায়। [১]

কাজী আসাদ বিন ফুরাত রহ.-এর সমাধি আজও সিসিলির কোনো এক অজ্ঞাত কোণে আইন্ম্যায়ে মুজতাহিদ্দীন ও ফুকাহায়ে কেরামের সেই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দিচ্ছে যা মসজিদ ও মাদ্রাসা, দরস ও তাদরীসের হালকাসমূহ এবং ইফতা ও বিচারালয়ের আঙিনা থেকে শুরু করে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত কদমে কদমে, ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত রয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. (১১৮হি.-১৮১হি.)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. ১১৮ হিজরিতে “মার্ত”-এ মুবারক নামক এক নেককার তুর্কি গোলামের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন খাওয়ারিজমের। [২] সেই যুগের তুর্কিদের মধ্যে খুব কম লোকই ইলমে হাদীস অর্জন করত। আবদুল্লাহ বিন মুবারক ছিলেন সেই অঞ্চলের প্রথম ব্যক্তি যিনি হাফিযুল হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [৩]

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. ইলম অর্জনের জন্য এত বেশি সফর করেছেন যে তাঁর উস্তাদ ও শায়খদের সংখ্যা চার হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। [৪] এমনকি এক মুহাদ্দিস রাবী বিন আনাস-এর সুখ্যাতি শুনে তাঁর শহরে পৌঁছালে জানতে পারেন যে তিনি কারাগারে আছেন। আবদুল্লাহ বিন মুবারক ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি পাননি যতক্ষণ না কোনো উসিলায় কারাগারের চার দেয়ালের ভেতরে গিয়ে সেই মুহাদ্দিসের কাছ থেকে চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করে নিয়েছেন। [৫]

তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং সুফিয়ান সাওরী রহ. সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. বলতেন: “যখন এই দুইজন (امام ابوحنيفه اور) কোনো মাসআলায় একমত হন, তখন তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।” [৬] একবার বললেন: “আমার কাছে যে ফিকহ আছে, তা তো আবু হানীফার কাছ থেকেই শিখেছি।” [৭]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা এমন ছিল যে কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলে স্মরণ করতেন। [৮]

একবার কিছু আলেম নিজেদের মধ্যে তাঁর সীরাত নিয়ে আলোচনা করতে বসলে তাঁর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো গণনা করেন:

- ইলম, ফিকহ, আদব, নাহ্, লুগাত, যুহদ, ফাসাহাত, কবিতা, তাহাজ্জুদ গুয়ারি, ইবাদত, হজ, জিহাদ, বীরত্ব, অশ্বারোহণ, শক্তি, অনর্থক কথা পরিহার করা, ইনসাফ এবং আপনজনদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত না হওয়া।

জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এমন ছিল যে প্রত্যেকেই তাঁকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসত। একবার তিনি রাক্কায় পৌঁছালেন যেখানে খলিফা হারুন...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৪৪৮ হিজরি

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৩৮২

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৩৭৯, তাবাতুর রিসালাহ

[৪] আখবারু আবি হানীফা লিস-সাইমারি, পৃ. ৮৯

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৩৭৯, ৩৮১, তাবাতুর রিসালাহ

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৩৯৭

[৭] আল-ইনতিকা ফি ফাদলিল সালাসাতিল আইম্মাতিল ফুকাহা লি ইবনি আবদিল বার, পৃ. ১৩২

[৮] তায়কিরাতুল হফফাজ লিয়-যাহাবি: ১/২০৭

সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁর আগমনের কথা শোনামাত্র এমনভাবে ছুটে এল যে ধুলোবালির মেঘ ছেয়ে গেল এবং মানুষের জুতো ছিঁড়ে গেল। হারুনুর রশিদের মা প্রাসাদের ওপরতলা থেকে এই ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

“কে এসেছে?” বলা হলো: “খুরাসানের একজন আলেম।” খলিফার মা বলতে লাগলেন: “আসল শাসক তো ইনিই, হারুন নয় যার চারপাশে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে ভিড় জমানো হয়।” [১]

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফকিহ, মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি একজন দুর্দান্ত রণকুশলী মুজাহিদও ছিলেন। তাঁর জীবন হুবহু সাহায্যে কেরামের নমুনার অনুরূপ ছিল। তিনি ছিলেন রাতের ইবাদতকারী এবং দিনের অশ্বারোহী। [২]

মুজাহিদ ও হাজীদের জন্য ব্যয়:

জিহাদের সফরে সবদিক থেকে নেককার লোকেরা একত্রিত হয়ে তাঁর সাথে চলতেন। আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি আসা-যাওয়ার সফরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের ওপর দুহাত খুলে খরচ করতেন, তবে এমনভাবে যাতে কারো আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। তাঁর সাথে জিহাদের সফরে যাওয়া এক দরবেশ উমর বিন হাফস সুফি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“ইবনে মুবারক বাগদাদ থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে মাসিসার সীমান্তের দিকে রওনা হলেন, তখন সুফিদের একটি দল তাঁর সঙ্গী হলো। ইবনে মুবারক তাঁদের বলতে লাগলেন: “তোমরা দরবেশ মানুষ, এটা পছন্দ করো না যে কেউ তোমাদের ওপর খরচ করুক।”

এই বলে তিনি একটি বড় পাত্র আনালেন, তার ওপর একটি রুমাল রাখলেন এবং বললেন: “প্রত্যেকে নিজ নিজ টাকা রুমালের নিচে রাখতে থাকো।” এখন কেউ দশ দিরহাম রাখল, কেউ বিশ দিরহাম। ইবনে মুবারক সফরে এবং মাসিসার যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁদের যাবতীয় খরচ বহন করতে থাকলেন। অভিযান শেষ হলে বললেন: “এখন ফেরার সফর, তাই অবশিষ্ট টাকা আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই।”

এই বলে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশ বিশ দিনার দিতে লাগলেন। কেউ বলত যে আমি তো বিশ দিরহাম দিয়েছিলাম, তখন তিনি বলতেন:

“আল্লাহ যদি মুজাহিদের মালে বরকত দান করেন, তবে তোমাদের কাছে তা অদ্ভুত লাগে কেন?” [৩]

হজের সফরে রওনা হওয়ার সময় তিনি নিজের শহর মার্ত-এর লোকদের একত্রিত করতেন এবং বলতেন: “তোমাদের খরচের টাকা জমা দাও।” এই টাকা একটি সিন্দুকে রেখে তাতে তালি লাগিয়ে দিতেন। এরপর পুরো কাফেলার লোকদের জন্য মক্কা পর্যন্ত সওয়ারি ভাড়া নিতেন। এভাবে মঞ্জিল পার হয়ে বাগদাদে পৌঁছাতেন। সারা পথ আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাফেলাকে উন্নত মানের খাবার সরবরাহ করতেন যাতে হালুয়া ও মিষ্টিও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাফেলাকে সর্বোত্তম পোশাক পরাতেন এবং চমৎকার শৃঙ্খলার সাথে বাগদাদ থেকে নিয়ে রওনা হতেন। কাফেলা মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালে সেখানে তিনি কাফেলার প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করতেন:

“তোমাদের বাড়ির লোকেরা তোমাদের কাছে মদিনার কোন কোন জিনিসের ফরমায়েশ করেছিল?”

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের ফরমায়েশগুলো জানাত। এরপর এই কাফেলা মক্কায় পৌঁছাত। সেখানে হজের আহকাম পালনের পর তিনি কাফেলার প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করতেন: “তোমাদের বাড়ির লোকেরা মক্কার কোন কোন জিনিস আনার ফরমায়েশ করেছিল?” লোকেরা ফরমায়েশগুলো জানাত।

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৫৬/১০

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৮২/৮

[৩] তারিখ বাগদাদ: ১৫৭/১০, ১৫৮

আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) সফরের ফিরতি পথে প্রত্যেক ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত জিনিস কিনে দিতেন। নিজ শহর মাৰ্ভে পৌঁছানো পর্যন্ত এই দানশীলতা অব্যাহত থাকত। শহরে পৌঁছে তিনি সকল হাজি সঙ্গীদের ঘর ও দরজায় চুনকাম করিয়ে দিতেন। এরপর এক মাসব্যাপী এক ভোজের আয়োজন করতেন, যার শেষে সবাইকে কাপড় ও পোশাক দিতেন। বিদায় দেওয়ার আগে তিনি একটি সিন্দুক আনিয়াে নিতেন যাতে প্রত্যেকের টাকা আলাদা থলিতে তাদের নামসহ থাকত। তিনি তাদের সেই টাকা ফেরত দিয়ে বিদায় জানাতেন। প্রতি বছর তিনি নিঃস্ব, দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য দেড় লক্ষ দিরহাম (প্রায় আড়াই কোটি টাকা) ব্যয় করতেন। [১]

জিহাদ ও বীরত্ব:

এই যুগে রোমের খ্রিস্টানদের সাথে সীমান্তে বারবার সংঘর্ষ হচ্ছিল। আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) এই লড়াইগুলোতে পূর্ণ উদ্যমে শরিক হতেন এবং বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তাঁর এক সফরসঙ্গী আবদাহ বিন সুলাইমান বর্ণনা করেন যে, এক যুদ্ধে সাধারণ লড়াইয়ের আগে একজন রোমান বীর মুসলমানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। একজন মুজাহিদ তার মোকাবিলায় বের হলেন এবং প্রথম আঘাতেই তাকে ধরাশায়ী করলেন। এরপর দ্বিতীয় আরেকজন লড়াই করতে এল, তাকেও তিনি তৎক্ষণাৎ শেষ করে দিলেন। এরপর একে একে আরও চারজন রোমান এল এবং ধুলোবালু ও রক্তে রঞ্জিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অবশেষে মুসলমানরা প্রশংসা ও ধন্যবাদের ধ্বনি দিয়ে সেই মুজাহিদকে ঘিরে ধরল। যখন তাঁর মুখ থেকে নেকাব সরানো হলো, দেখা গেল তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.)। [২]

আবদুল্লাহ বিন সিনান বর্ণনা করেন যে, তারসুসের যুদ্ধে আমরা আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.)-এর সাথে ছিলাম। একজন রোমান এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাল এবং তার মোকাবিলায় আসা ছয়জন মুসলমানকে একে একে শহীদ করে দিল। আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) এটি দেখে আমাকে বললেন: “দেখো! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তবে অমুক অমুক কাজ করো।” এই বলে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে সেই রোমানের মোকাবিলায় বের হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এরপর দ্বিতীয় আরেকজন সামনে এল, তারও একই পরিণতি হলো, এভাবে একে একে ছয়জন রোমান নিহত হলো। এরপরও আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকলেন, কিন্তু কোনো রোমানের মোকাবিলায় আসার সাহস হলো না। তখন আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন সিনান বলেন যে, পরে তিনি আমার সাথে দেখা করে বললেন: “আমার জীবদ্দশায় যদি কাউকে এটি না বলো তবে ভালো হবে।” [৩]

ফুদাইল বিন আইয়াজ (রহ.)-এর নামে রণসঙ্গীত:

তিনি নির্জন ইবাদত ও রিয়াযতের চেয়ে জিহাদকে প্রাধান্য দিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুটি কবিতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যা তিনি হারামাইনে ইবাদতকারী হযরত ফুদাইল বিন আইয়াজ (রহ.)-কে সম্বোধন করে লিখেছিলেন:

[১] তারিখ বাগদাদ: ১০/১৫৮

[২] তারিখ বাগদাদ: ১০/১৬৭

[৩] সিয়র আলামুন নুবালা: ৮/৪০৯

হে হারমাইনের ইবাদতকারী! তুমি যদি আমাদের (জিহাদের ময়দানে) লড়াই করতে দেখতে, তবে তোমার কাছে মনে হতো যে তুমি ইবাদতের নামে কেবল খেলাধুলা করছ। কেউ তার গালকে অশ্রু দিয়ে সিক্ত করে... কিন্তু আমাদের বক্ষ আমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়। অথবা কেউ তার ঘোড়াকে অনর্থক কাজে ক্লান্ত করে... কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের দিনে ক্লান্ত হয়।

তোমাদের জন্য রয়েছে আশ্বরের সুগন্ধি, কিন্তু আমাদের সুগন্ধি হলো... ঘোড়ার খুরের পবিত্র ধূলিকণা।

আমাদের কাছে আমাদের নবীর বাণী পৌঁছেছে... যা সহীহ ও সত্য, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

কোনো ব্যক্তির নাকে আল্লাহর রাস্তায় দৌড়ানো ঘোড়ার ধূলিকণা এবং জাহান্নামের লেলিহান আগুন একত্রিত হতে পারে না।

আল্লাহর কালাম আমাদের সামনে বলছে... যে শহীদ মৃত নয়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। [১]

বন্দী নারীদের বেদনা:

এই যুগে ইসলামী সীমান্তে রোমানদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। তাদের আকস্মিক হামলায় সীমান্তবর্তী জনপদগুলো লক্ষ্যবস্তু হতো এবং অনেক মুসলিম নারী-পুরুষ বন্দী হতো। যদিও আব্বাসী খলিফারা খুব দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুর থেকে প্রতিশোধ নিতেন, তবুও কাফেরদের কবলে পড়া মুসলিম নারীদের অসহায়ত্ব আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-কে প্রায়ই ব্যথিত করত। তিনি তাদের মুক্ত করার জন্য জিহাদের উৎসাহ দিয়ে নিজের এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন:

কীভাবে স্থির থাকা যায় এবং কীভাবে একজন মুসলিম শান্তিতে থাকতে পারে, যখন মুসলিম নারীরা অবাধ্য শত্রুর কাছে বন্দী?

তারা বিলাপের সাথে নিজেদের গাল চাপড়ায় এবং তাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে স্মরণ করে (যে তিনি থাকলে এমন হতো না)।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/৪১২

তাদের কোনো সামর্থ্য নেই এবং তাদের কাছে হাত ছাড়া তাদের (বন্দী) ভাইয়ের থেকে পর্দার কোনো উপায় নেই। [১]

আবদুল্লাহ বিন মুবারক হাদীসের অনেকগুলো কিতাব লিখেছেন যার মধ্যে “কিতাবুত তাফসীর”, “কিতাবুস সুনান”, “কিতাবুজ জুহুদ” এবং “কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ” প্রসিদ্ধ। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একুশ হাজার পর্যন্ত বলা হয়। [২]

তিনি অনর্থক মেলামেশা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে চলতেন। তাবলীগী কাজ, জিহাদ এবং হজ্জের ব্যস্ততা ছাড়া নিজের সময় ঘরে পড়াশোনা এবং লেখালেখির কাজে ব্যয় করতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল: “আপনি সালাতের পর আমাদের সাথে কেন বসেন না?” তিনি বললেন: “আমি সাহাবী এবং তাবিঈদের আসার (বর্ণনা) অধ্যয়ন করি। তোমরা গীবত করো। তোমাদের সাথে বসে আমি কী করব।” [৩]

৬৩ বছর বয়সে একটি জিহাদী অভিযান থেকে ফেরার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন। “আনাত”-এ তাঁকে দাফন করা হয়। হারুনুর রশীদ তাঁর মৃত্যুতে বলেছিলেন: “আজ সাইয়্যিদুল উলামা-র মৃত্যু হয়েছে।” এটি রমজান ১৮১ হিজরীর ঘটনা। [৪]

নিঃসন্দেহে তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁর মহানুভবতা, পরহেযগারী এবং ফিকহী জ্ঞান ইসলামি বিশ্বের প্রতিটি স্তরে স্বীকৃত ছিল।

[১] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৮/৪১৬

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৮/৩৯৬

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৮/৩৯৮

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৮/৪১৮। এই জায়গাটি আল-জাজিরার শহর রাব্বাহ এবং হীত-এর মাঝে ফোরাতে নদীর নিকটে অবস্থিত।

সিহাহ সিভার সংকলকগণ

বনু আব্বাসের উন্নতির যুগে যে সকল ইলমি কারনামা সম্পাদিত হয়েছে, তার মধ্যে ফিকহ সংকলনের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। এটি সেই যুগ যখন হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলিত হয়েছিল, যার ওপর এগারো-বারো শতাব্দী ধরে পুরো উম্মতের আস্থা চলে আসছে এবং যা ইসলামী আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত, সীরাত, ইতিহাস এবং আখলাক ও আদবের জন্য ভিত্তি ও বুনিয়াদের মর্যাদা রাখে।

হাদীস সংরক্ষণের কাজ নবুওয়াতের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল সংখ্যা হাদীসের হাফেজ ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস মুখস্থ করার সিলসিলা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিছু সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস লিখেও রাখতেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর যুগে সরকারি নির্দেশে হাদীসের লিখিত সংকলন তৈরি করা হয়েছিল [১]। তা সত্ত্বেও এর পরেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুখস্থ শক্তির ওপরই বেশি নির্ভর করা হতো। মুহাদিসগণের পক্ষে হাজার হাজার হাদীস এবং সেগুলোর সনদ মুখস্থ রাখা কীভাবে সম্ভব ছিল? এ বিষয়ে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন:

“মুহাদিসগণের এই জামাত ইরান ও তুর্কিস্তানের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছিল। বংশগতভাবে তারা ছিল অত্যন্ত সুস্থ, শক্তিশালী, পরিশ্রমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ইলমের প্রতি আগ্রহী এবং অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা হতো এবং তা থেকে কাজ নেওয়ার কারণে (মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো যা লালন-পালন ও অনুশীলনের মাধ্যমে অসাধারণভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে) তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখরতার এমন অসাধারণ নমুনা পেশ করত, যা এই বিশুদ্ধ কিতাবী যুগে কখনো কখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিক সাক্ষ্য তাদের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তাদের ইলমি ব্যাখ্যা মোটেও কঠিন নয়। অধিক কাজ, বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ এমন এক প্রতিভা ও মানসিক অবস্থা তৈরি করে দেয় যার এমন সব নমুনা প্রকাশ পায় যা সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বিস্ময়কর হয়।” [২]

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইলম অর্জনের মূল ভিত্তি ছিল মুখস্থ শক্তি। সেই যুগে লেখার উপকরণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। চামড়া, গাছের ছাল বা এ জাতীয় জিনিসের ওপর লেখার জন্য কাগজ ব্যবহার করা হতো। এটি ছিল দুপ্রাপ্য এবং দামী; তাই খুব কম লোকেরই এটি সংগ্রহ করার সামর্থ্য ছিল। সংক্ষেপে, বর্ণনার বিশাল ভাণ্ডার লিখে সংরক্ষণ করার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। এটাই কারণ যে প্রথম হিজরী শতাব্দীর ইলমি দলিলসমূহ কিতাবী আকারে...

[১] ফাতহুল বারী: ১৯৪/১, ১৯৫

[২] তারিখ-এ দাওয়াত ও আজীমত: ৭৮/১

সংরক্ষিত হয়ে আসছে, তাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। [১] যেহেতু কুরআন মাজীদ শরীযতের ভিত্তি এবং হাদীসের ভাণ্ডারের তুলনায় সংক্ষিপ্ত, আর আল্লাহ তাআলা তাকভীনি (প্রাকৃতিক) ভাবে এর স্মরণের ব্যবস্থা করেছেন; তাই এটি হাফেজদের মাঝেও প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং কিতাবী আকারেও। হাদীসের ময়দানে সেই সময়ের উলামা ও তলাবাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের মুখস্থ শক্তির ওপর নির্ভর করতেন। তাদের মুখস্থ শক্তি অত্যন্ত মজবুত ছিল। বরং এটা বলা সঠিক হবে যে, সেই যুগে হাদীসের আলিম কেবল তিনিই হতে পারতেন যার মুখস্থ শক্তি ছিল অসাধারণ। সাহাবী কিরাম এবং তাবিঈদের মধ্যে যত প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন, তারা সবাই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, যেমন হযরত আবু হুরায়রা, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত انس বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুম, ইমাম শাবী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সাঈদ বিন জুবায়ের রাহিমাহুমুল্লাহ।

কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটি ইলমী বিপ্লব আসে। বাগদাদে কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উন্নত মানের কাগজ পরিচিতি লাভ করে। ফলে সরকারি ও ব্যবসায়িক বিষয়াদি থেকে শুরু করে ইলমী কাজ পর্যন্ত সব কিছুতেই ধীরে ধীরে লেখালেখি সাধারণ হতে শুরু করে। [২]

তবে এই পরিবর্তন দুই-চার বছরে আসেনি বরং এতে কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট বছর সময় লেগেছে। যেমনটি আমরা দেখি যখন কোনো নতুন, সহজ এবং অধিক উপকারী পদ্ধতি পরিচিত হয়, তখন পূর্ববর্তী পদ্ধতিটি হঠাৎ করে একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে যায় না বরং দুই-তিন প্রজন্ম পর্যন্ত উভয় পদ্ধতিই চলতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে পুরনো কঠিন পদ্ধতিটি পরিত্যক্ত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কিতাবত সাধারণত হাতেই করা হতো। তারপর কম্পোজের যুগ শুরু হলো কিন্তু কিতাবতের কাজও চলতে থাকল। আর এখন কেবল কম্পোজই হয়।

কাগজ সহজলভ্য হওয়ার পর সব ধরনের ইলম ধীরে ধীরে হাফেজদের পাশাপাশি কিতাবসমূহেও স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। ষাট-সত্তর বছরে অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ লেখালেখির প্রচলন সাধারণ হয়ে গিয়েছিল, যদিও মুখস্থ শক্তির ওপর নির্ভর করার প্রবণতাও অবশিষ্ট ছিল। হাদীসের উস্তাদগণ নিজেদের লেখা পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে ছাত্রদের শোনাতে। ছাত্ররা সেগুলো শব্দে শব্দে নকল করত। বড় বড় হাদীস বিশারদদের নির্ভরতা মুখস্থ শক্তির পাশাপাশি নিজেদের পাণ্ডুলিপির ওপরও ছিল। যে উস্তাদ যত বেশি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে অধিক হাদীস সংগ্রহ করতেন, তার দরস তত বেশি জনপ্রিয় হতো। কিতাব নকলকারী কাতিবদের একটি নিয়মিত পেশা গড়ে ওঠে যারা বড় বড় কিতাব কয়েক দিনের মধ্যে নকল করে পেশ করে দিতেন। এভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দীর ইলমে সীনা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইলমে সাফীনা হয়ে গেল। হিজরী প্রথম শতাব্দীর হাতেগোনা কিছু কিতাব আমাদের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ডজন ডজন এবং তৃতীয় শতাব্দীর শত শত কিতাব আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে।

[১] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু (মৃ. ৬৮ হি.) এবং মুজাহিদ বিন জাবর (মৃ. ১০৪ হি.)-এর তাফসীরসমূহ, হযরত হাসান বসরী (১১০ হি.)-এর “ফাযায়েলে মক্কা”, মুহাম্মদ বিন সীরীন (১১০ হি.)-এর “তাফসীরুল আহলাম”, কাতাদা বিন দাতামা (১১৮ হি.)-এর “আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ” এবং হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (১৩১ হি.)-এর সহীফায়ে হাদীসকে হিজরী প্রথম শতাব্দী বা তার নিকটবর্তী সময়ের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। রাফেযী সুলাইম বিন কায়স নামক এক কাল্পনিক বর্ণনাকারীর কিতাব “কিতাব সুলাইম বিন কায়স”-কে হিজরী প্রথম শতাব্দীর রচনা বলা হয় যা নিছক মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে এটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর রচনা, কারণ এতে হযরত আবু বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা-এর চরম চরিত্রহনন করা হয়েছে অথচ খাইরুল্ল কুর্‌আন অর্থাৎ হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হযরত আবু বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা-কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হতো।

[২] লুগাতুল হাযারাহ, উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট, অনুবাদ: ডক্টর জাকি নাজীব: ১৩/১৬৯, ১৭০।

ইমাম যাহাবী বলেন: “আর এই যুগে ইসলামের উলামাগণ হাদীস, ফিকহ এবং তাফসীর সংকলন শুরু করেন... তার কথা পর্যন্ত: এবং মুখস্থ রাখার প্রবণতা কমতে শুরু করে।” (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ৯/১২, ১৪৩ হিজরীর অধীনে) এবং দেখুন: আন-নুজুমুয যাহিরাহ লিতাগরী বারদী: ১/৩৫১, তাবা দারুল কুতুব মিসর।

গ্রন্থ রচনার এই প্রাথমিক যুগে ফিকহী বর্ণনার ওপর ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৫০ হি.)-এর কিতাবুল আসার, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৭৯ হি.)-এর আল-মুয়াত্তা এবং ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২০৪ হি.)-এর ‘মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী’ জনসমক্ষে আসে। এই সবগুলোই ফিকহী বিন্যাসে সংকলিত হয়েছিল। এই একই যুগে মা’মার বিন রাশিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৫৩ হি.) এবং এরপর আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৯৭ হি.) তাদের সংকলনগুলো পেশ করেন। এই উভয়টি ‘আল-জামে’ নামে ছিল যা তাদের নিজ নিজ সংকলকদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। এরপর কিছু প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ‘মুসনাদ’সমূহ পেশ করেন যাতে সাহাবীদের বর্ণনাগুলো আলাদা আলাদাভাবে উদ্ধৃত ছিল। এগুলোর মধ্যে মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি (মৃ. ২০৪ হি.), মুসনাদে হুমাইদি (মৃ. ২১৯ হি.), মুসনাদে আলী বিন জা’দ (মৃ. ২৩০ হি.), মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (মৃ. ২৩৮ হি.) এবং মুসনাদে দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.) প্রসিদ্ধ। এই যুগে ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২১১ হি.) এবং ইমাম আবু বকর বিন আবি শায়বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২৩৫ হি.) ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী ‘মুসান্নাফ’ শিরোনামে দুটি অত্যন্ত বিশাল ও মহিমাম্বিত সংকলন পেশ করেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে ১৯ হাজার ৩১৮টি এবং মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় ৩৭ হাজার ৯৩৩টি বর্ণনা রয়েছে। কিছু আলেম বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হাদিস সংগ্রহ করেছেন যেমন আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ১৮১ হি.)-এর আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, কাসিম বিন সালাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২২৪ হি.)-এর আল-ঈমান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২২৮ হি.)-এর ‘আল-ফিতান’ এবং ইবনে যানজুয়াইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ. ২৫১ হি.)-এর ‘আল-আমওয়াল’। হাদিসের এই সংকলনগুলো সেই সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে এই সমস্যা অবশ্যই দেখা দিতে পারত যে, যদি উম্মতকে ডজন ডজন হাদিস ভাণ্ডার থেকে সবচেয়ে সংরক্ষিত বর্ণনাগুলো নির্বাচন করতে হয়, তবে তারা কাকে অগ্রাধিকার দেবে।

এটি সেই সময় ছিল যখন ই’তিযাল (মু’তাযিলা মতবাদ)-এর সূচনা হয়েছিল। মু’তাযিলা আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহকে বিবেকের অনুগামী করছিলেন। অন্যদিকে জাহম বিন সাফওয়ানের অনুসারীদের বিবেকপূজারী দলটিও বিদ্যমান ছিল যাদের জাহমিয়া বলা হতো। শিয়া মতবাদ রাফয-এ রূপান্তরিত হচ্ছিল এবং যিন্দিকদের সেই আন্দোলনগুলো যাদের মাহদী এবং হারুনুর রশীদ অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করেছিলেন, সেগুলো তখনও ভূগর্ভস্থ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। পথভ্রষ্ট দলগুলো আকীদা, আহকাম, সীরাত এবং ইতিহাসে জাল বর্ণনা তৈরির কাজ অব্যাহত রেখেছিল। এগুলোর যাচাই-বাছাই কেবল মুহাদ্দিসগণই করতে পারতেন। ফলে হারুনুর রশীদের দরবারে একজন যিন্দিককে আনা হলো এবং যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে লাগল, তখন সে বলল: “তোমরা আমাকে তো হত্যা করে ফেলবে, কিন্তু সেই এক হাজার হাদিসের কী করবে যা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি?” এটি শুনে হারুন তৎক্ষণাৎ বললেন: “হে আল্লাহর শত্রু! তুই আবু ইসহাক ফায়ারী এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারককে কীভাবে ভুলে গেলি? তারা এগুলোকে চালুনির মতো ছেকে এর একটি একটি অক্ষর বের করে ফেলে দেবেন।” [১]

সিহাহ সিভাহ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা:

সুতরাং সেই সময়ে কিছু হাদিস বিশেষজ্ঞ এই প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, জাল বর্ণনা থেকে বেঁচে নির্ভরযোগ্য এবং দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্য হাদিসের এমন কিছু সংকলন তৈরি করা হোক যা মানের দিক থেকে প্রচলিত সংকলনগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, দ্বীনের প্রতিটি শাখা সম্পর্কিত হাদিস সেগুলোতে জমা করা হবে, আইম্মায়ে আরবা অর্থাৎ: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ফিকহী দলিলসমূহও এতে চমৎকার বিন্যাসের সাথে বিদ্যমান থাকে এবং এগুলি ছাড়াও বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর বাতিল আকিদা খণ্ডনের জন্য এই সংকলনগুলো যথেষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতের উম্মতের উলামায়ে কেরাম আকিদা ও আহকামসহ সকল ক্ষেত্রে এই সংকলনগুলো থেকেই দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অনেক মুহাদ্দিস দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করেছেন।

তাদের মধ্যে যে ছয়জন ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তাদেরকে “মুয়াল্লিফিনে সিহাহ সিভাহ” বলা হয়। এই ব্যক্তিবর্গ হলেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)। সিহাহ সিভাহ বলতে এই ছয়জন ব্যক্তিত্বের সংকলিত ছয়টি হাদিসের কিতাবকে বোঝানো হয়, যার ওপর বারো শতাব্দী ধরে উম্মতের আস্তা চলে আসছে। পরবর্তী লাইনগুলোতে এই মুহাদ্দিসগণ এবং কিতাবসমূহের পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে।

এখানে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা কৌতূহলোদ্দীপক হবে যে, যেভাবে ফিকহ শাস্ত্রের প্রথম সংকলক ইমাম আবু হানিফা আজমী ছিলেন, তেমনি হাদিস শাস্ত্রের আমিরুল মুমিনীন ইমাম বুখারী (রহ.)-ও আজমী ছিলেন। বরং সিহাহ সিভাহর ছয়জন লেখকের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ব্যতীত বাকি সবাই আজমী ছিলেন, যেমনটি সামনে তাদের জীবনীতে আসছে। এটি এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামের হেফাজত ও প্রসারে আরব ও আজমের মুখলিস মুসলমানগণ কোনো প্রকার জাতিগত বৈষম্য ছাড়াই ঐক্যবদ্ধ এবং একই পথে অগ্রসর ছিলেন।

এটি সেই সময় ছিল যখন ইসলামি বিশ্বের জনসংখ্যায় আজমীদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। ইরাক ও পারস্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার পৌনে দুই শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু তুর্কিস্তানও মুসলিম শাসকদের দূরদর্শিতা ও কৌশল এবং উলামা ও মুবাল্লিগদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। আজম থেকে উদ্ভূত যেসব অনৈসলামিক আন্দোলনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলো নিজ স্থানে একটি বাস্তবতা, কিন্তু তার কারণে সকল আজমীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা এবং তাদের দ্বীনি ও রাজনৈতিক খিদমতসমূহকে উপেক্ষা করাও চরম অবিচার। এখন মুয়াল্লিফিনে সিহাহ সিভাহর ইলমি প্রচেষ্টাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হচ্ছে।

আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী রহমাতুল্লাহ

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁকে তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদিস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর হাদীস সংকলন যা “সহীহ বুখারী” নামে পরিচিত, সুন্নাহর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য উৎস। একে “আসসাহল কুতুব বা’দা কিতাবিল্লাহ” বলা হয়, অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)-এর পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ-এর আসল নাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল। তিনি ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজমী (অনারব) নওমুসলিমদের একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন মুগীরাহ, যিনি উমাইয়া যুগে বুখারার গভর্নরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম মুগীরাহ রাখা হয়েছিল। [১] মুগীরাহর পরিবার উলামা ও নেককারদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাইল ছিলেন ইলম ও ফযীলতের অধিকারী। তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সাথে মুসাফাহা করেছিলেন। [২]

ইমাম বুখারী শৈশবে কোনো এক অসুস্থতার কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মা তাঁর চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করে দুআ করতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর ঘিয়ারত লাভ করেন, যিনি তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন: “আল্লাহ তোমার অত্যধিক রোনাজারি ও দুআর কারণে তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।” তিনি যখন জেগে উঠলেন, তখন দেখলেন যে শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে গেছে। [৩] এটি এই বিষয়ের ইঙ্গিত ছিল যে, আল্লাহ এই শিশুর মাধ্যমে কোনো অসাধারণ কাজ নিতে চান।

ইমাম বুখারী সেই যুগে কুদরতে ইলাহীর এক অনন্য নিদর্শন ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, যা কিছু একবার তাঁর কানে পৌঁছাত তা চিরদিনের জন্য মুখস্থ হয়ে যেত। তিনি নিজেই বলতেন যে, যখন তাঁর বয়স নয় বা দশ বছর ছিল এবং তিনি লেখার অনুশীলন করতেন, তখনই হাদীসের ইলম তাঁর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

হাদীস শাস্ত্রে ‘ইসনাদ’ (বর্ণনাকারী পরম্পরা)-এর জ্ঞান বিশেষভাবে কঠিন বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু ইমাম বুখারী শৈশব থেকেই এতে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি যেকোনো ভুল সনদ তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারতেন যে কোনো বর্ণনার মূল সনদ কী এবং এর সনদে কী পরিবর্তন করা হয়েছে। এগারো বছর বয়সে তিনি মুহাদিসদের মজলিসে বসতে শুরু করেন। একদিন তিনি এক উস্তাদের মজলিসে বসা ছিলেন। উস্তাদ একটি পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা শোনাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: “সুফিয়ান আবু আয-যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন।”

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন: “সুফিয়ান আবু আয-যুবায়ের থেকে কোনো বর্ণনা শোনেনি, তাঁদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়।” উস্তাদ তাঁকে ধমক দিয়ে চুপ করাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে বললেন: “আপনি মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখে নিন।”

[১] ওফায়াতুল আ’যান: ১৯০/৪

[২] সিয়রু আ’লামিন নুবালা: ৩৯২/১২

[৩] তাহযীবুল কামাল: ৪৪৫/২৪

উস্তাদ ভেতরে গেলেন এবং মূল পাণ্ডুলিপি খুলে দেখলেন যে ইমাম বুখারী ঠিকই বলছেন।

উস্তাদ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন: “বাহা! তুমি কী বলছিলে?” ইমাম বুখারী সঠিক সনদটি বললেন এবং উস্তাদ কলম নিয়ে পাণ্ডুলিপিতে সংশোধন করে নিলেন। [১]

বড় বড় ফকীহদের মজলিসে বসতে শুরু করলে অল্প বয়সের কারণে সালাম দিতে লজ্জা পেতেন এবং একপাশে চুপচাপ বসে যেতেন। তাঁর সহপাঠীরা কখনো কখনো তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত, কিন্তু উস্তাদ তাঁর প্রতিভা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন: “ওকে নিয়ে হেসো না। হতে পারে একদিন সে তোমাদের ওপর হাসবে।” [২]

সেই যুগের একজন আলেম সালীম বিন মুজাহিদ বলেন যে, আমি একজন মুহাদিসের কাছে গেলাম, তখন তিনি বললেন: “এইমাত্র এখান থেকে একটি ছেলে উঠে গেল যার সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ।” সেই আলেম দ্রুত উঠে গিয়ে সেই ছেলের কাছে পৌঁছালেন। এই ছেলেটি ছিলেন ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আলেম বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার কি ৭০ হাজার হাদীস মুখস্থ?” তিনি বললেন: “শুধু হাদীসই মুখস্থ নয়, বরং রাবীদের নাম ও বংশ পরিচয়, জন্ম সাল, মৃত্যু সাল এবং বাসস্থানও জানা আছে। আর প্রতিটি বর্ণনা সম্পর্কে এটাও জানি যে কিতাব ও সুন্নাহতে এর মূল ও ভিত্তি কোথায়।” [৩]

ষোল বছর বয়সে তিনি আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ওয়াকী বিন জাররাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো প্রখ্যাত মুহাদিসগণের কিতাবসমূহ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। [৪] সেই সময়েই তিনি তাঁর মা ও ভাইয়ের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যান। হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করে মা তো ভাইয়ের সাথে নিজ দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি ইলমের নেশায় সেখানেই রয়ে গেলেন। [৫]

হাদীস অর্জনের জন্য সফর শুরু করলে বলখ, নিশাপুর, রায়, বাগদাদ, বসরা, কুফা, মক্কা, মদীনা, শাম এবং মিসর পর্যন্ত যান। তিনি নিজেই বলতেন যে: আমি ১০৮০ জন মুহাদিসের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছি। যেখানেই যেতেন সেখানে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জনে মগ্ন থাকতেন। তাঁর একজন সহপাঠী হানী বিন নযর বলতেন: “আমরা শামে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের মজলিসে ছিলাম। আমরা যুবকদের মতো ফলমূল খাওয়ার আমোদে লিপ্ত থাকতাম কিন্তু মুহাম্মদ বিন ইসমাইল হাদীস নিয়েই মগ্ন থাকতেন।” [৬]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এমন দক্ষতা ছিল যে, সনদ বা মতনে যেকোনো ধরনের সংমিশ্রণ তিনি সাথে সাথে ধরে ফেলতেন। বাগদাদে গেলে সেখানকার মুহাদিসগণ তাঁর পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একশটি হাদীসের সনদ ওলটপালট করে তাঁর সামনে এমনভাবে পেশ করলেন যে, দশজন আলেম একে একে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রত্যেকে দশটি করে হাদীস এমনভাবে শোনালেন যে সেগুলোর সনদ ও মতন একে অপরের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি প্রতিটি হাদীস শুনে বলতে থাকলেন: “আমি শুনি নি, আমি জানি না।”

লোকজন ভাবল যে তাঁর হাদীস বিশারদ হওয়ার দাবি নিছক অসার। কিন্তু সব হাদীস শোনার পর এবং নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করার পর তিনি প্রথম আলেমকে বললেন: “তুমি প্রথম হাদীসটি এভাবে শুনিযেছিলে, সেটি আসলে এভাবে হবে; দ্বিতীয়টি এভাবে, তৃতীয়টি এভাবে।” এভাবে সেই দশজন আলেমের প্রত্যেককে তাঁদের ভুল হাদীসগুলোর স্থলে একইভাবে ক্রমানুসারে সঠিক

[১] তাহযীবুল কামাল: ৪৩৯/২৪

[২] তাহযীবুল কামাল: ৪৩৯/২৪

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০১/১২

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০০/১২

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪১৭/১২

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪০৫/১২

সারসংক্ষেপ

তারিখ-এ-সুন্নাত

হাদিস শুনিয়ে যেতে লাগলেন। এটি দেখে মানুষ হতবাক হয়ে গেল।

সতেরো বছর বয়সে, যখন তাঁর চেহারা এখনও দাড়ির একটি চুলও গজায়নি, তিনি হাদিসের উস্তাদ হয়ে গেলেন। দরসে এত বরকত হলো যে, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাই (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

আঠারো বছর বয়সে তিনি বর্ণনার ওপর এতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর উস্তাদগণ ইলমি আলোচনায় তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রাখতেন। [২] এগুলো ছিল সেই ইলমি ব্যক্তিত্বের কিছু গুণাবলি, যিনি বিশ্বের জন্য হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার সংকলন করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মামুনুর রশীদের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মুতাসিমের যুগে তিনি যুবক ছিলেন এবং তাঁর ইলম ও ফযিলতের চর্চা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ওয়াসিক বিল্লাহর সময়ে তাঁকে উম্মতের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হতো, যিনি একে নিজের ইলমি প্রয়োজন ও অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করতেন। সেই সময়ে মুহাদ্দিসদের কাছে আলাদা আলাদা মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হাদিসের সংকলন তো বিদ্যমান ছিল, কিন্তু প্রথমত সেই বর্ণনাগুলোর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, সেগুলোতে সহিহ ও যযিফ সব ধরনের বর্ণনা মিশে ছিল। তৃতীয়ত, সেই সংকলনগুলোতে এমন কোনো বিন্যাস ছিল না যাতে প্রয়োজনীয় মাসআলার বর্ণনাগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে একদিন মুহাদ্দিসদের এক মজলিসে কেউ একজন বললেন:

“হায়! তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব সংকলন করতে।” [৩]

এই কথাটি ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অন্তরে গেঁথে গেল এবং তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সেই সংকলনটি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, যাকে সহিহ বুখারী বলা হয়। তিনি যদি সাধারণ মুহাদ্দিসদের মতো কেবল বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করতেন, তবে এই কাজ কয়েক মাসেই সম্পন্ন হয়ে যেত; কিন্তু ইমাম বুখারী জানতেন যে, কেবল বর্ণনা সংগ্রহ করলে শ্রুতিলিপি সংকলনগুলোর মধ্যে আরও একটি নতুন সংকলন যুক্ত হবে, যা আগে থেকেই শত শত সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মনোযোগ কাজের বিশালতার ওপর নয়, বরং এর গুণগত মানের ওপর ছিল এবং বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের চিন্তাধারা এমনই হয়ে থাকে। তাই ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি উচ্চতর মানদণ্ড নির্ধারণ করেন এবং তা ক্রমাগত উন্নত করতে থাকেন। সহিহ বুখারী, যা তাঁর সারা জীবনের মেহনতের নির্যাস, সেখানে তিনি তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত সকল যোগ্যতা ঢেলে দিয়েছেন এবং মানদণ্ডকে সনদ, মতন ও বিন্যাসের সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যার চেয়ে বেশি কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এটি কেবল সেই যুগের নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের দ্বিনি প্রয়োজনসমূহ সামনে রেখে সংকলিত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসগুলোকে উপযুক্ত ও সবচেয়ে উপকারী বিন্যাসের সাথে উপস্থাপন করার জন্য প্রায়ই চিন্তা করতেন। যখনই কোনো নতুন বিষয় মাথায় আসত, তখনই কাগজ তুলে নিতেন এবং কিতাবে পরিবর্তন শুরু করে দিতেন। কখনো কখনো রাতের বেলা বিছানা থেকে উঠে কলম ধরতেন এবং পরিমার্জন ও সংশোধন করতেন। সফরেও এই কাজ সাথে থাকত এবং মেজবানের ঘর একজন মুহাদ্দিসের হুজরায় পরিণত হতো।

(২) সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ৪০১/১২

(৪) তারিখ বাগদাদ: ৮/২

(১) ওফায়াতুল আ'য়ান: ১৮৯/৪

(৩) সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ৪০১/১২

এর সাথে সাথে আল্লাহর কাছে কিতাবটির কবুলিয়াতের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। ইখলাস এবং খুশু-খুযুর অবস্থা সর্বদা তাঁর ওপর বিরাজমান থাকত। প্রতিটি হাদিস লেখার আগে তিনি গোসল করতেন এবং দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। হাদিসের শিরোনাম নির্ধারণের কাজ মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে রিয়াজুল জাম্মাতে সম্পন্ন করেছেন। বারগাহে রুবুবিয়াতে তাঁর এই আদব এবং রাসূলের কাজের প্রতি এই সম্মানের কারণে আল্লাহ এই সংকলনকে এমন এক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে সমস্ত লেখকগণ এর ওপর ঈর্ষা করেন। এই সংকলনের নাম ‘আল-জামি’ আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি’ রাখা হয়েছিল, যা তাঁর নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ‘সহীহ বুখারী’ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। [১] ইমাম সাহেব বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, সংকলন এবং হাদিসের ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ছয় লক্ষ হাদিস থেকে ৭৫৬৩টি হাদিস নির্বাচন করে এই সংকলনে একত্রিত করেছেন। অনেক সহীহ বর্ণনা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বর্জনও করেছেন। এই মহান পরিকল্পনা ষোলো বছরে সম্পন্ন হয়েছিল যা তিনি নিজের জন্য নাজাতের মাধ্যম মনে করতেন। [২] এই হাদিস সংকলনের সবচেয়ে বড় তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- এর বিশুদ্ধতা।
- এর বিন্যাস।
- এর শিরোনামসমূহ যেগুলোকে ‘তরাজুমুল আবওয়াব’ বলা হয়।

বিশুদ্ধতার অবস্থা এই যে, কোনো দুর্বল বর্ণনাকারীর কাছ থেকে কোনো বর্ণনা নেওয়া হয়নি। বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই কিতাব ‘আল-আসার’ এবং ‘মুয়াত্তা মালিক’ থেকে অনেক বেশি উন্নত। এর শিরোনামগুলো হাদিস এবং ঘটনাবলি থেকে অত্যন্ত দূরদর্শী, সূক্ষ্ম এবং উপকারী ফলাফল বের করে অন্তরকে অন্তর্দৃষ্টি এবং মনের জ্যোতি দান করে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এতে শুধু ফিকহি মাসআলা অর্থাৎ: পবিত্রতা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানই নয়, বরং ঈমান ও আকিদা, কুরআনের তাফসির, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, সীরাতে নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদিসও পেশ করেছেন। এই সংকলন থেকে সাহাবায়ে কেরামের সঠিক ইতিহাসের ব্যাপারেও অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

নিজের সময়ের এই মহান মুহাদ্দিসকেও শাসকদের কঠোর মেজাজের লক্ষ্যবস্তু হতে হয়েছিল। বুখারার শাসক খালিদ বিন আহমদ অনুরোধ করেছিলেন যে ইমাম বুখারী যেন তাঁর বাড়িতে এসে সহীহ বুখারী পড়ান। ইমাম সাহেব এই ফরমায়েশের জবাবে বলেছিলেন: “আমি ইলমকে লাঞ্চিত করতে পারি না। যদি শাসক হাদিস পড়তে চান তবে তিনি নিজেই উপস্থিত হোন।”

এতে বুখারার শাসক ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে শহর ছাড়তে বাধ্য করেন। রমজান মাস ছিল; আপনি শহর ছেড়ে নতুন গন্তব্যের দিকে রওনা হলেন। পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ৩০ রমজান ২৫৬ হিজরির সূর্য যখন অস্ত গেল এবং মানুষ ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখে আনন্দ করছিল, তখন সমরকন্দের নিকটবর্তী গ্রাম ‘খরতঙ্গ’-এ ইলমে হাদিসের এই আসমানি চাঁদ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। খরতঙ্গে এই মহান মুহাদ্দিসের মাজারে আজও জিয়ারতকারীদের ভিড় থাকে। [৩]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৪০৪, ৪০৫।

[২] আল-মুত্তাজাম, সন ২৫৬ হিজরি; আত-তাকরীবুত তাহজীব, পৃ. ৫৭৬৭।

[৩] তাবাকাতুল হানাবিলা লি ইবনি আবি ইয়াল: ১/২৭৬, ত. দারুল মা’রিফাহ বৈরুত।

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী রহ.

আহাদিসের হেফাজত ও প্রচার-প্রসারে দ্বিতীয় অসাধারণ কাজটি ইমাম মুসলিম রহ. করেছেন। তিনি ২০৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.-এর দশ বছর পর। তাঁর সম্পর্ক ছিল নিশাপুরের ‘কুশাইর’ নামক জনপদের একটি অনারব পরিবারের সাথে। ইমাম বুখারীর পর সেই যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস তাঁকেই মানা হতো। তিনি পনেরো বছরের পরিশ্রমের পর তিন লক্ষ আহাদিস থেকে বারো হাজার এমন বর্ণনা নির্বাচন করেছেন যেগুলোর সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সেই যুগের মাশায়েখে হাদিসদের ঐকমত্য ছিল।

এই সংকলনটি তিনি তাঁর সময়ের মহান মুহাদ্দিস ও সমালোচক ইমাম আবু যুরআ রহ.-এর কাছে নিয়ে যান। তিনি যে বর্ণনাটিকে কোনো কারণে অনুপযুক্ত মনে করেছেন, সেটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এভাবে “আল-মুসনাদ আস-সহীহ” নামে ইসলামী আকীদা, আহকাম এবং সুন্নাহে নববিয়্যাহর এই মহান সংকলনটি সংকলিত হয় যা বিশুদ্ধতা ও মানের দিক থেকে সহীহ বুখারীর সমপর্যায়ের মনে করা হয়। বরং কোনো কোনো আলেম তো একে সহীহ বুখারীর ওপর প্রাধান্য দেন। মহান মুহাদ্দিস আবু আলী নিশাপুরী বলতেন: “আসমানের নিচে সহীহ মুসলিমের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য কিতাব আর নেই।” এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সহীহ মুসলিম বিন্যাসের সৌন্দর্যে সহীহ বুখারীর চেয়ে অগ্রগামী। ইমাম মুসলিম রহ. বলতেন: “মুহাদ্দিসগণ যদি দুইশ বছর পর্যন্তও হাদিস লিখতে থাকেন, তবে তাদের নির্ভরতা এই কিতাবের ওপরই হবে।”

ইমাম মুসলিম রজব ২৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন কিন্তু তাঁর এই কথাটি এতটাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে যে, আজ বারো শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর কিতাবটি দ্বীন ইসলামের মৌলিক উৎসের মর্যাদা লাভ করে আছে। তাঁর ইন্তেকালের ঘটনাটিও তাঁর ইলমি নিমগ্নতার প্রমাণ। তিনি কিতাব খুলে কোনো হাদিস তালাশ করছিলেন এমতাবস্থায় কেউ এক বুড়ি খেজুর উপহার পাঠাল। তিনি পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটি একটি করে খেজুর মুখে দিতে থাকলেন এমনকি পুরো বুড়ি খালি হয়ে গেল অথচ তিনি টেরও পেলেন না। এই কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থতাই মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়। [১]

ইমাম নাসায়ী রহ.

ইমাম আহমদ বিন শুআইব নাসায়ী রহ. ২১৫ হিজরিতে খোরাসানের ‘নাসা’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি সেই সময়ের অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মতো দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে ইলমে হাদিস অর্জন করেন। সেই যুগে খোরাসান ইলমের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ছোট ছোট শহরগুলোতে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম নাসায়ী বাগলানে কুতাইবা বিন সাঈদ-এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের কাছে পুরো চৌদ্দ মাস অবস্থান করে হাদিস অর্জন করেন। এরপর ইরাক, হিজাজ, শাম এবং ইসলামী সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে মুহাদ্দিসদের তালাশ করতে থাকেন। পরিশেষে মিসরকে আবাসভূমি বানিয়ে নেন। সেখানেই তাঁর দরসের হালকা প্রতিষ্ঠিত হয় যেখান থেকে অগণিত ছাত্র উপকৃত হতো।

[১] আল-মুনতাজাম: সন ২৬১ হিজরি; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৫৫৭ থেকে ৭৬৫; শারহ সহীহ মুসলিম ইমাম নববী রহ. থেকে: ১/১০০, ত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি।

ইমাম নাসাঈ এক চমৎকার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বার্ষিক্য সত্ত্বেও চেহারায় রক্তের লালিমা ফুটে উঠত। স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল; কারণ তিনি এর পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। মোরগের গোশত তাঁর প্রিয় খাবার এবং নাবীয তাঁর প্রিয় পানীয় ছিল। চারজন স্ত্রী ছিল এবং আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। ঘর-সংসারকে তিনি কখনো ইলমী ব্যস্ততার পথে বাধা হতে দেননি। তিনি যত বড় আলেম ছিলেন, তত বড় ইবাদতকারীও ছিলেন। রাতের অনেকটা সময় তিলাওয়াত এবং নফল ইবাদতে কাটাতেন। মিসরের শাসকরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। ইমাম নাসাঈ সাধারণত শাসকদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু যখনই রোমানদের কাছ থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার বিষয় আসত, তিনি তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। শাসকদের সাথে সীমান্তে যেতেন এবং বন্দীদের মুক্তির পর্যায়গুলো তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন হতো।

৩০২ হিজরীর ঘিলকদ মাসে তিনি সিরিয়া (শাম) গেলে দেখলেন যে সেখানে নাসিবীদের সংখ্যা অনেক। ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে “খাসাইসে আলী (রা.)” শিরোনামে একটি কিতাব লিখলেন। সেখানেই একদিন জনসমাবেশে লোকেরা তাঁর মুখ থেকে এমন কথা বলাতে চাইল যাতে হযরত আলী (রা.)-এর ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসাঈ তাদের ইচ্ছার বিপরীতে কঠোর জবাব দিলে চরমপন্থী লোকেরা তাঁর ওপর বাঁপিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তাঁকে আহত অবস্থায় তুলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁর মৃত্যু হয় এবং রামলায় দাফন করা হয়। এটি ৩০৩ হিজরীর শাবান মাসের ঘটনা। [১]

তিনি “আস-সুনানুল কুবরা” নামে বারো হাজার হাদীসের একটি সংকলন তৈরি করেন যাতে এমন সমস্ত বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলোর পরিত্যাগের ওপর মুহাদিসগণের ঐকমত্য নেই। পরবর্তীতে এর মধ্য থেকে সহীহ হাদীসসমূহের একটি আলাদা সংকলন “আল-মুজতবা” নামে পেশ করা হয় যা ৫৭৬১টি হাদীস সম্বলিত ছিল। একেই “সুনানে নাসাঈ” বলা হয় যা দ্বীনি মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নাসাঈ (রহ.) নিজে বলতেন যে, আমার সুনান সহীহ হাদীসসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

ইমাম ইবনে রুশদ বলতেন: “ইমাম নাসাঈর এই সংকলন সমস্ত হাদীস গ্রন্থ থেকে অনন্য এবং বিন্যাসের দিক থেকে সর্বোত্তম। বুখারী ও মুসলিমের পদ্ধতিসমূহ এতে একত্রিত করা হয়েছে এবং ইলমে হাদীসের অনেক জটিলতাও এতে দূর করা হয়েছে।” [২]

সনদের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈকে বুখারী ও মুসলিমের চেয়েও বেশি কঠোর মনে হয়। তিনি এমন কিছু রাবীকেও (বর্ণনাকারী) বর্জন করেছেন যাদের থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এজন্যই ইমাম মাআফিরী (রহ.) বলতেন: “যে বর্ণনার তাখরীজ ইমাম নাসাঈ করেছেন, তা অন্যান্য মুহাদিসগণের বর্ণনার তুলনায় অধিক সহীহ হবে।” [৩] একারণেই কিছু আফ্রিকান আলেম সুনানে নাসাঈকে বুখারী ও মুসলিমের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন যে, ইমাম নাসাঈ হাদীস, ইল্লাল হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম, তিরমিযী এবং আবু দাউদের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি বুখারী এবং আবু যুরআহ-এর সমপর্যায়ের। [৪]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/১৪, ১৩৪। কিছু লোকের ধারণা যে তাঁকে মক্কায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। এটি গবেষণার পরিপন্থী যেমনটি হাফেজ যাহাবী (রহ.) ব্যাখ্যা করেছেন।

[২] মুকাদ্দিমা যাহরুর রুবা আলাল মুজতবা (দ্রষ্টব্য: সুনানে নাসাঈ বিশারহিস সুয়ুতী-এর এই মুকাদ্দিমা: ১/৫, তাবা দারুল মা’রিফাহ বৈরুত)।

[৩] মুকাদ্দিমা যাহরুর রুবা আলাল মুজতবা (সুনানে নাসাঈ বিশারহিস সুয়ুতী: ১/৫)।

[৪] তাওহীছল আফকার লি-মাআনি তানকীহিল আনযার লিল আমীর আস-সানআনী, পৃ. ১৯৮।

ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি রহ.

ইমাম আবু দাউদের আসল নাম ছিল সুলাইমান ইবনুল আশআস। তিনি ২০২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরব গোত্র বনু আজদ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা সিজিস্তানে (দক্ষিণ আফগানিস্তান) বসবাস করতেন। এখানে এটি একটি সমৃদ্ধ পরিবার ছিল যারা জমি ও সম্পত্তির মালিক ছিল। কিন্তু আবু দাউদ রহ.-এর যখন ইলম অর্জনের নেশা জাগল, তখন তিনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দেশে দেশে সফর করে ইলমে হাদিস শিক্ষা করলেন। বসরায় পৌঁছে সুলাইমান বিন হারব, আবুল ওয়ালিদ এবং আবুল উসমান-এর মতো মুহাদ্দিসদের থেকে ফয়েজ হাসিল করলেন। এরপর সিরিয়া ও মিশরে গেলেন এবং মুহাদ্দিসদের মজলিসগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। এরপর ইরাকে আসলেন এবং নিশাপুরে কিছু সময় কাটিয়ে পৈতৃক ভিটা সিজিস্তানে ফিরে গেলেন, কিন্তু কিছুকাল পর পুনরায় সফরের প্রস্তুতি নিয়ে বাগদাদে চলে আসলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে উপকৃত হলেন এবং তাঁর ফিকহ শাস্ত্রে পূর্ণতা অর্জন করলেন। দীর্ঘ সময় বাগদাদে অবস্থান করলেন এবং সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন। তিনি উত্তম চরিত্র, উন্নত আখলাক, পরহেজগারি ও তাকওয়া এবং পবিত্রতা ও আমানতদারির মতো গুণাবলিতে ভূষিত ছিলেন। জিকির, তিলাওয়াত এবং ইবাদত-বন্দেগিতে তিনি ছিলেন অনন্য। মুহাদ্দিসগণ বলতেন:

“ইমাম আবু দাউদের জন্য হাদিসকে এমনভাবে মোম করে দেওয়া হয়েছে যেমন দাউদ আলাইহিস সালাম-এর জন্য লোহাকে মোম করে দেওয়া হয়েছিল।”

বসরা সে সময় হাবশিদের বিদ্রোহের কারণে আলেমশূন্য হয়ে পড়েছিল। বাগদাদের যুবরাজ আল-মুয়াফফাক-এর অনুরোধে তিনি বসরায় তাশরিফ নিলেন এবং সেখানে অবস্থান করে ইলম ও ফজিলতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করলেন। শাওয়াল ২৭৫ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। [১]

ইমাম আবু দাউদ রহ. মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি ফকিহও ছিলেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিস থেকে পাঁচ হাজার হাদিস নির্বাচন করে “সুনানে আবু দাউদ” সংকলন করেন এবং নিজের ফিকহি রূচি অনুযায়ী এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখেন যেন ফিকহি হাদিসসমূহের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার একত্রিত হয়। এই কারণেই এতে সিরাত ও ফজিলতের হাদিস কম রয়েছে, কিন্তু ফিকহি দলিলের জন্য আমরা সুনানে আবু দাউদ থেকে যতটুকু উপাদান পাই, তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সুনানে আবু দাউদের অধিকাংশ হাদিসই সহিহ বা হাসান, কিছু হাদিস কোনো কোনো দিক থেকে দুর্বল যেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ নিজেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই কারণেই আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন: “আবু দাউদ তাঁর সুনানে যেসব হাদিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সেগুলো তাঁর নিকট সহিহ।” [২]

ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর যৌবনেই সুনান সংকলন সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি যখন এটি তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর নিকট নিয়ে গেলেন, তখন তিনি এটি দেখে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। [৩]

ইমাম গাজালি রহ. বলেন: এই একটি কিতাবই একজন মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট। [৪]

আল্লামা জাকারিয়া সাজি রহ. বলতেন: “ইসলামের মূল হলো ‘কিতাবুল্লাহ’ এবং ইসলামের ফরমান হলো ‘সুনানে আবু দাউদ’।” [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২০৫ থেকে ২২০

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২০৯

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২১৫

[২] ফাতহুল মুগিস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদিস লিস সাখাভি: ১/১০৪, তবা মাকতাবাতুস সুন্নাহ মিশর

[৪] ফাতহুল মুগিস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদিস লিস সাখাভি: ১/১০১

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্পর্ক মধ্য এশিয়ার একটি আজমি পরিবারের সাথে ছিল। তিনি ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি কখনো কোনো কথা ভুলতেন না। ছাত্রজীবনে তিনি কোনো এক মুহাদিসের নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ লিখে রেখেছিলেন। সৌভাগ্যবশত মক্কার পথে সেই মুহাদিসের সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়। ইমাম তিরমিযীর মনে সেই মুহাদিসের নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শোনার আগ্রহ জাগল। তিনি তাঁর কাছে আবেদন করলেন যে, আমি আপনার হাদীসসমূহ লিখে রেখেছি কিন্তু আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। তিনি তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন। ইমাম তিরমিযী ছাত্রদের নিয়ম অনুযায়ী হাদীস ও কাগজ সামনে রাখতে চাইলেন তো দেখলেন যে সেই কাগজগুলো হারিয়ে গেছে। তিনি সাদা কাগজ তুলে নিয়ে সামনে ধরলেন। মুহাদিস হাদীস শোনাতে শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সাদা কাগজের ওপর পড়ল। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তোমার কি লজ্জা হয় না?” তিনি আরজ করলেন: “আপনি যে হাদীসগুলো শুনিয়েছেন সেগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।” উস্তাদ বললেন: “শোনাও।” তিনি সব শব্দে শব্দে শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদ বললেন: “তুমি আসার আগেই কি এগুলো মুখস্থ করে নিয়েছিলে?” তিনি বললেন: “আপনি কিছু নতুন হাদীস শুনিয়ে দেখুন।” উস্তাদ আরও কিছু হাদীস শোনালেন এবং তিনি সেগুলো একইভাবে হরফে হরফে শুনিয়ে দিলেন। [১]

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র ছিলেন কিন্তু কিছু রেওয়ায়েত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নিকট থেকে শুনেছিলেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বলতেন: “তুমি আমার থেকে যতটুকু উপকৃত হয়েছ, আমি তোমার থেকে তার চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি।” [২]

ইলমে হাদীস, স্মৃতিশক্তি এবং যুহদ ও ইবাদতে তিনি আহলে খোরাসানের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে অনেক কাঁদতেন। পড়াশোনা এবং অধিক কান্নাকাটির কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রজব ২৭৯ হিজরীতে তিনি তাঁর পৈতৃক শহর তিরমিযে ইন্তেকাল করেন। [৩]

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কীর্তি ‘সুনানে তিরমিযী’ প্রকৃতপক্ষে হাদীসের একটি অনন্য সংকলন। এতে একদিকে ঐ সমস্ত ফিকহী হাদীসসমূহ নেওয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর আমল করা হয়। দ্বিতীয়ত, একে শুধু আহকামের হাদীসের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়নি বরং এতে বুখারী ও মুসলিমের মতো প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ জমা করা হয়েছে; এজন্য একে “জামে”ও বলা হয়। হাদীস সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাযহাবসমূহ, সহীহ, হাসান বা যঈফ হওয়ার দিক থেকে হাদীসের মান কী? কোন রেওয়ায়েতের ওপর উম্মতের আমল রয়েছে এবং আর কোন কোন সাহাবী থেকে এই বিষয়ে রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে? রাবীদের নাম ও কুনিয়াতের স্পষ্টীকরণ যাতে অন্য রাবীদের সাথে বিভ্রান্তি না হয় এবং রাবীদের জারহ ও তা’দীল—জামে তিরমিযীতে এই সমস্ত দিক স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো হাদীস সংকলনে পাওয়া যায় না; এজন্য জামে তিরমিযী মুহাদিসগণের নিকট অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। [৪]

[১] তাযকিরাতুল হুফায লিয-যাহাবী: ২/১৫৫, ১৫৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২৭০ থেকে ২৭৭।

[৩] তাহযীবুত তাহযীব: ৯/৩৮৩, দারুল ইমাম তিরমিযী, ত. দাক্ষিণাত্য।

[৪] আরিদাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী লি-ইবনিল আরাবী: ১/৫, ৬।

ইমাম ইবনে মাজাহ কাযভিনী (রহ.)

মুহাম্মদ বিন যায়েদ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী (রহ.) আজমের সেই সকল মুহাদিসগণের মধ্যে একজন যারা ইলমে হাদীস সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর জন্ম ২০৯ হিজরীতে উত্তর ইরানের কাযভীন শহরে হয়েছিল। ৬৪ বছর বয়সে রমজান ২৭৩ হিজরীতে কাযভীন শহরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। [১]

তাঁর সংকলিত গ্রন্থ “সুনানে ইবনে মাজাহ” বিন্যাসের সৌন্দর্য এবং সংক্ষিপ্ততার দিক থেকে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। যখন ইমাম ইবনে মাজাহ এই প্রচেষ্টা ইমাম আবু যুরআ (রহ.)-এর খিদমতে পেশ করলেন, তখন তিনি এটি পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। [২]

এতে অধ্যায় বিন্যাস এমন চমৎকারভাবে করা হয়েছে যে বর্ণনার কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই কিতাবে এমন অনেক বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে নেই। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) চেয়েছিলেন যে কিছু যযীফ হাদীসও, যা কোনো না কোনো দিক থেকে ফযীলত বা তথ্যের কাজ দিতে পারে, তা যেন বিদগ্ধজনদের অধ্যয়নে আসে। ফলে তিনি তাঁর সংকলনে হাদীস অন্তর্ভুক্ত করার শর্তাবলী শিথিল রেখেছিলেন। এভাবে এতে প্রায় এক হাজারের মতো এমন হাদীস চলে এসেছে যা দ্বারা আকীদা বা ফিকহী মাসআলায় দলিল পেশ করা যায় না এবং প্রায় ত্রিশটির মতো এমন বর্ণনা রয়েছে যা অত্যন্ত যযীফ। [৩]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২৭৭ থেকে ২৮০

[২] তাযকিরাতুল হুফফায: ২/১৫৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/২৭৯

আইন্মায়ে তাযকিয়া ওয়া ইহসান

বনু আব্বাসের উত্থানের যুগে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং সাধারণ সচ্ছলতা মানুষের মধ্যে দুনিয়াদারীকে আম করে দিয়েছিল এবং দ্বীনের সেই প্রাণ যাকে আল্লাহর মা'রিফাত এবং রাসূল ﷺ-এর মহব্বত দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তা ম্লান হতে শুরু করেছিল। ইখলাস ও ইহসান, খুশু ও খুযু, আখিরাতের চিন্তা এবং ইবাদতের স্বাদ কম হতে শুরু করেছিল। এমন সময়ে কিছু মহান ব্যক্তি নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে আসলাফদের এই মেজাজকে জীবিত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেন। এই ব্যক্তিদের সাধারণভাবে উবাদ, যুহুদ বা সুফিয়ায়ে কিরাম বলা হয়।

সুফিয়া প্রতি যুগে কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কিছু লোক যারা হাল বা অজ্ঞতার কারণে এমন কাজে লিপ্ত হয় যা শরীয়তের গণ্ডির বাইরে চলে যায়। কিছু লোক তারা ছিল যারা সন্ন্যাসবাদ, অনারব চিন্তাধারা, গ্রীক দর্শন এবং হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ্য যিন্দিকিয়াতের শিকার হয়েছিল এবং এমন জীবন যাপনের দাওয়াত দিত যার সাথে ইসলামী আকীদা ও আমলের কোনো মিল ছিল না। অনেকে এমন ছিল যারা আকীদা বা আমলের দিক থেকে বাহ্যিকভাবে কোনো বক্রতার শিকার ছিল না বরং যুহুদ ও রিয়াযতে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু সাথে সাথে যশ ও খ্যাতির মোহে লিপ্ত ছিল এবং মানুষকে নিজেদের চারপাশে সমবেত করার জন্য অদ্ভুত কাহিনী শোনাত। কিছু লোক এমনও ছিল যারা মানুষের অন্তর নরম করার জন্য কবর, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বানোয়াট হাদীস তৈরি করে শোনাত। আইন্মায়ে ইসলামের কাছে এই ধরনের তাসাউফ কখনোই গ্রহণযোগ্য ছিল না বরং তারা সর্বদা এর প্রতিবাদ করে এসেছেন, যেমনটি আল্লামা ইবনুল জাওযী, ইমাম গাযালী, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (শেখ আহমদ সিরহিন্দী), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ.-এর রচনাবলী থেকে স্পষ্ট।

আসল সুফিয়ায়ে কিরাম ছিলেন সহীহ আকীদা সম্পন্ন, শরীয়তের আলিম এবং সুন্নতের অনুসারী। এই মহান ব্যক্তিগণ যে পথের আহ্বায়ক ছিলেন, তার সাথে মেকি তাসাউফের কোনো সম্পর্ক ছিল না বরং তা ছিল নিয়তকে খাঁটি করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যিকির ও তিলাওয়াত, মাসনুন আমল এবং নফলের আধিক্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা, ইবাদতে মন লাগানো এবং সুন্নতের অনুসরণ করার একটি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পষ্ট যে, এই সব বিষয় শরীয়তসম্মতভাবে কাম্য। একে তাসাউফ নাম দেওয়া হোক, বা তাযকিয়া বলা হোক, বা সুলুক ও ইহসান দ্বারা প্রকাশ করা হোক, যাই হোক না কেন এটিই ছিল মৃত অন্তরগুলোকে জাগ্রত করার ব্যবস্থাপত্র এবং উম্মতের সেই রুহ যার মাধ্যমে যিন্দেগী টিকে থাকতে পারত। আইন্মায়ে তাযকিয়া ওয়া ইহসানের অধীনে আমরা এখন সেই সব বুজুর্গদের কথা উল্লেখ করছি যারা প্রকৃতপক্ষে নফস তাযকিয়া ও ইহসানের আহ্বায়ক ছিলেন যাদের চেষ্টা সর্বদা এটাই ছিল যে, আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণকে প্রতিটি জিনিসের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিজেদের অবস্থা ও অনুভূতির ওপর সর্বদা শরীয়তকে প্রাধান্য দেওয়া।

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহ

ইব্রাহিম বিন আদহাম বলখের এক আমীরজাদা ছিলেন এবং ভ্রমণ ও শিকারের শৌখিন ছিলেন। তিনি গাফিলতির জীবন অতিবাহিত করছিলেন। একদিন শিকারের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই আওয়াজ কানে এল:

“আমরা তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করিনি!”

أَلْخَسِبُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি... এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?” [১]

এটি শোনার সাথে সাথেই হৃদয়ের জগত বদলে গেল। রাজত্ব এবং পারিবারিক আভিজাত্যকে পদাঘাত করলেন এবং দ্বীন শেখার জন্য আল্লাহর ওলিদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ-এর উক্তি হলো:

“খুরাসান থেকে আমরা ষাটজন যুবক দ্বীন শেখার জন্য বেরিয়েছিলাম, যাদের মধ্যে ইব্রাহিম বিন আদহামও ছিলেন।”

তিনি প্রয়োজনীয় পর্যায় পর্যন্ত ফিকহ ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, যেমনটি মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে কিছু বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন। তবে তাঁর অবস্থা থেকে জানা যায় যে, তাঁর ওপর যুহদ, ইবাদত এবং যিকির ও ফিকিরের এমন প্রবলতা ছিল যে, তিনি কেবল প্রয়োজন মারফিক দ্বীনি ইলম শিখতে পেরেছিলেন। আল্লাহর ওলিদের সাথে সম্পর্ক রাখা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা। মক্কায় গিয়ে ফুযাইল বিন আইয়ায এবং সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহ-এর মতো বুজুর্গদের খিদমতে ছিলেন। অধিকাংশ সময় সিরিয়ায় কাটিয়েছেন এবং নির্জনবাসের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

হালাল উপার্জনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ নসিহতে হালাল উপার্জনের ওপর জোর থাকত। নফল ইবাদতকে তিনি হারাম থেকে বেঁচে থাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। এত বড় ওলি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কঠোর পরিশ্রম ও মজুরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনও কারও কাছে চাষাবাদ করতেন, আবার কখনও বাগান পরিচর্যা করতেন। সিরিয়ার এক আমীর তাঁকে ডালিম বাগানের পাহারাদার নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই কাজ করতে থাকেন। একদিন আমীর তাঁকে বললেন: “একটি চমৎকার ও বড় ডালিম নিয়ে এসো এবং আমাকে খাওয়াও।”

তিনি একটি বড় ডালিম পেড়ে আনলেন। আমীর যখন সেটি চাখলেন, তখন তা অত্যন্ত টক বের হলো। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন:

“তুমি এত দিন ধরে এখানে কাজ করছ। এখনও টক ও মিষ্টি ফলের পার্থক্য বুঝতে পারোনি?”

তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! যখন থেকে কাজে লেগেছি, একবারও কোনো ফল পেড়ে খাইনি।”

আমীর বললেন: “মনে হচ্ছে আপনিই ইব্রাহিম বিন আদহাম!”

এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তিনি এতটাই নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন যে এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জীবন এভাবেই যিকির ও ইবাদত এবং নিজেকে লুকিয়ে রেখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো এবং আল্লাহর ওলিদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছে। শাকীক বলখী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ-এর মতো খুরাসানি বুজুর্গদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

[১] সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১১৫

ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ১৬০ হিজরিতে ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপে মুজাহিদদের সাথে পাহারারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শেষ রাতে অসুস্থতার কারণে তাঁকে বিশ বার শৌচকার্যের জন্য উঠতে হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই তিনি নতুন করে ওয়ু করেছিলেন যাতে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি নিজের ধনুকটি চাইলেন এবং সেটি ধরে রেখে প্রাণ সৃষ্টিকর্তার কাছে সঁপে দিলেন। তিনি সারা জীবন নিজেকে অখ্যাত রাখার চেষ্টা করেছেন। আত্মপ্রদর্শন ও খ্যাতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল। কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ওলিদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আল্লাহ তাঁকে এমন মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা দান করেছেন যে, আজ পর্যন্ত তাঁর নাম অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে নেওয়া হয়।

এতে আজকের সেই নামধারী দরবেশ ও ভণ্ড সুফিদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা খ্যাতির পেছনে ছোট্টে এবং এর জন্য অত্যন্ত নিম্নমানের পদ্ধতি অবলম্বন করতে সামান্যতম লজ্জাবোধ করে না।

হযরত দাউদ তাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

তিনি কুফার বিখ্যাত মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র এবং নিজ সময়ের ফকিহ ছিলেন, তবে যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ও ইবাদতে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দিনার পেয়েছিলেন। বাকি জীবন তা দিয়েই অতিবাহিত করেন। প্রতি বছর মাত্র এক দিনার (প্রায় আড়াই হাজার টাকা) খরচ করতেন, তা দিয়ে নিজের খরচও মেটাতেন এবং সদকাও করতেন।

তীব্র ক্ষুধা না লাগা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। একবার কেউ দেখল যে তিনি লবণের সাথে শুকনো রুটি খাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করল: “আপনি এটি কীভাবে খাচ্ছেন?” তিনি বললেন: “আমি নফসকে ক্ষুধার্ত রেখেছি যতক্ষণ না সে এই খাবারই পছন্দ করতে শুরু করেছে।”

একবার বাজারে গেলেন, তখন তাজা খেজুর দেখে কেনার ইচ্ছা হলো কিন্তু পকেট খালি ছিল। দোকানদারকে বললেন: “এক দিরহামের খেজুর দাও, কাল টাকা দিয়ে দেব।” সে বলল: “যাও নিজের পথ ধরো।”

এক ব্যক্তি তাঁকে চিনে ফেলল এবং দোকানদারকে বলল: “তাঁকে এক দিরহামের খেজুর দাও। যদি তিনি গ্রহণ করেন তবে আমি তোমাকে একশ দিরহাম দেব।” দোকানদার তাঁর পেছনে দৌড়ে গিয়ে বলল: “চলুন, যা প্রয়োজন নিয়ে নিন।”

তিনি বললেন: “আমি তো কেবল আমার নফসকে তার মর্যাদা দেখাচ্ছিলাম। এই দুনিয়ায় এর মূল্য এক দিরহামও নয়, অথচ কাল সে জান্নাত পেতে চায়।”

তিনি বলতেন: “আল্লাহ যে বান্দাকেই গুনাহ থেকে বের করে তাকওয়ার তাওফিক দিয়েছেন, তাকে সম্পদ ছাড়াই ধনী করে দিয়েছেন, বংশীয় পরিচয় ছাড়াই সম্মান দান করেছেন এবং কোনো সঙ্গী ছাড়াই তাকে মানসিক প্রশান্তি নসিব করেছেন।”

দাউদ তাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬২ হিজরি, হিলয়াতুল আউলিয়া: ৭/৩৬৮ থেকে ৩৭১

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ১৬৫ হিজরি, তাবাকাতুল আউলিয়া লি ইবনিল মুলাক্কিন, পৃষ্ঠা ২০১ থেকে ২০৩, তবা আল-খানজি কায়রো

হযরত ফযীল বিন আয়ায রহ.

ফযীল বিন আয়ায রহ. আব্বাসী যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নামকরা আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। যৌবনে তিনি অনেক বড় ডাকাত ছিলেন। কাফেলাসমূহ তাঁর নাম শুনে কাঁপত। এই সময়ে তিনি এক মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাকে অপহরণ করবেন। যখন এই উদ্দেশ্যে তার ঘরের দেয়াল টপকালেন, তখন ভেতর থেকে কুরআন মাজীদে এই আয়াত শুনতে পেলেন:

[১] اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

“এখনও কি ঈমানদারদের জন্য সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?”

এই আয়াত শোনামাত্রই তাঁর অন্তরে এমন প্রভাব পড়ল যে তিনি চিৎকার করে উঠলেন: “কেন নয়, কেন নয় আমার রব!”

একথা বলে পূর্বের জীবন এক নিমেষে ত্যাগ করলেন এবং তওবা করে দ্বীনি ইলম অর্জন এবং যিকির ও ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। এমনকি এই পথে এমন রিয়াযত ও মুজাহাদা করলেন যে চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। [২]

সেই যুগের এক বুজুর্গ ইবরাহীম বিন আশআস রহ.-এর বর্ণনা হলো: “তিনি প্রায়ই কোনো না কোনো চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। পড়া ও পড়ানো, দেওয়া ও নেওয়া, খরচ করা ও বিরত থাকা, ভালোবাসা ও ঘৃণা করার ক্ষেত্রে তাঁর মতো ইখলাস আমি আর কারো মাঝে দেখিনি। হৃদয়ের কোমলতা, খোদাভীতি এবং আখেরাতের চিন্তা তাঁর ওপর এতটাই প্রবল ছিল যে, যখনই কুরআন মাজীদ শুনতেন অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন। কখনো এমনভাবে চিৎকার করে কাঁদতেন যে দর্শকদের মায়া লাগত। যখন কোনো জানাজার সাথে কবরস্থানে যেতেন তখন ওয়াজ ও নসিহত করতেন এবং এতটাই কাঁদতেন যে মনে হতো তিনি নিজেই সবাইকে বিদায় জানিয়ে আখেরাতের সফরে রওনা হচ্ছেন।”

তিনি মক্কায় বসবাস শুরু করেছিলেন। অধিকাংশ সময় হারামে কাটত। একটি চাটাইয়ের ওপর নফল নামাজে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। এই সময়ে ঘুমের চাপ হলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন, যখন চোখ খুলত তখন ওয়ু করে আবার নফল শুরু করে দিতেন। তাঁর কিরাত অত্যন্ত চমৎকার ছিল। তিলাওয়াতের সময় কণ্ঠে দুঃখ ও বিষাদ মিশে থাকত। থেমে থেমে এমনভাবে তিলাওয়াত করতেন যেন কাউকে সম্বোধন করে কথা বোঝাচ্ছেন। তিলাওয়াতে কোথাও জান্নাতের আলোচনা আসলে তা বারবার আওড়াতে থাকতেন।

তাঁর ওপর আল্লাহর ভয় প্রবল ছিল। বলতেন: “যে আল্লাহকে ভয় করে, সে কোনো কিছু দ্বারা ধোঁকা খায় না এবং যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে তাকে কোনো কিছুই উপকার দিতে পারে না।”

তিনি প্রায়ই দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। দুঃখ ও বিষাদকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের চাবিকাঠি মনে করতেন। বলতেন: “যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তার দুঃখ বাড়িয়ে দেন এবং যখন কাউকে অপছন্দ করেন তখন তার ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেন।”

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফসের হিসাব নেওয়ার ওপর খুব জোর দিতেন। বলতেন: “যে আল্লাহর জন্য নিজের নফসের ওপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তাকে নিজের অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ রাখেন।”

[১] সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৮৭ হিজরী

আল্লাহ্‌র প্রতি আশা ও ভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তিনি বলতেন:

“যতক্ষণ মানুষ সুস্থ থাকে, ততক্ষণ আশা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল থাকা বেশি উপকারী।

আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন আশাকে ভয়ের ওপর প্রবল রাখা উচিত। যে ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় নেক আমল করে, শেষ সময়ে তার ওপর আশার আধিক্য থাকে। আর যে সুস্থ অবস্থায় মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়, শেষ সময়ে আল্লাহ্‌র প্রতি তার সুধারণা থাকে না এবং তার আশা দুর্বল হয়ে পড়ে।”

তিনি অখ্যাত থাকা ও নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ দিতেন। বলতেন:

“তোমরা সকলের অগোচরে একনিষ্ঠ হৃদয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো। উচ্চ মর্যাদা কেবল তারই হয় যাকে আল্লাহ্‌ উচ্চ করেন। তিনি যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তার ভালোবাসা বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেন।”

তিনি ইলম এবং এর সাথে যুহদ ও অল্লেতুষ্টিকে অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন। বলতেন:

“আল্লাহ্‌র ভয় মানুষের ইলম অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর দুনিয়া থেকে যুহদ ততটুকুই হয় যতটুকু আখিরাতের প্রতি আগ্রহ থাকে।” [১]

দুনিয়ার প্রতি তার এমন অনীহা ছিল যে তিনি বলতেন: “যদি সারা দুনিয়া আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়, তবুও আমি একে তেমনি ঘৃণা করব যেমন তোমরা মৃত প্রাণীকে ঘৃণা করো।”

নিয়ত সংশোধন ও ইখলাসের ওপর তিনি খুব জোর দিতেন এবং এ বিষয়ে নফসের চক্রান্তগুলো ভালোভাবে বুঝতেন। বলতেন: “মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা শিরক। আর মানুষকে দেখানো থেকে বাঁচার জন্য আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়াকারী। ইখলাস হলো এই যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে এই উভয় অবস্থা থেকে রক্ষা করেন।”

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা নিতেন এবং এর তাগিদ দিতেন। তার বক্তব্য ছিল যে, আনুগত্যের মাধ্যমে জীবনে বরকত হয় এবং গুনাহের প্রভাব সর্বদা নেতিবাচকভাবে প্রকাশ পায়। বলতেন:

“যদি আমার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তবে তার প্রভাব আমি আমার সওয়ারি এবং এমনকি আমার খাদেমের মধ্যেও অনুভব করি।”

তিনি কেবল নির্জনবাসী ইবাদতকারী ছিলেন না বরং সমাজ সংস্কারের জন্য চিন্তিত থাকতেন, বিশেষ করে শাসকদের নসিহত করার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। বলতেন: “যদি আমাকে একটি কবুল দোয়ার অধিকার দেওয়া হতো, তবে আমি শাসকের সংশোধনের জন্য দোয়া করতাম; কারণ তিনি যদি নেককার হন তবে জনগণ ও দেশ সবই ঠিক থাকবে।”

হারুনুর রশীদ তার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি যাহিদ হলেন কীভাবে?”

তিনি বললেন: “তুমি আমার চেয়ে বড় যাহিদ। আমি তো নশ্বর দুনিয়া থেকে যুহদ অবলম্বন করে আছি, কিন্তু তুমি চিরস্থায়ী আখিরাত থেকে যুহদে সন্তুষ্ট আছ।”

১৮৭ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [২]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৮/৮৫ থেকে ১০৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: সন ১৮৭ হিজরি

হযরত মারুফ কারখি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

মারুফ কারখি রহ. বাগদাদের একজন খ্রিস্টান ফিরোজানের পুত্র ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর তাওহীদের প্রবক্তা হয়ে যান। শিশুদেরকে খেলার ছলে নামাজ পড়াতেন, এটি দেখে তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। পাদ্রী তাঁকে পড়াতেন যে আল্লাহ তিনজনের মধ্যে তৃতীয়। তিনি বলতেন: “আল্লাহ এক।”

অবশেষে একদিন পাদ্রী রাগান্বিত হয়ে তাঁকে খুব মারধর করলেন। তিনি ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। পিতামাতা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বলতে লাগলেন: “হায়! সে যদি ফিরে আসত, চাই সে মুসলমান হয়েই হোক। আমরাও তাঁর দ্বীন গ্রহণ করে নেব।”

এদিকে মারুফ কারখি বাগদাদের আলেমদের সান্নিধ্যে এসে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। বাড়ি ফিরে এলে পিতামাতাও ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরাও কালিমা পড়ে নিলেন। [১]

মারুফ কারখি রহ. প্রথাগত আলেম ছিলেন না কিন্তু ইমাম জাফর সাদিক (৮০ হিজরী - ১৪৮ হিজরী), রবি বিন সাবিহ (১৬০ হিজরী), ইবনে সামাক (১৮৩ হিজরী) এবং আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মতো বাগদাদের আলেমদের মজলিসে বসতেন। নিজে বর্ণনা কম করতেন, তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রয়োজনীয় শরয়ী জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাবাকাতুল হানাবিলা-তে তাঁর উল্লেখ প্রকাশ করে যে তিনি হাম্বলী ছিলেন।

একবার কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল: “আপনি কি আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে কিছু শুনেছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ! এই কথা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে মৃত্যুর পর সে বিস্মৃত হয়ে যাবে, সে নেক আমল করবে, মন্দ কাজ করবে না।” [২]

মক্কার মুহাদ্দিস সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. (১০৭ হিজরী - ১৯৮ হিজরী) তাঁর বুজুর্গির প্রবক্তা ছিলেন এবং বাগদাদবাসীদের কাছে তাঁর খোঁজখবর নিতেন। একবার বললেন: “যতক্ষণ এই বুজুর্গ তোমাদের মাঝে আছেন, তোমরা কল্যাণ ও শান্তিতে থাকবে।” [৩]

বিশর হাফী রহ. (১৫০ হিজরী - ২২৭ হিজরী) তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাকারী ছিলেন।

ম। আহমদ বিন হাম্বল রহ.-ও তাঁর কামালিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা ছিলেন। একবার তাঁর মজলিসে কেউ বলে ফেলল যে মারুফ কারখির জ্ঞান কম। ইমাম আহমদ রহ. বললেন: “জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো সেটাই যেখানে মারুফ কারখি পৌঁছেছেন।”

একবার ইমাম আহমদ রহ.-এর সাহেবজাদা জিজ্ঞেস করলেন: “মারুফ কারখির কাছে কি জ্ঞানও আছে?” তিনি বললেন: “মারুফের কাছে জ্ঞানের মূল রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়।”

হযরত মারুফ কারখি রহ. সারাজীবন বিবাহ করেননি। কারখ মহল্লায় দজলা নদীর তীরে একটি মসজিদকে নিজের ঠিকানা বানিয়েছিলেন।

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৩/২০১, ২০২, ত. আল-ইলমিয়াহ

[২] তাবাকাতুল হানাবিলা লি-ইবনি আবি ইয়ালা: ১/৩৮২

[৩] তাবাকাতুল হানাবিলা লি-ইবনি আবি ইয়ালা: ১/৩৮১, ত. দারুল মা'রিফাহ

...তৈরি করেছিলেন। সারা জীবন সেখানেই কাটিয়েছেন। কারখে বসবাসের কারণে তাঁকে কারখী বলা হতো। [১] তিনি সেই মসজিদেই ইবাদত করতেন এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতেন। কেবল পবিত্রতা অর্জনের (শৌচকার্য) জন্য বাইরে বের হতেন। [২] তিনি ২০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং বাগদাদেই সমাহিত হন। [৩]

হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

বিশর হাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আসল নাম ছিল বিশর বিন হারিস। তিনি ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। লুটতরাজ করতেন। একদিন কোথাও দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একটি কাগজের টুকরো দেখলেন যাতে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম’ লেখা ছিল। তিনি আদবের সাথে কাগজটি তুলে পরিষ্কার করলেন, তারপর বাজার থেকে উত্তম সুগন্ধি কিনে সেই কাগজে লাগালেন এবং একটি উঁচু স্থানে রেখে দিলেন। রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে কেউ বলছে: “তুমি আমাদের নামকে রাস্তা থেকে তুলেছ এবং সুবাসিত করেছ, আমরা তোমার নাম দুনিয়া ও আখেরাতে সুবাসিত করে দেব।” স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলেন তো হৃদয়ের জগত বদলে গিয়েছিল। এরপর উলামা ও নেককারদের সাহচর্য গ্রহণ করলেন এবং ইলম ও আমল দ্বারা সজ্জিত হয়ে বাগদাদের প্রখ্যাত ওলী হিসেবে গণ্য হলেন। ফকিরির অবস্থা এমন ছিল যে খালি পায়ে থাকতেন, এই কারণেই তাঁর উপাধি ‘হাফী’ পড়ে যায়।

তিনি অধিকাংশ সময় নির্জনে অতিবাহিত করতেন, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে এমন মাকাম দান করেছিলেন যে বড় বড় উলামায়ে কেরাম তাঁর জিয়ারতের জন্য আসতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো ইমাম মুজতাহিদ তাঁর বুজুর্গির প্রবক্তা ছিলেন। তিনিও ইমাম সাহেবের ইলমি শান এবং হিম্মত ও মুজাহাদার প্রশংসাকারী ছিলেন। খালকে কুরআন (কুরআন সৃষ্টি) ইস্যুতে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অবিচলতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন: “আহমদ বিন হাম্বলকে আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তিনি সেখান থেকে খাঁটি লাল সোনা হয়ে বের হয়েছেন।”

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৩/২০৪, ২০৫ ত. আল-ইলমিয়াহ — নোট: পরবর্তীতে কারখ মহল্লায় শিয়াদের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাই আজ কিছু লোক মারুফ কারখীকে শিয়া মনে করে যা সঠিক নয়। তাঁর থেকে আহলে সুন্নাতের মাযহাবের পরিপন্থী কোনো আকিদা বা আমল বর্ণিত নেই।

নোট: কিছু ঐতিহাসিকের মতে মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি ভুল, কারণ মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হযরত যয়নুল আবেদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নাতি) থেকেও হাদিস শুনেছেন যাঁর মৃত্যু ১৪৮ হিজরিতে হয়েছে। (তারিখ দামেশক: ১৫/৪০৮, তাকরীবুত তাহযীব: পৃষ্ঠা ৯৫০)

অথচ ১৪৮ হিজরি হলো আলী রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্ম সাল। অর্থাৎ আলী রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্মের আগেই মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেবল ইসলামই গ্রহণ করেননি বরং প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলমও শিখে ফেলেছিলেন। এই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে আলী রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই দরস দিতেন, তাঁর জীবন সেখানেই কেটেছে। আমরা এমন কোনো বর্ণনা পাইনি যে তিনি কখনো বাগদাদে অবস্থান করেছেন। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী হিজাজ থেকে প্রথমবার তিনি ২০১ হিজরিতে সেই সময় বের হয়েছিলেন যখন মামুনুর রশীদ তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণার জন্য তাঁকে নিজের কাছে মার্ব (খোরাসান) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই সফরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটি ২০৩ হিজরির ঘটনা। যদি এই সফরে তিনি বাগদাদে অবস্থান করেও থাকেন তবুও মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল না, কারণ মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিন বছর আগে ২০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছিলেন। উভয় ব্যক্তি সমসাময়িক অবশ্যই ছিলেন কিন্তু তাঁদের নিয়মিত সাক্ষাতের বিষয়টি কখনো প্রমাণিত হয়নি যদি না কোনো বর্ণনায় এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। যাই হোক, তাঁর আলী রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার বর্ণনাটি নিছক একটি উপকথা। তর্কের খাতিরে যদি এমনটা হয়েও থাকে তবুও এই ভিত্তিতে তাঁকে ইসনা আশারি শিয়া মানা তো বর্তমান অবস্থায় একেবারেই অযৌক্তিক কথা হবে।

[২] তারিখ বাগদাদ: ১৩/২০৫, ত. আল-ইলমিয়াহ

[৩] তারিখ বাগদাদ: ১৩/২০৯, ত. আল-ইলমিয়াহ

...বলতে লাগলেন তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর শুকরিয়া যিনি বশরকে আমাদের আমলের মাধ্যমে খুশি করেছেন।”

...বলতেন: “আমার নাজাতের আশা আছে, কেবল সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া।”

...১১ যিলকদ ২২৭ হিজরীর সকালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। জানাজায় এত ভিড় ছিল যে দাফন করতে...

হযরত যুন-নুন মিসরী (সাওবান বিন ইবরাহিম) রহ.

আপনি মিশর ভূখণ্ডে ইলমে মারেফাতের আলো বিস্তারকারী একজন বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ। তিনি তাঁর যুগের প্রথম বুজুর্গ যিনি আউলিয়ায়ে আল্লাহর মাকামাত (স্তর) এবং কাইফিয়াত (অবস্থা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেহেতু এই বিষয়গুলো পূর্ববর্তীদের (আসলাফ) থেকে বর্ণিত ছিল না, তাই কিছু আলেম তাঁকে যিন্দিক (ধর্মত্যাগী) বলে আখ্যায়িত করেন। খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল তাঁর সম্পর্কে এসব কথা শুনে তাঁকে অবিলম্বে শিকলবদ্ধ অবস্থায় সওয়ারির মাধ্যমে মিশর থেকে বাগদাদে তলব করেন। এটি ২৩৪ হিজরীর ঘটনা। খিলাফত প্রাসাদে যাওয়ার সময় তিনি নিচু স্বরে দরুদ শরীফ পড়ছিলেন। এই ওজিফার এমন প্রভাব পড়ল যে, মুতাওয়াঙ্কিল তাঁকে দেখামাত্রই প্রভাবিত হয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। আলাপ-আলোচনার পর মুতাওয়াঙ্কিল তাঁর ইলম ও মারেফাতের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত হলেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করতে লাগলেন।

মুতাওয়াঙ্কিল তাঁর নসিহত শুনে অঝোরে কাঁদতেন। একদিন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: “আউলিয়াদের গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।” তিনি বললেন: “হে আমিরুল মুমিনীন! এরা সেই সব লোক যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ভালোবাসার প্রখর আলো দান করেছেন এবং তাঁদেরকে কারামতের পোশাক পরিয়েছেন এবং তাঁদের মাথায় চিরস্থায়ী আনন্দের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।”

যুন-নুন রহ. কিছুকাল বাগদাদে অবস্থান করে পুনরায় মিশরে ফিরে যান। ২ যিলকদ ২৪৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর বয়স ছিল ৯০ বছর। যুন-নুন মিসরী রহ. যদিও দরবেশীর প্রাবল্য ছিল, তবুও তিনি ইলমে হাদিস সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, লাইস বিন সাদ এবং ফুদাইল বিন ইয়াজ রহ.-দের থেকে হাদিস শ্রবণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি পূর্ণ সনদসহ হাদিস শোনাতেন যা সাধারণত আখলাক, আখেরাতের চিন্তা এবং খুশু-খুযু (বিনয় ও একাগ্রতা) সম্পর্কিত হতো। যুন-নুন রহ. বলতেন: “আল্লাহর সাথে অন্তর লাগানো একটি উজ্জ্বল আলোর মতো এবং মাখলুকের (সৃষ্টির) সাথে অন্তর লাগানো দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়।” তিনি আরও বলতেন: “আরিফ (আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) কখনো এক অবস্থায় থাকে না বরং প্রতি অবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুমের সাথে লেগে থাকে।” (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে) [২]

[১] আল-মুনতাজাম: ২২৭ হিজরী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২২৭ হিজরী; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩৩৮/৮ থেকে ৩৪৫

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৫৩৩/১১ থেকে ৫৩৯, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২৭ থেকে ৩৪

হযরত সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মুদি দোকান চালাতেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত সততার সাথে লেনদেন করতেন এবং অভাবীদের সাহায্যও করতেন। হযরত মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাঝে মাঝে সেখান দিয়ে যেতেন। তাঁর সততা ও দানশীলতা দেখে তিনি তাঁর জন্য দোয়া করতেন।

একবার এক দাসী তার মনিবের জন্য বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে একটি পাত্রে করে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাত্রটি ভেঙে গেল এবং জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেল। দাসী কাঁদতে লাগল যে এখন মনিব কী বলবে। সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার অবস্থা দেখে তাকে এত পরিমাণ টাকা দিলেন যা দিয়ে তার লোকসান পূরণ হয়ে গেল। মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর মুখ থেকে বের হলো: “আল্লাহ দুনিয়াকে তোমার জন্য ঘণ্য করে দিন।”

এক ঈদের দিন মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি নিঃস্ব শিশুকে দেখলেন যে জীর্ণ পোশাকে শিশুদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কারণ জিজ্ঞাসা করলে মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: “এই শিশুটি অন্য শিশুদের খেলা দেখে বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল: আমি এতিম, আমার কাছে এতটুকু টাকাও নেই যে আখরোট কিনে তাদের সাথে খেলতে পারি।” [১]

সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই শিশুকে সাথে নিয়ে গেলেন, তাকে নতুন পোশাক পরালেন এবং আখরোট কেনার জন্য টাকাও দিলেন। মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই নেক কাজের জন্য তাকে দোয়া দিলেন: “আল্লাহ তোমার অন্তর পূর্ণ করে দিন।”

সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “সেই দিনের পর থেকে দুনিয়া আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।”

তিনি মারুফ কারখী রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাত ধরলেন এবং নিজের যুগের আউলিয়ারদের সরদার হয়ে গেলেন।

তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি সালাতে মশগুল হয়ে আল্লাহর কাছে চাইতেন। একবার এক মহিলা এসে কান্নাকাটি করে বলল যে তার ছেলেকে কোতোয়াল ধরে নিয়ে গেছে। আপনি সুপারিশ করুন যেন তারা আমার ছেলের ওপর নির্যাতন না করে।

আপনি তার কথা শুনেই সালাতের নিয়ত করে নিলেন। সেই মহিলা এই সময়ে কান্নাকাটি ও আহাজারি করতে থাকল। আপনি যখন সালাত শেষ করলেন, তখন সে বলল: আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ছেলের ওপর রহম করুন।

তিনি বললেন: “আমি তো সেই কাজই করছিলাম।” কিছুক্ষণই অতিবাহিত হয়েছিল যে সেই মহিলার ছেলে ফিরে এল। [২]

সরী সাকতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইবাদত ও রিয়াযতের অবস্থা মানুষকে বিস্ময়ে ফেলে দেয়। দোকানের সময়টুকু বাদে বাকি পুরো সময় তিনি ইবাদতে কাটাতেন। ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। বলা হতো যে তাঁকে কখনো শুয়ে থাকতে দেখা যায়নি।

[১] আখরোট খেলা ইরাকের শিশুদের একটি সাধারণ খেলা ছিল। এই খেলাটি অনেকটা মার্বেল খেলার মতো; যা আমাদের দেশে শিশুরা গোলা বা মার্বেল দিয়ে খেলে থাকে।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৪৯৬, ৪৯৭।

লজ্জা, হায়া এবং খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, একবার বাজারে আগুন লেগে গেল। কেউ খবর দিল যে সবার দোকান পুড়ে গেছে কিন্তু আপনার দোকান বেঁচে গেছে। শুনেই অবলীলায় আলহামদুলিল্লাহ বললেন। পরে মনে হলো যে, অন্যদের ক্ষতির কোনো পরোয়া না করে আলহামদুলিল্লাহ কীভাবে বললাম। এতে এতটাই লজ্জিত হলেন যে, যখনই এই কথা মনে পড়ত, ইস্তিগফার করতে থাকতেন।

৯৮ বছর বয়সে ৬ রমজান ২৫৩ হিজরিতে ফজরের আজানের কিছুক্ষণ পর তাঁর ইন্তেকাল হয়। মৃত্যুর আগে তিনি এই কবিতাগুলো পড়ছিলেন:

অন্তর দন্ধ হচ্ছে এবং অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং ধৈর্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সেই অস্থির ব্যক্তি কীভাবে স্থির হবে, যাকে ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতা লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

হে রব! যদি আমার জন্য কোনোভাবে মুক্তি ও মাগফিরাত সম্ভব হয়, তবে প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাকে তা দান করুন।

তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

“আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সেই সব লোককেও যারা আমার জানাজায় শরিক হয়েছিল।” [১]

হযরত আবু ইয়াজিদ বুস্তামী রহ.

তিনি তাঁর সময়ের প্রখ্যাত ওলি ছিলেন এবং সুলতানুল আরেফিন নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণত তাঁকে বায়জিদ বুস্তামী বলা হয়।

তিনি বলতেন: “আমি ত্রিশ বছর মুজাহাদা করেছি, কিন্তু ইলম অনুযায়ী আমল করার চেয়ে কঠিন আর কিছু দেখিনি।”

তিনি বলতেন:

“আমি আমার নফসকে আল্লাহর দিকে টানতে থাকতাম আর নফস কাঁদতে থাকত। যখন আমি তাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে গেলাম, তখন সে হাসতে লাগল।”

তিনি বলতেন: “সেই ব্যক্তি নফসের মারিফাত লাভ করতে পারে না যার সাথে তার শাহওয়াত লেগে থাকে।”

কেউ জিজ্ঞেস করল: “দরবেশ কাকে বলে?”

তিনি বললেন: “যে নিজেও কোনো কিছুর মালিক নয় এবং কেউ তার মালিক হতে পারে না।”

কেউ প্রশ্ন করল: “আরেফ কে?” তিনি বললেন: “যে আল্লাহর জিকিরে ক্লান্ত হয় না, তাঁর হক আদায় করার (চেষ্টায়) পরিশ্রান্ত হয় না এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো সাথে মন লাগায় না।”

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ২/৩৫৭, ৩৫৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২৫৩ হিজরি।

জিজ্ঞাসা করা হলো: “আপনি আল্লাহকে কীভাবে পেলেন?” তিনি বললেন: “ক্ষুধার্ত পেট এবং নগ্ন শরীরের সাথে।”

কেউ জিজ্ঞাসা করল: “এমন কোনো আমল বলে দিন যাতে আমি আল্লাহর মুকাররাব হয়ে যাই!!”

তিনি বললেন: “আল্লাহর ওলিদের ভালোবাসো যাতে তারা তোমাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাঁর ওলিদের অন্তরের দিকে তাকান, হতে পারে তাদের অন্তরে তোমার স্থান দেখে তিনি তোমারও মাগফিরাত করে দেন।”

নিজের মুনাজাতে বলতেন: “ইলাহি! এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আমার মতো একজন ফকির বান্দা তোমাকে ভালোবাসে। আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে, তুমি শাহেনশাহ কাদির হয়েও আমাকে ভালোবাসো।”

তিনি বলতেন:

“এমন লোকও আছে যারা পানির ওপর দিয়ে হাঁটে কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। যদি কারো কারামত এই পর্যন্ত দেখো যে সে বাতাসে উড়ছে, তবুও ধোঁকা খেয়ো না যতক্ষণ না এটা দেখে নাও যে সে আদেশ ও নিষেধ এবং শরীয়তের বিধানাবলির কতটুকু অনুসারী।”

আবু ইয়াজিদ বাসতামি রহমাতুল্লাহ ৭৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং ২৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১]

হাফেজ জাহাবি রহমাতুল্লাহ তাঁর মানাকিব বর্ণনা করার পর লেখেন:

“তাঁর থেকে এমন কিছু বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর শরয়ি কোনো অবকাশ পাওয়া যায় না। হয় তো সেই বিষয়গুলো তাঁর দিকে ভুলভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। অথবা সেগুলো তাঁর থেকে ভয়ের আধিক্য, আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মহারা অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে; কারণ সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ ইলহাদ।” [২]

[১] তাবাকাতুল আউলিয়া লি ইবনিল মুলাক্কিন, পৃ. ৩৯৮ থেকে ৪০৩; তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ লিস সুলামি আন-নিশাপুরি, পৃ. ৬৭ থেকে ৭৪; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৩/৮৬, ৮৮

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৩/৮৮

বনু আব্বাসের উত্থানকাল..... শিক্ষা ও উপদেশ

ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের দলগুলো যখন কোনো ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্যের সুফল বড় ও শক্তিশালী দলের ভাগে আসে। কখনো এমনও হয় যে, সাফল্যের পর বড় দল তার দুর্বল মিত্রকে সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে দেখতে শুরু করে এবং তাকে তিরস্কার ও শাস্তির লক্ষ্যবস্তু বানায়। আলভী ও আব্বাসীয়রা উমাইয়া শাসন পতনের জন্য যৌথভাবে কাজ করেছিল। আব্বাসীয় দলটি ছিল অধিক সুসংগঠিত, মজবুত ও শক্তিশালী; তাই সরকার গঠনের পর কেবল আলভীদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিতই রাখা হয়নি, বরং তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে দেখা হয়েছিল যাতে তারা ক্ষমতায় পূর্ণ অংশীদারিত্ব দাবি না করে বসে। পরবর্তী যুগে অনেক আলভী এই কারণে খুরুজ করেন এবং শিক্ষণীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে থাকেন।

পৃথিবীতে অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ সর্বদা জন্ম নিতে থাকে। সাফল্যের পথ হলো এই যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিশিষ্ট প্রতিভাকে চিনে নিয়ে তার মাধ্যমেই পৃথিবীর উপকার করার চেষ্টা করবে। সমস্যা তখন সৃষ্টি হয় যখন অসাধারণ মেধা ও মনন সম্পন্ন অনেক ব্যক্তি একই সাথে তাদের মূল্যবান প্রতিভাকে রাজনীতির সংকীর্ণ আখড়ায় উৎসর্গ করতে শুরু করে। এই প্রচেষ্টায় তাদের শেষ লক্ষ্য থাকে নিজেকে সবার চেয়ে বড় বানানো। কখনো এমন প্রচেষ্টা বর্তমান শাসকদের ক্ষমতার গলি থেকে বিতাড়িত করার রূপে প্রকাশ পায়। কখনো এই চিন্তার কারণে ক্ষমতায় থাকা প্রত্যেক চতুর ব্যক্তি নিজের আলাদা দল গঠন করে নেয়। কখনো এই মানসিকতা রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এ জাতীয় ব্যস্ততার ফলাফল খুব কমই ইতিবাচক হয়। সাধারণত এর ফলে ফিতনা-ফাসাদই ছড়ায়; কারণ এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। একটি দেশ, একটি সমাজ এবং একটি প্রতিষ্ঠানে যখন প্রতিভাবান ও বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে আধিপত্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়, তখন জাতির সেবা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং ইতিবাচক লক্ষ্যগুলো আড়ালে চলে যায়। যখন দীর্ঘকায় ব্যক্তিরা নিচের দিকে না তাকিয়ে ক্ষমতার সিংহাসনের দিকে দৌড় দেয়, তখন দুর্বল ও খর্বকায় মানুষের পিষ্ট হওয়া অনিবার্য। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় যুগে আমরা পদে পদে এমন ভুল উদাহরণ দেখতে পাই এবং আজও সেগুলোর পুনরাবৃত্তি অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিশ্ব সুদৃঢ় মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি نظام حیات (জীবন ব্যবস্থা)। এটি কোনো জাদুকরী নয় যেখানে সবকিছু আকস্মিকতা ও অলৌকিকতার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি জাতির নেতৃত্ব দিতে চায়, মিলাতের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা রাখে অথবা অন্তত নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য একটি উন্নত জীবনের প্রত্যাশী হয়, তবে তাকে আল্লাহর শক্তি এবং তাঁর অটল ব্যবস্থার ওপর ঈমানও আনতে হবে, তাঁর কুদরতের ব্যবস্থাকে বুঝতেও হবে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করতে হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি কেবল সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনার ভিত্তিতে কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং নিজের কর্মপন্থাকে পরিকল্পনার পরিবর্তে অলীক কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, তার ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না, সে যত বড় মানুষই হোক না কেন।

কেন হবে না। অনেক নেক ও সালেহ ব্যক্তিদের ব্যর্থ বিপ্লবী প্রচেষ্টা এর সাক্ষী।

বিপ্লবের সময় আব্বাসীয়দের নির্ভরতা ছিল অনারব (আজমি) গোত্রগুলোর জনশক্তি ও সামরিক শক্তির ওপর। আরবদের পক্ষ থেকে তাদের তেমন কোনো সমর্থন ছিল না। যদিও ক্ষমতা লাভের পর তারা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বেশিরভাগই নিজেদের পরিবারের লোকদের দিয়েছিলেন যারা কুরাইশ ছিল, কিন্তু অনারবদের সামরিক শক্তিকে তারা উপেক্ষা করতে পারতেন না; তাই তাদের অনারবদের ক্ষমতায় অংশীদার করতে হয়েছিল। এভাবে খিলাফতের প্রাসাদ থেকে শুরু করে জনজীবন পর্যন্ত খুব দ্রুত ইরানি ও খোরাসানি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ পড়ে গেল। দুনিয়ার লোভের ব্যাধি তো আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন অপচয় ও অপব্যয়, জীবনযাত্রায় কৃত্রিমতা, বিলাসিতা এবং জাঁকজমক প্রদর্শনের চল সাধারণ হয়ে গেল, যা পরবর্তীতে অনেক সমস্যার জন্ম দিল। এটিও কম বড় ট্র্যাজেডি ছিল না যে, যে সম্পদ ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদের পথে ব্যয় হতে পারত, তার বড় একটি অংশ বংশপরম্পরায় নশ্বর দুনিয়াবি লালসা পূরণে নষ্ট হতে থাকল।

ইতিহাসের এই দৃশ্যপট বলে দেয় যে, ক্ষমতা লাভের জন্য যার সাহায্য নেওয়া হয়, পরবর্তীতে তারই কাছে ঋণী হয়ে থাকতে হয়। আমরা যার কাঁধে চড়ে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছাব, তার প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে; তাই ক্ষমতার জন্য কারো সাথে হাত মেলানোর সময় পরিণতির কথা ভালোভাবে ভেবে নেওয়া উচিত।

সকল সফলতার পেছনে ঐক্য ও সংহতির শক্তি কার্যকর থাকে। সকল ব্যর্থতার পেছনে মতভেদ ও বিভেদের বিষ বিদ্যমান থাকে। যদি বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম তাদের রাজনৈতিক মতভেদ দূর করে নিত যেমনটি হযরত হাসান ও হযরত মুয়াবিয়া এর সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল, তবে আমাদের ব্যর্থতার কাহিনী অনেক সংক্ষিপ্ত হতো। আর একইভাবে যদি বনু আব্বাস ক্ষমতায় আসার পর তাদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ না হতো, তবে তাদের পতনের যুগ এত দ্রুত শুরু হতো না।

মতভেদ হওয়া কোনো অদ্ভুত বিষয় নয় বরং মতপার্থক্য তো মানব প্রকৃতি ও সমাজের অংশ। সমস্যা তখন সৃষ্টি হয় যখন এর কারণে পথ আলাদা হয়ে যায় এবং ধ্বংস তখন ছড়িয়ে পড়ে যখন মতভেদ বেড়ে গিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। সফলতা সেই সকল জাতি ও দলই পায় যাদের বড়রা পারস্পরিক মতভেদকে দমন করেন, ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক ও পারিবারিক স্বার্থের ওপর জেদ করেন না এবং মহান উদ্দেশ্যের জন্য ছোটখাটো বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেন।

বিশ্বব্যবস্থা বোঝার মূলনীতি আমরা কুরআন মাজিদে পাব এবং সেগুলোর উদাহরণ আমরা ইতিহাসে দেখতে পাব, একেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বলা হয় যার দাওয়াত কুরআন মাজিদ স্থানে স্থানে দিয়েছে। ইতিহাস পাঠ করা মূলত বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করা; কারণ ইতিহাস হলো মানব অভিজ্ঞতার রেকর্ডের অপর নাম। যদি এটি সঠিক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ মস্তিষ্কে বোঝা হয় তবে অসংখ্য উপকারী শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু যদি এটি সন্দেহজনক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয় অথবা একে মন ভোলানো কাহিনী হিসেবে পড়া হয় তবে এর মাধ্যমে অন্যদের সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা নিজেদের সম্পর্কে আত্মতুষ্টি ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না।

ইসলামের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত

পতনের যুগ

২৩২ হিজরী ৬৫৬ হিজরী

৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

বনু আব্বাসের পতন যুগের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মুতাওয়াঙ্কিল ছিলেন বনু আব্বাসের শেষ মহান খলিফা যিনি এই বংশের উত্থানের দিনগুলো দেখেছিলেন। মুতাওয়াঙ্কিলের পর আব্বাসীয় খিলাফত অত্যন্ত দ্রুত পতনের শিকার হয়। মুতাওয়াঙ্কিল তার পুত্র মুনতাসিরের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তুর্কি আমিরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই দুঃসাহসের পর তুর্কিদের অন্তর থেকে খিলাফতের সিংহাসনের ভয় দূর হয়ে যায়। মুনতাসির তুর্কি আমিরদের কাঁধে চড়ে খিলাফতের সিংহাসনে বসেছিলেন। তুর্কিরা তাকে মাত্র ছয় মাস খিলাফতের প্রাসাদের স্বাদ নিতে দিয়েছিল। তারপর তাকে হত্যা করে খিলাফত তাদের পছন্দসই ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়, এভাবে খলিফারা তুর্কিদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হতে থাকে এবং খিলাফতের সেই প্রতিষ্ঠান যা আফ্রিকা থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল এলাকাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাইজেন্টাইন রোম থেকে কর আদায় করত, এক শতাব্দীর মধ্যে ভৌগোলিকভাবে সংকুচিত হয়ে কেবল ইরাক ও হিজাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সাফফাহ থেকে মনসুর পর্যন্ত (১৩২ হিজরি থেকে ১৫৮ হিজরি) ছিল বনু আব্বাসের স্থিতিশীলতার যুগ। এরপর মাহদী থেকে মুতাওয়াঙ্কিল পর্যন্ত (১৫৮ হিজরি থেকে ২৪৭ হিজরি) ছিল আব্বাসীয় বংশের উত্থানের যুগ। মুতাওয়াঙ্কিলের পর পতনের যুগ শুরু হয় যা ছিল অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ। ২৪৭ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি পর্যন্ত ৪০৯ বছরের দীর্ঘ সময় বনু আব্বাসের খলিফারা পতনের অবস্থায় অতিবাহিত করেন। এই পুরো সময়ে ইরাক বা হিজাজের বাইরে তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তবে তাদের মর্যাদা ছিল আধ্যাত্মিক নেতাদের মতো। তারা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হতেন, উম্মাহর সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বীকার করতেন যে বনু আব্বাসের উপস্থিতিতে অন্য কারো খিলাফতের দাবি সঠিক নয় এবং এমন ব্যক্তি খিলাফতের বিদ্রোহী এবং ইসলামী দেশগুলোর ঐক্য থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শাসক যারা বিশ্বজনীন ইসলামী ধারায় বিকশিত হতে চাইতেন, তারা খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং শাসনের জন্য খলিফার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতিপত্র নেওয়া জরুরি মনে করতেন।

দুর্বল খিলাফত না থাকাই কি ভালো ছিল?

কিছু মানুষের তখনও এই ধারণা ছিল এবং এখনও আছে যে, এমন দুর্বল খিলাফত বিলুপ্ত করে দিলেই ভালো হতো। এর পরিবর্তে কোনো শক্তিশালী খিলাফত অস্তিত্বে আসলে তা মুসলমানদের সুরক্ষা ও নির্দেশনার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করত। এ কথা নিজের জায়গায় সঠিক যে খিলাফত এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সময়ের বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুসলমানরা বনু আব্বাসের দুর্বল ও নামমাত্র খিলাফতকে চার শতাব্দী ধরে টিকিয়ে রেখেছিল এবং কখনো কোনো সামষ্টিক বিদ্রোহ করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি, তবে এই ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণ ছিল মুসলিম সমাজের সেই দুইশ বছরের অভিজ্ঞতা যা তাদের বলত...

দেখা গিয়েছিল যে, এক বংশের পরিবর্তে অন্য বংশের আগমনে দ্বীন ইসলামের কোনো উন্নতি হয় না এবং সাধারণ মুসলমানদেরও কোনো উপকার হয় না। বনু উমাইয়াকে সরিয়ে বনু আব্বাসের আগমনে এমন কোনো আদর্শ বিপ্লব আসেনি যে এখন পুনরায় এমন বিপ্লব থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা যায়। সবাই জেনে গিয়েছিল যে, কেবল চেহারা ও বংশ পরিবর্তন হয়, বাকি আর কিছুই বদলায় না। বিপ্লবে যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে তা সাধারণ মুসলমানদের জান-মালেরই হয়। সুতরাং মুসলমানদের সামষ্টিক চেতনা ও জনমতের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই সঠিক ছিল যে, খিলাফত যা আগে থেকেই দুর্বল ও ভগ্নপ্রায়, তাকে অন্তত নামমাত্র হলেও টিকিয়ে রাখা হোক। বারবার নতুন বংশ পরিবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে একে শিশুদের খেলার বস্তুতে পরিণত না করা হয়। বনু আব্বাসের উপস্থিতিতে অন্তত এই কল্যাণ তো ছিল যে, মুসলমানদের খলিফা একজনই ছিলেন। যদি এই বংশকে খিলাফতের মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতো, তবে এমনটা হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, আলাদা আলাদা দেশের অনেক শাসক তলোয়ারের জোরে খিলাফতের পদটি নিজের বংশে স্থানান্তরের চেষ্টা করত, যার ফলে একজন খলিফার ওপর ঐকমত্যের সম্ভাবনা কমে যেত এবং অনেক খলিফার যুগ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকত।

৪০৯ বছরের পতন যুগের ২৭ জন খলিফা কেন অখ্যাত?

মুতাওয়াক্কিলের পর আব্বাসী খিলাফতের পতন শুরু হয় যা চার শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ২৭ জন খলিফা খিলাফতের মসনদে বসেন। কেউ কয়েক মাস শাসন করেছেন আবার কেউ কয়েক বছর। কেউ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। এই যুগের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী খলিফা হলেন “নাসিরুদ্দীনিব্লাহ”, যিনি ৪৭ বছর খিলাফতের প্রাসাদে ভোগবিলাস করেছেন। কিন্তু ইবনে খালদুনের মতে সময়ের আধিক্য কোনো অর্থ বহন করে না যদি তা থেকে ফায়দা হাসিল না করা হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসনকাল আড়াই বছরও ছিল না। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) তিন বছর পূর্ণ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের কীর্তি আজ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। এর বিপরীতে বনু আব্বাসের এই ২৭ জন খলিফার নামও খুব কম লোক জানে। এমনকি যারা ইতিহাস পড়ে ও পড়ায় তাদেরও এদের নাম খুব কমই মনে থাকে; কারণ দুই-চারজন ছাড়া আর কেউ উম্মাহর ডুবন্ত নৌকাকে পার করার চেষ্টা করেনি এবং উম্মাহর এমন কোনো বড় খিদমত আঞ্জাম দেয়নি যার ভিত্তিতে তাদের মনে রাখা যায়। পক্ষান্তরে এই আব্বাসী খলিফাদের যুগেই অতিবাহিত হওয়া অন্য কিছু বাদশাহর নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মাহমুদ গজনভি, মালিক শাহ, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, শাহাবুদ্দীন যুরি এবং জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ এই পতন যুগেই উম্মাহর হেফাজত ও ইসলামের উচ্চমর্যাদার জন্য জীবন বাজি রাখতে দেখা যায়; তাই আজও মানুষ তাঁদের জন্য দোয়া করে।

পতন যুগকে সংক্ষেপে পেশ করার কারণ:

পাঠকরা দেখেছেন যে, সীরাতে নববী এবং সাহাবী ও তাবেরীদের যুগের ইতিহাসে আমরা বর্তমান যুগের সাধারণ ঐতিহাসিকদের তুলনায় অধিক বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি এবং বিশেষ করে এমন কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছি যা ঐতিহাসিকরা উপেক্ষা করে থাকেন। এর কারণ এটাই ছিল যে, সেই যুগ উম্মাহর জন্য অনেক আকিদাগত ও আমলি বিষয়ে দলিল ও প্রমাণের মর্যাদা রাখে এবং একটি উম্মাহ হিসেবে আমাদের গর্বের সম্পদ এবং আমাদের মূল ভিত্তি ও শেকড় সেটিই। তারপর যেহেতু সেই নাজুক যুগের কিছু দিক বিতর্কিতও করা হয়েছে...

দেওয়া হয়েছে; তাই আমরা সেখানে সহিহ এবং নির্ভরযোগ্য সনদের অনুসন্ধান করে বিতর্কিত ঘটনাবলির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার পূর্ণ চেষ্টা করেছি।

এরপর বনু উমাইয়ার যুগও এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এতে বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং নতুন নতুন দেশ ইসলামি সীমানায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বনু আব্বাসের উত্থানের যুগও আমাদের জন্য অনেক দিক থেকে শিক্ষণীয় পাঠ এবং রাজনীতির রহস্য ধারণ করে আছে। উম্মাহর অনেক অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এই যুগে অতিবাহিত হয়েছেন; তাই আমরা উম্মাহর প্রয়োজন বিবেচনা করে সেখানে বেশ বিস্তারিতভাবে ঘটনাবলি পেশ করতে থেকেছি।

এরপর বনু আব্বাসের পতনের যুগ সম্পর্কে আমাদের সামনে দুটি পথ ছিল:

- (১) দীর্ঘায়িত করা।

- (২) সংক্ষিপ্ত করা।

দীর্ঘায়িত করার অর্থ হলো এই যে, আমরা সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতো বনু আব্বাসের পতনের যুগ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড হুবহু বর্ণনা করে যেতাম এবং এই ৪০৯ বছরকে দেড়-দুই হাজার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বারবার চিন্তা করেও আমরা এতে পাঠকদের কোনো ফায়দা বুঝতে পারিনি; কারণ এই লেখনীর মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো উম্মাহর ইতিহাস পেশ করা, যেমনটি এর নামও ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’; তাই আমরা পাঠকদের সামনে কেবল সেই বিষয়গুলোই আনতে চাই যেগুলোর সম্পর্ক কোনো না কোনোভাবে উম্মতে মুসলিমার সাথে রয়েছে এবং যেখান থেকে আজ উম্মাহর আকিদাগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে কোনো দিকনির্দেশনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন উপাদান শাসকদের অবস্থা বা অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনে পাওয়া যাক না কেন, আমরা তা পাঠকদের সামনে আনা জরুরি মনে করি। এর বিপরীতে যেসব বিষয় এই উদ্দেশ্যের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না, যদিও ঐতিহাসিকগণ তাদের সময়ের আমানত মনে করে রেকর্ড পূর্ণ করার জন্য তা নকল করে গেছেন, কিন্তু আমরা অপ্রয়োজনে সেগুলো পুনরাবৃত্তি করাকে সময়ের অপচয় মনে করি।

এটিও একটি বাস্তবতা যে, আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের চার শতাব্দী কিছু বিশেষ অবস্থা ও ঘটনা বাদ দিলে আমাদের জন্য নিজেদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা শিক্ষা রাখে না। এটি ঠিক তেমনই যেমন একজন শতায়ু ব্যক্তির জীবনের সেই পঁচিশ-ত্রিশ বছরের অবস্থা যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া, পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন এবং উন্নতির পথ পাড়ি দেওয়া সংক্রান্ত হয়, তা পড়া এবং শোনা এতটাই উপকারী হয় যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনলেও আগ্রহ শেষ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তির সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর কোনো বিশেষ গুরুত্ব রাখে না যা ঘরের কোণে বসে থাকা বা হাসপাতালে যাতায়াত করতে করতে কেটে যায়। এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের অবস্থা কয়েক পৃষ্ঠায় গুছিয়ে আনাই উত্তম হয়। একইভাবে উম্মতে মুসলিমার প্রাথমিক আড়াই শতাব্দীর অবস্থা যেহেতু বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল; তাই সেগুলো বর্ণনা করার জন্য আমাদের দেড়-দুই হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে, যেখানে বনু আব্বাসের পতনের যুগের চার শতাব্দীর কাহিনী দেড়-দুইশ পৃষ্ঠায় গুছিয়ে আনা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে যে, বনু আব্বাসের পতনের যুগ উম্মাহর পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে এই কারণেও ভিন্ন যে, আগে আন্দালুস, মরক্কো এবং তিউনিসিয়া বাদে বাকি সমস্ত মুসলিম বিশ্বের লাগাম বনু আব্বাসের হাতে ছিল; তাই অধিকাংশ ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক বিষয়াবলি বনু আব্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। কিন্তু পতনের যুগ হলো বিভাজনের যুগ। এতে আলাদা আলাদা পরিবার পৃথক পৃথক রাজ্যে রাজত্ব...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

করতে এবং তাদের রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিজেদের মতো করে পরিচালনা করতে দেখা যাবে। যেভাবে একটি ঘর যখন অনেকগুলো পরিবারে বিভক্ত হয় তখন তাদের কাহিনীও আলাদা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি একটি উন্মতের ইতিহাসও এখানে এসে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হতে শুরু করে। বনু আব্বাসের এই চার শতাব্দীতে তাদের সমসাময়িক সরকারগুলো ছিল: যেমন ইদ্রিসি, আগলাবি, বনু তুলুন, সাফারি, সামানি, গজনভি, সেনজুকি, ঘুরি, আইয়ুবি, খাওয়ারজম শাহী এবং তাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। আমরা তাদের অবস্থা নিজ নিজ স্থানে বর্ণনা করব। তবে এখানে বনু আব্বাসের অবস্থার অধীনে এই সরকারগুলো এবং সুলতানদের অবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী কোথাও কোথাও বর্ণনা করা হবে।

বনু আব্বাস - পতনের যুগের তিনটি পর্যায়

বনু আব্বাসের পতনের কাহিনীকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি:

- প্রাথমিক পর্যায় (৮৭ বছর): মুস্তানসিরের সিংহাসন আরোহণ থেকে বাগদাদে বুওয়াইহিদের দখল পর্যন্ত (২৩২ হি. থেকে ৩৩৪ হি.)।
- মধ্যবর্তী পর্যায় (১১২ বছর): বুওয়াইহিদের আধিপত্য থেকে আল-কায়িমের অপসারণ পর্যন্ত (৩৩৪ হি. থেকে ৪৫০ হি.)।
- সমাপ্তি পর্যায় (২০৬ বছর): খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার থেকে শেষ খলিফা মুস্তাসিমের শাহাদাত পর্যন্ত (৪৫০ হি. থেকে ৬৫৬ হি.)।

১. প্রাথমিক পর্যায়

প্রাথমিক পর্যায়েই খিলাফতের পতন শুরু হয়েছিল। এই সময়ের তিনটি ধাপ ছিল:

- প্রথম ধাপ: পতনের সূচনা, তুর্কিদের একচ্ছত্র আধিপত্য... মুস্তানসিরের হত্যাকাণ্ড থেকে মুহতাদির অপসারণ পর্যন্ত (২৩২ হি. থেকে ২৫৬ হি.)।
- দ্বিতীয় ধাপ: সাময়িক উন্নতি... মুতামিদের খিলাফত থেকে মুক্তাফির ইন্তেকাল পর্যন্ত (২৫৬ হি. থেকে ২৯৫ হি.)।
- তৃতীয় ধাপ: পুনরায় রাজনৈতিক সংকট... মুকতাদিরের খিলাফত থেকে বাগদাদে বুওয়াইহিদের আধিপত্য পর্যন্ত (২৯৫ হি. থেকে ৩৩৪ হি.)।

প্রথম ধাপ: এতে ৩২ বছর পর্যন্ত তুর্কিদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই সময়ে খিলাফতের পতন অব্যাহত ছিল। খিলাফতের রাজধানী ছিল সামাররা যেখানে তুর্কিরা খলিফাদের ঘিরে রেখেছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ছিল। আলবিরি ক্রমাগত বিদ্রোহ করছিল। ক্ষমতার অলিন্দে তুর্কিরাই প্রভাবশালী ছিল। তারা এক খলিফাকে অপসারিত করত এবং অন্যজনকে বসাত। প্রয়োজন মনে করলে হত্যাও করে ফেলত। এই সময়ে কেবল মুহতাদি বিল্লাহ শাসনের মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই নিহত হন।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিল ‘আলী বিন মুহাম্মদ’ (সাহিবুজ জাঞ্জ)-এর বিদ্রোহ। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নিজেকে আলবি দাবি করে হাজার হাজার মানুষকে সাথে নিয়েছিল এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বসরাসহ ইরাকের অধিকাংশ এলাকা দখল করে রেখেছিল। লাখ লাখ মুসলমান তার হাতে নিহত হয়। অবশেষে ২৭০ হিজরিতে মুতামিদের ভাই মুওয়াফফাক এবং তার পুত্র আবুল আব্বাস (যিনি পরে মুতাদিদ বিল্লাহ উপাধিতে খলিফা হন) তিন বছরের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের পর তাকে দমন করেন।

এই যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের রাজনৈতিক ভূগোলও বদলে যায়। কিছু প্রদেশ কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। মরক্কোতে স্বাধীন ইদ্রিসি রাষ্ট্র, তিউনিসিয়ায় করদ রাজ্য আগলাবি এবং খোরাসানে অনুগত তাহিরি রাষ্ট্র তো আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ৩২ বছরে সিরিয়া ও মিসরও হাতছাড়া হয়ে যায় এবং সেখানে তুলুনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ায় সামানি রাষ্ট্র এবং খোরাসানে সাফারি রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে তাহিরি রাষ্ট্রের অবসান ঘটায়। পারস্য ও ইরাকের একটি বড় অংশও দীর্ঘ সময় ধরে জাঞ্জি বিদ্রোহীদের দখলে ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রায় সতেরো বছরের ছিল। এতে মুতাদিদ বিল্লাহর সাহস ও দূরদর্শিতার ফলে খলিফাদের ক্ষমতা অনেকাংশে পুনরুদ্ধার হয়। সামারার পরিবর্তে বাগদাদ পুনরায় খিলাফতের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি উন্নত হতে থাকে। তবে এই পর্যায়টি সংক্ষিপ্ত ছিল।

তৃতীয় পর্যায়: প্রায় ৩৮ বছরের ছিল। যা ছিল অত্যন্ত অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার। এতে রাজনৈতিক অবনতি বাড়তে থাকে। এই ৩৮ বছরে চারদিকে বাতিল ফেরকাগুলোর আধিপত্য ছিল যা কোনো না কোনোভাবে রাফেজি মতবাদের বিভিন্ন রূপ ছিল। আফ্রিকা ও মিসরে বনু উবাইদ, হিজাজে কারামাতি এবং বাগদাদসহ পুরো ইরান ও ইরাকে আল-বুইয়াহ দখলদারিত্ব কায়েম করে।

মধ্যবর্তী যুগ - বনু বুইয়াহর আধিপত্য: ৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি

মধ্যবর্তী যুগ যা প্রায় ১১৬ বছর ব্যাপী ছিল, তা ছিল খলিফাদের চরম দুর্দশা এবং খিলাফতের পদের চরম অবমাননার সময়। এই পুরো সময়ে আব্বাসীয় খলিফারা বনু বুইয়াহর আমিরদের হাতের পুতুল হয়ে ছিলেন। এই সময়ের দুটি পর্যায় ছিল:

- প্রথম পর্যায়: ৪৭ বছর: বনু বুইয়াহর আধিপত্য থেকে আল-কাদিরের খিলাফতের আটশতম বছর পর্যন্ত: ৩৩৪ হিজরি থেকে ৩৮৭ হিজরি। এতে দাইলামের ইসনা আশারি আমিররা খলিফাদের জিম্মি করে ফেলে। তাদের ক্ষমতা হিনিয়ে নেয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়: ৬৩ বছর: আল-কাদিরের আটশতম বছর থেকে আল-কায়িমের পুনরায় সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত: ৩৮৭ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি। এতে খলিফা তার ক্ষমতা কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং তার অবস্থান আগের চেয়ে উন্নত হয়।

সমাপ্তি যুগ - খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত: ৪৫০ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি

তৃতীয় এবং এই যুগটি ২০৬ বছর দীর্ঘ, যা তুঘরিল সেলজুকির হাতে বনু বুইয়াহর উচ্ছেদ এবং আল-কায়িম বি-আমরিবিল্লাহর পুনরায় সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে শুরু হয়। এই যুগকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

- প্রথম পর্যায়: সেলজুক সুলতানদের ছায়ায় আব্বাসীয় খিলাফত: ৪৫০ হিজরি থেকে ৫৪৭ হিজরি (৯৭ বছর)। সেলজুকরা এসে খিলাফতের পদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। তারা প্রায় ষাট বছর খলিফাদের রক্ষক হিসেবে ছিল, তারপর তারা খলিফাদের দমন করতে শুরু করে। কিন্তু এবার খলিফারা নতি স্বীকার করতে রাজি হননি, যার ফলে সুলতানদের এবং বাগদাদের খিলাফতের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা প্রায় ৭৭ বছর স্থায়ী হয়। অবশেষে সুলতান মাসউদের মৃত্যু এবং সুলতান সাঞ্জারের তুর্কান-এ-গুজদের হাতে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে সেলজুকদের আধিপত্য শেষ হয়ে যায়। [১]

[১] সেলজুকদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়িম বি-আমরিবিল্লাহর অবস্থার বর্ণনায় আসছে।

দ্বিতীয় পর্যায়: খিলাফতের স্বাধীন মর্যাদার পুনরুদ্ধার। ৫২৭ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি (১০৯ বছর)

সেলজুকদের পতনের পর আব্বাসীয় খিলাফতের স্বাধীন মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়। যদিও খিলাফত এখন আগের মতো বিশাল এলাকায় বিস্তৃত ছিল না, তবে এর ধন-সম্পদ এবং শান-শওকত একটি পর্যায় পর্যন্ত ফিরে এসেছিল। এই যুগে ইরাক ও সিরিয়ায় আতাবেগ আমিরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিছুকাল পর মিশরে আইয়ুবী সালতানাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা কয়েক বছর পর সিরিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আতাবেগ ও আইয়ুবী আমিরগণ খলিফাদের সম্মান বজায় রেখেছিলেন এবং তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেননি। [১]

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজম শাহী সালতানাত অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা সেলজুকদের মতো বাগদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও করে, যার ফলে উভয় রাজ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। এই যুগেই চীন থেকে তাতার শাসক চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ঘটে এবং বাগদাদের খলিফারা খোয়ারিজমের মোকাবিলায় তাতারদের সাথে আঁতাত করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে শত্রুতা, ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, জিহাদ থেকে বিমুখতা এবং বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের কারণে খিলাফত অলক্ষ্যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাতার আক্রমণকারীরা একে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। [২]

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এখন পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো থেকে আমরা বনু আব্বাসের পতন যুগের অধ্যয়ন শুরু করছি।

[১] আতাবেগ ও আইয়ুবী শাসকদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে পেশ করা হবে।

[২] খোয়ারিজম শাহী শাসকগণ, তাতার ফিতনা এবং বাগদাদের পতনের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে আসবে।

বাগদাদ খিলাফতের পতন

প্রাথমিক যুগ

প্রথম পর্যায়

পতনের সূচনা - তুর্কিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য

মুনতাসিরের হত্যাকাণ্ড থেকে মুতামিদের পদচ্যুতি পর্যন্ত

(২৪৭ হিজরি থেকে ২৭৯ হিজরি)

প্রায় ৩২ বছর

আল-মুনতাসির বিপ্লব

মুহাম্মদ বিন জাফর আল-মুতাওয়াঙ্কিল

শাওয়াল ২৪৭ হিজরি থেকে রবিউল আখের ২৪৮ হিজরি

ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মে ৮৬২ খ্রিস্টাব্দ

মুনতাসির তুর্কিদের হাতে নিজের পিতাকে হত্যা করিয়ে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এই দুঃসাহস তুর্কিদের বেপরোয়া করে দিয়েছিল। বুগা আল-কাবির এবং ওয়াসিফ আল-তুর্কি সেই যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী তুর্কি অফিসার ছিলেন এবং মুতাওয়াঙ্কিলের হত্যাকাণ্ডে অগ্রণী ছিলেন।

এই তুর্কি সর্দাররা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারল যে মুনতাসির একজন বুদ্ধিমান, গস্তীর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ; তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ নয়। মুনতাসির প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তায় ছিলেন যে কীভাবে তুর্কিদের ক্ষমতা খর্ব করা যায়। তিনি বলতেন: “তুর্কিরা খলিফাদের হত্যাকারী।”

একদিন তিনি কোষাগার পরিদর্শন করছিলেন তখন একটি পুরনো কাপেট পাওয়া গেল যাতে মুকুট পরিহিত একজন অশ্বারোহীর ছবি ছিল। নিচে ফারসিতে কিছু লেখা ছিল। তিনি একজন অনুবাদককে দিয়ে তা পড়ালেন, যাতে লেখা ছিল:

“আমি খসরু শিরওয়ান বিন খসরু পারভেজ। আমি আমার পিতাকে হত্যা করেছি কিন্তু ছয় মাসের বেশি বাঁচতে পারিনি।”

মুনতাসির কেঁপে উঠলেন এবং তার নিজের পরিণামও এমনই হবে বলে মনে হতে লাগল। কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক দূষিত রক্ত বের করার জন্য শিঙা লাগানোর পরামর্শ দিলেন। এদিকে তুর্কি আমিররা চিকিৎসককে মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে রাজি করাল যেন সে এই কাজের জন্য বিষাক্ত অস্ত্রোপচার যন্ত্র ব্যবহার করে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে মুনতাসিরের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ল এবং খিলাফতের সিংহাসনে বসার মাত্র ছয় মাস পর রবিউল আখের ২৪৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। শেষ সময়ে তিনি তার মাকে বলছিলেন:

“মা! আমার দুনিয়াও বরবাদ হলো এবং আখেরাতও। আমি আমার পিতাকে মারতে তাড়াহুড়ো করেছি, তাই আমার সময়ও দ্রুত চলে এল।” [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬০, তাবা নাজ্জার; তারিখ ইবনে খালদুন, ৩/৩৫০।

আল-মুস্তাইন বিল্লাহ

আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম

রবিউল আখের ২৪৮ হিজরি থেকে মহররম ২৫২ হিজরি

মে ৮৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ

মুনতাসিরকে হত্যার পর তুর্কি আমীররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে, এখন এমন কোনো ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো উচিত যে আমাদের অনুগত হবে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ ক্ষমতায় আসলে সে তার পিতার হত্যাকারীদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে; তাই শেষ পর্যন্ত তারা তাদের অন্নদাতা খলিফা মু'তাসিমের পুত্র আহমদকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করল। যিনি মুস্তাইন বিল্লাহ উপাধি নিয়ে খেলাফতের মসনদে বসলেন। তিনি একজন নেককার কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন। তার শাসনামলে রোমানরা আবারও ইসলামী সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। ১৫ রজব ২৪৯ হিজরিতে সংঘটিত যুদ্ধে তাদের বিশাল একটি অংশ রণক্ষেত্রে প্রাণ হারায় এবং সেনাবাহিনীর দুই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি: উমর বিন আব্দুল্লাহ এবং আলী বিন ইয়াহইয়া শহীদ হন। এটি ছিল এক বিরাট পরাজয় যার শোকে বাগদাদে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তুর্কি আমীরদের দোষারোপ করতে লাগল যে, তারা খলিফাদের হত্যা করতে খুব সাহসী কিন্তু কাফেরদের মোকাবিলায় দমে যাচ্ছে। উত্তেজিত জনতা জিহাদের ডাক দিল এবং জেল ভেঙে সব বন্দীদের মুক্ত করে নিল। এই ধরনের গণবিদ্রোহ সামারাতেও দেখা দেয় এবং সেখানেও জেল থেকে বন্দীদের বের করে নেওয়া হয়, তবে তুর্কি অফিসাররা দ্রুতই দমন-পীড়নের মাধ্যমে এই বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনে। [১]

আলাউয়ীদের বিদ্রোহ:

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের উত্থানকালে হাসান বসরী, ইমাম শাবী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মতো ব্যক্তিত্বদের নিরবচ্ছিন্ন ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেহনতের কারণে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে; ফলে জাল ইসলাম বিকাশের চেষ্টাগুলো ব্যর্থ হতে থাকে। মামুন ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি কিছুটা শিয়া এবং কিছুটা মুতাজিলা মতাদর্শী ছিলেন। মু'তাসিম এবং ওয়াসিক ছিলেন কটুর মুতাজিলা, কিন্তু ওলামায়ে হকের প্রচেষ্টায় খুব দ্রুতই শাসক পরিবার এই জাল থেকে মুক্ত হয় এবং মুতাওয়াঙ্কিল সরকারিভাবে বিদআত দমন করে খেলাফতের দরবারে ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর অগ্রযাত্রা রুখে দেন।

কিন্তু তৃতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুতাওয়াঙ্কিলের হত্যার পর খেলাফতের কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়লে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এখন পুতুল প্রকৃতির লোকেরা খলিফা হতে থাকে এবং শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে প্রতিটি ফেরকার দাওয়াতদানকারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যায়। এখন তারা...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৬৯, তবা নিয়ার; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/ ৪৬৮ থেকে ৪৭২।

প্রথম সারির সাদাতগণও তাদের মধ্যে ছিলেন না, যাদের ওপর সবার আস্থা ছিল এবং যাদের রাফয (শিয়া মতবাদ) থেকে বিমুখতা রাফযি আন্দোলনকে দুর্বল করে দিত। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী প্রতিটি সম্প্রদায় ইসলাম থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শিয়া মতবাদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ইবনে সাবার ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে অত্যন্ত তীব্রতার সাথে প্রচার করা হতে থাকে। চরমপন্থী শিয়ারা স্থায়ীভাবে তাদের ধর্মের ভিত্তি সেই নীতিগুলোর ওপর স্থাপন করেছিল যা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা পেশ করেছিল। এই নতুন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, তেমনি রাজনৈতিক শক্তিরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল; তাই বনু আব্বাসের পতন শুরু হতেই রাফযিরা আলউইদের নাম ব্যবহার করে তাদের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়। কিছুকাল পর কারামিতা, বুওয়াইহিয়া, ইছনা আশারি এবং বাতিনি সরকারগুলো এই মানসিকতার অধীনেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল।

আলউইদের বিদ্রোহ ঠিক সেই সময়ে শুরু হয়েছিল যখন খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং রোমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষায় ব্যর্থতা জনগণের মনে শাসকদের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আলউইদের বিদ্রোহে পুরো সাম্রাজ্যে এক তুফান সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথম ২৫০ হিজরিতে একজন হাসানি আমির আবুল হুসাইন (ইয়াহইয়া বিন উমর বিন ইয়াহইয়া বিন হুসাইন বিন যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন [রা.]) কুফায় বিদ্রোহের ঘোষণা দেন। বাগদাদের অনেক মানুষও এই বিদ্রোহে शामिल হয়। তবে শুরুতে কিছু সাফল্যের পর অবশেষে ১৫ রজব ২৫০ হিজরিতে বিদ্রোহী বাহিনী সরকারি বাহিনীর সাথে মোকাবিলায় শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং আবুল হুসাইন নিহত হন।

২৫১ হিজরিতে কুফায় তিনজন আলউই দাঁড়িয়ে যান: হুসাইন বিন মুহাম্মদ (বিন হামযা বিন আবদুল্লাহ বিন হুসাইন বিন আলী বিন হুসাইন [রা.]) বিদ্রোহ করেন এবং সরকারি বাহিনীর কাছে পরাজিত হন।

মক্কায় ইসমাইল বিন ইউসুফ (বিন ইব্রাহিম বিন মুসা বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হাসান [রা.]) বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং পবিত্র শহরের মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দেন। কাবার গিলাফ নামিয়ে ফেলেন, হারাম শরীফ থেকে সোনা-রূপার প্রতিটি জিনিস এমনকি আতর ও সুগন্ধিও লুট করেন। শহরবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক কয়েক লক্ষ দিরহাম আদায় করেন। এরপর মদিনা দখল করেন। এরপর তিনি পুনরায় মক্কার দিকে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে অবরোধ করেন যে মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরতে শুরু করে। এক ঢোক পানি তিন দিরহামে বিক্রি হতে থাকে। এরপর জেদ্দা বন্দরে পৌঁছে বণিকদের মালামাল লুট করেন এবং জাহাজগুলো দখল করে মক্কাবাসীদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এরপর হজের সময় পুনরায় মক্কায় আসেন এবং হাজিদের ওপর তলোয়ার চালান, এগারোশ হাজিকে হত্যা করে আরাফাতের ময়দান খালি করে দেন। ইয়াওমে আরাফায় সেখানে তার দল ছাড়া আর কাউকে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সরকারি বাহিনী এলে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এই বছরই কজভিনে হুসাইন বিন আহমদ কাওকাবি (বিন ইসমাইল বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-আরকাত বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন [রা.]) সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত এই অঞ্চলে তার আধিপত্য বজায় থাকে। অবশেষে ২৯ ফিলকদ ২৫৩ হিজরিতে আব্বাসীয় আমির মুসা বিন বুগা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এই তিন আলউই গ্রেফতার হতে পারেননি। কেউ কেউ দাইলামের পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৪৬৮ থেকে ৪৭২।

মুস্তাইন-এর হত্যাকাণ্ড

এই সময়ে খলিফা মুস্তাইন তুর্কি আমিরদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহররম ২৫১ হিজরিতে সামাররা থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হন। তুর্কি আমিররা তাকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি রাজি হননি। অবশেষে তুর্কিরা মুতাওয়াঙ্কিলের পুত্র মুতায বিল্লাহকে খিলাফতের জন্য দাঁড় করিয়ে মুস্তাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মুস্তাইনের অনুগত বাগদাদী আমির এবং তুর্কিদের বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করতে থাকে। যুদ্ধের কারণে খাদ্যদ্রব্য দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে এবং বাগদাদের জনগণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়।

অবশেষে মুস্তাইন বাধ্য হয়ে ৪ মহররম ২৫২ হিজরিতে পদত্যাগ করেন এবং জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে মুতায বিল্লাহর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। কিন্তু মুতায এই চুক্তির কোনো মর্যাদা দেননি এবং তাকে নয় মাস বন্দি রাখার পর ৩ শাওয়াল ২৫২ হিজরিতে হত্যা করিয়ে দেন। [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/৪৭৮ থেকে ৪৯০।

আল-মু'তায় বিল্লাহ

মুহাম্মদ বিন জাফর আল-মুতাওয়াঙ্কিল

মহররম ২৫২ হিজরি থেকে রজব ২৫৫ হিজরি

ফেব্রুয়ারি ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলাই ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ

মু'তায় ১৯ বছর বয়সে খেলাফতের মসনদে বসেন, কিন্তু তিনিও তুর্কিদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। ওয়াসিফ তুর্কি ছিলেন দরবারের প্রধান সেনাপতি, যার সামনে খলিফা ছিলেন একেবারেই অসহায়। এরপর দ্বিতীয় তুর্কি আমির বুগা আস-সাগির শাসনকার্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। একদিন ওয়াসিফ তুর্কি তার নিজেরই অবাধ্য সৈন্যদের হাতে নিহত হন, অন্যদিকে সুযোগ বুঝে খলিফা বুগা আস-সাগিরকে হত্যা করান। তা সত্ত্বেও তুর্কিদের প্রতাপ কমেনি। তারা খলিফার কাছে ইচ্ছামতো অর্থ দাবি করত এবং তিনি তা অস্বীকার করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত কোষাগার শূন্য হয়ে গেল, কিন্তু তুর্কিদের দাবি চলতেই থাকল। মু'তায় অতিষ্ঠ হয়ে তার মায়ের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ চাইলেন। সেই অভিজ্ঞ নারী তা দিতে অস্বীকার করলেন। তুর্কিরা তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা প্রাসাদে ঢুকে মু'তায়কে ধরে ফেলল এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল। প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে তাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কড়া রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো এবং চড়-থাপ্পড় মেরে পদত্যাগের দাবি জানানো হলো। যখন তিনি পদচ্যুত হওয়ার স্বীকৃতি দিলেন, তখন তাকে প্রাসাদে যেতে দেওয়া হলো। এটি ২ রজব ২৫৫ হিজরির ঘটনা।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। পদচ্যুতির পর ২ শাবান মু'তায় গোসল করার জন্য গরম হামামে প্রবেশ করেন। বাইরে বের হওয়ার পর তৃষ্ণায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তুর্কিরা তাকে ধরে এতক্ষণ তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাখল যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। এরপর হঠাৎ তাকে বরফ মেশানো পানি পান করানো হলো, যার ফলে তার অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হলো। এটি এমন এক কৌশল ছিল যে হত্যার কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ সামনে আসতে পারেনি। [১]

মিশরে তুলুনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা:

মু'তায়ের শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মিশরে “তুলুনি রাজবংশ” প্রতিষ্ঠা, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ বিন তুলুন। তার পিতা তুলুন ছিলেন একজন তুর্কি গোলাম, যাকে বুখারার শাসক মামুন আব্বাসির কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মুতাসিমের শাসনামলে তুলুন সামাররায় বসবাস শুরু করেন, যেখানে ২২০ হিজরিতে তার পুত্র আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। আহমদ শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন, কুরআন মাজিদ হিফজ করেন এবং ইলমে হাদিস অর্জন করেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আলেম ও নেককারদের মজলিস তার খুব পছন্দ ছিল। [২]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬৬ ত নোলার; তারিখে ইবনে খালদুন: ৩/ ৩৬৫, ৩৬৬। মু'তায়ের শাসনের মেয়াদ দুই বছর দশ মাস।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ১/ ১৭৩, ১৭৪।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (তৃতীয় খণ্ড)

খলিফা মু’তায়-এর যুগে আহমদ বিন তুলুনকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি ২৫৪ হিজরিতে মিশরে স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। [১] ২৬৫ হিজরিতে তিনি সিরিয়াও দখল করে নেন। [২]

আহমদ বিন তুলুন এমন এক সময়ে সিরিয়া ও মিশরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রোমানদের কবল থেকে রক্ষা করেন যখন আব্বাসীয় খিলাফত সীমান্ত রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। খোরাসানের ‘দৌলতে তাহিরিয়া’ এবং তিউনিসের ‘দৌলতে আগলাবিয়া’-র মতো এই সরকারও আব্বাসীয়দের অনুগত ছিল, যেখানে খুতবায় আব্বাসীয় খলিফার নাম নেওয়া হতো এবং খলিফাকে বার্ষিক কর পাঠানো হতো। [৩]

ইবনে তুলুন ২৭০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কায়রোর জামে মসজিদ তুলুন এবং ফিলিস্তিনের ইয়াফা দুর্গ তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান। [৪][৫]

ইবনে তুলুনের চরিত্র সম্পর্কে আল্লামা ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন:

“তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল, সাহসী, বিনয়ী, সচ্চরিত্র এবং তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। রাষ্ট্রীয় কার্যাদি তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখতেন এবং শহর আবাদ করতেন। আলেমদের ভালোবাসতেন। তাঁর দস্তুরখান সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রতিদিন তিনি এক হাজার দিনার দান করতেন। একবার তাঁর উকিল এসে বলল: আমার কাছে চাদর পরিহিত এক মহিলা আসে যার হাতে আংটি থাকে। তাকেও কি দিনার দেব? ইবনে তুলুন বললেন: ‘যে-ই হাত পাতবে তাকেই দিয়ে দাও’।” [৬]

ইবনে তুলুনের পরিবারের স্বায়ত্তশাসিত শাসন ২৯২ হিজরি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। [৭]

দৌলতে সাফফারিয়ার প্রতিষ্ঠা:

মু’তায়-এর যুগে খোরাসানে দৌলতে সাফফারিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াকুব বিন লাইস সাফফার। তিনি একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন এবং সিস্তানের সেই স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মী ছিলেন যারা জালিমদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। এই দলের নেতা সালেহ বিন নযর-এর মৃত্যুর কিছুকাল পর ইয়াকুব বিন লাইস নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২৫৩ হিজরিতে সিস্তান দখল করে একটি স্বাধীন সরকারের ভিত্তি স্থাপন করেন। ‘আমর বিল মারুফ’ এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ এই সরকারের মূলমন্ত্র ছিল। [৮]

[১] ওফায়াতুল আ’য়ান: ১/১৭৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/২৮৫; আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২৫৪ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২৬৪ হিজরি।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৩৮৬-৩৮৭।

[৪] তারিখ আল-ইসলামি মাহমুদ শাকির: ৬/৮১।

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২৭০ হিজরি; ওফায়াতুল আ’য়ান: ১/১৭৩।

[৬] তারিখ আল-ইসলামি মাহমুদ শাকির: ৬/৯৭।

[৭] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২৫৩ হিজরি।

আল-মুহতাদি বিল্লাহ

মুহাম্মদ বিন হারুন আল-ওয়াসিক

রজব ২৫৫ হিজরি থেকে রজব ২৫৬ হিজরি

জুলাই ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলাই ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ

তুর্কিরা মুতাজ-এর মৃত্যুর আগে খলিফা ওয়াসিক-এর পুত্র মুহাম্মদকে বাগদাদ থেকে সামাররায় ডেকে এনে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। ২৭ রজব ২৫৫ হিজরিতে তিনি ‘মুহতাদি বিল্লাহ’ উপাধিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১] তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় তুর্কি সর্দার সালেহ বিন ওয়াসিফ সরকারি বিষয়াবলীতে প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু তুর্কিদের দলগুলোর মধ্যেও উত্তেজনা চলছিল; তাই বাগদাদের এক তুর্কি সর্দার মুসা বিন বুগা সামাররায় আক্রমণ করে সালেহ বিন ওয়াসিফকে অসহায় করে দেন এবং পরে তাকে হত্যা করান। [২]

মুহতাদি ছিলেন সঠিক আকিদাবিশিষ্ট, সুন্নতের অনুসারী, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ এবং মুত্তাকি মানুষ। উমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং তিনি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইতেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো শান-শওকত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি সর্বদা নফল রোজা রাখতেন এবং অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। [৩] তিনি খোলা দরবারে বসতেন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনতেন। [৪]

তাঁর খলিফা হওয়ার কয়েক মাস পরের ঘটনা; জনৈক আমির তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। রমজান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই যুগে ইফতার হতো সাধারণ পানি ও খেজুর দিয়ে। পানাহারের সমস্ত সরঞ্জাম মাগরিবের নামাজের পর পেশ করা হতো। মুহতাদি মাগরিবের নামাজ পড়ালেন এবং সেই আমিরকে খাওয়ার জন্য থামিয়ে দিলেন। দস্তুরখানে বসার পর দেখা গেল সেখানে কেবল একটি রুটি, সামান্য সিরকা, জলপাই তেল এবং লবণ রয়েছে। আমির তা দেখে অবাক হলেন। তিনি ভালো খাবারের অপেক্ষায় ধীরে ধীরে খেতে লাগলেন, তখন মুহতাদি বললেন: “ভালোভাবে খাও। খাওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই নেই।”

আমির অবাক হয়ে এই মিতব্যয়িতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

“আমি ভাবি, বনু উমাইয়ায় একজন উমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন, যাঁর অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে জীবন সম্পর্কে তোমরাও জানো। আমার আত্মমর্যাদায় লাগে যে বনু আব্বাসে এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে না যার কোনো উদাহরণ বনু হাশেমের মধ্যে নেই।” [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৫২৫-৫২৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৫৩৭-৫৩৮

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৩

[৪] আল-মুনতাজাম: ১২/৮৪

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/৫২৬

মুহতাদী ‘নামের সার্থকতা রক্ষাকারী’ [১] ছিলেন। তিনি রাজধানী ‘সামাররা’কে নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র থেকে মুক্ত করেন। খিলাফত প্রাসাদে শিকারের জন্য পালিত হিংস্র পশুদের মেরে ফেলার এবং কুকুরদের শহর থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন পুনরায় খুলাফায়ে রাশেদার স্মৃতি সজীব হয়। [২]

তিনি ধীরে ধীরে নিজের সমর্থকদের সংগঠিতও করছিলেন। কিন্তু এখনও তাঁর শক্তি খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি, এর মধ্যেই তুর্কিরা সতর্ক হয়ে যায়। তারা তাঁকে কোনো সংস্কারমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়নি এবং তাঁকে পদচ্যুত করার পরিকল্পনা শুরু করে। মুহতাদী তাদের সংকল্পের কথা জানতে পেরে কোমর বেঁধে দরবারে আসেন এবং এক নির্ভীক ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

“তোমরা আমাকে পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো মনে করো না। তোমাদের পরামর্শ সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। আমি অসিয়তনামা লিখিয়ে এসেছি এবং মরা-মারার জন্য প্রস্তুত আছি। যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার আছে, আমি তোমাদের অনেকের প্রাণ নিয়েই ছাড়ব। আমার সাথে শত্রুতা তোমাদের জন্য দামী পড়বে। তোমাদের মধ্যে কি দ্বীনদারী, লজ্জা ও শরফাতের কোনো লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে! দীর্ঘকাল ধরে তোমরা খলিফাদের শত্রু হয়ে আছো! আল্লাহকে ভয় করো না! কোনো খলিফা তোমাদের ভালো চাক, বা তোমাদের শেষ করতে চাক অথবা তোমাদের দেওয়া দুঃখ-কষ্ট ভোলার জন্য পানাহারে ডুবে থাকুক, তোমাদের তাতে কোনো পার্থক্য পড়ে না। গিয়ে আমার এবং আমার ভাইদের ঘরগুলো দেখে নাও। পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো কোনো সাজ-সরঞ্জাম নেই। কেবল তাই আছে যা সাধারণ মানুষের ঘরে থাকে।” [৩]

মুহতাদীর হত্যাকাণ্ড:

সাময়িকভাবে কিছু তুর্কি আমির লজ্জিত হলো, কিছু দমে গেল কিন্তু অধিকাংশ পাল্টা আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে থাকল। অবশেষে তারা খলিফাকে হত্যা করার জন্য খিলাফত প্রাসাদে হামলা চালিয়ে দিল। মুহতাদী তাঁর অনুগতদের নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে চার হাজার তুর্কি নিহত হয়, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের পাল্লাই ভারী হলো। মুহতাদীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর প্রহারের পর হত্যা করা হয়। এটি ১৬ই রজব ২৫৬ হিজরীর ঘটনা। এই নেক শাসকের খিলাফত মাত্র সাড়ে এগারো মাস স্থায়ী ছিল। [৪]

[১] অর্থাৎ যেমন নাম ছিল তেমনই কাজ ছিল।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৫৫ হিজরী।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৫১৯; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৩৭২, ৩৭৩।

[৪] তারিখুত তাবারী: বছর ২৫৬ হিজরী; তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৬৩, ত ত নযর।

আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ

আহমদ বিন জাফর আল-মুতাওয়াঙ্কিল

রজব ২৫৬ হিজরি থেকে মহররম ২৭৯ হিজরির শেষ পর্যন্ত

জুলাই ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্চ ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ

এখন মুতাওয়াঙ্কিলের আরেক পুত্র আহমদকে খিলাফত অর্পণ করা হলো, যিনি আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ উপাধি ধারণ করে কাঁটার এই শয্যায় বসলেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তুর্কিদের এমন একজন খলিফা প্রয়োজন যে কোনো কাজের হবে না, তাই তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া নিরর্থক মনে করলেন এবং খিলাফতের সোনালী খাঁচায় আমোদ-প্রমোদকে নিজের ব্যস্ততার মাধ্যম বানিয়ে নিলেন। তাঁর হারেম এবং প্রমোদশালার বাইরে কী ঘটছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তুর্কিরা প্রকৃতপক্ষে এমনই একজন অকর্মণ্য খলিফা চেয়েছিল, তাই মু'তামিদের দিনগুলো দীর্ঘ হলো। পতনের যুগে তিনি ২৩ বছর পর্যন্ত খলিফা ছিলেন, যদিও এর আগের ৯ বছরে পাঁচজন খলিফা পরিবর্তিত হয়েছিলেন। [১]

বিদ্রোহসমূহ:

মু'তামিদের শাসনামলে ক্রমাগত বিদ্রোহ হতে থাকে। ২৫০ হিজরিতে ইয়াহইয়া বিন উমর যাইদি বিদ্রোহ করেন কিন্তু নিহত হন। একই বছর হাসান বিন যাইদ তালিবি নামক একজন সৈয়দ তাবারিস্থানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে “দাওলাতে যাইদিয়া তালিবিয়া”-র ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৫২ হিজরিতে আলী বিন যাইদ তালিবি বিদ্রোহ করে কুফা দখল করে নেন। তবে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। [২]

এই সময়ে খোরাসানে ইয়াকুব বিন লাইস সাফারি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। সাফারির শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি বাগদাদকেও দমানোর চেষ্টা শুরু করেন। এটি দেখে মু'তামিদ সামাররা থেকে বাগদাদে চলে আসেন এবং সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করেন। ২৬২ হিজরিতে ইয়াকুব বিন লাইস ওয়াসিত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এদিক থেকে উত্তরাধিকারী মুওয়াফফাক খিলাফতের সেনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলার জন্য বের হন। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইয়াকুব বিন লাইস পরাজিত হন এবং বাগদাদের ওপর তাঁর আধিপত্যের আশঙ্কা দূর হয়। [৩]

উত্তরাধিকারীর ঘোষণা:

২৬১ হিজরিতে মু'তামিদ তাঁর উত্তরসূরিদের ঘোষণা করে বলেন যে, আমার পর আমার পুত্র জাফর এবং তারপর আমার ভাই আবু আহমদ মুওয়াফফাক উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু যদি আমি আমার পুত্রের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যাই, তবে আমার ভাই আল-মুওয়াফফাক উত্তরাধিকারী হবেন। [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৬৬ থেকে ২৬৭।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ২৫০ হিজরি, সন ২৫৬ হিজরি।

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার, ১/৩৭৬।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/৫২৫।

সাহিব আল-জাঞ্জ আলী বিন মুহাম্মাদের ফিতনা

মুতাদিদ-এর শাসনামলে আলী বিন মুহাম্মাদ (সাহিব আল-জাঞ্জ)-এর ভয়াবহ ফিতনা, যা পূর্ববর্তী খলিফাদের সময় শুরু হয়েছিল, তা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আলী বিন মুহাম্মাদ ছিল আব্দুল কায়েস গোত্রের এক ধূর্ত ব্যক্তি, যার জন্মস্থান ছিল রে। এই ব্যক্তি ছিল সেই যুগের মুসাইলামা কাযযাব। সে নিত্যনতুন ভবিষ্যদ্বাণী, মিথ্যা কারামত এবং জাদুকরী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করত। তার অবস্থা দেখে হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. এটি লিখতে বাধ্য হয়েছেন: “এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তার সাথে শয়তান ছিল যে তার সাথে কথা বলত, যেমন শয়তান এক মুসাইলামা থেকে অন্য মুসাইলামার কাছে আসত।” [১]

ঘৃণ্য আকিদা ও মিথ্যা দাবি:

আলী বিন মুহাম্মাদের আকিদা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। তার প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাদাত এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রতি গালিগালাজ ও অপবাদ আরোপ করত। সে এমনকি এও বলত:

“আমাকে নবুওয়াতের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, আমি ভয় পেয়েছিলাম যে হয়তো এর বোঝা সহ্য করতে পারব না, তাই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।” [২]

২৪৯ হিজরিতে সে সামাররায় নিজেকে মুহাম্মাদ বিন ফজল বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আলী রা.-এর বংশধর বলে দাবি করে। যখন তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন সে পালিয়ে বাহরাইনে চলে যায় এবং দাবি করে যে, আমি হলাম আহমদ বিন ঈসা বিন যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা.-এর নাতি আলী বিন মুহাম্মাদ। এটিও ছিল ডাহা মিথ্যা; কারণ আসল আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন ঈসা তখন নিজেই কুফায় অবস্থান করছিলেন।

আরবদের মধ্যে নিজের সুবিধা করতে না পেরে সে তার মুরিদদের বলল যে, আমি মেঘের গর্জনের মধ্যে আওয়াজ শুনেছি যে বসরার দিকে যাত্রা করো। এভাবে ২৫৪ হিজরিতে সে তার দলবল নিয়ে বসরার উপকণ্ঠে চলে আসে এবং কিছুকাল গোপনে সদস্য সংগ্রহ করতে থাকে। সে বাগদাদেও এসেছিল এবং অলৌকিকতা দেখিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করেছিল।

শাওয়াল ২৫৫ হিজরিতে সে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং হাজার হাজার হাবশী গোলামকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের মুরিদ বানিয়ে নেয়। [৩]

মুসলমানদের গণহত্যা:

তার আলভী হওয়ার ওপর বিশ্বাস করে হাজার হাজার সাধারণ শহরবাসী ও গ্রামবাসীও তার পেছনে চলতে শুরু করে। সে ছিল একজন অসাধারণ বাগ্মী ও কবি। তার জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে সে ইরানি ও গোলামদের উত্তেজিত করে সরকারের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিত। কিছু সঠিক বংশীয় সৈয়দও ধোঁকা খেয়ে তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে তাদের ব্যবহার করে শীঘ্রই হত্যা করিয়ে দেয়। তাকে প্রতিহত করার জন্য রমজান ২৫৫ হিজরিতে বসরা থেকে চার হাজার সৈন্যের একটি সরকারি বাহিনী আসে, কিন্তু সাহিব আল-জাঞ্জ-এর মুরিদরা এমন পাগলের মতো লড়াই করে যে বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই হতভাগা দলটি নির্বিচারে মুসলমানদের গণহত্যা করত এবং নারীদের দাসী বানিয়ে রাখত। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৫৩৭, সন ২৫৭ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৫৩৯।

[৩] তাকে সাহিব আল-জাঞ্জ বলার কারণ ছিল এই যে, তার মুরিদদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল সেই হাবশী গোলাম যারা বসরার আশেপাশে খনি শ্রমিকের কাজ করত। হাবশীকে ফারসিতে ‘জাজ্জি’ এবং আরবিতে ‘জাজ্জি’ বলা হয়।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৫১৬ থেকে ৫১৮।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

নবম খণ্ড

বসরায় রক্তের নদী:

২৫৭ হিজরিতে আব্বাসীয় আমির সাঈদ হাজিব একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পিছু হটার পর সাহেব আল-জাঞ্জ দ্রুত রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং সরকারি বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। একই বছর শাওয়াল মাসে তিনি বসরার প্রাচীরের সামনে এসে পৌঁছান এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে অবরোধ করেন। বসরার অধিবাসীরা অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন।

একদিন এই ধূর্ত ব্যক্তি হাবশিদের বললেন: “আমি আল্লাহর দরবারে বসরার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছি, তখন জমিন ও আসমান আমার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আমি দেখেছি যে বসরার অধিবাসীদের লাশ বিছানো রয়েছে এবং ফেরেশতারা আমার সাথীদের সাথে মিলে যুদ্ধ করছে। আমি জেনে গেছি যে বিজয় আমারই হবে। আমাকে বলা হয়েছে যে বসরার অধিবাসীরা রুটির মতো, যখন রুটি কিনারা থেকে ভাঙা হবে তখন তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি এর অর্থ এই বুঝেছি যে চাঁদ গ্রহণ হওয়ার পর বসরা বিজয় হবে।”

১৪ শাওয়াল ২৫৭ হিজরি রাতে চন্দ্রগ্রহণ হলো। হাবশিদের জোশ ও উন্মাদনা আকাশচুম্বী হলো। তারা জোরালো আক্রমণ করল এবং সকাল পর্যন্ত শহর দখল করে নিল। এখানে হাবশিরা এমন গণহত্যা চালাল যে রক্তের নদী বয়ে গেল। চারদিকে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, আহতরা ছটফট করছিল, তাদের চিৎকার, আত্ননাদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর করুণ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। হাবশিরা শহরের জামে মসজিদ পুড়িয়ে ছাই করে দিল এবং জেলের দরজা ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করে দিল, যারা সবাই তাদের সাথে যোগ দিল। কয়েক দিন পর্যন্ত বসরায় হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম রইল। হাবশিরা একেকটি মহল্লা লুট করে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। কেবল তারাই বাঁচতে পেরেছিল যারা পালিয়ে গিয়েছিল। যারা লুকিয়ে ছিল তাদের অভয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একত্রিত করা হলো এবং তারপর তাদের গাজর-মুলার মতো কেটে ফেলা হলো। তাদের মধ্যে বড় বড় ওলামা, মুহাদ্দিস, কবি এবং সাহিত্যিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের নাম হাফেজ ইবনে কাসির রহ. উল্লেখ করেছেন।

বসরা বিজয়ের পর সাহেব আল-জাঞ্জ ইরাকি শিয়াদের সাথে নেওয়ার জন্য নিজেকে ইয়াহইয়া বিন যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন রা.-এর বংশধর বলে দাবি করলেন। কিন্তু এটিও মিথ্যা ছিল; কারণ ইয়াহইয়া বিন যায়েদের কোনো সন্তান ছিল না। কেবল একটি মেয়ে ছিল যে শৈশবেই মারা গিয়েছিল। [১]

জঞ্জিদের প্রথম পরাজয়:

২৫৮ হিজরিতে সাহেব আল-জাঞ্জ প্রথম ধাক্কা খেলেন। এই সময় পাঞ্জাব থেকে আসা তার সেনাপতি ‘ইয়াহইয়া হারানি’ গ্রেপ্তার হলো। খলিফা মুতামিদ তাকে দুইশ দোররা মারলেন এবং তারপর হাত-পা কেটে হত্যা করলেন। [২] ২৫৯ হিজরিতে তুর্কি আমির মুসা বিন বুগা জঞ্জিদের এক শোচনীয় পরাজয় দিলেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করলেন। কিন্তু তবুও তাদের ফিতনা শেষ হলো না। ২৬১ হিজরিতে সাহেব আল-জাঞ্জ আহওয়াজে আক্রমণ করলেন এবং আবাদানের সেই দশা করলেন যা বসরার করেছিলেন। পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করলেন এবং চল্লিশ হাজার নারী-পুরুষকে বন্দী করলেন। ২৬৫ হিজরিতে তিনি নুমানিয়ার ওপর আক্রমণ করলেন এবং সেখানেও কিয়ামত ঘটিয়ে দিলেন। পরের বছর তিনি ‘রামহরমুজ’ বন্দরও দখল করে নিলেন। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৫৩৫ ও ৫৩৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৫৪৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৫৪০ ও ৫৫৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৫৪০

আব্বাসীয় বাহিনীর আক্রমণ এবং জানজিদের পরাজয়:

সাহেব আল-জানজ দজলা নদীর শাখাগুলোর মধ্যবর্তী জলাভূমি অঞ্চলে আল-মুখতার নামে নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল, যেখানে সরকারি বাহিনীর পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ ছাড়া সে ‘মানিয়া’ এবং ‘মানসুরা’ নামে দুটি শক্তিশালী শহর নির্মাণ করে সেগুলোকে সামরিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। মুতামিদের শাসনামলে সে চৌদ্দ বছর ধরে অনবরত লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। বছবার সে পরাজিত হলেও ইরাকের একটি বড় অংশ তার বিচরণক্ষেত্র হয়ে ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব খলিফার ভাই আবু আহমদ মুওয়াফফাকের ওপর ন্যস্ত ছিল, যিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জানজিদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তিনি বছবার হাবশিদের পিছু হটতে বাধ্য করেন, কিন্তু এই মুরতাদরা প্রতিটি পরাজয়ের পর আগের চেয়ে বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাদের নেতার চারপাশে সমবেত হতো।

অবশেষে ২৬৭ হিজরিতে মুওয়াফফাক তার ২৫ বছর বয়সী পুত্র আহমদ আবুল আব্বাসকে (যিনি পরবর্তীতে মুতাদিদ বিল্লাহ উপাধিতে খলিফা হন) বিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য দিয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে পাঠান এবং নিজে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পেছনে রওনা হন। এই বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রতিপক্ষের শহর মানিয়া জয় করে সেখান থেকে পাঁচ হাজার মুসলিম নারীকে উদ্ধার করে। এরপর মানিয়া শহরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল মানসুরা, যেখানে মানিয়া থেকে পালিয়ে আসা সমস্ত মুরতাদ একত্রিত হয়েছিল। এই শহরের চারপাশে পাঁচটি পরিখার বেষ্টনী ছিল। এরপর একের পর এক পাঁচটি প্রাচীর ছিল। ২৬ রবিউস সানি মুওয়াফফাক নিজে বাহিনী নিয়ে এখানে পৌঁছান। চার রাকাত নামাজ আদায় করে অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দোয়া করেন এবং তারপর প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমানরা সেদিন পূর্বসূরিদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করেন; কদম কদম লাশের স্তুপ ফেলে তারা একের পর এক পরিখা পার হতে থাকেন এবং প্রাচীরের ওপর উঠে যান। মুরতাদরা এক প্রাচীর থেকে পিছু হটে অন্য প্রাচীরে অবস্থান নিচ্ছিল, কিন্তু তাদের কঠোরতম প্রতিরোধ সত্ত্বেও অবশেষে মুসলমানরা পাঁচটি প্রাচীর টপকে শহরে ঢুকে পড়েন। এখানে হাজার হাজার মুরতাদ নিহত ও বন্দি হয়। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পালিয়ে যায় যাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত থাকে। বন্দিদের তওবা করার আহ্বান জানানো হয় এবং যারা তওবা করে তাদের বিভিন্ন অঞ্চলের বাহিনীতে ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। শহর দখলের পর এখান থেকে দশ হাজার মুসলিম নারীকে উদ্ধার করা হয়।

মুওয়াফফাক এই মহান বিজয়ের পর সাহেব আল-জানজকে পত্র লিখে তওবা করার দাওয়াত দেন। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয়নি। অবশেষে মুওয়াফফাক পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে সেই হতভাগ্যের রাজধানী আল-মুখতার পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে প্রতিপক্ষ তিন লক্ষ যোদ্ধা একত্রিত করে রেখেছিল এবং শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই মজবুত ছিল যে বিজয় অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

মুওয়াফফাক এবং তার পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শহরের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন কিন্তু বিজয়ের কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে মুওয়াফফাক এখানে দীর্ঘ অবরোধের পরিকল্পনা করেন এবং আল-মুখতারার সামনে আল-মুওয়াফফাকিয়া নামে একটি শহর গড়ে তোলেন যেখানে সামরিক ও যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। সেই সাথে তিনি ঘোষণা করেন যে, সাহেব আল-জানজ ব্যতীত মুরতাদদের মধ্যে যে কেউ তওবা করবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পর সুযোগ পেলেই অনেকে আল-মুখতারার থেকে পালিয়ে মুওয়াফফাকের কাছে আসতে শুরু করে।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

লাগলেন এবং তিনি তাদের আল-মুওয়াফফাকিয়াতে পুনর্বাসন করতে থাকলেন। অবরোধ অব্যাহত থাকল যতক্ষণ না আল-মুখতারায় খাদ্যের অভাব দেখা দিল এবং সাহিবুজ জাঞ্জ-এর বড় বড় সর্দাররা তাদের সাথীদের নিয়ে মুওয়াফফাকের কাছে উপস্থিত হতে লাগল। তিনি তাদের সকলকে সঠিক আকিদার শিক্ষার সাথে ইসলামে দীক্ষিত করতে থাকলেন এবং নিরাপত্তা দিতে থাকলেন।

দুই বছর পর রবিউস সানি ২৬৯ হিজরিতে শহরের প্রাচীরের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ল। যখন মুওয়াফফাক বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যে প্রাচীরে ফাটল তৈরি করা হোক কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করা হয়। অনেক সৈন্য প্রাচীরে ফাটল তৈরির পর তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকে পড়ল যেখানে হাবশিরা তাদের ঘিরে ফেলে খতম করে দিল।

মুওয়াফফাক কয়েকদিন পর পুনরায় সৈন্যদের উৎসাহিত করে প্রাচীর ভাঙা শুরু করলেন। প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় বিজয় নিকটবর্তী মনে হচ্ছিল, এমন সময় প্রতিপক্ষের একজন রোমান তীরন্দাজ মুওয়াফফাককে লক্ষ্য করে এমন এক তীর ছুড়ল যা তার বুকে বিঁধে গেল। মুওয়াফফাক গুরুতর আহত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন কিন্তু আমিরদের প্রবল অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বাগদাদে ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন না এবং বাহিনীর সাহস বাড়াতে থাকলেন।

মুওয়াফফাকের এই বিজয়গুলোর সময় জনগণের মধ্যে তার অবস্থান একজন জাতীয় নেতার মতো হয়ে গিয়েছিল এবং খলিফা মুতামিদ সম্পূর্ণ নেপথ্যে চলে গিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি তুর্কিদের চাপে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মিশরের শাসক আহমদ বিন তুলুন তাকে মিশরে এসে কায়রোকে রাজধানী বানানোর প্রস্তাব দেন। মুতামিদের এই পরামর্শ পছন্দ হলো এবং তিনি সামাররা থেকে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন কিন্তু মুওয়াফফাক সময়মতো এই খবর পেয়ে গেলেন এবং তিনি মোসেলের আমিরদের বলে খলিফাকে পথেই আটকে দিলেন। এই আমিররা খলিফাকে বোঝালেন যে এই মুহূর্তে মুরতাদ জাঞ্জিদের সাথে লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, এমন সময় আপনার রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়ায় সরকারের মানহানি হবে এবং বাহিনী মনোবল হারিয়ে ফেলবে। মুওয়াফফাক এই অনুগত আমিরদের মাধ্যমে খলিফাকে জোরপূর্বক সামাররায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এরপর মুতামিদের সামান্য কিছু ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি মুওয়াফফাকের হাতে চলে এল।

শাবান ২৬৯ হিজরিতে মুওয়াফফাকের ক্ষত শুকিয়ে গেল এবং তিনি পুনরায় আক্রমণ শুরু করালেন। ততক্ষণে প্রতিপক্ষ প্রাচীর মেরামত করে তা নতুন করে মজবুত করে ফেলেছিল। তবে মুওয়াফফাক কয়েক সপ্তাহের নিরবচ্ছিন্ন পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তা ভেঙে তবেই দম নিলেন। আল-মুখতারা অনেক বড় শহর ছিল, পশ্চিম ও পূর্ব অংশ আলাদা আলাদা ছিল, মাঝখানে খাল ও সেতু ছিল। মুওয়াফফাক বেশ কিছু ধৈর্যপরীক্ষামূলক যুদ্ধের পর প্রথমে পশ্চিম অংশ জয় করলেন এবং তারপর পূর্ব অংশ। অবশেষে সাহিবুজ জাঞ্জ তার পরিবার-পরিজনকে রাজধানীতে রেখে পালিয়ে গেল। সরকারি বাহিনী এখানে অসংখ্য শত্রুকে হত্যা ও গ্রেপ্তার করল এবং অগণিত বন্দী নর-নারীকে মুক্ত করল।

মুওয়াফফাক এই গৌরবময় বিজয় সত্ত্বেও সাহিবুজ জাঞ্জকে ব্যক্তিগতভাবে ধাওয়া করা অব্যাহত রাখলেন। সে পরাজিত হয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পালিয়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে ২৭০ হিজরিতে এক যুদ্ধের সময় সে নিহত হলো। তার মাথা মুওয়াফফাকের সামনে আনা হলে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। ১২ই জমাদিউল আউয়াল মুওয়াফফাকের পুত্র আহমদ আবুল আব্বাস (মুতাদিদ বিল্লাহ) এই বিচ্ছিন্ন মাথা নিয়ে বাগদাদে পৌঁছালেন যেখানে জনগণের সমুদ্র বিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিল।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/ ৫৪০, ৫৪৯, ৫৬৬, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৮৫, ৫৮৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১/ ৩৮৭।

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

আব্বাসীয় খিলাফত ও তুলুনিদ রাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধ:

মুয়াফফাকের উত্তরোত্তর সাফল্যকে মিসরের শাসক আহমদ বিন তুলুন উদ্বেগের সাথে দেখছিলেন এবং তিনি মুয়াফফাকের আধিপত্য ও উত্তরাধিকার স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই মুয়াফফাক জাঞ্জিদের (বিদ্রোহ) দমন থেকে অবসর পেয়ে ২৭১ হিজরিতে তাঁর পুত্র আবুল আব্বাস মুতাদিদকে মিসরে প্রেরণ করেন। ততদিনে আহমদ বিন তুলুন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর পুত্র ও উত্তরসূরি খুমারওয়াইহ মিসর রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনের সীমান্তে এসে আব্বাসীয় বাহিনীর মুখোমুখি হন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ “ওয়াকআতুল তাওয়াহিন” নামে পরিচিত, যাতে উভয় পক্ষের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আব্বাসীয় বাহিনী বিজয়ী হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে মিসরীয়রা আব্বাসীয়দের পরাজিত করে নিজেদের এলাকা রক্ষা করে। এভাবে মিসরে তুলুনিদ রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়। [১]

রোমানদের আক্রমণ:

মুতাদিদের খিলাফতের শুরুর দিনগুলোতে বাইজেন্টাইন রোমে একটি বিপ্লব ঘটেছিল। কায়সার মিখাইল বিন তুফিল ২৩ বছরের শাসনকালের পর এক বিদ্রোহী অভিযানে নিহত হন এবং বিদ্রোহী নেতা বাসিল সাকলামি রোমের সিংহাসন দখল করেন। শীঘ্রই তিনি ইসলামী খিলাফতকে দুর্বল পেয়ে সীমান্তে আক্রমণ শুরু করেন। [২]

প্রতি দুই-তিন বছর অন্তর রোমানদের সামরিক অভিযান চলত। কখনো তারা এক-দুটি দুর্গ দখল করত, আবার কখনো লুটতরাজ করে পালিয়ে যেত। ২৭০ হিজরিতে তারা হিসনুল লুলুয়াহ দখল করে নেয়। ২৬৬ হিজরিতে তারা দিয়ার রাবিআহ আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের গণহত্যা করে তাদের লাশ পদদলিত করে এবং আড়াইশ ব্যক্তিকে বন্দী করে। নসিবিন ও মসুলের মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হলে রোমানরা পালিয়ে যায়। [৩]

২৬৮ হিজরিতে কায়সার সাকলামি নিজেই মালাতিয়া অবরোধ করেন। তবে মারআশের মুসলমানরা অবরুদ্ধদের সাহায্যে সময়মতো পৌঁছে যান এবং কায়সারকে পালিয়ে যেতে হয়। একই বছর মিসরের তুলুনিদ রাষ্ট্র বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করে, যারা সত্তর হাজার রোমানকে তরবারির নিচে ফেলে (হত্যা করে) ফিরে আসে। [৪]

২৭০ হিজরিতে এক লক্ষ রোমান পঙ্গপালের মতো সিরিয়ার উত্তরের শহর তারসুসের সামনে তাবু ফেলে। মুসলমানরা রাতের অন্ধকারে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং সকাল পর্যন্ত তলোয়ার চলতে থাকে। অবশেষে রোমানরা সত্তর হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করে, শুধুমাত্র সওয়ারির পশুই ছিল পনেরো হাজারের বেশি। [৫]

মোদ্দা কথা, এই চরম অবনতির যুগেও বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধের শক্তি জীবিত ছিল।

[১] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৩৯১/১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৩৭/১৪

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৪৬/১৪, ৫৬৯

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৮০/১৪

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৮৬/১৪, ৫৮৭

সাফফারি রাজবংশের উত্থান:

মুতামিদের শাসনামলে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়াও একে একে আব্বাসীয় খিলাফতের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। খোরাসানে সাফফারি রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করে, অন্যদিকে মধ্য এশিয়ায় সামানি রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সাফফারি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন লাইস সাফফারি ২৫৪ হিজরিতে কাবুলের বর্তমান আফগানিস্তান অঞ্চল জয় করে নিজের দখলে নেন এবং পরের বছর নিশাপুর জয় করে তাহিরি রাজবংশের অবসান ঘটান, যা মামুনুর রশিদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে সাফফারি রাজবংশ প্রায় পুরো খোরাসান জুড়ে বিস্তৃত হয়। এই শাসন ২৯৮ হিজরি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল; এর মধ্যে কয়েক বছর পর্যন্ত মিস্বরে খলিফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। পরে বাগদাদ খিলাফতের সাথে তাদের বিরোধ তৈরি হয়। ইয়াকুব বিন লাইসের পর তার ভাই আমর বিন লাইস এবং তারপর এই পরিবারের অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শাসন পরিচালনা করেন। অবশেষে আব্বাসীয় খলিফারা ইসমাইল সামানির মাধ্যমে এই শাসনের অবসান ঘটান। [১]

সামানি রাজবংশ:

এই যুগেই ২৬১ হিজরিতে মধ্য এশিয়ায় আমির নাসর বিন আহমদ সামানি তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে আব্বাসীয় খিলাফতের খুতবা বহাল ছিল। এর কেন্দ্র ছিল সমরকন্দ। নাসর বিন আহমদের পর তার ভাই ইসমাইল শাসক হন, যিনি বুখারাকে রাজধানী করে রাষ্ট্রকে মধ্য এশিয়া ছাড়াও খোরাসান, পারস্য এবং তাবারস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই শাসন প্রায় সোয়া শতাব্দীকাল স্থায়ী ছিল। এটি খোরাসানের সাফফারি রাজবংশ এবং উত্তর ইরানের জাইদি রাজবংশকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অবশেষে ৩৮৯ হিজরিতে তুর্কি সর্দার ইলিক খানের হাতে এর পতন ঘটে। [২]

উত্তরাধিকারী পরিবর্তন - একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত:

ইতিহাসের বহু ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই শাসকরা জাতীয় স্বার্থের ওপর পারিবারিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখনই দেশ ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছে। এর বিপরীতে, যদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তবে তার ফলাফল ইতিবাচক হয়েছে। মুতামিদ দীর্ঘ সময় পর পারিবারিক স্বার্থ উপেক্ষা করে জাতীয় স্বার্থে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার ভাই আবু আহমদ আল-মুওয়াফফাক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মুতামিদের অল্পবয়সী ছেলে জাফর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্ধারিত ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি দেখে ২৭৯ হিজরির মহররম মাসের শেষ দিকে তিনি নিজের ছেলের পরিবর্তে ভতিজা আবুল আব্বাস আহমদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, যিনি শাসনের যোগ্য ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের কয়েক মাস পর ২৭৯ হিজরির রজব মাসে মুতামিদ ইন্তেকাল করেন। [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/৯৯, ১০০; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি লিল ইবরি, পৃ. ২২২

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ২/৭৩ দারুল ইলম সংস্করণ; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি লিল ইবরি, পৃ. ২২৩ মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ সংস্করণ

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৭৯ হিজরি

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

বাগদাদ খিলাফতের পতন

প্রাথমিক যুগ

দ্বিতীয় পর্যায়

সাময়িক উপশম

মুতাদিদ-এর খিলাফত থেকে মুকতাবি-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত

(২৭৯ হিজরি হতে ২৯৫ হিজরি)

প্রায় সতেরো বছর

আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ

আহমদ বিন তালহা আল-মুওয়াফফাক বিন আল-মুতাওয়াঙ্কিল

মহররম ২৭৯ হিজরি থেকে রবিউল আখের ২৮৯ হিজরি

মার্চ ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ

নতুন খলিফা, মুওয়াফফাকের পুত্র এবং মুতাওয়াঙ্কিলের পৌত্র আবুল আব্বাস আহমদ, যিনি আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ উপাধিতে ১৯ রজব ২৭৯ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গুণাবলীতে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো ছিলেন। সাহসী, আত্মমর্যাদাশীল, সজাগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভাবশালী। তিনি তাঁর যৌবনকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জনগণকে নিজের অনুরাগী করে তুলেছিলেন।

তিনি যখন খলিফা হন, তখন রাজধানী সামাররা ছিল একটি খাঁচার মতো যেখানে খলিফারা তুর্কিদের ঘেরাওয়ের মধ্যে থাকতেন। মু'তাদিদ পূর্ববর্তী সাতজন খলিফার অনুকরণে সামাররাকে কেন্দ্র হিসেবে রাখার ভুল করেননি, বরং তিনি রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন এবং এর কেন্দ্রীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। এই সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি তুর্কিদের চাপ কমিয়ে খিলাফতের মসনদকে শক্তিশালী করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি না থাকলে আব্বাসীয় খিলাফত সেই যুগেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তিনি খিলাফতের মর্যাদা অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করেন। ঐতিহাসিকরা তাঁকে ‘সাফফাহ সানি’ (দ্বিতীয় সাফফাহ) উপাধিতে স্মরণ করেন; কারণ তিনি আব্বাসীয় খিলাফতকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনি সেই সব স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোর সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাদের সাথে অতীতে সম্পর্ক তিক্ত ছিল। তিনি মিশরের শাসক খুমারাওয়াইহ ইবনে তুলুনের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন। খোরাসানের শাসক আমর ইবনে লাইস আস-সাফফারির সাথেও সন্ধি করে তাঁকে নিজের সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিনি ধর্মদ্রোহী ও বিদআতিদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তাদের কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছর ২৮০ হিজরিতে তিনি দর্শনের (ফিলোসফি) বইপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বাগদাদে জ্যোতিষীদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। দরবার থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত সর্বত্র তারা মানুষের দ্বীন ও ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল। মু'তাদিদ তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

তাঁর যুগে দীর্ঘকাল পর জিহাদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ২৮১ হিজরিতে এশিয়া মাইনর অভিযানের সময় রোমানদের একটি দুর্গ ‘মালুরিয়া’ বিজিত হয়। মক্কায় জাহেলিয়াত যুগের একটি শক্তিশালী পরামর্শ কেন্দ্র ‘দারুন নদওয়া’ তখনও বিদ্যমান ছিল; মু'তাদিদ সেটিকে ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। অগ্নিপূজকদের উৎসব ‘ঈদে নওরোজ’ মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল, যে দিন আগুন জ্বালানো হতো এবং মানুষের ওপর পানি ছিটানো হতো। মু'তাদিদ ২৮৪ হিজরিতে এটি নিষিদ্ধ করেন। [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯, ত. নিযার; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার, ১/৪০০ থেকে ৪০৫।

মুতাদিদ-এর একটি গুরুতর পদক্ষেপ এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন:

তবে এই যুগে শিয়া মতবাদ ও রাফেযী মতবাদ এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল যে, মুতাদিদ-এর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও একবার এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে ২৮৪ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের জুমাবার বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জামে মসজিদগুলোতে এই ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আলোচনা যেন রহমত ও কল্যাণের দোয়ার সাথে না করা হয়।

কয়েকদিন পর মুতাদিদ এই ইচ্ছাও পোষণ করেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর লানত করার আদেশ জারি করা হোক (নাউযুবিল্লাহ)। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ঘোষণাপত্র (মাহযারনামা) তৈরি করা হয়েছিল যাতে তা বাগদাদের জামে মসজিদের জুমার সমাবেশে পাঠ করে শোনানো হয়।

এই উস্কানিমূলক পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। উজির উবায়দুল্লাহ বিন সুলাইমান অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে খলিফা এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেন, কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি। অবশেষে উজির কাজী আবু উমর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ)-কে খলিফার কাছে পাঠান। তিনি অত্যন্ত হিকমতের সাথে তাকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই জঘন্য আদেশ প্রত্যাহার করতে রাজি করান। [১]

কারামিতা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব:

মুতাদিদ-এর যুগে শুরু হওয়া সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ ছিল ‘কারামিতা আন্দোলন’, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল আবু সাঈদ কারামিতি। ২৮৬ হিজরীতে এর আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী বছরগুলোতে এই আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল যার নজির অতীতে পাওয়া যায় না। অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায়, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ এর রক্তপিপাসার বলি হয়েছিল এবং হারামাঈন শরীফাইনের পবিত্রতাও রক্ষা পায়নি।

মুতাদিদ অসুস্থ হয়ে ২২শে রবিউস সানি ২৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার শাসনামল অন্তত বাগদাদের সীমা পর্যন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ছিল। তিনি অনেক কর মওকুফ করে জনগণকে সচ্ছল করে দিয়েছিলেন। তার যুগে মানুষ অত্যন্ত আরাম ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। [২]

[১] তারিখুত তাবারী: খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে ৬৩।

এও বলা হয় যে, এই ঘোষণাপত্রটি মামুনুর রশীদের যুগে তৈরি করা হয়েছিল এবং সরকারি নথিপত্রে সংরক্ষিত ছিল। মুতাদিদ এটিই প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাগদাদের কাজী আবু উমর (রহিমাহুল্লাহ)-এর বুঝানোর ফলে এই ইচ্ছা থেকে ফিরে আসেন। এই ঘোষণাপত্রটি ইমাম তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) পূর্ণাঙ্গভাবে উদ্ধৃত করেছেন। (তারিখুত তাবারী: খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫৫ থেকে ৬৩)

যেহেতু ইমাম তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) মুতাদিদ-এর যুগে বাগদাদেই ছিলেন, তাই কোনো সূত্রের মাধ্যমে এর একটি অনুলিপি তার কাছে পৌঁছেছিল। এই ঘোষণাপত্রটি মিথ্যা বর্ণনায় ভরপুর এবং এটি রাফেযীরা সংকলন করেছিল। ইমাম তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক এটি উদ্ধৃত করার পেছনে এই হিকমত ছিল যে, এর মাধ্যমে যেন ধারণা পাওয়া যায় যে, সেই যুগে রাফেযী মতবাদ কতটা জুলুমপূর্ণ ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। এটি উদ্ধৃত করার কারণে ইমাম তাবারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আনা যায় না। এটি ঠিক তেমনই যেমন কোনো আলেম কাদিয়ানীদের কোনো আজোবাজে নিবন্ধ বা বই প্রকাশ করে দেন যাতে দুনিয়াবাসী তাদের ভয়াবহ মানসিকতা সম্পর্কে জানতে পারে।

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহিমাহুল্লাহ)-ও এই ঘোষণাপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তার পক্ষ থেকে এই ভুল হয়েছে যে, তিনি লিখে দিয়েছেন যে এই ঘোষণাপত্রটি জামে মসজিদগুলোতে পাঠ করে শোনানো হয়েছিল, অথচ জামে মসজিদগুলোতে শুধুমাত্র হযরত মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশংসামূলক আলোচনার ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ঘোষণাপত্রটি এর পরের কোনো জুমায় পাঠ করার কথা ছিল, কিন্তু কাজী আবু উমর (রহিমাহুল্লাহ) এই ফিতনা মাথাচাড়া দেওয়ার আগেই তা দমন করে দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৬৭১, ৬৭২)

নোট: কাজীর নাম মূল উৎস (তারিখুত তাবারী)-তে ইউসুফ বিন ইয়াকুব বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী-তে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে এটি লিখনশৈলীর ভুল। তিনি হলেন কাজী মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব আবু উমর (মৃত্যু ৩২০ হি.)। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ১৭/২১, ত. কদমি)

লেখকের মতে এটিই অগ্রগণ্য। সেই যুগে বাগদাদের কোনো কাজীর নাম ইউসুফ বিন ইয়াকুব হিসেবে বর্ণিত পাওয়া যায় না।

[২] তারিখুল খুলাফা: পৃষ্ঠা ২৭০, ২৭১।

আল-মুকতাবি বিল্লাহ

আলী বিন আহমদ আল-মুতাদিদ

রবিউল আখের ২৮৯ হিজরি থেকে জিলকদ ২৯৫ হিজরি

এপ্রিল ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ

মুতাদিদের পর তার পুত্র আলী, মুকতাবি বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে খলিফা হন। তিনিও একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। জনগণ তাকে পছন্দ করত। তিনি চেষ্টা করতেন যেন সরকারি অর্থ কেবল জনগণের প্রয়োজনেই ব্যয় হয়। একবার তিনি সাতশ দিনার একটি সরকারি নির্মাণ কাজে ব্যয় করেছিলেন যা খুব একটা জরুরি ছিল না। যখনই এই কথা তার মনে পড়ত, তিনি ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন:

“মুসলমানদের সম্পদ এমন এক নির্মাণ কাজে ব্যয় করে ফেলেছি যার আমার প্রয়োজন ছিল না।” [১]

তুলুনি রাজবংশের পতন, মিসর পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত:

মিসরের তুলুনি রাজবংশ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুযোগ বুঝে ২৯২ হিজরিতে খলিফা মুকতাবি তার সেনাপতি মুহাম্মদ বিন সুলাইমানকে দশ হাজার সৈন্যসহ মিসর বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তুলুনি রাজবংশের প্রধান হারুন বিন খুমারওয়াইহ মোকাবিলার জন্য ময়দানে নামেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু সংঘর্ষও হয়, কিন্তু হারুন স্বভাবগতভাবে শান্তিকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার আমিরদের খলিফার আনুগত্যে রাজি করাতে চাইলেন, কিন্তু কিছু আমির বিমুখ হলেন এবং তাদের জেদের কারণে স্বয়ং মিসরীয় সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি হলো। এই আমিররাই একজন তীরন্দাজকে নিযুক্ত করে ঠিক সেই মুহুর্তে হারুনকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানাল যখন তিনি সেনাবাহিনীকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন।

হারুনের মৃত্যুর পর মিসরে তার চাচা শায়বান ক্ষমতা গ্রহণ করেন, কিন্তু তার মধ্যে আব্বাসীয়দের মোকাবিলা করার শক্তি ছিল না। অবশেষে কিছুদিন পর তিনি নিজেকে আব্বাসীয় বাহিনীর কাছে সাঁপে দেন এবং মুহাম্মদ বিন সুলাইমান মিসর দখল করে তুলুনি রাজবংশের অবসান ঘটান। এভাবে এই অঞ্চলটি পুনরায় সরাসরি বাগদাদ খিলাফতের শাসনাধীনে চলে আসে। খলিফা মুকতাবি আল-তুলুনের সমস্ত সদস্যকে বাগদাদে ডেকে এনে নজরবন্দি করে রাখেন যাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা না থাকে।

[২]

মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার বন্য জাতিগুলোর আক্রমণ:

২৯৩ হিজরিতে মধ্য এশিয়ার উত্তরে বসবাসকারী রাশিয়ার আধা-বন্য জাতিগুলোর একটি ঢল মাওয়ারাননাহরের ওপর আছড়ে পড়ে, কিন্তু আমির ইসমাইল সামানি এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাদের বিতাড়িত করেন। [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৩-২৭৪

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ২৯২ হিজরি

[৩] মিরআতুয যামান লিসিবত ইবনুল জাওযি: ১৬/৩০৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ২৯৩ হিজরি

রোমানদের সাথে যুদ্ধ:

এই যুগে রোমানদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ২৯১ হিজরিতে এক লক্ষ রোমান সীমান্তে আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। ২৯৩ হিজরিতে তারা সন্ধি করে নেয়। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই তারা অতর্কিতে ‘ফুরস’-এ নৈশ অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ ও বন্দি করে পালিয়ে যায়। পরের বছর মুসলমানরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তারসুস থেকে রোমান সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে বিপুল সংখ্যক রোমানকে বন্দি করে। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একজন পাদ্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। [১]

আল-মুত্তাফির মৃত্যু:

আল-মুত্তাফি সাড়ে ছয় বছর সফলতার সাথে শাসন করেন। অবশেষে ২৯৫ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাস রোগাক্রান্ত থাকার পর ১২ ফিলকদ ২৯৫ হিজরিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৯১ হি., ২৯৩ হি., ২৯৪ হি.

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৯৫ হি.

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

বাগদাদ খিলাফতের পতন

প্রাথমিক যুগ

তৃতীয় পর্যায়

বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা

মুকতাদিরের খিলাফত থেকে বনু বুওয়াইহ-এর বাগদাদ দখলের সময় পর্যন্ত

(২৯৫ হিজরি থেকে ৩৩৪ হিজরি)

প্রায় ৩৮ বছর

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (অংশ ৬)

আল-মুকতাদির বিল্লাহ

জাফর বিন আহমদ আল-মুতাদিদ

জিলকদ ২৯৫ হিজরি থেকে শাওয়াল ৩২০ হিজরি

আগস্ট ৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নভেম্বর ৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

মুকতাবির মৃত্যুর পর আবারও এমন এক রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটল যে, বনু আব্বাসের যে শাসনব্যবস্থা মুতাদিদের শাসনামল থেকে পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, তা আবারও দ্রুত পতনের গহ্বরে নিমজ্জিত হতে লাগল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই আগের চেয়েও বেশি দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল।

মুকতাবির জীবদ্দশায় তার ভাই জাফর বিন মুতাদিদ উত্তরাধিকারী মনোনীত ছিলেন। যদিও জানা ছিল যে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মুকতাবি মারা যাবেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন এমনই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে সালতানাতের আমীরগণ কোনো যোগ্য ব্যক্তির ওপর একমত হওয়ার পরিবর্তে এই অপ্রাপ্তবয়স্ক জাফরকে খলিফা মনোনীত করেন, যিনি ২৮২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। তিনি আল-মুকতাদির বিল্লাহ উপাধি নিয়ে খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকাল পর কিছু আমীর বিদ্রোহ করে সাবেক খলিফা মুতাজ-এর পুত্র আবদুল্লাহকে খলিফা করার চেষ্টা করেন, যার ফলে বাগদাদে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। [১]

উবাইদিদের তিউনিসিয়া, মিশর ও মরক্কো দখল:

মুকতাদিরের অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে দরবারের আমীরগণ সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং শাসনব্যবস্থা আবারও টালমাটাল হয়ে পড়ে। এই সময়ে আফ্রিকায় (ইফ্রিকিয়া) এক বিপ্লব ঘটে যেখানে মাহদী হওয়ার মিথ্যা দাবিদার উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন তিউনিসিয়ায় নিজের শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করে বনু আগলাব রাজবংশের অবসান ঘটান। এভাবে তিউনিসিয়া চিরতরে আব্বাসীয় খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৩০১ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন মিশর আক্রমণ করেন। তিনি প্রায় কায়রো দখল করে ফেলেছিলেন কিন্তু নীল নদের প্লাবনের কারণে তাকে ফিরে যেতে হয়। ৩০৬ এবং ৩০৮ হিজরিতে তিনি মিশরে আরও আক্রমণ করেন এবং নীল নদের পশ্চিম তীরের পুরো এলাকা নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। [২]

৩০৫ হিজরিতে তিনি মরক্কো থেকে ইদ্রিসি রাজবংশের অবসান ঘটান যা ১৭২ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এক সঠিক বংশীয় আলভী ইদ্রিস বিন আবদুল্লাহ (মৃত্যু ১৭৭ হিজরি — নফস-এ-জাকিয়ার ভাই)। তাদের বংশধরদের মধ্যে এই শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তার পুত্র ইদ্রিস বিন ইদ্রিস (মৃত্যু ২১৩ হিজরি) তার উত্তরাধিকারী হন। এরপর তার পুত্র মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস (মৃত্যু ২২১ হিজরি), তারপর তার পুত্র আলী বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ২৩৩ হিজরি) এবং ইয়াহিয়া বিন মুহাম্মদ একে একে শাসক হন।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৪-২৭৫, তাবারী; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৪৩১/১

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৪৪০/১

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এই সাদাতদের (সৈয়দদের) আকিদা ও আমল তাই ছিল যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। সহীহুন নাসাব সাদাতদের এই হুকুমত শেষ পর্যন্ত মাহদীয়াতের মিথ্যা দাবিদার উবায়দুল্লাহ বিন মায়মুনের রাফেযী উত্তরসূরিদের হাতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মনসুর হাল্লাজের হত্যা:

৩০১ হিজরিতে বিখ্যাত সুফী হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজকে গ্রেফতার করে বাগদাদে আনা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, সে একজন কারামাতি। আট বছর বন্দী রাখার পর ৩০৯ হিজরিতে কাজী আবু উমরের ফতোয়া অনুযায়ী হাল্লাজকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [১]

মনসুর হাল্লাজকে ইতিহাসের অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। এক দল তাকে দরবেশ, খোদাভক্ত, আশেকে সাদিক এবং ফানা ফিল্লাহ মনে করে, আবার অন্য দল তাকে মুরতাদ ও যিন্দিক বলে। আজ পর্যন্ত এই বিতর্ক চলছে। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন। [২]

রোমানদের সাথে সন্ধি ও যুদ্ধ:

৩০৫ হিজরিতে কায়সারে রুম (রোমান সম্রাট) পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের জন্য তার দূতদের খিলাফতের দরবারে পাঠান। মুকতাদির পুরো শহরকে কনের মতো সাজিয়ে এক লক্ষ ষাট হাজার সৈন্যের উপস্থিতিতে তাদের অভ্যর্থনা জানান এবং সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করেন। কিন্তু এই সন্ধিনামা একটি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রোমানরা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে সন্ধি করেছিল। ৯ বছর পর যখনই তাদের সরকার শক্তিশালী হলো, তারা মুসলিম বিশ্বের ওপর জোরালো আক্রমণ শুরু করে দিল। ৩২১ হিজরিতে মালটিয়া এবং ৩২৬ হিজরিতে খালাত দখল করে নিল। এখানকার মসজিদগুলোর মিনার ভেঙে ফেলে সেগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করল। [৩]

দাইলামি শিয়া ও কারামাতিদের আক্রমণ:

এই সময়ে মুসলিম বিশ্ব এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়। এটি ছিল উত্তর ইরানের পাহাড়ি এলাকা দাইলামের মাজুসীদের পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ। তাদের সর্দার ছিল মারদাভিজ জিয়ারি। তার বক্তব্য ছিল: “আমি আরবদের শাসন মিটিয়ে দেব এবং পারস্যের রাজত্ব কায়ম করব।” এই হতভাগারা যেখানেই দখল করত, সেখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরাত এবং শিশু ও বৃদ্ধদের পর্যন্ত হত্যা করত। অন্যদিকে হিজাজে কারামাতিদের ফিতনা শুরু হয়। ৩১৬ হিজরিতে তারা হাজীদের কাফেলাগুলোকে এমনভাবে লুট করল যে মক্কার পথ বন্ধ হয়ে গেল। মক্কাবাসীদের শহর ছাড়তে হলো এবং বাইরের মুসলমানদের জন্য হজের সফর অসম্ভব হয়ে পড়ল। [৪] [৫]

[১] আল-ইসতিবসা লি-আখবার দুয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১/২০৩, ৬২৮।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবর: ১/৪৪১।

দ্রষ্টব্য: এই কাজী আবু উমর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (২৩৩-৩২০ হিজরি) ছিলেন। তিনি ২৮৩ হিজরিতে কাজী নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং পরহেজগার ছিলেন; বাগদাদে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। ফিকহ ও হাদিসের ইমাম ছিলেন। ইমাম দারা কুতনী তার উস্তাদ ছিলেন। হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন: “লাম ইউনজার লাহ ফি ফিল হুকাম আকিলান ওয়া হালিমান ওয়া জাকীয়ান।” (তারিখুল ইসলাম: ২৩/৬১৫)।

[৩] অনেক সুফী ও সমসাময়িক যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারদের কিতাবে মনসুর হাল্লাজের কালামের (কথার) ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। হাকিমুল উন্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ও হাল্লাজের কালামের ব্যাখ্যা করেছেন এবং হযরত থানভী রহ.-এর নির্দেশে মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী মরহুম “সীরাতে মনসুর হাল্লাজ” নামে একটি বিস্তারিত কিতাব লিখেছেন যা পাঠযোগ্য। এতে হাল্লাজকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এটিও সত্য যে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ যেমন হাফেজ ইবনে জাওযী, হাফেজ ইবনে কাসীর প্রমুখ মনসুর হাল্লাজকে গোমরাহ ও মুলহিদ বলেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং তারিখুল ইসলামে ৩০৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের অধীনে দেখা যেতে পারে। ওয়ালাহু আলামু বিল হাকিকাতিল হাল।

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৭।

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৭।

কারামাতিরা হাজরে আসওয়াদ উপড়ে নিয়ে গেল:

এরপর মুসলিম বিশ্বের সামনে এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল যে মুসলমানরা পূর্বের সকল বিপদ-আপদ ভুলে গেল। এই জালিমরা ৩১৭ হিজরিতে হাজার দিনগুলোতে মক্কায় হামলা চালায় এবং হাজীদের নির্বিচারে হত্যা করার পর হাজরে আসওয়াদ উপড়ে ফেলে তাদের কেন্দ্র ‘আহসা’ (বাহরাইন)-এ নিয়ে যায়। ২২ বছর পর্যন্ত এটি তাদের কাছেই ছিল এবং মুসলমানরা হাজরে আসওয়াদ ছাড়াই হজ পালন করতে থাকে। অবশেষে ৩৩৯ হিজরিতে হাজরে আসওয়াদ মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা পুনরায় স্থাপন করা হয়। [১]

ধর্মীয় বিতর্ক:

একদিকে মুসলিম বিশ্বের এই অবস্থা ছিল, অন্যদিকে বাগদাদের মুসলমানরা ধর্মীয় বিতর্কে একে অপরের মাথা ফাটাচ্ছিল। ৩১৭ হিজরিতে বাগদাদে আলেমদের মধ্যে এই আয়াতটি নিয়ে বিতর্ক চলছিল:

[২] عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

একটি দল বলছিল যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ-কে শাফায়াতের (সুপারিশের) মর্যাদা দান করা হবে। দ্বিতীয় দলের অবস্থান ছিল যে, এর অর্থ হলো আল্লাহ রাসূলুল্লাহ-কে নিজের আরশে বসাবেন। কথা বাড়তে বাড়তে উভয় পক্ষ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনকি বিতর্কের ময়দানে কয়েক ডজন লাশ পড়ে গেল। [৩]

নারীদের শাসন এবং ব্যর্থ বিদ্রোহ:

মুকতাদির ৩২০ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে কেবল নামেমাত্র শাসক ছিলেন। প্রতিটি স্থানে আমিররা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর খিলাফতের শেষ পনেরো বছর অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর অযোগ্যতার কারণে রাষ্ট্রের সকল বিষয় তাঁর মা নিজের হাতে তুলে নেন এবং ৩০৬ হিজরিতে নিয়মিত দরবার বসিয়ে আদেশ জারি করতে শুরু করেন। নারীদের এই হস্তক্ষেপের ফলে খিলাফতের মর্যাদা আরও ক্ষুণ্ণ হয়। বিশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দুর্ভিক্ষের মতো সমস্যা জনগণের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

দেশের এই দুরবস্থা, মুকতাদিরের অযোগ্যতা এবং খিলাফতের প্রাসাদে নারীদের শাসন দেখে বনু আব্বাসের কিছু আমির ৩১৭ হিজরির মহরম মাসের রাতে বিদ্রোহ করে বসেন। তারা খিলাফতের প্রাসাদে ঢুকে সবকিছু লুট করে নেয় এবং খলিফা মুকতাদিরের ভাই কাহির বিল্লাহ-কে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু মাত্র একদিন পর নতুন খলিফার ওপর তাদের আস্থা শেষ হয়ে যায় এবং তারা পুনরায় মুকতাদিরকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়।

এই সুযোগে কাহির বিল্লাহ কান্নাকাটি করে তাঁর ভাইয়ের কাছে প্রাণভিক্ষা চান। মুকতাদির দয়ালু ছিলেন, তিনি বললেন: “যা হওয়ার হয়েছে, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। আমি তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না।” আর তিনি তেমনই করলেন। [৪]

দ্বিতীয় বিদ্রোহ এবং মুকতাদিরের হত্যাকাণ্ড:

৩১৯ হিজরিতে ইরাকে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছায়। একদিকে কারামাতিরা কুফা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং বাগদাদবাসীরা নিজেদের ঘর...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩৩৯ হিজরি।

[২] অনুবাদ: আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত করবেন। (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭৯)।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৮।

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৭।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

বিপদের মুখে দেখা দিতে লাগল। অন্যদিকে দাইলামের শিয়ারা দিনাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং সেখানে হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম করে তুলল। কিন্তু খলিফা মুকতাদির নিশ্চিন্তে ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মানুষ চরম অস্থির ছিল। অবশেষে ২৭ শাওয়াল ৩২০ হিজরিতে মুনিস খাদেম নামক এক দরবারী বারবারদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ করে বসল। খলিফাকে হত্যা করে লাশ থেকে পোশাক পর্যন্ত খুলে নেওয়া হলো। কিছু লোক দয়া প্রবশ হয়ে তাকে ঢেকে দিল এবং সেখানেই দাফন করে দিল। মুকতাদিরের বয়স ছিল ৩৮ বছর। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫৯/১৫, আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৭/২

আল-কাহির বিল্লাহ

মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মুতাদিদ

শাওয়াল ৩২০ হিজরি থেকে জমাদিউল আখিরা ৩২২ হিজরি

নভেম্বর ৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুন ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ

মুকতাদিরের পরিবর্তে তার ৩২ বছর বয়সী ভাই মুহাম্মদ বিন মুতাদিদকে খলিফা বানানো হলো, যিনি কাহির বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তার উপাধির মতোই প্রকৃতপক্ষে কঠোরপন্থী ছিলেন। তিনি ক্ষমতা লাভ করে সবার আগে পূর্ববর্তী খলিফা মুকতাদির (যিনি তার বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন)-এর পুরো পরিবারকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানান। মুকতাদিরের মা, যিনি খিলাফতের বিষয়গুলোতে প্রভাবশালী ছিলেন, তাকে বন্দি করে এত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যে তিনি প্রাণ হারান।

কাহিরের কঠোরতা এমন ছিল যে, তিনি সেই সব লোকদেরও হত্যা করিয়েছিলেন যাদের কারণে তিনি ক্ষমতা পেয়েছিলেন। মুনিস খাদেম দরবারে সবচেয়ে প্রভাবশালী আমির ছিলেন। মুকতাদিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। কাহিরের বিশ্বাস ছিল যে মুনিস তাকে পুতুল বানিয়ে রাখবে। সুতরাং একদিন কাহির সুযোগ পেয়ে কোনো এক উছলায় তাকে বন্দি করেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই জবাই করিয়ে দেন। এই একই শাস্তি আরও কিছু প্রধান আমিরদেরও দেওয়া হয় এবং তাদের কাটা মাথা শহরে ঘোরানো হয়।

কাহিরের ভাতিজা শাহজাদা মুহাম্মদ বিন মুকতাবি নিশ্চয়ই ভালো আচরণের দাবিদার ছিলেন; কারণ তিনি কাহিরকে সমর্থন করেছিলেন। যখন মুকতাদিরের হত্যার পর বিদ্রোহী আমিরদের সভায় এটি ঠিক করা হচ্ছিল যে এখন কোন শাহজাদাকে খলিফা বানানো হবে, তখন মুহাম্মদ বিন মুকতাবি খিলাফতের প্রার্থীদের তালিকা থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন: “আমার চাচা কাহির বিল্লাহ খিলাফতের জন্য বেশি যোগ্য।”

কিন্তু কাহির বিল্লাহর তবুও সন্দেহ ছিল যে ভবিষ্যতে হয়তো তিনি বিদ্রোহ করতে পারেন, সুতরাং তাকে একটি কুঠুরিতে বন্দি করে তার চারপাশ দেয়াল দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়; এবং সেই অসহায় লোকটি ছটফট করে মারা যান। এই একই পরিণতি হয়েছিল ইসমাইল বিন ইসহাকের, যিনি কাহিরকে খলিফা বানানোর জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কোনো পুরনো মনোমালিন্যের কারণে তাকে একটি অন্ধ কূপে ফেলে দেওয়া হয় এবং কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়।

অবনতির এই যুগে বাগদাদে গান-বাজনা এবং মদ্যপানের প্রচলন সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। কাহির কঠোরভাবে এই সব অপকর্ম বন্ধ করে দেন। গায়ক, হিজড়া এবং কিশোর দাসদের শহর থেকে বের করে দেন। কিন্তু অন্যদিকে কাহির নিজেই প্রায়শই মদ্যপান এবং নাচ-গানের মাধ্যমে মন ভোলাতেন। কথা ও কাজের মধ্যে এত বেশি বৈষম্য থাকলে সমাজ সংস্কার কি করে সম্ভব হতে পারে? [১]

[১] তারিখুল খুলাফা: পৃষ্ঠা ২৭৯, ২৮০

দাইলামিদের আধিপত্য - কাহিরের পরিণতি:

কাহিরের শাসনের শেষ বছর ৩২২ হিজরিতে দাইলামিদের নেতা মারদাভিজ ইসফাহান ও শিরাজসহ সমগ্র পারস্য দখল করে নেয়। এভাবে মধ্য এশিয়া, খোরাসান, সিরিয়া ও মিসর এবং আফ্রিকার পর ইরানও আব্বাসীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আব্বাসীয় শাসন কেবল ইরাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কাহিরের শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর। তার এই ভুল ধারণা ছিল যে, সে লোমহর্ষক জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে একজন অনেক বড় শাসক হয়ে যাবে, কিন্তু তার জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমীরগণ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ৬ জমাদিউল আখিরা ৩২২ হিজরিতে তারা কাহিরকে গ্রেপ্তার করে এবং তার চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেয়। কাহির এগারো বছর পর্যন্ত বন্দী ছিল। [১]

৩৩৩ হিজরিতে সে মুক্তি পেলে বাগদাদের মসজিদগুলোতে ভিক্ষা করতে শুরু করে। এতে খিলাফত দরবারের মানহানি ঘটে, ফলে তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। এই অবস্থায় ৩৩৯ হিজরিতে সে মৃত্যুবরণ করে। [২]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮১, ২৮২

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮২

আর-রাযী বিল্লাহ

মুহাম্মদ বিন জাফর আল-মুত্তাদির

জমাদিউল আখিরা ৩২২ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরি

জুন ৯৩৪ খ্রি. থেকে ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি.

কাহিরের পরিবর্তে সাবেক খলিফা মুত্তাদির বিল্লাহর পুত্র মুহাম্মদকে ‘আর-রাযী বিল্লাহ’ উপাধি দিয়ে খেলাফতের মসনদে বসানো হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি একজন আলেম, ফাজেল এবং সাহিত্যিক ও কবি যুবক ছিলেন। তিনি ছিলেন নেককার, দয়ালু, মেহেরবান এবং মহৎপ্রাণ। তবে তাঁর শাসনকাল আমিরদের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এবং তিনি ‘রেজা বিল-কাজা’ (তকদিরে সম্ভুষ্ট থাকা)-এর ওপর আমলকারী ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন “নামের সার্থকতা বহনকারী” (ইসম বা-মুসাম্মা)।

তাঁর শাসনের প্রথম বছর ৩২২ হিজরিতে বনু উবাইদ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ মাহদী বিন মাইমুন মৃত্যুবরণ করেন, যিনি ছিলেন একজন কটর متعصب (ধর্মান্ব) রাফেযী। তিনিই ইসলামি বিশ্বে প্রথম রাফেযী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা তিন শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল এবং এর থেকে ফিতনা ও ফাসাদের এমন উপাদান ছড়িয়ে পড়ে যার ক্ষয়ক্ষতি শতাব্দীকাল ধরেও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। [১]

বনু বুওয়াইহ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা:

রাযীর শাসনের প্রথম বছর ৩২২ হিজরিতে একটি নতুন রাফেযী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলী বিন বুওয়াইহ। দাইলামিদের সরদার “মারদাভিজ” যে পারস্য দখল করে নিয়েছিল, সে বছরই সে মারা যায়। আলী বিন বুওয়াইহ, যে আগে তারই সেনাপতি ছিল, শক্তির জোরে তার বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল কিন্তু সে নিজের শাসনের স্থিতিশীলতার আগে আব্বাসীয় খেলাফতকে সতর্ক করতে চায়নি। তাই সে আর-রাযী বিল্লাহর কাছে বার্তা পাঠায় যে, তাকে যেন আব্বাসীয় খেলাফতের অনুগত শাসকদের অন্তর্ভুক্ত করে শাসনের ফরমান প্রদান করা হয়। এর বিনিময়ে সে বার্ষিক ৮০ কোটি দিরহাম খেরাজ (কর) প্রদান করবে।

আর-রাযী বিল্লাহ একদিকে যেমন রাজনৈতিক সচেতনতা বর্জিত ছিলেন, অন্যদিকে সাহায্যকারীদের থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। তিনি আলী বিন বুওয়াইহর প্রতারণামূলক প্রস্তাবকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং তাকে “ইমাদুদ দৌলা” উপাধি দিয়ে পারস্যের বৈধ শাসক হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু আলী বিন বুওয়াইহ খেরাজের অর্থ কখনো সময়মতো পরিশোধ করেনি বরং সবসময় টালবাহানা করতে থাকে। আলী বিন বুওয়াইহর প্রতিষ্ঠিত এই “বনু বুওয়াইহ রাষ্ট্র” পরবর্তীতে খলিফাদের জিম্মি করে ফেলে। এই রাফেযী রাষ্ট্রটি মুসলমানদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আলী বিন বুওয়াইহর “ইমাদুদ দৌলা” হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বে “দৌলা”দের (উপাধিধারী) জয়জয়কার শুরু হয়। মুইযযুদৌলা, রুকনুদৌলা, সাইফুদৌলা, নাসিরুদৌলা, তাজুদ দৌলা, শামসুদৌলা... প্রতিটি শহরেই একজন করে “দৌলা” ছিল কিন্তু যাকে দেখা যেত সে-ই ছিল “নাম বড় কিন্তু কাজে ঠনঠন” (উঁচি দোকান ফিকা পাকওয়ান)-এর দৃষ্টান্ত। এই “দৌলা”দের অধিকাংশই ছিল রাফেযী অথবা শিয়া মতবাদের দিকে ঝুঁকে থাকা। [২]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৭৭, ৮১, ৯৫, তাবা দারে হিজর; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৪৯০ থেকে ৪৯৫, তাবা দারে ফিকর

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

ইবনে রাইকের স্বায়ত্তশাসন। আন্দালুসের শাসকের খিলাফতের দাবি:

রাযী বিল্লাহ অত্যন্ত দুর্বল খলিফা ছিলেন; তাই তাঁর শাসনের তৃতীয় বছর ৩২৪ হিজরিতে ওয়াসিতের শাসক মুহাম্মদ বিন রাইক ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত শাসক হয়ে বসেন এবং খিলাফত দরবারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে রাযী বিল্লাহ নামমাত্র খলিফা হিসেবে থেকে যান। এটি দেখে ৩২৫ হিজরিতে আন্দালুসের স্বায়ত্তশাসিত উমাইয়া আমির আবদুর রহমান তৃতীয় সেখানে খিলাফতের দাবি করেন এবং “আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ” উপাধি গ্রহণ করেন। [১]

উত্তাল পরিস্থিতি:

মুসলমানদের দুর্বলতা এমন পর্যায়ে ছিল যে কারামাতিরা হিজাজের রাস্তাগুলো দখল করে রেখেছিল এবং কেউ হজের জন্য যেতে পারছিল না। অবশেষে ৩২৭ হিজরিতে এই দুর্ভাগাদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, তারা যদি অবরোধ তুলে নেয় তবে তাদের প্রতি হাজি পিছু পাঁচ দিনার প্রদান করা হবে। যখন কারামাতিরা রাজি হলো এবং পূর্বদেশীয় দেশগুলোর মানুষ হজে যেতে সক্ষম হলো। সরকারের দুর্বলতা এবং দেউলিয়াত্বের বাকি কসরত ৩২৮ হিজরিতে দজলা নদীর বন্যার ধ্বংসলীলা পূর্ণ করে দিল। বাগদাদ এর সবচেয়ে বেশি শিকার হয়। শহরের অলিগলিতে বারো-বারো ফুট পানি উঠে আসে এবং ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়।

রাযী বিল্লাহর শেষ বছরগুলোতে খিলাফতের কর্তৃত্ব কেবল বাগদাদ ও এর আশেপাশের এলাকা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। বসরার ওপর মুহাম্মদ বিন রাইক, পারস্য ও ইরানের ওপর আলী বিন বুওয়াইহ এবং তাঁর ভাই হাসান বিন বুওয়াইহ, মসুল, আল-জাজিরা ও কুর্দিস্তানের ওপর বনু হামদান, তাবারস্তানের ওপর দাইলামি এবং বাহরাইন ও হিজাজের ওপর কারামাতিরা দখলদার ছিল। এদের মধ্যে যেসব শাসক আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাসনের সনদ গ্রহণ করেছিলেন, তারা মাঝেমাঝে সামান্য কিছু করও প্রদান করতেন।

বাগদাদের অবস্থা এমন ছিল যে মুতাজিলাদের প্রতাপ অবশ্যই কমে গিয়েছিল, কিন্তু খোদ আহলে সুন্নাতে মাজহাবগুলো শাখা-প্রশাখাগত (ফুরুয়ি) মাসআলা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিল। প্রতিটি দল দ্বীন সম্পর্কে নিজেদের ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত মনে করত এবং সেটিই কার্যকর করতে চাইত। হাম্বলি উলামায়ে কেরাম সেই সময়ে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন; তাই ৩২৩ হিজরিতে তারা শক্তির জোরে পুরো শহরে নিজেদের মাজহাব কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করেন। এতে অন্যান্য মাজহাবের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি দলের সাধারণ মানুষ অন্যদের ওপর চড়াও হয়। অবশেষে খলিফার হস্তক্ষেপ এবং সরকারি শক্তি প্রয়োগ করে এই হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। [২]

আব্বাসীয় উজির ইবনে মুকলা-র হত্যাকাণ্ড:

বাগদাদ ছিল অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের আখড়া এবং ইরাক ও সিরিয়া ছিল গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র। প্রত্যেক আমির অন্যকে দমানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক যোগ্য লোক তাদের প্রতিভা এই গোলকধাঁধায় নষ্ট করছিল।

এই যুগে আবু আলী ইবনে মুকলা (২৭২ হি. - ৩২৮ হি.) খিলাফত দরবারের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রধান ছিলেন। তিনি সরকারি দপ্তরে...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৩

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৩

দশ দিনার মাসিক বেতনে মুন্সী নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু ইলমী যোগ্যতার কারণে খুব দ্রুতই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি আব্বাসী আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি আরবি ক্যালিগ্রাফিকে এক নতুন রূপ দেন এবং কুফি লিপির পরিবর্তে নসখ লিপি প্রবর্তন করেন যা আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। বিগত খলিফাদের সময়ে তিনি দুইবার উজির ছিলেন। খলিফা রাযী বিল্লাহ তাঁর যোগ্যতার সুযোগ নিয়ে ৩২৬ হিজরিতে তাঁকে পুনরায় উজির নিযুক্ত করেন। তিনি ইবনে রায়েকের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তিনি কিছু করার আগেই ইবনে রায়েক তা জেনে যান। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, ইবনে মুকলার এক হাত ও জিহ্বা কেটে দেওয়া হলো এবং তাঁকে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে নিক্ষেপ করা হলো। এটি ৩২৬ হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা। দুই বছর পর ইবনে মুকলা কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। [১]

কিন্তু ইবনে রায়েক এরপর বেশিদিন বাগদাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখার সুযোগ পাননি; কারণ তাঁর নায়েব বাজকাম দাইলামি তাঁর আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে বাগদাদে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন যে খলিফা তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য হন। ইবনে রায়েক তাঁকে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি পরাজিত হন এবং বাগদাদের ওপর উচ্চাভিলাষী ‘বাজকাম’ এর রাজত্ব কায়েম হয়। খলিফা তাঁকে ‘আমীরুল উমারা’ খেতাব দিতে বাধ্য হন। এটি একটি নতুন খেতাব ছিল যার অর্থ ছিল ‘সেনাপতিদের সেনাপতি’। পরবর্তী দশকগুলোর রাজনীতিতে এমন অনেক ‘আমীরুল উমারা’ আসেন এবং তাঁরাই বাগদাদের প্রকৃত হর্তাকর্তা হয়ে থাকেন। [২]

রাযীর মৃত্যু:

রাজনৈতিক দিক থেকে রাযী বিল্লাহর আমল ছিল চরম ব্যর্থতার চিত্র। তিনি ছিলেন শেষ খলিফা যিনি জুমার খুতবা নিজে প্রদান করতেন। ১৫ রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন। এরপর খলিফারা জুমার খুতবার দায়িত্ব তাঁদের নায়েবদের ওপর অর্পণ করেন। [৩]

ইখশিদী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা:

রাযী বিল্লাহর খেলাফতকালে মিসর ও শামে ‘ইখশিদী রাজবংশ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন তুর্কি নেতা আবু বকর মুহাম্মদ বিন তুগজ। যখন মিসর ও শাম থেকে তুলুনী রাজবংশের অবসান ঘটে, তখন সেখানে একে একে আব্বাসী খেলাফতের পক্ষ থেকে গভর্নর নিযুক্ত হতে থাকেন। এই অঞ্চলের স্থানীয় আমিরদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে মিসর ও শামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অবশেষে একজন যোগ্য ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন তুগজকে তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতে ৩২১ হিজরিতে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। মুহাম্মদ বিন তুগজ একজন সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি সেই তুর্কি গোলামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের খলিফা মুতাসিম ফরগানা থেকে আনিয়ে নিজের কাছে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পিতা তুগজ মিসরের শাসক আহমদ বিন তুলুনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। [৪]

মুহাম্মদ বিন তুগজ কেবল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করেননি, বরং উত্তর আফ্রিকা থেকে আক্রমণকারী ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করে মিসরকে সুরক্ষিত রাখেন। এর পুরস্কার স্বরূপ আব্বাসী খলিফা রাযী বিল্লাহ ৩২৩ হিজরিতে তাঁকে শামের শাসনভারও অর্পণ করেন এবং তাঁকে ‘ইখশিদ’ উপাধি প্রদান করেন যা তুর্কি ভাষায় ‘আমীরুল উমারা’ এর সমার্থক।

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ২৭৩/৬-২৭৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০৭/১৫।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮৩; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩৪/২ থেকে ৪৮।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩২২ থেকে ৩২৭ হিজরি।

[৪] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ১১৬/২৫; কদঙ্গ।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

৩২৬ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন রাইকের আধিপত্যের কারণে আব্বাসীয় খলিফা রাযি বিল্লাহর মর্যাদা কেবল নামমাত্র রয়ে গিয়েছিল। ইখশিদ ৩২৭ হিজরিতে শাম ও মিশরে নিজের স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ বিন রাইক তাকে দমন করার জন্য ৩২৮ হিজরিতে শামে অভিযান চালান এবং শামের কিছু অংশ দখল করে নেন। তবে ৩৩০ হিজরিতে (পরবর্তী খলিফা মুত্তাকীর আমলে) ইবনে রাইক নিহত হন, যার ফলে পুরো শাম ইখশিদের হাতে চলে আসে। [১]

ইখশিদের মৃত্যু এবং কাফুরের উত্থান:

ইখশিদ তেরো বছর শাসন করার পর যিলহজ ৩৩৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল ৬৬ বছর। [২]

এর পর তার পনেরো বছর বয়সী পুত্র আবুল কাসিম আনুজুর সিংহাসনে বসেন। তবে তিনি অল্পবয়সী হওয়ার কারণে শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না; তাই একজন সাহসী ও বুদ্ধিমান হাবশী গোলাম কাফুর রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি নিজের হাতে তুলে নেন। [৩]

৩৪৯ হিজরিতে আবুল কাসিমের মৃত্যু হলে তার ভাই আলী সিংহাসনে বসেন। কাফুর যথারীতি সালতানাতের প্রধান প্রশাসক হিসেবে বহাল থাকেন। ৩৫৫ হিজরিতে আলীও মৃত্যুবরণ করেন এবং কাফুর স্বাধীন শাসক হয়ে বসেন। ৩৫৭ হিজরিতে কাফুর মৃত্যুবরণ করেন। [৪]

ইখশিদী রাষ্ট্রের পতন ও সমাপ্তি:

কাফুরের পর ইখশিদী রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ইখশিদের নাতি আহমদ বিন আলী সিংহাসনে বসলেও তিনি বেশি সময় পাননি এবং ৩৫৮ হিজরিতে বনু উবাইদ মিশর জয় করে ইখশিদী রাষ্ট্রের সমাপ্তি ঘটায়। এভাবে ‘ইখশিদী রাষ্ট্র’ মাত্র ৩১ বছর স্থায়ী হয়েছিল। [৫]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৬/১৩০-১৩১।

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৫/৩৬৬।

[৩] আন-নুজুমুয যাহিরা: ৩/২৯১; তারিখুল ইসলাম, যাহাবি: ২৫/৩০ তদমুরি; আল-আলাম, যিরিকলি: ৬/১৭৪-১৭৫।

[৪] আল-ইবার ফি খবরিল গাবার: ২/৯৯।

বিখ্যাত আরব কবি মুতানাব্বি, যিনি আগে সাইফুদ দৌলার সহচর ছিলেন, পরে মিশরে গিয়ে কাফুরের দরবারী হন এবং তার প্রশংসায় কাসিদা রচনা করতে থাকেন। যখন তিনি কাফুরের চাকরি ছেড়ে চলে যান, তখন তার চরম নিন্দা করেন যার ফলে কাফুরের খুব বদনাম হয়, যদিও তিনি অত্যন্ত যোগ্য এবং প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। ইখশিদী রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক তিনিই ছিলেন। - ওফায়াতুল আ'য়ান: ৪/৯৪-১০১।

[৫] মুজিযুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২৩২।

আল-মুত্তাকী লিল্লাহ

ইব্রাহিম বিন জাফর আল-মুকতাদির

রবিউল আউয়াল ৩২৯ হিজরি থেকে সফর ৩৩৩ হিজরি

ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি. থেকে অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি.

রাযীর মৃত্যুর পর তার ভাই আবু ইসহাক আল-মুত্তাকী লিল্লাহ উপাধি নিয়ে খিলাফতের আসনে বসেন। তিনিও ‘ইসম বা মুসান্না’ (নামের সার্থকতা) ছিলেন। অত্যন্ত পরহেযগার এবং আবিদ ও যাহিদ মানুষ ছিলেন। মদ তো দূরের কথা, কখনো নাবীযও স্পর্শ করেননি। নাচ-গানের আসর তো দূরের কথা, কখনো ফালতু মজলিসেও বসেননি। সবসময় কুরআন মাজীদ সাথে রাখতেন এবং বলতেন: “এটাই সর্বোত্তম সঙ্গী।”

তবে তার রাজনৈতিক কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি কেবল নামমাত্র শাসক ছিলেন। সমস্ত ক্ষমতা ছিল আমীরদের হাতে। যে বছর তিনি খলিফা হন, বাগদাদের প্রাচীন কাসরে খিলাফতের বিখ্যাত ও সুপরিচিত সবুজ গম্বুজ, যা শহরের মুকুট মনে করা হতো, হঠাৎ ধসে পড়ে। একে খিলাফতের অবশিষ্ট মর্যাদা ও গান্ধীর্ষ শেষ হওয়ার লক্ষণ মনে করা হয়েছিল এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল। এই যুগে খিলাফতের নাড়ি ডুবে যেতে শুরু করে এবং সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। [১]

অত্যাচারী আমীরদের খলিফা ও নাগরিকদের সাথে আচরণ:

দারুল খিলাফতের চারদিকে স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্রোহী আমীরদের বাহিনী একে অপরের সাথে লড়াই করছিল। তাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হতো বাগদাদে ঢুকে খলিফার কাছে নিজের দাবি আদায় করে নিত। শাবান ৩২৯ হিজরিতে বসরার শাসক আবু আবদুল্লাহ আল-বারীদী বাগদাদে প্রবেশ করে খলিফার কাছে পাঁচ লক্ষ দিনার দাবি করেন, অন্যথায় হত্যার হুমকি দেন। খলিফাকে এই অর্থ দিতে হয়। [২] বারীদী কেবল এতেই ক্ষান্ত হননি, বরং শহরের মানুষের গবাদি পশু, শস্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও লুট করতে শুরু করেন। আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. এই ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর লিখেছেন:

“অত্যাচারীরা জেনে রাখুক যে, তাদের অপকর্মের খবর বর্ণিত হতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় বাকি থাকবে। তারা যদি আল্লাহকে ভয় করে জুলুম না ছাড়ে, তবে অন্তত (কমপক্ষে) বদনামের ভয়েই যেন ছেড়ে দেয়।” [৩]

‘আমীরুল উমারা’ পদের জন্য আমীরদের লড়াই:

আগে খলিফাদের ওপর কেবল তুর্কিদের একাধিপত্য ছিল। এখন প্রতিটি উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি নিজের শখ পূরণ করতে চাইছিল। দাইলামি শিয়া, বনু বুয়াইহ-এর রাফেযী এবং তুর্কি আমীরদের প্রত্যেকেই ‘আমীরুল উমারা’ অর্থাৎ বাগদাদের বাদশাহ হতে চাইছিল।

মুত্তাকীর যুগে সর্বপ্রথম কুরতাকীন নামক এক দাইলামি সরদার জোরপূর্বক এই সম্মান লাভ করেন এবং আমীরুল উমারার ক্ষমতার মধ্যে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে দেন যে, দজলা ও ফোরাতে মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলো অর্থাৎ দোয়াবার স্বাধীন শাসক হবেন। এই...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৪

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৩৩০ হিজরি

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৪

এর আগে এই এলাকা খলিফার অধীনে ছিল। এভাবে বাগদাদের আশপাশের এলাকা থেকেও খলিফাদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেল। কেবল বাগদাদেই তাদের সামান্য কিছু শাসন অবশিষ্ট রইল। বসরার শাসক মুহাম্মদ বিন রাইক কুজতগিনের শান-শওকত সহ্য করতে না পেরে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাগদাদে এসে পৌঁছালেন এবং কুজতগিনকে তাড়িয়ে দিয়ে এই পদটি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর একের পর এক আমিরুল উমারা পরিবর্তিত হতে থাকল।

গৃহযুদ্ধের এই যুগে মুসলমানদের সীমান্তগুলো এতটাই অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল যে, ৩৩১ হিজরিতে রোমানরা কুর্দিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। নসিবিন ও মিয়া ফারকিনে তারা প্রাণভরে লুটতরাজ চালান এবং লোকজনকে বন্দী করল। [১]

রুমালের বিনিময়ে রোম থেকে মুসলিম বন্দীদের মুক্তি:

সেই দিনগুলোর একটি আকর্ষণীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে খলিফা মুত্তাকির কাছে এই বার্তা পাঠানো হলো যে, জাবার প্রাচীন গির্জার একটি সিন্দুকে একটি রুমাল সংরক্ষিত আছে যা দিয়ে হযরত মসীহ নিজের মুখ মুছেছিলেন এবং তাঁর চেহারার প্রতিচ্ছবি সেই রুমালে ফুটে উঠেছিল। সম্রাট প্রস্তাব দিলেন যে, যদি সেই রুমালটি কনস্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে এর বিনিময়ে তিনি অনেক মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেবেন। খলিফা মুত্তাকি উলামা ও ফকিহদের ডেকে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। সবাই ভিন্ন ভিন্ন মত দিলেন। কেউ বললেন: “প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যেতে পারে।” কেউ বললেন: “এই রুমালটি শতাব্দী ধরে আমাদের কাছে আছে, এর আগে কোনো বাদশাহ আমাদের কাছে এটি চাননি। এখন এটি ফেরত দেওয়া আমাদের জন্য অবমাননাকর।”

পরিশেষে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উজির আলী বিন ঈসা বললেন: “হে আমিরুল মুমিনিন! মুসলমানদের বন্দীত্বের কষ্ট থেকে মুক্ত করা এই রুমালটি রক্ষা করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।” এই মতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হলো এবং রুমালের বিনিময়ে বিপুল সংখ্যক বন্দীকে মুক্ত করে আনা হলো। [২]

মুসলিম বিশ্বের ওপর রাশিয়ার আক্রমণ:

মুসলমানদের এতটাই দুর্বল মনে করা হতে লাগল যে, শত শত মাইল দূরে উত্তর-পূর্বে বসবাসকারী রাশিয়ার বন্য জাতিগুলোও মুসলিম বিশ্বকে সহজ শিকার মনে করতে শুরু করল। ৩৩২ হিজরিতে তাদের একটি বাহিনী জর্জিয়ার কুর নদী পার হয়ে মুসলিম জনপদগুলোতে পৌঁছে গেল। তাদের আগমনে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। “বারদা”-র প্রধান মারজুবান বিন মুহাম্মদ পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মোকাবিলায় নামলেন কিন্তু তিনি পরাজিত হলেন এবং রুশরা বারদা দখল করে নিল। তারা তিন দিনের মধ্যে শহর খালি করার নির্দেশ দিল। যারা বেরিয়ে গেল, তারা বেঁচে গেল। বাকি জনপদকে তারা হত্যা করল এবং সুন্দরী নারীদের দাসী বানিয়ে সাথে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মারজুবান বিন মুহাম্মদ আশপাশের এলাকাগুলোতে জিহাদের ডাক দিয়ে ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের আরও একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি রুশদের পিছু নিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা আক্রমণ চালিয়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করতে থাকলেন কিন্তু সফল হলেন না। অবশেষে এক জায়গায় খোলা ময়দানে মুখোমুখি লড়াই হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলমানদের পা টলে গেল। মারজুবান এটি দেখে নিজের বিশেষ বাহিনীসহ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এই সাহসিকতা পলায়নরত মুসলমানদেরও সাহস জোগাল এবং তারা ফিরে এল।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৩৩২ হিজরি

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মারজুবান বিন মুহাম্মদ যুদ্ধের আগেই শত্রুর পশ্চাতে কিছু সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সংকেত পাওয়া মাত্রই তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুশদের সর্দার নিহত হয় এবং তারা পিছু হটে জর্জিয়ার “শাহরিস্তান” দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, যেটিকে তারা নিজেদের সদর দপ্তর বানিয়েছিল। প্রবল তুষারপাত সত্ত্বেও মুসলমানরা দুর্গের অবরোধ ত্যাগ করেনি। অবশেষে এক রাতে তারা গনিমতের মাল ও বন্দীদের নিয়ে নিঃশব্দে দুর্গ থেকে বের হয়ে নৌকায় চড়ে কুর নদী পার হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের পিছু নিতে পারেনি, তবে একটি আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তি মিলে যায়। [১]

বনু হামদানের পক্ষ থেকে খলিফার সমর্থন:

এই যুগে বনু হামদান পরিবারের দুই ভাই: হাসান বিন আবদুল্লাহ এবং আলী বিন আবদুল্লাহ খলিফার সমর্থক ছিলেন। হাসান বিন আবদুল্লাহ মোসেলের শাসক ছিলেন এবং আলী বিন আবদুল্লাহ আলেপ্পোর। তাঁরা ৩৩০ হিজরিতে আমিরুল উমারা মুহাম্মদ বিন রায়েককে হত্যা করে খলিফা মুত্তাকীকে তাঁর কবল থেকে মুক্ত করেন, যাতে খুশি হয়ে খলিফা হাসান বিন আবদুল্লাহকে “আমিরুল উমারা” বানিয়ে দেন। সেই সাথে তাঁকে “নাসিরুদ্দৌলা” এবং তাঁর ছোট ভাই আলী বিন আবদুল্লাহকে “সাইফুদ্দৌলা” উপাধিতে ভূষিত করেন। [২]

বনু হামদানকে ক্রমাগত পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের শাসকদের জবরদস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, ফলে তাঁরা বাগদাদের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি এবং কিছুকাল পরেই ৩৩১ হিজরিতে তুজুন নামক এক বিদ্রোহী সর্দার বাগদাদে চড়াও হয় এবং খলিফার কাছ থেকে জোরপূর্বক নিজের জন্য “আমিরুল উমারা” উপাধি অনুমোদন করিয়ে নেয়। খলিফা বুঝতে পারলেন যে তিনি বাগদাদে একেবারেই অনিরাপদ। ফলে এমন দুর্ভাগাদের হাত থেকে বাঁচতে খলিফাকে বাগদাদ ছেড়ে রাক্কায় বনু হামদানের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। তিনি ৩৩৩ হিজরি পর্যন্ত সেখানেই আত্মগোপন করে থাকেন। [৩]

খলিফা মুত্তাকীর হত্যাকাণ্ড:

বাগদাদ দখলকারী নতুন আমিরুল উমারা তুজুনের শান ততক্ষণ পর্যন্ত বুলন্দ হতে পারত না যতক্ষণ না খলিফা তার হাতের মুঠোয় থাকেন। সে মুত্তাকীকে অপসারিত করে কোনো দুর্বলতম শাহজাদাকে পুতুল খলিফা বানানোর পরিকল্পনা করে এবং মিথ্যা তোষামোদ করে মুত্তাকীকে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। খলিফা প্রলোভনে পড়ে মহররম ৩৩৩ হিজরিতে রাক্কা থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৮ই সফর তিনি আনবার ও হীতের মধ্যবর্তী “সিন্দিয়া” নামক স্থানে পৌঁছান যেখানে তুজুন তাঁর অপেক্ষায় ছিল। এই জালেম সেই দিনই খলিফাকে গ্রেপ্তার করে অন্ধ করে দেয় এবং জেলে নিক্ষেপ করে যেখানে এই নেক ও সালেহ খলিফা পঁচিশ বছর পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করার পর ৩৫৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৪]

প্রাক্তন খলিফা কাহেরকে আগেই অন্ধ করে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি মুত্তাকীর বন্দী হওয়ার খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন: “যাক, আগে একজন অন্ধ ছিল, এখন দুইজন হলো। শুধু তৃতীয়জনের অভাব।” [৫]

ভাগ্যের লিখন যে এমনটাই হলো। কিছুদিন পর পরবর্তী খলিফা মুস্তাকফীরও একই পরিণতি হলো। [৬]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৩২ হিজরি, বারদাআ শহরে রুশদের রাজার আলোচনা।

[২] এটি বনু হামদানের সেই সাইফুদ্দৌলা যে ক্রমাগত রোমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করত।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮৪, ২৮৫।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৩৩ হিজরি; আল-আলাম জিরিকলি: ১/৩৫, দারুল ইলম।

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৩০ হিজরি থেকে ৩৩৩ হিজরি; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/৫৯।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুসতাকফি বিল্লাহ

আবদুল্লাহ বিন আলী আল-মুকতাহি

সফর ৩৩৩ হিজরি থেকে জমাদি আল-আখিরা ৩৩৪ হিজরি

অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ

সফর ৩৩৩ হিজরিতে মুত্তাকি-কে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়ার পরপরই তুজুন সাবেক খলিফা মুকতাহি বিল্লাহর পুত্র আবুল কাসেমকে ডেকে এনে খিলাফতের মসনদে বসিয়ে দেয়। তিনি মুসতাকফি বিল্লাহ উপাধিতে পরিচিত হন। এটি তাঁর সৌভাগ্য ছিল যে দুর্ভাগা তুজুন শীঘ্রই মারা যায়, কিন্তু খিলাফতের লাশের ওপর ডজন ডজন শকুন উড়ছিল। ফলে ইবনে শিরজাদ নামক আরেকজন অনারব সর্দার বাগদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং ‘আমীরুল উমারা’ হয়ে কোষাগারের অর্থ এমন নির্মমভাবে ওড়ায় যে অল্প সময়ের মধ্যেই কোষাগার শূন্য হয়ে যায়।

তবে বাগদাদের ভাগ্যে তখনো এর চেয়েও বড় বিপদ লেখা ছিল। মুসতাকফি খলিফা হওয়ার সোয়া এক বছর পর জমাদি আল-আখিরা ৩৩৪ হিজরিতে বনু বুওয়াইহ-এর শাসক আহমদ বিন বুওয়াইহ বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং ইবনে শিরজাদকে তাড়িয়ে দেন। [১]

খলিফা মুসতাকফির শাসন ছিল নামমাত্র। তিনি মাত্র এক বছর চার মাস খিলাফতের মসনদে বসতে পেরেছিলেন এবং ২২ জমাদি আল-আখিরা ৩৩৪ হিজরিতে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর এই পদচ্যুতি একটি বড় বিপ্লবের কারণে হয়েছিল, যার ব্যাখ্যার জন্য আমরা এখানে কিছুটা বিরতি নেব। কারণ এখান থেকে উম্মাহর ইতিহাসের একটি নতুন এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক অধ্যায় শুরু হয় যা ৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৫১ হিজরি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে শুধু বাগদাদ নয় বরং পুরো ইরান এবং ইরাকের অধিকাংশ অংশ ইসনা আশারি শিয়া, বনু বুওয়াইহ-এর কবলে চলে যায়। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পর্যালোচনা আমরা পরবর্তী পাতাগুলোতে করব।

তবে তার আগে ঐ সকল উলামা ও মাশায়েখদের ইলমি ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ওপর এক নজর দেওয়া জরুরি, যারা বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্যের আগের এক শতাব্দীতে আকিদাগত ও চারিত্রিক অবক্ষয়কে চরম পর্যায়ে পৌঁছানো থেকে রুখতে বীরত্বের সাথে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৬, ত. নিয়ার

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বনু আব্বাসের পতন যুগের প্রথম শতাব্দীতে

প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

২৫০ হিজরী থেকে ৩৫০ হিজরী

ইতিহাসে উম্মতে মুসলিমা

ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং সেই যুগের কিছু উলামার প্রচেষ্টায় দরবারে খিলাফতে খালকে কুরআনের মাসআলা শেষ হয়েছিল, কিন্তু মুতাজিলাদের শুরু করা ইলমী বিতর্কগুলো তখনও ইলমী মহলে আলোচিত হচ্ছিল। মুতাজিলা উলামা বড় বড় পদে আসীন ছিলেন। ইতিজালের (মুতাজিলা মতবাদ) একটি যুক্তিবাদী চিন্তাধারা হিসেবে তখনও অস্তিত্ব ছিল। একইভাবে তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)-এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে রাফযের রূপ ধারণ করেছিল। অন্যদিকে রাফযের খণ্ডন করতে গিয়ে কিছু উলামা নাসিবিয়াতের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। প্রয়োজন ছিল এই ফিতনাগুলো রোধ করার জন্য সুসংহত ও দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা চালানো। এই পরিস্থিতিতে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের জামাতে এক সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যাকে ইসলামী ইতিহাসে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নামে জানা যায়।

পিতার স্বপ্ন:

তিনি একজন মহান মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর জন্ম ২২৪ হিজরিতে উত্তর ইরানের তাবারস্তান প্রদেশের আমুল শহরে হয়েছিল। তাঁর পিতা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, এই শিশু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি থেকে পাথর ছুড়ছে। উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে: এই শিশু শরীয়ত রক্ষার কাজ করবে। পিতা এটি শুনে শিশুকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করে দেন। [১]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৭৬/১৪, তাবাকাতুল হফফাজ সুযুতী: ৩১৯/১।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনী আমাদের জন্য বর্তমান সময়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কারণ তাঁর সম্পর্কে বর্তমানে অনেক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি ইসলামের ইতিহাসের সেই মজলুম ব্যক্তিত্ব, যাকে তাঁর নিজ যুগেও কিছু মানুষ চিনতে পারেনি এবং আজও কিছু লোক যারা “তামান্নায়ী” (তামান্না ইমাদীর অনুসারী) হওয়ার দাবিদার, তারা তাঁর পেছনে পড়ে আছে। এই সিলসিলার সূচনা করেছিলেন তামান্না ইমাদী, যিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিতনায়ে ইনকারে হাদিসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যদিও তামান্না ইমাদী কেবল হাদিস অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁর “গবেষণা” অনুযায়ী হাদিসের বিশাল ভাণ্ডারকে সন্দেহজনক ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তামান্না ইমাদীর মতো ব্যক্তির তাঁদের “গবেষণা”র মাধ্যমে এই সিলসিলাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ইনকারে হাদিসের দিকে ধাবিত করেছেন।

এই বিষয়টি সাধারণ পাঠকদের জানা নেই যে, ইনকারে হাদিসের ফিতনা বিভিন্ন দরজা দিয়ে সমাজে প্রবেশ করে। এর মধ্যে একটি দরজা হলো ইতিহাসের অস্বীকার। তামান্না ইমাদী সবচেয়ে বেশি ইনকারে হাদিসের জন্য নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত তারিখ ও সীরাতের বর্ণনাগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি তিনি বুখারী ও মুসলিমের রাবীদেরও মিথ্যুক ও কাজ্জাব সাব্যস্ত করেছেন। তামান্না ইমাদী সাহেব তারিখের সংকলনকারী প্রথম ইমাম ইবনে জারীর তাবারীকেও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর ওপর আজ যে সব অভিযোগ করা হচ্ছে, তা মূলত তামান্না ইমাদী সাহেবের ইনকারেরই প্রতিধ্বনি। কিছু লোক “ইমাম ইবনে জারীর তাবারী: ছবির দ্বিতীয় দিক” শিরোনামে বইও প্রকাশ করেছে। এমন “গবেষক”দের লেখায় ইমাম তাবারীর ছবির দ্বিতীয় দিকটি দেখা যায় না, বরং কেবল প্রথম দিকটিই দেখানো হয়। তাই আমরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা মহান উলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকে ইমাম তাবারীর সীরাতের কিছু দিক উপস্থাপন করছি, যাতে পাঠকরা কেবল একতরফা কথা না পড়ে বরং এর দ্বিতীয় দিকটিও তাঁদের সামনে আসে। যদি আসলাফ, আইন্মায়ে জারহ ওয়াত তাদীল এবং ইলমে আসমাউর রিজালের ওপর আস্থা থাকে, তবে এর পরেই ফয়সালা করা যেতে পারে যে ইমাম তাবারীর মর্যাদা কী ছিল। ইমাম তাবারীর সাথে সম্পর্কিত উত্থাপিত কিছু প্রসিদ্ধ আপত্তির জবাব এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে দেওয়া হবে। পাঠকরা চাইলে সেখানে গিয়ে বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন।

ইলমের খাতিরে কষ্টসহিষ্ণুতা:

ইমাম তাবারী (রহ.) সাত বছর বয়সে কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। নয় বছর বয়সে হাদীস লিখতে শুরু করেন। তিনি ইলম অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করেন। যখন তাঁর বয়স বারো বছর হলো, তখন তিনি পিতার নিকট থেকে সফরের অনুমতি নিলেন এবং আমুল থেকে বিদায় নিলেন। [১]

প্রথমে তিনি রে-তে ইবনে হুমাইদ আর-রাযী (রহ.)-এর নিকট থেকে উপকৃত হন, এরপর অন্যান্য শহরের ক্বারী ও মুহাদ্দিসগণের সান্নিধ্যে থাকেন। তিন বছর পর তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সুখ্যাতি শুনে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন, কিন্তু তাঁর বাগদাদ পৌঁছানোর কিছুদিন পূর্বেই ইমাম আহমাদ (রহ.) ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে অবস্থান করে অন্যান্য হাদীস বিশারদদের নিকট থেকে বর্ণনা শ্রবণ করেন। এরপর বসরায় মুহাম্মদ বিন বাশশার বুন্দার, মুহাম্মদ বিন মুসান্না এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল আ'লা সানআনী-এর মতো ইমামদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। এরপর কুফায় ইমাম খাল্লাদ (রহ.)-এর উত্তরসূরি সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান (রহ.)-এর নিকট থেকে ইলমে ক্বিরাত শেখেন। কুফাতেই মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.)-এর মতো মহান মুহাদ্দিসের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে এক লক্ষ বর্ণনা শ্রবণ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, বর্ণনাগুলো মুখস্থ হয়ে যেত। একদিন উস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন যে, পঠিত পাঠ কার কার মুখস্থ আছে। সবাই চুপ থাকল, ইমাম তাবারী (রহ.) অনর্গল বর্ণনাগুলো শুনিতে দিলেন। এমনকি এটাও বলে দিলেন যে, কোন বর্ণনাটি কখন শোনানো হয়েছিল। [২]

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর পিতা তাঁর শিক্ষার খরচ বহন করেন। তিনি যে শহরেই থাকতেন, তাঁর পিতা সেখান থেকে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিতেন। [৩]

কুফা থেকে তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে এলে তাঁর কাছে থাকা অর্থ কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এদিকে পিতার পক্ষ থেকে খরচ পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। তাঁর কাছে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজের কাপড় বিক্রি করতে হয়। সে সময় উযীর উবাইদুল্লাহ বিন খাকানের তাঁর ছোট সন্তানদের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য একজন ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। ইবনে জারীরের এক বন্ধু তাঁর এই অবস্থা দেখে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন উযীরের বাড়িতে পড়াতে যান। ইবনে জারীর সেই বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা পোশাক পরে উযীরের কাছে গেলেন। তিনি এই শর্ত দিলেন যে, তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের ব্যস্ততা এবং ইবাদত থেকে বেঁচে যাওয়া সময়টুকুই কেবল শিশুদের শিক্ষাদানে ব্যয় করবেন। মাসিক দশ দিনার বেতন নির্ধারিত হলো। শিশুরা যখন লেখা শুরু করল, তখন প্রাসাদের ভৃত্যরা প্রথা অনুযায়ী দিরহাম ও আশরাফী ভর্তি থালা নিয়ে উপস্থিত হলো। ইবনে জারীর তা গ্রহণ করলেন না এবং বললেন: “নির্ধারিত বেতনের অতিরিক্ত আমি কিছুই নেব না।” [৪]

[১] মু'জামুল উদাবা: ৯/১৮ অর্থাৎ ২২৩ হিজরীর ঘটনা। কারণ ইমাম তাবারীর জন্ম ২২৪ হিজরীতে। কিছু লোক এত অল্প বয়সে এই সফরকে অসম্ভব মনে করে একে অনুমান বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই অনুমান সঠিক নয় কারণ ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে ১২ বছর বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, কিছু বর্ণনায় এটাও স্পষ্ট যে তিনি অনেক শহরের উলামা ও ক্বারীগণের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার পর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট থেকে ইলম অর্জনের জন্য বাগদাদ পৌঁছান। তখন ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েকদিন বাকি ছিল। ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল ২৪১ হিজরীতে। তখন ইমাম তাবারীর বয়স ১৭ বছর ছিল। এর আগে অন্যান্য শহরের ইলম অন্বেষণকারীদের সান্নিধ্যে দুই-তিন বছর কেটে থাকবে। তাই সফরের শুরুতে তাঁর বয়স ১২-১৩ বছর হওয়া স্বাভাবিক। এমনিতে ১২ বছর বয়সে ইলম অর্জনের জন্য সফর করা অসম্ভব কিছু নয়। আজও অনেক দ্বীনি মাদরাসায় দেখা যায় যে দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে মাত্র ১০-১২ বছরের শিশুরাও প্রচুর সংখ্যায় আসে। সেই যুগে যখন ইলম অর্জনের প্রবল আগ্রহ ছিল, তখন একে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ নেই।

[২] মু'জামুল উদাবা: ৯/১৮, ৫২৭

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ সুবকী: ৩/১২৫... আখরাজা আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানী ফিত তারিখিল মুয়াইয়্যাল বিস সানাদিল মুত্তাসিল

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭১, ২৭২; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ: ৩/১২৫; আখরাজাছ ইবনু আসাকির বিসানাদিন হাসান

বাগদাদে অবস্থানকালে কুরআনি উলুমের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি শাইখুল কুররা আহমদ বিন ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট থেকে ইলম অর্জন করতে থাকেন। এরপর শাফেয়ী ফিকহের প্রতি আগ্রহী হয়ে হাসান বিন মুহাম্মদ আস-সাবাহ (রহ.)-এর মতো শাফেয়ী ফকিহদের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। [১]

কিছুকাল পর তিনি সিরিয়া সফর করেন। বৈরুতে শাইখুল কুররা আব্বাস বিন ওয়ালিদ (রহ.)-এর নিকট থেকে সিরিয়াবাসীদের কিরাত শেখেন এবং জামে মসজিদে সাত রাতের মধ্যে কুরআন খতম করেন। ২৫৬ হিজরিতে তিনি বৈরুত থেকে মিশরে পৌঁছান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। [২]

মুহাম্মদ বিন হারুন, মুহাম্মদ বিন নাসর এবং মুহাম্মদ বিন খুজাইমাহ (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসগণ ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই আহলে সুন্নাতের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। এই চারজন হাদিস ও ফিকহ শেখার জন্য একসাথে মিশরে যান। সেখানে তাঁরা শাফেয়ী ও মালেকী উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলম অর্জন করতে থাকেন। সেই যুগে বর্তমানের মতো দ্বীনি মাদ্রাসা ছিল না। মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ মসজিদে দরস দিতেন। ছাত্রদের নিজেদের আবাসন ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হতো। এই তিনজন চরম অভাব ও অনাহারের শিকার হলেন, তখন এক রাতে তাঁরা লটারি করার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, লটারিতে যার নাম আসবে সে কোথাও থেকে খাবার চেয়ে আনবে। ইবনে খুজাইমাহ (রহ.)-এর নাম লটারিতে উঠল। তিনি সঙ্গীদের বললেন: আমাকে সামান্য সময় দাও। এই বলে তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর এক গোলাম ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল এবং বলল: “আপনাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন নাসর কে? মুহাম্মদ বিন জারির কে? মুহাম্মদ বিন খুজাইমাহ এবং মুহাম্মদ বিন হারুন কে?” প্রত্যেকেই নিজের নাম বললেন। গোলাম প্রত্যেককে পঞ্চাশ দিনারের একটি করে থলি দিল এবং বলল: “আজ দুপুরে মিশরের শাসক স্বপ্নে দেখেছেন যে, মুহাম্মদ নামের কিছু তালিবে ইলম ক্ষুধার্ত। তিনি এই অর্থ দিয়ে আপনাদের সন্ধান পেয়েছেন এবং আপনাদের কসম দিয়েছেন যে, যখনই অর্থ শেষ হয়ে যাবে, তাঁকে যেন জানানো হয়।” [৩]

ইবনে জারির তাবারী (রহ.) মিশরে কাব্য ও সাহিত্যের □□□□□□□□ (বিশেষজ্ঞদের) থেকেও উপকৃত হন এবং মাত্র একদিনে খলিল বিন আহমদের আরুজ (ছন্দতত্ত্ব) পড়ে তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। [৪] তিনি যে বিষয় বা শাস্ত্রই অধ্যয়ন করতেন, তাতেই পারদর্শী হয়ে উঠতেন। যুক্তিবিদ্যা, গণিত, বীজগণিত এবং চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। [৫]

বাগদাদে ইফতা ও হাদিসের দরস:

প্রায় ত্রিশ বছরের ইলমি সাধনার পর বাগদাদে ফিরে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে ফতোয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। [৬] হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাঁর মজলিস প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

তলামিয (ছাত্রবৃন্দ):

তাঁর অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নমুনা হিসেবে নিচে কয়েকটি নাম দেওয়া হলো:

[১] মুজাম্মুল উদাবা: ১৮/৫৫

[২] মুজাম্মুল উদাবা: ১৮/৫৬

[৩] তারিখে বাগদাদ ২/১৬৪; তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ: ৩/১২৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৪/২৭১, এবং ইবনে আসাকির তাঁর সনদে তারিখে দামেশকে এটি বর্ণনা করেছেন: ৫২/১৯২

[৪] মুজাম্মুল উদাবা: ১৮/৫৬

[৫] পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৭৬

[৬] তাবাকাতুল হফযাজ লিস-সুয়ুতী: ১/৩২০

তারিখ امت مسلمہ (উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস) — অংশ ৩

১. ইমাম আবু আল-কাসিম আত-তাবারানি
২. আবু আহমদ ইবনে আদি
৩. আবু বকর কাফফাল আশ-শাশী আশ-শাফিঈ
৪. কাজি আহমদ বিন কামিল
৫. আহমদ বিন কাসিম আল-খাত্তাব
৬. আবু উমর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আন
৭. আব্দুল গাফফার বিন উবাইদুল্লাহ আল-হুসাইনি আল-মুকরি
৮. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আবু বকর আশ-শাইবানি
৯. আবু শুআইব আল-হারানি
১০. আবু বকর ইবনে আস-সুন্নি... রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৌলিকভাবে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।
 উসূলে তিনি ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুসারী ছিলেন। ইলম অর্জনের পর যখন তিনি বাগদাদে আসলেন, তখন দশ বছর পর্যন্ত ফিকহ চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।
 এই সময়ে তিনি ফিকহে শাফিঈ অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। [১] ইমাম সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “তিনি প্রথমে শাফিঈ মাযহাবের ছিলেন। তারপর তিনি একটি স্বতন্ত্র মাযহাব গ্রহণ করেন যাতে তার নিজস্ব বক্তব্য ও ইজতিহাদ ছিল।” [২] তা সত্ত্বেও তাকে শীর্ষস্থানীয় শাফিঈ ফকিহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। শাফিঈ উলামায়ে কেরাম তাকে যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন তা এর স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“ইবনে জারীর আমাদের বিশিষ্ট সাথীদের একজন ছিলেন, এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই।” [৩]
 যেহেতু তিনি ইজতিহাদের মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই কিছু মাসআলায় তার ভিন্ন ইজতিহাদী রায় ছিল এবং একটি দল তার অনুসারী ছিল। [৪]

দৈনন্দিন রুটিন:

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত ইবাদতগুজার মানুষ ছিলেন। কোনো রাত কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অতিবাহিত হতো না। প্রতি চার রাতে খতম কুরআন তার রুটিন ছিল। প্রতিটি কাজ সময়ের সাথে মিল রেখে করতেন। যোহর থেকে আসর পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করতেন। কুরআন মাজীদ পড়ানোর প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে কুরআন মাজীদের শিক্ষা দিতেন। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত ফিকহ ও হাদীসের দরস হতো। [৫]

[১] দেখুন: তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ১/৭৮; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, পৃ. ২২৪; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৯।
 [২] ইবনে আস-সুন্নি ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’-এর লেখক। তার এই বিশ্ববিখ্যাত সংকলনে তিনি ইমাম তাবারী থেকে অনেক মুতাবা’আত (সমর্থনমূলক) বর্ণনাও নকল করেছেন।
 [৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিস-সুবকী: ৩/১২৩।
 [৪] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, পৃ. ৯৬।
 [৫] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ: ৩/১২৭।
 [৬] এজন্য তাকে মুজতাহিদও বলা হয়। তবে এই মতপার্থক্য ঠিক তেমনই ছিল যেমন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিছু মাসআলায় ইমাম সাহেবের সাথে ভিন্ন মত ছিল। যারা ইমাম তাবারীর ইজতিহাদ দেখেছেন তারা তাকে মুজতাহিদ বলেছেন। যারা ফিকহে শাফিঈ অনুযায়ী তার ফতোয়া দেখেছেন তারা তাকে শাফিঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইমাম তাবারীর ফিকহি মাযহাবের সাথে যুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে আলী বিন আব্দুল আজিজ আদ-দুলাবি, মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া এবং কাজি আবু বকর বিন কামিল বিখ্যাত। (মু’জামুল উদাবা লিল হামাভী: ১৮/৬২)।
 ইমাম তাবারীর ফিকহি মাযহাবের সবচেয়ে বিখ্যাত অনুবাদক (ব্যখ্যাকারী) আল্লামা আল-মুয়াফা বিন যাকারিয়া (মৃত্যু ৩৯০ হিজরী) ছিলেন, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ইবনে জারীরের [মাযহাবের] জন্য যথেষ্ট ছিলেন। জারহ ও তা’দীলের ইমামগণ তার সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি ফিকহ, লুগাত এবং আদবের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। (তাবাকাতুল ফুকাহা লিস-সুলামী: ১/৩০১; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ ইবনে কাসীর পৃ. ৩৩৮)।
 হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে “আল-ইমাম, আল-আল্লামা, আল-ফকিহ, আল-হাফেজ, আল-কাজি, আল-মুফাসসির, আলিমু আসরিহি” শব্দে স্মরণ করেছেন। (সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৭)।
 [৭] মু’জামুল বুলদান: ১৮/৮০ থেকে ৮২।

কুরআন মাজীদের প্রতি অনুরাগ

ইমাম তাবারী রহ. একজন শ্রেষ্ঠ ক্বারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সফর করে তাঁর যুগের কিরাত শাস্ত্রের ইমামদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে এবং তাজবীদের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। ওয়ারশ এবং হামযাহ-এর কিরাতে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। দূর-দুরান্ত থেকে ক্বারী, উলামা এবং সাধারণ মানুষ তাঁর পেছনে সালাত আদায় করতে আসতেন এবং তাঁর সুন্দর কিরাতের স্বাদ গ্রহণ করতেন। [১]

সেই যুগের একজন বড় ক্বারী আবু বকর বিন মুজাহিদ রহ. রমজানের শেষ দশকে তারাবীহ সালাত পড়াতে যাচ্ছিলেন, পশ্চিমধ্যে নিজের মসজিদ ছেড়ে মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী রহ.-এর মসজিদের দিকে মোড় নিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন ইমাম তাবারী রহ. তারাবীহ সালাতের ইমামতি শুরু করেছেন এবং সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করছেন। আবু বকর বিন মুজাহিদ রহ. বিমোহিত হয়ে তাঁর কিরাত শুনতে থাকলেন। তাঁর সঙ্গীরা বলতে লাগলেন: “হযরত! আপনি নিজের তারাবীহ ছেড়ে তাঁর কিরাত শুনতে শুরু করেছেন, সেখানে মসজিদে মানুষ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।” আবু বকর বিন মুজাহিদ রহ. বললেন: “চুপ থাকো! আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আল্লাহ এমন কোনো মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি এই ইমামের মতো এত সুন্দর কিরাত করতে পারেন।” [২]

হাফেজ যাহাবী রহ. আবু বকর মুহাম্মদ বিন খুযাইমাহ রহ.-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইবনে জারীরের তাফসীর দেখে বলেছিলেন: “এই মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠে তাঁর চেয়ে বড় কোনো আলেম নেই। হানবালীরা তাঁর ওপর জুলুম করেছে।” [৩]

[১] আইম্মায়ে জাযারী রহ. (মুকাদ্দিমাতুল জাযারীর লেখক) ইমাম তাবারী রহ.-কে প্রখ্যাত ক্বারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর কিরাত ও তাজবীদের উস্তাদদের মধ্যে সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান সাহেব খাল্লাদ, ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা, আবু কুরাইব মুহাম্মদ বিন আল-আলা এবং আহমদ বিন ইউসুফ তাগলাবীর মতো মহান ইমামদের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ইমাম তাবারী রহ. কিরাত শাস্ত্রের ওপর “আল-জামি” নামে একটি কিতাবও লিখেছিলেন। ইমাম জাযারী রহ. কিরাত শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আহমদ আদ-দাজুনী, আব্দুল ওয়াহিদ বিন উমর, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ফারগানী, ইবনে মুজাহিদ এবং মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ফিরোজ আল-আহওয়াযীর নাম উল্লেখ করেছেন। (গয়াতুন নিহায়াহ ফী তাবাকাতিল কুররা: ২/১০৭) হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর কিরাতের উস্তাদদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আবি হাশিমের নামও উল্লেখ করেছেন। (তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, পৃ. ২২৩, ত. মাকতাবাতুস সাকাফাহ)

[২] মু'জামুল উদাবা: ১৮/৭৩ (৩) খতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাসে সনদসহ বর্ণনা করেছেন: ২/৬৪, এবং দেখুন তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিস-সুবকী: ৩/১২১

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৩... এটি সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যখন কিছু হানবালী জুমার দিন জামে মসজিদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মাযহাব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তাঁর উত্তরগুলোকে ভিন্ন রঙ দিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ করেছিল এবং বাড়িতেও পাথর নিক্ষেপ করেছিল। বাধ্য হয়ে সরকারি পুলিশ তাঁকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নেয় এবং একদিন একরাত পর্যন্ত বাড়িতে পাহারা দেয়। (মু'জামুল উদাবা: ১৮/৭০)

স্পষ্টতই গোঁড়া হানবালীদের অভিযোগ এবং কষ্ট দেওয়ার কারণে ইমাম তাবারীর মর্যাদায় কোনো কমতি হয় না। সেই দিনগুলোতে কিছু হানবালী ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধেও একইভাবে বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। সেই যুগে রচিত হানবালীদের কিতাব “আস-সুন্নাহ”-তে ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর ছাত্রদের কুরআনের মাখলুক হওয়ার প্রবক্তা, বিদআতী, খারেজী এমনকি শরীয়ত অস্বীকারকারী পর্যন্ত বলা হয়েছে। (আস-সুন্নাহ: বর্ণনা নম্বর: ১৬৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪)

ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম তাবারীর চরিত্র হননের একটি কারণ এটিও ছিল যে, তিনি ইমাম আবু হানিফার প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি তাঁর রচনা “যাইলুল মুযাইয়্যাল”-এ ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা ও গুণগান করতে গিয়ে লিখেছেন “তিনি ফকীহ, আলেম এবং মুত্তাকী ছিলেন।” এতে কিছু আলেম উত্তেজিত হয়ে তাঁকে বদনাম করতে শুরু করেন। (মু'জামুল উদাবা: ১৮/৭৭)

বাগদাদের পরিবেশ প্রতিকূল দেখে ইমাম তাবারী তাঁর জন্মভূমি তাবারস্তানে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে রাফেযীদের অত্যাচারে তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসতে বাধ্য হন। (মু'জামুল উদাবা: ১৮/৮০) ইমাম তাবারীর চরিত্র হননের অভিযানে বাগদাদের একজন হানবালী আলেম আবু বকর ইবনে আবি দাউদ অগ্রণী ছিলেন। তাঁর অনুসারীরা বাগদাদের সচেতন মানুষ এবং সেখানে আগত ছাত্রদের ইমাম তাবারীর বিরুদ্ধে উসকে দিত। ইমাম তাবারী রহ. এই পরিস্থিতিতে নির্জনতা অবলম্বন করাকে প্রাধান্য দেন এবং সাধারণ মজলিসে যাতায়াত ত্যাগ করে নিজেকে বাড়িতে লেখালেখি ও সংকলনের কাজে সীমাবদ্ধ করে নেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৭) ... বাকি টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায়।

ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা এবং শাসকদের প্রতি নির্লিপ্ততা:

সরকারি সম্পর্ক এবং দুনিয়াবী মোহের লালসা থেকে তিনি অনেক দূরে ছিলেন। আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানী (রহ.) (মৃত্যু ৩৬২ হিজরি) বলেন: “ইবনে জারীর আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে কারো নিন্দার পরোয়া করতেন না। যদিও জাহেল, হিংসুক এবং ধর্মহীন লোকেরা তাকে কঠোর কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু ইলম ও দ্বীনের অধিকারীরা সর্বদা তার ইলম, ফযীলত, যুহদ ও অল্পে তুষ্টির স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার কাগজ ও কালির খরচ কেবল সেই জমির আয় থেকে আসত যা তার পিতা তাবারিস্থানে তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন।” [১]

বাগদাদের উজির আবুল খাকানী তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। উজির তাকে কাজীর পদের প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তাতেও রাজি হননি। বন্ধুরা বললেন: “এতে আপনি সওয়াব পাবেন, আপনি মৃত সুনাতগুলোকে জীবিত করতে পারবেন।” কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। বন্ধুদের প্রত্যাশা ছিল যে তিনি অন্তত “বিলায়েতে মাজালিম” (মজলুমদের ফরিয়াদ শোনার পদ) গ্রহণ করবেন। তাই পরের দিন খুব ভোরে তারা সওয়ারি নিয়ে হাজির হলেন যাতে তাকে উজিরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এতেও রাজি হলেন না এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন: “আমার তো প্রত্যাশা ছিল যে আমি যদি নিজে থেকে এমন পদের দিকে ঝুঁকে পড়তাম তবে আপনারা আমাকে বাধা দিতেন।” সঙ্গীরা লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। [২]

[১] ইবনে আসাকির এটি আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানীর ‘আত-তারীখ আল-মুয়াইয়্যাল’ থেকে উদ্ধৃত করেছেন (তারীখে দামেশক: ৫২/১৯৮, এবং দেখুন: সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৮)।

[২] ইবনে আসাকির এটি আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানীর ‘আত-তারীখ আল-মুয়াইয়্যাল’ থেকে বর্ণনা করেছেন (তারীখে দামেশক: ৫৬/২০০, এবং দেখুন: তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা লিস-সুবকী: ৩/১২৬)।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা: হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন: “আবু বকর ইবনে আবি দাউদ এবং তার সঙ্গীরা, যারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, ইবনে জারীরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতেন এবং তাকে বিদআতী হিসেবে প্রচার করেছিলেন। তারা তার সম্পর্কে বলতেন যে তিনি নিজের আকিদার ওপর একটি কিতাব লিখেছেন।” (লিসানুল মিজান: ৩/২৯৫)।

নিশাপুরের একজন আলেম এই ঘটনার পর এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি বাগদাদে এসে মুহাদ্দিস ইবনে খুজাইমাহ (সহীহ ইবনে খুজাইমাহ-এর লেখক)-এর সাথে দেখা করেন। ইবনে খুজাইমাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি কি মুহাম্মদ ইবনে জারীর থেকে রেওয়ায়েত লিখেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন: “না।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “কেন?” তিনি বললেন: “কারণ তিনি (ইবনে জারীর) সাধারণ মজলিসে উপস্থিত হন না এবং মানুষ তার কাছে যেতে বাধা দিত।” ইবনে খুজাইমাহ বললেন: “আপনি ভালো করেননি। আপনি কি তার প্রতি হিংসুকদের কথার কারণে তার থেকে রেওয়ায়েত নেয়া ছেড়ে দিয়েছেন?” আল্লামা সুবকী এই ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: “ইবনে জারীরের মর্যাদা এত উচ্চ ছিল যে তার শত্রুদের সমাবেশ তার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। কেউ তার মর্যাদাকে দাবিয়ে রাখতে পারত না। কিন্তু ইবনে জারীর নিজেই নিজের এবং নিজের মর্যাদার কথা এত বেশি উল্লেখ করতেন যে মানুষ বিরক্ত হয়ে যেত। তাই তিনি কেবল তাদের সাথেই দেখা করতে পছন্দ করতেন যারা তাকে পছন্দ করত এবং যাদের তার সুনাতের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইবনে আবি দাউদ অন্যান্য শহরবাসীদের মতো প্রকৃত অবস্থা জানতেন না এবং ইবনে জারীরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কারণে মানুষের কথায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তার সাথে দেখা করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।” (তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৩/১২৫, ১২৬)।

ইমাম তাবারীর জীবন ও রচনাবলীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আকিদার সাথে কোনো বিরোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি তার কিতাব ‘সারীহুস সুন্নাহ’-তে লিখেছেন যে এটিই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আকিদা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন: “যাঁর কথা অনুসরণ করা হয়, যাঁর সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি শামিল এবং যাঁর অনুসরণই হেদায়েত, তিনি হলেন আহমদ ইবনে হাম্বল - আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন।” (সারীহুস সুন্নাহ: ২৫)।

শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত মাসআলায় মতপার্থক্য সম্পর্কে কথা হলো, তিনি একজন শাফিঈ ফকীহ ছিলেন এবং নিজের ইলমের প্রশস্ততার কারণে তিনি মুজতাহিদ ছিলেন, তাই তার জন্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের তাকলীদ করা আবশ্যিক ছিল না। কিছু সংকীর্ণমনা মানুষের ইমাম তাবারীর ব্যক্তিত্বের ওপর অপবাদ আরোপের কারণ ছিল তার উচ্চ মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতা। সত্যের অনুসারীরা প্রতিটি যুগে এমন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ উম্মাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। বিরোধীদের শত্রুতা তার কাজের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইমাম তাবারী রহ. মুতামিদ আব্বাসীর যুগে বাগদাদে এসেছিলেন। এরপর তিনি মুতাদিদ, মুকতাবী, মুকতাদির এবং কাহিরের যুগও দেখেছেন। কিন্তু মুকতাবী ছাড়া অন্য কারো সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। [১]

মুকতাবী তাঁর ভক্ত ছিলেন। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজ করার শখ হলো, তখন তিনি একটি ওয়াকফ (ট্রাস্ট) প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন যার নিয়মকানুন যেন কোনো ফকীহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এই নিয়মকানুন নির্ধারণের জন্য ইমাম তাবারীর সেবা গ্রহণ করা হলো। তিনি ফকীহদের ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলাগুলো লিখে দিলেন। মুকতাবী খুশি হয়ে তাঁকে বড় অংকের পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। তিনি সাফ অস্বীকার করলেন। খলিফা বলে পাঠালেন: “হয়তো পুরস্কার গ্রহণ করুন অথবা আপনার কোনো প্রয়োজন বা অভাব থাকলে বলুন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ! একটি প্রয়োজন আছে। জুমার নামাজে প্রথম কাতারগুলো ছাড়া বাকি কাতারগুলোতে মানুষ নিরাপত্তার বেষ্টনী পার হওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হোক যেন তারা তাদের বাধা দেয়।” মুকতাবী তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধ ও অমুখাপেক্ষিতায় অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। [২]

একবার মুকতাবী ইলমে ফিকহের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হলো। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত রিসালা লিখে দিলেন। মুকতাবী পারিশ্রমিক হিসেবে এক হাজার দিনার পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছে অনুরোধ করা হলো যে, হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করে এরপর তা সদকা করে দিন। কিন্তু তিনি এতেও রাজি হলেন না এবং বললেন: “আপনারা ভালো জানেন যে সদকার হকদার কারা।” [৩]

মোটকথা, তাঁর সম্পর্ক ছিল মাত্র একজন খলিফার সাথে এবং তাতেও চরম পর্যায়ে নির্লিপ্ততা ও অমুখাপেক্ষিতার ছাপ প্রবল ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বর্ণনা করেন যে, একবার সালতানাতে উজির ইবনে ফুরাত তাঁর কাছে কিরাত শিখতে গেলেন। তাঁর আগে এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সবক নেওয়ার জন্য পৌঁছেছিলেন। ইমাম তাবারী রহ. সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি তোমার সবক পড়ছ না কেন?” সে উজিরের দিকে ইশারা করল (অর্থাৎ আগে তাঁর পালা)। ইমাম তাবারী বললেন: “ভাই! যখন তোমার পালা, তখন দজলা বা ফুরাত কারো পরোয়া করো না।” (এটি উজিরের দিকে ইশারা ছিল যার কুনিয়াত ছিল ইবনে ফুরাত)। [৪]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন: “এটি ইমাম তাবারীর সূক্ষ্ম রসবোধ, তাঁর সাবলীলতা ও বাগ্মিতা এবং দুনিয়াদারদের প্রতি তাঁর অনাসক্তির প্রমাণ।” [৫]

[১] মুকতাবীর সাথে সম্পর্ক ও খাতিরের কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তিনি একজন নেক চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সরকারি মাল খরচ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একবার তিনি একটি সরকারি ইমারত নির্মাণে সাতশ দিনার খরচ করেছিলেন যা খুব একটা জরুরি ছিল না। যখনই এই কথা মনে পড়ত, তিনি অনুতপ্ত হতেন এবং বলতেন: “এটি মুসলমানদের সম্পদ ছিল, আমি এমন ইমারতে খরচ করেছি যার কোনো প্রয়োজন ছিল না।” (তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৭৪)

[২] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ১২৪/৩; এবং ইবনে আসাকির এটি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ১২৪/৩; সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৭২/১৪; এবং ইবনে আসাকির এটি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন।

[৪] ইবনে আসাকির এটি তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন। (তারিখু দিমাশক: ২০১/৫২)

[৫] লিসানুল মিজান: ১০২/৫

দরবার-এ-খিলাফতে নির্মোহ উপস্থিতি:

একবার কোনো এক আব্বাসী খলিফা তাঁকে খিলাফতের প্রাসাদে তলব করলেন। দরবারে লোকজনের সমবেত হওয়ার পর উজিরের আগমন ঘটল। সবাই সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ইমাম তাবারী (রহ.)-এর অভ্যাসই ছিল যে, তিনি সম্মানের খাতিরে কারো জন্য দাঁড়াতে না; তাই তিনি বসেই রইলেন। উজির নিজের আসনে বসার পর উপস্থিতদের জিজ্ঞেস করলেন:

• “এই ব্যক্তি কে যে বসে আছে?”

উপস্থিতরা বললেন: “ইনি আবু জাফর তাবারী।”

উজির জিজ্ঞেস করলেন: “শহরে কি তাঁর কোনো ঘর আছে?”

লোকজন বলল: “হ্যাঁ, ছোট একটি।”

উজির জিজ্ঞেস করলেন: “শহরের বাইরে কি তাঁর কোনো সম্পত্তি আছে?”

লোকজন বলল: “কিছুই নেই।”

উজির জিজ্ঞেস করলেন: “সরকারের পক্ষ থেকে তিনি কত ভাতা পান?”

দরবারীরা বলল: “সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর কোনো ভাতা নির্ধারিত নেই।”

উজির এটি শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং বলতে লাগলেন:

• “তাঁর মতো ব্যক্তির এই অধিকার আছে যে, তিনি শাসকের জন্যও দাঁড়াবেন না।” [১]

আকিদা সংস্কারে তাঁর প্রচেষ্টা:

ইমাম তাবারী (রহ.) আকিদা সংস্কারের ময়দানে সর্বদা বাতিল ফিরকাগুলোর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মুতাজিলাদের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মুতাজিলাদের দাবি ছিল যে, আখিরাতে জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভ করতে পারবে না; কারণ এটি একটি অসম্ভব এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী বিষয়। ইমাম তাবারী (রহ.) তাদের খণ্ডন করে বললেন: “আমাদের আকিদা, যার ওপর আমরা আহলে সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি, তা হলো জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দিদার লাভ করবে, যেমনটি সহীহ হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।” [২]

মুতাজিলি আকিদা “খালকে কুরআন” (কুরআন সৃষ্টি)-এর খণ্ডনে তিনি স্পষ্টভাবে লেখেন: “আমাদের নিকট কুরআন মাখলুক নয়, চাই তা লেখা হোক, তিলাওয়াত করা হোক বা পড়া হোক।... যে ব্যক্তি আমাদের থেকে এর বিপরীত আকিদা বর্ণনা করবে বা আমাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে অথবা দাবি করবে যে আমরা এ ছাড়া অন্য কিছু বলি, তবে তার ওপর আল্লাহর লানত ও গজব নাজিল হোক। আল্লাহ তাকে সবার সামনে লাঞ্চিত করুন।” [৩]

মুতাজিলারা কবির গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাফির ও জাহান্নামী সাব্যস্ত করত। ইমাম তাবারী (রহ.) এ বিষয়ে বলেন:

[১] বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব: ১০/৪৬৫৮, ত. দারুল ফিকর।

[২] সারীহস সুন্নাহ, পৃ. ২০, ত. দারুল খুলাফা, কুয়েত।

[৩] সারীহস সুন্নাহ, পৃ. ১৮; বদদোয়ার শব্দগুলো এ কারণে বলেছেন যে, বিরোধীরা তাঁর দিকে ভুল আকিদা সম্বন্ধযুক্ত করছিল।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

“তারা ফাসেক এবং নাফরমান মুসলমান, আমরা তাদের জান্নাতিও বলি না, জাহান্নামিও বলি না। তাদের বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন, আবার চাইলে নিজের অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন।” [১]

মুতাযিলারা কবরে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত এবং বলত যে, যখন শরীর থেকে রুহ বের হয়ে যায়, তখন তাকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব। ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের আকিদার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন এবং বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, কবরের আজাব সত্য।” [২]

মুতাযিলারা নস-এ (কুরআন ও সুন্নাহর পাঠে) বর্ণিত আল্লাহর কিছু সিফাতে মুতাশাবিহাত যেমন: ইস্তাওয়া আলাল আরশ, আসমানে দুনিয়ায় অবতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা (তাবিল) পেশ করত এবং এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ অস্বীকার করত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুরু করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের আলেমদের অত্যন্ত সতর্ক গোষ্ঠী কোনো প্রকার তাবিল ছাড়াই এই নসগুলোর ওপর ঈমান আনার প্রবক্তা ছিলেন। এটিই ছিল ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব। তিনি যুক্তিবাদীদের নেতা জহম বিন সাফওয়ানের ওপরও নকলী (বর্ণনাভিত্তিক) ও আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিলের মাধ্যমে মুতাযিলা আকিদার মূলে এমনভাবে কুঠারাঘাত করেছেন যে, বিরোধীদের কাছে কোনো উত্তর অবশিষ্ট থাকেনি। [৩]

রাফেযীদের খণ্ডনে তাঁর প্রচেষ্টা:

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাফেযীদের বিরুদ্ধেও কোষমুক্ত তলোয়ারের মতো ছিলেন। নিজের তাফসীরে তিনি রাফেযীদের তাকিয়া আকিদার খণ্ডন করে বলেন: “আল্লাহ এই আয়াতে যে তাকিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা কেবল কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়।” [৪]

“তাহযীবুল আসার”-এ তিনি দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির (গুলু) নিন্দা করে বলেন: “চরমপন্থী রাফেযীরা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মহব্বতে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ইলাহ মানতে শুরু করেছে, কেউ তাঁকে প্রেরিত নবী হিসেবে গণ্য করেছে এবং কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা গ্রহণ করেছে।” [৫]

ইসনা আশারিয়াদের মতে, ইমাম হাসান আসকারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পুত্র মুহাম্মদ হলেন দ্বাদশ ইমাম গায়েব, যিনি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আকিদার বাস্তবতা উন্মোচন করে জানিয়েছেন যে, ইমাম হাসান আসকারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কোনো পুত্রই ছিল না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; তাই ইমামের গায়েব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। [৬]

তিনি শিয়া আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন: “আমাদের নিকট এই সবই পথভ্রষ্টতা এবং উম্মতের গণ্ডি থেকে বহিষ্কারের শামিল।” [৭]

তিনি ইসলামী আলেমদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি আব্দুল্লাহ বিন সাবার ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো সংগ্রহ করে সাবায়ী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পরবর্তী সকল ঐতিহাসিকগণ তাঁর থেকেই এই উপাদানগুলো গ্রহণ করেছেন। আজও যদি কোনো ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন সাবার অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়, তবে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির “তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক”-এর ওপর নির্ভর করা ছাড়া সে কিছুই করতে পারবে না।

[১] আল-তাবসীর ফী মাআলিমিত দ্বীন: ১৮৪, ত দারুল আসিমা

[২] আল-তাবসীর ফী মাআলিমিত দ্বীন, পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে ১৪৩

[৩] তাহযীবুল আসার: ২৮৭/৩, মুসনাদে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, মাতবা মাদানী কায়রো

[৪] আল-তাবসীর ফী মাআলিমিত দ্বীন, পৃষ্ঠা ২০৭

[৫] তাফসীরে তাবারী: সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৮

[৬] ইবনে তাইমিয়া বলেন: হাসান আসকারী নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁর কোনো উত্তরসূরি ছিল না যেমনটি মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী উল্লেখ করেছেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১২২/১, ৮৭/৪)

[৭] আল-তাবসীর ফী মাআলিমিত দ্বীন, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে ১৬৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

“ইমামত ও খিলাফত” এর বিষয়টি আহলে সুন্নাত এবং আহলে তাশাইয়ু (শিয়াদের) মধ্যে মতভেদের একটি বড় ভিত্তি। ইমাম তাবারী (রহ.) তাঁর উচ্চমানের গ্রন্থ “আত-তাবসীর ফী মাআলিম আদ-দীন”-এ এই বিষয়ে যৌক্তিক ও উদ্ধৃতিমূলক প্রমাণের মাধ্যমে এমন চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছেন যে, একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী না হয়ে থাকতে পারবেন না। [১]

খুলাফায়ে রাশেদীন (রাযি.)-এর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আত্মমর্যাদাবান ছিলেন। সূরা ফাতিহার তাফসীরে “সিরাতাল মুস্তাকীম”-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: “নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মানহাজ এবং আবু বকর, উমর ও উসমান (রাযি.)-এর মানহাজ অনুসরণ করা।” [২]

তিনি “সারীহ আস-সুন্নাহ”-তে স্পষ্টভাবে লিখেছেন: “রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)। তারপর উমর ফারুক (রাযি.)। তারপর উসমান যুন-নুরাইন (রাযি.)। তারপর আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.)।” [৩]

একবার তাঁর উপস্থিতিতে জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রাযি.)-কে হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম বলে স্বীকার করে না, তার বিধান কী? সেই আলিম বলতে লাগলেন: “সে বিদআতী।”

এতে ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) রাগান্বিত হয়ে বললেন: “শুধুমাত্র বিদআতী! তাকে তো হত্যা করা উচিত।” [৪]

ইমাম তাবারী (রহ.) দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পৈতৃক নিবাস তাবারস্তান থেকে দূরে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সেখানে রাফেযীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সরকারও তাদেরই কায়েম হয়েছিল। এদিকে বাগদাদে কিছু হাম্বলী আলিম অকারণে ইমাম তাবারী (রহ.)-কে কলঙ্কিত করার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইমাম তাবারী (রহ.) এমন পরিস্থিতিতে নিজ দেশে গিয়ে দ্বীনের খিদমত করাকে উত্তম মনে করলেন।

ফলশ্রুতিতে ২৯০ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর হয়েছিল, তিনি তাবারস্তানে চলে যান। সেখানে তিনি মানুষের আকিদা সংশোধনের জন্য হযরত আবু বকর (রাযি.) এবং হযরত উমর (রাযি.)-এর ফযীলত সম্পর্কে পুস্তিকা লিখলেন, যার ফলে সেখানেও তাঁর তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। তাবারস্তানের রাফেযী শাসক তাঁর গ্রেফতারের নির্দেশ দিল। ইমাম তাবারী (রহ.)-কে এক বুজুর্গ ব্যক্তি সময়মতো সংবাদ দিয়ে দিলেন এবং তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। শাসক সেই বুজুর্গ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক হাজার দোররা মারল।

যাই হোক, ইমাম তাবারী (রহ.) সহি-সালামতে পুনরায় বাগদাদে পৌঁছে গেলেন। [৫]

নাসিবীদের খণ্ডন:

নাসিবীরা সেই যুগে হযরত আলী (রাযি.)-এর ফযীলত সম্পর্কিত সহীহ হাদীসগুলোকেও অস্বীকার করতে শুরু করেছিল, যার মধ্যে হাদীস “মান কুনতু মাওলাহ ফা-আলীউন মাওলাহ” (আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা) হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[১] আত-তাবসীর ফী মাআলিম আদ-দীন, পৃ. ১৫৪ থেকে ১৫৯

[২] তাফসীরে তাবারী: ১৭১/১, ত. দার হিজর

[৩] সারীহ আস-সুন্নাহ, পৃ. ২৪

[৪] লিসান আল-মিযান: ১০১/৫ অর্থাৎ সে মুরতাদ ও যিন্দীক, শরয়ী আদালত তার ওপর মুরতাদের শাস্তি কার্যকর করবে। ইমাম তাবারীর পক্ষ থেকে রাফেযী মতবাদ খণ্ডনের জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ঘটনাটি ইবনে আসাকির বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যার প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন আলী আবু বকর আবজাহ আবী (মৃ. ৩৫৭ হি.) ইমাম তাবারীর ছাত্র ছিলেন।

[৫] মুজামুল উদাবা: ৭৭/১৮ ... ধারণা করা যেতে পারে যে, যখন সাহায্যকারীকে এক হাজার দোররা মারা হয়েছে, তখন ইমাম তাবারী যদি এই রাফেযীদের হাতে ধরা পড়তেন তবে হয়তো তাঁকে এর চেয়ে কম কোনো শাস্তি দেওয়া হতো না।

তারিখ উম্মাতে মুসলিমা

রাফেজিদের বিরোধিতায় হাম্বলি মুহাদ্দিস আবু বকর বিন আবি দাউদও এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ইমাম তাবারী (রহ.) এটি সহ্য করতে পারেননি যে, রাফেজিদের সাথে শত্রুতার কারণে একটি সহীহ হাদিসকে অস্বীকার করা হবে। তিনি এই হাদিসের সত্যতা প্রমাণের জন্য ‘কিতাবুল ফাদায়েল’ নামে একটি রিসালা (পুস্তিকা) লিখেন, যাতে প্রথমে খুলাফায়ে রাশেদীনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর এই হাদিসের ওপর উত্থাপিত আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। [১]

তাওহীদের প্রতিরক্ষায় ইমাম তাবারীর সত্যবাদিতা:

ইমাম তাবারী (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একনিষ্ঠ আশেক ছিলেন এবং একইভাবে তাওহীদের মাকামেও তাঁর অবস্থান ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। তিনি কখনোই এমন কিছু সহ্য করতেন না যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল। নবুওয়াত ও উলুহিয়াতের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয় এমন কোনো কথা কেউ বললে তিনি তা বরদাশত করতেন না।

একবার বাগদাদের এক ওয়ায়েজ (বক্তা) মসজিদে “عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا” আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বললেন: “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর হাবীবকে নিজের সাথে আরশে বসাবেন।”

ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি ওই ব্যক্তির এই মুখতাসুলভ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন। এরপর এই ভ্রান্ত আকিদার স্থায়ী খণ্ডনের জন্য তিনি নিজের ঘরের দরজায় এই কবিতাটি লিখে দিলেন:

سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أُنَيْسٌ ... وَلَا لَهُ فِي عَرْشِهِ جَلِيسٌ

(পবিত্র সেই সত্তা যাঁর কোনো সঙ্গী নেই এবং আরশে তাঁর কোনো সহচর নেই।)

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর এই সত্যবাদিতায় মুখ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ঘরে এত বেশি পাথর নিক্ষেপ করল যে সেখানে পাথরের স্তুপ জমে গেল। [২] কিন্তু ইমাম তাবারী (রহ.) তাঁর সত্যনিষ্ঠ কর্মকাণ্ড থেকে মোটেও পিছপা হননি।

[১] হাদিস “মান কুনতু মাওলাহ্ ফাহাযা আলীযুনে মাওলাহ্” (আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু) গাদীরে খুমের হাদিস নামে পরিচিত। এটি তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। শেখ আলবানীও এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ‘ফাদায়েলুস সাহাবা’ ও ‘মুসনাদ’-এ, ইমাম নাসাঈ ‘সুনানে কুবরা’-তে এবং ইমাম তাবারী তাঁর ‘কিতাবুল বিলায়াহ’-তে এটি বর্ণনা করেছেন। হাফেজ যাহাবীও এর বিভিন্ন সূত্রের ওপর একটি রিসালা লিখেছেন। রাফেজিরা একে তাদের ইমামতের আকিদার ভিত্তি বানিয়েছে, কিন্তু এটি দ্বারা তাদের দাবিকৃত ইমামত প্রমাণিত হয় না। ইমাম তাবারীর সমসাময়িক আবু বকর বিন আবি দাউদ এই হাদিসটি অস্বীকার করেছিলেন। ইমাম তাবারী এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে এর অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি দ্বারা রাফেজিদের আকিদা মোটেও প্রমাণিত হয় না। (শরহ মুশকিলুল আসার: ১৮০/৫, ত: আর-রিসালাহ)

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৪। হাফেজ যাহাবী বলেন: “আমি গাদীরে খুম সম্পর্কে তাঁর রিসালাটি দেখেছি, যা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি তাঁর বর্ণনার আধিক্য দেখে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৭)

[৩] এই হাদিসের প্রতিরক্ষার কারণে ইমাম তাবারীর অনেক শত্রু তৈরি হয় এবং তারা তাঁকে রাফেজি বলে অপবাদ দিতে শুরু করে। আজও ইমাম তাবারীর সমালোচনা তারাই করে যারা ইয়াজিদ ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর নামে বাড়াবাড়ি করে এবং হযরত আলী ও হুসাইন (রা.)-এর প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করে।

[৪] তাহযীরুল খাওয়াস মিন আকাদিবিল কাসাস, সুয়ুতী, পৃ. ১৬১, মাকতাবাতুল ইসলামী বৈরুত।

আকৃতি এবং অভ্যাস ও আচরণ

ইমাম তাবারী দীর্ঘকায়, পাতলা শরীর এবং শ্যামলা বর্ণের মানুষ ছিলেন। চোখ দুটি বড় এবং সুন্দর ছিল। ভাষা ছিল প্রাঞ্জল ও সাবলীল। স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। [১] তিনি অত্যন্ত হাসিখুশি এবং মার্জিত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পানাহার, পোশাক-আশাক, চালচলন এবং উঠাবসার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই ক্ষতিকারক জিনিস একেবারেই ব্যবহার করতেন না। চর্বি পরিহার করতেন। গোশত পছন্দ করতেন যা কিশমিশের সাথে রান্না করা হতো। ছাগলের দুধ, আঙুর, ডুমুর এবং খেজুর প্রিয় ছিল। তাঁর মজলিসে উপস্থিতদের সাথে অত্যন্ত মহব্বত ও স্নেহের সাথে কথা বলতেন।

কোনো বন্ধু হাদিয়া পেশ করলে তার বিনিময়ে অবশ্যই হাদিয়া পাঠাতেন। আমীর-উমারাদের দামী উপহার পছন্দ করতেন না। আমীর আবুল হাইজা তিন হাজার দিনার পাঠালে তিনি এই বলে ফেরত দেন যে, আমি এর প্রতিদান দিতে পারব না। [২]

ওফাত

৮৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন কিন্তু দাড়ি এবং মাথার চুল শেষ পর্যন্ত কালো ছিল। অসুস্থতার পর রবিবার ২৭ শাওয়াল ৩১০ হিজরিতে ইলম ও ফজিলতের এই সূর্য নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। [৩] শেষ দিনের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য: জোহরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল। পানি আনিয়ে নতুন করে অজু করলেন। সঙ্গীরা অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে বললেন: “আপনি জোহর বিলম্বিত করুন এবং আসরের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিন।” কিন্তু তিনি মানলেন না। জোহরের নামাজ নিজ ওয়াক্তে ভালোভাবে আদায় করলেন। এরপর আসরের নামাজ নিজ ওয়াক্তে উত্তম পদ্ধতিতে আদায় করলেন। [৪]

ওফাতের কিছুক্ষণ আগে তাঁর সামনে একটি রেওয়ায়েত পড়া হলো যাতে হযরত জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত একটি দোয়ার উল্লেখ ছিল। ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কলম, দোয়াত এবং কাগজ আনালেন এবং তা নকল করে নিলেন।

কেউ জিজ্ঞেস করল: “এই অবস্থায়ও আপনি লিখছেন!!”

বললেন: “মানুষের উচিত কখনো ইলম অর্জন করা না ছাড়া, যতক্ষণ না তার মৃত্যু চলে আসে।” [৫]

মৃত্যু যন্ত্রণার সময় একদল আলেম চারপাশে সমবেত ছিলেন। তাঁরা শেষ ওসিয়তের অনুরোধ করলে তিনি বললেন:

“আমি আমার কিতাবসমূহে সেই সবকিছু লিখে দিয়েছি যার ওপর অটল থাকা উচিত। সেগুলোর ওপরই আমল করো।”

এরপর নিজের চেহারা হাত বুলালেন এবং কালিমা শাহাদাত পড়তে পড়তে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। [৬]

ওফাতের ঘটনার কোনো প্রচার করা হয়নি। তবুও জানাজার নামাজে এত মানুষ হয়েছিল যে তা গণনা করা সম্ভব ছিল না। তিনি বাগদাদে নিজের ঘরেই দাফন হলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত দিনরাত মানুষ তাঁর কবরে এসে দোয়া করতে থাকত। [৭]

রাহিমাহুল্লাহ রহমাতান ওয়াসিআহ

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৮২

[২] মুজামুল বুলদান: ৮/১৮ থেকে ৮২

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৮৬

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৬ ... আখরাজাহ আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানী ফিত তারিখিল মুজাইয়্যাল বিসানাদিন মুত্তাসিল

[৫] তারিখে দামেশক: ৫২/১৯৯

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৬ ... আখরাজাহ আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানী ফিত তারিখিল মুজাইয়্যাল বিসানাদিন মুত্তাসিল

[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৬, ২৮২

বাগদাদের একজন বুজুর্গ আবু আলী বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) বলেন: আমি তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখেছি: দেখলাম তিনি খুব উত্তম ও প্রশস্ত পোশাকে আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: “আপনি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছেন?” তিনি বললেন: “খায়ের (কল্যাণ) ছাড়া কিছু দেখিনি।” জিজ্ঞেস করলাম: “মুনকার-নাকিরের সওয়ালের কী হলো?” তিনি বললেন: “খায়ের ছাড়া কিছু দেখিনি।”

আমি বললাম: “আপনার রব তো আপনার ওপর বড় মেহেরবান। আপনার রবের কাছে আমাকেও মনে রাখবেন।”

তিনি বললেন: “আবু আলী! আপনি বলছেন যে আমি আপনাকে রবের কাছে মনে রাখি, অথচ আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে আপনাকে উসিলা হিসেবে ধরি।” [১]

ইমাম তবারীর ইলমী অবদানসমূহ:

ইমাম তবারী (রহ.)-এর তাসনীফী ও তালীফী (রচনা ও সংকলন) কাজ এতো বেশি যে তা দেখে অবাক হতে হয়। ইসলামী সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল। ৩০ খণ্ডের ওপর **مشمط** এই তাফসীর “জামেউল বয়ান” নামে পরিচিত, তবে সাধারণত একে “তাফসীর তবারী” বলা হয়।

তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের জীবনীর ওপর “যায়লুল মুযায়্যাল মিন তারিখিস সাহাবা” [২] নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ পেশ করেছেন, যা পূর্বসূরীদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার প্রমাণ।

তাঁর সবচেয়ে মহান কাজ হলো সেই সুনান সংকলন যা “তাহযীবুল আসার” [৩] নামে পরিচিত। যার সম্পর্কে আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী (রহ.) বলেন:

“তিনি তাঁর কিতাব তাহযীবুল আসার সংকলন শুরু করেন যা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর সূচনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সেই বর্ণনাগুলো দিয়ে যা সহীহ সনদে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। তিনি প্রতিটি হাদীসের সনদ ও সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে বিদ্যমান ফিকহী মাসায়েল ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ ও তাঁদের দলিল উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ ও কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ‘আল-বাসীত’ নামেও একটি কিতাব শুরু করেছিলেন যার শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাত পনেরোশ পৃষ্ঠার ওপর **مشمط** ছিল।” [৪]

[১] আখরাজাহ্ ইবনে আসাকির বিল ইসনাদিল মুত্তাসিল ফী তারিখি দিমাস্ক: ৫২/২০৭-২০৮।

[২] আফসোস যে এই কিতাবটি বর্তমানে দুস্প্রাপ্য। এর মাত্র এক খণ্ড মুদ্রিত যা তারিখ-এ-তবারীর পরিশিষ্ট হিসেবে পাওয়া যায়।

[৩] এই কিতাবটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এর মাত্র ৪ খণ্ড মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাফেজ যাহাবী বলেন যে, যদি এটি পূর্ণ হতো তবে ১০০ খণ্ডে হতো। (সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৩)।

ওলামা ও ফুকাহাদের উচিত চিন্তা-ভাবনার পরিধি বিস্তৃত করার জন্য ইমাম তবারীর তাহযীবুল আসার অবশ্যই অধ্যয়ন করা। এটি ফিকহ শাস্ত্রে সেই ধরনের কাজ ছিল যা ইমাম তহাবী (রহ.) করেছিলেন এবং শরহ্ মাআনিল আসার সংকলন করেছিলেন। তবে শরহ্ মাআনিল আসার-এ বিভিন্ন ফিকহী মাসায়েলের হাদীস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে তাহযীবুল আসার-এ একজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া এতে সনদের ত্রুটি ও রিজাল (বর্ণনাকারী) নিয়ে এতো গভীর আলোচনা করা হয়েছে যেখান থেকে ইমাম তবারীর ফিকহী দূরদর্শিতার আন্দাজ করা যায়। হাদীসের সাথে সাথে ফুকাহাদের মাযহাবও বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ “তাহযীবুল আসার”কে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের সমর্থক মনে করে এর প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না, অথচ বাস্তবে তাহযীবুল আসার-এ ইমাম তবারীর ইখতিলাফ (মতভেদ)-এর ক্ষেত্রে যে বিশালতা রয়েছে তা ফুটে ওঠে। তিনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতামত উদ্ধৃত করেন। যারা হাদীস ও ইখতিলাফে মাযহাবের বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের উচিত তাহযীবুল আসার-এর বিদ্যমান খণ্ডগুলো সামনে রাখা।

[৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ২/১২০ থেকে ১২২।

তাঁর তাফসীর মহান ইমামদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। শেখ আবু হামিদ ইসফারায়িনী (যাঁকে ইবনে সালাহ চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেন) বলতেন: “যদি কেউ এই তাফসীর হাসিল করার জন্য চীন পর্যন্ত সফর করে তবে তা কোনো বড় বিষয় হবে না।” তিনি আরও বলতেন: “আল্লাহর আমার ওপর অনুগ্রহ যে আমি সর্বদা এই তাফসীর অধ্যয়ন করি এবং তা থেকে উপকৃত হই।” [১]

যখন ইমাম তাবারী এই তাফসীর সংকলন করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন: “কুরআন মাজীদের একটি তাফসীর দেখে কি তোমরা খুশি হবে?” সাথীরা জিজ্ঞেস করল: “এর কলেবর কতটুকু হবে?” তিনি বললেন: “ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা।” সাথীরা বলতে লাগল: “এটি পড়ার আগেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে।” তখন ইমাম তাবারী তাফসীরটিকে সংক্ষেপ করে তিন হাজার পৃষ্ঠায় নিয়ে আসলেন। [২]

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরও প্রকৃতপক্ষে অনেক বড়। এজন্যই শেখ আবু হামিদ ইসফারায়িনী বলতেন: “আমি চাই এর একটি সংক্ষিপ্তসার পেশ করতে যাতে প্রত্যেকের জন্য এটি থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হয়।” [৩]

ইমাম তাবারী যখন ইতিহাস লিখতে বসলেন, তখনও তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন: “হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস দেখে কি তোমরা আনন্দিত হবে না?” প্রশ্ন হলো: “এর কলেবর কতটুকু হবে?” এবারও তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠার কথা বললেন এবং সাথীরা পুনরায় ওজর পেশ করল যে এটি পড়তে পড়তে জীবন শেষ হয়ে যাবে। এটি শুনে ইমাম তাবারী বললেন: “ইন্না লিল্লাহ! হিম্মত কমে গেছে।” এরপর তিনি ইতিহাসকেও প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠায় সংকলন করেন। [৪]

তিনি ইতিহাস আখিয়ায়ে কেরাম থেকে শুরু করে ৩০২ হিজরীর ঘটনাবলী পর্যন্ত শেষ করেছেন। এতে নবুওয়াতের যুগ, খিলাফতে রাশেদা এবং বনু উমাইয়ার খিলাফত ছাড়াও বনু আব্বাসের পৌনে দুইশ বছরের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

‘তাবাকাতুল ফুকাহা’ তাঁর ফিকহী প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। এতে চার ইমামের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ইমামের মাযহাব এবং তার দলীল পেশ করা হয়েছে। এই আলোচনাগুলোতে গভীর যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক বিতর্কও করা হয়েছে। আজ এর মাত্র এক খণ্ড পাওয়া যায়, যা মুয়াম্মালাত (লেনদেন) সংক্রান্ত।

ইসলামের আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য কিতাব ‘সারীহুস সুন্নাহ’ও অধ্যয়নযোগ্য। বাতিল ফিরকাগুলোর খণ্ডনে তাঁর রিসালা ‘আত-তাবসীর ফী মাআলিমুদ্দীন’-এর প্রতিটি ছত্রও ঈমান উদ্দীপক। তাঁর রচনাবলী অনেক বেশি ছিল কিন্তু বর্তমানে মাত্র আটটির মতো অবশিষ্ট আছে। তারীখে তাবারীর ভূমিকায় ডক্টর আবুল ফজল ইব্রাহীম তাঁর ২৬টি রচনার পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লামা সুবকী লিখেছেন: “ইমাম জারীর তাবারী তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর এমনভাবে কাটিয়েছেন যে প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।” [৫]

[১] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন লিল-আদনাবী, পৃ. ৫০, ৫১।

[২] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন লিল-আদনাবী, পৃ. ৫১।

নোট: ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা তখনকার সময়ের ছিল। আজ মুদ্রিত তাফসীরে তাবারী ৩০ খণ্ডে রয়েছে, যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ হাজারের বেশি।

[৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, ৩/১৩৬।

[৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, ৩/১২৩।

[৫] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, ৩/১২৩; আখবারুল খতীব ফী তারীখে বাগদাদ বি-ইসনাদিহি।

ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রহ.

সেই সকল প্রাজ্ঞ আলেমদের মধ্যে ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ আত-তাহাবী রহ.-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ২৩৯ হিজরিতে মিশরের একটি গ্রাম “তাহা”-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত শাফেয়ী মুহাদ্দিস ইবরাহিম মুযানী রহ.-এর ভাগ্নে ছিলেন এবং তাঁর কাছেই পড়তেন। একদিন তিনি (মুযানী) রাগান্বিত হয়ে বলে ফেললেন: “তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।”

এতে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি মিশরের কাজী আহমদ বিন আবু ইমরান রহ.-এর দরসে চলে যান। ধীরে ধীরে তিনি হানাফী আলেমদের চিন্তা ও গবেষণায় প্রভাবিত হয়ে হানাফী ফিকহের অনুসারী হয়ে যান এবং এতে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, নিজ যুগে হানাফীদের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। যখন তাঁকে মিশরের কাজী নিযুক্ত করা হয়, তখন তাঁর বয়স আশি বছরের কিছু বেশি ছিল। ৩২১ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

ইমাম তাহাবী রহ.-এর প্রচুর রচনা রয়েছে যার মধ্যে ‘শরহু মাআনিল আসার’, ‘শরহু মুশকিলিল আসার’, ‘ইখতিলাফুল ফুকাহা’, ‘আল-মুখতাসার ফিল ফিকহ’, ‘আহকামুল কুরআন’ এবং ‘আল-ওয়াসায়্য’ প্রসিদ্ধ। হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন:

“যে ব্যক্তি এই ইমামের রচনাবলি অধ্যয়ন করবে, সে তাঁর ইলমী মাকাম এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততার প্রবক্তা হয়ে যাবে।” [১]

ইলমে হাদিসে তাঁর রচনা ‘শরহু মাআনিল আসার’ সমস্ত হাদিস গ্রন্থের মধ্যে এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোকে আলাদাভাবে পেশ করেন এবং শেষে নিজের “নজর” (গবেষণা) পেশ করে প্রমাণ করেন যে, হানাফী ফিকহ আকল (যুক্তি), নকল (বর্ণনা) এবং শরীয়তের মূলনীতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম তাহাবী রহ.-এর একটি অনেক বড় কীর্তি হলো তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত মাযহাবের চিন্তাধারার আকিদা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ মতন (মূল পাঠ) সংকলন করেছেন যা “আল-আকিদাতুত তাহাবিয়াহ” নামে প্রসিদ্ধ। আজ পর্যন্ত একে আহলে সুন্নাতের “শিরোনাম” হিসেবে গণ্য করা হয়; কারণ এটি এমন এক উচ্চমানের মুজতাহিদের সংকলিত মতন যার শ্রেষ্ঠত্ব, ইলমী মর্যাদা এবং আমানতদারিতার বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। ইমাম তাহাবী রহ. এই মতন লিখে ইসলামী আকিদা রক্ষার জন্য এমন এক মূল্যবান কাজ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত আকিদার আলোচনায় রেফারেন্স দেওয়ার জন্য “আল-আকিদাতুত তাহাবিয়াহ”-কে সবার আগে পেশ করা হয়।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ.

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম তাবারী এবং ইমাম তাহাবী রহ.-এর কাজের পর উম্মাহর এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি আধুনিক মনমানসিকতাকে সামনে রেখে নতুন নতুন সংশয় ও সন্দেহ দূর করবেন। যেহেতু মুতাজিলা আলেমরা যুক্তিনির্ভর দলিলের মাধ্যমে আলোচনা করতেন, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণ যুক্তিনির্ভর আলোচনার পদ্ধতির দিকে মনোযোগ দেননি, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ছিল যে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসদের দলিল দুর্বল। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য এমন এক আলেমের প্রয়োজন ছিল যিনি ইলম, প্রজ্ঞা, আকল, ভাষা এবং মানসিক স্তরের দিক থেকে সময়ের চেয়ে অগ্রগামী হবেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/২৭-৩০।

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা - তৃতীয় খণ্ড

এমন সময়ে আল্লাহ ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহ (২৬০ হিজরি - ৩২৪ হিজরি)-কে সত্যপন্থী উলামাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দাঁড় করালেন। তিনি হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশধর ছিলেন। প্রথমে তিনি একজন বিখ্যাত মুতাজিলা আলেম ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের সাথে বিতর্ক করতে থাকেন। তাকে মুতাজিলাদের মুখপত্র মনে করা হতো। কিন্তু বিতর্ক করতে করতে তিনি অনুভব করতে শুরু করেন যে, এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগুলো কেবল মেধা প্রদর্শনের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবতা সেটাই যা ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ বলেন এবং যা সাহায্যে কেরামের মাযহাব ছিল। তিনি কিছু দিন চিন্তা-ভাবনায় অতিবাহিত করেন এবং তারপর একদিন জনসমক্ষে মুতাজিলা আকিদা থেকে তওবা করার ঘোষণা দেন। এরপর তার জীবন সত্যপন্থী উলামাদের মাযহাব প্রচারের জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

তিনি মুতাজিলাদের উত্তেজিত করা বা তাদের তুচ্ছজ্ঞান করার পরিবর্তে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের নিজের কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন। এর জন্য তিনি মুতাজিলা ও মুহাদ্দিসদের মাঝে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুতাজিলাদের মতো আকল বা বুদ্ধিকে শেষ কথা হিসেবে মেনে নেননি, আবার ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিকে অকেজো সাব্যস্ত করে আলোচিত আকিদাগত বিষয়ে নীরবতা ও বিরত থাকাকে ওয়াজিব বলেননি। তার বক্তব্য ছিল যে, সাধারণ মানুষের সাথে যেমন সাধারণের ভাষায় কথা বলা জরুরি, তেমনি বুদ্ধিমানদের সাথে তাদের ভাষা ও পরিভাষায় বিতর্ক করা আবশ্যিক।

তিনি বিতর্ক, আলোচনা এবং তার লেখনীর মাধ্যমে আহলে সুন্নাতের আকিদাকে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির সাহায্যে স্পষ্ট করেন এবং বাতিল ফেরকাগুলোর প্রতিটি মতবাদকে তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় এবং তাদেরই স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে ভুল প্রমাণ করেন। আকিদা প্রমাণের এই বুদ্ধিবৃত্তিক, যৌক্তিক ও দার্শনিক পদ্ধতিকে ‘ইলমে কালাম’ বলা হয় এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবুল হাসান আশআরি। তার প্রচেষ্টাসমূহ মুতাজিলাদের পিছু হটতে বাধ্য করে এবং সত্যপন্থীদের হীনম্মন্যতা দূর করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দেয়। আকিদা, ইলমে কালাম এবং অন্যান্য দ্বীনি বিষয়ে আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহ-এর কিতাবের সংখ্যা আড়াইশ পর্যন্ত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে ‘আল-ইবানা’, ‘রিসালা ইলা আহলিস সাগর’ এবং ‘মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন’ আজও বিদ্যমান রয়েছে এবং নিজ লেখকের ইলমি শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার যুক্তিগুলোর জবাব আজ পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহ ৩২৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উলামায়ে কেরাম তাকে এই যুগের সুন্নাতের রক্ষক হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবু বকর ইসমাইলি দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ-এর পর তারই নাম উল্লেখ করেছেন। আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহ-এর পদ্ধতিতে আহলে সুন্নাতের আকিদার ওকালতি বা প্রতিনিধিত্বকারীদের ‘আশায়েরা’ বলা হয়। তিনি নিজে শাফেয়ি ফিকহের অনুসারী ছিলেন, তাই শাফেয়ি উলামা, মুতাকাল্লিম ও মুনাজিরগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারই অনুসরণ করেছেন। এই কারণেই আজ পর্যন্ত শাফেয়িদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আকিদাগত ও উসুলি দিক থেকে আশআরি ধারার অনুসারী হয়ে আসছে। যেহেতু আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহ ইসলামি বিশ্বের কেন্দ্র বাগদাদে কাজ করেছিলেন এবং মুতাজিলাদের সাথে সরাসরি মোকাবিলা করেছিলেন, তাই ইসলামি বিশ্বে তার ইলমে কালাম অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৮৫ থেকে ৯০, আবুল হাসান আল-আশআরি - শায়খ হাম্মাদ আনসারি: ৫ থেকে ২১, তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি: ৫৩১ থেকে ১২০, তারিখ-ই দাওয়াত ওয়া আজিমাত - মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী: ১/১০৩ থেকে ১১৬।

ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী রহ.

আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর পর আকিদা রক্ষার জন্য বুক পেতে দেওয়া আলেমদের মধ্যে মধ্য এশিয়ার আবু মনসুর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মাতুরিদী (মৃত্যু ৩৩৩ হি.) সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি সমরকন্দের একটি মহল্লা ‘মাতুরিদ’-এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের একজন মহান আলেম এবং অতুলনীয় তর্কিক ছিলেন। মধ্য এশিয়া ও খোরাসানে মনকুলাত (বর্ণিত জ্ঞান) ও মাকুলাত (যৌক্তিক জ্ঞান)-এ তাঁর মতো সমান পারদর্শী আর কোনো আলেম ছিল না। বাতিল ফেরকাগুলো তাঁর মুখোমুখি হতে ভয় পেত। তাঁর আলোচনা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, অকাট্য, যুক্তিপূর্ণ এবং প্রভাবশালী। তিনি অসংখ্য বিতর্ক ও আলোচনায় মুতাজিলা, রাফেজি এবং কারামাতি তর্কিকদের নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

তিনি অত্যন্ত মধ্যপন্থী মেজাজের মানুষ ছিলেন এবং সঠিক আকিদার জন্য সেই সব দলিলই পছন্দ করতেন যা প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ও ওজনদার। মুতাজিলাদের বিরোধিতার কারণে আবুল হাসান আশআরী (রহ.)-এর বক্তব্যে কিছু কঠোরতা চলে এসেছিল এবং তাঁর অনুসারীরা ওকালতি করতে গিয়ে বিষয়টিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবু মনসুর মাতুরিদী (রহ.) ইলমে কালাম থেকে সেই সব কম ওজনদার ও অতিরিক্ত বিষয়গুলো বের করে দিয়েছিলেন যা মূলত মুতাজিলাদের বিরোধিতার কারণে এর অংশ ও মৌলিক ভিত্তি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আহলে সুন্নাতের আকিদার সপক্ষে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুন্দর পদ্ধতিতে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। বিতর্ক ছাড়াও তিনি বাতিল আকিদা খণ্ডনে মহান তালিফী (রচনা) কাজ করেছেন। যার মধ্যে ‘কিতাবুত তাওহীদ’, ‘আর-রাদ্দু আলাল কারামিতা’, ‘আওহামুল মুতাজিলা’, ‘তাওয়ীলাতু আহলিস সুন্নাহ’, ‘তাওয়ীলাতুল কুরআন’, ‘কিতাবুল জাদাল’ এবং ‘মাআখিজুশ শারায়ে’ প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রিসালা ‘আল-ফিকহুল আকবার’-এর ব্যাখ্যাও লিখেছেন। [১]

‘কিতাবুত তাওহীদ’ তাঁর ইলমী প্রতিভা, যৌক্তিক জ্ঞানে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এবং ইসলামী ফেরকা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা সেই সব ধারণা ও কল্পনা থেকে উর্ধ্ব যাতে নাস্তিক, মূর্তিপূজারী, অগ্নিপূজক এবং খ্রিস্টানরা লিপ্ত রয়েছে। একইভাবে এতে মুতাজিলা ও কাদারিয়াদের চিন্তাধারাও খণ্ডন করা হয়েছে। ইবনে রাওয়ান্দির মতো দার্শনিকদের চিন্তাধারার অসারতাও এতে উন্মোচিত হয়েছে। [২]

‘তাওয়ীলাতুল কুরআন’ তার বিষয়ের ওপর একটি অনন্য রচনা, যা থেকে তাঁর কুরআনী প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শিতা, ইলমী প্রশস্ততা এবং যুক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতির আন্দাজ করা যায়। [৩]

আবু মনসুর মাতুরিদী (রহ.) ৩৩৩ হিজরিতে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন। [৪] তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং মধ্য এশিয়া, খোরাসান ও হিন্দুস্তানে ফিকহ-এ হানাফী মাযহাবই প্রচলিত ছিল; তাই তাঁর ইলমে কালাম হানাফীদের মধ্যে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। আজও হানাফীরা আকিদাগত ও উসুলী দিক থেকে ‘মাতুরিদী’ নামে পরিচিত। [৫]

[১] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ: ১৩০/২; আল-আলাম যিরিকলি, ১৯/৭।

[২] এই বইটি ডক্টর ফাতহুল্লাহ খুলাইফের তাহকীকসহ দারুল জামিআতিল মিসরিয়্যাহ ইস্কান্দারিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

[৩] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ: ১৩০/২।

[৪] আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ: ৫৬২/১।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — তৃতীয় খণ্ড

মাতুরিদি ও আশআরিদের মতপার্থক্য এক যুগে অত্যন্ত আলোচিত বিষয় ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন সমস্ত পয়েন্ট যাতে এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা ত্রিশটির বেশি নয় এবং গবেষকদের মতে এই মতপার্থক্যও আকিদাগত নয়, বরং তাদের দলিল পেশ করার পদ্ধতির ওপর; এজন্য একে শাব্দিক মতপার্থক্য বলাই সমীচীন।

ফাযায়েলে সাহাবার ওপর কতিপয় উলামার প্রচেষ্টা

এই যুগে উলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর সংকলনের কাজও শুরু করেন। শামী মুহাদ্দিস খাইসামা বিন সুলাইমান (২৫০হি.-৩৩৩হি.) “ফাযায়েলে সাহাবা” রচনা করেন। [১]

বাগদাদের একজন মুহাদ্দিস ইবনে হুবব বুখারী (২৬২হি.-৩৫০হি.) “ফাযায়েলে আলী” শিরোনামে একটি রিসালা লেখেন। [২] আর একজন আলেম আব্দুল ওয়াহিদ বাগদাদী (২৬১হি.-৩৩৫হি.) “জুয ফাযায়েলে মুয়াবিয়া” সংকলন করেন। [৩] এই বিষয়ের ওপর এটিই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা; তাই আব্দুল ওয়াহিদ বাগদাদী তার দরসে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে এই রিসালাটি পড়াতেন। [৪]

ইলমে হাদিসের খিদমত, আবু ইয়াল্লা মাওসিলি

হাদিসের ওপরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। আবু ইয়াল্লা মাওসিলি (২১১হি.-৩০৭হি.) তেরো খণ্ডে “মুসনাদে আবু ইয়াল্লা” সংকলন করেন, যা সমস্ত ইলমি মহলে সমাদৃত হয়েছে। [৫]

ইমাম তাবারানি

ফিলিস্তিনের তাবারিয়া শহরের সাথে সম্পর্কযুক্ত শামী মুহাদ্দিস আবুল কাসিম তাবারানি (২৬০হি.-৩৬০হি.) “আল-মু’জামুল কাবীর”, “আল-মু’জামুল আওসাত” এবং “আল-মু’জামুস সাগীর”-এর মতো হাদিসের মূল্যবান ভাণ্ডার পেশ করেন।

ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়ার কীর্তিসমূহ

কিছু উলামায়ে কেরাম খিলাফতের দরবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং চেষ্টা করতেন যেন সেখানে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান জীবিত থাকে। তাদের মধ্যে শায়খ ইবনে আবিদ দুনিয়া বাগদাদী (মৃ. ২৮১হি.)-এর নাম তালিকার শীর্ষে। তিনি বাগদাদের একজন প্রখ্যাত ওয়ায়েজ, সংস্কারক এবং লেখক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১৬৪টি বই লিখেছেন যার অধিকাংশ আজও বিদ্যমান।

এই বইগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাপকতা। এর পাশাপাশি এগুলো সহজবোধ্যও। সমাজের মন্দ কাজের ওপর তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; তাই তিনি আলাদা আলাদা মন্দ কাজের ওপর পৃথক পৃথক সংকলন পেশ করেছেন। যেমন গীবতের নিন্দা...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৪১৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৫২৪

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৫১০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/১৭৪

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১১৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এতে ‘যম্মুল গীবাহ’, মিথ্যার বিরুদ্ধে ‘যম্মুল কিযব’, নেশার অপকারিতা সম্পর্কে ‘যম্মুল মুসকির’ এবং গান-বাজনার কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ‘যম্মুল মালাহী’ লিখেছেন। একইভাবে রমজানের সওয়াব ও প্রতিদানের ওপর ‘ফাযায়েলে রমজান’, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ‘সিফাতুল জান্নাহ’, নৈতিকতা বিষয়ে ‘মুদারাতুন নাস’ ও ‘মাকারিমুল আখলাক’ এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্ক করার জন্য ‘মাকাইদুশ শয়তান’ লিখেছেন। প্রতিটি কিতাবই নিজ নিজ স্থানে অতুলনীয়।

ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ.) তাঁর ইলমি, আমলি এবং আদবি গুণাবলির কারণে প্রতিটি মহলে সম্মানিত ছিলেন। রাজদরবারেও তিনি এতটাই শ্রদ্ধেয় ছিলেন যে, খলিফাদের সন্তানদের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুতাদিদ এবং মুকতাফির মতো খলিফারা তাঁর তত্ত্বাবধানেই বেড়ে উঠেছেন। [১]

ইবনুল আশ্বারী (রহ.)

বাগদাদের বিখ্যাত আলেম আবু বকর ইবনুল আশ্বারী (রহ.) (২৭১ হি. - ৩২৮ হি.)-এর নামও বিস্মৃত হওয়া যায় না। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদও ছিলেন। কুরআন মাজীদেব শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের জন্য তিনি কাব্য ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিন লক্ষ উদাহরণ মুখস্থ রেখেছিলেন। ‘আল-ঈযাহ ফিল ওয়াকফি ওয়াল ইবতিদা ফি কিতাবিল্লাহ’ এবং ‘আজায়িবু উলুমিল কুরআন’ থেকে তাঁর ইলমি মর্যাদার অনুমান করা যায়। তিনি খলিফা রাযী বিল্লাহর প্রাসাদে শাহজাদাদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। [২]

আলী বিন ঈসা আল-জাররাহ, আব্বাসীয় খিলাফতের উজির:

এই আলেমদের মধ্যে আলী বিন ঈসা আল-জাররাহ (রহ.)-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর মর্যাদা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি মুকতাদির আব্বাসী এবং কাহের আব্বাসীর শাসনামলে উজির নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ৯০ বছর জীবন লাভ করেন এবং খলিফা মুত্তাকী লিল্লাহর যুগে ৩৩৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন যে, উজিরদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা ছিল তেমন, যেমন খলিফাদের মধ্যে হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর ছিল। [৩]

এই মহান ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতির মোড় ঘুরাতে পারেনি, তবে এর প্রভাব অবশ্যই ছিল যে, পরবর্তী দশকগুলোর বিপজ্জনক আকিদাগত ও তাত্ত্বিক ঢেউয়ের মধ্যে শাসক পরিবার তাসাইয়ু, ইতিযাল এবং নাসিবিয়াত-এ লিপ্ত হওয়া থেকে অনেকখানি সুরক্ষিত ছিল।

[১] তারিখ বাগদাদ: ১০/৮৯ থেকে ৯১, তাবা আল-ইলমিয়াহ; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/৩৯৭ থেকে ৪০৪, তাবা আর-রিসালাহ।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ৪/৩৪১ থেকে ৩৪২, তাবা দার সাদির।

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/৪৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সুফিয়ায়ে কেরাম

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (২২০ হিজরী - ২৯৭ হিজরী)

ইসলামী ইতিহাসের এই প্রখ্যাত সুফি ২২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নাহাওয়ান্দ। তিনি তাঁর মামা সিররি সাকতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট হাদীস এবং আবু সাওর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন বিশ বছর, তখন তিনি আবু সাওর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মজলিসে ফতোয়া প্রদানের আসনে বসেন। তবে শীঘ্রই তাঁর ঝাঁক সুলুক ও ইহসানের দিকে ধাবিত হয়। সিররি সাকতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও একজন বড় আরিফ ছিলেন। জুনাইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি শৈশব থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টির প্রভাব এমন ছিল যে, মারেফাতের নূর সেই সময় থেকেই তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিল এবং মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়েও তা প্রকাশ পেত। তাঁর বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি মামার ওয়াজ মাহফিলের সামনে খেলছিলেন; সেখানে ‘শুকর’ (কৃতজ্ঞতা) বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এমতাবস্থায় হযরত সিররি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন:

“বৎস! বলো তো শুকর-এর অর্থ কী?”

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: “মানুষ আল্লাহর নেয়ামত লাভ করে তাঁর নাফরমানি না করা।”

ইনিই ছিলেন জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি বড় হয়ে সেই যুগের অন্যান্য প্রখ্যাত মাশায়েখদের থেকেও ফয়েজ হাসিল করেন এবং জামেউল কামালত হয়ে ওঠেন। সুফি হওয়ার পর তিনি সাধারণ দরবেশদের মতো জীবিকা নির্বাহ ত্যাগ করেননি, বরং বাজারে তাঁর একটি দোকান ছিল যেখানে তিনি বসতেন। তবে সেখানেও প্রতিদিন এক হাজার তসবিহ এবং তিনশ রাকাত নফল পড়ার নিয়ম ছিল। [১]

প্রথমে তিনি ওয়াজ ও নসিহত করা থেকে বিরত থাকতেন এবং নিজেকে এর যোগ্য মনে করতেন না। একবার জুমার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিয়ারত নসিব হলো। নবীজী নির্দেশ দিলেন: “মানুষের মজলিসে ওয়াজ করো।”

পরের দিন তিনি যখন জামে মসজিদে ওয়াজ করার জন্য বসলেন, তখন চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল এবং মানুষের ঢল নামতে শুরু করল। প্রথম দিনের ওয়াজেই একজন খ্রিস্টান যুবক ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো। [২] এরপর বাগদাদে তাঁর ওয়াজ মাহফিল যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা তাঁর আগে আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। আল্লাহ তাঁর জবানে এক বিশেষ প্রভাব দান করেছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান যখন হৃদয়ের আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে মিশে তাঁর জবান দিয়ে বের হতো, তখন মারেফাতের নদী বইতে শুরু করত।

[১] সিয়র আলামুন নুবালা: ১৪/৬৬, ৬৮

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ১/৩৭৩, ৩৭৪

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই যুগে কিছু সুফী বুজুর্গের অবস্থা ও গুণাবলির খ্যাতি তাসাউফ সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি করেছিল যে, এটি শরীয়ত থেকে আলাদা কিছু। জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও এমন তাসাউফের প্রবক্তা ছিলেন না যা শরীয়তের পরিপন্থী। এজন্য তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন: “আমাদের এই ইলমের ভিত্তি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।”

এই যুগের এক ব্যক্তির বক্তব্য হলো:

“আমি বাগদাদে জুনায়েদকে দেখেছি, আমার চোখ তাঁর মতো কোনো ব্যক্তিত্ব দেখেনি। দার্শনিকরা তাঁর সূক্ষ্ম কথাগুলো নকল করতে আসতেন এবং মৃতকাল্লিমরা নিজেদের ইলমকে প্রশস্ত করার জন্য তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন। তাঁর কথা প্রত্যেকের ইলম ও বুকের স্তর থেকে আলাদা অনুভূত হতো।”

সময়ের পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন শহরের অবস্থার ওপর তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল, সেই অনুযায়ী তিনি মানুষের সাথে কথা বলতেন। একবার বললেন: “বাগদাদবাসী দাবি ও বাগ্মিতায় অভ্যস্ত। খোরাসানের মানুষ উচ্চ হৃদয়ের ও অনুগ্রহশীল। বসরার মানুষ দুনিয়াবিমুখ ও অল্পে তুষ্ট। শামের মানুষ ধৈর্যশীল ও শান্তিপ্ৰিয়। হিজাজের মানুষ ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর দিকে মনোযোগী।”

একইভাবে তিনি দরবেশদের দাবি এবং মারেফাত প্রকাশের ওপর ভিত্তি করা অবস্থার প্রবক্তা ছিলেন না। বলতেন:

“আমরা তাসাউফ তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অর্জন করিনি, বরং ক্ষুধা, দুনিয়া ত্যাগ এবং প্রিয় বস্তুসমূহ বর্জনের মাধ্যমে শিখেছি।”

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি সাধারণত সুফীদের কঠোর সমালোচনা করেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা উল্লেখ করার পর লেখেন: “জুনায়েদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ইলম ও আধ্যাত্মিক অবস্থায় জুনায়েদের সমকক্ষ আর কে আছে?” [১]

২৯৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: “সেই ওয়াজ ও মারেফাত সব বিলীন হয়ে গেছে। কেবল সেই কয়েক রাকাত কাজে এসেছে যা আমরা তাহাজ্জুদের সময় পড়তাম।” [২]

শেখ আবু বকর শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (২৪৭-৩৩৪ হিজরী)

শেখ আবু বকর শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মালিকী মাযহাবের আলেম এবং আবেদ ও যাহেদ বুজুর্গ ছিলেন। তিনি সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা সমরকন্দের নিকটবর্তী ‘উশরুশনা’র একটি জনপদ ‘শিবলিয়া’র অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিশ বছর পর্যন্ত হাদিস এবং বিশ বছর পর্যন্ত ইলমে ফিকহ অর্জন করেন।

তাঁর পিতা খিলাফতের দরবারে হিজাবত (দ্বাররক্ষী) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হিসেবে তিনি অনেক বড় অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। পিতার পর শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি খলিফা মুতাদিদ-এর ভাই মুওয়াফফাক-এর হাজিব (দ্বাররক্ষী) নিযুক্ত হন। কিন্তু যখন বাগদাদের বিখ্যাত বুজুর্গ খায়ের বিন আব্দুল্লাহ আন-নাসসাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩২২ হিজরী)-এর মজলিসে বসলেন, তখন দুনিয়া থেকে মন উঠে গেল এবং সরকারি পদ ত্যাগ করে আউলিয়াদের দলে शामिल হলেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/৬৮ থেকে ৭০।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ১/৩৭৪।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে নগদ অর্থ পেয়েছিলেন তা ছিল ৬০ হাজার দিনার (পনেরো কোটি রুপি), এ ছাড়াও ছিল স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু ধীরে ধীরে এ সবকিছুই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন এবং নিজে দারিদ্র্য ও অনাহারের জীবন বেছে নেন এবং বাগদাদে ইলম ও মারেফাতের মজলিস কায়েম করেন।

হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কঠোর মুজাহাদা ও রিয়াজতে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক সময় তাঁর ওপর হাল প্রবল হয়ে যেত এবং তিনি হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন; এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষ তাঁর অবস্থা বুঝতে পারত না।

তা সত্ত্বেও তিনি শরীয়ত ও সুন্নতের পুরোপুরি অনুসারী ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাগদাদে সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি বলেছিলেন: “আমার ওপর কারো এক দিরহাম ঋণ রয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত পাওনাদারের পক্ষ থেকে হাজার হাজার দিরহাম সদকা করেছি, কিন্তু তার বোঝা এখনো হৃদয়ে রয়ে গেছে।”

৩৩৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। শেষ মুহূর্তেও তাঁর সালাতের কথা স্মরণে ছিল। তিনি তাঁর খাস খাদেম আবু বকর দিনওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ওজু করানোর কথা বলেন। তিনি দাড়িতে খিলাল করাতে ভুলে গিয়েছিলেন। এদিকে হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; এই অবস্থায় তিনি আবু বকর দিনওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাত ধরে নিজের দাড়িতে প্রবেশ করালেন যাতে খিলাল করিয়ে দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় হযরত শিবলী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রুহ পরলোকগমন করে।

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এই মহান ব্যক্তিদের ওপর। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একটি সুন্নত ত্যাগ করাও তিনি পছন্দ করেননি [১]।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৩৬৯; তাবাকাতুল আউলিয়া: ১/৩৪ থেকে ৩৯; আল-আলাম যিরিকলি: ২/৩৭১।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বাগদাদ খিলাফতের পতন

মধ্যযুগ

বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্য

বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর দখল থেকে আল-কায়িমের পুনরায় সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত
(৩৩৪ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি)

১১৬ বছর

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

এখন আমরা প্রায় সোয়া শতাব্দী ব্যাপী সেই যুগটি অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি, যাতে আন্দালুস ব্যতীত প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বাতিল ফেরকাগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকৃত ইসলামের ভিত্তি উপড়ে ফেলে বাতিল আকিদার শিকড় বিস্তার করা হয়েছিল। কাল্পনিক কথাবার্তা, ধোঁকাবাজি এবং মনগড়া বর্ণনা ও কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নতুন ধর্মগুলোকে তথাকথিত ইলমি ভিত্তি প্রদান করা হয়েছিল। এভাবে ইসলামের মধ্যে এমন গভীর ফাটল সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই চরম দুঃখজনক বিপ্লবে তিনটি দলের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি:

- ১. বনু বুওয়াইহ
- ২. কারামিতা
- ৩. বনু উবাইদ

কারামিতা এবং বনু উবাইদ সম্পর্কে কিছু অবস্থা আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পড়েছি, যার সারকথা হলো হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাদের আবির্ভাব ঘটে এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ বনু উবাইদ আফ্রিকা এবং কারামিতা হিজাজ ও সিরিয়ার ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছিল। এই উভয় দলের বিস্তারিত অবস্থা আমরা সামনে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করব। এখানে আমাদের মনোযোগ মূলত বনু বুওয়াইহ-এর দিকে থাকবে; কারণ এটিই ছিল সেই দল যারা ইসলামের কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে রেখেছিল এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় এই সোয়া শতাব্দীতে ইরান ও খোরাসানে ভ্রান্ত আকিদা এমনভাবে প্রসার লাভ করেছিল যে আজ পর্যন্ত সেই অঞ্চলে এর প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

কুহিস্তান দাইলামের রহস্যময় কাহিনী:

মুসলিম বিশ্বের ওপর এই বিপদের উৎস উত্তর ইরানের অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল দাইলামের সাথে গিয়ে মিলেছে। পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে এই বিষয়টি সামনে এসেছে যে, অধিকাংশ বিদ্রোহের আন্দোলনের পেছনে পর্দার আড়ালে চরমপন্থী শিয়াদের হাত ছিল। এই ধরনের কত মানুষ উমাইয়া ও আব্বাসীয় সরকারের ধরপাকড় থেকে বাঁচতে এই পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে সরকারি বাহিনীর পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন ছিল, ক্রমাগত বসতি স্থাপন করতে থাকে। [১]

জাইদি শিয়াদের ধর্ম প্রচার:

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাইদি শিয়াদের একজন নেতা হাসান বিন জাইদ আলভী উত্তর ইরানের তাবারিস্তান জেলায় নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেন যা ‘দাওলাতে জাইদিয়া তালিবিয়া’ নামে পরিচিত। [২] হাসান বিন জাইদের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার ভাই মুহাম্মদ বিন জাইদ, কিন্তু ২৮৭ হিজরিতে খোরাসান দখলের চেষ্টার সময় তিনি সামানি শাসক ইসমাইল বিন আহমদের মোকাবিলায় নিহত হন। অন্যদিকে এই পরিবারের সদস্যরা দাইলামের পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করেন, যাদের মধ্যে হাসান বিন আলী আল-উতরুশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ২৮৭ হিজরি, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩৭।

[২] মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ব্যক্তিবর্গ রাফেজি ছিলেন না বরং রাফেজিদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। (আস-সাইফুল মাসলুল লিল মাসকি, পৃষ্ঠা ৪৪০)

নাম উল্লেখযোগ্য। তারা স্থানীয় লোকদের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে এখানে শিয়াদের বেশ শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল যা একটি দুর্বল দেশকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট ছিল। উত্তর ইরানের তাবারিস্তান, জুরজান এবং আস্তারাবাদ জেলা পর্যন্ত তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে আব্বাসীয় খিলাফত ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। [১]

দাইলামি আমিরদের উত্থান:

ওদিকে শিয়া মতবাদ গ্রহণকারী দাইলামি সরদাররা, যারা জাইদিয়া রাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তা ছিল, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের জাইদি নেতাদের হটিয়ে নিজেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। দাইলামিরা ৩১৬ হিজরিতে জাইদি প্রধান হাসান বিন কাসিম আলভিকে হত্যা করে তার এলাকাও দখল করে নেয়। দাইলামিদের মেজাজ অত্যন্ত উগ্র ছিল; তাই তারা জাইদিয়া থেকে জাবর ও রাফযের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আব্বাসীয় খিলাফতকে দুর্বল দেখে তারা কুহিস্তান-এ-দাইলাম থেকে বের হয়ে খোরাসান এবং ইরান ও ইরাকের সমতল ভূমিতে নেমে আসে এবং বিভিন্ন এলাকা জয় করতে থাকে। এই সময়ে এই দাইলামি সরদাররা, যারা আলাদা আলাদা এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা নিজেদের মধ্যেও লড়তে থাকে। এই সরদারদের মধ্যে আসফার বিন শিরওয়াইহ, আশার বিন শিরওয়াইহ, মাকান এবং আলী খুরশিদ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক যুদ্ধে প্রধান মারদাভিজ সবার ওপর বিজয়ী হয়। [২]

বনু বুওয়াইহ-এর আবির্ভাব:

দাইলামি কর্মকর্তাদের মধ্যে তিন ভাই: আলী, হাসান এবং আহমদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের পিতা বুওয়াইহ একজন দরিদ্র জেলে ছিল। দারিদ্র্যের অবস্থা এমন ছিল যে শুরুতে সে তার তিন ছেলেকে জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়ানোর কাজে লাগিয়েছিল। তবে এই তিন ছেলেই খুব চতুর ছিল; তাই তারা মারদাভিজের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং উন্নতি করতে করতে বড় কর্মকর্তা হয়ে ওঠে।

যখন মারদাভিজ পারস্য দখল করল, তখন আলী বিন বুওয়াইহ এবং তার ভাইয়েরা এই অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তাই মারদাভিজ তাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পরপরই আলী বিন বুওয়াইহ মারদাভিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং আররাজান ও অন্যান্য এলাকা নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এভাবে আলী বিন বুওয়াইহ পারস্যে ‘বুওয়াইহিয়া রাষ্ট্র’-এর ভিত্তি স্থাপন করে।

কয়েক বছরের মধ্যে বুওয়াইহিয়া রাষ্ট্র আব্বাসীয় খিলাফতের ওপরও বিজয়ী হয়ে যায়। এর সাথে সাথে বুওয়াইহিয়ারা নিজেদের আকিদা মজবুত করতে এবং নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য নিজেদের বংশলতিকা ইরানের প্রাচীন রাজাদের সাথে যুক্ত করে নেয়, যা ছিল একটি সফল রাজনৈতিক চাল। বুওয়াইহি ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আহমদ বিন বুওয়াইহ, যে আহওয়াজের শাসক ছিল, সবচেয়ে বেশি সুযোগ সন্ধানী প্রমাণিত হয়। সে ১১ই জমাদিউল আউয়াল ৩৩৪ হিজরিতে বাগদাদ দখল করে নেয়। এরপর সে এমন শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করে যে বাকি ভাইদের অনেক পেছনে ফেলে দেয়। [৩]

খলিফা এবং বনু বুওয়াইহ-এর সম্পর্ক:

বাগদাদের ওপর আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর দখলের মাধ্যমে ইতিহাসের সেই ১২০ বছরের অন্ধকার যুগ শুরু হয় যাকে ‘বুওয়াইহি যুগ’ বলা হয়। এর প্রাথমিক ৪৭ বছর ছিল বুওয়াইহিদের উত্থান, খলিফাদের অসহায়ত্ব এবং জনগণের চরম দুর্দশার সময়।

[১] মুরুজুয যাহাব লিল মাসউদি, পৃ. ২২০; আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ২৮৭ হিজরি, ৩০১ হিজরি, ৩৩৪ হিজরি।

[২] পূর্বোক্ত সূত্র।

[৩] পূর্বোক্ত সূত্র।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর ১১৬ বছরের শাসনামলে পাঁচজন খলিফা অতিবাহিত হয়েছেন:

১. মুস্তাকফী ২. মুতী' ৩. তায়ি' ৪. কাদির ৫. কায়িম

তাদের মর্যাদা দাবার গুটির চেয়ে বেশি ছিল না, যাদের মাধ্যমে বনু বুওয়াইহ বিভিন্ন চাল চালত। এই খলিফাদের কাছে কিছু দেহরক্ষী, সৈন্য এবং চাকর-বাকর অবশ্যই থাকত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাগদাদের ভেতরেও তাদের কোনো কর্তৃত্ব চলত না। হ্যাঁ, কাযীউল কুযাত নিয়োগ খলিফার হাতে ছিল এবং এটিই ছিল একমাত্র ক্ষমতা যাতে সাধারণত বনু বুওয়াইহ বাধা দিত না।

খলিফারা দরবারও বসাতেন এবং বাহ্যিকভাবে বনু বুওয়াইহ তাদের সম্মান ও মর্যাদাও করত, তাদের সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকত এবং ভূমি চুম্বনও করত; কিন্তু এই প্রদর্শনীমূলক সম্মান ততক্ষণই থাকত যতক্ষণ খলিফা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতেন। খলিফারা বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করতেন এবং মাঝে মাঝে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের খেলাত ও পুরস্কারে ভূষিত করতেন, কিন্তু এর কোনো কাজই বনু বুওয়াইহ-এর ইঙ্গিত ছাড়া হতো না। খলিফারা ব্যক্তিগত খরচের জন্যও বনু বুওয়াইহ-এর মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাদের একটি নির্দিষ্ট দৈনিক ভাতা নির্ধারিত ছিল। কোনো কোনো সময় এমন অবস্থাও হয়েছে যে, খরচ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খলিফাকে জীবন ধারণের জন্য ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করতে হয়েছে।

এই দীর্ঘ সময়ে সুন্যাহর নিদর্শনগুলো □□□□ভাবে পদদলিত হয়েছে। ভ্রান্ত আকিদা এমন প্রসার লাভ করেছিল যে, আল্লাহ রক্ষা করুন। শিয়া ইমামিয়া মতবাদের উত্থান এই সময়েই হয়েছিল। এভাবে সেই রাফেযী মতবাদ যা ইসলামের খলিফা এবং উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টার ফলে আড়ালে চলে গিয়েছিল, তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

খলিফা মুস্তাকফীর পদচ্যুতি:

বাগদাদে আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর দখলের সময় খলিফা মুস্তাকফী সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি আহমদ বিন বুওয়াইহ-কে 'মুইযযুদৌলা', তার ভাই আলী বিন বুওয়াইহ-কে 'ইমাদুদৌলা' এবং অপর ভাই হাসান বিন বুওয়াইহ-কে 'রুকনুদৌলা' উপাধি দেন। তবে আহমদ বিন বুওয়াইহ এতেই সন্তুষ্ট হননি বরং খলিফার কাছ থেকে 'মুনীক' উপাধিও গ্রহণ করেন। শীঘ্রই তিনি খলিফাকে ক্ষমতাহীন করে তার মর্যাদা পুরোপুরি মিটিয়ে দেন। এমনকি নিজের নামে মুদ্রাও জারি করেন।

কিছুদিন পর তার সন্দেহ হলো যে খলিফা তার বিরোধী। পনেরো দিন পর দরবারে খোরাসানের দুতের সম্মানে একটি অনুষ্ঠান ছিল। আহমদ বিন বুওয়াইহ ভরা দরবারে তার দুই দাইলামী অনুগতকে ইশারা করলেন। তারা খলিফার কাছে পৌঁছালে খলিফা ভাবলেন যে তারা হয়তো হস্তচুম্বন করতে চায়। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। দাইলামী অফিসাররা সেই হাত ধরেই তাকে টেনে হিঁচড়ে সিংহাসন থেকে নিচে ফেলে দিল। পুরো দরবারে কারো টু শব্দ করার সাহস হলো না। এই ঘটনাটি ২২ জুমাদাল আখিরা ৩৩৪ হিজরীর।

আহমদ বিন বুওয়াইহ খলিফার চোখ উপড়ে ফেললেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এভাবে মুস্তাকফী এক বছর চার মাস শাসন করে কারাগারের শিকারে পরিণত হন এবং সেখানেই ৩৩৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, বছর ৩৩৪ হি.

বনু বুওয়াইহ কেন আব্বাসীয় খিলাফত বহাল রেখেছিল?

মুস্তাকফিকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা বানিয়ে বনু বুওয়াইহ আব্বাসীয় খিলাফতকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে কোনো আলভী শিয়াকে খলিফা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু উপদেষ্টারা বুঝিয়েছিলেন যে, যদি কোনো আলভীকে খলিফা বানানো হয়, তবে মানুষ আপনাদের ছেড়ে তার আনুগত্য করতে শুরু করবে। আব্বাসীয় খলিফাদের টিকিয়ে রাখার সুবিধা হলো তারা অত্যন্ত দুর্বল, ফলে নাম তাদেরই চলতে থাকবে এবং মানুষ আপনাদের সামনেই নত হয়ে থাকবে। [১]

বনু বুওয়াইহ-এর সরাসরি শাসন করার ক্ষেত্রে একটি আশঙ্কা এটিও হতে পারত যে, এমন পরিস্থিতিতে ওলামাদের পক্ষ থেকে খুরাজ বা বিদ্রোহের ফতোয়া জারি হয়ে যেত। আব্বাসীয় খলিফাদের টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি অনেক কম ছিল; কারণ বাহ্যিকভাবে তো খিলাফত টিকে ছিল। তাই শুধু বনু বুওয়াইহ নয়, বরং পরবর্তী শতাব্দীগুলোর বিভিন্ন রাজ্যে রাফেযীদের নীতি এটাই ছিল যে, নাম অন্যদের চলবে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে।

আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর আগ্রহ ও অগ্রাধিকারসমূহ:

আহমদ বিন বুওয়াইহ (মুইয উদ-দৌলা) প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের মতো শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন। তিনি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন এবং ডাকের ঘোড়ার পরিবর্তে এমন আগ্রহী, কষ্টসহিষ্ণু ও দ্রুতগামী পদাতিক ব্যবহার শুরু করেন যাদের প্রত্যেকে ৩৬ ফারসাখ (১০৮ মাইল) দূরত্ব একদিনে দৌড়ে অতিক্রম করতে পারত। এই পদাতিকরা রাজকীয় আদেশ ও সংবাদসমূহ তার ভাই রুকন উদ-দৌলার কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে দিত।

আহমদ বিন বুওয়াইহ কুস্তি প্রতিযোগিতারও শৌখিন ছিলেন। তিনি খোলা ময়দানে এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। একইভাবে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করাও ছিল তার প্রিয় শখ। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিপুল সংখ্যায় এসব প্রদর্শনী দেখার জন্য সমবেত হতেন। সরকারের আগ্রহ দেখে বাগদাদের মানুষ তাদের সন্তানদের দ্রুত দৌড়ানো, কুস্তি লড়া এবং সাঁতারের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদের কিছু যুবক সাঁতারে এতটাই দক্ষ হয়ে ওঠে যে, তারা এক হাতে জ্বলন্ত চুলা নিয়ে যার ওপর হাঁড়ি রাখা থাকত, নদীতে ঝাঁপ দিত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সাঁতরাতে থাকত যতক্ষণ না হাঁড়ির মাংস রান্না হয়ে যেত। মানুষ এই দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে যেত। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/ ১৬৮-১৬৯, ৩৩৪ হিজরীর অধীনে।

[২] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২৫/ ২৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/ ১৬৯।

আল-মুতি’ লিল্লাহ

আল-ফজল বিন জাফর আল-মুকতাদির

জমাদিউল আখিরা ৩৩৪ হিজরি থেকে জিলকদ ৩৬৩ হিজরি

ফেব্রুয়ারি ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্ট ৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ

বনু বুওয়াইহ কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম খলিফা মুতি’ লিল্লাহ আব্বাসীর আসল নাম ছিল আবুল কাসেম আল-ফজল। তিনি সাবেক খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর পুত্র ছিলেন। মুস্তাকফির পদচ্যুতির পর জমাদিউল আখিরা ৩৩৪ হিজরিতে যখন তাকে নিযুক্ত করা হয়, তখন আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর পক্ষ থেকে তার দৈনিক খরচ একশ দিনার নির্ধারণ করা হয়েছিল। আহমদ বিন বুওয়াইহ (মুইজ্জুদ দাওলা) বাগদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চতুর্থ বছর ৩৩৮ হিজরিতে তার ভাই হাসান বিন বুওয়াইহকেও (রুকনুদাওলা) বাগদাদের শাসনে অংশীদার করে নেন। [১]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ:

বনু বুওয়াইহ-এর যুগ শুরু হতেই বাগদাদের ওপর বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের মেঘ ছেয়ে গেল এবং মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ল। ৩৩৪ হিজরিতে মিশরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় এবং চারদিকে এক কিয়ামত নেমে আসে।

৩৪২ হিজরিতে ইরান থেকে খোরাসান পর্যন্ত এমন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় যে, তালকান শহর মাটির নিচে দেবে যায়। শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা রে (তেহরান)-এর দেড়শটি জনপদ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়। শহরের উপকণ্ঠে একটি পাহাড় ফেটে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি জনপদ ঘরবাড়ি সহ মাটি থেকে শত শত ফুট উপরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পুনরায় নিচে পড়ে নাম-নিশানা মুছে যায়। ভূমিকম্পের কম্পন চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনুভূত হতে থাকে। জমিনের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ভয়াবহ ফাটল দেখা দেয় এবং ঝরনা প্রবাহিত হতে শুরু করে। সমুদ্রের পানি একশ বিশ ফুট নিচে নেমে যায় এবং স্থানে স্থানে দ্বীপ জেগে ওঠে। পরের বছর কোম, হালওয়ান এবং ইরানের পাহাড়ি এলাকায় পুনরায় ভূমিকম্প হয় এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। তার পরের বছর ভূমিকম্প বাগদাদের কিছু মহল্লা ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর পঙ্গপাল গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ছেয়ে যায় এবং শস্যের কোনো দানা বা ফলমূল কিছুই অবশিষ্ট রাখল না। [২]

দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু:

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। সাধারণ শহরের কথা তো বাদই দিলাম, অনেক সময় বাগদাদের অবস্থা এমন হতো যে খাদ্যদ্রব্য নাগালের বাইরে চলে যেত। মানুষকে কয়েক মণ গমের বিনিময়ে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে দেখা যেত। মুসলিম বিশ্বের মুকুট হিসেবে পরিচিত শহরে অনাহারী মানুষের লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যেত, যা কুকুরেরা ছিঁড়ে খেত।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৬

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৩৪-৩৩৫ হিজরি

...করতেন। অদ্ভুত ও বিচিত্র রোগ এবং হঠাৎ মৃত্যু সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। চোর কোনো ঘরে ঢুকত এবং সেখানেই মারা যেত। কাজী ফয়সালা শোনাতে শুরু করতেন এবং সেখানেই তার রুহ বের হয়ে যেত। [১]

বনু বুওয়াইহ-এর বিলাসিতা:

দেশের এই অবস্থা ছিল আর অন্যদিকে বনু বুওয়াইহ বাগদাদকে নিজেদের বিলাসপুরী বানাতে ব্যস্ত ছিল। তারা এখানে নিজেদের জন্য এমন সব চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল যার কোনো নজির কোথাও পাওয়া যেত না। আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর প্রাসাদের ভিত্তি ৪৫ ফুট গভীর করে খনন করা হয়েছিল। এর ওপর এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম (৩ আরব ২৫ কোটি রূপি) খরচ করা হয়েছিল।

মানুষ এই আকাশচুম্বী ইমারত দেখে হতবাক হয়ে যেত। তবুও আহমদ বিন বুওয়াইহ সন্তুষ্ট ছিল না, তাই আরও সাজসজ্জার কাজ করানোর জন্য সে কিছু আমিরের ওপর বিশ লক্ষ দিনার (৫ আরব রূপি) জরিমানা ধার্য করল। এতেও তৃপ্তি না হওয়ায় প্রাসাদকে সুন্দর ও মজবুত করার অজুহাতে পূর্ববর্তী আব্বাসীয় খলিফাদের অনেক প্রাচীন স্থাপনা, যা বাগদাদের পরিচয় ছিল, ভেঙে ফেলল এবং সেগুলোর দরজা ও জানালা পর্যন্ত উপড়ে ফেলে নিজের প্রাসাদে লাগিয়ে দিল। আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে এবং কোটি কোটি ও আরব আরব রূপি এতে ব্যয় হতে থাকে। [২]

হাজরে আসওয়াদ-এর প্রত্যাবর্তন:

হাজরে আসওয়াদ বিশ বছর ধরে কারামতিদের কাছে ছিল। এই যুগে একজন আলভী বুজুর্গ উমর বিন ইয়াহইয়া (রহ.), যাকে কারামতিরা সম্মান করত, খলিফা মুতী-এর পক্ষ থেকে দূত হয়ে বাহরাইনে কারামতিদের কাছে যান এবং হাজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে এর বিনিময়ে বিপুল ধন-সম্পদের প্রস্তাব দেন। কারামতিরা রাজি হয়ে যায় এবং বিশ বছর পর হাজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে একজন কারামতি মক্কার আলেমদের জিজ্ঞেস করল: “আপনারা কীভাবে নিশ্চিত হবেন যে এটিই আসল হাজরে আসওয়াদ? এর মতো অন্য কোনো পাথর নয়?” আলেমরা বললেন: “আমরা সহজেই তা জানতে পারি। আসল হাজরে আসওয়াদ পানিতে ডুবে না।”

এই বলে তারা হাজরে আসওয়াদকে পানিতে ফেললে তা পানির উপরিভাগে ভাসতে লাগল। আলেমরা সন্তুষ্ট হয়ে এটিকে নিজ স্থানে স্থাপন করলেন। [৩]

শিয়াদের অবাধ স্বাধীনতা:

যদি জনগণকে কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হতো তবে হয়তো তা সহ্য করার মতো হতো, কিন্তু সীমা এই ছিল যে এখন ইসলামি বিশ্বে যদি কোনো শিয়া প্রকাশ্যে কুফরি আকিদা প্রকাশ করত তবে তার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ৩৪১ হিজরিতে এক ব্যক্তি দাবি করে বসল যে, হযরত আলী (রা.)-এর রুহ তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। একইভাবে এক মহিলা ঘোষণা করল যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর রুহ তার মধ্যে চলে এসেছে। এক ব্যক্তি এই দাবি নিয়ে দাঁড়াল যে সে জিবরাঈল। বনু বুওয়াইহ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল ঠিকই, কিন্তু যখন তারা জানাল যে তারা শিয়া এবং আহলে বায়ত বা সাদাতদের প্রেমিক, তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩৩৪ হি.-৩৩৫ হি.

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩৫০ হিজরি; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৮

[৩] আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, পৃ. ৭৮

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৭, নিজার সংস্করণ

সাধারণত এ ধরনের দাবিদারদের রহস্য খুব দ্রুতই ফাঁস হয়ে যেত। আজারবাইজানে একজন দাবিদার দাঁড়িয়েছিল। সে বলত যে, তার কাছে ইলমে গায়েব হাসিল আছে। সে অনেকগুলো বিধানও জারি করে দিয়েছিল। চর্বি ও গোশতকে হারাম ঘোষণা করেছিল। এক বিশাল সৃষ্টি (জনগোষ্ঠী) তার চারপাশে জমা হয়ে গেল। একবার এক মেজবান তাকে দাওয়াত দিল এবং ঝোলে চর্বি মিশিয়ে দিল। ইলমে গায়েবের দাবিদার মজা করে তা খেতে থাকল। তখন মেজবান বলল: ‘দাবি তো ইলমে গায়েবের, অথচ এটাও জানা নেই যে তরকারিতে চর্বি আছে যাকে তুমি হারাম বলো।’ মানুষ তাকে লানত ও তিরস্কার করতে করতে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল এবং সে লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। [১]

শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা:

জনপদগুলোতে এক-দুইশ বছর ধরে আহলে সুন্নাত ছাড়াও প্রতিটি মাযহাব ও ফেরকার মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস করছিল। কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নামও শোনা যায়নি। এর কারণ ছিল এই যে, সমস্ত ধর্মীয় মতপার্থক্য ইলমি পর্যায়ে থাকত এবং সবাই একে অপরের পূর্বসূরিদের নাম সম্মানের সাথে নিত। কিন্তু বনু বুওয়াইহ-এর যুগে বাগদাদ রাফেজিদের আস্তানায় পরিণত হলো। তারা মনভরে আহলে সুন্নাতের নিদর্শনগুলোকে পদদলিত করত এবং আইন কার্যকর হতো না। শুধু তাই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র হনন শুরু করা হলো যা সহ্য করার মতো ছিল না। এতে মানুষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এবং বারবার শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে লাগল। [২]

সাহাবায়ে কেরামের ওপর তাবাররা বাজি:

৩৫১ হিজরিতে শিয়ারা বাগদাদের মসজিদগুলোতে নিম্নোক্ত অত্যন্ত উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপন লিখে দিল:

‘আল্লাহর লানত হোক মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের ওপর, এবং তার ওপর যে হযরত ফাতিমাকে বাগে ফাদাক থেকে বঞ্চিত করেছে (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.), এবং তার ওপর যে হযরত আব্বাস রা.-কে শুরায় শরিক হতে দেয়নি (অর্থাৎ হযরত উমর ফারুক রা.), এবং তার ওপর যে আবু যর গিফারি রা.-কে নির্বাসিত করেছে (অর্থাৎ হযরত উসমান গনি রা.), এবং তার ওপর যে হাসান রা.-কে তার নানার পাশে দাফন হতে দেয়নি (অর্থাৎ মারওয়ান ইবনে হাকাম)।’ [৩]

আহমদ ইবনে বুওয়াইহ (মুইয উদ-দৌলা)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করা হলে সে কোনো গুরুত্ব দিল না। অবশেষে এক রাতে আহলে সুন্নাত নিজেরাই এই শব্দগুলো মুছে দিল। আহমদ ইবনে বুওয়াইহ জানতে পেরে সরকারি নির্দেশে প্রতিটি মসজিদে এই উস্কানিমূলক শব্দগুলো ঝুলিয়ে দিল: “আল্লাহর লানত হোক মুয়াবিয়ার ওপর, এবং আল-ই মুহাম্মাদের ওপর জুলুমকারী সকল মানুষের ওপর।” [৪]

মাতমি মিছিল এবং ঈদে গাদীরের বিদআতের সূচনা:

পরের বছর ৩৫২ হিজরিতে আহমদ ইবনে বুওয়াইহ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দশই মহরমের মিছিল ও মাতমের প্রথা শুরু করল। সে নির্দেশ দিল যে, এই দিনে বাজার বন্ধ থাকবে, মানুষ জীর্ণ পোশাক পরে শাহাদাতে হুসাইনের শোকে মিছিল বের করবে। মহিলারাও মুখ খোলা রেখে, চুল এলোমেলো করে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মিছিলের সাথে চলবে। [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/২২৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/২৩১, ২৩৭, ২৪৭, ২৯৭... ৩৩৮ হিজরি, ৩৪৬ হিজরি, ৩৪৮ হিজরি, ৩৪৯ হিজরি, ৩৫৬ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৫১ হিজরি

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৮, “কুফর নকল করা কুফর নয়” এই মূলনীতির অধীনে এই উদ্ধৃতিগুলো নকল করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিনহা।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, নবম খণ্ড

এই বছর ঈদুল আযহার পর ১৮ই জিলহজ (যেদিন হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাত হয়েছিল) আহমদ বিন বুওয়াইহ আসে এবং ঈদ পালনের প্রথা চালু করে। একে ‘ঈদ-ই-গাদীর খুম’ নাম দেওয়া হয়। এই ঈদ এই মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে পালন করা হচ্ছিল যে, এই দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। সরকারি নির্দেশ ছিল যে, রাতেও বাজার খোলা রাখা হবে; ঢোল-তবলা বাজানো হবে। আলোকসজ্জা করা হবে এবং জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালানো হবে। এভাবে প্রতি বছর শিয়ারা মিছিল বের করত এবং ঈদ-ই-গাদীর পালন করত। এই প্রথাগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। [১]

বাগদাদসহ পুরো মুসলিম বিশ্বে সর্বত্র আহলে সুন্নাতের সংখ্যাধিক্য ছিল; ইরানের কিছু এলাকা ছাড়া শিয়ারা কোথাও দশ-পনেরো শতাংশের বেশি ছিল না। কিন্তু আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম ধৈর্য ধারণ করছিলেন এবং শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় নীরব ছিলেন; কারণ তারা উম্মতকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করতে চাননি। তবুও কখনও কখনও সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত এবং মাতমি মিছিল বের করার ফলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেত যাতে উভয় পক্ষের জানমালের ক্ষতি হতো। [২]

বখতিয়ার ইজ্জুদৌলার যুগ... পুরো মুসলিম বিশ্বে রাফেজি মতবাদের আধিপত্য:

৩৫৬ হিজরিতে ৫৩ বছর বয়সে আহমদ বিন বুওয়াইহ ২১ বছর শাসন করার পর মারা যায় এবং তার ছেলে বখতিয়ার ‘ইজ্জুদৌলা’ উপাধি নিয়ে ইরাকের নতুন শাসক হয়। পরিস্থিতি আগের মতোই চলতে থাকে। ৩৫৭ হিজরিতে মুসলিম বিশ্ব আরও দুটি বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়: একদিকে কারামতি শিয়ারা দামেস্ক দখল করে নেয় এবং এভাবে পুরো সিরিয়া তাদের অধীনে চলে আসে।

অন্যদিকে মিশরের শাসক কাফুর ইখশিদী, যে বনু আব্বাসের খুতবা পড়ত, মারা যায় এবং উবায়দী শাসকরা, যারা নীল নদের পশ্চিম পর্যন্ত দখলদার ছিল, এক লক্ষ অশ্বারোহী পাঠিয়ে ৩৫৮ হিজরিতে মিশর দখল করে নেয়। সেখানে বনু আব্বাসের খুতবা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং খুতবায় বারো ইমামের নাম নেওয়া হতে থাকে। আহলে সুন্নাতের নিদর্শনগুলো দ্রুত মিটিয়ে ফেলা হতে থাকে। ৩৫৯ হিজরিতে মিশরে সরকারি নির্দেশে শিয়াদের তরিকায় আযানে ‘হাইয়া আলা খাইরিল আমাল’ শব্দগুলো যোগ করা হয়। ৩৬০ হিজরিতে সিরিয়াতেও এই আযান প্রচলিত হয়। ৩৬২ হিজরিতে হিজাজও বনু উবায়দীদের অধীনে চলে আসে এবং সেখানে বনু আব্বাসের পরিবর্তে উবায়দী ফাতেমীদের খুতবা পড়া হতে থাকে। এভাবে ইরান ও ইরাক থেকে শুরু করে হিজাজ, সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত রাফেজি মতবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

রোমানদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ এবং মুসলমানদের অসহায়ত্ব:

বিগত ইতিহাসে মুসলিম বিশ্ব কখনও একসাথে এত বড় ঈমানি, আকিদাগত, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সংকটের সম্মুখীন হয়নি। উম্মতে মুসলিমার এই অভ্যন্তরীণ ভাঙনকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাইজেন্টাইন রোমানরা ইসলামী সীমান্তে এমন ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করে দেয় যার নজির অতীতে পাওয়া যায় না।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৩৫২ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/২৬৪, ২৬৯।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা: ২৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৩৫৬ হিজরি, ৩৫৯ হিজরি, ৩৬০ হিজরি।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা [অংশ: সপ্তম]

রোম সম্রাট নকফুর এবং তার আমেনীয় সেনাপতি ডোমেস্টিকাস ইসলামি বিশ্ব জয়ের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। শুরুতে তারা মুসলমানদের সেই সীমান্ত অভিযানগুলো থেকে বিরত রাখেন যা সেই যুগেও কখনো কখনো জিহাদের ঐতিহ্যকে জীবিত রাখার জন্য পাঠানো হতো। ৩৩৯ হিজরিতে তারা সীমান্ত অঞ্চলের মসুল ও হালবের শাসক সাইফ উদ-দৌলার আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং তাকে এমনভাবে পরাজিত করেন যে তিনি মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

সাইফ উদ-দৌলা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ৩৪২ হিজরিতে তিনি রোমান সেনাপতি ডোমেস্টিকাসের পুত্র কনস্টানটাইনকে বন্দী করে সেই পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে ফেলেন, কিন্তু খিলাফতের দুর্বলতা রোমানদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। ৩৪৩ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তারা আবারও সীমান্তে হানা দেয়; তবে সাইফ উদ-দৌলা বীরত্বের সাথে প্রতিরক্ষা করেন এবং রোমানদের অগ্রযাত্রা রুখে দেন।

একই বছরের শাবান মাসে ডোমেস্টিকাস রোমান ও বুলগেরীয় উপজাতিদের সাথে নিয়ে আবারও আক্রমণ করেন। এবারও তিনি পরাজিত হন এবং তার জামাতাসহ কয়েক ডজন অভিজাত ব্যক্তি ও শত শত সৈন্য বন্দী হয়।

তা সত্ত্বেও রোমানদের আক্রমণ থামেনি। এদিকে মুসলমানদের অনৈক্য তাদের শক্তি হ্রাস করছিল; বনু হামদানকে ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তে মুসলিম আমিরদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল; তাই সাইফ উদ-দৌলার মধ্যে আগের মতো সেই তেজ অবশিষ্ট ছিল না। রোমানরা ছোট ছোট আক্রমণের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি পরিমাপ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের ধ্বংসলীলা বাড়াতে থাকে। ৩৪৫ হিজরিতে তারা স্থলপথে কুর্দিস্তান এবং সমুদ্রপথে তারসুস আক্রমণ করে এবং ১৮০০ মুসলমানকে হত্যা করে এবং কয়েক ডজন জনপদ পুড়িয়ে দিয়ে ফিরে যায়।

৩৪৭ হিজরিতে রোমানরা মিয়াফারিকিন ও আমিদ পর্যন্ত পৌঁছে যায় যা ইরাকের সীমান্তে ছিল। এখানে দেড় হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং সামোসাতা শহর ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৩৪৮ হিজরিতে জুহাদ ও তারসুস আক্রান্ত হয় এবং হত্যা ও লুণ্ঠনের বাজার গরম থাকে। ৩৪৯ হিজরিতে সাইফ উদ-দৌলা পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সৈন্য পরিচালনা করেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং কোনোমতে ৩০০ অশ্বারোহী নিয়ে জীবিত ফিরে আসতে সক্ষম হন।

৩৫১ হিজরিতে ডোমেস্টিকাস দুই লক্ষ বিশাল বাহিনী নিয়ে হালবের দিকে অগ্রসর হন। পথে আইন জারবার মুসলমানরা তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তিনি তামাশা দেখার জন্য বললেন:

“সবাই মসজিদে আশ্রয় নাও। যাকে মসজিদের বাইরে দেখা যাবে তাকে হত্যা করা হবে।”

এই ঘোষণা শোনামাত্রই সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে পাগলের মতো মসজিদের দিকে ছুটতে থাকে। মসজিদে এত ভিড় হয়ে যায় যে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এবার তিনি বললেন:

“অবিলম্বে মসজিদ ছেড়ে এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। যে পেছনে থাকবে, তাকে হত্যা করা হবে।”

মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মসজিদ থেকে পালাল, অনেকে এই হুড়োহুড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হলো, অনেকে পায়ের নিচে পিষ্ট হলো। যার যদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই বেরিয়ে পড়ল। শত শত মানুষ পথ হারিয়ে মরুভূমিতে মারা গেল। বাকি মানুষও বাহন ও পাথেয় ছাড়া কতদূর যেতে পারত, অনেক বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও রোগী পথেই প্রাণ হারাল।

দিমাস্ক শহরের জামে মসজিদ ধ্বংস করে দিল, শহরের উপকণ্ঠে খেজুরের চল্লিশ হাজার গাছ উপড়ে ফেলে বাগানগুলো ধ্বংস করে দিল। ২১ দিন এখানে অবস্থানের সময় সে আশেপাশের ৪৫টি দুর্গ জয় করে নিল। তারপর কায়সারিয়ার দিকে অগ্রসর হলো এবং দিমাস্কের প্রতিরক্ষার জন্য বের হওয়া তারতুসের বাহিনীকে, যাতে চার হাজার সৈন্য ছিল, পিষ্ট করে দিয়ে হালাবে পৌঁছে গেল। এখানে সাইফুদ দৌলা সামনে এগিয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুই লক্ষের প্লাবন কারো পক্ষেই থামানো সম্ভব ছিল না।

সাইফুদ দৌলাকে ইরাকের দিকে পিছু হটতে হলো। দিমাস্ক অবিলম্বে হালাব ঘেরাও করল। কয়েক দিনের তীব্র যুদ্ধের পর তার হাজার হাজার সৈন্য প্রাচীর উপকণ্ঠে সক্ষম হলো। তারা ভেতরে ঢুকে দেড় হাজার রোমান বন্দীকে মুক্ত করল এবং সবাই মিলে নয় দিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপর গণহত্যা চালাল। শহরের প্রতিটি মূল্যবান জিনিস লুট করা হলো। দুই হাজার পুরুষ এবং এক হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করা হলো। যাওয়ার সময় জামে মসজিদ মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো এবং তেলের মজুদসহ এমন প্রতিটি জিনিস ধ্বংস করে দেওয়া হলো যা তারা সাথে নিয়ে যেতে পারছিল না।

রোমানদের আক্রমণ ক্রমান্বয়ে আরও বিপজ্জনক হতে লাগল। প্রতি বছর রোমানরা আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসত এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষাকে আগের চেয়ে দুর্বলতর দেখতে পেত। ৩৫৩ হিজরিতে দিমাস্ক মাসিসার ওপর আক্রমণ করল কিন্তু সফল হতে পারল না এবং বাইজান্টাইন ও তারতুসের আশেপাশে লুটতরাজ করে চলে গেল। কয়েক মাস পর রোম সম্রাট দিমাস্ককে সাথে নিয়ে তারতুস অবরোধ করলেন কিন্তু দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও শহরটি জয় করা সম্ভব হলো না এবং আক্রমণকারীরা ফিরে গেল।

৩৫৪ হিজরিতে রোম সম্রাট এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন। এই অভিযানের জন্য তিনি এশিয়া মাইনরে ‘কায়সারিয়া’ নামে একটি নতুন সামরিক শহর নির্মাণ করেছিলেন যাতে যেকোনো সময় মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ চালানো যায়। তারতুস ও মাসিসার মুসলমানরা ভীত হয়ে তার কাছে দূত পাঠাল, যে সম্রাটকে প্রস্তাব দিল যে তারা বার্ষিক কর প্রদান, বড় শহরগুলোতে সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ এবং আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত, যদি তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

সম্রাট এর প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু কয়েক দিন পর গোয়েন্দারা তাকে খবর দিল যে তারতুস ও মাসিসা রক্ষা করার মতো কেউ নেই এবং সেখানে দুর্ভিক্ষের কারণে প্রতিদিন তিন-চারশ জানাজা বের হচ্ছে। এ কথা শুনে সম্রাট তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। তিনি মুসলিম দূতকে ডাকলেন এবং চুক্তিপত্রের খসড়ায় আগুন ধরিয়ে জ্বলন্ত কাগজটি তার মাথার ওপর রেখে দিলেন। দূতের দাড়ি পুড়িয়ে দিলেন এবং গর্জন করে বললেন: “দূর হয়ে যাও। আমার কাছে তোমাদের জন্য শুধু তলোয়ার আছে।”

এখন তিনি মাসিসার ওপর আক্রমণ করলেন এবং এখানে দুই লক্ষ মুসলমানকে বন্দী করলেন। তারপর তলোয়ারের জোরে তারতুস জয় করলেন। এখানকার অধিবাসীদের নির্বাসিত করা হলো এবং জামে মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা হলো।

পরের বছর (৩৫৫ হিজরিতে) রোমানদের একটি বাহিনী আমদ-এর ওপর আক্রমণ করল, যদিও তারা তা জয় করতে পারেনি কিন্তু তিনশ মুসলমানকে হত্যা করার পর চারশ জনকে বন্দী করে নিয়ে গেল। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/ ২৬২, ২৬৯

সাইফ আদ-দাওলার মৃত্যু:

৩৫৬ হিজরিতে মুসলিম বিশ্বের বীর সেনানী, হালবের শাসক সাইফ আদ-দাওলা পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি সময় অতিবাহিত করার পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর নাম ছিল আলী বিন আবদুল্লাহ বিন হামদান। হাফেজ জাহাবী (রহ.) লিখেছেন:

“তিনি সাহসী ও বীর ছিলেন। প্রচুর জিহাদ করতেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর প্রশংসায় কাসিদা পাঠ করা হতো। তিনি পক্ষাঘাত বা পাথুরিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি সেই ধুলোবালি জমা করে রেখেছিলেন যা জিহাদী অভিযানে তাঁর গায়ে লাগত। এটি একটি আঠালো ইটের মতো পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যে, কবরে শোয়ানোর সময় এই পিণ্ডটি যেন তাঁর গালের নিচে রাখা হয়।” [১]

সাইফ আদ-দাওলার পর বনু হামদানের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর বড় ভাই নাসের আদ-দাওলা, যিনি মোসুলের শাসক ছিলেন, ভাইয়ের বিয়োগ ব্যথায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং দুই বছর পর ইন্তেকাল করেন। নাসের আদ-দাওলার পুত্র গজানফর আবু তাগলিব শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি একজন দুর্বল শাসক ছিলেন। ফলে বনু হামদান বংশ তাদের শান-শওকত হারিয়ে ফেলে। [২]

রুমীদের লুটতরাজ:

সাইফ আদ-দাওলা এবং নাসের আদ-দাওলার মৃত্যু মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি বড় আঘাত ছিল। এরপর রুমীরা (বাইজান্টাইন) সম্পূর্ণ নির্ভীক হয়ে আক্রমণ শুরু করে। ৩৫৪ হিজরিতে তারা আন্তাকিয়া অবরোধ করে এবং বারো হাজার মুসলমানকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ৩৫৮ হিজরিতে হিমসে আক্রমণ করা হয় এবং আশেপাশের এলাকা থেকে এক লক্ষ মুসলমানকে বন্দী করা হয়। [৩]

কায়সার-ই-রুমের বিদ্রোহ ও হুমকি সম্বলিত কাব্যিক পত্র:

এত বড় আঘাত সত্ত্বেও মুসলমানরা শোকে স্তব্ধ ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি ছিল না। কোনো উল্লেখযোগ্য পাল্টা ব্যবস্থা না দেখে কায়সার-ই-রুম নিকফোর খলিফা মুতি’-কে একটি বিদ্রোহপত্র ও হুমকি সম্বলিত কাব্যিক পত্র পাঠায় যাতে বলা হয়েছিল:

“তোমাদের অলসতা ও দুর্বলতার কারণে তোমাদের সীমানাগুলো এখন চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। জাজিরা, কিনাসরিন, কারকার, মালাতিয়া, হাইসাম এবং কায়সুমের কত সম্মানিত লোককে আমরা লাঞ্ছিত করেছি এবং এখন তারা আমাদের গোলাম ও খাদেম। আমরা রাস আল-আইনে রক্তপাত করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছি এবং মিয়াফারিকিনে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছি। আমরা সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী করেছি এবং কোমল ও লাভণ্যময়ী নারীদের দাসী বানিয়েছি। আমরা হালবের মেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের আদরের ভাই সাইফ আদ-দাওলা পালিয়ে গেছে।”

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার ২/৯৮

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার ২/১০৬

হামদান বংশের অধিকাংশ আমির শিয়া ছিলেন। যদিও তাদের শিয়া মতবাদ রাফয (চরমপন্থা) পর্যন্ত পৌঁছায়নি, বরং তাদের মধ্যে নাসের আদ-দাওলা আহলে সুন্নাহের অত্যন্ত সমর্থক হিসেবে পরিচিত। যাই হোক, এই বংশকে সাধারণত শিয়া মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাহ ঐতিহাসিকরা তাদের কার্যাবলীকে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন যা আমাদের পূর্বসূরীদের আমানতদারী, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হায়! যদি অন্যরাও আমাদের ব্যাপারে এই সততা প্রদর্শন করত।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/ ২৯০ থেকে ২৯১

তরতুসে আমরা সম্মানিত হাশেমি নারীদের নগ্ন মস্তকে বন্দি করেছি। খুব শীঘ্রই আমি আন্তাকিয়া এবং আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি দামেস্কও জয় করে নেব। আমি অচিরেই নাসিবিন, মসুল এবং সামাররাও ছিনিয়ে নেব।

হে বাগদাদবাসী! ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা তুচ্ছ লোক যারা দাইলামিদের আদেশে এবং রাফেজিদের তরিকায় চলা গোলামে পরিণত হয়েছ। এখন হিজাজের দিকে ফিরে যাও এবং রোমানদের এলাকা খালি করে দাও। আমি এখন মক্কার দিকে এমন এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে যাব যা অশ্রু বিসর্জনকারী রাতের মতো হবে। আমি সেখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নাইনিয়ার সিংহাসন পেতে শাসন করতে থাকব।

যদি হারুন বা মুতাসিমের যুগ হতো তবে কায়সারের (রোমান সম্রাট) এমন পত্র লেখার সাহস হতো না এবং যদি সে এমন ধৃষ্টতা দেখাত তবে মুসলমানরা তাকে এর স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দিত। কিন্তু এখানে বনু বুওয়াইহদের উদাসীনতা এবং খলিফার অসহায়ত্বের অবস্থা এমন ছিল যে বাগদাদের ওপর মৃত্যুর নীরবতা ছেয়ে ছিল। [১]

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন:

“আমার সেই যুগের এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানা নেই যে কায়সারের পত্রের উত্তর দিয়েছে। হতে পারে কেউ উত্তর দিয়েছে কিন্তু তা প্রসিদ্ধ হয়নি। এটাও সম্ভব যে মানুষ কায়সারকে এই যোগ্য মনে করেনি যে তার পত্রের উত্তর দেওয়া হোক। যা-ই হোক, এই পত্রটি পদ্য আকারে রচনাকারী কোনো অত্যন্ত শয়তান ও বিতাড়িত প্রকৃতির লোক ছিল।” [২]

তবে পরবর্তী শতাব্দীতে আল্লামা ইবনে হাজম আল-জাহেরি রহ. (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরি) যখন এই পত্রের অনুলিপি পেলেন, তখন তিনি ইসলামী আত্মমর্যাদা ও গায়রাতের কারণে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধিতে একটি কবিতা রচনা করেন যা ‘আল-ফারিদাতুল ইসলামিয়াতুল মানসুরাতুল মাইমুনা’ নামে পরিচিত। এর কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

“রব্বুল আলামীন এবং রাসূল হাশেমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীর পক্ষ থেকে এটি সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তর যে মুখতা ও গোমরাহির ভিত্তিতে মিথ্যা কথা বলে। তুমি এমন এক খলিফাকে সম্বোধন করেছ যার হাতে মাটির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদি তিনি তার পূর্বপুরুষদের মতো হতেন তবে তুমি সাপের বিষের মতো তিক্ত উত্তর পেতে।

আল্লাহর রহমত থেকে এটি অসম্ভব নয় যে তিনি তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া মর্যাদা পুনরুজ্জীবিত করার মতো লোক সৃষ্টি করবেন। মনে রেখো যে আমরা তোমাদের থেকে প্রকাশ্য যুদ্ধের মাধ্যমে (দেশ) ছিনিয়ে নিয়েছিলাম আর তোমরা কাপুরুশদের মতো প্রতারণার মাধ্যমে আক্রমণ করেছ। এতে তোমরা আনন্দিত ও অহংকারী হয়ে গেছ যেমনটা নীচ, অধম এবং বড়াই প্রদর্শনকারীরা করে থাকে। আমরা কি পূর্ণ শক্তির সাথে তোমাদের মস্তক উড়িয়ে দিয়ে তোমাদের থেকে শামের সমস্ত শহর, মিসর, তিউনিসিয়া, আন্দালুস এবং সিসিলি ছিনিয়ে নেইনি? একটু অপেক্ষা করো যে খেলাফতের আলো ফিরে আসবে এবং ধূলিমলিন চেহারাগুলো উজ্জ্বল হবে। যখন সমান শক্তির একটি বাহিনী তোমাদের দিকে আসবে তখন তোমরা ভাববে যে তোমাদের পালানোর পথ কোনটি।”

[১] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/১১৩

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/২৮৯, ২৯০

তারিখ উন্মতে মুসলিমা (পঞ্চম খণ্ড)

যদি সিজিস্তান, কাবুল, হিন্দুস্তান, পারস্য ও ইসফাহান এবং বসরা, কুফা ও ওয়াসিতের লোক, যাদের সংখ্যা বালুকণার সমান, যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে, তবে তাদের সাথে লড়াই করে কেউ বেঁচে ফিরতে পারবে না। আমরা শীঘ্রই কনস্টান্টিনোপল এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোও জয় করে নেব এবং তোমাদের গাধার খাদ্যে পরিণত করে ছাড়ব, যতক্ষণ না তলোয়ারধারী বাহিনীর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি দ্বীনের বিধান কার্যকর হয়।

আফসোস যে তোমরা এই বিশ্বাস পোষণ করো যে তোমাদের ঈশ্বরকে লাঞ্ছিত ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করেছে। আমাদের নবী ﷺ তো তিনি, যাঁর জন্য চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, যাঁর বরকতে এক সা’ খাদ্য সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং যাঁর হাতের তালু থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়েছে এবং পুরো বাহিনী তৃপ্ত হয়েছে। যতক্ষণ সূর্য কিরণ দেবে এবং অন্ধকার রাত আসতে থাকবে, তাঁদের ওপর আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক। তাঁদের দলিলসমূহ সূর্যের মতো উজ্জ্বল। সেগুলো তোমাদের কথার মতো নয় যাতে ভালো-মন্দ মেশানো থাকে। (তাঁর বরকতে) আমরা আধুনিক ও প্রাচীন সকল জ্ঞান লাভ করেছি, কিন্তু তোমরা সেই গাধাদের মতো যাদের পিঠ (বোঝা বইতে বইতে) রক্তাক্ত হয়ে গেছে। [১]

কায়সারের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং সীমান্ত লঙ্ঘন:

মুসলমানদের অসহায় দেখে ৩৫৯ হিজরিতে কায়সার আন্তাকিয়ার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়। রোমানরা শহরে ঢুকে পড়ে। সমস্ত বৃদ্ধ পুরুষ ও নারীকে নির্বাসিত করা হয়, বারো হাজার যুবতী নারী ও শিশুকে বন্দি করা হয় এবং শহরটি আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করে নেওয়া হয়।

সেই বছরই রোম সম্রাট স্বয়ং ত্রিপোলি ও হিমসের ওপর আক্রমণ চালায় এবং দুই মাস ধরে এই অঞ্চলে লুটতরাজ চালাতে থাকে। এখানে সে ১৮টি ছোট শহরের জামে মসজিদ ধ্বংস করে, হাজার হাজার মানুষকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানায় এবং এক লক্ষ ছেলে-মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। [২] মুসলমানরা এর আগে কখনো এমন লাঞ্ছনা দেখেনি।

বাগদাদের বাজারে অগ্নিসংযোগ। শিয়া উজির কর্মফলের শিকার:

বনু বুওয়াইহ-এর এ ব্যাপারে কোনো ভ্রক্ষেপ ছিল না যে বিজাতীয়রা কীভাবে মুসলিম বিশ্বের সীমান্ত পদদলিত করছে। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে আক্রমণকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাবে। উল্টো এই শাসকরা জনগণের ওপর অবর্ণনীয় জুলুম চালাচ্ছিল। রমজান ৩৬২ হিজরিতে এক সরকারি কর্মকর্তা বাজারে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ফলে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তারা ওই কর্মকর্তাকে মেরে ফেলে। বনু বুওয়াইহ-এর শিয়া উজির আব্বাস বিন হুসাইন (আবুল ফজল), যে সুন্নিদের ঘোর শত্রু ছিল, এই খবর পেয়ে তার দ্বাররক্ষীকে পাঠিয়ে বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে সতেরো হাজার মানুষ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। ৩৩টি মসজিদ, ৩১৭টি দোকান এবং ৩২০টি ঘর ভস্মীভূত হয়। বাগদাদে এর আগে কখনো এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। শহরকে জ্বলতে দেখে এক মজলুম ফরিয়াদ করে:

“হে আল্লাহ! উজির আমাদের তার শক্তি দেখিয়েছে। এখন তুমি তাকে তোমার শক্তি দেখাও।”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/২৯০ থেকে ৩০৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/২৫৫ থেকে ৩২৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৬/৫০ থেকে ৯৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আল্লাহর শান যে, কিছু দিন পরেই এই উজিরও শাসক মুইয়ুদ দৌলার রোযানলে পড়েন এবং তাকে বন্দী করা হয়। তিনি, তার স্ত্রী এবং হাজিব (দ্বাররক্ষী) মারা যান। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। কিছু দিন পর উজিরকেও কারাগারেই বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। [১]

বনু বুওয়াইহ-এর জিহাদ আন্দোলনের সাথে উপহাস:

৩৬১ হিজরিতে রোমানদের আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ দিয়ার বকর এবং আল-জাজিরা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নসীবাইন এবং আরজান লুণ্ঠনের শিকার হয়। হাজার হাজার মুসলমান নিহত ও বন্দী হয়। নিজেদের জন্য মুসলমানদের কিছু প্রতিনিধি বাগদাদে পৌঁছান যাতে খলিফাকে তাদের অসহায় অবস্থার কথা জানাতে পারেন এবং সাহায্য চাইতে পারেন। কিন্তু খলিফার সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বনু বুওয়াইহ-এর তৎকালীন শাসক বখতিয়ার বিলাসপ্রিয় লোক ছিলেন এবং সেই সময় শিকারে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় ওলামায়ে কেরাম জনগণকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেন, খতিবগণ জ্বালাময়ী খুতবা দেন। খতিব আব্দুর রহিম ইবনে নুবাতা (রহ.) মুসলমানদের রক্ত গরম করার জন্য ঐতিহাসিক খুতবা দেন যা ‘আল-জিহাদিয়াত’ নামে পরিচিত। অবশেষে মজলুম মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করা হলো এবং তুর্কি আমিরদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে জিহাদের জন্য বের হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলো। একটি বিশাল বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু তার আগেই এই ভিড়ের মধ্যে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় যার ফলে জিহাদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

যাত্রার আগে অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্রের খরচের ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। যখন বখতিয়ার ইবনে বুওয়াইহ-এর কাছে আবেদন করা হলো, তখন সে নিজের কোটি কোটি টাকার কোষাগার থেকে একটি পয়সাও দেয়নি বরং খলিফাকে নির্দেশ পাঠাল যে তিনি জিহাদের খাতে চার লাখ দিরহাম পাঠান। খলিফা জবাবে বলে পাঠালেন: “যদি দেশের রাজস্ব আমার কাছে জমা হতো তবে আমি অবশ্যই মুসলমানদের প্রয়োজনে তা খরচ করতাম। কিন্তু আমার কাছে এমন কোনো সরকারি সম্পদ নেই যা আমি আপনাকে পাঠাব। কোষাগার আপনার কাছে, আপনিই এই প্রয়োজন পূরণ করুন। খুতবায় আমার নাম নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো মর্যাদা নেই। আপনারা চাইলে আমি পদত্যাগ করতে পারি।”

কিন্তু বখতিয়ার খলিফাকে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিয়ে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য করল। অবশেষে খলিফা খেলাফত প্রাসাদের আসবাবপত্র যার মধ্যে প্রাসাদের ছাদ, দরজা, জানালা এবং জরির কাপড় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বিক্রি করে এই অর্থ সংগ্রহ করে বখতিয়ারকে পাঠিয়ে দিলেন। সে জিহাদের নামে জোরপূর্বক নেওয়া এই অর্থ নিজের বিলাসিতায় উড়িয়ে দিল এবং মুসলমানরা তা চেয়ে চেয়ে দেখল। [২]

খলিফা মুতী-র পদত্যাগ ও মৃত্যু:

এই ঘটনা খলিফাকে শোকে মুহ্যমান করে দেয়। তার ওপর পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয় এবং তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েন। ১৩ জিলকদ ৩৬৩ হিজরিতে তিনি নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং বাগদাদ ছেড়ে ওয়াসিতে চলে যান। দুই মাস পর মহরম ৩৬৪ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়। তার খেলাফতের মেয়াদ ২৯ বছর কয়েক মাস এবং কয়েক দিন ছিল।

[৩]

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবর: ২/১১৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৩১১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৩৩০ ও ৩৩৭; আল-ইবার ফি খবর মান গাবর: ২/৭০ ও ৭৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩৬১ হিজরির ঘটনাবলি।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৯০, মিশর।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ ৬)

আল্লাহর গায়েবি সাহায্য:

মুতী'-এর পদত্যাগের কিছুদিন আগে আল্লাহর গায়রত জোশে এল, তিনি তাঁর কুদরতের কারিশমা দেখালেন এবং মুসলমানদের দুই বড় শত্রুকে পাকড়াও করলেন। রোম সম্রাট দামেশককে আরও বিজয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সে আমদ অবরোধ করে রেখেছিল, এমন সময় সাইফুদ দৌলার ভাতিজা হিবাতুল্লাহ একটি ছোট বাহিনী নিয়ে আমদবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দামেশক তাকে বাধা দিতে এগিয়ে গেলে একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ উপত্যকায় উভয় বাহিনীর মুখোমুখি লড়াই হয়। এটি ২৯ রমজান ৩৬২ হিজরির ঘটনা। এখানে মুসলমানরা এমন তীব্র যুদ্ধ করলেন যে রোমানদের নাভিশ্বাস উঠে গেল। উপত্যকার সংকীর্ণতার কারণে অনেক রোমান পালাতেও পারেনি, তাদের মধ্যে দামেশকও ছিল। তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় যেখানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও পরের বছর (৩৬৩ হিজরিতে) মারা যায়।

যখন এই খবর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছাল, তার আগেই দুর্ভাগা রোম সম্রাট নকফুর, যে মক্কা দখলের দম্ভোক্তি করেছিল, নিজের ঘরেই বেগমদের রাজনীতির শিকার হয়ে কয়েকজন দাসীর হাতে অপমানজনক মৃত্যু বরণ করেছিল। [১]

ঐতিহাসিকগণ এই দুই শত্রুর মৃত্যুকে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য হিসেবে গণ্য করেছেন; কারণ মুসলমানদের তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অসম্ভব ছিল না যে, রোমানদের এই আক্রমণ যদি আরও কয়েক বছর এভাবে চলতে থাকত, তবে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে পদদলিত করে ফেলত। সত্যই বলা হয়েছে: “ইন্না বাতশা রাবিবিকা লাশাদীদ” (নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর)।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: বছর ৩৬২ হি., ৩৬৩ হি.

নোট: কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে এমন মনে হয় যেন তারা সম্রাট নকফুর এবং দামেশককে একই ব্যক্তি মনে করেন, অথচ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয় যে নকফুর ছিলেন রাজা এবং দামেশক ছিল তার সেনাপতি। তারা দুজন আলাদা ব্যক্তি ছিলেন।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আত-তাঈ' লিল্লাহ

আব্দুল কারীম বিন আল-ফজল আল-মুতী'

জিলকদ ৩৬৩ হিজরি থেকে শাবান ৩৮১ হিজরি

আগস্ট ৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নভেম্বর ৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

মুতী' লিল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আত-তাঈ' লিল্লাহ উপাধিতে আনুষ্ঠানিক খলিফা হন। তাঁর আসল নাম ছিল আব্দুল কারীম। তাঁর শাসনামলে বনু বুওয়াইহ-এর আরেকজন ব্যক্তি বাগদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন হাসান বিন বুওয়াইহ (রুকনুদ দৌলা)-এর পুত্র আযুদুদ দৌলা। অত্যন্ত চতুর, বুদ্ধিমান এবং প্রভাবশালী মানুষ। তাঈ'-এর খেলাফতের দ্বিতীয় বছর ৩৬৩ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি কোনো এক রাজনৈতিক সমস্যায় তাঁর চাচাতো ভাই বখতিয়ার (ইযযুদৌলা)-কে সাহায্য করার জন্য বাগদাদে এসেছিলেন, কিন্তু এই শহরের ধন-সম্পদ এবং বিশালতা ও জনবসতি দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বাগদাদের শাসনভার তাঁরই সাজে, বখতিয়ারের মতো কোনো বিলাসীর নয়। তিনি শক্তির জোরে বখতিয়ারকে সরিয়ে বাগদাদের ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে তুলে নেন। খলিফা তাঈ' তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। দুই মাস পর্যন্ত খেলাফত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তাঈ' ক্ষমা প্রার্থনা করলে ৩৬৪ হিজরির রজব মাসে তাঁকে পুনরায় খেলাফত অর্পণ করা হয়। [১]

এই সময়ে বনু বুওয়াইহ-এর প্রবীণ প্রধান হাসান বিন বুওয়াইহ (রুকনুদ দৌলা) অধিকৃত অঞ্চলগুলো সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন যাতে পরবর্তীতে কোনো বিবাদ না হয়। মুয়াইয়িদুদ দৌলাকে ইসফাহান ও রে, এবং ফখরুদৌলাকে হামদান ও দিনাওয়ার প্রদান করেন। আযুদুদ দৌলা বাগদাদ, পারস্য এবং কিরমানের শাসক হিসেবে বহাল থাকেন। [২]

আযুদুদ দৌলা বুওয়াইহির উত্থান:

এখান থেকে আযুদুদ দৌলার শাসনকাল শুরু হয়, যিনি এখন পারস্য থেকে ইরাক পর্যন্ত একচ্ছত্র শাসক ছিলেন। তিনি এমন শান-শওকত গ্রহণ করেছিলেন যা তাঁর পূর্বপুরুষদের ভাগ্যেও জোটেনি। তাঁর রাজনীতি প্রাচীন ইরানের সম্রাটদের সদৃশ ছিল। তিনি হীরা-জহরত খচিত মুকুট পরিধান করতেন। ফজর, মাগরিব এবং এশার সালাতের সময় তাঁর প্রাসাদের সামনে দামামা বাজানো হতো। তিনি খলিফার কাছে আবদার করে নিজের নামের সাথে “তাজুল মিল্লাত” খেতাবও যুক্ত করে নেন। [৩]

প্রথম শাহেনশাহ উপাধি:

পরবর্তীতে আযুদুদ দৌলা “শাহেনশাহ” উপাধিও গ্রহণ করেন, যা এর আগে কোনো মুসলিম শাসক গ্রহণ করেননি। তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি নাজাফে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের অস্তিত্বের দাবি করেন এবং সেখানে মাজার নির্মাণ করেন। তিনি কিছু...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৬৫ হিজরি

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৬

উন্নয়নমূলক কাজও করিয়েছেন। হাসপাতাল নির্মাণ করিয়েছেন এবং মদিনা মুনাওয়ারার নতুন প্রাচীর তৈরি করিয়েছেন।

তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী, বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। দ্রুত বিষয়ের মূলে পৌঁছে যেতেন। অপরাধীদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন এবং সামান্য অপরাধেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন। কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালো রুচি ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

[১]

তাঁর যুগে বনু বুওয়াইহ-এর বিরোধীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তাই তিনি একের পর এক যুদ্ধের মাধ্যমে বুওয়াইহী সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কারামতিয়াদের সাথে নিয়ে পুরো ইরাক দখল করে নেন। বনু বুওয়াইহ-এর প্রাক্তন শাসক বখতিয়ার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য হাত-পা ছুড়ছিলেন। আযুদুদৌলা তাকে আর কোনো সুযোগ দেননি এবং একটি যুদ্ধের পর তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। [২]

শাহজাদী জামিলা বিনতে হামদানের বেদনাদায়ক ঘটনা:

আযুদুদৌলার মেজাজে প্রতিশোধস্পৃহা ও নিষ্ঠুরতা মিশে ছিল, যার একটি উদাহরণ হলো বনু হামদানের শাহজাদী জামিলার ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন সচ্চরিত্রা ও সুন্দরী নারী, মোসেলের প্রাক্তন শাসক নাসিরুদৌলার কন্যা এবং বীর যোদ্ধা সাইফুদৌলার ভতিজি। তাঁর পিতা ও চাচার ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর ভাই গজনফর আবু তাগলিব শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ৩৬৬ হিজরিতে হজের জন্য তিনি পর্দার এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে চারশ পালকির মাঝে নিজের পালকি লুকিয়ে রেখেছিলেন। মসজিদে হারামে প্রচুর দান-সদকা করেন। হারামাইনের খাদেমদের মালামাল করে দেন। কাবার খেদমতের জন্য দশ হাজার দিনার পেশ করেন। [৩] সেই সময়ের রাজপরিবারগুলোতে তাঁর গুণাবলির ব্যাপক চর্চা ছিল। আযুদুদৌলা জামিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু জামিলা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আযুদুদৌলা এ কথা শুনে রাগে ফেটে পড়েন এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন।

তিনি ৩৬৭ হিজরিতে মোসেল আক্রমণ করে বনু হামদানকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। গজনফরকে তার বোন জামিলা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ পালিয়ে সিরিয়ায় আশ্রয় নিতে হয়, যেখানে তার পরিবারের মাত্র অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল। গজনফরের চেষ্টা ছিল সিরিয়ায় ফাতেমীয়দের অধীনে করদ রাজ্য হিসেবে কোনো অবস্থান পাওয়া যাতে আযুদুদৌলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলে মহররম ৩৬৯ হিজরিতে তিনি সপরিবারে মিশরের সীমান্তবর্তী শহরে পৌঁছান যাতে ফাতেমীয়দের সাথে আলোচনা করা যায়। কিন্তু ফাতেমীয়রা তার আগমনকে আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে এবং যুদ্ধের পর তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে। [৪] জামিলা, যিনি তার সাথে ছিলেন, বনু আকীলের লোক এবং তার চাচাতো ভাই সাদউদৌলা বিন সাইফুদৌলার সাথে আলেপ্পোতে চলে যান। কিন্তু বিপদের সময় আপনজনরাও কাজে আসেনি। সাদউদৌলা এই অসহায় জামিলাকে আযুদুদৌলার হাতে তুলে দেন। তিনি এই বিপদগ্রস্ত মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে বন্দি করে রাখেন। [৫]

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ২৬/৫২৬-৫২৭; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৮/৩৭৬, ত. বাশার।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩৬৭ হিজরি।

[৩] আল-মুনতাজাম: ১৪/২৪৮।

[৪] তারিখু দামেশক লি-ইবনে কালানিসি (৫৫৫ হিজরি), পৃ. ৩৮, ৪০, ত. দার ইহসান, দামেশক।

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩৬৯ হিজরি।

আযুদুদৌলা জামিলাকে বিবাহে রাজি করানোর জন্য সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি রাজি না হলে তার ওপর ভারী জরিমানা ধার্য করে সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেন এবং তাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেন। এতেও রাগ প্রশমিত না হলে তাকে কিছু সৈন্যের হাতে সোপর্দ করেন যাতে তারা তাকে কোনো ভূগর্ভস্থ কক্ষে আটকে রাখে এবং সে অর্থ উপার্জন করে জরিমানা পরিশোধ করে। এই ছিল এই রাফেজি শাসকদের আচরণ। কোথায় মুতাসিম, যিনি একজন মুসলিম বোনের সম্মান রক্ষার্থে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন! আর কোথায় আযুদুদৌলা, যে একজন মজলুম নারীর সম্ভ্রম বিক্রি করছিল!

এই দুঃখজনক ঘটনার পরিণতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। সৈন্যরা যখন জামিলাকে বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি নিজের সম্মান নিলাম হওয়ার আগেই দজলা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। [১]

ওবায়দিদের হাতে তুর্কি আমিরের পরাজয়:

আযুদুদৌলার স্বৈরাচারে ভীত হয়ে বাগদাদের কিছু শীর্ষস্থানীয় আমির দেশত্যাগ করেছিলেন। হাফতাগিন তুর্কি ছিলেন এমনই একজন প্রভাবশালী আমির। তিনি নিজের সেনাবাহিনীসহ বাগদাদ ত্যাগ করে সিরিয়ায় পৌঁছান এবং দামেস্ক দখল করেন। কিন্তু তিনি শান্তির দেখা পাননি। বনু ওবায়দ তাকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ৩৬৮ হিজরিতে ওবায়দি প্রধান আল-আজিজ নিজেই ৭০ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মিশরের সীমান্তে তার মোকাবিলায় আসেন এবং তাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। [২] এভাবে প্রমাণিত হলো যে, বাগদাদি আমিরদের জন্য সিরিয়া ইরাকের চেয়েও বেশি অনিরাপদ এবং বনু ওবায়দ বনু বুয়াইহ-এর চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক।

আযুদুদৌলার মৃত্যু। বনু বুয়াইহ-এর পতনের সূচনা:

৪৮ বছর বয়সী আযুদুদৌলা শাওয়াল ৩৭২ হিজরিতে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার পুত্র সামসামুদৌলা উপাধি নিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতা ছিলেন “তাজুল মিল্লাহ”, আর সাহেবজাদা হলেন “শামসুল মিল্লাহ”।

কিন্তু এখন বাগদাদ সম্পর্কে বনু বুয়াইহ-এর অবস্থা তেমন হয়ে গিয়েছিল যেমনটা ডাকাতদের লুণ্ঠিত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সামসামুদৌলার শাসনের চতুর্থ বছর ৩৭৬ হিজরিতে তার ভাই শরাফুদৌলা তিন হাজার তুর্কি সৈন্য নিয়ে বাগদাদে চড়াও হন। সামসামুদৌলা ১৯ হাজার দাইলামি সৈন্য নিয়ে মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হন। দাইলামিরা ৩ হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। শরাফুদৌলা সামসামুদৌলাকে গ্রেপ্তার করে তার চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ জারি করেন। নির্দেশ পালনের আগেই আতঙ্কে সামসামুদৌলার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পরও লাশের চোখ উপড়ে ফেলে সাজা কার্যকর করা হয়।

শরাফুদৌলা বাগদাদ দখল করে নেন। খলিফার কিছু বলার সাহস ছিল না। তিনি প্রথা অনুযায়ী নতুন শাসককে অভ্যর্থনা জানান এবং খেলাত প্রদান করে শাসনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেন। শরাফুদৌলা পূর্ববর্তী বুয়াইহি শাসকদের তুলনায় নরম মেজাজের ছিলেন। তিনি শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, উন্নয়নমূলক কাজ করেন এবং একটি বড় মানমন্দিরও নির্মাণ করেন। [৩]

[১] সিমারুল কুলুব লি আবি মানসুর আস-সাআলাবি (মৃত্যু ৪২৯ হিজরি), পৃ. ২০৫, ত. দারুল মাআরিফ কায়রো - সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১২/১২১, ত. আল-মুআসাসাহ

[২] ইত্তিআযুল হুনাফা বি আখবারি আইন্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা লিল মাকরিজি: ১/২৪৩, ত. জামিয়া কায়রো

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৩

তিন বছর শাসন করার পর ৩৭৯ হিজরিতে শরফ উদ-দৌলা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার ভাই আবু নসর বাহাউদ-দৌলা উপাধি ধারণ করে শাসক হন। একদিন খলিফা তায়ি' তার কোনো এক বিশেষ কর্মচারীকে কিছু বলেছিলেন। বাহাউদ-দৌলা ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি খলিফার কাছে আসলেন এবং দরবারি রীতি অনুযায়ী জমিন বুসি করলেন এবং খলিফার সাথে তার আসনে বসলেন। পরের মুহূর্তেই তার ইশারায় তার কর্মচারীরা খলিফাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে একটি চাদরে মুড়িয়ে ফেলল এবং শরফ উদ-দৌলার প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে জোরপূর্বক পদচ্যুত করা হলো। এটি ৯ শাবান ৩৮১ হিজরির ঘটনা। তায়ি' ভাগ্যবান ছিলেন যে, পদচ্যুতির পর তাকে হত্যা করা হয়নি এবং তার চোখও উপড়ে ফেলা হয়নি, বরং তাকে নতুন খলিফার প্রাসাদে জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বারো বছর জীবিত ছিলেন এবং ১লা শাওয়াল ৩৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯২ থেকে ২৯৪; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/ ১৩০ থেকে ১৪৭।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-কাদির বিল্লাহ

আহমদ বিন ইসহাক আল-মুক্তাদির

শাবান ৩৮১ হিজরি থেকে জিলহজ ৪২২ হিজরি

নভেম্বর ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ

তায়ি-এর স্থলে সাবেক খলিফা মুক্তাদিরের নাতি আহমদ বিন ইসহাক ‘কাদির বিল্লাহ’ উপাধি নিয়ে খেলাফতের মসনদে বসেন। তিনি পূর্ণ চল্লিশ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইলম ও ফজল এবং জুহদ ও ইবাদতে উলামা ও মাশায়েখদের সমপর্যায়ের ছিলেন। তিনি তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত এবং অধ্যয়নের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত শাফেয়ী ফকিহ আবু বিশর হারওয়ীর নিকট ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন লেখক ছিলেন। তাঁর একটি রচনা ছিল আকিদা বিষয়ে, যাতে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় রচনাটি ছিল মুতাজিলাদের খণ্ডনে। তৃতীয় রচনাটি ছিল হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর সীরাতের ওপর।

কাদির বিল্লাহর একচল্লিশ বছরের শাসনামলের প্রথম বিশ বছরে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা ছিল এমন এক অসাড় ও নিশ্চল রোগীর মতো যার প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। রোমান সাম্রাজ্য তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে বহিঃআক্রমণ থেকে বিরত ছিল, অন্যথায় সে সময় মুসলিম বিশ্ব ছিল শক্তিহীন। রাফেজিদের শাসনগুলো নিজ নিজ স্থানে কায়েম ছিল, তবে সেগুলোতেও পারিবারিক কোন্দলের কারণে ভাঙন শুরু হয়েছিল। ইসলামি দেশগুলো অনেক টুকরোয় বিভক্ত ছিল এবং আফ্রিকার রাফেজি উবায়দী শাসন ব্যতীত প্রতিটি রাষ্ট্রই দুর্বল ছিল। এ কারণে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিদাররা দাঁড়িয়ে যেত, তবে এখন কোনো বিদ্রোহী আগের মতো জনসমর্থন পেত না। ইঁ্যা, অল্প কিছু লোক প্রত্যেকের সাথেই দাঁড়িয়ে যেত, যাদেরকে আশেপাশের যেকোনো শাসকই শায়েস্তা করে দিত। ৩৮১ হিজরিতে ‘আসিফার’ নামক এক বেদুইন সর্দার ইরাক ও হিজাজের মধ্যবর্তী পথ অবরোধ করে এবং হাজিদের আটকে দিয়ে এই দাবি করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তার শাসন মেনে না নেবে ততক্ষণ তারা পথ পাবে না। বিশৃঙ্খলার কারণে সে বছর ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়েমেন থেকে কোনো কাফেলা হজের জন্য পৌঁছাতে পারেনি।

বাগদাদের শাসক বাহাউদ্দৌলা দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাই ৩৮২ হিজরিতে তিনি আবুল হাসান কুহী-কে, যিনি ওয়াজিহুল মুলক উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, বাগদাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তার জন্য আশুরার মাতম মিছিল বন্ধ করে দেন যা গত ত্রিশ বছর ধরে চলে আসছিল। শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো কিন্তু সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা বিগড়ে গেল এবং তারা ইবনে মুয়াল্লিমকে ধরে হত্যা করল। এরপর মাতম মিছিল আবার শুরু হয়ে গেল। [১]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৫, ২৯৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/ ১৬১, ১৭০।

বাগদাদে অশান্তি। শিয়াদের মিছিল:

বাগদাদের ওপর প্রায়ই এক গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করত, যা মাঝে মাঝে অশান্তির শোরগোল ভেঙে দিত। ৩৮৯ হিজরিতে শিয়ারা অস্বাভাবিক আয়োজনের সাথে ইয়াওমে আশুরা পালন করে, গম্বুজ আকৃতির তাজিয়া বের করে এবং শোরগোল ও চিৎকারে আকাশ মাথায় তুলে নেয়। ১৮ই জিলহজ তারিখে একই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ঈদে গদীয়রও পালন করা হয়। এটি দেখে আহলে সুন্নাত ঈদে গদীয়রের অষ্টম দিনে (২৬শে জিলহজ) “ইয়াওমে গাওর” (গুহার দিন) হিসেবে পালন করা শুরু করে এবং দাবি করে যে, এই দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “এটি একটি মূর্খতাসুলভ এবং ভুল কথা ছিল; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু-এর গুহায় আত্মগোপনের দিনগুলো নিশ্চিতভাবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাসে ছিল।” [১]

মুসআব বিন জুবায়ের দিবস পালনের বিদআত:

একইভাবে ইয়াওমে আশুরার প্রতিক্রিয়ায় সুন্নিদের মূর্খরা ১৮ই মহররমকে “মুসআব বিন জুবায়েরের শাহাদাত দিবস” হিসেবে পালন করা শুরু করে। এই দিনে সাধারণ মানুষের কাফেলা হযরত মুসআব বিন জুবায়েরের কবরে যেত এবং আহাজারি করত। তারা তাঁর শাহাদাতকে হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের সমতুল্য মনে করত; কারণ হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু যদি রাসূলের নাতি হন, তবে হযরত মুসআব বিন জুবায়ের ছিলেন সিদ্দিক আকবর রাদিআল্লাহু আনহু-এর নাতি। এই প্রথা দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। [২]

শহরে গুপ্তা ও ঠগদের দল ছিল যারা মানুষকে লুটতরাজ করত। মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তখনও চলত এবং সেই দিনগুলোতে অপরাধী ব্যক্তিদের তৎপরতা বেড়ে যেত। [৩]

উমায়্যেদ আল-জুয়ুশ-এর শাসনকাল। মিছিল বন্ধ। দাঙ্গা শেষ:

বাহাউদ্দৌলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখে আবু আলী আল-হুসাইনকে পুরো ইরাকের শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই আমির “উমায়্যেদ আল-জুয়ুশ” উপাধিতে পরিচিত ছিলেন এবং প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত চতুর ও কঠোর ছিলেন। ৩৯২ হিজরিতে তিনি বাগদাদে আসেন। তিনি প্রথম কাজ যা করেন তা হলো চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো এবং অনেককে ধরে হত্যা করা। দ্বিতীয় কাজ ছিল আহলে সুন্নাত এবং শিয়া উভয় পক্ষকে রাজপথে তাদের ধর্মীয় প্রদর্শন থেকে বিরত রাখা, আশুরার শোক মিছিল বন্ধ করে দেওয়া। প্রাত্যহিক দাঙ্গা এবং অসহনীয় জানমালের ক্ষতি এই সত্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকে দিয়ে কোনো সরকার টিকে থাকতে পারে না। ফলে ৩৯৩ হিজরিতে আশুরার শোক মিছিল বের হয়নি এবং মুসআব বিন জুবায়েরের কবরে সুন্নিদের সমাবেশও হয়নি। এভাবে শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৫, ২৯৬; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/১৫১-১৭০

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/১৭৬

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৪৮৩, ৫০০

হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই প্রথার উল্লেখ করে বলেন: “وهذا من باب مقابلة البدعة بمثلها ولا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة” (এটি বিদআতের মোকাবিলা বিদআত দিয়ে করার অন্তর্ভুক্ত, অথচ বিদআতকে কেবল সুন্নাহ সহীহাই মিটিয়ে দিতে পারে।)

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৪৯৯

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭/২৩১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৫০০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আবদুল্লাহ বিন মাসউদের মুসহাফের আবির্ভাব, সুন্নি-শিয়া দ্বন্দ্ব ইহুদিদের ভূমিকা:

ফিতনার স্ফুলিঙ্গ আবারও তখন জ্বলে ওঠে যখন ৩৯৮ হিজরির রজব মাসে শিয়ারা পবিত্র কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি, যা সাধারণ পাণ্ডুলিপি থেকে ভিন্ন ছিল, আহলে সুন্নাতের আলেমদের সামনে পেশ করে এর বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেয় এবং বলে যে এটি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর মুসহাফ। আলেমগণ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির একত্রিত হয়ে এটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। অবশেষে বাগদাদের সবচেয়ে বড় ফকিহ ইমাম আবু হামিদ আসফারাইনি (রহ.) ফতোয়া দেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি পড়া এবং এটি অবশিষ্ট রাখা ফিতনার কারণ; সুতরাং এটি ধ্বংস করে দেওয়া হোক, যেমনটি হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন।

এই ফতোয়ায় শিয়ারা রাগে বেসামাল হয়ে পড়ে এবং শেখ আবু হামিদ আসফারাইনি (রহ.)-এর বাড়িতে হামলা চালায়। তিনি কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে বের হতে সক্ষম হন। খলিফা কাদির জানতে পেরে কিছু লোক পাঠান যারা শিয়াদের মহল্লায় হামলা চালায়। এই সংঘর্ষে অনেক ঘরবাড়ি অগ্নিদগ্ধ হয়। শাবান মাসের মাঝামাঝি রাতে শিয়ারা বদ-দোয়ার মজলিস আয়োজন করে যেখানে তারা তাদের বিরোধীদের ধ্বংসের জন্য বদ-দোয়া করে। বেশ কয়েকদিন ধরে হাঙ্গামা চলতে থাকে। অবশেষে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে কোনো ওয়ায়েজ ফিতনা সৃষ্টি করবে না এবং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা হবে না।

বাগদাদে উমিদুল জিউশ আবু আলীর প্রশাসনিক পদ দশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এই সময়ে তিনি শোক মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছিলেন, ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ৪০১ হিজরিতে উমিদুল জিউশ মারা যান। শহরের নতুন প্রশাসক ফখরুল মুলক শোক পালনের অনুমতি দেন। ফলে ৪০২ হিজরির মহরম থেকে আবারও রাজপথে মিছিল বের হতে শুরু করে। আগের মতো শিয়ারা ঈদে গাদীর এবং সুন্নিরা ইয়াওমে গার পালন করতে শুরু করে। সেই সাথে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গাও শুরু হয়ে যায়। বাগদাদে ইহুদিরাও বসবাস করত, তারা এমন সব সুযোগে শিয়াদের পক্ষ নিত। মনে হয় যে দাঙ্গা বাধানোর পেছনে মাঝে মাঝে ইহুদিদের হাত থাকত; কারণ ৪৭৩ হিজরির তীব্র সুন্নি দাঙ্গায় যখন উভয় পক্ষ লড়তে লড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন জানা যায় যে এই আগুনে স্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্ষেপকারী ছিল এই লোকেরাই। এরপর শিয়া ও সুন্নি উভয়ই ইহুদিদের মহল্লায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানে অনেক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। [১]

বনু বুওয়াইহ-এর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব:

৪০৩ হিজরিতে বনু বুওয়াইহ-এর শাসক বাহাউদৌলা মারা যান এবং তার স্থলে তার পুত্র সুলতানুদৌলা নিজের খেতাব গ্রহণ করে শাসক হন। ৪১১ হিজরিতে সুলতানুদৌলা এবং তার ভাই ইরাকের শাসক মুশরিফুদৌলার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যার ফলে মুশরিফুদৌলা সুলতানুদৌলাকে সরিয়ে নিজে বাগদাদের শাসনভার গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর ৪১৬ হিজরিতে মুশরিফুদৌলা মারা যান, বাগদাদের শাসন বাহাউদৌলার আরেক পুত্র জালালুদৌলা লাভ করেন। [২]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৪৯৬, ৫০০, ৫২১, ৫২৭, ৫৬৩, ৫৭৩, ৬২৯, ৬৩৯, ৬৪৯, ৬৯৭, ৭০৭, ৭১০, আল-মুতাওয়াফ্ফা গদ মিন গায়র: ২/১৭০ থেকে ২০০।

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গবার: ২/২০৪

খলিফা কাদির বিল্লাহ ইসলাম ও খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্টি:

এই সময়ে খলিফা কাদির বিল্লাহ ইসলাম ও খিলাফতের মসনদের মর্যাদা পুনরায় বহাল করার জন্য নিজ সাধ্যমতো চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যদিও বুওয়াইহিদের চাপের কারণে তিনি খুব বেশি সফল হতে পারেননি, তবে পূর্ববর্তী খলিফাদের তুলনায় এই যুগে খলিফাকে কিছুটা ক্ষমতাধর দেখা যায়। তিনি সাহস করে আহলে সুন্নাতের অধিকারের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে সাধারণ মানুষ তাঁকে পছন্দ করতে শুরু করে এবং তিনি বুওয়াইহিদের মোকাবিলায় কিছুটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। [১]

সুলতান মাহমুদ গজনভীর আবির্ভাব এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা:

খলিফা কাদিরের শক্তিশালী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এই যে, এই যুগে আমরা সুলতান মাহমুদ গজনভীর তলোয়ারকে চমকাতে দেখি। গজনীর এই মুজাহিদ পূর্বসূরিদের চরিত্র ফুটিয়ে তুলে দীর্ঘকাল ধরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জিহাদের রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর পুরো জীবন জিহাদে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি খোরাসান, মধ্য এশিয়া এবং হিন্দুস্তানের বিশাল ভূখণ্ডে এক মহান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমানদের জন্য প্রায় দেড় শতাব্দী পর এশিয়ায় কোনো শক্তিশালী শাসক নসিব হয়। যদিও মাহমুদ গজনভীর বাগদাদ থেকে দূরত্ব ছিল অনেক, তবুও খিলাফতে বাগদাদের সাথে তাঁর অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। খলিফা কাদির তাঁকে ‘ইয়ামিন উদ-দৌলা’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। [২]

উবাইদি শাসকের খিলাত অগ্নিসাৎ:

মাহমুদ গজনভীর উত্থানের সাথে সাথে বাগদাদ খিলাফতের মর্যাদাও কিছুটা উন্নত হয়; কারণ এখন তাঁর অনুগতদের মধ্যে একজন শক্তিশালী শাসক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বাগদাদ খিলাফতের প্রতি মাহমুদ গজনভীর ভক্তি এমন ছিল যে, ৪০৩ হিজরিতে যখন উবাইদি শাসক আল-হাকিমের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তিনি যেন তাঁর ইমামতের বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হন, তখন গজনভী সেই চিঠিতে খুত্ব নিক্ষেপ করে তা পুড়িয়ে ফেলেন এবং দূতকে কঠোরভাবে অপমান করে ফেরত পাঠান। [৩] ৪১৫ হিজরিতে উবাইদি শাসক মাহমুদ গজনভীর জন্য খিলাত পাঠালে সুলতান তা খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং খলিফা নির্দেশ দেন যে তা যেন জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়। [৪]

খলিফা কাদির এবং সুলতান মাহমুদ গজনভী বাতিল আকিদা নির্মূলে সক্রিয়:

বুওয়াইহিরা এখন আহলে সুন্নাতের সমর্থনে কোনো বাধা দিতে পারছিল না, অথচ কয়েক বছর আগে খলিফাদের এমন আচরণের খেসারত পদচ্যুতি বা অন্তত লাঞ্ছনার মাধ্যমে দিতে হতো। এটি দেখে ৪০৮ হিজরিতে খলিফার সাহস বেড়ে যায়। তিনি বাগদাদের উলামাদের একত্রিত করে তাঁদের কাছ থেকে লিখিত স্বীকৃতি নেন যে তাঁরা মুতাজিলা ও রাফেজি মতবাদ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিচ্ছেন এবং যে ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এই ধরনের আকিদা প্রচার করবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯৭ থেকে ২৯৯

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ১৫/২১১

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৫৪৪, ৬৩৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৬০২

এই বিষয়ে একটি পত্র সুলতান মাহমুদ গজনভিকেও পাঠানো হয়েছিল এবং তাকিদ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি ভ্রান্ত আকিদা নির্মূল করার চেষ্টা করেন। সুলতান তেমনই করলেন এবং তাঁর বিজিত এলাকাগুলোতে কারামিতা, ইসমাইলিয়া, মুতাজিলা এবং জাহমিয়াদের তওবা করার আহ্বান জানালেন। যারা অস্বীকার করল তাদের শৃঙ্খলিত করা হলো এবং অনেক অবাধ্যকে হত্যাও করা হলো। [১]

মাহমুদ গজনভির পক্ষ থেকে খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখির উপহার

সুলতান মাহমুদ, কাদির বিল্লাহর কাছে পত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর বিজয়াভিযানের বিবরণ লিখে পাঠাতেন এবং সেই সাথে অত্যন্ত দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য উপহারসামগ্রীও প্রেরণ করতেন। ৪১৪ হিজরিতে হিন্দুস্তানে সফল অভিযান থেকে ফেরার পর সুলতান খলিফাকে গনিমতের মালে পাওয়া একটি অদ্ভুত পাখি পাঠান, যা আশেপাশে বিষের উপস্থিতি তৎক্ষণাৎ অনুভব করতে পারত এবং তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করত। হিন্দুস্তানি মহারাজারা এই পাখিকে দস্তুরখানে সাথে রাখতেন যাতে খাবারে বিষ মেশানো থাকলে তৎক্ষণাৎ জানা যায়। এই ঘটনাগুলো খলিফা কাদিরের প্রতি সুলতান মাহমুদ গজনভির মহাবত ও ভক্তির প্রমাণ ছিল। [২]

হজ কাফেলায় ডাকাতি, বাগদাদের উজিরের পাল্টা ব্যবস্থা

সেই সময় পর্যন্ত কারামিতাদের শক্তি ভেঙে পড়েছিল কিন্তু জাজিরাতুল আরব এবং এর পথগুলো যথারীতি অনিরাপদ ছিল। হাজিদের কাফেলাগুলো উপজাতীয় ডাকাতদের লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত হতো। ৪১৩ হিজরিতে ইরাকি হাজিদের কাফেলাকে বনু খাফাজা গোত্রের চুব সাওদা ডাকাতরা ইরাক সীমান্তের ‘আকাবা’র নিকটবর্তী একটি গিরিপথে ঘেরাও করে ফেলে। এর আগে তারা পথের পুকুরগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলেছিল এবং কুয়োর পানি তিক্ত মিশ্রণ মিশিয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী করে দিয়েছিল; ফলে কাফেলাটি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ছিল। ডাকাতরা তাদের পথ ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার দিনার দাবি করে। যখন কাফেলার লোকেরা এই অর্থ পরিশোধ করতে পারল না, তখন ডাকাতরা আক্রমণ করে বসল। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় পনেরো হাজার হাজি শহীদ হন এবং সওয়ারির পশুসহ তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। নিহতদের মধ্যে হাস্বলিদের মুফতিয়ে আজম হাসান বিন হামিদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই দুর্ঘটনার খবর শুনে বাগদাদের উজির ফখরুল মুলক সেনাপতি আলী বিন মাজইয়াদকে সক্রিয় করেন। তিনি দ্রুত বের হলেন এবং ধাওয়া করে অনেক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করলেন, যাদের দজলা নদীর তীরে বেঁধে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখা হলো যতক্ষণ না তারা মারা গেল। [৩]

বনু বুয়াইহ-এর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং গজনভির প্রতি তাদের ভীতি

বনু বুয়াইহ-এর শাসন এখন ধীরে ধীরে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বুয়াইহি শাসকরা জায়গায় জায়গায় একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে কিরমানের শাসক কাওয়ামুদ্দৌলা (আবু আল-ফাওয়ারিস) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাফেজিদের ওপর বিজয় লাভের জন্য সুলতান মাহমুদ গজনভির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং সুলতানও রাজনৈতিক কৌশলের খাতিরে তাঁকে সাহায্য করেন। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৫৭৪

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ১৫/১৫৯

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/২০৪, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৫৪৩

[৪] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৫৪৮

কওয়াম আদ-দাওলার জুলুম ও মৃত্যু:

কওয়াম আদ-দাওলাও এক অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। মদের নেশায় মত্ত হয়ে তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের চাবুক দিয়ে মারতেন। একবার তার উজির অতিষ্ঠ হয়ে তাকে কসম করালেন যে, যদি তিনি তাকে মারেন তবে তার (উজিরের) স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হবে। এরপর তিনি তাকে দুইশ চাবুক মারলেন এবং কসম করালেন যে তিনি এই জুলুমের কথা কাউকে জানাবেন না। ৪১৯ হিজরিতে কওয়াম আদ-দাওলার মৃত্যু হয়। বলা হয় যে, তার আমিররা তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে তাকে বিষ প্রয়োগ করেছিল। [১]

সুলতান মাহমুদের ইরান দখল:

সুলতান মাহমুদ গজনভি ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এরা সেই সব লোক ছিল যারা নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ মিটাতে পারছিল না এবং পিছু হটছিল। সুলতানের চূড়ান্ত অভিযান ৪১৯ হিজরিতে শুরু হয় যখন তিনি হিন্দুস্তান ও তুর্কিস্তানের সমস্ত রণাঙ্গন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এদিকে দুই বুওয়াইহি আমির: জালাল আদ-দাওলা এবং আবু কালিজারের মধ্যে ইরাকে যুদ্ধ চলছিল। তাদের মধ্যে সন্ধির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অবশেষে জালাল আদ-দাওলার মোকাবিলায় আবু কালিজার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

৪২০ হিজরির মহররম মাসে সুলতান মাহমুদ ইসফাহানসহ পুরো ইরান দখল করে নেন। বুওয়াইহি বংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রাই (বর্তমান তেহরান) সুলতানের সামনে পদানত হয়। এই অঞ্চলে অনেক ধর্মহীন রাফেজি ও বাতিনিদের ফাঁসি দেওয়া হয়। এখানকার রাফেজি শাসক মাজদ আদ-দাওলা বিন ফখর আদ-দাওলা (রুস্তম বিন আলী বিন বুওয়াইহ) এতটাই লম্পট ছিলেন যে তিনি পঞ্চাশজন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তার কোষাগার থেকে দশ লক্ষ দিনার বাজেয়াপ্ত করেন যা তিনি জুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছিলেন। সুলতান যখন তাকে এই পঞ্চাশটি বিয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন:

“এটি আমার পূর্বপুরুষদের প্রথা।”

এমন লম্পট শাসকদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিয়ে সুলতানি বাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে এমনকি বিলাদ আল-জাবাল এবং উত্তর ইরানের শেষ জেলা কাজভিনও পুনরুদ্ধার করা হয়। পরবর্তী দিনগুলোতে সুলতানের পতাকা আর্মেনিয়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে উড়তে থাকে। [২]

বাগদাদে রাফেজিদের কুফরি শব্দ সম্বলিত খুতবার ওপর নিষেধাজ্ঞা:

অন্যদিকে বাগদাদে খলিফার পক্ষ থেকে দ্বিনি নিদর্শনসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাগদাদে “জামে মসজিদ বারাথা” রাফেজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল যেখানে জুমার খুতবায় তারা হযরত আলী (রা.)-এর খোদায়ি দাবি পর্যন্ত করত। সেখানে জুমার খুতবায় বলা হতো:

“সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ভাই আমিরুল মুমিনি হযরত আলী বিন আবি তালিবের ওপর, যিনি জরাজীর্ণ খুলিগুলোকে বাকশক্তি দান করেন এবং সেগুলোকে জীবিত করেন, যিনি মানবিক ও খোদায়ি গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৯ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/১৬৫; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪২০ হিজরি।

নবম খণ্ড | তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

কাদির বিল্লাহ এটি শুনে একটি রিসালা (পুস্তিকা) রচনা করেন যাতে রাফেজি ও মুতাজিলাদের আকিদার খণ্ডন ছিল। এই রিসালাটি সাধারণ মানুষের সমাবেশে পড়ে শোনানো হয়েছিল। এরপর জামে বারাথায় শিয়া খতিবের পরিবর্তে সুন্নি খতিব নিয়োগ করা হয়।

যখন সুন্নি আলেম সেখানে জুমার খুতবা শুরু করলেন, তখন উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে ইট ও পাথর দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল (আক্রমণ করল)। খলিফা যখন এই বেদনাদায়ক সংবাদ পেলেন, তখন তিনি জামে বারাথা বন্ধ করে দিলেন এবং জুমার নামাজ বন্ধ করে দিলেন। অবশেষে শিয়াদের নেতা সৈয়দ শরীফ মুর্তজা একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন: “এটি ছিল মূর্খ সাধারণ মানুষের কাজ যাদের জানা ছিল না তারা কী করছে।”

তখন খলিফা জামে বারাথায় সুন্নি ইমামের ইত্তাদায় পুনরায় জুমার নামাজ ও খুতবার অনুমতি প্রদান করেন। এটি ৪২০ হিজরির ঘটনা। [১]

সুলতান মাহমুদ ও খলিফা কাদিরের মৃত্যু:

৪২১ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ গজনভি ইন্তেকাল করেন। [২] এই সময় পর্যন্ত সুলতান বনু বুওয়াইহকে অনেক দূর পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিলেন এবং এখন এই বংশের কাছে কেবল ইরাক অবশিষ্ট ছিল।

পরের বছর ১১ জিলহজ ৪২২ হিজরিতে কাদির বিল্লাহও ৪১ বছর ৩ মাসের দীর্ঘ খিলাফতের পর ইহকাল ত্যাগ করেন। [৩]

রোমানদের আক্রমণ:

কাদির বিল্লাহর শেষ দিনগুলোতে রোমানদের একটি ব্যর্থ আক্রমণের ঘটনা ইতিহাসের এক অদ্ভুত বিষয়। গত কয়েক দশক ধরে মুসলিম বিশ্বের ওপর রোমানদের আক্রমণের ধারা চলছিল। এর কারণ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অন্যথায় সেই যুগে মুসলমানদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। তা সত্ত্বেও রোমানরা মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণের সংকল্প থেকে সরে আসেনি। তাই ৪২১ হিজরিতে রোমান সম্রাট রোমানোস অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং কোনো বাধা ছাড়াই আলেপ্পোর (হালব) নিকট পৌঁছে যান।

মুসলমানদের সৌভাগ্য ছিল যে, সেটি ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন এবং রোমান বাহিনী পানির সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এমন অবস্থায় সম্রাটের এক নায়েবের (প্রতিনিধি) বিশ্বাসঘাতকতা বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়। এরই মধ্যে একদল আরব বেদুইন বাহিনীর ওপর অতর্কিত নৈশ হামলা চালায়। সম্রাট মনে করেছিলেন যে কোনো বিশাল বাহিনী আক্রমণ করেছে; তাই তিনি পেছনে না তাকিয়েই পালিয়ে যান। বাকি বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বিশ্বকে এক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেন। [৪]

পরের বছর সম্রাট পুনরায় আক্রমণ করেন এবং এবার তার সাথে খুব বেশি সৈন্য ছিল না, কিন্তু মুসলমানরা সীমান্ত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং সম্রাট এডেসা (রুহা)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকা দখল করে নেন। [৫]

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/২৩৯; আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৪২০ হিজরি।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৬২৮।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৬৩৭।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৬৩০; তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৯৭; আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৪২১ হিজরি।

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৪২২ হিজরি।

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

আল-কাযিম বি-আমরিলাহ

আবদুল্লাহ বিন আহমদ আল-কাদির

যিলহজ ৪২২ হিজরি থেকে শাবান ৪৬৭ হিজরি

ডিসেম্বর ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ

১২ যিলহজ ৪২২ হিজরিতে আল-কাদির বিলাহর পুত্র আবু জাফর আবদুল্লাহ ‘আল-কাযিম বি-আমরিলাহ’ উপাধি নিয়ে খিলাফতের মসনদে বসেন। তাঁর পিতার বিপরীতে তিনি ছিলেন একজন দুর্বল ও সাহসহীন ব্যক্তি। তদুপরি সুলতান মাহমুদ গজনভিও ইন্তেকাল করেছিলেন; তাই বাগদাদ খিলাফতের রাজনৈতিক মর্যাদা আগের মতোই হ্রাস পেতে থাকে।

এই সময়ে শাসক জালালুদ্দৌলার আমিরদের মধ্যে ফাটল ধরে, যার ফলে বুওয়াইহি সরকারও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, বাগদাদে অরাজকতার রাজত্ব শুরু হলো। প্রতি বছর শোক মিছিল বের হতে লাগল। আল-কাদির বিলাহ এগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, কিন্তু আল-কাযিমের সেই সাহস ছিল না; ফলে প্রতি বছর মহররম মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি রুটিনে পরিণত হলো। [১]

বনু বুওয়াইহ অভ্যন্তরীণ ভাঙনের শিকার:

অরাজকতা অপরাধীদের সাহসী করে তুলেছিল এবং চারদিকে লুটতরাজের বাজার গরম ছিল। ৪২২ হিজরি থেকে ৪৩৫ হিজরি পর্যন্ত দীর্ঘ তেরো বছর শহরে গুন্ডাদের রাজত্ব ছিল। সেনাবাহিনী ও পুলিশ ছিল অসহায়। সরকারি কোষাগার ছিল শূন্য। তুর্কি সৈন্যদের বেতন দিতে সামান্য দেরি হলেই তারা হাঙ্গামা শুরু করত এবং জালালুদ্দৌলাকে বন্দি করত। তিনি নিজের স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি ও আসবাবপত্র বিক্রি করে খরচের ব্যবস্থা করতেন। একবার তো খরচ মেটানোর জন্য তাঁকে নিজের পোশাক পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল। [২]

বাসাসিরির জুলুম এবং জালালুদ্দৌলার উদাসীনতা:

অবশেষে জালালুদ্দৌলা কৌশলগত কারণে পূর্ব বাগদাদের কারখ মহল্লায় যেখানে শিয়ারা বসবাস করত, সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং বাগদাদের কর্তৃত্ব একজন তুর্কি শিয়া নেতা বাসাসিরি (আরসালান তুর্কি)-র হাতে তুলে দেন। [৩] এই ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। সে বাগদাদের জনগণের ওপর চরম জুলুম চালায় এবং খলিফাকেও নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। [৪]

বাসাসিরির জুলুম সুন্নিদের আরও উত্তেজিত করে তোলে এবং সুন্নি-শিয়া দাঙ্গার আগুন আরও তীব্র হয়। এই পরিস্থিতির প্রভাব সেনাবাহিনীর ওপরও পড়ে এবং সরকারের ওপর তাদের আস্থা শেষ হয়ে যায়। ৪৩৭ হিজরিতে তুর্কি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং জালালুদ্দৌলার প্রাসাদ পর্যন্ত লুট করে নেয়। [৫][৬]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৬২৯, ৬৩৬, ৬৫০, ৬৯৭, ৭০৩, ৭০৭, ৭১০।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৬২৯, ৬৩৬, ৬৪১, ৬৪২, ৬৫৩, ৬৫৮।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৫৯।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৭৬৪, ৭৬৫।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৭২৯।

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪২৭ হিজরি।

জালাল উদ্দৌলার শাহেনশাহে আজম উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা:

জালাল উদ্দৌলার সুনাম পুরোপুরি ধসে পড়েছিল, কিন্তু তার নিজের শান-শওকত বাড়ানোর বাতিক ছিল। ৪২৯ হিজরিতে তিনি ওলামায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠের আপত্তি সত্ত্বেও নিজের নামের সাথে “শাহেনশাহে আজম, মালিকুল মুলুক” উপাধি যুক্ত করেন। তিনি এই নির্দেশও দেন যে, প্রত্যেক নামাজের সময় তার জন্য নাকাড়া (দামামা) বাজানো হবে। খলিফা এই বিদআত পছন্দ করতেন না, কিন্তু জালাল উদ্দৌলার জেদের সামনে চুপ হয়ে যান। তবে সাধারণ জনগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং জুমার খুতবায় যখন কিছু খতিব জালাল উদ্দৌলার নামের সাথে এই উপাধিগুলো পাঠ করেন, তখন মানুষ পাথর নিক্ষেপ করে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে। [১]

মুম্বুর্খু খেলাফত এবং সেলজুকদের উত্থান

জালাল উদ্দৌলার অদ্ভুত সব নির্দেশ ও দাবির কারণে সাধারণ জনগণ, সেনাবাহিনী এবং খলিফা—সবাই অতিষ্ঠ ছিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ৪৩৪ হিজরিতে খলিফা ওলামা ও ফুকাহাদের সাথে নিয়ে বাগদাদকে চিরতরে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু সুলতান মাহমুদ গজনভীর পর গজনভী শাসনের উত্তরসূরিরা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত থাকার কারণে বাগদাদকে কোনো সাহায্য করার মতো অবস্থায় ছিল না, তাই মনে হচ্ছিল যে আব্বাসীয় খেলাফত হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই নাজুক সময়ে আল্লাহ খেলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং উম্মতে মুসলিমাহর সীমান্ত রক্ষার জন্য সেলজুকদের মনোনীত করেন।

সেলজুক ছিল একটি অখ্যাত তুর্কি গোত্র যাদের শাসন কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গোত্রের সর্দার ছিলেন একজন সাহসী তুর্কি তুঘরিল বেগ। তিনি তার নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার মাধ্যমে তুর্কিদের ঐক্যবদ্ধ করে কয়েক বছরের মধ্যে তুর্কিস্তানের বিশাল এলাকা দখল করে নেন। সুলতান মাহমুদ গজনভীর মৃত্যুর পর গজনভী শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তাই সেলজুকরা তুর্কিস্তানের পর খোরাসানেরও বড় একটি অংশ নিজেদের শাসনাধীন করে নেয়।

তুঘরিল বেগ ৪২৯ হিজরিতে নিশাপুর এবং ৪৩৩ হিজরিতে তাবারস্তানও দখল করেন। পরের বছর খাওয়ারিজম, রে, কাজভিন এবং কারমানও তার সামনে নতি স্বীকার করে। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং বাগদাদের খেলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা জরুরি মনে করতেন; তাই তিনি ৪৩৫ হিজরিতে জালাল উদ্দৌলা বুয়াইহিকে পত্র লিখে তাগিদ দেন যেন তিনি জনগণের সাথে সদাচরণ করেন এবং খেলাফতের সম্মান বজায় রাখেন, অন্যথায় তাকে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। [২]

জালাল উদ্দৌলার মৃত্যু এবং বাগদাদে আবু কালিজার বুয়াইহির শাসন:

জালাল উদ্দৌলার এই পত্র অনুযায়ী আমল করার সুযোগ হয়নি, তার আগেই তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। এখন কার্যত তার ভাই আবু কালিজার “সুলতান উদ্দৌলা” এবং “মহিউদ্দিন” উপাধি ধারণ করে বাগদাদের শাসক হন। অন্যদিকে তার ছেলে “আল-মালিকুল আজিজ”-এর...

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৬৬৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৬৬৯, ৬৮৯

উপাধিসহ আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

চার বছর পর ৪৪০ হিজরিতে আবু কালিজারও মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র আবু নাসর ফিরোজ “আল-মালিকুর রহিম” উপাধি নিয়ে এই পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই ছিলেন বনু বুওয়াইহ-এর শেষ শাসক। [২]

সেলজুকরা ইসফাহান জয় করে নিল:

৪৪২ হিজরিতে তুঘরিল ইসফাহানও জয় করে নেন, এভাবে তিনি খোরাসানের সাথে সাথে সমগ্র ইরানের শাসক হয়ে যান। খলিফার পক্ষ থেকে তুঘরিল বেগকে সালতানাতের ফরমান এবং খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) পাঠানো হয়। তুঘরিল কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ফিরতি বার্তার সাথে খলিফাকে বিশ হাজার দিনার উপহার হিসেবে পেশ করেন। [৩]

সেলজুকদের বিজয়ের পরিধি এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত:

এই সময়ে ৪৪০ হিজরিতে তুঘরিলের ভাই ইব্রাহিম ইনাল বহু বছর পর রোমের সীমান্তে আক্রমণাত্মক জিহাদের সূন্যত পুনরুজ্জীবিত করেন এবং কনস্টান্টিনোপল থেকে মাত্র পনেরো মঞ্জিল দূরে পৌঁছে যান। তিনি এক লক্ষ রোমানকে বন্দী করেন এবং দশ হাজার গরুর গাড়িতে বোঝাই করে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে এই অভিযান থেকে ফিরে আসেন। রোম সম্রাট বন্দীদের মধ্য থেকে কয়েকজন রাজপুত্রের মুক্তির আবেদন জানিয়ে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ দেওয়ার প্রস্তাব করলে তুঘরিল বেগ অনুগ্রহ করে কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদের মুক্তি দেন। [৪]

আহলে সুন্নাত ও শিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

বাগদাদে শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা আগের মতোই বিদ্যমান ছিল। মহররম মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাগরিক জীবনের একটি রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৪৪১ হিজরিতে সরকার আবারও শোক মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করে, কিন্তু শিয়ারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে। এই হাঙ্গামা আবারও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের রূপ নেয় এবং উভয় পক্ষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শিয়ারা তাদের এলাকা কারখের চারপাশে একটি আলাদা প্রাচীর নির্মাণ করে যাতে সুন্নিরা তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

৪৪২ হিজরিতে শিয়া ও সুন্নি আলেমরা দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এটি সিদ্ধান্ত হয় যে ভবিষ্যতে কেউ কারো জানমালের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। শিয়ারা তাদের এলাকা কারখে সমস্ত সাহায্যে কেরামের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়ার আয়োজন করে এবং আহলে সুন্নাতের মসজিদে নামাজ আদায় করে। আহলে সুন্নাতের একটি বড় প্রতিনিধি দল হযরত আলী এবং হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মাজার ও নিদর্শনসমূহ জিয়ারতের জন্য যায়।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৬৮৯, ৭০৬

[২] মজার ব্যাপার হলো, এরপর “আল-মালিক” উপাধিটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে পরবর্তী আড়াই-তিন শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ শাসক ও নবাবরা এই ধরনের উপাধি পছন্দ করতেন। এভাবে “দাওলা” (উপাধি)-এর যুগ শেষ হয় এবং “মালিক” (উপাধি)-এর যুগ শুরু হয়। আল-মালিকুল মুজাফফর, আল-মালিকুন নাসির, আল-মালিকুল আশরাফ, আল-মালিকুল আদিল, আল-মালিকুস সালিহ-এর মতো “উপাধিগুলোর” একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যাদের ব্যক্তিদের পরবর্তী যুগে সর্বত্র দেখা যাবে।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৬৬৯ থেকে ৬৮৯, ৭০৭, ৭০৮

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৭০০, ৭০৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কিন্তু পরের বছর মহররম মাসে কিছু দুষ্কৃতকারী একটি উস্কানিমূলক কাজ করে, যার ফলে দাঙ্গা আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তারা বড় বড় ফলক স্থাপন করে যাতে লেখা ছিল:

“মুহাম্মদ ও আলী হলেন শ্রেষ্ঠ মানব। যে তা মানে, সে কৃতজ্ঞ। যে মানে না, সে কাফের।”

এর প্রতিবাদে আহলে সুন্নাত যখন বিক্ষোভ করল, তখন পুনরায় লড়াই শুরু হয়ে গেল যা দুই মাস পর্যন্ত চলতে থাকে এবং এতে উভয় পক্ষ একে অপরের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে চরম সীমায় পৌঁছে যায়। পরের বছর শিয়ারা পুনরায় এই ধরনের ফলক বোলায় এবং আবারও দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। তাজাকি নামক এক ব্যক্তি এই লড়াইগুলোতে শিয়াদের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে অংশ নিতে থাকে। রাফেযীরা তাকে খুব ভয় পেত। [১]

তুঘরিল সেলজুকির বাগদাদ আগমন:

এদিকে তুঘরিল বেগ ততদিনে সুলতান উপাধি পেয়ে গিয়েছিলেন, তার শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৪৪৬ হিজরিতে তিনি আজারবাইজান দখল করে এশিয়া মাইনর হয়ে রোমানদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং বাইজেন্টাইন রোম তার তলোয়ারে আবারও হারুন্নুর রশিদ ও মুতাসিমের ধার দেখতে পাচ্ছিল।

এই সময়ে তুঘরিল বেগ বাগদাদের অশান্ত পরিস্থিতির খবরও ক্রমাগত পাচ্ছিলেন। সেখানে তুর্কি সর্দার বাসাসিরি হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং অরাজকতা চরমে পৌঁছেছিল। অবশেষে সুলতান তুঘরিল বেগ প্রয়োজনীয় মনে করলেন যে, বাগদাদ গিয়ে শাসনকার্য সংশোধন করা উচিত এবং দুর্বল ও ভ্রান্ত আকিদার রাফেযী বুওয়াইহি শাসনের অবসান ঘটানো উচিত। রমজান ৪৪৭ হিজরিতে সুলতান তুঘরিল অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বাগদাদ পৌঁছান। খলিফা কায়েম এবং বাগদাদের আমীরগণ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

তুঘরিল বাগদাদের প্রশাসনিক বিষয়গুলো সংশোধন করেন এবং বুওয়াইহি শাসক আল-মালিকুর রহিমকে ক্ষমতাচ্যুত করে বনু বুওয়াইহি শাসনের অবসান ঘটান। আল-মালিকুর রহিমকে রে-এর দুর্গে বন্দি করা হয় যেখানে তিন বছর পর ৪৫০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

বাগদাদের আমীরগণ তুঘরিলের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন এবং তুঘরিল খলিফাকে আশ্বস্ত করেন যে, তার তলোয়ার আব্বাসীয় খিলাফতের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। সুলতান তুঘরিল খিলাফত দরবারের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ নিজের ভাতিজি আরসালান খাতুনকে খলিফার সাথে বিবাহ দেন। এভাবে খলিফা ও সেলজুকদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। [২]

বাসাসিরির ষড়যন্ত্র... খলিফার নির্বাসন:

বাগদাদের ফিতনাবাজ তুর্কি আমীর বাসাসিরি তুঘরিলের আনুগত্য স্বীকার করেনি, বরং তার আগমনে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে ছিল একজন কটুর রাফেযী এবং আব্বাসীয় খিলাফতের স্থিতিশীলতা সহ্য করতে পারছিল না। সুলতান তুঘরিলের বাগদাদ ত্যাগের পর সে এক বিশাল ষড়যন্ত্র শুরু করে যার উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদ থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটানো।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭১৭/১৫, ৭১৯, ৭২১; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২৭০/২ থেকে ২৭৮

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭২৭/১৫; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২৯৭/২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

সে মিশরের উবাইদি শাসকদের সাথে যোগাযোগ করে নিজের জন্য তাদের প্রতিনিধিত্বের সনদ লাভ করে এবং ৪৫০ হিজরিতে পুরো ইরাকে সুলতান তুঘরিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই সাথে বাগদাদে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, সুলতান তুঘরিল হামাদানে বিদ্রোহীদের অবরোধের মুখে পড়েছেন। এ কথা শোনা মাত্রই বাগদাদের সমস্ত সৈন্য সুলতান তুঘরিলের সাহায্যের জন্য রওনা হয়ে যায়। শহরটি রক্ষী বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে পড়ে।

বাসাসিরি এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল, সে দ্রুত বাগদাদের দিকে অগ্রসর হলো। বাগদাদবাসী তাকে ঘৃণা করত এবং তার জুলুমের ভয়ে ভীত ছিল। তারা শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করল। খলিফা কায়েমও পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। অবশেষে ৮ জিলকদ ৪৫০ হিজরিতে বাসাসিরি সশস্ত্র শিয়াদের এক বিশাল জনশ্রোত নিয়ে বাগদাদে এসে পৌঁছাল। এই লোকেরা উবাইদি সাম্রাজ্যের সাদা পতাকা বহন করছিল। কিছু খাদেম এই মিছিলের সামনে একটি বিশাল ফলক বহন করে চলছিল যাতে লেখা ছিল:

“আল-ইমাম আল-মুস্তানসির বিল্লাহ, আবু তামিম, আমিরুল মুমিনীন।”

বাগদাদের শিয়ারা এই মিছিলকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাগত জানায় এবং বাসাসিরিকে তাদের মহল্লা কারখে অবস্থান করায়। মজার ব্যাপার হলো, বাগদাদের শিয়ারা ছিল মূলত ইসনা আশারি, অন্যদিকে উবাইদি ইমাম ছিল ইসমাইলি। শিয়াদের এই দুই দল একে অপরকে কাফের বলত। কিন্তু আহলে সূন্নাহের শত্রুতায় তারা উভয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। তারা মিলেমিশে বাগদাদের সরকারি ভবনগুলো লুটতরাজ ও ধ্বংস করতে শুরু করে। আদালতের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং দপ্তরের সমস্ত ফাইলপত্র তুলে নিয়ে যায়। এরপর খলিফাকে পদচ্যুত করার ঘোষণা দিয়ে উবাইদি শাসকের নামে খুতবা জারি করা হয় এবং তার নামেই মুদ্রা তৈরি করা হয়।

খলিফা কায়েম প্রাসাদে অবরুদ্ধ এবং অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। রাফেজিদের ভিড় প্রাসাদটি ঘিরে রেখেছিল। বাসাসিরি খলিফা কায়েমকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এই সময়ে খলিফা বাসাসিরির সেনাবাহিনীর একজন আরব সরদার কুরাইশ বিন বাদরানের সাথে যোগাযোগ করেন। এই ব্যক্তি খলিফার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল কিন্তু সেই সময়ে কৌশলগত কারণে বাসাসিরির সাথে ছিল। খলিফা তার পরিবার-পরিজন এবং অনুগতদের জন্য তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন এবং সে নিজের দায়িত্বে এর জামিনদার হয়। খলিফা খেলাফত প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলে ইবনে বাদরান তাকে তার পরিবারসহ নিজের তাঁবুতে নিয়ে যায়। বাসাসিরি এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় কিন্তু ইবনে বাদরান খলিফার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে রাজি হয়নি। দীর্ঘ তর্কের পর সিদ্ধান্ত হলো যে, খলিফাকে শহরের বাইরে বন্দি করে রাখা হবে।

খলিফা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন যেন তাকে তার পূর্বপুরুষদের এই স্মৃতিবিজড়িত স্থানে জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করতে দেওয়া হয়, কিন্তু বাসাসিরি তা মানেনি এবং তাকে বাগদাদের বাইরে একটি দুর্গে একাকী নজরবন্দি করে রাখে। এরপর শহরে রাফেজিদের জন্য প্রতিটি দিন ছিল ঈদের মতো এবং প্রতিটি রাত ছিল শবে বরাতের মতো। খেলাফত প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে লুট করা হয়, সেখানে একটি পেয়লা পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখা হয়নি। আজানে “হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল” শব্দগুলো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিয়াদের রীতিনীতি চালু করা হয়। বাগদাদের সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর প্রাণভরে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কত মানুষকে দজলা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হলো এবং কতজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।

খলিফার উজির আবুল কাসিম বিন মাসলামাহ, যিনি “রাইসুল রুয়াসা” নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন তার সময়ের একজন বড় আলেম, মুহাদিস এবং মুত্তাকি...

মানুষ ছিলেন। খলিফা তাদের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বাসাসিরি খলিফাকে বন্দি করার পর আবু আল-কাসিম ইবনে মুসলিমাহর সাথে অত্যন্ত লোমহর্ষক আচরণ করেন। তাকে একটি উটের ওপর বসিয়ে বাগদাদে এমনভাবে ঘোরানো হয় যে, একজন সৈন্য চামড়ার টুকরো দিয়ে তাকে চড় মারছিল। কারখের শিয়া সম্প্রদায় তাকে গালিগালাজ করছিল; তার ওপর পুরনো জুতো ছুড়ে মারছিল এবং তাকে অভিশাপ দিচ্ছিল। এরপর তাকে শিংযুক্ত ষাঁড়ের চামড়া পরানো হয়। পরিশেষে তার চোয়ালে লোহার হুক ঢুকিয়ে ত্রুশবদ্ধ করা হয়। তিনি সারাদিন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ বিকেলে তার প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার সময় এই কথাগুলো বলছিলেন:

“الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي سَعِيدًا وَأَمَاتَنِي شَهِيدًا”

(আল্লাহর শোকর, যিনি আমাকে সুখী অবস্থায় জীবিত রেখেছেন এবং শাহাদাতের মৃত্যু দান করেছেন।) [১]

সুলতান তুঘরিলের হাতে খিলাফতের পুনরুদ্ধার

এক বছর পর্যন্ত বাগদাদে রাফেজি মতবাদের এমন দাপট ছিল যে আহলে সুন্নাত গত দিনগুলোর তিক্ততা ভুলে গিয়েছিল। এই সময়ে সুলতান তুঘরিল বিদ্রোহের সেই আগুন নেভাতে ব্যস্ত ছিলেন যা বাসাসিরি প্রজ্বলিত করেছিল এবং যার কারণে খোদ সুলতানের ভাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক মাস ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। বাগদাদবাসী অধীর আগ্রহে সুলতান তুঘরিলের বিজয়ের জন্য দোয়া করছিল। তাদের আশা এখন কেবল তার সাথেই যুক্ত ছিল। অবশেষে সুলতানের বিজয়ের খবর পৌঁছাল। বাগদাদে আনন্দের একটি ঢেউ বয়ে গেল। কিন্তু রাফেজিদের ভয়ে কেউ তা প্রকাশ করতে পারছিল না।

সুলতান তুঘরিলের পূর্ণ মনোযোগ এখন বাগদাদের দিকে ছিল, তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল খলিফার জীবন রক্ষা করা, যিনি বাসাসিরির একজন আমির মুহারিশ ইবনে মাজাল্লির কাছে আনবারের আশেপাশে নজরবন্দি ছিলেন। তুঘরিল বাসাসিরির সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে প্রথমে একটি হুমকি সম্বলিত চিঠি লিখলেন, তাদের রাফেজিদের সঙ্গে দেওয়ার জন্য কঠোর তিরস্কার করলেন এবং দাবি করলেন যে খলিফাকে যেন বাগদাদে তার পদে পুনর্বহাল করা হয়, অন্যথায় সেলজুক বাহিনীকে বাগদাদের দিকে যাত্রা করতে হবে।

বাসাসিরির সাথে থাকা কুরাইশ ইবনে বদরান এই চিঠি পড়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং বাসাসিরিকে বোঝালেন যে তুঘরিলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বাসাসিরি যুদ্ধে অনড় রইলেন। তিনি নিজের সমর্থকদের সাথে বাগদাদ থেকে বের হলেন এবং রাফেজিদের বড় সংখ্যার বিজয়ের ওপর বিশ্বাস রেখে বাসিত নামক স্থানে পৌঁছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

এই সময়ে খলিফাকে ‘আকবারা দুর্গ’-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা বাগদাদ থেকে ২১ মাইল দূরে ছিল। সুলতান তুঘরিল তার দরবারের সম্মানিত কর্মকর্তাদের দূত হিসেবে সেখানে পাঠালেন। দুর্গের প্রহরীরা পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে আগেই খলিফার অনুগত হয়ে গিয়েছিল; তারা কোনো বাধা দেয়নি এবং সুলতানের দূতরা খলিফাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে পেশ করে তার স্বাধীন মর্যাদার পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দিলেন।

এই সময়ে সুলতান তুঘরিল নিজে বাগদাদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি এখানকার প্রশাসনিক বিষয়গুলো সংশোধন করে খলিফার খিদমতও আঞ্জাম দিলেন।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৫/৭৫৭ থেকে ৭৫৯।

হাজিরা দিলেন এবং নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো বর্ণনা করে এত দীর্ঘ সময় বাগদাদ থেকে দূরে থাকার জন্য ক্ষমা চাইলেন। ২৫ ফিলকদ খলিফা আল-কায়েম এক জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সুলতান তুঘরিলের সাথে বাগদাদে পৌঁছালেন এবং পুনরায় খেলাফতের আসনে সমাসীন হলেন।

কিছু দিন পর তুঘরিল সেনাবাহিনী নিয়ে বাসাসিরিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বের হলেন। তিনি একটি বাহিনীকে ফাদাক পাঠিয়ে প্রতিপক্ষের জন্য সিরিয়া ও মিশরের দিকে পলায়নের পথ বন্ধ করে দিলেন। দ্বিতীয় বাহিনী নিয়ে তিনি ওয়াসিত পৌঁছালেন। বাসাসিরি খোলা ময়দানে মোকাবিলা করলেন কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। বাগদাদ থেকে তার সাথে বের হয়ে বিজয়ের রঙিন স্বপ্ন দেখা রাফেযীরা বিপুল সংখ্যায় নিহত হলো, অধিকাংশ পালিয়ে গেল, বাসাসিরি এক গোলামের হাতে নিহত হলেন এবং তার মাথা কেটে বাগদাদে খেলাফত প্রাসাদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে দীর্ঘ সময় পর আব্বাসী খলিফারা ভ্রান্ত আকিদার আমিরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হলেন।

এটা তো স্পষ্ট যে, খেলাফত প্রাসাদ এখন আর হারুনুর রশিদ এবং মুতাসিম বিল্লাহর যুগের মতো শান-শওকত ফিরে পেতে পারত না, তবে এটাও কম ছিল না যে, খেলাফত দরবার এমন কিছু সত্যনিষ্ঠ রক্ষক পেয়েছিল যারা এর সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখাকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য মনে করত।

খলিফা আল-কায়েম আরও নয় বছর জীবিত ছিলেন। এখন সেলজুক সুলতানরা ছিলেন তার খাদেম এবং চারদিকে বনু আব্বাসের খুতবা ও মুদ্রা প্রচলিত ছিল। আল-কায়েম পতনের চরম সীমা দেখার পর এই সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লেন। তিনি সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিলেন এবং অধিকাংশ সময় জায়নামাজে ইবাদতে কাটাতে লাগলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ৪৭ বছর পর ৪৬৭ হিজরির শাবান মাসে তার ইন্তেকাল হয়। [১]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৫৬৫ থেকে ৫৭৬।

বনু বুওয়াইহ-এর যুগ এক নজরে

বনু বুওয়াইহ প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে ইরাক ও পারস্য শাসন করেছে, এই সময়ে ১১৬ বছর পর্যন্ত বাগদাদও তাদের অধীনে ছিল। সামগ্রিকভাবে বনু বুওয়াইহ-এর যুগ মুসলিম বিশ্বের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা ও আজমাইশ। এই সরকার ছিল সেই প্রতিশোধমূলক আবেগের বহিঃপ্রকাশ যা গত তিন শতাব্দী ধরে মজুসী মস্তিস্কে লালিত হচ্ছিল। এই পরিবার একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্যের কেন্দ্রকে এক ক্ষমতাহীন দাসে পরিণত করে পুরো মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল।

এই যুগে মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব ক্রমাগত হুমকির মুখে ছিল। রোমানরা ইসলামী সীমান্তগুলো পদদলিত করতে থাকে এবং মুসলমানদের মান-সম্মান প্রতিনিয়ত ধূলিসাৎ হতে থাকে। কিন্তু অনারব মদে মত্ত বনু বুওয়াইহ তাদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল। তারা আহলে সুন্নাতকে কষ্ট দিতে, তাদের নিদর্শনাবলীর অবমাননা করতে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিতে ব্যস্ত থাকত। তারা এই দেড় শতাব্দীতে প্রাচীন শিয়া মতবাদের স্থলে রাফেযী মতবাদ নিয়ে আসতে এবং একেই শিয়া মতবাদ ও প্রকৃত ইসলাম হিসেবে পরিচিত করার আশ্রয় চেষ্টা চালায়। মরুরমের রসম-রেওয়াজসহ এমন সব বিদআত চালু করে যা আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ও ফাসাদের কারণ হয়ে আছে। তাদের কাছে শাসনের আসল উদ্দেশ্যই ছিল আরবদের ইসলামকে মিটিয়ে দিয়ে মনগড়া ইসলাম চালু করা।

বনু বুওয়াইহ এবং সۛۛۛۛۛ কিরামের মাযহাব:

বনু আব্বাসের উত্থানের যুগে বিদ্রোহকারী অনেক সঠিক বংশীয় সۛۛۛۛۛদের অবস্থা আমরা পড়েছি এবং এটি প্রমাণ করেছি যে, খলিফাদের সাথে তাদের বিরোধ ধর্মীয় নয় বরং রাজনৈতিক ছিল। তাদের একটি বড় অংশ একটি পরিচিত পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল অর্থাৎ মুহাম্মদ নাফসে যাকিয়ার পরিবার। তাদের পর তাদেরই কিছু ভাই ও শুভাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহ করতে থাকে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ সফলতার থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। কেবল একজন ব্যক্তি ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ মরক্কোতে “দাওলাতে ইদ্রিসিয়া” সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এটি প্রমাণিত যে, তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরির আহলে সুন্নাতের আকিদার ওপর অটল ছিলেন। বাকিদের মধ্যে অনেকেই বনু আব্বাসের খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং তাদের দরবারে সম্মানিত সদস্য হিসেবে ছিলেন। হযরত মুসা কাজিম এবং হযরত আলী রেযা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তো বনু আব্বাসের রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে গণ্য হতেন। এটিও নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিচিত সۛۛۛۛۛগণ উপস্থিত ছিলেন, ততক্ষণ শিয়া মতবাদ তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ছিল। তাঁদের ইন্তেকালের পরেই শিয়া মতবাদ থেকে হঠাৎ বিভিন্ন শাখা বের হয় এবং প্রতিটি শাখা একটি আলাদা ধর্মের রূপ ধারণ করে।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (ষষ্ঠ খণ্ড)

আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি যে, মামুনুর রশিদের ওপর শিয়া মতবাদের প্রভাব শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত জাফর সাদিক-এর নাতি আলী রেজা তাঁর সাথে ছিলেন, ততক্ষণ তিনিও শিয়া মতবাদের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছে যান যে, হযরত আলী-কে হযরত আবু বকর ও উমর-এর ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে শুরু করেন। যদি হযরত আলী রেজা জীবিত থাকতেন, তবে তিনি অবশ্যই মামুনকে সতর্ক করে এই ভুল আকিদা থেকে বিরত রাখতেন। এরাই ছিলেন প্রকৃত সাদাত, যাদের শিয়া মতবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না।

আমরা এখানে আবারও এই কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজ ইহুদি ও মদিনার মুনাফিকরা শুরু করেছিল। এরপর ইহুদি চর আবদুল্লাহ বিন সাবা মূল ইসলামের পরিবর্তে একটি বিকল্প ধর্ম নিয়ে আসার আশ্রয় চেষ্টা করে। এটি সত্য যে, কুফাবাসীদের মধ্যে শিয়া মতবাদের সূচনা হয়েছিল হযরত আলী-র প্রতি ভালোবাসার আতিশয্য থেকে এবং ইয়াজিদের শাসনামলে সাদাতদের ওপর নেমে আসা বিপদ-আপদ মুসলমানদের মনে সাদাতদের প্রতি সহমর্মিতার আবেগ সৃষ্টি করে তাদের শিয়া মতবাদের দিকে আরও বেশি ধাবিত করেছিল। এভাবে শিয়ানে আলী-র একটি স্থায়ী দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যার অধিকাংশ সদস্য উমাইয়া সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মধ্যপন্থী শিয়াদের সাথে জমহুর ওলামাদের মতপার্থক্য তেমন প্রকট ছিল না। সমাজে সবাই মিলেমিশে ছিল। তাদের আলেমদের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক সমানভাবে বজায় ছিল, যেমন ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ি, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ-র অনেক উস্তাদ শিয়া ছিলেন। শিয়া নেতৃবৃন্দ এবং কিছু সাদাতের যদি সরকারের সাথে কোনো বিরোধ থেকে থাকে, তবে তা ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আকিদাগত নয়। যেহেতু বিদ্রোহের চেষ্টাকারী সাদাতদের অবস্থান শরয়িভাবে মজবুত ছিল না, তাই জমহুরের কাছে তাদের প্রচেষ্টা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। আর এই কারণেই এ ধরনের বিদ্রোহ সাধারণত কোনো দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ বা কোনো সরকার গঠনে সফলতার কারণ হতে পারেনি।

কিন্তু ইবনে সাবার চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত চরমপন্থীরা দেড় শতাব্দী ধরে শিয়ানে আলী-কে প্ররোচিত করতে থাকে এবং উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত করতে থাকে। ইবনে সাবার পেশ করা হযরত আলী-র রাসুলের অসি হওয়ার তত্ত্ব তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে শিয়া ধর্মের মৌলিক স্তম্ভ ‘আকিদায়ে ইমামত’-এ পরিণত হয়েছিল; তাই রাফেজিরা সবসময় কোনো না কোনো ইমামের সন্ধান খোঁজত। এই অনুসন্ধান ও অন্বেষণে তাদের মধ্যে মতভেদও চলত এবং একই সময়ে রাফেজিদের বিভিন্ন দল আলে আলী-র ভিন্ন ভিন্ন বুজুর্গদের ‘ইমাম’ হিসেবে মানত।

বনু আব্বাসের উত্থানকালে রাফেজি আন্দোলনগুলো কেন সফল হয়নি?

সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুতাসিম ও মুতাওয়াক্কিলের মতো মহান খলিফাদের আমল পর্যন্ত রাফেজি মতবাদ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বা মধ্যপন্থী শিয়াদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এর দুটি বড় কারণ ছিল:

- ১. ইসলামি খেলাফত মজবুত ছিল। মুসলিম দেশগুলো এক সূত্রে গাঁথা ছিল; তাই রাফেজি মতবাদ প্রচারের কাজ প্রকাশ্যে হতে পারত না। রাফেজি মতবাদের পূর্ণ প্রচার সেখানেই হতে পারত যেখানে সরকারি ব্যবস্থাপনা অচল বা দুর্বল ছিল।
- ২. স্বয়ং সুপ্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত সাদাত নেতৃবৃন্দ সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গরা বনু আব্বাসের সমর্থন এবং...

রওয়াফিজদের আকিদা থেকে তারা সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতেন; তাই খোদ শিয়া সাধারণ জনগণেরও রওয়াফিজদের আকিদা ও মতাদর্শের প্রতি খুব একটা ভ্রক্ষেপ ছিল না।

আইম্মায়ে সাদাতের রাফদ থেকে বিমুখতা:

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, হযরত আলী রিদা (যাকে শিয়া ইসনা আশারিয়া তাদের অষ্টম ইমাম মনে করে) মামুনুর রশিদের উত্তরাধিকারী এবং জামাতা ছিলেন। তিনি কখনো ইমামতের দাবি করেননি, যদিও সেই যুগে অনেক আলভী বিদ্রোহ করেছিলেন।

একইভাবে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন আলী (ওরফে মুহাম্মদ তাকি ১৯৫ হিজরি - ২২০ হিজরি), যাকে ইসনা আশারিয়া তাদের নবম ইমাম মনে করে, তিনিও মামুনুর রশিদের জামাতা ছিলেন। তিনি মুতাসিমের শাসনামলে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খিলাফতের অনুগত ছিলেন এবং কখনো ইমামতের দাবি করেননি। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র আলী বিন মুহাম্মদ (আবুল হাসান ওরফে আলী আল-হাদী ২১২ হিজরি - ২৫৪ হিজরি) আট বছর বয়সী ছিলেন। ইসনা আশারিয়া তাঁকে দশম ইমাম বলে থাকে। তিনি খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের নির্দেশে সামারায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটি ভুলভাবে প্রচলিত যে, খলিফারা তাঁকে বন্দি করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পরহেজগার স্বভাবের কারণে সামারায় স্বেচ্ছায় নির্জন জীবন যাপন করতেন। হ্যাঁ, খলিফারা যদি তাঁর ওপর নজরদারি রেখে থাকেন, তবে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির বিচারে তা ভুল ছিল না; কারণ সেই যুগে চারদিকে আলভীরা বিদ্রোহ করছিল; তাই কোনো খলিফার তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। একবার মুতাওয়াঙ্কিল এমন কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলী আল-হাদীকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর নির্লোভ মানসিকতা দেখে লজ্জিত হন এবং তাঁর উপদেশ শুনে অব্বোরে কাঁদতে থাকেন। তিনি তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। এরপর শেষ পর্যন্ত খলিফাদের আচরণ তাঁর সাথে এমনই ছিল। এই আলী আল-হাদীও কখনো ইমামতের দাবিদার ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু খলিফা মুতাযের আমলে হয়েছিল। [১]

তাঁর পুত্র হাসান বিন আলী (ওরফে হাসান আসকারী, ইসনা আশারিয়ার একাদশ ইমাম: ২৩২ হিজরি - ২৬০ হিজরি) ছয়জন খলিফা: মুতাওয়াঙ্কিল, মুনতাসির, মুসতাইন, মুতায, মুহতাদী এবং মুতামিদের যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু কখনো ইমামতের দাবি করেননি বা বিদ্রোহ করেননি। [২] ইমামত যদি ধর্মীয় আকিদা ও রুকনসমূহের কোনো বিষয় হতো, তবে এই ব্যক্তিবর্গ কেবল তা প্রকাশই করতেন না, বরং এর জন্য যথেষ্ট সংগ্রামও করতেন।

হাসান আসকারীর কোনো সন্তান ছিল না, কিন্তু এটি প্রচার করে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর মুহাম্মদ নামে এক পুত্র ছিল যে ১৫ শাবান ২৫৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং ২৬৫ হিজরিতে যখন তার বয়স ৯ বা ১০ বছর ছিল, সে তার পৈতৃক বাড়ির একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এই মুহাম্মদ বিন হাসানকেই শিয়া ইসনা আশারিয়া তাদের দ্বাদশ ইমাম মনে করে, তাঁকে মাহদী, সাহিবুয যামান, ইমাম গায়েব এবং ইমাম মুনতায়ার বলে থাকে। তাদের আকিদা হলো যে, সে জীবিত কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে এবং গুহায় লুকায়িত আছে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়ে পুরো পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফে ভরে দেবে। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৫০২, ৫০৩

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ২/১৯৪, মুরুজুয যাহাব: ৫/১০৭, ১০৮

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৩/১১৯, ১২০০; আল-আলাম যিরিকলী: ৬/৮০

বনু বুওয়াইহ এবং ইথনা আশারিয়া:

যাই হোক, এই মহান সাদাতদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পঞ্চাশ-ষাট বছর পর যখন খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং চারদিকে আলাদা আলাদা ছোট ছোট সরকার গঠিত হওয়ার ফলে বাতিল ফেরকাগুলোর জন্য তাদের আকিদা প্রচার করা সহজ হয়ে গিয়েছিল, তখন শিয়া মতবাদের গর্ভ থেকে রাফেজি মতবাদের নিত্যনতুন শাখা জন্ম নিয়েছিল।

“ইথনা আশারিয়া” ফেরকাটি শিয়াদের প্রায় সত্তরটি ফেরকার মধ্যে একটি ছিল, যা আকিদার দিক থেকে সেই উদ্দেশ্যগুলোর জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল যা বনু বুওয়াইহ-এর সামনে ছিল। সেই সময় পর্যন্ত এই ফেরকার অনুসারী কয়েক হাজারের বেশি ছিল না। কিন্তু নিঃসন্দেহে ইসলামের ওপর চরম আঘাত হানার সবচেয়ে বেশি সক্ষমতা এর মধ্যেই ছিল; কারণ আল্লাহ, রাসূল এবং আখেরাতের ধারণা এবং কাবা ও হজের সম্মানের মতো কয়েকটি বিষয় ছাড়া এর শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল যা গত তিন শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল।

ইথনা আশারিয়ার “সিহাহ আরবাতা”:

আমরা দেখতে পাই যে, যে সময়ে বনু বুওয়াইহ দাইলামের পাহাড়ি অঞ্চলে ভবিষ্যতের আরব-বিরোধী সরকার গঠনের জন্য সংগ্রাম করছিল, সেই দিনগুলোতে একজন শিয়া আলেম হাসান বিন মুসা নওবাখতি (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) “কিতাবুল ইমামাহ” এবং “ফিরাকুশ শিয়া”-এর মতো বই লিখে ইথনা আশারিয়া মাযহাবের পক্ষে দলিল পেশ করেছিলেন। [১]

একই সময়ে রে-এর কালীন জনপদের সাথে সম্পৃক্ত একজন রাফেজি লেখক আবু জাফর কুলাইনি (মৃত্যু ৩২৯ হিজরি) বাগদাদে “আল-কাফি ফি উলুমুদ্দিন” (উসূলে কাফি) নামে আইন্মায়ে সাদাতদের দিকে নিসবত করা সেই বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন যা তিনি বিভিন্ন শিয়া ও রাফেজি বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। [২]

এই বইটি তিন প্রকারের ওপর مشتمل: প্রথম প্রকার “উসূল” নামে পরিচিত যাতে আকিদা সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার “ফুরূ” নামে পরিচিত যাতে আহকাম সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয়টি “আর-রওজা” নামে পরিচিত যাতে খুতবা, পত্রাবলী এবং আদব সংক্রান্ত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। [৩]

এই প্রচেষ্টার কারণে কুলাইনি রাফেজিদের কাছে ইথনা আশারি মাযহাবের প্রথম সংকলকের মর্যাদা লাভ করেন। এই রাফেজিদের মধ্যেই বনু বুওয়াইহ-ও ছিল যাদের কাছে “আল-কাফি” আকিদা ও মতাদর্শের দিক থেকে তাদের উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী মনে হয়েছিল।

বনু বুওয়াইহ-এর সরকার সুসংহত হওয়ার পর ইবনে বাবুওয়াইহ কুন্মি (৩০৬ হিজরি - ৩৮১ হিজরি) “মান লা ইয়াহজুরুহুল ফকিহ” নামে একটি ফিকহি সংকলন তৈরি করেন। ইবনে বাবুওয়াইহ-এর সম্পর্কও রে-এর সাথে ছিল। খোরাसानে তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। তার...

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ২/২২৭

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ৭/১৪৫

[৩] আশ-শিয়া ওয়াত তাশাইয়ু, ইহসান ইলাহি জহির, পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৬

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

অন্যান্য রচনার সংখ্যা তিনশ পর্যন্ত বলা হয়। [১]

আবু জাফর আল-তুসী (৩৮৫ হি. - ৪৬০ হি.) খোরাসান থেকে বাগদাদে এসে চল্লিশ বছর কাজ করেন, তারপর নাজাফে স্থানান্তরিত হন। তিনি ‘তহজীবুল আহকাম’ এবং ‘আল-ইস্তিবসার’ রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি ডজন ডজন বই রচনা করেছেন। [২]

ইসনা আশারিয়ার সিহাহ আরবাআ-তে বর্ণনার সংখ্যা:

- ‘আল-কাফি’-তে বর্ণনার সংখ্যা ‘১৬১৯৯’।
- ‘মান লা ইয়াহদুরুল ফকিহ’-তে ‘৫৯৬৩’টি বর্ণনা রয়েছে।
- ‘তহজীবুল আহকাম’-এ ‘১৩৫৯০’টি বর্ণনা রয়েছে।
- ‘আল-ইস্তিবসার’-এ ‘৬৫৩১’টি বর্ণনা রয়েছে।

ইসনা আশারিরা এই চারটি বইকে ‘সিহাহ আরবাআ’ নামে অভিহিত করেছে। এভাবে তারা হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার ‘সিহাহ সিভ্তা’-কে বাতিল ঘোষণা করেছে। [৩]

ইসনা আশারিদের ‘সিহাহ আরবাআ’-এর অনেক বর্ণনা ইসলামী আকিদা এবং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নস-এর সাথে এতটাই সাংঘর্ষিক যে, আল্লাহ ও রাসুলের বাণীর ওপর বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি এই বর্ণনাগুলোকে ইসলাম বিরোধী একটি ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে পারেন না। যারা মহান সাদাতদের জীবনী সম্পর্কে অবগত, তারা কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, এই ধরনের কুফরি, শিরকি এবং কাল্পনিক চিন্তাধারা সেই মহান ব্যক্তিদের হতে পারে। বলা যায় না যে, এর মধ্যে কতগুলো বর্ণনা লেখকরা নিজেরা তৈরি করেছেন এবং কতগুলো বর্ণনা অন্যদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন; তবে এটি নিশ্চিত যে, এই ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা আহলে সুন্নাতের আসমাউর রিজাল-এর আলোকে মিথ্যাবাদী, সংকীর্ণমনা বা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এই লেখকদের ইহুদি হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে অনেক বর্ণনার ওপর ইহুদি আকিদা ও মতাদর্শের গভীর ছাপ দেখা যায় এবং স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, ইহুদিরা ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করে শিয়া মহলে এগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। [৪]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যুগে অনেক সুপরিচিত সাদাত কিরাম উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বনু বুওয়াইহ কখনোই তাদের সামনে আসতে দেয়নি। এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, দাইলাম এলাকা যেখানে বনু বুওয়াইহ-এর বিকাশ ঘটেছিল, সেটি ছিল জাইদি শিয়া প্রচারকদের ঘাঁটি, যারা আকিদা ও মতাদর্শে আহলে সুন্নাত থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। সেখানে ইসনা আশারিরা খুব কম ছিল, কিন্তু যেহেতু সাদাত কিরামকে সাথে নেওয়া, তাদের মাযহাব ও পথ অনুসরণ করা এবং জাইদি আকিদা প্রচার করা বনু বুওয়াইহ-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কোনো কাজে আসত না; তাই তারা ইসনা আশারি ধর্ম গ্রহণ করেছিল যা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ২৭৯/৬

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ৮৯/৬

[৩] আশ-শিয়া ওয়াত-তাশাইয়ু লি-ইহসান ইলাহি জাহির, পৃ. ৩২৬, ৩৬৫

[৪] আশ-শিয়া ওয়াত-তাশাইয়ু লি-ইহসান ইলাহি জাহির, পৃ. ৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৪

ইত্না আশারি আকিদা এবং বনু বুওয়াইহ-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য:

মুগনির উসুল-ই-কাফি থেকে অস্তিত্বে আসা ইত্না আশারি মাযহাব বনু বুওয়াইহ-এর ক্ষমতার জন্য কীভাবে উপযুক্ত ছিল? এর পর্যালোচনা করা জরুরি।

ইত্না আশারি আকিদা অনুযায়ী ইমামতের পদটি কেবল বারোজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে: তাদের মধ্যে প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত আলী (রা.)। দ্বিতীয় হযরত হাসান (রা.), তৃতীয় হযরত হুসাইন (রা.), চতুর্থ হযরত যয়নুল আবেদিন (রহ.), পঞ্চম হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহ.), ষষ্ঠ হযরত জাফর সাদিক (রহ.), সপ্তম হযরত মুসা কাজিম (রহ.), অষ্টম আলী রিয়া (রহ.), নবম হযরত মুহাম্মদ তাকি (রহ.), দশম হযরত আলী আল-হাদী (রহ.), একাদশ হাসান আসকারি (রহ.) (মৃত্যু ২৬০ হিজরি), দ্বাদশ এবং শেষ ইমাম হলেন তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মাহদী, যিনি জীবিত কিন্তু অদৃশ্য এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবেন। [১]

যেহেতু ইমাম গায়েব (অদৃশ্য) থাকাবস্থায় কোনো সৈয়দ বা আলভীকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নই উঠতে পারে না; তাই সরকারের লাগাম বনু বুওয়াইহ-এর হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারত না। যেন বনু বুওয়াইহ-এর ক্ষমতা ইমাম গায়েবের ধারণার চারপাশেই আবর্তিত হচ্ছিল।

ইত্না আশারি আকিদার দর্শন:

ইত্না আশারিয়ার আরও কিছু আকিদা নিচু স্বভাবের লোকদের জন্য আকর্ষণীয় এবং বনু বুওয়াইহ-এর রাজনীতির জন্য কার্যকর ছিল।

- উদাহরণস্বরূপ, ইত্না আশারিয়ার আকিদা ছিল যে, ইমামের ইমামত যারা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর তাদের কোনো শাস্তি হবে না। কোনো সগিরা বা কবিরা গুনাহ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। বরং ইমামদের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যই তাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট। আর যারা ইমামকে মানে না তারা কাফের। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। তাদের নেক আমল কোনো কাজে আসবে না। [২]

বনু বুওয়াইহ-এর জন্য এই আকিদা ছিল অধিক সংখ্যক মানুষকে নিজেদের চারপাশে একত্রিত করে রাজনীতি উজ্জ্বল করার একটি কৌশল। প্রবৃত্তির দাস এবং পাপাচার ও অবাধ্যতায় অভ্যস্ত লোক যারা উলামা ও নেককারদের থেকে দূরে পালাত, তাদের নিজেদের চারপাশে একত্রিত করার জন্য এর চেয়ে ভালো অস্ত্র আর কী হতে পারত যে, কেবল নিজেদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ইমামের নামে স্লোগান দেওয়ার বিনিময়ে তাদের জান্নাতের সনদ দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে এই আকিদা ছিল ইহুদিদের, যারা বলত যে বনী ইসরায়েল যা-ই করুক না কেন, তারা অবশ্যই ক্ষমা পাবে। আর অন্যান্য জাতি নেক আমল করেও জাহান্নামী হবে। [৩]

[১] তুহফায়ে ইত্না আশারিয়া, পৃ. ৫৩। এই দ্বাদশ ইমাম নিছক একটি কাল্পনিক চরিত্র; কারণ হাসান আসকারির কোনো সন্তান ছিল না। (মিনহাজ্জুস সুন্নাহ: ৪/৮৬, ৬/১২৬)। বারো ইমামের এই আকিদার গুরুত্ব বোঝার জন্য এতটুকু দেখাই যথেষ্ট যে, শিয়াদের প্রায় সত্তরটি ফিরকার মধ্যে ইত্না আশারিয়া ছাড়া আর কেউ এই আকিদায় বিশ্বাসী নয়। যদি এই কথার সামান্যতম গুরুত্ব থাকত, তবে তেরোশ বছরের মধ্যে দুই-চারটি শিয়া ফিরকা তো এর ওপর একমত হতো। যে সময় এই আকিদাগুলোর উদ্ভব হয়েছিল, সে সময় দুনিয়ায় এগুলোর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। বরং বাস্তবতা হলো, তাদের চলে যাওয়ার পর এই প্রতারণামূলক আকিদা একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অধীনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সঠিক বংশীয় এবং পরিচিত প্রবীণ সাদাতদের থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়ার প্রশ্ন চিরতরে শেষ হয়ে যায়। বনু বুওয়াইহ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যখনই বিশ্বের কোনো অঞ্চলে শিয়া রাজনীতিকরা সরকার গঠন করেছে, তারা মানুষকে ইমাম গায়েবের দিকে ধাবিত করে এমন সঠিক বংশীয় সাদাতদের অনুসরণ থেকে দূরে রেখেছে।

[২] বিহারুল আনওয়ার মজলিসি: ২৭/২১৮, ২২৪, ৭৯/৩৩।

[৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ৮০ নম্বর আয়াতের অধীনে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

২. তাদের এই আকিদাও ছিল যে, ‘তাকিয়া’ করা অর্থাৎ নিজের দ্বীন গোপন করা এবং মিথ্যা বলা ইমামদের সুন্নাত। [১]

এই আকিদাটি বেশ কিছু উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। প্রথমত: যাতে যারা সঠিক বংশীয় সাদাত ছিলেন না, কিন্তু যাদের কথা ও কাজ আহলে সুন্নাতের সুন্নাহ অনুযায়ী দেখা যেত, তাদের এই বলে ধোঁকা দেওয়া যায় যে, এই বুজুর্গ সাদাতগণ আসলে ইসনা আশারি শিয়া ছিলেন, তাদের সুন্নী মাযহাব অনুসরণ করা এবং খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা মূলত ‘তাকিয়া’ ছিল।

তাকিয়ার আকিদা উদ্ভাবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইসনা আশারিয়াদের কিছু আকিদা জমহুর ওলামাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট কুফর ছিল। যে সমাজে ইসলামী আইন কার্যকর ছিল, সেখানে এই আকিদাগুলো প্রকাশের ফলে মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হওয়ার ভয় ছিল। তাই জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকিয়া করে নিজের আকিদা গোপন করা এবং শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যেত।

তাছাড়া এভাবে আহলে সুন্নাতের সমাজে বসবাস করে তাদের ধোঁকা দেওয়া, তাদের সাথে মিথ্যা বলা এবং তাদের ক্ষতি করা সহজ হয়ে যেত। আর মিথ্যা বলার ফলে বিবেকের যে স্বাভাবিক দংশন সৃষ্টি হয়, তাও দূর হয়ে যেত।

৩. এই আকিদাও ছিল যে, মুতআ অর্থাৎ এমন সাময়িক যৌন সম্পর্ক যা নিকাহর শর্তাবলী থেকে মুক্ত, তা জায়েজ বরং অনেক বড় ইবাদত। [২]

নিচু প্রকৃতির লোকদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করার এর চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কী হতে পারে?

৪. এই আকিদাও ছিল যে, সাধারণ মুসলমানদের রক্ত হালাল এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা জায়েজ। [৩]

মুসলমানদের হুকুমত ধ্বংস করার জন্য এবং বিশৃঙ্খলা, ফাসাদ ও অরাজকতার মাধ্যমে তাদের দুর্বল করে তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য বনু বুওয়াইহদের মতো ধূর্ত লোকদের জন্য এই আকিদা অত্যন্ত কার্যকর ছিল।

যেহেতু ইমাম সর্বদা অদৃশ্যই থাকতেন এবং প্রায় কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার অনুপস্থিতি অনুসারীদের মধ্যে অনাগ্রহের কারণ হতে পারত; তাই বনু বুওয়াইহরা এই ধর্মে আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। যেমন: হুসাইন [রা.]—এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন বিদআত যোগ করে সেগুলোকে ঈমানের অংশ বানিয়ে নেওয়া—মুহররমের মাতম মিছিল, ১৮ই জিলহজ ঈদে গাদীর এবং ১৫ই শাবানে আতশবাজির মতো উৎসব শুরু করে দেওয়া। [৪]

হাকিকত বা বাস্তবতা হলো এই যে, ইসনা আশারি আকিদাগুলো ইসলামের সাথে এতটাই সাংঘর্ষিক ছিল যে, রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে উল্লিখিত কোনো প্রসিদ্ধ সৈয়দ, কোনো ফকিহ, কোনো মুহাদ্দিস বা কোনো বুজুর্গ এমন পাওয়া যাবে না যিনি এই আকিদাগুলোর প্রবক্তা ছিলেন। প্রবক্তা হওয়া তো দূরের কথা, একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও এমন নেই যার ওপর এই আকিদাগুলোর অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

বনু বুওয়াইহরা সাদাতদের কেন ক্ষমতা দেয়নি?

বনু বুওয়াইহরা নিজেরা সাদাত হওয়ার দাবি করতে পারত না; কারণ তাদের দাইলামি-আজমি হওয়া স্পষ্ট ছিল। কিন্তু যদি ক্ষমতা...

[১] ইলালুশ শারায়ে: ইবনে বাবুওয়াইহ ৬০১/২; আদ-দুররুল মানজুদ: সৈয়দ গুলপায়গানী ২৫৩/২; ওয়াসায়েলুশ শিয়া আল-হুর আল-আমিলি ২৯৭/৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৩৫২ হিজরি

[৩] আল-কাফি: বাবুত তাকিয়া ২১৭/২

কিতাবে একটি মিথ্যা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। কিন্তু এই লোকেরা অগণিত মিথ্যা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলাকে ইবাদত বানিয়ে নিয়েছে।

[৪] আল-কাফি কুলিনী ৫৪০/৫, মান লা ইয়াহদুরুহুল ফকিহ ৪৬১/৩

সাদাতদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করেও কোনোভাবেই এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না যে সরকার প্রধান একজন আলভী হবেন। যদিও শিয়াদের সকল ফিরকার মতে শাসনক্ষমতা কেবল আলভীদেরই অধিকার। এখন যখন তিন শতাব্দীর অপেক্ষার পর নিজেদের আহলে বাইতের আশেক দাবিদার বুয়াইহিরা বাদশাহ হয়ে গিয়েছিল, তখন সাদাতদের হাতে শাসনভার অর্পণ করতে তাদের বাধা কী ছিল?

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো নিয়ে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, এর কারণ ছিল এই যে, বনু বুয়াইহ যে ইসলামকে পরিচিত করিয়ে মুসলমানদের দীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল, প্রকৃত সাদাত কেলাম তা কখনোই গ্রহণ করতে পারতেন না। সাদাতদের মধ্যে অবশ্যই কিছু ব্যক্তি শিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং কেউ কেউ রাফেজিদের মুনাফেকি এবং সাদাতদের প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শন, তাদের সমর্থনের ঘোষণা এবং অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতিতে প্রভাবিত হয়ে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিলেন। কিন্তু এখন যখন বনু বুয়াইহ শিয়া মতবাদের সীমা অতিক্রম করে প্রকাশ্যে রাফেজি মতবাদ ও জিন্দিকি (ধর্মদ্রোহিতা) ছড়াতে বন্ধপরিকর ছিল, তখন এটা খুবই অসম্ভব ছিল যে কোনো সঠিক বংশীয় আলেম ও ফাজেল আলভী তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন।

প্রকৃত সাদাতগণ তো বনু বুয়াইহ-এর যুগেও হযরত জাফর সাদিক [রা.] এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মাযহাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন আবু আব্দুল্লাহ আল-হাসানি [রা.] (বিন যাওয়াদ বিন আলী বিন ঈসা বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন হাসান বিন যায়েদ বিন আলী) চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর একজন বিখ্যাত সৈয়দ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম হাকেম নিশাপুরী [রহ.] (মুস্তাদরাক প্রণেতা) বলেন:

“তিনি তাঁর যুগে খোরাসানে আহলে বাইতের শায়খ ছিলেন। তাঁর যুগের আলভীদের সরদার ছিলেন। সালাত, সদকা-খয়রাত এবং সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসায় তিনি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আমি দীর্ঘকাল তাঁর সাথে ছিলাম। যখনই তাঁর কাছ থেকে হযরত উসমান [রা.] -এর আলোচনা শুনতাম, তিনি অবশ্যই বলতেন: ‘তিনি শহীদ ছিলেন।’ এরপর তিনি অঝোরে কাঁদতেন। আমি যখনই তাঁর কাছ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা [রা.] -এর আলোচনা শুনতাম, তিনি বলতেন: ‘সিদ্দিকের কন্যা, সিদ্দিক, আল্লাহর হাবিবের হাবিবা!’ এ কথা বলে তিনি কেঁদে ফেলতেন।” [১]

একইভাবে মুহাম্মদ বিন হাসান বিন কাসিম আলভী [রহ.] একজন প্রখ্যাত সৈয়দ ছিলেন। তিনি বনু বুয়াইহ-এর যুগে বিদ্রোহও করেছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে কারো ওপর আপত্তি করা বৈধ মনে করতেন না। তাঁর কাছে হযরত তালহা ও যুবাইর [রা.] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: “তাঁরা জান্নাতি; কারণ রাসূলুল্লাহ [সা.] এর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ [সা.] -এর সুসংবাদ ভুল হতে পারে না।” ফিকহি মাসআলায় তিনি আইন্মায়ে আরবাআ-এর (চার ইমাম) গণ্ডির বাইরে যেতেন না। তিন তালাকের মাসআলায় তিনি হযরত উমর [রা.] -এর ফতোয়ার ওপর আমল করতেন এবং একেই সাদাতদের মাযহাব বলে গণ্য করতেন। [২]

যেহেতু বনু বুয়াইহ এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিল যে সাদাতদের দিয়ে তাদের কাজ উদ্ধার হবে না; তাই তারা এই মহান ব্যক্তিদের দ্বারে যাওয়া বোকামি মনে করেছিল। শুধু তাই নয়, বরং নামকরা সাদাতদের তারা নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুও বানিয়েছিল। যেমন মুহাম্মদ বিন উমর বিন ইয়াহইয়া (৩১০ হি. - ৩৯০ হি.) একজন বিখ্যাত হাসানি সৈয়দ ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। এতে শাসক আযুদুদৌলার লোভ জেগে ওঠে এবং সে তাঁকে বন্দি করে তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। [৩]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৫৫ হিজরির মৃত্যুসন।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১১৫, ১১৬।

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/১৭৯।

পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত বনু বুওয়াইহ কেন নিজেদের সমর্থনের জন্য কোনো জাল ব্যক্তিকে সৈয়দ সাজিয়ে উপস্থাপন করল না যে তাদের মতো আকিদা পোষণ করত? এর দুটি কারণ ছিল: এক, সেই সময় পর্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সادات (সৈয়দগণ) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে অবশ্যই এই প্রশ্ন উঠত যে, একজন অপরিচিত সৈয়দ যাকে দুনিয়া আগে চিনত না, তাকে কেন সরকার প্রধান বানানো হলো? এই কারণেই বুওয়াইহি শাসকরা ইমাম গায়েব-এর প্রবক্তা হয়ে জীবিত সادات-দের অনুসরণ ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মুক্ত থাকাকে পছন্দ করেছিল।

দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল এই যে, বনু বুওয়াইহ-এর আসল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা। তারা যদি কোনো প্রকৃত বা জাল সৈয়দকে (চাই সে ইমাম মাসুম না হয়েও হোক) রাজনৈতিক শাসক বানাত, তবে নিশ্চিতভাবেই ক্ষমতা তাঁর কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যেত। এভাবে বনু বুওয়াইহ-এর ক্ষমতার অবসান ঘটত; তাই এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে শাসনের সময় তারা একবারও কোনো সৈয়দকে শাসনের সুযোগ দেয়নি যাতে নিজেদের ক্ষমতা সুরক্ষিত থাকে।

বনু বুওয়াইহ-এর ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযানসমূহ:

দাইলামিদের উত্থানের যুগে কুলাইনির ‘উসুল আল-কাফি’ সংকলিত হয়েছিল। কুলাইনির মৃত্যুর ৭ বছর আগে ৩২২ হিজরিতে বনু বুওয়াইহ পারস্যে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের শাসনের সংবিধান ও ইশতেহার কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নয়, বরং কুলাইনির ‘উসুল আল-কাফি’ থেকে গৃহীত ছিল। তবে আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কিরাম এর আগে আকিদা, তাফসির, হাদিস এবং অন্যান্য ইলমে যে বিশাল ভাণ্ডার পেশ করেছিলেন, তার তুলনায় ‘উসুল আল-কাফি’ একেবারেই অপরিপাক ছিল। নিজেদের শাসনের ভিত্তি মজবুত করার জন্য বনু বুওয়াইহ-এর কাছে এই অভাব পূরণ করা জরুরি ছিল; কারণ এখন পর্যন্ত রাকফ কোনো দলিলের ওপর নয় বরং ঘৃণার জন্য ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে ছিল; এই কারণে মূর্খরা ছাড়া অন্য কারো এতে আগ্রহ থাকতে পারত না। ফলে বনু বুওয়াইহ ইসনা আশারি লেখকদের দিয়ে প্রচুর কাজ করিয়ে নেয় যারা নিজেদের মাযহাবকে ইলমিভাবে শক্তিশালী করার জন্য মুসলমানদের হাদিস ভাণ্ডারের مقابلে নিজেদের হাদিস গ্রন্থ এবং মুসলমানদের ফিকহের مقابلে নিজেদের ফিকহ তৈরি করে যা আজ ফিকহে জাফরিয়া নামে পরিচিত। বানোয়াট বর্ণনাগুলোকে নিয়মিত সংকলন করা হয়। আকিদার আংশিক বিবরণসমূহ বিন্যস্ত করা হয় এবং ফিকহি বিধানসমূহ সংকলন করা হয়। এভাবে বনু বুওয়াইহ-এর যুগে রাফেজি উলামায়ে কিরাম সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন ধর্মের রূপরেখা ঠিক করতে ব্যস্ত থাকেন।

عبدالله بن الحسين الغضائرى (মৃত্যু ৪১১ হি.) ‘ইয়াওমুল গাদির’, ‘মুওয়াতী আমিরুল মুমিনিন’ এবং ‘আর-রাদু আলাল গুলাত’ লিখেছেন। [১]

‘আশ-শাইখ আল-মুফিদ’ উপাধিতে পরিচিত محمد بن نعمان بغدادى ৬৭ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং প্রায় দুইশ বই লিখেছিলেন। তিনি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিশুদের খুঁজে বের করে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন এবং তাদের দরসগাহে ভর্তি করে আলেম বানাতেন। এভাবে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইরাকের অভ্যন্তরে রাফেজি আলেমদের একটি বিশাল বলয় তৈরি হয়ে যায়। [২]

ابو جعفر محمد بن جرير ابن رستم طبرى ‘রুওয়াতু আহলিল বাইত’, ‘নাওয়াদিরুল মুজিজাত’ এবং ‘দালাইলুল ইমামাহ’-এর মতো কিতাবসমূহ লিখেছেন। [৩]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৩২৯

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/২৪৫, ২৫০

[৩] নাওয়াদিরুল মুজিজাত এবং দালাইলুল ইমামাহ নিঃসন্দেহে ইসনা আশারি আকিদার জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ابن-রستم طبرى-এর কাজের সময়কাল আহলে সুন্নাতের ইমাম তাবারির মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরের। তিনি তাঁর কিতাবসমূহে ‘محمد بن هارون بن موسى’ (মৃত্যু ৩৭৮ হিজরি), ‘ابو مفضل الشيباني’ (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরি) এবং ‘عبدالله بن الحسين الغضائرى’ (মৃত্যু ৪১১ হিজরি)-এর মতো রাফেজি বর্ণনাকারীদের বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন।

বিবেচনাযোগ্য বিষয়:

এটি প্রমাণিত যে, রাফয (শিয়া মতবাদ) সংকলনকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার বংশীয় সম্পর্ক সالتاد কিরামের সাথে রয়েছে। তারা সকলেই ছিল অনারব এবং তারা আরবদের ইসলামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল এমন অনারব লেখক ও কেরানি যারা অর্থ বা ধর্মীয় গোঁড়ামির খাতিরে যেকোনো কিছু বানিয়ে পেশ করতে অভ্যস্ত ছিল। [১]

ইসলামী ইতিহাসে ভেজাল:

এই যুগে ইসলামী ইতিহাসে বানোয়াট বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করার কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ঐতিহাসিক ‘আল-মাসউদী’ (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরি) বাগদাদ থেকে মিশরে পৌঁছে উবাইদিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মুরুজুজ জাহাব’ এবং ‘আত-তানবিহ ওয়াল ইশরাফ’ রচনা করেন। [২]

কাব্য ও সাহিত্যে যে কাজ হয়েছে তার আন্দাজ শিয়া কবি ও সাহিত্যিক ইবনে হাজ্জাজ বাগদাদীর রচনা থেকে করা যায়, যে ছিল আযুদুদৌলা বুয়াইহি এবং তার সন্তানদের স্তুতি গায়ক। তার রচনাগুলো অশ্লীলতায় ভরপুর। হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর মতে, সে ছিল অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার ঝাণ্ডা উত্তোলনকারীদের একজন। [৩]

নাস্তিক ও ধর্মহীন সাহিত্যিকরাও বনু বুয়াইহদের কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করত। এই যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি ইব্রাহিম বিন হিলাল হাররানি (মৃত্যু ৩৮৪ হিজরি) বুয়াইহি শাসক ইযযুদৌলা বখতিয়ারের কেরানি ছিল। সে ছিল সাবেয়ি ধর্মের অনুসারী। সে কুরআন মাজিদ পড়ত, রমজানের রোজা রাখত কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার লেখনিগুলো ধর্মহীনতা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ ছিল। [৪]

আল-আগানি-র বর্ণনা এবং বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের খলিফাদের নৈতিক চরিত্র?

এই সময়েই বাগদাদের আবুল ফারাজ ইসফাহানি (২৮৪ হিজরি - ৩৫৬ হিজরি) খ্যাতি লাভ করে। আবুল ফারাজ ইসফাহানি আহলে সুন্নাত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার বংশধারা উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদের সাথে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু এই যুগে শিয়া শাসকদের উত্থান দেখে অনেক সুযোগ সন্ধানী লেখক শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছিল। আবুল ফারাজও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করে এবং নিজের কলমকে শিয়া শাসকদের সম্ভৃষ্টির জন্য উৎসর্গ করে। যেহেতু কিচ্ছা-কাহিনী ও কবিতায় ভরপুর তার বইগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, তাই সেগুলো লুফে নেওয়া হয় এবং পুরো মুসলিম বিশ্বে সেগুলোর ব্যাপক প্রচার ঘটে। [৫]

[১] এখানে এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, হাদিস অস্বীকারকারীরা সিহাহ সিভাহর ওপর এই বলে আপত্তি করে যে, এগুলোও অনারবদের সৃষ্টি; কারণ সিহাহ সিভাহর ছয়জন লেখকের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন অনারব। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, সিহাহ আরবা এবং সিহাহ সিভাহর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সিহাহ আরবা কেবল অনারবদের কিছু এলাকায় জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আরবরা সেগুলোকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। পক্ষান্তরে সিহাহ সিভাহ পুরো বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আরব-অনারব সকলেই সেগুলোকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, সিহাহ সিভাহ ছাড়াও আরবদের সংকলিত প্রচুর হাদিস গ্রন্থ রয়েছে, যেমন: মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে শাফেয়ী, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসনাদে দারেমী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, শারহু মাআনিল আসার ইত্যাদি, যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে সিহাহ সিভাহর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ; কারণ এই সত্য হাদিস ভাণ্ডার সকল মুসলমানের অভিন্ন সম্পদ এবং এটাই প্রকৃত ইসলাম যেখানে আরব ও অনারবের কোনো ভেদাভেদ নেই। অন্যদিকে ‘সিহাহ আরবা’ যে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ধর্ম কেবল এই অভিন্ন সম্পদই নয় বরং কুরআন মাজিদের সাথেও সাংঘর্ষিক।

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ২৪৩/৬

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ৬০/১৭

[৪] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১৬৭/২

[৫] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ২০২/১৬

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আবু আল-ফারাজ আল-ইসফাহানিকে (ইতিহাসের জন্য) একটি ক্ষত হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার দুটি রচনা: “আল-আঘানি” এবং “মাকাতিল আত-তালিবিন” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। “আল-আঘানি”-তে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের চরিত্র ও অবস্থার এমন চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যেন গান-বাজনা, মদ্যপান, নাচ-গান, কবিতা ও কৌতুক এবং নারী ও দাসীদের সাথে বিলাসিতা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ ছিল না। আবু আল-ফারাজ আল-ইসফাহানি এবং মাসউদির মতো জালিয়াতরা এই যুগের কিছু অন্য লেখকদের কলমকেও প্রভাবিত করেছে। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাদের কাছ থেকে অনেক মুখরোচক কথা গ্রহণ করে খলিফাদের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

খলিফাদের বিলাসিতা ও সন্দেহজনক বর্ণনা:

আমরা মুসলিম শাসকদের বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশকে পুরোপুরি অস্বীকার করছি না, তবে “আল-আঘানি”-র মতো বইগুলোর বর্ণনায় অতিরঞ্জন বরং জালিয়াতির উপাদান নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান, যা ইতিহাসের অন্যান্য প্রাচীন উৎসের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, “আল-আঘানি”-র মতো বইগুলোতে সাধারণত সেই সব খলিফা ও আমিরদের বিলাসিতার কথা বেশি উল্লেখ করা হয়েছে যাদের শাসনামলে মুসলমানরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল; অর্থাৎ: আব্দুল মালিক, ওয়ালিদ, সুলাইমান, মাহদী, হারুন আল-রশিদ, মামুন, মুতাসিম এবং মুতাওয়াক্কিল প্রমুখ।

যদি এই বর্ণনাগুলোকে একইভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে যে কেউ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে বিলাসিতা ও মুক্তমনা শাসকই সালতানাতের উন্নতির কারণ হয় (এবং আজকালের সেকুলার গোষ্ঠীও এই দাবিই করছে)। এর মাধ্যমে আন্দাজ করা যায় যে এই চিন্তা মানুষকে কতটা বিভ্রান্ত করতে পারে। কুরআনের আলোকে দেখলে সত্য এর বিপরীত:

“আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন আমি তার বিলাসপ্রিয় লোকদের আদেশ দেই, ফলে তারা সেখানে পাপাচার করে, তখন তাদের ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়ে যায়, অতঃপর আমি তা সমূলে ধ্বংস করে দেই।” [১]

বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এবং জীবনের অভিজ্ঞতাও এই ধারণাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে যে বিলাসিতা থেকে উন্নতি এবং সরলতা থেকে অবনতি আসে। সুতরাং কুরআনের নির্দেশ, বুদ্ধি ও বিবেকের ফয়সালা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা—সবই নিজ নিজ স্থানে সঠিক।

বাস্তবতা হলো, বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের খলিফাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ খলিফাই ছিলেন বুদ্ধিমান ও সতর্ক ব্যক্তি। কিছু খলিফার এই বিলাসিতা বা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কথা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও উল্লেখ আছে, যা আমরা অস্বীকার করি না। এ ছাড়া রাজনৈতিক ভুল বা বোকামিও নিজ নিজ স্থানে আফসোসজনক এবং শিক্ষণীয় হিসেবে বিভিন্ন যুগে হতে থেকেছে। একজন নেককার বা সদীচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি তার প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলো সমাধানে ভুল বা বাড়াবাড়ি করেন, তবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। একইভাবে কিছু খলিফার ব্যক্তিগত মহত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত পতনের কারণ হয়েছে। কিছু খলিফার খারাপ চরিত্র, তাদের কুসংস্কার বা তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের জুলুম ও অত্যাচারও বিশৃঙ্খলা ও খিলাফতের পতনের কারণ হয়েছিল।

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৬

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

এই নীতি কেবল উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং মুসলমানদের সকল শাসনের ওপর প্রযোজ্য এবং এর প্রমাণ প্রতিটি যুগে দেখা যায়। ইতিহাসের পাতা এবং জীবনের দৃশ্যপটের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ এটাই বলে যে, ভালো ও পরিশ্রমী মানুষের নেক চরিত্র এবং দায়িত্বশীল আচরণ সাফল্যের কারণ হয়, পক্ষান্তরে মন্দ লোকদের অসচ্চরিত্র ও অবহেলা ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটাই কুরআনি সত্য এবং এটাই বুদ্ধি ও বর্ণনার ফয়সালা। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও এটাই প্রমাণ করে যে, যেকোনো জাতি, দেশ, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা কাল, স্থিতিশীলতা ও উন্নতির যুগে পদাধিকারীরা সাধারণত নেক নিয়ত, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল হয়ে থাকেন, যেখানে পতনের যুগে সাধারণত পদাধিকারীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অসচ্চরিত্র হয়ে থাকেন।

বনু বুওয়াইহ-এর শাসকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- ১. ইমাদুদ দাওলা আলী বিন বুওয়াইহ ৩২২ হিজরি থেকে ৩৩৮ হিজরি / ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ (সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। ইরান ও পারস্য দখল)।
- ২. মুইযুদ্দাওলা আবুল হুসাইন আহমদ বিন বুওয়াইহ ৩৩৪ হিজরি থেকে ৩৫৬ হিজরি / ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ (বাগদাদ দখল করেন। খলিফাকে হত্যা করেন। খলিফারা অসহায় হয়ে পড়েন)।
- ৩. ইযুদ্দাওলা বখতিয়ার বিন আহমদ বিন বুওয়াইহ ৩৫৬ হিজরি থেকে ৩৬৭ হিজরি / ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ (বিলাসী, নির্দয়)।
- ৪. আদুদুদ দাওলা বিন হাসান বিন বুওয়াইহ ৩৬৬ হিজরি থেকে ৩৭২ হিজরি / ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ (শক্তিশালী, কঠোর ও জালিম)।
- ৫. সামসামুদ দাওলা বিন আদুদুদ দাওলা ৩৭২ হিজরি থেকে ৩৭৬ হিজরি / ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ (বনু বুওয়াইহ-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ)।
- ৬. শারফুদ্দাওলা বিন আদুদুদ দাওলা ৩৭৬ হিজরি থেকে ৩৭৯ হিজরি / ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ (নরম মেজাজের শাসক। উন্নয়নমূলক কাজ)।
- ৭. বাহাউদ্দাওলা বিন আদুদুদ দাওলা আবু নাসর ফিরোজ ৩৭৯ হিজরি থেকে ৪০৩ হিজরি / ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০১২ খ্রিস্টাব্দ (বাগদাদে সুন্নি-শিয়া সংঘাতের চরম পর্যায়)।
- ৮. সুলতানুদ্দাওলা বিন বাহাউদ্দাওলা ৪০৩ হিজরি থেকে ৪১১ হিজরি / ১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ (আব্বাসীয় খলিফা শক্তিশালী, বুওয়াইহিরা দুর্বল)।
- ৯. মুশাররিফুদ্দাওলা বিন বাহাউদ্দাওলা ৪১১ হিজরি থেকে ৪১৬ হিজরি / ১০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ (বুওয়াইহিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা)।

খিলাফতে বনু আব্বাস

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

১০. জালাল আদ-দাওলা বিন বাহাউদ দাওলা ৪১৬ হিজরী থেকে ৪৩৫ হিজরী

খলিফা পুনরায় দুর্বল, বুয়াইহি শক্তিশালী

১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

১১. আবু কালিজার সুলতান আদ-দাওলা বিন বাহাউদ দাওলা ৪৩৫ হিজরী থেকে

৪৪০ হিজরী জালেম ও জাবের

১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ

১২. আল-মালিক আল-আজিজ বিন জালাল আদ-দাওলা ৪৪০ হিজরী থেকে ৪৪২

হিজরী নামমাত্র শাসক

১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দ

১৩. আল-মালিক আর-রাহিম বিন আবু কালিজার - আবু নাসর ফিরোজ ৪৪২ হিজরী

থেকে ৪৪৭ হিজরী শেষ বুয়াইহি শাসক

১০৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

সপ্তম খণ্ড

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বনু আব্বাসের পতন যুগের দ্বিতীয় শতাব্দীতে

প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

৩৫০ হিজরী থেকে ৪৫০ হিজরী

খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের হত্যার পর থেকে বনু বুওয়াইহ-এর ক্ষমতার অবসান পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দী এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বাগদাদ খিলাফত পতনের প্রতিচ্ছবি ছিল এবং উন্নত ছিল বিপর্যস্ত। এই সময়ে বাতিলপন্থীরা ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টাগুলো চালাচ্ছিল, আমরা তার পর্যালোচনা করেছি। বাতিল ফিরকাগুলোর খণ্ডনে ইমাম তহাবী, আবুল হাসান আশআরী, ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী এবং ইমাম তাবারী প্রমুখের অবদান সম্পর্কে আমরা পড়েছি। কিন্তু চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরিস্থিতি আরও বেশি সংকটময় হয়ে উঠেছিল এবং সরকারি নিপীড়নের কারণে হক্কানী উলামায়ে কেরামের জন্য জমিন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমে বনু উবাইদ রাষ্ট্র, পূর্বে বনু বুওয়াইহ এবং আরবে কারামিতাদের কারণে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল।” [১]

এমতাবস্থায় কিছু ইলম অন্বেষী এমনও ছিলেন যারা পরিস্থিতির সংস্কারে হতাশ হয়ে বনু বুওয়াইহ-এর রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন, যেমন একজন আলেম ইবনে আবি দারিম (মৃত্যু ৩৫২ হিজরি) রাফয গ্রহণ করেছিলেন। [২]

পরিস্থিতির চাপে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু আলেম হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেমন উমর ইবনে হুসাইন আল-খিরাকী (মৃত্যু ৩৩৪ হিজরি) সাহাবায়ে কেরামের প্রতি গালিগালাজ সহ্য করতে না পেরে বাগদাদ ছেড়ে দামেস্কে চলে যান। তাঁর ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডার এবং কুতুবখানা পেছনে রয়ে গিয়েছিল যা বাগদাদের দুর্ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। [৩]

শাফেয়ী ফকীহদের প্রধান আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৪০ হিজরি)-ও বাগদাদ থেকে মিশরে চলে যান। [৪]

যেহেতু এই যুগে হিজাজ কারামিতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছিল; তাই মক্কার মহান মুহাদ্দিস দাউলাজ ইবনে আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৫১ হিজরি) পালিয়ে বাগদাদে চলে আসেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করতেন। তাঁর সততা প্রবাদতুল্য ছিল। তিনি প্রচুর উপার্জন করতেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানে অনেক সহযোগিতা করতেন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি মক্কায় ‘দারুল আব্বাসিয়া’ ৩০ হাজার দিনারে (সাড়ে সাত কোটি রূপি) ক্রয় করেছিলেন। যখন তিনি হিজাজের স্থায়ী অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাগদাদে স্থানান্তরিত হলেন, তখন এখানে বনু বুওয়াইহ তাঁর সম্পদ দেখে অস্থির হয়ে পড়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত উত্তরাধিকার আত্মসাৎ করে নেয়, যা তিন লক্ষ দিনারের কম ছিল না। [৫]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/২৫২

[২] মিজানুল ইতিদাল: ১/১৩৯

[৩] তাবাকাতুল হনাবিলা: ২/৭৫

[৪] তারিখু বাগদাদ: ৬/১১

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৩২ — তিন লক্ষ দিনার, বর্তমান সময়ের প্রায় ৭ কোটি রূপি।

বাতিল ফেরকাগুলোর ইলমী মোকাবিলা

মুসলমানরা যে নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, উম্মতের উলামায়ে কেরাম তা সামনে রেখে সংস্কারের জন্য নিজেদের পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই সময়ে উলামাদের কাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। একদল দ্বীন রক্ষার জন্য হুজরা-নশীন থেকে গবেষণা ও রচনার মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এই উলামায়ে কেরাম আকীদা, হাদীস, উসূলে হাদীস, জারহ ও তাদীল, ফিকহ এবং ইতিহাসসহ বহু শাস্ত্রের ওপর কাজ করেছেন। একদল ময়দানে এসে বাতিল ফেরকাগুলোর সাথে মুনাজারা করেছেন এবং প্রতিটি স্থানে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন।

আবু বকর আল-আজুরী রহ.

ইসলামী আকীদা রক্ষার জন্য আবু বকর মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-আজুরী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হিজরী) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি ‘আশ-শারীয়াহ’ এর মতো একটি পথপ্রদর্শক কিতাব রচনা করেছেন যা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলে সমৃদ্ধ। এতে যেখানে মুতাজিলাদের আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে, সেখানে রাফেজীদের মতবাদকেও অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। এই কিতাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর খিলাফতকে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে প্রমাণ করা হয়েছে। এছাড়া চার খলীফা ও আহলে বাইতের ফযীলতের পাশাপাশি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর ফযীলত ও মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কিতাবটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে দুই হাজারের বেশি হাদীস থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে। [১]

কাজী আবু বকর ইবনে বাকিল্লানী রহ.

এই যুগে কাজী আবু বকর মুহাম্মদ বিন তাইয়েব ইবনে বাকিল্লানী মালিকী রহ. (৩৩৮ হিজরী - ৪০৩ হিজরী) মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেছেন এবং বাতিল ফেরকাগুলোকে প্রতিটি বিতর্কে দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনে বাগদাদকে নিজের ইলমী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করেন। ইরাকে তিনি মালিকী ফকীহদের শিরোমণি এবং আশআরীদের নেতা হিসেবে গণ্য হতেন। [২]

তাঁর মর্যাদার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, ৩৭১ হিজরীতে খলীফা তাঁকে রোম সম্রাটের কাছে নিজের দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট চেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর দরবারে মাথা নত করে প্রবেশ করবেন; তাই তিনি তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খোলান। তিনি বাদশাহর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উল্টো হয়ে (পিছন দিক দিয়ে) প্রবেশ করেন। কথোপকথনের সময় সম্রাট তাঁকে আক্রমণ করে জিজ্ঞেস করলেন:

“তোমাদের নবীর স্ত্রী আয়েশা (যাঁর ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল) সম্পর্কে তোমরা কী বলো?”

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন: “এমন (অপবাদগ্রস্ত) নারী ছিলেন দুইজন: একজন আমাদের নবীর স্ত্রী এবং অন্যজন হযরত মারয়াম। আমাদের নবীর স্ত্রী বিবাহিত ছিলেন কিন্তু সন্তানহীন ছিলেন। হযরত মারয়াম কুমারী ছিলেন কিন্তু সন্তানবতী ছিলেন। উভয়ের ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ উভয়কেই পবিত্র ঘোষণা করেছেন।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৩৩, ১৩৪।

[২] আলামুয যিরিকলী: ৬/১৭৬, সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/১৯০।

সাব্যস্ত করে দিলেন।“ রোমের সম্রাট এটি শুনে এমন চুপ হয়ে গেলেন যে কিছু বলার শক্তি রইল না।

কায়সারের দরবারে সন্ন্যাসীরাও আসতেন। একদিন ইমাম ইবনে বাকিল্লানি (রহ.) এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন:

“আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের কী অবস্থা?”

কায়সার বাধা দিয়ে বললেন: “চুপ করুন! আপনি কি জানেন না যে সন্ন্যাসীরা এসব বিষয় থেকে পবিত্র হন?”

ইমাম ইবনে বাকিল্লানি (রহ.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “আপনি সন্ন্যাসীকে এসব বিষয় থেকে পবিত্র বলে মেনে নিচ্ছেন, অথচ সমস্ত জগতের পালনকর্তাকে এসব বিষয় থেকে পবিত্র বলে মানছেন না।”

কায়সার বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। [১]

আলেমদের মহলে আবু বকর ইবনে বাকিল্লানি (রহ.)-এর সম্মান ছিল অত্যধিক। একবার বাগদাদে ইমাম দারাকুতনি (রহ.)-এর সাথে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ হলো। ইমাম দারাকুতনি (রহ.) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর মুখ ও কপালে চুম্বন করলেন।

তাঁর সঙ্গী আবু যর আল-হারবি জিজ্ঞেস করলেন: “ইনি কে যে আপনি সমসাময়িক ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এমন সম্মান প্রদর্শন করলেন?”

ইমাম দারাকুতনি (রহ.) বললেন: “ইনি মুসলমানদের ইমাম এবং দ্বীনের সাফাই উকিল কাজী আবু বকর।” [২]

আবু বকর ইবনে বাকিল্লানি (রহ.)-এর নিয়ম ছিল যে, সফরে থাকুন বা বাড়িতে, প্রতিদিন এশার পর বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন, তারপর লেখালেখির কাজ শুরু করতেন এবং ঘুমানোর আগে ৩৫ পৃষ্ঠা লিখে ফেলতেন। আবু বকর খাওয়ারিজমি বলেন যে, বাগদাদের প্রত্যেক লেখক অন্যদের রচনা দেখে বই লিখতেন, ইবনে বাকিল্লানি ছাড়া। তাঁর সিনা (বক্ষ) ছিল ইলমের ভাণ্ডার। তিনি নিজের স্মৃতিশক্তি ও মেধা থেকে সবকিছু লিখে যেতেন। তিনি আবুল হাসান আশআরি (রহ.)-এর ইলম যা তাঁর কিতাব “আল-ইবানাহ” এবং “আল-লুমা”-তে বিদ্যমান ছিল, সেগুলোকে আরও পরিমার্জিত করে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি “শরহুল ইবানাহ” এবং “শরহুল লুমা” লিখে এক মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দেন। এছাড়া তিনি “মানাকিবুল আইম্মাতুল আরবাবা” রচনা করেন এবং হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলিদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা বজায় রেখে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। “ইজায়ুল কুরআন” লিখে তিনি কুরআন মাজিদের অতুলনীয় ও নজিরবিহীন হওয়া এমনভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নাস্তিক, দার্শনিক এবং অমুসলিম পণ্ডিতরা আজ পর্যন্ত এর জবাব দিতে পারেনি।

“তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দালাইল” ইলমে আকিদার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি অনন্য কিতাব, যাতে ইহুদি, নাসারা এবং অগ্নিপূজকসহ অমুসলিমদের ইসলামের ওপর করা আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খোদ ইসলামি ফেরকাগুলোর পক্ষ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাবের ওপর করা প্রসিদ্ধ সংশয়গুলোও নিরসন করা হয়েছে। পাশাপাশি এতে আহলে সুন্নাতের নিকট “খুরুজ”-এর মাসআলাটি এত সুন্দরভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিজ্ঞজনরা প্রশংসা না করে থাকতে পারেন না। তিনি “কাশফুল আসরার ওয়া হাতকুল আস্তার” নামক এক অতুলনীয় কিতাব লিখেছেন, যার সেই যুগে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/১৯১, ১৯২; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৭১ হিজরি।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৫৫৮।

মিসর ও আফ্রিকায় ক্ষমতাসীন রাফেযী হুকুমত “দৌলতে বনী উবাইদ”-এর গোমর প্রথমবার ফাঁস করা হয়েছিল এবং এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, এই শাসকদের সাথে সাদাতদের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তারা একটি জাল বংশের মাধ্যমে মানুষের আকিদা এবং তাদের দীন ও ঈমান নিয়ে খেলায় সফল হয়েছে। [১]

আবু বকর ইবনে বাকিল্লানী (রহ.) শুধু জবান ও কলমেরই নয়, বরং তলোয়ারেরও অধিকারী ছিলেন। যখন বনী উবাইদ ইরাক দখলের চেষ্টা শুরু করল, তখন মোসেলের গভর্নর ভীত হয়ে তাদের অনুগত হয়ে গেল। খলিফা বাহাউদৌলাকে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে আবু বকর বাকিল্লানী (রহ.)-কে দূত হিসেবে পাঠালেন। এরপর তিনি খলিফার দূত হিসেবে মোসেলের গভর্নরের কাছে গিয়ে তাকে বুঝালেন ও ভয় দেখালেন। অবশেষে মোসেলের গভর্নর পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত হলেন এবং এভাবে ইরাক বনী উবাইদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল। এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকে “শমশীরে সুন্নাত” এবং “লিসানুল উম্মত” উপাধিতে স্মরণ করা হতো। [২]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন:

“বাগদাদে তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি হাদীস, সুন্নাহ এবং যুক্তি ও দর্শনের মাধ্যমে মুতাজিলা, রাফেযী, কাদরী এবং অন্যান্য বিদআতী দলগুলোর সাথে আমীরদের উপস্থিতিতে মুনাজারা করতেন, যদিও সে সময় হুকুমত ওইসব লোকদেরই ছিল এবং বনী বুওয়াইহ বিজয়ী ছিল।” [৩]

শেখ আবু ইসহাক ইসফারায়িনী (রহ.):

তাদের পর নিশাপুরের মহান আলেম শেখ আবু ইসহাক ইসফারায়িনী (মৃত্যু ৪১৮ হিজরী) মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তার মর্যাদা এত উচ্চ ছিল যে, তার জন্য নিশাপুরে একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছিল যেখানে তিনি হাদীস ও আকিদার দরস দিতেন। বাতিল দলগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার কারণে তাকে “নারে মুহতারিক” (দহনকারী আগুন) বলা হতো। খণ্ডনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তার মেজাজে কিছুটা কঠোরতা চলে এসেছিল; এজন্য তার কিছু মতামত স্বতন্ত্র ছিল, তবে সামগ্রিকভাবে তার কাজ অত্যন্ত উপকারী ছিল। তার কিতাব “আল-জামে ফিল উসুলিদ দ্বীন ওয়ার রাদ্দু আলাল মুলহিদ্দীন” পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। বাতিল দলগুলোর খণ্ডনে এটি একটি অতুলনীয় প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। [৪]

আল-ফকীহ ইয়াযীদী (রহ.):

রয়-এর হানাফী ফকীহ ও মুনাজির আল-ফকীহ ইয়াযীদী (মৃত্যু ৪৩২ হিজরী)-ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের একজন। তিনি তার...

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ১৭৬/৬

[২] আল-মুনতায়াম লিবনিল জাওযী: ৭৭/১৫; আল-ইবার ফী খবর মান গবার: ১৯৮, ১৯৭/২

[৩] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৫৫৮/১৭

[৪] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৩৫৪/১৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

পৈতৃক এলাকা থেকে বাগদাদে আসেন এবং এখানে বাতিল ফিরকাগুলোর সাথে মুনাজারা (বিতর্ক) করে খ্যাতি অর্জন করেন।

বিখ্যাত শিয়া আলেম শরীফ মুর্তজার সাথে বাগ-এ-ফাদাক ইস্যুতে তাঁর মুনাজারা হয়। আহলে সুন্নাতের অবস্থান হলো, নবীদের উত্তরাধিকার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয় না বরং তা সদকা হয়। শিয়াদের মাযহাব এর বিপরীত। শরীফ মুর্তজা আহলে সুন্নাতের দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদিস ‘মা তারাকনা সদকা’ (আমরা যা রেখে যাই তা সদকা)-কে প্রত্যাখ্যান করে বলেন: “এখানে ‘মা’ হলো নাফিয়া (না-বোধক), এর অর্থ হলো আমরা কোনো সদকা রেখে যাইনি।” আল-মুহিদ ইয়াজজি তৎক্ষণাৎ বলেন: “যদি এটি মেনে নেওয়া হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথাটি নিরর্থক বলে গণ্য হবে; কারণ সবাই জানে যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয়, সদকা হয় না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা উম্মত থেকে আলাদা ছিল, তাই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমাদের উত্তরাধিকার সদকা হবে।” এভাবে তিনি শরীফ মুর্তজাকে নিরন্তর করে দেন। [১]

আবু মনসুর আব্দুল কাহের বাগদাদী আল-ইসফরাইনী রহ.:

এই যুগের একজন প্রথিতযশা আলেম ছিলেন ইমাম আবু মনসুর আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. (মৃত্যু ৪২৯ হিজরি), যিনি ইমাম আবু ইসহাক ইসফরাইনী রহ.-এর বিশেষ ছাত্র ও তাঁর উত্তরসূরি ছিলেন। তিনি বাগদাদ থেকে নিশাপুরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর উস্তাদের দরসগাহে বসে সতেরোটি জ্ঞান ও শিল্পকলার ওপর দরস দিতে থাকেন। তিনি ‘আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক’ নামক এক অমর গ্রন্থ রচনা করেন, যা বিভিন্ন ফিরকার পরিচিতি ও তাদের ইতিহাসের ওপর আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। [২]

বনু মান্দাহ পরিবার:

এই যুগেই ইসফাহানের একটি পরিবার ‘বনু মান্দাহ’-এর চার প্রজন্ম একের পর এক সুন্নাহর সংরক্ষণে বীরত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। এই পরিবারের প্রত্যেক আলেম ‘ইবনে মান্দাহ’ উপনামে পরিচিত ছিলেন। প্রথম আলেম ছিলেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন মান্দাহ (২২০ হিজরি - ৩০১ হিজরি), যিনি হাফিজে হাদিস হিসেবে গণ্য হতেন। [৩]

এরপর তাঁর নাতি মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ (৩১০ হিজরি - ৩৯৫ হিজরি) আসেন, যিনি ‘আল-ঈমান’, ‘আত-তাওহীদ’, ‘আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়াহ’ এবং ‘মা’রিফাতুস সাহাবাহ’-এর মতো মহান গ্রন্থসমূহ রচনা করে ইলমে কালাম, আকাইদ ও ইতিহাসের ভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন করেন। [৪]

পরবর্তী যুগ ছিল তাঁর সাহেবজাদা আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ (৩৮১ হিজরি - ৪৭০ হিজরি)-এর, যিনি সুন্নাহর সমর্থন ও বিদআতের খণ্ডনে অনেক কিতাব লিখেন। [৫] তাঁর ভাই আব্দুল ওয়াহাব বিন মুহাম্মদ (৩৮৮ হিজরি - ৪৭৫ হিজরি)-এর হাদিসের দরস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। [৬]

এরপর তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া বিন আব্দুল ওয়াহাব (৪৩৪ হিজরি - ৫১১ হিজরি) ‘আত-তানবিহু আলাল জুহহালি ওয়াল মুনাফিকিন’ এবং ইতিহাসে ‘মানাকিবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল’ ও ‘তারিখে ইসফাহান’ লিখেন। প্রতিটি রচনা নিজ নিজ বিষয়ের হক আদায় করেছে। ইবনে খাল্লিকান তাঁর পরিচিতি এভাবে তুলে ধরেন: “মুহাদিস বিন মুহাদিস বিন মুহাদিস বিন মুহাদিস”। [৭]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৪২৫

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/২৮ থেকে ৩০, আল-আলাম যিরিকলি: ৬/২৯

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/৪৪১

[৪] আল-আলাম যিরিকলি: ৭/৪৮

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১৩৫

[৬] আল-আলাম যিরিকলি: ২/৩২৭

[৭] ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৬/১১৮

বাতিল হুকুমত এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালনকারী উলামায়ে কেরাম

এই যুগের কিছু আলেম জনগণ এবং বাতিল ফেরকাগুলোর হুকুমতের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করেছেন। তারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে জুলুম-অত্যাচার হ্রাস করতে, জনগণকে স্বস্তি দিতে, কঠোর নীতি পরিবর্তন করতে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। কিছু আলেম সরকারি পদও গ্রহণ করেছিলেন, যেমন ‘কাযা’ (বিচার বিভাগীয় পদ), যাতে জনগণকে ইনসাফ প্রদানে সাহায্য করা যায়। এই পদ গ্রহণ করার পেছনে শরয়ী অবকাশ তো ছিলই, হিকমতও এটাই ছিল যে, সমাজে প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ যেন নষ্ট না হয়।

কাজী আসসাল আসফাহানী রহ.

তাদের মধ্যে কাজী মুহাম্মদ বিন আহমদ আসসাল আসফাহানী রহ. (২৬৯ হি. - ৩৩৯ হি.)-ও ছিলেন। তিনি আসফাহানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তিনি ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। আবু সাঈদ নাখ্শ, যিনি দারকুতনী এবং ইমাম হাকীম রহ.-এর মতো মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তিনি বলতেন যে, আমি আসসালের মতো আলেম কোথাও দেখিনি।

তাকে আসফাহানের কাজী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে শুরুতে তিনি রাজি হননি, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যখন খুব পীড়াপীড়ি করা হলো তখন তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রুকনুদ্দৌলা হাসান বিন বুওয়াইহ ৩৩৯ হিজরীতে তাকে এই পদ অর্পণ করেন। তিনি বিচারিক দায়িত্ব এমনভাবে পালন করেন যে, মানুষের কাজী শুরাইহ রহ.-এর যুগের কথা মনে পড়ে যায়।

সব সময় তার দরজা ফরিয়াদীদের জন্য খোলা থাকত। যুহুদ ও ইবাদতের অবস্থা এই ছিল যে, এক রাকাতে পুরো কুরআন খতম করা তার জন্য সাধারণ বিষয় ছিল। মানুষ তার ইলম, ফযীলত এবং ইনসাফের খ্যাতি শুনে দূর-দূরান্ত থেকে আসত। কেউ আসত নিজেদের বিবাদ মীমাংসা করতে, কেউ হাদীস শুনতে এবং কেউ শুধু তার এক পলক দেখার জন্য উপস্থিত হতো।

যখন তার মৃত্যু হলো তখন আসফাহানে শোকের ছায়া নেমে এল। সেই দিনই কিছু মুসাফির সেখানে পৌঁছাল। এই খবর শুনে তারা কাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং কাঁদতে লাগল। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল:

“আমরা দেড় বছর ধরে মরক্কো থেকে এখানে পৌঁছেছি এই আশায় যে, তার কাছ থেকে হাদীস শুনব।” [১]

হাফেজ আব্দুল গনী আবু মুহাম্মদ আল-আযদী রহ.

এই যুগে মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ আব্দুল গনী বিন সাঈদ রহ. (৩৩২ হি. - ৪০৯ হি.), যিনি আবু মুহাম্মদ আল-আযদী কুনিয়ত (উপনাম) দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বখ্যাত কাজ করেছেন। তিনি ইমাম দারকুতনী রহ.-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যার ওপর ইমাম গর্ব করতেন। তিনি বলতেন: “সে আগুনের শিখা।” ইমাম দারকুতনী রহ. যখন মিশর সফর শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তার ভক্তরা কাঁদতে লাগল। ইমাম দারকুতনী রহ. বললেন: “তোমরা কাঁদছ কেন? তোমাদের কাছে আব্দুল গনী আছে, সে-ই যথেষ্ট।”

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/১৬ থেকে ১৩।

হাফিজ আব্দুল গনি (রহ.) বনু উবাইদের নিপীড়নমূলক পরিবেশেও দৃঢ়তার সাথে ইলমি কাজ করেছেন। তিনি ‘আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ’, ‘আল-গাওয়ামিদ ওয়াল মুবহামাত’, ‘আল-আওহাম আল-লাতি ফি মাদখাল আল-হাকিম’ এবং ‘আল-মুতাওয়ারিন’-এর মতো কিতাবসমূহ লিখেছেন।

‘আল-মুতাওয়ারিন’-এ অতীতের সেইসব ওলামায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা সরকারি রোযানলের শিকার হয়েছিলেন। এই কিতাবে তিনি নিজ যুগের আহলে ইলমদের অতীতের আয়না দেখিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে নিজেও এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে; উবাইদি শাসক আল-হাকিমের যুগে তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। কয়েক বছর পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।

এখন তিনি নিজেও বনু উবাইদের ব্যাপারে নিজের আচরণ নমনীয় করেন। হাফিজ জাহাবি (রহ.)-এর মতে, হাফিজ আব্দুল গনি (রহ.) একটি সরকারি পদ গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে কিছু আলেম তার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। যদিও হাফিজ আব্দুল গনি (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল কোনো না কোনোভাবে সুন্নাহর প্রচার-প্রসারের কাজ চালিয়ে যাওয়া। হাফিজ আব্দুল গনি (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায্যপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে জমহুর মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য রয়েছে। হাফিজ আব্দুল গনি (রহ.) কায়রোতেই ইন্তেকাল করেন। [১]

কাজী ইয়াহইয়া বিন মনসুর (রহ.):

তাদের মধ্যেই ছিলেন কাজী ইয়াহইয়া বিন মনসুর (রহ.) (মৃত্যু ৩৫১ হিজরি), যিনি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিশাপুরের কাজী ছিলেন এবং ৩৪৯ হিজরিতে অপসারিত হন। ইমাম হাকিম নিশাপুরি (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসগণ তার ছাত্র ছিলেন। [২]

ইমাম আবুল হাসান কাজভিনি (রহ.):

এই ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইমাম আবুল হাসান কাজভিনি (রহ.)-ও (৩৬০ হিজরি - ৪৪২ হিজরি) ছিলেন, যিনি হাফিজ, আশারা কিরাতেস কারী, মুহাদ্দিস, আবিদ, জাহিদ এবং কারামতসম্পন্ন বুজুর্গ ছিলেন। তিলাওয়াতে কুরআন ছিল তার সার্বক্ষণিক আমল ও ওজিফা। তিনি অত্যন্ত দরবেশসুলভ জীবন যাপন করতেন। শুধুমাত্র সালাতের জন্য ঘর থেকে বের হতেন। বাকি সময় তার ঘরটি ছিল একটি দরসগাহ এবং খানকাহ। কুরআন ও হাদিসের ইলম অন্বেষণকারীরা সব সময় তার চারপাশে ভিড় করে থাকত। আল্লাহ তাকে এমন জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন যে, খলিফা কাদির বিল্লাহ নিজেও ছদ্মবেশে তার মজলিসে উপস্থিত হতেন এবং ফায়দা হাসিল করতেন। এই গোপন কথাটি কেবল ইমাম আবুল হাসান কাজভিনি (রহ.)-ই জানতেন যে খলিফাও মজলিসে উপস্থিত আছেন। একইভাবে আমীর-উমরাগণও তার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতেন। আবু তাহির বিন বুওয়াইহ এবং আবু কালিজার তার সাথে দেখা করতে আসতেন এবং সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বসে থাকাকে আদব পরিপন্থী মনে করতেন।

যখন তার ইন্তেকাল হলো, তখন পুরো বাগদাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হতো যে, এটি এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জানাজা ছিল। [৩]

ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি (রহ.):

ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি (রহ.) (৩৪৪ হিজরি - ৪০৬ হিজরি) বাগদাদে শাফেয়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন। অনেক শাফেয়ী আলেম তাকে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করেন। তিনি ছাত্রজীবনে অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে সময় কাটিয়েছেন। রাতে পড়াশোনার জন্য প্রদীপে তেল ঢালার মতো পয়সাও তার কাছে ছিল না। অবশেষে তিনি রাতে একটি প্রাসাদে পাহারাদারের কাজ শুরু করেন। এই সময়ে...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/২৬৮, ২৭০; ওয়াফয়াতুল আইয়ান: ৩/২২৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/২৮

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৬০৯ থেকে ৬১৪

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

বড় বড় কিতাব পড়তেন। এই মেহনতের ফল এই ছিল যে, সতেরো বছর বয়সে তিনি ফতোয়া প্রদানের আসনে আসীন হন। বিশ বছর বয়সে বাগদাদে আসেন। এখানে তাঁর দরসের মজলিস এত প্রসিদ্ধ হলো যে, এক সময়ে তিনশ থেকে সাতশ ফকিহ তাঁর সামনে বসে উপকৃত হতেন। খিলাফতের দরবার এবং বাগদাদের আমিরদের মাঝে তাঁর বড় প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। রাফেজিদের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন সরকার, রাষ্ট্র এবং ক্ষমতার প্রাসাদে দ্বীনি নিদর্শনসমূহ জীবিত থাকে। [১]

ইমাম হাসান বিন আহমদ সুবায়ী রহ.

তাঁদের মধ্যে হামাদানে হাসান বিন আহমদ সুবায়ী (২৮১ হি.-৩৭১ হি.)-ও ছিলেন, যিনি ইমাম দারাকুতনি রহ.-এর উস্তাদদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর অবস্থান ছিল আলেপ্পোতে। আলেপ্পোর উলামায়ে কেরাম বলতেন যে, এই শহরে তাঁর সমকক্ষ কোনো মুহাদিস নেই। সাইফুদ দৌলা হামদানি তাঁকে অনেক সম্মান করতেন এবং তাঁর ঘরে হাজিরা দিতেন। তিনি ৯০ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং ৩৭১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [২]

ইমাম হাকীম আল-কাবীর রহ.

আবু আহমদ হাকীম আল-কাবীর (২৮৫ হি.-৩৭৮ হি.)-ও এই যুগের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। “শাআর আসহাবিল হাদীস”, “আল-আসমা ওয়াল কুনা”, “আল-ইলাল”, “আশ-শুযুখ”, “আল-আবওয়াব”, “আল-মুখরিজ আলা কিতাবিল মুজানি” এবং “ফাওয়ায়েদে আবি আহমদ” তাঁর উচ্চমানের রচনা। তাঁর সম্পর্ক ছিল মধ্য এশিয়ার সাথে। একবার বুখারার সামানি শাসক হাকীম নূহ বিন নাসর উলামায়ে কেরামের কাছে সদকা ও কর সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই চুপ থাকলেন। আবু আহমদ হাকীম সবার পেছনে বসে ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে হাদিস শুনিয়ে দিলেন। নূহ বিন নাসর বললেন: “কাজী তো তাঁর মতোই হওয়া উচিত।” ফলে এরপর তিনি বিভিন্ন শহরের কাজী নিযুক্ত হন। শাশ এবং তুস শহরে মানুষ তাঁর ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভক্ত হয়ে যায়। ৩৪৫ হিজরিতে তিনি নিশাপুরে ফিরে আসেন এবং বাকি জীবন দরস-তাদরিস ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। [৩]

ইমাম আল-মাওয়াদী রহ.

এই যুগের একটি বড় নাম ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়াদী (৩৬৪ হি.-৪৫০ হি.)-এর। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। নিশাপুরের “উস্তাওয়া” জনপদের কাজী ছিলেন। এরপর বাগদাদে এসে দীর্ঘ সময় দরস-তাদরিসে অতিবাহিত করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খিলাফতের দূত হিসেবে বৈদেশিক সফরেও নিয়োজিত ছিলেন। ৪২৯ হিজরিতে খিলাফতের পক্ষ থেকে তাঁকে “আকদাল কুদাত” (সবচেয়ে বড় কাজী) উপাধি দেওয়া হয়। [৪]

৪২৯ হিজরিতেই শাসক জালালুদ দৌলা খলিফার কাছে জোর দাবি জানিয়ে নিজের নামের সাথে “মালিকুল মুলুক” (শাহেনশাহ) উপাধি মঞ্জুর করিয়ে নেন। বাগদাদের অনেক আলেম শাসকের চাপে এর বৈধতার ফতোয়া দিয়ে দেন, যদিও হাদিসে পরিষ্কার...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/১৯৩ থেকে ১৯৫

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/২৯৬ থেকে ২৯৯

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৩৭০ থেকে ৩৭৬

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/৬৪ থেকে ৬৭

ভাবে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। [১] জালাল আদ-দৌলা জানতেন যে, যতক্ষণ না কাযিউল কুযাত আল-মাওয়াদি বৈধতার ফতোয়া দেবেন, ততক্ষণ সাধারণ মানুষ সম্ভ্রষ্ট হবে না। তাই তিনি কাযি সাহেবের সমর্থন চেয়েছিলেন, কিন্তু কাযি সাহেব এই পদক্ষেপের সমর্থন করেননি বরং দরবারে আসাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আড়াই মাস পর জালাল আদ-দৌলা নিজেই তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন:

“আপনি উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যে সবার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি জানি যে, আপনি আমার পক্ষে আপনার যে রাগের বিরোধিতা করেছেন তা কেবল এই কারণে যে, আপনি হকের অনুসরণ করতে চান এবং এ ব্যাপারে কারো পরোয়া করেন না। এই ঘটনার কারণে আমার কাছে আপনার মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।” [২]

সেলজুকি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল বেগ তাঁর প্রাথমিক বিজয়গুলোতে সাধারণ মানুষের জানমালের সম্মানের বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলেন। কাযি আল-মাওয়াদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি দূত হিসেবে তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে এই আচরণের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে জনগণের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের সাথে আচরণ করার ওপর জোর দেন। তুঘরিল বেগ তাঁর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন, তাঁর উপদেশগুলো মনে গঁথে নেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। [৩]

আল্লাহ তাঁকে ইসলামী রাজনীতি বোঝার বিশেষ প্রতিভা দান করেছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সুস্পষ্ট দূরদর্শিতার নির্যাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই কিতাবে পেশ করেছেন যা ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ’ নামে পরিচিত এবং আজ পর্যন্ত উলামাদের নিকট থেকে প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থে খিলাফত, ইমামত, উযরাত (মন্ত্রিত্ব), উত্তরাধিকার (অলি-অহদি), খিলাফতের অধীনস্থ সরকারসমূহ, বিচার ব্যবস্থা (কাদা), জিযিয়া, খারাজ, অপরাধের শাস্তি এবং ইহতিসাব (জবাবদিহিতা) বিভাগসহ ইসলামী রাজনীতির প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাব ‘আল-খারাজ’ এবং ইবনে যানজুয়াহ-এর ‘কিতাবুল আমওয়াল’ সহ ইসলামী রাজনীতির ওপর পূর্ববর্তী উলামা ও ফুকাহাদের যাবতীয় জ্ঞান এই কিতাবে সম্মিলিত করা হয়েছে। আল-মাওয়াদির এই রচনা প্রমাণ করে যে, তিনি বাস্তব জগতে বসবাসকারী একজন মানুষ ছিলেন এবং ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার মধ্যে বিদ্যমান সেই নমনীয়তা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন, যা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি যুগ ও সময়ের উপযোগী সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব।

‘আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ’ ছাড়াও আল-মাওয়াদি মুসলিম শাসকদের চরিত্র ও নৈতিকতা উন্নত করার জন্য দুটি অত্যন্ত চমৎকার কিতাব: ‘তাহশীলুন নাযার ওয়া তা’জীলুয যাহফার ফি আখলাকিল মালিক’ এবং ‘দুরারুস সুলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক’ রচনা করেছেন, যা এমন সব মূলনীতি ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার যে কোনো শাসকই তা পাঠ করে সেই ভুলগুলো সংশোধন করতে পারেন যার কারণে অতীতের বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আল-মাওয়াদি একজন বড় মুফাসসির ও ফকিহও ছিলেন। ৬ খণ্ডে ‘তাহসীরুল মাওয়াদি’ এবং ফিকহ শাস্ত্রের ওপর ১০ খণ্ডে ‘আল-হাভী’ তাঁর ইলমি গভীরতার প্রমাণ। [৪]

[১] “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলার নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকট নাম হলো সেই ব্যক্তির, যে নিজেকে ‘মালিকুল আমলাক’ (রাজাধিরাজ) নাম দেয়...” (সুন্নে আবু দাউদ, হা: ৪৯৬১, কিতাবুল আদাব, বাবু ফি তাগযীরিল ইসম, আলবানী একে সহীহ বলেছেন)। ইবনুল জাওযী বলেন: অধিকাংশ আলেম ‘মালিকুল আমলাক’ বলা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে কিয়াস (অনুমান) করেছেন তা সঠিক নয়। আমি মনে করি আল-মাওয়াদি যা দেখেছেন তা-ই সঠিক, কারণ হাদীসে এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে যা কিয়াসকে বাতিল করে দেয়। (আল-মুনতায়াম: ১৬/১৫)।

[২] আল-মুনতায়াম লি-ইবনিল জাওযী: ৪২৯ হিজরী।

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/২৭০।

[৪] সিয়রু আ’লামিন নুবালা: ১৭/৪৮১।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রচেষ্টা:

চরিত্র সংশোধন ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ময়দানে সমরকন্দের একটি গ্রাম ‘খারকান’-এর প্রখ্যাত সুফি বুজুর্গ শেখ আবুল হাসান খারকানি রহ. (৩৫২ হি. - ৪২৫ হি.) এই যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সংস্কার, দাওয়াত ও তাসাউফের ধারাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সম্পদে ভূষিত হন। তাঁর মর্যাদা এতটাই উচ্চ ছিল যে, সুলতান মাহমুদ গজনভি তাঁর খেদমতে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপস্থিত হন এবং অনেক সোনা-দানা ও মণি-মুক্তা পেশ করেন, কিন্তু তিনি একটি দিরহামও গ্রহণ করেননি এবং বললেন:

“আমি আমার সেনাবাহিনীর খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি, আপনি এটি আপনার সেনাবাহিনীর জন্য খরচ করুন।”

প্রসিদ্ধ আছে যে, মাহমুদ গজনভির বিজয়াভিযানগুলোতে এই বুজুর্গের দোয়ার বড় অবদান ছিল। [১]

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি রহ. (মৃ. ৩৭৩ হি.)-ও এই যুগের একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব, যিনি ফিকহ ও হাদিসের দরস ছাড়াও সাধারণ মানুষের সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব “তানবিহুল গাফিলিন” এমন খ্যাতি লাভ করেছে যে, বিশ্বের প্রায় সব ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে গেছে। [২]

জারহ ও তাদিল:

বাতিল দলগুলো জাল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হচ্ছিল, যা প্রতিরোধের জন্য ‘ইলমে আসমাউর রিজাল’ এবং ‘জারহ ও তাদিল’-এর শাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আকিদাগত ফিতনার আধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে জারহ ও তাদিলের নীতিকে আরও উন্নত করার জন্য আলেমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইবনে হিব্বান বুস্তি রহ. (মৃ. ৩৫৪ হি.) অত্যন্ত মজবুত ও অনন্য কাজ করেন। তিনি “আস-সিকাত”-এ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের এবং “আল-মাজরুহিন”-এ দুর্বল বর্ণনাকারীদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হাদিসের একটি অত্যন্ত মূল্যবান ভাণ্ডারও সংকলন করেন যা “সহিহ ইবনে হিব্বান” নামে সারা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়। একইভাবে সীরাতের ওপর একটি অত্যন্ত চমৎকার কিতাব লিখেন যা “সীরাতে ইবনে হিব্বান” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [৩]

এই সময়ে ইবনে আদি রহ. (মৃ. ৩৬৫ হি.) দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের অবস্থার ওপর অত্যন্ত ব্যাপক কাজ করেন যা “আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল” নামে সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়। [৪]

অতঃপর ইমাম দারাকুতনি রহ. (মৃ. ৩৮৫ হি.) কলম ধরেন এবং “আদ-দুয়াফা ওয়াল-মাতরুকুন” এবং “আল-মু’তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ”-এর মতো অত্যন্ত মহান কিতাবসমূহ রচনা করেন। [৫]

[১] আল-আনসাব লিস-সামআনি: ৫/৯৩, ৯৪, ত. হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৩২২

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৯২

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৫৬

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৪৪৯

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (নবম খণ্ড)

অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান:

এই যুগে আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম নিশাপুরী (রহ.) (৩২১ হি. - ৪০৫ হি.) “আল-মুস্তাদরাক”-এর মতো একটি বিশাল হাদিস সংকলন তৈরি করেন, যাতে অনেক দুর্বল বর্ণনা থাকলেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিষয়বস্তু বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। এই সংকলনের মাধ্যমে এই সংগ্রহে অনেক মূল্যবান বর্ণনা সংরক্ষিত হয়েছে। [১]

ইমাম আবু বকর বায়হাকী (রহ.) (৩৮৪ হি. - ৪৫৮ হি.) “আস-সুনান আস-সুগরা”, “আস-সুনান আল-কুবরা”, “দালাইলুন নুবুওয়াহ”, “শুয়াবুল ইমান” এবং “মা’রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার”-এর মতো হাদিস সংকলনগুলো সংকলন করেন। এ ছাড়া আকিদাহ বিষয়ে “আল-ইতিকাদ”, “হায়াতুল আশ্বিয়া ফি কুবুরিহিম” এবং “আল-বা’স ওয়ান নুশুর”-এর মতো গ্রন্থগুলো উপহার দেন। তাঁর প্রতিটি রচনা আজও আলেমদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছে। [২]

এই যুগে ফিকহ শাস্ত্রের ওপরও উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। বাগদাদের ফকিহ ইমাম কুদুরী (রহ.) (মৃত্যু ৪২৮ হি.) “মুখতাসার আল-কুদুরী” সংকলন করেন, যা ফিকহ শাস্ত্রের একটি ব্যাপক ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্য এবং আজও প্রচলিত। [৩]

ইসলামি ইতিহাসের ওপরও নতুন কাজ হয়েছে। আবু নুয়াইম আসফাহানি (রহ.) (৩৩৬ হি. - ৪৩০ হি.) “হিলয়াতুল আউলিয়া”-তে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, বুজুর্গ এবং সুফিদের জীবনী সংগ্রহ করেছেন। [৪]

একইভাবে খতিব বাগদাদী (রহ.) (৩৯২ হি. - ৪৬৩ হি.) “তারিখ বাগদাদ” সংকলন করেন, যাতে বাগদাদের মুহাদ্দিস, ফকিহ, আলেম ও মাশায়েখ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী সনদের সাথে বর্ণনার আকারে সংগ্রহ করা হয়েছে। খতিব (রহ.) উসুলে হাদিসের ওপরও কাজ করেছেন এবং “আল-কিফায়াহ ফি উলুমির রিওয়ায়াহ”-এর মতো একটি চমৎকার কিতাব রচনা করেছেন। [৫]

আন্দালুসের আলেমদের অবদান:

এই যুগে আন্দালুসের আলেমগণও উম্মাহর প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে উল্লেখযোগ্য ইলমি খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন আলেম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: একজন হলেন আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) (৩৬৮ হি. - ৪৬৩ হি.), যিনি মালিকি ফিকহ শাস্ত্রে “আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা’আনি ওয়াল আসানিদ” এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর “আল-ইসতিয়াব ফি আসমায়িল আসহাব”-এর মতো বিশাল ও বিস্তারিত কিতাব লিখেছেন। [৬]

দ্বিতীয়জন হলেন আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরি (রহ.) (৩৮৪ হি. - ৪৫৬ হি.), যাকে আন্দালুসের আলেমগণ তাঁর সময়ের মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ মনে করতেন। তিনি “আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল”-এর মতো একটি যুগান্তকারী কিতাব লিখে ইসলাম ও বাতিল ধর্মগুলোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। একইভাবে তিনি ফিকহ শাস্ত্রে “আল-মুহাল্লা”-এর মতো এক মহান শাহকার (মাস্টারপিস) উপহার দিয়েছেন। তাফসির শাস্ত্রে তাঁর “আল-ইরশাদ আল-মানসুখ”, বংশতালিকাবিদ্যায় “জামহারাতু আনসাবিল আরব” এবং সিরাতের ওপর “জাওয়ামিউস সিরাহ”ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/১৭৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৫৭৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/২৭০

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/১৬৩ থেকে ১৬৬

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৪৫৯

[৬] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/১৫৩

এ ছাড়াও ইতিহাস, আকাইদ, তাফসির, হাদিস এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত তাঁর অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা রয়েছে যা জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ‘রাসাইল ইবনে হাজম’ নামে এগুলোর সংকলন সাধারণভাবে পাওয়া যায়। [১]

একজন অজ্ঞাতনামা আলেমের কীর্তি:

হাফেজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর প্রথম শাসক আহমদ বিন বুওয়াইহ (মুইজ উদ-দৌলা) মৃত্যুর আগে তাঁর ভ্রাতৃ আকাইদ ও জুলুম থেকে তওবা করেছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, নিজের প্রাসাদে তিনি একজন মুত্তাকি আলেমের সাথে কথোপকথন করেন। কথার পিঠে কথা প্রসঙ্গে সেই আলেম তাঁর সামনে আহলে সুন্নাতের আকাইদ ও মতাদর্শের সমর্থনে কিছু দলিল উল্লেখ করেন। এরই মধ্যে তিনি এও জানান যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

এ কথা শুনেই মুইজ উদ-দৌলা চমকে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন: “আল্লাহর কসম! আমি এই কথা কখনো শুনিনি।”

এরই মধ্যে সালাত-এর সময় হলে সেই আলেম প্রাসাদ থেকে বের হতে লাগলেন।

মুইজ উদ-দৌলা জিজ্ঞেস করলেন: “কোথায় যাচ্ছেন?”

বললেন: “সালাত আদায় করতে।”

মুইজ উদ-দৌলা বললেন: “এখানে প্রাসাদেই কেন সালাত আদায় করে নিচ্ছেন না?”

তিনি বললেন: “আপনার প্রাসাদ জবরদখল করা জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে।” এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

যুক্তির শক্তি, নিঃস্বার্থতা এবং পরহেজগারির এই দৃশ্য দেখে মুইজ উদ-দৌলা অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি শিয়া আকাইদ থেকে তওবা করলেন এবং মৃত্যুর আগে নিজের গুনাহ ও জুলুম-অত্যাচারের ওপরও তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকলেন। [২]

মুইজ উদ-দৌলার তওবা করার বিষয়টি তাঁর উত্তরসূরিদের চরিত্রের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। তারা পূর্বের ন্যায় রাফয এবং জুলুম-অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তবে এই ঘটনা থেকে এটি আন্দাজ করা যায় যে, হিকমত, ইখলাস এবং লিল্লাহিয়াতের সাথে করা তাবলিগ বেদ্বীন লোকদের ওপরও কিছু না কিছু প্রভাব না ফেলে থাকে না এবং কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে ভোল পাল্টে যায়।

ফলাফল:

মোদাকথা, চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে পথভ্রষ্ট ফেরকা ও ফিতনা দমনের জন্য ইলমি ও তাবলিগি ময়দানে অক্লান্ত পরিশ্রম করা হয়েছিল যা ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই আলেমদের প্রচেষ্টায় প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া অধিকাংশ পথভ্রষ্ট ফেরকা যেমন: খারেজি, মুরজিয়া, কাদারিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর পর একেবারে শেষ হয়ে যায়। মুতাজিলা ফিতনার জোরও ভেঙে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই জনসমক্ষে ও সরকারি পর্যায়ে বিজয়ী থাকে।

[১] সিয়্যরু আলামিন নুবালা: ১৮/১৮৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৩০৫, ৩০৬

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

বাগদাদ খিলাফতের পতন

সমাপ্তি কাল

প্রথম পর্যায়

সেলজুক সুলতানদের ছায়ায় আব্বাসীয় খিলাফত

আল-কায়িমের পুনরায় সিংহাসন আরোহণ থেকে সুলতান মাসউদ সেলজুকের মৃত্যু পর্যন্ত

৪৫০ হিজরি থেকে ৫৪৭ হিজরি

(৯৭ বছর)

সলাজিকা

আব্বাসী খলিফা আল-কায়েম সেলজুক সুলতান তুঘরিল বেগের সাহায্যে ৪৫১ হিজরিতে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর তিনি সতেরো বছর জীবিত ছিলেন। বাগদাদের খলিফাদের সম্মান ও মর্যাদা এখন পুনরায় পুনরুদ্ধার হয়েছিল। সেলজুক সুলতানগণ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন। শর্ত ছিল এই যে, বাগদাদের জামে মসজিদে জুমার খুতবার সময় খলিফার সাথে সেলজুক সুলতানের জন্যও কল্যাণের দোয়া করা হবে। রমজান ৪৫৫ হিজরিতে সুলতান তুঘরিল জীবনের ৭০টি বসন্ত দেখার পর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তার মৃত্যু রে (Ray) শহরে হয়েছিল এবং দাফন মার্ভ (Merv) শহরে তার ভাই চাগরি বেগের কবরের পাশে সম্পন্ন হয়েছিল। [১]

সুলতান তুঘরিল বেগ - সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা:

খলিফা আল-কায়েম এবং তার উত্তরসূরিদের অবস্থা বর্ণনা করার আগে, সেলজুক সুলতানদের অবস্থার ওপর এক নজর বুলিয়ে নেওয়া সমীচীন হবে।

তুর্কিস্তানে তুর্কিরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: একদল তারা যারা পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের ওপর ছিল। দ্বিতীয় দল তারা যারা ঈমান এনেছিল। এই লোকেরা “তুর্ক আল-ঈমান” নামে পরিচিত ছিল। এই শব্দটিই ধীরে ধীরে “তুর্কম্যান” হয়ে যায়। তুর্কম্যানরা তুর্কিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করত যা মাওয়ারাননহর নামে পরিচিত। অমুসলিম তুর্কিরা বেশিরভাগই সিহ্ন নদী (সির দরিয়া) পার হয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে বসবাস করত। এই লোকেরা “তুর্কান-এ-গুজ” নামে পরিচিত ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে তুর্কান-এ-গুজ মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের মুসলিম শাসকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গজনভি ও সেলজুক সুলতানদের প্রায়ই তাদের নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হতো।

মুসলিম তুর্কিস্তানের সীমান্তে “জান্দ” নামক একটি ছোট শহর অবস্থিত ছিল। যার ওপর তুর্কান-এ-গুজরা আক্রমণ চালিয়ে যেত। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে সেলজুক নামক এক অমুসলিম তুর্কি তার এলাকা ছেড়ে সিহ্ন নদী পার হয়ে জান্দের উপকণ্ঠে এসে বসতি স্থাপন করেন। এরপর সেই শহরের শাসকের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তিনি ঈমান আনেন। এরপর তার জীবন জিহাদের জন্য উৎসর্গ হয়ে যায়। তিনি সারাজীবন অমুসলিম তুর্কিদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের প্রথম সারিতে থেকে লড়াই করেন। তুর্কিরা বীরদের খুব সম্মান করে; তাই সেলজুকের সাহসিকতা তাকে সর্দার বানানোর জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছিল। যখন চীতি শাসক ইলিক খান বুখারার শাসক নূহ সানির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, তখন সেলজুক রক্ষণাত্মক যুদ্ধে দুঃসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন, এমনকি এই যুদ্ধেই তার যুবক পুত্র মিকাইল শহীদ হন। এভাবে মিকাইলের অল্পবয়সী সন্তান তুঘরিল বেগ এবং চাগরি বেগ এতিম হয়ে যান। সেলজুক তার নাতিদের কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের...

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২০৩/২

শৌর্য ও নেতৃত্বের সেই সব কৌশল শিখিয়েছিলেন যা একজন বিজয়ীর জন্য অপরিহার্য। সেলজুক ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং জন্মে সমাহিত হন। মিকাইল ছাড়াও সেলজুকের আরও অনেক পুত্র ছিল এবং সেই সময় পর্যন্ত প্রত্যেকের সন্তানসন্ততি শক্তি ও শৌর্যে নাম কামিয়েছিল, কিন্তু সেলজুকি সালতানাতের ভিত্তি মিকাইলের দুই পুত্র: তুঘরিল বেগ এবং চাগরি বেগই স্থাপন করেছিলেন।

তুঘরিল বেগ:

তুঘরিল বেগের আসল নাম ছিল মুহাম্মদ। তিনি ৩৮৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দাদা সেলজুকের কাছে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, নিজের রাষ্ট্রকে তাঁরই দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে ‘সেলজুকি সালতানাত’ নাম দেন। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য শাসকরা যারা সেলজুকদের তুঘরিল বেগের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে দেখে ভীত ছিল, তারা এই নতুন শক্তিকে দমন করার আশ্রয় চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের সব জায়গায় পরাজয় বরণ করতে হয় এবং তুঘরিল বেগ প্রথমে তুর্কিস্তান এবং পরে খোরাসানের বড় একটি অংশ দখল করে নেন। এরপর খাওয়ারিজম এবং রে-ও জয় করে নেন। আশ্চর্যজনকভাবে এই সমস্ত বিজয় মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।

সেলজুকদের উত্থান সত্যিই কুদরতের এক কারিশমা ছিল যা ভ্রান্ত আকিদার সরকারগুলোকে নির্মূল করে ইসলামকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছিল এবং আবাসীয় খিলাফতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে মুসলমানদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত হলে সেলজুকরা দুটি কেন্দ্র তৈরি করে নেয়: ইরান ও ইরাকের জন্য রে-কে রাজধানী নির্ধারণ করা হয় যেখানে তুঘরিলের দরবার বসত। তুর্কিস্তানের জন্য মার্ভকে কেন্দ্র বানানো হয় যেখানে তুঘরিলের ভাই চাগরি বেগ শাসন করতেন। দুই ভাই এক প্রাণ দুই দেহের মতো কাজ করতেন।

তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আল্প আরসালান এবং পরে মালিক শাহ এই উভয় কেন্দ্র এবং অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের একক শাসক ছিলেন। তবে তিন প্রজন্ম পর এই দুই কেন্দ্র পুনরায় আলাদা হয়ে যায়। যে সেলজুক শাসকরা মার্ভকে কেন্দ্র করে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের ব্যবস্থাপনা সামলেছিলেন তারা ‘সালাজিকা-এ-খোরাসান’ নামে পরিচিত হন। যারা রে-কে কেন্দ্র নির্ধারণ করে ইরান ও ইরাকে বিশ্বশাসন করেছিলেন তারা ‘সালাজিকা-এ-ইরাক’ হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। এরপর এশিয়া মাইনরের সেলজুক আমিররাও স্বাধীন হয়ে যান এবং সেলজুকদের এই তৃতীয় দলটি ‘সালাজিকা-এ-রুম’ নামে অভিহিত হয়। [১]

তুঘরিল প্রজাবৎসল, ধর্মপ্রাণ এবং জামাতের সাথে সালাত আদায়ের পাবন্দ মানুষ ছিলেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। মসজিদ নির্মাণ এবং সদকা ও খয়রাতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি তুর্কিদের ঐক্যবদ্ধ করে কয়েক বছরের মধ্যে এত বড় এক রাষ্ট্র গঠন করেন যে ঐতিহাসিকরা বিস্ময়ে হতবাক। তুঘরিলের কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর ইন্তেকালের কিছুকাল আগে তাঁর ভাই চাগরি বেগও মারা গিয়েছিলেন, তাই তুঘরিলের পর তাঁর ভতিজা অর্থাৎ চাগরি বেগের পুত্র আল্প আরসালান শাসনভার গ্রহণ করেন। [২]

আল্প আরসালান এবং মানজিকাট যুদ্ধ:

আল্প আরসালান তাঁর পিতা ও চাচার মতো বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর আমলে ইরাক, খোরাসান, আজারবাইজান এবং...

[১] আল-মুনতাজাম: ৮/২৩৩

[২] সিয়াফু আলামিন নুবালা: ১৮/১০৯ থেকে ১১১

এশিয়া মাইনর পর্যন্ত সেলজুক পতাকা উড়তে শুরু করল। ইসলামের এই নতুন রক্ষকদের দেখে খ্রিস্টান শক্তিগুলো ঈর্ষায় জ্বলছিল। রোমান সম্রাট আরমানোস বহু বছর ধরে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর বাহিনীকে সাথে নিয়ে একটি বিশাল সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন, যাতে দুইশ পাদ্রী ও নবাব ছিলেন যাদের নেতৃত্বে ৩৫ হাজার নির্বাচিত অশ্বারোহী ছিল। ৩৫ হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর। ১৫ হাজার সৈন্য ছিল খোদ কনস্টান্টিনোপলের। এক লক্ষ সৈন্য ছিল শহর অবরোধের জন্য, আর এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক আলাদাভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ভারী মালামাল পরিবহনের জন্য চারশ গরুর গাড়ি ছিল। কয়েক ডজন মিনজানিক ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় মিনজানিকটি এতই ভারী ছিল যে বারোশ লোক মিলে সেটি পরিচালনা করত। এর আঘাত শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল।

পরিকল্পনা ছিল যে, এশিয়া মাইনর এবং কুর্দিস্তান হয়ে সেনাবাহিনী সরাসরি সেলজুকদের রাজধানী ‘রে’ পৌঁছাবে। সেখান থেকে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হবে। তা জয় করে তারপর সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করবে।

রওনা হওয়ার আগে সম্রাট বিভিন্ন ইসলামী প্রদেশগুলো ভিন্ন ভিন্ন নবাবদের নামে বরাদ্দ করে দিলেন। যে নবাবকে বাগদাদের গভর্নর হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, তাকে বিদায় জানিয়ে বললেন: “সেখানে দখল করার পর বৃদ্ধ শরীফ খলিফাকে কিছু বলো না, তিনি আমাদের বন্ধু।”

পাদ্রীরা যারা এই অভিযানে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যাচ্ছিলেন, তারা বললেন: “মহামান্য সম্রাট! আমরা শীতকাল ‘রে’-তে কাটাব এবং গ্রীষ্মকাল ইরাকে। সিরিয়ার পবিত্র স্থানগুলো ফেরার পথে দেখব।”

এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ৪৬৩ হিজরিতে সম্রাট প্রায় তিন লক্ষ লোকের বাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপল প্রণালী পার হলেন এবং মুসলিম বিশ্বের সীমানা পদদলিত করতে শুরু করলেন।

আব্বাস আরসালান সেই দিনগুলোতে সিরিয়ায় এসেছিলেন এবং বাহিনীকে ছুটি দিয়ে ফেরার পথে কুর্দিস্তানের একটি জনপদ “খুই”-তে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন এই সংবাদ পেলেন তখন হতবাক হয়ে গেলেন। তার কাছে মাত্র ১৫ হাজার সৈন্য ছিল। বাকি বাহিনী পুরো সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তের এলাকাগুলোতে মোতায়েন ছিল। এদিকে সম্রাট অগ্রসর হতে হতে “মালাজগার্দ” পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। পথের প্রতিটি মুসলিম জনপদে আগুন ও রক্তের নৃশংস খেলা চলছিল।

আব্বাস আরসালান তার নামের মতোই সিংহহৃদয় ছিলেন। তিনি জানতেন যে যদি তিনি পিছু হটেন, তবে ইরাক ও খোরাসান পর্যন্ত এই তুফান থামানোর মতো কেউ থাকবে না। তিনি তার পরিবার-পরিজনকে সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলক তুসীর তত্ত্বাবধানে হামাদানে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমিরদের ওসিয়ত করে বললেন: “আমি বিপদের সাথে খেলা করা ব্যক্তিদের মতো এই লড়াই লড়াই। যদি বেঁচে ফিরি তবে ঠিক আছে, অন্যথায় আমার পর আমার পুত্র মালিক শাহ শাসক হবে। আশা করি তোমরা তার আনুগত্য করবে।”

তিনি অগ্রবর্তী দলকে সামনে পাঠালেন, যারা প্রতিপক্ষের অগ্রবর্তী দলকে পরাজিত করে তাদের সেনাপতিকে বন্দি করল। তবে তখনও আড়াই লক্ষের পঞ্চপাল সদৃশ বাহিনী পেছনে আসছিল। আব্বাস আরসালান তার পনের হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। ২৫ জিলকদ ৪৬৩ হিজরি বুধবার “রাবওয়াহ” নামক একটি উপত্যকায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। আব্বাস আরসালান তার...

অষ্টম খণ্ড

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সামনে এক কূলহীন উত্তাল জনসমুদ্র দেখে তিনি অনুভব করলেন যে, এই বাহিনীর মোকাবিলা করা কৌশলের পরিপন্থী। তিনি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করে রোম সম্রাটের (কায়সার-এ-রুম) কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, বাগদাদের খলিফাকে জামিন রেখে সন্ধি করা হোক এবং উভয় বাহিনী নিজ নিজ সীমানাকে সীমান্ত নির্ধারণ করে ফিরে যাক। সম্রাট সুলতানের দূতকে অহংকারী সুরে জবাব দিলেন:

“আমি বিপুল অর্থ ব্যয় করে এত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান এই জন্য চালাইনি যে, বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ফিরে যাব। সুলতানের রাজধানী জয় করেই আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমি অবশিষ্ট ইসলামি শহরগুলোর সেই দশা করব যা এশিয়া মাইনরের করেছে।”

এই উত্তর শুনে আল্প আরসালানের চেহারা আত্মমর্যাদাবোধে লাল হয়ে গেল। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন এক লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে বাহ্যত সফলতার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কেবল একটিই ভরসা ছিল যে, আল্লাহর সেই সাহায্য যেন शामिल হয় যা বদর ও হুনাইনে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুলতানের ইমামুস সালাতও তাঁর সাহস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন:

“আপনি আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে এবং তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসা করে লড়াই করুন, আশা করা যায় আপনি বিজয় লাভ করবেন।”

দুই দিন পর্যন্ত উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা করতে থাকল। জুমার দিন সুলতানের ইমামুস সালাত বললেন:

“আপনি জুমার খুতবার সময় আক্রমণ করবেন যখন খতিবগণ আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।”

সূর্য উপরে ওঠার আগেই সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আল্প আরসালান সাদা পোশাক পরে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সময় হতেই তিনি নামাজ পড়ালেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ মাটিতে সিজদাবনত থাকলেন এবং অবোরে কাঁদতে কাঁদতে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করতে থাকলেন। এরপর সেনাবাহিনীর আমিরদের সম্বোধন করে বললেন:

“আমি সংকল্প করেছি যে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয় উদ্দেশ্য সফল হবে নতুবা শহীদ হয়ে জান্নাতে যাব। এখন আর কেউ সুলতান নেই আর কেউ অধীনস্থ নেই। তোমাদের মধ্যে যে ফিরে যেতে চায়, সে চলে যাক। আমি তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মুজাহিদ। সাথে থাকাদের জন্য রয়েছে গনিমতের মাল অথবা জান্নাত। আর পলায়নকারীদের জন্য রয়েছে দোজখ অথবা লাঞ্ছনা।”

আমির ও সৈন্যরা একস্বরে বলে উঠল: “আমরা আপনার অনুগত। আপনি আক্রমণ করুন। আমরা সাথে আছি।”

আল্প আরসালান ধনুক ঝোলালেন, তুণ বাঁধলেন, তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। উভয় বাহিনী ত্রোদ ও আক্রোশের মূর্ত প্রতীক হয়ে ভয়াবহভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। কয়েক ঘণ্টার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর আল্প আরসালান প্রতিপক্ষের মূল বাহিনীর (কেন্দ্র) ওপর আক্রমণ চালালেন। এই আক্রমণ আড়াই লক্ষের পঙ্গপাল সদৃশ বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। রোমানদের পা এমনভাবে উপড়ে গেল যে তারা আর পুনরায় দাঁড়াতে পারল না। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করতে লাগল। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করল যা সারা রাত ধরে চলল। রোমানদের লাশের স্তুপ জমে গেল এবং তাদের অসংখ্য লোক বন্দি হলো।

ইসলামি লঙ্করে একজন গোলাম ছিল যাকে সবাই নির্বোধ মনে করত। সে আহত শত্রুদের পর্যবেক্ষণ করছিল, এমন সময় সে জমকালো পোশাকে সজ্জিত একজন আহত খ্রিস্টানকে দেখতে পেল। গোলাম তলোয়ার উঁচিয়ে তার দিকে দৌড়ে গেলে এক ফিরিস্টি চিৎকার করে বলল:

“না না। ইনিই বাদশাহ।”

এই ব্যক্তি ছিলেন কায়সার রোমানুস, যিনি অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে একজন সাধারণ দাসের হাতে বন্দী হন। যখন তাকে তাঁরুতে এনে সুলতানকে জানানো হলো, তখন কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুলতানের একজন খাদেম কিছুদিন আগে একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের সাথে কায়সারের দরবারে গিয়েছিলেন। সুলতান তাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাঠালেন। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল: “হ্যাঁ। ইনিই তিনি।”

এখন রোমানুসকে সুলতানের সামনে পেশ করা হলো। সুলতান তাকে তিন-চারটি বেত্রাঘাত করলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন:

“আমি কি সন্ধির প্রস্তাব দিইনি? তুমি তা গ্রহণ করোনি। শেষ পর্যন্ত এত অবাধ্যতার কারণ কী ছিল?”

অপমানের অনুভূতিতে কায়সারের অবস্থা শোচনীয় ছিল। সে বলল: “আমাকে ধমক ও তিরস্কার থেকে অব্যাহতি দিন। বাকি যা ইচ্ছা করুন।”

আল্লা আরসালান বললেন: “আচ্ছা বলো! তুমি যদি আমাকে বন্দী করতে, তবে কী আচরণ করতে?” সে বলল: “খুবই খারাপ।”

সুলতান বললেন: “তুমি সত্য বলেছ। তোমরা এমনই করতে। এখন আমার কাছে কী আশা করো যে আমি কী করব?”

সে বলতে লাগল: “দুটি বিষয়ই হতে পারে: হয় হত্যা করবেন অথবা বন্দী করে সেই সব শহরে আমার তামাশা দেখাবেন যেগুলো আমি জয় করতে বেরিয়েছিলাম। তৃতীয় কোনো বিষয় হতে পারে না; তাই তা বলা নিরর্থক।”

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন: “তৃতীয় কথা দ্বারা কী উদ্দেশ্য?”

রোমানুস বলল: “অর্থাৎ মুক্তিপণ নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবেন। এর আশা করা খুবই কঠিন।”

সুলতান বললেন: “কিন্তু আমি এই তৃতীয় পথটিই অবলম্বন করব।”

সুলতান পনেরো লক্ষ দিনার পরিশোধ এবং রোমে বন্দী প্রত্যেক মুসলমানকে মুক্তি দেওয়ার শর্ত দিলেন। কায়সার তা মেনে নিলেন এবং সুলতান তাকে মুক্ত করে কিছু লোকের সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। কায়সার রোমানুস যখন নিজ দেশে পৌঁছালেন, তখন রোমের আমীররা এই শোচনীয় পরাজয়ে এতটাই বিমর্ষ ছিলেন যে, তারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য এক নেতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

আল্লামা ইবনুল জাওয়াযী (রহ.) লিখেছেন: “ইসলামের ইতিহাসে এটি এমন এক বিস্ময়কর বিজয় ছিল যার কোনো নজির মেলে না।”

আল্লা আরসালানের বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। তিনি মিশর জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় ৪৬৫ হিজরিতে হঠাৎ এক বন্দীর হামলার শিকার হয়ে নিহত হন। তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। [১]

মালিক শাহ:

আল্লা আরসালানের পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ২২ বছর শাসন করেন এবং ক্রমাগত বিজয়ের মাধ্যমে এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যা পূর্বে-পশ্চিমে চীনের কাশগর প্রদেশ থেকে মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে-দক্ষিণে কনস্টান্টিনোপল উপসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর আমলে মাওয়ারাননহর, আজারবাইজান, আল-জাজিরা, সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা এবং এশিয়া মাইনরসহ বহু দেশ সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, অতীতে এত বড় রাজত্ব কখনো দেখা বা শোনা যায়নি।

[১] আল-মুনতাজাম: ৮/২৭৬-২৭৮; দুওয়ালুল ইসলাম লিখ-যাহাবী: ১/২৭২, ২৭৩।

আসেনি। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানানুরাগী শাসক। তিনি সব ধরনের কর মওকুফ করে জনগণকে সচ্ছল করে দিয়েছিলেন। তিনি ভ্রমণ, শিকার এবং ইমারত নির্মাণের শৌখিন ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে মসজিদ, মাদ্রাসা, সেতু এবং দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বাগদাদের সবচেয়ে বড় মসজিদ জামে কাবীর তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন। [১]

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর পবিত্র আলোচনার সময় তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন। একবার হাজীদের কাফেলাকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতে লাগলেন: “রওজা আতহারে সালাম পেশ করবেন। বলবেন যে, এক পরিশ্রমী গোলাম সালাম পেশ করছিল এবং বলছিল: যদি উপস্থিত হওয়ার সামর্থ্য থাকত, তবে এই কাফেলার পেছনে কখনো থাকতাম না।” এই বলে তিনি খুব কাঁদলেন এবং উপস্থিত সবাইকে কাঁদালেন। শাওয়াল ৪৮৫ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর। [২]

বিখ্যাত প্রকৌশলী ওমর খৈয়াম:

মালিক শাহর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। তিনি নিশাপুরে একটি চমৎকার মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সেই যুগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী ওমর খৈয়ামের (মৃত্যু ৫১৫ হিজরি) ওপর ন্যস্ত ছিল। ওমর খৈয়ামকে বিশ্ব তাঁর পরিপক্ক ও সৃষ্টিশীল ফারসি রুবাইয়াতের কারণে চেনে, যার অনুবাদ ইউরোপের প্রতিটি ভাষায় হয়েছে এবং এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পশ্চিমা পণ্ডিতরা সেগুলোর প্রশংসা করছেন। তিনি ধর্মের দিক থেকে জাইদি মুতাজিলি ছিলেন কিন্তু গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন যে, আমি জাইদি কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সুলতানের হানাফি মাযহাব অনুসরণ করি। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতে মুক্তচিন্তার ছাপ পাওয়া যায়, তবে তিনি সাধারণ মদ্যপ দার্শনিকদের বিপরীতে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করতেন। তাঁর শেষ বয়সের রুটিন থেকেও জানা যায় যে, তিনি তওবা করেছিলেন। তাঁর এক ছাত্রের ভাষ্যমতে, এশার নামাজ আদায় করার সময় সিজদারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ওমর খৈয়ামের আসল দক্ষতা ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও মহাকাশ বিজ্ঞানে। তিনি বীজগণিতের ওপর একটি চমৎকার বই লিখেছিলেন যাতে গণিতবিদদের অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে। তিনি একজন ভালো চিকিৎসক এবং ব্যাকরণবিদও ছিলেন। চিকিৎসা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয় ছিল। তিনি “জিজ-ই-মালিক শাহী” নামে একটি নতুন সৌর পঞ্জিকাও পেশ করেছিলেন। [৩]

নিজামুল মুলক তুসি:

মালিক শাহর উজির নিজামুল মুলক তুসি ইসলামি ইতিহাসের এক সুপরিচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মালিক শাহর শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। মালিক শাহ একের পর এক বিজয় অর্জন করতেন আর নিজামুল মুলক অত্যন্ত নিপুণভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিজিত এলাকাগুলোর প্রশাসনিক কাজকে দীর্ঘায়িত করে তুলতেন।

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ২৮৪/৫

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৫৬/১৯

[৩] ততিম্মাতু সোয়ানিল হিকমাহ, পৃষ্ঠা ২৬; খৈয়াম - সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ৩৪, ২৯৬ থেকে ৩৩০; ফারসি আদব কে চন্দ গোশে - আনোয়ার মাসুদ, দোস্ত পাবলিশার্স।

দ্রষ্টব্য: এটি প্রসিদ্ধ যে, ওমর খৈয়ামের পঞ্জিকা গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকার চেয়ে উত্তম। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকায় প্রাকৃতিক সৌরজগতের সাথে ৩৩০০ বছরে একদিনের পার্থক্য হয়। পক্ষান্তরে ওমর খৈয়ামের পঞ্জিকায় পাঁচ হাজার বছরে এক বছরের পার্থক্য হয়। ইউরোপীয়রা সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে এটিকেই প্রচলিত করেছে যা আজ সারা বিশ্ব অনুসরণ করছে, অন্যথায় আসলে প্রতি দুই-তিন বছর পর মাত্র দুই-চার সেকেন্ডের পার্থক্য মনে হয়। বিষয়টি এভাবেই বর্ণিত হয়ে আসছে, তবে মনে হয় যে পাঁচ হাজার বছরে একদিনের ব্যবধান হওয়ার বিষয়টি কোনো লেখকের ভুলের কারণে বর্ণিত হয়ে আসছে। সঠিকটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছর; কারণ পাঁচ হাজার বছরে একদিনের পার্থক্যের অর্থ হলো প্রতি বছর ১৭ সেকেন্ডের পার্থক্য হওয়া, যেখানে পঞ্চাশ হাজার বছরে একদিনের পার্থক্য হলে বছরে ১.৭ সেকেন্ডের পার্থক্য হয় যা প্রচলিত সৌর পঞ্জিকার অত্যন্ত কাছাকাছি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ: সপ্তম

মুসলিম বিশ্বের এই বরেন্য ব্যক্তিত্ব ৪০৮ হিজরিতে তুসের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি শাফেয়ী ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন এবং শাফেয়ী ফকীহদের মধ্যে গণ্য হন। গণিত ও প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রবাদতুল্য হয়ে ওঠে। সেলজুক দরবারে চাকুরিতে নিযুক্ত হলে শাসকরা তাঁর যোগ্যতা আঁচ করতে পারেন। এভাবে উন্নতি করতে করতে তিনি আল্প আরসালানের যুগে উজির (মন্ত্রী) হন।

তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতিদিন সকালে একশ স্বর্ণমুদ্রা (প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা) সদকা করতেন। দাপ্তরিক কাজের জন্য সর্বদা গান্ধীর্যের সাথে বসতেন এবং দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে কাজ শুরু করতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। উলামা, বুজুর্গানে দ্বীন এবং নেককারদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁদের সম্ভাব্য সব ধরনের খেদমত করতেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ, দয়ালু, প্রজাবৎসল এবং অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। মালিক শাহর বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য সামলানো কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না। যদি কোনো দুর্বল ও অযোগ্য লোক হতো, তবে এক মুহূর্তেই সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খলার শিকার হতো। এটি নিজামুল মুলকের বিস্ময়কর প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল যে, তিনি এত বড় সাম্রাজ্যকে এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে প্রতিটি জিহ্বায় তাঁর প্রশংসা ছিল। তিনি খোয়ারিজম (উরগঞ্জ), মশহাদ এবং তুসের মতো শহরগুলো সংস্কার করে সেগুলোর জৌলুস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর মন্ত্রিত্বের কালকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং আহলে ইলমদের (জ্ঞানী ব্যক্তিদের) সম্মানের যুগ বলা হয়। তিনি বড় বড় কুতুবখানা (লাইব্রেরি) কায়ম করেন। দ্বীনি কিতাব রচনা ও প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

শিক্ষাকে তিনি ইসলামী সমাজের ভিত্তি মনে করতেন এবং তাঁর পুরো মন্ত্রিত্বকালে জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে চলেন। বাগদাদের বিশ্বখ্যাত ‘মাদ্রাসা নিজামিয়া’ তাঁরই নির্মিত। এটি ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রথম বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা সমবেত হতেন এবং ছাত্রদের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও ছিল। মাদ্রাসা নিজামিয়ার নির্মাণ কাজ ৪৫৭ হিজরিতে শুরু হয় এবং ৪৫৯ হিজরিতে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর নিজামুল মুলক নিশাপুর ও ইসফাহানেও অনুরূপ বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়ম করেন। এছাড়া তুস, মার্ভ, হেরাত, বলখ এবং বসরায়ও মাদ্রাসা খোলেন যার প্রত্যেকটি ‘মাদ্রাসা নিজামিয়া’ নামে পরিচিত ছিল। নিজামুল মুলক বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই সংগ্রহ করতেন।

বিখ্যাত ইসমাইলি মুলহিদ হাসান বিন সাব্বাহ এবং নিজামুল মুলক তুসি শৈশবে সহপাঠী ছিলেন। হাসান বিন সাব্বাহ তাঁর সাথে সেলজুক দরবারে কিছুকাল কাজও করেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। পরবর্তীতে হাসান বিন সাব্বাহ গোমরাহির পথ বেছে নেন এবং নিজামুল মুলক তুসি নেক কাজে এগিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে হাসান বিন সাব্বাহ একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি করেন এবং নিজামুল মুলককে হত্যার পেছনে লেগে থাকেন। রমজান ৪৮৫ হিজরিতে নিজামুল মুলক তুসি হজের সফরে বের হন। জুমার রাতে নেহাওয়ান্দের কাছে যেখানে তাবু ফেলা হয়েছিল, সেখানে হাসান বিন সাব্বাহর এক অনুচর দরবেশের বেশে উপস্থিত হয়। তুসি প্রথা অনুযায়ী তাকে কাছে ডেকে নেন। দরবেশ সুযোগ বুঝে খঞ্জর বের করে তাঁর বুকে বসিয়ে দেয়।

তুসির শেষ কথাগুলো ছিল: “হত্যাকারীকে কিছু বলো না... আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” [১]

[১] তবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ লিস-সুবকী: ৪/৩১২; আল-মুনতায়াম: ১৬৮, ৬৭/৯; আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৪৮৫ হিজরি।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

নিজামুল মুলকের হত্যাকাণ্ড মালিক শাহের ইন্তেকালের এক মাস আগে হয়েছিল। কিছু লোক একে মালিক শাহের কাজ বলে সাব্যস্ত করেন কিন্তু এটি সঠিক নয়। এটি নিশ্চিত যে হত্যাকারী হাসান বিন সাববাহর দলের লোক ছিল। যেহেতু তাকে ঘটনাস্থলেই পাকড়াও করে হত্যা করা হয়েছিল, তাই হাসান বিন সাববাহর নাম তার মুখ থেকে বের করানো সম্ভব হয়নি। তবে হামলার ধরন বাতেনি ফেদাইনদের মতোই ছিল এবং এটিও প্রমাণিত যে হাসান বিন সাববাহ নিজামুল মুলক তুসিকে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু মনে করত।

নিজামুল মুলক তুসির পর তার ছেলে ফখরুল মুলক উজির হন। পাঁচ বছর পর মহররম ৫০০ হিজরিতে তিনিও এক বাতেনির হাতে শহীদ হন। এরপর নিজামুল মুলকের দ্বিতীয় ছেলে আহমদ এই পদে অধিষ্ঠিত হন। [১]

দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা - নিজামুল মুলক তুসির মহান কীর্তি:

নিজামুল মুলক তুসির সবচেয়ে চিরস্মরণীয় কীর্তি হলো এই ধাঁচের দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পের শিক্ষকগণ সমবেত হন, নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অধীনে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং থাকা-খাওয়াসহ প্রতিটি প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা হয়। এর আগে সাড়ে চারশ বছর ধরে এমন মাদ্রাসার অস্তিত্ব কোথাও দেখা যেত না।

প্রাচীন পদ্ধতি ছিল এই যে, জ্ঞান ও শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ মসজিদে বা নিজ বাড়িতে পাঠদানের আসর বসাতেন। ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে তাদের থেকে উপকৃত হতো। প্রবাসী ছাত্রদের নিজেদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হতো। তারা ভাড়ার বাড়িতে, কোনো পরিচিত ব্যক্তির কাছে, সরাইখানায় বা কোনো মসজিদে অবস্থান করত। খাওয়ার চিন্তাও নিজেদেরই করতে হতো। এই সিলসিলায় উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা পেশ করা হলো যে, আল্লামা বারকানি (৩৭২ হি. - ৪২৫ হি.) ছাত্রজীবনে বিখ্যাত মুহাদ্দিস আহমদ বিন বিশর ইসফারাইনি (মৃ. ৩৭৭ হি.) থেকে হাদিস বর্ণনা করার জন্য ইসফারাইন গিয়েছিলেন। পথে তার টাকা হারিয়ে যায় এবং মাত্র এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকে। বারকানি বলেন যে, আমি সেই দিরহাম এক রুটি বিক্রেতাকে দিয়ে দিই এবং সেখান থেকে প্রতিদিন তাজা সেকাঁ রুটি খেতাম। এই সময়ে তিনি আহমদ বিন বিশর থেকে প্রতিদিন হাদিসের একটি অংশ নিজের কাগজে নকল করে নিতেন। এক মাস অতিবাহিত হলো, হাদিসের সংকলন পূর্ণ হলো, দিরহামও শেষ হয়ে গেল এবং আমাকে সেখান থেকে চলে যেতে হলো। [২]

অভাবী ছাত্রদের জন্য সেই যুগে জ্ঞান অর্জন করা সত্যিই খুব কঠিন ছিল, তবে তারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী। যখন কিছু পাওয়া যেত না তখন তারা রোজা রাখত কিন্তু শিক্ষার ধারা বিচ্ছিন্ন হতে দিত না। কখনো এমনও হতো যে মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুভব করে দান-সদকা করত। যে সকল শিক্ষক সচ্ছল ছিলেন তারা মেধাবী ও অভাবী ছাত্রদের সমস্যা আঁচ করে কখনো কখনো আর্থিক সহযোগিতা করতেন। দুই-চারজন বিশেষ ছাত্রের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের বাড়িতে বা মসজিদে করে দিতেন, কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের ছিল না। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে দ্বিতীয় বড় সমস্যা ছিল এই যে বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পের জন্য ছাত্রদের ডজন ডজন শহর ও দেশ ভ্রমণ করতে হতো; কারণ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ আলাদা আলাদা শহর ও জনপদে থাকতেন।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫০০ হিজরি।

[২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১৭/৪৬৬।

ছিলেন। এভাবে ছাত্রদের জীবনের বড় অংশ সফরেই কেটে যেত।

যদিও নিজামুল মুলকের পূর্বে এমন কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ছাত্রদের জন্য থাকা-খাওয়ার সুবিধা ছিল, যেমন: নিশাপুরে চারটি মাদ্রাসা ছিল। একটি মাদ্রাসা বায়হাকিয়া, দ্বিতীয়টি মাদ্রাসা সাদিয়া যা সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভাই নাসর বিন সবুজগিন নির্মাণ করেছিলেন, তৃতীয়টি সুফি ইসমাইল বিন আলী আস্তারাবাদীর নির্মিত মাদ্রাসা এবং চতুর্থটি সেই মাদ্রাসা যা ইমাম আবু ইসহাক আসফারাইনীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তবে এই মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রদের জন্য কোনো পাঠ্যক্রম নির্ধারিত ছিল না। [১] বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ এখানে এসে বসতেন এবং ছাত্ররা নিজ নিজ রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের মজলিসে গিয়ে বসত।

নিজামুল মুলক তুসী নিয়মিত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে এবং বিধিবদ্ধ মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করে শিক্ষা বিভাগকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেন। নামেমাত্র এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ‘মাদ্রাসা’ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ যেখানে প্রতিটি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস ও খাবারসহ সকল সুবিধা বিদ্যমান ছিল। শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক বেতন নির্ধারিত ছিল।

যেহেতু এই নতুন পদ্ধতির উপকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট ছিল, তাই খুব দ্রুত অন্যান্য শাসক ও আমীরগণও এর অনুকরণ করেন এবং এরপর এই আধুনিক পদ্ধতির মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি ধারা শুরু হয়। যদিও প্রায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত আলেমদের মজলিসে শিক্ষার পুরাতন পদ্ধতিও চালু ছিল, তবে ধীরে ধীরে মাদ্রাসার পদ্ধতিটি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং দুই শতাব্দী পর শিক্ষাব্যবস্থা দ্বিনি মাদ্রাসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সেলজুক শাসকদের বিভিন্ন শাখা:

সেলজুক শাসকরা প্রায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য এশিয়া, খোরাসান, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়া শাসন করেন। তাদের উত্থানের সময়কাল ছিল প্রায় ৬০ বছর। মালিক শাহের মৃত্যুর পর বিভিন্ন অঞ্চলে সেলজুক নওয়াব ও আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যার ফলে সেলজুক সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রায় ২৫ বছর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকার পর সুলতান সাঞ্জর সেলজুকের আমলে এই পরিবার পুনরায় নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা পূর্বের সেই গৌরব ফিরে পায়নি।

সুলতান সাঞ্জর চার দশক শাসন করার পর ৫৫২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার শেষ চার বছর অত্যন্ত অসহায়ত্বের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তিনি তুর্কানে গুজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। যখন মুক্তি পান, তখন তার সালতানাত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন সেলজুকদের কেবল একটি উল্লেখযোগ্য শাসন অবশিষ্ট ছিল যা এশিয়া মাইনরে ছিল এবং সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল।

বনু আব্বাসের অবস্থার বর্ণনার সাথে সেলজুকদের আলোচনা এজন্য জরুরি ছিল যে, তারা সেই যুগে মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখন আমরা পুনরায় বনু আব্বাস খলিফাদের অবস্থা বর্ণনা করছি।

[১] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিস-সুবকি: ৪/৩১৮... আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী নিজামুল মুলক তুসীর পূর্বে এই ধরনের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান ছিল না। আল্লামা আব্দুল কাদির নুয়াইমী (মৃত্যু ৯২৭ হি.)-এর মাদ্রাসার ইতিহাসের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস’-এ ইসলামি দেশগুলোর শত শত মাদ্রাসার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো মাদ্রাসাই ‘জামিয়া নিজামিয়া’-এর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (সপ্তম খণ্ড)

আল-কায়িম

পুনরায় শাসনভার গ্রহণ

যুল-কাদ ৪৫১ হিজরী থেকে শাবান ৪৬৭ হিজরী

১২ জানুয়ারি ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩ এপ্রিল ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

সুলতান তুঘরিল সেলজুকির সাহায্যে আব্বাসী খলিফা আল-কায়িম ২৫ যুল-কাদ ৪৫১ হিজরীতে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলামের নিদর্শনসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিয়ারা মাঝে মাঝে শোক মিছিল বের করত, কিন্তু মহরম ৪৫৮ হিজরীতে মিছিল দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ালে সরকারিভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সাথে আলেমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খেলাফত দরবার থেকে অধ্যাদেশ জারি করা হয় যে, সাহাবায়ে কেরামকে গালি প্রদানকারীদের ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য করা হবে। [১]

সেলজুকি উজির নিজামুল মুলকের সহযোগিতায় ১০ যুল-কাদ ৪৫৯ হিজরীতে বাগদাদে মাদ্রাসা-এ-নিজামিয়া চালু হয়, যার ফলে এখানে আলেম ও ছাত্রদের এমন সমাগম ঘটে যে পূর্বসূরিদের যুগের স্মৃতি সজীব হয়ে ওঠে। একই বছর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজারের পাশে আরও একটি বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে হানাফি ফকিহগণ পাঠদান শুরু করেন। [২]

বনু বুওয়াইহ-এর আমলে মদের দোকান খুলে গিয়েছিল এবং দেহব্যবসার কারবারও শুরু হয়েছিল। আলেমগণ খলিফাকে অবহিত করে এসব অপকর্ম বন্ধ করান। ক্ষমতার ৪৪ বছর পূর্ণ করার পর আল-কায়িম অসুস্থ হয়ে ১৩ শাবান ৪৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৭৫ বছর। [৩]

নুকতা:

৩৩৩ হিজরী থেকে ৪৬৭ হিজরী পর্যন্ত খেলাফতের মসনদে ধারাবাহিকভাবে অধিষ্ঠিত চারজন খলিফা—আল-মুতি, আত-তাই, আল-কাদির এবং আল-কায়িম—ছিলেন “নামের সার্থকতা বহনকারী”। মুতি এবং তাই বনু বুওয়াইহ-এর চরম আনুগত্য করে সময় অতিবাহিত করেন। কাদির বিল্লাহ ক্ষমতা অর্জন করেন এবং বনু বুওয়াইহ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হন। আল-কায়িমের শাসন চার দশকেরও বেশি সময় স্থায়ী ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে একবার অপসারিত হওয়ার পর পুনরায় নতুন শান-শওকতের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৬

[৩] আল-মুনতাজাম: ১১৬১/১৬, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪৭/১৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - সপ্তম খণ্ড

আল-মুকতাদি বি-আমরিলাহ

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাযিম

শাবান ৪৬৭ হিজরি থেকে মহররম ৪৮৭ হিজরি

এপ্রিল ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রিস্টাব্দ

আল-কাযিমের পর তার নাতি আল-মুকতাদি বি-আমরিলাহ উপাধি নিয়ে খলিফা হন। তার সময়কাল অত্যন্ত বরকতময় ছিল। অর্থনীতি উন্নতির দিকে ছিল। সকল শাসক খলিফাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। হারামাইন, বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সিরিয়ায় তার নামেই খুতবা পাঠ করা হতো। তিনি বাগদাদ থেকে গায়ক ও বাদ্যকরদের বের করে দেন এবং একে একটি আদর্শ ইসলামি সমাজ হিসেবে গড়ে তোলার পূর্ণ চেষ্টা করেন। [১]

তিন মুজাহিদ সুলভ বাদশাহর উত্থান:

তার শাসনামলে তিন মহান মুজাহিদ সুলভ বাদশাহর উত্থান ঘটে: প্রথমজন মালিক শাহ সেলজুকি, যিনি চীন থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। দ্বিতীয়জন সেলজুকি রুমের শাসক সুলাইমান বিন কুতুলমিশ: যিনি ৪৭৭ হিজরিতে রোমানদের কাছ থেকে আন্তাকিয়া ও রুহা পুনরুদ্ধার করেন। [২] তৃতীয়জন ইউসুফ বিন তাশফিন: যিনি মরক্কো শহর আবাদ করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় মুরাবিতুনদের এক মহান শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। খলিফা তাকে “আমিরুল মুসলিমিন” উপাধি প্রদান করেন।

সিসিলির পতন:

তবে এই সময়েই একটি বড় দুর্ঘটনাও ঘটে। তা হলো ৪৮৪ হিজরিতে ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র সিসিলি দ্বীপ (সাকলিয়া), যেখানে আড়াই শতাব্দী ধরে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। [৩]

শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা:

খলিফা মুকতাদির সময়কাল শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল, তবে ৪৮১ হিজরি এবং ৪৮২ হিজরিতে বাগদাদকে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গার সন্মুখীন হতে হয়। ৪৮১ হিজরির দাঙ্গা ছিল সামান্য, কিন্তু ৪৮২ হিজরিতে এই ধারা বাড়তে থাকে এবং ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের নেতারা মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, শিয়ারা তাদের উপাসনালয়গুলোতে এই শব্দগুলো বুলিয়ে রাখবে: “রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর।” যে শিয়া আলেমরা শান্তি চেয়েছিলেন তারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন, কিন্তু সাধারণ শিয়ারা এটি দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে, যার ফলে পুনরায় রক্তপাত শুরু হয়। অবশেষে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে এই হাঙ্গামা থামে। [৪]

খলিফা মুকতাদি ১৯ বছর ৫ মাস শাসন করার পর ১৮ মহররম ৪৮৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫০/১৬, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৩৫৫/২

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৮২ হিজরি, আন্তাকিয়া ১১৮ বছর এবং রুহা ৫৫ বছর ধরে রোমানদের দখলে ছিল।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৮২ হিজরি

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৮২ হিজরি

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৩০৩, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৩৫৫/২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুস্তাজহির বিল্লাহ

আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুকতাদি

মহররম ৪৮৭ হিজরি থেকে রবিউল আখের ৫১২ হিজরি

ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ

আল-মুকতাদির পর তার ১৬ বছর বয়সী পুত্র আহমদ ‘আল-মুস্তাজহির’ উপাধি গ্রহণ করে খলিফা হন। তিনি ছিলেন নেককার, দয়ালু, সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ এবং জনগণের প্রিয় শাসক। তবে তার শাসনামল ফিতনা ও বিশৃঙ্খলায় ভরপুর ছিল। [১]

মালিক শাহের উত্তরসূরিদের মধ্যে বিভেদ:

এই যুগে মালিক শাহ সেলজুকির উত্তরসূরিদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল। মালিক শাহের ভাই তাজউদ্দৌলা তুতুশ সিরিয়া, আল-জাজিরা এবং ইরাকের বিশাল এলাকা দখল করে নেন এবং মালিক শাহের ১৩ বছর বয়সী পুত্র সুলতান বারকিয়ারুকের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যান, এমনকি ৪৮৮ হিজরিতে তুতুশ নিজেই এই দ্বন্দ্ব নিহত হন। [২] সুলতান বারকিয়ারুক নিজের অবস্থান শক্ত করার পর তার চাচা আরসালান আরগুন থেকে খোরাসান কেড়ে নেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন, অবশেষে আরসালান আরগুন ৪৯০ হিজরিতে এক ঘাতক হামলায় নিহত হন। গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সিরিয়ার সেলজুক আমিররা স্বাধীন হয়ে যান এবং এই বিশাল দেশটিকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে ফেলেন। [৩]

প্রথম ক্রুসেড—বায়তুল মুকাদাসের পতন:

সেলজুকদের পারস্পরিক লড়াই দেখে মিশর থেকে বনু উবাইদ সিরিয়া আক্রমণ করে এবং বায়তুল মুকাদাস দখল করে নেয়। মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইউরোপ ক্রুসেডের দামামা বাজিয়ে দেয় এবং লাখ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্য দাঁড়িয়ে যায়, যারা (অঞ্চলগুলো) জয় করার পর শাবান ৪৯২ হিজরিতে বায়তুল মুকাদাস দখল করে নেয়। মুসলমানদের ভয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুসহাফ যা তাবারিয়ায় সংরক্ষিত ছিল, তা দামেস্কে নিয়ে যেতে হয়েছিল যাতে ফিরিঙ্গিরা তা ছিনিয়ে নিতে না পারে। [৪]

সেলজুকদের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সন্ধি:

মুসলিম শাসকরা এই সময়েও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিলেন। মালিক শাহের এক পুত্র মুহাম্মদ তার ভাই সুলতান বারকিয়ারুকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান এবং তাকে খোরাসান থেকে হটিয়ে দেন। খলিফা মুহাম্মদকে সুলতান হিসেবে মেনে নেন এবং বাগদাদে নিয়ম অনুযায়ী খুতবায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু বারকিয়ারুক মুহাম্মদকে সুলতান হিসেবে মেনে নেননি এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ৪৯৩ হিজরি এবং ৪৯৪ হিজরিতে দুই ভাইয়ের মধ্যে দুটি বড় যুদ্ধ হয়। ৪৯৫ হিজরিতে আরও দুটি লড়াই হয়। ৪৯৬ হিজরিতে পঞ্চম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৩, ত তনজিল

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/৩৬২

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার লিজ-জাহাবি: ২/৩৫৬, ত আল-ইলমিয়্যাহ

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৪, ৩০৫

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

অবশেষে পাঁচ বছরের প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধের পর ৪৯৭ হিজরিতে জাতির নেতৃবৃন্দ এবং উলামা ও ফুকাহাগণ মধ্যস্থতা করে সন্ধি করান। সিদ্ধান্ত হয় যে, ইরান, আল-জাজিরা এবং হিজাজ বরকিয়ারকের অধীনে থাকবে এবং বাগদাদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হবে। ইরাক, আজারবাইজান এবং ইসফাহান মুহাম্মদের অধীনে থাকবে, আর খোরাসান সানজারের কাছে থাকবে। এই সিদ্ধান্তের পরের বছর ৪৯৮ হিজরিতে বরকিয়ারক মৃত্যুবরণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ তাঁর পাঁচ বছর বয়সী ছেলের উত্তরাধিকার বাতিল করে নিজে সুলতান হয়ে যান। [১]

সিরিয়ায় ফরাসিদের ক্রমাগত বিজয়:

সুলতান মুহাম্মদের শাসনামলে ফরাসিদের জবরদখলমূলক আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ৪৯৭ হিজরিতে তারা জুবাইল এবং আক্কা দখল করার পর রানের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানকার শাসক সাকমান দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন, কিন্তু তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন এবং ফরাসিরা তাঁর পিছু ধাওয়া করতে শুরু করে। ছয় মাইল দূরে গিয়ে সাকমান শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পাল্টা আক্রমণ করেন। আল্লাহর সাহায্য সাথে ছিল এবং ফরাসিরা পিঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। [২]

তবে এর পরেও ফরাসিদের আক্রমণ মাঝেমাঝে অব্যাহত ছিল। ৫০৩ হিজরিতে বানিয়াস এবং তারতুস তাদের সামনে নতি স্বীকার করে। একই বছর জিলহজ মাসে সাত বছরের দীর্ঘ অবরোধের পর তারা ত্রিপোলির অজেয় শহরটিও দখল করে নেয়। ৫০৪ হিজরিতে হিসন আসারিব, বৈরুত এবং সিদাও তাদের দখলে চলে যায়।

মুসলমানদের অস্থিরতার কোনো সীমা ছিল না। মনে হচ্ছিল ফরাসিরা কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো সিরিয়া পদদলিত করবে। সিরিয়ার মুসলিম আমিরগণ ফরাসিদের কাছে সন্ধির আবেদন করেন, যা ফরাসিরা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে। পরে অত্যন্ত অহংকারের সাথে বিপুল অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়, কিন্তু কয়েক দিন পরেই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে শুরু করে। [৩]

سلاجوق (সেলজুক) বাহিনীর ব্যর্থ অভিযান:

এই পরিস্থিতিতে বাগদাদের জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়, জামে মসজিদের মিন্বর ভেঙে ফেলা হয় এবং জিহাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের দল তৈরি হতে থাকে। জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে সুলতান মুহাম্মদ জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর ৫০৫ হিজরিতে ইরাক ও আল-জাজিরার মুসলিম বাহিনী ফরাসিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে রাহা এবং তাল বাশির অবরোধ করে, কিন্তু ৪৫ দিনের অবরোধ সত্ত্বেও কোনো সাফল্য আসেনি। এই সময়ে সেনাপতি মৃত্যুবরণ করেন এবং বাহিনী ফিরে আসে। [৪]

তাবারিয়ায় ফরাসিদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়:

মহররম ৫০৭ হিজরিতে দামেস্ক এবং আল-জাজিরার বাহিনী তাবারিয়ার কাছে ফরাসিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে জেরুজালেমের ফরাসি রাজা আহত হয়ে বন্দি হন, কিন্তু মুসলমানরা না বুঝে মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয় এবং কয়েক দিন পর্যন্ত অতর্কিত হামলা চালিয়ে ফিরে আসে। লশকর বা বাহিনীর আমির মওদুদ দামেস্কে ফিরে এলে জুমার নামাজের সময় জামে মসজিদে কোনো এক বাতেনি তাকে শহীদ করে দেয়। [৫]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৪, ৩০৫; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬।

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৩৭৭

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৩৮৪; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৫

[৪] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৩৮৫, ৩৮৬

[৫] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৩৮৯

এর ওপর ফিরিজিরা মুসলমানদের একটি বিদ্রোহপত্র পত্র লিখেছিল যাতে লেখা ছিল:

“যে জাতি তাদের নেতাকে এমন এক বরকতময় দিনে আল্লাহর ঘরে হত্যা করে, তারা এর যোগ্য যে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিন।” [১]

মুসলিম আমিরদের ফিরিজিদের সাহায্যে একে অপরকে দমানোর ধারা:

মুসলমানদের এই অভিযানে ফিরিজিদের ওপর যদি কিছুটা ভীতি সৃষ্টি হয়েও থাকে, তবে তা ৫০৯ হিজরিতে তখন শেষ হয়ে যায় যখন সুলতান মুহাম্মদের বাহিনী তার প্রতিদ্বন্দ্বী তুঘতেগিনের বিরুদ্ধে হামাতে আক্রমণ করে এবং তুঘতেগিন নিরুপায় হয়ে ফিরিজিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সম্ভবত এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যখন এই অঞ্চলের মুসলমানরা পারস্পরিক যুদ্ধে ফিরিজিদের কাছ থেকে নিয়মিত সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। এরপর এই ধারা চলতে থাকে। ফিরিজিরা একজনের পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে পদদলিত করতে থাকে। এভাবে মুসলমানদের বিভেদের ফাটল আরও গভীর হতে থাকে। [২]

বাতিনিদের ফিতনা:

খলিফা মুস্তাজহিরের যুগে হাসান বিন সাব্বাহর ফিতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার খঞ্জরধারীরা ইরান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যক্তিত্ব এই খঞ্জরগুলোর শিকারে পরিণত হতেন। [৩] মাঝে মাঝে এই সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের হাতে ধরাও পড়ত এবং উত্তেজিত জনতা তাদের ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলত। [৪] কিছু ক্ষেত্রে সেলজুক আমিররাও বাতিনিদের সন্ধান পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাদের বিশাল এক সংখ্যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। [৫]

অবশেষে সুলতান মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ সেলজুকি তাদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অভিযান শুরু করেন এবং তাদের এক বিশাল সংখ্যাকে তরবারির নিচে ফেলে দেন। [৬]

সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকির মৃত্যু, মাহমুদ সেলজুকির সিংহাসন আরোহণ:

সুলতান মুহাম্মদের শাসনকাল ৫১১ হিজরি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র মাহমুদ বিন মুহাম্মদ শাসক নিযুক্ত হন। [৭]

মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা এবং এর কারণ:

১৬ রবিউস সানি ৫১২ হিজরিতে খলিফা মুস্তাজহির বিল্লাহ ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৪২ বছর। তার শাসনকাল ছিল ২৫ বছর। [৮] তার যুগ ছিল পুরোপুরি গৃহযুদ্ধ, বহিঃশক্তির আধিপত্য এবং মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার এক প্রতিচ্ছবি।

রাজনৈতিক সংকটের দায় কার ওপর?

এই শোচনীয় পরিস্থিতির দায়ভার অনেকাংশেই সেলজুক শাসকদের ওপর বর্তায়। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং অসাধারণ শক্তি দান করে সমগ্র মুসলিম জাহানের পাহারাদারির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু এই পরিবার...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৬

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২৯২/২

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৫৪/৮, ৪১৩, ৪৩০

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৫০/৮

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৫৪/৮

[৬] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২৯৭/২

[৭] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩৯৭/২

[৮] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২৯৭/২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

এই চতুর্থ প্রজন্মে শাসনের উত্তরাধিকারীরা চরম অদূরদর্শিতা প্রদর্শন করে ক্ষমতার জন্য একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, এমনকি ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পতনও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। ক্ষমতার জন্য এই ধরনের গৃহযুদ্ধ আমরা উম্মাহর ইতিহাসে হিজরি প্রথম শতাব্দী থেকেই দেখে আসছি এবং সামনেও এই ধারা চলতে দেখা যাবে। আবারও যদি চিন্তা করা হয়, তবে এর মূল কারণ এটাই দেখা যাবে যে, মুসলমানরা ইসলাম থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণে চরম অবহেলা করেছিল। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের একটি বড় অপরাধ ছিল এই যে, তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শরীয়তের উৎসসমূহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সীরাত থেকে কোনো সুসংহত ও নিরাপদ কর্মপন্থা গ্রহণ করেনি। তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃশ্যত একটিই নীতি কার্যকর ছিল, অর্থাৎ বংশপরম্পরা এবং উত্তরসূরি ঘোষণা। কিন্তু বংশপরম্পরারও কোনো সুসংহত সংজ্ঞা বিদ্যমান ছিল না। সাধারণ ধারণা ছিল যে, শাসকের পর তার ছেলে বা ভাই উত্তরসূরি হবে। কিন্তু যদি অনেক ছেলে বা অনেক ভাই থাকে, তবে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? এমন প্রতিটি প্রশ্নের ব্যবহারিক উত্তর একটাই ছিল যে, যার সাধ্য আছে সে ক্ষমতা দখল করে নেবে, অর্থাৎ ‘জোর যার মুল্লুক তার’।

বংশপরম্পরা বা উত্তরাধিকারের নীতি ছিল শক্তির গোলাম। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ক্ষমতা লাভের জন্য প্রাচীন ভারত ও ইউরোপে যেভাবে ভাগ্য অন্বেষণকারীরা একে অপরের সাথে লড়াই করে প্রাণ দিত, মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও তেমনই ছিল। এই ভুলের খেসারত মুসলমানদের বারবার রাজনৈতিক সংকট, বড় বড় সাম্রাজ্যের বিভাজন এবং বারবার ভয়াবহ ধ্বংসের মাধ্যমে দিতে হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ

আল-ফজল বিন আহমদ আল-মুসতায়হির

রবিউল আখের ৫১২ হিজরি থেকে যিলকদ ৫২৯ হিজরি

আগস্ট ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেপ্টেম্বর ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ

মুসতায়হিরের পর তার পুত্র আবু মনসুর আল-ফজল ‘আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ’ উপাধি ধারণ করে খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি ছিলেন পরহেজগার, ইবাদতগুজার, সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং যোদ্ধা শাসক। তিনি পশমের মোটা পোশাক পরিধান করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন। তার ইলম ও ফজিলতের গভীরতা এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, তাকে শাফেয়ী ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [১]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) বলেন: “মুসতানজিদের পর মুসতারশিদের চেয়ে অধিক সাহসী কোনো খলিফা অতিবাহিত হননি। তিনি ছিলেন নির্ভীক, বীর, সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারী, অত্যন্ত প্রভাবশালী, বিচক্ষণ, সচেতন এবং উচ্চ সাহসী।” [২]

ইরাকে গৃহযুদ্ধসমূহ

আল-মুসতারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে ইরাক ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের শিকার ছিল। সেলজুক সালতানাতে উত্তরাধিকারীরা নিজেদের মধ্যে মারাত্মকভাবে বিবাদে লিপ্ত ছিল। বাগদাদের ওপর কখনো একজন আধিপত্য বিস্তার করত, আবার কখনো অন্যজন। খোরাসানে সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির শাসন ছিল এবং ইরাকে সুলতান মাহমুদ বিন মুহাম্মদ সেলজুকি শাসক ছিলেন। এছাড়া সুলতান মাসুদ সেলজুকিও এই পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। বসরার শাসক ইমাদউদ্দিন যঙ্গি এবং আরব সরদার দুবাইস বিন সাদাকাও এই যুদ্ধগুলোতে শরিক ছিলেন। [৩]

সিরিয়ায় রাফেযীদের দৌরাণ

সিরিয়ায় শিয়াদের বেশ কিছু চরমপন্থী (গালি) দল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, যাদের মধ্যে নুসাইরি এবং দ্রুজরা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক, যাদের আকিদা নিঃসন্দেহে কুফরি ছিল। ইসমাইলি বাতিনিরা তাদের সাথে মিলে ক্রুসেডারদের (ফিরিঙ্গি) ক্ষমতায় বসানোর ষড়যন্ত্র করছিল, যারা আগে থেকেই আরও এলাকা জয়ের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ৫২৩ হিজরিতে দামেস্কের ইসমাইলিরা ক্রুসেডারদের সাথে আঁতাত করে শহরটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে যায়। শহরের শাসক তাজুল মুলুক বুরি ষড়যন্ত্রের মূল হোতাকে ধরে হত্যা করান এবং তার মাথা দুর্গের বুরুজে ঝুলিয়ে দেন। এরপর শহরে সেই ইসমাইলিদের গ্রেপ্তার করা হয় যারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই ধরপাকড়ে ছয় হাজার ইসমাইলি নিহত হয়। এই সময়ে ক্রুসেডাররা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দামেস্কের বাইরে সমবেত হয়েছিল। দামেস্কের বাহিনী তুর্কি ও বেদুইনদের সাথে মিলে তাদের ওপর অতর্কিত নৈশ হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডাররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৭

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৭, ৩০৮; দুওয়ালুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ২/১৬৫ থেকে ২৪

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৪১৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫২৩ হিজরি

[৪] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৪৩৭

দুবাইস বিন সাদাকার ফিতনা:

মুস্তারশিদের আমলে ইরাকের একজন শিয়া আরব জমিদার দুবাইস বিন সাদাকা আল-আসাদি এক বিশাল ফিতনা সৃষ্টি করেছিল, যে তার বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সাহিত্যিক ও কবিদের কদর করার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততার জন্যও পরিচিত ছিল। [১] ৫১৬ হিজরিতে সে খিলাফত দরবারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহী হয়ে ইরাকে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে, হজ যাত্রীরা হিজাজে যেতে পারছিল না। [২] অবশেষে ৫১৭ হিজরির মহরম মাসে মুস্তারশিদ তার মোকাবিলায় বের হন। তিন শতাব্দী পর এটিই ছিল প্রথম যুদ্ধ যেখানে কোনো খলিফা নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। খলিফার উপস্থিতি বাগদাদী বাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। [৩] দুবাইসের বাহিনীতে গায়ক, ভাঁড় এবং সঙ্গীতশিল্পীদের আধিক্য ছিল যাদের গান-বাজনার আওয়াজ দূর-দুরান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অন্যদিকে খলিফার বাহিনীতে কুরআন, তাকবির এবং তাসবিহ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। অবশেষে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে দুবাইস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। [৪]

৫১৯ হিজরিতে দুবাইস সেলজুক রাজপুত্র মুহাম্মদ বিন তুঘরিলকে সাথে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে এবং শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তবে খলিফা যখন নিজে সেনাবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন, তখন পরিস্থিতি পাল্টে যায়। দুবাইস কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা চায় এবং খলিফা তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে তাড়িয়ে দেন। দুবাইস এখান থেকে বের হয়ে খোরাসানে সুলতান সাঞ্জারের কাছে পৌঁছায় যাতে তাকে সাথে নিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে একটি জোট গঠন করা যায়, কিন্তু সুলতান সাঞ্জার খিলাফত দরবারের সম্মানে তাকে নজরবন্দি করে রাখেন। [৫]

৫২২ হিজরিতে সাঞ্জার দুবাইসকে ইরাকের কিছু জেলার নায়েব নিযুক্ত করেন এবং খলিফার কাছে সুপারিশ করেন যেন দুবাইসকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু দুবাইস এলাকার শাসনভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই বাগদাদ আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। [৬] সেই সাথে সে বার্তা পাঠায় যে, খলিফা যদি তার ওপর সন্তুষ্ট হন তবে সে খিলাফত দরবারে মূল্যবান উপটোকন পেশ করবে, কিন্তু খলিফা তাকে বিশ্বাস করার ভুল করেননি। [৭] এরপরও দুবাইস শান্ত হয়নি। ৫২৬ হিজরিতে সে ইমাদ উদ্দিন জঙ্গিকে সাথে নিয়ে বাগদাদ দখলের চেষ্টা করে যা ব্যর্থ হয়। [৮]

সুলতান মাসউদ সেলজুকি এবং খলিফার মধ্যে দ্বন্দ্ব:

বাগদাদবাসীকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যখন ৫২৫ হিজরিতে ইরাকের সেলজুক রাজা মাহমুদ বিন মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন এবং সুলতান মাসউদ সেলজুকি সিংহাসন দখল করেন। খলিফা মুস্তারশিদ বাগদাদে সুলতান মাসউদের নামে খুতবা পাঠ শুরু করিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কারণে সুলতান মাসউদ খলিফার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদের দিকে রওনা হন। [৯] সুলতান মুস্তারশিদের বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তার অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বে ছিল দুবাইস, যে কিছুকাল আগে সুলতান মাসউদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। [১০]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৯/৬১৩

[২] আল-মুনতাজাম: ১৭/২০৯

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪০৭

[৪] আল-মুনতাজাম: ১৭/২১৭

[৫] আল-মুনতাজাম: ১৭/২২৯

[৬] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৪৯-২৫০

[৭] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৫৩

[৮] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৭১

[৯] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৭, ৩০৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৫২৯ হিজরির ঘটনাবলি

[১০] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৯২, ২৯৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান মাসউদ এবং দুবাইস-এর সৈন্য অভিযানের খবর শুনে মুসতারশিদও বাগদাদের আমিরদের নিজের অধীনে নিয়ে বের হলেন। ১০ রমজান ৫২৯ হিজরিতে হামাদানের কাছে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে বাগদাদের আমিররা বিশ্বাসঘাতকতা করে খলিফাকে একা ফেলে চলে যায় এবং সুলতান মাসউদ খলিফাকে গ্রেপ্তার করে নিজের সাথে মারাঘায় নিয়ে যান। খলিফার কাছ থেকে খেলাফতের নিদর্শনসমূহ: চাদরে নববী এবং আসায়ে মুবারক (পবিত্র লাঠি) ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় বাগদাদে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অশ্রুসিক্ত দেখা যাচ্ছিল। উত্তেজিত জনতা হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। মহিলারা খেলাফতের এই অপমানের জন্য মাতম করতে শুরু করে। বাগদাদসহ সমস্ত শহরের সাধারণ মানুষ শোকের তীব্রতায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। [১]

ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধারাবাহিকতা:

এদিকে ইরাকে একের পর এক বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর আজাব থেকে পানাহ চাইতে শুরু করে। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) এই ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন:

“১১ই শাওয়াল থেকে ২৭শে শাওয়াল পর্যন্ত বারবার কম্পন অনুভূত হতে থাকে। ২৭শে শাওয়ালের রাতে এমন এক ভূমিকম্প হয় যে অনেক দেয়াল ও ছাদ ধসে পড়ে। সেই রাতে আমি আমার ঘরের ছাদে ঘুমাচ্ছিলাম, আমার ঘুম খুব গভীর ছিল কিন্তু ভূমিকম্পের ঝটকায় আমি ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠি। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কম্পন হতে থাকে এবং মানুষ কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকে।” [২]

খোরাসানের সেলজুক শাসক সুলতান সাঞ্জর এই পরিস্থিতিতে এতটাই ব্যথিত হন যে, তিনি সুলতান মাসউদকে অবিলম্বে একটি তিরস্কারমূলক চিঠি লিখে খলিফার কাছে ক্ষমা চাইতে এবং তাঁকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে বাগদাদে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা; তাই মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীককে অবমাননা করার জন্য তওবা করা উচিত।

সুলতান সাঞ্জর লিখেছিলেন:

“আমার প্রিয় বৎস! তুমি খলিফার কাছে গিয়ে জমিন চুম্বন করো, নিজের অপরাধের ক্ষমা চাও। বর্তমানে যেসব আসমানি বিপদ আসছে, সেগুলো শোনারও শক্তি নেই, সেখানে এই ঝড়-তুফান, বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করার তো প্রশ্নই আসে না যা টানা বিশ দিন ধরে চলছে। সেনাবাহিনীতে উদ্বেগ এবং শহরগুলোতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হওয়ার ভয় পাচ্ছি, আবার জনগণ ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও বিপদের আশঙ্কা করছি। মানুষ জামে মসজিদগুলোতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, মিস্বরগুলো ভেঙে ফেলেছে। খতিবদের খুতবা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ভুলগুলো সংশোধন করো। মুসলমানদের রক্ত থেকে নিজের আঁচল বাঁচাও, আমিরুল মুমিনিনকে তাঁর সম্মানের স্থানে ফিরিয়ে দাও, দুবাইসকে তাঁর হাতে সোপর্দ করো যার আমিরুল মুমিনিনের খুব প্রয়োজন।”

সুলতান মাসউদ এই পত্র পাঠ করে প্রকাশ করলেন যে, তিনি নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত। তিনি খলিফা মুসতারশিদের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন, ক্ষমা চাইলেন এবং দুবাইসকে হাত-পা বেঁধে খলিফার সামনে হাজির করলেন এবং বললেন: “আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে, তার জন্য এই ব্যক্তিই দায়ী। সে এখন আপনার জিন্মায়। আপনি যা বলবেন, তার সাথে তাই করা হবে।”

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৭, ৩০৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৫২৯ হিজরির ঘটনাবলি।

[২] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৯৬।

খলিফা মুসতারশিদ সুলতানের ওজর কবুল করে নিলেন। যখন দুবাইস অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইল, তখন তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। [১]

খলিফা মুসতারশিদের হত্যাকাণ্ড:

ইতিমধ্যে সুলতান সাঞ্জর তার দূতকে একটি সেনাদলের সাথে মারাগায় পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি খলিফাকে বাগদাদে পৌঁছে দিয়ে আসেন। সফর চলাকালীন এই সেনাবাহিনীতে সতেরোজন বাতেনিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যখন এই কাফেলা মারাগায় পৌঁছাল, তখন সুলতান মাসউদ তার লোকজনসহ সুলতান সাঞ্জরের দূতকে অভ্যর্থনা জানাতে চলে গেলেন, আর খলিফা মুসতারশিদ তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরের সাথে একা রয়ে গেলেন। এই সুযোগে বাতেনিরা খলিফার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল এবং খঞ্জরের উপর্যুপরি আঘাতে তাকে শহীদ করে দিল। খুনিদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে গেল এবং কেউ কেউ ধরা পড়ে নিহত হলো। এই দুঃখজনক ঘটনাটি ১৭ জিলকদ ৫২৯ হিজরির। [২] এই খবর বাগদাদে পৌঁছালে সেখানে শোকের ছায়া নেমে এল। মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুসতারশিদের বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি সতেরো বছর ছয় মাস শাসন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ খলিফা যিনি জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবা দিতেন। [৩]

আসল অপরাধী কে ছিল:

আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন: “কিছু লোকের বক্তব্য হলো, সুলতান মাসউদ জানতেন না যে সেখানে বাতেনিরাও উপস্থিত আছে। অথচ বাহ্যিক অবস্থা এই মতের পরিপন্থী ছিল। তারা খলিফাকে হত্যার পরিকল্পনা করে রেখেছিল; এই কারণেই তার তাঁবুটি অন্য তাঁবুগুলো থেকে আলাদা করে স্থাপন করা হয়েছিল।” [৪]

ইমাম সুয়ুতী (রহ.) লিখেছেন: “বলা হয় যে মাসউদ এ সম্পর্কে জানতেন না। আবার এও বলা হয়েছে যে তিনি জানতেন। আরও বলা হয় যে তিনিই বাতেনিদের হত্যার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।” [৫]

হাফেজ জাহাবী (রহ.) লিখেছেন: “বলা হয় যে বাতেনিদের সুলতান মাসউদই হত্যার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।” [৬]

সুলতান মাসউদের আদেশে দুবাইসের হত্যাকাণ্ড:

খলিফার হত্যাকাণ্ডের এক মাস পর দুবাইস সুলতান মাসউদের সাথে দেখা করতে এলে সুলতানের ইশারায় এক গোলাম পেছন থেকে তলোয়ার চালিয়ে তাকে হঠাৎ হত্যা করে। সুলতান প্রকাশ করলেন যে, খলিফা মুসতারশিদকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ দুবাইসকে হত্যা করা হয়েছে। [৭] ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, সুলতান মাসউদ নিজেই বাতেনিদের খলিফার তাঁবুতে আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার ভয় ছিল পাছে এই হত্যাকাণ্ডের দায় তার ওপর না পড়ে। তাই তিনি দুবাইসের ওপর দোষ চাপানোর পরিকল্পনা করেন এবং তাকে হত্যা করিয়ে এটি প্রকাশ করেন যে, সাবেক খলিফার আসল খুনি তার পরিণাম ভোগ করেছে। [৮]

[১] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৯৮

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫২৯ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৩০৫, ৩০৬

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৩০৫

[৪] আল-মুনতাজাম: ১৭/২৯৮

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৮

[৬] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/৪৩৫

[৭] ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২/২৬৫

[৮] ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২/২৬৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

রাশিদ বিল্লাহ

মনসুর বিন আল-ফজল আল-মুসতারশিদ

জিলকদ ৫২৯ হিজরি থেকে জিলকদ ৫৩০ হিজরি

সেপ্টেম্বর ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ

খলিফা মুসতারশিদের শাহাদাতের পর বাগদাদে তাঁর পুত্র আবু জাফর মনসুর ‘রাশিদ বিল্লাহ’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান, সাহসী এবং সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। [১]

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, কেউ যেন কারো ওপর জুলুম না করে; যদি কারো ওপর জুলুম হয়ে থাকে, তবে সে যেন সরাসরি খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি শুনে মানুষ আশ্বস্ত হলো। তবে মাত্র দুই দিন পরেই ঘোষণা করা হলো যে, মানুষ যেন জুলুমের অভিযোগসমূহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করে। [২] এই ঘটনা থেকে রাশিদ বিল্লাহর অস্থিরচিহ্নতার আন্দাজ পাওয়া যায়।

খলিফা এবং সুলতান মাসউদের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

সুলতান মাসউদ নতুন খলিফাকে নিজের অধীনে রাখতে চেয়েছিলেন। ৫৩০ হিজরির শুরুর দিকে যখন রাশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে, তখন সুলতান খলিফার কাছে সাত লক্ষ দিনার দাবি করেন। খলিফা তাঁর আমিরদের সাথে পরামর্শ করে সুলতানের দাবি মানতে অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

সুলতান মাসউদ সেলজুকি এটি দেখে খলিফাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বাগদাদে এসে শহরের আলেমদের সামনে এই ফতোয়া তলব করলেন যে, খলিফা মন্দ কাজ, রক্তপাত এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন; এরপরও কি তিনি খলিফা থাকতে পারেন?

সুলতানের নায়েবের ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে ১৬ই জিলকদ ৫৩০ হিজরিতে কিছু আলেম খলিফাকে পদচ্যুত করার ফতোয়া দিয়ে দেন এবং সুলতান রাশিদ বিল্লাহর চাচা সাবেক খলিফা মুসতায়হিরের পুত্র মুহাম্মদকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করেন। রাশিদকে পদচ্যুত করা হলো। [৩]

রাশিদ বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড:

রাশিদ বিল্লাহ সুলতানের বাগদাদ আগমনের পূর্বেই গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে সেনাবাহিনীসহ পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে মসুল এবং তারপর আজারবাইজান পৌঁছান। এরপর হামদান হয়ে ইসফাহানে চলে যান। প্রতিটি স্থানেই তিনি কঠোর জুলুম ও নির্যাতনের প্রমাণ দেন। আলেমদের প্রতি তিনি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, কিছু আলেমের দাড়ি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। ২৬শে রমজান ৫৩২ হিজরিতে কিছু লোক আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। বলা হয় যে, এই আক্রমণ বাতিনিরা করেছিল। [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৮, ৩০৯

[২] আল-মুনতায়াম, ১৭/ ৩০০

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/ ৪৩৭; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০৮, ৩০৯

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১০

তারীখে উম্মাতে মুসলিমা

আল-মুকতাবী লি-আমরিলাহ

মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মুসতাজহির

যিলকদ ৫৩০ হিজরি হতে রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরি

আগস্ট ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে মার্চ ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ

এই সময়ে বাগদাদে মুকতাবী খলিফা হয়েছিলেন। তিনি ৫৩০ হিজরিতে রাশিদ বিলাহর পলায়নের পরপরই ইরাকের সুলতান মাসউদ সেলজুকির সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেক, সৎ এবং যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, কিন্তু সুলতান মাসউদের আচরণ তাঁর সাথেও ভালো ছিল না। সুলতান তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন; তাই খলিফা প্রায় অসহায় ছিলেন। [১]

খোরাসানে তুর্কানে গুয-এর ফিতনা এবং সেলজুকদের পতন:

এই সময়ে খোরাসানের সেলজুকরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের এলাকায় “তুর্কানে গুয” বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল এবং তাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তুর্কানে গুয-এর অনেক সর্দার মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে মূর্খতা ও গোঁয়ো স্বভাবের সমস্ত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বখতিয়ার, দিনার, তুতি, ইগফার, আরসালান এবং মাহমুদ তাদের বড় সর্দার ছিলেন। তাদের লশকরগাহে তাঁবুর সংখ্যা এক লক্ষের বেশি ছিল যা থেকে তাদের জনশক্তির আন্দাজ করা যায়। [২]

তুর্কানে গুয-এর মোকাবিলায় সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির পরাজয় ও বন্দিত্ব:

৫৪৬ হিজরিতে সুলতান সাঞ্জর মাওরাউন নাহরের ময়দানে তুর্কানে গুয-এর তিন লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করেন, এই যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত দুঃখজনক হয়েছিল। এক লক্ষের বেশি মুসলমান শহীদ হন এবং সুলতান সাঞ্জর অতি কষ্টে সামান্য কিছু লোক নিয়ে পালিয়ে বলখ পৌঁছাতে সক্ষম হন। নিজের অবস্থা ঠিক করতে তাঁর কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

বারো বছর পর ৫৪৮ হিজরিতে বলখের কাছে সাঞ্জরের “তুর্কানে গুয”-এর সাথে আরও একটি বড় যুদ্ধ হয় যাতে তাঁর ৭০ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়। বিজয়ীরা তাঁর বড় বড় আমিরদের গ্রেপ্তার করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। খোদ সুলতান সাঞ্জর সেলজুকিও গ্রেপ্তার হন। তুর্কানে গুয তাঁকে নজরবন্দি করে ফেলে এবং প্রতিটি অভিযানে তাঁকে সাথে নিয়ে ঘুরত। তারা তাঁকে নিয়ে উপহাসও করত। তারা তাঁর সামনে এসে জমিন বুসি করত এবং বলত: “আমাদের সুলতান তো আপনিই।” কেউ হাঁক ছাড়ত: “সুলতান মুয়াজ্জাম! আমাদের জায়গির দান করুন।” কেউ বলত “হজুর! আমরা ও নহি দান করুন।” তাঁরই নাম, খুতবা ও মুদ্রার সাথে তারা খোরাসানে ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকে। এই সময়ে সুলতান একজন সাধারণ গোলামের মতো খাবার ও ভাতা পেতেন। সুলতান সাঞ্জর দীর্ঘ সময় তাদের হেফাজতে ছিলেন। তিনি এই রাজনৈতিক ভুলগুলোর জন্য অঝোরে চোখের পানি ফেলতেন [৩]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১০

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৫৪৬ হিজরি, ৫৪৮ হিজরি

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৪/২

যাদের কারণে সেলজুক বংশকে এই দিন দেখতে হয়েছিল। [১]

সুলতান সাঞ্জারের মুক্তি ও মৃত্যু:

সুলতান সাঞ্জারের কিছু এলাকা খাওয়ারিজম শাহী আমিরগণ এবং কিছু এলাকা ঘুরি সুলতানগণ দখল করে নিয়েছিলেন। বাকি প্রদেশগুলো তুর্কানে গুযদের দখলে ছিল। কয়েক মাস পর তুর্কানে গুয সুলতানকে তার রাজধানী মার্ভে নিয়ে আসে এবং তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে অনেক উপহাস করে। সুলতান আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি উঠে মার্ভের খানকাহে চলে গেলেন এবং রাজনীতির প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন।

তুর্কানে গুযদের কাছে তিন বছর চার মাস বন্দি থাকার পর ৫৫১ হিজরির রমজান মাসে তিনি সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান এবং তিরমিয দুর্গে আশ্রয় নেন। এই সময়ে খাওয়ারিজম শাহ আতসিজ সুলতানের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং তিনি সুলতানকে অনুসরণকারী তুর্কানে গুযদের যুদ্ধে লিপ্ত রাখেন। সুলতান সাঞ্জার তুর্কানে গুযদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার রাজধানী মার্ভে ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে মুক্তির মাত্র ছয় মাস পর ৫৫২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তার মৃত্যু হয়। তার বয়স ছিল ৭২ বছর। [২]

তুর্কানে গুযরা এরপর মালিক শাহ সেলজুকির নাতি মাহমুদ বিন মুহাম্মদকে ‘খাকান’ উপাধি দিয়ে তাদের নামমাত্র রাজা বানিয়ে নেয় এবং বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। মাহমুদ ৫৫৬ হিজরিতে তাদের হাত থেকে পালিয়ে যান এবং অজ্ঞাত ও নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

ইসলামি বিশ্বের নতুন রক্ষক, ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গি:

সেলজুক বংশীয়রা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আল্লাহ এই বছরগুলোতে ইসলামের আরও কিছু রক্ষক তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আতাবেগ ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গি, যিনি প্রথমে বসরার গভর্নর, তারপর বাগদাদের নাজিম এবং পরে মসুলের স্বাধীন শাসক হন। তিনি সিরিয়ার উপকূল দখলকারী ক্রুসেডারদের সাথে অনেক যুদ্ধ করেন এবং মুসলমানদের বিমিয়ে পড়া প্রতিরক্ষা শক্তিকে পুনরায় জীবিত করেন। [৪]

ইমাদ উদ্দিনের প্রথম লক্ষ্য ছিল এশিয়া মাইনর এবং সিরিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত এডেসার বিশাল খ্রিস্টান সাম্রাজ্য। অবশেষে ৫৩৯ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গি এডেসার কেন্দ্র ‘রাহা’ আক্রমণ করেন এবং ২৮ দিনের তীব্র যুদ্ধের পর তা দখল করে নেন। এই বিজয়ে ইসলামি বিশ্বে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। খলিফা মুকতাবি আনন্দিত হয়ে বাগদাদের খুতবায় ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গির নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। [৫] মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে “ফাতহুল ফুতুহ” (বিজয়সমূহের বিজয়) নামে স্মরণ করেন। [৬]

ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গির ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চেহারা ছিল সুন্দর এবং গায়ের রং ছিল গন্দমি (শ্যামলা)। চোখগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি ষাট বছরের বেশি বয়স পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান রাজনীতিবিদ। তার কাছে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কোনো দুর্বলের ওপর জুলুম করতে পারত না। এর আগে আল-জাজিরার অনেক শহর ইউরোপীয়দের আক্রমণ এবং মুসলিম শাসকদের অদূরদর্শিতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইমাদ উদ্দিন এই শহরগুলোকে নিরাপদ, সুসংহত ও আবাদ করেন। [৭] যিঙ্গি নারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন। অনেক শত্রুর মাঝে ঘেরা থাকার...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৩৬ হি., ৫৪৮ হি.; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৪/৩

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৫২ হি., ৫৫৩ হি., ৫৫৬ হি.; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২৭/৩

[৩] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩২৮, ২৭৭/২

[৪] উম্মুর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন লি আবি শামা: ৪৩/১, ত. মুআসসাসাতুর রিসালাহ

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৪৮ হি., ৫৫১ হি., ৫৫২ হি.

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৫৩৯ হি.

[৭] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৬২/৯, ১৪৩

...সত্ত্বেও তিনি কেবল নিজের এলাকা রক্ষায় সফল ছিলেন না বরং তার রাজ্য দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছিল। [১]

নুরুদ্দিন জঙ্গি:

ইমাদ উদ্দিনের পর তার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: সিরিয়া তার ছোট ছেলে নুরুদ্দিন মাহমুদ জঙ্গির কাছে আসে এবং মসুল ও আল-জাজিরার শাসনভার তার বড় ছেলে সাইফ উদ্দিন গাজীর হাতে যায়। নুরুদ্দিন জঙ্গি তার মৃত্যু পর্যন্ত সিরিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তার সিংহাসন আরোহণের পরপরই ৫৪২ হিজরিতে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা সিরিয়ার ওপর সম্মিলিত আক্রমণ চালায় যা দ্বিতীয় ক্রুসেড নামে পরিচিত। ৫৪৩ হিজরিতে তারা দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে নুরুদ্দিন জঙ্গি এবং দামেস্কের আমিরদের চমৎকার প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক কৌশলের কারণে খ্রিস্টানদের শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। [২]

সুলতান মাসুদ ও খলিফার মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব:

এদিকে বাগদাদ খিলাফত এবং ইরাকের সেলজুক শাসক সুলতান মাসুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। সুলতান মাসুদ খলিফাকে সেভাবেই দমন করার চেষ্টা করতেন যেভাবে বনু বুওয়াইহ খলিফাদের পরাভূত করে রাখত। তিনি এক পর্যায়ে খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাদে বাগদাদ খিলাফতের সমস্ত জায়গিরের অধিকার দখল করে নেন। এরপর আরও এক লক্ষ দিনার দাবি করেন। খলিফা জবাবে বলে পাঠান: “আমাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর প্রজাদের ওপর কর আরোপ করে আমি কিছুই আদায় করব না, কারণ আমি শপথ করেছি যে জনগণের ওপর এক পয়সারও জুলুম করব না।”

সুলতান মাসুদ তার দাবি ত্যাগ করেন। তবে তার আমির ও প্রতিনিধিরা বারবার খলিফার সাথে অভদ্র আচরণ করত। [৩] খলিফার অর্থনীতি পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। তার আস্তাবলে চারটি ঘোড়া এবং আটটি খচ্চর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। [৪]

খলিফার বদদোয়া ও সুলতানের মৃত্যু:

খলিফা সুলতান মাসুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কুন্নে নাজেলা পড়া শুরু করেন। এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সুলতান মাসুদ শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাগদাদ একজন জালেম সুলতানের হাত থেকে মুক্তি পায়। এটি ৫৪৭ হিজরির ঘটনা। [৫]

শত্রুদের বিরুদ্ধে দোয়ায়ে কুন্নে নাজেলা পড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত। তিনি ﷺ কিছু জালেম গোত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ফজর নামাজে এক মাস পর্যন্ত দোয়ায়ে কুন্নে নাজেলা পড়েছিলেন। [৬] চিন্তা করে দেখুন যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাতসমূহে কত প্রভাব রয়েছে। সেই শক্তিশালী সুলতানগণ যাদের অত্যাচার কোনোভাবেই শেষ হচ্ছিল না, দোয়ায়ে কুন্নে নাজেলার আমলের পর তারা এমন দুর্বল হয়ে পড়লেন যে বাগদাদ খিলাফত কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর বাগদাদ খিলাফত শেষ পর্যন্ত বহিরাগত শাসকদের আধিপত্য ও চাপ থেকে সুরক্ষিত ছিল। এভাবে এক নতুন যুগের সূচনা হলো যাতে বাগদাদ দরবারে কোনো সুলতানের হস্তক্ষেপ ছিল না।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/১৪২, ১৪৩

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১০, ৩১১

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১২

[৪] ওফয়াতুল আয়ান: ৫/১৮৪, ১৮৫; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/৪৬৩, ৪৬৪

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১০

[৬] সহিহ আল-বুখারি, হা: ১০০২, বাব আল-কুনুত

সাজুকিদের যুগের ওপর এক নজর:

সেলজুকদের উত্থান এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক অঙ্গন বাতিল ফেরকাগুলোর দখলে ছিল। সেলজুকরা রাজনীতির এই বিশৃঙ্খলা দূর করে দিয়েছিল। তারা আব্বাসীয় খিলাফতের পদদলিত মর্যাদা পুনরায় পুনরুদ্ধার করে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা কখনো বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। তারা ডজন ডজন ছোট ছোট শাসক ও সরকারকে নির্মূল করে একটি ঐক্যবদ্ধ ও বিশাল সাম্রাজ্যকে আব্বাসীয় খিলাফতের অনুগত করে সারা বিশ্বে এর নাম উজ্জ্বল করে দিয়েছিল।

সেলজুকরা ছিল নওমুসলিম এবং ধর্মপ্রাণ। জিহাদ ছিল তাদের মজ্জাগত। তারা তাদের তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে রোমানদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল এবং খ্রিস্টধর্মের প্লাবনের উত্তাল তরঙ্গকে অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছিল। তারা উলামা ও নেককারদের অত্যন্ত ভালোবাসত। ইরানিদের মতো ধূর্ততা এবং শিয়াদের ষড়যন্ত্রের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা আব্বাসীয় ও আলবীদের পূর্ববর্তী দ্বন্দের সাথেও কোনো সম্পর্ক রাখেনি, বরং সকল বংশকে সমানভাবে সম্মান করত এবং এক পক্ষকে সমর্থন করে অন্য পক্ষকে দমন করার চেষ্টা করেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খিলাফত যেন সমুন্নত থাকে এবং মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকে। তবে তারা সামরিক শক্তি নিজেদের হাতেই রেখেছিল এবং এই দিক থেকে তারা আব্বাসীয় খিলাফতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং মাঝে মাঝে তারা কার্যত এটি বুঝিয়েও দিত। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি শাসকের মতো সেলজুকরাও খিলাফত দরবারের প্রতি সম্মান থাকা সত্ত্বেও ইসলামের কেন্দ্রের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইত; এজন্য বাগদাদের প্রধান প্রশাসক তাদের পক্ষ থেকেই নিযুক্ত হতো।

যদি চিন্তা করা হয় তবে খিলাফতকে ভ্রান্ত আকিদার আমিরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার পর সেলজুকদের সামনে দুটি পথ ছিল: একটি হলো তাদের সমস্ত সেনাবাহিনী ও কোষাগার খলিফার হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরা বাগদাদের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এর ফলাফল সম্ভবত ভালো হতো না, কারণ সেই যুগের আব্বাসীয় খিলাফত যদি তার পূর্বের শান-শওকত ফিরে পেতে বা বজায় রাখতে সক্ষম হতো, তবে তাদের কাছে সম্পদ বা জনশক্তির অভাব ছিল না। সমস্যা ছিল নেতৃত্বের দুর্বলতার। যদি সেলজুকরা সবকিছু বাগদাদের খলিফার হাতে সঁপে দিয়ে নিজেরা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তবে তাদের দেওয়া জনশক্তি ও আর্থিক শক্তি অপচয় হয়ে যেত।

দ্বিতীয় পথটি ছিল নিজেদের সামরিক ও বৈষয়িক শক্তি নিজেদের হাতে রেখে বাহ্যিকভাবে খিলাফতকে সমর্থন দেওয়া। তৎকালীন পরিস্থিতিতে এটাই ছিল উপযুক্ত এবং সেলজুকরা এটিই গ্রহণ করেছিল। এভাবে মুসলিম বিশ্বে শক্তির কেন্দ্র আলাদা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের কেন্দ্র আলাদা হয়ে গেল। সেলজুক বাদশাহ ছিলেন যুদ্ধের রাজা এবং খলিফা ছিলেন রাজনীতির রাজা। এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন, জটিল ও নাজুক এক পরিস্থিতি এবং শক্তির এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ছিল অত্যন্ত উদারতা, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দাবি। এটি উভয় পক্ষের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এক বড় পরীক্ষা ছিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত সেলজুক সুলতান ও খলিফাদের মধ্যে আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সম্মানের অনুভূতি বজায় ছিল, ততক্ষণ সামান্য ভুলত্রুটিগুলো উপেক্ষা করা হতো, কিন্তু পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শীতলতা এবং কখনো কখনো চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

সেলজুকদের পতনের কারণসমূহ:

সেলজুকদের পতনের প্রথম কারণ ছিল তাদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে বহু সেলজুক রাজপুত্র ক্ষমতার জন্য একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করেন, আবার কেউ ব্যর্থ হয়ে দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির শিকার হন। এতে সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, তাদের সমস্ত শক্তি সামরিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রত্যেক সেনাপতি নিজ নিজ এলাকার সুবাদার ছিলেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই এই সেনাপতিরা স্থানে স্থানে স্বাধীন সরকার গঠন করে নেন।

তৃতীয় কারণ ছিল তাদের শেষদিকের কয়েকজন শাসকের খলিফাদের সাথে অশোভন আচরণ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে এ ধরনের আচরণ যেকোনো জাতির মধ্যে সর্বদা বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উন্মত্ত মুসলিমার মধ্যেও এই আচরণ বিভেদ ও কুধারণার জন্ম দেয়। এর ফলে শেষ যুগের সেলজুক শাসকরা বুজুর্গানে দ্বীন, নেককার ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনগণের দোয়া ও আন্তরিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন। অতঃপর আল্লাহর সাহায্যের ছায়া সরে যায় এবং তারাও পূর্ববর্তী শাসক রাজবংশগুলোর মতো বিভক্ত হতে হতে ইতিহাসের পাতা থেকে বিলীন হয়ে যান।

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

বাগদাদ খিলাফতের পতন

সমাপ্তি কাল

শেষ পর্যায়

খিলাফতের স্বাধীন মর্যাদার পুনরুদ্ধার

আল-কায়িমের পুনরায় সিংহাসন আরোহণ থেকে সুলতান মাসউদ সেলজুকির মৃত্যু পর্যন্ত

৫৪৭ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি

১০৯ বছর

খলিফা মাকতাবি, খেলাফতের স্বাধীন মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পর

৫৪৭ হিজরিতে সুলতান মাসউদ সেলজুকির মৃত্যুর পর বাগদাদের খেলাফতের প্রাচীন স্বাধীন মর্যাদা নতুন করে পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাগদাদ ও ইরাক পুনরায় বনু আব্বাসের খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং তাদের মোকাবিলা করার মতো কেউ ছিল না। খোরাसानে সেলজুকরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং খেলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছিল। অন্যদিকে মোসেল ও আল-জাজিরার আতাবেগ পরিবারও এখন আব্বাসীয় খেলাফতের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। ইরাকে এমন কোনো সুলতান ছিল না যে খলিফার ওপর হুকুম চালাত। মোটকথা, গত কয়েক শতাব্দীতে মাকতাবিই ছিলেন প্রথম খলিফা যিনি ‘দৌলত’, ‘মুলুক’ এবং ‘সালাতিন’ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। [১] দীর্ঘকাল ধরে বাগদাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী মাত্র ছয় হাজার সৈন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মাকতাবি ৫৪৯ হিজরিতে তিন লাখ দিনার খরচ করে একে দ্বিগুণ করে দেন। [২]

খলিফার দাকুকা এবং খুজিস্তানে সৈন্য প্রেরণ:

পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে আসার পর দীর্ঘকাল পর এমন হলো যে খলিফা নিজেই কোনো অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। ৫৫০ হিজরিতে খলিফা ‘দাকুকা’ এবং ‘খুজিস্তান’-এর দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। যেহেতু খেলাফতের সৈন্যেরা দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার অভ্যস্ত ছিল না, সম্ভবত এই কারণেই উভয় অভিযানে কোনো অঞ্চল জয় করা সম্ভব হয়নি এবং খেলাফতের বাহিনীকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তবে খুজিস্তানের শাসক মালিক শাহ বিন মাহমুদ পরবর্তীতে খলিফার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে এই নতুন যুগে খলিফার মর্যাদা অতীতের তুলনায় কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। [৩]

বাগদাদে একটি ব্যর্থ আক্রমণ:

৫৫১ হিজরিতে রয়-এর সেলজুকি শাসক মুহাম্মদ বিন মাহমুদ খলিফার কাছে দাবি জানান যে খুতবায় যেন তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু খলিফা তা অস্বীকার করেন। মুহাম্মদ বিন মাহমুদ ক্ষুব্ধ হয়ে ৫৫৩ হিজরির শুরুতে বাগদাদ আক্রমণ করেন। অবরোধ ও যুদ্ধ শুরু হলে খলিফা ঘোষণা করেন যে বাগদাদের যে ব্যক্তি লড়াইয়ে আহত হবে, তাকে পাঁচ দিনার দেওয়া হবে। ফলে সাধারণ মানুষও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে সেলজুকি বাহিনীর মোকাবিলা করে। অবশেষে মুহাম্মদ বিন মাহমুদ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ফেরার পথে তার বাহিনীতে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সৈন্য মারা যায়, এমনকি মুহাম্মদ বিন মাহমুদ নিজেও অসুস্থ হয়ে মারা যান। [৪]

খলিফা মাকতাবির মৃত্যু:

এই স্বস্তিদায়ক পরিবেশে আট বছর শাসন করার পর ২ রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরিতে খলিফা মাকতাবি ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৬৬ বছর এবং খেলাফতের মেয়াদ ছিল ২৪ বছর সাড়ে তিন মাস। [৫]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/৩৯৩; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১১, ৩১২

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৫৫০ হিজরি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১২/৩৯৩; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১১, ৩১২

[৪] আল-ইবার ফি খবর মান গাবারা: সন ৫৪৯ হিজরি

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: সন ৫৫১ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ

ইউসুফ বিন মুহাম্মদ আল-মুকতাহি

রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরি থেকে রবিউল আখের ৫৬৬ হিজরি

মার্চ ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ

মুকতাহি-র পর তার পুত্র আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ খলিফা হন। তিনিও তার পিতার মতো জ্ঞানানুরাগী, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ এবং নেক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের ওপর কোনো কর (ট্যাক্স) বাকি রাখেননি, অত্যাচারী কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করেছেন এবং সব ধরনের অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়েছেন। [১] তিনি দর্শনশাস্ত্রকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তাই তিনি এই ধরনের বইয়ের একটি বিশাল ভাণ্ডার ধ্বংস করে দেন। [২] তবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কদর করতেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায় তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। [৩]

ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা:

মুসতানজিদ-এর চেষ্টা ছিল যেন দারুল খিলাফতে কোনো ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি না থাকে। একবার তিনি এমন এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠান যে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করত। কিছুকাল পর তার এক শুভাকাঙ্ক্ষী খলিফার কাছে এল এবং দশ হাজার দিনার নজরানা হিসেবে পেশ করে অনুরোধ করল যেন এই বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। খলিফা বললেন: “আমি তোমাকে দশ হাজার দিনার পুরস্কার দেব যদি তুমি এমন আরও কোনো ব্যক্তির সন্ধান দাও যাতে আমি তাকেও কারাগারে পাঠাতে পারি এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারি।” [৪]

উজির আল্লামা ইবনে হ্বাইরার মৃত্যু:

মুসতানজিদ-এর সময়ে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রখ্যাত উজির আল্লামা ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ ইবনে হ্বাইরা মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে হ্বাইরা হাদিস, কিরাত, নাহ (ব্যাকরণ), লুগাত (অভিধান) এবং আরুয (হন্দতত্ত্ব)-এর একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তাকে হাম্বলি ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার জীবনের বড় অংশ ফকিহসুলভ ব্যস্ততায় এবং ইলমি চর্চায় অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি সরকারি খেদমতের সাথে যুক্ত হন এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে সেলজুকদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার যোগ্যতা দেখে মুকতাহি তাকে খিলাফতের উজির নিযুক্ত করেন। এত বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শরয়ী সীমা অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতেন। তিনি কখনো রেশম ব্যবহার করেননি। খলিফা মুকতাহি বলতেন: “বনু আব্বাস তার মতো উজির কখনো পায়নি।”

ইবনে হ্বাইরার বিনয় এমন ছিল যে, একবার তিনি কোনো এক ফকিহকে কঠোর কথা বলে ফেলেছিলেন। সাথে সাথেই তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং বললেন: “আপনিও আমাকে একই কথা বলুন।” তিনি অস্বীকার করলেন। এতে ইবনে হ্বাইরা তাকে দুইশ দিনার দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন।

মুকতাহি-র পর তিনি মুসতানজিদ-এরও উজির ছিলেন। তিনি মুসলমানদের বিষয়াদি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন যে খলিফা মুসতানজিদ স্বয়ং তার ওপর গর্ব করতেন। তাই একদিন মুসতানজিদ আল্লামা ইবনে হ্বাইরাকে সম্বোধন করে এই কবিতাগুলো পাঠ করেন:

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৪

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৪

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/২৭২; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৪

[৪] পূর্বোক্ত সূত্র

“দুটি নিয়ামত যা আপনার সাথে খাস এবং আম। তাদের আলোচনার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার আলোচনা হতে থাকবে।”

“একটি আপনার অস্তিত্ব যখন দুনিয়া আপনার মুখাপেক্ষী, আর দ্বিতীয়টি আপনার দানশীলতা যখন মানুষের মধ্যে নেক কাজ অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল।” [১]

আল্লামা ইবনে হুবারা “আল-ইফসাহ আন মা’আনিস সিহাহ” নামে সহীহ হাদীসের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন যা আট খণ্ডে সমাপ্ত। এটি কিয়ামত পর্যন্ত তার এক স্মরণীয় ইলমী কীর্তি। [২]

উজির জামালুদ্দীন আসফাহানীর মৃত্যু:

মুসতানজিদ-এর যুগে আতাবেগ বংশের উজির ছিলেন বিজ্ঞ জামালুদ্দীন আসফাহানী। জনহিতকর কাজের আধিক্যের কারণে তাকে ‘আল-জাওয়াদ’ (দানবীর) বলা হতো। তিনি হাজীদের জন্য বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। একটি ঝরনা থেকে খাল খনন করে আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। হাজীদের জন্য গোসলখানা নির্মাণ করেছেন। মসজিদে আরাফাত এবং মসজিদে খায়ফ নির্মাণ করেছেন। কাবা শরীফের দরজায় সোনার প্রলেপ লাগিয়েছেন এবং এর ইমারতকে মার্বেল পাথর দিয়ে সজ্জিত করেছেন। মদীনা মুনাওয়ারার চারপাশে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছেন। দজলা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেছেন। মুসাফিরদের জন্য জায়গায় জায়গায় সরাইখানা খুলেছেন। উক্ত উজির প্রতি বছর নিজের দরজায় এক লক্ষ দিনার সদকা করতেন। প্রতি বছর দশ হাজার দিনার খরচ করে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করতেন। উক্ত উজির রমজান ৫৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। [৩]

নুরুদ্দীন জঙ্গীর কীর্তি:

মুসতানজিদ বিল্লাহর যুগে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর ভাগ্যের নক্ষত্র তুঙ্গে ছিল। ইসলামের এই রক্ষক ৫৫৯ হিজরীতে ক্রুসেডারদের মজবুত দুর্গ ‘হারিম’ জয় করেন। এই যুদ্ধে দশ হাজার ক্রুসেডার নিহত হয় এবং তাদের অনেক বড় বড় সেনাপতি ও নবাব বন্দী হয়। [৪] ৫৬৩ হিজরীতে নুরুদ্দীন জঙ্গী মিশরের শাসক আল-আদিদ-এর অনুরোধে নিজের সেনাপতি শিরকুহ-কে একটি বাহিনী দিয়ে মিশরের হেফাজতের জন্য পাঠান। [৫] এই পদক্ষেপ মিশর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। [৬]

মুসতানজিদ-এর মৃত্যু:

মুসতানজিদ বিল্লাহর যুগ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। এগারো বছর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৯ রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। [৭]

[১] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১১৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৪১৭... মুসতানজিদ-এর এই ইলমী ও আদবী কবিতা অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও উচ্চমানের, যা থেকে তার ইলমী যোগ্যতার আন্দাজ করা যায়। এছাড়া উজিরের শানে কাসিদা বলাও ইতিহাসের বিরল ঘটনা। অন্যথায় উজিররাই খলিফাদের প্রশংসা করে থাকেন।

[২] এই কিতাব ‘দারুল ওয়াতান’ থেকে ড. ফুয়াদ আব্দুল মুনইম আহমদের তাহকীকসহ ১৪১৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৪১১, ৪১২।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৪১০।

[৫] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৫, ৩১৬।

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৪১০।

[৭] তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩১১, ৩১২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৪৪৪।

আল-মুস্তাদি বি-আমরিলাহ

আল-হাসান বিন ইউসুফ আল-মুসতানজিদ

রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরি থেকে শাওয়াল ৫৭৫ হিজরি

ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ

আল-মুসতানজিদ বিলাহর পর তার পুত্র হাসান ‘আল-মুস্তাদি’ উপাধিতে খলিফা হন। তিনি ছিলেন একজন নেককার, ধৈর্যশীল, দানশীল এবং সৌভাগ্যবান শাসক। বাগদাদে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, আহলে সুন্নাতে নদর্শনসমূহ জীবিত ছিল এবং রাফয দমিত হয়েছিল। [১]

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহ বলেন যে, তিনি ইনসার ও উদারতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যার নজির আমরা আমাদের জীবনে দেখিনি। [২]

খলিফা হওয়ার পর তিনি যে খিলআত দান করেছিলেন তার সংখ্যা ছিল তেরো শতেরও বেশি। তিনি বনু হাশিম এবং আলবীদেবর অনেক অনুগ্রহ করেছিলেন। উলামা, মাদ্রাসা এবং খানকাহগুলোর জন্য প্রচুর ব্যয় করেছিলেন। [৩]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহর প্রতি ভক্তি:

খলিফা আল-মুস্তাদির আলেমদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি সাধারণত আল্লামা ইবনুল জাওযীর ওয়াজ মাহফিলে শরিক হতেন এবং আল্লামা তার সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কথা বলতেন। [৪]

আল-মুস্তাদির ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহর প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। ৫৬৭ হিজরিতে তিনি ইমাম সাহেবের কবরে এই ফলকটি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন:

هذا قبر تاج السنة، وحيد الامة، العالي الهمة، العالم العابد، الفقيه الزاهد، الامام ابى عبد الله
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله -

“এটি হলো আহলে সুন্নাতেবর মুকুট, উম্মাহর অনন্য ব্যক্তিত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আলেম ও ইবাদতকারী, ফকিহ এবং দুনিয়াবিমুখ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন আহমদ বিন হাম্বল শায়বানী রহমাতুল্লাহর কবর।” [৫]

সাহাবায়ে কেরামেবর অবমাননাকর বইসমূহ ধ্বংস করা:

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহর মতে, এই যুগে বাগদাদেবর রাফেযীরা এতটাই হীনবল হয়ে পড়েছিল যে গত আড়াইশ বছরে এমন...

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৬

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৬

[৩] আল-মুনতায়াম: ১৮/২৫০

[৪] আল-মুনতায়াম লি-ইবনিল জাওযী: ১৮/১৯১

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/৫৩৬

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - তৃতীয় খণ্ড

রাজধানী শহরে একটি ঘোড়াও অবশিষ্ট ছিল না যাতে মুসতানসির সওয়ার হতে পারতেন। একবার তাঁর সওয়ারির খুব প্রয়োজন পড়ল, অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি খচ্চর পাওয়া গেল। হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর মতে, এই যুগটি ছিল ইউসুফ (আ.)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি। [১]

বিপর্যয়ের যুগ। মুসতানসিরের মৃত্যু:

মুসতানসির ৪৮৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল চরম বিপর্যয়ের। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। বারবার দুর্ভিক্ষ এবং ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দেশের অর্থনীতি চরম অবনতির শিখরে পৌঁছেছিল। [২]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫ / ১৯০ থেকে ১৯৫

[২] ওফায়াতুল আ'ইয়ান: ৫ / ২৩০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আন-নাসির লি-দীনিব্লাহ

আহমদ বিন আল-হাসান আল-মুস্তাদি

শাওয়াল ৫৭৫ হিজরি থেকে রমজান ৬২২ হিজরি

এপ্রিল ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অক্টোবর ১২২৫ খ্রিস্টাব্দ

আল-মুস্তাদির পর তাঁর ২৪ বছর বয়সী পুত্র আহমদ আবুল আব্বাস, ‘আন-নাসির লি-দীনিব্লাহ’ উপাধি নিয়ে খিলাফতের আসনে আসীন হন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল ৪৭ বছর, যা অন্য কোনো খলিফার ভাগ্যে জোটেনি। [১]

গোয়েন্দাগিরির বিস্ময়কর ব্যবস্থা:

আন-নাসিরের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা ছিল বিস্ময়কর, যার শক্তিতে তিনি তাঁর শত্রুদের নির্মূল করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী প্রত্যেককে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাঁর গোয়েন্দারা সারা বিশ্বের দরবারগুলোর খবর তাঁর কাছে নিয়ে আসত। [২] একবার এক মুসাফির তাঁর জন্য হিন্দুস্তান থেকে একটি তোতা পাখি নিয়ে আসেন যা সূরা ইখলাস পাঠ করত। কিন্তু বাগদাদে এসে দরবারে পেশ করার আগেই তোতাটি মারা যায়। সেই ব্যক্তি চিন্তিত হয়ে বসে ছিলেন, এমন সময় খলিফার বিশেষ খাদেম এসে তাঁর কাছে দাবি করলেন যে, তোতাটি যেন খিলাফতের দরবারে পাঠানো হয়। মুসাফির অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন: “আফসোস, গত রাতে তোতাটি মারা গেছে।” খাদেম বললেন: “আমরা জানি। ওর মৃতদেহটিই দিয়ে দিন।” তারপর জিজ্ঞেস করলেন: “আপনার কী আশা ছিল যে খলিফা এর বিনিময়ে কত পুরস্কার দেবেন?” মুসাফির বললেন: “পাঁচশ দিনার।” খাদেম পাঁচশ দিনার তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন: “খলিফা এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি যখন হিন্দুস্তান থেকে রওনা হয়েছিলেন, তখনই খলিফার কাছে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল।” [৩]

গোপন কুটকৌশলে পারদর্শী খলিফা:

আল্লামা সুয়ুতী রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন: “তিনি এমন সূক্ষ্ম কুটকৌশল, এমন গোপন ষড়যন্ত্র এবং এমন চালবাজিতে অভ্যস্ত ছিলেন যা কেউ বুঝতে পারত না। তিনি দুই বন্ধু রাজার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিতেন অথচ তারা টেরও পেত না। তিনি দুই শত্রু শাসককে ঐক্যবদ্ধ করে দিতেন এবং কেউ খবরও পেত না।” [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৮

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২২/১৯৬

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৮

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৮

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আন-নাসিরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনে ওয়াসিলের বর্ণনা হলো:

“তার সংবাদদাতারা ইরাকসহ সবদিকে ছড়িয়ে ছিল যারা তাকে প্রতিটি বিষয়ে লিখিত তথ্য প্রদান করত। একদিন তিনি একটি চিরকুট পেলেন যে, অমুক দাওয়াতে মেজবান (স্বাগতিক) মেহমানদের আগে হাত ধুয়ে নিয়েছেন। নাসির উত্তরে লিখলেন, ‘মেজবানের এই কাজ ছিল সৌজন্যবোধের পরিপন্থী এবং সংবাদদাতার এতটুকু বিষয় নোট করা ছিল নিরর্থক।’ [১]”

আন-নাসিরের দুশ্চরিত্র ও ভ্রান্ত বিশ্বাস:

যদিও আন-নাসিরের চরিত্রের অনেক দিক ছিল দুঃখজনক। এ বিষয়ে ইবনে ওয়াসিলের নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রণিধানযোগ্য:

- তিনি প্রজাদের প্রতি দুর্ব্যবহারকারী ছিলেন। তিনি জুলুম ও নির্যাতনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তার আমলে ইরাক জনশূন্য হয়ে পড়ে। নাগরিকরা তার দেশ ত্যাগ করে এবং তিনি তাদের ধন-সম্পদ ও স্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেন। [২]
 - তার পদক্ষেপগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী। তিনি মানুষকে ইফতার করানোর জন্য বাগদাদে একটি লঙ্গরখানা খুলেছিলেন যা কিছুকাল চলেছিল, তারপর আন-নাসির সেটি বন্ধ করে দেন। তিনি হাজীদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন যা কিছুকাল চালু ছিল, তারপর সেগুলোও বন্ধ করে দেন। তিনি বাগদাদবাসীর ওপর আরোপিত কিছু বিশেষ কর রহিত করেছিলেন, তারপর সেগুলো পুনরায় কার্যকর করেন। [৩]
 - তিনি তার পূর্বপুরুষদের বিপরীতে শিয়া ইমামি মতবাদের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন। [৪]
- খলিফা নাসিরের কিছু উজিরও শিয়া ছিলেন যারা তাকে এ জাতীয় কাজে প্ররোচিত করতেন। হিবাতুল্লাহ বিন আলী এমনই একজন রাফেজি দরবারী ছিলেন যিনি খলিফা নাসিরের আমলে অনেক উন্নতি লাভ করেছিলেন। [৫]

মাতম মিছিলের অনুমতি, শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা পুনরায় শুরু:

আন-নাসিরের আমলে আশুরার মাতম মিছিল যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল, তা পুনরায় শুরু হয় এবং শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা আবার ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারার প্রথম মিছিলটি ৫৮২ হিজরির মহররম মাসে বের হয়। শিয়ারা রাস্তায় নেমে স্লোগান দেয় এবং বলে: “এখন চুপ থাকার এবং তাকিয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।” তারা প্রকাশ্যে সাহাবীদের অবমাননা করে যার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পরবর্তী বছরগুলোতে এই উত্তেজনা বাগদাদবাসীর জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। [৬]

খলিফার বিদ্বेषপরায়ণতা এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা:

আন-নাসির চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও কুটিল চিন্তার অধিকারী, সংকীর্ণমনা এবং বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। তার শাসনামল এই দিক থেকে অত্যন্ত নাজুক ছিল যে, একদিকে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং অন্যদিকে মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মুসলমানদের গণহত্যা করার জন্য...

[১] মফারিযুল কুরুব লি-ইবনে ওয়াসিল: ৪/১৬৩, ত. আল-মাতবাতুল আমিরিয়া মিসর।

[২] মফারিযুল কুরুব: ৪/১৬৪।

[৩] মফারিযুল কুরুব: ৪/১৬৪।

[৪] মফারিযুল কুরুব: ৪/১৬৬।

[৫] মাজদুদ্দিন ইবনুল সাহিব হিবাতুল্লাহ বিন আলী, আল-মুসতানজির দরবারের শিক্ষক ছিলেন। যখন আন-নাসির ক্ষমতায় আসেন, তিনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন গালিগালাজকারী রাফেজি, তিনি ইমামিয়ার রীতিনীতি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং প্রতিটি মন্দ কাজ করেন, এমনকি তিনি দিওয়ান থেকে ফজল ও হাদাস হাওসলা দাবি করেন, যার পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ দিনার। তিনি একচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। (আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ৩/৮৭)

[৬] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: সন ৫৮২ হিজরি।

...তাতারিরা আবির্ভূত হলো। এমন সময়ে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, উদারতা এবং প্রজ্ঞার প্রয়োজন ছিল, আন-নাসির তা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলেন। এমন এক সময়ে যখন পূর্ব ও পশ্চিমের কাফিররা পুরো মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্বকে বাজি ধরেছিল, তখন আন-নাসিরের সমস্ত মনোযোগ শিয়াদের প্রাধান্য দেওয়া এবং বাগদাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ওপর নিবদ্ধ ছিল। ইসলামি বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল এইটুকু ছাড়া যে সেখানে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে কী ঘটছে তা তিনি জানতে পারতেন। নিঃসন্দেহে তিনি এতে সফল ছিলেন এবং তার অত্যন্ত ক্ষিপ্ত গোয়েন্দা ব্যবস্থা বিশ্বে এই কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তার অধীনে জিন রয়েছে। আমীররা তার বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও ভয় পেতেন। [১]

খলিফা যদি তার মেধা, চতুরতা এবং ধূর্ততা উম্মাহর সামষ্টিক স্বার্থে কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন, তবে তা মুসলিম বিশ্বের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হতো। কিন্তু আফসোস যে খলিফা কখনো সেই তাওফিক পাননি, বরং তার ষড়যন্ত্রগুলো তার নিজের বাগানকেই পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল।

রণকৌশলের পরিবর্তে খেলাধুলার উৎসাহ প্রদান:

তার শাসনামলে একটি বড় দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল যে, মুসলিম সমাজে তরবারি চালনা, নেজাবাজি এবং ঘোড়সওয়ারির মতো যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক খেলাধুলার প্রবণতা কমে গিয়েছিল; কারণ খলিফা নাসিরের মনোযোগ ছিল আমোদ-প্রমোদের দিকে। তিনি গুলতি ছোড়ার অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন। তার দ্বিতীয় শখ ছিল পাখিদের মাধ্যমে মন ভোলানো, বিশেষ করে কবুতর পালনের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। [২]

এই শখগুলোর প্রতি খলিফার আগ্রহের মাত্রা এমন ছিল যে, তিনি “আল-ফুতুওয়াহ” (বীরত্ব) নামে একটি নিয়মিত দল গঠন করেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিজেও খেলোয়াড়দের মতো পোশাক পরতে শুরু করেন যাকে “সারাবিলুল ফুতুওয়াহ” বলা হতো। এরপর তিনি চেষ্টা করেন যাতে যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা এবং বিনোদনমূলক খেলাধুলায় আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি এই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে তিনি আদেশ জারি করেন যে, এই দলের নিয়মিত সদস্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা বা বিনোদনমূলক খেলাধুলা করার অথবা খেলোয়াড়দের পোশাক পরার অনুমতি নেই। এই আদেশের প্রভাব এই হলো যে, যারা কোনো ওজরের কারণে খলিফার দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন না, অথবা খলিফার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রতি যাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, তারা পুরুষোচিত শরীরচর্চা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। যারা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা বা লক্ষ্যভেদের শৌখিন ছিলেন এবং কোনোভাবেই এই শখ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাদের ইরাক ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে হয়েছিল। [৩]

বাগদাদে এক ব্যক্তি অত্যন্ত দক্ষ লক্ষ্যভেদকারী ছিলেন। তাকে খলিফার দলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হলে তিনি দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান। খলিফা দূত পাঠিয়ে তাকে বিপুল পারিশ্রমিকের প্রলোভন দেখান কিন্তু তিনি রাজি হননি। এ নিয়ে কেউ তাকে তিরস্কার করলে তিনি জবাবে বলেন: “আমার জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে, আজ আমি ছাড়া সমস্ত লক্ষ্যভেদকারী খলিফার দলে রয়েছে।” [৪]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৮

[২] এর পাশাপাশি তিনি গুলতি ছোড়া, কবুতর নিয়ে খেলা এবং বাগদাদের ধূর্তদের মতো ফুতুওয়াহর পায়জামা পরার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। (তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৬৬০, ত. দারুল ফিকর)

[৩] মুফাররিজুল কুরুব: ৪/১৬৪ ত. আল-মাতবাতুল আমিরিয়াহ মিসর

[৪] মুফাররিজুল কুরুব: ৪/১৬৫

সংক্ষেপে, ইরাকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী লোকের সংখ্যা কমতে থাকে। এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেছেন: “এসবই ছিল রাষ্ট্রের পতন এবং এর শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পূর্বাভাস।” [১]

রাফেজিদের প্রতি ঘৃণার কারণে উত্তরাধিকারীর পদচ্যুতি ও বন্দিত্ব:

খলিফা নাসিরের উত্তরাধিকারী ছিল তার বড় ছেলে আবু নসর মুহাম্মদ, কিন্তু রাফেজিদের প্রতি তার চরম ঘৃণা ছিল; তাই খলিফা নাসির যখন শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন, তখন তিনি আবু নসর মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করেন এবং তার ছোট ছেলে আবুল হাসান আলীকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, যে শিয়া আকিদা গ্রহণ করেছিল। আবু নসর মুহাম্মদকে কারাগারে কঠোর পরিশ্রম ও যন্ত্রণার মধ্যে রাখা হয়েছিল; কারণ তার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে খলিফা তাকে নিয়ে চরম বিপদের আশঙ্কা করতেন।

কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর কোনো শাসকের হাত নেই। ৬১২ হিজরিতে আবুল হাসান আলী মৃত্যুবরণ করেন, যাতে খলিফা নাসির অত্যন্ত শোকাহত হন। পুরো বাগদাদে তার জন্য শোক পালন করা হয়। ছয় বছর পর্যন্ত খলিফা নাসির দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারের সমস্যা কীভাবে সমাধান করবেন। অবশেষে ৬১৮ হিজরিতে তিনি আবু নসর মুহাম্মদের উত্তরাধিকারের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। [২]

নাসিরের ওপর পক্ষাঘাতের আক্রমণ ও মৃত্যু:

জীবনের শেষ বছরগুলোতে পক্ষাঘাত (ফালজ) আন-নাসিরের পুরো শরীরকে অকেজো করে দিয়েছিল। দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিল। বিছানা থেকে মৌখিক আদেশ জারি করতেন। একজন দাসী আদেশনামা লিখে তাতে মোহর লাগিয়ে দিত। খলিফা পানি পানের ক্ষেত্রে এতটাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তার জন্য বাগদাদ থেকে ২১ মাইল দূরবর্তী একটি বিশেষ স্থান থেকে উন্নত মানের পানি আনা হতো, যা সাতবার ফোটানো হতো, তারপর ঠান্ডা করে পরিবেশন করা হতো। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেষ দিনগুলোতে তিনি পাথুরির (কিডনি স্টোন) রোগে আক্রান্ত হন। বিশ দিন প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে কাটান, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত রাজকীয় চিকিৎসক মূত্রথলি চিরে পাথর বের করেন। কয়েক দিন পর সেই ক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ৭০ বছর বয়সী খলিফা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এটি ২৯ রমজান ৬২২ হিজরির ঘটনা। এই সময়ে প্রাচ্যে তাতারীরা ইসলামি বিশ্বের একটি বড় অংশ দখল করে নিয়েছিল এবং প্রতীচ্যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ চলছিল। [৩]

ক্রুসেড এবং তাতারী আক্রমণ:

ক্রুসেড এবং তাতারী আক্রমণ কেবল ইসলামি ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। খলিফা নাসিরের ৪৭ বছরের শাসনামলে সংঘটিত এই দুটি ছিল অনেক বড় বিপ্লব যা বিশ্বের মানচিত্র বদলে দিয়েছিল। জাতিগতভাবে বহু জাতি এদিক-সেদিক হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধগুলোর সাংস্কৃতিক, তুুুুনি, সামাজিক, নৈতিক এবং আদর্শিক প্রভাব পুরো ভূখণ্ডের ওপর পড়েছিল। [৪]

[১] وكان ذلك كله دليلاً على هرم الدولة وذهاب الملك عن اهلهما بذهاب ملاكها منهم (তারিখ ইবনে খালদুন: ৬৬০/৩)

[২] মুফারিযুল কুরব: ১৬৭/৪, ২২৯/৩

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩১৭ থেকে ৩২৩; আল-কামিল ফিত তারিখ ৬১৬ হিজরি থেকে ৬২৩ হিজরি।

[৪] ক্রুসেড এবং তাতারী আক্রমণের বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ আমরা আতাবেগ, আইয়ুবি এবং খাওয়ারিজম শাহী শাসকদের অবস্থার অধীনে চতুর্থ খণ্ডে করব। যদি কেউ এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিতভাবে দেখতে চান তবে লেখকের রচিত “মুশিরে খাওয়ারিজম সুলতান জালালুদ্দিন” এবং “সালাহউদ্দিন আইয়ুবি” অধ্যয়ন করতে পারেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আজ-জাহির বি-আমরিলাহ

মুহাম্মদ বিন আহমদ আন-নাসির

রমজান ৬২২ হিজরি থেকে রজব ৬২৩ হিজরি

অক্টোবর ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুলাই ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ

খলিফা নাসিরের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ আবু নাসর, আজ-জাহির বি-আমরিলাহ উপাধিতে সিংহাসনে আসীন হন। তিনি ফর্সা বর্ণ ও অত্যন্ত সুশ্রী, শক্তিশালী দেহ এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় তার বয়স ৫২ বছর হয়ে গিয়েছিল। [১]

উত্তম চরিত্রের খলিফা:

যখন তিনি খলিফা হলেন তখন মানুষের ধারণা ছিল যে তিনি সেই সব বিরোধীদের বেছে বেছে হত্যা করবেন যারা তাকে বন্দি করে রেখেছিল। কিন্তু তিনি কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি এবং সবার জন্য দয়া ও অনুগ্রহের হাত প্রসারিত রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরদমাখা হৃদয়ে পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতেন। তার চেহারায় গান্ধীর্ষ ও দুঃখ প্রকাশ পেত। একবার তাকে বলা হলো: “আপনি কেন ভ্রমণে বের হন না?” তিনি উত্তর দিলেন: “বাগান তো উজাড় হয়ে গেছে।” [২] তিনি বলতেন: “যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় দোকান খোলে, সে আর কী লাভ করতে পারে?” [৩]

তিনি সাধারণ মানুষের সাথে খোলামেলাভাবে মেলামেশা করতেন। অথচ পূর্ববর্তী আব্বাসীয় খলিফারা অধিকাংশ সময় পর্দার আড়ালে থাকতেন এবং খুব কমই সাধারণ সমাবেশে দেখা দিতেন। [৪] তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুভাকি, দয়ালু, ইবাদতকারী এবং দুনিয়াবিমুখ মানুষ। আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) বলেন: “যদি বলা হয় যে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর পর এমন উত্তম চরিত্রের আর কোনো খলিফা অতিবাহিত হননি, তবে তা সত্য হবে।” [৫]

তার পূর্বপুরুষরা সরকারি কোষাগারে যে সম্পদ জমা করেছিলেন, তিনি তা দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দেন এবং দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে সবাইকে আপন করে নেন। নিজ পিতার বিপরীতে তিনি ছিলেন সঠিক আকিদার অধিকারী এবং পুরো উম্মতের লাভ-ক্ষতির কথা মাথায় রেখে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি জিহাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মতের ঐক্যের আহ্বানকারী ছিলেন। [৬]

কিন্তু এই উত্তম চরিত্রের মানুষটি শাসনের জন্য মাত্র নয় মাস চব্বিশ দিন সময় পেয়েছিলেন। ১৩ রজব ৬২৩ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। [৭]

যুগ যোগ্য ব্যক্তিদের প্রাপ্য নয়:

আল্লামা ইবনুল আসির বলেন: “যখন আজ-জাহির খলিফা হলেন, তখন যুগের অস্থিরতা এবং সমকালীন মানুষের ফাসাদ দেখে আমার মনে এই আশঙ্কা জাগল যে তার শাসনের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হবে। আর আমি আমার অনেক বন্ধুদের বলেছিলাম: ‘আমার ভয় হচ্ছে যে তার শাসনের সময়কাল সংক্ষিপ্ত হবে; কারণ আমাদের যুগ এবং বর্তমানের মানুষ তার খিলাফতের যোগ্য নয়।’ শেষ পর্যন্ত তাই হলো।” [৮]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২২/২৬৬, আল-সুয়ুতি বলেন: জন্ম ৫৭১ হিজরি। (তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৪৩৪)।

[২] মিরাতুয যামান লিসিবত ইবনুল জাওজি: ২২/২৭৫, দারুল রিসালাহ আল-আলামিয়াহ।

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৪৩৪, মুফাররিজুল কুরুব: ৪/১৬৮।

[৪] মুফাররিজুল কুরুব: ৪/১৭১।

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৪০১, ৬২২ হিজরি, দারুল কিতাব।

[৬] প্রাপ্ত।

[৭] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৪১৩।

[৮] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০/৪১৪, ৬২৩ হিজরি, দারুল কুতুব।

আল-মুস্তানসির বিল্লাহ

মনসুর বিন মুহাম্মদ আল-জাহির

রজব ৬২৩ হিজরি থেকে জুমাদাল আখিরাহ ৬৪০ হিজরি

জুলাই ১২২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ

আল-জাহিরের পর তার পুত্র আবু জাফর মনসুর ‘আল-মুস্তানসির বিল্লাহ’ উপাধি নিয়ে খলিফা হন। সে সময় তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি সচ্চরিত্রবান, নেককার এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানচর্চা ও জনকল্যাণমূলক কাজের অনুরাগী ছিলেন। [১]

বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও হাসপাতাল:

তিনি বাগদাদে ‘আল-মুস্তানসিরিয়া’ নামে একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে হানাফি, মালিকি, শাফেয়ী এবং হাম্বলি ফকিহদের তত্ত্বাবধানে চার ইমামের ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। একইভাবে ইলমে হাদিস, আরবি ভাষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ সেখানে সমবেত ছিলেন, যাদেরকে শায়খুল হাদিস, শায়খুত তিব্ব, শায়খুন নাহ এবং শায়খুল ফারায়েজ ইত্যাদি বলা হতো। জামিয়ার নির্মাণ কাজ ৬২৫ হিজরিতে শুরু হয় এবং ৬৩১ হিজরিতে সমাপ্ত হয়। উলামা, ফকিহ, আমির এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জামিয়াটি উদ্বোধন করা হয়।

মুস্তানসিরিয়া জামিয়ার পাঠাগারটি ছিল অতুলনীয়, যেখানে সারা বিশ্বের অনেক দুর্লভ বই সংরক্ষিত ছিল। ছাত্রদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা বিনামূল্যে ছিল। তাদের খাবারের তালিকায় রুটি ও তরকারি ছাড়াও হালুয়া ও ফলমূল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতিম শিশুদের জন্য আলাদা কোটা নির্ধারিত ছিল, যাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভর্তি করা হতো। মুস্তানসির একটি হাসপাতালও নির্মাণ করেন এবং অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করে বাগদাদকে ঈর্ষণীয় করে তোলেন। [২]

বিশাল সেনাবাহিনী:

তাতারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করেন এবং এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এর আগের তিন শতাব্দীতে বাগদাদে এত বড় সেনাবাহিনী গঠিত হয়নি। [৩]

সত্যনিষ্ঠা:

তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, অহেতুক তোষামোদ পছন্দ করতেন না। এক মজলিসে কোনো এক আলেম তার প্রশংসায় এই কবিতাটি পাঠ করেন:

لَوْ كُنْتُ فِي يَوْمِ السَّقِيْفَةِ حَاضِرًا ... كُنْتُ الْمُقَدَّمُ وَالْإِمَامُ الْأَوْرَعَا

“যদি আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বায়আতের দিন উপস্থিত থাকতেন, তবে আপনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হতো এবং আপনিই মুত্তাকি খলিফা হতেন।” এর ওপর দাউদ বিন আল-মালিক আল-মুয়াজ্জাম নামক এক আমির তৎক্ষণাৎ বললেন: “এটি মিথ্যা। সেদিন আমিরুল মুমিনিনের মহান পূর্বপুরুষ হযরত আব্বাস (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কেই অগ্রাধিকার দিয়ে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।” মুস্তানসির এই সত্য কথাটিকে সমর্থন করেন এবং সেই তোষামোদকারী আলেমকে শাস্তি হিসেবে নির্বাসিত করেন। [৪] ১০ই জুমাদাল আখিরাহ ৬৪০ হিজরিতে মুস্তানসির ইন্তেকাল করেন। [৫]

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৫

[২] মুফাররিজুল কুরুব: ৫/৩১৭

[৩] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৪৬/৪৫৮, ইউসরি সংস্করণ; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৬

[৪] মুফাররিজুল কুরুব: ৯/২০১

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুসতাসিম বিল্লাহ

আবদুল্লাহ বিন মনসুর আল-মুসতানসির

জুমাদাল আখিরা ৬৪০ হিজরি থেকে সফর ৬৫৬ হিজরি

ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্চ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ

মুসতানসিরের পর তার ভাই “খাফাজি” খিলাফতের সর্বোত্তম হকদার ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সেনাপতি এবং বাগদাদ রক্ষার জন্য এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, আমু দরিয়া পার হয়ে তাতারীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু “খাফাজি”-র যোগ্যতার কারণে স্বার্থান্বেষী আমীরগণ শঙ্কিত ছিলেন। দরবারের এই সদস্যরা মুসতানসিরের ৩১ বছর বয়সী পুত্র আবদুল্লাহ আবু আহমদকে খলিফা নিযুক্ত করেন যাতে তার নরম স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তারা নিজেরা শাসন করতে পারে। এভাবে আবু আহমদ “আল-মুসতাসিম বিল্লাহ” উপাধি ধারণ করে খলিফা হন। [১]

দুর্বল শাসক:

মুসতাসিম বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের শেষ প্রদীপ ছিলেন। তিনি তার পিতা ও পিতামহের মতো ধর্মপ্রাণ, কোমল স্বভাবের, দানশীল এবং সচ্চরিত্রবান ছিলেন, কিন্তু সাহস, সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার অভাব ছিল। [২]

নববী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ:

মুসতাসিমের শেষ বছরগুলোতে অনেক আসমানি দুর্যোগ নেমে আসে। ৬৫৪ হিজরিতে মদিনার উপকণ্ঠে সেই আগুন প্রকাশ পায় যার ভবিষ্যদ্বাণী হাদিসে রয়েছে। এই আগুন পাথরকেও জ্বালিয়ে দিত, এর আলো বসরা পর্যন্ত দেখা যেত। [৩]

বাগদাদের পতন - আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান:

মুসতাসিমের শাসনামলে তাতারীরা সবদিকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসতাসিমের চাচা “খাফাজি” আমীরদের ষড়যন্ত্রের কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে আলকামি রাফেজি আব্বাসীয় খিলাফতের উজির ছিলেন। এই গাদ্দার আব্বাসীয় বংশকে মিটিয়ে দিয়ে শিয়া খিলাফতের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তাতারীদের সাথে আঁতাত করেন এবং তাদের বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। অবশেষে মহরম ৬৫৬ হিজরিতে তাতারীরা বাগদাদ আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে দেয়। খলিফা মুসতাসিমকে তার পুরো পরিবারসহ হত্যা করা হয়। এভাবে বাগদাদ খিলাফতের অবসান ঘটে। এই বংশে মোট ৩৭ জন খলিফা অতিবাহিত হয়েছেন। প্রথমজন ছিলেন আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ এবং শেষজন ছিলেন মুসতাসিম। [৪]

ক্রুসেড এবং তাতারীদের আক্রমণ ইসলামি ইতিহাসের দুটি রক্তক্ষয়ী এবং শিক্ষণীয় অধ্যায়, যা আমরা আতাবেগ, আইয়ুবি এবং খাওয়ারিজম শাহী শাসকদের বর্ণনার অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করব। সেখানেই বাগদাদের পতন এবং এর কারণ ও প্রভাব নিয়েও আলোচনা হবে। এখানে আমরা এই পরিস্থিতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি যাতে আব্বাসীয় খলিফাদের আলোচনা একটি ধারাবাহিকতার সাথে সম্পন্ন হয়।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৮

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/১৭৫

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২৩/১৮০, নববী ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন: সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭১১৮, বাব খুরুজুন নার

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬৫৬ হিজরি; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৪২৮, ৪৩২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) — তৃতীয় খণ্ড

আব্বাসীয় খিলাফতের পতন..... শিক্ষা ও উপদেশ

বনু আব্বাসের পতনের যুগে আমরা অনেক খলিফাকেই নেককার ও মুত্তাকী দেখতে পাই, সমাজে উলামা ও সালেহীনদেরও কোনো অভাব ছিল না, তা সত্ত্বেও পতন ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ইসলাম-বিদ্বেষী শক্তিগুলো রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি সফল ইসলামী সরকারের জন্য কেবল শাসকের ইসলাম অনুসরণ বা সমাজে উলামা ও সালেহীনদের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো সাধারণ ধর্মীয় ঝোঁক বা প্রবণতা। যদি এই নির্যাসটি না থাকে তবে ইসলামী সরকার অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়বে। একবার হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: “কী কারণে যে পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে কোনো মতভেদ ছিল না কিন্তু আপনার যুগে মতভেদ সৃষ্টি হলো?” আমীরুল মুমিনীন জবাবে বললেন:

“কারণ আবু বকর ও উমর (রা.) আমার মতো লোকদের ওপর শাসন করেছেন আর আমি তোমার মতো লোকদের ওপর শাসন করছি।” [১]

জানা গেল যে, যদি জনগণের মধ্যে ধর্মীয় নির্যাস দুর্বল হয়ে পড়ে তবে নেককার শাসকও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন না; বরং মানুষ এমন দীনদার শাসকেরই বিরোধী হয়ে যায়। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) এই ধর্মীয় নির্যাস ও ইসলামী ঝোঁককে “আল-ওয়াজি আদ-দ্বীন” নাম দিয়েছেন এবং একেই খুলাফায়ে রাশেদীনের সাফল্যের আসল কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন, তিনি বলেন:

“খুলাফায়ে রাশেদীন এমন এক যুগে ছিলেন যখন রাজতন্ত্রের মেজাজ তৈরি হয়নি এবং সমাজে ধর্মীয় ঝোঁক প্রবল ছিল। তাই মানুষ তাদের ঝোঁক অনুযায়ী খিলাফত কেবল এমন ব্যক্তিদের হাতেই সোপর্দ করেছিল যারা দীনদারীর দিক থেকে সবচেয়ে যোগ্য ছিল এবং অন্য যাদের দৃষ্টি খিলাফতের দিকে ছিল, তাদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।” [২]

এর পরে যখন আমরা বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের যুগ পর্যবেক্ষণ করি, তখন দেখতে পাই যে উমাইয়া যুগে এই ধর্মীয় নির্যাস দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই দুর্বলতা এমন ছিল না যে রাষ্ট্রের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলো মিটে গিয়েছিল; বরং মুসলমানরা তখনও ইসলামের ওপর অটল ছিল এবং জিহাদ করত। আর এই কারণেই বনু আব্বাস ইসলামের সাথে “আর-রিদা মিন আল-মুহাম্মদ” স্লোগান দিয়ে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে সফল হয়েছিল যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে উন্নতির শিখরে ছিল।

তবে এই ধর্মীয় ঝোঁককে গোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। গোত্রীয় অহমিকার কারণে প্রথম হিজরি শতাব্দী শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রবীআহ ও মুদারের দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব গোত্রগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এরপর বনু হাশিমের বিপ্লবী আন্দোলনের সময়...

[১] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ২৬০; তারিখ ইবনে খালদুন, ১ম খণ্ড, দারুল ফিকর।

[২] “তাদের অবস্থা সেই হানিফদের (একনিষ্ঠদের) মতো ছিল না, কারণ তারা এমন এক সময়ে ছিল যখন রাজতন্ত্রের প্রকৃতি প্রকাশ পায়নি এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল, ফলে প্রত্যেকে নিজের নফসের ওপর নিজেই নিয়ন্ত্রক ছিল। তাই তারা খিলাফতের দায়িত্ব কেবল তাদেরই দিয়েছিল যাদের দীন পছন্দ করে এবং অন্যদের তুলনায় তাদেরই অগ্রাধিকার দিয়েছিল।” (মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃ. ২৬৩; তারিখ ইবনে খালদুন, ১ম খণ্ড, দারুল ফিকর)।

উমাইয়া ও হাশেমীদের বিরোধ আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং উম্মত আরও খণ্ডিত হয়ে যায়। কিছু লোক শাসক পরিবার অর্থাৎ বনু উমাইয়ার সমর্থক ছিল এবং কিছু লোক তাদের বিরোধী বনু হাশেমের সাথে ছিল। এরপর বনু আব্বাসের শাসন এলে খোদ বনু হাশেমের মধ্যেই আলভী ও আব্বাসীদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং বনু আব্বাসের শাসন মেনে না নেওয়া ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক বিদ্রোহের আন্দোলন শুরু হয়। এভাবে ধর্মীয় পটভূমিতে ব্যক্তিগত ও বংশীয় গোষ্ঠীপ্রীতি প্রবল হয়ে ওঠে যা উম্মতের মেজাজকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে সংস্কারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে এবং পতনের যুগ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

•

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে উম্মতের ঐক্য “ইসলামী রুহ” থেকে সৃষ্টি হয়। এই রুহ দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই ঐক্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই রুহ শেষ হয়ে গেলে ঐক্যও শেষ হয়ে যায়। উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু এর জন্য কেবল প্রস্তাবনা, দাবি, সভা ও মিছিল যথেষ্ট নয়; বরং এই ঐক্য তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন সমাজে বড় আকারে ধর্মীয় চেতনার প্রাধান্য ঘটবে। ধর্মীয় প্রবণতা ও সমাজের সংস্কারের মাধ্যমেই তা সৃষ্টি হবে এবং সমাজের সংস্কার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও মানসিক গঠনের মাধ্যমে হয়।

•

উম্মতের ঐক্য বলা একটি শব্দ মাত্র, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি দীর্ঘ সফর। কেবল স্লোগান দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, বরং এর জন্য পদে পদে ত্যাগ ও কুরবানি প্রদর্শন করতে হবে। ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও খ্যাতির মোহ ত্যাগ করতে হবে। নিজের মতামত, নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং নিজের স্বার্থকে বারবার বিসর্জন দিতে হবে। যখন একটি বড় সংখ্যা এই স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন কোনো স্লোগান ছাড়াই ঐক্যের পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করবে।

•

সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং ক্ষমতার পালাবদলের পরিবর্তন একে অপরের পরিপূরক। পরিস্থিতির বিচারে কখনো প্রথমে উপরিস্তরে পরিবর্তন আসে এবং এর প্রভাব ধীরে ধীরে নিচে সঞ্চারিত হয়। কখনো এমন হয় যে প্রথমে সমাজে পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর এর প্রভাব ক্ষমতার উচ্চস্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

সাধারণত বলা হয়: “النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ” (মানুষ তাদের শাসকদের ধর্মের অনুসারী হয়)। ইতিহাসের অনেক যুগে এই কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কায়সার ও কিসরা এবং পরে বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের যুগে আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাই। শাসক শ্রেণী সাধারণত তাদের বিশ্বাসগত, তাত্ত্বিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিচে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে। কোথাও জুলুম ও জবরদস্তির মাধ্যমে এবং কোথাও প্রলোভন ও মন জয়ের মাধ্যমে। জুলুম ও জবরদস্তির প্রচেষ্টা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়, যেখানে প্রলোভন প্রায়শই কার্যকর হয়। বনু উবাইদ শিয়া প্রভাব প্রচারের জন্য অত্যন্ত কঠোরতা ও নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল; তাই তাদের দাওয়াত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেনি এবং তিন শতাব্দী পর্যন্ত শাসন থাকা সত্ত্বেও তাদের পতনের সাথে সাথেই মরক্কো থেকে মিশর পর্যন্ত পুনরায় আহলে সুন্নাহের নিদর্শনগুলো জীবিত হয়ে ওঠে। বনু বুওয়াইহ রাজনৈতিক চালবাজি এবং জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল; তাই তাদের যুগে ইসনা আশারিয়া মতবাদের যে প্রচার ঘটেছিল, তার প্রভাব কয়েক শতাব্দী পরেও অবশিষ্ট রয়েছে।

• এই বিশ্লেষণ করা খুব একটা কঠিন নয় যে অতীতের কোন যুগে উপর থেকে নিচের স্তরে বিপ্লব এসেছে এবং কখন ও কীভাবে?

...প্রভাবিত করেছে। কিন্তু নিজের সময় সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে যে, আজ কোন পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর হবে। তবে ইতিহাস অধ্যয়ন এই সমস্যাকে সহজ করে দেয়। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের সময়ের পরিস্থিতির তুলনা অতীতের সমাজগুলোর সাথে করতে পারি। বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন যুগে সফল বা ব্যর্থ হওয়া আন্দোলনগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারি। তবে এটি জরুরি যে, আমরা এই তুলনা ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং স্বভাবজাত প্রবণতাকে একপাশে রেখে পূর্ণ সচেতনতার সাথে এবং একদম ঠান্ডা মাথায় করি। অন্যথায় সম্ভব যে, কোনো সুধারণা বা ভুল ধারণার শিকার হয়ে আমরা অতীতের এমন কোনো আন্দোলনের অনুকরণ শুরু করে দিই যা প্রকৃতপক্ষে আজকের চেয়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে সফল হয়েছিল। যদি আমাদের তুলনা ভুল হয় তবে আমাদের সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপও ভুল হবে এবং এমন অবস্থায় আমাদের অবশ্যই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে।

ইতিহাস অধ্যয়ন বলে যে, যদি মন্দ এমন পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই এতে লিপ্ত হয়, তবে সংস্কারের প্রচেষ্টা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করা কার্যকর হয়। সমাজে সাধারণ পরিবর্তন আসার পরেই রাজনীতির সংস্কার সম্ভব হয়। যদি দেখা যায় তবে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচেষ্টা এমন এক যুগেই হয়েছিল যখন চারদিকে গোমরাহির রাজত্ব ছিল। ফলে এই দাওয়াতের সূচনা সমাজে তৃণমূল পর্যায়ে মেহনত এবং ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে হয়েছিল।

হ্যাঁ, যদি মন্দ ও ভালোর অনুপাত কাছাকাছি হয় তবে শক্তির মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করা যেতে পারে। সুতরাং যদি শক্তি অর্জনের মাধ্যমগুলো হাতের নাগালে থাকে এবং সফলতার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তবে রাজনৈতিক পর্যায়ে পরিবর্তন এনে মন্দ দূর করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। এই পরিবর্তন একটি অস্ত্রোপচারের মতো হয় যার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অপারেশনের জন্য সবসময় সার্জনের প্রয়োজন হয়। যদি কোনো আনাড়ি এই কাজ করে তবে সম্ভব যে রোগীর অবস্থা আগের চেয়েও বেশি খারাপ হয়ে যাবে এবং এটিও সম্ভব যে সে আর বেঁচে ফিরবে না।

কুদরতে ইলাহিয়ার একটি নিয়ম রয়েছে যার ওপর ইতিহাসের হাজারো সাক্ষ্য বিদ্যমান, তা হলো যাকে যা কিছু দেওয়া হয়, তা তার ধারণক্ষমতা, যোগ্যতা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী দেওয়া হয়। যার থেকে যা কেড়ে নেওয়া হয় তা তার হীনম্মন্যতা এবং খারাপ যোগ্যতার কারণে কেড়ে নেওয়া হয়। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে বনু আব্বাসের রাজনৈতিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বনু বুওয়াইহ এবং বনু উবাইদ রাজ্য জয়ের পাঠ শিখে নিয়েছিল। ফলে বনু আব্বাস সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এবং খেলাফতের আসনে আসীন থেকেও দাসে পরিণত হলো। বনু বুওয়াইহ এবং বনু উবাইদ শিয়া সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শাসন করতে থাকল।

ইতিহাস বলে যে, যখন আল্লাহর নেয়ামতের নাশুকরি করা হয়েছে তখন আল্লাহ দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শত্রুদের আধিপত্য এবং পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের আজাব চাপিয়ে দিয়েছেন। এই পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী খোদ কালামুল্লাহতে বিদ্যমান রয়েছে:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“আর আল্লাহ এক জনপদের উদাহরণ বর্ণনা করেছেন যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত এবং সেই জনপদের জন্য রিজিক আসত প্রচুর পরিমাণে...”

তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

আদর্শগুলো প্রভাবশালীদের প্রভাবিত করেছে। কিন্তু নিজের যুগের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন হয়ে যায় যে আজ কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকর হবে। তবে ইতিহাসের অধ্যয়ন এই সমস্যাতে সহজ করে দেয়। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা নিজেদের যুগের অবস্থাকে অতীতের সমাজগুলোর সাথে তুলনা করতে পারি। বিচিত্র অবস্থা এবং বিভিন্ন সময়ে সফল বা ব্যর্থ হওয়া আন্দোলনগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারি। তবে এটি জরুরি যে আমরা এই তুলনা ব্যক্তিগত ঝোঁক, প্রবণতা এবং আবেগীয় মানসিকতাকে দূরে রেখে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং একেবারে ঠান্ডা মাথায় ও হৃদয়ে করি। অন্যথায় সম্ভব যে কারো খুশি বা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে আমরা অতীতের এমন কোনো আন্দোলনের অনুকরণ শুরু করে দিই যা প্রকৃতপক্ষে আজকের চেয়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে সফল হয়েছিল। যদি আমাদের তুলনা ভুল হয় তবে আমাদের সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপও ভুল হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিতভাবে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে।

ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের বলে যে যদি মন্দ এই মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই এতে লিপ্ত হয়, তবে সংস্কারের চেষ্টা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করা কার্যকর হয়। সমাজে সাধারণ পরিবর্তন আসার পরেই রাজনীতির সংস্কার সম্ভব হয়। যদি দেখা যায় তবে রহমতে আলম (সা.)-এর চেষ্টা এমন এক যুগেই হয়েছিল যখন চারদিকে গোমরাহির রাজত্ব ছিল। ফলে তাঁর দাওয়াতের সূচনা সমাজে তৃণমূল পর্যায়ে মেহনত এবং ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমেই হয়েছিল।

হ্যাঁ, যদি মন্দ এবং ভালোর অনুপাত কাছাকাছি হয় তবে শক্তির মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করা যেতে পারে। সুতরাং যদি শক্তি অর্জনের উপায় আয়ত্তে থাকে এবং সফলতার সম্ভাবনা প্রবল হয়, তবে রাজনৈতিক পর্যায়ে পরিবর্তন এনে মন্দ দূর করার চেষ্টা সফল হতে পারে। এই পরিবর্তন একটি অস্ত্রোপচারের মতো হয়, যার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ দূষিত পদার্থ বের করে দেওয়া হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে অপারেশনের জন্য সবসময় সার্জনের প্রয়োজন হয়। যদি কোনো আনাড়ি এই কাজ করে তবে সম্ভব যে রোগীর অবস্থা আগের চেয়েও বেশি খারাপ হয়ে যাবে এবং এমনকি সে বাঁচতেও পারবে না।

কুদরতে ইলাহির একটি নিয়ম আছে যার ওপর ইতিহাসের হাজারো সাক্ষ্য বিদ্যমান; তা হলো এই যে, যে যা পায় তা তার যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং মেধার ভিত্তিতে পায়। যার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা তার নীচতা এবং অযোগ্যতার কারণে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে বনু আব্বাসের রাজনৈতিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বনু বুওয়াইহ এবং বনু সেলজুক রাজ্য শাসনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। ফলে বনু আব্বাস কেবল হকের অধিকারী হয়ে এবং খেলাফতের মসনদে আসীন থেকে গোলাম হয়ে গেল। বনু বুওয়াইহ এবং বনু ওবায়দ শিয়া সংখ্যালঘু হয়েও সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর শাসন করতে থাকল।

ইতিহাস বলে যে যখন আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করা হয়, তখন আল্লাহ দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শত্রুদের আধিপত্য এবং পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের আজাব চাপিয়ে দেন। এই পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং কালামুল্লাহতে বিদ্যমান রয়েছে:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

“আর আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ বর্ণনা করেছেন যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত এবং সেই জনপদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রিজিক আসত”

সব দিক থেকে, অতঃপর সে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করল, ফলে আল্লাহ তাকে তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাকের স্বাদ আস্বাদন করালেন। [১]

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۚ انظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

“হে নবী! তাদের বলুন যে, আল্লাহ তাআলা এর ওপর সক্ষম যে (তোমাদের নাফরমানির কারণে) তোমাদের ওপর আজাব পাঠাবেন তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে, অথবা (তঁার কোনো আজাব পাঠানোর প্রয়োজনই হবে না বরং) তিনি তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে একে অপরের সাথে লড়িয়ে দেবেন, অতঃপর তোমাদের এককে অপরের লড়াইয়ের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। হে নবী! দেখুন আমি কীভাবে আমার আয়াতসমূহ বারবার বর্ণনা করি যাতে তারা বিষয়টি বুঝতে পারে।” [২]

বনু আব্বাসের পতনের যুগে এবং আজ আমাদের নিজেদের অবস্থায় আমরা এই আসমানি আজাবসমূহের ঝলক জায়গায় জায়গায় দেখতে পাই।

ইতিহাসের একটি শিক্ষা এটিও যে, যে সকল ব্যক্তি, যে সকল সমাজ এবং যে সকল দেশ দেওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তারা যোগ্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে উপকার পৌঁছানোর স্তরে পৌঁছে যায়, তারাই বিশিষ্ট মর্যাদায় টিকে থাকে এবং বিজয়ী থাকে, চাই এই উপকার পৌঁছানো দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবি।

এর বিপরীতে যে সকল ব্যক্তি, যে সকল সমাজ এবং যে সকল দেশ দ্বীনি দিক থেকেও উপকারী থাকে না আর দুনিয়াবি দিক থেকেও নয়, বরং তারা কেবল গ্রহণের ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তারা তাদের উপকার পৌঁছানোর দিকটি হারিয়ে ফেলে এবং খুব দ্রুত ভুল অক্ষরের মতো মুছে যায়। আল্লাহর আইন হলো, যে জিনিস উপকারী হবে তা টিকে থাকবে, আর যে জিনিস অকেজো হবে তা ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ প্রশস্ততা অনুযায়ী প্রবাহিত হলো, এরপর পানির স্রোত উপরিভাগে ভেসে ওঠা ফেনা তুলে নিল। আর সেই সকল ধাতু যেগুলোকে তারা আগুনের মধ্যে উত্তপ্ত করে যাতে সেই ধাতুগুলোর মাধ্যমে কিছু অলঙ্কার বা অন্য কিছু আসবাবপত্র লাভ করতে পারে, সেগুলোর ওপরও অনুরূপ ফেনা (মরিচা) চলে আসে। এভাবেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা সত্য ও মিথ্যা বর্ণনা করেন। অতঃপর সেই যে ফেনা, তা তো শুকিয়ে উড়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসার মতো জিনিস, তা জমিনের ভেতর বাকি থাকে। নিশ্চয়ই মিথ্যা তো মিটে যাওয়ার জন্যই। এভাবেই আল্লাহ তাআলা উদাহরণসমূহ বর্ণনা করছেন।” [৩]

[১] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১২

[২] সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৬৫

[৩] সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

উম্মতে মুহাম্মদীকে শেষ উম্মত হিসেবে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। এটাই এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে, তারা সারা বিশ্বকে উপকৃত করবে। দ্বীন ও দুনিয়াতে তাদের পথপ্রদর্শন করবে। তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, কুফর, শিরক, জুলুম-অত্যাচার এবং চারিত্রিক অবক্ষয় ও নির্লজ্জতার পরিবেশ থেকে বের করে ঈমান ও ইয়াকীন, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার এবং শরাফত ও হায়া-শরমের পরিবেশে নিয়ে আসবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“(হে মুসলমানরা!) তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে (যেহেতু) তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো আর আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো।” [১]

যতক্ষণ এই উম্মত এই দায়িত্ব পালন করেছে এবং নিজেদেরকে মানবতার জন্য কল্যাণকর প্রমাণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিজয়ী রেখেছেন। যতক্ষণ তারা দাওয়াতে ইসলাম দিতে থেকেছে, ইলম ছড়িয়েছে এবং সত্য ও ন্যায়ের পতাকা উড্ডীন রেখেছে, দুনিয়া তাদের পেছনে ছিল। কিন্তু যখন তারা এই উচ্চতর লক্ষ্য থেকে গাফেল হয়ে সাধারণ জাতিগুলোর মতো কেবল খাওয়া-দাওয়া, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে গেল, তখন তাদের জনকল্যাণের দিকটি বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হলো।

- ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের বলে যে, শেষ যমানার নবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার কারণে মুসলমানদের ওপর আল্লাহর রহমত সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা তাদেরকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুযোগ প্রদান করে চলেছে। হ্যাঁ! যদি মুসলমানরা নিজেরাই তাঁর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর আযাবকে দাওয়াত দেয়, তবে তা তাদের নিজেদের দুর্ভাগ্য ছিল।
- ইতিহাসের এই পাতাগুলো বলে যে, মুসলমানদের মধ্যে সাহসী, সঠিক মতের অধিকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উৎসর্গকারী ব্যক্তিদের অভাব কোনো যুগেই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি দল সর্বদা দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছে এবং কোনো জালিমের জুলুম বা ভয় তাদেরকে দাওয়াতে হক এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। [২]
- ইতিহাস বলে যে, মুসলমানরা ডুবে ডুবে আবার ভেসে উঠেছে। তারা কখনো স্থায়ীভাবে পরাজিত হয়নি। যদি এক ময়দানে পরাজিত হয়েছে, তবে খুব শীঘ্রই অন্য ময়দানে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে আবির্ভূত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়ার বরকতে কোনো শত্রু তাদের ওপর এমন বিজয় লাভ করতে পারেনি যা ইসলাম ও ইসলামের সন্তানদের তাওহীদকে পুরোপুরি মিটিয়ে দেবে। [৩] এ কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন অবশিষ্ট থাকবে।
- ইতিহাসের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো এই দুনিয়া নশ্বর, আর চিরস্থায়ী সত্তা কেবল এক আল্লাহর। ইতিহাসে বর্ণিত কোনো ভালো বা মন্দ ব্যক্তিত্ব কি এমন আছে যে আজ পর্যন্ত জীবিত আছে? কোনো ব্যক্তিত্বই মৃত্যু থেকে রেহাই পায়নি। তাই প্রয়োজন হলো নিজের প্রস্থানের সময়ের কথা স্মরণ করা এবং এর আগে এমন কাজ করে যাওয়া যা স্রষ্টার সন্তুষ্টি, সৃষ্টির দোয়া এবং আখেরাতে সাফল্যের মাধ্যম হতে পারে।

[১] সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১১০

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৫০৫৯

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৭৪৪০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বনু আব্বাসীয় খলিফাদের তালিকা..... খলিফাদের শুরু ও শেষ

নম্বর খলিফা শাসনকালের শুরু ও শেষ পরিণতি

১ আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ১২ রবিউল আউয়াল ১৩২ হি. থেকে ১৩ জিলহজ ১৩৬ হি. (১১ অক্টোবর ৭৪৯ খ্রি. থেকে ১৯ জুন ৭৫৪ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

২ আবু জাফর আল-মানসুর ১৩ জিলহজ ১৩৬ হি. থেকে ৬ জিলহজ ১৫৮ হি. (১৯ জুন ৭৫৪ খ্রি. থেকে ১৮ অক্টোবর ৭৭৫ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

৩ আল-মাহদী ৬ জিলহজ ১৫৮ হি. থেকে ২২ মহররম ১৬৯ হি. (১৮ অক্টোবর ৭৭৫ খ্রি. থেকে ১৫ আগস্ট ৭৮৫ খ্রি.) শিকার করার সময় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন

৪ আল-হাদী ২২ মহররম ১৬৯ হি. থেকে ১৫ রবিউল আউয়াল ১৭০ হি. (১৫ আগস্ট ৭৮৫ খ্রি. থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রি.) হঠাৎ রহস্যজনক মৃত্যু

৫ হারুনুর রশিদ ১৫ রবিউল আউয়াল ১৭০ হি. থেকে ৩ জমাদিউল আখিরা ১৯৩ হি. (২৬ সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রি. থেকে ৫ এপ্রিল ৮০৯ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

৬ আমিনুর রশিদ জমাদিউল আখিরা ১৯৩ হিজরির মাঝামাঝি থেকে ২৫ মহররম ১৯৮ হি. (৮০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ৭ অক্টোবর ৮১৩ খ্রি.) নিহত হন

৭ মামুনুর রশিদ ২৫ মহররম ১৯৮ হি. থেকে ১৮ রজব ২১৮ হি. (৭ অক্টোবর ৮১৩ খ্রি. থেকে ২০ আগস্ট ৮৩৩ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

৮ মুতাসিম বিল্লাহ ১৮ রজব ২১৮ হি. থেকে ১৮ রবিউল আউয়াল ২২৭ হি. (২০ আগস্ট ৮৩৩ খ্রি. থেকে ১৮ ডিসেম্বর ৮৪১ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

৯ ওয়াসিক বিল্লাহ ১৮ রবিউল আউয়াল ২২৭ হি. থেকে ২৩ জিলহজ ২৩২ হি. (১৮ ডিসেম্বর ৮৪১ খ্রি. থেকে ২২ আগস্ট ৮৪৭ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু

১০ মুতাওয়াঙ্কিল আল্লাহ ২৩ জিলহজ ২৩২ হি. থেকে ৫ শাওয়াল ২৪৭ হি. (২২ আগস্ট ৮৪৭ খ্রি. থেকে ২৩ ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রি.) নিহত হন

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (তৃতীয় খণ্ড)

১১. আল-মুনতাসির ৫ শাওয়াল ২৪৭ হি. থেকে ৫ রবিউল আখের ২৪৮ হি. / ২৪ ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রি. থেকে ২০ মে ৮৬২ খ্রি. বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

১২. আল-মুসতাইন ৫ রবিউল আখের ২৪৮ হি. থেকে ৩ মহররম ২৫২ হি. / ২০ মে ৮৬২ খ্রি. থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ৮৬৬ খ্রি. পদচ্যুত করার পর হত্যা করা হয়েছে।

১৩. আল-মুতাজ ৪ মহররম ২৫২ হি. থেকে ২৮ রজব ২৫৫ হি. / ৬ ফেব্রুয়ারি ৮৬৬ খ্রি. থেকে ২৩ জুলাই ৮৬৯ খ্রি. গরম ও ঠান্ডার মাধ্যমে (নির্যাতন করে) হত্যা করা হয়েছে।

১৪. আল-মুহতাদি ২৮ রজব ২৫৫ হি. থেকে ১৬ রজব ২৫৬ হি. / ২৩ জুলাই ৮৬৯ খ্রি. থেকে ১ জুলাই ৮৭০ খ্রি. হত্যা করা হয়েছে।

১৫. আল-মুতামিদ ১৬ রজব ২৫৬ হি. থেকে মহররম ২৭৯ হিজরির শেষ পর্যন্ত / ১ জুলাই ৮৭০ খ্রি. থেকে মার্চ ৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন।

১৬. আল-মুতাদিদ মহররম ২৭৯ হিজরির শেষ থেকে ২২ রবিউল আখের ২৮৯ হি. / মার্চ ৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষ থেকে ১৬ এপ্রিল ৯০২ খ্রি. স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৭. আল-মুকতাবি ২২ রবিউল আখের ২৮৯ হি. থেকে ১২ জিলকদ ২৯৫ হি. / ১৬ এপ্রিল ৯০২ খ্রি. থেকে ১৩ আগস্ট ৯০৮ খ্রি. স্বাভাবিক মৃত্যু।

১৮. আল-মুকতাদির ১২ জিলকদ ২৯৫ হি. থেকে ২৭ শাওয়াল ৩২০ হি. / ১৩ আগস্ট ৯০৮ খ্রি. থেকে ৩১ নভেম্বর ৯৩২ খ্রি. হত্যা করা হয়েছে।

১৯. আল-কাহির ২৭ শাওয়াল ৩২০ হি. থেকে ৬ জমাদিউল আখের ৩২২ হি. / ৩১ নভেম্বর ৯৩২ খ্রি. থেকে ৩ জুন ৯৩৪ খ্রি. পদচ্যুত করে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

২০. আর-রাজি ৬ জমাদিউল আখের ৩২২ হি. থেকে ১৫ রবিউল আউয়াল ৩২৯ হি. / ৩ জুন ৯৩৪ খ্রি. থেকে ২০ ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি. স্বাভাবিক মৃত্যু।

২১. আল-মুত্তাকি ১৫ রবিউল আউয়াল ৩২৯ হি. থেকে ৪ সফর ৩৩৩ হি. / ২০ ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি. থেকে ২৭ অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি. পদচ্যুত করে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

২২. আল-মুসতাকফি ৪ সফর ৩৩৩ হি. থেকে ২২ জমাদিউল আখের ৩৩৪ হি. / ২৭ অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি. থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ৯৪৬ খ্রি. পদচ্যুত করে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

২৩. আল-মুতি ২২ জমাদিউল আখের ৩৩৪ হি. থেকে ১৩ জিলকদ ৩৬৩ হি. / ২৯ ফেব্রুয়ারি ৯৪৬ খ্রি. থেকে ৭ আগস্ট ৯৭৪ খ্রি. পদত্যাগ করেছেন।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

২৪ আত-তাই ১৩ জিলকদ ৩৬৩ হিজরী থেকে ৯ শাবান ৩৮১ হিজরী (৭ আগস্ট ৯৭৪ খ্রি. থেকে ৩০ নভেম্বর ৯৯১ খ্রি.) পদচ্যুত করে প্রাসাদে নজরবন্দি করা হয়েছিল।

২৫ আল-কাদির ৯ শাবান ৩৮১ হিজরী থেকে ১১ জিলহজ ৪২২ হিজরী (৩০ নভেম্বর ৯৯১ খ্রি. থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১০৩১ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

২৬ আল-কায়েম ১১ জিলহজ ৪২২ হিজরী থেকে ১৩ শাবান ৪৬৭ হিজরী (২৯ ডিসেম্বর ১০৩১ খ্রি. থেকে ২ এপ্রিল ১০৭৫ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

২৭ আল-মুক্তাদি ১৩ শাবান ৪৬৭ হিজরী থেকে ১৪ মহররম ৪৮৭ হিজরী (২ এপ্রিল ১০৭৫ খ্রি. থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

২৮ আল-মুসতাজহির ১৪ মহররম ৪৮৭ হিজরী থেকে ১৬ রবিউস সানি ৫১২ হিজরী (১৯ ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রি. থেকে ১৯ আগস্ট ১১১৮ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

২৯ আল-মুসতারশিদ ১৬ রবিউস সানি ৫১২ হিজরী থেকে ১৭ জিলকদ ৫২৯ হিজরী (১৯ আগস্ট ১১১৮ খ্রি. থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১১৩৫ খ্রি.) হত্যা করা হয়েছিল।

৩০ আর-রাশিদ ১৭ জিলকদ ৫২৯ হিজরী থেকে ১৬ জিলকদ ৫৩০ হিজরী (১০ সেপ্টেম্বর ১১৩৫ খ্রি. থেকে ২৮ আগস্ট ১১৩৬ খ্রি.) হত্যা করা হয়েছিল।

৩১ আল-মুক্তাফি ১৬ জিলকদ ৫৩০ হিজরী থেকে ২ রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরী (২৮ আগস্ট ১১৩৬ খ্রি. থেকে ২৩ মার্চ ১১৬০ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

৩২ আল-মুসতানজিদ ২ রবিউল আউয়াল ৫৫৫ হিজরী থেকে ৮ রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরী (২৩ মার্চ ১১৬০ খ্রি. থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

৩৩ আল-মুসতাদি ৮ রবিউস সানি ৫৬৬ হিজরী থেকে ২৯ শাওয়াল ৫৭৫ হিজরী (৩০ ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি. থেকে ১৯ এপ্রিল ১১৮০ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

৩৪ আন-নাসির ২৯ শাওয়াল ৫৭৫ হিজরী থেকে ২৯ রমজান ৬২২ হিজরী (১৯ এপ্রিল ১১৮০ খ্রি. থেকে ১৬ অক্টোবর ১২২৫ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

৩৫ আজ-জাহির ২৯ রমজান ৬২২ হিজরী থেকে ১৩ রজব ৬২৩ হিজরী (১৬ অক্টোবর ১২২৫ খ্রি. থেকে ২৩ জুলাই ১২২৬ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

৩৬ আল-মুসতানসির ১৩ রজব ৬২৩ হিজরী থেকে ১০ জমাদিউল আখিরা ৬৪০ হিজরী (২৩ জুলাই ১২২৬ খ্রি. থেকে ৫ ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রি.) স্বাভাবিক মৃত্যু।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আল-মুসতাসিম (১০ জুমাদাল আখিরা ৬৪০ হি. থেকে ১৪ সফর ৬৫৬ হি. / ৭ ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রি. থেকে ৩ মার্চ ১২৫৮ খ্রি.) হত্যা করা হয়েছে।

বনু আব্বাসীয় খলিফাদের তালিকা - বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা

উত্থান যুগের দশজন খলিফা

নম্বর | খলিফা | শাসনকাল | চরিত্র | বিশেষ বিপ্লব

- ১. আবুল আব্বাস সাফফাহ | ১৩২ হি. থেকে ১৩৬ হি. / ৭৪৯ খ্রি. থেকে ৭৫৪ খ্রি. | কঠোর, দানশীল | আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা
- ২. আবু জাফর আল-মনসুর | ১৩৬ হি. থেকে ১৫৮ হি. / ৭৫৪ খ্রি. থেকে ৭৭৫ খ্রি. | কঠোর, মিতব্যয়ী | বিদ্রোহীদের দমন
- ৩. আল-মাহদী | ১৫৮ হি. থেকে ১৬৯ হি. / ৭৭৫ খ্রি. থেকে ৭৮৫ খ্রি. | সচ্চরিত্র, দানশীল, কোমল | যিন্দিকদের নির্মূল
- ৪. আল-হাদী | ১৬৯ হি. থেকে ১৭০ হি. / ৭৮৫ খ্রি. থেকে ৭৮৬ খ্রি. | কঠোর মেজাজ | বারমাকিদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে
- ৫. হারুনুর রশীদ | ১৭০ হি. থেকে ১৯৩ হি. / ৭৮৬ খ্রি. থেকে ৮০৯ খ্রি. | নেককার, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, দাতা | আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনা
- ৬. আমিনুর রশীদ | ১৯৩ হি. থেকে ১৯৮ হি. / ৮০৯ খ্রি. থেকে ৮১৩ খ্রি. | নেককার, উচ্চ বংশীয়, অবুঝ | দেশ বিভাজন, বাগদাদে দাঙ্গা
- ৭. মামুনুর রশীদ | ১৯৮ হি. থেকে ২১৮ হি. / ৮১৩ খ্রি. থেকে ৮৩৩ খ্রি. | বুদ্ধিমান, জ্ঞানানুরাগী, ভ্রান্ত চিন্তাধারা | শিয়া মতবাদ ও মুতাজিলা মতবাদের প্রসার
- ৮. মুতাসিম বিল্লাহ | ২১৮ হি. থেকে ২২৭ হি. / ৮৩৩ খ্রি. থেকে ৮৪১ খ্রি. | নিরক্ষর, সাহসী, যোদ্ধা | তুর্কিদের উত্থান, রোম অভিযান
- ৯. ওয়াসিক বিল্লাহ | ২২৭ হি. থেকে ২৩২ হি. / ৮৪১ খ্রি. থেকে ৮৪৭ খ্রি. | নেক স্বভাব, মুতাজিলা | শেষ জীবনে মুতাজিলা মতবাদ থেকে তওবা করেছেন

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

১০. মুতাওয়াঙ্কিল আলাল্লাহ | ২৩২হি. থেকে ২৪৭হি. / ৮৪৭খ্রি. থেকে ৮৬১খ্রি. |
সুন্নাতের অনুরাগী | সুন্নাতের পুনর্জাগরণ

পতনের যুগের ২৭ জন খলিফা

নম্বর খলিফা শাসনকাল চরিত্র বিশেষ ঘটনা ও বিপ্লব

১ আল-মুনতাসির ২৪৭হি. থেকে ২৪৮হি. / ৮৬১খ্রি. থেকে ৮৬২খ্রি. দুর্বল, হঠকারী
তুর্কিদের আধিপত্য - খলিফারা ক্ষমতাহীন

২ আল-মুসতাসিন ২৪৮হি. থেকে ২৫২হি. / ৮৬২খ্রি. থেকে ৮৬৬খ্রি. দুর্বল, সচ্চরিত্র

৩ আল-মুতায ২৫২হি. থেকে ২৫৫হি. / ৮৬৬খ্রি. থেকে ৮৬৯খ্রি. দুর্বল, অসচ্চরিত্র
খোরাসানে সাফারি রাজবংশ এবং মিশরে তুলুনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

৪ আল-মুহতাদী ২৫৫হি. থেকে ২৫৬হি. / ৮৬৯খ্রি. থেকে ৮৭০খ্রি. নেককার ও বুদ্ধিমান

৫ আল-মুতামিদ ২৫৬হি. থেকে ২৭৯হি. / ৮৭০খ্রি. থেকে ৮৯২খ্রি. অত্যন্ত দুর্বল,
ক্ষমতাহীন মধ্য এশিয়ায় সামানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

৬ আল-মুতাদিদ ২৭৯হি. থেকে ২৮৯হি. / ৮৯২খ্রি. থেকে ৯০২খ্রি. শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান
খিলাফতের শান-শওকত পুনরুদ্ধার

৭ আল-মুকতাবী ২৮৯হি. থেকে ২৯৫হি. / ৯০২খ্রি. থেকে ৯০৮খ্রি. নেককার ও মুত্তাকী

৮ আল-মুকতাদির ২৯৫হি. থেকে ৩২০হি. / ৯০৮খ্রি. থেকে ৯৩২খ্রি. অত্যন্ত দুর্বল,
ক্ষমতাহীন খিলাফত পুনরায় দুর্বল হয়ে পড়ে - নারীরা সরকারি বিষয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে

৯ আল-কাহির ৩২০হি. থেকে ৩২২হি. / ৯৩২খ্রি. থেকে ৯৩৪খ্রি. সহিংসতাপ্রিয়, জালিম
ও জবরদস্তিকারী

১০ আর-রাযী ৩২২হি. থেকে ৩২৯হি. / ৯৩৪খ্রি. থেকে ৯৪০খ্রি. দুর্বল, ক্ষমতাহীন

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

১১. আল-মুত্তাকী ৩২৯ হি. থেকে ৩৩৩ হি. / ৯৪০ খ্রি. থেকে ৯৪৪ খ্রি. দুর্বল, ক্ষমতাহীন
১২. আল-মুস্তাকফী ৩৩৩ হি. থেকে ৩৩৪ হি. / ৯৪৪ খ্রি. থেকে ৯৪৬ খ্রি. দুর্বল, ক্ষমতাহীন; বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্য
১৩. আল-মুতি' ৩৩৪ হি. থেকে ৩৬৩ হি. / ৯৪৬ খ্রি. থেকে ৯৭৪ খ্রি. দুর্বল, ক্ষমতাহীন
১৪. আত-তাই' ৩৬৩ হি. থেকে ৩৮১ হি. / ৯৭৪ খ্রি. থেকে ৯৯১ খ্রি. দুর্বল, ক্ষমতাহীন
১৫. আল-কাদির ৩৮১ হি. থেকে ৪২২ হি. / ৯৯১ খ্রি. থেকে ১০৩১ খ্রি. বুদ্ধিমান, দীনদার, আলেম; মাহমুদ গজনভীর উত্থান; বনু বুওয়াইহ-এর বিপরীতে খলিফার ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়
১৬. আল-কায়েম ৪২২ হি. থেকে ৪৬৭ হি. / ১০৩১ খ্রি. থেকে ১০৭৫ খ্রি. নেক সীরাত, সৌভাগ্যবান; সেলজুকদের উত্থান, বনু বুওয়াইহ-এর পতন, খেলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার
১৭. আল-মুকতাদী ৪৬৭ হি. থেকে ৪৮৭ হি. / ১০৭৫ খ্রি. থেকে ১০৯৪ খ্রি. নেক সীরাত, সৌভাগ্যবান; সেলজুকদের উন্নতি, আল্প আরসালানের বিজয়সমূহ
১৮. আল-মুস্তাজহির ৪৮৭ হি. থেকে ৫১২ হি. / ১০৯৪ খ্রি. থেকে ১১১৮ খ্রি. নেক সীরাত; সেলজুকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা; প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ; বায়তুল মুকাদাসের পতন
১৯. আল-মুস্তারশিদ ৫১২ হি. থেকে ৫২৯ হি. / ১১১৮ খ্রি. থেকে ১১৩৫ খ্রি. সাহসী, সাদাসিধে পছন্দকারী, জনগণের প্রিয়; ইরাকে ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ
২০. আর-রাশিদ ৫২৯ হি. থেকে ৫৩০ হি. / ১১৩৫ খ্রি. থেকে ১১৩৬ খ্রি.
২১. আল-মুকতাত্ফী ৫৩০ হি. থেকে ৫৫৫ হি. / ১১৩৬ খ্রি. থেকে ১১৬০ খ্রি. নেক সীরাত; ইমাদউদ্দিন জঙ্গির জিহাদ; দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ
২২. আল-মুস্তানজিদ ৫৫৫ হি. থেকে ৫৬৬ হি. / ১১৬০ খ্রি. থেকে ১১৭০ খ্রি. নেক সীরাত; নুরুদ্দিন জঙ্গির উত্থান ও জিহাদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৩৩ আল-মুস্তাদি ৫৬৬ হি. থেকে ৫৭৫ হি. / ১১৭০ খ্রি. থেকে ১১৮০ খ্রি.

নেক সীরাত

৩৪ আন-নাসির ৫৭৫ হি. থেকে ৬২২ হি. / ১১৮০ খ্রি. থেকে ১২২৫ খ্রি. ভিন্ন

প্রকৃতির, মন্দ আকিদা, ষড়যন্ত্রকারী

৩৫ আজ-জাহির ৬২২ হি. থেকে ৬২৩ হি. / ১২২৫ খ্রি. থেকে ১২২৬ খ্রি.

নেক সীরাত

৩৬ আল-মুস্তানসির ৬২৩ হি. থেকে ৬৪০ হি. / ১২২৬ খ্রি. থেকে ১২৩২ খ্রি.

নেক, দানশীল, জনকল্যাণমূলক কাজের অনুরাগী

৩৭ আল-মুস্তাসিম ৬৪০ হি. থেকে ৬৫৬ হি. / ১২৩২ খ্রি. থেকে ১২৫৮ খ্রি.

নেক, অল্প সাহসী, নির্বোধ

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর উত্থান, মিশর থেকে উবাইদী শাসনের অবসান।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ, খোয়ারিজম শাহীদের উত্থান,

তাতারীদের মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ।

সুলতান জালালুদ্দীনের তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা।

তাতারীদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতি।

বিশ্বাসঘাতকদের আধিপত্য, বাগদাদের পতন।

উন্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

বাগদাদের আববাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক সরকারসমূহ

আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে প্রতিষ্ঠিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকার

বনু আব্বাসের যুগে আন্দালুস, খোরাসান, মধ্য এশিয়া, শাম, মিসর, ইয়েমেন, ইরান এবং উত্তর আফ্রিকায় অসংখ্য স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আব্বাসীয় খিলাফতের আলোচনায় ইতিপূর্বেই এসেছে এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা যথেষ্ট। তাই এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে।

মিসরের সরকারসমূহ

دلت, তুলুনীয়: ২৫৪ হিজরি থেকে ২৯২ হিজরি (৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ)

- ১. আহমদ বিন তুলুন: এই সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ বিন তুলুন, যাকে বাগদাদ থেকে মিসরের গভর্নর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের সুযোগে আহমদ বিন তুলুন মিসরে নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পর শামও (সিরিয়া) তার অন্তর্ভুক্ত হয়। আহমদ বিন তুলুন নীল নদের তীরে ‘ফুসতাত’-এর উত্তরে ‘সামাররা’-এর আদলে একটি বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর নির্মাণ করেন, যা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের কারণে ‘আল-কাতায়ি’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। তার নির্মিত ‘জামে মসজিদ ইবনে তুলুন’ আজও বিদ্যমান এবং এর প্রতিষ্ঠাতার সুরত্বটির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তার নির্মিত ‘কালা কাবশ’ নামক প্রাসাদটি ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আজও তার আদি রূপে টিকে আছে।

দلت, তুলুনীয়ার শাসনামলে মিসর ও শাম অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এই দেশ বস্ত্রশিল্প, রূপার কাজ, কাঁচ এবং চিনি শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কৃষির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নীল নদের খালগুলো পরিকার করা হয়েছিল এবং নতুন খাল খনন করা হয়েছিল। কৃষকদের জমির মালিকানা দেওয়ার জন্য ‘দিওয়ানুল মাউন’ নামে একটি স্থায়ী বিভাগ কাজ করত। কর হ্রাস করা হয়েছিল। নীল নদের ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল এবং মরুভূমির রাস্তায় মুসাফিরদের পানির সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হয়েছিল।

- ২. খুমারাওয়াইহ: আহমদ বিন তুলুনের পর তার পুত্র খুমারাওয়াইহ শাসক হন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য নিজের কন্যা ‘কাতরুন নাদা’-কে খলিফা মুতাঈদ-এর সাথে বিয়ে দেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে পানির মতো অর্থ ব্যয় করেন।

- ৩. হারুন বিন খুমারাওয়াইহ: খুমারাওয়াইহ-এর মৃত্যুর পর তুলুনীয় রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উত্তরসূরি আবুল আসাকির জাইশ-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং তাকে অপসারিত করে তার ভাই হারুনকে সিংহাসনে বসায়, যার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আব্বাসীয়রা ২৯২ হিজরিতে সৈন্য পরিচালনা করে হারুনকে পরাজিত করে।

শাইবান বিন আহমদ: এরপর তার চাচা শাইবান কয়েক দিন সিংহাসনে আসীন ছিলেন কিন্তু পরে তিনি আব্বাসীয়দের কাছে পরাজয় মেনে নেন। এভাবে তুলুনি রাজবংশের অবসান ঘটে। এর শাসকরা নিম্নরূপ:

১. আহমদ বিন তুলুন (২৫৪ হিজরি থেকে ২৭০ হিজরি / ৮৬৮ থেকে ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)
২. খুমারওয়াইহ বিন আহমদ (২৭০ হিজরি থেকে ২৮২ হিজরি / ৮৮৩ থেকে ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ)
৩. জাইশ বিন খুমারওয়াইহ (২৮২ হিজরি থেকে ২৮৩ হিজরি / ৮৯৫ থেকে ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ)
৪. হারুন বিন খুমারওয়াইহ (২৮৩ হিজরি থেকে ২৯২ হিজরি / ৮৯৬ থেকে ৯০৪ খ্রিস্টাব্দ)
৫. শাইবান বিন আহমদ (২৯২ হিজরি / ৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)

তুলুনি রাজবংশ মাত্র ৩৮ বছর স্থায়ী ছিল কিন্তু ঐতিহাসিকগণ একে ভালো শব্দে স্মরণ করেন। [১]

ইখশিদি রাজবংশ: ৩৩২ হিজরি থেকে ৩৫৮ হিজরি (৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)

তুলুনি রাজবংশের পতনের পর আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে মিশর ও সিরিয়ায় যে গভর্নররা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুগজ, যিনি “ইখশিদ” উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে দুর্বল দেখে তিনি ৩৩২ হিজরিতে সিরিয়া ও মিশরে নিজের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইখশিদ ৩৩৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার সন্তানদের মধ্যে এই শাসন চলতে থাকে।

ইখশিদরাও তুলুনি রাজবংশের মতো মিশর ও সিরিয়ার উন্নতি সাধন করেন। “ফুসতাত”-এর সম্প্রসারণ ঘটে। মিশরের শাসনে প্রথমবারের মতো “উজির” পদটিও ইখশিদরা শুরু করেন এবং ফজল বিন জাফর প্রথম উজির নিযুক্ত হন। ইখশিদি শাসকরা প্রতি সপ্তাহে একদিন উন্মুক্ত দরবার বসাতেন যেখানে যে কেউ শাসকের সামনে নিজের অভিযোগ পেশ করতে পারত।

ইখশিদি রাজবংশ মাত্র ৩১ বছর টিকে ছিল। এতে নিম্নোক্ত শাসকরা অতিবাহিত হয়েছেন:

১. আবু বকর মুহাম্মদ বিন তুগজ ইখশিদ (সরকারের প্রতিষ্ঠাতা) (৩৩২ হিজরি থেকে ৩৩৪ হিজরি / ৯৩৫ থেকে ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)
২. আবুল কাসিম আনুজুর বিন ইখশিদ (৩৩৪ হিজরি থেকে ৩৪৯ হিজরি / ৯৪৬ থেকে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)
৩. আলী বিন ইখশিদ (৩৪৯ হিজরি থেকে ৩৫৫ হিজরি / ৯৬০ থেকে ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ)
৪. আবুল মিসক কাফুর মাওলা ইখশিদ (৩৫৫ হিজরি থেকে ৩৫৭ হিজরি / ৯৬৬ থেকে ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)
৫. আহমদ বিন আলী বিন ইখশিদ (৩৫৭ হিজরি থেকে ৩৫৮ হিজরি / ৯৬৮ থেকে ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

৩৫৮ হিজরিতে বনু উবাইদ মিশর দখল করে এই শাসনের অবসান ঘটায়। [২]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ১৭৩/১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩৮৫/৪; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯২ হিজরি; আত-তারিখুল ইসলামি মাহমুদ শাকির: ১৯৭/৬; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ৯/১৪ থেকে ১৭; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২২০, ২৬১।

[২] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ৫/১৪ থেকে ১৮; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২৩২।

মধ্য এশিয়া, খোরাসান এবং ইরান ও ইরাকের সরকারসমূহ

তাহিরি রাজবংশ: ২০৫ হিজরি থেকে ২৫৯ হিজরি (৮২ . খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)

এই সরকারের ভিত্তি তখন স্থাপিত হয় যখন মামুনুর রশিদ ২০২ হিজরিতে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহির বিন হুসাইনকে পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই প্রদেশটি পূর্ব ইরাক, পারস্য, উত্তর ইরান এবং খোরাসান থেকে মাওয়ারাউন নহর এর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ২০৫ হিজরিতে তাহির বিন হুসাইন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তবে স্বাধীন সরকার পরিচালনার জন্য তিনি মাত্র দুই বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর পর এই সরকার তাঁর বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে। এর রাজধানী ছিল নিশাপুর। এটি আব্বাসীয়দের অনুগত এবং করদাতা ছিল; এর সীমানায় আব্বাসীয় খলিফাদের নামে খুতবা পাঠ করা হতো। তাহিরি রাজবংশে নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

- ১. তাহির বিন হুসাইন (সরকারের প্রতিষ্ঠাতা): ২০৫ হিজরি থেকে ২০৭ হিজরি (৮২০, ৮২২ খ্রিষ্টাব্দ)
- ২. তালহা বিন তাহির: ২০৭ হিজরি থেকে ২১৩ হিজরি (৮২২, ৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- ৩. আবদুল্লাহ বিন তাহির: ২১৩ হিজরি থেকে ২৩০ হিজরি (৮২৮, ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- ৪. তাহির সানি বিন আবদুল্লাহ বিন তাহির: ২৩০ হিজরি থেকে ২৪৮ হিজরি (৮৪৫, ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ)
- ৫. মুহাম্মদ বিন তাহির: ২৪৮ হিজরি থেকে ২৫৯ হিজরি (৮৬২, ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)

তাহিরের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর শাসনকালে রাষ্ট্রের সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন। তবে তাঁর পর তাহির সানির শাসনামলে সরকার দুর্বল হতে শুরু করে। তাহির সানির পুত্র মুহাম্মদ বিন তাহির সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হন। তাঁর সময়েই সাফারিদের হাতে এই সরকারের অবসান ঘটে। [১]

জায়েদি তালিবিয়া রাজবংশ (তবারিস্তান): ২৫০ হিজরি থেকে ৩১২ হিজরি (৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ, ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত হাসান (রা.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন মহান ব্যক্তি হাসান বিন জায়েদ ২৫০ হিজরিতে (৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) আব্বাসীয় খিলাফত এবং তাহিরি সরকারের হাত থেকে দায়লাম ও তবারিস্তানের এক বিশাল এলাকা মুক্ত করে সেখানে নিজের সরকার কায়েম করেন। [২] এই সরকারে প্রথম তিনজন শাসক ছিলেন হাসানি। এই সময়ে এই সরকারকে জায়েদি হাসানি রাষ্ট্র বলা হতো। শেষ তিনজন শাসক ছিলেন হুসাইনি। তাঁদের সময়ে এই সরকারকে জায়েদি হুসাইনি রাষ্ট্র বলা হতো। [৩]

[১] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৮৬

[২] মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২২০

[৩] তারিখুল খুলাফা: পৃ. ৩৬৮; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১১/৩৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

এই হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন যায়েদ ছিলেন একজন বড় আলেম, ফাজিল এবং আবেদ ও জাহিদ ব্যক্তি। তিনি শিয়া মুখলিসীন (শিয়া উলা)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পশমের মোটা পোশাক পরিধান করতেন। সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে তাঁর প্রবল উদ্দীপনা ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি আলাদা হুকুমত কায়েম করেছিলেন। [১]

হুকুমত কায়েমের ঘটনাটি ছিল এই যে, সেই যুগে খোরাসানের গভর্নর সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন তাহির এবং তাবারস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হয়। হাসান বিন যায়েদ ‘রে’ শহরে বসবাস করতেন। তাবারস্তানের অধিবাসীরা তাঁকে দাওয়াত দিল যেন তিনি এসে তাদের নেতৃত্ব দেন। ফলে তিনি আসলেন, বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং জনশক্তির মাধ্যমে সুলাইমানকে বিতাড়িত করে তাবারস্তানে হুকুমত কায়েম করলেন। এরপর তিনি দিয়ার বকর এবং রে শহরও দখল করে নিলেন। তাঁর পুরো শাসনকাল সামানিদের সাথে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। [২]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। সাহাবায়ে কেরামের বংশধরদের ছোট শিশুদের জন্য তিনি প্রতি বছর বিশ হাজার দিনার (প্রায় পাঁচ কোটি টাকা) পাঠাতেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সম্মানকে ঈমানের অংশ মনে করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর শানে বেয়াদবি করল। হাসান বিন যায়েদ তৎক্ষণাৎ তাঁর গোলামকে বললেন: “এর শিরশ্ছেদ করো।” কেউ একজন সুপারিশ করে বলল: “এই ব্যক্তি তো শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত।”

তিনি বললেন: “আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই (যে এই ব্যক্তি শিয়ানে আলীর অন্তর্ভুক্ত হবে), আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

‘দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য। তারা (সচ্চরিত্র পুরুষ ও নারীগণ) ঐসব কথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যা এই লোকেরা রটাচ্ছে। তাদের (সচ্চরিত্রদের) জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক’। [৩]

এই আয়াত শুনিয়া হাসান বিন যায়েদ বললেন: “যদি কারো নিকট হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) খারাপ হতেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও (নাউযুবিল্লাহ) খারাপ প্রমাণিত হতেন। সুতরাং এই লোক কাফের হয়ে গেছে। এর গর্দান উড়িয়ে দাও।” ফলে সেই হতভাগাকে হত্যা করা হলো। [৪]

হাসান বিন যায়েদ ২৭০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পর তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন যায়েদ শাসক হন। সেই সময়ে খোরাসানের সামানি সাম্রাজ্যের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। অবশেষে সামানিরা বিজয়ী হয় এবং ২৮৭ হিজরিতে যায়েদী রাষ্ট্রের পতন ঘটে। মুহাম্মদ বিন যায়েদকে তাবারস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। ২৮৮ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৫]

[১] মাওসুআতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাতি ওয়াল মানহাজি ওয়াত তারবিয়্যাহ: ৪/২৯৯

[২] আলামুয যিরিকলি: ২/১৯১, ১৯২; আত-তারিখুল ইসলামি মাহমুদ শাকির: ৬/৮৪, ৮৫

[৩] সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬

[৪] মাওসুআতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাতি ওয়াল মানহাজি ওয়াত তারবিয়্যাহ: ৪/২৯৯, ৩০০

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৬৮; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১১/৩৩; আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১০৯

৩০১ হিজরিতে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বংশের নাসের আল-উতরুশ নামক এক ব্যক্তি তাবারস্তান এলাকাটি পুনরায় জয় করে ‘দৌলতে জাইদিয়া’-র পুনর্জাগরণ ঘটান। এখন এই সরকারকে ‘দৌলতে জাইদিয়া হুসাইনিয়া’ বলা হতো।

উতরুশ ৩০৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার পুত্র হাদি সিংহাসনে বসেন। কিছুকাল পর তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করেন এবং তার ভাই আন-নাসের আহমদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আন-নাসের আহমদের পর জাফর বিন মুহাম্মদের শাসন আসে। এই যুগে পুরো তাবারস্তান জাইদিয়া রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। [১]

তবে ৩৩৫ হিজরিতে জাফরের মৃত্যুর পর দাইলামি সরদার মারদাভিজ বনু জাইদকে পরাজিত করে তাবারস্তান দখল করে নেন। [২] এভাবে জাইদিয়া রাষ্ট্র অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়।

দৌলতে সাফারিয়া: ২৫৪ হিজরি থেকে ২৯৮ হিজরি (৮৬৭ থেকে ৯১১ খ্রিস্টাব্দ)

এই রাষ্ট্রের ভিত্তি ২৫৪ হিজরিতে ইয়াকুব বিন লাইস সাফারি সিজিস্তানে (দক্ষিণ আফগানিস্তান) স্থাপন করেন। ২৫৬ হিজরিতে তিনি কাবুলও দখল করেন। ২৫৯ হিজরিতে তিনি নিশাপুর জয় করে তাহিরি রাষ্ট্রের অবসান ঘটান। অবশেষে সাফারিয়া রাষ্ট্র পুরো খোরাসান ও পারস্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কয়েক বছর পর্যন্ত আব্বাসীয় খলিফা মুতামিদ বিল্লাহর খুতবা পাঠ করা হতো। পরে বাগদাদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যখন খলিফা মুতামিদ অসন্তুষ্ট হন। আব্বাসীয় খিলাফত চেষ্টা করছিল যাতে সাফারিয়া রাষ্ট্র বাগদাদের সাথে কেবল সংযুক্তই না থাকে বরং খিলাফতের প্রকৃত অনুগত হয়ে যায়। ইয়াকুব বিন লাইস তা গ্রহণ করেননি যার ফলে আব্বাসীয় খিলাফত ও সাফারিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তবে সাফারিয়া রাষ্ট্র না বাগদাদকে পরাজিত করতে পেরেছে, আর না আব্বাসীয় খিলাফত সাফারিয়াদের অধিকৃত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। অবশেষে ২৭৫ হিজরিতে ইয়াকুব বিন লাইসের মৃত্যু হয়।

ইয়াকুব বিন লাইস সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কোষাগার থেকে কেবল প্রয়োজনীয় খরচ করতেন। তার রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল। ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় কোষাগারে সাড়ে আট কোটি দিনার ছিল।

ইয়াকুব বিন লাইসের পর তার ভাই আমর বিন লাইস শাসক হন। তিনি বাগদাদ খিলাফতের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন যার ফলে খলিফা মুতামিদ তাকে খোরাসান, সিন্ধু, সিজিস্তান, কিরমান, পারস্য ও ইসফাহানের শাসনের সনদ প্রদান করেন। খলিফা মুতামিদের পর খলিফা মুতাদিদও আমর বিন লাইসকে এই প্রদেশগুলোর ওপর বহাল রাখেন। এর সুযোগ নিয়ে আমর বিন লাইস খলিফার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমু দরিয়া নদীর ওপারে সামানিয়া রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করেন। তবে সামানি শাসক ইসমাইল বিন আহমদ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং পাল্টা আক্রমণে আমর বিন লাইসকে বন্দি করে খলিফা মুতাদিদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ২৮৯ হিজরিতে আমর জেলের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৯৮; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ৩৩/১১

[২] মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২২০

আমর বিন লাইসের অনুপস্থিতিতে তার সন্তানরা শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। অবশেষে বনু আব্বাস সামানিয়া রাষ্ট্রের আমির ইসমাইল সামানির মাধ্যমে ২৯৮ হিজরিতে এই শাসনের অবসান ঘটায়।

সাফারিয়া রাষ্ট্রের শাসকরা নিম্নরূপ:

১. ইয়াকুব বিন লাইস ২৫৩ হি. থেকে ২৬২ হি. / ৮৬৮ খ্রি. থেকে ৮৮০ খ্রি. (রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা)
২. আমর বিন লাইস ২৬২ হি. থেকে ২৮৭ হি. / ৮৮০ খ্রি. থেকে ৯০০ খ্রি.
৩. তাহের বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন লাইস ২৮৭ হি. থেকে ২৯৬ হি. / ৯০০ খ্রি. থেকে ৯০৯ খ্রি.
৪. লাইস বিন আলী বিন লাইস ২৯৬ হি. থেকে ২৯৮ হি. / ৯০৯ খ্রি. থেকে ৯১১ খ্রি.
৫. মুহাম্মদ বিন আলী বিন লাইস ২৯৮ হি. / ৯১১ খ্রি. (সর্বশেষ শাসক)

সাফারিয়া রাষ্ট্র মাত্র ৪৮ বছর স্থায়ী ছিল। সাফারি শাসকরা ইসলামের অনুসারী, ন্যায়পরায়ণ এবং জনদরদী ছিলেন। তাদের শাসকদের জীবনযাপন তাদের সৈন্যদের থেকে ভিন্ন ছিল না। মানুষের ওপর সমতার সাথে ব্যয় করা হতো, যার ফলে প্রজারা সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। [১]

সামানিয়া রাষ্ট্র: ২৬১ হি. থেকে ৩৯৫ হি. (৮৭৫ খ্রি. থেকে ১০০৫ খ্রি.)

“সামান” সমরকন্দের একটি শহরতলী এলাকা, যেখানে প্রত্যেক প্রধানকে “সামান খোদা” বলা হতো। উমাইয়া যুগে এই এলাকার প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খোরাসানের গভর্নর আসাদ বিন আব্দুল্লাহ কাসরির নামানুসারে তার ছেলের নাম “আসাদ” রাখেন। আসাদ মামুনুর রশিদের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং মামুনের মাঝে অবস্থানের সময় তিনি তার পুত্র আহমদ, নুহ, ইলিয়াস এবং ইয়াহইয়ার সাথে কিছুকাল তার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং নিজের আনুগত্যের এমন প্রমাণ দেন যে, মামুন বাগদাদে খেলাফতের মসনদে বসার পর তার পুত্রদের মধ্যে নুহকে সমরকন্দ, আহমদকে ফারগানা, ইয়াহইয়াকে শাশ এবং ইলিয়াসকে হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

তাদের মধ্যে ফারগানার শাসক আহমদ বিন আসাদ অধিক প্রভাবশালী প্রমাণিত হন। ২৫০ হিজরিতে তার মৃত্যু হলে তার সাত পুত্র: নসর, ইয়াহইয়া, ইয়াকুব, ইসমাইল, ইসহাক, আসাদ এবং হামিদ তার উত্তরাধিকারী হন। তাদের মধ্যে নসর পিতার স্বেচ্ছাভিষিক্ত হন। ২৬১ হিজরিতে নসর বিন আহমদের ভাগ্যের নক্ষত্র আরও উজ্জ্বল হয় যখন খলিফা মুতামিদ আব্বাসি তাকে পুরো মাওয়ারাউন নাহরের শাসনভার লিখে দেন। নসর বিন আহমদ নিজে সমরকন্দে অবস্থান করেন এবং তার ভাই ইসমাইলকে বুখারার গভর্নর নিযুক্ত করেন। একইভাবে অন্যান্য ভাইদেরও বিভিন্ন শহরের শাসনভার প্রদান করেন।

২৭৯ হিজরিতে নসর বিন আহমদের মৃত্যু হলে তার ভাই ইসমাইল বিজয়ী হয়ে পরিবারের শাসক হন। তিনি সমরকন্দকেও বুখারার শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন সামানিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। শাসনক্ষমতা তার বংশধরদের মধ্যেই চলতে থাকে।

[১] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৬, ২৭৭

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সামানি আমীররা সাহসী এবং যোদ্ধা ছিলেন। তারা সুন্নি ছিলেন এবং বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতকে পূর্ণ সম্মান করতেন; এজন্য সামানি সাম্রাজ্যে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফতের খুতবা জারি ছিল। এই সরকার প্রায় সোয়া একশ বছর স্থায়ী ছিল।

সামানিরা তাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তাদের যুগে সমরকন্দ ও বুখারার জ্ঞানতাত্ত্বিক, তামাদুনিব এবং বাণিজ্যিক জৌলুস বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। বড় বড় আলেম, ফযীলাতধারী ব্যক্তি, সাহিত্যিক, কবি এবং হেকিমরা এই দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। চিকিৎসকদের প্রধান আবু বকর বিন জাকারিয়া আল-রাজি (মৃত্যু ৩৩০ হিজরি)-র সম্পর্ক এই যুগেরই সাথে। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-মানসুরি’ এই বংশের একজন শাসক আমির মনসুর সামানির নামে উৎসর্গ করেছিলেন, যিনি সিজিস্তানের গভর্নর ছিলেন।

বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক ইবনে সিনা এই সরকারের আমলেই খ্যাতি লাভ করেন। নূহ সানি বিন মনসুরের সফল চিকিৎসার পর তিনি তার বিশাল কুতুবখানা (লাইব্রেরি) থেকে উপকৃত হতে থাকেন।

সামানিরা ফারসি কবিতা ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রখ্যাত ফারসি কবি ফেরদৌসীর সম্পর্ক এই যুগেরই সাথে।

সামানি সাম্রাজ্যের পতন গজনভি সুলতানদের এবং তুর্কিস্তানের যোদ্ধা ইলিক খানের হাতে ঘটে।

সামানি বংশের শাসকদের তালিকা নিম্নরূপ:

- ১. নসর বিন আহমদ ২৬১ থেকে ২৭৯ হিজরি / ৮৭৫ থেকে ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ (প্রতিষ্ঠাতা)
- ২. ইসমাইল বিন আহমদ ২৭৯ থেকে ২৯৫ হিজরি / ৮৯২ থেকে ৯০৮ খ্রিস্টাব্দ
- ৩. আহমদ বিন ইসমাইল ২৯৫ থেকে ৩০১ হিজরি / ৯০৮ থেকে ৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
- ৪. নসর বিন আহমদ ৩০১ থেকে ৩৩১ হিজরি / ৯১৩ থেকে ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
- ৫. নূহ বিন নসর ৩৩১ থেকে ৩৪৩ হিজরি / ৯৩৩ থেকে ৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
- ৬. আব্দুল মালিক বিন নূহ ৩৪৩ থেকে ৩৫০ হিজরি / ৯৫৪ থেকে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
- ৭. মনসুর বিন নূহ ৩৫০ থেকে ৩৬৫ হিজরি / ৯৬১ থেকে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
- ৮. নূহ সানি বিন মনসুর বিন নূহ ৩৬৫ থেকে ৩৮৭ হিজরি / ৯৭৬ থেকে ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
- ৯. মনসুর বিন নূহ সানি বিন মনসুর ৩৮৭ থেকে ৩৮৯ হিজরি / ৯৯৭ থেকে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
- ১০. আব্দুল মালিক বিন নূহ সানি ৩৮৯ থেকে ৩৯৫ হিজরি / ৯৯৯ থেকে ১০০৫ খ্রিস্টাব্দ
- ১১. আল-মুনতাসির ইসমাইল বিন নূহ সানি ৩৯৫ হিজরি / ১০০৫ খ্রিস্টাব্দ (শেষ শাসক)

সামানি সাম্রাজ্য ১৩২ বছর স্থায়ী ছিল। [১]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৯/৯৯; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৬।

বনু হামদান রাষ্ট্র: ৩০৮ হিজরি থেকে ৩৯২ হিজরি (৯২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ)

এই বংশের সম্পর্ক ছিল খ্রিস্টান আরবদের বনু তাগলিব গোত্রের সাথে, যারা আল-জাজিরার দিয়ার রবিআ জেলায় বসবাস করত। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হামদান বিন হামদুন। তৃতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন বাগদাদ খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নতুন নতুন ফিতনা দেখা দেয়, তখন হামদান একজন খারেজি নেতা হারুন আল-শারির সাথে মিলে আল-জাজিরার বিখ্যাত শহর মারদিন দখল করে নেন। খলিফা আল-মুতাদিদ-এর বাহিনী কিছুকাল পর মারদিনের ওপর পাল্টা আক্রমণ করলে হামদান বিন হামদুন পালিয়ে যান। তার ছেলে হুসাইন, যে দুর্গে তার প্রতিনিধি ছিল, খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। খলিফার বাহিনী হামদানকে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে ফেলে এবং বাগদাদের কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে। হুসাইন তার পিতাকে মুক্ত করার জন্য খলিফার কাছে ওয়াদা করেন যে, তিনি সেই খারেজি নেতা হারুন আল-শারীকে ধরে বাগদাদে নিয়ে আসবেন। তিনি তা-ই করে দেখালেন। এতে খলিফা তাকে নিজের সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কারামাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুসাইন এবং তার ভাইয়েরা—আবদুল্লাহ, নাসর, সাঈদ, দাউদ এবং ইবরাহিম—অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তারা সবাই বিভিন্ন পদে ভূষিত হন। এরপর খিলাফতের বিভিন্ন পদপ্রার্থীদের সমর্থক হওয়ার কারণে এই ভাইদের পদোন্নতি বা অবনতি হতে থাকে। কোনো কোনো সময় তাদের নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষ হয়েছে। হামদানি ভাইদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- ১. হুসাইন বিন হামদান: তিনি ২৯২ হিজরিতে মিশরের তুলুনিদের ওপর আব্বাসীয়দের আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিজয়ের পর তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তবে ২৯৬ হিজরিতে তিনি আল-মুকতাদিরের পরিবর্তে আবদুল্লাহ বিন আল-মু'তায়-এর দুই দিনের খিলাফতকে সমর্থন করেন। এজন্য আল-মুকতাদির তাকে বন্দি করেন। পরে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং কুম, কাশান ও দিয়ার রবিআর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত আল-মুকতাদিরের উজির আলী বিন ঈসার সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাকে আবার জেলে পাঠানো হয়। হুসাইন বিন হামদান ৩০৬ হিজরিতে জেলেই মৃত্যুবরণ করেন।
- ২. ইবরাহিম বিন হামদান: তিনি ৩০৬ হিজরিতে তার ভাই হুসাইনের মৃত্যুর পর তার জায়গির 'দিয়ার রবিআ'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র দুই বছর পর ৩০৮ হিজরিতে তিনি মারা যান।
- ৩. দাউদ বিন হামদান: তিনি খলিফা আল-মুকতাদিরের সাথে ছিলেন এবং ৩২০ হিজরিতে বিদ্রোহীদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হন।
- ৪. নাসর বিন হামদান: ৩১৮ হিজরিতে তিনি তার ভাই আবদুল্লাহ বিন হামদানের স্থলে মসুলের শাসক হন। খলিফা আল-কাহির বিল্লাহ ৩২২ হিজরিতে তাকে হত্যা করান।
- ৫. সাঈদ বিন হামদান: তিনি নিহাওয়ান্দের জায়গিরদার ছিলেন। ৩১৭ হিজরি থেকে ৩১৯ হিজরির মধ্যে খলিফা আল-মুকতাদিরের আদেশে মসুলেও দখল কয়েম করেন। মসুল নিয়ে নিজের ভতিজা হাসানের সাথে বিরোধের কারণে ৩২৩ হিজরিতে তিনি নিহত হন। [১]

পরবর্তীতে এই বংশের রাজনীতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়:

১. মসুলের হামদানি রাষ্ট্র

২. আলেপ্পোর হামদানি রাষ্ট্র

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১১৮, ১১৯, ১২০; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৯।

দাউলাতে হামদানিয়া মসুল: (৩০৮ হিজরি থেকে ৩৬৮ হিজরি)

১. আবদুল্লাহ বিন হামদান আবুল হাইজা: “দাউলাতে বনু হামদান মসুল”-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। খলিফা মুকতাবি ৩০৮ হিজরিতে তাকে মসুলের শাসনভার অর্পণ করেন যেখান থেকে বনু হামদানের স্বায়ত্তশাসনের সূচনা হয়। আবদুল্লাহ বিন হামদান নয় বছর শাসন করেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি খলিফা মুকতাবির বিরুদ্ধে কাহিরের ব্যর্থ বিদ্রোহে সঙ্গ দিয়েছিলেন। এর ফলে মুকতাবির ৩১৭ হিজরিতে তাকে হত্যা করান। তবে তার পরিবারে শাসন অব্যাহত থাকে এবং তার পুত্র নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা অত্যন্ত খ্যাতিমান হন। [১]

২. হাসান বিন আবদুল্লাহ নাসিরুদ্দৌলা: তিনি বনু হামদানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ৩০৮ হিজরি থেকে ৩১৭ হিজরি পর্যন্ত তিনি মসুলে তার পিতা আবদুল্লাহ বিন হামদানের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করেন। ৩১৭ হিজরিতে পিতার হত্যার পর তিনি মসুলের স্বাধীন শাসক হন কিন্তু ৩১৯ হিজরি পর্যন্ত তাকে অস্থির থাকতে হয় কারণ খলিফার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তার চাচা নাসির এবং সাঈদ মসুলের ওপর কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টায় সফল হচ্ছিলেন। অবশেষে ৩২২ হিজরিতে খলিফা কাহির বিল্লাহর নির্দেশে নাসির নিহত হন এবং সাঈদ ৩২৩ হিজরিতে মসুলের ওপর দখলের লড়াইয়ে মারা যান। হাসান ৩৩২ হিজরিতে কিনাসরিনও দখল করে নেন। তিনি তার ভতিজা হুসাইন বিন সাঈদকে সেখানে নায়েব নিযুক্ত করেন। খলিফা রাজির অনুমতিতে তিনি দিয়ার বকর, দিয়ার রবিআ এবং দিয়ার মুদারকেও নিজের শাসনাধীনে নিয়ে নেন। [২]

হাসান বিন আবদুল্লাহর যুগে বনু হামদান পরিবারের সৌভাগ্য মধ্যগগনে ছিল। তিনি তার ছোট ভাই আলী বিন আবদুল্লাহর সাথে মিলে আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। যখন আমিরুল উমারা ইবনে রাইক আব্বাসীয় খলিফা মুতাকির ওপর সীমাহীন বাড়াবাড়ি শুরু করেন, তখন হাসান ইবনে রাইককে হত্যা করে খলিফাকে রক্ষা করেন, যার ফলে খলিফা তাকে “আমিরুল উমারা” এবং “নাসিরুদ্দৌলা” উপাধিতে ভূষিত করেন, আর তার ভাই আলী বিন আবদুল্লাহকে “সাইফুদ্দৌলা” উপাধি দেন। [৩] ৩৩১ হিজরিতে যখন তুজুন নামক এক বিদ্রোহী সর্দার বাগদাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে খলিফা মুতাকিকে লাঞ্ছিত করেন, তখন খলিফা বাগদাদ ছেড়ে বনু হামদানের কাছেই আশ্রয় নেন। [৪]

নাসিরুদ্দৌলা সাইফুদ্দৌলার সাথে মিলে বনু আব্বাসের সমর্থন এবং রোমানদের হাত থেকে ইসলামের সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাইফুদ্দৌলাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সাইফুদ্দৌলাও তাকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। যখন ৩৫৬ হিজরিতে সাইফুদ্দৌলার মৃত্যু হয়, তখন নাসিরুদ্দৌলা শোকের তীব্রতায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং এই শোকের মধ্যেই দুই বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ষাট বছর। এর আগেই ৩৫৩ হিজরিতে তিনি শাসনভার তার পুত্র আবু তাগলিব গজানফরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। [৫]

৩. আবু তাগলিব গজানফর: নাসিরুদ্দৌলাকে ৩৩৩ হিজরি থেকেই তার প্রতিবেশী বুওয়াইহি আমিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার পুত্রের ক্ষেত্রেও এই পরীক্ষা অব্যাহত থাকে। আবু তাগলিব গজানফর তার পিতার মতোই সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যদিও তিনি বীরত্বের সাথে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ৩৬৮ হিজরিতে তিনি পরাজিত হন এবং এভাবে মসুলে বনু হামদানের শাসনের অবসান ঘটে। [৬]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১১৯-১২০; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিল তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৯

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১১৯-১২০; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিল তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৯

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩৩২ হিজরি

[৫] আল-ইবার ফি খবর মান গাবর: ২/১০২

[৬] আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিল তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হালাবের হামদানি রাষ্ট্র: (৩৩৩ হিজরি থেকে ৩৯২ হিজরি)

আলী বিন আব্দুল্লাহ সাইফুদ দৌলা: হামদানি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত ও মহান বীর হলেন এই ব্যক্তি। তিনি ৩৩৩ হিজরিতে ইখশিদিদের কাছ থেকে হালাব ছিনিয়ে নিয়ে হামদানি রাষ্ট্রের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৩৬ হিজরিতে তিনি হিমস, কিনাসরিন, আওয়াসিম এবং আল-জাজিরার কিছু জেলাও দখল করেন। আব্বাসীয় খিলাফত সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের রক্ষায় অক্ষম ছিল, অন্যদিকে রোমানরা ক্রমাগত উপকূলীয় শহরগুলোতে আক্রমণ করছিল। সাইফুদ দৌলা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা করেন এবং সারা জীবন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। জিহাদের কারণে ইতিহাসে তার নাম অমর হয়ে আছে।

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমঝদার এবং নিজেও একজন সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। আবু নসর আল-ফারাবি, ইবনে খালওয়াইহ, আবু তাইয়িব আল-মুতানাব্বি, আবু ফিরাস আল-হামদানি, ইবনে নুবাতা এবং সাররি আল-রাফ্ফা-এর মতো জ্ঞান ও শিল্পের পণ্ডিতরা তার দরবারের শোভা বর্ধন করতেন। [১]

সাদুদ দৌলা: ৩৫৬ হিজরিতে সাইফুদ দৌলা ইন্তেকাল করেন এবং তার পুত্র আবুল মাআলি সাদুদ দৌলা ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সাইফুদ দৌলার মৃত্যুর পর একদিকে রোমানরা, অন্যদিকে বুওয়াইহিরা এবং তৃতীয় দিকে বনু উবাইদ হামদানি রাষ্ট্রকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এভাবে হামদানি রাষ্ট্র দিন দিন দুর্বল হতে থাকে, তবে সাদুদ দৌলা হালাবকে সুরক্ষিত রাখেন। [২]

সাস্তুদ দৌলা: ৩৮১ হিজরিতে সাদুদ দৌলার মৃত্যু হয়। তার স্থলে তার পুত্র আবুল ফাযায়েল সাস্তুদ দৌলা ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বনু উবাইদের করদ রাজ্যগুলোর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি নিজের প্রতিরক্ষার জন্য রোমানদের সাথে চুক্তি করেন। ৩৯২ হিজরিতে তার উজির লুলু হাজিব তাকে হত্যা করান। এভাবে বনু হামদান (হালাব) রাষ্ট্রেরও সমাপ্তি ঘটে। [৩]

বনু হামদান রাষ্ট্রে নিম্নোক্ত প্রধানগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

বনু হামদান রাষ্ট্র (মসুল):

১. আব্দুল্লাহ বিন হামদান আবুল হাইজা ৩০৮ হিজরি থেকে ৩১৭ হিজরি ৯২০ থেকে ৯২৯ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাতা

২. হাসান বিন আব্দুল্লাহ নাসিরুদ দৌলা ৩১৮ হিজরি থেকে ৩৫৩ হিজরি ৯২৯ থেকে ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

৩. আবু তাগলিব গাযানফার ৩৫৩ হিজরি থেকে ৩৬৮ হিজরি ৯৬৩ থেকে ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ শেষ শাসক

বনু হামদান রাষ্ট্র (হালাব):

১. আলী বিন আব্দুল্লাহ সাইফুদ দৌলা ৩৩৩ হিজরি থেকে ৩৫৬ হিজরি ৯৪৫ থেকে ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ প্রতিষ্ঠাতা

২. আবুল মাআলি সাদুদ দৌলা ৩৫৬ হিজরি থেকে ৩৮১ হিজরি ৯৬৭ থেকে ৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

৩. সাস্তুদ দৌলা ৩৮১ হিজরি থেকে ৩৯২ হিজরি ৯৯১ থেকে ১০০২ খ্রিস্টাব্দ শেষ শাসক

সামগ্রিকভাবে বনু হামদানের শাসন ৮৬ বছর স্থায়ী ছিল। [৪]

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ৪/৩০৩, ৩০৪, ত: দারুল ইলম; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৮০

[২] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৮০

[৩] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৮০, ২৮১

[৪] মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃ: ২২৮; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৭৯ থেকে ২৮১

বনু হামদানের যুগের ওপর এক নজর

বনু হামদান রোমানদের বিরুদ্ধে জোরদার জিহাদ করেছিল; তারা বুওয়াইহিদের শক্তি হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বনু হামদানের মূল এলাকা ছিল দিয়ার রবিআ, দিয়ার বকর এবং মসুল। নাসিরুদ্দৌলা এবং সাইফুদ্দৌলা রাষ্ট্রকে বিস্তৃত করে উত্তর সিরিয়াও দখল করে নিয়েছিলেন। [১] বনু হামদানকে পারস্য ও ইরাকের শিয়া সরকার এবং সিরিয়া ও মিশরের ইখশিদি ও ওবায়দি (ফাতেমি) রাষ্ট্রের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে বনু হামদান আব্বাসীয় খলিফাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল। [২]

হাফেজ জাহাবি (রহ.) বনু হামদানের সবচেয়ে বড় শাসক নাসিরুদ্দৌলা সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি আহলে সুন্নাতের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করতেন এবং ওবায়দি শাসকদের তাদের রাফেজি ও গুলাত (চরমপন্থী) আকিদার কারণে অপছন্দ করতেন। [৩] একইভাবে সাইফুদ্দৌলা আহলে সুন্নাতের আলেমদের খুব সম্মান করতেন এবং তাদের কাছে বিনীতভাবে উপস্থিত হতেন। [৪]

সম্ভবত আহলে সুন্নাতের সাথে এই নৈকট্যের কারণেই বনু হামদান শিয়া সরকারগুলোর পরিবর্তে বনু আব্বাসের সমর্থক ছিল। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থও এর মধ্যেই ছিল; কারণ ওবায়দিসহ প্রতিদ্বন্দ্বী শিয়া রাষ্ট্রগুলোর সামনে টিকে থাকা অন্য কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। কিছু ঐতিহাসিক সাফারি রাষ্ট্র, সামানি রাষ্ট্র এবং হামদানি রাষ্ট্রকে শিয়া সরকার হিসেবে গণ্য করেছেন, কিন্তু এর কোনো অকাট্য প্রমাণ পেশ করা যায় না। নিশ্চিতভাবেই এই যুগে ইসলামি বিশ্বের এক বিশাল অংশে রাফেজিদের আধিপত্য একটি ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল; তাই উল্লিখিত সরকারগুলোতে এমনকি খোদ আব্বাসীয় খেলাফতের ধরনেও কোথাও কোথাও তাশাইয়ু (শিয়া মতবাদ)-এর ছাপ দেখা যেতে পারে, কিন্তু এই ভিত্তিতে শাসক পরিবারকে শিয়া মনে করা ন্যায়বিচারের কথা নয়। এমন মনে হয় যে, এই যুগে কিছু সুন্নি পরিবার লোকদেখানো তাশাইয়ু গ্রহণ করেছিল। সম্ভবত বনু হামদান তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাহরাইন

উয়ুনি রাষ্ট্র (বাহরাইন): ৪৬৬ হিজরি থেকে ৬৩৬ হিজরি (১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

বাহরাইনের ‘আহসা’ অঞ্চলে বনু আবদ আল-কায়েসের একটি পরিবার বসবাস করত যারা তাদের বসতি ‘উয়ুন’-এর দিকে সম্বন্ধ করে ‘উয়ুনি’ নামে পরিচিত ছিল। এই পরিবারের একজন নেতা আবদুল্লাহ বিন আলী আল-উয়ুনি আব্বাসীয় খলিফা এবং সেলজুক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বাহরাইনের কারামাতিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ৪৬৬ হিজরি থেকে তার অভিযান অব্যাহত থাকে, এমনকি তিনি পুরো বাহরাইন থেকে কারামাতিদের বিতাড়িত করে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উয়ুনরা এখানে ৬০০ হিজরি পর্যন্ত শাসন করে। পরবর্তীতে তারা দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে, তবে ৬৩৬ হিজরি পর্যন্ত কোনো না কোনো রূপে টিকে ছিল, এরপর পারস্যবাসীরা এটি দখল করে নেয়। [৫]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১১৯, ১২০।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮৪, ২৮৫।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৯১।

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/২৯৬ থেকে ২৯৯।

[৫] মুজিজ আত-তারিখুল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২৪৭, ২৪৮।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

নবম খণ্ড

সেলজুক সাম্রাজ্য

সেলজুকদের আদিপুরুষ মধ্য এশিয়ার একটি তুর্কি পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত সেলজুক নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দুই পৌত্র: তুঘরিল বেগ এবং চাগরি বেগ পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তুর্কিস্তান ও খোরাসানে আধিপত্য বিস্তার করে “দৌলতে সেলজুকিয়া”-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের প্রাথমিক কয়েকজন শাসক “মহান সেলজুক” নামে পরিচিত, যারা এক সময় মধ্য এশিয়া, খোরাসান, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়া শাসন করতেন।

মহান সেলজুক:

মহান সেলজুকদের মধ্যে নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

-
- ১. তুঘরিল বেগ: ৪২৯ হিজরি থেকে ৪৫৫ হিজরি (১০৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দ):
মহান সেলজুকদের মধ্যে প্রথম নাম তুঘরিল বেগের, যিনি এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মধ্য এশিয়া, খোরাসান এবং ইরান জয় করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েমকে বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্য থেকে মুক্ত করে খিলাফতকে নতুন জীবন দান করেন। ৪৫৫ হিজরিতে তুঘরিল বেগের মৃত্যু হয়।
-
- ২. আল্প আরসালান: ৪৫৫ হিজরি থেকে ৪৬৫ হিজরি (১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দ):
তুঘরিল বেগ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, ফলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প আরসালান বিন চাগরি বেগ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং মহান সম্রাট ছিলেন। ৪৬৩ হিজরিতে তিনি মাত্র ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে রোমানদের আড়াই লক্ষ বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে ইউরোপে আবারও মুসলমানদের দাপট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দশ বছর শাসন করেন।
-
- ৩. মালিক শাহ: ৪৬৫ হিজরি থেকে ৪৮৫ হিজরি (১০৭২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ):
আল্প আরসালানের স্ত্রীভাষিক্ত হন তাঁর পুত্র মালিক শাহ, যিনি সেলজুক সাম্রাজ্যকে মধ্য এশিয়া থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং বনু উমাইয়া ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে এত বড় সাম্রাজ্য জোটেনি। মালিক শাহ ২১ বছর অত্যন্ত সফলভাবে শাসন করে ৪৮৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর।
-
- ৪. আরসালান আরগুন বিন আল্প আরসালান: ৪৮৫ হিজরি থেকে ৪৯০ হিজরি (১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ):
আল্প আরসালানের পুত্র আরসালান আরগুন খোরাসানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাঁচ বছর শাসক ছিলেন। অবশেষে ৪৯০ হিজরিতে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহের সাথে সংঘর্ষে নিহত হন।
-
- ৫. বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ: ৪৯০ হিজরি থেকে ৪৯৮ হিজরি (১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দ):
আরসালান আরগুনের হত্যার পর খোরাসান মালিক শাহের পুত্র বারকিয়ারুকের দখলে আসে। বারকিয়ারুক এগারো বছর শাসন করেন। তাঁর পুরো সময়টি তাঁর ভাই মুহাম্মদের সাথে লড়াইয়ে অতিবাহিত হয়। অবশেষে ৪৯৬ হিজরিতে উলামায়ে কেরাম মধ্যস্থতা করে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। বারকিয়ারুককে ইরাকের সুলতান এবং মুহাম্মদকে শাসক...

আজারবাইজান মেনে নেওয়া হলো। অন্যদিকে খোরাসানের ওপর তাদের তৃতীয় ভাই সঞ্জরের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হলো।

৬. মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ: ৪৯৮ হিজরি থেকে ৫১১ হিজরি (১১০৫ খ্রি. থেকে ১১১৭ খ্রি.): বরকিয়ারুকের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ তার ছেলের উত্তরাধিকার বাতিল করে ইরাকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩ বছর শাসন করেন, তবে এই সময়কাল গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

মহান সেলজুকদের তালিকা নিম্নরূপ:

- ১. তুঘরিল বেগ বিন মিকাইল: ৪২৯ হিজরি থেকে ৪৫৫ হিজরি / ১০৩৮ খ্রি. থেকে ১০৬৩ খ্রি. - শাসনের প্রতিষ্ঠাতা
- ২. আল্প আরসালান বিন চাগরি বেগ: ৪৫৫ হিজরি থেকে ৪৬৫ হিজরি / ১০৬৩ খ্রি. থেকে ১০৭২ খ্রি.
- ৩. মালিক শাহ: ৪৬৫ হিজরি থেকে ৪৮৫ হিজরি / ১০৭২ খ্রি. থেকে ১০৯২ খ্রি.
- ৪. আরসালান আরগুন বিন আল্প আরসালান: ৪৮৫ হিজরি থেকে ৪৯০ হিজরি / ১০৯২ খ্রি. থেকে ১০৯৭ খ্রি.
- ৫. বরকিয়ারুক বিন মালিক শাহ: ৪৯০ হিজরি থেকে ৪৯৮ হিজরি / ১০৯৭ খ্রি. থেকে ১১০৫ খ্রি.
- ৬. মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ: ৪৯৮ হিজরি থেকে ৫১১ হিজরি / ১১০৫ খ্রি. থেকে ১১১৭ খ্রি. - শেষ শাসক

সেলজুক সালতানাতের বিভাজন

সেলজুকদের উত্থানের সময়কাল ছিল প্রায় ৬০ বছর। মালিক শাহের মৃত্যুর পর বিভিন্ন অঞ্চলে সেলজুক নবাব ও আমিররা স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করেন এবং জায়গায় জায়গায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই বিশৃঙ্খলা সালতানাতের স্থায়ী বিভাজন ও সীমানা নির্ধারণের দিকে নিয়ে যায়।

এখন যেসব সেলজুক তাদের পূর্বপুরুষদের আদি কেন্দ্র মার্ত-এ সিংহাসনে আরোহণ করে মধ্য এশিয়া ও খোরাসানের শাসনভার গ্রহণ করেন, তারা “সলাজিকা-এ-খোরাসান” (খোরাসানের সেলজুক) নামে পরিচিত হন। তাদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। যেসব সেলজুক রেই-কে কেন্দ্র করে ইরান ও ইরাক শাসন করেন, তারা “সলাজিকা-এ-ইরাক” (ইরাকের সেলজুক) নামে অভিহিত হন। যেসব শাহজাদা এশিয়া মাইনরে স্বায়ত্তশাসিত শাসন শুরু করেন, তারা “সলাজিকা-এ-রুম” (রুমের সেলজুক) নামে পরিচিত হন। তাদের একটি শাখা সিরিয়া ও আল-জাজিরাতেও শাসন করতে থাকে।

সলাজিকা-এ-ইরাক (ইরাকের সেলজুক):

- ১. মাহমুদ বিন মুহাম্মদ: ৫১১ হিজরি থেকে ৫২৫ হিজরি (১১১৭ খ্রি. থেকে ১১৩১ খ্রি.): “মহান সেলজুকদের” মধ্যে মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ যখন ৫১১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন, তখন সালতানাতের আমিররা সালতানাতের কেন্দ্র রেই-এর সিংহাসনে তার বারো বছর বয়সী ছেলে মাহমুদকে বসিয়ে দেন। এর সাথে সাথেই খোরাসানের সেলজুকরা রেই-এর আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফলে রেই-এর সিংহাসনের কার্যপরিধি কেবল ইরাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে “মহান সেলজুকদের” শাসন “ইরাকের সেলজুক” শাসনে রূপান্তরিত হয়।

মাহমুদ ১৪ বছর শাসন করেন এবং ৫২৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আমলে ইরাকের সেলজুক শাসন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

- ২. তুঘরিল বিন মুহাম্মদ: ৫২৫ হিজরি থেকে ৫২৯ হিজরি (১১৩১ খ্রি. থেকে ১১৩৫ খ্রি.): মাহমুদের মৃত্যুর পর তার ভাই তুঘরিলকে সিংহাসনে...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

৩. মাসউদ বিন মুহাম্মদ: ৫২৯ হিজরি থেকে ৫৪৭ হিজরি (১১৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি পুরো বিশ বছর শাসন করেন। তাঁর শাসনামল খলিফাদের পরাজিত করার প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়। এই সময়েই মোসেলের আতাবেগ ইমাদউদ্দিন জঙ্গির উত্থান ঘটে, যিনি ইরাকের সেলজুকদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে তাদের শক্তি বহুলাংশে হ্রাস করে দেন। সুলতান মাসউদ ৫৪৭ হিজরিতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ইরাকের সেলজুকদের পতন শুরু হয়।

৪. মালিক শাহ সানি: ৫৪৭ হিজরি থেকে ৫৪৮ হিজরি (১১৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র কয়েক দিনের। তিনি ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতেন। অবশেষে মুহাম্মদ সানি তাঁর তখত উল্টে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। মালিক শাহ সানি পালিয়ে যান।

৫. মুহাম্মদ সানি: ৫৪৮ হিজরি থেকে ৫৫৪ হিজরি (১১৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনামল ছিল ইরাকের সেলজুকদের পতনের যুগ। তিনি নিজের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বাগদাদ দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. সুলাইমান শাহ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ: ৫৫৪ হিজরি থেকে ৫৫৫ হিজরি (১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ)। মুহাম্মদ সানির মৃত্যুর পর সেলজুক আমিররা তাঁর চাচা সুলাইমান শাহকে সিংহাসনে বসান, কিন্তু তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সারাক্ষণ ভাঁড়দের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। এখান থেকেই আজারবাইজানের গভর্নর ইলদিগুজের উত্থান শুরু হয়। ইরাকের সেলজুকদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি মনে করা হতো। তিনি মরহুম তুঘরিল বিন মুহাম্মদের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন এবং তাঁর ছেলে আরসালানকে নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন; এই কারণেই তাঁকে ‘আতাবেগ’ বলা হতো। [১] সুলাইমান শাহের চারিত্রিক স্বলন দেখে তিনি অন্যান্য আমিরদের সাথে মিলে সুলাইমান শাহকে বন্দি করেন এবং পরে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

৭. আরসালান বিন তুঘরিল সানি: ৫৫৫ হিজরি থেকে ৫৭১ হিজরি (১১৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। সুলাইমান শাহকে অপসারণ করে ইলদিগুজ তাঁর সৎ ছেলে আরসালান বিন তুঘরিলকে নামমাত্র রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসান এবং নিজে তাঁর আড়ালে শাসন করতে থাকেন। ৫৬৮ হিজরিতে ইলদিগুজের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জাহান পাহলওয়ান আরসালান বিন তুঘরিলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। মোদাকথা, আরসালান বিন তুঘরিল ছিলেন কেবল নামেমাত্র শাসক। ৫৭১ হিজরিতে জাহান পাহলওয়ান তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর নাবালক ছেলে তুঘরিলকে সিংহাসনে বসান।

৮. তুঘরিল বিন আরসালান: ৫৭১ হিজরি থেকে ৫৯০ হিজরি (১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন ইরাকের সেলজুকদের শেষ শাসক এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি নিজেকে আজারবাইজানের আতাবেগদের কবল থেকে মুক্ত করেন। তাঁর বীরত্ব একদিকে খোয়ারিজম শাহী সালতানাত এবং অন্যদিকে বাগদাদের খিলাফতকে ভীত করে তুলেছিল। অবশেষে খোয়ারিজমের বাদশাহ আলাউদ্দিন তেকিশ ৫৯০ হিজরিতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তুঘরিল বিন আরসালানকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং তাঁর মস্তক আব্বাসীয় খলিফা নাসিরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এভাবেই ইরাকের সেলজুক রাষ্ট্র খোয়ারিজম শাহী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[১] তুঘরিলের বিধবা স্ত্রীর গর্ভে তাঁর এক পুত্র জাহান পাহলওয়ান জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীতে এই রাষ্ট্রের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেন।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ইরাকের সেলজুকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. মাহমুদ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫১১ হি. থেকে ৫২৫ হি. (১১১৭ খ্রি. থেকে ১১৩১ খ্রি.) প্রথম শাসক
২. তুঘরিল বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫২৫ হি. থেকে ৫২৯ হি. (১১৩১ খ্রি. থেকে ১১৩৫ খ্রি.)
৩. মাসউদ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫২৯ হি. থেকে ৫৪৭ হি. (১১৩৫ খ্রি. থেকে ১১৫২ খ্রি.)
৪. মালিক শাহ সানি বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫৪৭ হি. থেকে ৫৪৮ হি. (১১৫২ খ্রি. থেকে ১১৫৩ খ্রি.)
৫. মুহাম্মদ সানি বিন মাহমুদ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫৪৮ হি. থেকে ৫৫৪ হি. (১১৫৩ খ্রি. থেকে ১১৫৯ খ্রি.)
৬. সুলাইমান শাহ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ ৫৫৪ হি. থেকে ৫৫৬ হি. (১১৫৯ খ্রি. থেকে ১১৬১ খ্রি.) পুতুল শাসক
৭. আরসালান বিন তুঘরিল বিন মুহাম্মদ ৫৫৬ হি. থেকে ৫৭১ হি. (১১৬১ খ্রি. থেকে ১১৭৫ খ্রি.) পুতুল শাসক
৮. তুঘরিল বিন আরসালান ৫৭১ হি. থেকে ৫৯০ হি. (১১৭৫ খ্রি. থেকে ১১৯৪ খ্রি.) শেষ শাসক

খুরাসানের সেলজুক:

১. সাঞ্জার বিন মালিক শাহ: ৫১১ হি. থেকে ৫৫২ হি. (১১১৭ খ্রি. থেকে ১১৫৭ খ্রি.):
৪৯০ হিজরিতে সুলতান আরসালান আরগুনের হত্যার পর বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ খুরাসানের শাসনভার তার ভাই সাঞ্জারের হাতে অর্পণ করেন। সাঞ্জার এখানে ২১ বছর পর্যন্ত সেলজুক সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করেন। জুমার খুতবায় তাকে ‘মালিক’ বলা হতো। ৫১১ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন মালিক শাহের মৃত্যুর পর সাঞ্জার খুরাসানের কেন্দ্র মার্ভে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাকেই সেলজুকদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে ৫১১ হি. থেকে ৫৫২ হি. পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শহরের জুমার খুতবায় সাঞ্জারকেই ‘সুলতান’ বলা হতো।

সুলতান সাঞ্জার একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তার পুরো জীবন সামরিক অভিযানে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি আফগানিস্তান থেকে গজনভি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। তার শাসনামলেই তার প্রতিনিধি আতসিজ খাওয়ারিজমে একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা খাওয়ারিজম শাহী সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি পায়। সুলতান সাঞ্জার চার দশক শাসন করার পর ৫৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেলজুকদের ভিত্তি পুনরায় মজবুত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এই সাম্রাজ্য আর আগের মতো গৌরব ফিরে পায়নি।

সুলতান সাঞ্জারের শেষ চার বছর অত্যন্ত অসহায়ত্বের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তিনি তুর্কান-এ-গুজদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং নির্জনবাস অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

২. মাহমুদ খান খাওহারজাদা: ৫৫২ হি. থেকে ৫৫৬ হি. (১১৫৭ খ্রি. থেকে ১১৬১ খ্রি.):
সুলতান সাঞ্জারের পর তুর্কান-এ-গুজরা তার ভাগ্নে মাহমুদ খান খাওহারজাদাকে সিংহাসনে বসায়। তিনি বাধ্য হয়ে কিছুকাল সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তার নামমাত্র শাসন খুরাসান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অবশেষে ৫৫৬ হিজরিতে তিনি রাজমুকুট ও সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান। নিশাপুরে পৌঁছালে সেখানকার গভর্নর মুয়াইয়িদ তাকে অন্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এভাবেই খুরাসানের সেলজুক শাসন তুর্কান-এ-গুজ, খাওয়ারিজমি এবং ঘুরি শাসকদের দখলে চলে যাওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

খোঁরাসানের সেলজুকরা নিম্নরূপ:

- ১. সাঞ্জার বিন মালিক শাহ (৫১১ হিজরী থেকে ৫৫২ হিজরী / ১১১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) - প্রথম শাসক
- ২. মাহমুদ খান খাওয়াহরজাদা (৫৫২ হিজরী থেকে ৫৫৬ হিজরী / ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) - শেষ শাসক

সিরিয়া ও আল-জাজিরার সেলজুক:

সেলজুকদের একটি শাখা সিরিয়া ও আল-জাজিরাতেও তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালিক শাহের ভাই (আল্ল আরসালানের পুত্র) তুতুশ, যিনি ৪৭১ হিজরীতে সিরিয়া জয় করে সেখানকার প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন।

তুতুশ: ৪৮৫ হিজরীতে মালিক শাহের মৃত্যুর পর তুতুশ সিরিয়া ও আল-জাজিরার স্বাধীন শাসক হন। ৪৮৮ হিজরীতে তিনি মার্ভের উদ্দেশ্যে রওনা হন যাতে মালিক শাহের শূন্য সিংহাসন দখল করতে পারেন, কিন্তু পথিমধ্যে মালিক শাহের পুত্র বারকিয়ারুকের সাথে যুদ্ধে নিহত হন।

দুকাক বিন তুতুশ: তুতুশ নিহত হওয়ার পর তার পুত্র দুকাক দামেস্কে তার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

তুঘতেকিন: ৪৯৭ হিজরীতে দুকাকের মৃত্যু হয়। তার পুত্র অত্যন্ত অল্পবয়সী ছিল; তাই তার স্বশুর জহিরুদ্দিন তুঘতেকিন দামেস্কের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। তুঘতেকিন ২৫ বছর শাসন করেন এবং ৫২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। তার আমলে ফিরিজিরা (ক্রুসেডাররা) দামেস্ক দখলের ব্যাপক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন।

হাফেজ যাহাবী (রহ.) তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন সাহসী, বীর, প্রভাবশালী এবং ফিরিজিদের বিরুদ্ধে একজন মুজাহিদ। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন... যদি আল্লাহ ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য তুঘতেকিনকে ফিরিজিদের সামনে দাঁড় না করাতেন, তবে তারা দামেস্ক দখল করে নিত, কিন্তু তিনি তাদের বহুবার পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন।” [১]

তাজুল মুলুক বুরি: তুঘতেকিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র তাজুল মুলুক বুরি শাসক হন। তিনিও ফিরিজিদের হাত থেকে ইসলামী সীমান্ত রক্ষায় তৎপর ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় ইসমাইলীদেরও নির্মূল করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় বাতেনী খঞ্জরধারীরা তার ওপর হামলা চালায়। তিনি আহত হন এবং অবশেষে এক বছর পর ৫২৬ হিজরীতে সেই ক্ষতের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন।

শামসুল মুলুক ইসমাইল: এরপর তার পুত্র শামসুল মুলুক ইসমাইল শাসক হন। তিনি একজন জালেম শাসক ছিলেন। মানুষের বদদোয়ার শিকার হয়ে একটি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ৫২৯ হিজরীতে তিনি নিহত হন।

মাহমুদ শিহাবুদ্দিন: এরপর তার ভাই মাহমুদ শিহাবুদ্দিন শাসক হন। ৫৩৩ হিজরীতে তিনিও একটি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন।

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯ খণ্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা... নোট: দুকাকের পর সিরিয়ার শাসন সেলজুক বংশ থেকে শেষ হয়ে যায়; কারণ এরপর শাসনভার গ্রহণকারী তার স্বশুর তুঘতেকিন মূলত সেলজুক ছিলেন না, তবে যেহেতু সেলজুকদের সাথে তার আত্মীয়তা ছিল, তাই তার এবং তার সন্তানদের শাসনকালকে সিরিয়ার সেলজুকদের মধ্যেই গণ্য করা হয়।

জামালুদ্দিন মুহাম্মদ: শিহাবুদ্দিনের পর তার ভাই জামালুদ্দিন মুহাম্মদ এক বছর শাসন করেন।

মুজিরুদ্দিন: জামালুদ্দিনের পুত্র মুজিরুদ্দিন ৫৩৩ হিজরি থেকে ৫৩৯ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। ৫৩৯ হিজরিতে দামেস্কে সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সিরিয়ার সেলজুক শাসনের অবসান ঘটে।

সিরিয়ার সেলজুক শাসকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

- ১. তুতুশ বিন আল্প আরসালান: ৪৮৫ হিজরি থেকে ৪৯৫ হিজরি / ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ (প্রতিষ্ঠাতা)
- ২. দুকাক বিন তুতুশ: ৪৯৫ হিজরি থেকে ৪৯৭ হিজরি / ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দ
- ৩. তুগতেকিন: ৪৯৭ হিজরি থেকে ৫২২ হিজরি / ১১০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ
- ৪. তাজুল মলুক বুরি: ৫২২ হিজরি থেকে ৫২৬ হিজরি / ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩২ খ্রিষ্টাব্দ
- ৫. শামসুল মলুক ইসমাইল: ৫২৬ হিজরি থেকে ৫২৯ হিজরি / ১১৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ
- ৬. মাহমুদ শিহাবুদ্দিন: ৫২৯ হিজরি থেকে ৫৩৩ হিজরি / ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দ
- ৭. জামালুদ্দিন মুহাম্মদ: ৫৩৩ হিজরি থেকে ৫৩৩ হিজরি / ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ
- ৮. মুজিরুদ্দিন: ৫৩৩ হিজরি থেকে ৫৩৯ হিজরি / ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দ (শেষ শাসক)

সেলজুক রুম:

খুরাসান ও রুমের সেলজুকরা ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের একটি শাখা ‘সেলজুক রুম’ এশিয়া মাইনরে সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। সেলজুক রুমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলাইমান বিন কুতুলমিশ (ইবনে ইসরাঈল বিন সেলজুক), যিনি সেলজুক বংশের একজন অত্যন্ত সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তিনি সেলজুক সালতানাত প্রতিষ্ঠার সময় তুঘরিল বেগের শাসনামলে এশিয়া মাইনর জয় করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শাসন করেছিলেন। ৪৭৯ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র কিলিজ আরসালান শাসক হন। এরপর শাসনভার তার বংশধরদের মধ্যেই চলতে থাকে। সেলজুক রুমের ঘটনাবলি চতুর্থ খণ্ডে উসমানীয় সালতানাতের আলোচনার সাথে আসবে; কারণ উসমানীয় সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতারা সেলজুক রুমের অনুসারী ছিলেন এবং তাদের শাসনের ভিত্তি সেলজুক রুমের সীমানার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [১]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ৪, পৃ. ৪২৯ থেকে ৫৫৬; আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ২/২১৬, ২১৮, ২২২ থেকে ২৩৩, ২৩৯, ২৫১; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিল তারিখিল ইসলামি: ১৪/২৮২ থেকে ২৮৫; মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২৩৮, ২৫১।

সেলজুকদের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন:

- দাওলাতুস সালাজিকাহ: মুহাম্মদ আলি মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি, মুয়াসসাআতুল ইকরা, কায়রো।
- দাওলাতুস সালাজিকাহ: ডক্টর আবদুন নাঈম মুহাম্মদ হাসনাইন, মাকতাবাতুল আনজলো আল-মিসরিয়্যাহ।
- আস-সালাজিকাহ, তারিখুহমুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি: আবি আন-নাসর মুহাম্মদ আবদুল আজিম ইউসুফ, আইন লিন-দিরাসাত ওয়াল বুহসিল ইনসানিয়্যাহ।
- তারিখুস সালাজিকাহ ফি বিলাদিশ শাম: ডক্টর সুহাইল তাকুশ, দারুন নাফাইস, বৈরুত।
- তারিখু দাওলাতি আলি সেলজুক: ইমাদুদ্দিন আল-ইসফাহানি।

আতাবকান আজারবাইজান:

আববাসীয়দের পতনের যুগে আজারবাইজান একটি শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছিল, যা ইরাকের সেলজুকদের ওপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীতে এটি ইরাকের ওপর পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করে।

ইলদগিজ: এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “ইলদগিজ” নামক এক অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি, যিনি সুলতান মাসুদ সেলজুকির উজিরের গোলাম ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুলতান মাসুদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, এমনকি শাহজাদা আরসালান বিন তুঘরিলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয় এবং এভাবেই তাঁকে “আতাবক” বলা হতে থাকে। এরপর তিনি সুলতান তুঘরিলের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন।

৫৩১ হিজরিতে সুলতান মাসুদ তাঁকে আজারবাইজানের ওয়ালি নিযুক্ত করেন। সেলজুকরা দুর্বল হয়ে পড়তেই তিনি সেখানে নিজের স্বায়ত্তশাসিত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ইরাকের সেলজুক শাসকদের নিয়োগ ও বরখাস্ত তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হতে থাকে। ইলদগিজ এই উদ্দেশ্যে “আতাবক-ই-আজম” উপাধি গ্রহণ করে নিজের জন্য এমন এক পদমর্যাদা অর্জন করেন যা সেলজুক শাসকের চেয়েও উর্ধ্ব ছিল। এই পদের জোরেই তিনি ইরাকের সেলজুক শাসক সুলাইমান শাহকে বরখাস্ত করে হত্যা করান এবং তাঁর স্থলে নিজের সৎ ছেলে আরসালান বিন তুঘরিলকে নামমাত্র শাসক নিযুক্ত করেন।

মুহাম্মদ জাহান পাহলওয়ান: ৫৬৮ হিজরিতে ইলদগিজের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পদমর্যাদা তাঁর পুত্র “মুহাম্মদ জাহান পাহলওয়ান” গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁর সৎ ভাই আরসালান বিন তুঘরিলকে হাতের পুতুল করে রাখেন। কিছুকাল পর যখন দেখলেন যে তাঁকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, তখন ৫৭১ হিজরিতে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করান এবং তাঁর সাত বছর বয়সী পুত্র তুঘরিল বিন আরসালানকে সিংহাসনে বসান যাতে নিজের আধিপত্য বজায় থাকে। ৫৮২ হিজরিতে মুহাম্মদ জাহান পাহলওয়ানের মৃত্যু হয়। ততদিনে তাঁর শাসন বিলাদ আল-জাবাল, রে এবং ইসফাহান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

উসমান কাজিল আরসালান: জাহান পাহলওয়ানের স্থলে তাঁর ভাই উসমান কাজিল আরসালান “আতাবক” হন। ততদিনে তুঘরিল বিন আরসালান আঠারো বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি কাজিল আরসালানের আধিপত্য মানতে অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধ করে ইরাকে নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজারবাইজান ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ইলদগিজের পুত্র ও পৌত্রদের শাসন চলতে থাকে। তাঁদের প্রত্যেক শাসককে “আতাবক আজারবাইজান” বলা হতো।

উজবেক মুজাফফর উদ্দিন: “আতাবকান আজারবাইজান”-এর শাসন ৯০ বছর স্থায়ী ছিল। এর শেষ শাসক ছিলেন উজবেক মুজাফফর উদ্দিন, যাঁর শাসনের অবসান ঘটে ৬২২ হিজরিতে সুলতান জালাল উদ্দিন খাওয়ারিজম শাহের হাতে। [১]

[১] দাওলাতুস সালাজিকা: ইমাদুন নাসিম: ১১৯ থেকে ১২৬।

উত্তর আফ্রিকার সরকারসমূহ (যা বনু আব্বাসের উত্থানের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)

রুস্তমীয় সালতানাত: ১৬০ হিজরি থেকে ২৯৬ হিজরি (৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ)

১. আবদুর রহমান বিন রুস্তম: আবদুর রহমান বিন রুস্তম একজন ছাত্র ছিলেন যিনি ইবাদি ফকিহ মুসলিম বিন আবি কারিমা থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তার ধর্মের দাঈ (আহ্বায়ক) হয়ে যান। [১]

তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আফ্রিকার অসংখ্য গোত্র যেমন: মিকনাসা, লামায়া, সাদরাতা, মাজাতা, লাওয়াতা, ফাওয়ারা, আজদাজা, হাওয়ারা এবং নাফুসা তার অনুসারী হয়ে যায়। এই গোত্রগুলো একটি বিশাল এলাকায় তিলিমসান থেকে ত্রিপোলি (লিবিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস করত। আবদুর রহমান বিন রুস্তমের ডান হাত ছিলেন আবু খাত্তাব, যিনি কায়রোয়ানে গিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তার সাহায্যে আবদুর রহমান অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন পরিচালনা করেন।

আবদুর রহমান “তাহেরত” শহর নির্মাণ করে সেটিকে তার রাজধানী ঘোষণা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরবর্তী শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব শুরার ওপর ছেড়ে দেন, যারা তার পুত্র আবদুল ওয়াহাবকে নির্বাচিত করে।

২. আবদুল ওয়াহাব: আবদুল ওয়াহাব চল্লিশ বছর শাসন করেন। এই যুগে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কারণে শাসনব্যবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আবদুল ওয়াহাব মৃত্যুর পূর্বে তার পিতার বিপরীতে তার পুত্র আফলাহকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরসূরি মনোনীত করে যান।

৩. আফলাহ বিন আবদুল ওয়াহাব: আফলাহর যুগ ছিল রুস্তমীয় সালতানাতের “স্বর্ণযুগ”। এই সময়ে তাহেরত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব দিক থেকে রুস্তমীয় সালতানাত মাঝেমধ্যে আব্বাসীয় বা তাদের অনুগত মিশরীয় শাসকদের আক্রমণের শিকার হতো। ফলে এক পর্যায়ে আফলাহর পুত্র আবুল ইয়াকজান, যিনি যুবরাজও ছিলেন, আব্বাসীয়দের হাতে বন্দি হন। পুত্রের বন্দি হওয়ার শোকে পিতা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থতাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

৪. আবু বকর বিন আফলাহ: এরপর তার দ্বিতীয় পুত্র আবু বকর সিংহাসনে বসেন, যিনি ছিলেন উদাসীন ও বিলাসপ্রিয়। দুই বছর পর আবুল ইয়াকজান বনু আব্বাসের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন এবং সহযোগী হিসেবে আবু বকরকে সাহায্য করতে শুরু করেন। কিন্তু আবু বকরের অযোগ্যতার কারণে রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে আবু বকরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার পরিবর্তে আবুল ইয়াকজান শাসনভার লাভ করেন।

৫. আবুল ইয়াকজান মুহাম্মদ বিন আফলাহ: আবুল ইয়াকজান সমস্ত গোত্রীয় প্রধানদের নিয়ে একটি মজলিসে শুরা গঠন করে সবাইকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি সাম্য ও ইনসাফের সাথে বারো বছর শাসন করেন।

৬. আবু হাতেম ইউসুফ: তার পুত্র আবু হাতেম ইউসুফ এরপর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন ভদ্র স্বভাবের ও কোমল হৃদয়ের মানুষ, যার সুযোগ নিয়ে জনগণ কর্মকর্তাদের খেলনায় পরিণত করে এবং একটি দল আবু হাতেমের চাচা ইয়াকুব বিন আফলাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ...

[১] ইবাদি চিন্তাধারার খারিজিরা সুন্নাহ নববী থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। তাই অন্যান্য খারিজিদের বিপরীতে তাদের কাছে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের চর্চা অব্যাহত ছিল। এটি খারিজিদের একমাত্র দল যা আজও বিদ্যমান। বাহরাইন ও মাস্কাটে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে।

করে দিল। এভাবে রুস্তমীয় রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। কিছুকাল পর সন্ধি হলেও অন্তরে ঘৃণা বজায় ছিল। ফলে বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে আবু হাতেমকে হত্যা করে।

১. ইয়াকজান: এরপর আবু হাতেমের ভাই ইয়াকজান বিন আবি আল-ইয়াকজান শাসক হন। তার শাসনামল ছিল বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার। তিনিই রুস্তমীয় রাষ্ট্রের শেষ শাসক প্রমাণিত হন। এ যুগে খারেজিদের মধ্যে শিয়া মতবাদ ও মুতাজিলা মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া আলাদা আলাদা দল তৈরি হয়েছিল। ইয়াকজান তাদের দমনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তবে এরই মধ্যে বনু উবাইদের দাঈ আবু আব্দুল্লাহ আল-শিয়ি আফ্রিকায় পৌঁছে যান। ইয়াকজানের বিরোধীরা তার সাথে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে সাবেক নিহত শাসক আবু হাতেমের মেয়ে ‘দুসার’ও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে তার বাবার হত্যাকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। আবু আব্দুল্লাহ আল-শিয়ি উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে ২৯৭ হিজরিতে তাহেরতের ওপর আক্রমণ করে ইয়াকজান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেন। এভাবে রুস্তমীয় রাষ্ট্রের অবসান ঘটে।

এই সরকারের শাসকদের তালিকা নিম্নরূপ:

১. আব্দুর রহমান বিন রুস্তম ১৬০ হিজরি থেকে ১৬৮ হিজরি / ৭৭৬ থেকে ৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ, প্রতিষ্ঠাতা
২. আব্দুল ওয়াহাব বিন আব্দুর রহমান ১৬৮ হিজরি থেকে ২০৮ হিজরি / ৭৮৪ থেকে ৮২৩ খ্রিস্টাব্দ
৩. আফলাহ বিন আব্দুল ওয়াহাব ২০৮ হিজরি থেকে ২৩০ হিজরি / ৮২৩ থেকে ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৪. আবু বকর বিন আফলাহ ২৩০ হিজরি থেকে ২৬৮ হিজরি / ৮৫২ থেকে ৮৮১ খ্রিস্টাব্দ, পদত্যাগকারী
৫. আবুল ইয়াকজান মুহাম্মদ বিন আফলাহ ২৬৮ হিজরি থেকে ২৮১ হিজরি / ৮৭৩ থেকে ৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. আবু হাতেম ইউসুফ বিন মুহাম্মদ ২৮১ হিজরি থেকে ২৯৩ হিজরি / ৮৮১ থেকে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দ
৭. ইয়াকজান বিন মুহাম্মদ বিন আফলাহ ২৯৩ হিজরি থেকে ২৯৭ হিজরি / ৯০৬ থেকে ৯১০ খ্রিস্টাব্দ, শেষ শাসক

রুস্তমীয় রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে ১৩৬ বছর টিকে ছিল। [১]

বনু মিদরার রাষ্ট্র (সিজিলমাসা, মরক্কো): ১৪০ হিজরি থেকে ২৯৭ হিজরি (৭৫৭ থেকে ৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)

১. ঈসা বিন ইয়াজিদ: ১২২ হিজরিতে সুফরি খারেজিদের নেতা মায়সারা আল-মাতঘারি উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরক্কোতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তিনি ব্যর্থ হন, তবে সুফরি খারেজিরা দক্ষিণ মরক্কোর অঞ্চলে সংগঠিত হতে থাকে। আব্বাসীয় যুগের শুরুতে তারা মরক্কোকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে তাদের একজন নেতা ঈসা বিন ইয়াজিদ বিন আসওয়াদের হাতে বায়াত গ্রহণ করে। এটি ১৪০ হিজরির ঘটনা।

২. আবুল কাসিম মিদরার: পনের বছর পর ঈসা বিন ইয়াজিদকে হত্যা করা হয় এবং তার স্থলে “আবুল কাসিম বিন সামনুন মিদরার” স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর তার বংশেই শাসন চলতে থাকে এবং এই রাষ্ট্র “বনু মিদরার রাষ্ট্র” নামে পরিচিত হয়।

[১] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/৭৫ থেকে ৭৮; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২০০, ২০৬।

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

৩. আল-ইয়াসা: ২৭৪ হিজরিতে আবুল কাসিমের পুত্র আল-ইয়াসা শাসক হন, যিনি ‘সিজিলমাসা’র ভিত্তি স্থাপন করেন এবং একে কেন্দ্র বানিয়ে দীর্ঘ সময় শাসন করেন। তাকে বনু মিদরার রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তার শাসনামলে সিজিলমাসা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বড় কেন্দ্র এবং একটি বিশাল বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক শহরে পরিণত হয়।

বনু মিদরার আব্বাসীয়দের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিল এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন বাণিজ্য ও কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকত। অবশেষে ২৯৭ হিজরিতে বনু উবাইদ এই শাসনের অবসান ঘটায়। [১]

বনু মিদরারের শাসন প্রায় ১৫৮ বছর স্থায়ী ছিল। এর গুরুত্বপূর্ণ শাসকরা ছিলেন:

- ১. ঈসা বিন ইয়াজিদ আল-আসওয়াদ (১৪০ থেকে ১৫৫ হি. / ৭৫৭ থেকে ৭৭২ খ্রি.) - শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।
- ২. আবুল কাসিম সামকু (১৫৫ থেকে ১৬৮ হি. / ৭৭২ থেকে ৭৮৪ খ্রি.)।
- ৩. ইলিয়াস আবুল উজির (১৬৮ থেকে ১৭৪ হি. / ৭৮৪ থেকে ৭৯০ খ্রি.)।
- ৪. আল-ইয়াসা বিন আবুল কাসিম (১৭৪ থেকে ২০৮ হি. / ৭৯০ থেকে ৮২৩ খ্রি.)।
- ৫. মিদরার আল-মুনতাসির (২০৮ থেকে ২২৩ হি. / ৮২৩ থেকে ৮৩৯ খ্রি.)।
- ৬. মায়মুন বিন মিদরার (২২৩ থেকে ২৬৩ হি. / ৮৩৯ থেকে ৮৭৬ খ্রি.)।
- ৭. মুহাম্মদ (২৬৩ থেকে ২৭০ হি. / ৮৭৬ থেকে ৮৮৩ খ্রি.)।
- ৮. আল-ইয়াসা (২৭০ থেকে ২৯৭ হি. / ৮৮৩ থেকে ৯১০ খ্রি.) - শেষ শাসক।

ইদ্রিসীয় রাষ্ট্র (মরক্কো) ১৭২ হি. থেকে ৩১২ হি. : (৭৮৮ খ্রি. থেকে ৯২৪ খ্রি.)

১. ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ: মনসুর আব্বাসীয়র বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বিখ্যাত ফাতেমি নেতা নাফস-এ-জাকিয়ার এক ভাই ছিলেন ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ, যিনি নাফস-এ-জাকিয়ার হত্যার পরও বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৬৯ হিজরিতে এই পরিবারেরই এক সদস্য হুসাইন বিন আলী (বিন হাসান বিন হাসান বিন হাসান বিন আলী) মদিনার গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যাতে ইদ্রিস এবং আব্দুল্লাহও शामिल ছিলেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ তার পরিবার এবং তার গোলাম রশিদের সাথে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নেন এবং মরক্কোর ‘ওয়ালিলা’ শহরে অবস্থান করেন। সেখানে ‘আওরাবা’ গোত্রের সরদার ইসহাক বিন মুহাম্মদ তাকে স্বাগত জানান এবং তার কাহিনী শুনে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। এই গোত্রের সাহায্যে রমজান ১৭২ হিজরিতে ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা অল্প সময়ের মধ্যেই আলজেরিয়ার তিলিমসান শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়।

ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ ১৭৭ হিজরিতে হঠাৎ এক হামলায় (যার দায় বনু আব্বাসের ওপর চাপানো হয়) নিহত হন।

[১] আল-মাওসুআতুল মুজিজাতু ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৭/৮৬ থেকে ৮৯; মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২০০; আত-তারিখুল ইসলামি মাহমুদ শাকির: ৬/১১৫।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

২. ইদ্রিস বিন ইদ্রিস: ইদ্রিসের হত্যার পর তার দাসী কানজা, যিনি আসিদ গোত্রের ছিলেন, এক সন্তানের মা হন যার নাম তার পিতার নামানুসারে ইদ্রিস রাখা হয়। শিশুর শিক্ষা ও লালন-পালনের দায়িত্ব ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহর মুক্ত করা গোলাম রাশিদের ওপর ন্যস্ত হয় এবং ইদ্রিস রাষ্ট্রের নেতৃত্বও তারই হাতে থাকে। মানুষ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। বনু আব্বাস এটি দেখে বিপদ অনুভব করে এবং তিউনিসিয়ায় তাদের করদ রাজ্য আগলাবি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম বিন আগলাবকে দায়িত্ব দেয় যেন সে ইদ্রিস রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত নেতা রাশিদকে সরিয়ে দেয়। ফলে ১৮৬ হিজরিতে একটি গোপন অভিযানের মাধ্যমে রাশিদকে হত্যা করা হয়। রাশিদের মৃত্যুর পর দুই বছর পর্যন্ত ইদ্রিস রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং ইদ্রিস বিন ইদ্রিসের লালন-পালনের দায়িত্ব আবু খালিদ বিন ইয়াজিদ পালন করেন। অবশেষে ১৮৮ হিজরিতে ইদ্রিস বিন ইদ্রিস বায়াত নবায়নের মাধ্যমে নিজের পদ গ্রহণ করেন। কায়রোয়ান এবং আন্দালুসের আরব নেতৃবৃন্দ দলে দলে তার চারপাশে সমবেত হতে শুরু করেন এবং এই নতুন সরকারের উচ্চপদগুলোতে বেশিরভাগ তাদেরই নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদেরই পরামর্শে ইদ্রিস বিন ইদ্রিস মরক্কোতে একটি নতুন শহর “ফাস” নির্মাণ করে সেটিকে নিজের রাজধানী বানান। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি আলজেরিয়ার শহর তিলিমসান থেকে শুরু করে সুস আল-আকসা পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা জয় করেন।

৩. মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস: ২১৩ হিজরিতে ইদ্রিস বিন ইদ্রিসের মৃত্যু হয় এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি তার দাদি “কানজা”-র পরামর্শে রাষ্ট্রকে ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেন, যার ফলে ইদ্রিস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছরের মধ্যেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। মুহাম্মদ বিন ইদ্রিসকে এই ভুল সংশোধনের জন্য ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় এবং তিনি বেশ কিছু এলাকা পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নেন, তবে যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল তা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মুহাম্মদ বিন ইদ্রিসের পর রাষ্ট্র এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে কখনো তাকে বনু উবাইদের করদ রাজ্যে পরিণত হতে হয়, আবার কখনো আন্দালুসের উমাইয়াদের।

৪. ইয়াহইয়া তৃতীয়: সালতানাত বিভক্তির পর ইদ্রিসিদের মধ্যে কেবল ইয়াহইয়া তৃতীয় এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতাপের সাথে শাসন করেন। তবে ৩০৫ হিজরিতে তাকেও বনু উবাইদের বিশাল শক্তির সামনে মাথা নত করতে হয় এবং তিনি ভণ্ড মাহদি উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুনের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ৩১০ হিজরিতে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হয়। বনু উবাইদ তার স্থলে এই পরিবারেরই হাসান বিন মুহাম্মদকে পুতুল শাসক হিসেবে দুই বছর পর্যন্ত সিংহাসনে বসিয়ে রাখে। এরপর তাকেও অপসারিত করা হয়। এভাবে ৩১২ হিজরিতে ইদ্রিসিদের স্বাধীন শাসনের অবসান ঘটে। ইদ্রিসি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ছিল ১৪০ বছর। যদিও ইদ্রিসি পরিবারের কিছু নেতা আরও দুই শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার কিছু প্রান্তে সীমিত এলাকায় ক্ষমতাসীন ছিলেন, কিন্তু তাদের কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। ইদ্রিসি রাষ্ট্রের শাসকগণ নিম্নরূপ: [১]

- ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ: ১৭২ হি. থেকে ১৭৭ হি. / ৭৮৮ খ্রি. থেকে ৭৯৩ খ্রি. - প্রতিষ্ঠাতা
- রাশিদ মাওলা ইদ্রিস (ভারপ্রাপ্ত শাসক): ১৭৭ হি. থেকে ১৮৬ হি. / ৭৯৩ খ্রি. থেকে ৮০৩ খ্রি.
- আবু খালিদ বিন ইয়াজিদ (ভারপ্রাপ্ত শাসক): ১৮৬ হি. থেকে ১৮৮ হি. / ৮০৩ খ্রি. থেকে ৮০৫ খ্রি.

তারিখ মিল্লাতে মুসলিমা

২. ইদ্রিস সানি বিন ইদ্রিস ১৮৮ হিজরী থেকে ২১৩ হিজরী ৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩. মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস সানি ২১৩ হিজরী থেকে ২২১ হিজরী ৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ
৪. আলী বিন মুহাম্মদ ২২১ হিজরী থেকে ২৩৪ হিজরী ৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ
৫. ইয়াহইয়া আউয়াল বিন আলী ২৩৪ হিজরী ৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ
৬. ইয়াহইয়া সানি বিন মুহাম্মদ ২৩৪ হিজরী থেকে ২৫০ হিজরী ৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ
৭. আলী বিন উমর বিন ইদ্রিস সানি ২৫০ হিজরী থেকে ২৬৩ হিজরী ৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ
৮. ইয়াহইয়া সালেস বিন কাসিম বিন ইদ্রিস সানি ২৬৩ হিজরী থেকে ২৯২ হিজরী ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ
৯. ইয়াহইয়া রাবে বিন ইদ্রিস বিন উমর বিন ইদ্রিস সানি ২৯২ হিজরী থেকে ৩১০ হিজরী ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ
১০. আল-হাসান বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন ইদ্রিস সানি ৩১০ হিজরী থেকে ৩১৪ হিজরী ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ, শেষ শাসক

আগলাবি রাষ্ট্র, তিউনিস: ১৮৪ হিজরী থেকে ২৯৬ হিজরী (৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

বনু তামীমের একজন নেতা ইব্রাহিম বিন আল-আগলব আব্বাসীয় আন্দোলনের সাফল্য এবং উমাইয়া সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হারুনুর রশীদ তাঁর খিলাফতকালে ইব্রাহিমের পুত্রকে বারবারদের বিদ্রোহ দমন এবং ইদ্রিসি রাষ্ট্রের বিস্তার রোধ করার জন্য আফ্রিকার কায়রোয়ান সামরিক ছাউনিতে নিযুক্ত করেছিলেন। ইব্রাহিম একজন আলেম ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর যৌবনকাল ফুসতাত (মিশর)-এর জামে মসজিদে কাটিয়েছিলেন যা ধর্মীয় জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল এবং ইমাম লাইস বিন সাদ-এর মতো বুজুর্গদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছিলেন। তিনি হারুনুর রশীদের দেওয়া দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন।

তবে যখন আফ্রিকায় আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণ আর থাকল না, তখন ইব্রাহিম বিন আল-আগলব ১৮৪ হিজরীতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর যুগে কায়রোয়ান ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাঁর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শহর: তিউনিস, সুসা, কাবেস, গাফসা, তোজার, নাফতা, তেবিসা, মাসিলা এবং বেজাইয়া-এর গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ ইব্রাহিম বিন আল-আগলবের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি ওয়াদা রক্ষাকারী, সচ্চরিত্রবান এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সুনিপুণভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সরকার ‘আগালাবি রাষ্ট্র’ নামে পরিচিত হয়; তাঁর পর তাঁর পুত্র জিয়াদাতুল্লাহ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

জিয়াদাতুল্লাহর যুগে কায়রোয়ান, আব্বাসিয়া, তিউনিস এবং সুসার মতো শহরগুলো আগের চেয়ে বেশি জনবহুল হয়ে ওঠে। সিসিলি (সিকিলিয়া) দ্বীপেও জিহাদ সংঘটিত হয় এবং এর একটি বড় অংশ আগালাবি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, যখন বাকি এলাকাগুলোতে জিহাদ অব্যাহত ছিল।

[১] আত-তারিখুল ইসলামী, মাহমুদ শাকির: ৬/১১৬ থেকে ১১৩; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামী: ১৪/৭৯ থেকে ১৮৯; মুজাযুত তারিখিল ইসলামী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৬ থেকে ২০।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস - তৃতীয় খণ্ড

যিয়াদাতুল্লাহর পুত্র আবু আফফান আগলাবও একজন নেককার শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন, যিনি শরয়ী বিধান বাস্তবায়নে আপসহীন ছিলেন।

আহমদ বিন মুহাম্মদ পনেরো বছর শাসন করেন এবং জনকল্যাণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি প্রতি বছর শাবান ও রমজান মাসে টহল দিতেন এবং অভাবী মানুষের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি নাগরিকদের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি করেন। ইবরাহিম বিন আহমদের শাসনামল ছিল ২৮ বছর দীর্ঘ। শুরুতে তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করেন। তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন, উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্গ তৈরি করেন, কায়রোয়ানের কাছে “রাঙ্কাদা” নামক একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন এবং সেখানে একটি চমৎকার জামে মসজিদও নির্মাণ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি এক মানসিক রোগে আক্রান্ত হন এবং এই সময়ে তিনি চরম অত্যাচার চালান। অবশেষে রোগ নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার পুত্র আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ শাসনভার গ্রহণ করেন।

আবুল আব্বাস বছরের পর বছর ধরে চলা সিসিলি অভিযান সমাপ্ত করতে তৎপরতা দেখান। এই সময়ে তার পিতা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং অতীতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সিসিলির জিহাদে শরিক হন এবং ২৮৯ হিজরিতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

এই সময়ে আফ্রিকায় বনু উবাইদের দাঈ আবু আব্দুল্লাহ শিয়ীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি আগলাবি রাষ্ট্রের জন্য এক বিরাট হুমকি ছিলেন। আরও পরিতাপের বিষয় হলো, আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহকে তার অযোগ্য পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ আসগর হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন, কিন্তু তিনি বনু উবাইদের মোকাবিলা করতে পারেননি এবং খুব দ্রুতই সাহস হারিয়ে পালিয়ে যান। ২৯৭ হিজরিতে বনু উবাইদ কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই আগলাবি রাষ্ট্রের কেন্দ্র কায়রোয়ান এবং অন্যান্য শহর দখল করে নেয়। আগলাবি রাষ্ট্র প্রায় ১১৩ বছর স্থায়ী ছিল।

এর শাসকরা নিম্নরূপ: [১]

১. ইবরাহিম বিন আগলাব ১৮৪হি. থেকে ১৯৬হি. / ৮০০খ্রি. থেকে ৮১২খ্রি. প্রতিষ্ঠাতা

২. আব্দুল্লাহ আউয়াল বিন ইবরাহিম ১৯৬হি. থেকে ২০১হি. / ৮১২খ্রি. থেকে ৮১৭খ্রি.

৩. যিয়াদাতুল্লাহ আউয়াল বিন ইবরাহিম ২০১হি. থেকে ২২৩হি. / ৮১৭খ্রি. থেকে ৮৩৮খ্রি.

৪. আগলাব আবু আফফান বিন ইবরাহিম ২২৩হি. থেকে ২২৬হি. / ৮৩৮খ্রি. থেকে ৮৪১খ্রি.

৫. মুহাম্মদ আউয়াল বিন আগলাব আবু আফফান ২২৬হি. থেকে ২৩২হি. / ৮৪১খ্রি. থেকে ৮৫৬খ্রি.

৬. আহমদ বিন মুহাম্মদ আউয়াল ২৩২হি. থেকে ২৪৯হি. / ৮৪৬খ্রি. থেকে ৮৬৩খ্রি.

৭. যিয়াদাতুল্লাহ সানি বিন মুহাম্মদ আউয়াল ২৪৯হি. থেকে ২৫০হি. / ৮৬৩খ্রি. থেকে ৮৬৪খ্রি.

৮. মুহাম্মদ সানি বিন আহমদ ২৫০হি. থেকে ২৬১হি. / ৮৬৪খ্রি. থেকে ৮৭৫খ্রি.

৯. ইবরাহিম সানি বিন আহমদ ২৬১হি. থেকে ২৮৯হি. / ৮৭৫খ্রি. থেকে ৯০২খ্রি.

১০. আব্দুল্লাহ সানি বিন ইবরাহিম সানি ২৮৯হি. থেকে ২৯০হি. / ৯০২খ্রি. থেকে ৯০৩খ্রি.

১১. আবু মুদার যিয়াদাতুল্লাহ সালিস বিন আব্দুল্লাহ সানি ২৯০হি. থেকে ২৯৭হি. / ৯০৩খ্রি. থেকে ৯০৯খ্রি. শেষ শাসক

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৬/১১০; আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৭/৭১ থেকে ১৭৪; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা

উত্তর আফ্রিকার সরকারসমূহ (যা বনু আব্বাসের পতনের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)

জিরি রাজবংশ (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া): ৩৬২ হিজরি থেকে ৫৪৩ হিজরি (৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

এই সরকার ছিল বার্বারদের শক্তিশালী গোত্র সানহাজার। বার্বারদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রেরই একজন সর্দার জিরি বিন মানাদ ৩৩৫ হিজরিতে আবু ইয়াজিদ খারিজির বিরুদ্ধে বনু উবাইদকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে উবাইদি শাসক আল-মানসুরের কাছ থেকে সম্মানসূচক পোশাক লাভ করেছিলেন। এরপর থেকে জিরি এবং তার পরিবার বনু উবাইদের বিশেষ অনুগত হিসেবে গণ্য হতে থাকে। ৩৫৮ হিজরিতে বনু উবাইদ মিশর দখল করে এবং ৩৬১ হিজরিতে উবাইদি শাসক আল-মুইজ সেখানে স্থানান্তরিত হন। যাওয়ার সময় তিনি তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ার বিশাল এলাকা, যেখান থেকে বনু উবাইদ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল, সেখানে জিরি বিন মানাদের পুত্র ইউসুফ বুলুন্ধিনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

- ইউসুফ বুলুন্ধিন: ইউসুফ বুলুন্ধিন অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন করেন। তিনিই “আলজেরিয়া” শহর নির্মাণ করেন এবং এই এলাকাকে শান্তিপূর্ণ করে তোলেন। তবে তাকে বেশ কিছু বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। জিলহজ ৩৭৩ হিজরিতে সিজিলমাসাকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করার অভিযানের সময় তার মৃত্যু হয়।
- মনসুর বিন ইউসুফ: তার মৃত্যুর পর তার ওসিয়ত অনুযায়ী তার পুত্র মনসুর শাসক হন, যিনি পিতার বিপরীতে নরম মেজাজের ছিলেন। তার শাসনকাল বেশিরভাগ সময় বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হয়। ৩৮৬ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।
- বাদিস বিন মনসুর: এবার মনসুরের পুত্র বাদিস সিংহাসনে আরোহণ করেন, যিনি মরক্কোর গভর্নর ছিলেন। তিনি ৩৯৮ হিজরিতে তার চাচা হাম্মাদ বিন ইউসুফকে আলজেরিয়ার “আশির শহর”-এর শাসনভার পূর্ণাঙ্গভাবে অর্পণ করেন। এখান থেকে বনু জিরি রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: বর্তমান তিউনিসিয়া এবং লিবিয়ার জেলাগুলো বাদিসের বংশধরদের কাছে থাকে। আলজেরিয়ার জেলাগুলো হাম্মাদের বংশধরদের কাছে চলে যায়।
- মুইজ বিন বাদিস: বাদিস ৪০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অল্পবয়সী পুত্র মুইজ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি শৈশবে ওলামাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের কারণে পরিপক্ক চিন্তার সুন্নি ছিলেন। মুইজ তার রাষ্ট্রকে বনু উবাইদের আনুগত্য থেকে মুক্ত করেন এবং বনু উবাইদের পরিবর্তে বনু আব্বাসের খুতবা জারি করেন। মুইজ বিন বাদিসের শাসনকাল ছিল বনু জিরি বংশের স্বর্ণযুগ, যাতে দ্বীনি ইলম ব্যাপকতা লাভ করে এবং মানুষ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া ইসমাইলি মতবাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়। মুইজ তার চাচাতো ভাই বনু হাম্মাদের সাথে সন্ধি বজায় রাখেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম রাখেন। এ পর্যন্ত বনু জিরির রাজধানী ছিল কায়রোয়ান, কিন্তু বনু উবাইদের প্ররোচনায় আরব গোত্রগুলোর আক্রমণের ফলে মুইজ কায়রোয়ান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন এবং একটি বিশাল এলাকা তার হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর বনু জিরি শেষ পর্যন্ত “মাহদিয়া”কে তাদের কেন্দ্র হিসেবে ধরে রাখে।

তামিম বিন মুইজ: ৪৫৩ হিজরীতে মুইজের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র তামিম শাসক হন। তিনি অনেক হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার পরেও নিজের সরকারকে সুসংহত রাখেন। ৫০১ হিজরীতে তামিমের মৃত্যু হয়।

ইয়াহইয়া বিন তামিম: এরপর তার পুত্র ইয়াহইয়া শাসক হন। তিনি একজন মুজাহিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করে ভূমধ্যসাগরের সেই দ্বীপগুলোতে যেখানে রোমানদের সামরিক ঘাঁটি ছিল, সেখানে গেরিলা আক্রমণের ধারা শুরু করেন। ৫০৯ হিজরীতে ঈদুল আযহার দিন তিনি হঠাৎ ইন্তেকাল করেন।

আলী বিন ইয়াহইয়া: এখন ইয়াহইয়ার পুত্র আলী সিংহাসনে বসেন। তিনিও নৌ জিহাদ অব্যাহত রাখেন এবং বিদ্রোহগুলোও দমন করেন। ৫১৫ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়।

হাসান বিন আলী: আলীর স্থলে তার বারো বছর বয়সী পুত্র হাসান তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার সময়ে রোমানরা জিরি রাষ্ট্রের উপকূলীয় শহরগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। হাসান দীর্ঘ সময় সফলভাবে প্রতিরক্ষা করতে থাকেন। তবে ৫৪৩ হিজরীতে রোমানরা একটি বিশাল নৌবহর প্রস্তুত করে মাহদিয়ার ওপর আক্রমণ করে। হাসান বিন আলী তাদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখতেন না। তিনি সপরিবারে পালিয়ে তার চাচাতো ভাই বনী হাম্মাদের কাছে আলজেরিয়ায় চলে যান, যারা তাকে নজরবন্দি করে রাখে। পরে রোমানরা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই মাহদিয়া দখল করে নেয়। এভাবে বনী জিরি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। [১]

বনী জিরি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ছিল ১৩৬ বছর। এর শাসকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. ইউসুফ বুলুক্কিন বিন জিরি ৩৬১ হি. থেকে ৩৭৩ হি. / ৯৭২ থেকে ৯৮৩ খ্রি. গভর্নর
২. মনসুর বিন ইউসুফ ৩৭৩ হি. থেকে ৩৮৬ হি. / ৯৮৩ থেকে ৯৯৫ খ্রি.
৩. বাদিস বিন ইউসুফ ৩৮৬ হি. থেকে ৪০৬ হি. / ৯৯৫ থেকে ১০১৫ খ্রি.
৪. মুইজ বিন বাদিস ৪০৬ হি. থেকে ৪৫৩ হি. / ১০১৫ থেকে ১০৬২ খ্রি. প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা
৫. তামিম বিন মুইজ ৪৫৩ হি. থেকে ৫০১ হি. / ১০৬২ থেকে ১১০৮ খ্রি.
৬. ইয়াহইয়া বিন তামিম ৫০১ হি. থেকে ৫০৯ হি. / ১১০৮ থেকে ১১১৫ খ্রি.
৭. আলী বিন ইয়াহইয়া ৫০৯ হি. থেকে ৫১৫ হি. / ১১১৫ থেকে ১১২১ খ্রি.
৮. হাসান বিন আলী ৫১৫ হি. থেকে ৫৪৩ হি. / ১১২১ থেকে ১১৪৮ খ্রি. শেষ শাসক

দৌলত বনী হাম্মাদ, আলজেরিয়া: ৩৯৮ হি. থেকে ৫৪৭ হি. (১০০৭ থেকে ১১৫২ খ্রি.)

- হাম্মাদ বিন বুলুক্কিন: এটি আল-জিরি সরকারেরই একটি শাখা ছিল যা হাম্মাদ বিন বুলুক্কিন ৩৯৮ হিজরীতে আল-মাগরিব আল-আওসাত (আলজেরিয়া)-এ গঠন করেছিলেন। পরে তিনি মরক্কো সরকারের “ফাস” এলাকাগুলোও দখল করেন।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৬/২০৫ থেকে ২১৪; মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২২৫; আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিল তারিখিল ইসলামি: ১৪/৮৬-৯০।

তারিখ উম্মতে মুসলিমাহ

৩. **আল-কায়েদ বিন হাম্মাদ:** এই সরকারের দ্বিতীয় প্রধান আল-কায়েদ বিন হাম্মাদ, যিনি জিরি রাজবংশের প্রধান মুইজ বিন বাদিসের সমসাময়িক ছিলেন, ২৪ বছর দীর্ঘ সময় রাজত্ব করেন এবং ৪৪৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. **মুহসিন বিন কায়েদ:** তাঁর পুত্র মুহসিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য ও অত্যাচারী ব্যক্তি। তিনি মাত্র নয় মাস সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং নিজের পরিবারের বিদ্রোহের শিকার হয়ে নিহত হন।

৫. **বুলুগগিন মুহাম্মদ বিন হাম্মাদ:** তাঁর স্থলে তাঁর চাচাতো ভাই বুলুগগিন মুহাম্মদ বিন হাম্মাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনিও একজন কঠোর ও নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে মরক্কো মুরাবিতুনদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং তাদের আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের সৌভাগ্যের নক্ষত্র তুঙ্গে ছিল। তবে বুলুগগিন ৪৫৪ হিজরিতে মুরাবিতুনদের নিজ সীমান্ত থেকে মরুভূমির দিকে পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং অগ্রসর হয়ে ‘ফাস’ পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই অভিযান থেকে ফেরার পথে বুলুগগিন তাঁর চাচাতো ভাই আন-নাসিরের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং সেনাবাহিনীর সেই কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন যারা তাঁর কঠোরতায় অসন্তুষ্ট ছিল।

৬. **আন-নাসির:** ৪৫৪ হিজরিতে আন-নাসির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনামল ছিল বনু হাম্মাদের স্বর্ণযুগ, যে সময়ে বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল এবং শহরগুলোর সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল।

৭. **আল-মানসুর বিন আন-নাসির:** ৪৮১ হিজরিতে আন-নাসিরের পর তাঁর পুত্র আল-মানসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪৮৩ হিজরিতে ‘বেজাইয়া’কে তাঁর রাজধানী বানান। সেখানে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। প্রাসাদ, দুর্গ ও মিনার নির্মাণ করা হয় এবং বাগান লাগানো হয়। তাঁর আমলে মুরাবিতুনরা উন্নতির শিখরে ছিল। বনু হাম্মাদের সাথে তাদের বেশ কিছু যুদ্ধ হয়। তবে আল-মানসুর সফলভাবে নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করেন।

৮. **বাদিস বিন আল-মানসুর:** ৪৯৮ হিজরিতে আল-মানসুরের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র বাদিস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু তিনি এক বছর পূর্ণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

৯. **আব্দুল আজিজ বিন আল-মানসুর:** তাঁর স্থলে তাঁর ভাই আব্দুল আজিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁর সময়কাল ছিল শান্তি ও স্থিতিশীলতার।

১০. **ইয়াহইয়া বিন আব্দুল আজিজ:** ৫১৫ হিজরিতে আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পুত্র ইয়াহইয়া সিংহাসনে বসেন। তিনি নারী এবং ভ্রমণ ও শিকারে মগ্ন থাকতেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। এই সময়ে বনু উবাইদ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ইয়াহইয়া প্রথমবারের মতো বনু হাম্মাদ রাষ্ট্রে বনু উবাইদের মুদ্রার পরিবর্তে নিজের রাষ্ট্রীয় মুদ্রা চালু করেন, যাতে আব্বাসীয় খলিফার নামও খোদাই করা ছিল।

ইয়াহইয়ার শাসনামলে রোমানরা বনু জিরির রাজধানী মাহদিয়া দখল করে নেয় এবং সেখানকার শেষ শাসক হাসান বিন আলী ইয়াহইয়ার কাছে এসে বেজাইয়াতে আশ্রয় নেন। কিন্তু বেজাইয়াও বেশিদিন নিরাপদ থাকেনি; কারণ উত্তর আফ্রিকায় মুওয়াহহিদুনরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের আক্রমণের মুখে ইয়াহইয়াকেও পিছু হটতে হয় এবং বেজাইয়া মুওয়াহহিদুনদের দখলে চলে যায়। ইয়াহইয়া কিছুকাল এখানে-সেখানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ান। অবশেষে ৫৪৭ হিজরিতে তিনি আব্দুল মুমিনের নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। ৫৫৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এভাবেই রাষ্ট্র...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বনী হান্মাদের শেষ উত্তরাধিকারীও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

দৌলতে বনী হান্মাদের শাসকরা ছিলেন নিম্নরূপ:

- ১. হান্মাদ বিন বুলুগগিন — ৩৯৮ হিজরি থেকে ৪১৯ হিজরি — ১০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৮ খ্রিস্টাব্দ — প্রতিষ্ঠাতা
- ২. আল-কায়েদ বিন হান্মাদ — ৪১৯ হিজরি থেকে ৪৪৬ হিজরি — ১০২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ
- ৩. মুহসিন বিন কায়েদ — ৪৪৬ হিজরি (৯ মাস) — ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ
- ৪. বুলুগগিন মুহাম্মদ বিন হান্মাদ — ৪৪৬ হিজরি থেকে ৪৫৪ হিজরি — ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৬২ খ্রিস্টাব্দ
- ৫. আন-নাসির বিন আলনাস — ৪৫৪ হিজরি থেকে ৪৮১ হিজরি — ১০৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ
- ৬. আল-মানসুর বিন আন-নাসির — ৪৮১ হিজরি থেকে ৪৯৮ হিজরি — ১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ
- ৭. বাদিস বিন আল-মানসুর — ৪৯৮ হিজরি, এক বছরেরও কম — ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ
- ৮. আব্দুল আজিজ বিন আল-মানসুর — ৪৯৮ হিজরি থেকে ৫১৫ হিজরি — ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১২১ খ্রিস্টাব্দ
- ৯. ইয়াহইয়া বিন আব্দুল আজিজ — ৫১৫ হিজরি থেকে ৫৪৭ হিজরি — ১১২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫২ খ্রিস্টাব্দ — শেষ শাসক

বনু হান্মাদ ১৪৯ বছর পর্যন্ত শাসন করেছিল। [১]

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বনু হান্মাদ এবং বনু জিরির যুগ একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সামগ্রিকভাবে এই যুগটি ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির। তিউনিসিয়া থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত কৃষি তার শিখরে ছিল, যার ওপর অধিকাংশ আফ্রিকান গোত্রের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। তুলা, আখ, জলপাই, যব, খেজুর, আঙুর এবং কলার উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হতো। কাপড় বিক্রেতা, কসাই এবং কাঁচ শিল্পীদের আলাদা আলাদা বাজার বসত। কাপড় বুনন, মাটির পাত্র তৈরি, চামড়া শিল্প এবং হাঁস-মুরগি পালনের পেশাগুলো সাধারণ ছিল। গম এবং জলপাই তেলসহ এখানকার বিভিন্ন পণ্য উপকূলীয় পথের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোতে পৌঁছাত। [২]

দৌলতে আলে খায়রুন (বনী যানাতা) লিবিয়া, ৩৯০ হিজরি থেকে ৫৪০ হিজরি (৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দ):

আলে জিরির পক্ষ থেকে ত্রিপোলি (লিবিয়া)-র গভর্নর ফুলফুল বিন সাঈদ বিন খায়রুন আল-যানাতি বনু উবাইদ এবং আলে জিরির মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নেন এবং ৩৯০ হিজরিতে নিজের এলাকায় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই সরকার খুব বেশি স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। বনু উবাইদ এবং বনু জিরির সাথে এর টানাপোড়েন চলতেই থাকে। পরিশেষে বনু মাত্রহ নামক একটি পরিবার আলে খায়রুনকে বিতাড়িত করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে। তবে ৫৪১ হিজরিতে ফিরিজিরা তাদের পরাজিত করে এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। ৫৫৫ হিজরিতে মুওয়াহহিদিনরা ফিরিজিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই এলাকাকে নিজেদের শাসনাধীনে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। [৩]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৬/২২৮ থেকে ২৩৫; মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২৪১, ২৪২

[২] আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৪/৯২

[৩] মুজাযুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২৩৫

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ইয়েমেনের সরকারসমূহ

ইয়াফুরি রাষ্ট্র (সানা-ইয়েমেন): ২২৫ হিজরি থেকে ৩৯৩ হিজরি (৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ)

ইব্রাহিম বিন ইয়াফুর হিময়ারি, যিনি আব্বাসীয় সরকারের পক্ষ থেকে ইয়েমেনের ওয়ালি ছিলেন, তিনি স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করেন। তিনি ২২৫ হিজরি (৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ২৪৭ হিজরি (৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত এখানে শাসন করেন। তাঁর নাতি ইয়াফুর বিন আব্দুর রহিম বিন ইব্রাহিম ২৭৩ হিজরি (৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ২৭৯ হিজরি (৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করেন এবং এই রাষ্ট্রকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসিত ও সুসংহত করেন।

এই সরকারের একদিকে জাইদি ইমামদের সাথে এবং অন্যদিকে কারামাতিদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। কারামাতিদের দমনে এটি বড় ভূমিকা পালন করে। অবশেষে ৩৯৩ হিজরিতে (১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) এই সরকার ইমাম আইয়ানি আল-জাইদির অনুগত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। [১]

জিয়াদি রাষ্ট্র (জাবিদ-ইয়েমেন): ২০৩ হিজরি থেকে ৪১২ হিজরি (৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২১ খ্রিষ্টাব্দ)

মামুনুর রশিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ নামক একজন কর্মকর্তাকে (যিনি জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের বংশধর ছিলেন) ইয়েমেনে পাঠান যাতে তিনি “তিহামা” অঞ্চলে আলবিদের বিদ্রোহ দমন করতে পারেন। কিন্তু এখানে এসে তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাবিদ নামক শহর নির্মাণ করে সেটিকে নিজের রাজধানী বানান। ২০৩ হিজরি থেকে ২৩৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে কিছুকাল এই শাসন চলে এবং পরে বিভক্তির শিকার হয়ে তা শেষ হয়ে যায়। [২]

নাজাহ রাষ্ট্র (জাবিদ-ইয়েমেন): ৪০৩ হিজরি থেকে ৫৫৩ হিজরি (১০১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)

জিয়াদি রাষ্ট্রের একজন মুক্ত করা হাবশি গোলাম নাজাহ ৪০৩ হিজরিতে জাবিদে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানে শাসন করতে থাকেন। এরপর বনু সুলাইহ এখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে। তবে কিছুকাল পর নাজাহর উত্তরাধিকারীরা বনু সুলাইহ থেকে নিজেদের এলাকা পুনরুদ্ধার করে নেয়। উভয় পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, অবশেষে সাঈদ বিন নাজাহ এখানে একটি সুসংহত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

সাঈদ বিন নাজাহর পর নাজাহ রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এখানে হাবশিরা আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। বনু নাজাহর মনসুর বিন ফাতিক তাদের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন। পরিণামে এখানে বনু উবাইদের এক সমর্থক গোষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার করে, কিন্তু ৫৫৩ হিজরিতে খারিজিদের একটি গোত্র বনু মাহদি তাদের তাড়িয়ে দেয়। ৫৬৯ হিজরিতে এই অঞ্চল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। [৩]

[১] মুজায়ুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২১৯

[২] মুজায়ুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২১৯

[৩] মুজায়ুত তারিখিল ইসলামি, পৃ. ২২৫

সলিহী রাষ্ট্র (ইয়েমেন): ৪২৯ হিজরি থেকে ৫৬৯ হিজরি (১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ)

আলী বিন মুহাম্মদ সলিহী নামক এক বাতেনী ইসমাইলি দাঈ ইয়েমেনে বনু উবাইদের দাওয়াতকে সাধারণ করেন এবং তাদেরই সাহায্যে পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে পুরো ইয়েমেনের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে সানআকে নিজের রাজধানী বানান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বনু নাজাহ গোত্র তাকে হত্যা করে, কিন্তু তার পুত্র মুকাররম বনু উবাইদের সহযোগিতায় নিজের সিংহাসন ফিরে পেতে সফল হন। মুকাররমের পর এই সরকার দুর্বল হতে থাকে। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন মিসর থেকে ইসমাইলি শাসনের অবসান ঘটান, তখন এর পর ইয়েমেনের করদাতাদেরও দমন করা জরুরি মনে করেন। چنانچه সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অনুমতিতে তার ভাই তুরান শাহ ৫৬৯ হিজরিতে ইয়েমেনে সৈন্য পরিচালনা করে এই শাসনের অবসান ঘটান। [১]

এই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ছিলেন নিম্নরূপ:

- ১. আলী বিন মুহাম্মদ সলিহী: ৪২৯ হিজরি থেকে ৪৫৯ হিজরি / ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ
- ২. মুকাররম বিন আলী: ৪৫৯ হিজরি থেকে ৪৮৪ হিজরি / ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৯১ খ্রিস্টাব্দ
- ৩. আরওয়া বিনতে আহমদ সলিহী: ৪৯২ হিজরি থেকে ৫৩২ হিজরি / ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দ

(মুকাররম বিন আলীর স্ত্রী)

□□□

বনু জুরআই রাষ্ট্র (এডেন, ইয়েমেন): ৪৭৬ হিজরি থেকে ৫৬৯ হিজরি (১০৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ)

মুকাররম সলিহী যখন এডেন এবং এর আশপাশের এলাকা দখল করেন, তখন বনু জুরআই-এর দুই ব্যক্তি: আব্বাস এবং মাসউদকে, যারা তার সমমনা ছিল, এই এলাকার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। তারা উভয়ই বনু সলিহীকে বার্ষিক খরাজ প্রদান করত। একইভাবে তাদের সন্তানরাও এখানে বনু সলিহীর অনুগত হিসেবে শাসন করতে থাকে। তবে পরবর্তীতে এই সরকার স্বায়ত্তশাসিত হয়ে যায় এবং সলিহী শাসনের পর ইয়েমেনের সবচেয়ে শক্তিশালী সরকার হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এখানকার শাসকদের নিয়োগ ও বরখাস্ত বনু উবাইদ করত। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ভাই তুরান শাহ ৫৬৯ হিজরিতে এই শাসনেরও অবসান ঘটান। [২]

□□□

[১] মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২৪৭।

এই যুগের একজন আলেম শেখ মুহাম্মদ বিন মালিক ইয়ামানি (মৃত্যু ৪৭০ হিজরি) বাতেনীদের প্রকৃত আকিদা-বিশ্বাস জানার জন্য সলিহীদের বৃত্তে शामिल হয়েছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তাদের সমস্ত অবস্থা জেনে নেন এবং এরপর ‘কাশফুল আসরারিল বাতেনিয়া’ নামে একটি চমৎকার কিতাব লেখেন, যাতে তাদের সমস্ত রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে এবং আলী বিন মুহাম্মদ সলিহীর কর্মকাণ্ডও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। (দেখুন: কাশফুল আসরারিল বাতেনিয়া, পৃষ্ঠা ২২; পৃষ্ঠা ৭২-৭৫। মাকতাবাতুস সামি, রিয়াদ)

[২] মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২৪৯।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হামদানি রাষ্ট্র (সানআ): ৪৯২ হিজরি থেকে ৫৯৬ হিজরি (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হাতেম বিন গাশাম হামদানি বনু সুলাইহ থেকে সানআ ছিনিয়ে নিয়ে এখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বনু উবাইদের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। হামদানির বংশধররা এক শতাব্দী পর্যন্ত এখানে শাসন করতে থাকে। অবশেষে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উত্তরসূরিরা ৫৯৬ হিজরিতে একে “আইয়ুবী রাষ্ট্র”-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। [১]

জাইদি রাষ্ট্র - আলে রসি (সানআ - ইয়েমেন): ২৮০ হিজরি থেকে ১৩৮২ হিজরি (৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ)

হুসাইন বিন কাসিম আল-রসি (আলে হাসান বিন আলী) ২৮০ হিজরিতে ইয়েমেনকে নিজের আবাসস্থল বানান এবং নিজের বাইয়াতের জন্য দাওয়াত দেন। এরপর তার পুত্র ইয়াহইয়া বিন হুসাইন এই মসনদ গ্রহণ করেন এবং “হাদী” উপাধির সাথে মানুষের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে “সাদা”-কে কেন্দ্র বানিয়ে ২৮৪ হিজরিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইমামতের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজের শাসনের সূচনা করেন। তিনি একজন দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি সানআও দখল করে নেন এবং এক বিশাল ভূখণ্ডে নিজের মুদ্রা চালু করেন।

ইয়াহইয়া বিন হুসাইনের বংশধরদের মধ্যে এই শাসন দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। ইয়েমেনে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শাসনব্যবস্থার সাথে এর সংঘাতও চলতে থাকে। এই শাসনের পতনও এসেছিল এবং সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে (ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দ শতাব্দীতে) এটি “সাদা”-এর সীমিত ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তা সত্ত্বেও এটি ছিল ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘতম শাসন যা ১০৯৮ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। এই শাসনের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ নিম্নরূপ:

১. আল-হাদী, ইয়াহইয়া বিন হাসান ২৮৪ হিজরি থেকে ২৯৮ হিজরি ৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯১১ খ্রিষ্টাব্দ
২. আল-মুতাওয়াফিল, আহমদ বিন সুলাইমান ৫৩২ হিজরি থেকে ৫৬৬ হিজরি ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ
৩. আল-মাহদী, মুহাম্মদ বিন আল-মুতাহার ৬৯৭ হিজরি থেকে ৭২৮ হিজরি ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দ
৪. শরফুদ্দিন বিন আল-মাহদী ৯১২ হিজরি থেকে ৯৬৫ হিজরি ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দ
৫. ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন হামিদুদ্দিন ১৩২৬ হিজরি থেকে ১৩৬৭ হিজরি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ
৬. আল-বদর বিন আহমদ ১৩৮২ হিজরি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

আল-বদরের শাসনামলে ইয়েমেনে বিপ্লব আসে এবং এই শাসনের অবসান ঘটে। [২]

নোট: উল্লিখিত শাসনব্যবস্থাগুলো ছাড়াও গজনভি, ঘুরি, খাওয়ারিজমি, আতাবকি, আইয়ুবী এবং মামলুকদের শাসনও বাগদাদের আবাসীয় খিলাফতের যুগের সাথে সম্পর্কিত, তবে আমরা সেগুলোকে ‘তারিখ উম্মতে মুসলিমা’-এর চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। কারণ বিশ্ব ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে এগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। এখানে আমরা পাঠকদের মৌলিক তথ্য প্রদানের জন্য কিছু শাসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

[১] মুজাযুত তারিখিল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২৪৯

[২] মুজাযুত তারিখিল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২২৭

উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসী খিলাফতের সমান্তরালে পথভ্রষ্ট দলগুলোর শাসনব্যবস্থা

খিলাফতের সমান্তরাল বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বনু আব্বাসের সমসাময়িক সরকারগুলোর আলোচনার পাশাপাশি তাদের সমসাময়িক কিছু ফিতনাপূর্ণ আন্দোলনের পর্যালোচনা করাও জরুরি, যা বাগদাদের সীমানার বাইরে লালিত-পালিত হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের ইতিহাসে যার গভীর প্রভাব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের সামনে রয়েছে:

- ইসমাইলিয়া ফেরকা
- কারামিতা
- বনু উবায়দ রাষ্ট্র
- বাতেনিয়া রাষ্ট্র, বাতেনিয়া আলমুত
- গ্রীক দর্শনের পুনরায় আক্রমণ এবং বাতেনিয়াতের ফিতনা
- দার্শনিক ফিতনাগুলোর মোকাবিলায় সে যুগের উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

এখন আমরা এই বিষয়গুলো আলাদাভাবে পর্যালোচনা করছি। এটি মনে রাখা উচিত যে, এই বিষয়গুলোর যোগসূত্র তৃতীয় হিজরি শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

□□□

বাগদাদ খিলাফতের পতন যুগে বিভ্রান্ত ফেরকাগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের দাঈদের মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় এবং নিজ নিজ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালায়। এই সমস্ত ফেরকা শিয়া মতবাদের চরমপন্থা থেকে জন্ম নিয়েছিল। এই নতুন ফেরকাগুলোর কিছু মৌলিক নীতি ছিল সেগুলোই যা আব্দুল্লাহ বিন সাবা পেশ করেছিল, তবে এর সাথে মজদক, জরখুস্ত্র এবং দার্শনিকদের শিক্ষাকেও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কৃত্রিম ধর্মগুলোতে যুক্তিনির্ভর মূলনীতি তৈরির অবাধ সুযোগ ছিল; তাই প্রতিটি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজ নিজ খেয়ালখুশি মতো ইজতিহাদ করতে থাকে।

এই “নতুন ইসলাম” আনার জন্য সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, যার জন্য জনগণকে নিজের চারপাশে সমবেত করা ছিল প্রথম ধাপ। জনমনে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে উচ্চ বংশীয় মর্যাদার প্রভাব সর্বদা প্রতিটি সমাজেই বিদ্যমান ছিল। ইসলামী সমাজে হাশেমী বংশের চেয়ে অধিক আভিজাত্য আর কিছু হতে পারত না; তাই হাশেমী, আলভী এবং ফাতেমী হওয়ার দাবি করা যেকোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির জন্য আকর্ষণীয় এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। অ-সাদাতদের জন্য এই উদ্দেশ্যে সাদাতদের সাথে বংশীয় সম্পর্কের ভান করা জরুরি ছিল।

তারিখ উন্মত-এ-মুসলিমা

এই দুঃসাহস কেবল চরম বিবেকহীন এবং অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তিরাই করতে পারত।

এই দিকগুলো সামনে রেখে যদি তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়, তবে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাবে যে, একের পর এক অনেক অপরিচিত লোক নিজেদের সাদাত (সৈয়দ) দাবি করে সামনে আসে, শিয়া এবং সরলমনা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে হত্যা ও লুণ্ঠনের এক তুফান সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে নিজের জন্মস্থানে কোনো সুখ্যাতি অর্জন করে সেখান থেকে আন্দোলন শুরু করেছিল এবং নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে আগে থেকেই সুপরিচিত ছিল। এই একটি পয়েন্টই এই লোকদের সন্দেহভাজন করার জন্য যথেষ্ট।

আধ্যাত্মিকতার নামে প্রতারণা করা এবং রাতারাতি অসাধারণ খ্যাতি অর্জনকারী জাদুকরদের আজও যদি দেখা হয়, তবে তাদের মধ্যে এই বিষয়টি সাধারণ দেখা যাবে যে, তারা হঠাৎ কোনো স্থানে উচ্চ বংশীয় সম্পর্ক এবং অদ্ভুত সব দাবির সাথে আবির্ভূত হয় এবং হঠাৎ করেই বিখ্যাত হয়ে যায়। যদি অনুসন্ধান করা হয় যে তারা কোন গ্রামের বা কোন মহল্লার, তাদের পিতামাতা কোথাকার, তাদের সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মতামত কী? তবে সাধারণত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কখনোই পাওয়া যায় না। সরলমনা সাধারণ মানুষ তাদের দাবির ওপর “ঈমান বিল গায়েব” নিয়ে আসে, যেখানে বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের থেকে দূরে থাকে। যদি কখনো কোনো গবেষক এই ধরনের দাবিদারদের বংশপরিচয় জানতে বের হয়, তবে সে কানে হাত দিয়ে (হতবাক হয়ে) ফিরে আসে।

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর জাল ভাগ্য-অন্বেষণকারীরাও জানত যে, যখনই কোনো ব্যক্তি নিজেকে হাসানি, হসাইনি, আলবি বা ফাতিমি বলে দাঁড়ায়, তখন সাধারণ মানুষের বিশাল জনশ্রোত অন্ধ ভক্তিতে লিপ্ত হয়ে তার পেছনে চলতে শুরু করে। বিশেষ করে যখন কেউ নিজেকে মাহদি বলে দাবি করে, তখন সরলমনা মুসলমানরা তার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রাখে। এই ধূর্ত ও প্রতারক লোকদের কাছে বংশমর্যাদা, ধন-সম্পদ, সম্মান-খ্যাতি বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো যোগ্যতা ছিল না যার মাধ্যমে তারা ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখতে পারত; তাই তারা ক্ষমতার প্রাসাদে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ততম পথ এটাই মনে করেছিল যে, ফাতিমি এবং হাসানি ও হসাইনি সেজে যাওয়া এবং সুযোগ পেলে মাহদি হওয়ার দাবিও করে বসা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে বিদ্রোহকারী সঠিক বংশীয় আলবি ব্যক্তিদের মধ্যে ইদ্রিস বিন আব্দুল্লাহ বা হাসান বিন যায়েদ ব্যতীত আর কেউ সরকার গঠনে সফল হননি। অধিকাংশ বিদ্রোহই ব্যর্থ হয়েছে। এর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, এই ব্যক্তিদের আকিদা ও আদর্শ ছিল তাই যা সাধারণ মুসলমানদের ছিল। তারা মিথ্যা কারামত দেখানো এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার অভ্যস্ত ছিলেন না, আর না তারা প্রতারণা ও কূটকৌশল অবলম্বন করে জনগণকে বোকা বানানোর পক্ষপাতী ছিলেন; তাই সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে এমন কোনো নতুনত্ব দেখতে পেত না। তাদের দাওয়াতে এমন কোনো কথা ছিল না যা মানুষকে চরমপন্থী কায়দায় সাধারণ মুসলমানদের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলত।

তাদের বিপরীতে যখন তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে কিছু তথাকথিত আলবি নতুন আকিদা ও আদর্শ নিয়ে দাঁড়াল, তখন নিঃসন্দেহে তাদের দাওয়াত সেই ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছিল যা সাহাবী এবং আসলাফ থেকে বর্ণিত এবং তিন শতাব্দী ধরে তিন মহাদেশে...

প্রচলিত ছিল। এই নতুন দাওয়াতে নফসের স্বাধীনতার পাশাপাশি সরকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লালচও ছিল। নিত্যনতুন জাদুকরী কৌশলের ছোঁয়াও ছিল এবং ত্রোদ ও উত্তেজনার আগুনও ছিল। ফলে এই আন্দোলনগুলোর কর্মীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই একই জোশ ও উদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেমন এক দ্বীনের অনুসারীরা অন্য দ্বীনের অনুসারীদের সাথে লড়াই করে। সাধারণ মুসলিমদের নাস্তানাবুদ করার এই সেই উদ্দীপনা ছিল যার ভিত্তিতে সাহেব আল-জাঞ্জ, কারামিতা এবং বনু উবাইদের মতো তথাকথিত আলবীদের আন্দোলনগুলো বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তারা সবাই ‘হবেব আলে মুহাম্মদ’ (মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা) এর স্লোগান দিয়ে ছোট-বড় অনেক সরকার গঠন করেছিল। তারা সবাই ভ্রান্ত আকিদার অধিকারী ছিল এবং স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে তারা নিজেদের ভুলভাবে আলবী বা ফাতেমী বলে দাবি করত। তাদের বংশপরিচয় *ادات كرام* (ادات কেরাম)-দের সাথে প্রমাণিত করা যায় না এবং তাদের আকিদা ও আমল দেখে কোনো মুসলমান এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে বনু হাশিম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের রক্ত এমন হতে পারে; বরং তাদের অবস্থা পড়ে যে কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এটাই বলবে যে, তারা ছিল ধূর্ত ও সুযোগসন্ধানী লোক যারা বাতিল লক্ষ্য পূরণের জন্য ময়দানে এসেছিল।

বংশপরিচয়ের দাবির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের পর এই দাবিদারদের কাছে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ছিল সেই আকিদাগুলো যা প্রকৃতপক্ষে এই নিন্দনীয় আন্দোলনগুলোকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

এগুলোর মধ্যে প্রথম আকিদাটি ছিল ইমামত সংক্রান্ত, যা যদিও সাধারণ আকারে আবদুল্লাহ বিন সাবার যুগ থেকে চলে আসছিল, কিন্তু এখন তা আরও বিস্তারিতভাবে পেশ করা হলো। এর সারসংক্ষেপ ছিল এই:

“ইমামত একটি বিশেষ পদ যা তাওহীদ ও রিসালাতের মতো দ্বীনের একটি মৌলিক স্তম্ভ। সর্বপ্রথম এই পদটি ইমাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু লাভ করেন যিনি *نص قطعي* (নস-এ-ক্বতয়ী)-এর ভিত্তিতে ইমাম। ইমামত হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর সন্তানদের জন্যই নির্দিষ্ট। ইমাম মাসুম (নিষ্পাপ) হন, তাঁর আনুগত্য করা ঠিক তেমনি ফরজ যেমন নবীর আনুগত্য। ইমাম এবং পয়গম্বরের মধ্যে রিসালাতের মর্যাদা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক ইমামের পর নতুন ইমাম অবশ্যই পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবেন।” [১]

ইমামতের প্রত্যেক দাবিদার কখনো নিজের মুখে আবার কখনো তার শিষ্যদের মুখে জনগণের কাছে এটা প্রকাশ করত যে, ইমামতের পদটি তার পরিবারে চলে আসছে এবং পূর্ববর্তী ইমাম তার পক্ষে ইমামতের ওসিয়ত করে গেছেন; অতএব সারা বিশ্বে সেই সময়ে কেবল তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার আনুগত্য ফরজ। এটি কতই না চমৎকার কারসাজি ছিল যে, কেবল মিথ্যা বংশপরিচয় তৈরি করে এবং ইমামতের দাবি করে যে কোনো মানুষ নিজেকে পয়গম্বরদের সমকক্ষ অর্থাৎ তাদের মতো মাসুম এবং *مفترض* (মুফতারিজুত তা’আত) হিসেবে জাহির করতে পারত। আখেরাতে পরিণাম যা-ই হোক না কেন, দুনিয়াতে তখন তার আর কোনো বড় থেকে বড় বাদশাহ বা খলিফার, এমনকি কারোই প্রয়োজন থাকত না।

এই আকিদা জঘন্য রাজনীতির একটি চাল হিসেবে কতবার ব্যবহার করা হয়েছে? এটি কোনো গোপন বিষয় নয়। এই শতাব্দীগুলোর

[১] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৬, তাবা হলাবি।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই প্রতারণার মাধ্যমে একই সময়ে ইমামতের একাধিক দাবিদার বিদ্যমান ছিল এবং প্রত্যেকের অনুসারীরা এই দাবিতে অনড় ছিল যে, পূর্ববর্তী ইমাম আমাদের ইমামের পক্ষেই অসিয়ত করে গেছেন। এমন প্রত্যেক ইমামই ইসলামি বিশ্বের একমাত্র শাসক হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছিলেন এবং এই কারসাজির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ফিতনা-ফ্যাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন। এগুলো ছিল সেই অদ্ভুত ও বিচিত্র ধর্মগুলোর পরিণাম, যা হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নতুন নতুন ইমাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভূয়া মুজতাহিদদের হাতে এর রূপও সময়ভেদে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এই গুটিকয়েক আকিদার সাথে আরও কিছু সংযোজিত আকিদা ও ইবাদত যুক্ত হওয়ার ফলে এই দ্বীন স্থানে স্থানে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং বারবার বিভক্তির শিকার হতে থাকে। এই পথভ্রষ্ট দলগুলোর সংখ্যা একশ'রও বেশি, যাদের প্রত্যেকের ইমামদের বংশপরম্পরা আলাদা।

যেহেতু আমাদের বিষয়বস্তু হলো ইতিহাস; তাই আমরা এই অসংখ্য দলগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সেই গুটিকয়েক দল বা ইমামতের দাবিদার নেতাদের কথা উল্লেখ করছি, যারা বনু আব্বাসের পতন যুগে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে মুসলিম সমাজের ওপর রাজনৈতিক, বিশ্বাসগত বা জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ফেরকা ইসমাইলিয়া

আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বনু উমাইয়া এবং ইসনা আশারিয়া প্রসঙ্গে পড়েছি যে, রাফেজিদের ইসনা আশারি ফেরকার দাবি ছিল যে হযরত জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পুত্র মুসা কাজিমকে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন এবং এরপর ইমামত তাঁরই বংশধরদের মধ্যে চলতে চলতে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ মাহদী ইমাম মুনতাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কিন্তু এরই মধ্যে অন্য একটি ফেরকা এই প্রচার করছিল যে, জাফর সাদিকের ইমামত তাঁর বড় ছেলে ইসমাইলের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ফেরকাটি ইসমাইলিয়া নামে পরিচিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যময় ব্যক্তি, যার দাঈরা গোপনে কাজ করছিল।

যেহেতু হযরত জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রকৃত বংশধরদের (চাই তারা মুসা কাজিমের বংশের হোক বা ইসমাইলের) এই ধরনের আন্দোলনের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাই প্রতিটি ফেরকা এই মহান ব্যক্তিদের নির্লিপ্ততা থেকে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করার জন্য কোনো না কোনো অজুহাত তৈরি করে তাকে আকিদার নাম দিয়েছে। ইসনা আশারিয়া হযরত মুসা কাজিমের বংশধরদের পক্ষ থেকে ইমামতের দাবি না করা এবং বনু আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি তাদের আনুগত্যকে “তাকিয়া” নাম দিয়েছে।

ইসমাইলিয়া এর চেয়েও অদ্ভুত চাল চলেছে এবং তাদের ইমামদের “আইন্মায়ে মাসতুরিন” নাম দিয়েছে। ইসমাইলি দাঈদের বক্তব্য ছিল যে, ইমামগণ কেবল আমাদের মাধ্যমেই মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন এবং নিজেরা “মাসতুর” বা গোপনে থাকেন।

যদি এই মাসতুর ইমামদের নাম অনুসন্ধান করা হয়, তবে দেখা যাবে যে ঐতিহাসিকভাবে খোদ ইসমাইল বিন জাফর সাদিকের বংশধারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণিত নয়। তাদের মধ্যে এমন কোনো পরিচিত ব্যক্তিত্ব নেই যার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। বরং এই মাসতুর ইমামদের নামের ব্যাপারে খোদ ইসমাইলি দাঈরাও একমত হতে পারেননি। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে দাবি করেছে। তাদের দাবির বাস্তবতা কেবল এই একটি পয়েন্ট বিবেচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৪৮ হিজরিতে হযরত জাফর সাদিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল থেকে শুরু করে এক শতাব্দী পর্যন্ত ইসমাইলি ফেরকার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তবে এরপর যখনই আব্বাসীয় খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন পারস্য, ইয়েমেন এবং আরও কিছু স্থানে ইসমাইলি আকিদাধারী কিছু লোক প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে:

- একজন ছিল “ফারাজ বিন উসমান কাশানি”, যার আসল নাম ছিল “জিকরওয়াইহ” (নাম থেকেই স্পষ্ট যে সে ছিল মজুসি বংশোদ্ভূত)। সে ইরাকে ইমাম মাসতুরের দিকে দাওয়াত দিত।
- দ্বিতীয়জন ছিল “হামদান কারমাত বিন আশআস”, যে কুফার আশেপাশে এই ধরনের দাওয়াত প্রচার করছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয়জন ছিলেন ‘আবদুল্লাহ বিন মায়মুন’ (২৫৯ হিজরি - ৩২২ হিজরি), যিনি আফ্রিকায় ফাতেমি উবাইদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ইসমাইলিয়াদের আকিদার সারসংক্ষেপ হলো:

- প্রত্যেক যুগে ইমামের উপস্থিতি অপরিহার্য এবং তিনি হযরত জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাইলের বংশধর হবেন।
- নিজ যুগের ইমামকে (ইমামে জামান) চেনা ফরজ। যে তাকে চিনবে না, সে কাফের অবস্থায় মারা যাবে।
- পৃথিবী ইমামশূন্য হতে পারে না। ইমাম হয়তো প্রকাশ্য থাকবেন অথবা গুপ্ত।
- ইমামের গুণাবলি আল্লাহর গুণাবলির সদৃশ হয়। তিনি বিপদভঞ্জন (মুশকিল কুশা), এবং প্রতিটি উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে অবগত।
- ইমাম মাসুম (নিষ্পাপ) হন; তিনি যদি গুনাহও করেন তবে তার মাসুম হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য ঘটে না। সেই গুনাহ মূলত নেকি বা পুণ্য, যার হাকিকত সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।
- তাকিয়া করা উচিত এবং নিজের আকিদা গোপন রাখা উচিত। সাধারণ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সামনে মধ্যপন্থী চিন্তাধারা প্রকাশ করা উচিত। [১]

ইসমাইলি ফেরকার হাকিকত আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ ‘আল-মুনতাজাম’-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

“বেদ্বীনি বিস্তারকারী লোকেরা জরথুষ্ট্র ও মাজদাকের শিক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। ইসলামের আধিপত্য দেখে এই মূর্তিপূজারি, অগ্নিপূজারি, নাস্তিক ও দার্শনিকরা নিজ নিজ অভিমত পেশ করল। তারা বলল: আমাদের ধর্মগুলোকে মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে বেশি কেউ মিটিয়ে দেয়নি; আরবরা তাদের জন্য জান ও মালের বাজি ধরেছিল এবং আমাদের দেশগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিল। এখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। মুসলমানরা অর্থ উপার্জন, অট্টালিকা নির্মাণ এবং খেলাধুলার মতো বিভিন্ন কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাদের আলেমরা একে অপরকে কাফের ফতোয়া দিচ্ছে। এখন আমরা তাদের দ্বীন মিটিয়ে দেওয়ার আশা করতে পারি। কিন্তু তাদের আধিক্যের কারণে আমরা এখনো যুদ্ধের যোগ্য নই। সুতরাং এর পদ্ধতি এটাই যে, তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া হোক এবং তাদেরই একটি ফেরকার নাম ব্যবহার করা হোক। যেহেতু তাদের মধ্যে রাফেজিদের চেয়ে নির্বোধ ফেরকা আর কেউ নেই; তাই আমরা তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের বোঝাব যে, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর জুলুম করা হয়েছে, তাদেরকে ইমামতের হক দেওয়া হয়নি। যখন এই দাওয়াতদাতারা এই দাওয়াত দিল, তখন মানুষ তাদের সাহায্যের জন্য সমবেত হলো। এই লোকেরা নিজেদের জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাইলের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে নিল।” [২]

পরবর্তীতে ইসমাইলিদের আরও অনেক ফেরকা তৈরি হয় এবং প্রতিটি ফেরকার আকিদা একে অপরের চেয়ে বেশি কুফরি ছিল।

ইসমাইলিয়াদের প্রসিদ্ধ ফেরকাগুলোর নাম হলো:

- কারামিতা
- ফাতেমিয়া
- বাতেনিয়া
- নিজারিয়া
- দাউদি বোহরা
- সুলাইমানি বোহরা
- আগাখানি

[১] আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: ১/১৯০ থেকে ১৯৫

[২] আল-মুনতাজাম: ১২/২৮৮

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

কারামিতা

কারামিতা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসমাইলি দাঈ হামদান বিন আশআস। লোকেরা তাকে “কারমাত” বলত। কেউ কেউ বলেন, এই নাম হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তিনি খাটো ছিলেন এবং ছোট ছোট কদমে হাঁটতেন। কেউ বলেন, তার চোখ লাল ছিল, তাই এই নাম হয়েছে। একটি মত এমনও আছে যে, কারমাত শব্দের অর্থ হলো “গোপন দাঈ”। যাই হোক, এই শব্দটি তার ওপর এমনভাবে সেঁটে গেল যে, তার পুরো দলটিই “কারামিতা” নামে পরিচিতি লাভ করল।

এই ব্যক্তি ইরানের খুজিস্তান অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে কুফার আশেপাশে এসে একজন দরবেশের বেশে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যুহদ ও ইবাদতের ভান করে অনেক মানুষকে মুরিদ বানিয়ে নেন। কিছুকাল তিনি বাগদাদেও অবস্থান করেন। তিনি গোপনে মাহদী হওয়ার দাবি করেন। এরপর বলেন যে, ঈসা মসীহের রুহ আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে। এভাবে অগ্রসর হতে হতে তিনি রুহুল কুদুস এবং জিবরাঈল হওয়ার দাবিও করে বসেন।

ইরাকের যিন্দিক আলী বিন মুহাম্মদ (সাহিবুয যাঞ্জ) তার সমসাময়িক ছিলেন। একবার তাদের দুজনের মধ্যে নিজ নিজ স্বরচিত ধর্ম নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। কারমাতের বক্তব্য ছিল যে, যদি আমি হেরে যাই তবে এক লক্ষ সশস্ত্র ব্যক্তিসহ বাইয়াত গ্রহণ করব। কিন্তু কোনো ফলাফল আসার আগেই কারমাত যোহরের সালাতের বিরতির সময় সেখান থেকে সটকে পড়েন। এই বিতর্কের কিছুকাল পর ২৭০ হিজরিতে সাহিবুয যাঞ্জ আব্বাসীয় বাহিনীর হাতে নিহত হন। এভাবে কারমাতের জন্য ময়দান খালি হয়ে যায়। কারমাত আরও আট বছর পর্যন্ত তার বাতিল চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। তার দাওয়াতের চর্চা সর্বপ্রথম ২৭৮ হিজরিতে শুরু হয়। তিনি তার মুরিদদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত থেকে নিষেধ করে কেবল দুই ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দিতেন, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় দুই রাকাত এবং সূর্যাস্তের সময় দুই রাকাত। [১] তিনি বাইতুল্লাহর পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানান। রমজানের রোজার পরিবর্তে পুরো বছরে মাত্র দুই দিন অর্থাৎ মজুসীদের উৎসব: নওরোজ এবং মেহেরজানের দিন রোজা রাখার নির্দেশ দেন। মদকে হালাল এবং নাবীযকে হারাম বলেন। জানাবাতের গোসলের পরিবর্তে কেবল ওযু যথেষ্ট বলে জানান। [২]

কারামিতাদের আকিদা দেখার পর এটা আন্দাজ করা কঠিন নয় যে, এই দাওয়াতকে গোপনে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহস্যময় এজেন্টরা প্রচার করতে থাকে। যেমন কারমাতের কিছু দাঈর ব্যাপারে প্রমাণিত যে, তারা মজুসী বংশোদ্ভূত বা ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিল। এই আকিদা নিয়ে কারমাতের দাঈরা ইরাকের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুর্থ লোক যারা শরয়ী বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি চেয়েছিল, তারা কারমাতের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। সাহিবুয যাঞ্জের অবশিষ্ট অনেক লোকও তার দলে যোগ দেয়। [৩]

কারমাতের নিজের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা জানা যায় না। তবে এটা প্রমাণিত যে, বনু আব্বাসীয় খলিফারা তাকে দমনের জন্য...

[১] ইসলামে এই দুই সময়ে সালাত নিষিদ্ধ।

[২] তারিখে তাবারী: ১০/২৫ থেকে ২৭

[৩] তারিখে মুজাফফরী: ১/১৬০ থেকে ১৬৭

চিন্তিত। মুতাদিদ আব্বাসি তার আকিদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বড় পরিসরে ধরপাকড় শুরু করেন। মুতাদিদ তাদের কিছু দাঈকে গ্রেফতার করে তাদের সাথে বিতর্কও করেন এবং যখন বুঝতে পারেন যে এরা চরম বিদ্রোহী, তখন তাদের কঠোরতম শাস্তি দিয়ে হত্যা করান। মুতাদিদের কর্মকাণ্ড থেকে কারামতিদের আশঙ্কা হয়েছিল যে তারা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে। [১] এই পরিস্থিতিতে কারামতের অনুসারীরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আশ্রয়স্থল খুঁজে নেয় এবং তাদের অনেক দাঈ আলাদা আলাদা দল গঠন করে।

সিরিয়ায় কারামতিদের রাজত্ব:

২৮৫ হিজরিতে তাদের একজন দাঈ জিকরাওয়াইহ ইবনে মিহরাওয়াইহ সিরিয়ায় বসতি স্থাপনকারী কিছু আরব গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে নিজেকে হযরত জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাইলের নাতি বলে দাবি করেন। এই আরব গোত্রগুলো তার প্রতারণায় পড়ে যায় এবং তাকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দেয় ও তার শিক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে সিরিয়াতেও কারামতিদের প্রভাব বেড়ে যায়। [২]

আবু সাঈদ জান্নাবি, বাহরাইনে কারামতি সরকারের প্রতিষ্ঠাতা (২৮০ হি. হতে ৩০১ হি.):

এর আগে একজন দাঈ, যে নিজেকে ইয়াহইয়া ইবনে মাহদি বলত, ২৮০ হিজরিতে বাহরাইনে পৌঁছে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সে তাদের গোপন ইমামের আত্মপ্রকাশের সুসংবাদ দিত। তার মুরিদদের মধ্যে হাসান ইবনে বাহরাম নামক এক ব্যক্তি ছিল, যে ২৮৩ হিজরিতে কারামতি দাওয়াতকে প্রকাশ্য রূপ দেয় এবং হাজার হাজার আরবকে নিজের সাথে যুক্ত করে নেয়। সে পারস্য ও বাহরাইনের সীমান্তবর্তী জান্নাবা নামক জনপদের বাসিন্দা ছিল এবং আবু সাঈদ জান্নাবি কুনিয়াত বা উপনামে পরিচিত ছিল। কারামতিদের অপবিত্র আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সে ছিল সবচেয়ে চরিত্রহীন ব্যক্তি। সে বাহরাইনের শহরগুলো: হাজার, কতিফ এবং আহসা দখল করে একটি নিয়মিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তার শক্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে সে বারবার জাজিরাতুল আরব থেকে বসরা ও বাগদাদের আশপাশে আক্রমণ করত। একবার সে খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ৩০১ হিজরিতে আবু সাঈদ জান্নাবি তার এক দাসের হাতে গোসলখানায় নিহত হয়। [৩]

আবু তাহির কারামতি (৩০১ হি. হতে ৩৩২ হি.):

আবু সাঈদ তার বড় ছেলেকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিল কিন্তু তার ছোট ছেলে আবু তাহির সুলাইমান তার পরিবর্তে সিংহাসন দখল করে নেয়। আবু তাহির ছিল অত্যন্ত রক্তপিপাসু মানুষ। সে পুরো ৩১ বছর ধরে মুসলিম বিশ্বকে অস্থির করে রেখেছিল। খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামলে সে ইরাকের বড় বড় শহরগুলোতে ক্রমাগত আক্রমণ করে মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বসরায় আক্রমণ করে সে সেখানকার জামে মসজিদকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। তার শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সে হাজিদের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ বছর ধরে ইরাক ও সিরিয়ার হাজিদের জন্য হজের সফর অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সিরিয়ায় কারামতিদের যে দল...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫২৩/৬

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫২৩/৬

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ১১৪/৪ হতে ১১৫; ওফায়াতুল আইয়ান: ১৪৮/২; কাশফু আসরারিল বাতিনিয়্যাহ ওয়াল কারামিতাহ লি-মুহাম্মদ বিন মালিক আল-হামাদি, পৃ. ৩৮, ৩৯

যার শাসন ছিল, সেও আবু তাহিরকে কর প্রদান করত। আবু তাহির বাহরাইনের প্রাচীন শহর “হাজর” ধ্বংস করে তার পরিবর্তে নিজের রাজধানী হিসেবে একটি নতুন শহর পত্তন করেন যা “আল-আহসা” নামে পরিচিত হয়।

৩১৫ হিজরিতে আবু তাহির খলিফা মুকতাদিরের কাছে বসরা ও আহওয়াজের শাসনের অনুমতিপত্র দাবি করেন, কিন্তু খলিফা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আবু তাহির দ্রুত হয়ে কুফার দিকে আক্রমণ চালান এবং বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করে আনবারের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেন। এরপর তিনি রাহবা ও রাঙ্কাকেও পদানত করেন এবং ওইসব এলাকা থেকে কর আদায় করতে থাকেন। ৩১৭ হিজরির জিলহজ মাসে তিনি মক্কায় আক্রমণ করে কয়েক হাজার হাজিকে হত্যা করেন, কাবার গিলাফ খুলে টুকরো টুকরো করে সঙ্গীদের মাঝে বিলিয়ে দেন, মিজাবে রহমত ফেলে দেন এবং হাজারে আসওয়াদ উপড়ে বাহরাইন নিয়ে যান। আবু তাহির কারমাতি ৩৩২ হিজরিতে গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

আবু মনসুর কারমাতি (৩৩২ হি. হতে ৩৫৯ হি.):

এখন তার পুত্র আহমদ আবু মনসুর কারমাতিদের নেতা হন। যেহেতু তিনি তার ভাইদের সাথে বিবাদ করে মিশরের উবায়দি শাসকের সুপারিশে শাসক হয়েছিলেন; তাই তার শাসন ছিল দুর্বল এবং বনু উবায়দির মুখাপেক্ষী। ৩৩৯ হিজরি পর্যন্ত হাজারে আসওয়াদ কারমাতিদের দখলে ছিল। অবশেষে একজন আলভি বুজুর্গ উমর বিন ইয়াহইয়া (রহ.) আব্বাসীয় খলিফা মুতি’-এর দূত হিসেবে আবু মনসুর কারমাতির কাছে যান এবং হাজারে আসওয়াদের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রস্তাব দেন। এভাবে বিশ বছর পর হাজারে আসওয়াদ পুনরায় কাবায় স্থাপন করা হয়। [২]

আসাম কারমাতি... বনু উবায়দির সাথে দ্বন্দ্ব এবং কারমাতিদের পতন:

আবু মনসুর ৩৫৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র হাসান বিন আহমদ (আবু আলী আসাম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনামলে কারমাতিদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে; তাই তিনিও সহিংসতা ত্যাগ করে নরম নীতি গ্রহণ করেন এবং বাগদাদ খিলাফতের সমর্থনের দাবি করতে থাকেন। তার সময়ে বনু উবায়দি দামেস্কের কারমাতিদের পরাজিত করে সিরিয়া দখল করে নিয়েছিল। যেহেতু দামেস্ক থেকে বাহরাইনে কর আসত; তাই হাসান বিন আহমদ প্রথা অনুযায়ী বনু উবায়দির সিরিয়ার গভর্নরের কাছে কর দাবি করেন। এখানে এসে শিয়াদের এই দুই উপদল অর্থাৎ কারমাতি এবং বনু উবায়দি নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং সিরিয়ায় তাদের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এদিকে বাহরাইনে কারমাতিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে: এক দল বনু উবায়দির সমর্থক ছিল এবং অন্য দল বিরোধী। শেষ পর্যন্ত বনু উবায়দির সমর্থকরা বিদ্রোহ করে রাজধানী আহসা দখল করে নেয়। বনু উবায়দি বিরোধী আসাম কারমাতিকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বিদ্রোহী নেতা জাফর এবং ইসহাক বাহরাইনে বনু উবায়দির অনুগত কারমাতি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল এই শাসন বেশ জাঁকজমকের সাথে চলে এবং তারা ইরাকের আরও কিছু এলাকা জয় করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারমাতি নেতা জাফর এবং ইসহাকের মধ্যে ফাটল ধরে। ওদিকে একজন আরব নেতা আসগর বিন আবুল হাসান সা’লাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন এবং তিনি ৩৬৫ হিজরিতে বাহরাইনের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেন। এভাবে কারমাতিদের শাসন আল-আহসা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। [৩]

[১] আল-আলাম যিরিকলি: ৩/১২২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৩২৫; তারিখ ইবনে খালদুন: ৯/১১৬

[২] আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ, পৃ. ৭৯। কিছু ঐতিহাসিকের মতে হাজারে আসওয়াদ উবায়দি শাসক মুইয-এর নির্দেশে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তবে এই বর্ণনাটি দুর্বল, আল্লাহ্ আলাম।

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৪৭১ হতে ৪৭২; ৯/১১৬

ইরান ও সিন্ধুতে কারামিতা:

সিরিয়া ও ইরাকে কারামিতাদের পতনের পর অনেক কারামিতা পালিয়ে ইরান ও সিন্ধুতে চলে আসে। এখানে তারা আরও ত্রিশ-চল্লিশ বছর গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদের একজন দাঈ আবুল ফাতহ সিন্ধুতে বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে প্রলুদ্ধ করে এবং মুলতানকে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকে। সুলতান মাহমুদ গজনভি ৪০১ হিজরিতে মুলতান জয় করলে এই কারামিতাদের মধ্যে যারা তওবা করেনি তাদের নির্বিচারে হত্যা করেন এবং তাদের অনেকের হাত-পা কেটে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আবুল ফাতহকে জীবিত গ্রেপ্তার করে ঘোরের দুর্গে বন্দি করা হয়, যেখানে সে মৃত্যুবরণ করে।

৪১৮ হিজরিতে যখন সুলতান মাহমুদ “রে” দখল করেন, তখন সেখানেও কারামিতা এবং অন্যান্য বিভ্রান্ত ফেরকার লোক ধরা পড়ে। সুলতান ওই এলাকার সমস্ত বেদ্বীন ও জিন্দিকদের মৃত্যুদণ্ড দেন।

কারামিতারা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে আসছিল, তাই সুলতান তাদের প্রতি কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। এর ফলে হিন্দুস্তান ও ইরানে কারামিতারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। [১]

আল-আহসায় কারামিতা শাসন:

আল-আহসা (বাহরাইন)-এর ছোট কারামিতা রাষ্ট্রটি বাগদাদ খিলাফতের দুর্বলতা, বনু বুওয়াইহ-এর উত্থান এবং বনু উবাইদ-এর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আরও ৯৫ বছর টিকে থাকে। কিন্তু বনু বুওয়াইহ-এর পতন, সেলজুকদের উত্থান, বাগদাদ খিলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং বনু উবাইদ-এর দুর্বলতার পর তাদের শক্তি কমতে শুরু করে। অবশেষে মালিক শাহ সেলজুকি ৪৬৭ হিজরিতে এখানে সেনাবাহিনী পাঠান, যারা বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর ৪৭০ হিজরিতে কারামিতাদের আল-আহসা থেকেও বিতাড়িত করে। এভাবেই কারামিতা শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে, যা কয়েক দশক ধরে মুসলিম বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলা তছনছ করে রেখেছিল। [২]

এক নজরে কারামিতা:

- কারমাত (হামদান বিন আশআস): তৃতীয় হিজরি শতাব্দী, ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা।
- হাসান বিন বাহরাম (আবু সাঈদ জাম্বাবি): ২৮০ হিজরি থেকে ৩০১ হিজরি, বাহরাইনে কারামিতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।
- সুলাইমান বিন হাসান (আবু তাহির): ৩০১ হিজরি থেকে ৩৩২ হিজরি, ৩১ বছর শাসন করেন। হাজরে আসওয়াদ উপড়ে নিয়ে যান।
- আবু মনসুর কারামিতি (আবু তাহিরের ছেলে): ৩৩২ হিজরি থেকে ৩৫৯ হিজরি, হাজরে আসওয়াদ ফেরত দেন।
- হাসান আল-আসাম বিন সুলাইমান (আবু তাহিরের নাতি): বনু উবাইদ-এর সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে ক্ষমতা হারান।

[১] তারিখ-ই-ফিরিশতা: ১/ ৬৬ থেকে ৬৮, ৮৭

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/ ৪৭২ থেকে ৪৭৩, ৪/ ১১৮

দ্রষ্টব্য: কারামিতাদের অবস্থা, এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যান্য নেতাদের নাম, বংশপরিচয় ও ঘটনাবলীতে তীব্র মতভেদ রয়েছে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যদি পাঠকরা কোথাও এর বিপরীত কিছু পান, তবে তা বর্ণনার ভিন্নতা হিসেবে গণ্য করা উচিত।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দৌলতে বনু উবাইদ (প্রতিষ্ঠাকাল)

আফ্রিকা ও মিশরে ইসমাইলি ফিরকার শাসন

উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন ওরফে আল-মাহদী

শাসনকাল: ২৯৭ হিজরি থেকে ৩২২ হিজরি

ইসমাইলি শিয়াদের যে দলটি শক্তি, ক্ষমতা ও খ্যাতিতে সবার আগে বেরিয়ে এসেছিল তা ছিল ‘বনু উবাইদ’। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিল উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন বিন আল-কাদাহ, যে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে হযরত জাফর সাদিক রাদিআল্লাহু আনহু-এর পুত্র ইসমাইলের বংশধর হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছিল। সে সিরিয়ার সালামিয়া শহরের বাসিন্দা ছিল।

তার দাদা মাইমুন চোখের চিকিৎসক (আই স্পেশালিস্ট) ছিল, এজন্য তাকে ‘কাদাহ’ বলা হতো।

উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন চরম ধূর্ততার প্রমাণ দিয়ে নিজেকে ‘ইমামে মাসতুর’ (গুপ্ত ইমাম) হিসেবে লুকিয়ে রেখেছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার গোপন আস্তানা সালামিয়ার এক ইহুদির বাড়িতে ছিল। ইহুদি মারা যাওয়ার পর উবাইদুল্লাহ তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নেয়। [১]

উবাইদুল্লাহ নিজে আত্মগোপনে থেকে কেবল দুই-তিনজন বিশেষ সহযোগীকে জনসম্পর্কের জন্য ব্যবহার করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছিল রুস্তম বিন হাওশাব, যে ইয়ামেনে ‘ইমামে মাসতুর’-এর বায়াতের দাওয়াত দিয়েছিল। এই স্থানটি খেলাফতের কেন্দ্র থেকে দূরে জাজিরাতুল আরবের এক কোণে ছিল; তাই দীর্ঘ সময় ধরে সে নির্বিঘ্নে দাওয়াত দিতে থাকে এবং বেশ ভালো সংখ্যক মুরিদ তৈরি করে নেয়। [২]

এরপর উবাইদুল্লাহ তার কিছু দাঈ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন:

“উবাইদুল্লাহ সিরিয়ার সালামিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। সে ছিল বুদ্ধিমান, চতুর, ধূর্ত এবং উচ্চাভিলাষী। সে আলী বিন মুহাম্মদ (সাহিবুজ জাঞ্জ) নামক খবিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল, যে বসরাকে ধ্বংস করেছিল এবং দশ বছর সেখানে দখলদার ছিল এবং মানুষ ও শহরগুলোকে বরবাদ করেছিল এবং যে উম্মতের জন্য এক আপদ ছিল এবং ২৭০ হিজরিতে নিহত হয়েছিল। উবাইদুল্লাহ বুঝতে পেরেছিল যে, তার যেমন রাজত্ব প্রয়োজন, তা ইরাক বা সিরিয়ায় নসিব হবে না; তাই সে তার দাঈদের আফ্রিকায় পাঠায়।” [৩]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪৩, ১৪৬

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ৬/২৩০

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৭৩

বনু উবাইদ আন্দোলন এবং ফ্রিম্যাসনরির মধ্যে সাদৃশ্য:

উবাইদুল্লাহর প্রচারকরা সাধারণ মানুষকে তাদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করত। কাউকে বলত যে উবাইদুল্লাহ আল-মাহদী আল্লাহর রাসূল। কাউকে শেখাত যে সে স্বয়ং আল্লাহ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্বাস করাত যে সে মাহদী [১]।

উবাইদুল্লাহ তার মুরিদদের উন্নতির জন্য সাতটি স্তর নির্ধারণ করেছিলেন। প্রতিটি স্তরকে ‘বালাগ’ বলা হতো। প্রথম বালাগ থেকে সপ্তম বালাগ পর্যন্ত স্তরগুলো ছিল:

১. বালাগ আউয়াল: এটি সাধারণ মানুষের জন্য ছিল এবং এতে শিয়া মতবাদের শিক্ষা দেওয়া হতো এবং বলা হতো যে উবাইদুল্লাহ ‘মাহদী’।

২. বালাগ সানি: এতে রাফেজি মতবাদ শেখানো হতো।

৩. বালাগ সালিস: এমন পরিপক্ক মুরিদদের জন্য যারা প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে পারত। এতে তাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করানো হতো।

৪. বালাগ রাবে: তাদের জন্য যাদের দুই বছর পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, এখানে মাহদীকে খোদা বলা হতো।

৫. বালাগ খামিস: তাদের জন্য যাদের তিন বছর পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে।

৬. বালাগ সাদিস: তাদের জন্য যারা চার বছর পর্যন্ত এই আন্দোলনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

৭. বালাগ সাবি: এতে মুরিদকে ‘নামূসে আজম’ পদে অধিষ্ঠিত করা হতো অর্থাৎ তার জন্য প্রতিটি হারাম কাজ বৈধ হয়ে যেত অর্থাৎ সে প্রতিটি শরয়ী বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে যেত [২]।

যদি চিন্তা করা হয়, তবে এই বিন্যাস ফ্রিম্যাসনরির সাংগঠনিক বিন্যাসের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ [৩]।

[১] আর-রওজাতাইন ফি আখবার আদ-দাওলাতাইন লি আবি শামাহ: ২/২১৬ থেকে ২২৭।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪৪।

[৩] ফ্রিম্যাসন ইহুদিদের একটি গোপন সংগঠন যা বিশ্বে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এবং ইহুদিদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর। এই সংগঠনে অনেক স্তর ও ধাপ রয়েছে, উচ্চবিত্তের লোকেরা এর সদস্য এবং এর অনুসারীদের সংখ্যা লাখে লাখে। প্রতিটি স্তরের ওস্তাদকে (গ্র্যান্ড মাস্টার) আলাদা আলাদা চিহ্ন দেওয়া হয়। ফ্রিম্যাসনরির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রথম স্তর: আল-রামজিয়াতুল আম্মাহ (সাধারণ প্রতীকী): এতে সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ আসতে পারে। এর সদস্য সংখ্যা লাখে লাখে। এর চারটি ধাপ রয়েছে: (১) ভাই (২) সাথী (৩) ওয়ার্কিং ফুল মাস্টার (৪) গ্র্যান্ড মাস্টার। একজন সাধারণ কর্মী যেকোনো স্তরে পৌঁছে গ্র্যান্ড মাস্টার হতে পারে। পদোন্নতির সিদ্ধান্ত সংগঠনের প্রতি আনুগত্য ও কাজের ভিত্তিতে হয়। যখন কোনো কর্মী উন্নতি করে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ ওয়ার্কিং ফুল মাস্টারে পৌঁছায়, তখন তার সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং তাকে নিম্নোক্ত শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়: “আমি শপথ করছি যে প্রতিটি মানুষ থেকে নিজের সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব, হোক সে মা, বাবা, বোন, ভাই, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন। যাদের সাথে আমি আমানত, আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা বা খেদমতের কোনো অঙ্গীকার করেছিলাম, তা আজ শেষ করছি।”

এই শপথের পর কর্মী একজন রোবটের মতো ইহুদিদের জন্য কাজ করে। অনুগতদের কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে গ্র্যান্ড মাস্টার বানানো হয়।

দ্বিতীয় স্তর: আল-মাসুনিয়াতুল মুলুকিয়াহ (শাহী রাজমিস্ত্রি): এই স্তরে শুধুমাত্র ইহুদিরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখানে ফ্রিম্যাসনরির গোপন বিষয়গুলো অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয় স্তর: আল-মাসুনিয়াতুল কাউনিয়াহ (বৈশ্বিক রাজমিস্ত্রি): এটি দ্বিতীয় স্তরের বাছাইকৃত নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়। এরা সারা বিশ্বের ইহুদি হয়ে থাকে, যাদের সংখ্যা আঙুলে গণনা করা যায়।

যাইহোক, সব স্তর ও পদের উপরে ফ্রিম্যাসনরির একজন প্রধান থাকে যাকে ‘নামূসে আজম’ বলা হয়, কিন্তু তার পরিচয় সবসময় গোপন রাখা হয়।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: (১) মাওসুআতুল ইয়াহুদ ওয়াল ইয়াহুদিয়াহ ওয়াস সাহইউনিয়াহ: ড. আব্দুল ওয়াহাব আল-মাসিরি (২) ইয়াহুদি খুফিয়া তানজিমাইন: ড. আব্দুল্লাহ আল-তাল, অনুবাদক মাওলানা সালমান হসাইনি নদভী; (৩) ফ্রিম্যাসনরি কি রুসুমাত: লরেন্স আল-দিন মিদ।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

সুতরাং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, উবাইদুল্লাহ ছিল শয়তানি শক্তির লালিত এক ক্রীড়নক।

আফ্রিকায় আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি-র কর্মকাণ্ড:

উবাইদুল্লাহ পর্দার আড়ালে থেকে ইয়েমেনের সানআর একজন চতুর ইসমাইলি আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি (হুসাইন বিন আহমদ) এবং তার ভাই আবু আব্বাসকে নিজের ক্রীড়নক বানায়। এই দুই ভাই ইসমাইলি মতবাদ প্রচারের জন্য অস্বাভাবিক মাত্রায় উৎসাহী ছিল। উবাইদুল্লাহ অনুভব করল যে, ইসমাইলি মতবাদ প্রচারের জন্য আফ্রিকা একটি উপযুক্ত অঞ্চল; তাই সে আবু আব্দুল্লাহকে আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করল। [১] আবু আব্দুল্লাহ তার মিশন সম্পন্ন করার জন্য প্রথমে হজের মৌসুমে মক্কায় পৌঁছাল; এবং আফ্রিকান হাজিদের সাথে মেলামেশা করে নিজের যুহদ ও ইবাদত এবং ইলম ও ফযিলতের প্রভাব তাদের ওপর বিস্তার করল। কুতামা গোত্রের আফ্রিকানরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জেদ ধরল। আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি-র আর কী চাই ছিল। সে দ্বীনি ইলম প্রচারের আবেগ প্রকাশ করে তাদের সাথে আফ্রিকায় চলে গেল। আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহরে অবস্থান করল এবং সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। সে আন্দাজ করে নিল যে, আফ্রিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র হলো কুতামা, যাদের সাথে নিয়ে সরকারের মোকাবিলা করা সম্ভব। ফলে ২৮০ হিজরিতে সে কুতামা গোত্রের শায়খদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাদের নিজের বাগ্মিতা, দার্শনিক কথাবার্তা ও জাদুকরী কৌশলে প্রভাবিত করার পর সেখানেই বসবাস শুরু করল। সে এই গোত্রকে “মাহদি মাসতুর”-এর বায়আতের দাওয়াত দিল এবং বলল যে, শীঘ্রই মাহদির আবির্ভাব হতে চলেছে। সে তাদের এই বলে অনুগত মুরিদ বানিয়ে নিল যে, তাদের গোত্রের নাম “কুতামা” শব্দটি “কিতমান” থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো এই লোকেরাই প্রতিশ্রুত মাহদির রহস্য রক্ষা করার যোগ্য। [২]

মোদাকথা, গোপনে এই দাওয়াত চলতে থাকল। এই সময়ে তিউনিসিয়ার শাসক ইব্রাহিম বিন আহমদ আগলাবি আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি-র জনপ্রিয়তা দেখে আশঙ্কা বোধ করে স্থানীয় গভর্নরের কাছ থেকে তথ্য নিলেন। সে বলল: “এ একজন দরবেশ, তার থেকে কোনো বিপদ নেই।” [৩]

আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেশ কয়েক বছর ধরে কুতামা গোত্রের লোকদের সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে থাকল। [৪] সে লোকদের এই বিশ্বাস করাত যে, মাহদি মৃতদের জীবিত করেন এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করতে পারেন এবং তিনি সারা পৃথিবী শাসন করবেন। [৫] ইমাম মাসতুরের আসন্ন আবির্ভাবের সুসংবাদ শুনে কুতামা ছাড়াও আরও অনেক গোত্র তার চারপাশে সমবেত হয়েছিল। অবশেষে আবু আব্দুল্লাহ শিয়ি আশপাশের এলাকাগুলোতে আক্রমণ শুরু করল এবং শীঘ্রই বেশ কিছু এলাকা জয় করে নিল। ইব্রাহিম বিন আহমদ আগলাবি এবার সজাগ হলেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞ জেনারেল আহওয়ালের নেতৃত্বে আবু আব্দুল্লাহকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন। বেশ কিছু কঠিন যুদ্ধের পর আবু আব্দুল্লাহ পিছু হটতে বাধ্য হয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করল। সরকার মনে করল যে বিষয়টি মিটে গেছে, কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ তার শক্তি লুকিয়ে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। [৬]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, ১৫/১৪৩

[২] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনে ইযারি, ১/১২৪, ১২৫; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৯/৫৮৪, ২৯৬ হিজরির অধীনে; আল-ইত্তিআজ বি আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিইয়িন আল-খুলাফা, মাকরিজি, পৃ. ৫৫ থেকে ৫৮; সিয়রু আলামিন নুবালা, ১৪/৫৮

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৬/৫৮৫, ২৯৬ হিজরির অধীনে; আল-আলাম যিরিকলি, ২/২৩০

[৪] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ১/১১৮

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৭/২৮৭; সন ২৯৬ হিজরি

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ, ৬/৫৮৬, ২৯৬ হিজরির অধীনে

আফ্রিকার সরকারগুলোর পরিস্থিতি:

সেই সময় আফ্রিকায় তিনটি সরকার ছিল: মিশরে ইখশিদি রাষ্ট্র, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ায় আগলাবি রাষ্ট্র এবং মরক্কোতে ইদ্রিসি রাষ্ট্র। এই সময় ইখশিদি ও ইদ্রিসি রাষ্ট্রগুলো কিছুটা স্থিতিশীল ছিল, অন্যদিকে আগলাবি শাসক ইব্রাহিম বিন আহমদ তার মানসিক অসুস্থতার কারণে টালমাটাল অবস্থায় ছিলেন। ইব্রাহিম বিন আহমদ অনেক বছর পর্যন্ত ভালো শাসন চালিয়েছিলেন, কিন্তু ২৮৭ হিজরিতে তিনি একটি মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় তিনি অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তার অদ্ভুত ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের কারণে তিউনিসিয়ার আমিরগণ এবং সাধারণ জনগণ অত্যন্ত বিচলিত ছিল। [১]

আগলাবি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকট এবং আবু আবদুল্লাহ শিয়ার জন্য অনুকূল সুযোগ:

অবশেষে ইব্রাহিম বিন আহমদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং ২৮৯ হিজরিতে ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে তার পুত্র আবুল আব্বাস ক্ষমতা গ্রহণ করেন, কিন্তু এক বছর পর তার অযোগ্য পুত্র আবু মুদার জিয়াদাতুল্লাহ তাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন এবং সাথে সাথেই ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। যখন রাষ্ট্রের আমিরগণ তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি কেবল তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই নয়, বরং তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও হত্যা করেন। [২]

আবু আবদুল্লাহ শিয়িকে প্রতিহতকারী জেনারেল আহওয়ালকেও হত্যা করা হয়েছিল, যার ফলে আবু আবদুল্লাহর সাহস অনেক বেড়ে যায়। অন্যদিকে আবু মুদার জিয়াদাতুল্লাহর অব্যবস্থাপনা ও জুলুমের কারণে তিউনিসিয়ার সমস্ত আমির বনু আগলাবের বিরোধী হয়ে ওঠেন। [৩]

আবু আবদুল্লাহ শিয়ার কায়রোয়ান দখল:

এখন আবু আবদুল্লাহর জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার বাহিনীকে আশেপাশের সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেন। তিনি ঘোষণা করেন: “অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইমাম মাহদির আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে তার অনুসারী হবে।” [৪]

এর পাশাপাশি তিনি তিউনিসিয়ার জনগণকে বর্তমান শাসক আবু মুদারের বিরুদ্ধেও উসকে দেন।

অবশেষে ২৯৬ হিজরিতে আবু আবদুল্লাহ শিয়ি এক বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে রাজধানী কায়রোয়ানের দিকে অগ্রসর হন। আবু মুদার জিয়াদাতুল্লাহ এই তুফান মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে আফ্রিকা থেকে মিশরের দিকে পালিয়ে যান এবং ২৯২ হিজরিতে সেখানেই অজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার অনুপস্থিতিতে আবু আবদুল্লাহ শিয়ি প্রথমে কায়রোয়ানের চাবিকাঠি হিসেবে পরিচিত শহর ‘আরিস’ দখল করেন। সেখানে আবু মুদার জিয়াদাতুল্লাহর অধিকাংশ সৈন্য জমায়েত ছিল। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তিনি ‘আরিস’ দখল করেন। এখানে তিনি জামে মসজিদে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের সাধারণ গণহত্যার নির্দেশ দেন, যা আসর থেকে রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। এখানে তিনি এত পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছেন যে মসজিদ থেকে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৩২, ১৩৩।

[২] নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব লিন-নুওয়াইরি: ২৪/১৩০, ১৪৬; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৮৭ হিজরি থেকে ২৮৯ হিজরি।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/২৮৭, ২৯৬ হিজরি।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/২৮৭, ২৯৬ হিজরি।

[৫] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/১৪৬, ১৪৭; নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব: ২৪/১৫০ থেকে ১৫৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯০ হিজরি থেকে ২৯৬ হিজরি।

রজব ২৯৬ হিজরিতে আবু আবদুল্লাহ আল-শিয়ি তিন লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিউনিসের রাজধানী কায়রোয়ানে পৌঁছান। শহরে প্রতিরোধের কোনো শক্তি ছিল না। তারা প্রাণের নিরাপত্তার বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করল। আবু আবদুল্লাহ ইবনে আবি খিনজির নামক এক কঠোর মেজাজের অফিসারকে এখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। [১] এই বছরই আবু আবদুল্লাহ আল-শিয়ি মরক্কোতে খারিজি ইবাদিয়াদের রুস্তমিয়া সালতানাতকেও মিটিয়ে দিলেন। [২]

উবায়দুল্লাহ বিন মাইমূনের আফ্রিকায় আগমন ও গ্রেফতারি:

এই বিজয়ের পর আবু আবদুল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, ‘ইমাম মাসতুর’ উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি, যিনি জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাইলের বংশধর এবং খুব শীঘ্রই আফ্রিকায় তার আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দুই লক্ষ সরলমনা মানুষ ‘আলে রাসূল’-এর খাতিরে জীবন উৎসর্গ করার জন্য তার সাথে যোগ দিল। জালিয়াত মাহদি উবায়দুল্লাহ, যে সিরিয়ার ‘সালামিয়া’ শহরে এই পরিস্থিতির অপেক্ষায় ছিল, আবু আবদুল্লাহর অনুকূল পরিস্থিতি দেখে তাকে আফ্রিকায় ডেকে পাঠাল। সে পথ সুগম হওয়ার খবর পেয়ে বণিকদের বেশে মিশর, বারকা এবং ত্রিপোলি হয়ে জিলহজ ২৯৬ হিজরিতে তিউনিস পৌঁছাল। সিজিলমাসায় (যেখানে খারিজি সাফরিয়াদের ‘দৌলতে বনি মাদার’ প্রতিষ্ঠিত ছিল) স্থানীয় আমিররা তার আসল পরিচয় জেনে ফেলল; ফলে তাকে ধরে বন্দি করা হলো। [৩]

نام: ٥٤ (তথাকথিত) ‘ফাতেমি সালতানাত’ প্রতিষ্ঠা:

আবু আবদুল্লাহ শিয়ি যখন জানতে পারল, তখন সে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিজিলমাসা জয় করতে পৌঁছাল এবং বনি মাদারের শাসনের অবসান ঘটিয়ে উবায়দুল্লাহ বিন মাইমুনকে মুক্ত করল। ‘তথাকথিত মাহদি’ কায়রোয়ানে প্রবেশ করলে বারবার (Berber) গোত্রের লোকেরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তার অনুগত হয়ে গেল। তাদের শক্তির জোরে রবিউস সানি ২৯৭ হিজরিতে এই মিথ্যা মাহদি আলে রাসূলের শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল এবং হযরত ফাতেমা আল-জাহরা (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে একে ‘ফাতেমি সালতানাত’ নাম দিল। [৪] এর জন্য কমলা রঙের পতাকা নির্দিষ্ট করা হলো। [৫] এই সরকারকে ‘ফাতেমি সালতানাত’ নাম দেওয়া ছিল সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগানোর একটি চাল, অন্যথায় এই সরকার প্রকৃতপক্ষে আলে রাসূলের দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই অস্তিত্বে এসেছিল। হাফেজ যাহাবি (রহ.) বলেন:

“আমি এই কথা বলা বৈধ মনে করি না যে, (এই পরিবারকে) আলভি ফাতেমি বলা হোক; কারণ আমার অন্তরে এই কথা বদ্ধমূল যে, এরা মিথ্যা দাবিদার ছিল।” [৬]

ওলামাদের নির্বিচারে হত্যা:

উবায়দুল্লাহর জালে যারা আটকা পড়েছিল তারা ছিল মূলত গ্রামের মূর্খ ও অশিক্ষিত মানুষ। শহরের মানুষ এই নতুন দ্বীন ও মাযহাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সর্বত্র ওলামায়ে কেরাম এই নতুন দ্বীনের বিরোধিতা করছিলেন।

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৪৯, ১৫০।

[২] মুজিজুত তারিখিল ইসলামি, পৃ: ২০০, ২০১।

[৩] আখবারু বনি উবাইদ ওয়া সিরাতুহুম লিল ফালাকি, পৃ: ৩৯, ৪০; দারুস সাহওয়াতুল কাহিরা; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/৫৮৯ থেকে ৫৯৩; সন ২৯৬ হিজরি।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/৫৮৯; সন ২৯৬ হিজরি।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৮১।

[৬] “লা আসতাহিলু আন আকুলাল আলাউয়িল ফাতিমি, লিমা ওয়াকারা ফি নাফসি মিন আন্নাহ দাউয়ি।” (সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৮৪)।

উবাইদুল্লাহ তাদের নির্মূল করতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। অসংখ্য আলেমকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়েছে। অনেককে শূলে চড়ানো হয়েছে। অনেককে পায়ের নিচে পিষ্ট করা হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন বারদুন দ্ববিব এবং আবু বকর বিন হুযাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাইরাওয়ানের প্রখ্যাত মালিকি ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন যখন কাইরাওয়ানের শহরতলি রাক্কাদায় পৌঁছাল, তখন সে কাইরাওয়ান থেকে তাদের দুজনকে সেখানে ডেকে পাঠাল; কারণ তাদের সম্পর্কে জানা গিয়েছিল যে তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা নন। যখন তারা দুজন উবাইদুল্লাহর কাছে পৌঁছাল, তখন সে সিংহাসনে আসীন ছিল। আবু আব্দুল্লাহ শিয়া এবং তার ভাই আবু আব্বাস ডানে-বামে দাঁড়িয়ে ছিল। আবু আব্দুল্লাহ শিয়া তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করল:

“তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে এই (উবাইদুল্লাহ) আল্লাহর রাসুল?”

তারা দুজন একযোগে বলে উঠল: আল্লাহর কসম! যদি তার ডান পাশে সূর্য এবং বাম পাশে চাঁদ এসে দাঁড়ায় এবং তারা সাক্ষ্য দেয় যে সে আল্লাহর রাসুল, তবুও আমরা তা বলব না। এই সাহসিকতার কারণে কাইরাওয়ানের গভর্নর ইবনে আবি খিনজিরকে নির্দেশ দেওয়া হলো যেন আবু বকর বিন হুযাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পাঁচশ দোররা মারা হয় এবং ইবনে বারদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিরশ্ছেদ করা হয়। গভর্নর ভুলবশত ইবনে বারদুনকে পাঁচশ দোররা মারল এবং আবু বকর বিন হুযাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিরশ্ছেদ করে দিল। পরের দিন যখন ভুল বুঝতে পারল, তখন ইবনে বারদুনকে ডেকে বলল: “ওহে খিনজির!”

ইবনে বারদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তৎক্ষণাৎ বললেন: “শুকর তার দাঁত দিয়ে চেনা যায়।” ইবনে আবি খিনজির তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। যখন তার কাপড় খোলা হতে লাগল, তখন ইবনে আবি খিনজির শেষবারের মতো সতর্ক করে বলল: “তুমি কি তোমার ধর্ম থেকে তওবা করছ?”

তিনি গর্জে উঠে বললেন: “আমি কি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাব!”

অবশেষে তাকে শূলে চড়ানো হলো। এটি ২৯৯ হিজরির ঘটনা।

মুহাম্মদ বিন খাইরুন মাআফিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ আলেম ছিলেন। উবাইদুল্লাহর নির্দেশে ইবনে আবি খিনজির তাকে তলব করল এবং তাকে জানাল যে, মনিবের নির্দেশ হলো তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পদদলিত করা হবে যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। এরপর হাবশিরা মুহাম্মদ বিন খাইরুন রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ফেলে দিল এবং একটি তক্তায় চড়ে তার ওপর লাফাতে লাগল যতক্ষণ না তার প্রাণবায়ু নির্গত হলো। হাফেজ যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনা বর্ণনা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন: “হায়! ইসলাম ও মুসলমানদের উবাইদুল্লাহ যিনদিকের হাতে কী না সহ্য করতে হলো।” [১]

মুসলমানদের ওপর জুলুম। মসজিদের অবমাননা:

ভণ্ড মাহদির অধার্মিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, এক অভিযানে তার সৈন্যরা ঘোড়াসহ জামে মসজিদে ঢুকে পড়ে। আল্লাহর ঘরের এই অবমাননা দেখে মানুষ প্রতিবাদ করলে সেনাপতি বলল:

“এই ঘোড়াগুলোর গোবর ও প্রস্রাব পবিত্র; কারণ এগুলো মাহদির ঘোড়া।”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২১৬ থেকে ২১৯।

মসজিদের নাযিম ঘোড়াগুলোকে বাইরে বের করার জন্য জেদ করলে সৈন্যরা তাকে ধরে উবাইদুল্লাহর কাছে নিয়ে যায়, যে তাকে হত্যা করিয়ে দেয়। [১]

বিরোধী আলেম ও ফকিহদের দরবারে তলব করে নিজের সামনে কার্পেটের ওপর জবাই করা তার জন্য একটি সাধারণ বিষয় ছিল। [২]

মুসলমানদের প্রতিরোধ এবং তাদের গণহত্যা:

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপোলিতে (লিবিয়া) হাওয়ারা গোত্রের প্রধান হারুন আল-বুওয়ারি ২৯৮ হিজরিতে এই মিথ্যা মাহদির বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরেন। এই বিদ্রোহের পরিধি বাড়তে থাকে, যা দমন করার জন্য ২৯৯ হিজরির শুরুতে উবাইদি বাহিনী যানাতা গোত্রের কেন্দ্র “ফালাক মাদিক”-এ আক্রমণ করে এবং তা জয় করে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এরপর “সিরত” শহরের ওপর আক্রমণ হয় এবং সফর ২৯৯ হিজরিতে তা জয় করে অসংখ্য পুরুষকে হত্যা করা হয়, নারীদের দাসী ও শিশুদের গোলাম বানানোর পর শহরটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। [৩]

এই পুরো এলাকা পরিষ্কার করার পর ৩০০ হিজরিতে উবাইদি বাহিনী স্থল ও সমুদ্র উভয় দিক থেকে ত্রিপোলি (ট্রিপলি) অবরোধ করে, যা এতটাই কঠোর ছিল যে নাগরিকদের মৃত পশুর মাংস খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অবশেষে উবাইদুল্লাহর বাহিনী বিজয়ী হয় এবং ত্রিপোলিবাসীকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হয়। [৪]

পরের বছর বারকাবাসী বিদ্রোহ করলে উবাইদুল্লাহ তার হিংস্র প্রকৃতির সেনাপতি হাবাসা বিন ইউসুফকে তাদের দমনের জন্য পাঠায়। এই জালিম যেখানেই বিজয় লাভ করেছে, সেখানেই মানুষকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এক জায়গায় সে মানুষকে আগুনের কুণ্ডলীর চারপাশে জড়ো করে, তারপর তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং আগুনের ওপর ঝলসানো ও রান্না করা হয়। এরপর সেই ছটফট করতে থাকা ব্যক্তিদের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

বারকা দখল করার পর সে ঘোষণা দেয় যে, যারা প্রাণের নিরাপত্তা চায় এবং যাদের খাদ্যের প্রয়োজন তারা এদিকে চলে আসুক। শহরের এক হাজার গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে সমবেত হলে হাবাসা বিন ইউসুফ সবার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপর তাদের লাশের ওপর চেয়ার পেতে বসে নাগরিকদের জড়ো করে এবং নির্দেশ দেয় যে, আগামীকালকের মধ্যে এক লক্ষ মিসকাল (প্রায় এগারো মণ) সোনা জমা দিতে হবে, অন্যথায় সবাইকে হত্যা করা হবে। বারকা একটি ছোট শহর ছিল। মানুষ তাদের সবকিছু গুছিয়ে হস্তান্তর করে, তখন গিয়ে কোনোমতে এই পরিমাণ পূর্ণ হয়। এরপরও তাদের ক্ষমা করা হয়নি। শহরের সবকিছু লুট করে নেওয়া হয়। নারীদের দাসী বানিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। [৫] কিছু নাগরিক গিয়ে উবাইদুল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলে সেই প্রতারক মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, এসবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই জুলুমের প্রতিকারের জন্য সে তবুও কিছুই করেনি। [৬]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/২৮৪

[২] আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন লি-আবি শামাহ: ২/২২৭

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬৩ থেকে ১৬৫

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬৮, ১৬৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/৬১৫; ৩০০ হিজরি

[৫] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৭০

[৬] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৭১

আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ রহস্য ফাঁস করে দিলেন

মিথ্যা সর্বাবস্থায় মিথ্যাই হয়। ইসমাইলিদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে মিথ্যা মাহদীর হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা) গোপন থাকতে পারেনি। খোদা উবায়দুল্লাহর জন্য আফ্রিকায় পথ সুগমকারী তার নায়েব আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার নাম বহুরূপী। উবায়দুল্লাহর ছোট ছেলের ইন্তেকালের পর তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এই ইমামত সম্পূর্ণ মিথ্যা; কারণ উবায়দুল্লাহ ছোট ছেলেকে উত্তরসূরি বানানোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যদি তিনি মাহদী এবং আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞাতা) হতেন, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হতো না।

আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ গোত্রীয় সরদারদের এই রহস্য সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করলেন। তিনি তাদের একত্রিত করে বললেন:

“ইমাম আলিমুল গায়েব হন, কিন্তু আমি যখন ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার উত্তরসূরি কে হবে? তখন ইমাম বললেন: ছোট ছেলে। অথচ কয়েকদিন পর ছোট ছেলে মারা গেল। যদি তিনি সত্য ইমাম হতেন, তবে তিনি জানতেন যে ছোট ছেলের ইমামতের সুযোগ আসবে না। তাছাড়া শরিয়তে রেশম পরা জায়েজ নয়, কিন্তু এই ইমাম রেশমি পোশাক পরেন। এর বাইরে তিনি তিউনিস দখল করে সেখানকার আমির জিয়াদাতুল্লাহর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন।” সরদাররা জিজ্ঞেস করল: “তবে এখন কী করা উচিত?” আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ বললেন: “আমরা ইমামকে বন্দি করে ফেলি। তারপর তার বংশপরিচয় যাচাই করি।”

এদিকে এই পরামর্শের কথা উবায়দুল্লাহর কানে পৌঁছে গেল। হলো এই যে, কুতামা গোত্রের এক সরদার উবায়দুল্লাহর কাছে গিয়ে সেই সন্দেহগুলো তুলে ধরলেন যা আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ পেশ করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ বললেন: “প্রথম কথা হলো, আমার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের যে বিশ্বাস ছিল, তা এখন কেবল সন্দেহে পরিণত হয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাসকে সন্দেহের ভিত্তিতে ত্যাগ করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হলো, ইমাম সর্বদা জীবিত থাকেন। তারা নতুন নতুন দেহে জন্ম নেন। এই মুহূর্তে আমি অন্য কারো দেহে অবস্থান করে সমাজের সংস্কার করছি। আর রেশমি পোশাক পরার কথা, আমি তো আল্লাহর নায়েব (প্রতিনিধি), আমার হারামকে হালাল করার অধিকার আছে। জিয়াদাতুল্লাহর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করাও আমার জন্য হালাল ছিল। তাছাড়া তারা ছিল বিদ্রোহী শত্রুর নারী।” [১]

উবায়দুল্লাহর আদেশে আবু আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড:

সরদার এই কথাগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং উবায়দুল্লাহর সাথে মিলে আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈ ও তার সঙ্গীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। এই ভণ্ড মাহদী, যে হুকুমতের জন্য আকিদা পর্যন্ত তৈরি করতে পারত, সে আবু আবদুল্লাহর অবদানকে কী আর গুরুত্ব দিত। সে তাকে এবং তার ভাই আবুল আব্বাস উভয়কে হত্যার নির্দেশ দিল।

যখন আবু আবদুল্লাহ আল-শিঈকে হত্যা করা শুরু হলো, তখন সে জল্লাদের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জল্লাদ উত্তর দিল: “তুমি যার আনুগত্যের দাওয়াত দিতে, এটি তারই নির্দেশ।” এ কথা বলে সে আবু আবদুল্লাহকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল এবং সে সেখানেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মারা গেল। তার ভাই আবুল আব্বাসকেও বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা করা হলো। [২]

শিক্ষণীয় বিষয় হলো, যে দুর্ভাগার জন্য আবু আবদুল্লাহ নিজের দীন ও দুনিয়া বরবাদ করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারই আদেশে সে নিহত হলো।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪৬

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬৪

ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সমাপ্তি

উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুনের অনুসারীদের মধ্যে আফ্রিকান গোত্র মিকনাসার সরদার মাসালা বিন হাবুসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উবাইদুল্লাহর আদেশে সে ৩০৫ হিজরিতে মাগরিবের দিকে অভিযান চালায় এবং ইদ্রিসি রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন শাসক ইয়াহিয়া বিন ইদ্রিসকে পরাজিত করে তাকে করদ রাজ্যে পরিণত করে। ৩১০ হিজরিতে ইয়াহিয়া বিন ইদ্রিসের কাছ থেকে নামমাত্র শাসন ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে নির্বাসিত করা হয়। সে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। একজন সত্যিকারের সাইয়েদের সাথে একজন নকল সাইয়েদ এমনই আচরণ করতে পারত। [১]

উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুনের ধারাবাহিক বিজয়সমূহ

উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন ৩২২ হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিল এবং তার শাসনের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মরক্কো থেকে শুরু করে নীল নদ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তার পদানত হয়, এমনকি সিসিলিও (সাকলিয়া) তার শাসনাধীনে চলে আসে। ৩০১ হিজরিতে সে মিশরেও সৈন্যবাহিনী পাঠায় এবং আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়; তবে সেখানে তার দখল স্থায়ী হয়নি এবং উবাইদি লঙ্কর লুটতরাজ করে ফিরে আসে। আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ এই তুফান থামানোর জন্য দুইবার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। ৩০৬ এবং ৩০৮ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ মিশরের ওপর আরও দুটি আক্রমণ চালায় এবং নীল নদের পশ্চিমের সমগ্র এলাকা জয় করে নেয়। [২]

বনু আগলাবের প্রাসাদ ও দুর্গসমূহ ধ্বংস করা

বনু আগলাব তাদের শাসনামলে বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ এবং ইমারত নির্মাণ করেছিল। উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন অধিকাংশ ইমারত ধ্বংস করে দেয় যাতে পূর্ববর্তী শাসকদের স্মৃতি মুছে যায়। অনেক ইমারতে প্রাচীন খলিফা ও উজিরদের নাম খোদাই করা ছিল। উবাইদুল্লাহ সেই নামগুলো মুছে ফেলে সব জায়গায় নিজের নাম খোদাই করিয়ে দেয়। [৩]

মাহদিয়া প্রতিষ্ঠা

নিজের নাম বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে ৩০০ হিজরিতে তিউনিসের রাক্কাদা শহরের কাছে একটি নতুন শহর বসায় এবং নিজের দিকে সম্বন্ধ করে এর নাম দেয় “মাহদিয়া” এবং একে নিজের রাজধানী বানায়। [৪]

শরিয়তে বিকৃতি—ইসলামের নামে কুফরের প্রচার

উবাইদুল্লাহ শরিয়তে বিকৃতি ঘটিয়ে ধীরে ধীরে নিজের নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে। তারাবিহ নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রমজানের দুই দিন আগে রোজা রাখার নির্দেশ জারি করে। ফজরের আজান থেকে “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” শব্দগুলো বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে “হাইয়া আলা খাইরিল আমাল... মুহাম্মাদুন ওয়া আলিয়ুন খাইরুল বাশার” বলার বিদআত চালু করে। এরপর এই শব্দগুলো পাঁচ ওয়াক্তের আজানে বাধ্যতামূলক করে দেয় এবং আজানের পর ইমামে জামানের ওপর সালাম পাঠানোও জরুরি ঘোষণা করে। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৯৫ থেকে ১৯৭

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩০০ থেকে ৩০১

[৩] আখবার বানি উবাইদ, পৃ. ৪২

[৪] আখবার বানি উবাইদ, পৃ. ৫০

[৫] আখবার বানি উবাইদ, ৪২; আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৬৯

যে সকল দ্বীনদার ও বুদ্ধিমান লোক তার এই আকিদা গ্রহণ করত না, সে তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করত। এর জন্য সে ‘দারুন নহর’ (কুরবানিগাহ) নামে একটি বিশেষ নির্যাতন কক্ষ তৈরি করেছিল। তিউনিসের একজন মালিকি আলেম আবুল হাসান ইবনুল কাবিসি থেকে বর্ণিত আছে যে, উবায়দুল্লাহ ও তার বংশধররা ‘দারুন নহর’-এ সেই সকল আলেম ও দরবেশদের হত্যা করেছিল যারা সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসতেন (এবং তাদের গালি দিতে অস্বীকার করতেন)। তাদের সংখ্যা চার হাজারের কম নয়। তাদের সবাইকে ‘দুমস্তির’-এর একটি প্রাচীন মন্দিরে দাফন করা হতো। [১]

যারা তার দ্বীন গ্রহণ করত, সে তাদের বড় বড় পদ দিত এবং তাদের ওপর ধন-সম্পদের বৃষ্টি বর্ষণ করত। আবার অদ্ভুত প্রতারণামূলক উপায়ে তাদের বিশ্বাস করাত যে, তারা শরয়ী বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত। এই যুগের একজন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একবার উবায়দুল্লাহ পশুর মতো হাত ও পা উভয়টির ওপর ভর দিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হলো। সে তার জুব্বাও উল্টো করে পরেছিল। সামনে এসে সে আওয়াজ দিল: ‘বখ’। মানুষ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন উবায়দুল্লাহ বলল: “পশুর মতো চলার অর্থ হলো তোমরা পশুর মতো, তোমাদের না আছে নামাজ, না আছে জাকাত, না আছে ওজু-গোসল। আর উল্টো জুব্বা পরার অর্থ হলো তোমরা দ্বীন পাল্টে ফেলেছ। আর ‘বখ’ এর অর্থ হলো তোমাদের জন্য সবকিছু বৈধ— চাই তা মদ্যপান হোক বা ব্যভিচার।” [২]

রিসালাতের প্রকাশ্য ঘোষণা:

উবায়দুল্লাহ শুধু মাহদী ও ইমাম হওয়ার দাবিতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ধীরে ধীরে রিসালাতের পদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং অস্বীকারকারীদের হত্যা করা হতো। কিছু মুফতিকে এই কারণে হত্যা করা হয়েছিল যে, তারা উবায়দুল্লাহকে আল্লাহর রাসূল বলতে অস্বীকার করেছিল। [৩]

মিথ্যা অভিযোগে আলেমদের শূলে চড়ানো:

বিরোধীদের হত্যা করার সহজ উপায় ছিল তাদের ওপর হযরত আলী (রা.)-এর অবমাননার অভিযোগ আনা। এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হতো। কিছু মাশায়েখকে এই অজুহাতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল এবং শূলে চড়ানো হয়েছিল। [৪]

উবায়দুল্লাহর শিক্ষণীয় মৃত্যু:

ফিতনার কারিগর উবায়দুল্লাহ ৬২ বছর বয়সে ৩২২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে। [৫] তার মৃত্যু ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়। তার তীব্র অর্শ রোগ হয়েছিল যার ফলে তার মলদ্বারে পোকা জন্মেছিল, যার যন্ত্রণায় সে ছটফট করত। কোনো ওষুধেই কাজ হয়নি। এই পোকাগুলো তার প্রস্রাব ও পায়খানার অঙ্গগুলো খেয়ে ফেলেছিল এবং সে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শিকার হয়ে জাহান্নামবাসী হয়।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪৫; শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি: ৪/১১৪, ১১৫।

[২] রিয়াদুন নুফুস ফি তবাকতি উলামায়ি ইফরিকিয়া লি-আবি বকর আল-মালিকি: ২/৫০৫, ৫০৬, বৈরুত দারুল গারব আল-ইসলামি।

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২১৫, ২১৬।

[৪] আল-মু’জাম লি-আবি আল-আরব আল-তামিমি, পৃ. ২৯৪, ২৯৫।

[৫] আখবারু বানি উবায়দ, পৃ. ৪৯।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অবতরণের জায়গাটি অত্যন্ত মন্দ:

তার মৃত্যুর পর বিখ্যাত হাফেজ ও ক্বারী ইবনে আখত আল-গাসসানিকে ডাকা হলো যাতে তিনি তার শিয়রে বসে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। ক্বারী সাহেব অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু তার কোনো আয়াত মনে পড়ল না, তবে একটি আয়াত স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার মুখে চলে এল:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ

“সে কিয়ামতের দিন তার কওমের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর যে স্থানে তাদের নামানো হবে, তা কতই না নিকৃষ্ট অবতরণস্থল।” [১]

ক্বারী সাহেব বলতেন যে, আমি অনেক চেষ্টা করেছি যাতে অন্য কোনো আয়াত মনে পড়ে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি এবং এই আয়াতটিই বারবার আওড়াতে থাকলাম। এই সময়ে মৃতের উত্তরাধিকারীরা কান্নাকাটিতে ব্যস্ত ছিল। আমি ভাবলাম, এমন যেন না হয় যে তাদের মনোযোগ আয়াতের অর্থের দিকে চলে যায় এবং আমি নিহত হই। তাই আমি কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করে সেখান থেকে সরে পড়লাম। [২]

উবাইদুল্লাহর বংশপরিচয়:

উবাইদুল্লাহর নাম ও বংশপরিচয় সর্বদা একটি রহস্য হয়ে রয়েছে। একটি বর্ণনা অনুযায়ী তার দাবি ছিল এমন:

“আমি উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মাইমুন বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন জাফর সাদিক।”

দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী সে নিজের বংশপরিচয় এভাবে দিয়েছিল:

“আমি উবাইদুল্লাহ বিন আহমদ বিন ইসমাইল বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন জাফর সাদিক।”

তৃতীয় বর্ণনা হলো, তার নাম ছিল সাজিদ বিন আহমদ। চতুর্থ বর্ণনা হলো, তার নাম ছিল সাজিদ বিন হুসাইন। পঞ্চম বর্ণনা হলো, উবাইদুল্লাহর আসল নাম ছিল ‘ফিমা’ এবং সে দাইসান নামক এক মজুসির (অগ্নিউপাসক) বংশধর ছিল যে ধর্মহীনতা ভিত্তিক আকিদা প্রচার করত। ষষ্ঠ বর্ণনা হলো, তার পিতা ছিল ইহুদি। [৩]

উবাইদুল্লাহ নিজেও তার বংশপরিচয় সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি এবং তার সন্তানরাও এই সাহস করতে পারেনি। যখনই তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা তা এড়িয়ে গেছে। উবাইদুল্লাহর এক উত্তরসূরি আল-মুইয-এর কাছে যখন এক সৈয়দ তার বংশপরিচয় জানতে চাইলেন, তখন সে বলল: “কাল জবাব দেব।” পরের দিন সে দরবারে স্বর্ণমুদ্রার একটি স্তুপ করল। প্রথমে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বলল: “এটিই আমার বংশ।” তারপর উপস্থিতদের মাঝে স্বর্ণমুদ্রা বিলিয়ে দিয়ে বলল: “এটিই আমার মর্যাদা।” [৪]

কতিপয় ঐতিহাসিকের একটি গুরুতর ভুল এবং তার নিরসন:

কতিপয় ঐতিহাসিক বনু উবাইদ-এর সৈয়দ হওয়ার বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন, যেমন আল্লামা ইবনে খালদুনের ধারণা, কিন্তু তিনি এর কোনো...

[১] সূরা হুদ, আয়াত: ৯৮

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪১, ১৪২

[৩] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩/৮২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৪২

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/১৮৯

তারা কোনো দলিল পেশ করতে পারে না, কেবল অনুমানের ভিত্তিতে বলেছে যে, যদি সে সৈয়দ না হতো তবে শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন তাকে সৈয়দ বলে মানত এবং তার জন্য কেন প্রাণ দিত। আল্লামা ইবনে আসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কেও এই দিকেই ঝুঁকে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এটি কোনো দলিল নয়; কারণ অসংখ্য মানুষ শত শত বছর ধরে নমরুদ ও ফেরাউনের মতো বাদশাহদের খোদা বলে মেনেছে এবং তাদের ইশারায় জীবন বাজি রেখেছে। তাহলে কি এমন লোকদের নির্বোধ অথবা বাধ্য ও নিপীড়িত হয়ে কোনো মতবাদের সমর্থক হওয়া সেই মতবাদের সত্যতার দলিল হতে পারে?

এই কারণেই গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম যেমন ইমাম আবু বকর বাকিল্লানি, হাফেজ ইবনে কাসির, হাফেজ জাহাবি এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কথার ওপর জোর দিয়েছেন যে, উবাইদুল্লাহ মিথ্যাবাদী ছিল। তার ইহুদিদের কাছে থাকা, তাদের নারীকে বিয়ে করা, জায়নবাদী ফ্রিম্যাসনদের স্টাইলে আন্দোলন চালানো, তার অনুসারীদের মধ্যে ইহুদিদের উপস্থিতি এবং ইসলামের পরিবর্তে জাল ইসলামকে কোথাও প্রচারণার মাধ্যমে আবার কোথাও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে চালু করা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, সে ইহুদিদের এজেন্ট ছিল। যেমন পল নামক ইহুদি খ্রিস্টান সেজে খ্রিস্টানদের তাওহিদ থেকে ত্রিত্ববাদের জালে ফাঁসিয়েছিল, তেমনি উবাইদুল্লাহও ইসলামের পরিবর্তে সচেতনভাবে কুফর ও শিরক প্রচলিত করার জন্য কোমর বেঁধেছিল। এমন দাজ্জালকে কীভাবে সৈয়দ বলে মানা যেতে পারে? তার সৈয়দ হওয়ার দাবি কেবল তার মৌখিক বর্ণনায় পাওয়া যায়। যদি এটি সত্য হয়, তবে এর জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন।

বাহ্যিক দলিল বাদ দিলেও বংশের দাবির ক্ষেত্রে সত্য বা মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। রাস্তার কোনো ভিখারিও যদি সৈয়দ হওয়ার দাবি করে, তবে উভয় সম্ভাবনাই থাকবে। কিন্তু একে কেবল সম্ভাবনার মর্যাদা দেওয়া হবে, নিশ্চিত জ্ঞানের নয়। নিশ্চিত জ্ঞান কেবল শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমেই হতে পারে। যদি কোনো শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে কোনো কাফেরের বংশ কোনো পয়গম্বরের সাথে প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে তা মেনে নেওয়া হবে; যেমন একজন কাফেরের নুহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র হওয়া এবং একজন কাফেরের ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর পিতা হওয়ার কথা কুরআনে আছে। কিন্তু যেখানে কোনো দলিল নেই বরং কেবল সম্ভাবনা আছে, সেখানে “উসূলে দিরায়াত” ব্যবহার করা জরুরি, যা চিৎকার করে বলে যে, এমন দাজ্জালরা সৈয়দ হতে পারে না। আম গাছে কাঁটা ধরে না এবং গোলাপ গাছে গাঁজার পাতা জন্মায় না।

উবাইদি সরকারের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামের প্রতিক্রিয়া:

বনু উবাইদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই উলামায়ে কেরাম তাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের পথ অবলম্বন করেন। তারা স্পষ্টভাবে ফতোয়া দেন যে, এই লোকেরা আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের পেছনে নামাজ পড়া, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, মোবারকবাদ দেওয়া, তাদের শোক প্রকাশ করা এবং তাদের জানাজায় শরিক হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। [১] যখন কায়রোয়ানে বনু উবাইদের প্রধান উবাইদুল্লাহর প্রথম খুতবা পাঠ করা হলো, তখন শহরের সবচেয়ে বড় ফকিহ জাবালা বিন হামুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন: “আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।” [২] এরপর উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার লোকেরা বনু উবাইদের পেছনে জুমা ও অন্যান্য নামাজ পড়া বর্জন করেন।

[১] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ, ডক্টর মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ৭৯, হাওয়ালা: মাদরাসাতু আহলিল হাদিস ফি কায়রোয়ান: ২৮/১।

[২] রিয়াজুন নুফুস, আবু বকর আল-মালিকি: ৪৩/২।

উত্তর আফ্রিকার সমস্ত আহলে সুন্নাত উলামায়ে কেলাম ফতোয়া জারি করেন যে, যারা বনু উবাইদের ধর্মীয় দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য খুতবা পাঠ করবে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিস্কৃত হবে। ফতোয়া প্রদানকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত আফ্রিকান ফকিহ শেখ আবু ইসহাক (রহ.) সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। এই ফতোয়াসমূহ প্রচারের ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই বনু উবাইদের প্রকৃত রূপ জানতে পারে; ফলে নির্বোধ ও মূর্খরা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষ তাদের ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। [১] শুধু আফ্রিকাই নয়, বরং অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের উলামায়ে কেলামও বনু উবাইদের স্বরূপ উন্মোচন করেন। বাগদাদের উলামায়ে কেলাম নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি ফতোয়া জারি করেন:

“এরা যিন্দিক, এদের বংশধারা দাইসান বিন সাঈদ খুররামির সাথে গিয়ে মিলেছে, এরা কাফেরদের ভাই। এই সাক্ষ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং সকলেই এর সাক্ষী... উবাইদুল্লাহ নামে অভিহিত যে ব্যক্তি আফ্রিকায় গিয়ে মাহদী উপাধি গ্রহণ করেছে, সে অপবিত্র লোকদের বংশধর; এরা বিদ্রোহী এবং মিথ্যা দাবিদার। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এদের কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই। আমাদের জানামতে আবু তালিবের বংশধরদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই এই বিদ্রোহীদের দাবিকে মিথ্যা মনে করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এই বিষয়টি হারামাইন শরীফাইনেও প্রসিদ্ধ। আর এরা কাফের ও ফাসেক, এদের ধর্ম মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকদের মতো বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা শরীয়তের বিধানসমূহ স্তূগিত করে দিয়েছে, ব্যভিচারকে বৈধ করেছে, আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের অবমাননা ও পূর্বসূরিদের অভিশাপ দিয়েছে এবং খোদায়িত্বের দাবি করেছে।”

এই ফতোয়ায় শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান ইমাম আবু হামিদ ইসফারায়িনী (৩৪৪ হি. - ৪০৬ হি.), ইমাম আবুল হুসাইন কুদুরী (৩৬২ হি. - ৪২৮ হি., মুখতাসারুল কুদুরী-র লেখক) এবং প্রধান বিচারপতি আবু মুহাম্মদ বিন আল-আকফানি (৩১৬ হি. - ৪০৫ হি.) ছাড়াও শিয়া আলেম যেমন সাইয়েদ শরীফ মুরতাজা (৩৫৫ হি. - ৪৩৬ হি., নাজুল বালাগাহ-র সংকলক) এবং তার ভাই সাইয়েদ শরীফ আর-রাজীর স্বাক্ষরও ছিল। [২] একইভাবে ৪৪৩ হিজরিতে বাগদাদের উলামায়ে কেলাম আরও একটি সর্বসম্মত ফতোয়া জারি করেন যাতে বলা হয়েছিল যে, বনু উবাইদ ইহুদি বংশোদ্ভূত এবং হযরত জাফর সাদিক (রা.)-এর বংশধর হওয়ার দাবিটি মিথ্যা। এই ফতোয়ায় আহলে সুন্নাত ছাড়াও শিয়া আলেমদের সিলমোহরও অঙ্কিত ছিল। [৩]

বনু উবাইদের সাথে মুনাজারা:

মোদ্বাকথা, উলামায়ে কেলাম বনু উবাইদের কুফরি আকিদাকে স্পষ্টভাবে কুফর বলে ঘোষণা করেন। এর বিনিময়ে আফ্রিকান ও সিরীয় উলামায়ে কেলাম কারাবরণ থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করেন। কিছু আলেম বিভিন্ন সময়ে রাফেযীদের সাথে প্রকাশ্য বিতর্কের প্রস্তাবও দিতে থাকেন। আল্লামা আবু বকর কুমুদী (রহ.)-এর সাথে রাফেযী আলেম আবুল আব্বাস শিয়ীর মুনাজারা প্রসিদ্ধ, যাতে আবুল আব্বাস শিয়ীকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। [৪]

[১] রিয়ায়ুন নুফুস লিল মালিকি: ২/৩৩৯

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/২০০

[৩] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/২৮৪

[৪] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়া লিস সাল্লাবি, পৃ. ৮৩, বরাতে: মাদ্রাসা আহলে হাদিস ফি কায়রাওয়ান: ২/৮০

এই মুনাযিরদের (বিতর্ককারী) মধ্যে শেখ আবদুল্লাহ বিন তাব্বান (রহ.)-ও ছিলেন, যিনি রাফেজি আলেমদের সব জায়গায় নিরন্তর করে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন শেখ আবু উসমান সাঈদ বিন মুহাম্মদ (রহ.), যিনি এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহর মুখোমুখি বিতর্কের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। উবাইদুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করল: “হাদিসে আছে যে: **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ**’ (আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা), সুতরাং প্রমাণিত হলো যে তোমরা সবাই আমাদের গোলাম।”

শেখ আবু উসমান (রহ.) উত্তর দিলেন: “হাদিসের অর্থ এই নয় যে মানুষ গোলাম আর আমরা মনিব। এর অর্থ কেবল দ্বীনি দিকনির্দেশনায় নেতৃত্ব। (অর্থাৎ আমি এবং আলী দ্বীনি নেতা।)”

এরপর তিনি বললেন: “দেখুন, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [১]

‘কোনো মানুষের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন, আর সে মানুষকে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা (গোলাম) হয়ে যাও। বরং (সে তো এটাই বলবে যে) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং নিজেরাও তা পড়তে। তিনি (নবী) তোমাদের কখনো এই নির্দেশ দেবেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদের রব বানিয়ে নাও। তিনি কি তোমাদের কুফরির নির্দেশ দেবেন, যখন তোমরা আনুগত্য স্বীকার (মুসলিম) করে নিয়েছ?’

আলী নবী ছিলেন না, বরং নবীর উজির ছিলেন। এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ নবীকেও এই অধিকার দেননি যে তিনি মানুষকে নিজের গোলাম বানাবেন, তাহলে একজন অ-নবীর এই অধিকার কীভাবে থাকতে পারে?”

উবাইদুল্লাহ নিরন্তর হয়ে বলল: “আপনি যান। আপনার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।” [২]

একবার সালতানাতের উজির আবু আবদুল্লাহ শিয়ি তাকে বললেন: “রাসুলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী ছিলেন না। কারণ কুরআন নিজেই বলছে: **وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ** (কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী) [৩] এতে বোঝা গেল যে রাসুলুল্লাহ আলাদা এবং খাতামুন নাবিয়্যিন অন্য কেউ।”

শেখ আবু উসমান (রহ.) বললেন: “এই ‘ওয়াও’ (এবং) কথা শুরু করার জন্য নয়, বরং এটি সংযোজক অব্যয় (আতিফ)। যেমন আল্লাহর বাণী: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** (তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপন) [৪] কেউ কি বলতে পারে যে ‘প্রথম’ গুণটি একজনের জন্য আর ‘শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন’ গুণগুলো অন্য সত্তার জন্য!!”

আবু আবদুল্লাহ শিয়ি চুপ হয়ে গেলেন। [৫]

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৯, ৮০

[২] রিয়াজুন নুফুস লিল মালিকি: ২/৫৯, ৬০০

[৩] সূরা আল-আহজাব, আয়াত: ৪০

[৪] সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ৩

[৫] রিয়াজুন নুফুস লিল মালিকি: ২/৬২

একবার সেই শেখ আবু উসমান (রহ.)-এর সোজাসাপটা কথায় এক রাফেযী সরদার ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল। কেউ শেখকে বুঝিয়ে বললেন: “এভাবে সরদারকে রাগান্বিত করবেন না, তার অধীনে বারো হাজার তলোয়ারধারী রয়েছে।” শেখ আবু উসমান (রহ.) দ্বিধাহীনভাবে বললেন: “আমি সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমনটি করি, যিনি আদ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।” আফ্রিকার প্রখ্যাত আলেম ও মুনাযির শেখ ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-লাখমি (রহ.)-কেও এ কারণেই হত্যা করা হয়েছিল। [১]

আলেমগণ ছাড়াও অন্যান্য মুসলমানরাও এই জযবায় পিছিয়ে ছিলেন না। কায়রোয়ানের ইবনে আইয়াশ মসজিদে ‘আরুস’ নামে এক মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি ফজরের আযানে ‘হইয়া আলা খাইরিল আমল’ বলার সরকারি নির্দেশ মানেননি। শাসকরা তাকে গ্রেফতার করে চাবুক মারল, এরপর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে শহর প্রদক্ষিণ করাল, জিহ্বা কেটে ফেলা হলো এবং সবশেষে শূলে চড়ানো হলো। ইমাম আবুল আরব (রহ.), যিনি সেই মুয়াজ্জিনের হত্যার খবর জানতেন না, তিনি লিখেন যে, সেই রাতেই তিনি স্বপ্নে দেখলেন কেউ বলছে: “আরুস মুয়াজ্জিন এখন জান্নাতের মজলিসে আছে।” [২]

সমাজে এ ধরনের সত্যনিষ্ঠ মানুষদের সম্মানের চোখে দেখা হতো এবং তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।

দুনিয়াপরস্ত আলেম:

এর বিপরীতে কিছু আলেম বনু উবাইদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো দুনিয়া ও সম্পদের লোভে নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল। যেমন একজন ফকীহ কাজী নুমান বিন মুহাম্মদ (আবু হানিফা কায়রোয়ানী) বনু উবাইদের কাজী হওয়ার পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বনু উবাইদের পক্ষে এবং আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে অনেক কিতাব রচনা করেন। শিয়া ফিকহ সংকলন করেন এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের ফিকহ খণ্ডন করেন। বনু উবাইদের দাওয়াতকে সত্য প্রমাণের জন্য ‘ইবতিদাউদ্দাওয়াহ’ নামক একটি কিতাব লিখেন। এই খেদমতের বিনিময়ে বনু উবাইদ তাকে ‘কাজীউল কুযাত’ বানিয়ে দেয়। হাফেজ যাহাবী (রহ.) তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

“এই আলেম দ্বীন থেকে বিচ্যুতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আল্লাহর অসন্তুষ্টির যোগ্য হয়েছিলেন।” [৩]

সুতরাং এই আলেমগণ সাময়িকভাবে খ্যাতি পেলেও প্রকৃতপক্ষে চিরদিনের জন্য লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছেন। [৪]

কিছু আলেম এমনও ছিলেন যারা সঠিক আকিদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারি আমীরদের সাথে উঠাবসা রাখতেন। যদিও এই আলেমগণ কোনো দ্বীনি কল্যাণের খাতিরে এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, তবুও সমাজে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাদের ইলমি খেদমত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা হয়নি। আবুল কাসিম বারযালী ছিলেন এমনই একজন সুবিধাবাদী আলেম যিনি বনু উবাইদকে সমর্থন করতেন; এ কারণে তার সুনাম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় এবং আফ্রিকার ফকীহগণ তার কিতাবসমূহ ধ্বংস করে দেওয়ার ফতোয়া দেন। [৫]

[১] রিয়াযুন্নুফুস: ২/৬২-৬৩।

[২] আল-মিহান লি-আবীল আরব আত-তামিমী, পৃ. ১৯৪।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/১৫০, ১৫১; আল-ইবার ফী খবর মান গাবার: ২/১১৭।

[৪] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ, পৃ. ৮২ বরাতে মাদ্রাসা আহলে হাদিস ফী কায়রোয়ান: ১/৭৮।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস - দ্বিতীয় খণ্ড

বনু উবাইদ রাষ্ট্র (উত্থানকাল)

আল-কায়েম

৩২২ হিজরি থেকে ৩৩৪ হিজরি

উবাইদুল্লাহর পর তার পুত্র মুহাম্মদ আবুল কাসেম ‘আল-কায়েম’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল-কায়েম অধার্মিকতায় তার পিতার চেয়েও অনেক এগিয়ে ছিলেন। তার এক দুর্ভাগা প্রতিনিধি হাসান আল-ফারিবার, যার উপাধিই ছিল ‘সাববাব’ (গালি প্রদানকারী), সে প্রকাশ্যে বাজারে বাজারে এই বলে চিৎকার করে বেড়াত:

“العنوا عائشة و بعلها... العنوا الغار و من حوى”

(আয়েশা ও তার স্বামীর ওপর লানত করো। গুহা এবং গুহার ভেতরে যারা ছিল তাদের ওপর লানত করো।) নাউযুবিল্লাহ সুম্মা নাউযুবিল্লাহ [১]

আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ এবং ইসলামি উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সমর্থন:

বনু উবাইদ উত্তর আফ্রিকার যেসব সরকারকে তছনছ করেছিল, তার মধ্যে খারেজিদের সরকারগুলোও ছিল। খারেজি ইবাদিয়াদের রাষ্ট্র ‘দাওলাতে রুস্তমিয়া’ (আলজেরিয়া) ২৯৬ হিজরিতে এবং খারেজি সাফরিয়াদের রাষ্ট্র ‘দাওলাতে বনি মাদরার’ (মরক্কো) ২৯৭ হিজরিতে বিলুপ্ত হয়েছিল। এরপর তলোয়ারের জোরে ইসমাইলি মতবাদ প্রচারের প্রচেষ্টায় চারদিকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ও বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবু ইয়াজিদ নামক এক খারেজি ব্যক্তি বনু উবাইদের বিরুদ্ধে মানুষকে একত্রিত করে বিদ্রোহ করেন। তার বয়স ছিল কমবেশি ৯০ বছর। তিনি নিজেকে ‘শাইখুল মুমিনিন’ বলে পরিচয় দিতেন। এই চটপটে বৃদ্ধ একটি গাধার পিঠে চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং মানুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। বনু উবাইদ এবং তার মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [২] আহলে সুন্নাতের অনেক আলেমও এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে শাইখ মারদান বিন নাসরান, শাইখ আবুল ফজল মাসি এবং শাইখ রবি আল-কাত্তান-এর মতো নামগুলো প্রসিদ্ধ, যারা বনু উবাইদকে ‘বনু আদুউল্লাহ’ (আল্লাহর শত্রুদের বংশ) বলে স্মরণ করতেন। শাইখ আবু ইসহাক রহমাতুল্লাহ-এর এক জামাতসহ আবু ইয়াজিদের আন্দোলনে শরিক হন। তারা আবু ইয়াজিদ খারেজির লশকর বা বাহিনীর দিকে ইশারা করে ঘোষণা করেন:

“এরা আহলে কিবলা। আমরা তাদের সাথে মিলে আল্লাহর ঐসব শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব যারা আহলে কিবলার বহির্ভূত।” [৩]

[১] কিতাবুর রওজাতাইন লি-আবি শামাহ: ১২৬/২, সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৭৩/১৫

[২] ইত্তিআজুল হুনাফা লিল-মাকররিজি: ৭৪/১ থেকে ৮৩

[৩] রিয়াজুন নুফুস লিল-মালিকি: ৩৪৩/২

বনু উবাইদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (খুরুজ) ডাক দানকারীদের মধ্যে মালিকি ফকিহ আল্লামা আবু আল-আরব বিন তামীম (রহ.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি হাদিস, রিজাল এবং ইতিহাসে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্রদের ছাত্র ছিলেন এবং ইমাম সাহনুন (রহ.)-এর নিকট থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ‘১৫৫’, যার মধ্যে ‘আল-লাহন’, ‘তাবাকাত আহলে ইফ্রিকিয়া’, ‘ফাযায়েল মালিক’, ‘মানাকিব সাহনুন’ এবং ‘আত-তারিখ’ (এগারো খণ্ডে) প্রসিদ্ধ হয়েছে।

[১]

ঐ সকল আলেমদের মধ্যে শায়খ রবি আল-কাত্তান (রহ.)-ও ছিলেন, যিনি সবার আগে বিদ্রোহের (খুরুজ) ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং একে জিহাদ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ইমাম আহমদ বিন আবি আল-ওয়ালিদ (রহ.) জুমার খুতবায় উপস্থিতদের সাহস জোগাতে এই আয়াতটি পাঠ করেন:

“لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ”

(মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো ওজর ছাড়াই ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়।) [২]

তারপর বললেন: “হে লোকসকল! এই কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, যে আল্লাহ ছাড়া নিজেকে রব ঘোষণা করেছে, আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং রাসূলের সাহাবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের গালি দিয়েছে।” এ কথা শুনে মানুষ অবোরে কাঁদতে লাগল। ইমাম আহমদ (রহ.) দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! এই কারমাতি কাফির যে নিজেকে উবাইদুল্লাহ বলে, যে রব হওয়ার দাবি করে, যে তোমার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ, যে তোমার উলুহিয়াত অস্বীকার করে, যে তোমার নবী ও রাসূলদের ওপর আপত্তি করে, যে তোমার রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে তোমার রাসূলের সাহাবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের গালি দেয়, যে উম্মতের রক্ত ঝরাচ্ছে, যে হারাম জিনিসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করছে, যে তোমার ওপর মিথ্যা আরোপ করছে এবং তোমার সহনশীলতার কারণে ধোঁকায় পড়ে আছে... হে আল্লাহ! তার ওপর লানত বর্ষণ করো, তাকে চিরতরে লাঞ্ছিত করো। তার ওপর সকাল-সন্ধ্যা তোমার গজব নাজিল করো, তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দাও এবং তার আগে এই দুনিয়ায় তাকে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তার দলকে ধ্বংস করে দাও, তার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও এবং ঈমানদারদের অন্তর শীতল করে দাও।”

জুমার নামাজের পর ইমাম আহমদ (রহ.) ঘোষণা করলেন: “শুনে রাখো! আগামীকাল বিদ্রোহ (খুরুজ) হবে।” [৩]

যখন লস্কর রওনা হলো, তখন শায়খ রবি আল-কাত্তান (রহ.) পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় প্রথম সারিতে ছিলেন। তাঁর গলায় কুরআন মাজিদ ঝুলানো ছিল এবং তিনি বলছিলেন: “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হে আল্লাহ! আমার কোন নেক আমল তোমার পছন্দ হয়েছে যে আমাকে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছ?” এ কথা বলে তিনি এত কাঁদলেন যে তাঁর হেঁচকি উঠে গেল এবং দাড়ি ভিজে গেল।

তারপর উপস্থিতদের বললেন: “আজ যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের দেখতেন, তবে তিনি কতই না খুশি হতেন।”

[১] লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী আজকাল কেবল ‘আল-মিহান’ পাওয়া যায়।

[২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৫।

[৩] রিয়াদুন নুফুস লিল মালিকি: ২/২৪৪।

এই অভিযানের সময় রবী আল-কাত্তান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক স্থানে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً^ج وَأَعْلُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” [১]

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ^ج أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ^ج فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ^ج عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ^ج وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“হে মুসলমানগণ! তোমাদের কী হলো? তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেওয়ার সংকল্প করেছিল? আর তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (যুদ্ধ) শুরু করেছিল। তোমরা কি তাদের ভয় পাও? অথচ আল্লাহই অধিক হকদার যে তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন... আর মুমিনদের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন। আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [২]

এই আবেগপূর্ণ ভাষণের পর তিনি উচ্চস্বরে বললেন: “আল্লাহকে স্মরণ করো। আল্লাহ তোমাদের স্মরণ রাখবেন।” মানুষ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সামনে অগ্রসর হলো এবং যুদ্ধে শরিক হলো।

এই যুদ্ধ ৩৩৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়। শুরুতে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং তারা উবায়দীদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর তারা অগ্রসর হয়ে উবায়দীদের কেন্দ্র মাহদিয়া অবরোধ করে। শহরের ফটকে যুদ্ধের সময় আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম প্রথম সারিতে ছিলেন। এমন সময় আবু ইয়াজিদ তার সঙ্গীদের তাকিদ দিল যে, তোমরা কায়রোয়ানবাসীদের (আহলে সুন্নাত) একা ফেলে পিছু হটে যাও যাতে শত্রু তাদের পিষে ফেলে। এর ফলে আহলে সুন্নাতের ৮৫ জন আলেম তাদের সঙ্গীদেরসহ শহীদ হন। এই আলেমদের মধ্যে শেখ রবী আল-কাত্তান এবং শেখ আবুল ফজল মাসী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আবুল আরব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও এই যুদ্ধের কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। [৩]

৩৩৪ হিজরিতে উবায়দী শাসক মুহাম্মদ আল-কায়েম মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় পর্যন্ত আবু ইয়াজিদের বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। [৪]

[১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৩

[২] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১৩-১৫

[৩] রিয়াজুন নুফুস লিল মালিকি: ২/৩৪৪; আল-আলাম জিরিকলি: ৩/৩৬৪; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/৩৭৩

[৪] ইত্তিআজুল হনাফা, পৃষ্ঠা ৭৪ থেকে ৮৩

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

আল-মানসুর

৩৩৪ হিজরি থেকে ৩৪১ হিজরি

আল-কাযিমের পর তার পুত্র আল-মানসুর শাসক হন। সে সময় তার বয়স ছিল ৪১ বছর।

তিনি ৩৪১ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। [১]

আবু ইয়াজিদ খারিজির অভিযান এবং আহলে সুন্নাতের প্রতি দুর্ব্যবহার:

আবু ইয়াজিদ খারিজির বনু উবাইদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। তিনি আহলে সুন্নাতের সাথে খারাপ আচরণ করে এক মারাত্মক ভুল করেন। তিনি যেভাবে বনু উবাইদের বিরোধী ছিলেন, তেমনি আহলে সুন্নাতেরও শত্রু ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সুন্নি জনবসতিগুলোতে আক্রমণ করেন এবং সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালান। তার বক্তব্য ছিল যে, আহলে সুন্নাতের জনবসতি লুণ্ঠন করা আমাদের জন্য হালাল। তার সাথে থাকা সুন্নি উলামায়ে কেরাম অনেক বুঝিয়ে তাকে এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখেন। অবশেষে আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখাই সমীচীন মনে করেন। এভাবে আবু ইয়াজিদের পক্ষপাতমূলক আচরণ তাকে একা করে দেয়। তিনি যদি উদারতা প্রদর্শন করতেন, তবে আহলে সুন্নাত তাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যেত, যেমনটি অনেক প্রখ্যাত আলেম তার পতাকাতলে শহীদ হয়েছিলেন। নিজের রাজনৈতিক ভুলের কারণে আবু ইয়াজিদ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং আল-মানসুর নিজের শাসন রক্ষা করতে সক্ষম হন। [২]

আবু ইয়াজিদের হত্যাকাণ্ড:

আবু ইয়াজিদকে গ্রেফতার করার পর আল-মানসুর তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। তাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেন এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে হত্যা করেন। [৩] এত কঠোর বিদ্রোহের সম্মুখীন হওয়ার পর আল-মানসুর জনগণের আস্থা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি মানুষের সাথে নরম আচরণ শুরু করেন এবং নিজের আকিদায় তাশাইয়ু প্রকাশ করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। [৪]

একজন অন্ধ আলেমের সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি:

আল-মানসুরের চেষ্টা ছিল উলামায়ে কেরামকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা, তাই তিনি একজন অন্ধ মালিকি আলেম আবু মাইসারা কায়রাওয়ানিকে কাজি পদের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন: “আমি অন্ধ মানুষ, কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করব?” যেহেতু তার আশঙ্কা ছিল যে তিনি সরকারি চাপের মুখে বাধ্য হতে পারেন, তাই তিনি দোয়া করেন: “হে আল্লাহ, আমি যৌবনকালে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমার সাথে সম্পর্ক গড়েছিলাম। এখন এমন লোকদের আমার ওপর চাপিয়ে দিও না।” সেই দিন আসরের সময় তার ইন্তেকাল হয়। [৫]

[১] ইতিআজুল হুনাফা বি আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা লিল মাকরিজি: ৮৮/১

[২] ইতিআজুল হুনাফা, পৃ. ৮৪ থেকে ৯০

[৩] আর-রওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২২৬/২

[৪] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫৭/১৫

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৯৬/১৫

দ্বীনের হিফাজতের জন্য উলামায়ে হকের প্রচেষ্টা:

এই সময়ে উলামায়ে কেরাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গোপনে শিক্ষা-দীক্ষা এবং দ্বীনের দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রত্যেক আলেমের ঘর এবং প্রত্যেক ফকীহর কক্ষ ছিল শিক্ষা ও দাওয়াতের কেন্দ্র। যুবকরা তাদের কাছে আসত এবং আকীদা, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের শিক্ষা গ্রহণ করত। এভাবে এই অন্ধকার যুগে মসজিদগুলো জনশূন্য এবং মাদরাসাগুলো বিরান থাকলেও মুসলমানদের কোনো প্রজন্মই দ্বীনি ইলম থেকে বঞ্চিত থাকেনি এবং সব সময় সব জায়গায় বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণ বিদ্যমান ছিলেন।

বনু উবাইদের আসল শক্তি ছিল আফ্রিকার কুতামা, সানহাজি এবং বারবারি গোত্রগুলো। বিদ্রোহের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর উলামায়ে কেরাম এই গোত্রগুলোর মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন; তাই উলামায়ে কেরাম গোত্রীয় প্রধানদের সম্মানদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং অত্যন্ত হিকমতের সাথে তাদের কাছে পৌঁছে তাদের বিনামূল্যে শিক্ষার অলঙ্কারে সজ্জিত করতে থাকেন। পরবর্তীতে এই ছেলেরাই যখন বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হলো, তখন তাদের বোঁক রাফযিয়াতের পরিবর্তে সুন্নাহর দিকে ছিল; তাই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আহলে সুন্নাতে শ্রুতাকাঙ্ক্ষীরা তৈরি হয়ে যায়। [১]

আল-মানসুরের মৃত্যু:

আল-মানসুর অসুস্থ হয়ে শাওয়াল ৩৪১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৮২, ৮৩, বরাতে মাদরাসাতু আইলিল হাদীস ফি কাইরাওয়ান: ২/ ৭৮, ৮০।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/ ১৫৮ ত. আর-রিসালাহ।

আল-মুইজ

৩৪১ হিজরি থেকে ৩৬৫ হিজরি

তিনি আল-মানসুরের পুত্র ছিলেন। ৩৪১ হিজরিতে তিনি শাসক হন। তিনি তাঁর সরকারকে অনেক উন্নত করেছিলেন। তাঁর রোমান খাদেম ‘জওহর’ উজির হয়েছিলেন, যার নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সুপরিচিত। আল-মুইজ মিসর দখলের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। মিসরের মূল অঞ্চল ছিল নীল নদের পূর্বে, যেখানে দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র ‘ফুসতাত’ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর অবস্থিত ছিল। সেখানে তখন ‘ইখশিদি রাজবংশ’ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কাফুর ইখশিদি সেখানকার শাসক ছিলেন।

৩৫৫ হিজরিতে আল-মুইজ সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্য মিসরগামী মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করে পানির ব্যবস্থা করেন। তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি; কারণ কিছুদিন পরই মিসরের শাসক কাফুর ইন্তেকাল করেন। সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আল-মুইজ মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নেন এবং জওহরকে সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠিয়ে দেন। ইখশিদিরা এই পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারেনি এবং পিছু হটে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। [১]

আলেকজান্দ্রিয়া দখল

জিলহজ ৩৫৭ হিজরিতে উবাইদিরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম জিন্দিকিয়াতের (ধর্মদ্রোহিতা) এই ঝড়ে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হামজা বিন মুহাম্মদ আবুল কাসিম আল-কিনানি কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন: “হে আল্লাহ! আমাকে কমলা রঙের পতাকা দেখার আগেই মৃত্যু দান করুন।” দোয়া কবুল হলো এবং শহর পতনের তিন দিন আগে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। [২]

শাবান ৩৫৮ হিজরিতে উবাইদিরা এই সমৃদ্ধশালী ইসলামি দেশ দখল করে নেয়। মিসর ছিল আহলে সুন্নাতের উলামা ও ফুকাহাদের প্রাচীন কেন্দ্র। মানুষ বনু উবাইদের শাসনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; তাদের আশ্বস্ত করার জন্য আল-মুইজ ঘোষণা জারি করেন যে আজান, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ এবং সমস্ত ইসলামি বিধান কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী জারি রাখা হবে। [৩]

কিন্তু এটি ছিল কেবল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। শহরগুলোতে নিজেদের লোক নিয়োগ করার সাথে সাথেই তারা জোরপূর্বক নিজেদের আকিদা ও বিদআতের প্রচার শুরু করে দেয়। প্রথম জুমার নামাজে কুনুতে নাজিলা পড়া হয় এবং ফজরের আজানে ‘হাইয়া আলা খাইরিল আমাল’ যোগ করা হয়। [৪] আল-মুইজ দশই রমজান ঘোষণা করেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হলেন হযরত আলী। [৫]

[১] আখবার বনি উবাইদ, পৃ. ৮৩ থেকে ৮৫

[২] আখবার বনি উবাইদ, পৃ. ৮৬ থেকে ৮৮

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৮১

[৪] আখবার বনি উবাইদ, পৃ. ৮০, ৮৫

[৫] ইত্তিআজুল হনাফা: ১/১৩৫

ঈদে গাদির ও মাতমি মিছিল:

১৮ জিলহজ ৩৫৮ হিজরিতে মিশরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাফেজিদের প্রথা “ঈদে গাদির” পালন করা হয়। [১] আশুরার দিনে মাতম পালনের ধারাও শুরু করা হয়, মাতমি মিছিলগুলো শহরে ভাঙচুর করতে শুরু করে, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকে এবং বাগদাদের মতো এখানেও জনগণের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও মারামারি শুরু হয়ে যায়। [২]

কায়রো এবং জামে আল-আজহারের ভিত্তি স্থাপন:

আল-মুইজ-এর প্রতিনিধি জওহর ৩৫৯ হিজরিতে ফুসতাতের বিপরীতে কায়রো নামক একটি নতুন শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন, যাকে বনু উবায়দ তাদের রাজধানী বানিয়ে নেয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই শহরটিই মিশরের রাজধানী হিসেবে চলে আসছে। [৩] এই জওহরই ৩৬১ হিজরিতে এখানে “জামে আল-আজহার” নামক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাতে একে কেন্দ্র বানিয়ে তাদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করা যায়। [৪] [৫]

কুফরি কবিতা:

আল-মুইজ-এর প্রচারকরা মানুষকে এই আকিদা শেখাত যে, খলিফাই সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করেন। [৬] আল-মুইজ-এর দরবারে কিছু চাটুকার ও ভ্রান্ত আকিদার কবি ছিল যারা তাকে খুশি করার জন্য কুফর ও শিরক আওড়াত। আল-মুইজ-এর এই সবকিছু শুনে চুপ থাকা প্রমাণ করে যে, এই পুরো পরিবারটিই এমন ভ্রান্ত আকিদা সম্পন্ন ও ধর্মহীন ছিল। কবি ইবনে হানির কিছু কুফরি কবিতা হলো:

“মনে হয় আপনিই নবী মুহাম্মদ... এবং যেন আপনার সাহায্যকারীরাই আসল আনসার।”

“তকদির যা চায় তা হয় না বরং আপনি যা চান তাই হয়। আপনি হুকুম দিন; কারণ আপনিই ওয়াহিদ ও কাহার।”

“আপনি নূর এবং বাকি সব নূর অন্ধকার। আপনি সবার উপরে এবং বাকি সবাই আপনার নিচে।”

“আপনার জন্য সুউচ্চ আসমান গর্বিত এবং আপনার শানেই কুরআন নাজিল হয়েছে।”

“আপনি আল্লাহর সেই গোপন রহস্যগুলো জানেন যা মিকাইলকেও জানানো হয়নি।” [৩]

[১] ইত্তিআজুল হনাফা: ১৪২/১

[২] ইত্তিআজুল হনাফা: ১৪৫/১

[৩] আখবার বনু উবায়দ, পৃ. ১৮৮, আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৮০/৭

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩২/২৭, তাদমুরি; আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৪৪/৪... দুই শতাব্দী পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এই মসজিদকে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং আজ পর্যন্ত এটি মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

[৫] আর-রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২২১/২

[৬] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়া লিস সাল্লাবি, পৃ. ৬৯, ৭০ বরাতে আল-ফাতহুল আরাবি ফি লিবিয়া

একবার সে আল-মুইযের দিকে ইশারা করে বলল:

حَلِّ بِرَقَّادَةَ الْمَسِيحِ ... حَلِّ بِهَا آدَمَ وَنُوحَ

“এখানে রাক্কাদা শহরে মাসীহ তাশরীফ এনেছেন। এখানে আদম ও নূহ অবতীর্ণ হয়েছেন।”

حَلِّ بِهَا اللَّهُ ذُو الْمَعَالِي ... فَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ رِيحٍ

“বরং এখানে আল্লাহ তাআলাই চলে এসেছেন। তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুই নশ্বর।” [১]

এই দুর্ভাগা কবি আন্দালুসের ইশবিলিয়া (Seville) শহরের অধিবাসী ছিল। সে ছিল যুক্তিবাদী, দার্শনিক এবং মদ্যপায়ী। আন্দালুসবাসীরা তাকে হত্যা করার সংকল্প করলে সে পালিয়ে কায়রোয়ানে চলে আসে এবং বনু উবাইদের দাসে পরিণত হয়। আল্লাহ তাকে কটু কথা বলার জন্য শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদান করেন। তার নিজের সঙ্গীরাই ৩৬২ হিজরিতে তাকে হত্যা করে। তার বয়স ছিল ৫০ বছরের বেশি। [২]

কারামিতা সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত:

আল-মুইযের শাসনামল পর্যন্ত সিরিয়ায় কারামিতা সম্প্রদায়ের শাসন ছিল এবং হাসান বিন আহমদ (আসাম) কারামিতি তাদের প্রধান ছিল। বনু উবাইদ এবং কারামিতা উভয়ই শিয়াদের ইসমাইলিয়া ফিরকার অনুসারী ছিল, কিন্তু কর আদায়ের লেনদেন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। অবশেষে আল-মুইয কেবল শক্তি প্রয়োগ করে কারামিতাদের সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেনি, বরং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের প্রাচীন কেন্দ্র বাহরাইনের বড় অংশ থেকেও তাদের উচ্ছেদ করেন। [৩]

সিরিয়াবাসীদের ওপর জুলুম:

সিরিয়া দখলের পর বনু উবাইদের সিরীয় গভর্নর খাইমিশ বিন মুহাম্মদ (যার নিয়োগ ৩৬৩ হিজরিতে হয়েছিল) জনগণের ওপর অবর্ণনীয় জুলুম চালায়। এখানে প্রায় তিন হাজার নিরপরাধ মানুষকে তলোয়ারের নিচে প্রাণ দিতে হয়। এই জুলুমের পরিণামে কয়েক সপ্তাহ পর সে এক অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়। বলা হয় যে, আবু বকর বিন আল-হারমি নামক এক ইবাদতগুজার ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। খাইমিশ চিৎকার করে বলত: “আমাকে হত্যা করে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।” অবশেষে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েই মারা যায়। [৪]

ফকিহ আবু বকর নাবলুসির ওপর অমানবিক নির্যাতন:

আল-মুইয ছিল অত্যন্ত জালেম ও দয়াহীন মানুষ। সিরিয়া দখলের পর সেখানকার আলেমদের ধরপাকড় শুরু হয়। রামলার বিখ্যাত ফকিহ আবু বকর ইবনে নাবলুসি (মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাহল) রহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘকাল ধরে বনু উবাইদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের ফতোয়া দিয়ে আসছিলেন। সিরিয়ার গভর্নর আবু মাহমুদ কাতমামির নির্দেশে তাকে গ্রেপ্তার করে কাঠের একটি খাঁচায় বন্দি করে কায়রোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাকে এক বছর বন্দি রাখা হয়। [৫]

[১] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ১৭৩, হাওয়ালা আল-ফাতহুল আরাবি ফি লিবিয়া: ৩৯২/১; এই শিরকি কালাম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ১১৪/২, ১১৫।

[৩] মিরআতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান: ২৮২/২, ২৮৩; আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ, পৃ. ৭০, হাওয়ালা আল-ফাতহুল আরাবি ফি লিবিয়া, পৃ. ৩১২।

[৪] আখবারু বনি উবাইদ, পৃ. ৮৩ থেকে ৯০।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৭/৫৫, ৫৬।

৩৬৩ হিজরিতে আল-মুইজ-এর প্রতিনিধি জওহর তাকে সামনে হাজির করে জিজ্ঞেস করল:

“আপনি কি এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি কারো কাছে দশটি তীর থাকে তবে সে যেন একটি তীর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এবং নয়টি তীর বনু উবাইদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করে?”

এই মুজাহিদ ব্যক্তি বললেন: “না, এটা আমার ফতোয়া নয়। আমার ফতোয়া তো এই ছিল যে, যদি কারো কাছে দশটি তীর থাকে তবে সে যেন দশটিই তোমাদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করে; কারণ তোমরা দীনকে মিটিয়ে দিয়েছ, সালেহীনদের হত্যা করেছ এবং আল্লাহর দেওয়া হেদায়েতের নুরকে নিভিয়ে দিয়েছ।”

জওহর রাগে ফেটে পড়ল। সে একজন ইহুদিকে ডাকল যে মানুষের চামড়া ছাড়াতে পারদর্শী ছিল। ফকিহ নাবলুসিকে সামনে দাঁড় করিয়ে ইহুদিকে তার চামড়া ছাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হলো। সে মাথার তালু থেকে ছুরি দিয়ে চিরে চামড়া ছাড়ানো শুরু করল। এই অমানবিক নির্যাতনের সময় ফকিহ নাবলুসি রহ. না দয়া ভিক্ষা চাইলেন, না আত্ননাদ করলেন। তিনি অনবরত আল্লাহর জিকির করছিলেন।

ইহুদি যখন ছুরির সাহায্যে চেহারার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন ফকিহ নাবলুসি এই আয়াতটি পড়ছিলেন:

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

(এই বিষয়টি লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল) [১]

বুকের চামড়া ছাড়ানোর পর ইহুদির মনে দয়া হলো এবং সে তার হৃদপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে তাকে শেষ করে দিল।

পুরো মুসলিম বিশ্বে যেখানেই এই বেদনাদায়ক ঘটনার খবর পৌঁছাল, মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। ইমাম দারাকুতনি রহ. যখনই আবু বকর ইবনে নাবলুসি রহ.-কে স্মরণ করতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে যেতেন। [২]

আন্দালুস দখলের ব্যর্থ চেষ্টা:

আল-মুইজ আন্দালুস দখলেরও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বারবার আন্দালুসের সাহসী মুসলমানরা তার বাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নিজের শেষ দিনগুলোতে আল-মুইজের প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ৩৬৫ হিজরিতে মক্কা ও মদিনার শাসকরাও তার অনুগত হয়ে গিয়েছিল এবং সরকারি ভাতাভোগী আলেমগণ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর মিস্বর থেকে তার জন্য দোয়া করতে শুরু করেছিলেন। এটাই ছিল আল-মুইজের জীবনের শেষ বছর। [৩]

[১] সূরা আল-আহজাব, আয়াত: ৬

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৪৮, ১৪৯

[৩] ইত্তিয়াজুল হনাফা, পৃ. ৯৩ থেকে ১২৩; আখবারু বনি উবাইদ, পৃ. ৯০ থেকে ৯৩

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আল-আজিজ

৩৬৫ হিজরি থেকে ৩৮৬ হিজরি

আল-মুইজ্জের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-আজিজ উপাধি নিয়ে শাসক হন। তিনি তার বাপ-দাদার মতো জালেম ও স্বৈরাচারী ছিলেন না। তার শাসনামলে বনু উবাইদের মুদ্রা সিরিয়া ও ইয়েমেনেও প্রচলিত হতে শুরু করে। সিরিয়ার বড় বড় শহর যেমন: হামাহ, হিমস এবং আলেপ্পোও তাদের অধীনে চলে আসে। এমনকি ৪০১ হিজরিতে কুফা ও মোসেলেও বনু উবাইদের খুতবা পাঠ করা হতে থাকে। [১]

যদি সত্যবাদী হও তবে নিজের বংশপরিচয় বর্ণনা করো:

সাধারণ মানুষ বনু উবাইদের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল কিন্তু তারা কিছু বলতে পারত না। একবার জুমার নামাজের অনেক আগে কোনো এক রসিক কবি একটি চিরকুট লিখে মিস্বারের ওপর রেখে অদৃশ্য হয়ে যান। আল-আজিজ খুতবা দেওয়ার জন্য মিস্বারে উঠলে এই চিরকুটটি দেখতে পান। সেটি খুললে তাতে লেখা ছিল:

إِذَا سَمِعْنَا نَسَبًا مُنْكَرًا ... نَبْكِ عَلَى الْمَنِيرِ وَالْجَامِعِ

“যখন আমরা কোনো মিথ্যা বংশপরিচয় শুনি, তখন এই মিস্বার এবং জামে মসজিদের অবস্থার জন্য কেঁদে ফেলি।”

إِنْ كُنْتَ فِيمَا تَدَّعِي صَادِقًا ... فَادْكُرْ أَبَا بَعْدَ الْأَبِ الرَّابِعِ

“যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে চতুর্থ প্রজন্মের পরের বাপ-দাদার নাম বলো।”

وَإِنْ تُرَدُّ تَحْقِيقَ مَا قُلْتَهُ ... فَانْسِبْ لَنَا نَفْسَكَ كَالطَّائِعِ

“যদি তুমি তোমার কথা প্রমাণ করতে চাও, তবে নিজের বংশপরিচয় সেভাবে বর্ণনা করো যেভাবে খলিফা আত-তাই আব্বাসি নিজের বংশপরিচয় বর্ণনা করেন।”

أَوْ لَا، دَعِ الْأَنْسَابَ مَسْتُورَةً ... وَادْخُلْ بِنَا فِي النَّسَبِ الْوَاسِعِ

“নতুবা বংশপরিচয় গোপনই থাকতে দাও এবং আমাদের মতো একজন সাধারণ বংশের মানুষ হয়ে যাও।”

فَإِنَّ أَنْسَابَ بَنِي هَاشِمٍ ... يَفْصُرُ عَنْهَا طَمَعُ الطَّامِعِ

“কেননা বনু হাশিমের বংশপরিচয় (এতই সুপরিচিত যে তাতে) কোনো লোভী (প্রতারক) জালিয়াতির লালসা করতে পারে না।”

আল-আজিজ এর জবাবে আমতা আমতা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। [২]

একইভাবে অন্য এক সময় অন্য এক কবি এই চিরকুটটি রেখে দেন:

بِالظُّلْمِ وَالْجَوْرِ قَدْ رَضِينَا ... وَلَيْسَ بِالْكَفْرِ وَالْحَمَاقَةِ

“আমাদের ওপর জুলুম ও অবিচার হতে থাকুক এটা মেনে নেওয়া যায়... কিন্তু কুফর ও বোকামি থেকে আল্লাহ রক্ষা করুন।”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৫৭১

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৬৯, ত ত-রিসালাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

إِنْ كُنْتَ أُعْطِيتَ عِلْمَ غَيْبٍ فَقُلْ لَنَا كَاتِبَ الْبِطَاقَةِ

“যদি তুমি ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখার দাবিতে সত্যবাদী হও... তবে বলে দাও এই চিরকুটটি কে লিখেছে।”

আল-আজিজ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন কিন্তু চিরকুট লেখককে চিনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। [১]

আল-আজিজ সাড়ে পঁচিশ বছর শাসন করেন। রমজান ৩৮৬ হিজরিতে গোসল করার সময় তার রুহ কবজ হয়ে যায়। [২]

ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত উজির: ইবনে কিলিস

আল-আজিজ অমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি একজন খ্রিস্টান ঈসা বিন নাসতুরসকে মিশরের এবং একজন ইয়াহুদি মানশাকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। [৩] তার শাসনামলে সালতানাতের উজির ছিলেন ইবনে কিলিস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত ও চতুর একজন ইয়াহুদি ব্যবসায়ী, যিনি প্রথমে মিশরের শাসক কাফুর ইখশিদির দরবারী হন। এই সময়ে তিনি বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরবি শাস্ত্রসমূহ শিখে নেন। খুব দ্রুতই তিনি এত উন্নতি করেন যে সালতানাতের উজির হয়ে যান। মিশরের ওপর আল-মুইজ্জের দখলের পর তিনি বনু উবাইদের দরবারের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। বনু উবাইদের অনুসারীদের মধ্যে ইয়াহুদিদের বেশ ভালো প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাদের মাধ্যমেই তিনি দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। আল-মুইজ্জের পর আল-আজিজ শাসক হওয়ার সাথে সাথেই ইবনে কিলিসকে সালতানাতের উজির নিযুক্ত করেন।

ইবনে কিলিস তার সেবার মাধ্যমে বনু উবাইদকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতেন। তিনি শিয়া ফিকহের ওপর একটি কিতাব সংকলন করেন যা আল-আজিজ সাধারণ দরবারে পাঠ করে শোনান এবং একে পুরো সালতানাতের আইন হিসেবে ঘোষণা করেন। এই যুগে কাজীদের ওপর আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন এর আলোকেই ফয়সালা করেন। এভাবে মুসলিম বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে একজন ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত রাফেজির সংকলিত আইন কার্যকর হয়ে যায়। [৪]

ইয়াহুদি উজিরের মৃত্যুতে আল-আজিজের শোক ও দুঃখ:

পনেরো বছর উজির থাকার পর ৩৮০ হিজরিতে ৬২ বছর বয়সে ইবনে কিলিসের মৃত্যু হয়। আল-আজিজ ইবনে কিলিসের ভক্ত, গুণগ্রাহী ও তাকে সম্মান করতেন। তিনি তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন, তার মৃত্যুতে অনেক কান্নাকাটি করেন এবং রাজপ্রাসাদের সেই স্থানেই নিজ হাতে তাকে দাফন করেন যেখানে তিনি নিজে দাফন হতে চেয়েছিলেন। ইবনে কিলিস আল-আজিজকে যে অসিয়ত করেছিলেন তা থেকে তার ঝোঁক বা প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি বলেছিলেন: “রোমানদের সাথে সন্ধি বজায় রাখুন যতক্ষণ তারা আপনার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখে। বনু হামদানের নিকট আপনার দাওয়াত কবুল হওয়া এবং আপনার মুদ্রা চালু থাকার ওপরই সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু মফরাজ বিন দাগফালকে যখনই বাগে পাবেন তাকে জীবিত ছাড়বেন না।” [৫]

ইবনে কিলিসের বার্ষিক বেতন ছিল দুই লক্ষ দিনার (প্রায় ৫০ কোটি টাকা)। এছাড়া তিনি যা পেতেন তার কোনো হিসাব ছিল না। তার জাঁকজমক কোনো বাদশাহর চেয়ে কম ছিল না। যখন তিনি মারা যান তখন তার ভাগ্যেরে থাকা মণি-মুক্তা ও দুল্লভ বস্তুর...

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩/৩৭৩, দার সাদির

[২] আখবার বনু উবাইদ, পৃ. ৯৭

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/১৬৮, আর-রিসালাহ

[৪] পাঠকরা ধারণা করতে পারেন যে, যে ফেরকার ফিকহ একজন ইয়াহুদি সংকলন করেছে, ইসলামের সাথে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে।

[৫] বনু হামদান বলতে আল-জাজিরার শাসক সাইফুদ দৌলা প্রমুখ উদ্দেশ্য। মফরাজ বিন দাগফাল ফিলিস্তিনে বনু উবাইদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একজন আরব সরদার ছিলেন।

মূল্য ধারণার বাইরে ছিল। শুধুমাত্র তার দাসের সংখ্যা ছিল চার হাজার। তার কাফনের খরচ ছিল দশ হাজার দিনার (প্রায় আড়াই কোটি রুপি)। [১]

জওহরের মৃত্যু:

আজিজের শাসনামলেই সালতানাতে প্রাক্তন উজির জওহরের মৃত্যু হয়। মিসর ও শামের ওপর বনু উবাইদকে দখল পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। কায়রো নির্মাণ ইতিহাসে তার নামকে জীবিত রেখেছে। তবে এর পাশাপাশি সে আলেমদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, তা তার চরিত্রে একটি কলঙ্কজনক দাগ। [২]

সানহাজা গোত্রের ক্ষমতা:

আজিজের শাসনামলের বিশেষ দিক ছিল এই যে, সে বনু উবাইদের প্রাচীন অনুগত গোত্র কাতামার পরিবর্তে বারবারি গোত্র সানহাজাকে প্রাধান্য দেয় এবং তিউনিসিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এভাবে এখানে সানহাজি সরদাররা অধীনস্থ শাসক হিসেবে শাসন করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরদার ছিল ইউসুফ বুলুঙ্কিন বিন জিরি, যে ৩৬২ হিজরি থেকে ৩৭৩ হিজরি পর্যন্ত শাসন করে। এরপর এই এলাকাগুলো তারই সন্তানদের অধীনে থাকে।

এই ব্যক্তি আহলে সুন্নাতে প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করত। এর কারণ ছিল এই যে, প্রায় ত্রিশ বছর আগে আহলে সুন্নাতে আলেমগণ সানহাজি সরদারদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা এবং সংস্কার ও নির্দেশনার কাজ শুরু করেছিলেন, যার প্রভাব পুরো গোত্রের ওপর পড়েছিল। এ কারণে ইউসুফ বুলুঙ্কিন উত্তর আফ্রিকায় আহলে সুন্নাতে ওপর থাকা বিধিনিষেধ শিথিল করে দেয় এবং আলেমদেরকে ওয়াজ ও নসিহত, পাঠদান ও পাঠগ্রহণ এবং গ্রন্থ রচনা ও ফতোয়া প্রদানের স্বাধীনতা দেয়। তবে মসজিদগুলোতে খুতবা বনু উবাইদের নামেই পাঠ করা হতো এবং তাদের শুরু করা অনেক বিদআতও অবশিষ্ট ছিল। ইউসুফ বিন জিরির এই সরকার যদিও বনু উবাইদের করদ রাজ্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটি স্বাধীন হয়ে যায় এবং ‘দাওলাতে আলে জিরি’ নামে পরিচিতি লাভ করে। [৩]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ১৩৪/৭, আন-নুজুমুজ জাহেরা: ১৪৬/৪, আল-মুনতাজাম: ১৫৫/৭

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩৭৮/১, সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৪৯৮/১৬

[৩] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৯৩, ৯৪ বরাতে মাওসুআতুল মাগরিবিল আরাবি: ২৪/২ থেকে ৩০

আল-হাকিম

৩৮৬ হি. থেকে ৪১১ হি.

আল-আজিজের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-হাকিম উপাধি নিয়ে শাসক হন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল এগারো বছর। [১] তার আমলে বনু বুওয়াইহ-এর ক্ষমতার কারণে বাগদাদ খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তাই কুফা ও মাদায়েনেও বনু উবাইদ-এর মুদ্রা ও খুতবা চালু হয়ে যায়। [২] তার শাসনামলেই পূর্ব দিগন্তে সুলতান মাহমুদ গজনভির আবির্ভাব ঘটে। আল-হাকিম এই সিংহপুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সুলতান মাহমুদ এই ঘিনদিকের চিঠির ওপর খুতু নিক্ষেপ করেন। [৩]

অহংকার, জেদ, দম্ভ, ঘৃণা, জুলুম ও নিষ্ঠুরতার মতো দোষগুলো আল-হাকিম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন; ফলে তিনি জনগণের ওপর জুলুম ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে তার পূর্বপুরুষদের অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি একটি নির্যাতন কক্ষ তৈরি করেছিলেন যার নাম রাখা হয়েছিল “জাহান্নাম”। সেখানে নির্যাতনের অদ্ভুত সব সরঞ্জাম ছিল। যে ব্যক্তির ওপর সরকারি রোযানল পড়ত, তাকে সেই নির্যাতন কক্ষে নিক্ষেপ করা হতো। [৪]

তিনি অল্পবয়সী হওয়ার পাশাপাশি নির্বোধও ছিলেন। কিন্তু দরবারীদের কাছে তিনি ছিলেন “ইমাম মাসুম”, যার কোনো কথা ভুল হতে পারত না। পূর্ববর্তী উবাইদি শাসকদের মতো তার প্রতিটি আদেশ ছিল অমোঘ; ফলে এই সময়কালটি অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে অতিবাহিত হয়। আল-হাকিম একদিন একটি আদেশ দিতেন। কয়েকদিন পর তা বাতিল করে তার বিপরীতে অন্য কোনো নির্দেশনা জারি করতেন। অধিকাংশ কাজ যা তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করাতেন, সেগুলোর কোনো গুরুত্ব ছিল না। কিছু আদেশ ভালো হতো, কিছু হাস্যকর এবং কিছু দুঃখজনক।

৩৯৫ হিজরিতে তিনি গভর্নরদের আদেশ দেন যেন সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের জন্য অবমাননাকর শব্দের ফলক বাজার, মসজিদ এবং বড় বড় ইমারতগুলোতে স্থাপন করিয়ে দেন। সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে গালিগালাজ লেখা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সরকারি কর্মচারীরা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা কারীদের থ্রেপ্তার করত এবং প্রকাশ্যে গর্দান উড়িয়ে দিয়ে বলত:

“আবু বকর ও উমরকে ভালোবাসার পরিণাম এমনই হয়।” [৫]

হাকিমের অদ্ভুত ও বিচিত্র আদেশসমূহ:

৩৯৯ হিজরিতে তিনি সালাতুত তারাবিহ-এর অনুমতি দেন কিন্তু ৪০১ হিজরিতে তা নিষিদ্ধ করে দেন। [৬] পুরো মিসর ও শামে সালাত...

[১] ইত্তিআজুল হুনাফা বি আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা: ৩/২

[২] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৭৭/১৫, তাবা আর-রিসালাহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৪৪/১৫, ১৬৩৩; সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৭৮/১৫, তাবা আর-রিসালাহ

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা: ১৭৭/১৫, তাবা আর-রিসালাহ

[৫] আর-রওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২৬৪/২ থেকে ২৬৫

[৬] ইত্তিআজুল হুনাফা বি আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা: ৮৬, ৭৮/২

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

তারাবিহ পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। একজন আলেম আবুল হাসান বিন দাকাক সাহস করে নিজের মসজিদে পুরো মাস তারাবিহ নামাজ পড়াতে থাকলেন। আল-হাকিম যখন জানতে পারলেন, তখন তাকে হত্যা করালেন। ৭ বছর পর্যন্ত আফ্রিকা, মিসর ও শামের মানুষ তারাবিহ থেকে বঞ্চিত থাকল। ৩৯৮ হিজরিতে পুনরায় তারাবিহর অনুমতি দিলেন। (তবে আল-হাকিমের পরবর্তী উবাইদি শাসকরা তারাবিহর ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।)

৩৯৫ হিজরিতে আল-হাকিম নির্দেশ দিলেন যে, কুকুর যেখানেই দেখা যাবে সেখানেই যেন মেরে ফেলা হয়। তিনি নির্দিষ্ট কিছু মাছ হারাম ঘোষণা করলেন। এদের কেনাবেচায় লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হতো। যব থেকে তৈরি মদ হারাম করলেন। বাকি সব ধরনের মদ চালু থাকল। ৪০২ হিজরিতে খেজুর ও আঙুর চাষ এবং কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাদের বাগানগুলো পুড়িয়ে দিলেন। মধুর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন এবং পুরো দেশ থেকে মধুর ভাণ্ডার খুঁজে বের করে ভূমধ্যসাগরে ফেলে দেওয়া হলো। এই মধুর পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার মটকারও বেশি। ৪০৩ হিজরিতে ইহুদিদের জন্য কালো পাগড়ি পরা এবং খ্রিস্টানদের জন্য গলায় ত্রুশ ঝোলানো বাধ্যতামূলক করলেন। জ্যোতিষীদের দেশান্তর করলেন।

৪০০ হিজরিতে তিনি “ইসলাম প্রিয়তা” প্রদর্শন করে কায়রোতে “আল-জামে আল-হাকিমি” নামে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করালেন, “দারুল ইলম” নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন এবং সেখানে ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের দরসের ব্যবস্থা করলেন। এটি দেখে মানুষ তার জন্য দোয়া করতে লাগল এবং ভাবল যে হয়তো তিনি সঠিক মুসলমান হয়ে গেছেন, কিন্তু তিন বছর পর তিনি হঠাৎ মত পরিবর্তন করলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলেন এবং ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের হত্যার নির্দেশ দিলেন।

এই সুযোগে তিনি মিসরের গির্জাগুলো ধ্বংস করে দিলেন এবং খ্রিস্টানদের জোরপূর্বক মুসলমান করার চেষ্টা করলেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা যা বায়তুল মুকাদাসে ছিল, সেটিও ধ্বংস করে দিলেন। কিছু খ্রিস্টান ভয়ে কালিমা পড়ে নিল। কয়েক বছর পর তিনি বায়তুল মুকাদাসের গির্জাগুলো পুনরায় নির্মাণ করিয়ে দিলেন এবং কালিমা পাঠকারী খ্রিস্টানদের পুনরায় তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

একবার মালিকি ফিকহের প্রতি অনুরাগী কিছু আফ্রিকান শাসককে প্রভাবিত করার জন্য তিনি দুইজন মালিকি ফকিহকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন করে জামে মসজিদে দরস দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে দুজনেরই শিরশ্ছেদ করালেন।

একবার তিনি নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। আইন অমান্যকারী অনেক যুবতী নারীকে হত্যা করা হলো এবং বৃদ্ধা নারীদের নদীতে ডুবিয়ে মারা হলো। সাড়ে সাত বছর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এরপর নির্দেশ দিলেন যে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

একবার বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শনের শখ জাগলে তিনি নিজের জন্য ভূমিচুম্বন নিষিদ্ধ করলেন। খুতবা ও চিঠিপত্রে নিজের জন্য উপাধি ও দোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং শুধু সালামের ওপর সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেন।

শেষ কয়েক বছরে তার আধ্যাত্মিক (প্রকৃতপক্ষে সফল) বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের নেশা চেপে বসল। তিনি কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ে...

সময় একা কাটাতে লাগলেন। এখন তিনি ঘোড়ার পরিবর্তে গাধার পিঠে চড়তেন। একজন দীর্ঘদেহী হাবশী তার সাথে সাথে চলত। পথে কারো ওপর রাগ হলে তিনি সেই হাবশীকে নির্দেশ দিতেন তার সাথে অপকর্ম করতে। যার দুর্গতি আসত, সে ভরা বাজারে এই অদ্ভুত ও লজ্জাজনক শাস্তিতে মুখ লুকাতে বাধ্য হতো।

একবার তার মাথায় বড় হওয়ার ভূত চাপল এবং তিনি নিজেকে খোদা দাবি করার কথা ভাবতে লাগলেন। তার দরবারীরা তাকে অনেক বোঝালেন এবং সাধারণ বিদ্রোহ ও কুফরের ভয় দেখিয়ে তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখলেন।

একবার রাগান্বিত হয়ে তিনি কায়রোর জনপদ লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা জনবসতিতে ঢুকে পড়ল, জনগণের সবকিছু লুট করে নিল এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিল। আল-হাকিম তার এক বিশেষ খাদেমের কাছে এই অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ শুনতে চাইলে সে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সারগর্ভ বাক্যে বলল:

“রোমানরা আক্রমণ করলেও এর চেয়ে বেশি ধ্বংসলীলা চালাতে পারত না যা আমি দেখে এসেছি।”

খাদেম তার বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য পুরস্কার ও সম্মানের আশা করেছিল, কিন্তু আল-হাকিম তাকে হত্যা করালেন। [১]

আবু রাকোয়ার বিদ্রোহ:

আল-হাকিমের শাসনামলে একজন উমাইয়া নেতা আবু রাকোয়ার বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য, যিনি বনু উবায়দ শাসন প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন। তার আসল নাম ছিল ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ। তিনি সুফিদের মতো সাধারণ পোশাক পরতেন এবং সাথে ওজুর জন্য একটি পানির পাত্র (রাকোয়া) রাখতেন, তাই তাকে ‘আবু রাকোয়া’ বলা হতো। তিনি খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বংশধর ছিলেন, একজন আলেম, ফাজিল এবং আবেদ ও জাহিদ হওয়ার পাশাপাশি চতুর ও বুদ্ধিমানও ছিলেন। তিনি মানুষের এই মানসিকতাকে সামনে রেখেছিলেন যে তারা “ইমাম”-এর পেছনে চলে; তাই তিনি নিজেই ইমামতের দাবি করলেন। বনু উবায়দদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাজার হাজার মানুষ তার সাথে যোগ দিল।

আরব গোত্র বনু হিলাল তাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিল। আবু রাকোয়া খুব দ্রুত বারকা এবং এর আশপাশ থেকে বনু উবায়দদের বিতাড়িত করে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মিশরের দিকে অগ্রসর হয়ে মিশরের একটি বিশাল এলাকা দখল করে নেন। এটি দেখে আল-হাকিমের হাত-পা ফুলে গেল, তিনি সিরিয়া থেকে নতুন সৈন্যবাহিনী আনালেন এবং আবু রাকোয়ার সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করলেন।

আবু রাকোয়ার শক্তি দমন করা কঠিন ছিল কারণ তার সাথে জনগণের সমর্থন ছিল; তাই আল-হাকিম প্রতারণার আশ্রয় নিলেন এবং কিছু আমিরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা তার সাথে যোগ দেয় এবং সুযোগ বুঝে তাকে অপহরণ করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ গ্রেফতার হলেন। তিনি প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছিলেন যা প্রত্যাখ্যান করা হয়। [২]

আবু রাকোয়ার আত্মহত্যা:

আবু রাকোয়াকে কায়রোর দিকে এমনভাবে পাঠানো হলো যে, একটি প্রশিক্ষিত বানর তার পিঠে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যা তাকে চড় মারছিল...

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৭৩-১৮৪; আখবারু বানি উবায়দ: ৯৫-১০২; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/১৯৬-২০৮।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৯৭ হিজরি; আল-হারিসি উবায়দ, পৃষ্ঠা: ১০৪। দ্রষ্টব্য: আখবারু বানি উবায়দ-এ আবু রাকোয়ার বিদ্রোহের ঘটনা ৩৯৫ হিজরির অধীনে রয়েছে।

যেত। এই লাঞ্ছনা দেখে আবু রুকওয়াহ নিশ্চিত হলেন যে, আল-হাকিম তাকে নিকৃষ্টতম নির্যাতন দিয়ে হত্যা করবে; ফলে কায়রোর পথে তিনি বিষাক্ত কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তা সত্ত্বেও কায়রোতে তার শিরশ্ছেদ করা হয় এবং লাশ জনসমক্ষে শূলে চড়ানো হয়। [১]

নির্যাতনের চরম সীমা। আল-হাকিম নিজ পরিবারের হাতে নিহত:

আল-হাকিম শেষ দিনগুলোতে কায়রোর জনগণের ওপর নির্যাতনের চরম সীমা অতিক্রম করেন। শুধু পুরুষ নয়, নারীদেরও সরকারের বিরোধিতার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার করা হতে থাকে। তার খামখেয়ালিপনায় তার কর্মকর্তা ও পরিবারের সদস্যরাও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তার বোন তার নির্বোধ রাজনীতির প্রতিবাদ করতেন এবং বিনিময়ে তার হুমকি শুনতেন। অবশেষে বোন সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইবনে দাওয়াসকে নতুন সরকারে বড় পদের লোভ দেখিয়ে আল-হাকিমকে হত্যার জন্য রাজি করান। আল-হাকিমের অভ্যাস ছিল যে, তিনি গাধায় চড়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেতেন এবং কিছু সময় নির্জনে কাটাতেন। ঘাতকরা এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর মারাত্মক আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে লাশ গায়েব করে দেয়। এটি ৪১১ হিজরির ঘটনা। বেশ কিছু দিন লাশ না পাওয়ায় সালতানাতের লোকজন নিশ্চিত হয় যে, আল-হাকিমকে হত্যা করা হয়েছে। [২]

আল-হাকিম ৩৬ বছর ৯ মাস বয়স পেয়েছিলেন এবং ২৫ বছর শাসন করেছিলেন। হাফিজ যাহাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে: “সে ছিল তার সময়ের বিতাড়িত শয়তান এবং যুগের ফেরাউন।” [৩]

মুইজ বিন বাদিস। আফ্রিকায় মুসলমানদের সাহায্যকারী:

এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় বাদিস বিন মানসুর বনু উবাইদের অধীনে শাসক হিসেবে উত্তর আফ্রিকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি বারবার গোত্র সানহাজার শাখা আল-যিরির সর্দার ছিলেন। ৪০৬ হিজরিতে হঠাৎ তার মৃত্যু হলে তার আট বছর বয়সী পুত্র মুইজ বিন বাদিস তার উত্তরসূরি হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি আকিদার দিক থেকে কটুর সুন্নি ছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর তিনি বিচার বিভাগ মালেকি ফকিহদের হাতে সঁপে দেন। এভাবে সুন্নাহর নিদর্শনসমূহ পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে এবং রাফেজি শাসকদের তাৎক্ষণিকভাবে এই উপলব্ধি হয়নি যে, তিউনিসিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত কত বড় পরিবর্তন আসছে। [৪]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৪৯/৭

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১১ হিজরি

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭৪/১৫, ত. আর-রিসালাহ

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪০/১৮

আয-যাহির

আল-হাকিমের মৃত্যুর পর তার ষোলো বছর বয়সী পুত্র আয-যাহির উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১] তিনি একজন বিলাসপ্রিয় যুবক ছিলেন এবং বেশিরভাগ সময় রঙ-রলিতে মগ্ন থাকতেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি বেশিরভাগই তার ফুফু সিদ্দুল মুলকের হাতে ছিল।

[২]

তার পিতার মতো তিনিও অদ্ভুত সব আদেশ জারি করতেন। তিনি নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার এবং সব ধরনের কাজ করার অবাধ অনুমতি দিয়েছিলেন। [৩]

একবার তার মনে হলো, তাই তিনি গরু ও বলদ জবাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। দেশে বড় মাংস দুস্প্রাপ্য হয়ে গেল। গরুর মাথার দাম একশ দিনার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সাধারণ মানুষ চরম দুশ্চিন্তায় পড়ল এবং কসাইদের জীবিকাও শেষ হয়ে গেল। আয-যাহির মজুসিদের নওরোজ উৎসবের সময় এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেন, কিন্তু তিন দিন পার হতেই এই নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করেন। [৪]

শাসকদের বিলাসিতার প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপরও ছিল। নসরানিরা (খ্রিস্টান) তাদের উৎসব পালন করলে প্রকাশ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করত, যেখানে মুসলিম ও কাফির এবং নারী ও পুরুষ সবাই অংশগ্রহণ করত এবং একে অপরের সাথে মেলামেশা করত। নারীরাও মদে এতটাই মাতাল হয়ে যেত যে তাদের পালকিতে করে তুলে নিয়ে যেতে হতো। [৫]

তার শাসনামলে ইরাকে ইসনা আশারি বুয়াইহিদের প্রভাব কমে যায় এবং সুলতান মাহমুদ গজনভীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদির বিল্লাহর খিলাফত সুসংহত হয়। এমন পরিস্থিতিতে ইরাকের রাফেঘিরা নিজেদের সমর্থনের জন্য জুমার নামাজে আয-যাহিরের নামে খুতবা পড়া শুরু করে দেয়। [৬]

হাজারে আসওয়াদের অবমাননা:

আয-যাহিরের আমলে উবাইদি ইসমাইলি শিয়াদের ধৃষ্টতা এই পর্যায়ে ছিল যে, ৪১৩ হিজরিতে এই ফেরকার কিছু লোক মসজিদে হারামে ঢুকে পড়ে এবং তাদের মধ্যে একজন হাজারে আসওয়াদের কাছে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে তাতে তিনটি আঘাত করে। সে বলছিল:

[১] আখবার বনী উবাইদ: ১০৩/১

[২] ইত্তিআযুল হুনাফা: ১৮২/২; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৬/১৫

[৩] ইত্তিআযুল হুনাফা: ১২৬/২

[৪] ইত্তিআযুল হুনাফা: ১৪৯/২, ১৫০

[৫] ইত্তিআযুল হুনাফা: ১৩৭/২

[৬] ইত্তিআযুল হুনাফা: ১৬৮/২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

“এই পাথরের পূজা আর কতকাল করা হবে! আজ মুহাম্মদ কোথায় যে আমাকে আটকাবে!
আমি বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করেই ছাড়ব।” (নাউযুবিলাহ)

একজন মুসলিম খঞ্জর দিয়ে এই হতভাগার ওপর হামলা করলেন এবং তাকে মেরে ফেললেন, তার বাকি সঙ্গীদেরও জনতা ঘিরে ফেলে হত্যা করল। হাতুড়ির আঘাতে হাজারে আসওয়াদে ফাটল ধরেছিল এবং কিছু কণা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। এই চিহ্নগুলো আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। [১]

শাম হাতছাড়া হয়ে যাওয়া:

আয-যাহিরের শাসনামলে রামলার শাসক হাসান বিন মুফরাজ শামের এক বিশাল এলাকা দখল করে নেন, এভাবে বনু উবাইদ রাষ্ট্র কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। [২]

আয-যাহির ষোলো বছর শাসন করার পর ৪২৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

[১] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২২৩/২

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮৩/১৫, ১৮৫

[৩] আখবার বনু উবাইদ, পৃষ্ঠা ১০৭

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আল-মুস্তানসির

৪২৭ হিজরি থেকে ৪৮৭ হিজরি

আল-জাহিরের পুত্র আল-মুস্তানসির সাত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]
 তিনি ৪২৭ হিজরি থেকে ৪৮৭ হিজরি পর্যন্ত টানা ষাট বছর শাসক ছিলেন। বনু উমাইয়া,
 বনু আব্বাস এবং বনু উবাইদ-এর কোনো শাসকের ভাগ্যে এত দীর্ঘ সময় শাসন করার
 সুযোগ জোটেনি। [২]

বাগদাদেও খুতবা:

তিনি একমাত্র উবাইদি খলিফা ছিলেন যার ষড়যন্ত্রের প্রভাব বাগদাদেও পড়েছিল এবং
 সেখানে রাফেজিরা আব্বাসীয় খলিফাকে সরিয়ে পুরো এক বছর (৪৫১ হিজরিতে) তার
 নামে খুতবা পাঠ করিয়েছিল। [৩]

সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ ও আহলে সুন্নাত উলামাদের বন্দিত্ব:

সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করার যে ধারা বনু উবাইদ-এর সূচনালগ্ন থেকে শুরু
 হয়েছিল, মুস্তানসিরের যুগেও তা অব্যাহত ছিল। সুন্নাতসমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
 রাফয সাধারণ রূপ নিয়েছিল। উলামায়ে কেরাম পূর্বের ন্যায় বন্দি ছিলেন এবং হাদিসের
 দরস দিতে পারতেন না। [৪]

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে বন্ধুত্ব:

মুস্তানসিরের দাদা আল-হাকিম বাইতুল মুকাদাসের কেন্দ্রীয় গির্জা “কুমামাহ” ধ্বংস
 করে দিয়েছিলেন। মুস্তানসির ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক ছিলেন;
 তাই তিনি রোমান শাসকদের পাঁচ হাজার বন্দি ফেরত দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করেন
 এবং তাদের বাইতুল মুকাদাসের কেন্দ্রীয় গির্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। নির্মাণ ব্যয়
 মুস্তানসির বহন করেন। [৫]

মুস্তানসির প্রশাসনিক যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত - বদর জামালীর উত্থান:

মুস্তানসিরের প্রশাসনিক যোগ্যতা ছিল না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি নামমাত্র শাসক ছিলেন
 এবং আমীরগণ তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলেন। অবশেষে তার নায়েব
 বদর জামালী তার ইচ্ছায় মিশরে এসে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়
 কিছুটা প্রাণ ফিরে আসে। [৬]

উত্তর আফ্রিকায় আহলে সুন্নাতের বিজয় - দৌলতে আল-যিরিয়ার প্রতিষ্ঠা:

উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুইজ বিন বাদিস আহলে সুন্নাতের সমর্থক ছিলেন এবং সেখানে
 আহলে সুন্নাতের নিদর্শনসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত সময়ের
 অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর ৪৩৬ হিজরিতে যখন তিউনিসের শাসক
 হন, তখন সেই সময়...

[১] আল-ইত্তিআয আল-হনাফা: ১৮৪/২

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৬/১৫; ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২২৯/৫

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৬/১৫

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৬/১৫

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৬/১৫; ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২২৯/৫

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯৬/১৫

[৭] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩৮২/৮; ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২৩০/৫

তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তিনি মালিকি আলেমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং ক্ষমতা গ্রহণের পর নিজের রাজ্যে মালিকি ফিকহ বাস্তবায়নে পূর্ণ আগ্রহ দেখান। [১] তাঁর চরিত্র গঠনে সালতানাতের উজির আবুল হাসান ইবনে আবি রিজালের বড় ভূমিকা ছিল, যিনি একজন নেককার, সৎ এবং বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি মুইযের লালন-পালন সঠিক ধারায় করেন এবং তাঁকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা ও মালিকি ফিকহের আলেম হিসেবে গড়ে তোলেন। সেই সময়ে কায়রোয়ানে রাফেজিদের প্রভাব ছিল প্রবল, কিন্তু উজিরের এই কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

একবার ঈদের নামাজের জন্য যাওয়ার সময় মুইযের ঘোড়া চমকে ওঠে এবং তাঁর মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেরিয়ে আসে: “আবু বকর ও উমর”। এটিই ছিল প্রথমবার যখন মানুষ মুইযের আহলে সুন্নাত হওয়ার কথা জানতে পারে। তাঁর মুখ থেকে “আবু বকর ও উমর”-এর নাম শুনেই রাফেজিরা রাগে ফেটে পড়ে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তেড়ে আসে। তবে মুইযের গোলামরা ঢাল হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সেই সাথে সুন্নি জনগণ, যারা বছরের পর বছর ধরে রাফেজিদের জুলুম সহ্য করে আসছিল, তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং কেবল রাফেজিদের আক্রমণই প্রতিহত করেনি, বরং তাদের অনেক লোককে হত্যাও করে। বনু উবাইদের আধিপত্যের পর এটিই ছিল প্রথমবার যখন সুন্নিরা রাফেজিদের জুলুমের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিল। ফলে দেখতে দেখতে তিউনিসিয়ার আশপাশে এবং আরও অনেক স্থানে সুন্নিরা জেগে ওঠে। দাঙ্গায় অন্তত তিন হাজার রাফেজি নিহত হয়। [২]

৪০৬ হিজরিতে মুইয বিন বাদিস যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি ছিলেন একেবারেই অনভিজ্ঞ। তিনি কৈশোর থেকে যৌবনের যাত্রা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কণ্টকাকীর্ণ পথ একই সাথে পাড়ি দেন। তিনি অত্যন্ত অনুগত আমিরদের সাহচর্য পেয়েছিলেন, যাদের ওপর ভর করে তিনি ৪২ বছর ধরে ধীরে ধীরে নিজের রাজ্যকে সুসংহত এবং আহলে সুন্নাতকে সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত সময়ে নিজের জাতিকে বনু উবাইদের অশুভ ছায়া থেকে মুক্তি দেওয়া। [৩]

বনু উবাইদের ছায়া থেকে মুক্তির ঘোষণা:

সুন্নিরা যতই স্বাধীনতা পাচ্ছিল, কায়রোয়ানের জামে মসজিদে যেখানে জুমার নামাজে বনু উবাইদের খুতবা পড়া হতো, সেখানে মানুষের উপস্থিতি ততই কমে যাচ্ছিল; কারণ মিস্র থেকে বনু উবাইদের জন্য দোয়া শোনা তাদের জন্য অসহ্য ছিল। এরপর এমন সময় এল যখন জামে মসজিদে জুমার দিন একজন মুসল্লিও থাকত না। মানুষ বাড়িতে জোহরের নামাজ আদায় করে নিত।

অবশেষে ৪৪০ হিজরিতে যখন মুস্তানসির উবাইদির শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন মুইয স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বনু উবাইদের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের খুতবা ও মুদ্রা বাতিল করা হয় এবং সেখানে আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েমের খুতবা শুরু করা হয়। মুইয বিন বাদিস খতিবদের নির্দেশ দেন যেন তারা জুমার খুতবায় বনু উবাইদের স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে বদদোয়া করেন। [৪]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪০৯ হিজরি; আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/২৬৭। হাফেজ জাহাবি এবং আল্লামা ইবনুল আসির বলেন যে, মুইযের আগে আফ্রিকার আহলে সুন্নাতরা বেশিরভাগই হানাফি মাযহাব অনুসরণ করত। সেখানে মালিকি ফিকহের প্রাধান্য মৃত বারবার আলেমদের কারণে হয়েছিল। সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/১১৪; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭/৬০৫।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/২৭৪।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/২৭৪; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪০৬ হিজরি থেকে ৪৪০ হিজরি।

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/২৭৭, ২৭৮; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৩৫ হিজরি।

বনু উবাইদের দাওয়াতী কেন্দ্র ‘দারুল ইসমাইলিয়া’ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং কালো পোশাককে সরকারি পোশাক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা ছিল আব্বাসীয়দের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। [১]

মুসলমানদের আপসে লড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা:

তিউনিসিয়ার এই বিপ্লবে বনু উবাইদ দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। অবশেষে মুস্তানসিরের উজির ‘ইয়াজুরি’ মিশরের সাইদে বসবাসরত বনু সুলাইম এবং বনু হিলালের সেই যোদ্ধা আরব বেদুইনদের তলব করলেন, যারা বনু উবাইদ এবং বনু উমাইয়াদের লড়াইয়ে গনিমতের মালের লোভে কোনো এক পক্ষের হয়ে লড়াই করত। তাদের অর্থ দিয়ে যে কারো বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। তাদের মধ্যে শিয়া মতবাদের কিছু প্রভাব থাকলেও তারা রাফেজি ছিল না, বরং সাধারণ মুসলমানদের মতোই ছিল।

ইয়াজুরি তাদের ডেকে শুধু পুরস্কারের লোভই দেখাননি, বরং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা যতটুকু এলাকা জয় করবে তা তাদের নামেই লিখে দেওয়া হবে এবং সেসব এলাকা থেকে যে ধন-সম্পদ ও মালামাল তাদের হস্তগত হবে, সেগুলোও তাদের মালিকানাধীন হবে। এই ঘোষণা বেদুইন গোত্রগুলোর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করল এবং তারা দলে দলে মুইজ বিন বাদিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রওনা হলো। ইয়াজুরি তাদের সবাইকে নগদ অর্থ ও উট সরবরাহ করেছিলেন। ৪৪৪ হিজরিতে তারা তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়, কিন্তু বেদুইনদের প্রবল উদ্দীপনার সামনে বারবার টিকতে পারল না এবং এই প্লাবন থামানো সম্ভব হলো না।

বেদুইনরা কোনো বিশেষ প্রতিরোধ ছাড়াই বারকা দখল করে নিল এবং পথের সমস্ত শহর, জনপদ ও গ্রাম ধ্বংস করতে করতে কায়রাওয়ানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। মুইজ বিন বাদিস ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বের হলেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন। প্রকৃতপক্ষে মুইজ বিন বাদিসের সমর্থকরা যারা রাফেজিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তারা নিজেদের সামনে আরব মুসলমানদের দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে সেই উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করতে পারেনি। মুইজ দ্রুত কায়রাওয়ানের দিকে ফিরে যান এবং এর চারপাশে একটি নতুন প্রাচীর নির্মাণ করান যাতে দীর্ঘ অবরোধের সময় শহরটিকে রক্ষা করা যায়।

দীর্ঘ সময় ধরে আরব গোত্রগুলো কায়রাওয়ানের ওপর হামলা চালাতে থাকে। উভয় পক্ষেরই জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকে। মুইজ বিন বাদিস বুঝতে পারলেন যে, বনু উবাইদ মুসলমানদের আপসে লড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করতে চায়। তিনি একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কায়রাওয়ানের পরিবর্তে মাহদিয়াকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করলেন। সেই সাথে প্রজাদেরও পরামর্শ দিলেন যে, আরবদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে তারা যেন মাহদিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।

৪৪৯ হিজরির শাবান মাসে মুইজ বিন বাদিস সরকারি কর্মকর্তা ও বিপুল সংখ্যক প্রজা নিয়ে লিবিয়ার মাহদিয়া শহরে স্থানান্তরিত হন, যেখানে তার পুত্র তামীম শাসন করছিলেন। রমজান মাসে আরবরা কায়রাওয়ান লুণ্ঠন করে। এই বিজয়কেই তারা যথেষ্ট মনে করল এবং আর সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেনি। এভাবেই এই ভয়াবহ ফিতনা প্রশমিত হলো। এরপর এই আরবরা এই এলাকাতেই বসবাস করতে থাকে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আফ্রিকান গোত্রগুলোর সাথে তাদের সংমিশ্রণের ফলে তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় আরবদের এক মিশ্র জাতি সাধারণ হয়ে ওঠে। [২]

[১] আল-ইত্তিআজ আল-হুনাফা: ২/২১৬

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/৪৪২, আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/২৮৮ থেকে ২৯৪, আল-মাওসুআতুল মুজিজাহ ফিত তারিখিল ইসলামি: ১৭/৯১, ৯২

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মুইজ বিন বাদিসের ইন্তেকাল - জীবন ও চরিত্রের ওপর এক নজর:

৪৫৩ হিজরিতে মুইজ বিন বাদিসের ইন্তেকাল হয়। তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি ছিলেন শ্যামলা বর্ণের, সুদর্শন এবং দীর্ঘদেহী মানুষ। তিনি দূরদর্শী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ৪৭ বছর শাসন করেন। উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের সুরক্ষা এবং সুন্নাহর পুনর্জীবনে তার অবদান কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়। [১]

মুইজের পর তার ছেলে তামীম ৫৬ বছর শাসন করেন এবং এই সুন্নি রাষ্ট্রকে, যা বর্তমান লিবিয়া ও আলজেরিয়ার এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন যা এক শতাব্দী পর্যন্ত স্বাধীনভাবে টিকে ছিল। [২]

বনু উবাইদের পতন শুরু, সিরিয়ায় সেলজুকদের আধিপত্য:

বনু উবাইদের পতন শুরু হয়েছিল। পূর্ব দিক থেকে উত্থিত সেলজুক সুলতানরা দ্রুত পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাদের বিখ্যাত শাসক মালিক শাহ-এর প্রতিনিধিরা ৪৬৩ হিজরিতে সিরিয়ার দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং দেখতে দেখতেই তারা আলেপ্পো ও দামেস্ক দখল করে নেন। ৪৭৭ হিজরি নাগাদ সমস্ত উপকূলীয় এলাকা সেলজুকদের শাসনাধীনে চলে আসে। [৩]

মিশরের উজির বদর জামালি ৪৮৭ হিজরিতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেলজুকদের সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করার অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে কোনো সফলতা আসেনি। [৪] অন্যদিকে মরক্কোতে মুরাবিতুনদের আমির ইউসুফ বিন তাশফিন একটি বিশাল ও সুসংহত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে মিশরকে বাদ দিয়ে পুরো উত্তর আফ্রিকায় আহলে সুন্নাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫]

ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ:

অবশেষে মুস্তানসির সেলজুক ও মুরাবিতুনদের ক্ষমতা দেখে ভীত হয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান যাতে তার সুন্নি বিরোধীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি ছিল এমন এক ভয়াবহ অপরাধ যা মুসলিম বিশ্বের ওপর ক্রুসেডারদের আক্রমণের পথ খুলে দেয় এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর সাহস অনেক বাড়িয়ে দেয়। [৬]

মিশরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ:

মুস্তানসিরের শেষ বছরগুলোতে মিশরে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। নীল নদে নামমাত্র পানি অবশিষ্ট ছিল। ক্ষেত-খামার শুকিয়ে যায়। চারণভূমিতে ঘাসের নামনিশানাও দেখা যেত না। অগণিত মানুষ দেশ ছেড়ে হিজরত করে, যাদের মধ্যে মুস্তানসিরের মা ও পরিবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ এমনকি সওয়ারির পশুদেরও জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪৫৩ হিজরি; আল-বায়ানুল মাগরিব: ১/২৯৫, ২৯৬; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/১৪০; আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ২/২৬৪, ২৮৮।

[২] ওফায়াতুল আ'য়ান: ৬/৩০৪, ৩০৫।

নোট: ৫০১ হিজরিতে তামীমের ইন্তেকাল হলে তার ছেলে ইয়াহইয়া বিন তামীম শাসক হন। তিনি ৫০৯ হিজরিতে মারা যান এবং তার ছেলে আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৯ বছর শাসন করেন। এরপর তার ছেলে হাসান বিন আলী শাসক হন। ৫৪৩ হিজরিতে মাহদিয়া (ত্রিপোলি)-র ওপর ফরাসিরা (ক্রুসেডাররা) দখলদারিত্ব কয়েম করলে হাসান বিন আলী পলায়ন করতে বাধ্য হন এবং এভাবে এই রাজবংশ শেষ হয়ে যায়।

[৩] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৪৭১ হিজরি।

[৪] আল-মুখতাসার ফি তারিখিল বাশার: ২/১৯৬।

[৫] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৪৭৯ হিজরি, ৪৮৪ হিজরি।

[৬] তারা ফ্রাঙ্কদের (ইউরোপীয়দের) কাছে পত্র পাঠাল এবং সিরিয়া দখলের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাল। (তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/২৪)

উজিরের দপ্তরে একটি ঘোড়াও অবশিষ্ট ছিল না যে মুস্তানসির তাতে সওয়ার হতে পারতেন। একবার তাঁর সওয়ারির খুব প্রয়োজন হলো, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি খচ্চর পাওয়া গেল। হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর মতে, এটি ছিল ইউসুফ (আ.)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি। [১]

চরম বিশৃঙ্খলার যুগ। মুস্তানসিরের মৃত্যু:

মুস্তানসির ৪৮৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শাসনামল ছিল চরম বিশৃঙ্খলার। সাধারণ মানুষ ছিল নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত। বারবার দুর্ভিক্ষ এবং ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পৌঁছেছিল। [২]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ১৯০

[২] ওফায়াতুল আইয়ান, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বনু উবাইদ রাষ্ট্র (পতনের যুগ)

আল-মুস্তা'লি

৪৮৭ হিজরি থেকে ৪৯৫ হিজরি

মুস্তানসির তার পুত্র নিযারকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তার উজির বদর জামালি নিযারের পরিবর্তে মুস্তানসিরের দ্বিতীয় পুত্র মুস্তা'লিকে শাসক বানিয়ে দেন। এভাবে বনু উবাইদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুস্তা'লির ভাই নিযার এই বলে বিদ্রোহ করেন যে, পিতা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। নিযার তার সমর্থকদের নিয়ে এক বছর পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে রাখেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হন এবং মুস্তা'লি তাকে জীবন্ত দেয়ালে গেঁথে দেন। [১]

নিযারি ফেরকার আবির্ভাব। হাসান বিন সাব্বাহ এবং শাইখুল জাবাল সিনান:

নিযারের অনুসারীরা পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। নিযারের একজন সমর্থক হাসান বিন সাব্বাহ ইরানে গিয়ে দাইলামের পাহাড়ি অঞ্চলে “আলমুত দুর্গ”-কে নিজের কেন্দ্র বানান এবং একটি নতুন ফেরকা “বাতিনিয়া ইসমাইলিয়া”-র ভিত্তি স্থাপন করেন। [২]

কেউ কেউ সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল: মাসইয়াফ এবং বানিয়াসে গিয়ে আস্তানা গাড়েন এবং “আধ্যাত্মিকতার” ভণ্ডামি করে সেখানে একটি দল গঠন করেন। এই গোষ্ঠীর একজন নেতা রশিদ উদ্দিন সিনান, যিনি “শাইখুল জাবাল” নামে পরিচিত ছিলেন, অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [৩]

প্রথম ক্রুসেড:

মুস্তা'লির শাসনামলে সিরিয়ার ওপর ইউরোপীয় শক্তিগুলো সেই রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালায় যা ইতিহাসে প্রথম ক্রুসেড নামে পরিচিত। মুস্তা'লি সিংহাসনে আরোহণের দুই বছর আগে সেলজুক বাদশাহ মালিক শাহ ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্ক (ইউরোপীয়) এবং বনু উবাইদ উভয়ই একে সেলজুকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সেরা সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে।

যখন উত্তর দিক থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো সিরিয়ার সেলজুকদের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন মুস্তা'লি ইসলাম বিদ্বেষের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে সিরিয়া আক্রমণ করেন। এভাবে সেলজুকরা উভয় দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ে এবং মুস্তা'লির বাহিনী রবিউল আউয়াল ৪৯০ হিজরি (মার্চ ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ) মাসে প্রথমে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর সুর এবং তারপর শাবান ৪৯১ হিজরি (জুলাই ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দ) মাসে আল-কুদসকে সেলজুকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। [৪] উবাইদিদের প্রতিনিধি ইফতিখারুদ্দৌলা আল-কুদসের শাসক নিযুক্ত হন। [৫]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৯৭

[৩] মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার: ৩/৪৭৯; খিতাতুশ শাম, মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাজ্জাক কুর্দ আলী: ৬/২৫৬; আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/৩৮৫

[৪] ইত্তিআয়ুল হনাফা: ৩/২০, ২২০

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৩৮৩, ৪৫১

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫/২৫

যাইহোক, ইউরোপীয় শক্তিগুলো সিরিয়া জয় করে যখন বায়তুল মুকাদাসে পৌঁছাল, তখন তারা বনু উবাইদের সাথে বন্ধুত্বের কোনো তোয়াক্কা করল না এবং ২৪ শাবান ৪৯২ হিজরি (১৫ জুলাই ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) বায়তুল মুকাদাস দখল করে নিল। এখানে কয়েক সপ্তাহ ধরে গণহত্যা চলতে থাকে। মুসলিম বিশ্বে এই ক্ষত সৃষ্টিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে মুস্তালি পুরোপুরি অংশীদার ছিল। মুস্তালি সফর ৪৯৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

আল-আমির

৪৯৫ হিজরি থেকে ৫২৪ হিজরি

মুস্তালির পর তার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে আল-আমির শাসক হন। তিনি ২৯ বছর ৯ মাস শাসন করেন। তার পুরো সময়কাল আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় অতিবাহিত হয়। এই সময়ে একদিকে ক্রুসেডাররা সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পুরোপুরি দখল করে নেয়। অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকায় ইবনে তুমারত নামক একজন আলেম ও বিজ্ঞ আমির ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুওয়াহহিদুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই নতুন রাষ্ট্র বনু উবাইদকে আফ্রিকা থেকে এতটাই পিছু হটতে বাধ্য করে যে তাদের কাছে কেবল মিশর অবশিষ্ট থাকে। ৫২৪ হিজরিতে আল-আমির একদিন ভ্রমণে বের হলে হঠাৎ তার বিরোধী হাসান বিন সাবাহর অনুসারীরা আক্রমণ করে তাকে তার পুত্রদেরসহ হত্যা করে। [২]

আল-হাফিজ

৫২৪ হিজরি থেকে ৫৪৪ হিজরি

আল-আমিরের কোনো সন্তান জীবিত ছিল না; তাই বনু উবাইদ তার চাচাতো ভাই আব্দুল মাজিদ বিন মুহাম্মদকে ইমাম হিসেবে নির্বাচিত করে। তিনি সাবেক খলিফা মুস্তানসিরের নাতি ছিলেন। তিনি আল-হাফিজ উপাধি গ্রহণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি একজন দুর্বল ও ষড়যন্ত্রকারী শাসক ছিলেন। তার আমলে আল-উবাইদ বংশের প্রভাব অনেক কমে গিয়েছিল; তাই একজন প্রভাবশালী ইসনা আশারি নেতা আবু আলী (সাবেক প্রধানমন্ত্রী আফজাল বিন বদর জামালির ছেলে) শাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তিনি সর্বত্র ইসনা আশারি রীতিনীতি চালু করে দেন। আবু আলীর উপস্থিতিতে আল-হাফিজ দুই বছর পর্যন্ত ক্ষমতাহীন ছিলেন। একদিন তিনি তার এক অনুগত ব্যক্তির মাধ্যমে আবু আলীকে হত্যা করান, তখন শাসনকার্য তার হাতে আসে। কিন্তু আল-হাফিজের দুর্বলতা এমন ছিল যে, যখনই তিনি কাউকে উজির বানাতেন, তখনই তার কাছে দমে যেতেন এবং উজির সবকিছুর ওপর প্রভাবশালী হয়ে উঠতেন। এরপর তিনি ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করাতেন। তিনি বিশ বছর সাত মাস শাসন করেন। ৫৪৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [৩]

তার শাসনামলে ইমাদ উদ্দিন জঙ্গি আল-জাজিরা ও সিরিয়ায় একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সিরিয়া দখলকারী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন, যার ফলে মিশরের আহলে সুন্নাতও অনেক সাহস পায়। [৪]

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪৯২ হিজরি।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৯৯ থেকে ২০২।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/১৯৮, ১৯৯।

[৪] ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৬/৩২৭, ৩২৮।

আজ-জাফির

৫৪৪ হিজরি থেকে ৫৪৯ হিজরি

আল-হাফিজের পর তার পুত্র আজ-জাফির শাসক হন। তিনি খেলাধুলা, নাচ-গান এবং বিলাসিতায় অভ্যস্ত ছিলেন। পাঁচ বছর শাসন করার পর ৫৪৯ হিজরিতে তিনি নিজ আমীরদের হাতেই নিহত হন। [১]

আল-ফায়েজ

৫৪৯ হিজরি থেকে ৫৫৫ হিজরি

আজ-জাফিরের পর তার পাঁচ বছর বয়সী পুত্র আল-ফায়েজ সিংহাসনে বসেন। ছয় বছর নামমাত্র শাসন করার পর ৫৫৫ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার শাসনামলে শাম-এ সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর শাসন শুরু হয়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত মুজাহিদ এবং ওলী প্রকৃতির মানুষ। তিনি শাম-এর মুসলমানদের এতই শক্তিশালী করেছিলেন যে, মুসলিম বিশ্বে ফিরিঙ্গিদের আর কোনো অগ্রযাত্রার আশঙ্কা রইল না। [২]

আল-আদিদ

৫৫৫ হিজরি থেকে ৫৬৭ হিজরি

আজ-জাফিরের পর প্রাক্তন খলিফা আল-হাফিজের নয় বছর বয়সী পুত্র ইউসুফ “আল-আদিদ” উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন বনু উবাইদের শেষ শাসক। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত কট্টর রাফেজি হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি আহলে সুন্নাতের রক্তের পিপাসু ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত একদিকে ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ এবং অন্যদিকে তার ধূর্ত উজির শাওয়ারের ফিতনা থেকে বাঁচতে তাকে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সাহায্য নিতে হয়। নূরুদ্দীনের সাহায্যকারী বাহিনীর সেনাপতিদের মধ্যে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি মিশরে এসে আদিদের উজিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে দেশের সমস্ত শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে বনু উবাইদ শাসনের অবসান ঘটান।

আল-আদিদ তার পদচ্যুতির কয়েকদিন পর ৫৬৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ২৭০ বছরের দীর্ঘ রাফেজি ইসমাইলি শাসনের সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয় এবং মুসলমানরা একটি অন্ধকার যুগ থেকে মুক্তি পায়। [৩]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/২০৫ থেকে ২০৭

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/২০৭ থেকে ২০৯

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫/২০০ থেকে ২০২

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

বনু উবাইদের শাসকদের তালিকা

১. উবাইদুল্লাহ বিন মায়মুন ২৯৭ হিজরী থেকে ৩২২ হিজরী ৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা, শাসনের প্রতিষ্ঠাতা
২. আল-কায়েম ৩২২ হিজরী থেকে ৩৩৪ হিজরী ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ শাসনের সুদৃঢ়করণ
৩. আল-মনসুর ৩৩৪ হিজরী থেকে ৩৪১ হিজরী ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ
৪. আল-মুইজ ৩৪১ হিজরী থেকে ৩৬৫ হিজরী ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ রাজধানী মিশরে স্থানান্তরিত করেন
৫. আল-আজিজ ৩৬৫ হিজরী থেকে ৩৮৬ হিজরী ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ
৬. আল-হাকিম ৩৮৬ হিজরী থেকে ৪১১ হিজরী ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দ মানসিক বিকারগ্রস্ত শাসক
৭. আজ-জাহির ৪১১ হিজরী থেকে ৪২৭ হিজরী ১০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দ
৮. আল-মুস্তানসির ৪২৭ হিজরী থেকে ৪৮৭ হিজরী ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ দীর্ঘতম শাসনকাল
৯. আল-মুসতালি ৪৮৭ হিজরী থেকে ৪৯৫ হিজরী ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১০২ খ্রিষ্টাব্দ পতনের যুগ
১০. আল-আমির ৪৯৫ হিজরী থেকে ৫২৪ হিজরী ১১০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩১ খ্রিষ্টাব্দ
১১. আল-হাফিজ ৫২৫ হিজরী থেকে ৫৪৪ হিজরী ১১৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ
১২. আজ-জাফির ৫৪৪ হিজরী থেকে ৫৪৯ হিজরী ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দ
১৩. আল-ফায়েজ ৫৪৯ হিজরী থেকে ৫৫৫ হিজরী ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ
১৪. আল-আদিদ ৫৫৫ হিজরী থেকে ৫৬৭ হিজরী ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ শেষ শাসক

বনু উবাইদের যুগের ওপর এক নজর

বনু উবাইদের যুগ মুসলমানদের জন্য ছিল চরম দুর্দশার। ইসলাম মানুষকে যে নাগরিক স্বাধীনতা দিয়েছিল, তা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষ একটি কারাগারে জীবন অতিবাহিত করছিল। বনু উবাইদের কর্মকাণ্ডের কয়েকটি দিক লক্ষ্য করুন:

মৌলিক অধিকার হরণ:

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাতের কারফিউ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অন্ধকার ঘনি়ে আসার সাথে সাথেই বিউগল বাজানো হতো। ভোর হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় বিউগল বাজত। এই সময়ের মধ্যে যাকে দেখা যেত, তাকেই বিদ্রোহের সন্দেহে হত্যা করা হতো। [১]

ইসলামী জ্ঞানচর্চা নির্মূল:

দ্বীনি ইলম প্রচার ও প্রসারের পথ রুদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছিল। সরকারি রাফেজি আলেমদের রচিত গ্রন্থ ছাড়া বাকি সব দ্বীনি কিতাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। সেগুলোর সংগ্রহ খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করা হতো। ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবি হাশিম (মৃত্যু ৩৩৬ হিজরি) নিজ হাতে লেখা কিতাবের সাতটি আলমারি রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন। বনু উবাইদিরা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেয়। [২]

আহলে সুন্নাতের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদেও আলেমদের দরস দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তবুও বনু উবাইদ ইসলামকে মিটিয়ে দিতে পারেনি। দ্বীনি ইলমের অনুরাগীগণ গোপনে আলেমদের কাছে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে ইলমি ফায়দা হাসিল করতেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই এক সময়ে মাত্র এক-দুজন ব্যক্তি যেতে পারতেন যাতে শাসকরা টের না পায়। শাসকদের ভয় এতটাই ছিল যে, আবু মুহাম্মদ বিন আবি যাইদ এবং আবু মুহাম্মদ বিন তাব্বান (রহ.) কায়রোয়ানের একজন প্রবীণ আলেম আবু বকর বিন লাব্বাদ (রহ.)-এর কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে যেতেন। পড়ার সময় তাঁরা কিতাবগুলো কোলে রেখে সেগুলোর ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়তেন যাতে কোনো ছিদ্র দিয়েও কেউ দেখতে না পায়। বন্ধ কামরায় পড়ার সময় কিতাবের ওপর ঘাম ঝরতে থাকত এবং পড়া শেষ হতে হতে কিতাব ভিজে যেত। [৩]

ﷺ (সাহাবীদের) অবমাননা ব্যাপক হওয়া:

উবাইদিদের শাসনামলে সাহাবীদের অবমাননা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করত অথবা হযরত আলী (রা.)-কে সৃষ্টির সেরা মানতে অস্বীকার করত, তাকে হত্যা করা হতো অথবা জেলে নিক্ষেপ করা হতো। বাজারে গাধা ও গবাদি পশুর মাথা কেটে ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং সেগুলোর ওপর সাহাবীদের সম্মানিত নামসমূহ লিখে দেওয়া হতো। [৪]

[১] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৭৪

[২] রিয়াজুন নুফুস: ২/২৮৭, ২৮৮

[৩] রিয়াজুন নুফুস: ২/৪২৩

[৪] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৭৩

ফৄ মালিকীর ওপর নিষেধাজ্ঞা

আফ্রিকান মুসলমানরা মালিকী ফিকহের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু বনু উবাইদ মালিকী ফিকহ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর লঙ্ঘনে চাবুক মারা হতো অথবা জেলে নিক্ষেপ করা হতো। কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হতো এবং নিহত মুফতির লাশ ঘুরিয়ে ঘোষণা করা হতো: “এটি মালিকী ফিকহের ওপর ফতোয়া প্রদানকারীর শাস্তি।” [১] ফকীহ মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন আবি রামলাহকে শুধুমাত্র এই অপরাধের কারণে চাবুক মারা হয়েছিল এবং নগ্ন করে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হয়েছিল এবং তারপর জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। [২]

আযান ও সালাতে পরিবর্তন। মসজিদসমূহ জনশূন্য

এই যুগে আযান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত এবং তারাবীহ সালাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। যোহরের সালাত ওয়াক্তের আগে পড়ার রেওয়াজ শুরু করা হয়েছিল। জুমার সালাতের খুতবায় সাহাবীদের ওপর গালিগালাজ করা (তাবরা বাজি) মামুলি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। অনেক রাফেযী ইমাম শাসকদের সন্তুষ্ট করার জন্য মক্কার পরিবর্তে “মাহদিয়া”র দিকে মুখ করে সালাত আদায় করাতেন। অধিকাংশ মানুষ মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ঘরে সালাত আদায় করতে শুরু করেছিলেন। মসজিদসমূহ জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং দ্বীনি নিদর্শনসমূহ মুছে গিয়েছিল। [৩] কখনো কখনো ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার আগেই রোজা বন্ধ করার এবং ঈদ পালন করার সরকারি নির্দেশ জারি করা হতো। [৪]

□□□

কায়রো নির্মাণের ওপর এক নজর

মিশরে উবাইদীদের সবচেয়ে বড় স্মৃতি হলো তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়রোর সুমহান শহর, যা আজ বিশ্বের কয়েকটি বড় শহরের মধ্যে একটি। এর ভিত্তি উবাইদী খলিফা মুইয-এর প্রতিনিধি জওহর স্থাপন করেছিলেন। তবে সেই দিনগুলোতে কায়রো এত প্রশস্ত ছিল না। এটি নীল নদের তীরে মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি কেবল সদৃশ শহর ছিল যেখানে কেবল সরকারি লোকজন বসবাস করত। সাধারণ জনবসতি কায়রো সংলগ্ন প্রাচীন শহর ফুসতাতে বসবাস করত। কায়রোকে সেই সময় “আল-মদিনা” এবং ফুসতাকে “মিসর” বলা হতো। এই সরকারি শহরে উবাইদী খলিফাদের দুটি বড় প্রাসাদ ছিল যা কাসরে শারকি এবং কাসরে গারবি নামে পরিচিত ছিল। উভয় প্রাসাদের মাঝখানে একটি বড় ময়দান ছিল এবং একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ এই উভয় প্রাসাদকে সংযুক্ত করত।

কাসরে গারবি মূলত উবাইদী শাসকদের বিলাসকেন্দ্র ছিল যেখানে তারা সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করত। এর সাথে সংলগ্ন ছিল গুলশানে কাফুর, যার মধ্যে কাসরে গারবির দরজাগুলো খুলত। কাছেই উবাইদীদের পৈতৃক কবরস্থান ছিল। এই শহরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা বড় বড় কুতুবখানা ছিল যা কর্তোভার জ্ঞানভাণ্ডারের সমতুল্য গণ্য করা হতো। বলা হয় যে, শেষ উবাইদী শাসক আযিদ-এর কুতুবখানায় কমপক্ষে এক লক্ষ বিশ হাজার বই ছিল।

[১] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৭৪

[২] আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ লিস-সাল্লাবি, পৃ. ৭৬-৭৭

[৩] রিয়ায়ুন নুফুস: ২/২৬৫

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৫/৩৭৪

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

কাসরে শারকি উবাইদি খলিফার বাসভবন ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, গোলাম, চাকর ও দাসীসহ এই তিলসমখানায় (জাদুকরী প্রাসাদে) বসবাস করতেন। এখানেই তাঁর দরবার বসত। উবাইদি খলিফাদের ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকের অবস্থা এই ছিল যে, কাসরে শারকিতে খলিফার বসার আসনটি খাঁটি সোনার তৈরি ছিল, যার সামনে সোনার জালি ঝোলানো থাকত। রাজকীয় দেওয়ান সম্পূর্ণভাবে সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল। উবাইদিদের এই প্রাসাদ চার হাজার কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই ইমারতে একটি বালানা (বারান্দা) ছিল যেখানে খলিফা প্রতিদিন জনগণের সমস্যা শোনার জন্য বসতেন, এর নিচে একটি অন্ধ কুয়ো ছিল যার তলদেশে উবাইদিদের অসংখ্য বিরোধীদের লাশ কঙ্কাল আকারে পড়ে থাকত। উবাইদিদের কোষাগারে দুনিয়ার অসংখ্য ও দুর্লভ মণি-মুক্তার স্তুপ ছিল।

এক বিঘত পরিমাপের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পান্না এই কোষাগারেই ছিল। এখানে ‘জাবালে নূর’ নামক একটি অতুলনীয় ইয়াকুত ছিল যার ওজন ছিল দুই হাজার চারশ ক্যারেট। এগুলো ছাড়াও হীরা-জহরত, আশরাফি এবং নগদ অর্থ ও সম্পদ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র ছিল যার মধ্যে সোনার ফ্রেমযুক্ত আয়না, চমৎকার রেশমি কাপড়, কারুকার্যখচিত অত্যন্ত মূল্যবান পাত্র, উন্নতমানের কস্তুরীপূর্ণ সুরাহি, উন্নতমানের পাথরের আসবাবপত্র, হাতির দাঁত এবং চন্দন কাঠের সাজসজ্জার সামগ্রী, সর্বোত্তম চীনা মাটির বাসনপত্র, সুন্দর আলমারি এবং সোনার সিন্দুক অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১]

চিন্তার মুহূর্ত:

আজকাল প্রাচ্যবিদ এবং রাফেজিরা উচ্চকণ্ঠে দাবি করে যে, বনু উবাইদ এবং একইভাবে বনু বুওয়াইহরা মুসলমানদের অনেক বড় সেবা করেছে। এই সিলসিলায় তারা বলে যে, তারা অমুক অমুক ইমারত তৈরি করেছে, অমুক অমুক শহর আবাদ করেছে, অমুক অমুক কিতাব তাদের যুগে লেখা হয়েছে। এভাবে তারা তাদের প্রশংসা ও গুণগান গেয়ে তাদের শাসনকালকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোনো মুসলমান এমনকি কোনো মানুষই এমন শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। একজন মানুষের জন্য সবার আগে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রয়োজন। এর অভাবে সেই যুগকে অন্ধকার যুগই বলা যেতে পারে।

মানছি যে, বনু বুওয়াইহ এবং বনু উবাইদের কিছু শাসক আলেম, সাহিত্যিক, কবি এবং চারুকলার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট কদর করতেন, তারা উন্নয়নমূলক কাজও করেছেন। কুতুবখানা এবং জাঁকজমকপূর্ণ ইমারত নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু এটি কোনো বড় কথা নয়। বাস্তবতা হলো, সাধারণত কোনো ব্যক্তিই পুরোপুরি খারাপ হয় না, বরং তার জীবনের কিছু দিক প্রশংসার যোগ্যও হয়ে থাকে। সুতরাং কিছু উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রশংসনীয় কাজ বনু বুওয়াইহ এবং বনু উবাইদও আঞ্জাম দিয়েছে। তাদের আগে ফেরাউন এবং শাদাদের মতো বাদশাহরাও বড় বড় ইমারত তৈরি করেছিল, কিন্তু কুরআন তাদের প্রশংসা করেনি বরং তাদের অবস্থা ও পরিণতিকে শিক্ষা হিসেবে পেশ করেছে।

এটিও মনে রাখা উচিত যে, তাদের যুগে সরকারি পর্যায়ে যে বৈজ্ঞানিক কাজগুলো হয়েছিল তা বেশিরভাগই জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন এবং এ জাতীয় শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল যা গ্রিস থেকে এসেছিল এবং যার দ্বারা মুসলমানদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়েছে।

[১] আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন: ২/২২৩ থেকে ২৩৪।

যে ইলমি কাজ হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে শিয়া মতবাদের বিভিন্ন রূপ: ইসনা আশারিয়া এবং ইসমাইলিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য করা হয়েছিল।

যেখানে কুতুবখানা বা লাইব্রেরির সম্পর্ক রয়েছে, নিঃসন্দেহে বনু উবাইদ তাদের প্রাসাদে সারা বিশ্বের কিতাব সংগ্রহ করেছিল কিন্তু এর অন্য দিকটি হলো সাধারণ মানুষকে দ্বীনি কিতাব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই ধরনের সমস্ত কিতাব হয় নষ্ট করে দেওয়া হতো অথবা লাইব্রেরির সৌন্দর্য বাড়ানোর অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করা হতো। স্পষ্টতই প্রাসাদের এই লাইব্রেরিগুলোতে উলামা ও তলাবাদের প্রবেশাধিকার কোথায় হতে পারত। সুতরাং এটি ছিল জ্ঞানানুরাগের নামে মানুষকে উলুমে ইসলামিয়া থেকে বঞ্চিত করার একটি ষড়যন্ত্র।

বনু উবাইদ এবং বনু বুয়াইহ-এর বিরুদ্ধে খুরুজের প্রশ্ন:

আমরা পড়েছি যে জুমহুর আহলে সুন্নাতের নিকট খুরুজের যে শর্তাবলি রয়েছে তা সামনে রেখে বনু উমাইয়া বা বনু আব্বাসের কোনো শাসকের বিরুদ্ধে খুরুজ জায়েজ ছিল না; কারণ তাদের মধ্যে কেউ কুফরে বাওয়াহ-এর লিপ্ত ছিল না। মামুন, মুতাসিম এবং ওয়াসিক বিল্লাহর মতো খলিফাদের মুতাজিলা হওয়া এবং আহলে সুন্নাতের উলামাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও জুমহুর তাদের বিরুদ্ধে খুরুজের ফতোয়া দেননি। খোদ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মতো মুজতাহিদগণ কালিমায়ে হক বুলন্দ করার কারণে জুলুমের শিকার হয়েছিলেন কিন্তু তারাও খুরুজের পথ অবলম্বন করেননি; কারণ এই মহান ব্যক্তিগণ বিদআত এবং কুফরে বাওয়াহ-এর পার্থক্য ভালোভাবেই বুঝতেন।

তবে আমরা দেখি যে বাগদাদে বনু বুয়াইহ এবং আফ্রিকায় বনু উবাইদের সরকার দুটি এমন উদাহরণ ছিল যাদের কিছু পদক্ষেপ কুফরে বাওয়াহ হওয়া স্পষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা ইরাকি আহলে সুন্নাতের উলামাদের বনু বুয়াইহ-এর যুগে খুরুজ থেকে বিরত থাকতে দেখি। অবশ্য বনু উবাইদের যুগে আফ্রিকায় আহলে সুন্নাত কয়েকবার খুরুজ করেছিল কিন্তু সফলতা আসেনি। এই প্রচেষ্টাসমূহের আলোচনা ইতিপূর্বে এসেছে।

আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইরাকি উলামাদের খুরুজ থেকে বিরত থাকার কারণ এটি ছিল না যে তাদের নিকট বনু বুয়াইহ-এর আকিদা কুফরে বাওয়াহ-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল না। বরং প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাতের নিকট খুরুজের জন্য কুফরে বাওয়াহ ছাড়াও আরও কিছু শর্ত রয়েছে যা থাকা জরুরি। সেগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এটিও যে খুরুজে সফলতার সম্ভাবনা প্রবল হতে হবে এবং অধিক ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

ইরাকি উলামাদের বনু বুয়াইহ-এর বিরুদ্ধে খুরুজ না করার আসল কারণ এটাই ছিল যে তাদের মতে যদি খুরুজ করা হতো তবে সফলতার সম্ভাবনা কম এবং ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি ছিল। এই অবস্থায় সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আরও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। দৌলতে বনু উবাইদ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩৭ বছর পর দৌলতে বনু বুয়াইহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু ইরাকের আহলে সুন্নাতের উলামাগণ অধিক সতর্ক ছিলেন এবং তারা বনু উবাইদের বিরুদ্ধে খুরুজের প্রচেষ্টাসমূহের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তাই তাদের অধিকাংশ এমন কোনো ব্যর্থ অভিজ্ঞতার অংশ হওয়া সমীচীন মনে করেননি। এর পরিবর্তে তারা অবস্থা সংশোধনের অন্যান্য নিরাপদ পথ অবলম্বনে ব্যস্ত ছিলেন।

আলমুতের বাতেনি রাষ্ট্র

বনু উবাইদের পতনের যুগে ইসমাইলি শিয়াদের একটি নতুন ফেরকা আত্মপ্রকাশ করে, যা মুসলিম বিশ্বে গোমরাহির এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করে। এই ফেরকা ‘বাতেনিয়া’ নামে পরিচিত হয়। এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান বিন সাব্বাহ (মৃত্যু ৫১৮ হিজরি), যার সম্পর্ক ছিল খোরাসানের বিখ্যাত শহর মার্ভের সাথে। তিনি অত্যন্ত চতুর ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জাদুমন্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। [১]

তার শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুল মালিক বিন আত্ৰাশ ছিলেন একজন চিকিৎসক, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, ক্যালিগ্রাফার এবং উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি শুরু থেকেই ইসমাইলি আকিদা পোষণ করতেন। নিশ্চিতভাবেই হাসান বিন সাব্বাহর বিচ্যুতি তার সাহচর্য থেকেই শুরু হয়েছিল। [২]

এই যুগের আরও দুই বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি: নিজামুল মুলক তুসি এবং ওমর খৈয়াম যৌবনে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। [৩]

হাসান বিন সাব্বাহ যৌবনে একজন ইরানি যুবক ছিলেন। [৪] যখন নিজামুল মুলক সেলজুক সালতানাতের উজির-এ-আজম (প্রধান উজির) পদ লাভ করলেন, তখন তিনি তার পুরনো বন্ধুকে ভুলে যাননি এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে থাকেন। তবে হাসান বিন সাব্বাহর স্বভাব ছিল স্বাধীনচেতা, যার কারণে তিনি কোনো বড় পদ পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। ধীরে ধীরে নিজামুল মুলক হাসান বিন সাব্বাহর অদ্ভুত ও বিচিত্র মানসিকতা বুঝতে পারলেন এবং একবার বলে উঠলেন: “শীঘ্রই এই ব্যক্তি দুর্বল চিত্তের লোকদের পথভ্রষ্ট করবে।”

কিছুকাল পর নিজামুল মুলকের জামাতা আবু মুসলিম, যিনি রয় শহরের গভর্নর ছিলেন, জানতে পারলেন যে হাসান বিন সাব্বাহর বনু উবাইদের সাথে গোপন সম্পর্ক রয়েছে এবং মিশরের গোয়েন্দা ও দূতরা তার কাছে আসা-যাওয়া করে। যখন হাসানের ওপর এই অভিযোগ আনা হলো, তখন তিনি শাস্তির ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো কিন্তু তিনি কারো হাতে ধরা পড়লেন না। [৫]

ইসমাইলি দাঈর বেশে হাসান বিন সাব্বাহ:

৪৭৯ হিজরিতে হাসান বিন সাব্বাহ একজন বণিকের বেশে বনু উবাইদ শাসক মুস্তানসিরের কাছে মিশরে পৌঁছান এবং তার বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হন। কিছুকাল পর তিনি একজন দাঈ হিসেবে ফিরে আসেন এবং গোপনে খোরাসান, ইরাক ও ইরানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং কৃচ্ছসাধন ও তাকওয়া প্রকাশ করতেন। এভাবে তিনি খুব দ্রুত অনেক মুরিদ (অনুসারী) তৈরি করে ফেলেন। [৬]

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৪৫১; আল-মুনতাজাম: ১৭/৬৩।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৫৪২; তারিখুল ইসলাম লিয়-যাহাবি: ৩৪/২২। তার ছেলে আহমদও একজন ইসমাইলি রাফেজি ছিল, তবে সে তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং একেবারে মুর্থ ছিল। হাসান বিন সাব্বাহ তাকে অনেক সম্মান করত। আহমদ ইসফাহানের একটি দুর্গে দখলদারিত্ব কয়েম করে আল্লাহর সৃষ্টির (মানুষের) জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে।

[৩] আল-আলাম লি-যিরিকলি: ৫/৩৮।

[৪] আল-মুনতাজাম: ১৭/৬৩।

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৪৫২।

[৬] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৭/৭৭৫।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) লিখেছেন:

“হাসান কেবল এমন নির্বোধদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করত যাদের ডানে-বামের কোনো খবর ছিল না এবং দুনিয়ার বিষয়াদি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর সে তাকে মধুর সাথে আখরোট ও কালোজিরা খাওয়াত যতক্ষণ না তার মস্তিষ্ক শুষ্ক হয়ে যেত। এরপর সে তাকে জানাত যে আহলে বাইতের ওপর কী কী জুলুম হয়েছে, যতক্ষণ না এই কথাগুলো তার অন্তরে গেঁথে যেত। তারপর সে বলত, যখন আযরাকী ও খারেজীরা বনু উমাইয়ার সাথে যুদ্ধে নিজেদের প্রাণের বাজি লাগাতে পারে, তখন তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা নিজেদের ইমামের সাহায্যের জন্য উঠছ না? এসব কথার মাধ্যমে সে তাকে শিকার করে নিত।” [১]

হাফিজ ইবনে কাসীর লিখেছেন:

“হাসান বিন সাব্বাহ কোনো ব্যক্তিকে অনবরত এসব কথা বলতে থাকত যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি কায়ল হয়ে যেত এবং নিজের বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি হাসান বিন সাব্বাহর অনুগত হয়ে যেত। তারপর সে তার সামনে কিছু ভেলকিবাজি ও কসরত দেখাত যা কেবল মুর্থদের ওপরই প্রভাব ফেলতে পারে। এভাবে অনেক মানুষ তার মুরিদ হয়ে গেল।” [২]

আলমুত দখল

৪৮৩ হিজরিতে হাসান বিন সাব্বাহ উত্তর ইরানের পাহাড়ি জেলা কাজভিনের “আলমুত” দুর্গটিকে নিজের বিশ্বজনীন কেন্দ্রে পরিণত করে, যেখানে পৌঁছানো কারো জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। [৩]

বলা হয় যে, এই দুর্গটি দাইলামের কোনো এক প্রাচীন রাজা নির্মাণ করেছিলেন যিনি শিকারের খুব শৌখিন ছিলেন। একবার তিনি একটি ঈগল ওড়ালেন এবং সেটির পিছু পিছু গিয়ে দেখলেন যে ঈগলটি সেখানে গিয়ে বসেছে যেখানে এই দুর্গটি অবস্থিত। রাজা দেখলেন যে এটি অত্যন্ত নিরাপদ একটি জায়গা। তিনি এখানে এই দুর্গটি নির্মাণ করালেন এবং এর নাম রাখলেন “আলাহ মুত” যার অর্থ দাইলামি ভাষায় “ঈগলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া”। [৪] পরবর্তীতে এই দুর্গটিকে আলমুত বলা হতে থাকে। এই দুর্গটি একজন আলভী দুর্গ-অধিপতির তত্ত্বাবধানে ছিল। হাসান বিন সাব্বাহ ঘুরতে ঘুরতে এই দুর্গের কাছে আসে এবং এর বাইরে ডেরা গেড়ে দুর্গবাসীদের নিজের লোকদেখানো যুহদ ও তাকওয়া দিয়ে প্রভাবিত করে ফেলে। [৫]

দুর্গবাসীরা তামান্না করতে লাগল যে হয়! সে যদি দুর্গের ভেতরে এসে থাকত। কিন্তু হাসান বিন সাব্বাহ অস্বীকার করতে থাকল। সে বলত: “তোমরা কি দেখছ না যে মানুষের মধ্যে পাপাচার কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে? মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে।” অবশেষে দুর্গবাসীদের পক্ষ থেকে একটি দল এসে তাকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে গেল। [৬]

হাসান বিন সাব্বাহ একজন কামেল মুরশিদের মতো অত্যন্ত সম্মানের সাথে দুর্গে বসবাস করতে লাগল। দুর্গ-অধিপতি তার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিল যে বরকত হাসিলের নিয়তে তার কাছে এসে বসত। [৭]

[১] আল-মুনতায়াম: ৯/৯৩, ৬৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৭৬; সন ৪৯৪ হিজরি

[৩] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ২/২০০

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৪৫১

[৫] নিহায়াতুল আরাব ফি ফুন্ুনিল আদাব: ৩০/২৪৪, ২৪৫

[৬] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩৭/৩১

[৭] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৪৫২

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

দুর্গে কিছুদিন অবস্থানের পর সে দুর্গবাসীদের বলল: “আমরা সুফি মানুষ। তোমরা এই দুর্গের অর্ধেক অংশ আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। আমরা এখানেই তোমাদের সাথে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকব।” দুর্গপতি নয় হাজার দিনারে দুর্গের অর্ধেক অংশ বিক্রি করে দিল। [১]

শীঘ্রই দুর্গবাসীদের একটি বড় অংশ হাসান বিন সাবাহর মুরিদ হয়ে গেল। এরপর হাসান বিন সাবাহ দুর্গ দখলের সিদ্ধান্ত নিল। একদিন দুর্গপতি শিকারে বের হলে হাসান বিন সাবাহর মুরিদরা পুরো দুর্গ দখল করে নিল এবং তাকে এখানকার মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে মেনে নিল। দুর্গপতির পেছনে একজন মুরিদকে পাঠানো হলো যে তাকে হত্যা করল। [২]

এই অঞ্চলের শাসক খবর পেয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছাল। হাসান বিন সাবাহর সাথে আলী ইয়াকুবী নামক একজন অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক ছিল। সে পুরো দলকে চার ভাগে বিভক্ত করে আক্রমণকারীদের চারদিকে ছড়িয়ে দিল। এরপর এই লোকেরা একই সাথে দামামা বাজিয়ে এবং ‘ইয়া আলী’ স্লোগান দিতে দিতে সামনে এগিয়ে এল। আক্রমণকারীরা ভাবল যে আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছি। তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের তাবুগুলো খালি পড়ে রইল। হাসান বিন সাবাহ এই সমস্ত সরঞ্জাম আলমুত দুর্গে নিয়ে এল। এরপর সে তার সঙ্গীদের খঞ্জর চালানোর প্রশিক্ষণ দিল এবং তাদের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল। [৩]

ধীরে ধীরে সে উত্তর ইরান থেকে পারস্য পর্যন্ত বিভিন্ন দুর্গ দখল করে নিল যার মধ্যে তাবাস, কুহিস্তান, আজ দেহান, কুর্দ কুহ, তানবুর, খালিজান (ইসফাহানের শহরতলী), খালা ও খান (খুজিস্তানের শহরতলী) উল্লেখযোগ্য। [৪]

কৃত্রিম জান্নাত এবং হাশিশ পাতা:

হাসান বিন সাবাহ আলমুত দুর্গের চারপাশে বিস্তৃত সবুজ ও সজীব পাহাড়ে কয়েক মাইল জুড়ে একটি কৃত্রিম জান্নাত নির্মাণ করাল যাতে ইন্দ্রিয়সুখের সমস্ত সরঞ্জাম বিদ্যমান ছিল। এই জান্নাতে বিশেষ মুরিদদের কিছুকাল থাকার সুযোগ দেওয়া হতো। এই বিশেষ লোকেরা ‘ফেদায়ী’ নামে পরিচিত ছিল। হাসান তাদের হাশিশ পাতার (ভাং) নেশায় অভ্যস্ত করাত; এজন্য এই লোকেরা ‘হাশাশিন’ নামেও পরিচিত ছিল। কৃত্রিম জান্নাতে সুন্দরী মেয়েরা হ্র হিসেবে তাদের আলিঙ্গন করত এবং তাদের নিজের প্রেমিক বানিয়ে নিত। কিছুকাল পর তাদের বের করে আনা হতো এবং ইমামের জন্য উৎসর্গিত হওয়ার বিনিময়ে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেওয়া হতো। তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো যে তারা একটি ইশারায় প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকত। তাদের ‘ফেদায়ী’ নাম দেওয়া হতো এবং খঞ্জর চালানোর বিশেষ অনুশীলন করিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রগুলোতে গোয়েন্দা হিসেবে নিযুক্ত করা হতো। হাসানের ইশারা পাওয়া মাত্রই বড় বড় জেনারেল, আমির এবং সুলতানরা ফেদায়ী খঞ্জরের শিকার হতেন। হাসান বিন সাবাহর এই কর্মকাণ্ডের ফলাফল এই দাঁড়াল যে সারা বিশ্বের দরবারগুলোতে তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং তার প্রতিটি দাবি মেনে নেওয়া হতে লাগল। [৫]

[১] নেহায়াতুল আরাব ফি ফুন্নিলা আদব: ৩০/২৪৪, ২৪৫

[২] নেহায়াতুল আরাব ফি ফুন্নিলা আদব: ৩০/২৪৪, ২৪৫

[৩] কিসসাতুল হাযারা: ১৩/৩১৭, ত দারুল জিল

[৪] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ২৭/২১

[৫] আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ২/২১১

মালিক শাহের দূত এবং হাসানের প্রভাব:

মালিক শাহের মতো শক্তিশালী শাসকও হাসান বিন সাববাহর ধৃষ্টতা দমন করতে পারেননি।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) লিখেন:

“সুলতান মালিক শাহ তার কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তাকে আনুগত্যের দাওয়াত দেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে হুমকি দেন এবং তাকে তার লোকদের আলেম ও আমীরদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন।”

হাসান বিন সাববাহ সুলতানের দূতকে বললেন: “উত্তর তুমি নিজেই দেখে নেবে।”

একথা বলে তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দলের উদ্দেশ্যে বললেন: “আমি চাই তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে একটি কাজের জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে পাঠাতে। তোমাদের মধ্যে কে প্রস্তুত আছে?”

একথা শুনে উপস্থিতদের প্রত্যেকেই এই দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। মালিক শাহের দূত মনে করেছিলেন যে হাসান বিন সাববাহ এই লোকদের কোনো পত্র দিয়ে পাঠাতে চান। কিন্তু হাসান বিন সাববাহ একজন যুবকের দিকে ইশারা করলেন এবং তাকে বললেন: “নিজেকে হত্যা করো।” সে তৎক্ষণাৎ একটি খঞ্জর বের করে নিজের গলায় চালিয়ে দিল এবং মৃত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর হাসান বিন সাববাহ অন্য এক মুরীদকে বললেন: “নিজেকে এখান থেকে নিচে ফেলে দাও।” সে তৎক্ষণাৎ দুর্গের উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দিল এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

হাসান বিন সাববাহ দূতকে বললেন: “সুলতানকে বলে দিও যে আমার কাছে এই ধরনের বিশ হাজার লোক আছে যারা আমাকে এই পর্যায় পর্যন্ত আনুগত্য করে। এটাই আমার উত্তর।”

মালিক শাহ যখন এটি জানতে পারলেন তখন তিনি বিস্মিত হলেন এবং তাকে পত্র পাঠানো থেকে বিরত থাকলেন। [১]

এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে হাসান বিন সাববাহ কী পরিমাণ ফিদায়ী এবং জানবাজ একটি দল তৈরি করে রেখেছিলেন।

৪৮৫ হিজরীতে নিজামুল মুলক তুসী হাসান বিন সাববাহকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান কিন্তু তিনি তার মুরীদদের নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং বাহিনীকে সামনে এগোতে দেননি। এরই মধ্যে তিনি তার খঞ্জরধারী পাঠিয়ে নিজামুল মুলক তুসীকে শহীদ করিয়ে দেন যার ফলে সরকারি বাহিনীকে ফিরে যেতে হয়। [২] ৫০৩ হিজরীতে নিজামুল মুলকের ছেলে আহমদ, যিনি সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকীর উজির ছিলেন, এখানে আক্রমণ করেন। হাসান বিন সাববাহ আত্মসমর্পণ করেননি। এই সময়ে প্রবল তুষারপাত শুরু হয় এবং সেলজুকী বাহিনীকে অবরোধ তুলে নিতে হয়। এর পরপরই দারুল মউত থেকে উজিরকে হত্যার পরোয়ানা জারি করা হয়। একজন বাতেনী ওত পেতে উজিরের ওপর খঞ্জর দিয়ে হামলা করে, আহমদ বিন নিজাম আহত হন কিন্তু প্রাণ বেঁচে যায়। হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন সে কিছু বলতে রাজি হলো না তখন তাকে মদ পান করিয়ে জ্ঞানশূন্য করে দেওয়া হলো। এই অবস্থায় সে জানিয়ে দিল যে মসজিদ-এ-মাসুনিয়াতে তার কিছু সঙ্গী উপস্থিত আছে। ফলে তাদের গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়। [৩]

[১] আল-মুনতায়াম: ১৭/৬৭

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ১৮/৩৫, তাদমুর

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৮/৫৮০

বাতেনীদের দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র—খানলজান দুর্গ:

ইরানের ইসফাহান শহরের নিকটবর্তী কোহিস্তানের একটি চুড়ায় একটি দুর্গ ছিল যা মালিক শাহ নির্মাণ করেছিলেন। বলা হয় যে, মালিক শাহ একবার শিকারের জন্য এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর একটি শিকারি কুকুর পালিয়ে যায়। মালিক শাহ তাকে খুঁজতে খুঁজতে এই চুড়ায় পৌঁছান, সেই সময় রোমানদের একজন দূত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি এই জায়গাটি দেখে বললেন: “যদি এই চুড়াটি আমাদের দেশে হতো, তবে আমরা এতে একটি দুর্গ তৈরি করতাম।”

একথা শুনে মালিক শাহ এখানে বারো লক্ষ দিনার ব্যয়ে একটি অজেয় দুর্গ নির্মাণ করান যা “খানলজান” নামে পরিচিত হয়। [১] নিজামুল মুলক তুসীর পুত্র মুয়ায়্যিদুল মুলক এর ওয়ালী নিযুক্ত হন। [২]

৪৯৪ হিজরিতে হাসান বিন সাবাহর উস্তাদজাদা ইবনে আত্শাশ এই দুর্গের ওপর দখল করেন এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়ায় পরিণত করেন। মানুষ এই দুর্গটিকে “অভিশপ্ত দুর্গ” বলতে শুরু করে। তারা বলত: “এই জায়গার পথপ্রদর্শক ছিল একটি কুকুর। এটি নির্মাণের পরামর্শ একজন খ্রিস্টান দিয়েছিল এবং এখন এর ওপর একজন জিন্দিকের দখল রয়েছে।” [৩]

হজযাত্রীদের কাফেলাও এই দুর্গের অধিবাসীদের নিষ্ঠুরতা থেকে নিরাপদ ছিল না। [৪] বিশেষ ব্যক্তির ছাড়াও তারা সাধারণ মুসলমানদেরও অপহরণ করে হত্যা করত। ইসফাহানে তাদের এমন আতঙ্ক ছিল যে মানুষ একা কোথাও বের হতে ভয় পেত। যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে ফিরতে দেরি করত, তখন পরিবারের সদস্যরা তার মৃত্যুর আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়ত। [৫] কিছু আমির ও সেনাপতি সব সময় তাদের পোশাকের নিচে বর্ম পরে থাকতেন যাতে বাতেনীদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। [৬]

আল্লামা ইবনুল জাওয়ী (রহ.) লিখেন:

“মালিক শাহের মৃত্যুর পর ইসফাহানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বাতেনী গোষ্ঠীর লোকেরা মানুষকে অপহরণ করত এবং হত্যা করে কুয়ায় ফেলে দিত। কোনো ব্যক্তি আসর পর্যন্ত ঘরে না ফিরলে মানুষ তার জীবনের আশা ছেড়ে দিত। যখন মানুষ তল্লাশি শুরু করল, তখন একটি মহল্লার একটি ঘরে এক মহিলাকে দেখা গেল যে চাটাইয়ের ওপর বসে ছিল। মানুষ যখন চাটাই সরাল, তখন তার নিচে (কুয়ায়) চল্লিশটি লাশ পাওয়া গেল। মানুষ ওই মহিলাকে হত্যা করল এবং ওই ঘর ও মহল্লাকে ধ্বংস করে দিল। মূলত ওই মহল্লার প্রবেশপথে একজন অন্ধ লোক বসে থাকত। যখন কোনো মানুষ সেখান দিয়ে যেত, তখন সে তাকে অনুরোধ করত যে তাকে কয়েক কদম ওই মহল্লার ভেতরে নিয়ে যেতে। যখন ওই ব্যক্তি তাকে ভেতরে নিয়ে যেত, তখন ওই ঘরের লোকেরা তাকে কাবু করে ফেলত। ইসফাহানের লোকেরা এমন ব্যক্তিদের সন্ধান...”

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৯৪, ১৯৫, এই অর্থ আজকের হিসাব অনুযায়ী প্রায় তিন কোটি ডলার (বা প্রায় তিনশ কোটি টাকা) হবে।

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১২৪

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৫১১

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৪৫০

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৪৩৯

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/১৯৫

...এ বড় চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদের অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছে। [১]

সরকারি কর্মচারীদের তদন্ত:

এই যুগে সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারেও ব্যাপক তদন্ত শুরু হয় যে, তাদের মধ্যে কেউ বাতেনি কি না। এমনকি কখনো কখনো আলেমদের ব্যাপারেও এই তদন্ত করা হতো। ৪৯৪ হিজরিতে জামিয়া নিজামিয়া (বাগদাদ)-এর শিক্ষক শাফেয়ি ফকিহ আল-কিয়া আল-হাররাসি (রহ.)-এর ব্যাপারেও গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি বাতেনি। সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকি তাকে হেফাজতে নেন। অবশেষে খলিফা মুস্তাজহির বিল্লাহর পক্ষ থেকে তার আকিদার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। [২]

বাতেনিদের হাতে ফখরুল মুলক শহীদ:

নিজামুল মুলক তুসির বড় ছেলে আলী (ওরফে ফখরুল মুলক) খোরাসানের শাসক সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির উজির ছিলেন। তার বয়স ৬৬ বছর হয়েছিল। তিনি তার পিতার মতো অত্যন্ত পরহেজগার ও দীনদার ছিলেন। ১০ মহরম ৫০০ হিজরির রাতে তিনি স্বপ্নে হযরত হুসাইন (রা.)-কে দেখলেন, যিনি বলছিলেন: “তাড়াতাড়ি করো। আমাদের সাথে ইফতার করো।”

ফখরুল মুলক যখন তার আমিরদের এই স্বপ্নের কথা শোনালেন, তখন তারা তাকে সেই দিন ঘরে অবস্থান করার পরামর্শ দিলেন। সেই দিন আসরের সময় ফখরুল মুলক তার দরজায় এক সাহায্যপ্রার্থীর কণ্ঠ শুনতে পেলেন যে বলছিল:

“মুসলমানরা শেষ হয়ে গেছে। মজলুমের ফরিয়াদ শোনার কেউ নেই। সাহায্যপ্রার্থীর হাত ধরার কেউ নেই।”

এই চিৎকার শুনে ফখরুল মুলক অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভেতরে ডেকে নিলেন। সাহায্যপ্রার্থী একটি চিরকুট পেশ করল। ফখরুল মুলক সেটি পড়ছিলেন, এমন সময় সে হঠাৎ খঞ্জর বের করে ফখরুল মুলকের বুকে বসিয়ে দিল। ঘাতক ছিল হাসান বিন সাববাহর এক ফিদায়ী। [৩]

সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকির ইসফাহানের বাতেনি দুর্গে অভিযান এবং শেখ সামানজানি (রহ.)-এর দূরদর্শিতা:

বাতেনিদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকি ৫০০ হিজরিতে তাদের বিরুদ্ধে এক বড় অভিযান শুরু করেন এবং ইসফাহানে তাদের কেন্দ্র খানলাজান দুর্গ অবরোধ করেন। বাতেনিরা যখন মোকাবিলায় অসমর্থ হয়ে পড়ল, তখন তারা সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বাতেনিরা এটি দেখে অন্য এক কৌশল অবলম্বন করল। তারা একটি ইস্তফতা (ফতোয়া তলব) তৈরি করে আহলে সুন্নাতের আলেমদের কাছে পাঠাল, যাতে লেখা ছিল:

“ইসলামের ফকিহগণ এমন লোকদের সম্পর্কে কী বলেন যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে এবং বলে যে মুহাম্মদ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য ও সঠিক, কেবল তারা শাসকের বিরোধী; তবে শাসকের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করা, তাদের আনুগত্য কবুল করা এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়া জায়েজ কি না?”

[১] আল-মুনতাজাম: ১৭/৯৩

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮, পৃ. ৪৫৭... সিয়ারুল কুতাবা আল-হাররাসি আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী তাবারী (মৃত্যু ৫০৪ হি.) যিনি তার সময়ের: সুর লাকিয়া, মুফাসসির এবং মুনাজির ছিলেন।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৫৩২

অধিকাংশ আলেম তাদের চালে পড়ে গিয়ে লিখে দিয়েছিলেন যে, এটি সম্পূর্ণ জায়েজ। কেউ কেউ উত্তর দিতে ইতস্ততবোধ করেছিলেন। তবে একজন শাফেয়ী ফকিহ ইমাম আবুল হাসান আলী সামজানি (রহ.) তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। তিনি এক বিশাল জনসমাবেশের সামনে বললেন: “তাদের সাথে লড়াই করা ওয়াজিব। তাদেরকে এভাবেই তাদের কেন্দ্রে বসবাস করতে দেওয়া জায়েজ নয়। তাদের কেবল কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করা তাদের জন্য ফলপ্রসূ নয়। তাদের একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, যদি তোমাদের ইমাম তোমাদের জন্য শরীয়তের হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করে দেয় অথবা হালাল বিষয়গুলোকে হারাম করে দেয়, তবে কি তোমরা তার হুকুম মানবে? তখন তাদের উত্তর এটাই হবে যে, হ্যাঁ আমরা মানবো। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তাদের রক্ত হালাল হয়ে যায়।” [১]

ইবনে আতাশের হত্যা এবং খানলজান দুর্গ ধ্বংস:

ফলশ্রুতিতে বাতিনিদের সাথে সমঝোতার চেষ্টা ত্যাগ করা হলো এবং সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকি এক বছরের অবরোধের পর খানলজান দুর্গ জয় করে নিলেন। যেহেতু এই দুর্গটি অত্যন্ত অশুভ হিসেবে পরিচিত ছিল, তাই সুলতান এর প্রতিটি পাথর উপড়ে ফেললেন। এই অভিযানে অধিকাংশ বাতিনি নিহত হয়। তাদের নেতা ইবনে আতাশ, যে বারো বছর ধরে এই অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল, তাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে বিভিন্ন শহরে ঘোরানোর পর চামড়া ছাড়িয়ে হত্যা করা হয় এবং তার মাথা কেটে বিভিন্ন শহরে প্রদর্শন করা হয়। [২]

নিজের শেষ দিনগুলোতে সুলতান মুহাম্মদ বাতিনিদের বিশ্বকেন্দ্র “আলমুত” জয় করার জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর খবর পাওয়ায় বাহিনীটি মারপথ থেকেই ফিরে আসে। [৩]

হাসান বিন সাব্বাহর মৃত্যু এবং তার উত্তরসূরিদের অপকর্ম:

হাসান বিন সাব্বাহ ৫১৮ হিজরিতে (১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ৯০ বছর দীর্ঘ বয়সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা তাদের খুনি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে এবং নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে থাকে। আলমুত দুর্গ তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ আস্তানা হিসেবে রয়ে যায়। [৪]

পরবর্তী দশকগুলোতে বিভিন্ন শাসক আলমুতের ওপর বারবার আক্রমণ করলেও আলমুত সবসময়ই অপরাজেয় থেকে যায়। [৫]

হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন করাও বাতিনিদের একটি প্রিয় শখ ছিল। ৫৪৮ হিজরিতে তারা খোরাসানের একটি হজ্জ কাফেলার ওপর হামলা চালিয়ে লাশের স্তুপ করে দেয়। হামলার কয়েক ঘণ্টা পর এক বৃদ্ধ বাতিনি ঘুরে ঘুরে চিৎকার করে বলতে লাগল: “হে মুসলমানরা! আসো এবং যাও। কেউ কি তৃষ্ণার্ত আছো? আমি তাকে পানি পান করাবো।” [৬]

যে আহত ব্যক্তি পানির জন্য আর্তনাদ করত, বৃদ্ধ তাকে হত্যা করে ফেলত। এভাবে কাফেলার একজন ব্যক্তিকেও জীবিত ছাড়া হয়নি।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৪৪২, ৪৪৩

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬/১৯৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৫৪২ থেকে ৫৪৪; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/২৯৭

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/৬৯৬

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮/১৬২; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ২/৩৬৯; নেহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব: ৩০/২৪৫

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/২৪৩

জালালুদ্দিন হাসানের ইসলাম প্রকাশ:

আব্বাসীয় খলিফা নাসের দীর্ঘকাল ধরে আলমুতের নেতাদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, যদি তোমরা ইসলামী নিদর্শনসমূহ গ্রহণ করো তবে আমরা ও তোমরা এক হয়ে যাব। হাসান তৃতীয় তার যুগে কিছু জাল চিঠি তৈরি করালেন যা খিলাফতের দরবার থেকে লেখা হয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, খাওয়ারেজম শাহ সালতানাত বাতেনীদের কেল্লাগুলোতে আক্রমণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় এবং এই ব্যাপারে খিলাফতের দরবারের সাহায্য প্রার্থী। এখন বাগদাদে বসবাসরত এক বাতেনীকে ডেকে চিঠিগুলো দেখানো হলো এবং বলা হলো: “দেখো খাওয়ারেজম শাহের সংকল্প কতটা বিপজ্জনক। যদি তুমি তোমার প্রভুর নিরাপত্তা চাও তবে এই চিঠিগুলো তার কাছে পৌঁছে দাও।” এরপর সেই বাতেনীকে রাতের ডাকের সওয়ারিতে আলমুতের উদ্দেশ্যে রওনা করে দেওয়া হলো। হাসান তৃতীয় এই সব কিছু পড়ে ভীত হয়ে গেলেন। [১] তিনি একটি চাল চাললেন এবং তার মুরিদদের বললেন: “আমি স্বপ্নে হযরত আলীকে দেখেছি। তিনি বলছিলেন যে তোমরা ইসলামী নিদর্শনসমূহ এবং এর ফরজ ও সুন্নাতসমূহ পুনরায় গ্রহণ করো।”

এই অদ্ভুত নির্দেশে বাতেনীরা বিস্মিত হলো। হাসান তৃতীয় বললেন: “এই দ্বীন আমাদেরই। কখনো আমরা তোমাদের শরীয়ত থেকে মুক্ত করে দিই এবং কখনো শরীয়তের বিধি-নিষেধ কার্যকর করি।” সবাই বলল: “আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।” [২]

৬০৮ হিজরীতে তার দূতরা বাগদাদে এসে সংবাদ দিল যে আমরা বাতেনী মতবাদ থেকে মুক্ত হয়েছি এবং ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা মসজিদ ও জামেয়া নির্মাণ করছি এবং রমজানের রোজা রাখছি। খলিফা এবং সাধারণ মুসলমানরা এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাসান তার মাকে হজের জন্য পাঠালেন, যাকে খিলাফতের দরবার থেকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হলো এবং তার জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলো। [৩] জালালুদ্দিন হাসান নিজে কালিমা শাহাদাত দ্বারা সজ্জিত বড় বড় দিনার তৈরি করালেন এবং দুইশ বাতেনী যুবক বাগদাদে গিয়ে জনসম্মুখে সেগুলো প্রদর্শন করল এবং মুখে কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে থাকল। [৪]

কিন্তু মনে হয় যে, ইসলামের এই প্রকাশ ছিল নিছক একটি রাজনৈতিক কৌশল। কারণ ৬১৬ হিজরীতে যখন খাওয়ারেজম সালতানাত তাতারীদের আক্রমণের মুখে ধসে পড়ল এবং বিপদ দূর হয়ে গেল, তখন বাতেনীরা পুনরায় তাদের পুরনো পথে ফিরে গেল। এই কারণেই হাফেজ জাহাবী জালালুদ্দিন হাসানের পরিচয় এভাবে করিয়েছেন: “ইসমাইলীদের তাগুত জালালুদ্দিন হাসান বিন আলী আস-সাব্বাহ, আলমুতের ধ্বংস।” [৫]

আলমুতের ধ্বংস:

হাসান বিন সাব্বাহর উত্তরসূরিরা মূলত একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং ভাড়াটে খুনিদের দল ছিল যারা আলমুতের মজবুত কেল্লা থেকে নির্দেশ জারি করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হত্যার লক্ষ্যবস্তু বানাত অথবা কর হিসেবে কোটি কোটি টাকা আদায় করত। দাবি পূরণ না করলে তারা আক্রমণের শিকার হতো। নিজামুল মুলক তুসী (মৃত্যু ৪৮৫ হিজরী) ফিদাইনদের প্রথম শিকার ছিলেন।

[১] সিয়র আলামুন নুবালা: ১৯৮/২২

[২] আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: ১৪৭/৩, আন-নুজুমুজ জাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ২০৩/৬

[৩] সিয়র আলামুন নুবালা: ১৯৮/২২

[৪] নেহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব: ২১৭/৩০

[৫] সিয়র আলামুন নুবালা: ১১৪/২২... ইসমাইলীদের তাগুত, দ্বীন থেকে বিচ্যুতকারী, হাসান বিন আলী আস-সাব্বাহ।

নিশানা ছিল। এরপর শাফেয়ী ফকীহ আল্লামা আর-রুয়ানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৫০২ হিজরি), মওসুলের শাসক মওদুদ (মৃত্যু ৫০৭ হিজরি), খলিফা মুসতারশিদ (৫২৯ হিজরি), খলিফা রাশিদ (৫৩৩ হিজরি) এবং শিহাবুদ্দিন ঘুরি (৬০২ হিজরি) তাদের খঞ্জরের শিকারে পরিণত হন। সুলতান সাঞ্জর, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এবং ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো ব্যক্তিত্বরা তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। কখনো কখনো এই ঘাতক দলটি এক শাসকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে অন্য শাসককে হত্যা করত। তাদের নৃশংস কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা দেড় শতাব্দী ধরে অতিষ্ঠ ছিল। অবশেষে চেন্সিস খানের উত্তরসূরিদের হাতে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অবসান ঘটে।

বাতিনিদের শেষ শাসক ছিল রুকনুদ্দিন খুরশাহ। তার শাসনামলে বাহ্যিকভাবে বাতিনিরা তাদের অবস্থানে বেশ সুসংহত ছিল, কারণ তাতারীদের হাতে মুসলমানদের ওপর নেমে আসা বিপদ-আপদ বাতিনিদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এর অন্য দিকটি ছিল এই যে, তাদের পূর্বদিকের শিকারভূমিগুলোতে এখন তাতারীদের রাজত্ব ছিল; তাই তাদের মুসলিম শাসকদের পরিবর্তে প্রায়ই তাতারী কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হতে হতো, যাদের নৃশংসতা ও লুটতরাজ থেকে এশিয়ার কোনো অংশই নিরাপদ ছিল না।

বাতিনি ও তাতারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব খুব দ্রুতই রূপ নিল এবং খুরাসানের তাতারী শাসক হলাকু খান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ৬৫৫ হিজরিতে বাতিনিদের রাজ্যে প্রবেশ করল। বাতিনিদের সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করার পর অবশেষে সে ‘আলমুত’ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই অপরাজেয় দুর্গ জয় করে সে রুকনুদ্দিন খুরশাহকে হত্যা করল এবং ‘আলমুত’ মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। ইসমাইলিদের বর্ণনা অনুযায়ী, রুকনুদ্দিন খুরশাহর ছেলে শামসুদ্দিন ‘আলমুত’ থেকে ককেশাস অঞ্চলের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে সে ইসফাহান ও হামাদানের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে আত্মগোপন করে ছিল এবং অষ্টম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুবরণ করে। বলা হয় যে, আগাখানি পরিবার তারই বংশধর।

[১]

আলমুতের বাতিনি ধর্মগুরুদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

১. হাসান বিন সাব্বাহ ৪৮৩ হিজরি থেকে ৫১৮ হিজরি / ১০৯০ থেকে ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ (প্রতিষ্ঠাতা)
২. মুহাম্মদ বিন কিয়া বুজুর্গ ৫১৮ হিজরি থেকে ৫২৯ হিজরি / ১১২৪ থেকে ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ
৩. হাসান সানি বিন মুহাম্মদ ৫২৯ হিজরি থেকে ৫৬১ হিজরি / ১১৩৫ থেকে ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দ
৪. মুহাম্মদ সানি বিন হাসান ৫৬১ হিজরি থেকে ৬০৭ হিজরি / ১১৬৬ থেকে ১২১০ খ্রিস্টাব্দ
৫. হাসান সালেস বিন মুহাম্মদ, জালালুদ্দিন ৬০৭ হিজরি থেকে ৬১৮ হিজরি / ১২১০ থেকে ১২২১ খ্রিস্টাব্দ (ইসলাম প্রকাশ)
৬. মুহাম্মদ সালেস বিন হাসান সালেস ৬১৮ হিজরি থেকে ৬৫৩ হিজরি / ১২২১ থেকে ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দ
৭. রুকনুদ্দিন খুরশাহ ৬৫৩ হিজরি থেকে ৬৫৫ হিজরি / ১২৫৫ থেকে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ (শেষ শাসক)

আলমুত কেন্দ্রে বাতিনিদের শাসন ১৭১ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। [২]

[১] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/৫, ৪; কিসসাভুল হাদারাহ: ১৩/৩১৭

[২] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/২৮৫, ৪০৩

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

ইসমাইলিদের অন্যান্য উপদল

অন্যান্য বাতিল ধর্মের মতো ইসমাইলি ধর্মও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা নেতারা নিজেদের পৃথক পৃথক দল তৈরি করে নেন যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদলগুলো নিচে দেওয়া হলো:

নিজারি:

ইসমাইলি নিজারি উপদলের লোকেরা উবাইদি শাসক মুসতানসিরের পুত্র নিজারকে ইমাম মানত এবং তার ভাই মুসতালির শাসন ও ইমামতকে অস্বীকার করত। তাদের ইমামগণ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকা: সালামিয়া, কাদমুস, মাসয়াফ, খাওয়াবি, কাহফ এবং বানিয়াস ইত্যাদিতে বসবাস করতেন। তারা শাসনের পরিবর্তে দরবেশ ও আধ্যাত্মিক নেতাদের রূপ ধারণ করেছিলেন। এই উপদলের একটি অতিরিক্ত আকিদা ছিল যে, মানুষ বারবার বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে। শেখ রাশিদুদ্দিন সিনান ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় নেতা, যিনি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির যুগে মাসয়াফে (সিরিয়া) অবস্থান করতেন। তিনি ফিদায়ী খঞ্জরধারীও তৈরি করেছিলেন। [১]

বোহরি:

উবাইদি শাসক মুসতালির পুত্র আমির তার দুই পুত্রসহ হাসান বিন সাব্বাহর লোকদের হাতে নিহত হন এবং এরপর মুসতালির বংশের শাসন তাদের হাত থেকে চলে গিয়ে তার চাচাতো ভাই হাফিজের কাছে চলে আসে।

তবে একটি গোষ্ঠী মুসতালির বংশধরদের মধ্যে ইমামত বিশ্বাস করতে থাকে। এই গোষ্ঠীটি বোহরি নামে পরিচিত হয়। তাদের মতে মুসতালির পুত্র ছিল আমির এবং তারপর আমিরের পুত্র ছিল তাইয়েব, যিনি ইমাম ছিলেন। এটি বোহরিদের দাবি, অন্যথায় ঐতিহাসিক নথিপত্রে তাইয়েব নামে কোনো পুত্রের অস্তিত্ব নেই।

বোহরিদের আকিদা অনুযায়ী, তাইয়েব ৫২৫ হিজরিতে আত্মগোপন (মাস্তুর) করেন, কিন্তু ইমামত তার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে চলে আসছে, যারা সবাই সর্বদা আত্মগোপন করে থাকেন। এমনকি এই উপদলের আলেমগণও এই আত্মগোপনকারী ইমামদের নাম জানেন না।

বোহরি উপদল রাজনীতি ছেড়ে ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বোহরীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: এক হলো দাউদি বোহরি, যারা নিজেদের নেতা কুতুব শাহ বিন দাউদের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এই লোকেরা এখনও বোম্বে (ভারত) এবং করাচিতে (পাকিস্তান) বসবাস করছে। তাদের কেন্দ্র বোম্বেতে।

দ্বিতীয় হলো সুলাইমানি বোহরি, যারা নিজেদের নেতা সুলাইমান বিন হাসানের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। ইয়েমেনে আজও তাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই বোহরীরা সালাত আদায় করে কিন্তু আত্মগোপনকারী ইমামের জন্য। তারা হজ করে কিন্তু বলে যে কাবা হলো আত্মগোপনকারী ইমামের প্রতীক (মাযহার), অর্থাৎ এর তাওয়াফ হলো আত্মগোপনকারী ইমামের তাওয়াফ। তাদের মতে মুসলমানদের মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েজ নয়। [২]

[১] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ৪/৮৮

[২] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ৫৭৩/৮৮

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আঘা খানি

এই ফেরকা একাদশ হিজরি শতাব্দীর শুরুতে (উনবিংশ শতাব্দী ঈসায়ীর শুরুতে) ইরানে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই লোকেরা নিজেদের ইসমাইলি নিজারি ফেরকার সাথে সম্পৃক্ত করে। তাদের প্রথম নেতা ছিলেন হাসান আলী শাহ (আঘা খান প্রথম), যিনি ইরানে ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সময় ইসমাইলি নিজারি ধর্মের দিকে দাওয়াত দিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলেন। তাকে যখন দেশান্তর করা হয়, তখন তিনি আফগানিস্তানে পৌঁছান। সেখানে তিনি কাবুলের উত্তরে কিয়ানকে নিজের কেন্দ্র বানান। কিছুকাল পর সেখান থেকে বোম্বে চলে আসেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘স্যার আঘা খান’ উপাধি দেয়। ১৮৮১ ঈসায়ীতে তার মৃত্যু হয়।

তার পর আঘা খানি ইমামদের ক্রমধারা নিম্নরূপ:

- আঘা আলী শাহ (আঘা খান দ্বিতীয়) ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ ঈসায়ী
- মুহাম্মদ হুসাইনি (আঘা খান তৃতীয়) ১৮৮৫ থেকে ১৯৫৭ ঈসায়ী

আঘা খান তৃতীয় উপাধিতে বিখ্যাত এবং অগাধ সম্পদের মালিক মুহাম্মদ হুসাইনির অবস্থান বেশিরভাগ সময় ইউরোপে ছিল। ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে আঘা খান তৃতীয়-এর বিশেষ প্রভাব ছিল। মুহাম্মদ হুসাইনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠনে সহায়তা করেন এবং দীর্ঘকাল এর সভাপতিত্ব করেন। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এখানে আঘা খানিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- স্যার করিম (আঘা খান চতুর্থ) ১৯৫৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত

মুহাম্মদ হুসাইনি নিজের ধর্মীয় নীতি ভেঙে নিজের বড় ছেলের পরিবর্তে নিজের নাতি করিমকে নেতা বানিয়ে দেন। করিম আঘা খান আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা লাভ করেন এবং ফ্রান্সে বসবাস শুরু করেন। সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক থেকে করিম আঘা খানকে পূর্ববর্তী সকল ইমামদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। [১] ইউরোপীয় শক্তি এবং আমেরিকার সাথে করিম আঘা খানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে আঘা খানিদের প্রভাব অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে চিত্রালে জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আঘা খানিরা যে অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করেছে, তা প্রিন্স করিম খানের পরিকল্পনারই কারিশমা।

[১] আল-মাওসুআহ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ৯৬৭/৮৮।

গ্রিক দর্শনের আক্রমণ এবং বাতেনিয়্যাতের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণা

বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস এবং বনু উবায়্যেদের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মরত ধর্মহীন চিন্তাবিদদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল দর্শন। এটি ব্যবহার করে তারা ইসলামের ওপর আঘাত হানার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

দর্শনের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা এবং পদার্থবিজ্ঞানের মতো জ্ঞানগুলো অবশ্যই দরকারী ছিল, তবে এর একটি বড় অংশ ছিল ধর্মতত্ত্ব এবং অধিবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল গ্রিকদের পৌরাণিক কাহিনীর একটি নতুন রূপ যা দার্শনিক পরিভাষায় রূপান্তর করা হয়েছিল। এতে ‘দশ বুদ্ধি’ এবং আসমানসমূহের বংশলতিকা থেকে শুরু করে কতই না অদ্ভুত ও বিচিত্র জিনিস প্রবর্তন করা হয়েছিল, যার কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি ছিল অনুমান এবং কল্পনার একটি অর্থহীন ভাণ্ডার যাকে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান নাম দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা যাদের আল্লাহ তাঁর শেষ কিতাব, শেষ রাসূল এবং তাঁর পবিত্র সূন্যাহর মাধ্যমে ঈমান ও মারেফাতের সাথে পরিচিত করেছিলেন, তারা মোটেও এই ধরনের আজোবাজে কথার মুখাপেক্ষী ছিল না। কিন্তু এরিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনে অভিভূত মুসলিম পণ্ডিতরা দর্শনের অন্যান্য জ্ঞানের মতো এই কুসংস্কারগুলোকেও হুবহু গ্রহণ করে পূর্ণ শক্তিতে প্রচার করেন। এর ফলে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে তার প্রথম প্রভাব মুতাযিলা মতবাদের আকারে প্রকাশ পায়। এরপর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর বিভিন্ন রূপ সামনে আসতে থাকে।

প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত মাবাদ আল-জুহানি, জাহম বিন সাফওয়ান, ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দি, ইবনুল রাওয়ান্দি, ইবনুল মুকাফফা, আবু ইসা ওয়াররাক, আবুল আলা আল-মাআরি, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা এবং শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী আল-মাকতুল এমন কিছু নাম যারা দর্শন ও আধুনিকতাবাদের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বে বিভ্রান্তিকর মতাদর্শের প্রবর্তক ছিলেন। [১]

দর্শনের ব্যবহারে মুতাযিলা ও বাতেনিয়্যার মধ্যে পার্থক্য:

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধর্মের মর্যাদা স্বীকার করে ধর্মীয় বিতর্কে দর্শন ব্যবহার করা হচ্ছিল। যুক্তিবাদী মুতাযিলা আলেমরা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা উড্ডীন করা সত্ত্বেও কুরআন ও হাদিসের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন। তাদের চেষ্টা ছিল দ্বীনকে বুদ্ধির সাথে এমনভাবে চালানো যাতে গ্রিক দর্শন ইসলামের পরিপূরক মনে হয়, যদিও তারা এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন এবং ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার পরিবর্তে নিজেরাই বিভ্রান্ত চিন্তার শিকার হন, তবে যাই হোক তারা ঈমানদার ছিলেন। তাদের সম্পর্কে কঠোরতম অবস্থান গ্রহণকারী ইসলামি আলেমরাও তাদের কেবল “বিদআতি” বলেছেন।

[১] শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী আল-মাকতুল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর যুগে অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি একজন চমৎকার কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তরুণরা তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে তার নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের কারণে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। মনে রাখা দরকার যে, সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর যুগের একজন বুজুর্গ, তবে শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী আল-মাকতুল এবং তিনি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

গণনা করা হয়েছে। তাদের ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য করা হয়নি।

কিন্তু বনু বুওয়াইহ এবং বনু উবাইদ-এর শাসনামলে চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে দর্শনের যে জোয়ার এসেছিল, তার পেছনে ইসলাম ও ধর্মকে পেছনে ফেলে দেওয়া বরং তাকে অস্তিত্বহীন মনে করার মানসিকতা কাজ করছিল। এটি ছিল সেই গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রভাব। এই নতুন চিন্তা ও ভাবনার ভিত্তি তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে বাগদাদ, খোরাসান এবং মিশরের সেই দার্শনিকদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল, যারা কেবল দার্শনিকদের বই অনুবাদ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সেগুলোর ব্যাখ্যাও করেছিল। তাদের মধ্যে ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দি (মৃত্যু ২৫৮ হিজরি), আল-রাওয়ান্দি (মৃত্যু ২৯৮ হিজরি), আবু নসর আল-ফারাবি (মৃত্যু ৩৩৯ হিজরি) এবং আবুল আলা আল-মা'আররি (মৃত্যু ৪৪৯ হিজরি) উল্লেখযোগ্য।

আল-রাওয়ান্দি এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ব্যক্তি ছিলেন। কিছু মানুষের ধারণা যে তিনি প্রথমে মুতাজিলা ছিলেন, পরে জিন্দিক হয়ে যান। কিন্তু গবেষকদের মতে তার কোনো ধর্ম বা মাযহাব ছিল না। তিনি ছিলেন একজন ধর্মহীন দার্শনিক এবং অর্থের জন্য যা খুশি করতে পারতেন। তিনি ইহুদিদের কাছ থেকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি ৮০ বছরেরও বেশি সময় বেঁচে ছিলেন। সরকার তাকে গ্রেফতার করতে চাইলেও কখনো ধরতে পারেনি; কারণ ইহুদিরা তাকে আত্মগোপনের জায়গা করে দিত। [১]

আল-ফারাবি এবং বু আলী সিনা

আল-ফারাবি (মৃত্যু ৩৩৯ হিজরি) এরিস্টটলের দর্শনকে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। তিনি এরিস্টটল দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন; তাই তিনি তার চিন্তাধারার ওপর কোনো বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করার চেষ্টা করেননি, বরং অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সেগুলোর সংকলন ও ব্যাখ্যা করে মানুষের সামনে পেশ করেন। তিনি যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে নতুনভাবে সুবিন্যস্ত করেন যার ফলে শত শত আলেম এই জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন। এজন্যই আল-ফারাবিকে এরিস্টটলের পর সবচেয়ে বড় অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারী এবং গ্রিক দর্শনের 'দ্বিতীয় শিক্ষক' (মুয়াল্লিম-এ-সানি) বলা হয়। [২]

এরপর চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে হাকীম বু আলী ইবনে সিনা (মৃত্যু ৪২৮ হিজরি) হিকমতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। তার পিতা ইসমাইলি মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, তাই ইবনে সিনা শুরু থেকেই বাতেনি দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইবনে সিনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে মহান কাজ করেছেন তার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি দর্শনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সংশয়বাদ ও মুক্তচিন্তার যে পথ প্রশস্ত করেছিলেন, তা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা ছাড়া আর কোনো ফল বয়ে আনেনি। [৩]

দার্শনিকদের এই গোষ্ঠী যদিও প্রকাশ্যভাবে ধর্ম অস্বীকারকারী ছিল না, কিন্তু তারা আমল ও শরীয়তকে অপ্রয়োজনীয় মনে করত এবং মৌলিকভাবে এরিস্টটল ও প্লেটোর মতো কেবল আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা ছিল। এই গোষ্ঠী দর্শনকে ধর্মের সমান্তরাল একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মনে করত। কেবল পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান বরং রাজনীতি ও নৈতিকতা থেকে শুরু করে আকিদা ও আধ্যাত্মিকতা পর্যন্ত তাদের কাছে দর্শনই ছিল একমাত্র পথপ্রদর্শক। মানুষের মধ্যে দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ যত বাড়তে লাগল, আল্লাহ, রাসূল, ধর্ম ও শরীয়তের গুরুত্ব অন্তর থেকে তত বিদায় নিতে লাগল এবং বাস্তব জীবনেও পাপাচার ও অনাচার ছড়িয়ে পড়ল।

[১] সিয়্যার আলামুন নুবালা: ১৭/৬১

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ৫/১৫৩ থেকে ১৫৬

[৩] সিয়্যার আলামুন নুবালা: ১৭/৫৩১, ৫৩৬

তারিখ উন্মতে মুসলিমা - দ্বিতীয় খণ্ড

বনু বুওয়াইহ-এর আধিপত্যের সময় বাগদাদে ‘ইখওয়ানুস সাফা’ নামে একটি গোপন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা নাস্তিক ও ধর্মত্যাগীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। এই মাদ্রাসার ইশতেহার ছিল:

“নিশ্চয়ই ইসলামী শরীয়ত মূর্খতা দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং ভ্রষ্টতার সাথে মিশে গেছে, আর দর্শন ছাড়া একে ধৌত ও পবিত্র করার কোনো পথ নেই।”

(নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়ত মূর্খতা ও গোমরাহি দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েছে, একে পবিত্র করার জন্য দর্শন থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।) - নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক।

এই মতাদর্শের চিন্তাবিদগণ কেবল যুবক ও ছাত্রদের গোপনে দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সমমনা বানাতেন; কারণ পরিপক্ক চিন্তার অধিকারী মুসলিম এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে এই নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই মতাদর্শের প্রবক্তারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ছোট ছোট বই রচনা করেন, যার সংখ্যা ‘৫২’। এই বইগুলো খোরাসান থেকে আন্দালুস পর্যন্ত আধুনিকতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের বীজ বপন করতে থাকে। [১]

আবুল আলা আল-মা’আররি (৩৬৩ হিজরী - ৪৪৯ হিজরী) এই নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত এবং অন্ধ ছিলেন। তিনি দরবেশের মতো জীবন অতিবাহিত করতেন, মোটা কাপড় পরতেন, গোশত স্পর্শ করতেন না, বরং কেবল শাকসবজি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তিনি একজন দক্ষ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে কয়েক ডজন ছাত্র তৈরি করেন এবং কয়েক ডজন বই লিখেন, যার পরতে পরতে নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মহীনতার শিক্ষা ছিল। তিনি আসমানী কিতাব ও রাসূলদের অস্বীকার করতেন এবং কেবল বিবেক-বুদ্ধিকে হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। [২]

বাতিনিয়্যাত:

পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে একটি নতুন মতবাদ ইসলামের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। এই মতবাদকে “বাতিনিয়্যাত” বলা হতো। ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো দেখেছিল যে, ইসলামের কুরআন ও সুন্নাহর সমস্ত বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দালিলিক রূপে বিদ্যমান এবং শতাব্দী ধরে এগুলোকে ভুল প্রমাণ করার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, শরীয়তের মূল উৎসগুলোর শব্দাবলী পরিবর্তন করা তাদের সাধ্যাতীত। তাই তারা এমন একটি মতবাদ উদ্ভাবন করল যা মূল উৎসের শব্দাবলীর ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট করে দেয়। এটাই “বাতিনিয়্যাত” নামে পরিচিতি লাভ করে। এই মতবাদের সারকথা ছিল যে, প্রতিটি শব্দের একটি জাহির (প্রকাশ্য) এবং একটি বাতিন (গোপন) দিক থাকে। আলিমগণ জাহির জানেন কিন্তু বাতিনের জ্ঞান কেবল সমসাময়িক ইমামের থাকে; আর এই বাতিনই হলো প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই কুরআন ও হাদীসের কোনো ইবারত (পাঠ্য) থেকে যা-ই প্রমাণিত হোক না কেন, ইমাম যদি এর বিপরীত কোনো হুকুম দেন তবে তা পালন করা জরুরি; কারণ তিনি সেই বাতিন অনুযায়ী হুকুম দিচ্ছেন যা সাধারণ মানুষের কাছে গোপন। [৩]

[১] তারিখ ফালাসিফাতুল ইসলাম, মুহাম্মদ লুতফি জুমআ, পৃষ্ঠা ২৫৬।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৫/৭৪৫ থেকে ৭৫৩; সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/২৩।

[৩] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারা ফিল আদইয়ানি ওয়াল মাজাহিব: ১/৮৮ থেকে ৯৫; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি: ১/১৯০ থেকে ১৯৫।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

এই মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বনু উবাইদের সেই ইমামগণ যারা মিশরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাদের দাঈগণ ইসলামের প্রতিটি পরিভাষা ও প্রতিটি অর্থকে নিজেদের আন্দোলনের রঙে রাঙিয়ে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তাদের ইমামদের বক্তব্য ছিল যে, তাহারা-এর মানে হলো ‘বাতিনী ধর্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া’। ‘যাকাত’ বলতে বোঝায় ‘নিজের ধর্মের প্রচার’। ‘হজ্জ’ মানে হলো ‘বাতিনী ইলম অন্বেষণ করা’। ‘জান্নাত’ মানে হলো ‘ইলমে বাতেন’। ‘জাহান্নাম’-এর মানে হলো ‘ইলমে জাহের’ (ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের জ্ঞান)। কাবা বলতে মসজিদে হারামের কাবা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বয়ং নবী। কাবার দরজা বলতে হযরত আলী (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। জিবরাঈল বলতে কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং তা হলো পবিত্র শক্তির ফয়জান। সংক্ষেপে, এভাবে বাতেনিয়াত পুরো ইসলাম ধর্মকেই নির্মূল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল; এজন্যই ইসলামের আলেমগণ বাতেনীদের ‘মুলহিদ’ বা ‘মালাহিদা’ নামে স্মরণ করতেন।

বাতেনিয়াতের সবচেয়ে বড় এবং সফল দাঈ ছিলেন হাসান বিন সাব্বাহ। তিনি নিজেও একজন দার্শনিক ছিলেন; তাই যুক্তি দিয়ে ভুলকে সঠিক হিসেবে উপস্থাপন করার শিল্প তার ভালোই জানা ছিল। এই শিল্পকেই তিনি তার ‘দ্বীনি দাওয়াত’-এর জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যে, বিদ্যমান কোনো জিনিসেরই কোনো হাকিকত নেই। হাকিকত এর ভেতরে লুকিয়ে আছে যা কেবল ইমামই বলতে পারেন। তার শিক্ষা ছিল যে, ইমাম যদি মূর্তিপূজাকে তাওহীদ বলে ঘোষণা করেন অথবা কোনো নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, তবে তা সম্পূর্ণ সঠিক হবে, কারণ এই মন্দ কাজের বাতেন ভালো হবে। যদি তিনি তাওহীদকে শিরক বলেন বা নেক কাজকে গুনাহ বলেন, তবে তাও সম্পূর্ণ সঠিক হবে; কারণ বাতেন সম্পর্কে কেবল তিনিই অবগত।

সংক্ষেপে, এই আন্দোলন শরীয়তের শব্দাবলির সুপরিচিত অর্থগুলো অস্বীকার করে হালাল ও হারামের বাধ্যবাধকতা তুলে দেয়, সব ধরনের কামাচারকে বৈধ ঘোষণা করে এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য একটি ধর্মকে ইসলামের নাম দিয়ে উপস্থাপন করে। এর পাশাপাশি হাসান বিন সাব্বাহর ফিদায়ীগণ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের শহীদ করে মুসলমানদের এক ভয়াবহ নেতৃত্বহীনতার সংকটেও নিপতিত করে। [১]

[১] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারা ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব: ১/৮৮ থেকে ১৫; আল-মিলাল ওয়ান নিহাল শাহরাস্তানি: ১/১৯০ থেকে ১৯৫; কাশফুল আসরারিল বাতেনিয়া, লেখক: মুহাম্মদ বিন মালিক ইয়ামানি, পৃষ্ঠা ১৪ থেকে ৭৮।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

দার্শনিক ফিতনাগুলোর মোকাবিলায় উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে

তারিখে উম্মাতে মুসলিমা

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে বিভ্রান্তিকর আন্দোলনগুলোর পাশাপাশি খোদ আহলে সুন্নাহের আলেমদের মধ্যেও একটি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলমে কালামের প্রসার ঘটিয়ে ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য যুক্তি ও তর্কের যে দুর্গ তৈরি করেছিলেন, তাতে ফাটল ধরেছিল। প্রকৃতপক্ষে এসব মূলনীতি ও নিয়মের মাধ্যমে দ্বীন প্রমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবন্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের বড় ভূমিকা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালের মুতাকাল্লিমগণ (ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞগণ) তাঁর পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ করেন এবং সেই সব মূলনীতি ও নিয়মকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশের মর্যাদা দেন, যা মূলত যুক্তিবাদী মুতাজিলা আলেমদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তদুপরি কিছু মুতাকাল্লিম দার্শনিক বিতর্ককেও ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। স্পষ্টতই, এই যুক্তিপ্রদান পদ্ধতি ধর্মীয় আকিদা ও মতাদর্শের জন্য কোনো অকাট্য প্রমাণ সরবরাহ করত না; কারণ সর্বদা এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকত যে, কোনো অধিকতর বুদ্ধিমান ও মেধাবী ব্যক্তি যুক্তির ভিত্তিতে এগুলোর কোনো দুর্বলতা বের করে সেগুলোকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দেবে। তাছাড়া এই যুক্তিপ্রদান পদ্ধতি কুরআন হাকিম ও সুন্নাহে মুতাহহারার মতো আকর্ষণীয়, মনোহর, স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য ছিল না।

এই পদ্ধতির একটি বড় ক্ষতি এই শুরু হয়েছিল যে, যারা ইলমে কালামে আগ্রহী হতো তারা এক ধরনের মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার আগ্রহ জেগে উঠত, যদিও সেই কথাগুলো পুরোপুরি ভিত্তিহীন হতো। ফলে মানুষ দার্শনিক, বাতেনি দাঈ এবং বিভ্রান্ত দলগুলোর চটকদার কথাগুলো এমনভাবে কান পেতে শুনতে শুরু করেছিল যেন সেগুলোর মধ্যে সত্যিই কোনো গভীর জ্ঞান ও অদ্ভুত রহস্য লুকিয়ে আছে।

মোদ্বাকথা, সেই যুগের মুতাকাল্লিমগণ দ্বীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না এবং ধরাবাঁধা মূলনীতি ও নিয়মের ওপর তাদের জেদের কারণে খোদ দ্বীনের ভিত্তি দুর্বল হতে শুরু করেছিল এবং বাতিল দলগুলোর জাদু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে কিছু রাসিখ ফিল ইলম (জ্ঞানে সুগভীর) ব্যক্তি ইলমে কালামের ত্রুটি, ফিতনার আপদ এবং বাতেনিয়াতের বিষাক্ততা সহ এই সমস্ত তুফানের সামনে বাঁধ দেওয়ার আগ্রাণ চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনী পেশ করা হলো।

শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাইল আনসারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৩৯৬ হিজরি - ৪৮১ হিজরি)

এই মহান আলেমদের মধ্যে খোরাসানের শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাইল আনসারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (তৃতীয় খণ্ড)

সন্তানদের মধ্য থেকে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় দেখা যায়। তাঁর অবস্থান ছিল হেরাতে। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, ফকিহ, ওয়ায়েজ, সংস্কারক এবং সুফি ছিলেন। মজলিসে ওয়াজ ও নসিহতে তিনি প্রতিটি হাদিস পূর্ণ সনদসহ শুনাতেন এবং সনদ বিচ্ছিন্ন করে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দিতেন না। তাঁর বারো হাজার হাদিস মুখস্থ ছিল।

তিনি হাম্বলি ছিলেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ইস্তিদলাল বা দলিল প্রদানের পদ্ধতির প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর জীবনও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সাথে অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি ইলমে কালাম এবং যুক্তিবিদ্যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন এবং উলামায়ে কেরামকে এগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করতেন। এই বিষয়ে তাঁর একটি কিতাব ‘যম্বুল কালাম’ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর বিতর্কের পদ্ধতি ছিল কেবল কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলিল প্রদান করা। বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্মতা এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মারপ্যাঁচকে তিনি ঈমানের দুর্বলতা মনে করতেন।

হাফেজ যাহাবি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন:

“তিনি মুতাকাল্লিমিনদের মাথার ওপর এক উন্মুক্ত তলোয়ার ছিলেন। নিজ শহরে তাঁর ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গান্ধীর্ঘ ছিল। মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। তাঁর নির্দেশে তারা জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকত। সাধারণ মানুষ শাসকদের চেয়ে তাঁর নির্দেশের বেশি আনুগত্য করত। তিনি আহলে সুন্নাহের এমন এক স্তম্ভ ছিলেন যাকে টলানো বা নমনীয় করা অসম্ভব ছিল।”

তিনি কখনো দুনিয়া উপার্জনে লিপ্ত হননি। তাঁর একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ ছিল যেখানে তিনি হাদিসের দরস প্রদানের পাশাপাশি ছাত্র ও মুরিদদের তরবিয়তও করতেন। তাদের পানাহারের ব্যবস্থাও তিনি নিজেই করতেন, কিন্তু কখনো কোনো শাসকের অনুগ্রহ গ্রহণ করেননি। পুরো ব্যবস্থা তাওয়াক্কুলের ওপর চলত। রুটি বিক্রেতা, কসাই এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ঋণ জমে থাকত। কোনো মুখলিস মুরিদ কখনো হাদিয়া পাঠালে শায়খুল ইসলাম তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতেন। কিছু বেঁচে গেলে তা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করতেন। কখনো কোনো কাপড় বা জোড়া পাঠালে তা-ও ছাত্র ও মুরিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

হাফেজ যাহাবি (রহ.) লিখেন:

“তিনি শাসক বা আমীরদের পক্ষ থেকে কখনো কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। না তাদের তোয়াজ করতেন, না তাদের সাথে উঠাবসা করতেন, বরং তাদের পরওয়াই করতেন না। ফলে মানুষের মধ্যে তাঁর এমন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল যা রাজকীয় শান-শওকতের চেয়েও বেশি ছিল। ষাট বছর ধরে বিনা অংশীদারিত্বে মানুষের ওপর তাঁর হুকুম চলত।”

যখন কোনো ভাষণ বা মুনাজারার জন্য বের হতেন, তখন সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন এবং উন্নত সওয়ারিতে আরোহণ করতেন। বলতেন: “আমি এটি এজন্য করি যাতে দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত থাকে এবং দ্বীনের শত্রুদের নাক কাটা যায় (অপমানিত হয়) এবং সাধারণ মানুষ দ্বীনের শান-শওকত দেখে এর নিকটবর্তী হয়।” কিন্তু খানকাহে ফিরে এসে আবার সাধারণ ও সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন এবং সবার সাথে এমনভাবে মিশে থাকতেন যে খাদেম ও মাখদুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভূত হতো না।

তিনি সুন্নাহর অনুরাগী ছিলেন এবং শরিয়ত বিরোধী কোনো কথা সহ্য করতেন না। তিনি তাঁর এক উস্তাদ আবু বকর হাইরি-এর নিকট থেকে কিছু...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুন্নাহ বিরোধী কথা শুনলে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। তিনি বলতেন: “আমি তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছি।”

বড় বড় জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকদের কাছে তিনি নির্ভীকভাবে যেতেন এবং আহলে হকের অবস্থান পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করতেন। শাসকদের পক্ষ থেকে তাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কয়েকবার তাকে দেশান্তর ও নির্বাসনের শিকার হতে হয়েছে। পাঁচবার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শাসকদের দাবি এটা ছিল না যে তিনি তার ধর্ম ত্যাগ করবেন, বরং তাদের বলা হতো যে তিনি যেন তার অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি কখনো বিচ্যুত হননি।

হাফেজ আবু নুআইম (রহ.) বলেন:

“কোনো রাজা বা উজিরের পরোয়া না করে দ্বীন ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসারই তার কৃতিত্ব। হিংসুকরা সবসময় তার কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। তারা অনেকবার তার প্রাণনাশের ও তাকে হত্যার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রতিটি অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।”

একদিকে তার গাভীর্য ও শান এমন ছিল যে তিনি বাদশাহদের কোনো পাত্তাই দিতেন না, কিন্তু অন্যদিকে সমাজের দুর্বল বলে বিবেচিত দরিদ্র আলেম ও তালিবে ইলমদের (শিক্ষার্থীদের) সম্মানিত মেহমানদের মতো সম্মান করতেন। মানুষ অবাক হলে তিনি বলতেন:

“এই অবস্থা কেবল সেই লোকদেরই হয় যাদের এই (দ্বীনি ইলম) কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।”

শেখ আবু ইসমাইল আনসারী (রহ.) ৮৬ বছর বয়স পেয়েছিলেন। এই দীর্ঘ ষাট বছর তিনি সত্য দ্বীনের হেফাজত ও প্রচার-প্রসারের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। তিনি তার প্রচেষ্টার ফল নিজ জীবনেই দেখে গিয়েছেন যখন খোরাসান থেকে ইরাক পর্যন্ত সেলজুক সুলতানদের উত্থান ঘটে এবং আহলে সুন্নাহর নিদর্শনসমূহ পুনরায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। [১]

ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী (রহ.) (৩৯৩ হি. - ৪৭৬ হি.)

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে শায়খুল ইসলাম আবু ইসহাক শিরাজী উম্মতে মুসলিমার জন্য যোগ্য ব্যক্তি তৈরির দায়িত্ব পালনে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইরাক, ইরান ও কুর্দিস্তানের অধিকাংশ বড় বড় আলেম তার ছাত্র ছিলেন।

ইমাম আবু ইসহাক (রহ.)-এর আসল নাম ছিল ইব্রাহিম বিন আলী। তিনি শিরাজের নিকটবর্তী ফিরোজাবাদ নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। শিরাজেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নিজ সময়ের বিভিন্ন আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের পর ৪১৫ হিজরিতে তিনি বাগদাদে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। মুনাযারা (বিতর্ক), ফিকহি পাঠদানের দক্ষতা এবং দলীল উপস্থাপনের শক্তিতে তিনি নিজ যুগে অনন্য ছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আসত। বাগদাদের শাফেয়ী ফকিহদের মধ্যে তার মর্যাদা ছিল সবার উর্ধ্ব। এমনকি কিছু প্রখ্যাত হানাফী আলেমও তাকে ‘আমীরুল মুমিনীন ফিল ফুকাহা’ (ফকিহদের মধ্যে মুমিনদের নেতা) বলতেন। [২]

শেষ জীবনে আল্লাহ তাকে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন যে বাদশাহরাও তাকে হিংসে করতেন। বনু আব্বাসের খলিফারা তার ভক্ত ছিলেন এবং...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৫০৫ থেকে ৫১৫

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৪৫২ থেকে ৪৫৪

সেলজুক সুলতানগণ তাঁর অনুসারী ছিলেন। নিজামুল মুলক তুসী বাগদাদে মাদ্রাসা নিজামিয়া প্রতিষ্ঠা করলে তাঁকেই প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। খলিফা মুকতাদী তাঁকে নিজের দূত বানিয়ে মালিক শাহ সেলজুকের নিকট নিশাপুরে প্রেরণ করেন। তিনি পথিমধ্যে যে শহরের ওপর দিয়ে যেতেন, সেখানে পুরো শহর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভেঙে পড়ত। মানুষ বরকতের জন্য তাঁর পায়ের ধুলো তুলে নিত। ফলমূল, মিষ্টি ও দামী কাপড়ের হাদিয়া পেশ করত; ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার মালামাল তাঁর ওপর উৎসর্গ করত।

যখন তিনি নিশাপুরে পৌঁছালেন, তখন পুরো জনপদ অভ্যর্থনার জন্য বেরিয়ে এল। নিশাপুরের সবচেয়ে বড় আলেম ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আসবাবপত্র নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এই বলতে বলতে সামনে এগিয়ে চললেন যে, আমি এই খেদমত করতে পেরে গর্বিত থাকব। [১]

এই শান ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তিনি স্ত্রী-সন্তানের ঝামেলা থেকে মুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি জামিয়া নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি দ্বীনি খেদমতের বিনিময় গ্রহণ করা সঠিক মনে করতেন না। এজন্য তিনি শুধু নিজেই বিনা বেতনে কাজ করতেন না, বরং নিজের বন্ধুদের জন্যও এটিই পছন্দ করতেন।

শেখ রাফে নামক তাঁর এক আলেম বন্ধু দিনে কয়েক ঘণ্টা কুলির কাজ করতেন এবং যে মজুরি পেতেন তা দিয়ে নিজের ও তাঁর খরচ নির্বাহ করতেন। ৪৩০ হিজরিতে শেখ রাফে হজের জন্য গেলে তিনি হারামেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এভাবে আবু ইসহাক শিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র জীবিকার এই ধারাটিও বন্ধ হয়ে যায়। এখন মাঝেমাঝে অনাহারও হতে লাগল। ক্ষুধা বেশি কষ্ট দিলে তিনি তাঁর এক পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে চলে যেতেন, তিনি সারীদ দিয়ে তাঁর আপ্যায়ন করতেন। একবার এক ব্যক্তি লিখিত ফতোয়া নিতে এল, তাঁর কাছে তখন কাগজ বা কালি ছিল না। তিনি এক রুটি বিক্রেতার কাছে গেলেন। তার কাছ থেকে দোয়াত নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর লিখলেন এবং প্রশ্নকারীর হাতে তুলে দিলেন।

অভাব-অনটনের কারণেই সারাজীবনে কখনো হজের জন্য যেতে পারেননি। তাঁর এক সমসাময়িক বলেন যে, তিনি যদি বলতেন তবে মানুষ তাঁকে কাঁধে তুলে হজ করিয়ে দিত।

বিতর্কশৈলী ও ইলমি পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দরবেশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর একটিই পাগড়ি ছিল যা তিনি দজলা নদীতে নিজেই ধুতেন এবং পরিধান করতেন। একবার পাগড়ি শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখলে কোনো চোর তা নিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে একটি অত্যন্ত জীর্ণ পাগড়ি রেখে যায়। তিনি অন্যমনস্কভাবে সেটিই পরিধান করে পাঠদানে চলে যান। যখন ছাত্ররা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন পাগড়িটি দেখে বললেন: ‘হয়তো ওই ব্যক্তির আমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।’

তিনি ‘তাবাকাতুল ফুকাহা’, ‘আত-তানবিহ’, ‘আল-লুমা ফি উসুলিল ফিকহ’, ‘আল-মাউনা ফিল জাদাল’ এবং ‘আল-মুহাযযাব’-এর মতো মহান গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। এই সময়ে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই কিতাবের কোনো অধ্যায় শুরু করতেন তখন প্রথমে নফল নামাজ আদায় করতেন। ৪৭৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি উত্তরাধিকার হিসেবে কোনো দিরহাম বা দিনার রেখে যাননি। [২]

[১] আত-তাবাকাতুল শাফিইয়্যাতুল কুবরা লিস-সুবকী: ৪/২১৯, ২২০

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/৪৫৫ থেকে ৪৬১; তাবাকাতুল ফুকাহা লি-আবি ইসহাক শিরাজী (মুয়াল্লিফের জীবনী, ইহসান আব্বাস কর্তৃক): ১/১২৫৬

ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী রহ. (৪১৯ হি. - ৪৭৮ হি.)

এই সকল রব্বানী উলামায়ে কিরামের মধ্যে শাফেয়ী মাযহাবের অগ্রগণ্য ইমাম আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী রহ.-ও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতা আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ জুওয়াইনীও অনেক বড় আলেম ছিলেন। তিনি নিশাপুরের পার্শ্ববর্তী জুওয়াইন জনপদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার পাশাপাশি সে যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পাঠদানের আসনে বসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। এক বিশাল সৃষ্টিজগত তাঁর থেকে উপকৃত হয় এবং চারদিকে তাঁর ইলমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু নিশাপুরে সুন্নি-শিয়াদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব চলছিল, যার ফলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বাগদাদে চলে যান। কিছুকাল সেখানে ইলমি ফায়দা ও জ্ঞান অন্বেষণে ব্যস্ত থাকার পর হিজাযের পথ ধরেন এবং চার বছর পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় দরস দিতে থাকেন। এরপর মদিনা মুনাওয়ারায়ও দরস ও পাঠদানের মজলিস কায়েম করেন। মক্কা ও মদিনায় দরস ও পাঠদানের কারণে তাঁকে ‘ইমামুল হারামাইন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

অবশেষে পরিস্থিতির উন্নতি হলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এখানে তিনি এমন মর্যাদা লাভ করেন যা সম্ভবত এই শহরের অন্য কেউ পায়নি। তিনি ‘আল-আকিদাহ আল-নিজামিয়াহ’, ‘নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব’ এবং ‘লুমউল আদিল্লাহ ফি কাওয়াইদিল আকাইদিল আহলিস সুন্নাহ’ এর মতো অতুলনীয় কিতাবসমূহ রচনা করেন, যাতে ইসলামী উসুল ও আকাইদের ওপর উত্থাপিত সকল আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে এবং যুক্তিবাদী, প্রকৃতিপূজারী, দার্শনিক ও ইলমে কালামের মাধ্যমে পথভ্রষ্টদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

ইসলামী রাজনীতির ওপর তিনি ‘গিয়াসুল উমাম’ এর মতো এক শাহকার গ্রন্থ রচনা করেন যা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে এক অনন্য প্রচেষ্টা ছিল। এছাড়া উসুলে ফিকহ শাস্ত্রে ‘আল-ইজতিহাদ’, ‘আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ’ এবং ‘আত-তালখিস ফি উসুলিল ফিকহ’ এর মতো চমৎকার কিতাবসমূহ ইলমে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর উচ্চমার্গের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

বাতিলপন্থীদের খণ্ডনে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা উল্টে, হাজার হাজার পাতা লিখে এবং শত শত দলিল উপস্থাপন করার পর ইমামুল হারামাইন সকলকে এই নসিহতই করতেন যে, তোমরা বৃদ্ধা নারীদের মতো সহজ-সরল আকিদা গ্রহণ করো। তাঁর নিকট মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সহজ ও অবিচল ঈমান যা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারী একজন সাধারণ নারীর অন্তরে গেঁথে থাকে। তিনি এমনকি বলতেন যে, যদি ইমামুল হারামাইন বৃদ্ধা নারীদের ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করে তবেই তার জন্য মুক্তি। [১]

ইমামুল হারামাইন রহ. সেলজুক সুলতানগণ এবং নিজামুল মুলক তুসীর নিকট অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি নিশাপুরের জামে মসজিদের খতিব, ইসলামী ওয়াকফসমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং মাদ্রাসা নিজামিয়াহ নিশাপুরের পরিচালক ছিলেন। [২]

তাঁর মর্যাদার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, একবার সেলজুক বাদশাহ ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দিলেন। ইমামুল হারামাইন রহ.-এর নিকট তখনো চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়নি; তাই তিনি ঘোষণা দিলেন যে আগামীকাল রোজা। বাদশাহ যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন: “যে সকল বিষয় বাদশাহর সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোতে আপনার আনুগত্য আমাদের ওপর আবশ্যিক...”

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/৪৬৫ থেকে ৪৭১।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ২/২৯১।

কিন্তু ফতোয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাদশাহর আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত। চাঁদ দেখা, রোজা রাখা বা ঈদ পালন করা ফতোয়া সংক্রান্ত বিষয়। বাদশাহর সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই।

লিখিত আদেশটি সংশোধন করতে হয়েছিল যে, আমার আদেশ ভুল এবং ইমামুল হারমাইনের নির্দেশ সঠিক। [১]

তাঁর মৃত্যুতে নিশাপুরের বাজারগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাঁর কাছ থেকে উপকৃত আলেমগণ, যাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারশ, সবাই পাঠদান বন্ধ করে একে অপরকে সমবেদনা জানান। বলা হয় যে, সারা বছর তাঁর মৃত্যুর শোক তাজা ছিল। [২]

ইমাম আবুল মাআলি জুওয়াইনি রহ.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি বাগদাদের মাদরাসা নিজামিয়া এবং নিশাপুরের মাদরাসা বায়হাকিয়াকে আহলে সুন্নাতের আলেমদের ইলমি কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে এই মহৎ কাজে এই মাদরাসাগুলোর প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুলক তুসিরও পূর্ণ অংশ রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো পরবর্তী দশকগুলোতে হুজ্জাতুল ইসলাম গাজালি, ফকিহ আল-কিয়া হাররাসি, আল্লামা ইবনুল জাওজি এবং ইমাম রাজি রহ.-এর মতো আলেম তৈরি করেছে, যাঁরা উম্মাহর সামনে আসা সমস্ত দ্বীনি চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

ইমাম আবু হামিদ গাজালি রহ. (৪৫০ হিজরি - ৫০৫ হিজরি)

সেই যুগের ফিতনাগুলোর সামনে বাঁধ নির্মাণকারী সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ ইমাম গাজালি রহ.। তিনি ৪৫০ হিজরিতে তুস জেলার তাহরান জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল মুহাম্মদ। এটিই ছিল তাঁর পিতার নাম। তিনি উচ্চশিক্ষা নিশাপুরের মাদরাসা নিজামিয়ায় ইমামুল হারমাইন জুওয়াইনি রহ.-এর কাছ থেকে লাভ করেন এবং পাঠদানে খ্যাতি অর্জনের পর ২৮ বছর বয়সে নিশাপুর থেকে রে শহরে গিয়ে নিজামুল মুলক তুসির দরবারের সাথে যুক্ত হন।

তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দেখে নিজামুল মুলক ৪৮৪ হিজরিতে তাঁকে বাগদাদের মাদরাসা নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। এক বছরের মধ্যে তাঁর পাঠদানের এমন খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে যে, আলেম ও ছাত্ররা পতঙ্গের মতো ছুটে আসতে থাকে। খিলাফতের দরবারে তাঁর সম্মান কোনো রাষ্ট্রীয় প্রধানের চেয়ে কম ছিল না, এজন্যই ৪৮৫ হিজরিতে খলিফা মুকতাদি তাঁকে মালিক শাহ সেলজুকির রানি তুরকান খাতুনের কাছে দূত হিসেবে পাঠান। মুকতাদির উত্তরসূরি খলিফা মুস্তাজহিরের সাথেও তাঁর অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল; এজন্যই তিনি বাতিনি আকিদা খণ্ডনে তাঁর একটি বইয়ের নাম খলিফার নামে নামকরণ করে ‘আল-মুস্তাজহিরি’ রাখেন। মর্যাদা ও খ্যাতির এই চরম শিখরে থাকাকালীন তিনি অনুভব করেন যে, তিনি যা কিছু করছেন তাতে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সেই অবস্থা এবং খুশু-খুজুর সেই মান মোটেও নেই যা কুরআন ও হাদিসে একজন মুমিনের কাছে কাম্য। ফলে নিজের সংশোধনের জন্য তাঁর ঝোঁক তাসাউফের দিকে চলে যায় এবং যিলকদ ৪৮৮ হিজরিতে তিনি নিজের পদমর্যাদা, ঘরবাড়ি সবকিছু ত্যাগ করে সুফিদের সান্নিধ্যে চলে যান এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন।

[১] আখলাকে জালালি, জালালুদ্দিন দাওয়ানি, পৃষ্ঠা ১১৮ থেকে ১২১, শেখ মুবারক আলী তাজের লাহোর সংস্করণ।

[২] ওফায়াতুল আয়ান: ২/২৭২।

এই আত্মিক নির্জনতার যুগে ইমাম গাযালী রহ. হিজায, শাম ও মিসর সফর করেন। দামেস্কে অবস্থানকালে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘এহয়াউ উলুমিদ্দীন’ লেখা শুরু করেন। এগারো বছর পর ৪৯৯ হিজরীতে তিনি ফিরে আসেন এবং বাগদাদের পরিবর্তে নিশাপুরের মাদরাসা নিযামিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এখন তিনি প্রচলিত ইসলামী জ্ঞান এবং আকলী (যৌক্তিক) জ্ঞান উভয়টিতেই পারদর্শী ছিলেন; তাই এখন তাঁর কাজের ধরনও ছিল ভিন্ন।

৫০০ হিজরীর শুরুর দিকে তিনি এই পদ থেকেও ইস্তফা দেন এবং নিজ জন্মভূমি তুসে ফিরে যান। সেখানে নিজ বাড়ির পাশেই একটি মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্র ও মুরিদদের শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় দেড়শ ছাত্র তাঁর কাছে সমবেত হতো। সেলজুক শাসক মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ এবং উজির সুলতান আহমদ (নিযামুল মুলক তুসীর বড় ছেলে) তাঁকে পুনরায় বাগদাদের মাদরাসা নিযামিয়ার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

মৃত্যু তাঁকে মাত্র সোয়া পাঁচ বছর সময় দিয়েছিল এবং ১৪ জুমাদাল আখিরা ৫০৫ হিজরীতে ৫৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি যে কাজ করেছেন তা শত শত আলেমের প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি ওজনদার ও বিস্তৃত। [১]

ইমাম গাযালী রহ.-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি দর্শনের (ফিলোসফি) মূল ভিত্তির ওপর আক্রমণ করেন এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে একে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করেন। তাঁর আগে কেউ এই কাজ করেননি। দর্শন ইসলামের ওপর আঘাত হানছিল আর মুতাকাল্লিমগণ (ধর্মতাত্ত্বিকগণ) আকলী যুক্তির মাধ্যমে কেবল আত্মরক্ষা করছিলেন। কেউ দর্শনের ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিয়ে এর মূল ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর আঘাত করার চেষ্টা করেননি যার ওপর দর্শনের ভিত্তি দাঁড়িয়ে ছিল। এটি উম্মতের আলেমদের ওপর একটি ঋণ হয়ে আসছিল। ইমাম গাযালী রহ. এই দায়িত্ব পালনের জন্য দর্শনের গভীর অধ্যয়ন করেন এবং এতে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে দার্শনিকদের দুর্বলতাগুলো তাঁর কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি প্রথমে দর্শনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ‘মাকাসিদুল ফালাসিফা’ নামক কিতাব লেখেন, যাতে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং এর ইলাহিয়াত (মেটাফিজিক্স) ও অন্যান্য দার্শনিক আলোচনা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি কিতাবের ভূমিকায় স্পষ্ট করেন যে দর্শনের প্রতিটি শাখা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন গণিত অস্বীকার বা ধর্ম দিয়ে তা সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই। একইভাবে যুক্তিবিদ্যারও মাত্র কয়েকটি স্থানে ভুল রয়েছে এবং এর অধিকাংশ আলোচনাই গ্রহণযোগ্য।

তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (তবিয়াত) সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে, আর দার্শনিকদের ইলাহিয়াত বা অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো (মেটাফিজিক্স) পুরোপুরি ইসলামের পরিপন্থী।

এরপর তিনি ‘তাহাফুতুল ফালাসিফা’ নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন যাতে তিনি কোনো প্রকার প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই দর্শনের সেই মূলনীতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন যা মানুষ শত শত বছর ধরে অন্ধভাবে মেনে আসছিল। তিনি প্রমাণ করেন যে দার্শনিকরা আল্লাহ, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং নবুওয়াত সম্পর্কে যেখানেই মুখ খুলেছেন সেখানেই হোঁচট খেয়েছেন। দর্শনের ইলাহিয়াত সংক্রান্ত আলোচনাগুলো মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাসহ বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[১] ওফায়াতুল আ’যান: ৪/১২৬; সিয়রু আ’লামিন নুবালা: ১৯/৩২২ থেকে ৩২৭।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর এই যুগান্তকারী রচনাবলি আধুনিকতাবাদীদের স্তব্ধ করে দেয় এবং গ্রীক দর্শনের পাণ্ডিত্যের প্রভাব খতম করে দেয়। নাস্তিক ও বাতেনীদের আক্রমণের জবাবে ইমাম গাযালী (রহ.) ‘হুজ্জাতুল হক’, ‘মুফাসসালুল খিলাফ’, ‘কাসিমুল বাতেনিয়া’, ‘ফাযায়েহুল বাতেনিয়া’ এবং ‘মাওয়াহিমুল ইবাহিয়া’-এর মতো চোখ খুলে দেওয়ার মতো কিতাবসমূহ পেশ করেন এবং সেগুলোতে বাতেনী আকিদাহর কঠোর খণ্ডন করেন।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর দ্বিতীয় বড় কীর্তি হলো ‘এহয়াউ উলুমিদ্দীন’ নামক সেই অতুলনীয় গ্রন্থ, যার বিষয়বস্তু সাধারণত তাসাউফ এবং আত্মশুদ্ধি মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে তিনি মানুষ, মানব সমাজ এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে ইসলামী ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন এবং সমাজে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও সংকট নিরসনে একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গঠনের পাঠ্যক্রম পেশ করেছেন। এই কিতাব তাদের অন্তরের অবস্থা, জীবনের অভিজ্ঞতা, গভীর চিন্তা ও হৃদয়ের অনুভূতির প্রতিফলন যা মানুষের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এতে বিশেষভাবে আলিম সমাজ ও শাসক শ্রেণীর সংশোধনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; কারণ তাদের সংশোধন ছাড়া সমাজের সংশোধন সম্ভব নয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) ইলমে কালামে সৃষ্ট স্থবিরতা ভাঙারও চেষ্টা করেন এবং ইসলামের আকিদাহ প্রমাণের জন্য আশআরী চিন্তাধারার গণ্ডিবদ্ধ গৎবাঁধা নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী মূলনীতি পেশ করেন। এই কারণে তাকে প্রথাগত আলিমদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়; কারণ প্রথাগত আলিমরা ইলমে কালাম থেকে সামান্য বিচ্যুতিকেও ইসলামের পরিপন্থী মনে করতেন।

এসব অভিজ্ঞতার ফলে ইমাম গাযালী (রহ.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সাধারণ মানুষের জন্য ইলমে কালামের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি; তাই এটি বর্জন করাই উত্তম। তার শেষ রচনা ‘ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম’ এই বিষয়ের ওপরই ছিল। [১]

ইমাম আল-কিয়া আল-হাররাসী (৪৫০ হিজরী - ৫০৪ হিজরী)

ইমাম আলী মুহাম্মদ বিন আলী তাবারী আল-কিয়া আল-হাররাসী (মৃ. ৫০৪ হি.)-ও এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তার জন্ম তাবারিস্থানে হয়। বিভিন্ন আলিমের নিকট জ্ঞান ও শিল্পকলা সমাপ্ত করার পর যৌবনের শুরুতে তিনি নিশাপুরে আসেন এবং মাদ্রাসা নিজামিয়াতে ইমামুল হারামাইন থেকে উপকৃত হন। ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনীরা বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে ইমাম গাযালী (রহ.)-এর পরেই তার স্থান।

যেহেতু ইমাম গাযালী (রহ.) খুব দ্রুত জামেয়া নিজামিয়া নিশাপুরের মসনদ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনীরা মসনদ আল-কিয়া আল-হাররাসীই সামলেছিলেন। এক সময় পর্যন্ত ছাত্রদের ফয়েজ দান করার পর তিনি বাগদাদে স্থানান্তরিত হন এবং মাদ্রাসা নিজামিয়া বাগদাদে দরস দিতে শুরু করেন। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অসংখ্য আলিম ইমাম আল-কিয়া আল-হাররাসী থেকে উপকৃত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ইমাম সাদুল খায়ের, ইমাম আবদুল্লাহ বিন গালিব এবং ইমাম আবু তাহের সিলারফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আল-কিয়া আল-হাররাসী একজন মর্যাদাবান ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী, সূক্ষ্মদর্শী এবং দূরদর্শী ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর ও উচ্চ। বাগ্মিতা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনি তার সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। মুনাযারা বা বিতর্কে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

[১] তারিখ দাওয়াত ও আজিমত: ১/১৭১ থেকে ১৯০।

এতে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্নতে নববী থেকে দলিল পেশ করতেন। [১]

তিনি শাফেয়ী উসূলের কঠোর অনুসারী ছিলেন এবং হাদীসের বিপরীতে কিয়াস বা অনুমানকে গুরুত্বহীন মনে করতেন। তিনি বলতেন: “যখন বিতর্কের ময়দানে ইলমে হাদীসের অশ্বারোহীদের মোকাবিলা হয়, তখন আসহাবে কিয়াসদের (কিয়াসপন্থীদের) মাথা বাতাসে উড়ে যায়।” [২]

তাকসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, অভিধান এবং অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর রচনা ছিল। মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাসমূহে তাঁর ‘শিফা আল-মুস্তারশিদিন’ অতুলনীয় বলে গণ্য হয়। তবে তাঁর তাকসীরী প্রচেষ্টা ‘আহকামুল কুরআন’ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

তিনি ইমাম গাজালী (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ই ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, একই স্থানে শিক্ষা লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল একই স্থানে অর্থাৎ নিশাপুরের মাদ্রাসা নিজামিয়াতে শিক্ষকতা করেন। উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে মাত্র এক বছরের ব্যবধান। ইমাম আল-কিয়া আল-হরাসী (রহ.) ৫০৪ হিজরীতে এবং ইমাম গাজালী (রহ.) ৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। [৩]

□□□

ইমাম ফখর উদ্দিন রাজী (রহ.) (৫৪৪ হি. - ৬০৬ হি.)

এই যুগের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ইমাম ফখর উদ্দিন আল-রাজী (রহ.)-ও অন্তর্ভুক্ত, যাঁর যৌক্তিক (মাকুলাত) ও বর্ণনাভিত্তিক (মানকুলাত) উভয় শাস্ত্রের ওপর সমান দখল ছিল। তিনি বংশগতভাবে তাবারস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রে-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং হেরাত ছিল তাঁর ইলমী কর্মকাণ্ডের...

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩ পৃ. ২৮৬, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮ পৃ. ৫৮৬, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৬ পৃ. ২১১, তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াতিল কুবরা লিস সুবকী: ৭ পৃ. ২৩১ থেকে ২৪২।

[২] ওফায়াতুল আইয়ান: ২৮৭/৩।

[৩] ওফায়াতুল আইয়ান: ২৮৬/৩, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৮৬/৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৬৯/১৬, তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াতিল কুবরা লিস সুবকী: ৫২৩১/৭ - ২৪২।

ফায়াদা: “আল-কিয়া” ফারসি শব্দ। এটি একটি সম্মানসূচক উপাধি যার অর্থ: “উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন”। এতে হামজা মাকসুর (জেরযুক্ত)। এটি আলিফ লাম তারিফ (নির্দিষ্টতাবাচক) নয় বরং মূল শব্দের অংশ। (তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াতিল লি ইবনে কাসীর: ৫২৮)

“আল-হরাসী” সম্পর্কে গবেষণা অত্যন্ত কঠিন। শতাব্দীকাল ধরে কেউ এর ওপর আলোকপাত করেনি। নবম হিজরী শতাব্দীর কাজী ইবনে শুহবা লিখেছেন: “আমি জানি না এই নিসবত (সম্পর্ক) কার দিকে?” (তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ: ২৯৮/১, দারু আলমিল কুতুব বৈরুত)

একটি মত সামনে এসেছে যে, এটি ফারসি শব্দ “হরাস” এর দিকে নিসবত যার অর্থ “ভয়”। দেখুন: “আল-বুলগাহ ফী তারাজিম আইম্মাতিন নাহবি ওয়াল লুগাহ” পৃ. ২৭৪, দারু সা’দুদ্দীন (মিশর) থেকে প্রকাশিত, ইহসান আহমদ রাতেব-এর টীকা। লেখক আরজ করছেন যে, এমতাবস্থায় এই শব্দটি ‘হা’-এর কাসরা এবং ‘রা’ তাকসীরী (অ-দ্বিত্ব) হবে, কারণ পারস্যে শব্দটি ‘হরাস’, ‘হরাস্’ নয়। যদিও নিসবত এটাই হয়, তবে সম্ভব যে বাতিল ফেরকাদের ওপর প্রভাবের কারণে তাঁদের “হরাসী” বলা হতো।

লেখকের মতে অধিক সম্ভাবনা হলো এটি কোনো স্থানের দিকে নিসবত। মনে রাখতে হবে যে “আল-হরাস” বাগদাদের একটি মহল্লার নাম ছিল। (তারিখে বাগদাদ: ১৭ পৃ. ১১৭, ‘ইয়াসকুনু ফী খারাবাতিল হরাস’; আখবারুল উলামা বি আখবারিল হকামা, পৃ. ১৯৬) যেহেতু ইমাম সাহেবও দীর্ঘকাল বাগদাদে বসবাস করেছেন, তাই এটি সম্ভব যে তিনি উক্ত মহল্লায় অবস্থান করতেন এবং এ কারণেই “হরাসী” নামে পরিচিত হন। ওয়াল্লাহু আলাম।

কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তিনি আকল (যুক্তি) ও নকল (বর্ণনা)-এর আলোকে ‘মাফাতিহুল গায়েব’-এর মতো এক অতুলনীয় তাফসীর লিখেছেন যা তাফসীরে রাযী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে, এতে একটি খণ্ড শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার তাফসীরের ওপর مشتمل (অবলম্বনে)। পূর্ণাঙ্গ তাফসীরটি ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত।

‘এতেকাদ ফিরাকিল মুসলিমীন ওয়াল মুশরিকীন’ তাঁর আরও একটি শ্রেষ্ঠ রচনা যাতে সংক্ষিপ্তভাবে বিদআতী এবং ইসলাম বহির্ভূত ফেরকাগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ইয়াহুদী, নাসারা এবং হিন্দুদের আকিদা ও তাদের ফেরকাবন্দীর অবস্থাও পেশ করা হয়েছে।

‘মাআলিম উসুলুদীন’ও তাঁর অত্যন্ত উপকারী কিতাব যাতে ইসলামী আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই সাথে বাতিল ফেরকা বিশেষ করে শিয়াদের আপত্তির জোরালো জবাব দেওয়া হয়েছে। তিনি মৃত ইলমে কালামে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে একে দার্শনিক ও নাস্তিকদের খণ্ডনে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে বাতিলপন্থীদের সব জায়গায় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রেষ্ঠ খতিব ও ওয়ায়েজও ছিলেন। ফারসি ও আরবিতে সমানভাবে প্রাজ্ঞ ও সাবলীল বক্তৃতা করতেন। তিনি কেবল শুষ্ক আলেম ছিলেন না বরং হৃদয়ের ব্যথার সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রায়ই ওয়াজ করার সময় তিনি নিজেও কাঁদতেন এবং উপস্থিতদেরও অশ্রুসিক্ত করতেন।

এই যুগটি ছিল খোরাसानে ঘুরি এবং মধ্য এশিয়ায় খাওয়ারেজম শাহী বংশের শাসনের। সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘুরির দরবারে তিনি অত্যন্ত সম্মান লাভ করেছিলেন। সুলতান নিজে তাঁর ওয়াজ শুনতেন এবং কখনো কখনো অঝোরে কাঁদতেন। সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরির হিন্দুস্তানের জিহাদী অভিযানে ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাথে ছিলেন। তিনি লস্করে (বাহিনীতে) কুরআনের দরস দিয়ে সৈন্যদের ঈমানি ও আমলি তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ) দিতেন।

শাহাবুদ্দিন ঘুরিকে হিন্দুস্তানের শেষ অভিযান থেকে ফেরার পথে বাতেনি খঞ্জরধারীরা শহীদ করে দেয়, যার পর খাওয়ারেজম শাহী সুলতানগণ ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিজেদের কাছে ডেকে নিয়ে রাজধানীর জামেয়ার প্রধান শিক্ষক এবং শাহজাদাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬০৬ হিজরিতে হেরাতে ইন্তেকাল করেন এবং শহরের উপকণ্ঠের গ্রাম মজদাখানে তাঁকে দাফন করা হয়। [১]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ২৫২/৭; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা: ৮১/৮, ১৮২; আল-আলাম যিরিকলি: ৩১৩/৬

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর সংস্কারক এবং সুলুক ও ইহসানের ইমামগণ

হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৪৭০ হি. - ৫৬১ হি.)

৪৮৮ হিজরীতে যখন ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদকে চিরতরে বিদায় জানালেন, তখন সেই একই বছর আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্ব ইসলামের এই কেন্দ্রে সংস্কার ও নসিহতের ধারা এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরও এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বকে এখানে পাঠানো হলো।

ইনি ছিলেন শেখ আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ৪৭০ হিজরীতে উত্তর ইরানের জিলান জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন বাগদাদে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর এবং জ্ঞান অর্জন ছাড়া তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহর তকদিরে এই শহরের দিকনির্দেশনার জন্য তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। এখানে আপনি আবুল ওয়াফা, ইবনে আকিল এবং আবু জাকারিয়া তাবরিজি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো প্রখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেন এবং শেখ হান্নাদ বিন মুসলিম আদ-দাব্বাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৫২৫ হি.), যিনি বাগদাদের অধিকাংশ আলেম ও ফকিহদের তরিকতের শেখ ছিলেন, তাঁর কাছে বায়াত হন এবং অনুমতি (ইজাজত) লাভে ধন্য হন।

ফকিহ হিসেবে আপনি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা কাজী আবু সাঈদ মাখরামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৫১৩ হি.) থেকে অর্জন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁরই মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এই পাঠদানের মজলিস এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, খুব শীঘ্রই ভবনটি সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। পাশাপাশি আপনি ওয়াজ ও নসিহতের মজলিস শুরু করেন যাতে এত বরকত হয়েছিল যে, শুধু আলেম ও ফকিহরাই নন, বরং বাদশাহ ও খলিফারা পর্যন্ত উপস্থিত হতে শুরু করেন।

আল্লাহ আপনাকে দিয়ে মৃত অন্তরগুলোকে জীবিত করার কাজ করিয়েছেন। আপনার জবানে এমন প্রভাব ছিল যে অন্তরগুলো কেঁপে উঠত এবং সমস্ত কলুষতা চোখের পানির সাথে ধুয়ে যেত। ওয়াজের মজলিসে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য অমুসলিমরা প্রচুর সংখ্যায় শরিক হতো। প্রতিটি মজলিসের শেষে অমুসলিমরা কালিমা পড়ত, চোর, ডাকাত, দস্যু এবং পাপাচারী লোকেরা তওবা করত। আপনি নিজে একবার বলেছিলেন যে, আমার হাতে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখের বেশি মানুষ তওবা করেছেন। আপনি দরস ও নসিহতের পাশাপাশি জনসেবাকে নিজের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছিলেন। গরিব-মিসকিনদের আপনি খুব খেয়াল রাখতেন, আপনার দস্তরখান ছিল বিশাল যেখানে অভাবী মানুষের ভিড় লেগে থাকত। আপনি প্রত্যেকের উপকারে আসতেন এবং প্রত্যেকের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

এইসব ব্যস্ততার পাশাপাশি আপনার ইলমি ব্যস্ততা দেখলে অবাক হতে হয়। সকালে তাফসির, হাদিস, ফিকহ এবং উসূলে ফিকহের পাঠ দান করতেন। জোহরের পর তাজবিদ ও নাহ পড়াতেন। এরপর ফতোয়ার জবাব লিখতেন।

আপনি প্রচলিত তাসাউফের পরিবর্তে সুন্নাহ ও শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত তাজকিয়া ও ইহসানের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলতেন: “যদি আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হয়, তবে বুঝে নিও শয়তান তোমার সাথে খেলছে। শরীয়ত যে বিষয়কে সমর্থন করে না, তা বাতিল।”

শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ৪৮৮ হিজরিতে বাগদাদে এসেছিলেন এবং এখানেই ৫৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এভাবে তিনি এখানে ৭৩ বছর অর্থাৎ প্রায় পৌনে এক শতাব্দী সময় অতিবাহিত করেন। তিনি পাঁচজন খলিফার শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি খলিফা মুস্তাজহির বিল্লাহর (মৃত্যু ৫১১ হি.) আমলে এখানে আগমন করেন। এরপর মুসতারশিদ বিল্লাহ, রাশিদ বিল্লাহ, আল-মুকতাবি এবং আল-মুসতানজিদের শাসনকাল দেখেন।

এই সময়ে সেলজুক সুলতান এবং আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে ছিল। সেলজুক সুলতানরা খলিফাদের নিজেদের অনুগত করতে চাইতেন, অন্যদিকে খলিফারা নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে কখনো কখনো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতো এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের রক্ত ঝরতো। এই যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী খলিফা ছিলেন মুসতারশিদ বিল্লাহ, যিনি একাধিকবার নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে সেলজুকদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। কিন্তু ৫২৯ হিজরিতে সুলতান মাসুদ সেলজুকির সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। সুলতান পরে তাকে মুক্তি দিলেও বাগদাদে পৌঁছানোর আগেই বাতেনিপন্থীরা খলিফাকে শহীদ করে দেয়।

মুসলমানদের অনৈক্য ও বিভক্তির কারণে মুসলিম বিশ্ব যে পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর মতো জাতির সংস্কারক তা থেকে উদাসীন থাকতে পারতেন না। প্রত্যেক দরদী উম্মতের মতো তাঁর হৃদয়ও এই ট্র্যাজেডিগুলোতে ব্যথিত হতো। তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা তাঁর ওয়াজ ও বয়ানসমূহে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, এই সমস্ত ফিতনার মূলে রয়েছে দুনিয়ার মোহ এবং ধন-সম্পদ ও পদের লালসা; তাই তাঁর অধিকাংশ খুতবায় দুনিয়াপ্রীতির নিন্দা এবং ফকীরি ও সাদাসিধে জীবনের শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে উম্মতকে বিনয়, দয়া, খোদাভীতি, আখেরাতের চিন্তা, পারস্পরিক সম্মান, ঐক্য ও সংহতি এবং মিলেমিশে থাকার উপদেশ দিতে থাকেন।

কিন্তু কেবল ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে এমন একটি সমাজের সংস্কার করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, যার প্রতিটি সদস্য দিনের অধিকাংশ সময় দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত থাকে এবং মাঝেমাঝে মনে নাড়া দেওয়া নসিহতগুলো জীবনযাত্রার কলুষতা তাদের অন্তর থেকে মুছে দেয়; তাই তিনি খানকাহ ব্যবস্থার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন এবং তাসাউফের পূর্ববর্তী দুর্বলতাগুলো দূর করে একে একটি মুজতাহিদসুলভ মর্যাদায় বিধিবদ্ধ করেন। তিনি খানকাহতে শত শত মুরিদকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তাদের এমন জাহেরি ও বাতেনি প্রশিক্ষণ দেন যে, তারা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে গিয়ে দাওয়াত ও সংস্কারের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে ওঠেন। তাঁর এই খলিফারা আফ্রিকা, ইয়েমেন, হাজরামাউত এবং হিন্দুস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন এবং এই সিলসিলা ‘সিলসিলায়ে কাদেরিয়া’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিলসিলার হাজরামি মাশায়েখ ও ব্যবসায়ীরা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে জাভা ও সুমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছে যান। হিন্দুস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এই তৎপরতার ফলে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং অগণিত মানুষের জীবনে বিপ্লব আসে। [১]

[১] তারিখ দাওয়াত ওয়া আজিমত: ১/ ১৯৮ থেকে ২২২; সিয়রু আলামিন নুবালা: ২০/ ৪৩৯ থেকে ৪৫০।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

আল্লামা ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫০৮ হিজরী - ৫৯৭ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর উলামা ও মাশায়েখের আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লামা আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আলোচনা না করা হয়। তিনি ৫০৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি এতিম হয়ে যান। তিনি একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য ছিলেন। মা অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। তিনি শৈশবেই কুরআন হিফজ করেন। এরপর বাগদাদের প্রখ্যাত উস্তাদদের সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। খুব দ্রুতই বাগদাদের বিজ্ঞ আলোচনার মধ্যে তার গণনা হতে থাকে।

তার অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রতিটি জ্ঞান ও শিল্পের যে কিতাবই তিনি পেতেন তা না পড়ে ছাড়তেন না। এর পাশাপাশি তিনি রচনা, সাহিত্য, বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ পারদর্শিতা রাখতেন। তিনি মাদরাসা নিজামিয়া বাগদাদের একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। শেখ সাদী শিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহান ব্যক্তির তরফে ছাত্র ছিলেন। ওয়াজ ও বক্তৃতায় তিনি তার সময়ের সুবহান বিন ওয়ায়েল ছিলেন। তার ওয়াজের মজলিসে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। আমীর, শাহজাদা এবং কখনো কখনো খলিফারাও তার ওয়াজ শুনতে আসতেন। প্রতিটি ওয়াজের পর বিপুল সংখ্যক মানুষ তওবা করত এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প করত।

তিনি প্রথাগত সুফি ছিলেন না কিন্তু দোয়া ও মুনাজাতের স্বাদ এবং খুশু-খুজুর নিয়ামত দ্বারা ধন্য ছিলেন। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও জিকির ও ইবাদতের জন্য বিশেষ সময় বের করতেন। প্রতি সপ্তাহে একটি কুরআন খতম করা এবং কিয়ামুল লাইলের পাবন্দ ছিলেন। সারাজীবনে কখনো সন্দেহজনক কোনো জিনিস ব্যবহার করেননি। এর পাশাপাশি তার মেজাজে ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও পরিমিতবোধ। তিনি নিজের এবং অন্যের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং অন্যদেরও এর তাকিদ দিতেন। কৃত্রিম সুফিয়ানা রিয়াযত, অতিরঞ্জিত যুহদ ও দুনিয়া ত্যাগকে তিনি ইসলামী মেজাজের পরিপন্থী মনে করতেন।

তার জীবনের শেষ দিকে বাগদাদে খলিফা নাসিরের শাসন ছিল যিনি শিয়া মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। বাগদাদে তিনি আশুরার মিছিল পুনরায় শুরু করিয়েছিলেন যার কারণে শহরে দাঙ্গার আশঙ্কা লেগে থাকত। অনিষ্টকারীরা দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টায় থাকত যখন আল্লামা ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জননিরাপত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

এই সিলসিলায় তার বুদ্ধিমত্তার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, একবার এক জনসভায় তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? যেহেতু মজলিসে শিয়া ও সুন্নি উভয়ই উপস্থিত ছিল এবং সামান্য কথাতেই তলোয়ার চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল; তাই আল্লামা ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৌশলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম না নিয়ে বরং ইশারায় উত্তর দিয়ে বললেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি, যার কন্যা তাঁর বিবাহে ছিলেন।”

এই কথা বলে তিনি দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তায় মজলিসকে বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। শিয়ারা মনে করল যে তার উদ্দেশ্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার বিবাহে ছিলেন। অন্যদিকে আহলে সুন্নাহ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করল, কারণ তার কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহে ছিলেন। [১]

[১] শাজারাতুজ জাহাব ৯৮/৫; আল-ইবার ফি খবর মান গাবার: সন ৫৮২ হিজরী।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ষষ্ঠ খণ্ড

তবুও তিনি সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না। নিজের মজলিসগুলোতে তিনি সর্বদা আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতেন; এই কারণেই তিনি খলিফা নাসিরের রোযানলের শিকার হন। ৫৯০ হিজরিতে খলিফা তাকে শিয়া মতাদর্শ খণ্ডন করার অপরাধে বাগদাদ থেকে নির্বাসিত করে ওয়াসিতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাকে পাঁচ বছর এমন এক কারাগারে কাটাতে হয় যেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং তাকে বেশ দূর থেকে পানি নিজেকেই ভরে আনতে হতো। তা সত্ত্বেও তিনি হকের মাযহাবের ওকালতি ত্যাগ করেননি। পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি এই কষ্ট সহ্য করতে থাকেন, সে সময় তার বয়স আশি বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ৫৯৫ হিজরিতে যখন তিনি মুক্তি পান, তখন তার জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। [১]

খলিফার পক্ষ থেকে রাফযি মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা কিছু সুন্নি আলেমকে শিয়াদের খণ্ডন করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জে প্ররোচিত করেছিল। ফলে বাগদাদের একজন আলেম আব্দুল মুগীস বিন যুহাইর (মৃ. ৫৮৩ হি.) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার পক্ষে একটি বই লিখে ফেলেন। এই বিষয়ের ওপর এটিই ছিল প্রথম রচনা, এর আগে উম্মাহর ইতিহাসে কোনো আলেম ইয়াজিদকে প্রশংসার যোগ্য মনে করে তার পক্ষে কোনো বই লেখেননি। হাফেজ যাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই রচনা সম্পর্কে লিখেছেন যে, এতে জাল বর্ণনা রয়েছে। [২]

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি শিয়া মতবাদ খণ্ডনে ছিলেন উন্মুক্ত তলোয়ারের মতো, কিন্তু আব্দুল মুগীস বিন যুহাইরের এই পক্ষপাতদুষ্ট রচনা তিনিও সহ্য করতে পারেননি এবং এর খণ্ডনে ‘আর-রাদ্দু আলাল মুতাসিবিল আনীদিল মানি’ মিন যাম্মি ইয়াজিদ’ নামক বই লেখেন এবং প্রমাণ করেন যে, ইয়াজিদের নিন্দা করা জায়েজ এবং শিয়াদের বিরোধিতায় গিয়ে তার প্রশংসা ও গুণগান করা আহলে সুন্নাতের নীতি কখনোই নয়।

ইবনুল জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর লেখনীর কাজের পরিধি এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রতিদিন চার জুয (প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা) লেখা তার রুটিন ছিল। এভাবে একাধারে তিনি কয়েক দশক ধরে রচনার কাজ করেছেন, এমনকি তার রচনার সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু রচনা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। সেই যুগের সম্ভবত এমন কোনো জ্ঞান বা শিল্প নেই যার ওপর তিনি নিজের অনন্য ঢঙে কাজ করেননি। আকাইদ, তাফসির, হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, নৈতিকতা, ওয়াজ ও নসিহত—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার ইলমি শাহকার বিদ্যমান।

তার সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা হলো ‘তালবিসে ইবলিস’, যাতে বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দল ছাড়াও আলেম, ছাত্র, ইবাদতকারী, যাহেদ এবং সুফিদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লিখেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, শয়তান তাদের কীভাবে পদস্খলনে লিপ্ত করে আসছে। মূর্খ ওয়াজকারী এবং সুফিদের মধ্যে যঈফ এমনকি জাল হাদিস অনেক বেশি প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। ইবনুল জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সংশোধনের জন্য ‘কিতাবুল মাওয়ুআত’ রচনা করেন এবং দুর্বল, সন্দেহজনক ও জাল বর্ণনার পর্দা ফাঁস করে দেন। একইভাবে যঈফ এবং মিথ্যা বর্ণনাকারীদের পরিচয়ের জন্য তিনি ‘আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকাীন’ লিখেছেন।

স্বভাবগতভাবেই ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি একে আলেমদের জন্য জরুরি মনে করতেন। ইতিহাসের ওপর তার রচনা ‘আল-মুনতায়াম’ বারো খণ্ডে সমাপ্ত, যাতে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নিজের সময় পর্যন্ত ঘটনাবলি সন অনুযায়ী জমা করেছেন।

[১] আয-যাইলু আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ: ১/৭৪-৭৫

[২] আল-ইবারু ফি খাবারি মান গাবার: ৩/৮৫

এটি তারিখ-ই-তাবারির পর ইসলামি ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যেমন ইবনুল আসির আল-জাযারি, হাফিজ ইবনে কাসির এবং ইবনে খালদুন (রহ.) তারিখ-ই-তাবারির পর বেশিরভাগ উপাদান এই কিতাব থেকেই গ্রহণ করেছেন। ‘তালকিহ ফুহুমুল আসার’ও ইতিহাসের ওপর তাঁর একটি বিরল রচনা, যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির একটি চমৎকার সংকলন। ‘বুস্তানুল ওয়ায়েজিন’ একটি সম্পূর্ণ অনন্য প্রচেষ্টা, যাতে ওয়াজ ও খুতবার আদব বর্ণনা করা হয়েছে এবং বক্তৃতা শিল্পের রহস্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি সাহিত্য ও প্রজ্ঞায় ভরপুর অনেকগুলো আকর্ষণীয় গ্রন্থও উপহার দিয়েছেন, যেমন ‘সাইদুল খাতির’, যা তাঁর অনুভূতি, চিন্তা, প্রজ্ঞা ও উপদেশের একটি সুন্দর পুষ্পস্তুবক। ‘কিতাবুল আযকিয়া’-তে তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের চমৎকার সব কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ‘আখবারুল হামকা ওয়াল মুগাফফালিন’ নির্বোধদের হাস্যকর ঘটনাবলির ওপর ভিত্তি করে রচিত।

লেখার সময় কলম কাটার ফলে যে গুঁড়ো পড়ত, তিনি তা সংরক্ষণ করতেন। তাঁর ওসিয়ত ছিল যে, তাঁর মৃতদেহ গোসল করানোর জন্য পানি যেন সেই গুঁড়ো দিয়ে গরম করা হয়। ৫৯৭ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হলে ওসিয়ত অনুযায়ী সেই গুঁড়ো দিয়েই গোসলের পানি গরম করা হয়েছিল। এটি পরিমাণে এত বেশি ছিল যে, এরপরও বেশ খানিকটা বেঁচে গিয়েছিল। [১]

শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) (৫৩৯ হি. - ৬৩২ হি.)

এই যুগের মাশায়েখদের মধ্যে শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর নাম কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, যিনি সিলসিলায়ে আলিয়া সোহরাওয়ার্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং ‘আওয়ারিফুল মাআরিফ’-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত কিতাবের লেখক। তিনি তাঁর সময়ের একজন বিখ্যাত শাফেয়ী আলেম, ওয়ায়েজ এবং সুফি বুজুর্গ ছিলেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান (রহ.) বলেন যে, শেষ বয়সে তাঁর সময়ে তাঁর কোনো নজির ছিল না। মুরিদদের তরবিয়ত এবং দাওয়াত ও ইসলামের কাজে তিনি ছিলেন মানুষের আশ্রয়স্থল।

তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর ছিলেন, তাঁর পৈতৃক এলাকা ছিল ‘সোহরাওয়ার্দ’, যা উত্তর ইরানের কাজভিন ও জানজানের একটি পার্শ্ববর্তী জনপদ। তিনি যখন বাগদাদে আসেন, তখন তাঁর মুখে দাড়ির একটি চুলও গজায়নি। সেই সময় শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) জীবিত ছিলেন এবং তাঁর ফয়েজের ধারা জারি ছিল। শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-ও তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিলেন, তবে এটি ছিল তাঁর শিক্ষার সময়, সম্ভবত একারণেই তিনি বেশি সাহচর্য লাভ করতে পারেননি। অবশ্য তাঁর চাচা শেখ আবুল নাজিব সোহরাওয়ার্দী (রহ.) শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর তরবিয়তে ছিলেন এবং খলিফায়ে মাজাজ হয়েছিলেন। শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) ফিকহ, হাদিস এবং অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের পর আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে তাঁর চাচা এবং পরে সমসাময়িক অন্যান্য মাশায়েখদের থেকে ফয়েজ হাসিল করেন।

তিনি বাগদাদকে কেন্দ্র করে প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত ওয়াজ, ইসলাহ এবং মুরিদদের তরবিয়তের কাজ করেন। তাঁর ওয়াজ ও খুতবায় বিদ্যুতের মতো প্রভাব ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহর মাখলুক অনেক উপকৃত হয়েছে; সাধারণ মানুষ তো বটেই, দূর-দূরান্ত থেকে আলেম ও মাশায়েখগণও তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন এবং উপকৃত হতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর দোয়ার প্রত্যাশী থাকতেন।

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩/১৪০ থেকে ১৪৯; সিয়রু আলামিন নুবালা: ২১/৩৭৭ থেকে ৩৮৭; শাযারাতুয যাহাব: ৫/১৯৮; যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা: ১/৭৪,

তিনি তাসাউফকে অনারব প্রভাব এবং বিদআত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘আওয়ারিফুল মাআরিফ’ এই ধারায় একটি সফল প্রচেষ্টা, যা আজও আল্লাহর ওলিদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শেখ সাদী শিরাজী এবং শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মাশায়েখগণ তাঁর মুরিদ ও ফয়েজপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মধ্যে একজন ইরানে এবং অন্যজন হিন্দুস্তানে হেদায়েত ও মারেফাতের এমন প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন যার আলোকরশ্মি আজও বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

[১]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৩/৪৪৬ থেকে ৪৪৮।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের পাঁচ শতাব্দী

এক নজরে

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দী

১৩২ হিজরী ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ

- সাফফাহ-এর খিলাফত - ১২ রবিউল আউয়াল ১৩২ হিজরী (৩০ অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

১৩২ হিজরী ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ

- রোম সম্রাট লিওন বিন কনস্টানটাইন-এর মালতিয়া আক্রমণ, মুসলমানদের নির্বাসন
- আব্বাসী উজির আবু সালামাহ আল-খাল্লাল-এর আবু মুসলিম খোরাসানির হাতে হত্যা

১৩৪ হিজরী ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ

- সাফফাহ-এর হীরা (কুফা) ত্যাগ করে আনবারে অবস্থান
- কুফা থেকে মক্কা পর্যন্ত মাইলফলক স্থাপন

- ইসমাইল বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস-এর ইন্তেকাল

১৩৫ হিজরী ৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ

- আবদুল্লাহ বিন হাবিব-এর সিসিলি (সাকলিয়া) অভিযান
- মুহাদ্দিস মদিনা জিয়াদ বিন আবি জিয়াদ মাওলা আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ-এর ইন্তেকাল

১৩৬ হিজরী ৭৫৩-৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

- আবু জাফর মনসুর এবং আবু মুসলিম খোরাসানির হজ পালন
- আন্দালুসে বিশৃঙ্খলা এবং সেখানে স্বাধীন আমিরদের শাসন প্রতিষ্ঠা
- সাফফাহ-এর ইন্তেকাল যিলহজ (জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- আবু জাফর আল-মনসুরের খিলাফত

১৩৭ হিজরী ৭৫৪-৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

- আবু মুসলিম খোরাসানির হত্যা ২৬ শাবান (১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- সিনবাদ মজুসির বিদ্রোহ

১৩৮ হিজরী ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

- কনস্টানটাইন বিন লিওন-এর দাবিক আক্রমণ এবং সালেহ বিন আলী আব্বাসীর হাতে পরাজয়

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আন্দালুসে প্রথম আবদুর রহমানের হাতে স্বাধীন উমাইয়া সরকার প্রতিষ্ঠা ১৩৯
হিজরী / ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

মনসুর আব্বাসীর নির্দেশে মালাতিয়া পুনর্নির্মাণের সূচনা ১৪০ হিজরী / ৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ
মাসিসা পুনর্নির্মাণ ১৪০ হিজরী / ৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

মনসুরের হজ সফর এবং বাইতুল মাকদিস সফর ১৪১ হিজরী / ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

রাওয়ান্দিয়া ফেরকার আবির্ভাব এবং দমন ১৪১ হিজরী / ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

আল-মাগাযী রচয়িতা মুসা ইবনে উকবা (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৪২ হিজরী / ৭৫৯
খ্রিষ্টাব্দ

মিসর থেকে মুহাম্মদ ইবনে আশআসের অপসারণ এবং হুমাইদ ইবনে কাহতাবা-র নিযুক্তি
..... ১৪২ হিজরী / ৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দ

মুহাদ্দিস খালিদ আল-হাযযা (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৪২ হিজরী / ৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফফা-র ইন্তেকাল - বয়স ৩৬ বছর - প্রধান রচনাবলী:
কলিলা ওয়া দিমনা, আল-আদাব আল-সাগীর ওয়াল কাবীর ১৪৩ হিজরী / ৭৬০
খ্রিষ্টাব্দ

দাইলামের বিদ্রোহীদের দমন ১৪৩ হিজরী / ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ

মুহাদ্দিস হুমাইদ আত-তাবীল বসরী (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৪৪ হিজরী / ৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ
মনসুরের হজ সফর, মুহাম্মদ নাফসে যাকিয়া এবং ইব্রাহিমের অনুসন্ধান ১৪৪ হিজরী /
৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ

মনসুরের কারাগারে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-মুসান্না (রহ.)-এর ইন্তেকাল ১৪৫
হিজরী / ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ

মদিনায় মুহাম্মদ নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহ ১লা রজব (২৫ সেপ্টেম্বর ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ)
সরকারি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে নাফসে যাকিয়ার মৃত্যু ১৫ই রমজান (৬ ডিসেম্বর ৭৬২
খ্রিষ্টাব্দ)

ইরাকে ইব্রাহিমের বিদ্রোহ ১লা রমজান (২২ নভেম্বর ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ)

ইব্রাহিমের পরাজয় ও মৃত্যু ২৫শে জিলকদ (১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)

بغداد বাগদাদ নির্মাণের সূচনা ১৪৬ হিজরী / ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

- বাগদাদে মনসুরের অবস্থান
- আন্দালুস দখলের প্রচেষ্টায় আব্বাসীয় বাহিনী ব্যর্থ
- মুহাদ্দিস ও ফকিহ হিশাম বিন উরওয়াহ রহ.-এর ইন্তেকাল
- শিয়া ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন সাঈব কালবীর ইন্তেকাল

১৪৬ হিজরি ৭৬৩ খ্রি.

- ঈসা বিন মুসার উত্তরাধিকার বাতিল, নতুন উত্তরাধিকারী হিসেবে মাহদীর নিযুক্তি
- উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর পুত্র আব্দুল আজিজ বিন উমর রহ.-এর ইন্তেকাল -
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ
- আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলীর কারাগারে মৃত্যু

১৪৮ হিজরি ৭৬৫ খ্রি.

- হযরত জাফর সাদিক রহ.-এর ইন্তেকাল, ইসনা আশারিয়াদের মতে ষষ্ঠ ইমাম
শাওয়াল (নভেম্বর ৭৬৫ খ্রি.)
- কুফার কাজী ইবনে আবি লায়লা রহ.-এর ইন্তেকাল

১৪৯ হিজরি ৭৬৬ খ্রি.

- রোমীয় ভূখণ্ডে জিহাদ চলাকালীন মুহাম্মদ বিন আশআসের ইন্তেকাল
- ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র জাকারিয়া বিন আবি যায়েদা রহ.-এর ইন্তেকাল
- বাগদাদ নির্মাণ সম্পন্ন

১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রি.

- উস্তাদ সিসের বিদ্রোহ
- ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ইন্তেকাল রজব (আগস্ট ৭৬৭ খ্রি.)

১৫১ হিজরি ৭৬৮ খ্রি.

- আল-মাগাজি ও আস-সিরাহ-এর রচয়িতা মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার রহ.-
এর ইন্তেকাল
- খারেজীদের আকস্মিক হামলায় মা'ন বিন যায়েদা নিহত

১৫২ হিজরি ৭৬৯ খ্রি.

- ইবনে শিহাব আজ-জুহরীর ছাত্র ইউনুস বিন ইয়াজিদ আইলির ইন্তেকাল

১৫৩ হিজরি ৭৭০ খ্রি.

- আফ্রিকায় ইবাদি খারেজীদের বিদ্রোহ
- মনসুরের আদেশে হারসামা বিন আয়ান গ্রেফতার

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

- আব্বাসী দরবারীদের জন্য লম্বা টুপি বাধ্যতামূলক

১৫২ হিজরী ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ

- মনসুরের সিরিয়া সফর। আফ্রিকান খারেজীদের দমনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ
- বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা আশআব তামে-এর মৃত্যু
- কুরাহ বিন খালিদ বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, বসরার মুহাদ্দিস
- হিশাম আদ-দাস্তাওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, বসরার মুহাদ্দিস

১৫৫ হিজরী ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ

- ইয়াজিদ বিন আবি হাতেমের হাতে আফ্রিকায় খারেজীদের পরাজয়
- মিসআর বিন কিদাম কুফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, কুফার মুহাদ্দিস

১৫৬ হিজরী ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দ

- হামজা বিন হাবিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, সাতজন ক্বারীর একজন
- আব্দুর রহমান বিন জিয়াদ বিন আনআম-এর মৃত্যু, আফ্রিকার কাজী

১৫৭ হিজরী ৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাম আওযাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, বৈরুতের মুহাদ্দিস, বয়স ৭০ বছর ২ সফর (২১ ডিসেম্বর ৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- মুসআব বিন সাবিত রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি

১৫৮ হিজরী ৭৭৪-৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

- খালিদ বিন বারমাককে মোসেলের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়
- হাইওয়াহ বিন শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, মিশরের মুহাদ্দিস
- ইমাম জুফার বিন হযাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু, ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র, বসরার কাজী
- মনসুরের হজ সফর
- মনসুর আব্বাসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু ৬ জিলহজ (১৮ অক্টোবর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- মাহদী আব্বাসীর খেলাফত
- কায়সার কনস্টানটাইন বিন লিওনের মৃত্যু

১৫৯ হিজরী ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

- মাহদী কর্তৃক ঈসা বিন মুসার পরিবর্তে তার পুত্র হাদীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা
- খোরাসানের আমীর হামিদ বিন কাহতাবা-এর মৃত্যু

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

১৬০ হিজরী ৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

- শু'বা বিন হাজ্জাজ-এর মৃত্যু, মুহাদিস-ই-ইরাক
- ইব্রাহিম বিন আদহাম রহ.-এর মৃত্যু

১৬১ হিজরী ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

- ইবনে মুকান্না-এর আবির্ভাব
- ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মৃত্যু

১৬২ হিজরী ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

- হাসান বিন কাহতাবা-এর বিলাদ-ই-রুম-এ সৈন্য পরিচালনা ও বিজয়সমূহ

১৬৩ হিজরী ৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

- ইবনে মুকান্না-এর দমন
- হারুনুর রশীদ-এর বিলাদ-ই-রুম-এ জিহাদ, রোমানদের সন্ধিতে বাধ্য করা
- মুহাদিস-ই-নিশাপুর ইব্রাহিম বিন তাহমান রহ.-এর মৃত্যু

১৬৪ হিজরী ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ

- মিখাইল রোমান-এর সীমান্তে আক্রমণ - ইসলামী বাহিনীর পশ্চাদপসরণ
- মুবারক বিন ফাযালা রহ. মাওলা হযরত উমর ফারুক রা.-এর মৃত্যু

১৬৫ হিজরী ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ

- হারুনুর রশীদ-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণ ও বিজয়
- খালিদ বিন বারমাক-এর মৃত্যু

- দাউদ তাঈ রহ. সুফী, ফকীহ, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ছাত্র-এর মৃত্যু

১৬৬ হিজরী ৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ

- খলিফা মাহদী-এর উজির ইয়াকুব বিন দাউদ-এর প্রতি অসন্তুষ্টি
- মক্কা, মদিনা ও ইয়েমেনের মধ্যে ঘোড়া ও উটের ডাক ব্যবস্থা

- যিন্দিক কবি বাশার বিন বুরদ-এর হত্যা

১৬৭ হিজরী ৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

- মাহদী কর্তৃক যিন্দিকদের নির্মূলে তৎপরতা
- মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

- বসরার মুহাদ্দিস হাম্মাদ বিন সালামাহ রহ.-এর ইন্তেকাল

১৬৭ হিজরি ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ

- রোমানদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে রোম ভূখণ্ডে জিহাদি অভিযান
- আব্বাসীয় আমির সাঈদ জুরাশি কর্তৃক তাবারস্তান আক্রমণ

১৬৯ হিজরি ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ

- মাহদীর ইন্তেকাল ২২ মহরম (১৫ আগস্ট ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)
- হাদী বিন মাহদীর খিলাফত
- হুসাইন বিন আলী বিন হাসান বিন হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিদ্রোহ
- ইমামুল কুররা নাফে বিন আবি নুআইম আল-মাদানি রহ.-এর ইন্তেকাল

১৭০ হিজরি ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ

- হাদী বিন মাহদীর ইন্তেকাল ১৫ রবিউল আউয়াল (১৪ সেপ্টেম্বর ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)
- হারুনুর রশিদের খিলাফত
- রবি হাজিবের ইন্তেকাল

১৭১ হিজরি ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ

- কবি আবু দুলামাহ-এর ইন্তেকাল
- আফ্রিকায় ইদ্রিসি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

১৭২ হিজরি ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ

- আন্দালুসের আমির আব্দুর রহমান আউয়ালের ইন্তেকাল এবং হিশাম বিন আব্দুর রহমানের সিংহাসন আরোহণ

১৭৩ হিজরি ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ

- বসরার মুহাদ্দিস জুওয়াইরিয়া বিন আসমা রহ.-এর ইন্তেকাল ১ রজব (২৩ নভেম্বর ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) - তিনি একজন পুরুষ ছিলেন, নারী নন।
- হারুনুর রশিদের মাতা রানী খায়জুরানের ইন্তেকাল

১৭৪ হিজরি ৭৯০ খ্রিস্টাব্দ

- হারুনুর রশিদের হজ পালন
- ইসমাইল বিন যিয়াদ রহ. মোসুলের কাজি নিযুক্ত

১৭৫ হিজরি ৭৯১ খ্রিস্টাব্দ

- সিরিয়ায় কায়সি ও ইয়ামানি গোত্রগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- খলিল বিন আহমদ বসরী আল-ফারাহিদী, ইলমে আরুযের প্রবর্তকের মৃত্যু ১৭০ হিজরী ৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ
- রোমে ওয়াবসা দুর্গ বিজয়
- নুআইম বিন মায়সারা নাহভীর মৃত্যু ১৭১ হিজরী ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
- সুফিদের শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বসরী রহ.-এর মৃত্যু
- আন্দালুসের আমির হিশাম বিন আব্দুর রহমানের ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে জিহাদ ১৭৮ হিজরী ৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
- খোরাসানের ওয়ালী ফজল বিন ইয়াহইয়া বারমাকীর মধ্য এশিয়ায় জিহাদ, মসজিদ নির্মাণ
- বসরার মুহাদিস আব্দুল ওয়ারিস বিন সাঈদের মৃত্যু
- কুফার মুহাদিস মুফাযযাল বিন ইউনুস রহ.-এর মৃত্যু ১৭৯ হিজরী ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
- ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.-এর মৃত্যু ১৪ রবিউল আউয়াল (৭ জুন ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- বসরার মুহাদিস হান্নাদ বিন যায়েদ বিন দিরহাম রহ.-এর মৃত্যু ১০ রমজান (ডিসেম্বর ৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- বাগদাদে কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপিত হলো। ১৮০ হিজরী ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ
- সিরিয়ায় ইয়ামানী ও নিযারী গোত্রগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ
- আলেকজান্দ্রিয়ায় ভূমিকম্প
- হারুনুর রশীদ রাব্বাহকে রাজধানী বানালেন
- হাফস বিন সুলাইমান আল-কুফী রহ., ইমামে কিরাত, আসিম রহ.-এর ছাত্রের মৃত্যু
- আন্দালুসের আমির হিশাম বিন আব্দুর রহমানের মৃত্যু। হাকাম বিন হিশামের সিংহাসন আরোহণ
- নাহর ইমাম সিবওয়াইহ রহ.-এর মৃত্যু। বয়স ৩২ বছর। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী চল্লিশ বছরের কিছু বেশি। ১৮১ হিজরী ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
- হারুনুর রশীদের রোম ভূখণ্ডে জিহাদ। সাফসাফ দুর্গ দখল
- মনসুর আব্বাসীর সেনাপতি হাসান বিন কাহতাবা-র ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল
- আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৬৩ বছর রমজান (অক্টোবর ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

১৮২ হিজরী ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

- কাযীউল কুযাত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ইন্তেকাল ১লা রবিউস সানি (২২ মে ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)

১৮৩ হিজরী ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

- ইবনে সামাক ওয়ায়েজ রহ.-এর ইন্তেকাল
- হযরত মুসা কাযিম রহ.-এর ইন্তেকাল
- আমেনিয়ার ওপর তুর্কিস্তানের খাকানের আক্রমণ

১৮৪ হিজরী ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

- হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর ইন্তেকাল, তিনি হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর প্রপৌত্র

- মুহাদিসে মওসেল মুয়াফি বিন ইমরান রহ.-এর ইন্তেকাল, বয়স ৮৫ বছর

১৮৫ হিজরী ৮০১ খ্রিষ্টাব্দ

- আন্দালুসের বার্সেলোনা শহর ফ্রাঙ্কদের দখলে
- আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.-এর প্রপৌত্র আবদুস সামাদ বিন আলীর ইন্তেকাল
- মসজিদুল হারামে আকাশ থেকে বজ্রপাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু

১৮৬ হিজরী ৮০২ খ্রিষ্টাব্দ

- ফকিহে কুফা আবু ইসহাক ফাযারি রহ.-এর ইন্তেকাল
- ফকিহে বাগদাদ আব্বাদ বিন আওয়াম রহ.-এর ইন্তেকাল
- মুহাদিসে বসরা খালিদ বিন হারিস রহ.-এর ইন্তেকাল

১৮৭ হিজরী ৮০২ ও ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ

- কনস্টান্টিনোপলে রানী আইরিনের মৃত্যু, সম্রাট নিসেফোরাসের সিংহাসন আরোহণ এবং এশিয়া মাইনরে আক্রমণ
- হারুনুর রশীদের পাল্টা আক্রমণ

- জাফর বারমাকির হত্যা - বারমাকিদের পতন ও কারাবরণ ১লা সফর (২৮ জানুয়ারি ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১৮৮ হিজরী ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ

- রোমানদের সাথে যুদ্ধ; সম্রাট নিসেফোরাসের আহত অবস্থায় পলায়ন
- হারুনুর রশীদের শেষ হজ

১৮৯ হিজরী ৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ

- রোমানদের সাথে বন্দি বিনিময় - সমস্ত মুসলিম বন্দি মুক্ত।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

- রে-তে হারুনুর রশীদের সাথে থাকাকালীন কাযীউল কুযাত ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (রহ.) এবং নাহ ও কিরাআতের ইমাম কিসায়ী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, উভয়ের রে-এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় দাফন।

১৮৯ হিজরী ৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদের কাযী, আবু হানিফার ছাত্র আসাদ বিন উমর (রহ.)-এর ইন্তেকাল।
- রোম সাম্রাজ্যের শহর হিরাক্লিয়া (হারকিউলিস) বিজয়।
- সমরকন্দে রাফে বিন লাইসের বিদ্রোহ।
- মামুনুর রশীদের মজুসী গৃহশিক্ষক ফজল বিন সহলের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা।
- হারুনুর রশীদ এশিয়া মাইনরের রণাঙ্গনে ২০ রজব (১১ জানুয়ারি ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ)।
- কারাগারে ইয়াহইয়া বিন খালিদ বারমাকীর মৃত্যু, বয়স ৭৭ বছর।

১৯১ হিজরী ৮০৭ খ্রিষ্টাব্দ

- আন্দালুসে আমীর আল-হাকামের ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিজয়।
- খোরাসান থেকে আলী বিন ইসা বিন মাহানের অপসারণ।
- হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে সীমান্তের গির্জাগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ।

১৯২ হিজরী ৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ

- দাইলামে যিন্দিকদের আবির্ভাব।
- কারাগারে ফজল বিন ইয়াহইয়া বারমাকীর ইন্তেকাল।

১৯৩ হিজরী ৮০৮-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ

- হারুনুর রশীদের ইন্তেকাল ৩ জুমাদিউল আখিরা (৫ এপ্রিল ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ)।
- আমীনুর রশীদের খিলাফত।
- জুবায়দা খাতুনের রাক্বা থেকে বাগদাদে স্থানান্তর।

১৯৪ হিজরী ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ

- আমীন ও মামুনুর রশীদের মধ্যে বিবাদের সূচনা।

১৯৫ হিজরী ৮১০-৮১১ খ্রিষ্টাব্দ

- সুফী বুজুর্গ শাকীক বলখী (রহ.)-এর জিহাদ চলাকালীন শাহাদাত।
- খোরাসানে আমীনের বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় শাবান (এপ্রিল ৮১১ খ্রিষ্টাব্দ)।
- অন্ধ মুহাদ্দিস আবু মুয়াবিয়া কুফী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৮২ বছর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

১৯৬ হিজরি ৮১১ খ্রিস্টাব্দ

- কবি আবু নুওয়াসের মৃত্যু
- তাহির বিন হুসাইনের আমীনুর রশীদে এলাকাগুলোর ওপর দখল

১৯৭ হিজরি ৮১২ খ্রিস্টাব্দ

- মামুনের বাহিনীর বাগদাদ আক্রমণ ও অবরোধ.....
- ওয়াকি বিন জাররাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, কুফার মুহাদিসের মৃত্যু..... জিলহজ মাসের শেষ দিকে (আগস্ট ৮১৩ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৮ হিজরি ৮১৩ খ্রিস্টাব্দ

- আমীনুর রশীদে হত্যাকাণ্ড..... ২৫ মহরম (২৭ অক্টোবর ৮১৩ খ্রিস্টাব্দ)
- মামুনুর রশীদে খিলাফত
- সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, মক্কার মুহাদিসের মৃত্যু..... ১লা রজব (৮ মার্চ ৮১৩ খ্রিস্টাব্দ)
- ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান রহমাতুল্লাহি আলাইহি, বসরার মুহাদিস, হানাফি ফকিহের মৃত্যু

- হাসান বিন সহলের হাতে ইরাকের শাসনভার অর্পণ

১৯৯ হিজরি ৮১৩-৮১৫ খ্রিস্টাব্দ

- আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে ইবনে তাবাতাবার বিদ্রোহ..... ১০ জমাদিউল আখিরা (২৫ জানুয়ারি ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ)
- ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র, আল-ফিকহুল আকবার ও আল-ফিকহুল আবসাতে বর্ণনাকারী, আবু মুতি হাকাম বিন আবদুল্লাহ বলখি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু

২০০ হিজরি ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ

- আলবীয়দের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে.....
- আব্বাসীয় সেনাপতি হারসামা বিন আয়ুনের বরখাস্ত, কারাবরণ ও হত্যাকাণ্ড.....
- হযরত মারুফ কারখি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু.....

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী

২০১ হি. ৮১৬ খ্রি.

- মামুনের পক্ষ থেকে হযরত আলী রেযা (রা.)-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার ঘোষণা
- বাবাক খুররামির আবির্ভাব

২০২ হি. ৮১৭ খ্রি.

- আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উজির ফজল বিন সহলের হত্যাকাণ্ড
- মামুনের বাগদাদে আগমন এবং শাসনের সুসংহতকরণ

২০৩ হি. ৮১৮ খ্রি.

- হযরত আলী রেযা (রা.)-এর ইন্তেকাল
- মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক (রা.)-এর ইন্তেকাল
- ফকিহ, ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ নযর বিন শুমাইল (রা.)-এর ইন্তেকাল
- আসাদ বিন ফুরাত (রা.) কায়রোয়ানের কাজি নিযুক্ত
- খোরাসানে ভূমিকম্প, জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

২০৪ হি. ৮১৯-৮২০ খ্রি.

- মামুনের বাগদাদে আগমন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসন আরোহণ ১৬ সফর (১১ আগস্ট ৮১৯ খ্রি.)
- ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর ইন্তেকাল ৩০ রজব (২০ জানুয়ারি ৮২০ খ্রি.)
- বসরার মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসি (রা.)-এর ইন্তেকাল

২০৫ হি. ৮২০ খ্রি.

- খোরাসানে তাহির বিন হুসাইনের নিযুক্তি
- ওয়াসিতের মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইয়াযিদ বিন হারুনের ইন্তেকাল
- দজলা নদীতে জলোচ্ছ্বাস, বাগদাদে বন্যা
- মিসরের ওয়ালি সারি বিন আল-হাকামের ইন্তেকাল

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

২০৬ হিজরি ৮২১ খ্রিস্টাব্দ

- হাইশাম বিন আদীর মৃত্যু, দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী।
- মুহাম্মদ বিন মুত্তানির নাহভী-র মৃত্যু, সিবওয়াইহ-এর ছাত্র।
- আন্দালুসের শাসক আমির হাকাম বিন হিশামের মৃত্যু।
- আবদুল্লাহ বিন তাহির বিন হুসাইন রাক্কার গভর্নর নিযুক্ত, তাহির বিন হুসাইনের পক্ষ থেকে ছেলের কাছে উপদেশনামা প্রেরণ।

২০৭ হিজরি ৮২২ খ্রিস্টাব্দ

- ওয়াহাব বিন জারীর বিন হাফিম বসরী (রহ.)-এর মৃত্যু... মহররম (জুন ৮২২ খ্রি.)।
- তাহির বিন হুসাইনের মৃত্যু, খোরাসানের তাহিরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- ফাররা নাহভী-র মৃত্যু, ইমাম কিসায়ীর ছাত্র।

২০৮ হিজরি ৮২৩ খ্রিস্টাব্দ

- মামুনুর রশীদের হাজিব ফজল বিন রবী-র মৃত্যু।
- সাইয়েদা নারিসা বিনতে হাসান বিন যায়েদ বিন হাসান (রাযি.)-এর মৃত্যু।

২০৯ হিজরি ৮২৪ খ্রিস্টাব্দ

- রোম সম্রাট মাইকেল বিন জর্জের মৃত্যু।
- আবু উবায়দা মা'মার বিন মুসান্না-র মৃত্যু, আরবি ব্যাকরণ ও অভিধান বিশেষজ্ঞ, বয়স ৯৩ বছর।
- মসুলের মুহাদ্দিস ফজল বিন আব্দুল হামিদ (রহ.)-এর মৃত্যু।

২১০ হিজরি ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ

- আন্দালুসে আব্দুর রহমান বিন হাকাম উমাইয়্যাহর বিজয় অভিযান... রবিউল আউয়াল (জুলাই ৮২৫ খ্রি.)।
- মামুনের সাথে তার উজির হাসান বিন সাহলের কন্যা বুরানের বিবাহ... রমজান (ডিসেম্বর ৮২৫ খ্রি.)।
- মামুন তার বিরোধী ইব্রাহিম বিন মাহদী এবং ইবনে আয়েশার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন।

২১১ হিজরি ৮২৬ খ্রিস্টাব্দ

- মামুনের পক্ষ থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর প্রশংসা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা।
- কবি আবুল আতাহিয়া-র মৃত্যু... ৩ জমাদিউল আখিরা (৯ সেপ্টেম্বর ৮২৬ খ্রি.)।
- ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বিন হান্নাম সানআনী (রহ.)-এর মৃত্যু, খ্যাতির কারণ 'মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক'।

২১২ হিজরি ৮২৭ খ্রিস্টাব্দ

- আসাদ বিন ফুরাতের নেতৃত্বে সিসিলির উদ্দেশ্যে নৌবহরের যাত্রা... ১৫ রবিউল আউয়াল (১৪ জানুয়ারি ৮২৭ খ্রি.)।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

বাবক খুররমীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান

আব্বাসীয় রাষ্ট্রে খালকে কুরআনের আকিদা সরকারিভাবে কার্যকর করা

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নাতি বসরার কাজী ইসমাইল বিন হাম্মাদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল

২১৩ হিজরি ৮২৮ খ্রিস্টাব্দ

কাজী আসাদ বিন ফুরাত (রহ.)-এর ইন্তেকাল রবিউস সানি (জুলাই ৮২৮ খ্রি.)

কবি আলী বিন জাবালার ইন্তেকাল

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইব্রাহিম মৌসিলির মৃত্যু

২১৪ হিজরি ৮২৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবক খুররমীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনীর পরাজয়, সেনাপতি ইবনে হামিদ তুসী নিহত

কবি আবু দুলাফ মামুনের দরবারের সাথে যুক্ত হওয়া

বসরার মুহাদ্দিস দাহহাক বিন মাখলাদ শায়বানীর ইন্তেকাল

২১৫ হিজরি ৮৩০ খ্রিস্টাব্দ

জিহাদের উদ্দেশ্যে মামুনের এশিয়া মাইনরের তারতুস পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ৮৩০ খ্রি.)

বুজুর্গ সুফি আবু সুলাইমান দারানী (রহ.)-এর ইন্তেকাল

২১৬ হিজরি ৮৩১ খ্রিস্টাব্দ

এশিয়া মাইনরে মামুনের দ্বিতীয় আক্রমণ, সিরিয়া ও মিশর সফর

জুবায়দা খাতুনের ইন্তেকাল জমাদিউল আউয়াল (জুন ৮৩১ খ্রি.)

আরবি ভাষাবিদ ইমাম আসমায়ি (আবদুল মালিক বিন কুরাইব আল-বাহিলি)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৮৮ বছর

২১৭ হিজরি ৮৩২ খ্রিস্টাব্দ

এশিয়া মাইনরে মামুনের সামরিক অভিযান, রোম সম্রাট থিওফিলাসের সাথে যুদ্ধ

বসরার মুহাদ্দিস হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.)-এর ইন্তেকাল

২১৮ হিজরি ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ

মামুনের আদেশে এশিয়া মাইনরে নতুন শহর তুওয়ানা নির্মাণের সূচনা

খালকে কুরআন ইস্যুতে মামুনুর রশিদের কঠোরতা। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর গ্রেপ্তার

মামুনের ইন্তেকাল ১৮ রজব (২০ আগস্ট ৮৩৩ খ্রি.)

মুতাসিমের খিলাফতের সূচনা

বাবক খুররমির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ ফিলকদ (ডিসেম্বর ৮৩৩ খ্রি.)

সীরাতে ইবনে হিশামের রচয়িতা আব্দুল মালিক বিন হিশাম হিময়ারি রহ.-এর মৃত্যু
২১৯ হিজরি ৮৩৩ খ্রি.

উজির বাগদাদ ইসহাক বিন ইব্রাহিমের মজুসি বন্দীদের সাথে দাইলাম থেকে প্রত্যাবর্তন
..... জমাদিউল আউয়াল (মে ৮৩৪ খ্রি.)

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলভির বিদ্রোহ, পরাজয়, কারাবরণ ও পলায়ন

ফজল বিন দুকাইন রহ., শায়খ ইমাম বুখারি রহ.-এর মৃত্যু শাবান (আগস্ট ৮৩৪ খ্রি.)

মুতাসিমের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ওপর মাসআলায়ে খালকে কুরআন নিয়ে
জুলুম ও নির্যাতন রমজান (সেপ্টেম্বর ৮৩৪ খ্রি.)

২২০ হিজরি ৮৩৫ খ্রি.

আব্বাসীয়দের নতুন রাজধানী ‘সুররা মান রাআ’ (সামারা) নির্মাণ

ইমাম কিরাত কালুন আবু মুসা বিন মিনা মাদানি রহ.-এর মৃত্যু

মুহাম্মদ তাকি আল-জাওয়াদ বিন আলী রেজা রহ.-এর মৃত্যু, ইসনা আশারিয়ার নবম ইমাম
.....

২২১ হিজরি ৮৩৫ খ্রি.

আদম বিন আবি ইয়াস রহ., মুহাদিসে আসকালানের মৃত্যু

ঈসা বিন আবান বিন সাদাকা রহ., কাজি ও মুহাদিসে বসরা, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান
রহ.-এর ছাত্রের মৃত্যু

বুগা কবিরের বাবক খুররমির কাছে পরাজয় - আফশিনের বাবকের বিরুদ্ধে অভিযান

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মুতাসিমের দরবারে উপস্থিতি - বেত্রাঘাতের শাস্তি

২৫ রমজান (১১ সেপ্টেম্বর ৮৩৬ খ্রি.)

২২২ হিজরি ৮৩৬ খ্রি.

ইসলামি বাহিনীর বাবকের রাজধানী ‘বারজান্দ’-এ প্রবেশ ২০ রমজান (২৬ আগস্ট
৮৩৭ খ্রি.)

বাবক খুররমি মুতাসিমের সেনাপতি আফশিনের হাতে গ্রেফতার ১০ শাওয়াল (১৫
সেপ্টেম্বর ৮৩৭ খ্রি.)

২২৩ হিজরি ৮৩৭ খ্রি.

বাবক খুররমির হত্যা

কায়সার তুফায়েল বিন মিখাইলের সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ, মালতিয়া দখল এবং
মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণের পর পিছু হটা

২২৪ হিজরি ৮৩৮ খ্রি.

আবু উবায়দ কাসিম বিন সালাম রহ., ভাষাবিদ ও ফকিহ-এর মৃত্যু

ইব্রাহিম বিন মাহদির মৃত্যু রমজান

২২৫ হিজরি ৮৩৯, ৮৪০ খ্রি.

আবু দুলফ, কবি ও ভাষাবিদের মৃত্যু

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ঐতিহাসিক আবুল হাসান আল-মাদাইনীৰ মৃত্যু, বয়স ৯৩ বছৰ...
- তুৰ্কি সেনাপতি আফশিনেৰ পদচ্যুতি ও মৃত্যুদণ্ড... শাবান (জুন ৮৪০ খ্রি.)
- ২২৬ হিজরি... ৮৪০ খ্রি.
- আহওয়াজে শক্তিশালী ভূমিকম্প...
- মুতাজিলাদেৰ শায়খ আবুল হুযাইল আল্লাফ বসরীৰ মৃত্যু, বয়স ১০০ বছৰেৰ বেশি...
- বসৱাৰ মুহাদ্দিচ সুলাইমান বিন হাৰব (রহ.)-এৰ মৃত্যু...
- ২২৭ হিজরি... ৮৪১ খ্রি.-৮৪২ খ্রি.
- মুতাসিম বিল্লাহৰ মৃত্যু... ১৮ রবিউল আউয়াল (১৮ ডিসেম্বৰ ৮৪১ খ্রি.)
- হযরত বিশৰ হাফী (রহ.)-এৰ মৃত্যু... ২০ রবিউল আউয়াল (২০ নভেম্বৰ ৮৪১ খ্রি.)
- ওয়াসিক বিল্লাহৰ খিলাফত...
- ২২৮ হিজরি... ৮৪২ খ্রি.
- সিসিলিতে মুসলমানদেৰ বিজয়সমূহ...
- ২২৯ হিজরি... ৮৪৩ খ্রি.
- শায়খুল কুৱৱা ইমাম খালাফ বিন হিশাম (রহ.)-এৰ মৃত্যু... জমাদিউল উলা (ফেব্ৰুৱাৰি ৮৪৪ খ্রি.)
- খলিফা ওয়াসিকেৰ পক্ষ থেকে সৱকাৰি দপ্তৰেৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মকৰ্তাদেৰ ওপৰ ভাৱী জৰিমানা আৰোপ...
- ২৩০ হিজরি... ৮৪৪ খ্রি.-৮৪৫ খ্রি.
- খোৱাসানেৰ শাসক আবদুল্লাহ বিন তাহিৰেৰ মৃত্যু...
- ‘তাবাকাত’ প্ৰণেতা মুহাম্মদ বিন সাদ (রহ.)-এৰ মৃত্যু... জমাদিউস সানি (ফেব্ৰুৱাৰি ৮৪৫ খ্রি.)
- ২৩১ হিজরি... ৮৪৫ খ্রি.-৮৪৬ খ্রি.
- ৰোমানদেৰ সাথে বন্দি বিনিময়... ১০ মহৰম (১৬ সেপ্টেম্বৰ ৮৪৫ খ্রি.)
- ইৰাকেৰ বিখ্যাত মুহাদ্দিচ আহমদ বিন নাসৰ (রহ.)-এৰ হত্যাকাণ্ড... ৩০ শাবান (৩০ এপ্ৰিল ৮৪৬ খ্রি.)
- ওয়াসিফ তুৰ্কি বাগদাদ দৱবাৰেৰ ঘনিষ্ঠ আমিৰদেৰ অন্তৰ্ভুক্ত হন
- বাগদাদেৰ বাইতুল মালে সিঁধ কেটে ৪২ হাজাৰ দিৱহাম চুৰি...
- বিখ্যাত কবি ও ‘দিওয়ানে হামাসা’ৰ সংকলক আবু তাম্মাম হাবিব বিন আউস তাঈ-এৰ মৃত্যু...
- ২৩২ হিজরি... ৮৪৬ খ্রি.-৮৪৭ খ্রি.
- ওয়াসিক বিল্লাহৰ মৃত্যু... ২৪ জিলহজ (২৪ আগষ্ট ৮৪৭ খ্রি.)

বিষয়বস্তু

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন আইজ দামেশকীর মৃত্যু
- মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহর খিলাফত

২৩৩ হিজরি ৮৪৭ - ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ

- সিরিয়ায় ভূমিকম্প, পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু
- ইমামুল জারহ ওয়াত তাদীল ইয়াহইয়া বিন মাসীন (রহ.)-এর মৃত্যু, বাগদাদের মুহাদ্দিস জিলকদ (জুন ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

২৩৪ হিজরি ৮৪৮ - ৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ

- আলী বিন মাদিনী (রহ.)-এর মৃত্যু, বসরার মুহাদ্দিস জিলকদ (জুন ৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

২৩৫ হিজরি ৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ

- আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (রহ.)-এর মৃত্যু, কুফার মুহাদ্দিস, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বার লেখক রবিউস সানি (নভেম্বর ৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

২৩৬ হিজরি ৮৫০ - ৮৫১ খ্রিস্টাব্দ

- মামুনের শ্বশুর ও উজির হাসান বিন সহলের মৃত্যু, বয়স ৬৭ বছর রমজান (মার্চ ৮৫১ খ্রিস্টাব্দ)

২৩৭ হিজরি ৮৫১ - ৮৫২ খ্রিস্টাব্দ

- মুতাজিলা কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদের ওপর খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ত্রোধ
- আরমেনিয়ার খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ আব্বাসীয় সেনাপতি বুগা আল-কাবীর কর্তৃক দমন
- সুফি বুজুর্গ হাতেম আসম (রহ.)-এর মৃত্যু শাওয়াল (এপ্রিল ৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)

২৩৮ হিজরি ৮৫২ খ্রিস্টাব্দ

- রোমানদের দামিয়াত আক্রমণ
- আন্দালুসের আমির আবদুর রহমান বিন হাকামের ইন্তেকাল, ৩২ বছরের শাসনকাল, বয়স ৬২ বছর

২৩৯ হিজরি ৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ

- এশিয়া মাইনরে সামরিক অভিযান, ইসলামি বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের সন্নিকটে

২৪০ হিজরি ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ

- মুতাজিলা কাজী আহমদ বিন আবি দুয়াদের মৃত্যু

২৪১ হিজরি ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মৃত্যু ১২ রবিউল আউয়াল, বয়স ৭৭ বছর (৩০ জুলাই ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

২৪২ হিজরি ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ

- আফ্রিকার গভর্নর মুহাম্মদ বিন আগলাবের মৃত্যু ১০ মহররম (১৮ মে ৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

ইতিহাসে উন্মতে মুসলিমা

- বাগদাদের কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রহ.)-এর মৃত্যু... জমাদিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ৮৫৬ খ্রি.)

- উত্তর ইরানে ভূমিকম্প, ৪৫ হাজার মানুষ নিহত...

২৪৩ হিজরি... ৮৫৭ খ্রি.

- ইবনে সিক্কীত নাহতী-র মৃত্যু...

- সুফী হারিস ইবনে আসাদ মুহাসিবী (রহ.)-এর মৃত্যু...

২৪৪ হিজরি... ৮৫৮ খ্রি.

- রোমীয় ভূখণ্ডে বুগা কাবীরের জিহাদ, সামলাহ বিজয়...

- রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বর্শা ‘আনজাহ’ খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের নিকট পেশ করা হলো...

- ঈদুল আযহা, নাসারাদের ঈদ এবং ইহুদিদের ঈদ একই দিনে সংঘটিত হলো... ১০ জিলহজ (১৯ মার্চ ৮৫৯ খ্রি.)

২৪৫ হিজরি... ৮৫৯-৮৬০ খ্রি.

- বেশ কিছু শহরে ভূমিকম্প, খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রিশ লক্ষ দিরহাম সাহায্য প্রদান...

- মুতাওয়াঙ্কিলের আদেশে নতুন শহর ‘জাফরিয়া’ নির্মাণ...

২৪৬ হিজরি... ৮৬০ খ্রি.

- আন্দালুসের আমির মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমানের ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ ও বিজয়...

- বাগদাদে ২৫ দিন ধরে হালকা বৃষ্টি, ঘরের ছাদে ঘাস জন্মে গেল...

- যুননুন মিসরী (রহ.)-এর মৃত্যু... ২ জিলকদ (১৭ জানুয়ারি ৮৬১ খ্রি.)

- রাফেজি কবি দি’বিল খুজায়ী-র মৃত্যু...

২৪৭ হিজরি... ৮৬১ খ্রি.

- ইমামুন নাহব আবু উসমান মাযানী (রহ.)-এর মৃত্যু...

- খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের হত্যাকাণ্ড... ৫ শাওয়াল (২৩ ডিসেম্বর ৮৬১ খ্রি.)

২৪৮ হিজরি... ৮৬২ খ্রি.

- খলিফা মুনতাসির বিল্লাহর মৃত্যু... ৫ রবিউস সানি (৩০ মে ৮৬২ খ্রি.)

- মুসতাইন-এর খিলাফত

- আব্বাসীয় রাষ্ট্রের সেনাপতি বুগা কাবীরের মৃত্যু... জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ৮৬২ খ্রি.)

২৪৯ হিজরি... ৮৬৩ খ্রি.

- এশিয়া মাইনরে মুসলমানদের পরাজয়, সেনাপতি উমর ইবনে আবদুল্লাহ শহীদ... ১৫ রজব (৩ সেপ্টেম্বর ৮৬৩ খ্রি.)

- আল-জাজিরার সীমান্তে মুসলমানদের দ্বিতীয় পরাজয়, সেনাপতি আলী বিন ইয়াহইয়া শহীদ... ১৪ রমজান (৩১ অক্টোবর ৮৬৩ খ্রি.)
- বাগদাদে পরাজয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সামাররার জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করা হয়।
- ২৫০ হিজরি ৮৬৪ খ্রি.
- মিশরের কাজী হারিস বিন মিসকিন রহ.-এর ইন্তেকাল, বয়স ৯৬ বছর... রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ৮৬৪ খ্রি.)
- আবুল হুসাইন আলভীর বিদ্রোহ এবং হত্যা... ১৫ রজব... (২২ আগস্ট ৮৬৪ খ্রি.)
- ২৫১ হিজরি ৮৬৫ খ্রি.
- হাফেজ নিশাপুরী ইসহাক বিন ইব্রাহিমের ইন্তেকাল... জমাদিউল উলা (জুন ৮৬৫ খ্রি.)
- ইসমাইল বিন ইউসুফ আলভীর বিদ্রোহ, মসজিদে হারামে লুটতরাজ, এগারো শত হাজি হত্যা।
- ২৫২ হিজরি ৮৬৬ খ্রি.
- আব্বাসীয় খলিফা মুসতাইন-এর পদচ্যুতি... ৪ মহররম (৬ ফেব্রুয়ারি ৮৬৬ খ্রি.)
- আব্বাসীয় মুসতাইন-এর হত্যা... ৩ শাওয়াল (২৮ অক্টোবর ৮৬৬ খ্রি.)
- ইসমাইল বিন ইউসুফ তালেবি আলভীর মৃত্যু।
- বুন্দার মুহাম্মদ বিন বাশশার রহ.-এর ইন্তেকাল, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ।
- মুহাম্মদ বিন আল-মুসান্না রহ.-এর ইন্তেকাল, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ।
- ২৫৩ হিজরি ৮৬৭ খ্রি.
- হযরত সিররি সাকতি রহ.-এর ইন্তেকাল... ৬ রমজান (৮ সেপ্টেম্বর ৮৬৭ খ্রি.)
- আব্বাসীয় রাষ্ট্রের প্রধান ওয়াসিফ আত-তুর্কির মৃত্যু।
- মুসা বিন বুগা কাবিরের কাছে পরাজিত হয়ে কাওকাবি আলভীর পলায়ন।
- ২৫৪ হিজরি ৮৬৮ খ্রি.
- আব্বাসীয় রাষ্ট্রের আমির বুগা আস-সাগিরের হত্যা।
- সামাররায় হযরত আলী আল-হাদী বিন মুহাম্মদ তাকী বিন আলী রেযা রহ.-এর ইন্তেকাল, বয়স ৪০ বছর... ইসনা আশারিয়ার দশম ইমাম।
- ২৫৫ হিজরি ৮৬৮-৮৬৯ খ্রি.
- বিখ্যাত মুতাজিলা সাহিত্যিক ও লেখক আবু উসমান জাহিজের ইন্তেকাল, বয়স ৯০ বছর... মহররম (জানুয়ারি ৮৬৯ খ্রি.)
- ইরাকে জাঞ্জি ফিতনার আবির্ভাব।
- সুনানে দারমির সংকলক ইমাম দারেমী রহ.-এর ইন্তেকাল।
- খলিফা মুতায বিল্লাহর জোরপূর্বক পদচ্যুতি... ২৮ রজব (২৪ জুলাই ৮৬৯ খ্রি.)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- মুহতাদি আব্বাসীর খিলাফত ২৮ রজব (২৩ জুলাই ৮৬৯ খ্রি.)
- সাবেক খলিফা মুতায় বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড ২ শাবান (২৭ জুলাই ৮৬৯ খ্রি.)
- তুর্কি সরদার সালিহ বিন ওয়াসিফ আব্বাসী রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন ২৫৬ হিজরি ৮৬৯-৮৭০ খ্রি.
- খলিফা মুহতাদি বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড এবং মুতামিদ আব্বাসীর খিলাফত ১৬ রজব (১ জুলাই ৮৭০ খ্রি.)
- ইমাম বুখারী রহ.-এর ইন্তেকাল ৩০ রমজান (৩০ আগস্ট ৮৭০ খ্রি.) ২৫৭ হিজরি ৮৭০ খ্রি.
- জাঞ্জিদের তাণ্ডব। বসরায় বারো হাজার মানুষ নিহত ১৪ শাওয়াল (৩ সেপ্টেম্বর ৮৭১ খ্রি.)
- ভাষাবিদ আব্বাস বিন আল-ফারাজের ইন্তেকাল ২৫৮ হিজরি ৮৭১-৮৭২ খ্রি.
- যুবরাজ মুওয়াফফাক আব্বাসীর জাঞ্জিদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং সাফল্য
- বিখ্যাত ওয়ায়েজ ও সুফি ইয়াহইয়া বিন মুয়ায আর-রাযী রহ.-এর ইন্তেকাল জমাদিউল আউয়াল (মার্চ ৮৭২ খ্রি.) ২৫৯ হিজরি ৮৭২ খ্রি.
- মুওয়াফফাক আব্বাসী এবং মুসা বিন বুগার জাঞ্জিদের বিরুদ্ধে বিজয়
- মালাতিয়ায় রোমানদের সাথে যুদ্ধ এবং বিজয়
- খোরাসানে সাফারি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ২৬০ হিজরি ৮৭৩-৮৭৪ খ্রি.
- হাসান বিন আলী (হাসান আসকারী রহ., ইসনা আশারিয়ার একাদশ ইমাম)-এর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল (জানুয়ারি ৮৭৪ খ্রি.)
- চিকিৎসক হুনাইন বিন ইসহাকের মৃত্যু ২৬১ হিজরি ৮৭৪-৮৭৫ খ্রি.
- ইয়াকুব বিন লাইস সাফারির উত্থান
- বাগদাদী বাহিনীর সাথে জাঞ্জিদের যুদ্ধ
- ইমাম কিরাত আবু শুয়াইব সুসী (সালিহ বিন যিয়াদ) রহ.-এর ইন্তেকাল
- সুফি বুজুর্গ আবু ইয়াজিদ বিস্তামী রহ.-এর ইন্তেকাল
- ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ-এর ইন্তেকাল রজব (এপ্রিল ৮৭৫ খ্রি.) ২৬২ হিজরি ৮৭৫-৮৭৬ খ্রি.
- ‘আখবারুল মদিনা’-এর লেখক উমর বিন শাব্বাহ বসরী রহ.-এর ইন্তেকাল জমাদিউস সানি (মার্চ ৮৭৬ খ্রি.)

ওয়াসিতে ইয়াকুব বিন লাইসের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় সালার মুওয়াফফাকের বিজয়

২৬৩ হিজরি ৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

সিরিয়ার উপকূলীয় দুর্গ লুলুয়া ফিরিজিদের দখলে চলে যায়

আন্দালুসে খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে শাহজাদা মুনজিরের পরাজয় ২৬৪ হিজরি

৮৭৭-৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

আব্বাসীয় আমির মুসা বিন বুগা কাবিরের মৃত্যু মহররম (সেপ্টেম্বর ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ওয়াসিতে জাঞ্জিদের আক্রমণ

রোমীয় ভূখণ্ডে মুসলমানদের পরাজয়, পুরো সেনাবাহিনী শহীদ হয়

শাফেয়ী ফকিহ আবু ইব্রাহিম মুজানি (রহ.)-এর মৃত্যু রবিউল আউয়াল (নভেম্বর ৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ)

মুহাদিস আবু জুরআ (রহ.)-এর মৃত্যু ২৯ জিলহজ (১ সেপ্টেম্বর ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)

২৬৫ হিজরি ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

তিউনিসিয়ার মালেকী ফকিহদের শায়খ মুহাম্মদ বিন সাহনুন (রহ.)-এর মৃত্যু

খুরাসানের সাফারি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন লাইস সাফারির মৃত্যু

২৬৬ হিজরি ৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

রোমীয়দের অগ্রযাত্রা, আল-জাজিরা অঞ্চলে লুটতরাজ

রাম-হরমুজের ওপর জাঞ্জিদের দখল

২৬৭ হিজরি ৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

ওয়াসিতে জাঞ্জিদের দখল এবং জনগণের ওপর গণহত্যা

মুওয়াফফাক কর্তৃক তার পুত্র মুতাদিদকে সাথে নিয়ে জাঞ্জিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান

২৬৮ হিজরি ৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ

তুর্কি সরদার খালাফ আত-তুলুনির রোমীয় ভূখণ্ডে জিহাদ, বিপুল সংখ্যক শত্রু বন্দি

খুরাসানের মুহাদিস আহমদ বিন সাইয়ার মারওয়াজি (রহ.)-এর মৃত্যু

২৬৯ হিজরি ৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ

মুওয়াফফাক ও মুতাদিদের হাতে জাঞ্জিদের নির্মূল

আহমদ বিন তুলুন-এর আমন্ত্রণে আব্বাসীয় খলিফা মুতামিদের মিশর সফর এবং জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন

২৭০ হিজরি ৮৮৩-৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ

মিশরের তুলুনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ বিন তুলুন-এর ইন্তেকাল, বয়স ৬০ বছর

জিলকদ (মে ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

- রবী বিন সুলাইমান রহ.-এর মৃত্যু, ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ছাত্র... শাবান (ফেব্রুয়ারি ৮৮৪ খ্রি.)

২৭০ হিজরি... ৮৮৩-৮৮৪ খ্রি.

- বুরান-এর মৃত্যু, মামুনুর রশীদেব স্ত্রী... রবিউল আউয়াল (সেপ্টেম্বর ৮৮৪ খ্রি.)
- ওয়াকআতুল তাওয়াহীন: ফিলিস্তিনে আব্বাসীয়দের মিশরীয়দের কাছে পরাজয়, ১৬ শাওয়াল (৬ এপ্রিল ৮৮৫ খ্রি.)

২৭১ হিজরি... ৮৮৪-৮৮৫ খ্রি.

- মিশরে ভূমিকম্প, এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু... জমাদিউল উলা (অক্টোবর ৮৮৫ খ্রি.)
- বাগদাদে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব...

২৭২ হিজরি... ৮৮৫-৮৮৬ খ্রি.

- আন্দালুসের আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের ৩৫ বছর শাসনের পর ইস্তিকাল...
সফর (জুলাই ৮৮৬ খ্রি.)
- ইমাম ইবনে মাজাহ কাজভিনী রহ.-এর মৃত্যু... রমজান (ফেব্রুয়ারি ৮৮৭ খ্রি.)

২৭৩ হিজরি... ৮৮৬-৮৮৭ খ্রি.

- আমর বিন লাইস সাফারি এবং খিলাফতের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ...
- তারতুসের শাসক 'ইয়াজমান'-এর রোম ভূখণ্ডে আক্রমণ, সফল অভিযান ও প্রত্যাবর্তন...

২৭৪ হিজরি... ৮৮৭-৮৮৮ খ্রি.

- বসরায়ে ইমাম আব দাউদ সাজিস্তানি রহ.-এর মৃত্যু... শাওয়াল (ফেব্রুয়ারি ৮৮৯ খ্রি.)

১৭৫ হিজরি চহচ-চহ৯ খ্রি

- আব্বাসীয় ও মিশরীয়দের মধ্যে আরেকটি যুদ্ধ। আব্বাসীয়দের পরাজয়...
- আন্দালুসের মুহাদ্দিস বাকি বিন মাখলাদ আবু আবদুর রহমান রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৭৫ বছর... জমাদিউস সানি (অক্টোবর ৮৮৯ খ্রি.)
- ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি রহ.-এর মৃত্যু, ঐতিহাসিক... শাবান (ডিসেম্বর ৮৮৯ খ্রি.)
- আবু বকর ও আহমদ বিন হাজেম রহ.-এর মৃত্যু, কুফার মুহাদ্দিস, জিলহজ (এপ্রিল ৮৯০ খ্রি.)

২৭৬ হিজরি... ৮৮৯-৮৯০ খ্রি.

- ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাউয়ি রহ.-এর মৃত্যু, ঐতিহাসিক, “আল-মা’রিফাত ওয়াত তারিখ”-এর লেখক, বয়স ৮২ বছর... জমাদিউস সানি (সেপ্টেম্বর ৮৯০ খ্রি.)

୧୭୭ ହିଜରି... ୪୯୦-୪୯୧ ଖ୍ରୀ.

- কারামিতা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব
- আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী মুওয়াফফাক বিন মুতাওয়াঙ্কিল আলান্লাহ-এর মৃত্যু, বয়স ৪৯ বছর... সফর (মে ৮৯১ খ্রি.)

২৭৮ হিজরি... ৮৯১-৮৯২ খ্রি.

- খলিফা মতাদিদ-এর পদত্যাগ... মহররমের শেষ দিকে (মার্চ ৮৯৩ খ্রি.-এর শেষ দিকে)

୧୭୩ ହିଜାରି... ୮୩୨-୮୩୭ খ্রি

সপ্তম খণ্ড তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- মুতাদিদ আব্বাসীর খিলাফত
- প্রাক্তন খলিফা মুতামিদ আব্বাসীর ইন্তেকাল, বয়স ৫০ বছর রজব (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি.)
- ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ইন্তেকাল রজব (অক্টোবর ৮৯২ খ্রি.)
- ‘আত-তারিখুল কাবীর’-এর লেখক ইমাম ইবনে আবি খাইসামা রহ.-এর ইন্তেকাল, বয়স ৯৪ বছর

২৮০ হিজরী ৮৯৩ খ্রি.

- কাজী আহমদ বিন ইবনে ইমরান রহ., শায়খ ইমাম তহাবী রহ.-এর ইন্তেকাল

২৮১ হিজরী ৮৯৪ খ্রি.

- ইমাম ইবনে দিজিল রহ. (ইবরাহিম বিন হুসাইন), মুহাদিসে হামদান-এর ইন্তেকাল, শাবান (নভেম্বর ৮৯৩ খ্রি.)

২৮২ হিজরী ৮৯৫ খ্রি. - ৮৯৬ খ্রি.

- খারেজীদের বিরুদ্ধে মুতাদিদের বিজয়
- আমর বিন লাইস সাফফারীর বিজয়সমূহ
- মিসরের শাসক খুমারওয়াইহ বিন ইবনে তুলুন নিহত যিলকদ (জানুয়ারি ৮৯৬ খ্রি.)

২৮৩ হিজরী ৮৯৬ খ্রি.

- সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুস্তারি রহ.-এর ইন্তেকাল

২৮৪ হিজরী ৮৯৭ খ্রি.

- মিসরে কালো ঝড় রবিউস সানি (মে ৮৯৭ খ্রি.)
- মুতাদিদ আব্বাসী কর্তৃক হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবমাননার সিদ্ধান্ত এবং পুনরায় তা থেকে প্রত্যাবর্তন জুমাদাল আখিরা (জুলাই ৮৯৭ খ্রি.)
- খিলাফত দরবার থেকে আমর বিন লাইস সাফফারীর নিকট শাসনকার্যের ফরমান ও সম্মানসূচক পোশাক প্রেরণ

২৮৫ হিজরী ৮৯৮ খ্রি.

- ইমামুন নাহু আবুল আব্বাস আল-মুবারাদ রহ.-এর ইন্তেকাল

২৮৬ হিজরী ৮৯৯ খ্রি.

- মাওরাউন নাহরে সাফফারীদের পরাজয় - সামানিয়া রাষ্ট্রের উত্থান
- বাহরাইনে আবু সাঈদ জানাবীর উত্থান, কারামতিদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, বসরা বিপদের মুখে

২৮৭ হিজরী ৯০০ খ্রি.

- কারামতিদের হাতে মুসলমানদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, আরবগামী কাফেলাগুলো অনিরাপদ

২৮৮ হিজরী ৯০০ খ্রি.

- উত্তর আফ্রিকায় বনু উবাইদের দাওয়াতের আত্মপ্রকাশ

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (অষ্টম খণ্ড)

- আজারবাইজানে মহামারী রোগে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেন..... ২৮৯ হিজরি / ৯০১-৯০২ খ্রি.
- খলিফা মুতাদিদ আব্বাসীর ইন্তেকাল, বয়স ৪৬ বছর..... ২২ রবিউস সানি (১৬ এপ্রিল ৯০২ খ্রি.)
- খলিফা মুকতাবি আব্বাসীর সিংহাসন আরোহণ ২৯০ হিজরি / ৯০২ খ্রি.
- সিরিয়ায় কারামাতিদের তাড়ব, দামেস্ক অবরোধ, আল্লাহর সৃষ্টি (মানুষ) অতিষ্ঠ.....
- আফ্রিকায় বনু উবাইদ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা.....
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাহেবজাদা, মুসনাদে আহমাদ-এর সংকলক ইমাম আবদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল, বয়স ৭৭ বছর..... ২৯১ হিজরি / ৯০৩ খ্রি.
- সিরিয়ার ওপর কারামাতিদের দখল..... সালামিয়া শহরের সমস্ত অধিবাসী তলোয়ারের আঘাতে নিহত
- মাওয়ারাননাহরের ওপর অমুসলিম তুর্কিদের আক্রমণ, আমির ইসমাইল সামানির সফল প্রতিরোধ ও বিজয়.....
- এশিয়া মাইনরে রোমানদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ.....
- শায়খুল কুররা ইমাম কুশুল মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল-মাক্কি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল ২৯২ হিজরি / ৯০৪ খ্রি.
- তুলুনি রাজবংশের পতন। মিসরের শাসক হারুন ইবনে খুমারওয়াইহ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত..... মিসর বিদ্রোহী সর্দার খালানজি কর্তৃক দখল
- মুসনাদে বাজারের লেখক হাফেজ আবু বকর বাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল..... ২৯৩ হিজরি / ৯০৫ খ্রি.
- সিরিয়া ও ইরাকে কারামাতিদের রক্তক্ষয়ী তৎপরতা। কুফা দখল ও গণহত্যা.....
- মিসরের ওপর আব্বাসীয় বাহিনীর আক্রমণ। খালানজি পরাজিত ও নিহত..... ২৯৪ হিজরি / ৯০৬-৯০৭ খ্রি.
- কারামাতিদের হাতে বিশ হাজার হাজি শহীদ.....
- আন্দালুসের মুহাদ্দিস সাব্বাহ ইবনে আবদুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল। বয়স ১১৮ বছর..... মহররম (নভেম্বর ৯০৬ খ্রি.)
- কারামাতি নেতা জাকরাওয়াইহ-এর অনুসারীরা সরকারি বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত..... ২৯৫ হিজরি / ৯০৭-৯০৮ খ্রি.
- খোরাসানের আমির ইসমাইল ইবনে আহমাদ সামানির ইন্তেকাল.....
- খলিফা মুকতাবি আব্বাসীর ইন্তেকাল, বয়স ৩৬ বছর..... ১৩ জিলকদ (২৫ আগস্ট ৯০৮ খ্রি.)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

খিলাফতে মুকতাদির আব্বাসী

২৯৬ হিজরী ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে রাজনৈতিক সংকট, খলিফা মুকতাদির বিল্লাহকে অপসারিত করে আবদুল্লাহ বিন মুতায়কে সিংহাসনে বসানোর ব্যর্থ চেষ্টা.....
- আফ্রিকার আমির যিয়াদাতুল্লাহ বিন আগলাব বনু উবাইদের মোকাবিলায় পলায়ন করে মিশরে পৌঁছে যান.....

২৯৭ হিজরী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ

- লাইস বিন আলী সাফহারীর পারস্য দখল.....
- লাইস বিন আলীর পরাজয় ও মৃত্যু.....
- মুহাম্মদ বিন সালেমের ইন্তেকাল, যিনি সাহল বিন আবদুল্লাহ তুস্তারি রহ.-এর শিষ্য ছিলেন.....

২৯৮ হিজরী ৯১০ খ্রিষ্টাব্দ

- প্রখ্যাত সুফী বুজুর্গ আবু উসমান হাইরী রহ.-এর ইন্তেকাল.....

২৯৯ হিজরী ৯১১ খ্রিষ্টাব্দ

- নাছবিদ মুহাম্মদ বিন কায়সানের ইন্তেকাল, যিনি সা'লাব ও মুবাররাদের ছাত্র ছিলেন.....
- কায়রোয়ান (তিউনিসিয়া)-এ ভয়াবহ ভূমিকম্প

৩০০ হিজরী ৯১২ খ্রিষ্টাব্দ

- আন্দালুসের আমির আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ উমাবীর ইন্তেকাল, শাসনকাল ২৫ বছর.....
রবিউস সানি (নভেম্বর ৯১২ খ্রিষ্টাব্দ)
- নাস্তিক দার্শনিক রাওয়ান্দি-র মৃত্যু। নাস্তিক্যবাদ বিষয়ক তার রচনাবলী: নাতুল হিকমাহ, কযীবুয যাহাব, কিতাবুয যুমুররুদ.....

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ হিজরি শতাব্দী

৩০১ হিজরি ৯১৩-৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ

- মনসুর হাল্লাজের গ্রেফতারি
- কারামিতা নেতা আবু সাঈদ জানাবীর মৃত্যু
- মাওরাউনহারের আমির আবু নসর আহমদ সামানীর হত্যাকাণ্ড ২৩ জুমাদিউল আখিরা (২৩ জানুয়ারি ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৩০২ হিজরি ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ

- ইবনে জারীর তাবারী রহ. তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ সমাপ্ত করেন
- তারসুসের শাসক বিশর খাদেমের রোমান ভূখণ্ডে অতর্কিত আক্রমণ

৩০৩ হিজরি ৯১৫-৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাম নাসায়ী রহ.-এর ইন্তেকাল শাবান (ফেব্রুয়ারি ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- আল-জাজিরার সীমান্তে রোমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ
- বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড

- শায়খুল মুতাজিলা আবু আলী জুবায়ীর ইন্তেকাল

৩০৪ হিজরি ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ

- রামলা (সিরিয়া)-তে আগলাবি রাজবংশের নির্বাসিত শেষ শাসক যিয়াদাতুল্লাহর ইন্তেকাল
- বাগদাদে অদ্ভুত আকৃতির মানুষখেকো পশুর আতঙ্ক

৩০৫ হিজরি ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ

- আব্বাসীয় খিলাফত ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সন্ধি, রোমান দূতের বাগদাদে আগমন ও অভ্যর্থনা

৩০৬ হিজরি ৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে খলিফা মুকতাদিরের মায়ের পক্ষ থেকে নতুন হাসপাতালের উদ্বোধন ১লা মহররম (১৩ জুন ৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর বনু উবাইদের দখল

৩০৭ হিজরি ৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে অগ্নিকাণ্ড, ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সফর (জুলাই ৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

- বসরায় কারামাতিদের আক্রমণ, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড.....

৩০৮ হিজরী..... ৯২০ খ্রিষ্টাব্দ

- মিশরে বনু উবাইদের আধিপত্য, কায়রো দখল.....
- ইরাকে গ্রীষ্মকালে তীব্র শীত ও তুষারপাত..... মহররম (জুন ৯২০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩০৯ হিজরী..... ৯২১ খ্রিষ্টাব্দ - ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ

- মনসুর হাল্লাজের হত্যাকাণ্ড..... ২৪ জিলকদ (২৫ মার্চ ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ)

৩১০ হিজরী..... ৯২২ খ্রিষ্টাব্দ - ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ

- ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক-এর লেখক, বয়স ৯২ বছর..... ২৮ রমজান (১৯ জানুয়ারি ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ (রহ.)-এর ইন্তেকাল, মুফাসসির, নাহবী.....
- আবু বকর খাল্লাল হাসলী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, আস-সুন্নাহ ও আল-জামি লি-মাসায়িল আহমাদ-এর লেখক.....

৩১১ হিজরী..... ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ

- আবু তাহের কারামাতির বসরায় আক্রমণ, সাধারণ মানুষের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড.....
- বিখ্যাত চিকিৎসক মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর-রাজীর ইন্তেকাল.....

৩১২ হিজরী..... ৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ

- হাজীদের ফেরার পথে কাফেলার ওপর আবু তাহের কারামাতির আক্রমণ..... মহররম (এপ্রিল ৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৩১৩ হিজরী..... ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ

- সিসিলির শাসক সালিম বিন রশিদের জিহাদী অভিযান, ফিরিঙ্গিদের বেশ কিছু দুর্গ বিজয়.....
- রোমান সম্রাটের ইসলামী সীমান্ত জনপদগুলোতে হুমকি, এলাকা খালি করার নির্দেশ.....

৩১৪ হিজরী..... ৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ

- এশিয়া মাইনরে রোমানদের আক্রমণ, মালাতিয়া দখল এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড.....
- কারামাতিদের অবরোধ, ইরাকী হাজীদের পথ রুদ্ধ.....

৩১৫ হিজরী..... ৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ

- রোমানদের সুমাইসাত দখল, মসজিদগুলোকে গির্জায় রূপান্তর.....
- কুফায় কারামাতিদের আক্রমণ, যুদ্ধে আব্বাসী সেনাপতি নিহত, বাগদাদ বিপন্ন.....
- বাগদাদে শতাধিক নারী হত্যার অপরাধে নাজবীকে মৃত্যুদণ্ড..... জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

৩১৬ হিজরী..... ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ

- সিরিয়ার শহরসমূহ: রাহবা ও রাঙ্কায় কারামাতিদের দখল.....

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

৩১৭ হিজরি ৯২৯ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর জোরপূর্বক অপসারণ - কাহির বিল্লাহর সাময়িক খিলাফত
- সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ এবং মুকতাদির বিল্লাহর পুনরায় সিংহাসন আরোহণ.....
- মক্কার ওপর কারমাতিদের আক্রমণ - ৭০০ হাজি হত্যা - আক্রমণকারীরা হাজারে আসওয়াদ উপড়ে বাহরাইন নিয়ে যায়

৩১৮ হিজরি ৯৩০ খ্রিস্টাব্দ

- বেতন না পাওয়ায় বাগদাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দফায় দফায় প্রতিবাদ, খলিফা মুকতাদির কর্তৃক আশ্বাসের পর প্রতিবাদ শেষ.....
- আহমদ বিন ইসহাক তনুখী রহ.-এর মৃত্যু, হানাফি ফকিহ, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ.....

৩১৯ হিজরি ৯৩১ খ্রিস্টাব্দ

- ইরানে দাইলামি শিয়া প্রধান মারদাভিজের দখল.....

৩২০ হিজরি ৯৩২ খ্রিস্টাব্দ

- আব্বাসীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে ইরান ও খোরাসানে বুয়াইহি সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান.....
- খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড, খিলাফতের মেয়াদ ২৫ বছর..... ২৭ শাওয়াল (১১ নভেম্বর ৯৩২ খ্রি.)
- খিলাফত আল-কাহির আব্বাসি
- ইমাম বুখারি রহ.-এর বিশেষ ছাত্র, সহিহ বুখারির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ফারাবরি রহ.-এর মৃত্যু.....

৩২১ হিজরি ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ

- ইমাম তহাবি রহ.-এর মৃত্যু..... জিলকদ (নভেম্বর ৯৩৩ খ্রি.)

- আবু হাশিম জুব্বায়ী শায়খুল মুতাজিলা.....

৩২২ হিজরি ৯৩৩-৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ

- মুহাম্মদ বিন বুয়াইহির দাইলামি সরদার মারদাভিজের অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বুয়াইহি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা.....
- ভণ্ড মাহদি, বনু উবাইদ ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ বিন মায়মুন নিহত..... রবিউল আউয়াল (মার্চ ৯৩৪ খ্রি.)
- খলিফা কাহির বিল্লাহর অপসারণ..... ৬ জমাদিউল আখিরা (৩ জুন ৯৩৪ খ্রি.)
- খিলাফত রাজি বিল্লাহ আব্বাসি
- দাইলামি শাসক মারদাভিজের মৃত্যু.....
- হযরত আবু আলী রুদবারি রহ.-এর মৃত্যু, হযরত জুনাইদ বাগদাদি রহ.-এর খলিফা.....

৩২৩ হিজরি ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ

- আবু তাহের কারমাতি ইরাকি হাজিদের পথে বাধা সৃষ্টি করে, হাজিদের প্রত্যাবর্তন.....

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- বাগদাদ - হাম্বলী ও শাফেয়ী দলগুলোর মধ্যে উত্তেজনা...
- ৩২৩ হিজরি ৯৩৫ - ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
- ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী রহ.-এর ইন্তেকাল...
- আবু বকর নিশাপুরী রহ.-এর ইন্তেকাল, শাফেয়ী ফকিহ... রবিউল আউয়াল (ফেব্রুয়ারি ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)
- ৩২৫ হিজরি ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
- মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধ, ইরাক ও সিরিয়ার আমিরদের মধ্যে সংঘাত...
- আবুল হুসাইন খাররাজ নাহবী রহ.-এর ইন্তেকাল, মুবাররাদ ও সা'লাবের ছাত্র... রবিউল আউয়াল (জানুয়ারি ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)
- ৩২৬ হিজরি ৯৩৭ - ৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
- মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে ৬ হাজার ৩০০ বন্দি বিনিময়... জিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)
- বাগদাদে বাজকাম দাইলামীর আধিপত্য...
- ৩২৭ হিজরি ৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
- কারামিতা কর প্রদানের বিনিময়ে হাজীদের জন্য পথ খুলে দিতে সম্মত...
- জারহ ও তাদীল-এর ইমাম ইবনে আবি হাতিম আর-রাজী-এর ইন্তেকাল, “আল-জারহ ওয়াত তাদীল”-এর লেখক...
- ৩২৮ হিজরি ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
- ইবনে আবদে রাবিহি আল-আন্দালুসী রহ.-এর ইন্তেকাল, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, “আল-ইকদুল ফারিদ”-এর লেখক - বয়স ৮০ বছর...
- আবু বকর আল-আনবারী রহ.-এর ইন্তেকাল, নাহবী (ব্যাকরণবিদ), সাহিত্যিক, আরবি অভিধান বিশেষজ্ঞ...
- ইবনে মুকলা রহ.-এর ইন্তেকাল, লিপিকার, আব্বাসীয় রাষ্ট্রের উজির, কুফি লিপির পরিবর্তে নাসখ লিপি উদ্ভাবন ও প্রচলিত করেন।
- ৩২৯ হিজরি ৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
- খলিফা রাযী বিল্লাহ-এর ইন্তেকাল... ১৫ রবিউল আউয়াল, বয়স ৩১ বছর (৩০ ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)
- মুত্তাকী আব্বাসীর খিলাফত
- ৩৩০ হিজরি ৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
- বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর হস্তক্ষেপের সূচনা...
- ৩৩১ হিজরি ৯৪২ - ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
- বাগদাদে বনু হামদানের আধিপত্য, বাজকাম দাইলামী কারাবরণ ও অন্ধ করে দেওয়ার পর নিহত...
- বাগদাদে তুর্কি আমির তুযুন-এর আধিপত্য...
- মধ্য এশিয়ার আমির নসর বিন আহমদ সামানীর ইন্তেকাল... রজব (মার্চ ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

৩৩২ হিজরী ৯৪৩-৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

- রোম সম্রাটের প্রস্তাব অনুযায়ী ঈসা (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত রুমালের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি
- সিনান বিন সাবিত, ওস্তাদুল আতিব্বা-এর মৃত্যু ১ জিলকদ (২৫ জুন ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৩৩৩ হিজরী ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

- ইরাক ও সিরিয়ার আমিরদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ
- বনু হামদান এবং মিশরের ইখশিদী শাসকের মধ্যে উত্তেজনা, সীমান্ত সংঘর্ষ
- খলিফা মুত্তাকীর জোরপূর্বক অপসারণ ২০ সফর (৭ অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
- খিলাফতে মুত্তাকফী আব্বাসী
- আফ্রিকায় বনু উবাইদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আবু ইয়াজিদদের পরাজয়
- আবু আল-আরব তামিমি (রহ.), ‘মিহান’ ও ‘তাবাকাত উলামায়ে আফ্রিকা’-এর লেখকের মৃত্যু

৩৩৪ হিজরী ৯৪৫-৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে বনু বুওয়াইহ শাসনের সূচনা ১১ জমাদিউল আউয়াল (৩১ ডিসেম্বর ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)
- মুত্তাকফীর জোরপূর্বক অপসারণ ২২ জমাদিউস সানি (৯ ফেব্রুয়ারি ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- খিলাফতে মুত্তাকফী আব্বাসী
- মিশরের ইখশিদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন তুগজ-এর মৃত্যু জিলহজ (জুলাই ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- মহান সুফি বুজুর্গ আবু বকর শিবলী বাগদাদী (রহ.)-এর মৃত্যু

৩৩৫ হিজরী ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ

- আবু বকর আস-সুলি, ব্যাকরণবিদ, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, মুবাররাদ ও সা’লাবের ছাত্র-এর মৃত্যু
- সাইফুদ্দৌলা এবং রোমানদের মধ্যে ২৪৮২ জন বন্দী বিনিময়
- বুওয়াইহী এবং বনু হামদানের মধ্যে সন্ধি

৩৩৬ হিজরী ৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ

- মুইজ্জুদ্দৌলা বুওয়াইহীর বসরা দখল
- রুকনুদ্দৌলা বুওয়াইহীর জুরজান ও তাবারিস্তান দখল

৩৩৭ হিজরী ৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে বন্যা, ভয়াবহ ধ্বংসলীলা
- বনু হামদানের বুওয়াইহীদের কাছে পরাজয়, মুসলে বুওয়াইহী দখলদার

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

৩৩৮ হিজরী ৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ

- রুমীদের মোকাবিলায় সাইফুদ দৌলার পরাজয়, রুমীদের মারআশ দখল...
- খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহর মৃত্যু...
- বনু বুওয়াইহ-এর প্রতিষ্ঠাতা আলী বিন বুওয়াইহ-এর মৃত্যু, বয়স ৫৩ বছর।
- আবু জাফর আন-নাহহাস, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ-এর মৃত্যু...

৩৩৯ হিজরী ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ

- হাজরে আসওয়াদ ফেরত আনা, কাবায় পুনরায় স্থাপন...
- রুমীদের সাথে সাইফুদ দৌলার যুদ্ধ - শুরুতে বিজয় - শেষে শোচনীয় পরাজয়...
- পদচ্যুত খলিফা মুত্তাকি বিল্লাহর কারাগারে মৃত্যু...
- দার্শনিক আবু নসর আল-ফারাবির মৃত্যু, বয়স ৮০ বছর।

৩৪০ হিজরী ৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ

- সাইফুদ দৌলার রোমান ভূখণ্ডে আক্রমণ ও বিজয়...
- আন্দালুসের মুহাদিস কাসিম বিন আসবাগ-এর মৃত্যু...
- ইরাকে হানাফিদের শায়খ আবুল হাসান কারখি (রহ.)-এর মৃত্যু...

৩৪১ হিজরী ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

- রুমীদের সারুজ দখল...
- সিসিলিতে রুমীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের চমৎকার বিজয়...

৩৪২ হিজরী ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ

- রুমীদের বিরুদ্ধে সাইফুদ দৌলার বিজয়...

৩৪৩ হিজরী ৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

- রুমীদের আক্রমণ - সাইফুদ দৌলার সফল প্রতিরক্ষা...

৩৪৪ হিজরী ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

- রে শহরে মহামারী, বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু...
- বনু উবায়দ ও আন্দালুসের নৌবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ...

৩৪৫ হিজরী ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

- রুমীদের তারসুস দখল...

ঐতিহাসিক মাসউদী-র মৃত্যু ৩৪৬ হিজরী ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

দুর্ভিক্ষ, আসমানী দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ৩৪৭ হিজরী ৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

রোমানদের আগমন, মিয়াফারকিন ও কিননাসরিন আক্রমণ - মুসলিমরা প্রতিরক্ষায় অক্ষম
আবুল হাসান শারানী নিশাপুরী রহ.-এর মৃত্যু ৩৪৮ হিজরী ৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ

রোমানদের রাহা, হাররান ও দিয়ার বকর আক্রমণ ও লুটতরাজ ৩৪৯ হিজরী ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ

সাইফুদ দৌলার গোলাম নাজা-র রোমানদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান

সাইফুদ দৌলার রোমান ভূখণ্ডে সৈন্য পরিচালনা এবং পরাজয়ের পর পিছু হটা
বাগদাদে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ

তুর্কিস্তানে দলে দলে গোত্রগুলোর ইসলাম গ্রহণ ৩৫০ হিজরী ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ

বাগদাদে বনু বুওয়াইহ কর্তৃক জাঁকজমকপূর্ণ “দারুস সুলতানাত” নির্মাণ

আন্দালুসের প্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের মৃত্যু ৩৫১ হিজরী
..... ৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

রোমান ডমেস্টিকাসের বড় আক্রমণ - হালাব দখল - মুসলিমদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড
৩৫২ হিজরী ৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাগদাদে আশুরার মাতম ও তাজিয়া পালনের সূচনা

বাগদাদে ঈদে গাদীরের প্রথা শুরু

কায়সার নাইকিফোরাস নিজের স্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত ৩৫৩ হিজরী
..... ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

রোমান ডমেস্টিকাসের মাসিসা ও তারসুস আক্রমণ ৩৫৪ হিজরী ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ
এশিয়া মাইনরে রোমানদের নতুন সামরিক শহর কায়সারিয়া নির্মাণ

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

.

দামেস্কের মাসিসায় গণহত্যা - জামে মসজিদ আস্তাবলে রূপান্তর.....

.

কবি মুতানাবির মৃত্যু.....

.

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর মৃত্যু, সহীহ ইবনে হিব্বান ও আস-সিরাত আন-নাবাবিয়াহ-এর লেখক.....

৩৫৫ হিজরি..... ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

.

আমেদের ওপর রোমানদের আক্রমণ

.

সাইফুদ দৌলা এবং রোমানদের মধ্যে বন্দি বিনিময়, সাইফুদ দৌলার চাচাতো ভাই আবু ফিরাস উদ্ধার.....

৩৫৬ হিজরি..... ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

.

বাগদাদের সুলতান আহমদ বিন বুওয়াইহ-এর মৃত্যু.....

.

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানি-এর মৃত্যু - আল-আগানি-এর লেখক.....

.

হালবের শাসক আলী বিন আবদুল্লাহ সাইফুদ দৌলা-এর মৃত্যু..... সফর (জানুয়ারি ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

.

মিশরের শাসক কাফুর আল-ইখশিদি-এর মৃত্যু

৩৫৭ হিজরি..... ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

.

সাবেক আব্বাসীয় খলিফা মুতাকির কারাগারে ইন্তেকাল.....

৩৫৮ হিজরি..... ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

.

সাইফুদ দৌলার ভাই ও মসুলের শাসক নাসিরুদ দৌলা-এর মৃত্যু.....

৩৫৯ হিজরি..... ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

.

আন্তাকিয়ার ওপর রোমানদের দখল.....

.

রোমান সম্রাট নিকেফোরোস (নাকফুর) নিহত.....

৩৬০ হিজরি..... ৯৭০ খ্রিস্টাব্দ - ৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

.

আশ-শরীয়াহ-এর লেখক আবু বকর আল-আজুরি (রহ.)-এর মৃত্যু..... মহররম (নভেম্বর ৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

.

মুজামুল কাবীর, আওসাত ও সাগীর-এর লেখক আবুল কাসিম তাবারানি (রহ.)-এর মৃত্যু, বয়স ১০০ বছর..... জিলকদ (সেপ্টেম্বর ৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)

.

খলিফা মুতির ওপর পক্ষাঘাতের আক্রমণ.....

৩৬১ হিজরি..... ৯৭১ খ্রিস্টাব্দ

.

কর্ডোভার মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন হারিস আল-খুশানি (রহ.)-এর মৃত্যু.....

৩৬২ হিজরি..... ৯৭২ খ্রিস্টাব্দ - ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ

.

রোমানদের দ্বারা নাসিবিন লুণ্ঠন ও গণহত্যা.....

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

- নাস্তিক কবি ইবনে হানির মৃত্যু
- বাগদাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড রমজান (জুন ৯৭৪ খ্রি.)
- ৩৬৩ হিজরি ৯৭৩-৯৭৪ খ্রি.
- হারামাঈনের ওপর বনু উবাইদের আধিপত্য - উবাইদি ইমামদের খুতবা শুরু
- ফকিহ আবু বকর নাবুলসি রহ.-এর শাহাদাত
- বনু উবাইদের প্রধান বিচারপতি নুমান বিন মুহাম্মদের মৃত্যু
- খলিফা মুতি-এর পদত্যাগ ১৩ জিলকদ (৭ আগস্ট ৯৭৪ খ্রি.)
- খলিফা তাই-এর সিংহাসন আরোহণ
- ৩৬৪ হিজরি ৯৭৪ খ্রি.
- প্রাক্তন আব্বাসীয় খলিফা মুতি-এর ইন্তেকাল বয়স ৬৩ বছর... মররম (অক্টোবর ৯৭৪ খ্রি.)
- বাগদাদে বনু বুওয়াইহ-এর অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ - পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত খিলাফত ছিনতাই - খলিফা অসহায়
- আদুদ দাওলা বুওয়াইহি বাগদাদের সুলতান নিযুক্ত
- ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’-এর লেখক আবু বকর ইবনে সুন্নি রহ.-এর ইন্তেকাল ৩০ জিলহজ (৯ সেপ্টেম্বর ৯৭৬ খ্রি.)
- ৩৬৫ হিজরি ৯৭৫ খ্রি.
- বনু বুওয়াইহ-এর মধ্যে অঞ্চলসমূহ বণ্টন
- ‘আল-কামিল ফিদ দুয়াফা’-এর লেখক আল্লামা ইবনে আদি জুরজানি রহ.-এর ইন্তেকাল
- মধ্য এশিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কাফফাল শাশী আল-কাবীর রহ.-এর ইন্তেকাল
- ৩৬৬ হিজরি ৯৭৬ খ্রি.
- জামিলা বিনতে নাসিরুদ্দৌলার হজ
- কারামাতি শাসক হাসান বিন আহমদের মৃত্যু
- বুওয়াইহি প্রধান হাসান বিন বুওয়াইহ (রুকনুদ্দৌলা) ২৫ বছরের শাসনের পর ইন্তেকাল করেন বয়স ৮০ বছরের বেশি
- আন্দালুসের আমির আল-হাকাম সানি মুস্তানসির বিল্লাহ বিন আবদুর রহমান আন-নাসিরের ইন্তেকাল বয়স ৬৩ বছর, শাসনকাল ১৬ বছর
- ৩৬৭ হিজরি ৯৭৭ খ্রি.
- ক্ষমতাচ্যুত বুওয়াইহি শাসক বখতিয়ার ইজ্জুদ্দৌলা নিহত
- মসুলের ওপর আদুদ দাওলার আধিপত্য, বনু হামদান বিতাড়িত
- ৩৬৮ হিজরি ৯৭৮ খ্রি.
- কিরাত, নাহ ও আরবি অভিধানের ইমাম হাসান বিন আবদুল্লাহ সিরারির ইন্তেকাল

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- বাগদাদী আমীর হাশতাগীন তুর্কি বনু উবাইদের সাথে যুদ্ধে নিহত ৩৬৯ হিজরী
৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
- বনু হামদানের শেষ শাসক গজনফর নিহত
- আবু সাহল সা'লুকী রহ.-এর মৃত্যু, নিশাপুরের ফকিহ ৩৭০ হিজরী ৯৮০-৯৮১
খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদে আহনাফদের শিরোমণি আবু বকর জাসসাস আর-রাযী রহ.-এর মৃত্যু। বয়স
৬৫ বছর যিলহজ (জুন ৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ) ৩৭১ হিজরী ৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদের দূত আবু বকর ইবনে বাকিল্লানী রহ. কর্তৃক রোম সম্রাটের দরবারে সত্য ভাষণ
..... ৩৭২ হিজরী ৯৮২-৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদ ও ইরাকের শাসক আযুদুদৌলার মৃত্যু শাওয়াল (এপ্রিল ৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
..... ৩৭৩ হিজরী ৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদে সামসামুদৌলার শাসন বাগদাদে দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি
৩৭৪ হিজরী ৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
- হাফিযুল হাদীস আবুল ফাতহ মাওসিলী রহ.-এর মৃত্যু ৩৭৫ হিজরী ৯৮৫
খ্রিষ্টাব্দ
- রোম সম্রাট ও রাশিয়ার রাজার মধ্যে ঐক্য
- রাশিয়ায় খ্রিষ্টধর্মের সূচনা। রাশিয়ার রাজা রোম সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য
খ্রিষ্টান হয়ে যান ৩৭৬ হিজরী ৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদে শরফুদৌলা বুয়াইহীর আধিপত্য, সামসামুদৌলা নিহত ৩৭৭ হিজরী
৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ
- বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবু আলী ফারিসীর মৃত্যু ৩৭৮ হিজরী ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
- বাগদাদে মানমন্দির স্থাপন
- সূফী আবদুল্লাহ বিন আলী আত-তুসী রহ.-এর মৃত্যু, 'আল-লুমআ ফিত তাসাউফ'-এর
লেখক
- মুস্তাদরাক-এর লেখক হাকেম নিশাপুরী রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৯৩ বছর রবিউল
আউয়াল (জুলাই ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- আন্দালুসের প্রখ্যাত মুহাদিস আল্লামা ইবনে বাজি আল-ইশবিলী রহ.-এর মৃত্যু
রমজান (ডিসেম্বর ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩৭৯ হিজরি ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদে চরম অরাজকতা, গুন্ডা ও ডাকাতদের রাজত্ব
- বাগদাদের শাসক শরফ উদ-দৌলার মৃত্যু

৩৮০ হিজরি ৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

- মিসরের ইহুদি উজির ইয়াকুব বিন কিলিসের মৃত্যু

৩৮১ হিজরি ৯৯১ - ৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা তায়ি'কে জোরপূর্বক পদচ্যুত করা হয় ৯ শাবান ৩৮১ হিজরি (২ নভেম্বর ৯৯১ খ্রিস্টাব্দ)
- খলিফা আল-কাদির সিংহাসনে আরোহণ করেন
- 'মুসনাদ আল-মুয়াত্তা'-এর লেখক আবুল কাসিম আল-জাওহারি আল-মিসরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল রমজান (ডিসেম্বর ৯৯১ খ্রিস্টাব্দ)
- ইমামুল কুররা এবং 'আল-গায়াহ ফিল কিরাআত'-এর লেখক আবু বকর আসবাহানি নিশাপুরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল শাওয়াল (জানুয়ারি ৯৯২ খ্রিস্টাব্দ)

৩৮২ হিজরি ৯৯২ - ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদের প্রশাসক ইবনে মুয়াল্লিম কুহির হত্যাকাণ্ড
- ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আবু আহমদ আসকারি (রহ.)-এর ইন্তেকাল জিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ)

৩৮৩ হিজরি ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা কাদির বিল্লাহর সাথে বাহাউদ-দৌলা বুওয়াইহির কন্যার বিবাহ
- বাগদাদের উজির আবু নাসরের আদেশে কারখ মহল্লায় 'দারুল ইলম' নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

৩৮৪ হিজরি ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

- বনু বুওয়াইহির লেখক নাস্তিক কবি ইব্রাহিম বিন হিলাল সাবির মৃত্যু

৩৮৫ হিজরি ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

- ইমাম দারাকুতনি (রহ.)-এর ইন্তেকাল
- আল্লামা ইবনে শাহীন (রহ.)-এর ইন্তেকাল

৩৮৬ হিজরি ৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

- 'কুতুল কুলুব'-এর লেখক আবু তালিব মক্কি আস-সুফি (রহ.)-এর ইন্তেকাল

৩৮৭ হিজরি ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

- রে-এর শাসক ফখরুদ-দৌলা বুওয়াইহির মৃত্যু

৩৮৮ হিজরি ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

- 'মাআলিমুস সুনান' ও 'গারিবুল হাদিস'-এর লেখক আবু সুলাইমান খাত্তাবি (রহ.)-এর ইন্তেকাল

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৩৮৯ হিজরী ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বনু উবাইদের কাযীউল কুযাত মুহাম্মদ বিন নুমানের মৃত্যু.....

৩৯০ হিজরী ৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

- মুহাম্মদ বিন উমর বিন ইয়াহইয়া হাসানী যায়েদীর মৃত্যু.....

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে প্রথম আক্রমণ.....

৩৯১ হিজরী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে তুর্কি ও কারখের শিয়াদের মধ্যে লড়াই, আহলে সুন্নাত তুর্কিদের সাথে.....

- কাযী আবুল হাসান আল-জাওযী (রহ.)-এর মৃত্যু, জাহেরী মাযহাবের শায়খ.....

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে দ্বিতীয় আক্রমণ.....

৩৯২ হিজরী ১০০১ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে চোর-ডাকাতদের রাজত্ব, বিশৃঙ্খলার অবসান.....

- বাগদাদ আমীদুল জিউশ আবু আলী আল-হুসাইনের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হলো.....

৩৯৩ হিজরী ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে শোক মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা, শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল

- সাবেক খলিফা তায়ি'-এর মৃত্যু, বয়স ৭৩ বছর..... ২৯ রমজান (১৩ আগস্ট ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- ইসমাইল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারীর মৃত্যু, ভাষাবিদ, 'সিহাহ'র রচয়িতা.....

- মনসুর হাজিব মুহাম্মদ বিন আবি আমেরের মৃত্যু, আন্দালুসের নায়েবে আমীর

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর সিজিস্তান দখল

৩৯৪ হিজরী ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে ধর্মীয় বিষয়াবলির (বিচার বিভাগ, হজ) মন্ত্রণালয় আবু আহমদ মুসাভী (শরীফ রাযীর পিতা)-এর ওপর ন্যস্ত.....

৩৯৫ হিজরী ১০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

- আফ্রিকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, দৈনিক পাঁচ থেকে সাতশ লোক মৃত্যুবরণ করে.....

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে তৃতীয় আক্রমণ.....

৩৯৬ হিজরী ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে চতুর্থ আক্রমণ

- মাহমুদ গজনভীর মুলতান দখল

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

নবম খণ্ড

৩৯৭ হিজরি ১০০৬ খ্রিস্টাব্দ

- আফ্রিকায় ইবনে রুকওয়াহ উমাবীর বিদ্রোহ ও হত্যা
- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে পঞ্চম আক্রমণ

৩৯৮ হিজরি ১০০৭ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদে শিয়াদের দাঙ্গা
- ইরানে ভূমিকম্প
- আল-হাকিম উবাইদীর আদেশে বাইতুল মুকাদ্দাসের সবচেয়ে বড় গির্জা ধ্বংস
- বদিউজ্জামান আহমদ বিন হাসান আল-হামাদানী (রহ.)-এর মৃত্যু, মাকামাত-এর লেখক
- আবুল ফারাজ আল-বাবাগা-এর মৃত্যু, সাইফুদ দৌলার প্রশংসাকারী কবি

৩৯৯ হিজরি ১০০৮ খ্রিস্টাব্দ

- আবুল আব্বাস আন-নামীর মৃত্যু, সাইফুদ দৌলার প্রশংসাকারী কবি, মুতানাব্বীর প্রতিদ্বন্দ্বী
- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে ষষ্ঠ আক্রমণ—উত্তর হিন্দুস্তানে নগরকোট বিজয়

৪০০ হিজরি ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ

- আল-হাকিম উবাইদীর আদেশে কায়রোতে জামে মসজিদের নির্মাণ
- সুলতান মাহমুদ গজনভীর হিন্দুস্তানে সপ্তম আক্রমণ—মধ্য হিন্দুস্তানের নারান রাজ্য বিজয়

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী

৪০১ হি..... ১০১০ খ্রি.

- ইরাকের শহরগুলোতেও উবায়দী শাসকদের খুতবা শুরু...
- বাগদাদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জামিনদার আমির আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবি আল-হাইজা-এর মৃত্যু...
- মাহমুদ গজনভীর অষ্টম আক্রমণ। মুলতানে বিপুল সংখ্যক কারামাতি তলোয়ারের শিকার। কারামাতি নেতা আবুল ফাতাহ গ্রেফতার।

৪০২ হি..... ১০১১ খ্রি.

- বাগদাদের নতুন নাযিম ফখরুল মুলকের তত্ত্বাবধানে শোক মিছিল পুনরায় শুরু...
- সুলতান মাহমুদ গজনভীর নবম ভারত আক্রমণ। মধ্য ভারতের থানেশ্বর বিজয়।

৪০৩ হি..... ১০১২ খ্রি. - ১০১৩ খ্রি.

- ইরাক-আরব সীমান্তে পনের হাজার খারেজি ডাকাতে হাতে প্রাণহানি...
- শায়খুল হানাবিলা হাসান বিন হামিদ বাগদাদী (রহ.) হজ্জ কাফেলায় নিখোঁজ...
- বাহাউদ্দৌলা দাইলামীর মৃত্যু...
- ইমাম আবু বকর ইবনুল বাকিল্লানী (রহ.)-এর মৃত্যু... জিলকদ (জুন ১০১৩ খ্রি.)।
- আবুল ওয়ালিদ ইবনুল ফারযী আন্দালুসী (রহ.)-এর মৃত্যু, ‘তারিখে আন্দালুস’-এর লেখক।
- মাহমুদ গজনভীর প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কি সর্দার ইলিক খানের মৃত্যু।

৪০৪ হি..... ১০১৩ খ্রি.

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর দশম ভারত আক্রমণ। পিন্ড দাদন খান এবং কাশ্মীর বিজয়।

৪০৫ হি..... ১০১৪ খ্রি.

- হাকিম উবায়দীর পক্ষ থেকে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা।
- বাগদাদের প্রধান বিচারপতি (কাযিউল কুযাত) আবু মুহাম্মদ আল-আকফানী (রহ.)-এর মৃত্যু, বয়স ৮৯ বছর...
- সুলতান মাহমুদ গজনভীর একাদশ ভারত আক্রমণ। তুষারপাতের কারণে কাশ্মীরে ব্যাপক জানমালের ক্ষতির পর প্রত্যাবর্তন...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৩৯৬ হিজরি ১০০৫ খ্রিস্টাব্দ

- আবু হামিদ আসফারাইনি (রহ.)-এর মৃত্যু, শাফেয়ী মাযহাবের শায়খ
- মক্কার শাসক য়ায়েদ বিন মনসুরের মৃত্যু, আফ্রিকা
- সাইয়েদ আশ-শরীফ আর-রাযী-এর মৃত্যু, শিয়াদের প্রধান, কবি ও সাহিত্যিক
- মুহাদিস আবু বকর ইবনে ফুরাক আল-ইসফাহানি-এর মৃত্যু, ইসলামের মুতাকাল্লিম

৩৯৭ হিজরি ১০০৬ খ্রিস্টাব্দ

- ওয়াসিতে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা
- কাবার রুকনে ইয়ামানি ভেঙে যাওয়া
- রওজা আতহারের দেয়াল ধসে পড়া
- বাইতুল মুকাদাসের কুব্বাতুস সাখরা ধসে পড়া
- কারবালায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাজারে অগ্নিকাণ্ড
- বাগদাদের উজির ফখরুল মুলক বুয়াইহি শাসক সুলতানুদ দাওলার আদেশে নিহত
- সুলতান মাহমুদ গজনভি কর্তৃক খোয়ারিজম দখল - খোয়ারিজম শাহ আলতুন তাশ নিহত

৪০৮ হিজরি ১০১৭ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদে শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ, প্রচুর লোক নিহত
- খলিফা কাদির বিল্লাহর রাফেযি ও মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে ফরমান
- আন্দালুসে অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনের সূচনা

৪০৯ হিজরি ১০১৮ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান মাহমুদ গজনভির ভারতে দ্বাদশ অভিযান - গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা বিজয়

৪১০ হিজরি ১০১৯ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান মাহমুদ গজনভির ভারতে ত্রয়োদশ অভিযান - কালিঞ্জর বিজয়, ৫০ হাজার মূর্তিপূজারী নিহত, ২০ হাজার ইসলাম গ্রহণকারী
- অন্ধ আলেম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন সালামাহ আল-বাগদাদি (রহ.)-এর মৃত্যু, “আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ”-এর লেখক

৪১১ হিজরি ১০২০ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদে দুর্ভিক্ষ - আল-হাকিম উবাইদির রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

৪১২ হিজরি ১০২১ খ্রিস্টাব্দ

- মাহমুদ গজনভির চতুর্দশ অভিযান, উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল বিজয়

তারিখ-এ উম্মত-এ মুসলিমা

ইসমাইলি শিয়াদের হাতে হাজারে আসওয়াদের অবমাননা ও ভাঙচুর ৪১৩ হিজরি / ১০২২ খ্রিস্টাব্দ

শিরাজ-এ সুলতান আদ-দৌলা বুওয়াইহির মৃত্যু ৪১৩ হিজরি / ১০২২ খ্রিস্টাব্দ

মুশাররিফ আদ-দৌলা বুওয়াইহির বাগদাদ আগমন ৪১৪ হিজরি / ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান মাহমুদ গজনভির পঞ্চদশ আক্রমণ। মধ্য ভারতে জিহাদ, গোয়ালিয়র বিজয় ৪১৪ হিজরি / ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান আদ-দৌলা বুওয়াইহির মৃত্যু, আবু কালিজার নতুন শাসক (শাওয়াল/নভেম্বর ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ) ৪১৫ হিজরি / ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ইবনে দাকীক নাহভির মৃত্যু ৪১৫ হিজরি / ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ইবনে সামসি আদিবের মৃত্যু ৪১৫ হিজরি / ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান মাহমুদ গজনভির ষোড়শ আক্রমণ। সোমনাথ বিজয় ৪১৬ হিজরি / ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ

মুশাররিফ আদ-দৌলা বুওয়াইহির মৃত্যু; বাগদাদে গুণ্ডাদের রাজত্ব, চরম বিশৃঙ্খলা ৪১৬ হিজরি / ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে সেনাবাহিনী ও লুটেরাদের সংঘর্ষ। সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম ৪১৭ হিজরি / ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে জালাল আদ-দৌলা বুওয়াইহির শাসন ৪১৮ হিজরি / ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ

আবু ইসহাক আসফারাইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যু, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, বয়স ৮০ বছর (১০ মহরম/২০ ফেব্রুয়ারি ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ) ৪১৮ হিজরি / ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান মাহমুদ গজনভির সপ্তদশ আক্রমণ। পাঞ্জাবে জাঠদের দমন ৪১৮ হিজরি / ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ

জালাল আদ-দৌলা বুওয়াইহির বাগদাদের আমিরদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ৪১৯ হিজরি / ১০২৮ খ্রিস্টাব্দ

ইরাকে প্রবল তুষারপাত ও ঝড় ৪২০ হিজরি / ১০২৯ খ্রিস্টাব্দ

খলিফা কাদির বিল্লাহ রাফেজিদের খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করে সাধারণ সমাবেশে পাঠ করে শোনান ৪২০ হিজরি / ১০২৯ খ্রিস্টাব্দ

আশুরার মিছিলে বাগদাদে লড়াই, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ৪২১ হিজরি / ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

- সুলতান মাহমুদ গজনভীর মৃত্যু জমাদিউল আউয়াল (মে ১০৩০ খ্রি.)

- রোমানদের ব্যর্থ আক্রমণ

৪২২ হিজরী ১০৩০ খ্রি. - ১০৩১ খ্রি.

- খলিফা কাদির বিল্লাহর মৃত্যু ১১ জিলহজ (১৪ ডিসেম্বর ১০৩১ খ্রি.)

- আল-কায়েম বি-আমরিব্লাহ আব্বাসীর সিংহাসন আরোহণ

৪২৩ হিজরী ১০৩১ খ্রি.

- বাগদাদে জালালুদ্দৌলা বুয়াইহির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ, জালালুদ্দৌলার পলায়ন

- সুলতান মাসউদ বিন মাহমুদ গজনভীর ইসফাহান দখল

৪২৪ হিজরী ১০৩২ খ্রি.

- বাগদাদে শান্তি-শৃঙ্খলা বিলুপ্ত, লুটেরাদের রাজত্ব, পুলিশ প্রধান নিহত

৪২৫ হিজরী ১০৩৩ খ্রি.

- বাগদাদে মহামারী রোগে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু

- বাগদাদের লুটেরাদের সর্দার বুর্জি নিহত

৪২৬ হিজরী ১০৩৪ খ্রি.

- সুলতান মাসউদ বিন মাহমুদের হিন্দুস্তানে জিহাদ

- খুরাসানে গুয তুর্কিদের আধিপত্য

৪২৭ হিজরী ১০৩৫ খ্রি.

- নিজাম বসরীর মৃত্যু

- বাগদাদের শাসক জালালুদ্দৌলার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রতিবাদ, জালালুদ্দৌলা প্রথমে কারখ এবং পরে তিকরিত-এ আশ্রয় গ্রহণ

৪২৮ হিজরী ১০৩৬ খ্রি. - ১০৩৭ খ্রি.

- বাগদাদে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা, গুণ্ডাদের রাজত্ব

- আবুল হুসাইন আল-কুদুরী (রহ.)-এর মৃত্যু, ‘মুখতাসার আল-কুদুরী’-এর লেখক, বয়স ৬৬ বছর রজব (এপ্রিল ১০৩৭ খ্রি.)

- আবু আলী ইবনে সিনা, দক্ষ চিকিৎসক, বয়স ৫৩ বছর

- রাফেযী কবি মাহইয়ার বিন মারযওয়াইহ দাইলামীর মৃত্যু

৪২৯ হিজরী ১০৩৭ খ্রি.

- আল-কুদসে কিলিসায়ে কিয়ামাহ পুনর্নির্মাণের শর্তে মুস্তানসির উবাইদী এবং রোমান সম্রাটের মধ্যে সন্ধি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- সেলজুকদের উত্থান, সুলতান মাসউদ গজনভী মোকাবিলায় পিছু হটেছেন
- তুঘরিল বেগ সেলজুকির নিশাপুর দখল..... রমজান (জুন ১০৩৮ খ্রি.)
- আব্দুল কাহের তামিমি আল-বাগদাদী আবু মনসুর রহ.-এর ইন্তেকাল..... ‘আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক’-এর লেখক

৪৩০ হিজরি..... ১০৩৮ খ্রি.-১০৩৯ খ্রি.

- সেলজুক এবং সুলতান মাসউদ গজনভীর মধ্যে সংঘর্ষ, গজনভী সালতানাত দুর্বল.....
- বাগদাদে তীব্র শীত ও তুষারপাত..... ২৩ রবিউল আউয়াল (২১ জানুয়ারি ১০৩৯ খ্রি.)

৪৩১ হিজরি..... ১০৩৯ খ্রি.

- বাগদাদে তুর্কি সৈন্যদের জালালুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে
- আবু নসর বিন মিশকান-এর ইন্তেকাল, সুলতান সবুত্তাগিন ও মাহমুদ গজনভীর সচিব.....

৪৩২ হিজরি..... ১০৪০ খ্রি.

- সেলজুকদের খোরাসান দখল.....

৪৩৩ হিজরি..... ১০৪১ খ্রি.

- সুলতান মাসউদ বিন মাহমুদ গজনভী আমিরদের হাতে নিহত.....

৪৩৪ হিজরি..... ১০৪২ খ্রি.

- তাবরিজে ভূমিকম্প, ৪০ হাজার লোক নিহত.....

৪৩৫ হিজরি..... ১০৪৩ খ্রি.

- কর্ডোভার আমির জাহওয়ার বিন মুহাম্মদের ইন্তেকাল, বয়স ৮১ বছর..... মাহররম (আগস্ট ১০৪৩ খ্রি.)
- তুঘরিল বেগ সেলজুকির ‘রে’ শহর দখল.....
- জালালুদ্দৌলা বুয়াইহির মৃত্যু.....
- বাগদাদে খুতবায় জালালুদ্দৌলার ছেলে আল-মালিকুল আজিজ এবং আবু কালিজার বুয়াইহির নাম অন্তর্ভুক্ত.....

৪৩৬ হিজরি..... ১০৪৪ খ্রি.-১০৪৫ খ্রি.

- আবু আব্দুল্লাহ আস-সাইমারি আল-হানাফি রহ.-এর ইন্তেকাল, ইমাম আবু হানিফার জীবনী নিয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ “আখবারু আবি হানিফা”-এর লেখক, বয়স ৮৫ বছর..... শাওয়াল (মে ১০৪৫ খ্রি.)
- শরীফ মুর্তজার ইন্তেকাল, নাহজুল বালাগার লেখক, বয়স ৮১ বছর.....

৪৩৭ হিজরি..... ১০৪৫ খ্রি.

- বাগদাদে কারখ ও বাবুল বসরার অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ, বেশ কিছু লোক নিহত.....

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

ইরাকে মহামারী—বুয়াইহি শাসক আবু কালিজারের বারো হাজার ঘোড়া মারা যায়

৪৩৮ হিজরি / ১০৪৬-১০৪৭ খ্রিস্টাব্দ

আবু মুহাম্মদ আল-জুওয়াইনি (রহ.)-এর মৃত্যু, ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি (রহ.)-এর পিতা—জিলকদ (মে ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ৪৩৯ হিজরি / ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দ

ইরাকে বুয়াইহি শাসনের পতন ও বিশৃঙ্খলা; মিশরে বনু উবাইদের পতন ৪৪০ হিজরি / ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ

আবু কালিজার বুয়াইহির মৃত্যু; লিবিয়ার শাসক মুইজ বিন বাদিসের দরবারে বনু উবাইদের পরিবর্তে বনু আব্বাসের খুতবা শুরু ৪৪১ হিজরি / ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে শোক মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞার সরকারি ঘোষণার বিরুদ্ধে শিয়াদের প্রতিবাদ ও দাঙ্গা; সুলতান মওদুদ বিন মাসউদ গজনভীর মৃত্যু, শাসনকাল দশ বছর—রজব (ডিসেম্বর ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ৪৪২ হিজরি / ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে শিয়া ও সুন্নি দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা; আল-মালিকুল আজিজ বিন জালালুদ্দৌলা বুয়াইহির মৃত্যু ৪৪৩ হিজরি / ১০৫১ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে শিয়া-সুন্নি লড়াই; আহওয়াজে তুর্কান-এ-গাজ্জিদের লুটতরাজ; তুঘরিল বেগের ইসফাহান দখল; তিউনিসিয়ার শাসক মুইজ বিন বাদিস এবং বনু উবাইদ সমর্থকদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ ৪৪৪ হিজরি / ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ

বাগদাদে শিয়া-সুন্নি রক্তপাত, বুয়াইহি শাসক নীরব দর্শক ৪৪৫ হিজরি / ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ

তুঘরিল বেগ ইসফাহানে গুরুতর অসুস্থ, মৃত্যুর আশঙ্কা; বাগদাদে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ, পুলিশের হাতে এক শিয়া নেতার হত্যার পর পরিস্থিতির চরম অবনতি ৪৪৬ হিজরি / ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ

মুইজ বিন বাদিস এবং বনু উবাইদের সমর্থক আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ৪৪৬ হিজরি / ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ইবনে বাদিসের কায়রোয়ান থেকে মাহদিয়ার দিকে স্থানান্তর

- তুঘরিল বেগের আজারবাইজান দখল

৪৪৭ হিজরী ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান তুঘরিল বেগ ইরাক দখল করেন। বনু বুওয়াইহ শাসনের অবসান

৪৪৮ হিজরী ১০৫৬ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা কায়েম আব্বাসীর সাথে সুলতান তুঘরিল বেগের বোনের বিবাহ

৪৪৯ হিজরী ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ

- মাওয়ারাননাহরে মহামারী রোগে ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু

- আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ.-এর ইন্তেকাল, সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার সফর (এপ্রিল ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

৪৫০ হিজরী ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদের ওপর আরসালান বাসাসিরির আধিপত্য, বনু উবাইদের খুতবা জারি

- খলিফা কায়েম আব্বাসী গৃহবন্দী

- কাযিউল কুযাত আল্লামা মাওয়ারদী রহ.-এর ইন্তেকাল, আল-হাবী ও আল-আহকামুস সুলতানিয়ার লেখক, বয়স ৮৬ বছর

- শেষ বুওয়াইহী শাসক আল-মালিকুর রহীম বিন আবু কালিজার দুর্গে মৃত্যু

৪৫১ হিজরী ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা কায়েম বিল্লাহর পুনরায় সিংহাসন আরোহণ, খেলাফতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার ফিলকদ (ডিসেম্বর ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

- সেলজুকদের মোকাবিলায় রাফেযীদের পরাজয়, তাদের নেতা বাসাসিরি নিহত

- সুলতান ইবরাহিম বিন মাসউদ গজনভী এবং চাগরি বেগ সেলজুকির মধ্যে সন্ধি

- চাগরি বেগ সেলজুকির ইন্তেকাল

৪৫২ হিজরী ১০৬০ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান তুঘরিলের স্ত্রী “খাতুন”-এর ইন্তেকাল খলিফা কায়েম আব্বাসীর মাতা কাত্রন নাদার ইন্তেকাল

৪৫৩ হিজরী ১০৬১ খ্রিস্টাব্দ

- মসুলের ওয়ালী কুরাইশ বিন বদরানের ইন্তেকাল

৪৫৪ হিজরী ১০৬২ খ্রিস্টাব্দ

- দজলা নদীতে জলোচ্ছ্বাস, বাগদাদে বন্যা

- উত্তর আফ্রিকার শাসক মুইয বিন বাদিসের ইন্তেকাল, বয়স ৫৬ বছর

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৪৫৫ হিজরি ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান তুঘরিল সেলজুকির বাগদাদ আগমন
- সুলতান তুঘরিলের ইন্তেকাল, বয়স ৭০ বছর রমজান (সেপ্টেম্বর ১০৬৩ খ্রি.)
- চাগরি বেগ সেলজুকির পুত্র আল্প আরসালানের সিংহাসন আরোহণ

৪৫৬ হিজরি ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ

- আল্প আরসালানের নিকট নিজামুল মুলক তুসি সালতানাতের উজির নিযুক্ত
 • আল্লামা আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম আল-উমাবি আল-আন্দালুসির ওফাত, বয়স ৭৩ বছর
- কুতলুমিশ বিন ইসরাইল বিন সেলজুক নিহত, যিনি রুমের সেলজুকদের আদি পিতা

৪৫৭ হিজরি ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ

- আল্প আরসালান কর্তৃক জান্দ এবং সিহ্ন নদীর উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দখল
- লিবিয়ার শাসক তামিম বিন মুইজ-এর আদেশে নতুন শহর ‘বেজাইয়া’ নির্মাণ

৪৫৮ হিজরি ১০৬৫ খ্রিস্টাব্দ

- দালায়েলুন নুবুওয়াহ-এর লেখক ইমাম আবু বকর বায়হাকি (রহ.)-এর ওফাত, বয়স ৭৪ বছর ১০ জমাদিউল আউয়াল (১৮ এপ্রিল ১০৬৬ খ্রি.)

৪৫৯ হিজরি ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদে মুসলিম বিশ্বের আদর্শ বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-এ-নিজামিয়ার নির্মাণ সম্পন্ন, শিক্ষা কার্যক্রম শুরু জিলকদ (সেপ্টেম্বর ১০৬৭ খ্রি.)

৪৬০ হিজরি ১০৬৭ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদের নারী ওয়ায়েজ খাদিজা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.)-এর ওফাত, বয়স ৮৩ বছর মহরম (সেপ্টেম্বর ১০৬৭ খ্রি.)
- সিরিয়ার রামলা শহরে ভূমিকম্প, ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু
- নারী মুহাদিস আয়েশা বিনতে হাসান (রহ.)-এর ওফাত

৪৬১ হিজরি ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ

- দামেস্কের জামে উমাবিতে অগ্নিকাণ্ড, ভবনের ব্যাপক ক্ষতি

৪৬২ হিজরি ১০৬৯ খ্রি. - ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ

- রোমানদের মানবিজ আক্রমণ ও লুটতরাজ
- হিজাজ থেকে বনু উবাইদ-এর খুতবা বন্ধ, বাগদাদ খিলাফতের খুতবা চালু
- মুস্তানসির উবাইদি কর্তৃক ইউরোপকে সিরিয়া আক্রমণের আমন্ত্রণ (১০৭০ খ্রি.)

৪৬৩ হিজরি ১০৭০ খ্রি. - ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ

- আলেপ্পোতে আব্বাসীয় খিলাফতের খুতবা চালু

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- রামলা ও বায়তুল মুকাদ্দাসসহ ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অঞ্চলে সেলজুকদের দখল.....
- কবি ইবনে যায়দুনের মৃত্যু, কর্ডোভার শাসক মুতামিদ বিন আব্বাদের সহচর।
- আল্লামা ইবনে আব্দুল বার আন্দালুসীর মৃত্যু, বয়স ৯৫ বছর..... ২৯ রবিউস সানি (৩ ফেব্রুয়ারি ১০৭১ খ্রি.)।
- সুলতান আল্প আরসালান ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে কায়সার আরমানুসের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীর ওপর বিজয়ী, কায়সার গ্রেফতার..... ২৫ জিলকদ (২৬ আগস্ট ১০৭১ খ্রি.)।
- খতিব বাগদাদী রহ.-এর মৃত্যু..... ৭ জিলহজ (৪ সেপ্টেম্বর ১০৭১ খ্রি.)।
- ৪৬৪ হিজরি..... ১০৭১ খ্রি.
- সেভিলের (আন্দালুস) শাসক মুতাদিদ বিল্লাহর মৃত্যু.....
- ৪৬৫ হিজরি..... ১০৭২ খ্রি.
- সুলতান আল্প আরসালান নিহত, মালিক শাহ সেলজুকি সিংহাসনে আরোহণ.....
- মিশরে দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বনু উবাইদের শাসন আরও দুর্বল.....
- হযরত আবুল কাসেম কুশাইরী রহ.-এর মৃত্যু, রিসালায়ে কুশাইরিয়ার লেখক.....
- ৪৬৬ হিজরি..... ১০৭৩ খ্রি.
- বাগদাদে দজলা নদীর প্লাবনের কারণে বন্যা.....
- বনু উবাইদের উজির বদর জামালীর সিরিয়ায় বিজয় অভিযান.....
- ৪৬৭ হিজরি..... ১০৭৪-১০৭৫ খ্রি.
- উজির বদর জামালীর জাজিরাতুল আরবে বিজয় অভিযান.....
- জাজিরাতুল আরবে বনু উবাইদের খুতবা পুনরায় শুরু.....
- মালিক শাহ সেলজুকির নির্দেশে মানমন্দির স্থাপন.....
- খলিফা কায়েম আব্বাসীর মৃত্যু, বয়স ৬৭ বছর, খিলাফতের মেয়াদ ৪৪ বছর..... ১৩ শাবান (১৩ এপ্রিল ১০৭৫ খ্রি.)।
- আল-মুত্তাদী আব্বাসীর খিলাফত।
- ৪৬৮ হিজরি..... ১০৭৫ খ্রি.
- দামেস্কে সেলজুকদের দখল, শিয়া রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা.....
- ৪৬৯ হিজরি..... ১০৭৬ খ্রি.
- বায়তুল মুকাদ্দাসে সেলজুকদের দখল.....
- বাগদাদের মাদ্রাসা নিজামিয়ায় আশায়েরা ও হানাবেলাদের মধ্যে বিবাদ, বহু লোক নিহত.....

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- আবু হাইয়ান কুরতুবী, ‘আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস’-এর লেখকের মৃত্যু..... ৪৭০ হিজরি ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ
- নিজামুল মুলক তুসীর কন্যার মৃত্যু, সম্মানস্বরূপ কাসরে খিলাফতে দাফন..... শাওয়াল (এপ্রিল ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ৪৭১ হিজরি ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দ
- তাজউদ্দৌলা তুতুশ সেলজুকির সিরিয়া দখল, জনগণের ওপর জুলুমের অভিযোগে আসর খাওয়ারেজমির হত্যা.....
- আল্লামা আব্দুল কাহের জুরজানী (রহ.)-এর মৃত্যু, ‘আসরারুল বালাগাহ’, ‘দালাইলুল ইজায’, ‘আল-মুগনি ফি শারহিল ঈযাহ’-এর লেখক ৪৭১ হিজরি ১০৭৯ খ্রিস্টাব্দ
- মাহমুদ গজনভীর পৌত্র ইব্রাহিমের হিন্দুস্তান বিজয়..... ৪৭৩ হিজরি ১০৮০ খ্রিস্টাব্দ
- কবি আবু আলী বিন শিবলের মৃত্যু..... ৪৭৪ হিজরি ১০৮১ খ্রিস্টাব্দ
- তুতুশ সেলজুকির তারতুস দখল..... ৪৭৫ হিজরি ১০৮২ খ্রিস্টাব্দ
- আল্লামা ইবনে মাকুলা (রহ.)-এর মৃত্যু, ‘আল-ইকমাল’, ‘আল-উযারা’-এর লেখক..... এক বর্ণনা মতে মৃত্যু ৪৮৭ হিজরিতে হয়েছে। ৪৭৬ হিজরি ১০৮৩ খ্রিস্টাব্দ
- আল্লামা আবু ইসহাক শিরাজি (রহ.)-এর মৃত্যু, বাগদাদের মাদরাসা নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষক..... জুমাদাল আখিরাহ (অক্টোবর ১০৮৩) ৪৭৬ হিজরি ১০৮২-১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ
- কোনিয়ার শাসক সুলাইমান বিন কুতুলমিশের হাতে ১৮ বছর পর খ্রিস্টানদের থেকে আন্তাকিয়া পুনরুদ্ধার..... শাবান (জানুয়ারি ১০৮৫)
- আন্দালুসের কবি ইবনে আন্মারের মৃত্যু, মুতামিদ বিন আব্বাদের সহচর.....
- সিনজারে মালিক শাহের পুত্র আহমদের জন্ম, শহরের নামানুসারে ‘সানজার’ উপাধি হয়..... ২৫ রজব (১৮ ডিসেম্বর ১০৮২ খ্রিস্টাব্দ) ৪৭৮ হিজরি ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ
- আন্দালুসের শহর তোলেদোর (তলাইতলা) ওপর আলফনসোর দখল.....
- ইমামুল হারামাইন আবুল মাতালি জুওয়াইনি (রহ.)-এর মৃত্যু, বয়স ৬০ বছর..... রবিউল আখির (আগস্ট ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ)
- ইমাদউদ্দীন জঙ্গির জন্ম..... ৪৭৯ হিজরি ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দ
- কোনিয়ার শাসক সুলাইমান বিন কুতুলমিশ এবং সিরিয়ার শাসক তুতুশ সেলজুকির মধ্যে যুদ্ধ। কুতুলমিশ নিহত.....

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

- জাল্লাকার যুদ্ধ, ইউসুফ বিন তাশফিনের হাতে আলফনসোর পরাজয়..... ১৫ রমজান (১৩ ডিসেম্বর ১০৮৬ খ্রি.)
- মালিক শাহ সেলজুকি কর্তৃক আলেপ্পো এবং আল-জাজিরা দখল.....
- হারাইমাইন-এ বনু উবাইদের খুতবা বন্ধ। বনু আব্বাসের খুতবা চালু।
৪৮০ হিজরি..... ১০৮৭ খ্রি.-১০৮৮ খ্রি.
- খলিফা মুকতাদি আব্বাসির সাথে মালিক শাহ সেলজুকির কন্যার বিবাহ.....
- বিদুষী নারী ফাতিমা বিনতে আবু আলী দাঙ্কাক (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৯০ বছর.....
জিলকদ (ফেব্রুয়ারি ১০৮৮ খ্রি.)
- বিদুষী নারী ফাতিমা বিনতে আল-হাসান বাগদাদিয়া (রহ.)-এর ইন্তেকাল.....
৪৮১ হিজরি..... ১০৮৮ খ্রি.-১০৮৯ খ্রি.
- হেরাতে শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাইল আনসারি (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৮০ বছর.....
জিলহজ (মার্চ ১০৮৯ খ্রি.)
- ৪৮২ হিজরি..... ১০৮৯ খ্রি.
- ইসফাহান, সমরকন্দ এবং কাশগরে মালিক শাহ সেলজুকির বিজয়সমূহ.....
- আবু ইসহাক হাব্বাল মিসরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল, হাফিজুল হাদিস, “ওয়াফিয়াতুল মিসরিয়নে”-এর লেখক।
৪৮৩ হিজরি..... ১০৯০ খ্রি.
- বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা.....
- বুখারায় আল্লামা খাওয়াহের জাদা হানাফি (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ১০৯০ খ্রি.)
- ৪৮৪ হিজরি..... ১০৯১ খ্রি.
- সিকিলিয়া (সিসিলি)-তে রোমানদের দখল.....
- আন্দালুসে আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের শাসনের সূচনা, মুলুকুত তাওয়াইফের অবসান.....
- আলমেরিয়ার শাসক মুতাসিম মুহাম্মদ বিন মা’নের ইন্তেকাল.....
- ৪৮৫ হিজরি..... ১০৯২ খ্রি.
- ইউসুফ বিন তাশফিনের মোকাবিলায় আলফনসোর শোচনীয় পরাজয়.....
- বাতিনিদের প্রথম শিকার - নিজামুল মুলক তুসি শহীদ..... ১০ রমজান (১৪ অক্টোবর ১০৯২ খ্রি.)
- মালিক শাহ সেলজুকির ইন্তেকাল..... শাওয়াল (নভেম্বর ১০৯২ খ্রি.)
- ৪৮৬ হিজরি..... ১০৯৩ খ্রি.
- তুতুশ সেলজুকি সিরিয়া, আল-জাজিরা এবং ইরাকের একটি বড় অংশ দখল করেন.....
- সুলতান বারকিয়ারুক বিন মালিক শাহ এবং তুতুশের মধ্যে দ্বন্দ্ব.....

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

৪৮৭ হিজরি ১০৯৪ খ্রি.

খলিফা মুকতাদির পক্ষ থেকে সুলতান বারকিয়ারুককে সালতানাতের সনদ প্রদান ১লা
মহররম (৩ ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রি.)

খলিফা মুকতাদি আব্বাসীর ইন্তেকাল ১৮ই মহররম (১৯ ফেব্রুয়ারি ১০৯৪ খ্রি.)

মুসতায়হির আব্বাসীর খিলাফত

হালবের শাসক আক সানকার এবং তুতুশ সেলজুকির মধ্যে যুদ্ধ, আক সানকার নিহত

জমাদিউল আউয়াল (জুন ১০৯৪ খ্রি.)

হালব, খালাত এবং আজারবাইজানের ওপর তুতুশের দখল

ষাট বছর শাসনের পর মুসতানসির উবাইদির মৃত্যু

৪৮৮ হিজরি ১০৯৫ খ্রি.

রের নিকট বারকিয়ারুক এবং তুতুশের মধ্যে যুদ্ধ, তুতুশ নিহত

ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর দামেস্কে আগমন, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন রচনায় আত্মনিয়োগ

কর্ডোভার প্রাক্তন শাসক মুতামিদ চার বছর মুরাবিতুনদের বন্দি থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন
..... শাওয়াল (অক্টোবর ১০৯৫ খ্রি.)

ফ্রান্সে ক্লারমন্ট সম্মেলন, ইউরোপীয় শাসকদের ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপারে ঐক্যমত

জিলকদ (নভেম্বর ১০৯৫ খ্রি.)

ইমাদউদ্দীন জঙ্গীর পিতা আক সানকারের মৃত্যু

৪৮৯ হিজরি ১০৯৫ খ্রি.

বাগদাদে ভয়াবহ বন্যা। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণে সীমিত ক্ষয়ক্ষতি

৪৯০ হিজরি ১০৯৬ খ্রি.

আব্বাস আরসালানের পুত্র খোরাসানের শাসক আরসালান আরগুন নিজ দাসের হাতে নিহত

খোরাসানে সুলতান সাঞ্জর সেলজুকির শাসন

সিরিয়ায় তুতুশ সেলজুকির দুই পুত্র রিদওয়ান এবং দুকাকের মধ্যে যুদ্ধ

বনু উবাইদ কর্তৃক সিরিয়ার শহর সুর দখল রবিউল আউয়াল ৪৯০ হিজরি (মার্চ ১০৯৭
খ্রি.)

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা, ইউরোপ থেকে সৈন্যবাহিনী যাত্রা শুরু

৪৯১ হিজরি ১০৯৭ খ্রি.

ক্রুসেডারদের আন্তাকিয়া দখল ২৫শে রজব (২৮ জুন ১০৯৮ খ্রি.)

বনু উবাইদ কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাস দখল শাবান ৪৯১ হিজরি (জুলাই ১০৯৮ খ্রি.)

৪৯২ হিজরি ১০৯৮ খ্রি.

ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখল ২৩শে শাবান (১৫ জুলাই ১০৯৯ খ্রি.)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- আল্লামা মক্কী বিন আব্দুস সালাম এবং আল্লামা আবুল কাসিম বিন রুমাইলি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাইতুল মাকদিসে ফরাসিদের হাতে শহীদ।
- বাগদাদে বারকিয়ারুকের খুতবা বন্ধ, মুহাম্মদ বিন মালিক শাহকে সুলতান হিসেবে মেনে নেওয়া হলো...
- হাসান বিন সাব্বাহর বাতেনি দাওয়াত তুঙ্গে...

৪৯৩ হিজরি ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দ

- জেরুজালেমের প্রথম রাজা গডফ্রের মৃত্যু রমজান (জুলাই ১১০০ খ্রিস্টাব্দ)
- বারকিয়ারুকের বাগদাদ আগমন, মুহাম্মদ বিন মালিক শাহর পরিবর্তে বারকিয়ারুকের খুতবা জারি।
- সাঞ্জর ও মুহাম্মদ বিন মালিক শাহর মোকাবিলায় বারকিয়ারুকের পরাজয়...
- বারকিয়ারুকের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন মালিক শাহর পরাজয়...
- বারকিয়ারুকের বাগদাদ আগমন ও অসুস্থতা, সেনাবাহিনী অনিয়ন্ত্রিত, জনগণ নিরাপত্তাহীন।
- সুলতান সাঞ্জর ও সুলতান মুহাম্মদের বাগদাদ আগমানে বারকিয়ারুকের ওয়াসিত অভিমুখে যাত্রা...
- হাইফা, সারুজ, আরসুফ এবং কায়সারিয়া ফরাসিদের দখলে...
- মুসলিম বিশ্বে হাসান বিন সাব্বাহর দাঈদের তৎপরতা, ফিদায়ী বা আত্মঘাতীদের খঞ্জর হামলা।

৪৯৪ হিজরি ১১০০ খ্রিস্টাব্দ

- হাসান বিন সাব্বাহর দল উত্তর ইরানের পাহাড়ি দুর্গগুলো দখল করে নেয়...

৪৯৫ হিজরি ১১০১ খ্রিস্টাব্দ

- বারকিয়ারুক ও মুহাম্মদ বিন মালিক শাহর মধ্যে তৃতীয় যুদ্ধ, সৈন্য ও খাদ্যের তীব্র সংকট...
- বারকিয়ারুক ও মুহাম্মদের মধ্যে চতুর্থ যুদ্ধ, মুহাম্মদ ৭০০ অশ্বরোহী নিয়ে ইসফাহানে আশ্রয় গ্রহণ করেন...
- মুসতালি উবাইদির মৃত্যু...

৪৯৬ হিজরি ১১০২ খ্রিস্টাব্দ

- আজারবাইজানে বারকিয়ারুক ও মুহাম্মদের মধ্যে পঞ্চম যুদ্ধ, মুহাম্মদের পিছু হটা...

৪৯৭ হিজরি ১১০৩ খ্রিস্টাব্দ

- মালিক শাহর পুত্র সাঞ্জর, বারকিয়ারুক ও মুহাম্মদের মধ্যে সন্ধি, অঞ্চল বণ্টন...
- আক্কা ও জুবাইল ফরাসিদের দখলে...

- দামেস্কের শাসক দুকাক বিন তুতুশ সেলজুকির মৃত্যু...

৪৯৮ হিজরি ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান বারকিয়ারুকের মৃত্যু, বয়স ২৬ বছর, শাসনকাল ১৩ বছর রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

- মারদিনের শাসক সুলাইমান বিন আরতুক তুর্কমানির মৃত্যু.....

৪৯৯ হিজরি ১১০৫ খ্রিস্টাব্দ

- নাহাওয়ানদে নবুওয়াতের দাবিদারের আবির্ভাব এবং তাকে হত্যা.....
- ফিরিঙ্গিদের ফামিয়া দুর্গ দখল.....

৫০০ হিজরি ১১০৬ খ্রিস্টাব্দ

- ইউসুফ বিন তাশফিন (রহ.)-এর মৃত্যু - বয়স ৯০ বছর ৩ মহররম (৩ সেপ্টেম্বর ১১০৬ খ্রিস্টাব্দ)

ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দী

৫০১ হিজরি ১১০৭ খ্রিস্টাব্দ

- উত্তর আফ্রিকার শাসক তামীম বিন মুইজ বিন বাদিসের মৃত্যু, রাজত্বকাল ৪৬ বছর, বয়স ৭৪ বছর।
- জাজিরাতুল আরবের শাসক সাদাকা বিন মানসুর ২২ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মুহাম্মদ সেলজুকির সাথে যুদ্ধে নিহত।

৫০২ হিজরি ১১০৮ খ্রিস্টাব্দ

- আমুল - জুমার দিন জামে মসজিদে শাফেয়ী ফকিহ কাজী আবুল মাহাসিন আর-রুয়ানি বাতিনিয়াদের হাতে শহীদ, বয়স ৭৭ বছর (মুহররম/আগস্ট ১১০৮)।
- ঈদুল ফিতরের দিন ইসফাহানে হানাফিদের মুফতি আবুল আলা সাঈদ বিন মুহাম্মদ আল-বুখারি বাতিনিয়াদের হাতে শহীদ।
- কোনিয়ার শাসক কিলিজ আরসালান বিন সুলাইমান যুদ্ধ চলাকালীন ডুবে মৃত্যুবরণ করেন... ১৩ জিলকদ (জুন ১১০৯)।
- ইসফাহানের কাজীউল কুজাত আবদুল্লাহ বিন আলী খতিবি বাতিনিয়াদের হাতে শহীদ।

৫০৩ হিজরি ১১০৯-১১১০ খ্রিস্টাব্দ

- ফরাসিদের বানিয়াস, তারতুস এবং হিসনুল আকরাদ দখল।
- ফরাসিদের ত্রিপোলি (সিরিয়া) দখল... জিলহজ (জুলাই ১১১০)।

৫০৪ হিজরি ১১১০ খ্রিস্টাব্দ

- ফরাসিদের বৈরুত, সিদন এবং হিসনুল আসারিব দখল।
- বাগদাদে মুসলমানদের পরাজয় ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ, সেলজুকি সুলতানের পক্ষ থেকে জিহাদের প্রতিশ্রুতি।

৫০৫ হিজরি ১১১১ খ্রিস্টাব্দ

- ফরাসিদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ইরাকি বাহিনীর অভিযান, রুহা ও তাল বাশির অবরোধ এবং প্রত্যাবর্তন।
- আলফনসোর বিরুদ্ধে আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফিনের গৌরবময় বিজয়।
- ইমাম গাজালির মৃত্যু... ১৪ জমাদিউল আখিরা (১৯ ডিসেম্বর ১১১১)।

৫০৬ হিজরি ১১১২ খ্রিস্টাব্দ

- বাগদাদের ওয়ায়েজ আবু সাদ বিন আবু উমামার মৃত্যু।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (তৃতীয় খণ্ড)

- মোসেলের শাসক মওদুদ-এর তাঁবুতে শাওয়ার্স বা জোসেলিনের অতর্কিত হামলা, জান-মালের ক্ষতি...

৫০৭ হিজরি ... ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ

- দামেস্ক ও আল-জাজিরার সেনাবাহিনীর তাবারিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিজয়, জেরুজালেমের শাসক আহত।
- মোসেলের শাসক মওদুদ দামেস্কের জামে উমাবীতে জুমার সমাবেশে বাতেনি খঞ্জরধারীর হাতে নিহত... মহররম (জুন ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ)

৫০৮ হিজরি ... ১১১৩ খ্রিস্টাব্দ - ১১১৫ খ্রিস্টাব্দ

- জেরুজালেমের শাসক জখমের কারণে নিহত...
- মারাগার শাসক আহমদ ইয়াল বাতেনিদের হাতে শহীদ...
- সুলতান মাসুদ গজনভীর মৃত্যু, মাহমুদ গজনভীর প্রপৌত্র... শাওয়াল (মার্চ ১১১৫ খ্রিস্টাব্দ)

৫০৯ হিজরি ... ১১১৫ খ্রিস্টাব্দ - ১১১৬ খ্রিস্টাব্দ

- উত্তর আফ্রিকার শাসক ইয়াহইয়া বিন তামীমের মৃত্যু... ১০ জিলহজ (২৫ এপ্রিল ১১১৬ খ্রিস্টাব্দ)

৫১০ হিজরি ... ১১১৬ খ্রিস্টাব্দ

- তুসে মাহমুদ আলী রেজার (রহ.) সমাবেশে দাঙ্গা, বহু লোক নিহত... ১০ মহররম (২৫ মে ১১১৬ খ্রিস্টাব্দ)
- বাগদাদের মাদ্রাসা নিজামিয়ার কুতুবখানা অগ্নিকাণ্ডের কবলে, সমস্ত বই রক্ষা করা হয়েছে...

৫১১ হিজরি ... ১১১৭ খ্রিস্টাব্দ - ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ

- মুহাম্মদ বিন মালিক শাহের মৃত্যু... জিলহজ (এপ্রিল ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ)

৫১২ হিজরি ... ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ - ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা মুস্তাজহির আব্বাসীর মৃত্যু... ১৬ রবিউল সানি (১৯ আগস্ট ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ)
- মুস্তাশসি আব্বাসীর খেলাফত
- আজাজের ওপর ক্রুসেডারদের দখল... রমজান (জানুয়ারি ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫১৩ হিজরি ... ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান সাঞ্জর এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ বিন মুহাম্মদের মধ্যে যুদ্ধের পর সন্ধি...
- আস্তাকিয়ার ক্রুসেডার নবাব, দামেস্কের শাসক তুঘতেগিনের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে পলায়ন...
- সিরিয়ায় হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কবরের প্রকাশ, পবিত্র দেহসমূহ অক্ষত...

৫১৩ হিজরি ... ১১২০ খ্রিস্টাব্দ

- মরক্কোতে ইবনে তুমারতের আবির্ভাব...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- আপন দুই ভাই মাহমুদ বিন মুহাম্মদ সেলজুকি এবং মাসুদ বিন মুহাম্মদ সেলজুকির মধ্যে যুদ্ধ, মাসুদের পরাজয়।
- জর্জিয়ান খ্রিস্টান এবং খাজার উপজাতিদের আক্রমণ, তিবলিস দখল, মুসলমানদের পরাজয়।

৫১৫ হিজরি ১১২১ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে রাজপ্রাসাদ পুড়ে ধ্বংস।
- মিশরের উজির আফজাল বিন বদর জামালি বাতিনিদের হামলায় নিহত।

৫১৬ হিজরি ১১২২ খ্রিষ্টাব্দ

- মাকামাত-এর রচয়িতা কাসেম বিন আলী আল-হারিরি (রহ.)-এর ইন্তেকাল, জন্ম ৪৪৬ হিজরি রজব (সেপ্টেম্বর ১১২২ খ্রি.)।
- তাফসিরে বাগভী ও শারহুস সুন্নাহ-এর রচয়িতা আবু মুহাম্মদ আল-বাগভী আশ-শাফেয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকাল।

৫১৭ হিজরি ১১২৩ খ্রিষ্টাব্দ

- দুবাইস বিন সাদাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে খলিফা মুসতারশিদের বিজয় ১লা মহররম (১৩ মার্চ ১১২৩ খ্রি.)।

৫১৮ হিজরি ১১২৪ খ্রিষ্টাব্দ

- সুর (টায়ার) নগরীর ওপর ফিরিজিদের দখল।
- হাসান বিন সাবাহ-এর মৃত্যু।
- সাইদা (সিডন) নগরীর ওপর ফিরিজিদের দখল।

৫১৯ হিজরি ১১২৫ খ্রিষ্টাব্দ

- আমির বুরসুকি ফিরিজিদের দুর্গ কাফর তাব দখল করে নেন।
- জোসেলিনের দুর্গ আজাজ-এর ওপর মুসলমানদের ব্যর্থ আক্রমণ এবং পিছু হটা।

৫২০ হিজরি ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দ

- মসুলের আমির আক সানকার কাসিমুদ দাওলা বাতিনিদের হাতে নিহত জিলকদ (নভেম্বর ১১২৬ খ্রি.)।

৫২১ হিজরি ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দ

- সুলতান মাহমুদ সেলজুকির বাগদাদ আক্রমণ, পরাজয়ের পর খলিফার সাথে সন্ধি।
- বাগদাদে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে আমির ইমাদউদ্দিন জঙ্গির নিযুক্তি।

৫২২ হিজরি ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাদউদ্দিন জঙ্গির আলেপ্পো (হালাব) দখল ১লা মহররম (জানুয়ারি ১১২৮ খ্রি.)।

৫২৩ হিজরি ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাদউদ্দিন জঙ্গির হামাহ দখল।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ইসমাইলিদের ফিরিজিদের হাতে দামেস্কের দখল পাইয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ, ছয় হাজার ইসমাইলি নিহত ৫২৩ হিজরি / ১১২৯-১১৩০ খ্রিস্টাব্দ
- ইমাদউদ্দিন জঙ্গি ফিরিজিদের কাছ থেকে আসারিব দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন
- মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন তুমারতের মৃত্যু, মুওয়াহহিদুন রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক নেতা
- আল-আমির বি-আহকামিল্লাহ বাতিনিদের হাতে নিহত, শাসনকাল ৩০ বছর জিলকদ (অক্টোবর ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ) ৫২৫ হিজরি / ১১৩০ খ্রিস্টাব্দ
- সুলতান মাহমুদ বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ সেলজুকির মৃত্যু
- জেরুজালেমের রাজা দ্বিতীয় বল্ডউইনের মৃত্যু রমজান (আগস্ট ১১৩১ খ্রিস্টাব্দ) ৫২৬ হিজরি / ১১৩১-১১৩২ খ্রিস্টাব্দ
- দিনাওয়ারে সুলতান সাঞ্জার এবং সুলতান মাসুদ সেলজুকির মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ৩০ হাজার লোক নিহত
- মুসতারশিদের ইমাদউদ্দিন জঙ্গি এবং দুবাইস বিন সাদাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় ২৭ রজব (১৩ জুন ১১৩২ খ্রিস্টাব্দ)
- দামেস্কের শাসক তাজুল মুলুক বুরি বাতিনিদের হামলায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ৫২৭ হিজরি / ১১৩২ খ্রিস্টাব্দ
- দামেস্কের শাসক শামসুল মুলুক ইসমাইল ফিরিজিদের কাছ থেকে বানিয়াস পুনরুদ্ধার করেন ৫২৮ হিজরি / ১১৩৩ খ্রিস্টাব্দ
- ইমাদউদ্দিন জঙ্গি এবং খলিফা মুসতারশিদের মধ্যে সন্ধি
- সুলতান সাঞ্জার এবং খলিফার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ৫২৯ হিজরি / ১১৩৪-১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ
- ইমাদউদ্দিন জঙ্গি ফিরিজিদের কাছ থেকে মা'আররা পুনরুদ্ধার করেন
- খলিফা মুসতারশিদের পক্ষ থেকে সুলতান মাসুদের জন্য খিলআত এবং মুকুট প্রেরণ
- খলিফা এবং সুলতান মাসুদের মধ্যে যুদ্ধ, খলিফা পরাজিত ও বন্দি। খলিফার কাছ থেকে খেলাফতের নিদর্শনসমূহ—নবীজির চাদর এবং পবিত্র লাঠি ছিনিয়ে নেওয়া হয় রমজান (জুন ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ)
- খলিফা মুসতারশিদ বাতিনিদের হামলায় শহীদ, বয়স ৪৫ বছর ১৭ জিলকদ (১০ সেপ্টেম্বর ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ)
- রাশিদ বিল্লাহ আববাসির খেলাফত
- দামেস্কের শাসক শামসুল মুলুক ইসমাইল নিহত
- আরবের শাসক দুবাইস বিন সাদাকা সুলতান মাসুদ সেলজুকির হাতে বন্দি এবং নিহত জিলহজ (অক্টোবর ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ)

৫৩০ হিজরী ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে সুলতান মাসউদের হস্তক্ষেপ, ইরাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাহরাইন...
- নতুন খলিফা রাশিদ বিল্লাহর পদচ্যুতি, মুকতাফি আব্বাসীর সিংহাসন আরোহণ... ১৬
ফিলকদ (২৮ আগস্ট ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)

৫৩১ হিজরী ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ

- ইমাদউদ্দীন জঙ্গির হাতে জেরুজালেমের রাজা ফুলক এবং কাউন্ট অফ আনজু-র পরাজয়... শাওয়াল (জুলাই ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইমাদউদ্দীন জঙ্গি ফ্রাঙ্কদের কাছ থেকে বারিন ও বালবেক দুর্গ ছিনিয়ে নিতে সফল...

৫৩২ হিজরী ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ

- বাতিনীদের হাতে পদচ্যুত খলিফা রাশিদ বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড... ২৬ রমজান (৬ জুন ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- বাগদাদের বিখ্যাত মহিলা মুহাদ্দিস শুহদাহ উম্মুল খায়ের ফাতিমা বিনতে আলী আল-বাগদাদীর ইন্তেকাল, বয়স ৯৭ বছর...
- সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)-এর জন্ম...

৫৩৩ হিজরী ১১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ

- সানজারের সাথে আতসিজ খাওয়ারেজম শাহের যুদ্ধ, আতসিজের পিছু হটা...

৫৩৪ হিজরী ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ

- ইরাকে দুর্ভিক্ষ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অত্যন্ত চড়া...
- বাগদাদের প্রশাসক মুজাহিদউদ্দীন বেহরোজের নির্দেশে নতুন খাল খনন...
- খলিফা মুকতাফির কন্যার সাথে সুলতান মাসউদের বিবাহ... জমাদিউল আখিরা (জানুয়ারি ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ)
- সুলতান মাসউদের কন্যার সাথে খলিফা মুকতাফির বিবাহ, বাগদাদে উৎসব... জমাদিউল আখিরা (জানুয়ারি ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ)

৫৩৫ হিজরী ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দ

- বাগদাদে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় “মাদরাসা কামালিয়া”-র নির্মাণ সম্পন্ন, পাঠদান শুরু...
- সিরিয়ার মাসয়াফ দুর্গগুলোর ওপর বাতিনি গোষ্ঠীর দখল...
- সুলতান সানজারের নির্দেশে আব্বাসীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চাদরে নব্বী এবং আসায়ে মুবারক খলিফা মুকতাফিকে ফেরত প্রদান...

৫৩৬ হিজরী ১১৪১ খ্রিষ্টাব্দ

- কারা-খিতাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুলতান সানজারের পরাজয়, এক লক্ষ লোক শহীদ...
- মা ওয়ারাউন নাহর-এর ওপর কারা-খিতাইদের দখল...

৫৩৭ হিজরী ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ

- মালাতিয়ার শাসক মুহাম্মদ বিন দানিশমান্দের মৃত্যু, কোনিয়ার শাসক মাসউদ বিন কিলিজ আরসালান কর্তৃক তার এলাকা দখল...

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

- মরক্কো ও আন্দালুসের আমির আলী বিন ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যু। বয়স ৬১ বছর...
রজব (ফেব্রুয়ারি ১১৪৩ খ্রি.)

৫৩৮ হিজরি ১১৪৩ খ্রি.

- তাফসীরে কাশশাফ-এর রচয়িতা আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী মুতাহিলীর মৃত্যু, বয়স ৭১ বছর...
- জেরুজালেমের রাজা ফিলিপের মৃত্যু... ফিলকদ (নভেম্বর ১১৪৩ খ্রি.)

৫৩৯ হিজরি ১১৪৪ - ১১৪৫ খ্রি.

- ফাতহুল ফুতুহ যুদ্ধ, ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে রুহা পুনরুদ্ধার করেন... ৬ জমাদিউল আখিরা (২৩ ডিসেম্বর ১১৪৪ খ্রি.)
- আফ্রিকায় মুরাবিতুন বংশের শেষ শাসক তাশফিন বিন আলী, মুওয়াহহিদুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মুমিনের সাথে যুদ্ধে নিহত... রমজান (মার্চ ১১৪৫ খ্রি.)
- কাজী বাহাউদ্দিন ইবনে শাদাদের জন্ম
- আফ্রিকায় মুরাবিতুন শাসনের অবসান...
- ইসফাহানের ওয়ায়েজ ও মুহাদিসা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ রুজবাহর মৃত্যু, বয়স ৯৪ বছর...

৫৪০ হিজরি ১১৪৫ খ্রি.

- ইরাকের নাজিম মুজাহিদ উদ্দিন বেহরুজ ত্রিশ বছরেরও বেশি চাকুরির পর মৃত্যুবরণ করেন...
- আন্দালুসে খ্রিস্টানরা সান্তারেন এবং লিসবনসহ বেশ কিছু ইসলামী দুর্গ দখল করে...

৫৪১ হিজরি ১১৪৬ খ্রি.

- ক্রুসেডারদের ত্রিপোলি (লিবিয়া) দখল, আলে যিরি শাসনের অবসান...
- ইমাদ উদ্দিন যিঙ্গি এক ঘাতক হামলায় শাহাদাত বরণ করেন... ৫ রবিউস সানি (১৪ সেপ্টেম্বর ১১৪৬ খ্রি.)

৫৪২ হিজরি ১১৪৭ খ্রি.

- ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নুর উদ্দিন যিঙ্গির জিহাদ, তিনটি দুর্গ বিজয়...

৫৪৩ হিজরি ১১৪৮ খ্রি.

- দ্বিতীয় ক্রুসেড, ইউরোপীয় বাহিনী দামেস্ক অবরোধ করে ফিরে যায়... রবিউল আউয়াল (আগস্ট ১১৪৮ খ্রি.)
- আবুল হাজ্জাজ ফান্দালাভি রহমাতুল্লাহ দামেস্কের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন...

৫৪৪ হিজরি ১১৪৯ খ্রি.

- সিসিলির ক্রুসেডারদের মাহদিয়া (লিবিয়া) দখল...
- নুর উদ্দিন যিঙ্গির ক্রুসেডারদের আফামিয়া দুর্গ দখল, ক্রুসেডার শাসক জোসেলিন গ্রেফতার...
- দামেস্কের শাসক মুঈন উদ্দিন আনযের মৃত্যু... রবিউস সানি (আগস্ট ১১৪৯ খ্রি.)

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

- মালেকী ফকীহ কাজী আয়াজ মারাকেশী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, তিনি মাশারিকুল আনওয়ার ও আশ-শিফা গ্রন্থের রচয়িতা... জমাদিউল আখিরা (অক্টোবর ১১৪৯ খ্রি.)।
- মসুলের শাসক সাইফ উদ্দিন গাজী বিন ইমাদ উদ্দিন জঙ্গীর ইন্তেকাল... জমাদিউল আখিরা (অক্টোবর ১১৪৯ খ্রি.)।

৫৪৫ হিজরী... ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

- নূরুদ্দীন জঙ্গীর হাতে ফিরিজিদের পরাজয়, আজাজ দখল... মরররম (মে ১১৫০ খ্রি.)।
- ঘুরিদের উত্থান, হাসান বিন হুসাইন ঘুরি হেরাত দখল করেন...

৫৪৬ হিজরী... ১১৫১ খ্রিষ্টাব্দ।

- রাহার খ্রিস্টান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নূরুদ্দীন জঙ্গীর জিহাদ শুরু...
- রাহার ১৩টি দুর্গ বিজয়, রাহার শাসক জোসেলিন বন্দী...

৫৪৭ হিজরী... ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দ।

- সুলতান মাসউদ সেলজুকি বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহের ইন্তেকাল, বয়স ৪৫ বছর... জমাদিউল আখিরা (সেপ্টেম্বর ১১৫২ খ্রি.)।
- ওঘুজ তুর্কিদের সাথে যুদ্ধে সুলতান সাঞ্জারের বন্দী হওয়া...

৫৪৮ হিজরী... ১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

- খোরাসান ও মাওয়ারাননাহরে ওঘুজ তুর্কিদের তাণ্ডব, হাজার হাজার মানুষ নিহত...
- জেরুজালেমের রাজা তৃতীয় বন্ডউইন কর্তৃক আসকালান দখল... জমাদিউল আখিরা (সেপ্টেম্বর ১১৫৩ খ্রি.)।

৫৪৯ হিজরী... ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

- সেলজুক সুলতানদের দুর্বলতা...
- আব্বাসী খলিফা মুকতাফির শাসন শক্তিশালী হওয়া, বাগদাদের সেনাবাহিনী ৬ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ হাজারে উন্নীত হওয়া...
- নূরুদ্দীন জঙ্গী দামেস্ক দখল করেন... সফর (এপ্রিল ১১৫৪ খ্রি.)।

৫৫০ হিজরী... ১১৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

- ওঘুজ তুর্কিদের নিশাপুর দখল, ত্রিশ হাজার মুসলমান নিহত...

৫৫১ হিজরী... ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

- সেলজুক মালিক শাহের পৌত্র সুলাইমানের বাগদাদে আগমন এবং শাসনের অনুমতি লাভ...
- মুহাম্মদ শাহ বিন মাহমুদ সেলজুকির কাছে সুলাইমান শাহের পরাজয়।
- ওঘুজদের বন্দিদশা থেকে সুলতান সাঞ্জারের পলায়ন... রমজান (নভেম্বর ১১৫৬ খ্রি.)।
- সাঞ্জারের ভাগ্নে মাহমুদ এবং খোয়ারিজম শাহ আতসিজের মধ্যে যুদ্ধ...

৫৫২ হিজরী... ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

- বাতেনীদের পক্ষ থেকে হাজীদের কাফেলার ওপর হামলা, সকল হজ যাত্রী শহীদ...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (তৃতীয় খণ্ড)

- মুহাম্মদ শাহ সেলজুকির বাগদাদে ব্যর্থ আক্রমণ...
- সুলতান সানজারের মৃত্যু, বয়স ৭৩ বছর... রবিউল আউয়াল (এপ্রিল ১১৫৭ খ্রি.)
- খোরাসানে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ...
- নুরুদ্দিন জঙ্গির বানিয়াস ও গাজা দখল
- আন্দালুস থেকেও মুরাবিতুন শাসনের অবসান
৫৫৩ হিজরি ১১৫৮ খ্রি.
- বিবাদমান দুই ভাই মালিক শাহ সানি ও মুহাম্মদ শাহ সেলজুকির মধ্যে সন্ধি...
৫৫৪ হিজরি ১১৫৯ খ্রি.
- গুয তুর্কিদের দ্বারা নিশাপুরে তৃতীয়বার লুটতরাজ...
- আব্দুল মুমিনের মাহদিয়া দখল, ফিরিজিদের প্রস্থান...
- সিরিয়ায় রোমানদের ব্যর্থ সামরিক অভিযান...
- মুহাম্মদ শাহ বিন মাহমুদ বিন মালিক শাহের মৃত্যু, বয়স ৩৩ বছর
৫৫৫ হিজরি ১১৬০ খ্রি.
- খলিফা মুকতাফির মৃত্যু। বয়স ৬৩ বছর, শাসনকাল ২৫ বছর... ২ রবিউল আউয়াল
(২৩ মার্চ ১১৬০ খ্রি.)
- মুসতানজিদ বিল্লাহর খিলাফত
- মালিক শাহ বিন মাহমুদ বিন মালিক শাহের ইসফাহানে মৃত্যু
- সুলাইমান শাহ সেলজুকি মদ্যপানের কারণে আমিরদের বিদ্রোহের শিকার হয়ে
ক্ষমতাচ্যুত
- আরসালান বিন তুঘরিল বিন মুহাম্মদের খুতবা জারি...
- গজনির সুলতান খসরু শাহের মৃত্যু। খসরু বিন মাসউদ বিন ইবরাহিম বিন মাসউদ বিন
মাহমুদ গজনভি...
৫৫৬ হিজরি ১১৬১ খ্রি.
- ঘুরি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন ঘুরির মৃত্যু...
- গৃহবন্দী প্রাক্তন সেলজুক সুলতান সুলাইমান শাহের হত্যাকাণ্ড... রবিউস সানি (এপ্রিল
১১৬১ খ্রি.)
- জেরুজালেমের রাজা তৃতীয় বল্ডউইনের মৃত্যু... জিলকদ (নভেম্বর ১১৬১ খ্রি.)
৫৫৭ হিজরি ১১৬১ খ্রি.
- ফকিহ শুজা হানাফি রহ.-এর মৃত্যু, শিক্ষক: মাদ্রাসা আবু হানিফা, বাগদাদ...
- খোরাসানে প্রবল তুষারপাত ও মুষলধারে বৃষ্টি, ফসল ধ্বংস...

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

৫৫৮ হিজরি ১১৬২-১১৬৩ খ্রিস্টাব্দ

- মুওয়াহহিদুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মুমিনের মৃত্যু জমাদিউল আখিরা (মে ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

৫৫৯ হিজরি ১১৬৩-১১৬৪ খ্রিস্টাব্দ

- রোম সম্রাটের আক্রমণ এবং কিলিজ আরসালানের হাতে পরাজয়
- শিরকুহ-এর মিশরে প্রথম অভিযান, বনু উবাইদের বিদ্রোহী দিরগামের দমন জমাদিউল আখিরা (মে ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দ)
- নুরগদিন জঙ্গির হারিম দখল, শীর্ষস্থানীয় ক্রুসেডার শাসকদের বন্দীকরণ রমজান (আগস্ট ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দ)

৫৬০ হিজরি ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ

- জর্জীয়দের আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ায় লুটতরাজ

৫৬১ হিজরি ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ

- হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর মৃত্যু

৫৬২ হিজরি ১১৬৬-১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ

- শিরকুহ-এর মিশরে দ্বিতীয় অভিযান রবিউস সানি (ফেব্রুয়ারি ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ)
- শিরকুহ-এর দুই হাজার সৈন্যের সাথে ক্রুসেডার এবং মিশরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় ২৬ জমাদিউল আখিরা (১৮ এপ্রিল ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

৫৬৩ হিজরি ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ

- শেখ আবু নাজিব সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর মৃত্যু, ফকিহ ও সুফি
- শেখ আবু বকর সামআনি আল-মারওয়াজি (রহ.)-এর মৃত্যু, ফকিহ, ঐতিহাসিক - তারিখ বাগদাদের পরিশিষ্ট (যাইল), আল-আনসাব এবং আত-তাহবির-এর লেখক

৫৬৪ হিজরি ১১৬৮-১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ

- শিরকুহ-এর মিশরে তৃতীয় অভিযান রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দ)
- শাওয়ারের হত্যা, শিরকুহ মিশরের উজির পদে অধিষ্ঠিত ১৭ রবিউস সানি (১৮ জানুয়ারি ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ)
- শিরকুহ-এর মৃত্যু ২২ জমাদিউল আখিরা (২৩ মার্চ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ)
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবির মিশরের উজির পদে নিযুক্তি জমাদিউল আখিরার শেষভাগ (মার্চ ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ)

৫৬৫ হিজরি ১১৬৯-১১৭০ খ্রিস্টাব্দ

- দামিয়েত্তা রণাঙ্গনে ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয় ২১ রবিউল আউয়াল (১২ ডিসেম্বর ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দ)
- নুরগদিন জঙ্গির সিনজার দখল
- সিরিয়ায় ভূমিকম্প, হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ১২ শাওয়াল (২৯ জুন ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ)
- মসুলে শাসক মওদুদ বিন ইমাদউদ্দিন জঙ্গির মৃত্যু শাওয়ালের শেষভাগ (জুলাই ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ)

৫৬৬ হিজরি ১১৭০-১১৭১ খ্রিস্টাব্দ

- খলিফা মুসতানজিদ-এর ইন্তেকাল, বয়স ৪৮ বছর..... ৮ রবিউস সানি (৩০ ডিসেম্বর ১১৭০ খ্রি.)
- আল-মুসতাদি আব্বাসীর খিলাফত.....
- নুরুদ্দিন জঙ্গির মসুল বিজয়..... ১৩ জমাদিউল উলা (৩ ফেব্রুয়ারি ১১৭১ খ্রি.)
- মিশরের আদালতগুলোতে সুন্নি ফকিহদের নিয়োগ..... ২০ জমাদিউল আখিরা (১২ মার্চ ১১৭১ খ্রি.)

৫৬৭ হিজরি ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ

- মিশরে বনু উবাইদ-এর শাসনের অবসান, বনু আব্বাসের খুতবা জারি..... জুমুয়াবার ১লা মহররম (১৫ সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রি.)
- শেষ উবাইদি শাসক আদিদ-এর মৃত্যু, বয়স ২১ বছর..... ১০ মহররম (২৩ সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রি.)

৫৬৮ হিজরি ১১৭২ খ্রিস্টাব্দ

- খাওয়ারিজম শাহ আরসালান বিন আতসিজ-এর তুর্কানে খাতার সাথে যুদ্ধ
- খাওয়ারিজম শাহ আরসালান বিন আতসিজ-এর ইন্তেকাল.....
- আইয়ুবি জেনারেল কারাকুশ-এর হাতে ত্রিপোলি (লিবিয়া) ফ্রাঙ্কদের থেকে পুনরুদ্ধার.....
- নুরুদ্দিন জঙ্গির খ্রিস্টান মিত্র ইবনে লাউনের কায়সারে রোমের হাতে পরাজয়.....
- নাজমুদ্দিন আইয়ুব, সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পিতার ইন্তেকাল..... ২৭ জিলহজ (১৯ আগস্ট ১১৭৩ খ্রি.)

৫৬৯ হিজরি ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ, বিদ্রোহী আমিরদের মৃত্যুদণ্ড..... ২ রমজান (৫ মে ১১৭৪ খ্রি.)
- সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গির ইন্তেকাল..... ১১ শাওয়াল (১৪ মে ১১৭৪ খ্রি.)
- জেরুজালেমের রাজা আমালরিক-এর মৃত্যু..... জিলহজ (জুলাই ১১৭৪ খ্রি.)

৫৭০ হিজরি ১১৭৪-১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ

- আলেকজান্দ্রিয়া রণাঙ্গনে ফ্রাঙ্কদের শোচনীয় পরাজয়..... ১লা মহররম (১ আগস্ট ১১৭৪ খ্রি.)
- দামেস্ক সালাহউদ্দিন আইয়ুবির শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া..... ২৯ রবিউল আউয়াল (২৭ অক্টোবর ১১৭৪ খ্রি.)
- খাতুন মুহাম্মদ শাহ খাদিজা বিনতে আহমদ-এর ইন্তেকাল..... রমজান (এপ্রিল ১১৭৫ খ্রি.)
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবি এবং সিরিয়ার আমিরদের মধ্যে করুনে হামার যুদ্ধ..... ১৯ রমজান (১৩ এপ্রিল ১১৭৫ খ্রি.)
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবির স্বাধীনতার ঘোষণা..... শাওয়াল (মে ১১৭৫ খ্রি.)

৫৭১ হিজরি ১১৭৫-১১৭৬ খ্রিস্টাব্দ

- হাফেজ ইবনে আসাকির দামেশকি (রহ.)-এর ইন্তেকাল, তারিখ-এ-দামেস্ক-এর লেখক, বয়স ৭২ বছর..... ১১ রজব (জানুয়ারি ১১৭৬ খ্রি.)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- সুলতান আইয়ুবী এবং সিরিয়ার আমিরদের মধ্যে তিল আস-সুলতানের যুদ্ধ ৯ শাওয়াল (২২ এপ্রিল ১১৭৬ খ্রি.)
- সুলতান আইয়ুবীর ওপর বাতিনিদের আত্মঘাতী হামলা ব্যর্থ ১১ জিলকদ (২২ মে ১১৭৬ খ্রি.)
- আজারবাইজানের শাসক আরসালান বিন তুঘরিল বিন মুহাম্মদ বিন মালিক শাহ সেলজুকির মৃত্যু

৫৭২ হিজরি ১১৭৬ খ্রি.

- সালাহউদ্দীন এবং আলেপ্পো সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তি ২০ মহররম (২৯ জুলাই ১১৭৬ খ্রি.)
- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সাথে খাতুন ইসমত উদ্দীনের বিবাহ ২ রবিউল আউয়াল (৯ সেপ্টেম্বর ১১৭৬ খ্রি.)
- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কায়রো আগমন ১৬ রবিউল আউয়াল (২১ সেপ্টেম্বর ১১৭৬ খ্রি.)
- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর নির্দেশে কায়রো পুনর্নির্মাণ শুরু

৫৭৩ হিজরি ১১৭৭ খ্রি.

- রামলায় সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পরাজয় ১ জমাদিউল আখিরা (২৪ নভেম্বর ১১৭৭ খ্রি.)
- শাহাবুদ্দীন ঘুরীর হিন্দুস্তানে প্রথম আক্রমণ, মুলতান ও উচ বিজয়

৫৭৪ হিজরি ১১৭৮ খ্রি.

- শাহাবুদ্দীন ঘুরীর দ্বিতীয় আক্রমণ। গুজরাটে ভীম দেবের সাথে মোকাবেলা এবং পিছু হটা
- বাগদাদে সাহাবায়ে কেরাম-এর অবমাননাকর বইসমূহ ধ্বংস করা
- হাইস বাইস কবির মৃত্যু
- ফখরুন নিসা শুহদাহ বিনতে আবি নাসর আল-ফালাকিহার মৃত্যু, নারী মুহাদ্দিস, বয়স ৯২ বছর ১৩ মহররম (৩ জুলাই ১১৭৮ খ্রি.)

৫৭৫ হিজরি ১১৭৯ খ্রি. - ১১৮০ খ্রি.

- শাহাবুদ্দীন ঘুরীর তৃতীয় আক্রমণ। পেশোয়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বিজয়
- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর হিসনুল আহজান দখল ২২ রবিউস সানি (২৮ সেপ্টেম্বর ১১৭৯ খ্রি.)
- খলিফা মুস্তাজি আব্বাসীর মৃত্যু, বয়স ৩৫ বছর ২৯ শাওয়াল (৯ এপ্রিল ১১৮০ খ্রি.)
- খলিফা নাসির আব্বাসীর খেলাফতের সূচনা

৫৭৬ হিজরি ১১৮০ খ্রি.

- তুরান শাহ বিন নাজমুদ্দীন আইয়ুবের মৃত্যু মহররম (জুন ১১৮০ খ্রি.)
- মসুলের শাসক সাইফুদ্দীন গাজি দ্বিতীয়ের মৃত্যু ৩ সফর (১০ জুলাই ১১৮০ খ্রি.)
- শায়খ আবু তাহের সালাফি (রহ.)-এর মৃত্যু, মিশরের মুহাদ্দিস, বয়স একশ বছরের বেশি ৫ রবিউস সানি (৯ সেপ্টেম্বর ১১৮০ খ্রি.)
- শাহাবুদ্দীন ঘুরীর চতুর্থ আক্রমণ। সিন্ধুর দেবল বন্দর ও বেশ কিছু শহর বিজয়

৫৭৭ হিজরি ১১৮১ খ্রি.

- আলেপ্পোর শাসক আল-মালিক আল-সালিহ-এর মৃত্যু ২৫ রজব (৪ ডিসেম্বর ১১৮১ খ্রি.)
- ঐতিহাসিক, ‘নুজহাতুল আলিব্বা ফি তাবাকাতিল উদাবা’-এর লেখক আবুল বারাকাত আল-আনবারী (রহ.)-এর মৃত্যু...

৫৭৮ হিজরি ১১৮২ খ্রি.

- সিরিয়ার শাসক ফাররুখ শাহ-এর মৃত্যু জুমাদাল উলা (সেপ্টেম্বর ১১৮২ খ্রি.)
- ‘আস-সিলা ফি রিজালিল আন্দালুস’-এর লেখক আল্লামা ইবনে বাশকুওয়াল-এর মৃত্যু, বয়স ৮৩ বছর ৮ রমজান (১৭ জানুয়ারি ১১৮৩ খ্রি.)

৫৭৯ হিজরি ১১৮৩ খ্রি.

- সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক আলেপ্পো দখল ১৮ সফর (২৩ জুন ১১৮৩ খ্রি.)
- সালাহউদ্দিনের সেনাপতিদের প্রশংসাকারী কবি, ইসলামি নারী কবি তাকিয়া বিনতে গাইস-এর মৃত্যু, বয়স ৭৪ বছর...

৫৮০ হিজরি ১১৮৪ খ্রি.

- শাহাবুদ্দিন ঘোরীর পঞ্চম আক্রমণ। পাঞ্জাবে শিয়ালকোট দুর্গ নির্মাণ...
- মরক্কোর সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন আব্দুল মুমিন-এর মৃত্যু রজব (নভেম্বর ১১৮৪ খ্রি.)
- জেরুজালেমের রাজা কুঠরোগী চতুর্থ বন্ডউইন-এর মৃত্যু জিলকদ (মার্চ ১১৮৫ খ্রি.)

৫৮১ হিজরি ১১৮৫ খ্রি.

- মসুল অবরোধের সময় সালাহউদ্দিনের গুরুতর অসুস্থতা শাবান (নভেম্বর ১১৮৫ খ্রি.)
- সুলতান আইয়ুবীর আরোগ্য লাভ এবং মসুল সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি ৯ জিলহজ (১৩ মার্চ ১১৮৬ খ্রি.)
- মহান অন্ধ আলেম আল্লামা সুহাইলি আন্দালুসি (রহ.), ‘আর-রওদুল উনুফ’-এর লেখক-এর মৃত্যু, বয়স ৭৩ বছর...
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর স্ত্রী, দামেস্কের জামিয়া হানাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ইসমত আদ-দীন (রহ.)-এর মৃত্যু...

৫৮২ হিজরি ১১৮৬ খ্রি.

- গজনভি বংশের শেষ শাসক খসরু মালিকের মৃত্যু, গজনভি সালতানাতের অবসান...

৫৮৩ হিজরি ১১৮৭ খ্রি.

- শেখ আব্দুল মুগীস বিন জুহাইর বাগদাদী-এর মৃত্যু, বয়স ৮৩ বছর মহরম (মার্চ ১১৮৭ খ্রি.)
- হাভিনের যুদ্ধ, সিরিয়ার ফিরিজিদের চূড়ান্ত পরাজয় ২৫ রবিউস সানি (১৬ জুলাই ১১৮৭ খ্রি.)
- বাইতুল মুকাদাসের গৌরবময় বিজয় ২৭ রজব (১৩ অক্টোবর ১১৮৭ খ্রি.)

৫৮৪ হিজরি ১১৮৮ খ্রি.

- আইয়ুবী বাহিনীর কারাক দখল...

- সুলতান তুঘরিল বিন আরসালান সেলজুকির সাথে যুদ্ধে বাগদাদী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ৮ রবিউল আউয়াল (১৯ মে ১১৮৮ খ্রি.)
- আল্লামা আবু বকর আল-হাজমি (রহ.)-এর ইন্তেকাল, লেখক: আল-ইতিবার ফিন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ওয়াল আসার, আল-আমাকিন, উজলাতুল মুবতাদি ফিন নাসাব, বয়স ৩৫ বছর জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ১১৮৮ খ্রি.)
- সাহেব-ই-সাইফ ওয়া কলম উসামা বিন মুরশিদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৯৬ বছর ২৩ রমজান (২৭ নভেম্বর ১১৮৮ খ্রি.)
- কওকাব দুর্গ বিজয় ১২ জিলকদ (৩ জানুয়ারি ১১৮৯ খ্রি.)
- ৫৮৫ হিজরি ১১৮৯ খ্রি.
- তৃতীয় ক্রুসেডের সূচনা শাবান (সেপ্টেম্বর ১১৮৯ খ্রি.)
- ক্রুসেড, আক্কার মহাযুদ্ধ ২১ শাবান (৪/১৬ অক্টোবর ১১৮৯ খ্রি.)
- শামের প্রধান বিচারপতি ইবনে আবি আসরুন (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৮৭ বছর
- ফকিহ ঈসা হাক্কারি (রহ.)-এর ইন্তেকাল ৯ জিলকদ (৮ ডিসেম্বর ১১৮৯ খ্রি.)
- ৫৮৬ হিজরি ১১৯০ খ্রি.
- জার্মান সম্রাট বারবারোসার মৃত্যু ২৭ মহরম (মার্চ ১১৯০ খ্রি.)
- ক্রুসেড, মারজ-ই-আক্কার যুদ্ধ ১১ শাওয়াল (১১ নভেম্বর ১১৯০ খ্রি.)
- ক্রুসেড, নুবাতুন নাহর-এর যুদ্ধ ১২ শাওয়াল (১২ নভেম্বর ১১৯০ খ্রি.)
- জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিকের মৃত্যু ২২ জিলহজ (২০ জানুয়ারি ১১৯১ খ্রি.)
- ৫৮৭ হিজরি ১১৯১ খ্রি.
- ক্রুসেড রণাঙ্গনে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের আগমন ২৩ রবিউল আউয়াল (১৩ এপ্রিল ১১৯১ খ্রি.)
- রণাঙ্গনে ব্রিটেনের রাজা রিচার্ডের আগমন ১৩ জমাদিউল আউয়াল (৭ জুন ১১৯১ খ্রি.)
- আক্কার পতন ৭ জমাদিউল আউয়াল (১১ জুলাই ১১৯১ খ্রি.)
- হালবের নাস্তিক দার্শনিক শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদণ্ড, বয়স ৩৬ বছর ৫ রজব (২৮ জুলাই ১১৯১ খ্রি.)
- আরসুফের যুদ্ধ ১৪ শাবান (৪ সেপ্টেম্বর ১১৯১ খ্রি.)
- আসকালান ধ্বংস ১৯ শাবান (৯ সেপ্টেম্বর ১১৯১ খ্রি.)
- শামশিরে ইসলাম তাকিউদ্দিন উমরের ইন্তেকাল রমজান (অক্টোবর ১১৯১ খ্রি.)
- শাহাবুদ্দিন ঘুরীর ষষ্ঠ আক্রমণ। ভাতিভা বিজয়। তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ।
- আল্লামা নাজমুদ্দিন খাবুশানির ইন্তেকাল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

৫৮৮ হিজরি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ

- আজারবাইজানের শাসক কিজিল আরসালানের মৃত্যু
- ক্রুসেড যুদ্ধ - আল-কুদস অবরোধ জুমাদাল আখিরা (জুন ১১৯২ খ্রি.)
- ক্রুসেডারদের ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন, অবরোধ সমাপ্ত ২১ জুমাদাল আখিরা (৩ জুলাই ১১৯২ খ্রি.)
- শাহাবুদ্দিন ঘুরির সপ্তম আক্রমণ - ফাতহে মুবিন, পৃথ্বীরাজ নিহত ১ জুমাদাল আখিরা (১৩ জুন ১১৯২ খ্রি.)
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ২২ শাবান (৩ সেপ্টেম্বর ১১৯২ খ্রি.)
- ক্রুসেড যুদ্ধের মহান বীর আমির সাইফউদ্দিন মাসতুকের মৃত্যু ২৩ শাওয়াল (১ নভেম্বর ১১৯২ খ্রি.)
- কুনিয়ার শাসক কিলিজ আরসালান সানি বিন মাসউদ বিন কিলিজ আরসালান আউয়াল বিন সুলাইমানের মৃত্যু

৫৮৯ হিজরি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ

- সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (রহ.)-এর মৃত্যু ২৭ সফর (৪ মার্চ ১১৯৩ খ্রি.)
- খিলাতের শাসক সাইফউদ্দিন বাক্তিমারের মৃত্যু জুমাদাল উলা (মে ১১৯৩ খ্রি.)
- সুলতান শাহ, আলাউদ্দিন তেকিশ খোয়ারিজম শাহের ভাইয়ের মৃত্যু
- মসুলের শাসক ইজ্জুদ্দিন মাসউদের মৃত্যু

৫৯০ হিজরি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ

- শাহাবুদ্দিন ঘুরির হিন্দুস্তান আক্রমণ ও বিজয়
- তুঘরিল বিন আরসালান সেলজুকি, আলাউদ্দিন তেকিশের সাথে যুদ্ধে নিহত
- ইমাম আল-কুররা আবু মুহাম্মদ আশ-শাতিবি আল-আন্দালুসি সুন্মাল মিসরি (রহ.), ‘হারজুল আমানি’-র রচয়িতার মৃত্যু, বয়স ৫২ বছর
- আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.)-এর আহলে সুন্নাতে ও কালতির কারণে ওয়াসিত জেলে বন্দি হওয়া

৫৯১ হিজরি ১১৯৪-১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ

- আন্দালুসে জালাকার দ্বিতীয় যুদ্ধ, ইয়াকুব বিন ইউসুফের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিজয়, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার খ্রিস্টান নিহত ৯ শাবান (১৯ জুলাই ১১৯৫ খ্রি.)
- শাম ও মিসরে আইয়ুবি শাহজাদাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত
- চতুর্থ ক্রুসেড যুদ্ধ, জার্মান রাজা হেনরি ষষ্ঠের আক্রমণ ও ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন

৫৯২ হিজরি ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ

- সালাহউদ্দিনের পুত্র আল-আফজাল ক্ষমতাচ্যুত, আল-মালিকুল আদিলের শাসনের সূচনা
- ইয়াকুব বিন ইউসুফের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আরও একটি গৌরবময় বিজয়, তলেতলার অবরোধ

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- শাহাবুদ্দিন ঘুরীর হিন্দুস্তানে অষ্টম আক্রমণ ৫৯৩ হিজরী ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ
- আল-মালিকুল আদিলের ইয়াফা দখল
- ফিরিঙ্গিদের বৈরুত দখল ৫৯৪ হিজরী ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
- আবদাল-এ-ওয়াক্ত আবু আলী ফারসী রহ., বয়স ৯০ বছর মহররম (নভেম্বর ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এ ইন্তেকাল
- সিনজারের শাসক ইমাদুদ্দিন বিন মওদুদ বিন ইমাদুদ্দিন জঙ্গীর ইন্তেকাল
- আলাউদ্দিন তাকিশের তুর্কানে খাতার সাথে যুদ্ধ, বুখারা বিজয় ৫৯৫ হিজরী ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ
- কাজী ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী রহ., ফকীহ, দার্শনিক, সাহিত্যিক-এর ইন্তেকাল সফর (ডিসেম্বর ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. ওয়াসিতের কারাগার থেকে পাঁচ বছর পর মুক্তি
- আল-মালিকুল আযীয বিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ইন্তেকাল
- আইয়ুবী বংশে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
- মরক্কো ও আন্দালুসের আমীর ইয়াকুব বিন ইউসুফের ইন্তেকাল
- ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রহ.-এর হেরাত থেকে নির্বাসন ৫৯৬ হিজরী ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ - ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ
- আলাউদ্দিন তাকিশের ইন্তেকাল ১৯ রমজান ৫৯৬ হিজরী (৩ জুলাই ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)
- আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের শাসন ২০ শাওয়াল (১৩ আগস্ট ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)
- মিশর ও সিরিয়ার ওপর আল-মালিকুল আদিলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, আল-আফদাল বঞ্চিত
- নীল নদে অনাবৃষ্টি ৫৯৭ হিজরী ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ - ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ
- আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ.-এর ইন্তেকাল ১৩ রমজান (জুন ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ)
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাতিব ইমাদ ইসফাহানীর ইন্তেকাল ১লা রমজান (৪ জুন ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ)
- এশিয়ায় ভূমিকম্প, মিশরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু
- সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনাপতি আমীর কারাকুশের ইন্তেকাল
- কাযিউল কুযাত মুহিউদ্দিন ইবনে জাকি আবুল মাআলী রহ.-এর ইন্তেকাল, বয়স ৪৪ বছর, ২৮ বছর বয়সে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

...এর পর মিশরে প্রথম খুতবা প্রদানকারী.....

৫৯৮ হিজরী ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ

- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর আমীরুল বাহর হুসামুদ্দীন লুলুর মৃত্যু সফর (নভেম্বর ১২০১ খ্রি.)

৫৯৯ হিজরী ১২০২ খ্রি. - ১২০৩ খ্রি.

- প্রচুর পরিমাণে উল্কাপাতের কারণে কিয়ামত-ই-সুগরা ২৯ মহররম (১৬/১৭ অক্টোবর ১২০২ খ্রি.)
- আবুল হাসান ইবনে নাজিবা (ইবনে নাজা) আল-ওয়ায়েজ রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৯১ বছর রমজান (জুন ১২০৩ খ্রি.)
- সমগ্র সিরিয়া ও মিশরের ওপর আল-মালিক আল-আদিলের শাসন প্রতিষ্ঠিত
- সুলতান গিয়াসউদ্দীন ঘুরীর মৃত্যু, শিহাবুদ্দীন ঘুরী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৬০০ হিজরী ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ

- হাফেজ আব্দুল গনি আল-মাকদিসি রহ.-এর মৃত্যু, তিনি আল-কামাল ফি আসমাউর রিজাল, আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আদ-দুররাতুল মুদিয়্যাহ ফিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ-এর লেখক, বয়স ৫৪ বছর
- মুহাদ্দিসা খাতুন ফাতিমা বিনতে সাদ আল-মিসরিয়্যাহ রহ.-এর মৃত্যু, তিনি ওয়ায়েজ ইবনে নাজা রহ.-এর স্ত্রী ছিলেন, বয়স ৮৭ বছর রবিউল আউয়াল (নভেম্বর ১২০৩ খ্রি.)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সপ্তম হিজরি শতাব্দী

ফিরিজ্জিদের কনস্টান্টিনোপল দখল, কায়সার ক্ষমতাহীন ৬০১ হি. / ১২০৪ খ্রি.

ইসলামি সীমান্তে জর্জিয়ানদের আক্রমণ

ইবনে লাউনের আলেপ্পোর শহরতলিতে লুটতরাজ ৬০২ হি. / ১২০৫ খ্রি.

শাহাবুদ্দিন ঘুরির হিন্দুস্তানে দশম আক্রমণ - গাখ্খরদের দমন

ঝিলামের নিকট সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরির শাহাদাত... ১লা শাবান (১৩ মার্চ ১২০৫ খ্রি.)

কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লিতে প্রথম স্বাধীন মুসলিম সরকারের ভিত্তি স্থাপন করেন... ১৮ই

জিলকদ (২৭ জুন ১২০৬ খ্রি.)

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খোয়ারিজম শাহ নিশাপুর থেকে খোরাসান দখল করেন ৬০৩

হি. / ১২০৬ খ্রি.

খোয়ারিজম শাহ এবং কারাকিতাই তুর্কিদের মধ্যে যুদ্ধ, খোয়ারিজম শাহ বন্দি ৬০৪

হি. / ১২০৭-১২০৮ খ্রি.

কবি ইবনে সাআতির মৃত্যু, বয়স ৫১ বছর... রমজান (এপ্রিল ১২০৮ খ্রি.)

খোয়ারিজম শাহের মুক্তি ৬০৫ হি. / ১২০৮ খ্রি.

খোয়ারিজম শাহের হাতে কারাকিতাই তুর্কিদের শোচনীয় পরাজয়, শাহ তানিগু বন্দি ৬০৬ হি. / ১২০৯ খ্রি.

৬০৬ হি. / ১২০৯ খ্রি.

নারী মুহাদ্দিস আফিফা বিনতে আহমদ (রহ.)-এর মৃত্যু... রবিউস সানি (অক্টোবর ১২০৯

খ্রি.)

ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাজি (রহ.)-এর মৃত্যু... ১লা শাওয়াল (২৮ মার্চ ১২১০ খ্রি.)

আল্লামা ইবনুল আসির মুবারক বিন মুহাম্মদ আল-জাযারি (রহ.)-এর মৃত্যু; মুহাদ্দিস,

মুতাকাল্লিম, ভাষাবিদ, “আন-নিহায়াহ ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল আসার” ও “জামি আল-

উসুল ফি আহাদিসির রাসুল”-এর লেখক... ৩০শে জিলহজ (২৬ জুলাই ১২১০ খ্রি.)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

৬০৭ হিজরি ১২১০ খ্রিষ্টাব্দ

- মুহাদ্দিসা আয়েশা বিনতে মুয়ান্মার (রহ.)-এর ইন্তেকাল রবিউস সানি (অক্টোবর ১২১০ খ্রি.)
- মুহাদ্দিসা তাকিয়া বিনতে মুহাম্মদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল জিলকদ (এপ্রিল ১২১১ খ্রি.)

৬০৮ হিজরি ১২১১ খ্রি. - ১২১২ খ্রি.

- বাতিনি প্রধান জালালুদ্দিন হাসানের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা
- কবি ও সাহিত্যিক কাজী ইবনে সানাউল মুলক বিন জাফর-এর ইন্তেকাল, বয়স ৬৩ বছর রমজান (ফেব্রুয়ারি ১২১২ খ্রি.)

৬০৯ হিজরি ১২১২ খ্রি.

- মুওয়াহহিদিন ও ক্রুসেডারদের মধ্যে আল-উকাবের যুদ্ধ, মুসলমানদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি

৬১০ হিজরি ১২১৩ খ্রি.

- আন্দালুসের শাসক মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন ইউসুফ বিন আব্দুল মুমিনের ইন্তেকাল শাবান (ডিসেম্বর ১২১৩ খ্রি.)

৬১১ হিজরি ১২১৪ খ্রি.

- আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারেজম শাহ কর্তৃক কিরমান, মাকরান ও সিন্ধু দখল

৬১২ হিজরি ১২১৫ খ্রি.

- ইসলামি সীমান্তে জর্জীয়দের আক্রমণ, এক লক্ষ মুসলমান বন্দি

- খাওয়ারেজম শাহ কর্তৃক গজনী দখল

৬১৩ হিজরি ১২১৬ খ্রি.

- হালাবের শাসক আল-মালিকুজ জাহির বিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ইন্তেকাল ২০ জমাদিউস সানি (৪ অক্টোবর ১২১৬ খ্রি.)

৬১৪ হিজরি ১২১৭ খ্রি.

- বাগদাদে খাওয়ারেজম শাহের ব্যর্থ সামরিক অভিযান শাবান (নভেম্বর ১২১৭ খ্রি.)
- মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ও পর্যটক ইবনে জুবারের আন্দালুসি (রহ.)-এর ইন্তেকাল শাবান (নভেম্বর ১২১৭ খ্রি.)
- পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা, আইন জালুত ও বাইসানে ক্রুসেডারদের লুটতরাজ রমজান (ডিসেম্বর ১২১৭ খ্রি.)

৬১৫ হিজরি ১২১৮ খ্রি.

- মিশরে ক্রুসেডারদের আক্রমণ, দামিয়াত অবরোধ সফর (মে ১২১৮ খ্রি.)
- মিশর ও শামের শাসক আল-মালিকুল আদিলের ইন্তেকাল, বয়স ৭২ বছর ৭ জমাদিউস সানি (সেপ্টেম্বর ১২১৮ খ্রি.)
- চেঙ্গিস খান ও খাওয়ারেজম শাহের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি জিলকদ (ফেব্রুয়ারি ১২১৮ খ্রি.)

- কোনিয়ার শাসক কায়কাউস বিন খুসরু বিন কিলিজ আরসালান সানির ইন্তেকাল

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- তৌশিয়াতে আলাউদ্দিন কায়কোবাদের শাসনের সূচনা ৬১৬ হিজরি / ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ
- মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে চেঙ্গিস খানের অগ্রযাত্রার সূচনা রজব (সেপ্টেম্বর ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ)
- ক্রুসেড যুদ্ধ অব্যাহত, ফরাসিদের দিময়াত দখল ২৭ শাবান (৭ নভেম্বর ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ)
- সীমান্তে খাওয়ারেজম শাহের শোচনীয় পরাজয় জিলকদ (জানুয়ারি ১২২০ খ্রিস্টাব্দ)
- সিতুশ শাম (রহ.)-এর ইন্তেকাল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বোন জিলকদ (২২ জানুয়ারি ১২২০ খ্রিস্টাব্দ)
- ৬১৭ হিজরি ১২২০ খ্রিস্টাব্দ
- ক্রুসেড যুদ্ধ। মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণ, দিময়াতে দশ হাজার ফরাসি নিহত
- বুখারার পতন মহররম (মার্চ ১২২০ খ্রিস্টাব্দ)
- সমরকন্দের পতন রবিউল আউয়াল (মে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ)
- তাতারীরা পুরো মধ্য এশিয়া দখল করে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত
- আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারেজম শাহের ইন্তেকাল শাবান (অক্টোবর ১২২০ খ্রিস্টাব্দ)
- ৬১৮ হিজরি ১২২১ খ্রিস্টাব্দ
- খাওয়ারেজম সাম্রাজ্যের রাজধানী উরগঞ্জ-এর পতন, বারো লক্ষ লোক নিহত সফর ৬১৮ হিজরি (এপ্রিল ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- ইমাম নাজমুদ্দিন কুবরা (রহ.) উরগঞ্জ রক্ষায় শহীদ
- নিশাপুরের পতন, আট লক্ষ লোক নিহত ১২ সফর (৭ এপ্রিল ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- নিশাপুরে ‘পন্দ নামা’-র লেখক খাজা ফরিদউদ্দিন আত্তার শহীদ
- আবু বকর বিন সাফফার নিশাপুরী (রহ.) শহীদ, বয়স ৮৫ বছর
- হেরাতের পতন, ষোল লক্ষ লোক নিহত রবিউল আউয়াল ৬১৮ হিজরি (মে ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- মুহাদিসে আজম আব্দুল মুইজ বিন আবুল ফজল আল-বাজজাজ (রহ.) হেরাতে শহীদ
- সুলতান জালালউদ্দিন খাওয়ারেজম শাহের মোকাবিলায় তাতারীদের পরাজয় রজব ৬১৮ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি, দিময়াতের ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ, ফরাসি আমিরদের বন্দিত্ব ৯ রজব (২৮ আগস্ট ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- পরওয়ানে তাতারীদের দ্বিতীয় পরাজয় রমজান ৬১৮ হিজরি (অক্টোবর ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- সিন্ধু নদের যুদ্ধ, সুলতান জালালউদ্দিনের নদীতে ঝাঁপ ৮ শাওয়াল (২৪ নভেম্বর ১২২১ খ্রিস্টাব্দ)
- ৬১৯ হিজরি ১২২২ খ্রিস্টাব্দ
- সুলতান জালালউদ্দিনের হিন্দুস্তানে বিজয় অভিযান

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমাহ (তৃতীয় খণ্ড)

- তাতারীদের রুশ অঞ্চল দখল ৬২০ হিজরি ১২২৩ খ্রি.
- সুলতান মুওয়াহহিদিন মুসতানসির বিল্লাহ আবু ইয়াকুব ইবনে ইউসুফের মৃত্যু শাওয়াল (নভেম্বর ১২২৩ খ্রি.)
- ৬২১ হিজরি ১২২৪ খ্রি.
- সুলতান জালালুদ্দিনের ইরানে আগমন, আজারবাইজান দখল
- মরক্কোর শাসক আব্দুল ওয়াহিদ বিন আবু ইয়াকুবের হত্যাকাণ্ড শাবান (সেপ্টেম্বর ১২২৪ খ্রি.)
- ৬২২ হিজরি ১২২৫ খ্রি.
- সুলতান জালালুদ্দিনের মারাগা দখল জুমাদিউল আখিরা-র মাঝামাঝি (জুন ১২২৫ খ্রি.)
- সুলতান জালালুদ্দিনের তাবরিজ দখল ১৭ রজব (২৫ জুলাই ১২২৫ খ্রি.)
- সুলতান জালালুদ্দিনের জর্জিয়ায় প্রথম আক্রমণ শাবান (আগস্ট ১২২৫ খ্রি.)
- আল-মালিক আল-আফজাল বিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মৃত্যু সফর (ফেব্রুয়ারি ১২২৫ খ্রি.)
- খলিফা নাসির আব্বাসীর মৃত্যু ২৯ রমজান (১৬ অক্টোবর ১২২৫ খ্রি.)
- আয-যাহির আব্বাসী রহ.-এর সিংহাসন আরোহণ
- ৬২৩ হিজরি ১২২৬ খ্রি.
- তিফলিসের ওপর সুলতান জালালুদ্দিনের দখল ৮ রবিউল আউয়াল (৮ মার্চ ১২২৬ খ্রি.)
- খলিফা যাহির আব্বাসী রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৫৩ বছর, খিলাফতের মেয়াদ ছয় মাস ১৩ রজব (২৩ জুলাই ১২২৬ খ্রি.)
- মুসতানসির বিল্লাহ আব্বাসীর খিলাফত
- আল্লামা আব্দুল কারীম রাফেয়ী আশ-শাফেয়ী রহ.-এর মৃত্যু, ‘আত-তাদউইন ফি আখবার কাজউইন’-এর লেখক জিলহজ মাসের শেষ দিকে (২১ ডিসেম্বর ১২২৬ খ্রি.)
- ৬২৪ হিজরি ১২২৬-১২২৭ খ্রি.
- তাতারীদের সাথে সুলতান জালালুদ্দিনের যুদ্ধ, পাল্লা সমান শাবান ৬২৪ হিজরি (জুলাই ১২২৭ খ্রি.)
- চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ৪ রমজান (১৮ আগস্ট ১২২৭ খ্রি.)
- দামেস্কের শাসক আল-মালিক আল-মুয়াজ্জমের মৃত্যু ৩০ জিলকদ (২২ নভেম্বর ১২২৭ খ্রি.)
- ৬২৫ হিজরি ১২২৭ খ্রি.
- ষষ্ঠ ক্রুসেড - জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আক্রমণ
- আল-কুদস সম্পর্কে আল-মালিক আল-কামিল এবং ফিরিজিদের মধ্যে আলোচনা
- ইসফাহানে তাতারীদের বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দিনের বিজয় ২৪ রমজান (২৪ আগস্ট ১২২৮ খ্রি.)

সপ্তম খণ্ড

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

৬২৬ হিজরি ১২২৮ খ্রি.

- চুক্তির অধীনে আল-কুদস ফ্রাঙ্কদের হাতে হস্তান্তর.....
- আল-মালিক আল-কামিল এবং তার ভাতিজা আল-মালিক আল-মুয়াজ্জামের পুত্র নাসিরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ.....
- মুজামুল বুলদান ও মুজামুল মুসান্নিফীন-এর লেখক ইয়াকুত আল-হামাভী (রহ.)-এর ইন্তেকাল।

৬২৭ হিজরি ১২২৯ খ্রি.

- সুলতান জালালুদ্দিন খিলাত দখল করেন..... ২৮ জুমাদাল উলা (১৪ এপ্রিল ১২২৯ খ্রি.)
- কোনিয়া ও মিশরের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দিনের পরাজয়..... ২৮ রমজান (১৯ আগস্ট ১২২৯ খ্রি.)

৬২৮ হিজরি ১২৩০ খ্রি.

- তাতারীরা আজারবাইজান দখল করে.....
- সুলতান জালালুদ্দিনের নিখোঁজ হওয়া..... শাওয়াল (আগস্ট ১২৩১ খ্রি.)

৬২৯ হিজরি ১২৩১ খ্রি.

- দার্শনিক ও সাহিত্যিক মুওয়াফফাক আব্দুল লতিফ বিন ইউসুফ বাগদাদীর ইন্তেকাল..... ১২ মহরম (৮ নভেম্বর ১২৩১ খ্রি.)
- তাতারীরা বাগদাদের নিকটবর্তী শাহরজোরে তাবু স্থাপন করে। খলিফা মুস্তানসির বাগদাদ রক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন.....

৬৩০ হিজরি ১২৩২ খ্রি.

- কোনিয়ার শাসকের আল-জাজিরা ও হাররান দখল.....
- মুওয়াহহিদুন সুলতান ইদ্রিস বিন ইয়াকুবের ইন্তেকাল.....
- ইসলামের ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনুল আসীর আল-জাযারী (রহ.)-এর ইন্তেকাল, বয়স ৭৫ বছর..... ২৫ শাবান (৫ জুন ১২৩৩ খ্রি.)
- আরবেলের শাসক মুজাফফরুদ্দিন কুকুবরীর ইন্তেকাল, বয়স ৮১ বছর..... ১৪ রমজান (২৪ জুন ১২৩৩ খ্রি.)

৬৩১ হিজরি ১২৩৩ খ্রি.

- সুলতান সালাহউদ্দিনের চিকিৎসক আবুল হাজ্জাজ ইউসুফের ইন্তেকাল, বয়স ৭৯ বছর..... ১০ মহরম (১৬ অক্টোবর ১২৩৩ খ্রি.)
- মিশরের শাসক আল-মালিক আল-কামিল কোনিয়ার শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন.....
- বদরুদ্দিন লুলু কর্তৃক মসুল দখল, আতাবেগ রাজবংশের শাসনের অবসান.....
- বাগদাদে মুস্তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন.....

৬৩২ হিজরি ১২৩৪ খ্রি.

- শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহ.)-এর ইন্তেকাল..... মহরম (অক্টোবর ১২৩৪ খ্রি.)
- ইসফাহানে তাতারীদের সাথে যুদ্ধ, ডজন ডজন আলেম এবং হাজার হাজার মুসলমান শহীদ.....

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ রহ.-এর মৃত্যু, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উপদেষ্টা ও জীবনীকার...

৬৩৩ হিজরি ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দ

- তাতারীদের মসুল পর্যন্ত আক্রমণ, বাগদাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার...
- আল-মালিক আল-কামিল কুনিয়ার শাসকের কাছ থেকে আল-জাজিরা অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন...
- ঐতিহাসিক কাইলুবীর মৃত্যু, বয়স ৭০ বছর...
- বিদুষী নারী জোহরা বিনতে মুহাম্মদ রহ.-এর মৃত্যু, বয়স ৯৭ বছর... জমাদিউল উলা (জানুয়ারি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ)
- ইবনে দাহিয়া আন্দালুসী, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের মৃত্যু...

৬৩৪ হিজরি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ

- নারী মুহাদ্দিস ইয়াসমিন বিনতে সালেম রহ.-এর মৃত্যু... ১০ মহরম (১৩ সেপ্টেম্বর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ)
- তাতারীদের আরবিল দখল, সাধারণ জনগণের গণহত্যা...
- কুনিয়ার শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদের মৃত্যু...
- শেখ আবুল হাসান কাতিয়ী রহ.-এর মৃত্যু, বাগদাদের জামিয়া মুসতানসিরিয়ার প্রথম প্রধান শিক্ষক...

৬৩৫ হিজরি ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ

- ওকুফায় তাতারীদের সাথে যুদ্ধে বাগদাদী বাহিনীর পরাজয়...
- সিরিয়ায় আইয়ুবী বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও লড়াই...
- সিরিয়া ও মিশরের সুলতান আল-মালিক আল-কামিলের মৃত্যু, বয়স ৫৯ বছর... ২১ রজব (২০ মার্চ ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

৬৩৬ হিজরি ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ

- সিরিয়া ও মিশরের ওপর আল-মালিক আল-সালিহ বিন কামিলের দখল মজবুত...

৬৩৭ হিজরি ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ

- সিরিয়ায় আইয়ুবী বংশের পারস্পরিক সংঘাত অব্যাহত...
- আল-মালিক আল-সালিহ আইয়ুব মিশরের বাদশাহ হলেন...

৬৩৮ হিজরি ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ

- আল-মালিক আল-সালিহ ইসমাইল সাকিফ দুর্গ ফিরিজিদের হাতে তুলে দেন...
- আল্লামা ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম রহ. আল-মালিক আল-সালিহ ইসমাইলের সমালোচনা করার কারণে কারারুদ্ধ...

৬৩৯ হিজরি ১২৪১ খ্রিস্টাব্দ

- তাতারীদের ইসফাহান দখল...

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

৬৪০ হিজরি ১২৪২ খ্রি.

- খলিফা মুস্তানসির আব্বাসীর মৃত্যু ১০ জুমাদাল আখিরা (৫ ডিসেম্বর ১২৪২ খ্রি.)
- মুস্তাসিম বিল্লাহর খিলাফত, বাগদাদের শেষ আব্বাসী খলিফা।
- মরক্কোর শাসক আব্দুল ওয়াহিদ বিন ইদ্রিস (আবু মুহাম্মদ বিন মামুন)-এর মৃত্যু

৬৪১ হিজরি ১২৪৩ খ্রি.

- তাতারীরা কুনিয়া সরকারকে করদ রাজ্যে পরিণত করে। দৈনিক এক হাজার দিনার কর ধার্য করা হয়

৬৪২ হিজরি ১২৪৪ খ্রি.

- মিশরের শাসক আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুব এবং দামেস্কের শাসক আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইলের মধ্যে চরম উত্তেজনা
- আসকালানে মিশরীয় ও খাওয়ারিজমি বাহিনীর দামেস্ক ও তার মিত্র ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় জুমাদাল উলা (অক্টোবর ১২৪৪ খ্রি.)

৬৪৩ হিজরি ১২৪৫ খ্রি.

- আল্লামা সাখাভী (রহ.)-এর মৃত্যু, শারহে মাতনে শাতিবিয়্যাহ ১২ জুমাদাল আখিরা (৪ নভেম্বর ১২৪৫ খ্রি.)
- খাওয়ারিজমি ও মিশরীয় বাহিনী দামেস্ক অবরোধে ব্যস্ত, আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইলের পলায়ন
- সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বোন রাবিয়া খাতুন (রহ.)-এর মৃত্যু, বয়স ৮০ বছর

৬৪৪ হিজরি ১২৪৬ খ্রি.

- আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইলের শাসনের অবসান
- আল-মালিকুস সালিহ আইয়ুবের বিজয়ী বেশে দামেস্কে প্রবেশ ফিলকদ (মার্চ ১২৪৬ খ্রি.)

৬৪৫ হিজরি ১২৪৭ খ্রি.

- মিয়াফারিকিনের শাসক আল-মালিকুল মুযাফফর শিহাবুদ্দীন গাজীর মৃত্যু

৬৪৬ হিজরি ১২৪৮ খ্রি.

- দামেস্কে উদ্ভিদবিদ হাকীম ইবনুল বাইতার আল-মালিকীর মৃত্যু শাবান (নভেম্বর ১২৪৮ খ্রি.)
- ইশবিলিয়ার ওপর ক্রুসেডারদের দখল শাবান (নভেম্বর ১২৪৮ খ্রি.)
- ইশবিলিয়ায় শায়খে আন্দালুস আবুল হাসান আলী বিন জাবির (রহ.)-এর মৃত্যু
- মুওয়াহহিদুন শাসক আলী বিন মামুন (আল-মুতাদিদ আবুল হাসান)-এর মৃত্যু।
- হালবের উজির, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আল-কিফতির মৃত্যু।

৬৪৭ হিজরি ১২৪৯ খ্রি.

- সপ্তম ক্রুসেড শুরু। ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইসের আক্রমণ।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

- ফরাসিদের দমিয়াত দখল রবিউল আউয়াল (জুন ১২৪৯ খ্রি.)
- আল-মালিক আস-সালিহ আইয়ুবের মানসুরা (কায়রো)-তে ইন্তেকাল, বয়স ৪৪ বছর ১৫ শাবান (২২ নভেম্বর ১২৪৯ খ্রি.)
- আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম তুরান শাহ মিসরের নতুন শাসক নিযুক্ত
- কায়রোতে ফরাসিদের আক্রমণ, মিসরের নায়েব ফখরুদ্দিন বিন শেখ শহীদ জিলকদ (ফেব্রুয়ারি ১২৫০ খ্রি.)
- ৬৪৮ হিজরি ১২৫০ খ্রি.
- ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদের গৌরবময় বিজয়, ফ্রান্সের রাজা বন্দি ১লা মহররম (৫ এপ্রিল ১২৫০ খ্রি.)
- বিদ্রোহে আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম তুরান শাহ নিহত, রানী শাজারাতুদ দুর-এর শাসন শুরু
- দমিয়াত পুনরুদ্ধার
- দশ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ফ্রান্সের রাজার মুক্তি সফর (মে ১২৫০ খ্রি.)
- আমির ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি, আল-মালিক আল-মুইজ উপাধি নিয়ে মিসরের নতুন রাজা হলেন
- সিরিয়ার ওপর আলেপ্পোর শাসক আল-মালিক আন-নাসিরের দখল
- ৬৪৯ হিজরি ১২৫১ খ্রি.
- সিরিয়া ও মিসর সরকারের মধ্যে উত্তেজনা
- ৬৫০ হিজরি ১২৫২ খ্রি.
- তাতারদের হাতে দিয়ার বকর-এ মুসলমানদের গণহত্যা
- ৬৫১ হিজরি ১২৫৩ খ্রি.
- ইজ্জুদ্দিন আইবেক তুর্কমানির তত্ত্বাবধানে আল-মালিক আল-আশরাফ মিসরের নামমাত্র শাসক নিযুক্ত
- ৬৫২ হিজরি ১২৫৪ খ্রি.
- ইজ্জুদ্দিন তুর্কমানি রানী শাজারাতুদ দুর-কে বিয়ে করে মিসরের স্বাধীন শাসক নিযুক্ত
- বাহরি মামলুক অফিসার রুকনুদ্দিন বাইবার্গের সিরিয়ার শাসক আন-নাসিরের দরবারে যোগদান
- ৬৫৩ হিজরি ১২৫৫ খ্রি.
- শেখ জিয়াউদ্দিন সাকর বিন ইয়াহইয়া রহ.-এর ইন্তেকাল, আলেপ্পোর ফকিহ ১৮ সফর (২৯ মার্চ ১২৫৫ খ্রি.)
- ৬৫৪ হিজরি ১২৫৬ খ্রি. - ১২৫৭ খ্রি.
- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মদিনার পার্শ্ববর্তী আশ্মেয়গিরি থেকে অগ্নি উদগিরণ শুরু
- বাগদাদে ভয়াবহ বন্যা
- মসজিদে নববীতে অগ্নিকাণ্ড

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

- হালাকু খানের আবির্ভাব, বাতিনিদের অপরাজেয় দুর্গ আলমুত দখল।
- সূফী বুজুর্গ নজমউদ্দীন রাজি রহ.-এর ইন্তেকাল।
- লেখক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আবুল মুজাফফর সিবত ইবনুল জাওজি রহ.-এর ইন্তেকাল... ২১ জিলহজ (৯ জানুয়ারি ১২৫৭ খ্রি.)।
- ৬৫৫ হিজরি ১২৫৭ খ্রি.
- হালাকু খানের আলমুত দখল। বাতিনিদের সালতানাতের অবসান।
- বাগদাদে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা।
- বাগদাদের দিকে হালাকু খানের অগ্রযাত্রা.....
- রুকনউদ্দীন বাইবার্দের সিরিয়া ত্যাগ করে মিসরীয় দরবারে যোগদান.....
- মিসরের সুলতান ইজ্জউদ্দীন তুর্কমানির নিজ স্ত্রী শাজারাতুদ দুরের ষড়যন্ত্রে হত্যাকাণ্ড.....
- ইজ্জউদ্দীন তুর্কমানির অনুগতদের হাতে রানী শাজারাতুদ দুরের হত্যাকাণ্ড।
- কুতুজের তত্ত্বাবধানে ইজ্জউদ্দীনের অল্পবয়স্ক পুত্র নূরউদ্দীন আল-মানসুর উপাধিতে মিসরের বাদশাহ নিযুক্ত।
- ৬৫৬ হিজরি ১২৫৮ খ্রি.
- হালাকু খান বাগদাদের বাইরে পৌঁছে গেলেন, অবরোধ শুরু..... ১২ মহররম ৬৫৬ হিজরি (১৯ জানুয়ারি ১২৫৮ খ্রি.)।
- পরিবারসহ খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর শাহাদাত, বাগদাদের আবাসীয় খিলাফতের অবসান..... ১৪ সফর ৬৫৬ হিজরি (৪ মার্চ ১২৫৮ খ্রি.)।
- বাগদাদে গণহত্যা, ১৮ লক্ষ মানুষ শহীদ.....

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (সপ্তম খণ্ড)

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলির উত্তর

এই পৃষ্ঠাগুলোতে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে যেগুলোর সম্পর্ক ইতিহাসের সাথে এবং সরাসরি সাক্ষাতে বা ডাকযোগে অথবা অন্যান্য মাধ্যমে (ই-মেইল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ) এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। লেখক পূর্ণ চেষ্টা করেছেন যেন ভারসাম্য ও ন্যায়ে গণ্ডির মধ্যে থেকে পাঠকদের সেই কথাই জানানো হয় যা দলিলের আলোকে প্রমাণিত। ওয়াল্লাহুল মুওয়াফফিক।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে কিছু সংশয়

প্রশ্ন: একটি বর্ণনা আছে যে, ইমাম আবু হানিফা জ্ঞান অর্জন শুরু করার আগে চিন্তা করতে শুরু করেন যে, কোন জ্ঞান থেকে কী পদ এবং কত টাকা পাওয়া যাবে। তিনি ক্বারী, মুহাদ্দিস, কবি, ইলমে কালামের বিশেষজ্ঞসহ প্রতিটি জ্ঞান থেকে অর্জিত মর্যাদার বিষয়ে চিন্তা করেন। ক্বারী হওয়ার পরিণতি এই জানা গেল যে, মসজিদে বসে কুরআন পড়াতে হবে, আশেপাশে শিশুরা বসে থাকবে, তারপর কোনো বড় ক্বারী চলে আসলে মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে। মুহাদ্দিস হওয়ার শেষ পরিণতি এই জানা গেল যে, বার্ষিক্যে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং শিশুরা এসে হাদীস পড়বে, কোনো বর্ণনা ভুলভাবে উদ্ধৃত হয়ে গেলে “কাজ্জাব” (মিথ্যাবাদী) অপবাদ লেগে যাবে। ইলমে কালাম শেখা থেকে এই ভেবে বিরত থাকলেন যে, আকিদাগত বিতর্কে কোথাও পা পিছলে গেলে জিন্দিক হওয়ার অপবাদ লেগে যাবে। ফলে ইমাম সাহেব এই সমস্ত জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর জানা গেল যে, ফিকহ শিখে তিনি কাজী হতে পারবেন, তাই ফিকহ শেখা শুরু করলেন। এই বর্ণনাটি কি সঠিক?

উত্তর: এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এর সারকথা হলো ইমাম সাহেব সরকারি পদের প্রত্যাশী ছিলেন, অথচ তাঁর জীবন সাক্ষী যে, তিনি শাসকদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সরকারি পদগুলো প্রত্যাখ্যান করে গেছেন এবং সারাজীবন পদ থেকে দূরে ছিলেন। হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এর সনদে কিছু বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নন।

এর পর হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি বানোয়াট হওয়ার বেশ কিছু প্রমাণ পেশ করেছেন: প্রথমত, মসজিদের চেয়ে উত্তম কোনো জায়গা নেই এবং নিষ্পাপ শিশুদের কুরআন মাজীদ পড়ানোর চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই, সুতরাং ইমাম আবু হানিফা এই কাজকে কীভাবে তুচ্ছ মনে করতে পারতেন।

একইভাবে এই বর্ণনায় আছে যে, তিনি শিশুদের সাহচর্য এবং স্মৃতিশক্তিতে ঘাটতি আসার ভয়ে ইলমে হাদীস শেখেননি, অথচ এটি প্রমাণিত যে তিনি মুহাদ্দিসগণের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন এবং হাদীস শেখার ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাছাড়া শিশুদের হাদীস শেখার ধারা তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর পর শুরু হয়েছে। সেই যুগে তো বড় বড় ওলামায়ে কেরাম হাদীস শিখতেন এবং ফিকহের জন্য কুরআনের পর হাদীসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইমাম সাহেব এটি থেকে বিমুখ কীভাবে হতে পারতেন। বানোয়াট হওয়ার আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো এতে এটিও উল্লেখ আছে যে, ইমাম সাহেব “ইলমে কালাম” শেখার ইচ্ছা করেছিলেন। ‘নাজারতু ফিল কালাম মা ইয়াকুনু আখিরুহ’, অথচ তাঁর যুগে ইলমে কালামের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

ফলে হাফেজ জাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: “আমি বলি, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন যে এই কাহিনীটি বানিয়েছে। সেই যুগে কি ইলমে কালামের কোনো অস্তিত্ব ছিল??” [২]

[১] আত-তাবাকাতুস সুন্নিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ: ২৬/১

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৯৫ থেকে ৩৯৭/৬

ইমাম আবু হানিফা এবং খুরুজ-এর সমর্থন

প্রশ্ন: ইমাম আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি আলবীদের (আলী বংশীয়দের) খুরুজের সমর্থক ছিলেন? এই ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলো কেমন?

উত্তর: এই বর্ণনাগুলোর মর্যাদা তাদের সনদের পর্যালোচনার মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। এমন বর্ণনা অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে কিন্তু আমরা শুধু প্রাচীন উৎসগুলোর পর্যালোচনা করব। যদি এগুলোতে এই কথা প্রমাণিত না হয় তবে পরবর্তীকালের বর্ণনাগুলো গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। প্রাচীন লেখকদের সময়ের ক্রমানুসারে আমরা বর্ণনাগুলো ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করছি:

১. ইমাম বালাজুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি)-এর বর্ণনা:

(জায়েদ বিন আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম আবু হানিফার কাছে বার্তা পাঠালেন। এতে তিনি ভয়ে মুর্ছিত হওয়ার উপক্রম হলেন। তিনি বললেন: (জায়েদ)-এর সাথে ফকিহদের মধ্যে কে কে আছে? বলা হলো: সালামা বিন কুহাইল, ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ, হাশিম আল-বাররাদ এবং আবু হাশিম আর-রুমানি প্রমুখ। তিনি বললেন: আমার খুরুজ করার শক্তি নেই। তবে তিনি জায়েদ বিন আলীর কাছে অর্থ পাঠিয়ে তাকে শক্তিশালী করলেন। [১]

পর্যালোচনা: আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে খুরুজে সাহায্যের এটিই সবচেয়ে প্রাচীন বর্ণনা যা বালাজুরি (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি) বর্ণনা করেছেন। এটি অত্যন্ত দুর্বল; কারণ বালাজুরি এর কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। [২]

২. আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ২৯০ হিজরি) থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো:

•

আবু ইসহাক ফাজারির ভাই ইব্রাহিমের সাথে খুরুজে শরিক হয়ে নিহত হন। তারা জানতে পারলেন যে ভাই ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়েছিলেন। অতঃপর আবু ইসহাক ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি আমার ভাইকে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে সে ইব্রাহিমের সাথে খুরুজে শরিক হবে? ইমাম সাহেব বললেন: “হ্যাঁ, আর সে তোমার চেয়ে উত্তম ছিল।” [৩]

পর্যালোচনা: এই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এর একজন বর্ণনাকারী ইয়াজিদ বিন ইউসুফ আর-রাহবি দুর্বল। [৪]

•

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সামনে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন: “তুমি আমার সামনে এমন এক ব্যক্তির কথা বলছ যে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর তলোয়ার চালানো বৈধ মনে করে।” [৫]

[১] এবং আবু হানিফার কাছে বার্তা পাঠালেন, এতে তিনি প্রায় মুর্ছিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন: ফকিহদের মধ্যে তার সাথে কে আছে? বলা হলো: সালামা বিন কুহাইল, ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ, হাশিম আল-বাররাদ এবং আবু হাশিম আর-রুমানি প্রমুখ। অতঃপর বললেন: খুরুজ করার শক্তি আমার নেই। এবং তাকে অর্থ পাঠিয়ে শক্তিশালী করলেন। “আনসাবুল আশরাফ বালাজুরি: ২৩৯/৩”

[২] অবশ্য এর এক পৃষ্ঠা আগে বালাজুরি জায়েদ বিন আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খুরুজের ঘটনাবলী বর্ণনা শুরু করার সময় “আব্বাস বিন হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব আল-কালবি...” থেকে “মাদায়েনি এবং তার শায়খদের...” এবং “আবদুল্লাহ বিন সালাহ, মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন জায়েদ ইবনে কিনানা”-এর সম্মিলিত সনদ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন সালাহ (মৃত্যু ২২৩ হিজরি) সত্যবাদী, “মাদায়েনি এবং তার শায়খদের...” এবং “আবদুল্লাহ বিন কাসিম (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি) নির্ভরযোগ্য। মাদায়েনিও নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার “শায়খরা” অজ্ঞাত। আব্বাস বিন হিশাম, তার পিতা হিশাম কালবি এবং আবু মুখনাফ—এই তিনজন কউর শিয়া বর্ণনাকারী। বালাজুরি যদি তাদের হালকা সনদের সাথে এই বর্ণনাটি যুক্ত করে থাকেন তবে তদন্ত করা সম্ভব ছিল যে কোন অংশটি নির্ভরযোগ্য এবং কোনটি দুর্বল। কিন্তু তিনি একবার সম্মিলিত সনদ বর্ণনা করার পর অনেকগুলো টুকরো “কালু” (তারা বলল) শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো এই ঘটনাটি ওই সমস্ত বর্ণনাকারীদের সমষ্টি বর্ণনা করেছে। এখন এটি জানা সম্ভব নয় যে বর্ণনার কোন টুকরোটি কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। এজন্য পুরো বর্ণনাটিই অস্পষ্ট হয়ে যায়।

[৩] আমি বললাম: “আপনি কি আমার ভাইকে ইব্রাহিমের সাথে খুরুজের ফতোয়া দিয়েছিলেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আর সে তোমার চেয়ে উত্তম ছিল।” “আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ বিন আহমদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৯৭”

[৪] যাহাবির মতে দুর্বল। ইবনে হাজার বলেন: “দুর্বল” “তাকরিবুত তাহজিব, নং: ৭৭৭৯”

[৫] “তুমি এমন এক ব্যক্তির কথা বলছ যে উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তলোয়ার চালানো বৈধ মনে করে।” “আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ বিন আহমদ, বর্ণনা নম্বর: ৩৪৩”

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সমালোচনা: এই বর্ণনার সনদে একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত (মাজহুল), যাকে “উম্মন হাদ্দাসাহ্ আন ইবনিল মুবারক” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই বর্ণনাটি প্রকাশ করে যে, আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি এতটাই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁর আলোচনা শোনাও পছন্দ করতেন না, অথচ তিনি নিজে ইমাম সাহেবের নিকট থেকেই ফিকহ শাস্ত্র শিখেছিলেন। তিনি কেন তাঁর শিক্ষকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবেন?! [১]

(৩) আবুল ফারাজ ইসফাহানি (মৃ. ৩৫৬ হি.) থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো:

১. মুহাম্মদ বিন জাফর বলতেন যে, আল্লাহ আবু হানিফার ওপর রহম করুন, জায়েদ বিন আলীর সাহায্যে এগিয়ে আসার কারণে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়েছে। [২]
২. ফজল বিন জুবায়ের বলেন, ইমাম আবু হানিফা বললেন: জায়েদের সাথে এই বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কে কে আছেন? বলা হলো: সালামা বিন কুহাইল, ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ, হারুন বিন সাদ, হাশিম আল-বারিদ, আবু হাশিম আর-রুমানি এবং হাজ্জাজ বিন দিনার প্রমুখ। তিনি বললেন: জায়েদকে গিয়ে বলা যে, আমার কাছে আপনার জন্য আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সাহায্য ও শক্তি মজুদ আছে, সুতরাং আপনি তা নিজের এবং আপনার সাথীদের সওয়ারির জন্য গ্রহণ করুন। [৩]
৩. আমাদের নিকট আবু নাস্ঈম বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম জুফারকে বলতে শুনেছি যে, আবু হানিফা ইব্রাহিমের বিষয়ে প্রকাশ্যে কঠোর বক্তব্য দিতেন এবং মানুষকে তাঁর সাথে বিদ্রোহ (খুরুজ) করার ফতোয়া দিতেন, অতঃপর আমি তাঁকে বললাম:

[১] আবদুল্লাহ বিন মুবারক তো ইমাম সাহেবের নিন্দা শোনাও পছন্দ করতেন না। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে গালি দিলে আবদুল্লাহ বিন মুবারক বললেন: “মান ইয়াজমাউল কুরআন ফি রাকাআতাইনি ফি লাইলাতিন, ওয়া তাআল্লামতুল ফিকহাল্লাজি মিন ইনদি মিন ইবনি হানিফা” অর্থাৎ “তিনি তো এক রাতেই দুই রাকাতে পুরো কুরআন খতম করতেন এবং আমি যে ফিকহ শিখেছি তা তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি।” (আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবুহ লিস-সাইমারি, পৃ. ৮৬) ইমাম আবু হানিফার কুৎসা সম্বলিত যে বর্ণনাগুলো আবদুল্লাহ বিন আহমদ “আস-সুন্নাহ” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলোকে খোদ হাম্বলি আলেমগণও গোঁড়ামি বা বিদ্বেষপ্রসূত মনে করেন। যেমন:

- কিছু বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা, তাঁর সন্তান এবং ছাত্রদের কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) হওয়ার প্রবক্তা, বরং এই গোমরাহির প্রবর্তক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (বর্ণনা ১৬৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮)
- কিছু বর্ণনায় তাঁকে শরীয়ত অস্বীকারকারী, যুক্তিবাদী এবং জাহমিয়া ফিরকার অনুসারী বলা হয়েছে। (বর্ণনা ২৩১, ২৩২, ২৩৭)
- কিছু বর্ণনায় তাঁকে মুরজিয়া, বিদআতি, খারেজি এবং উম্মতের রক্তপাতকারী হিসেবে কুখ্যাত করা হয়েছে। (বর্ণনা ২৩৩, ২৩৪, ২৪২)
- কিছু বর্ণনায় তাঁকে দ্বীনের শত্রু এবং বেদ্বীন বলা হয়েছে। (বর্ণনা ২৪৬, ২৫৮)

বাস্তবতা হলো, এই সংকলনে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে সব ধরনের ভালো-মন্দ বর্ণনা জমা করা হয়েছে। আমরা আবদুল্লাহ বিন আহমদের ওপর এই কারণে আপত্তি করি না যে, বর্ণনা নকল ও সংগ্রহ করা এবং তা থেকে দলিল পেশ করার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আহমদ নিজেই বলতেন: “লাম ইয়াসিহু ইনদানা আন্না আবা হানিফাতা রাহিমাহুল্লাহ্ কলা: আল-কুরআনু মাখলুকুন... ছয়া মিনাল ইলমি ওয়াল ওয়ারাঈ ওয়ায যুহদি ওয়া ঈসারিদ দারিল আখিরাতি বি-মাহাল্লিন লা ইয়াদরিকুহ ফীহি আহমাদ, ওয়া লাক্বাদ যুরিবা বিস-সিয়াতি আলা আন ইয়ালিয়াল ক্বাযাআ লি-আবি জা’ফারিন ফালাম ইয়াফআল” (আমাদের নিকট এটি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় যে ইমাম আবু হানিফা কুরআনকে মাখলুক বলতেন... তিনি তো ইলম, তাকওয়া, যুহদ এবং আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন স্তরে ছিলেন যেখানে ইমাম আহমদও পৌঁছাতে পারেননি। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল যাতে তিনি আবু জাফর মনসুরের কাজীর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।) (মানাকিবে ইমাম আবু হানিফা ওয়া সাহিবাইহি লিয-যাহাবি, পৃ. ৪৩)। আজও হাম্বলি আলেমগণ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর ছাত্রদের আলোচনা সম্মানের সাথে করেন। যাই হোক, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর খুরুজের (বিদ্রোহ) বিষয়ে একক মত পোষণ করা সহ কোনো অভিযোগই গ্রহণ করা যায় না।

[২] হাদ্দাসানা আবদুল্লাহ বিন মারওয়ান বিন মুয়াবিয়া কলা সামি’তু মুহাম্মাদ বিন জা’ফার বিন মুহাম্মাদ ইয়াকুলু: রাহিমাহুল্লাহ্ আবা হানিফাতা ফাক্বাদ তাহাক্বাক্বাত মাওয়াদাতুহ লানা ফী নুসরতিহি যাইদ বিন আলী। (মাক্বাতিলুত তালিবীন: ১/১৪০)

[৩] আন ফজল বিন জুবায়ের কলা কলা আবু হানিফাতা মান ইয়াতি যাইদান ফী হাযাশ শানি মিন ফুকাহাইন নাস? ফাক্বিলা লাহ্: সালামা বিন কুহাইল, ওয়া ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ, ওয়া হারুন বিন সা’দ, ওয়া হাশিম আল-বারিদ ওয়া আবু হাশিম আর-রুমানি ওয়া হাজ্জাজ বিন দিনার ওয়া গাইরুহুম, ফাক্বলা লী: কুল লি-যাইদিন লাকা ইনদী মাউনাতুন ওয়া কুওয়াতুন আলা জিহাদি আদুউডিকা, ফাসতাসীন বিহা আনতা ওয়া আসহাবুকা ফিল কুরা’ই। (মাক্বাতিলুত তালিবীন: ১/১৪১)

“আল্লাহর কসম, আপনি ততক্ষণ থামবেন না যতক্ষণ না আমাদের ঘাড়ে ফাঁসির দড়ি পরানো হয়।” [১]

আবু ইসহাক ফাজারি বলেন যে, আমি আবু হানিফার কাছে গেলাম এবং বলতে লাগলাম: “আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত যখন আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহর সাথে روج (বিদ্রোহ)-এর ফতোয়া দিয়েছিলেন এমনকি সে নিহত হয়েছে।” তিনি বললেন: “তোমার ভাই যেখানে নিহত হয়েছে, সেখানে তার নিহত হওয়া তার গাজওয়ায়ে বদরে শহীদ হওয়ার সমান। ইব্রাহিমের সাথে তার শহীদ হওয়া তার জন্য জীবনের চেয়ে উত্তম।” আমি বললাম: “তাহলে আপনি কেন গেলেন না?” তিনি বললেন: “ঐ আমানতগুলোর কারণে যা আমার কাছে রাখা আছে।” [২]

عبدالله بن ادريس (আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রিস) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি যখন তিনি মিসরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং দুই ব্যক্তি তাকে ইব্রাহিমের সাথে روج করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিল। ইমাম সাহেব বললেন: “রওনা হয়ে যাও।” [৩]

আবু ইসহাক ফাজারি বলেন: যখন ইব্রাহিম روج করলেন তখন আমার ভাই গিয়ে আবু হানিফার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল, তিনি روج করার পরামর্শ দিলেন ফলে সে ইব্রাহিমের সাথে নিহত হলো। তাই আমি আবু হানিফাকে কখনোই পছন্দ করতে পারি না। [৪]

হাসান বিন হুসাইন এবং অন্যান্যদের বর্ণনা যে, ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ যখন ঈসা বিন মুসা আব্বাসীর দিকে অগ্রসর হলেন তখন আবু হানিফা তাকে লিখেছিলেন যে, যখন আল্লাহ আপনাকে ঈসা বিন মুসা এবং তার সঙ্গীদের ওপর বিজয় দান করবেন, তখন তাদের সাথে তেমন আচরণ করবেন না যেমন আপনার পিতা (আলী রাদিআল্লাহু আনহু) আহলে জামালের সাথে করেছিলেন যে, না তো পরাজিতদের হত্যা করেছিলেন, না সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন, না পলায়নকারীর পিছু নিয়েছিলেন এবং না আহতকে হত্যা করেছিলেন। [৫]

ইব্রাহিম বিন সুয়াইদ বলেন যে, আমি ইমাম আবু হানিফাকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি ইব্রাহিমের (روج-এর) দিনগুলোতে আমাকে খুব সম্মান করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ফরজ হজের পর আপনার কাছে روج পছন্দনীয় নাকি হজ? তিনি বললেন: “ফরজ হজের পর জিহাদ করা পঞ্চাশটি হজ করার চেয়ে উত্তম।” [৬]

সমালোচনা: উল্লিখিত আটটি বর্ণনা আবুল ফারাজ আসফাহানি (২৮৪ হিজরি - ৩৫৬ হিজরি) নকল করেছেন। আসফাহানি নিজে শিয়া ছিলেন।

[১] আবু নুয়াইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জুফার বিন হুজাইলকে বলতে শুনেছি: আবু হানিফা ইব্রাহিমের ব্যাপারে অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে (প্রকাশ্যে) কথা বলতেন এবং মানুষকে তার সাথে روج করার ফতোয়া দিতেন... (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩০১/১)

[২] আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হানিফাকে তার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় শুনেছি এবং দুই ব্যক্তি ইব্রাহিমের সাথে روج করার ব্যাপারে তার কাছে ফতোয়া চাচ্ছিল আর তিনি বলছিলেন: তোমরা বের হও। (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩১৩/১)

[৩] আবু ইসহাক ফাজারি বলেন: আমি আবু হানিফার কাছে আসলাম এবং তাকে বললাম: আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেননি যখন আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানের সাথে روج করার ফতোয়া দিয়েছিলেন এমনকি সে নিহত হয়েছে?... (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩১৩/১)

[৪] আবু ইসহাক ফাজারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্রাহিম বের হলেন তখন আমার ভাই আবু হানিফার কাছে গেল এবং তার কাছে ফতোয়া চাইল। তিনি তাকে روج করার পরামর্শ দিলেন ফলে সে তার সাথে নিহত হলো। তাই আমি আবু হানিফাকে কখনোই পছন্দ করি না। (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩১৩/১, ৩১৪)

[৫] হাসান বিন হুসাইন এবং তার অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে বর্ণিত: আবু হানিফা ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহর কাছে লিখেছিলেন যখন তিনি ঈসা বিন মুসার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন: যখন আল্লাহ আপনাকে ঈসা এবং তার সঙ্গীদের ওপর বিজয়ী করবেন তখন তাদের ব্যাপারে আপনার পিতার আহলে জামালের সাথে করা আচরণের মতো করবেন না, কারণ তিনি পরাজিতদের হত্যা করেননি, সম্পদ গ্রহণ করেননি, পলায়নকারীর পিছু নেননি এবং আহতকে চূড়ান্ত আঘাত করেননি। (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩১৫/১)

[৬] ইব্রাহিম বিন সুয়াইদ আল-হানাফি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আর তিনি ইব্রাহিমের দিনগুলোতে আমাকে সম্মান করতেন—আমি বললাম: হজ্জাতুল ইসলামের পর আপনার কাছে কোনটি অধিক প্রিয়? এর জন্য روج করা নাকি হজ? তিনি বললেন: হজ্জাতুল ইসলামের পর একটি যুদ্ধ পঞ্চাশটি হজের চেয়ে উত্তম। (মাকাতিলুত তালিবিন: ৩২৬/১)

তারিখ امت مسلمہ

খতীব বাগদাদীর মতে তিনি ‘আকযাবুন নাস’ ছিলেন। পুস্তিকাগুলো কিনে সেগুলোকে নিজের নামে চালিয়ে দিতেন। [১]

সপ্তম বর্ণনার জাল হওয়ার প্রমাণ তো খোদ এর মূল পাঠের (মতন) মধ্যেই রয়েছে। এতে ইমাম সাহেবের দিকে এই কথাটি সম্বন্ধ করা হচ্ছে যে, তিনি সাদাতদের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.)-এর সীরাত অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। অথচ ইমাম সাহেব এবং আইন্মায়ে সালাসার নিকট এই ধরনের পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.)-এর সীরাতই আদর্শ এবং শরয়ী দলিল।

এটি যদি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হতো, তবে হয়তো আমরা এই বর্ণনাগুলো গ্রহণ করে নিতাম; কিন্তু একটি ইতিকাদী (বিশ্বাসগত) বিষয়ে একজন সত্যবাদী ইমাম মুজতাহিদ এবং তাঁর মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীতে একজন দুর্বল শিয়া বর্ণনাকারীর বর্ণনার ওপর কীভাবে নির্ভর করা যেতে পারে?

৪. আবু বকর জাসসাস আর-রাযী (রহ.) (মৃ. ৩৭০ হি.)-এর মন্তব্য:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যায়িদ বিন আলী (রহ.)-এর ব্যাপারে বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, তিনি তাঁকে অর্থ পাঠাতেন, তাঁকে গোপনে সাহায্য করা ওয়াজিব হওয়ার ফতোয়া দিতেন এবং একইভাবে আব্দুল্লাহ বিন হাসানের পুত্রদ্বয়: মুহাম্মদ এবং তাঁর ভাই ইব্রাহিমের ব্যাপারেও তাঁর একই অবস্থান ছিল। [২]

সমালোচনা: এই মন্তব্যটি ইমাম আবু বকর জাসসাস আর-রাযী করেছেন, যিনি নিঃসন্দেহে একজন মহান হানাফী ফকীহ ছিলেন; কিন্তু তিনি আলোচ্য বিষয়ের কোনো সনদ (সূত্র) বর্ণনা করেননি। কেবল এটুকু বলেছেন যে, এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ। যেহেতু ইমাম জাসসাস এবং ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের মাঝে দেড়শ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান রয়েছে। আর যেহেতু এই সময়ের মধ্যে এই কথাগুলো কেবল শিয়া বর্ণনাকারী বা সন্দেহজনক ও দুর্বল সূত্রের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে; তাই এটি স্পষ্ট যে, এই দুর্বল বর্ণনাগুলো অধিক প্রচারের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে প্রতিটি প্রসিদ্ধ বিষয়ই যে সঠিক হবে তা জরুরি নয়।

৫. খতীব বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) থেকে বর্ণিত বর্ণনা:

“ইব্রাহিম বিন সুওয়াইদ বলেন যে, আমি ইমাম আবু হানিফাকে প্রশ্ন করেছিলাম—ইব্রাহিমের (বিদ্রোহের) দিনগুলোতে তিনি আমাকে অনেক সম্মান করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফরয হজ আদায়ের পর আপনার কাছে এই ব্যক্তির সাথে বের হওয়া (বিদ্রোহে অংশ নেওয়া) বেশি পছন্দনীয় নাকি হজ করা? তিনি বললেন: ফরয হজের পর যুদ্ধ করা পঞ্চাশটি হজ করার চেয়েও উত্তম।” [৩]

সমালোচনা: খতীব এটি সায়মারী (মৃ. ৪৩৬ হি.)-এর বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ইব্রাহিম বিন সুওয়াইদ (মৃ. ১৮০ হি.) থেকে বর্ণনা করছেন। তাই সনদের বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) স্পষ্ট। সায়মারী ইমাম সাহেবের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ‘আখবারু আবি হানিফা’ সংকলন করেছিলেন। এতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ নেই। যদি তিনি এই বর্ণনার বর্ণনাকারী হতেন, তবে তিনি সেখানে এটি লিপিবদ্ধ করতেন। সুতরাং, এই বর্ণনার দুর্বলতা স্পষ্ট।

[১] মীযানুল ইতিদাল: ৩/৬২৩, ১২৪। এই জেরা (সমালোচনা) আমাদের আলোচ্য বর্ণনাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নয়। এর অর্থ হলো আল-আগানীর বর্ণনাটি মিথ্যা।

[২] এবং যায়িদ বিন আলীর ব্যাপারে তাঁর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ, তিনি তাঁর কাছে অর্থ পাঠাতেন এবং তাঁকে সাহায্য করা ও তাঁর সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ফতোয়া দিতেন, এবং একইভাবে আব্দুল্লাহ বিন হাসানের পুত্র মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমের বিষয়টিও। আহকামুল কুরআন, আবু বকর জাসসাস আর-রাযী: ১/৮৫, ত. আল-ইলমিয়াহ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরবর্তী মুফাসসিরগণ যেমন: ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.) এবং আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী (মৃ. ৮৫০ হি.) আহকামুল কুরআনের বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল উদ্ধৃত করার মাধ্যমে কোনো বর্ণনা শক্তিশালী হয়ে যায় না।

[৩] বিচারক আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন বিন আলী বিন মুহাম্মদ আস-সায়মারী আমাদের সংবাদ দিয়েছেন ইব্রাহিম বিন সুওয়াইদ আল-হানাফী থেকে, তিনি বলেন: আমি আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আর তাঁর কাছে আমার একটি অবস্থান ছিল... ইব্রাহিম... ইসলামের হজের পর আপনার কাছে কোনটি বেশি প্রিয়, এই ব্যক্তির সাথে বের হওয়া নাকি হজ করা? তিনি বললেন: ইসলামের হজের পর যুদ্ধ করা পঞ্চাশটি হজের চেয়েও উত্তম। (আল-ইলাল ওয়াল মা’রিফাহ: খতীব বাগদাদী: ১/২৪৭)।

(৬) মুওয়াফফাক মক্কী রহ. (মৃ. ৫৬৮ হি.) থেকে বর্ণিত বর্ণনাগুলো:

১. আবদুল্লাহ বিন মালিক বিন সুলাইমান বলেন যে, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, য়ায়েদ বিন আলী ইমাম আবু হানিফার কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নিজের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইমাম সাহেব দূতকে বললেন: যদি আমি জানতাম যে মানুষ তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং নেক নিয়তের সাথে তার পাশে দাঁড়াবে, তবে আমি অবশ্যই তার সাথে থাকতাম এবং তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতাম; কারণ তিনি হকের ইমাম, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে মানুষ তাকে সেভাবেই একা ছেড়ে দেবে যেভাবে তারা তার পিতা (হযরত হুসাইন রা.)-কে ছেড়ে দিয়েছিল। তবে আমি তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করব যার মাধ্যমে তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করবেন। ইমাম সাহেব য়ায়েদ বিন আলীর দূতকে বললেন: তার কাছে আমার ওজর (অপারগতা) বর্ণনা করে দিও। আর ইমাম সাহেব তাকে দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। আমি (মুওয়াফফাক মক্কী) বলছি যে, অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সাহেব সেই অসুস্থতার ওজর পেশ করেছিলেন যা সেই দিনগুলোতে তাকে পেয়ে বসেছিল। এই কারণে তিনি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। [১]

পর্যালোচনা: বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ এটি তার পিতা মালিক বিন সুলাইমান থেকে বর্ণনা করছেন। পিতা-পুত্র উভয়ই দুর্বল। [২]

[১] আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-হারাবী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন মালিক বিন সুলাইমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, য়ায়েদ বিন আলী ইমাম আবু হানিফার নিকট একজন দূত পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে নিজের দিকে আহ্বান করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা তার দূতকে বললেন: “যদি আমি জানতাম যে মানুষ তাকে অপদস্থ করবে না এবং সত্যনিষ্ঠার সাথে তার সাথে দাঁড়াবে, তবে আমি অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম এবং তার সাথে থেকে তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতাম; কারণ তিনি হকের ইমাম। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে তারা তাকে সেভাবেই অপদস্থ করবে যেভাবে তারা তার পিতাকে অপদস্থ করেছিল। তবে আমি তাকে আমার সম্পদ দিয়ে সাহায্য করব যার মাধ্যমে তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হবেন।” তিনি দূতের উদ্দেশ্যে আরও বললেন: তার নিকট আমার ওজর পেশ করো। আর তিনি তার নিকট দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। আমি (মুওয়াফফাক মক্কী) বলছি: এই বর্ণনাটি ছাড়াও অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেই দিনগুলোতে তাকে পেয়ে বসা অসুস্থতার কারণে ওজর পেশ করেছিলেন, যার ফলে তিনি তার থেকে পিছিয়ে ছিলেন। (মানাক্বিবে আবি হানিফা, মুওয়াফফাক মক্কী: ২৬০/১)

নোট: “মুওয়াফফাক বিন আহমদ আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী” খতিবে খাওয়ারিজম নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ ফকীহ ও বাগ্মী ছিলেন। তার এই কিতাব “মানাক্বিবুল মুওয়াফফাক” বা “মানাক্বিবুল মক্কী” নামেও পরিচিত। মুওয়াফফাক মক্কীর মধ্যে তাশাইয়ু’ (শিয়া মতবাদ) ও মু’তাযিলা মতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি হযরত আলী রা.-এর ওপর “ফাযায়েলে আলী” নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যার সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন যে এতে অনেক দুর্বল বর্ণনা রয়েছে। (তারিখুল ইসলাম, যাহাবী: ৩২/৩৫৭)

মুওয়াফফাক নিশ্চিতভাবেই একজন বড় আলেম ছিলেন। মানাক্বিবে আবি হানিফাতে তিনি অধিকাংশ বর্ণনা সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সংকলনের দিক থেকে এই কিতাবটি প্রশংসনীয়। এতে অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে লেখকের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের ওপর গবেষনাকারী কোনো আলেমই এই কিতাব থেকে বিমুখ থাকতে পারেননি। তবে এই সংকলনে অনেক দুর্বল বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাই সেগুলো গ্রহণ না করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ ফযীলত, মানাক্বিব এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দুর্বল বর্ণনা গ্রহণের অবকাশ থাকে। কিন্তু প্রতিটি দুর্বল বর্ণনাকে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা ঠিক নয় যেখানে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। বিশেষ করে যখন কোনো দুর্বল বর্ণনা কোনো শক্তিশালী দলিলের পরিপন্থী হয়, তখন তার প্রত্যখ্যান আবশ্যক। এখানে ইমাম আযম রহ.-এর বিদ্রোহকে সমর্থন করার যে কাহিনীটি প্রসিদ্ধ করা হয়েছে; যেহেতু ইমাম সাহেবের অবস্থান ফকীহদের বর্ণনার পরিপন্থী, তাই এই দুর্বল বর্ণনাগুলো থেকে দলিল পেশ করা একটি দুর্বল নীতি। এটি মুওয়াফফাক মক্কীর ভুল যে তিনি অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতো কেবল বর্ণনা সংগ্রহের কাজ করেছেন। বর্ণনা সংগ্রহ করা এক জিনিস আর তা থেকে দলিল পেশ করা অন্য জিনিস। প্রতিটি বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিকের নিজস্ব শর্ত থাকে, কেউ কঠোর, কেউ শিথিল। তবে ঐতিহাসিক দলিলের শর্তাবলী আলাদা এবং শরয়ী দলিলের শর্তাবলী আলাদা। তাই মুওয়াফফাক যদি দুর্বল বর্ণনা সংগ্রহ করে থাকেন, তবে তার এই শিল্পের ওপর কোনো আপত্তি তোলা যায় না। ভুল তাদের যারা এই বর্ণনাগুলো দেখে প্রচার শুরু করেছে যে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব ছিল ফাসেক ও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এটি ইমাম সাহেবের ফতোয়ার পরিপন্থী।

[২] এই বর্ণনার সনদ হলো আবদুল্লাহ বিন মালিক এবং তার পিতা মালিক বিন সুলাইমান। উভয়ই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন: “সে এবং তার পিতা কারাবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত।” (মাওসুআতু আক্বওয়ালিল দারাকুতনী: ১৯৩২)। মালিক বিন সুলাইমান সম্পর্কে ইবনে হিব্বান বলেন: (আল-হিক্বাত, নং: ১৪৮৪৪) ইবনে জাওযী বলেন: “তিনি এমন একজন বর্ণনাকারী যিনি এমন সব বর্ণনা করেন যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।” (আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন, নং: ২৮২৩) ইমাম নাসাঈও তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনে হিব্বান তার ওপর তাদলীসের অভিযোগ এনেছেন। (তাবাক্বাতুল মুদাঙ্লিসীন লি-ইবনে হাজার, পৃ. ৫৭)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মুয়াফফাক মক্কী রহ. ইমাম সাহেবের অসুস্থ হওয়ার কারণে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে না পারার যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তার কোনো সনদ বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এর দুর্বলতা স্পষ্ট।

২. হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে যায়েদ বিন আলী রহ.-এর বিদ্রোহকে বদর যুদ্ধের সদৃশ মনে করতেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তবে আপনি কেন তাঁর সাথে বের হলেন না? তখন তিনি বললেন:

“মানুষের আমানতসমূহ আমাকে আটকে দিয়েছে। আমি সেগুলো ইবনে আবি লায়লার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমি এমন অবস্থায় মারা না যাই যে তাদের মালিকরা বিস্মৃত হয়ে যায়।” [১]

নকদ: মুয়াফফাক মক্কী রহ. এই বর্ণনার কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কেবল ‘অন্য এক বর্ণনায়’ বলে উদ্ধৃত করেছেন।

৭. মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির বিন মুহাম্মদ হানারফী (মৃ. ৭৭৫ হি.)-এর বর্ণনা:

আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন সুলাইমান থেকে বর্ণিত যে, যায়েদ বিন আলী ইমাম আবু হানিফার কাছে পয়গাম পাঠিয়ে বাইয়াতের দাওয়াত দিলেন। ইমাম সাহেব বললেন: যদি আমার ধারণা হতো যে মানুষ তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না যেমন তাঁর পিতাকে ছেড়ে দিয়েছিল, তবে আমি তাঁর সাথে জিহাদ করতাম; কারণ তিনি সত্য ইমাম। কিন্তু আমি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করব। এক বর্ণনায় আছে যে, অসুস্থতা দেখা দেওয়ার ওজর পেশ করেছেন। আর ওজর ও সাহায্য একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

অতঃপর তাঁকে দশ হাজার দিরহাম পাঠালেন এবং দূতকে বললেন যে, তাঁকে আমার ওজর বলে দিও। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তবে আপনি কেন তাঁর সাথে বের হলেন না? তখন তিনি বললেন: “মানুষের আমানতসমূহ আমাকে আটকে দিয়েছে। আমি সেগুলো ইবনে আবি লায়লার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমি মারা না যাই এবং তাদের মালিকদের শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।” [২]

নকদ: সনদ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই বর্ণনা মুহিউদ্দীন হানারফী আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন সুলাইমান থেকে সরাসরি ইমাম সাহেব থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এটি সম্ভব নয়। মুহিউদ্দীন হানারফী অষ্টম হিজরি শতাব্দীর এবং আব্দুল্লাহ বিন মালিক তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর। উভয়ের মাঝে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। সুতরাং বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত দুর্বল।

৮. জামালুদ্দীন হুসাইনী (মৃ. ৮২৮ হি.)-এর বর্ণনা:

জামালুদ্দীন হুসাইনী তাঁর এক বর্ণনায় ইব্রাহিমের বিদ্রোহের আলোচনার অধীনে বর্ণিত হয়েছে: “ফকিহ ইমাম আবু হানিফা...”

[১] অন্য এক বর্ণনায় তাঁর সাথে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর বের হওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদর যুদ্ধের বের হওয়ার সদৃশ। তাঁকে বলা হলো: তবে আপনি কেন তাঁর থেকে পিছনে রয়ে গেলেন? তিনি বললেন: মানুষের কিছু আমানত আমার কাছে ছিল বলে। আমি সেগুলো ইবনে আবি লায়লার কাছে পেশ করেছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমি অজ্ঞাত অবস্থায় নিহত হব এবং আমানতগুলো নষ্ট হবে। আর তিনি যখনই তাঁর বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখনই কাঁদতেন। (মানাকিব আবি হানিফা লিল মক্কী: ১৬০/১)

[২] আব্দুল্লাহ বিন মালিক বিন সুলাইমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে যায়েদ তাঁর কাছে বাইয়াতের দাওয়াত দিয়ে লোক পাঠালেন। তখন তিনি বললেন: “যদি আমি জানতাম যে মানুষ তাঁকে অসহায় ছেড়ে দেবে না যেমন তাঁর পিতাকে ছেড়ে দিয়েছিল, তবে আমি তাঁর সাথে জিহাদ করতাম। কারণ তিনি সত্য ইমাম। তবে আমি তাঁকে আমার সম্পদ দিয়ে সাহায্য করব।” অতঃপর তিনি তাঁর কাছে দশ হাজার দিরহাম পাঠালেন এবং দূতকে বললেন আমার ওজর বিস্তারিত বর্ণনা করো। এক বর্ণনায় আছে তিনি অসুস্থতার ওজর পেশ করেছেন। আর উভয়টি (সাহায্য ও ওজর) একত্রিত হতে বাধা নেই। তাঁকে তাঁর বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: তাঁর বের হওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদর যুদ্ধের দিনের বের হওয়ার সদৃশ। তাঁকে বলা হলো: আপনি কেন পিছনে রয়ে গেলেন? তিনি বললেন: মানুষের আমানতসমূহ আমাকে আটকে দিয়েছে। আমি সেগুলো ইবনে আবি লায়লার কাছে পেশ করেছিলাম কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি অজ্ঞাত অবস্থায় মারা যাব। আর তিনি যখনই তাঁর বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখনই কাঁদতেন। (আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়াহ ফি তাবাকাতিল হানারফিয়াহ: ৪৯৬/১)

প্রকৃতপক্ষে এটি সেই বর্ণনাই যা মুয়াফফাক মক্কী তাঁর সনদে আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতা মালিক বিন সুলাইমানের উল্লেখ করেছেন। এর সনদের অবস্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাই এর দুর্বলতায় কোনো সন্দেহ থাকে না।

“...থেকে বাইয়াত করছিল।” তিনি আরও লেখেন যে: “এক মহিলার ছেলে ইব্রাহিমের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেলে ইমাম সাহেব শোক প্রকাশ করে বললেন: ‘হায়! তোমার ছেলের জায়গায় যদি আমি হতাম’।” [১]

নকদ (পর্যালোচনা): এই বর্ণনাটি দুর্বল; কারণ এর লেখক জামালুদ্দিন ইবনে আনবা আল-হুসাইনি (মৃত্যু ৮২৮ হি.) একজন কটুর শিয়া।

নতিজা (ফলাফল): এমন একটিও সহিহ সনদের বর্ণনা নেই যা ইমাম সাহেবকে আলওয়ীদের বিদ্রোহের সমর্থক হিসেবে প্রমাণ করে।

একটি বর্ণনা যা দুর্বলতা সত্ত্বেও অনেকটা নির্ভরযোগ্য:

ইমাম আবু হানিফার জীবনী সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য উৎস হলো আবু আব্দুল্লাহ আস-সাইমারি (৩৫১ হি. - ৪৩৬ হি.)-এর “আখবার আবি হানিফা” (মানাকিবুল ইমাম আবু হানিফা)। লেখক বাগদাদের কাজি এবং হানাফি ফকিহ ছিলেন, তাকে শায়খুল হানাফিয়া বলা হতো। তার কিতাবে ইমাম সাহেবের জীবনী সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সনদের সাথে রয়েছে। কোনো কোনোটির সনদ চমৎকার এবং কোনোটি দুর্বল। এই বর্ণনাগুলোর কোনোটিতেই বিদ্রোহে সমর্থনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একটি বর্ণনায় সরকারের সমালোচনা এবং তার পরিণামে জেলখানায় যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। এই কাজটি ইমাম সাহেবের ফিকহ ও ফতোয়ার সম্পূর্ণ অনুকূল। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

ফজল বিন দুকাইন বর্ণনা করেন, ইমাম জুফার থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন বসরায় ইব্রাহিম বিদ্রোহ করলেন, তখন ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে কঠোর বক্তব্য দিতেন, এমনকি আমি তাকে বললাম: আল্লাহর কসম! আপনি ততক্ষণ থামবেন না যতক্ষণ না আমাদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়। এরপর মনসুর কুফার গভর্নর ঈসা বিন মুসাকে লিখলেন যে, আবু হানিফাকে গ্রেপ্তার করে বাগদাদে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বাগদাদে আসলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স ছিল সত্তর বছর। আবু নুয়াইম (ফজল বিন দুকাইন) বলেন, তাকে এমন কিছু পান করানো হয়েছিল যার ফলে তিনি মারা যান।

এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে, যখন তিনি মনসুরের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন মনসুর তার জন্য ছাত্তু আনালেন এবং তা পান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি অস্বীকার করলেন। মনসুর বললেন: অবশ্যই পান করতে হবে। তিনি আবারও অস্বীকার করলেন। মনসুর জোর করলে তিনি তা পান করলেন। এরপর তৎক্ষণাৎ উঠে হাঁটা দিলেন। মনসুর জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন: যেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি আমাকে এখানে এনেছেন। অতঃপর মনসুর তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। জেলখানাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

[১] নিশ্চয়ই ফকিহ আবু হানিফা তার কাছে বাইয়াত করেছিলেন... হায় আমি যদি তোমার ছেলের জায়গায় হতাম... (উমদাতুত তালিব ফি আনসাবি আবি তালিব: ১/৮৭)

[২] আবু হানিফা যখন বসরায় ইব্রাহিম বিদ্রোহ করলেন তখন উচ্চস্বরে (তার পক্ষে) কথা বলতেন, এমনকি আমি বললাম, আল্লাহর কসম আপনি থামবেন না যতক্ষণ না আমাদের গলায় দড়ি পরানো হয়। এরপর যখন মনসুর কুফার গভর্নর ঈসা বিন মুসাকে লিখলেন যে, আবু হানিফাকে বাগদাদে নিয়ে আসা হোক। আবু নুয়াইম বলেন, আমি আবু হানিফার খোঁজে বের হলাম এবং তাকে সওয়ার অবস্থায় দেখলাম, তিনি ঈসার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন এবং ভয়ে তার চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বাগদাদে আসলেন এবং সেখানেই সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আবু নুয়াইম বলেন, তাকে পানীয় পান করানো হয়েছিল যার ফলে তিনি মারা যান। এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে, যখন তিনি মনসুরের সামনে উপস্থিত হলেন, তিনি তার জন্য ছাত্তু আনালেন এবং তা পান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি অস্বীকার করলেন। মনসুর বললেন, আপনাকে অবশ্যই পান করতে হবে। তিনি অস্বীকার করলেন, অতঃপর তাকে বাধ্য করা হলো এবং তিনি তা পান করলেন। এরপর তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। আবু জাফর (মনসুর) তাকে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, যেখানে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি কারাগারেই ইন্তেকাল করেন। (আখবার আবি হানিফা: ১/৯২-৯৩)

অহম নিকাত (গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট): ১. এই বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, এই বর্ণনাটি প্রাচীনদের মধ্যে ইমাম বুখারির উস্তাদ আবু নুয়াইম ফজল বিন দুকাইন আসবাহানিও বর্ণনা করেছেন, তবে এতে “...ইমাম আবু হানিফা ইব্রাহিমের ব্যাপারে উচ্চস্বরে কথা বলতেন” এর সাথে “এবং তিনি মানুষকে তার সাথে বিদ্রোহে বের হতে উৎসাহিত করতেন” কথাটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। (আখবার আস-সাইমারি) তে শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনার কথা উল্লেখ আছে, বিদ্রোহের ফতোয়ার কথা নয়। সুতরাং এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম আবু হানিফার দিকে বিদ্রোহের ফতোয়া আরোপ করা শিয়া বর্ণনাকারীদের কাজ।

বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার ঢাকায়।

এই বর্ণনার সনদও দুর্বল, তবে এর সারমর্ম মেনে নিতে কোনো বাধা নেই; কারণ এর দ্বারা কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. নফস জাকিয়া এবং ইব্রাহিমের বিদ্রোহের বিষয়ে শাসকদের সমালোচনা করতেন এবং তাঁর সহানুভূতি আলবিদের সাথে ছিল। স্পষ্টতই এতে কোনো আপত্তির অবকাশ নেই। বংশ ও মর্যাদার দিক থেকে আলবিগণ উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আব্বাসীয়রা কুরআন ও সুন্নাহর শ্রেষ্ঠত্বের ইশতেহার নিয়ে এবং আলবিদের সাথে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই শুরুতে ইমাম সাহেবও তাদের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন আব্বাসীয়দের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতন শুরু হলো, তখন ইমাম সাহেবের আব্বাসীয়দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া এবং আলবিদের মজলুম মনে করা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

এখন মূল পাঠে উল্লিখিত বর্ণনার সনদ দেখুন: মুহাম্মদ বিন ইমরান বিন মুসা আল-মারজুবানি... হাসান বিন মুহাম্মদ আল-মাখরামি... মুহাম্মদ বিন উসমান (ইবনে আবি শায়বাহ)... নাসর বিন আব্দুর রহমান বিন বাক্কার আল-ওয়াশশা... ফজল বিন দুকাইন... জুফার বিন হুদাইল... মারজুবানি (মৃ. ৩৮৪ হি.) মুতাজিলি হিসেবে গণ্য এবং তাঁর বর্ণনায় মিথ্যার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। [সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/৪৪৮]।

মুহাম্মদ বিন উসমান বিন আবি শায়বাহ (মৃ. ২৯৭ হি.)-কে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য এবং কেউ কেউ ‘লাইসা বি-শাই’ (কিছুই না) বলেছেন। কেউ কেউ তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। [মিজানুল ইতিদাল, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৬৩৪]।

নাসর বিন আব্দুর রহমান এবং ফজল বিন দুকাইন অর্থাৎ আবু নুআইম নির্ভরযোগ্য। ইমাম জুফার তো কোনো দলিলের মুখাপেক্ষী নন। তবে হাসান বিন মুহাম্মদ মাখরামি কে তা জানা নেই।

[২] ঘটনার কিছু অংশ যা আবু নুআইম আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যাতে ইমাম সাহেবের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা সনদের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি); কারণ আবু নুআইম এর প্রত্যক্ষদর্শী নন। সুতরাং বর্ণনার সনদ ও মূল পাঠে দুর্বলতা অবশ্যই আছে। একইভাবে ইমাম সাহেবের চেহারা ভয়ে কালো হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও অবাস্তব।

[৩] এই বর্ণনাটি খতিব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) ভিন্ন সনদ ও শব্দের সামান্য পার্থক্যের সাথে উদ্ধৃত করেছেন:

“কান আবু হানিফা ইয়াজহারু বিল-কালামি আইয়ামা ইব্রাহিমা জিহারান শাদিদান...” [তারিখে বাগদাদ: ১৩/৩৩]।

খতিব বাগদাদী এই বর্ণনার যে সনদটি উদ্ধৃত করেছেন তা হলো:

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন রিজক... ইসমাইল বিন আলী আল-খুতাবি... মুহাম্মদ বিন উসমান (ইবনে আবি শায়বাহ)... নাসর বিন আব্দুর রহমান বিন বাক্কার আল-ওয়াশশা... ফজল বিন দুকাইন... জুফার বিন হুদাইল।

সনদের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্য, তবে মুহাম্মদ বিন উসমান বিন আবি শায়বাহ এখানেও উপস্থিত আছেন যার নির্ভরযোগ্যতা বিতর্কিত।

খতিবের বর্ণনায় একটি বিষয় অত্যন্ত সন্দেহজনক যে, এতে ইমাম সাহেবকে মনসুরের তলবে বাগদাদে গিয়ে পনের দিন পর মৃত্যুবরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সবাই জানেন যে, ইমাম সাহেব বিদ্রোহের ঘটনার পাঁচ বছর পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ১৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)-ও ‘আল-ইনতিকা ফি ফাদাইলিল সালাসাতি আল-আইম্মাতিল ফুকাহা’ [পৃষ্ঠা: ১৭০]-এ উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদও একইভাবে দুর্বল।

পাঠকদের এটিও ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, ইমাম সাহেব রহ.-কে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক প্রমাণ করা তাঁর প্রশংসার কোনো বিষয় নয়, বরং এটি একটি ত্রুটি। এটি সেই বিখ্যাত অভিযোগ যা তাঁর বিরোধী কিছু আলেম তাঁর ওপর আরোপ করেছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ইমাম সাহেবের সমসাময়িক যুগে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁর প্রতি অনেকের ঈর্ষা ছিল।

আহলে তাশাইয়ু (শিয়া) নিজেদের স্বার্থে এবং বিদ্রোহের মাসআলায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে তাঁকে নিজেদের লোক হিসেবে প্রচার করেছিল। অন্যদিকে একদল কটরপন্থী তাঁকে মুরজিয়া, খারিজি, যুক্তিপূজারী এবং ধর্মহীন বলে অপবাদ দিতে শুরু করেছিল। [আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল, বর্ণনা নম্বর: ২৭৬]।

এটিও প্রচার করা হয়েছিল যে, “আবু হানিফা মুরজিয়া ছিলেন যারা জামাতের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালানো জায়েজ মনে করত।”

এমনকি এও বলা হতো: “আবু হানিফা এমন সব হাদিসকে আজোবাজে কথা বলতেন যেগুলোতে তলোয়ার চালানো নিষেধ করা হয়েছে।” [আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল, বর্ণনা: ২৬৫, ৩৬৮, ৩৬৯]।

যাই হোক, আজ পর্যন্ত ইমাম সাহেবের কোনো ছাত্র বা তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে: ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম জুফার পরবর্তী কোনো হানাফি ফকিহদের পক্ষ থেকে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি যা থেকে এই ভুল আকিদা ও বিশ্বাস প্রকাশ পায়। সুতরাং এই বর্ণনাগুলোর মর্যাদা ভিত্তিহীন অভিযোগের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ইতিহাসে এও বিদ্যমান যে, আব্বাসীয়রা বিপ্লবের আগে গোপন বৈঠকে নফস জাকিয়াকে খলিফা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু পরে তারা তা থেকে সরে আসে। সম্ভবত এই গোপন বৈঠকের কথা সাফফাহর খেলাফতের ঘোষণা পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়নি, কিন্তু মনসুরের সময় পর্যন্ত তা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই, এই প্রেক্ষাপটে যে কেউ আব্বাসীয়দের বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী মনে করবে।

এই সমস্ত দিক বিবেচনায় ইমাম সাহেবের আলবীদের প্রতি সহানুভূতি থাকা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এই সহানুভূতি বিদ্রোহে অংশগ্রহণের ফতোয়া দেওয়া বা আর্থিক সহায়তার পর্যায় পর্যন্ত ছিল না; কারণ বিদ্রোহ করা স্বয়ং ইমাম সাহেবের ফিকহি মাযহাবের পরিপন্থী ছিল। তবে সরকারের সমালোচনা করা একেবারেই সংগত ছিল; কারণ সরকারের অনেক পদক্ষেপ সত্যিই আপত্তিকর ছিল। বিশেষ করে বিরোধীদের অহেতুক রক্তপাত এবং সন্দেহ ও সংশয়ের ভিত্তিতে ধরপাকড় করা কোনোভাবেই সঠিক ছিল না। এ ধরনের কঠোর আচরণ ও অহেতুক ধরপাকড়ের ফলে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না; তাই ইমাম সাহেবের মতো একজন আলেমের অধিকার ছিল যে তিনি সমালোচনা করবেন, কিন্তু এই সমালোচনাকে সশস্ত্র বিদ্রোহের সমর্থন নাম দেওয়া কীভাবে সঠিক হতে পারে?

সম্ভবত ইমাম সাহেবের সমালোচনার কারণে কিছু লোক ভুল বুঝেছে যে তিনি বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক। তাছাড়া অতীতে ইমাম সাহেবের আলবী বুজুর্গদের সাথে যে গভীর সম্পর্ক চলে আসছিল, তা দেখেও যে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে এত বড় বিদ্রোহী আন্দোলনের পেছনে তারা অবশ্যই থাকবেন। এভাবে মূল কথাকে বাড়িয়ে শুনিয়ে তাতে অনেক কিছু যোগ করা হয়েছে।

ইমাম মালিক রহ. এবং বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা

সওয়াল: ইমাম মালিক রহ. কি নফস জাকিয়ার সমর্থনে ফতোয়া দিয়েছিলেন?

জওয়াব: ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে এটি প্রসিদ্ধ যে তিনি লোকজনকে নফস জাকিয়ার সমর্থন ও বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সহিহ রেওয়ায়েত বিদ্যমান নেই। যে রেওয়ায়েতগুলো প্রায়ই পেশ করা হয়, সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) ইবনে জারির তাবারী রহ. (মৃ. ৩১০ হি.)-এর রেওয়ায়েত:

“মালিক বিন আনাসকে মুহাম্মদ (নফস জাকিয়া)-এর সাথে বিদ্রোহ করার মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, যাও এবং তা করো। বলা হলো যে আমাদের ঘাড়ে তো আবু জাফর (মনসুর)-এর বায়াত রয়েছে। ইমাম মালিক বললেন: তোমরা তো বাধ্য হয়ে বায়াত করেছ, আর বাধ্য হয়ে করা শপথ আবশ্যিক হয় না। ফলে লোকজন মুহাম্মদের দিকে ধাবিত হলো এবং মালিক ঘরেই অবস্থান করলেন।” [১]

পর্যালোচনা: এই রেওয়ায়েতটি যয়িফ (দুর্বল); কারণ তাবারী এটি সাঈদ বিন আব্দুল হামিদ বিন জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি জানাননি যে তাকে কে সংবাদ দিয়েছে, বরং তিনি বলেছেন যে “একজনের বেশি লোক আমাকে জানিয়েছে।” সুতরাং এই বর্ণনাকারী অজ্ঞাত (মাজহুল) হওয়ার কারণে এটি যয়িফই হবে।

[১] মালিক বিন আনাস থেকে মুহাম্মদ (নফস জাকিয়া)-এর সাথে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে ফতোয়া চাওয়া হলে তাকে বলা হলো যে আমাদের ঘাড়ে তো আবু জাফরের বায়াত রয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা তো বাধ্য হয়ে বায়াত করেছ, আর বাধ্য হয়ে করা শপথের কোনো কার্যকারিতা নেই। ফলে লোকজন দ্রুত মুহাম্মদের দিকে গেল এবং মালিক নিজের ঘরেই অবস্থান করলেন। (তারিখুত তাবারী: ৭/৫৬০; সন: ১৪৫ হিজরি)

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

(২) জামালুদ্দিন হুসাইনী (মৃ. ৮২৮ হি.)-এর বর্ণনা:

“ফকিহ মালিক বিন আনাস মানুষকে মুহাম্মাদের সাথে বিদ্রোহ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং নিজেও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন; এই কারণেই মনসুর তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।” [১]

পর্যালোচনা: লেখক জামালুদ্দিন হুসাইনী নবম হিজরি শতাব্দীর একজন কটর শিয়া ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়।

(৩) ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারী রহ. (মৃ. ২৭৬ হি.)-এর বর্ণনা:

“লোকেরা জাফর বিন সুলাইমানকে (মদিনার গভর্নর) অভিযোগ করল যে, ইমাম মালিক ফতোয়া দিয়েছেন যে বায়আতের সময় কৃত শপথের কোনো গুরুত্ব নেই... তারা বলে যে তিনি মদিনার সকল অধিবাসীকে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন; এবং এর স্বপক্ষে এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন যে, ‘আমার উন্মতের ভুলভ্রান্তি এবং জোরপূর্বক করানো কাজ ক্ষমাযোগ্য’। এই বিষয়টি আবু জাফর (মনসুর)-এর কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হলো এবং তিনি ভয় পেলেন যে মদিনাবাসীরা হয়তো এই কারণে তাদের দৃঢ় বায়আত ভেঙে ফেলবে।” [২]

পর্যালোচনা: এই বর্ণনাটিও সনদবিহীন। ইবনে কুতাইবা এটি “দাসসু” (লোকেরা চোগলখুরি করেছে) এবং “যা’আমু” (লোকেরা দাবি করেছে) শব্দগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যার স্পষ্ট অর্থ হলো এটি একটি গুজব এবং শোনা কথা ছিল।

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর দিকে বিদ্রোহের বৈধতার ফতোয়া নিসবত না করে বলেন:

“মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান (নফস জাকিয়া)-এর বিদ্রোহের সময় ইমাম মালিক ঘরে আবদ্ধ হয়ে বসে ছিলেন; কারো কাছে শোক প্রকাশ করতে বা অভিনন্দন জানাতে যেতেন না। এমনকি জুমার নামাজ এবং জামাতে নামাজের জন্যও বের হতেন না।” [৩]

[১] ফকিহ মালিক বিন আনাস মানুষকে মুহাম্মাদের সাথে বিদ্রোহ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, আর এই কারণেই মনসুর তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। (উমদাতুত তালিব: ১/৮৮)

[২] অতঃপর তারা জাফর বিন সুলাইমানের কাছে এমন লোক পাঠাল যে তাকে বলল: মালিক মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছেন যে বায়আতের শপথ বৈধ নয় এবং তাদের জন্য তা আবশ্যিক নয় - এবং তারা দাবি করল যে তিনি মদিনার সকল অধিবাসীর জন্য এই ফতোয়া দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করলেন যে তিনি বলেছেন: “আমার উন্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যা করতে তারা বাধ্য হয় তা ক্ষমা করা হয়েছে”। এতে জাফরের কাছে বিষয়টি গুরুতর মনে হলো এবং তিনি ভয় পেলেন যে মদিনাবাসীদের থেকে যে বায়আত নেওয়া হয়েছে তা ভেঙে যাবে। (আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ: ২/৩২১) নোট: “আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ” আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারীর রচনা হিসেবে প্রসিদ্ধ, যিনি আহলে সুন্নাতের একজন বড় আলেম ছিলেন। (ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৩/৩২৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৩/২৯৬; মাওসুয়াতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাহ: ৩/৪২৩) যদিও এটি তাঁর দিকে নিসবতকৃত একটি দরকারী কিতাব, কিন্তু এতে অনেক অনির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক বর্ণনা রয়েছে। কিছু গবেষকের মতে এই কিতাবটি ইবনে কুতাইবার দিকে ভুলভাবে নিসবত করা হয়েছে। (মানহাজুর রাশাদ লিমান আরাদাল আসদাদ: ৩২০) আল্লামা মুহিবুদ্দিন আল-খাতিব মরহুম এর স্বপক্ষে এই দলিল দিয়েছেন যে, এই কিতাবে এমন দুই জন মিশরীয় বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যাদের থেকে ইবনে কুতাইবা কখনো শোনেননি এবং তিনি কখনো মিশরেও যাননি। (হাশিয়া: “আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম” লি ইবনিল আরাবি, পৃষ্ঠা ১৩৬, দারুল ওকাফ আস-সাউদিয়া)

কিছু গবেষক বলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারী নামে দুইজন ব্যক্তি আছেন: একজন সুন্নি এবং অন্যজন রাফেজি। মূলত এটি বাতিলপন্থীদের একটি চাল যে তারা তাদের মিথ্যা বর্ণনাকারীদের আহলে সুন্নাতের বড় বড় আলেমদের নাম, উপাধি ও লকব দিয়ে নামকরণ করে এবং এরপর দুনিয়াকে ধোঁকা দেয় যে দেখো! আহলে সুন্নাতের আলেমরাই এটি লিখেছেন যা আমরা বলছি। এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন: ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান নামে একজন সুন্নি বর্ণনাকারী ‘সুদী’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ এবং তিনি মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনাকারী। কিন্তু একজন মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস-সুদীকে তাঁর সাথে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে যে কিছু লোক ভুলবশত তাঁর ওপরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীতে গবেষকরা পার্থক্য করেছেন যে, একজনকে ‘সুদী আল-কাবির’ এবং মিথ্যাবাদীকে ‘সুদী আস-সগির’ উপাধিতে স্মরণ করা হয়। একইভাবে ইবনে জারির তবারী নামে একজন রাফেজিকেও ইমাম ইবনে জারির তবারীর সাথে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। (আন-নাসারুল লিসাহাব ওয়াল আলাল মিন ইফতিরাআতিল মাসাবিদিল আদলাল, ইব্রাহিম বিন আমের আর-রুহায়লি, পৃষ্ঠা ১১)

[৩] আর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানের বিদ্রোহের সময় থেকে মালিক নিজের ঘরে অবস্থান করতে থাকেন, তিনি শোক প্রকাশ বা অভিনন্দন জানাতে কারো কাছে যেতেন না, এমনকি বলা হয় যে তিনি জামাত বা জুমার নামাজের জন্যও বের হতেন না। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৬০১, ত. দার হিজর)

খুরুজ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন: খুরুজ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য ও আমল কী ছিল?

উত্তর: ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর কর্মপন্থাও ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে হকের বাণী উচ্চকিত করা। শাসকদের জুলুম ও পাপাচারের কারণে তিনি খুরুজ ও বিদ্রোহের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি যখন ইয়ামেনে ছিলেন, তখন সেখানকার শাসক হাম্মাদ আল-বারবারী ছিল জালেম ও স্বৈরাচারী। ইমাম শাফিঈ তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতেন এবং তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখতেন। সে খলিফা হারুনুর রশীদদের কাছে মিথ্যা লিখে পাঠাল যে, এই আলভীর পক্ষ থেকে খুরুজের আশঙ্কা রয়েছে। হারুন তাকে বাগদাদে তলব করলেন। তিনি যখন উপস্থিত হলেন, তখন দরবারে চামড়ার বিছানা পাতা ছিল এবং তলোয়ারগুলো ছিল কোষমুক্ত। ইমাম শাফিঈ (রহ.) সেই মুহূর্তে এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করলেন যে, হারুনুর রশীদদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। [১]

হারুনের পর তার পুত্র মামুনুর রশীদ সালতানাতে অংশীদার তার ভাই আমীনকে পরাজিত করে একক খলিফা হন। তিনি যুক্তিবাদ, ইতিহাস এবং শিয়া মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া ও নির্দেশ জারি করতেন। একবার শিয়া উলামাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, মুতআ জায়েয। [২]

২১১ হিজরিতে তিনি এই ফরমান জারি করেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হলেন হযরত আলী। মুয়াবিয়ার প্রশংসা করা থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করা হোক।” [৩]

পরের বছর তিনি ‘খালকে কুরআন’ আকিদার প্রচারও শুরু করেন, অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহর সৃষ্টি। মামুনুর রশীদদের গোমরাহির এই যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ.) মিসরে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে আধা-স্বায়ত্তশাসিত সরকার “দাওলাতুল আগলাবা” প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার আমিরগণ আব্বাসীয় খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতেন।

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর জীবদ্দশায় দাওলাতুল আগলাবার নিম্নোক্ত শাসকগণ অতিবাহিত হয়েছেন:

- ১. ইব্রাহিম বিন আগলাব: ১৮৪ হিজরি থেকে ১৯৬ হিজরি
- ২. আব্দুল্লাহ আউয়াল বিন ইব্রাহিম: ১৯৬ হিজরি থেকে ২০১ হিজরি
- ৩. যিয়াদাতুল্লাহ আউয়াল বিন ইব্রাহিম: ২০১ হিজরি থেকে ২২৩ হিজরি [৪]

[১] তারিখু দামেশক: ৫১/২৮৭; সিয়াকু আলামিন নুবাল: ১০/৮৬; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৯/৭০

[২] ওফয়াতুল আইয়ান: ৬/১৫০

[৩] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৪৫

[৪] তারিখু ইবনে খালদুন: ৪/১৮, ১৯, ২৫০

যিয়াদাতুল্লাহর শাসনের তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০৪ হিজরীতে ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মৃত্যু হয়। এই পুরো সময়ে তিনি একবারও মামুনুর রশীদ বা তার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (খুরুজ) ফতোয়া দেননি। এই সময়ে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে কিছু বিদ্রোহ হলেও ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রতি কোনো আমলি বা কউলি, গোপন বা প্রকাশ্য সমর্থনের প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) মামুনুর রশীদ এবং মুতাসিম বিল্লাহর যুগে খালকে কুরআন-এর ভুল আকিদার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করেন এবং কারাবরণ ও বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে কঠিন শাস্তি সহ্য করে হকের ওপর অটল থাকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেন, কিন্তু এই জালিম ও বিদআতি শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি নিজেও বিদ্রোহ করেননি এবং কাউকে এর ফতোয়াও দেননি।

খুলাসায়ে কালাম

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সম্ভাব্য সবটুকু অনুসন্ধানের পরেও আমরা কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ বা উদ্ধৃতি পাইনি যার মাধ্যমে আইন্মায়ে আরবাতা-এর মধ্য থেকে কারো পক্ষ থেকে তাদের সমসাময়িক কোনো বিদ্রোহের সমর্থনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

যদি এর সপক্ষে কোনো সহীহ রেওয়ায়েত পাওয়া যায় বা যযীফ রেওয়ায়েতসমূহের সমষ্টি দেখে এটি মেনে নেওয়া হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) বা অন্য কোনো মুজতাহিদ কোনো এক সময় কোনো সরকার বিরোধী আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন, তবুও আইন্মায়ে আরবাতা-এর মুতাওয়াতির ফিকহি মাযহাবের ভিত্তিতে একে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, এই মহান ব্যক্তিদের প্রাথমিক মাযহাব ছিল শাসকদের জুলুম-অত্যাচার বা ফিসকের কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ [১]। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই কর্মপদ্ধতির ক্ষয়ক্ষতি দেখা গেল এবং সুনতে নববিয়ার ওপর আরও গভীরভাবে চিন্তা করা হলো, তখন চূড়ান্ত ফতোয়া এটাই দেওয়া হলো যে, বিদ্রোহ কেবল তখনই জায়েজ যখন কুফরে বাওয়াহ (প্রকাশ্য কুফর) প্রকাশ পাবে, অন্যথায় বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকা জরুরি। এই সিলসিলায় হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)-এর অভিমত প্রাধান্যযোগ্য, তিনি নফসে জাকিয়্যার আন্দোলনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার পর শেষে বলেন:

“আইন্মায়ে কেরামের একটি জামাত সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা এই দুজনের (মুহাম্মদ নফসে জাকিয়্যা এবং ইব্রাহিম) বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।” [২]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)-এর মতো গবেষকদের নিকটও আইন্মায়ে মুজতাহিদীনের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সমর্থনের রেওয়ায়েতগুলো প্রমাণিত নয় বরং সন্দেহযুক্ত। আমরা এই বিষয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি, তার আলোকে এই বাস্তবতা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আইন্মায়ে মুজতাহিদীন এই ধরনের বিদ্রোহকে ফিতনা মনে করতেন।

[১] লেখক এটি সম্ভাবনা হিসেবে লিখেছেন। যখন এই ময়দানের বিশেষজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কি অন্য কোনো বক্তব্য (অর্থাৎ কুফরে বাওয়াহ ছাড়া ফাসেক ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতা সম্পর্কে) কোথাও বর্ণিত আছে? তখন উত্তর পাওয়া গেল যে, ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে কেবল একটিই বক্তব্য বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় কোনো বক্তব্য হানাফি ফিকহের ভাণ্ডারে বিদ্যমান নেই। একইভাবে ইমাম মালিক বা অন্যদের পক্ষ থেকে জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতার কোনো বক্তব্য আমরা পাইনি।

[২] وقد حكى عن جماعة من الأئمة أنهم مالوا الى ظهورهما وفي هذا نظر (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৩৮৩; সন ১৪৫ হিজরী)

সীরাত ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ওপর اعتراضات (আপত্তি)

প্রশ্ন: কিছু ব্যক্তি তাদের প্রবন্ধে লিখেছেন যে, মুসলমানদের কাছে সীরাত বা ইসলামী ইতিহাসের কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব নেই। তাদের বক্তব্য হলো, সীরাতের প্রথম কিতাব মুহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন। হিশাম বিন উরওয়াহ তাকে মিথ্যাবাদী (কাযযাব) বলতেন। ইমাম মালিক তার সীরাত যাচাই-বাছাই করার পর তাকে দাজ্জাল আখ্যা দিয়েছিলেন এবং বলতেন যে, এই মুহাম্মদ বিন ইসহাক সীরাতের নামে কিচ্ছা-কাহিনী বানায়; এজন্যই ইবনে ইসহাকের এই সীরাত উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক শতাব্দী পর ইবনে হিশাম এটিকে সংক্ষেপ করে পেশ করলে পরবর্তী লোকেরা এটিকে ইবনে হিশামের সীরাত মনে করে যাচাই-বাছাই ছাড়াই নকল করতে থাকে। তাবারী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং ইবনে খালদুন প্রমুখ তার থেকে প্রচুর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এভাবে মিথ্যার ওপর মিথ্যা নকল হতে থাকে।

এই ধরনের প্রবন্ধ পড়ে মন অত্যন্ত অস্থির। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছে:

(১) এই মুহাম্মদ বিন ইসহাক কে ছিলেন? তিনি কি সত্যিই মুসলমানদের বেশে কোনো মুনাফিক প্রকৃতির লোক ছিলেন?

(২) ইমাম মালিক প্রমুখ কি সত্যিই তাকে কাযযাব এবং দাজ্জাল বলেছেন? যদি তাই হয়, তবে পরবর্তী আকাবিরগণ ইমাম মালিকের কথার ওপর গুরুত্ব দেননি কেন? আর তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে তথ্য নকল করার ক্ষেত্রে আমাদের চৌদ্দ শতাব্দীর উলামায়ে কেরাম কোন কাতারে গণ্য হবেন? তারা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে গুরুতর অবহেলাকারী হিসেবে গণ্য হবেন না?

উত্তর: যারা এই ধরনের প্রবন্ধ লিখছেন, তাদের চিন্তার শেষ গন্তব্য এটাই হতে পারে যে, চৌদ্দ শতাব্দীর উলামায়ে কেরাম প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানশূন্য ছিলেন। যদি এই ব্যক্তির তওবা না করেন, তবে আশঙ্কা আছে যে, এক সময় তারা নিজেরাও উম্মতের পুরো ইলমী সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন এবং আপনার মতো যুবকদেরও সেই দিকে নিয়ে যাবেন।

এখন আমি আপনার উভয় প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর পেশ করছি:

১. মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ., উম্মতে মুসলিমার প্রখ্যাত আহলে ইলম এবং মদীনা মুনাওয়ারার আলেমদের মধ্যে একজন ছিলেন। হাফেজ যাহাবী রহ. তার পরিচয় এভাবে করিয়েছেন: “আল-আল্লামাহ, আল-হাফেজ, আল-আখবারী” [১]। তার পিতা ইসহাক বিন ইয়াসার তাবেয়ী এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী ছিলেন। [২]

এছাড়াও হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন: “তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইলমে হাদীস সংকলনকারী প্রথম আলেম ছিলেন। এই কাজ তিনি ইমাম মালিক রহ. এবং তার স্তরের আলেমদেরও আগে করেছিলেন। তিনি ইলমের উত্তাল সমুদ্র ছিলেন, তবে তিনি তেমন মানসম্মত কাজ করতেন না যেমনটি মুহাদ্দিসগণের নিকট হওয়া উচিত।” [৩]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৩/৭, আর-রিসালাহ

[২] তাহযীবুল কামাল: ৪৯৫/২, আর-রিসালাহ

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৫/৭

মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন। তারপর বাগদাদে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর তাঁর ইলমি পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। খতিব বাগদাদী (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী বাগদাদে আগত আলেমদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক অপেক্ষা অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ, উচ্চ সনদধারী এবং বিলম্বে মৃত্যুবরণকারী আর কেউ ছিল না। [১]

খতিব বাগদাদী (রহ.) বলেন: আলেমদের ইমামগণ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের মধ্যে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারী, সুফিয়ান আস-সাওরী, ইবনে জুরাইজ, শু'বা বিন হাজ্জাজ, জারীর বিন হাযিম, হাম্মাদ বিন সালামাহ, হাম্মাদ বিন যায়েদ, ইব্রাহিম বিন সাদ আল-যুহরী, শারীক বিন আব্দুল্লাহ আন-নাখঈ এবং সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [২]

তিনি প্রথম আলেম, যিনি সাহাবী ও তাবিঈদের থেকে বর্ণিত সীরাতের বর্ণনাগুলো একত্রিত করেন এবং একটি চমৎকার বিন্যাসে উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সকল সীরাত গ্রন্থ এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করেই রচিত। বর্ণনাগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি একটি উন্মুক্ত মানদণ্ড রেখেছিলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ছোট বিষয়ও সংরক্ষিত হয়ে যায়; এজন্য তিনি বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার শর্তারোপ করেননি। তিনি প্রতিটি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর চিন্তা ছিল যে, সেই পুরো পরিবেশকেও যেন সংরক্ষিত করা হয় যাতে নবুওয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল; এজন্য তিনি জাহেলিয়াত যুগের অবস্থা, প্রাচীন আরব শাসকদের রাজনীতি, গোত্রীয় বিবাদ, মুশরিকদের অহেতুক রেষারেষি, কবিদের বাগ্মিতা এবং বীরত্বগাথা—সবকিছুই এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সংক্ষেপে এতে এমন সব উপাদানও এসে গেছে যার সম্পর্ক নবুওয়াত পূর্ব ও পরবর্তী সময় এবং পরিবেশের সাথে ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না। এভাবে তাঁর কিতাবটি অত্যন্ত বিশালাকার হয়ে যায় এবং মুক্তার সাথে সাথে কঙ্করও জমা হয়ে যায়; এজন্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর অন্য একজন আলেম ইবনে হিশাম তা থেকে এমন অধিকাংশ বিষয় বাদ দিয়ে দেন যা সীরাত বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই দ্বিতীয় কিতাবটি ‘সীরাতে ইবনে হিশাম’ নামে মূল কিতাবের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়, এমনকি কিছু লোক ইবনে হিশামকেই প্রথম সীরাত রচয়িতা মনে করতে শুরু করে।

এটি ছিল মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কাজের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা যা আমরা আসমাউর রিজালের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে উপস্থাপন করেছি। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) একজন বড় আলেম ছিলেন। তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করা ইনসাফের পরিপন্থী।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর ওপর কিছু আলেম জেরা (সমালোচনা) করেছেন, যেমনটি আপনি তাঁদের জীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন। আমরা তা অস্বীকার করি না। তাঁদের জেরা নিজ স্থানে অকাট্য। কিন্তু অন্যদিকে মুহাদ্দিস ও ফকীহদের এক বিশাল বড় সংখ্যা তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। তাঁরা চোখ বন্ধ করে এই নির্ভরযোগ্যতার সনদ দেননি, বরং জেরার বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যারা জেরাকে হুবহু মেনে নিয়েছেন তারা কেবল জেরার শব্দগুলো দেখেছেন, যেখানে অন্যান্য আলেমগণ এই জেরার প্রেক্ষাপটও দেখেছেন। সমসাময়িকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, রেষারেষি এবং একে অপরের ওপর আঘাত করা একটি সাধারণ বিষয়। আলেমগণ ফেরেশতা নন, মানুষ। প্রাচীন যুগের মহান ব্যক্তিরূপেও সমসাময়িক রেষারেষি থেকে মোটেও নিরাপদ ছিলেন না।

[১] তারিখ বাগদাদ: ৭/২

[২] তারিখ বাগদাদ: ৭/২

মদিনায় ইমাম মালিক রহ.-এর জনপ্রিয়তার সূর্য মধ্যগগনে ছিল। তবে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-ও কোনো অংশে কম ছিলেন না। বয়সে তিনি ইমাম মালিক রহ.-এর চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন। [১] উভয়ই নিজ নিজ পদ্ধতিতে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করে বর্ণনা সংগ্রহ করেছিলেন। মানহাজ বা পদ্ধতির পার্থক্যের কারণে বড় বড় ইলমি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

একবার এক ব্যক্তি (যার নাম আজও অজ্ঞাত, এবং বর্ণনাগুলোতে তাকে ‘রজুল’ বা এক ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এসে ইমাম মালিক রহ.-কে বললেন: “মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন যে, মালিকের হাদিসগুলো আমাকে দেখাও। এই ইলম যাচাই করার লোক আমিই।”

ইমাম মালিক রহ. নিজের ইলমের ওপর সমালোচনা সহ্য করতে পারলেন না এবং বললেন: “সে তো দাজ্জালদের মধ্যে এক দাজ্জাল, যে বলে যে মালিকের ইলম আমাকে দেখাও।” [২]

ইমাম মালিক রহ.-এর এই বাক্যগুলো সংরক্ষিত হয়ে ইলমে জারহ ও তাদিলের অংশ হয়ে গেছে। ইমাম মালিক রহ.-এর জারহ-এর যে শব্দগুলো জারহ ও তাদিলের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো এটাই। লেখক অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও এমন কোনো প্রমাণ পাননি যে, ইমাম মালিক রহ. সিরাতে ইবনে ইসহাক দেখে বলেছিলেন যে এতে কিচ্ছা-কাহিনী রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর ওপর দ্বিতীয় কঠোর জারহ করেছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ি হিশাম বিন উরওয়াহ রহ.। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুনজির নিজের দাদি আসমা বিনতে আবি বকর রাযি. এবং উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযি. থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। [৩] মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-ও ফাতিমা বিনতে মুনজির থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং তা বর্ণনা করেছেন। হিশাম বিন উরওয়াহ রহ. যখন জানতে পারলেন যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. তাঁর স্ত্রীর থেকে বর্ণনা নকল করেছেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন: “মুহাম্মদ বিন ইসহাক মিথ্যাবাদী (কাযযাব)। সে আমার স্ত্রীর সাথে আবার কখন দেখা করল?” [৪]

হিশাম বিন উরওয়াহ রহ.-এর এই জারহ-ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

মোদ্দাকথা, মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর ওপর এই দুটি জারহ সত্যিই হয়েছে; তাই আমরা এই দাবি কখনোই করি না যে, জারহ ও তাদিলের প্রত্যেক ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-কে সিকাহ মনে করেছেন। ইমাম মালিক রহ. এবং হিশাম বিন উরওয়াহ রহ.-এর উল্লিখিত জারহগুলো ছাড়াও কেউ কেউ তাঁর ওপর তাশাইয়ু-এর অভিযোগ এনেছেন, আবার কেউ কেউ কাদরি হওয়ার অপবাদও দিয়েছেন। তাঁকে তাদলীস-এ লিপ্ত বলেও গণ্য করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলো উত্থাপনকারীরা ছিলেন প্রথম সারির মুহাদিস ও সমালোচক। তবে তাঁকে সিকাহ বলার এবং তাঁর ওপর আরোপিত অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করার মতো ব্যক্তিরও সেই যুগেই অতিবাহিত হয়েছেন, যারা মর্যাদার দিক থেকে অভিযোগকারীদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

ইমাম জুহরি রহ. বলতেন: “মদিনায় ইলম ততক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে যতক্ষণ এখানে মুহাম্মদ বিন ইসহাক আছেন।”

জারহ ও তাদিলের ইমাম হাফিজুল হাদিস ইমাম আলী বিন মাদিনী রহ. বলতেন: “হাদিসের ভিত্তি ছয়জন ব্যক্তির ওপর এবং এই ছয়জনের বর্ণনার ভিত্তি বারোজন ব্যক্তির ওপর, যাদের মধ্যে একজন হলেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক।” [৫]

[১] মুহাম্মদ বিন ইসহাকের জন্ম ৮০ হিজরির কিছু পরে এবং ইমাম মালিকের জন্ম ৯৩ হিজরিতে।

[২] আল-জারহ ওয়াত তাদিল লি ইবনে আবি হাতিম: ১৯১/৭, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য সংস্করণ।

[৩] তারিখুল ইসলাম জাহাবি: ৫৯২/৯, তাদমুনি সংস্করণ; ২৯৬/৩, বাশার সংস্করণ।

[৪] আল-জারহ ওয়াত তাদিল: ১৯৩/৭।

[৫] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৩৬/৭।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে: “যে ব্যক্তি মাগাযী (যুদ্ধাভিযান)-এর ইলমের সমুদ্র হতে চায়, তাকে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মুখাপেক্ষী হতে হবে।” [১]

ইবনে নুমাইর (রহ.) বলতেন: তার ওপর কাদারি হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল, অথচ তিনি সকল মানুষের চেয়ে এ থেকে বেশি দূরে ছিলেন। [২]

ইজলী (রহ.) এবং ইবনে হিব্বান (রহ.) তাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলে অভিহিত করেছেন। [৩] ইয়াহইয়া বিন মঈন (রহ.)-এরও একই অভিমত। [৪]

ইমাম আলী বিন আল-মাদিনী (রহ.) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন: “আমার নিকট তার বর্ণনা সহীহ।” এর ওপর একজন আলেম ইয়াকুব বিন শায়বাহ (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন: আর ইমাম মালিক (রহ.) তার সম্পর্কে কী বলেছেন? আলী বিন আল-মাদিনী (রহ.) দ্রুততার সাথে বললেন: “ইমাম মালিক (রহ.) তার মজলিসে বসেননি, তিনি তাকে চেনেন না।” তিনি আরও বললেন: “তিনি মদীনায় এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন যার কারণে তার ওপর সমালোচনা করা হয়েছে?” ইয়াকুব বিন শায়বাহ (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন: “আর হিশাম বিন উরওয়াহ-ও তার ওপর সমালোচনা করেছেন।” আলী বিন আল-মাদিনী (রহ.) বললেন: “তিনি যে সমালোচনা করেছেন তা দলিল নয়। হতে পারে মুহাম্মদ বিন ইসহাক তার স্ত্রীর নিকট ঐ সময় গিয়েছিলেন যখন তিনি (হিশাম) সেখানে ছিলেন না।” [৫]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) হিশাম বিন উরওয়াহ (রহ.)-এর এই শপথের ব্যাপারে যে “মুহাম্মদ বিন ইসহাক ফাতিমাকে কখনো দেখেননি,” বর্ণনা করে বলেন: “হিশাম তার শপথে সত্যবাদী। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ফাতিমাকে দেখেননি এবং তিনি এমন দাবিও করেননি যে তিনি তাকে দেখেছেন, বরং তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরাও অনেক মহিলার নিকট থেকে হাদীস শুনেছি কিন্তু তাদের দেখিনি। কত তাবেয়ী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তারা তার চেহারা কখনো দেখেননি।” [৬]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতার নিকট মুহাম্মদ বিন ইসহাক-এর হাদীসগুলো শুনালাম, তখন তিনি বললেন: “হিশাম এই কথা কেন অস্বীকার করতেন? সম্ভবত মুহাম্মদ বিন ইসহাক এসেছিলেন এবং ফাতিমার নিকট অনুমতি নিয়েছিলেন। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।” ইমাম আহমদ (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে হিশাম বিন উরওয়াহ-এর হয়তো এ বিষয়ে জানা ছিল না। [৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.)-এর সমালোচনাকে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন: “যদি ইমাম মালিকের ইবনে ইসহাকের ওপর অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে অনেক সময় মানুষ কোন কথা বলে এবং কাউকে কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি তাকে প্রতিটি বিষয়ে অভিযুক্ত করছেন।” [৮]

[১] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩৬/৭

[২] তাহযীবুত তাহযীব: ৪২/৯

[৩] আস-সিকাত লিল-ইজলী, পৃ. ৪০০; আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৩৮০/৭

[৪] তাহযীবুল কামাল: ৪১১/২৪, ত. আর-রিসালাহ

[৫] তাহযীবুত তাহযীব: ৪২/৯ - লেখক আরজ করছেন যে: এই সম্ভাবনা প্রবল; কারণ মুহাম্মদ বিন ইসহাক ফাতিমা বিনতে আল-মুনযির থেকে কমপক্ষে ৩২ বছরের ছোট ছিলেন। ফাতিমা বিনতে আল-মুনযিরের জন্ম তারিখ কোথাও বর্ণিত নেই, তবে হিশাম বিন উরওয়াহ-এর জন্ম ৬১ হিজরী। সিয়ার আলামুন নুবালা ৩৮/৬ অনুযায়ী ফাতিমা তার থেকে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। এভাবে তাহযীবুল কামাল ২৬৬/৩৫ অনুযায়ী ফাতিমার জন্ম ৪৮ হিজরী। তিনি উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আবওয়াবুর রাদা’, এবং একে হাসান সহীহ বলেছেন)। এর ভিত্তিতে তার বয়স সঠিক প্রমাণিত হয়। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ৮০ হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ফাতিমা থেকে ৩২ বছরের ছোট ছিলেন।

[৬] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩৮/৭

[৭] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩৮/৭... স্পষ্ট যে মানুষ সব সময় ঘরে থাকে না। আর এটি জরুরি নয় যে ফাতিমা বিনতে আল-মুনযির পরে হিশাম বিন উরওয়াহকে বলবেন যে আজ অমুক হাদীস শোনার জন্য এসেছিল। বরং হাদীস শ্রবণকারীর জন্য এটিও জরুরি নয় যে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম সে জানবে।

[৮] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৪০/৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হাফিজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’-তে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেন:

“এটি একটি সুপরিচিত বিষয় যে, অনেক সমসাময়িক আলেমদের একে অপরের প্রতি সমালোচনা গুরুত্বহীন। এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তিকে এমন এক জামাত নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বলে ঘোষণা করেছে যারা ন্যায়পরায়ণ।” [১]

অতঃপর যেভাবে এক পক্ষ তাঁর ওপর জরাহ (সমালোচনা) করার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করছিল, অন্য এক পক্ষ তাঁর তাদীল (নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা) করার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিল এবং তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইমাম শু’বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি তাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলতেন। [২]

জমহুর আইন্মায়ে কেরাম এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। জরাহ ও তাদীল শাস্ত্রের আলেমগণ যে নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন, তার অধীনে তাঁদের অধিকাংশ মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওপর না তো কঠোর জরাহ গ্রহণ করেছেন, না তাঁকে উচ্চপর্যায়ের সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলে মেনে নিয়েছেন। না তো তাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ সাব্যস্ত করেছেন, আর না কাযযাব (মিথ্যাবাদী) ও দাজ্জাল। না তো তাঁর প্রতিটি বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর না তাঁর প্রতিটি বর্ণনাকে চোখ বন্ধ করে দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন। বরং তাঁরা মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে মধ্যম সারির একজন সত্যবাদী রাবী এবং সীরাত ও ইতিহাসের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কেমন ছিলেন? উত্তর এল: ‘হাসানুল হাদীস’। তবে তিনি সুনান-এর ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করতেন না। [৩]

এই পুরো বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট ভঙ্গিতে ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। তিনি বলেন:

“মুহাম্মদ বিন ইসহাক-এর ওপর দুইজন ব্যক্তি জরাহ করেছেন: হিশাম বিন উরওয়াহ এবং মালিক বিন আনাস। হিশাম বিন উরওয়াহ-কে যখন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক কি ফাতিমা বিনতে মুনযির থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন? তখন হিশাম বিন উরওয়াহ বললেন: সে কি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে? ... (ইবনে হিব্বান বলেন) হিশাম বিন উরওয়াহ-এর এই কথার কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মজরুহ (ত্রুটিপূর্ণ) মনে করা যেতে পারে না: কারণ ইরাকী তাবিঈগণ যেমন: আসওয়াদ, আলকামা, আবু সালামাহ এবং আতা, সেইসাথে তাঁদের ব্যতীত হিজাজী তাবিঈগণ আয়েশা رضى الله عنها-কে না দেখেই বর্ণনা শুনেছেন, কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন কিন্তু মানুষ তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করেছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ হযরত আয়েশা رضى الله عنها-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেনি।”

সুতরাং একইভাবে ইবনে ইসহাক পর্দার আড়াল থেকে ফাতিমা বিনতে মুনযির থেকে বর্ণনা শুনেছেন, তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। শ্রবণের (সামা’) এই পদ্ধতি সঠিক। আর এর ভিত্তিতে কারো ওপর জরাহ করা ইনসাফের পরিপন্থী।

ইমাম মালিকের কথা যদি ধরা হয়, তবে তিনি কেবল একবারই এমনটি বলেছিলেন। এরপর তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সাথে সেই আচরণের দিকেই ফিরে এসেছিলেন যা তিনি পছন্দ করতেন। আসলে হয়েছিল এই যে, হিজাজে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের চেয়ে আরবদের বংশপরম্পরা এবং ইতিহাসের অধিক পারদর্শী আর কেউ ছিল না। মুহাম্মদ বিন ইসহাকের দাবি ছিল যে, ইমাম মালিক বনু যী আসবাহ-এর মাওয়ালী (মুক্তদাস বা অনুগত)-দের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ইমাম মালিকের দাবি ছিল যে তিনি বনু যী আসবাহ-এরই অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৭/৪০

[২] তাহযীবুল কামাল: ২৪/৪১৭

[৩] মাওসুআতু আকওয়ালি আহমদ: ৩/২৩৯

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অতঃপর যখন ইমাম মালিক মুয়াত্তা রচনা করলেন, তখন মুহাম্মদ বিন ইসহাক বললেন যে, এটি আমাকে দেখাও, আমি এর চিকিৎসক।

এই কথা ইমাম মালিকের কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন: সে দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল, যে ইহুদিদের বর্ণনা গ্রহণ করে।

এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে তা-ই ঘটল যা মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে।

অবশেষে মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইরাক যাওয়ার সংকল্প করলেন। তখন তাদের উভয়ের মধ্যে আপস হয়ে গেল। ইমাম মালিক তাকে বিদায় জানানোর সময় সেই বছরের তার ফসলের অর্ধেক অংশ অর্থাৎ পঞ্চাশ দিনার উপহার দিলেন।

ইমাম মালিক হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ওপর জরাহ করেননি, বরং এই কারণে করেছিলেন যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক নবী ﷺ-এর গাজওয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য (রাসুলের যুগের) ইহুদিদের নওমুসলিম সন্তানদের কাছেও যেতেন যাদের খায়বার, কুরাইজা ও বনু নাজির এবং এই জাতীয় অন্যান্য যুদ্ধের অবস্থা মুখস্থ ছিল। ইবনে ইসহাক এই বিষয়গুলো অনুসন্ধান করতেন যাতে সেগুলো জানতে পারেন; এজন্য নয় যে সেগুলো থেকে (শরয়ী) ইস্তিদলাল করবেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক কেবল সিকাহ, সাদুক, আলেম ও ফাজেল ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন যিনি উত্তমরূপে বর্ণনা পেশ করতেন এবং সেই বর্ণনার (অর্থ) জানতেন। [১]

এটি ছিল ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর বক্তব্য যার আলোকে মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর ওপর কিছু ইমামের জরাহ-এর প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ভালোভাবে সামনে চলে আসে। এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, জরাহ বড় বড় সিকাহ রাবিদের ওপরও হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমের মধ্যেও এমন বিশজন রাবি রয়েছেন যাদের ওপর কেউ না কেউ জরাহ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকের ওপর প্রতিটি জরাহ হুবহু গ্রহণযোগ্য হয় না।

মাওলানা আব্দুল হাই লখনভি (রহ.) বলেন:

“জরাহ যখন গোঁড়ামি, শত্রুতা বা বিদ্বেষের কারণে প্রকাশ পায়, তখন সেই জরাহ অগ্রহণযোগ্য এবং তা কেবল সেই ব্যক্তিই মানে যে নিজে প্রত্যাখ্যাত। এই কারণেই মাগাজি বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালিকের উক্তি যে: ‘সে দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল’, তা গ্রহণ করা হয়নি; কারণ এটি জানা গিয়েছিল যে, এর প্রকাশ ঘটেছিল প্রকাশ্য বিদ্বেষের কারণে। বরং উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক হাসানুল হাদিস, এবং হাদিসের ইমামগণ তার ওপর আস্তা রেখেছেন।” [২]

মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। শত শত বছর আগে জুমহুর মুহাদ্দিসগণ এই মতামতগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনা সীরাত, গাজওয়াত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নির্ভরযোগ্য, তবে আহকাম-এর ক্ষেত্রে সেই স্তরের নির্ভরযোগ্য নয়। সাধারণভাবে তাকে গ্রহণযোগ্য রাবি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যার প্রমাণ হলো সহীহ মুসলিমে ৭টি, নাসায়ীতে ৪১টি, তিরমিযীতে ৪১টি, ইবনে মাজাহ-তে ৭০টি এবং আবু দাউদে ৮০টি বর্ণনা এই মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এরই।

[১] আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান: ৭/৩৮৩, ৩৮৪

[২] আর-রাফ' ওয়াত-তাকমিল, পৃ. ৪১১, ত. হালব

ইমাম মালিক (রহ.) থেকে হিশাম বিন উরওয়াহ (রহ.) সম্পর্কেও কঠোর জরাহ বর্ণিত হয়েছে: ‘হিশাম বিন উরওয়াহ কাযযাব’ (তারিখে বাগদাদ: ১/২৩৯, আল-ইলমিয়াহ)। কিন্তু পরবর্তী গবেষকগণ হিশাম বিন উরওয়াহ (রহ.)-এর ওপর এই জরাহ-এরও প্রতিবাদ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন (রহ.)-ও এই উক্তির তাবিল করেছেন। খতিবে বাগদাদী (রহ.) এই উক্তিটিকে সনদের দিক থেকে মজবুত মনে করেন না (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৭/৩৮, ৩৯)। আর এটাই বাস্তবতা যে এই জরাহ প্রমাণিত নয় এবং যদি প্রমাণিত হয়ও তবে তা অবশ্যই মুআউওয়াল (ব্যখ্যার দাবি রাখে)।

ফকীহগণও মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মুসনাদে তাঁর ৪৮টি বর্ণনা রয়েছে। অন্যদিকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মুসনাদে ৫৯০টি। আহনাফদের মহান ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবী রহ. শারহু মাআনিল আসার-এ তাঁর ৮৭টি এবং শারহু মুশকিলিল আসার-এ ৭৭টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার অধিকাংশই ফিকহ সংক্রান্ত।

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. থেকে শুধুমাত্র তালীকান বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর “আত-তরীখুল আওসাত”-এ তাঁর ৪৪টি এবং “আত-তরীখুল কাবীর”-এ ১০৪টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে একটি বড় সংখ্যা মারফু হাদীসের।

ইবনে হিব্বান রহ. (মৃত্যু ৩৫৪ হিজরী) সহীহ ইবনে হিব্বান-এ মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর ৫৭টি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইবনে হিব্বান রহ.-এর “আস-সীরাতুন নববীয়াহ”-এর একটি বড় অংশ মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রচিত।

ইমাম দারাকুতনী রহ. (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী) জারহ ও তাদীল নিয়ে কাজ করার সময় মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর ওপর জারহ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের সুনান-এ মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর ৪৯টি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার অধিকাংশই শরয়ী বিধান সংক্রান্ত।

বর্ণনাগুলো হাদীসের ভাণ্ডারের হোক বা ইতিহাসের ভাণ্ডারের, যেকোনো বর্ণনার সনদ এবং মতন নিয়ে আজও আলোচনা হতে পারে। একেবারে নিকট অতীতেও এই কাজ হয়েছে। যেমন শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ. হাজার হাজার হাদীসের সনদ যাচাই করে সেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান বা যযীফ চিহ্নিত করেছেন। একইভাবে তাফসীরে তাবারী এবং তারীখে তাবারীর ওপরও গবেষণামূলক কাজ হয়েছে, বর্ণনাকারীদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সহীহ, হাসান এবং যযীফকে আলাদা করা হয়েছে। এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা কোনো বর্ণনা সম্পর্কে কোনো গবেষকের মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু কোনো গবেষক এই বোকামি করেননি এবং করতেও পারেন না যে, যদি হাদীস, সীরাত বা ইতিহাসের কোনো সংকলনে কিছু বর্ণনা যযীফ প্রমাণিত হয়, অথবা সেগুলোর পাঠে এমন কিছু থাকে যা প্রশ্নবিদ্ধ এবং মনে খটকা সৃষ্টি করে, তবে লেখককেই খায়েন, প্রতারক, ইসলাম বিদ্বেষী এবং কাফেরদের এজেন্ট বলে ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

প্রশ্নবিদ্ধ বর্ণনা এবং মনে খটকা সৃষ্টি করার মতো বিষয় তো বুখারী ও মুসলিমসহ প্রায় প্রতিটি হাদীস সংকলনেই রয়েছে, যেগুলোকে পুঁজি করে প্রাচ্যবিদরা “হাদীস নিয়ে প্রাচ্যবাদ”-এর ফ্রন্ট খুলে রেখেছে। কিন্তু সামান্য সর্দি হলেই নাক কেটে ফেলা হয় না। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং দেওয়া হয়েছে, যা হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতেও বিদ্যমান এবং প্রাচ্যবাদের মোকাবিলায় লেখা বইগুলোতেও। সমালোচনা শাস্ত্রে কেউ এর অবকাশ দেখেননি যে লেখক এবং সংকলনগুলোকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হবে। এ ধরনের জনমত কেবল সাধারণ মানুষেরই হতে পারে, জ্ঞানতাত্ত্বিক নয়।

জারহ ও তাদীলের কিছু মতামত ব্যবহার করে সীরাতুন নববীর মহান খেদমতকে নস্যাত করা কখনোই ইসলামের প্রতিরক্ষা নয়। যদি তা হতো, তবে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক উলামায়ে কেরাম বিগত শতাব্দীগুলোতে ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে ইবনে হিশাম রহ.-এর সীরাতের ধারা মুসনাদে ইবনে ইসহাক রহ.-এর সাথে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু ইসলামের উলামায়ে কেরাম বারোশ শতাব্দী ধরে না সীরাতে ইবনে ইসহাককে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, না সীরাতে ইবনে হিশামকে আগুনে পুড়িয়েছেন। বরং তাঁরা এগুলোর যথাযথ খেদমত করেছেন। এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন, টীকা লিখেছেন।

এই কথাটিও সম্পূর্ণ ভুল যে, “মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর সীরাতুন নববী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এক শতাব্দী পর্যন্ত...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

পরিত্যক্ত ছিল। মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু ১৫০ হিজরিতে হয়েছিল এবং তাঁর সীরাতকে আরও উত্তমভাবে উপস্থাপনকারী ইবনে হিশাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মৃত্যু ২১৩ হিজরিতে। যদি এই সময়ের মধ্যে সীরাতে ইবনে ইসহাক বিলুপ্ত হয়ে যেত, তবে ইবনে হিশাম কীভাবে এর বিন্যাস ও পরিমার্জন করতেন? সুতরাং মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সীরাত সেই যুগেও আলেমদের কাছে বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীতেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। হ্যাঁ, গত দুই-তিন শতাব্দীতে এটি অবশ্যই অজ্ঞাত ছিল। এর কারণ ছিল এই যে, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ মুসলিম বিশ্বের লাইব্রেরিগুলো লুটতরাজ করে যেসব উচ্চমানের কিতাব ইসলামী বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত করেছিল, সেগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সীরাতও ছিল। যখন উপনিবেশবাদের সূর্য অস্তমিত হলো, তখন ইসলামের আলেমগণ এর সন্ধান তৎপর হলেন এবং বছরের পর বছর অনুসন্ধানের পর তা খুঁজে বের করলেন এবং এই পাণ্ডুলিপিটি গবেষণা করে পুনরায় মুদ্রণ করালেন।

প্রয়োজন হলো এই যে, পূর্বসূরিদের ইলমি মানহাজকে গুরুত্বের সাথে বোঝা এবং যদি এর তাওফিক না হয়, তবে অন্তত ‘আধুনিক গবেষণা’র নামে করা এমন কোনো প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত না করা, যা শিরোনামের দিক থেকে আবেগপ্রসূত হলেও বাস্তবে মুসলমানদের ইলমি ঐতিহ্যকে ডুবিয়ে দেওয়ার নামান্তর।

উম্মতের আলেমদের দৃষ্টিতে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর মর্যাদা

কিছু লোক বিভিন্ন ফোরামে এবং নানাভাবে এই অপপ্রচার শুরু করেছে যে, ইমাম তাবারী (রহ.) মুহাদ্দিসগণ, ফকীহগণ এবং জারহ ও তা’দীল বিশেষজ্ঞদের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। আমাদের তাদের প্রতিটি কথার উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে পাঠকদের তাদের প্রতারণা থেকে বাঁচাতে ইমাম তাবারীর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা জরুরি। এই সিলসিলায় আমরা ইনশাআল্লাহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রেফারেন্সের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করব:

- ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে ইসলামের মহান আলেমদের অভিমত।
- তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উস্তাদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।
- তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।
- হাদীস, তাফসীর ও আকীদার কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ও উক্তিগুলোর প্রমাণ।
- রাবীদের তাওযীক ও তাযঈফ নির্ধারণে তাঁর মতামতের ওপর আস্তার প্রমাণ।
- হাদীসের তাস্বহীহ ও তাযঈফ-এর ক্ষেত্রে গবেষকদের তাঁর মতামতের ওপর আস্তার প্রমাণ।

(১) ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে ইসলামের মহান আলেমদের অভিমত:

প্রত্যেক যুগের মহান আলেমগণ ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর অত্যন্ত আস্তা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিমত নিম্নরূপ:

ইমাম আবুবকর ইবনে খুযাইমাহ (রহ.) (মৃত্যু ৩১১ হিজরী)-এর অভিমত:

ইমাম আবুবকর ইবনে খুযাইমাহ (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং মিশরের শিক্ষা সফরে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁর চেয়ে এক বা দুই বছরের বড় ছিলেন। [১] ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে তাঁর উক্তি হলো: “আমি এই ভূপৃষ্ঠে তাঁর চেয়ে বড় আলেম আর কাউকে জানি না।” [২]

ইমাম ইবনে খুযাইমাহ-এর বিশেষ ছাত্র আবু আহমদ বাগদাদী যখন হাম্বলীগণের বিরোধী আন্দোলনের কারণে ইমাম তাবারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি, তখন ইবনে খুযাইমাহ (রহ.) দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন: “আফসোস! তুমি যদি অন্য কারো থেকে বর্ণনা না নিয়ে তাঁর থেকেই বর্ণনা নিতে।” [৩]

[১] হাফেজ যাহাবী তাঁকে এভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন: আল-হাফেজ, আল-হুজ্জাহ, আল-ফকীহ, শায়খুল ইসলাম, ইমামুল আইম্মাহ (সিয়ার আলামুন নুবালা: ১৪/৩৬৫)। তাঁর সংকলিত সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হাদীসের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে গণ্য হয়।

[২] মা আ’লামু আলা আদিলিল আরদি আ’লামা মিন মুহাম্মাদ বিন জারীর... ইবনে আসাকির এটি মুত্তাসিল সনদে জাহের বিন তাহের আবু আল-কাসিম আল-শাহামী থেকে, তিনি ইমাম বায়হাকী থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ আল-নিশাপুরী (আল-হাকিম) থেকে, তিনি আবু বকর বিন বালুয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন... (তারীখে দামেশক: ৫২/১৯৬)। ইবনে সালুয়াহ এবং যাহাবীর উক্তি: তিনি মুহাদ্দিস ও ইমামদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। (সিয়ার আলামুন নুবালা: ১৪/৪১৯; তারীখুল ইসলাম: ৭/৪৬০)। তাঁর নাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ, আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি, আর এই যুগের লোকেরা তাঁর প্রতি রাফেযী হওয়ার যে অপবাদ দেয় তা তাদের মূর্খতা, কারণ রাফেযীরা আবু বকরকে পছন্দ করে না।

[৩] ইবনে আসাকির এটি তারীখে দামেশক: ৫২/১৯৫-এ মুত্তাসিল সনদে জাহের বিন তাহের আবু আল-কাসিম আল-শাহামী থেকে, তিনি ইমাম বায়হাকী থেকে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফেজ (আল-হাকিম) থেকে, তিনি আল-হুসাইন বিন আলী আবু আহমদ আল-নিশাপুরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি আল-খতিব এবং তিনি বলেছেন: হুজ্জাহ।

আবদুর রহমান বিন ইউনুস আল-মিসরি আল-হাফিজ (৩৪৭ হিজরি)-এর মতামত:

আবদুর রহমান বিন ইউনুস আল-মিসরি চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর জরাহ ও তাদিল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। [১]

তিনি ইবনে জারির তাবারির কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন:

“মুহাম্মদ বিন জারির, যার কুনিয়ত আবু জাফর, তাবারিস্থানের আমুল শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ফকিহ ছিলেন। অনেক আগে ২৬৩ হিজরিতে মিশরে আসেন এবং এখানে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি উত্তম গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন যা তার জ্ঞানের বিশালতার প্রমাণ।” [২]

আবদুল আজিজ আবুল হাসান আত-তাবারী (৩৬০ হিজরি)-এর মতামত:

এই মহান ব্যক্তি ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরির অনুগ্রহভাজন এবং আশআরিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মুতাকাল্লিম ছিলেন। [৩] তার উক্তি হলো:

“ইবনে জারির এমন একজন কারি ছিলেন যে মনে হতো তিনি কুরআন ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তিনি এমন একজন মুহাদ্দিস ছিলেন যে মনে হতো তিনি হাদিস ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তিনি এমন একজন ফকিহ ছিলেন যে মনে হতো ফিকহ-ই তার সব কিছু। নাহ্ এবং গণিতে তিনি এমন ছিলেন যেন এগুলোই তার বিছানা।” [৪]

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারগানি (৩৬২ হিজরি)-এর মতামত:

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারগানি ইমাম দারা কুতনির হাদিসের উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাগদাদের জরাহ ও তাদিল ইমামদের মধ্যে আল্লামা ইবনে মাসরুর তাকে সিকাহ বলেছেন। [৫] আল-ফারগানি ইবনে জারির তাবারির অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং পরবর্তী আসমাউর রিজাল বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ ইমাম তাবারির বর্ণনায় তার থেকে উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন:

“তিনি এমন এক পূর্ণাঙ্গ তাফসির রচনা করেছেন যাতে তাফসিরের বিধানসমূহ, নাসিখ ও মানসুখ, জটিল বিষয়সমূহ, বিরল শব্দাবলি, বিধান ও ব্যাখ্যাসমূহে মুফাসসিরদের মতভেদ, তার নিকট সঠিক মতের নির্ধারণ, হরফের ইরাব, বিভ্রান্ত ফেরকাদের খণ্ডন, কিচ্ছা-কাহিনী, অতীত জাতিসমূহের সংবাদসহ বিধান ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ একত্রিত করা হয়েছে... যদি কোনো আলেম চান তবে তিনি এ থেকে আলাদা আলাদা শাস্ত্রের কিতাব বের করতে পারেন... এবং তিনি তাহজিবুল আসার শুরু করেছিলেন...”

[১] আয-যাহাবি বলেন: তিনি এই বিষয়ে ইমাম ছিলেন, তারপর বললেন: জরাহ ও তাদিল বিষয়ে তার বক্তব্য রিজাল শাস্ত্র ও ইল্লাত সম্পর্কে তার গভীর দৃষ্টির প্রমাণ দেয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৭/৮৫৩)

[২] “মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ, কুনিয়ত আবু জাফর, তাবারী, আমুল শহরের অধিবাসী, ফকিহ ছিলেন; প্রাচীনকালে ২৬৩ হিজরিতে মিশরে আসেন এবং সেখানে কিতাব রচনা করেন, উত্তম গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন যা তার জ্ঞানের বিশালতার প্রমাণ।” (তারিখ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি: ২/১৯৫, ১৯৬)

[৩] ইমাম আবদুল আজিজ আত-তাবারী বিভ্রান্ত ফেরকাদের খণ্ডনে ‘রিয়াজুল মুহতাদি ওয়া বাসীরাতুল মুস্তাহদি’ লিখে এই বিষয়ের হক আদায় করেছেন। একইভাবে মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে ‘আর-রদু আলা জাফর বিন হারব’ লিখে ওলামায়ে ইসলামের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আল্লামা ইবনে আসাকির বলেন: “আমি তার কিছু কিতাব দেখেছি যা তার ইলম ও ফজিলতে অগ্রগণ্য হওয়ার প্রমাণ।” (তারিখ দিমাশক: ৩৬/৩৪০)

[৪] মুজামুল উদাবা: ১৮/৬১

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/১৩২, ১৩৩

তাকে যারা নির্ভরযোগ্য বলেছেন তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল ফাতহ বিন মাসরুর আল-বাগদাদি (৩৮৫ হিজরি) অন্যতম, তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন। হাফেজ যাহাবি তাকে ‘আল-ইমাম, আল-কুদওয়াহ, আর-রবানি, আস-সিকাহ’ শব্দে স্মরণ করেছেন। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত এবং আবদালদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনি বলতেন: “যখন তিনি আমাদের কাছে আসতেন, আমরা তার থেকে বরকত হাসিল করতাম।” অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও তিনি ফাজায়েলে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপরও একটি কিতাব লিখেছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬/৪৭৪, ৪৭৫)

যা এক বিস্ময়কর কিতাব। এর সূচনা হয়েছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ঐসব বর্ণনা থেকে যা তাঁর নিকট সহীহ সনদে পৌঁছেছে। প্রতিটি হাদীসের ওপর তিনি আলোচনা করেছেন, এর ইলল (ত্রুটি) ও তুরূক (সূত্রসমূহ) বর্ণনার মাধ্যমে। এরপর তিনি সেই হাদীস থেকে ফিকহী মাসায়েল, সুনান, এতে উলামায়ে কেরামের মতভেদ, তাঁদের দলীলসমূহ, এই হাদীসের মা’আরিফ (গুঢ় রহস্য) ও সুস্পষ্ট বিষয়সমূহ এবং বাতিলপন্থীদের আপত্তিসমূহ ও তাদের দলীলসমূহের অসারতাও বর্ণনা করেছেন। তিনি আশারায়ে মুবাশশারা, আহলে বাইত এবং মুসনাদে ইবনে আব্বাসের একটি বড় অংশ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি সহীহ হাদীস শেষ পর্যন্ত এভাবেই বর্ণনা করবেন এবং সবগুলোর ওপর একইভাবে আলোচনা করবেন যেমনটি তিনি শুরু থেকে করে আসছিলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইলমের ওপর কারো কোনো আপত্তির সুযোগ না থাকে। আর তিনি ঐসব বিষয় পেশ করে দেন ইলম অন্ত্রেষণকারীদের যার প্রয়োজন পড়ে। যেমন তিনি তাফসীরে করেছেন, তেমনি এতে শরীয়ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর ইলম পেশ করেছেন। তবে তিনি (তহযীবুল আসার) সম্পন্ন করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, তিনি একটি হাদীসেরও এমন ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং এর ওপর এমন আলোচনা করতে পারেন যেমনটি তিনি করেছেন। [১]

ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারাইনী (রহ.) (মৃ. ৪০৬ হি.)-এর রায়:

ইমাম ইসফারাইনী এবং আল্লামা ইবনে সালাহ (রহ.) তাঁকে চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেছেন। [২] শাফেয়ীগণ বলেন: “যদি কোনো ব্যক্তি ইবনে জারীরের তাফসীর হাসিল করার জন্য চীন পর্যন্ত সফর করে, তবে এটি কোনো বড় কথা নয়।” [৩]

আল-হাফিয আবু ইয়লা আল-খালীলী (রহ.) (মৃ. ৪৪৬ হি.)-এর রায়:

হাফিয খালীলী (রহ.) উচ্চ সনদধারী হাফিযে হাদীস, ফকীহ এবং রিজাল ও ইলল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। [৪] তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.)-এর নিকট থেকে ফয়েজ লাভকারীদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে জারীর তাবারীও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। [৫] অন্য এক স্থানে বলেন: “তিনি এতোটাই বিশ্বখ্যাত যে তাঁর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। ইলমের সংকলক, ইমাম।” [৬]

খতীব বাগদাদী (রহ.) (মৃ. ৪৬৩ হি.)-এর রায়:

তিনি বলেন: “তিনি ইলমসমূহের ওপর আধিপত্যের দিক থেকে নিজ যুগে অতুলনীয় ছিলেন। আল্লাহর কিতাবের হাফিয, কিরাত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ...”

[১] আত-তারীখুল মুসাহহাল আলা তারীখিত তাবারী লি-আবি মুহাম্মদ আল-ফারগানী, আখরাজাহ ইবনু আসাকির বি-খাতি ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ আল-উমাইমী, মুআল্লাফাহ মিন কিতাবি আবি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-ফারগানী, ওয়াকাদ লাকিয়া মান হাদ্দাসা আনহু। (তারীখে দামেশক: ১৯/৫২)

ওয়াহাযা আবু মুহাম্মদ রিয়কুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আত-তামীমী শায়খু শুয়ুখি ইবনি আসাকির, ওয়া যাকারাহ আসহাবু জুরহি ওয়াত তা’দীল বি-আল্লাতিহি “রাইসুল হানাবিলাতি ফী বাগদাদ”, ওয়া “কানা কাবীরা বাগদাদা ওয়া জালীলুহা”, ওয়া “কানা মিনাল আসবাত”। (তারীখুল ইসলাম যাহাবী: ৫৯৫/১০)

[২] তহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ২/১০২

[৩] আখরাজাহুল খতীবুল বাগদাদী ফী তারীখিহি: ২/১৬৪। কাল বিলফযি আন আবি হামিদ আহমাদ বিন আবি তাহের আল-ইসফারাইনী আম্মাহ কাল লাও সাফারা রাজুলুন ইলা আস-সীন হাভা ইয়াহসুলা কিতাবা তাফসীরি মুহাম্মদ বিন জারীর লাম ইয়াকুন যালিকা কাসীরান। ওয়ানযুর তারীখুল ইসলাম লিয়-যাহাবী (২৮১/২৩, ত: তাদমারী)

[৪] আল-কাযী, আল-আল্লামা, আল-হাফিয... তলা উমরুহ ওয়া আলা ইসনাদুহ, কানা সিকাহ, হাফিযান, আরিফান বির-রিজালি ওয়াল ইলাল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৬৬৬/১৭, ত: আর-রিসালাহ)

[৫] “আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিতাবারিস্তান।” (আল-ইরশাদ ফী মা’রিফতি উলামাইল হাদীস: ১/৪৩০, ত: আর-রশিদ)

[৬] “আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী, আশহারু মিন আন ইউযকারা, জামিউন ফিল উলুম, ইমাম।” (আল-ইরশাদ ফী মা’রিফতি উলামাইল হাদীস: ২/৮০০)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

তাফসীর শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন, আহকামের ফকীহ, সুন্নাহর আলেম, সহীহ ও যয়ীফ এবং নাসিখ ও মানসুখ বর্ণনা সম্পর্কে অবগত এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। [১]

ইমাম আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী আবু মনসুর আল-ইসফারাইনী (মৃত্যু ৪২৯ হি.)-এর অভিমত:

তিনি বাগদাদের একজন প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম (ধর্মতত্ত্ববিদ) ছিলেন। তাঁর বক্তব্য হলো: “একইভাবে কিরাত ও তাফসীর বির-রিওয়ায়াহর ইমামগণ, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারীর যুগ পর্যন্ত, সকলেই আহলে সুন্নাত ছিলেন।” [২]

ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী (মৃত্যু ৪৭৬ হি.)-এর অভিমত:

ইমাম শিরাজী একজন প্রখ্যাত মুহাদিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি সারা জীবন সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে এবং বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে ঢাল ও তলোয়ার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। [৩]

তিনি ইমাম তাবারীকে ইসলামের ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন। [৪]

আল্লামা ইবনে সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হি.)-এর অভিমত:

শাফেয়ী আলেমদের মধ্যে আল্লামা ইবনে সালাহ এমন এক নাম যার কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। উসূলে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর কাজ থেকে দ্বীনের আলেমগণ আজও উপকৃত হচ্ছেন। [৫] তিনি ইবনে জারীর তাবারীকে শাফেয়ী ফকীহদের কাতারে গণ্য করেছেন।

ইমাম শরফুদ্দিন নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.)-এর অভিমত:

তাবারী সম্পর্কে তিনি বলেন: “তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈর স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” [৬]

আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী (মৃত্যু ৭৭১ হি.)-এর অভিমত:

তিনি বলেন: “ইবনে জারীর আমাদের বিশিষ্ট সাথীদের একজন ছিলেন, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই।” [৭] [৮]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি.)-এর অভিমত:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন তাফসীর কুরআন ও সুন্নাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী? তিনি উত্তর দিলেন: “বিদ্যমান তাফসীরগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারীর তাফসীর সবচেয়ে সহীহ। কারণ তিনি পূর্বসূরিদের (আসলাফ) উক্তিগুলো প্রমাণিত সনদের সাথে বর্ণনা করেন, এতে কোনো বিদআত নেই এবং তিনি মুকাতিল বিন সুলাইমান ও কালবীর মতো লোকদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন না।” [৯]

[১] তারিখ বাগদাদ: ১৬১/২, তাবা ইলমিয়াহ।

[২] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, আল-ফাসলুস সাদিস।

[৩] ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী বলেন: আশ-শাইখ, আল-ইমাম, আল-কুদওয়াহ, আল-মুজতাহিদ, শাইখুল ইসলাম। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪৫২/১৮)

[৪] ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী এখানে সেই মুহাদিসদের উল্লেখ করেছেন যাদেরকে শুধুমাত্র ফকীহ হিসেবেও গণ্য করা হয়। তাদের মধ্যে ইমাম তাবারীর কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন: “আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী: বাগদাদে বসবাস করতেন, ৩১০ হিজরীতে ইস্তিকাল করেন, তিনি বহু গ্রন্থ, ইতিহাস ও বৃহৎ সংকলনের রচয়িতা।” (তাবাকাতুল ফুকাহা: ৯৩/১, দারুল রাযিদ আল-আরাবী, বৈরুত)

[৫] আল-ফকীহ আশ-শাফেয়ী, তিনি তাঁর যুগের তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আসমাউর রিজাল এবং হাদীস শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে শ্রেষ্ঠদের একজন ছিলেন। (ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ২৪৩/৩)

[৬] মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন কাসীর বিন গালিব, আবু জাফর আত-তাবারী, তিনি উলামায়ে কেরামের অন্যতম ইমাম ছিলেন, যাঁর কথা অনুযায়ী ফয়সালা করা হতো এবং যাঁর মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হতো, তাঁর জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। তিনি এমন অনেক শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যাতে তাঁর সমসাময়িক কেউ তাঁর অংশীদার ছিল না। (তাবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফেয়িয়াহ: ১০৬/১, ১০৭, দারুল বাশাইর বৈরুত)

শাফেয়ী ফকীহদের স্তরেও ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারীর উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি কেবল মুহাদিসই ছিলেন না বরং উচ্চপর্যায়ের ফকীহও ছিলেন।

[৭] তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত: ৭৮/১, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[৮] তাবাকাতুশ শাফেয়িয়াহ আল-কুবরা: ১২৭/৩।

[৯] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ইবনে তাইমিয়া: ৮৪/৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়া স্বয়ং ‘দাকায়িকূত তাফসীর’-এ ইমাম তাবারীর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। (১৫৯, ২৯/৩)

হাফিজ যাহাবী (রহ.) (৭৪৮ হি.)-এর অভিমত:

হাফিজ যাহাবী (রহ.) বিভিন্ন স্থানে ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর কয়েকটি বক্তব্য নিচে দেওয়া হলো:

- “মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন কাসীর, ইমাম, মুজতাহিদ, আপন যুগের আল্লামা ছিলেন।” [১]
- “জ্ঞান, মেধা এবং অধিক রচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সময়ের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চোখ তাঁর মতো খুব কমই দেখেছে।” [২]
- “আমি বলছি, তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, তাফসীরের হাফিজ, ফিকহ এবং ইজমা ও ইখতিলাফী মাসআলার ইমাম, ইতিহাস ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অনেক বড় আলেম, কিরাত ও ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।” [৩]
- হাফিজ যাহাবী (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর নাম ইমাম নাসাঈ, আবু ইয়াল্লা মুসিলী এবং ইমাম ইবনে খুযাইমা নিশাপুরী (রহ.)-এর মতো উচ্চপদস্থ মুহাদিসগণের সাথে ১১তম স্তরের (তাবাকা) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। [৪]

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) (৭৭৪ হি.)-এর অভিমত:

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁকে শাফেয়ী ফকীহ ও মুহাদিসগণের মধ্যে গণ্য করে বলেছেন: “ইমাম, আলেম, মহান গ্রন্থসমূহের রচয়িতা।” [৫]

‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ গ্রন্থে তাঁর কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন: “তিনি আলেমদের ইমাম ছিলেন। তাঁর কথার ওপর ফয়সালা হতো। তাঁর জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁর মতামতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হতো।” [৬]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) (৮৫২ হি.)-এর অভিমত:

হাফিজ ইবনে হাজার ইমাম তাবারীকে “আল-ইমামুল জলীল, আল-মুফাসসির, সাহেবুত তাসানীফ আল-বাহিরা” (মহান ইমাম, মুফাসসির, চমৎকার গ্রন্থসমূহের রচয়িতা) বলে পরিচয় করিয়েছেন। [৭]

আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রহ.)-এর অভিমত:

আল্লামা আলুসী (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে বলেন: “তিনি আহলে সুন্নাতের মহান আলেমদের একজন।” [৮]

বর্তমান যুগের ইলমী উৎস থেকে সমর্থনমূলক কিছু উদাহরণ:

- শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল-মাগরাবী (রহ.), যিনি দশ খণ্ডে ‘মাওসুআতু মাওয়াফিফিস সালাফ ফিল আকীদা ওয়াল মানহাজ’ গ্রন্থে ইসলামী আকীদা সংরক্ষণের জন্য কাজ করেছেন, তিনি ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে লিখেন:

“তিনি ঐসব ইমামদের অন্তর্ভুক্ত যাদের জীবনে আল্লাহ বরকত দান করেছেন। তাঁরা এত বেশি লিখেছেন যে, একজন পরিশ্রমী পাঠকও তা পড়তে অক্ষম হয়ে পড়বে, আর তাঁর মতো লেখা তো দূরের কথা। এই ইমাম এমন এক উত্তরাধিকার রেখে গেছেন যার জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।” [৯]

[১] আল-ইমাম, আল-আলম, আল-মুজতাহিদ, আলমুল আসর। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৭, আর-রিসালাহ)

[২] তিনি জ্ঞান, মেধা এবং অধিক রচনার ক্ষেত্রে যুগের অনন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, চোখ তাঁর মতো খুব কমই দেখেছে... (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৭)

[৩] আমি বলছি: তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, হাফিজ, তাফসীরের প্রধান ব্যক্তিত্ব, ফিকহ, ইজমা ও ইখতিলাফের ইমাম, ইতিহাস ও মানবজাতির দিনকাল সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেম এবং কিরাত ও ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭০)

[৪] আল-মুঈন ফী তাবাকাতিল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১০৮

[৫] “ইমাম, আলেম, মহান গ্রন্থসমূহের রচয়িতা।” (তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ: ১/২২১)

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১৪/৮৪৬

[৭] লিসানুল মীযান: ৫/১০০

[৮] তাফসীরে রুহুল মাআনী, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬

[৯] মাওসুআতু মাওয়াফিফিস সালাফ ফিল আকীদা ওয়াল মানহাজ: ১/৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

‘আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলমিয়্যাহ’-তে ইমাম তাবারী রহ.-এর পরিচিতি এভাবে দেওয়া হয়েছে:

“তিনি আহলে সুন্নাতের বড় ইমামদের একজন ছিলেন, তাঁর মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর ইলমের বিশালতা ও সঠিক পদ্ধতির কারণে তাঁর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তিনি অনেকগুলো উপকারী কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে তাঁর ‘তাফসীর জামিউল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন’ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, যা তাফসীরে তাবারী নামে পরিচিত। এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাঁর পরবর্তী সকলেই এই তাফসীর থেকে উপকৃত হয়েছেন; এজন্যই উলামায়ে কেরাম তাবারীকে ‘আবুত তাফসীর’ (তাফসীরের জনক) হিসেবে গণ্য করেন যেমনটি তাঁকে ‘আবুত তারিখ’ (ইতিহাসের জনক) বলা হয়; কারণ তিনি ইতিহাসে এমন এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন যা অতুলনীয়। তবে তিনি এতে কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোই জমা করার প্রতিশ্রুতি দেননি।”

(২) হাদীসের শিক্ষকগণ

ইমাম তাবারী রহ. হাদীসের যেসব প্রখ্যাত শায়খদের থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তিত্বের নাম নিম্নরূপ:

- ১. আবু যুরআহ আর-রাযী রহ. (মৃত্যু ২৬৪ হি.) রায়... মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ। [১]
- ২. ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী রহ. (মৃত্যু ২৫০ হি.) আইন যারবাহ, উত্তর সিরিয়া... মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৩. আবু কুরাইব মুহাম্মদ বিন আল-আলা রহ. (মৃত্যু ২৪৭ হি.) কুফা... বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৪. আহমদ বিন মিকদাম রহ. (মৃত্যু ২৫৩ হি.) বসরা... বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৫. আহমদ বিন মানী আল-বাগতী রহ. (মৃত্যু ২৪৪ হি.) বাগদাদ... বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৬. ইসহাক বিন আবু ইসরাঈল রহ. (মৃত্যু ২৪৫ হি.) বাগদাদ... বুখারী, নাসাঈ ও আবু দাউদ রহ.-এর শায়খ।
- ৭. ইসমাইল বিন মুসা আস-সুদী রহ. (মৃত্যু ২৪৫ হি.) কুফা... আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৮. বুনদার মুহাম্মদ বিন বাশার রহ. (মৃত্যু ২৫২ হি.) বসরা... বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ৯. হাসান বিন সাব্বাহ আল-বাযযার রহ. (মৃত্যু ২৪৯ হি.) বাগদাদ... বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ রহ.-এর শায়খ।
- ১০. সালিহ বিন মিসমার রহ. (মৃত্যু ২৪৫ হি.) মার্ব... মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ রহ.-এর শায়খ।
- ১১. আব্দুল হামীদ বিন বায়ান রহ. (মৃত্যু ২৪৪ হি.) ওয়াসিত... মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ১২. মুজাহিদ বিন মুসা রহ. (মৃত্যু ২৪৪ হি.) বাগদাদ... মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ।
- ১৩. মুহাম্মদ বিন আব্দুল আ’লা রহ. (মৃত্যু ২৪৫ হি.) বসরা... মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ রহ.-এর শায়খ।
- ১৪. মুহাম্মদ বিন আল-মুসান্না আবু মুসা রহ. (মৃত্যু ২৫২ হি.) বসরা... বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ রহ.-এর শায়খ। [২]

[১] তবাকাতুল হানাবিলাহ লি-ইবনে আবি ইয়াল। ১:৫২৬, ২০০১, দারুল মারিফাহ বৈরুত।

[২] বসরার মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুসান্না আল-আনসারী তাঁরই সমনাম ও সমস্থানের অধিবাসী, যাঁকে সংক্ষেপে মুহাম্মদ বিন আল-মুসান্না বলা হয়। সিহাহ সিভায় তাঁর বর্ণনাও রয়েছে তবে একটি মধ্যস্থতার মাধ্যমে। তিনি ১৫০ হিজরীতে অর্থাৎ ইমাম তাবারীর জন্মের দশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন। কিছু লোক আপত্তি করেন যে, ইমাম তাবারী তাঁর জন্মের দশ বছর আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির থেকে কীভাবে বর্ণনা করার দাবি করেছেন? কারণ ইমাম তাবারী এবং সিহাহ সিভার সংকলকগণ যে মুহাম্মদ বিন আল-মুসান্না থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন, তিনি ২৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

(১৫) মুহাম্মদ বিন আব্দুল হামিদ আল-রাজি (মৃ. ২৪৮ হি.) ... শায়খ আবু দাউদ সিজিস্তানি, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।

(১৬) মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালিক বিন আবি আশ-শাওয়ারিব (মৃ. ২৪৪ হি.) বসরা ... শায়খ মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।

(১৭) মুহাম্মদ বিন মুয়ান্মার কায়সি (মৃ. ২৫০ হি. এর পর) ... শায়খ বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

(১৮) নাসর বিন আলী জাহজামি (মৃ. ২৫০ হি.) ... শায়খ বুখারি, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। [১]

(১৯) হান্নাদ বিন আস-সাররি (মৃ. ২৪৩ হি.) ... শায়খ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

(২০) ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম আদ-দাওরাকি (মৃ. ২৫২ হি.) বাগদাদ ... শায়খ বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

(২১) ইউনুস বিন আব্দুল আলা (মৃ. ২৬৪ হি.) মিসর ... শায়খ মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। [২]

এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম তাবারির উস্তাদ ও মাশায়েখদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমন বয়োজ্যেষ্ঠ ও উচ্চ সনদধারী মুহাদিস ছিলেন, যাদের থেকে সিহাহ সিত্তার সংকলকগণও হাদিস শ্রবণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি আরও শত শত আলেম ও মুহাদিস থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

স্মর্তব্য যে, ইমাম তাবারি যখন হাদিসের জ্ঞান অর্জন শুরু করেন, ততদিনে সিহাহ সিত্তার সংকলকদের শিক্ষা গ্রহণের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা হাদিস পাঠদান ও সংকলনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইমাম তাবারি তাদের থেকে সামান্য পরবর্তী প্রজন্মের ছিলেন; তাই এই ব্যক্তিদের থেকে ইমাম তাবারির হাদিস শ্রবণের প্রয়োজন ছিল না। [৩] রইল এই কথা যে, ইমাম তাবারি কেন সিহাহ সিত্তার সংকলকদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেননি, তবে ইমাম তাবারির শায়খদের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও উচ্চ সনদধারী মুহাদিসদের থেকে হাদিস শ্রবণ করাকে প্রাধান্য দিতেন। যেহেতু সেই সময় সিহাহ সিত্তার সংকলকদের অনেক দীর্ঘজীবী শায়খ জীবিত ছিলেন, তাই ইমাম তাবারি সরাসরি তাদের থেকেই হাদিস শ্রবণ করেছেন। ফলে অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ সনদের কারণে ইমাম তাবারিকেও ইমাম নাসাঈর স্তরে গণ্য করা হয়েছে এবং পরবর্তী বড় বড় মুহাদিস ও গবেষকগণ তার বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছেন।

[১] নাসর বিন আলী জাহজামি দুইজন: এক. আল-কাবির (মৃ. ১৫৮ হি.) আল-আজদি আল-বসরি... দ্বিতীয়. আস-সগির (মৃ. ২৫০ হি.) যিনি আল-কাবিরের নাতি। ইমাম বুখারি, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইমাম তাবারি এই দ্বিতীয়জন (আস-সগির) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[২] শায়খদের নামের বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১৪/২৬৯; তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, পৃ. ২২৩; তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত লিন-নববী: ১/৭৮। ইমাম তাবারির আরও অনেক শায়খ ও ছাত্রের নাম সংশ্লিষ্ট কিতাবগুলোতে দেখা যেতে পারে। শায়খদের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করার জন্য এখানে মাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃক্ষ দেখে যেমন ফলের আন্দাজ করা যায়, তেমনি উস্তাদ ও মাশায়েখদের মর্যাদা দেখে কোনো আলেমের মাকাম বা অবস্থান বোঝা যায়।

[৩] জন্ম ও মৃত্যুর তারিখের নিচের তালিকা থেকে এই ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণের সময় এবং পাঠদান ও পাঠগ্রহণের মধ্যকার পার্থক্য অনুমান করা যেতে পারে: ইমাম বুখারি: ১৯৪ হি. থেকে ২৫৬ হি.

ইমাম আবু দাউদ: ২০২ হি. থেকে ২৭৫ হি.

ইমাম মুসলিম: ২০৪ হি. থেকে ২৬১ হি.

ইমাম ইবনে মাজাহ: ২০৯ হি. থেকে ২৭৩ হি.

ইমাম তিরমিজি: ২০৯ হি. থেকে ২৭৯ হি.

ইমাম নাসাঈ: ২১৫ হি. থেকে ৩০৩ হি.

ইমাম তাবারি: ২২৪ হি. থেকে ৩১০ হি.

(৩) ইমাম তাবারী রহ.-এর কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র

- ১. ইমাম আবুল কাসেম তাবারানী রহ. (মৃ. ৩৬০ হি.): তিনি বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস। আল-ইমাম, আল-হাফিজ, আল-ফকিহ, মুহাদ্দিসুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত। তাঁর সংকলিত মু'জাম কাবীর, মু'জাম আওসাত এবং মু'জাম সাগীর তাঁর পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। [১]
- ২. আবু আহমদ ইবনে আদি রহ. (মৃ. ৩৬৫ হি.): জারাহ ও তাদীল শাস্ত্রের ইমাম। 'আল-কামিল ফি মা'রিফাতিদ দুয়াফা' গ্রন্থ থেকে তাঁর মাকাম বা মর্যাদা আন্দাজ করা যায়। হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন: "তিনি মহান ইমামদের একজন, যিনি মানুষের দোষ-গুণ যাচাই করতেন, ইসলামের স্তম্ভ।" [২] তাঁর সমসাময়িক ইমাম দারাকুতনী রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কি দুর্বল রাবীদের ওপর একটি কিতাব লিখবেন? তিনি বললেন: "তোমাদের কাছে কি ইবনে আদির কিতাব নেই? তা-ই যথেষ্ট, এতে আর কোনো সংযোজনের প্রয়োজন নেই।" [৩] হাফিজ যাহাবী রহ. বলেন: "ইবনে আদি ইলাল এবং রিজাল শাস্ত্রের এমন হাফিজ ছিলেন যার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।" [৪]
- ৩. আবু বকর কাফফাল শাশী শাফেয়ী রহ. (মৃ. ৩৬৫ হি.): আল-কাফফাল আল-কাবীর উপাধিতে পরিচিত। মধ্য এশিয়ায় তিনি শাফেয়ীদের ইমাম ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'শরহুর রিসালাহ', 'দালাইলুন নুবুওয়াহ' এবং 'মাহাসিনুশ শরীয়াহ' বিখ্যাত। উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাফসীর, হাদীস, ইলমে উসুল এবং ইলমে কালামের কিতাবসমূহে তাঁর বক্তব্য প্রচুর উদ্ধৃত করা হয়। [৫]
- ৪. আহমদ বিন কামিল রহ. (মৃ. ৩৫০ হি.): ফিকহ, তাফসীর এবং ইতিহাসের অনেক বড় আলেম ছিলেন। কুফার কাজী ছিলেন। অনেক কিতাব লিখেছেন। ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। কোনো কোনো আলিম তাঁকে হানাফী ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে সঠিক কথা হলো তিনি মাযহাবগতভাবে শাফেয়ী ছিলেন এবং ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। [৬]
- ৫. আহমদ বিন কাসেম খাশশাব রহ. (মৃ. ৩৬২ হি.): হাফিজে হাদীসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাফিজ যাহাবী রহ. তাঁকে 'আল-হাফিজুল আওহাদ' বলেছেন। ইমাম তাবারী রহ. ছাড়াও তিনি ইমাম আবুল কাসেম বগভী রহ. এবং ইমাম তহাবী রহ.-এর ছাত্র ছিলেন। [৭]
- ৬. আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন হামদান রহ. (মৃ. ৩৭৩ হি.): ইমাম সুবকী রহ. তাঁকে 'আয-যাহিদ, আল-মুকারি, আল-ফকিহ, আল-মুহাদ্দিস, আন-নাহবী' শব্দে পরিচয় করিয়েছেন। [৮] হাফিজ যাহাবী রহ. তাঁকে 'মুহাদ্দিসে নিশাপুর' বলে স্মরণ করেছেন। [৯]
- ৭. আব্দুল গাফফার বিন উবাইদুল্লাহ হুসাইনী রহ. (মৃ. ৩৬৬ হি.): নিজ যুগের কিরাত ইমাম এবং এই শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। [১০]
- ৮. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আবু বকর শায়বানী রহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.): ইমাম সুবকী রহ. বলেন: "আবু বকর ইলম ও দ্বীনের দিক থেকে মুসলিমদের ইমামদের একজন ছিলেন। নিশাপুরের মুহাদ্দিস ছিলেন। 'আল-মুসনাদ আস-সহীহ আলা কিতাবিল মুসলিম' এবং 'কিতাবুল মুত্তাফাক' তাঁর রচনা। তিনি বলতেন: ইলমে হাদীসের জন্য আমি এক লক্ষ দিরহাম খরচ করেছি এবং তা থেকে একটি দিরহামও উপার্জন করিনি।" [১১]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১১৯

[২] তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ: ২৪৩

[৩] তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৪৩

[৪] তারিখুল ইসলাম: ২৪০/৮

[৫] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২৬/৩৪৫, ৩৪৭; ততদমরী: ৮/২৪৫, ত বাশার... যখন আল-কাফফাল আল-কাবীর উল্লেখ করা হয় তখন তিনিই উদ্দেশ্য হন, তবে একজন কাফফাল আল-মারওয়াযীও বিখ্যাত যিনি পঞ্চম হিজরী শতকের এবং তাঁর আলোচনা ফিকহী বিতর্কে আসে।

[৬] আল-জাওয়াহিরুল মুদয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়াহ: ১/৯০ ত মীর মুহাম্মদ; আত-তাবাকাতুস সানিয়াহ ফি তারাজুমিল হানাফিয়াহ, পৃষ্ঠা ১২৫

[৭] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৬/১৫১

[৮] তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ: ৩/৯৯

[৯] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৪৫৭

[১০] তারিখুল ইসলাম: ২৬/৩৭৩, ৩৭৪ ততদমরী: ৮/২৬৮ ত বাশার

[১১] তাবাকাতুশ শাফেয়ীয়াহ: ৩/১৮৪, ১৮৫

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

(৯) আবু শুয়াইব আবদুল্লাহ বিন হাসান আল-হাররানি আল-উমাবী রহ. (মৃত্যু ২৯৫ হি.): বয়সে বড় এবং উচ্চ পর্যায়ের সনদ থাকা সত্ত্বেও তিনি ইমাম তাবারী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। [১]

(১০) ইবনে সুন্নী রহ. (মৃত্যু ৩৬৪ হি.): ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’-এর মতো উপকারী কিতাবের লেখক এবং ইমাম তাবারী রহ.-এর ছাত্র। [২]

হাদীস, তাফসীর ও আকিদাহর কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ও বাণীর প্রমাণসমূহ ইমাম তাবারী রহ. এত বড় আলেম ছিলেন যে, পরবর্তীকালের মহান ইমামগণ ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর এবং ইলমে আকিদাহ সংক্রান্ত নিজ নিজ রচনায় তাঁর বর্ণনাগুলোকে পূর্ণ আস্থার সাথে পেশ করেছেন। এর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

হাদীসের কিতাবসমূহে ইমাম তাবারী রহ.-এর বর্ণনা:

- মুজামুস সাগীর: ইমাম তাবারানী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)-এর সংকলন, যাতে ইমাম তাবারী রহ. থেকেও হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। [৩]
- মুজামুল কাবীর: ইমাম তাবারানী রহ.-এর এই মহান হাদীস ভাণ্ডারেও ইমাম তাবারী রহ.-এর হাদীসসমূহ রয়েছে। [৪]
- আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: এটি ইবনে সুন্নী আদ-দিনাওয়ারী রহ. (মৃত্যু ৩৬৪ হি.)-এর বিশ্ববিখ্যাত ও অত্যন্ত উপকারী সংকলন, এতেও ইমাম তাবারী রহ.-এর মাধ্যমে বর্ণিত মারফু হাদীসসমূহ বিদ্যমান। [৫]
- মুস্তাদরাক হাকেম: ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ. (মৃত্যু ৪০৫ হি.)-এর মুস্তাদরাক-এ ইমাম তাবারী রহ. থেকে প্রচুর হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে কিছু হাদীসকে হাফেজ যাহাবী রহ. সহীহইন বা উভয়ের কোনো একটির মানদণ্ড অনুযায়ী সহীহ বলে গণ্য করেছেন। [৬]
- সুনানে সাগীর বায়হাকী: ইমাম বায়হাকী রহ. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)-এর এই সংকলনে ইমাম তাবারী রহ. থেকে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। [৭]

[১] তারিখুল ইসলাম: ২৩/১১৭৭/২২; তাদমিরাহ: ৬/১৯৬৩/৭; ১৬০/৭; নুবাত বাশার।

[২] দেখুন: আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৯৯।

[৩] তাবারানী: আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ফকিহ মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন আল-মুতাওয়াঙ্কিল আল-হিমসি... আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম... (আল-মুজামুস সাগীর, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০০৩)।

[৪] আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ফকিহ মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন ইব্রাহিম... এখন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিষাপ ইত্যাদি। (আল-মুজামুল কাবীর, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৯৪৬৯)।

[৫] আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু কুরাইব... তারিক বিন শিহাব থেকে, তিনি আবদুল্লাহ রাযি. থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: যে কোনো মুসলিম যখন সালাতের আযান শোনে তখন সে বলে... (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৯৯); আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-ফজল বিন সাহল আল-আরাজ... হুমরান বিন হুসাইন রাযি. থেকে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩২৭); আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী ও সাল্লাম বিন মুয়াজ, তারা বলেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম বিন আহমদ বিন আমরুন নাসিহ... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন... (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, রেওয়ায়েত নম্বর: ৫৯৩)।

[৬] আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আলী আল-হুসাইন বিন আলী আল-হাফেজ, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন উসমান বিন ইয়াহইয়া আল-কুরাশি... আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিতেন ইত্যাদি (আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৯৭৮, যাহাবী বলেছেন এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ); আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... তিনি বললেন: “আমি কিবলা পাঁচবার পেয়েছি...” ইত্যাদি (খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০৮৭, যাহাবী বলেছেন এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ) আরও দেখুন: রেওয়ায়েত নম্বর: ১৭৫৯, ৪২৭৬, ৪৫১৮, ৪৮৬৪, ৫৫৪৮, ৫৫৫৫, ৫৬২৫, ৬২২৬, ৬৪২৩, ৬৭৭১, ৬৮১৭, ৬৮৬১, ৬৯৪৩, ৬৯৯৫, ৭৫৯৩।

[৭] আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবু আবদুল্লাহ আল-হাফেজ, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবু আবদুল্লাহ আল-ফকিহ, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী... উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা রাযি. থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: যে কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করবে এবং ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকবে না, তবে তার বিবাহ বাতিল। (আস-সুনান আস-সাগীর লিল বায়হাকী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩৮২)।

- আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: এটি ইমাম বায়হাকী রহ.-এর একটি বিশাল হাদীস ভাণ্ডার যা থেকে প্রতিটি যুগে উলামায়ে কেরাম উপকৃত হয়ে আসছেন। এর অসংখ্য হাদীসের সনদে ইমাম তাবারী রহ. বিদ্যমান রয়েছেন। [১]
- শুআবুল ঈমান: ইমাম বায়হাকী রহ.-এর এই কালজয়ী রচনাতেও ইমাম তাবারী রহ.-এর হাদীসসমূহ রয়েছে। [২]
- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: হাফেজ আব্দুল আজীম আল-মুনজিরী রহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.)-এর এই জনপ্রিয় হাদীস ভাণ্ডারেও ইমাম তাবারী রহ.-এর বর্ণনা থেকে উপকৃত হওয়া হয়েছে। [৩]
- মুসনাদুল ফারুক: হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) মুসনাদুল ফারুকে ইমাম তাবারী রহ. থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। [৪]
- ইতহাফুল মাহারা: এটি হাদীস শাস্ত্রে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.)-এর একটি অনন্য রচনা, যাতে পঁচিশ হাজারের বেশি হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সমালোচনা ও পর্যালোচনায় (নকদ ও জরাহ) উচ্চ মানসম্পন্ন ইবনে হাজার রহ. এই রচনায় ইমাম তাবারী রহ.-এর সনদে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। [৫]

তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইমাম তাবারী রহ.-এর বর্ণনা:

ইমাম তাবারী রহ.-কে মুফাসসিরদের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়, তাঁর পরে আসা সম্ভবত এমন কোনো মুফাসসির নেই যিনি তাঁর বর্ণনা বা তাঁর তাফসীরী বক্তব্য থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। সতর্ক উলামায়ে কেরামও এ বিষয়ে ইমাম তাবারী রহ.-এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। ইমাম আবুল হাসান আল-ওয়াহিদী রহ. (মৃ. ৪৬৮ হি.)-এর ‘আত-তাফসীরুল ওয়াসীত’, ইমাম বাগভী রহ. (মৃ. ৫১০ হি.)-এর ‘তাফসীরু মাআলিমুত তানজীল’, ইমাম রাযী রহ. (মৃ. ৬০৬ হি.)-এর ‘তাফসীরু মাফাতিহুল গায়েব’, ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃ. ৬৭১ হি.)-এর ‘আল-জামি লি আহকামিল কুরআন’, ইমাম খাযেন রহ. (মৃ. ৭৪১ হি.)-এর ‘লুবাবুত তাবীল’, হাফেজ ইবনে কাসীর রহ.-এর ‘তাফসীরুল কুরআনিল আজীম’, ইমাম সালাবী রহ. (মৃ. ৮৭৫ হি.)-এর ‘আল-জাওয়াহিরুল হিসান’, ইমাম সুয়ুতী রহ. (মৃ. ৯১১ হি.)-এর ‘আদ-দুররুল মানসুর’ এবং আল্লামা মাহমুদ আলুসী রহ. (মৃ. ১২৭১ হি.)-এর ‘তাফসীরু রুহুল মাআনী’ সহ ডজন ডজন তাফসীর গ্রন্থে ইমাম তাবারী রহ.-এর বক্তব্য ও বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। [৬]

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, বর্ণনা নম্বর: ৫৭৬... ১০১১৬... ১২৫৫৫... ১৫৫৫৫... ১৮১০৯।

[২] শুআবুল ঈমান, বর্ণনা নম্বর: ১২১৯... ২৬৬৫... ৬৬১২... ১০৩৮৪।

[৩] আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, বর্ণনা নম্বর: ১০৭০... ৬৮১০।

[৪] মুসনাদুল ফারুক: ৬৯৯/২, তাবা দারুল ওয়াফা আল-মানসুরা।

[৫] ইতহাফুল মাহারা: ৪৫০/৩... ৩৯৮/৪... ৫৩৮/৪... ২১০/৫... ১৩২/৫... ১৩৫/৫... ৩৬৭/৬... ৫০২/৬... ৫৩৯/৭... ২১৬/১০... ১৮৩/১০... ২২৯/১০... ৩৫৪/১১... ৩৭৬/১১... ৫১৫/১১... ৫৯৬/১১... ৬১৪/১১... ৬৫৫/১১... ৬৫৬/১১... ৪৯/১৩... ৬২৪/১৩... ১৬৯/১৪... ৬৮৫/১৪, তাবা মাজমাউল মালিক ফাহাদ।

[৬] শুধুমাত্র তাফসীরে ইবনে কাসীরের সূরা আল-বাকারাহ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত সতর্ক ও গবেষণামূলক তাফসীর:

সূরা আল-ফাতিহা, হাদীস: হিয়া উম্মুল কুরআন ওয়া হিয়া ফাতিহাতুল কিতাব ওয়া হিয়াস সাবউল মাসানী: ১৯/১।

সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৫, ৪৬: ১৫৪/১... আল-বাকারাহ, আয়াত: ৬৭: ১৯১/১... আল-বাকারাহ, আয়াত: ৯৪ থেকে ৯৬: ২২১/১... আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬: ৩৭৪/১... আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫০ থেকে ২৫২: ৫১০/১।

যদি তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইমাম তাবারী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত বক্তব্য ও বর্ণনাগুলো একত্রিত করা হয়, তবে একটি পৃথক বিশাল গ্রন্থ তৈরি হবে।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

আকিদা ও আহকামের কিতাবসমূহে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর বর্ণনা থেকে দলিল গ্রহণ:

ইমাম তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর ও অন্যান্য কিতাবে সহীহ আকিদা ও ফিকহি আহকাম প্রমাণে এবং বাতিল মতবাদ ও বিদআত খণ্ডনে যেসব হাদিস ও উক্তি পেশ করেছেন, উলামায়ে কেরাম আকিদা ও আহকামের কিতাবসমূহে সেগুলো স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। এই আলেমদের মধ্যে হাফেজ যাহাবী, ইমাম সুয়ুতী, আল্লামা শাওকানী, ইবনে হাজার হাইতামী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতো উচ্চমর্যাদার ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [১]

(৫) রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা নির্ধারণে ইমাম তাবারীর মতামতের ওপর আস্তা

ইমাম তাবারী (রহ.) জারহ ও তাদীল (বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও প্রশংসা) এবং ‘ইলাল’ (সূক্ষ্ম ত্রুটি) শাস্ত্রে ঈর্ষণীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। “ইখতিলাফুল ফুকাহা” এবং “তাহযীবুল আসার” গ্রন্থে তাঁর গবেষণাসমূহ এর সাক্ষী। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ তাঁদের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বকোষগুলোতে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর উক্তিগুলো উদ্ধৃত করেছেন। যা থেকে অনুমান করা যায় যে, জারহ ও তাদীল শাস্ত্রের ইমামগণ রাবীদের ব্যাপারে তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। [২]

[১] এই সিলসিলায় আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করছি:

- আল-আরশ: লিল হাফেজ আয-যাহাবী: ১৭/২... পৃ. ১৮২... পৃ. ২৮৫... পৃ. ৩৫৭... পৃ. ৩৫৮... মাকতাবা আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ।
- আল-উলুউ লিল আলীয়্যিল গাফফার লিয়-যাহাবী... পৃ. ৮৩... পৃ. ১২৯... পৃ. ২০৫।
- আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল লিয়-যাহাবী, পৃ. ৩১... পৃ. ১৭২ ও ১৭৩... পৃ. ৪৪৯...।
- বাযলুল হাক্ক আলাল খালক, লিইযযুদ্দীন আল-ইয়ামানী... পৃ. ১৮৯... পৃ. ৪১৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।
- হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ লিস-সুয়ুতী... পৃ. ১১৭, তবা’ মাতাবিউর রশীদ।
- আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা আলা আহলিল রাফযি ওয়াদ দলালাতি ওয়ায যান্দাকা লিইবনে হাজার আল-হাইতামী... ২৯০/১... ৪২২/২... ৫৩০।
- আত-তাওয়ীলুশ শাফাত ফী তাওয়ীলিল আসমাযি ওয়াস সিফাত, লিল মাকদিসী আল-হাম্বলী... পৃ. ৫৭।
- তাতহীরুল ইতিকাদ লি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমীর ইয়ামানী ওয়া মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী, পৃ. ১০৮, তবা’ সাফীরুর রিয়াদ।
- রাফউল আস্তার লি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমীর ইয়ামানী, পৃ. ৯৩, ১১০, তবা’ আল-মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত।
- লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়াহ... লিস-সাফারীনী আল-হাম্বলী: ৩৭৬/১... পৃ. ৪৪৯... ১৫৮/২... ১৬১... ১৬৩... ১৯৯, তবা’ মুয়াসসাসাতুল খাফেকাইন।
- ইতিকাদ আহলিস সুন্নাহ লি আবিল কাসিম আল-লালকাঈ: ১৮৩/১... ১৮৪... ২৩৪/২... ২৯... ৩৫৩... ৩৫৫... ৩৫৯, তবা’ দারুল তীবাহ রিয়াদ।
- ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম লিইবনে তাইমিয়া: ১৯২/২, তবা’ দারুল আলমিল কুতুব বৈরুত।
- আল-ইখনাঈয়াহ লিইবনে তাইমিয়া, পৃ. ২১৬... পৃ. ২১৭, তবা’ দারুল খুরাজ জেদ্দা।
- আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা ধীনাল মাসীহ লিইবনে তাইমিয়া: ১৯৫/১... ১৯০/২, তবা’ দারুল আসিমাহ।
- আল-হাসানাহ ওয়াস সাইয়্যিআহ লিইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১৫৭, তবা’ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।
- আর-রাদ্দু আলা মান কালা বিফনাউল জাম্মাতি ওয়ান নার লিইবনে তাইমিয়া, পৃ. ৬৮, তবা’ দারুল বালানসিয়া।
- মিনহাজুস সুন্নাহ লিইবনে তাইমিয়া: ৫১৮/৫... পৃ. ৭ ও ১৩... ১৪১/৭... ২৪৯/৭... ৩০০/৭... ৪৯৫/৮... পৃ. ৫৫৫।

[২] মনে রাখা দরকার যে, ইমাম তাবারীর এই উক্তিগুলো কেবল রাবীদের জন্ম-মৃত্যু সাল বা বংশ পরিচয় সংক্রান্ত নয়, বরং তাদের বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, দুর্বলতা এবং দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারেও। জারহ ও তাদীল শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ “তাহযীবুত তাহযীব” (ইবনে হাজার)-এ এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো:

- কাল আবু জাফর আত-তাবারী: লাইসা বিযা যাকা। (তাহযীবুত তাহযীব, ১৬৯/২, তরজমা: আল-হারিস বিন ওয়াজহ, মাতবুআহ নিয়ামিয়া দাক্ষিণাত্য)
- ফাযাকারা আবু জাফর আত-তাবারী ফী সিফাতিল ফুকাহা। (১৭৯/২, তরজমা: হাবীব বিন আবি সাবিত)
- কাল আবু জাফর আত-তাবারী ফীত তাহযীব: লাইসা বিমা’রুফ ফী আহলিত তিকা ইনদাহুম। (৩৯৬/৪, তরজমা: সালিহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি ফারওয়াহ)
- কাল আবু জাফর আত-তাবারী ফী সিফাতিল ফুকাহা: কানা যা আদাব ওয়া ফিকহ ওয়া ইলম। (৯/৫, তরজমা: আমির বিন শারাহীল আশ-শাবী)

৬. আহাদিসের তাসহিহ ও তাদঈফে ইমাম তাবারির রায়ের ওপর গবেষকদের আস্থা

গবেষকগণ আহাদিসের মানদণ্ডেও ইমাম তাবারির (রহ.) রায়কে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। যেসব আহাদিসকে ইমাম বুখারির (রহ.) মতো দিকপালগণ সহিহ বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর বিশুদ্ধতার সমর্থনেও ইমাম তাবারির (রহ.) রায় পেশ করা হয়েছে। যেসব আহাদিস সম্পর্কে পূর্বে কোনো রায় প্রদান করা হয়নি, সেগুলোতেও ইমাম তাবারির (রহ.) রায়ের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। [১]

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: তিনি কবি, ফকিহ এবং পরহেজগার ছিলেন। (৫/২৫১, অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন শুবরুমাহ)
- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে ‘তহজিবুল আসার’-এ বলা হয়েছে: শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিভ্রম হয়েছিল। (৫/৩৭৯, অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন লাহিআহ)
- ইবনুল মাদিনি বলেন: তিনি একজন অপরিচিত শায়খ ছিলেন এবং আবু জাফর তাবারির ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন। (৬/৮৫, অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার)
- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: তিনি ইলম ও আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। (৭/২৪, অনুবাদ: উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন মাসউদ)
- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: উবায়দুল্লাহ বিন ওয়াজিউ তাঁর বর্ণনায় অপরিচিত ছিলেন। (৭/৫৫, অনুবাদ: উবায়দুল্লাহ বিন ওয়াজিউ)
- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: কাসির বিন জায়েদ এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করা যায়। (৮/৪৬৪, অনুবাদ: কাসির বিন জায়েদ)
- আবু জাফর তাবারি সম্পর্কে বলা হয়েছে: তাঁর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। (৯/৪৩৬, অনুবাদ: মুহাম্মদ বিন মারওয়ান বিন আবদুল্লাহ)

হাফেজ মিজ্জি (রহ.) রাবিদের (বর্ণনাকারী) ব্যাপারে মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির (রহ.) মতামতও উদ্ধৃত করেছেন, যেমন:

মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির ব্যাপারে বলা হয়েছে: তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ছিলেন তবে কখনো কখনো ভুল করতেন। (তহজিবুল কামাল: ১৪/১৩১, অনুবাদ: ইয়াদ বিন শায়বান, দারুল রিসালাহ, বৈরুত)

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির ব্যাপারে বলা হয়েছে: আমি আবু কিলাবাহর চেয়ে বেশি মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। (তহজিবুল কামাল: ১৮, পৃষ্ঠা ৪০৩, অনুবাদ: আবদুল মালিক বিন মুহাম্মদ আবি কিলাবাহ আর-রাকাসি)

জারহ ও তাদিলের ইমামগণ কি তাঁদের শাস্ত্রে কোনো ভ্রান্ত আকিদার মানুষের মতামত গ্রহণ করতে পারেন? আর এমতাবস্থায় কি জারহ ও তাদিল শাস্ত্র এবং হাদিস শাস্ত্রকে নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে?

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] শুধুমাত্র হাফেজ ইবনে হাজারের (রহ.) ‘ইতহাফুল মাহারা’র ওপর এক নজর বুলিয়ে যেসব উদাহরণ সামনে এসেছে, তা পেশ করা হচ্ছে। আমাদের দাবির প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইবনে হাজার আসকালানির (রহ.) মতো গবেষক ইমাম তাবারির (রহ.) তাসহিহ (বিশুদ্ধকরণ)-এর ওপর আস্থা রাখছেন। ইবনে জারির মুহাম্মদ বিন সাহল বিন আসকার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে সহিহ বলেছেন... তাবারি বলেন: এই খবরটি আমাদের নিকট সহিহ সনদযুক্ত। (১১/৬১৯)

ইমাম বুখারি একে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে জারির একে সহিহ বলেছেন: (১১/৫৫৬) ইবনে জারির একে মুয়াম্মালের হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে সহিহ বলেছেন। (১৪/৬৮৫)

ইবনে জারির একে বর্ণনা করেছেন... এবং একে সহিহ বলেছেন (১৭/৪৫৬...)

আবু হাইয়ান আন্দালুসি (রহ.), যাঁর ব্যাপারে অপপ্রচার করা হয় যে তিনি ইমাম তাবারিকে (রহ.) রাফেজি বলতেন, হাদিসের মানদণ্ডে ইমাম তাবারির (রহ.) রায়ের ওপর আস্থা রেখে বলেন: “এই মর্মে হুজাইফা থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এবং তাবারি উল্লেখ করেছেন যে এর সনদ দুর্বল, ইবনুল জাররাহর বর্ণনায় এতে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।” (তাফসিরে বাহরুল মুহিত: ৮/৫৬৫)

আমরা হাদিস, তাফসির এবং আকিদা বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে ইমাম তাবারির ওপর আস্থার উদাহরণগুলোর দিকে কেবল ইঙ্গিত করেছি। যদি সমস্ত উদ্ধৃতি পেশ করা হয়, তবে একটি বিশাল খণ্ড তৈরি হতে পারে। এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। যদি কেউ এর ওপর মনোযোগ দেন, তবে এটি অত্যন্ত দরকারী একটি গবেষণামূলক কাজ হতে পারে।

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ এবং তারিখ-ই-তাবারীর ওপর কিছু আপত্তির জবাব

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ-এর দাফন রাতে হওয়া কি তাঁর রাফেযী হওয়ার প্রমাণ?

প্রশ্ন: ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ রাফেযী ছিলেন; এজন্য বাগদাদের লোকেরা তাঁকে এতটাই ঘৃণা করত যে তাঁর দাফনও গোপনে রাতের বেলা হয়েছিল। তাহলে তাঁকে আহলে সুন্নাতের আলেম কেন বলা হচ্ছে?

উত্তর: রিজাল শাস্ত্রের সকল বিশেষজ্ঞ ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ-কে আহলে সুন্নাতের ইমাম হিসেবে মেনে এসেছেন। আপনার উচিত তাঁদের দাবির খণ্ডন এবং নিজের দাবির প্রমাণের জন্য আসমাউর রিজাল থেকেই কোনো উদ্ধৃতি পেশ করা। বাকি রইল এই কথা যে, তাঁর দাফন দিনে কেন হলো না, এর উত্তর আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারী রহমাতুল্লাহ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

“মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারীর মৃত্যুর আলোচনা: এই বছর (৩১০ হিজরিতে) তারিখ-এর লেখক মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম ২২৪ হিজরিতে হয়েছিল। তাঁকে রাতের বেলা তাঁর ঘরে দাফন করা হয়; কারণ সাধারণ মানুষ জমা হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে দিনের বেলা দাফন করতে বাধা দিয়েছিল। আর তাঁর ওপর রাফয-এর অভিযোগ আনা হয়েছিল। এরপর তাঁর ওপর ইলহাদ-এর অভিযোগ আনা হয়েছিল। আলী বিন ঈসা বলতেন: আল্লাহর কসম! যদি এই লোকদের কাছে রাফয এবং ইলহাদ-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তারা তা জানবেও না এবং চিনবেও না। ‘তাজারিবুল উমাম’-এর লেখক ইবনে মিসকাওয়াইহ এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারীর মতো ইমাম এমন সব বিষয়ে লিপ্ত হতে পারেন না। ইবনে মিসকাওয়াইহ যেখানে সাধারণ মানুষের গোঁড়ামির কথা উল্লেখ করেছেন, বিষয়টি তেমন ছিল না। বরং কেবল কিছু হাম্বলী ইমাম তাবারীর প্রতি গোঁড়ামি প্রদর্শন করেছিল এবং তাঁর ওপর কটুক্তি করেছিল, এরপর সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করেছিল। [১]”

হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহ-ও ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ-কে সব ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেন:

“ইমাম তাবারী তাঁর নিজ ঘরে দাফন হয়েছিলেন; কারণ হাম্বলীদের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে কিছু বখাটে দিনের বেলা তাঁর দাফনে বাধা দিয়েছিল এবং তাঁর ওপর রাফয-এর অভিযোগ এনেছিল এবং কিছু মূর্খ তাঁর ওপর ইলহাদ-এর অপবাদ দিয়েছিল। অথচ ইমাম তাবারী এই অভিযোগ থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ওই অভিযোগ থেকেও। বরং তিনি তো কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূল-এর জ্ঞানে ইসলামের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: বছর ৩১০ হিজরি।

[২] এবং তাঁকে তাঁর ঘরে দাফন করা হয়েছিল কারণ হাম্বলীদের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে কিছু ইতর লোক দিনের বেলা তাঁর দাফনে বাধা দিয়েছিল এবং তাঁকে রাফয-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছিল এবং মূর্খদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাঁর ওপর ইলহাদ-এর অপবাদ দিয়েছিল, অথচ তিনি এ থেকে এবং ও থেকেও মুক্ত ছিলেন, বরং তিনি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞানে ইসলামের অন্যতম ইমাম ছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৮৪৯)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কি হাফিজ যাহাবী ইমাম তাবারীকে শিয়া বলেছেন?

প্রশ্ন: আপনি আপনার একাধিক কলাম ও লেখায় ইমাম তাবারীর কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনও করে আসছেন। অথচ তাবারীর শিয়া হওয়া বরং রাফেযী হওয়া গবেষকদের নিকট সুনিশ্চিত। আর ‘হাতিবুল লাইল’ প্রকৃতির অন্ধ অনুসারীদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। হাফিজ যাহাবী ‘মিয়ানুল ইতিদাল’-এ তাবারীর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: “ফিহি তাশাইয়ু” (তাঁর মধ্যে শিয়াত্বই শিয়াত্ব ভরা ছিল।)

উত্তর: ইমাম তাবারীর প্রশংসা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে জারাহ ও তাদীল শাস্ত্রের ইমামগণ একমত। যে কেউ চাইলে রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহ খুলে দেখতে পারেন। আপনি যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তা সম্পূর্ণ খেয়ানতের ওপর ভিত্তি করে। যদি আপনি মূল কিতাব না দেখে কারো অন্ধ অনুকরণে এই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, তবে আপনাকে অজ্ঞতার কারণে অক্ষম মনে করা যেতে পারে, অন্যথায় এমন কাজ অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আখেরাতের বিচারে জবাবদিহিতার যোগ্য। হাফিজ যাহাবীর মূল বক্তব্য হলো:

“ফিহি তাশাইয়ুন ইয়াসিরুন ওয়া মুওয়ালাতুন লা তায়ুররু।”

“তাঁর মধ্যে সামান্য তাশাইয়ু এবং (আহলে বাইতের প্রতি) ভালোবাসা ছিল যা ক্ষতিকর নয়।” [১]

“ফিহি তাশাইয়ু”-এর অনুবাদ এটা হতে পারে না যে, তাঁর মধ্যে শিয়াত্ব ভরা ছিল। বরং সঠিক অনুবাদ হলো: তাঁর মধ্যে কিছুটা তাশাইয়ু ছিল। “তাশাইয়ু” শব্দের তানভীন এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল, অথচ এখানে এরপর “ইয়াসির” শব্দ দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর “মুওয়ালাতুন লা তায়ুররু” বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছে।

হাফিজ যাহাবী “সিয়ারু আলামিন নুবালা”-তে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন:

“ওয়া শুন্নিআ আলাইহি বিইয়াসিরি তাশাইয়ু, ওয়ামা রাইনা ইল্লাল খাইর।” [২]

অর্থাৎ সামান্য তাশাইয়ুও প্রমাণিত নয়, কেবল এর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, কেবল অপবাদ দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না। হাফিজ যাহাবী নিজের মতামত হিসেবে যে গবেষণালব্ধ কথাটি লিখেছেন তা হলো: “ওয়ামা রাইনা ইল্লাল খাইর” (আমরা তাঁর মধ্যে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি)।

এখানে এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবীর তারিখুল ইসলাম এবং মিয়ানুল ইতিদাল-এ ইমাম তাবারীর জীবনী পড়লে এটি খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাফিজ যাহাবী ইমাম তাবারী সম্পর্কে অন্ধ অনুকরণ করে কিছু লেখেননি, বরং তাঁর রচনাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, আমি তাঁর অমুক অমুক কিতাব পড়েছি। এরপর তিনি সেগুলোর ওপর নিজের মন্তব্য পেশ করেছেন এবং সেগুলোকে প্রতিটি অপবাদ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে এমন কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে যা আজ বিলুপ্ত। [৩] শুধু তাই নয়, বরং তারিখুত তাবারীসহ ইমাম তাবারীর একাধিক কিতাব থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা নিজের রচনাবলিতে উদ্ধৃত করেছেন।

[১] মিয়ানুল ইতিদাল: ৩/৪৯৮, ৪৯৯

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৭

[৩] উনয়ুর তারজামাতা ইবনি জারীরিত তাবারী ফী তারিখিল ইসলাম লিয়ায যাহাবী ওয়া সিয়ারু আলামিন নুবালা

বিশেষ করে ‘তারিখুল ইসলাম’ এবং ‘সিয়ারু আলামিন নুবালা’ গ্রন্থে; তাই এই ধারণার কোনো অবকাশ নেই যে হাফেজ যাহাবী (রহ.) কেবল শোনা কথা নকল করেছেন। এই সমস্ত অধ্যয়নের পর হাফেজ যাহাবী (রহ.) যে ফয়সালা দিয়েছেন, তা তাঁর নিজের ভাষায় নিম্নরূপ:

[১]. وكان ابن جرير من رجال الكمال، وُشِّعَ عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخير

“ইবনে জারীর পূর্ণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সামান্য শিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। আমরা তো (তাঁর মধ্যে) কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।”

এখানে এই কথা মনে রাখা উচিত যে, প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ‘তাশাইয়ু’ (শিয়া মতবাদ)-এর অর্থ আজকের শিয়া মতবাদের মতো ছিল না, যার ভিত্তি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষের ওপর। সেই যুগে ‘তাশাইয়ু’-এর অর্থ ছিল আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং ফযিলত ও মর্যাদার দিক থেকে হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করা। পক্ষান্তরে যারা সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিত, তাদের ‘রাফেযী’ বলা হতো। বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সমস্ত সংকলকদের উস্তাদদের মধ্যে এমন ব্যক্তির ছিলেন যাদের সম্পর্কে জারাহ ও তাদীল (সমালোচনা ও মূল্যায়ন)-এর কিতাবগুলো “রুমিয়া বিত-তাশাইয়ু”, “ফিহি তাশাইয়ু”, বা “কানা শিয়ান” বলে ঘোষণা করে; কিন্তু তারা বিদআতি বা রাফেযী ছিলেন না। তাদের শিয়া ভাবধারা আকিদাগত দিক থেকে ক্ষতিকর ছিল না; তাই তাদের আমানত ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং যদি তর্কের খাতিরে ইবনে জারীর তাবারীর ওপর ‘তাশাইয়ু’-এর ‘জারাহ’ (সমালোচনা) মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য পড়ে না।

কি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা সম্বলিত একটি পত্র নকল করা কি তাঁর রাফেযী হওয়ার প্রমাণ?

সওয়াল: ইমাম তাবারী খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহর অবস্থার বর্ণনায় তাঁর একটি দীর্ঘ পত্র নকল করেছেন, যাতে খলিফা মিথ্যা বর্ণনার ভিত্তিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর লানত করেছেন। এই পুরো পত্রটি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসংখ্য ধৃষ্টতায় ভরপুর। ইমাম তাবারী এটি নকল করার সময় এমন কোনো শিরোনাম দেননি যার মাধ্যমে এই পত্রের নিন্দা প্রমাণিত হয়। না এর শুরুতে বা শেষে বা মাঝখানে কোথাও ‘নাউযুবিল্লাহ’, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বা ‘ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন’ বলেছেন। এমনকি শুরুতে বা শেষে এমন কোনো নোট বা শিরোনামও দেননি যা থেকে এই পত্রের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাবারী নিজেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাফেযী মনোভাব পোষণ করতেন, অন্যথায় এমন অসার ও ঈমান বিধ্বংসী কথায় ভরপুর পুরো পত্রটি এত গুরুত্বের সাথে নকল করার কী প্রয়োজন ছিল? যদি এটি নকল করার খুব বেশি শখ থাকত, তবে বড়জোর তিনি নিজের ভাষায় এর সারসংক্ষেপ নকল করে দিলেই যথেষ্ট হতো। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, তারিখুত তাবারীর কাজ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

জওয়াব: কোনো ব্যক্তির কুফরি বা হারাম কথা বা কাজকে গল্প হিসেবে বা লিখিতভাবে নকল করা জায়েজ, তবে শর্ত হলো সেই হারাম বা কুফরি কথা বা কাজের সমর্থন করা যাবে না। এই ধরনের বিষয় বর্ণনা করার সময় সেই হারাম বা কুফরি কথা বা কাজের প্রতিবাদ করা...

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

বিমুখতা প্রকাশের পাশাপাশি ইস্তিয়াজ (নাউযুবিল্লাহ, আল-আইয়াজু বিল্লাহ ইত্যাদি) শব্দগুলো বলা অবশ্যই উত্তম, কিন্তু যদি কেউ তা প্রত্যাখ্যান, বিমুখতা প্রকাশ বা ইস্তিয়াজার শব্দগুলো উচ্চারণ না করে, তবে সে কেবল একটি উত্তম কাজ (খিলাফে আওলা) বর্জন করেছে। এর কারণে তার দ্বীন ও ঈমানের ওপর সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই; কারণ এটা স্পষ্ট যে, যখন কোনো মুসলমান, বিশেষ করে কোনো আলেম, কোনো ফাসিক, পাপিষ্ঠ বা কাফের-মুশরিকের মন্দ কাজ বা কথা উদ্ধৃত করেন, তখন তার উদ্দেশ্য কখনোই সেটিকে সমর্থন করা হয় না। তাই এ নিয়ে অহেতুক সন্দেহ করার কোনো ভিত্তি নেই।

হাদিসের কিতাবগুলোতে ডজন ডজন স্থানে কাফেরদের অবমাননাকর শব্দ বা তাদের কুফরি ও শিরকি কথা এবং দ্বীনহীন কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক স্থানে মুহাদিসগণ এমন কোনো বাক্য যোগ করেননি যা দ্বারা এসব কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। মুহাদিসগণের এই পদ্ধতির ওপর কোনো ব্যাখ্যাকারীর পক্ষ থেকেও কোনো সমালোচনা দেখা যায়নি। যার অর্থ হলো, বর্ণনার ক্ষেত্রে সবাই এই মূলনীতির ওপর একমত যে, “কুফর বর্ণনা করা কুফর নয়”।

কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো:

সহীহ বুখারীতে আবু জাহলের হত্যার ঘটনায় বর্ণিত আছে:

তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) বললেন: তুমি কি আবু জাহল? সে বলল: তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে বড় আর কেউ আছে কি? সুলাইমান বলেন: অথবা সে বলেছিল: যাকে তার কওম হত্যা করেছে। আবু মিজলাজ বলেন: আবু জাহল বলেছিল: আফসোস! যদি কোনো কৃষক ছাড়া অন্য কেউ আমাকে হত্যা করত। [১]

এই ঘটনা একইভাবে সহীহ মুসলিম-এও বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আবু জাহলের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার শেষ কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে সে বদরী সাহাবীদের “আক্কার” (কৃষক) বলে অবমাননা করেছে যে, হায়! যদি তোমাদের মতো গর্ত খননকারী এবং কৃষকদের মতো নিচু স্তরের মানুষের পরিবর্তে কোনো উচ্চ মর্যাদার মানুষের হাতে নিহত হতাম। সকল ব্যাখ্যাকারী এর অর্থ এটাই বলেছেন যে, আবু জাহল তার প্রতিপক্ষ সাহাবীদের তুচ্ছজ্ঞান করছিল। [২]

তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রহ. আবু জাহলের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য উদ্ধৃত করার সময় নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদী বাক্য বাড়াননি; এর ওপর না আল-আইয়াজু বিল্লাহ বলেছেন, না নাউযুবিল্লাহ। না কোনো এমন শিরোনাম দিয়েছেন যা দ্বারা এই কাজের নিন্দা প্রমাণিত হয়। বরং কেবল “আবু জাহলের হত্যা”-র মতো একটি সাধারণ শিরোনাম দিয়েছেন। ইমাম নববী রহ.-ও সহীহ মুসলিমের ওপর তার শিরোনাম কেবল “আবু জাহলের হত্যা”-ই দিয়েছেন।

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪০২০, আবু কতলি আবি জাহল; সহীহ মুসলিম, হা: ৪৭৬৩।

[২] কাজী আইয়াজ বলেন: ‘লাও গায়রু আক্কারিন কতলানি’ এখানে হামজার ওপর ফাতহ এবং কাফ-এর ওপর তাম্বুতসহ ‘আল-হাফফার’ ও ‘আল-হারিস’ (খননকারী ও কৃষক) অর্থ প্রকাশ করে। (মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহািল আসার লিল কাজী আইয়াজ: ৩১/১, ত: আল-মাকতাবাতুল আতীকাহ)। ইবনুল আসীর আল-জাযারী বলেন: আবু জাহলের হত্যার হাদিসে আছে: ‘ফালো গায়রু আক্কারিন কতলানি’। আল-আক্কার: কৃষিজীবী, এর দ্বারা সে তাদের তুচ্ছজ্ঞান ও অবজ্ঞা করা উদ্দেশ্য নিয়েছে। (আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার: ৫৭/১)।

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: সে তাদের থেকে যারা তাকে হত্যা করেছে তাদের তুচ্ছজ্ঞান করার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। (ফাতহুল বারী: ২৯৫/৭)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন: সে তাদের তুচ্ছজ্ঞান করা উদ্দেশ্য নিয়েছে। (উমদাতুল কারী: ১১২/১৭)।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর এই সংকলন পদ্ধতির ওপর কি কোনো নির্বোধ এই মন্তব্য করতে পারে: “ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম এই বর্ণনাটি এজন্য উদ্ধৃত করেছেন যাতে মানুষের মনে সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তারা সাহাবীদের তুচ্ছ এবং আবু জাহলকে সাহসী লোক মনে করতে শুরু করে?”

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর যারা আপত্তি করেন, তাদের মতে এখানে কি ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ওপর আবশ্যিক ছিল যে, তারা এই বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে আবু জাহলের ওপর লানত পাঠাতেন এবং বলতেন যে আবু জাহল তুচ্ছ ছিল আর সাহাবীরা মহান ছিলেন? এমন কোন মুসলমান আছে যে এতটুকুও জানে না? সুতরাং যদি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) এমন শব্দ যোগ না করে থাকেন, তবে এর ওপর এ কথা বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, এই ব্যক্তিবর্গ সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না অথবা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বিন্যাস অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

তৃতীয় উদাহরণটি লক্ষ্য করুন। ইমাম মুসলিম (রহ.) নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “নিশ্চয়ই ইবলিস পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে, অতঃপর সে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে মর্যাদায় তার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হয়, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করে। তাদের একজন এসে বলে: আমি এই এই করেছি। সে বলে: তুমি কিছুই করোনি। তিনি বলেন: অতঃপর তাদের আরেকজন এসে বলে: আমি তাকে ততক্ষণ ছাড়িনি যতক্ষণ না তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তিনি বলেন: তখন সে তাকে নিজের কাছে টেনে নেয় এবং বলে: তুমিই শ্রেষ্ঠ। আমাশ বলেন: আমার মনে হয় তিনি বলেছেন: অতঃপর সে তাকে জড়িয়ে ধরে।” [১]

এই বর্ণনার সারমর্ম হলো, শয়তান সমুদ্রে তার দরবার বসায় এবং তার প্রতিনিধি শয়তানদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ শোনে যে, তারা কীভাবে মানুষকে পাপে লিপ্ত করেছে, আর যে বেশি বিভ্রান্তিকর কাজ করায় তাকে সে সাবাশ দেয় এবং নিজের নিকটবর্তী করে নেয়।

এই বর্ণনার শিরোনামে, শুরুতে বা শেষে ইমাম মুসলিম (রহ.) কোথাও শয়তানের নিন্দা করেননি বরং তার ঘৃণ্য কাজগুলোর বর্ণনা হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। এটা কি এজন্য ছিল যে—নাউযুবিল্লাহ—ইমাম মুসলিম শয়তানের কাজে খুশি ছিলেন এবং তার কীর্তিগুলো দুনিয়ার কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন?

চতুর্থ উদাহরণটি দেখুন, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন:

আসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হাজ্জাজকে মিসরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: “তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, এতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর আমীরুল মুমিনীন আব্দুল মালিকের কথা শোনো ও আনুগত্য করো, এতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহর কসম, আমি যদি মানুষকে মসজিদের কোনো এক দরজা দিয়ে বের হওয়ার নির্দেশ দিই আর তারা অন্য দরজা দিয়ে বের হয়, তবে আমার জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, আমি যদি মুদার গোত্রের অপরাধে রাবিয়া গোত্রকে পাকড়াও করি, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা আমার জন্য বৈধ হবে। আর হুযাইল গোত্রের দাসের ব্যাপারে আমার ওজর কে শুনবে? সে দাবি করে যে তার কিরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর কসম, তা গ্রাম্য ছন্দের কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আল্লাহ তাঁর নবী (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ করেননি।” [২]

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৭২৮৪, বাব তাহরীশ আশ-শায়তান

[২] সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৬৪২, বাব ফিল খুলাফা

এই রেওয়ায়েতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে নিয়ে উপহাস করছে। সে তাঁকে ‘হজাইলের উপাসক’ বলছে এবং তাঁর কিরাতকে গ্রামবাসীদের ‘রজজ’ বলে অভিহিত করছে। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এখানে হাজ্জাজের বক্তব্যের প্রতি কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

তাহলে কি এর অর্থ এই ধরা হবে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে তুচ্ছ করার জন্য এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করছিলেন?

একটি শেষ উদাহরণ দেখে নিন। ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন:

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমকে আকৃতি দান করলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে যতটুকু সময় ইচ্ছা সেভাবেই রেখে দিলেন। তখন ইবলিস তাঁর চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল যে তিনি কী। যখন সে তাঁকে ফাঁপা দেখল, তখন সে বুঝতে পারল যে তাঁকে এমন এক সৃষ্টি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে যা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।” [১]

এই রেওয়ায়েতে শয়তান আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সময় তাঁকে নিয়ে উপহাস করেছিল এবং তাঁকে এক নির্বোধ সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করেছিল। শয়তানের এই প্রলাপগুলো ইমাম মুসলিম (রহ.) কোনো প্রতিবাদমূলক নোট বা নাউযুবিল্লাহ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই হতে পারে যে, ইমাম মুসলিম (রহ.) শয়তানের মুখ দিয়ে আদম (আ.)-এর এই উপহাসকে সঠিক মনে করতেন এবং এই উপহাসে নিজেও শরিক ছিলেন?

আল্লাহর দোহাই, একটু বিবেক খাটান! পূর্বসূরিদের ইলমি প্রচেষ্টাকে সঠিক প্রেক্ষাপটে রেখে দেখুন। সঠিক প্রেক্ষাপট হলো এই যে, সমস্ত প্রাচীন মুহাদিস ও ঐতিহাসিকদের একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি ছিল। তাঁদের কাজ ছিল রেওয়ায়েতগুলোকে রেকর্ড হিসেবে জমা করা। কোনো তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে রেকর্ড সংগ্রহ করেন, তখন তিনি তাতে নিজের পক্ষ থেকে প্রশংসা বা নিন্দার শব্দ যোগ করতে থাকেন না। প্রাচীন মুহাদিস ও ঐতিহাসিকদের পদ্ধতিও এমনই ছিল। তাঁরা যে রেওয়ায়েতই পেতেন, চাই তা পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্বদের অবস্থা সম্পর্কিত হোক বা শয়তান ও তার অনুসারীদের অবস্থা ভিত্তিক হোক, তাঁরা প্রতিটি রেওয়ায়েত মূল শব্দ অনুযায়ী হুবহু বর্ণনা করে দিতেন। নিজের পক্ষ থেকে কোনো টীকা-টিপ্পনী করতেন না। কারণ ব্যাখ্যা বা টীকা প্রদান করা তাঁদের দায়িত্বের পরিপন্থী ছিল। হ্যাঁ, যখন এই রেওয়ায়েতগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা হয়েছে, তখন সেখানে প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন, তবে তাঁরাও সব জায়গায় প্রয়োজন মনে করেননি; কারণ এই মন্দ বিষয়গুলো এতটাই স্পষ্ট ছিল যে কোনো মুসলমানকে এটি বোঝানোর প্রয়োজনই ছিল না যে এটি কুফর নাকি ফিসক।

মুতাদিদ বিল্লাহর এই পত্রটি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর বর্ণনা করা ছিল নিছক একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড পেশ করার জন্য। তিনি গুরুত্বের সাথে পুরো পত্রটি এজন্য বর্ণনা করেছেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে পারে যে সেই যুগে অভ্যন্তরীণভাবে রাফেজি মতবাদ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। যদি তিনি দুই-চারটি বাক্য বর্ণনা করতেন বা নিজের ভাষায় এর সারমর্ম ব্যক্ত করতেন, তবে কারো মনে সন্দেহ হতে পারত যে খলিফা মুতাদিদ-এর সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা আছে এবং তিনি বর্ণনায় খেয়ানত করেছেন। সত্য তখনই সামনে আসতে পারত যখন পুরো পত্রটি কোনো কাটছাঁট ছাড়াই বর্ণনা করা হতো। সুতরাং পুরো পত্রটি বর্ণনা করার কারণে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আনা যায় না।

এটি ঠিক তেমনই যেমন কোনো আলেম মির্জা কাদিয়ানীর কোনো অপ্রকাশিত প্রলাপপূর্ণ পুস্তিকা সংগ্রহ করে কোনো মন্তব্য ছাড়াই প্রকাশ করে দেন

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৮৭৫, বাবু খালকিল ইনসান।

...যাতে বিশ্ব মির্জায়ীদের ঘৃণ্য চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারে। এখন যদি কোনো সংকীর্ণমনা ব্যক্তি এই আলেমকে মির্জা কাদিয়ানীর সমমনা সাব্যস্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে, তবে তার বুদ্ধির জন্য শোক প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ইমাম তাবারী (রহ.) কি দুই পা মাসেহ করার প্রবক্তা ছিলেন?

প্রশ্ন: সবাই জানেন যে ওযুতে ‘মাসেহ আলাল কাদামাইন’ (পা ধোয়ার পরিবর্তে মাসেহ করা) রাফেযীদের মাযহাব। আহলে সুন্নাতের কেউ এর প্রবক্তা নন, অথচ ইমাম তাবারীর মাযহাব এটাই ছিল। যেমন আল্লামা ইবনুল জাওযী ‘আল-মুনতায়াম’-এ লিখেছেন যে, ইমাম তাবারী মাসেহ আলাল কাদামাইনের প্রবক্তা ছিলেন:

“ইবনে জারীর দুই পা মাসেহ করা জায়েজ মনে করতেন এবং তা ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন না।”

(ইবনে জারীর পায়ের ওপর মাসেহ করার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সেগুলো ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন না।)

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমাম তাবারী কউর রাফেযী ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত আমরা নয়, বরং আল্লামা ইবনুল জাওযী বের করেছেন। তিনি তাবারী সাহেব পায়ের ওপর মাসেহ করার প্রবক্তা ছিলেন—একথা উল্লেখ করার পর বলেন:

“এ কারণেই তাকে রাফযের (শিয়া মতবাদের) দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।”

(সুতরাং এই কারণেই তাকে রাফযের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।)

উত্তর: আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর উল্লিখিত ইবারত থেকে স্পষ্ট যে, তিনি এটাই মনে করতেন যে ইমাম তাবারী (রহ.) “মাসেহ আলাল কাদামাইন”-এর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল।

তিনি যদি এই কথা কোনো গবেষণার ভিত্তিতে বলে থাকেন, তবে তার উচিত ছিল ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহ থেকে এর প্রমাণ পেশ করা, কিন্তু তিনি কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। বাস্তবতা হলো এই বিষয়ে তার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল।

এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, তা সত্ত্বেও আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) এখানে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর নিজে “রাফয”-এর হুকুম লাগাননি, বরং এটা বলেছেন যে তাকে রাফযের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছিল। তাকে “রাফয”-এর দিকে সম্বন্ধকারী আসলে কারা ছিল? কোনো উচ্চমর্যাদার ইমামগণ ছিলেন? নাকি দু-একজন বিদ্বেষী সাধারণ মানুষ? আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি এবং কোনো কিতাবের হাওয়ালাও দেননি আর কোনো সনদও পেশ করেননি।

সুতরাং এটি ছিল কেবল দু-একজন সংকীর্ণমনা ও বিদ্বেষী আলেমদের কাজ, যাদের অনিষ্ট থেকে হয়তো খুব কম মহান ব্যক্তিত্বই রক্ষা পেয়েছেন। তারা ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর এমন অপবাদ আরোপ করেছেন যার সাথে উক্ত ইমামের দূরতম কোনো সম্পর্কও ছিল না।

পরবর্তীতে হাফেজ যাহাবী (রহ.) এই অপবাদের অনুসন্ধানের জন্য ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন:

[১] আল-মুনতায়াম: ১৩/২১৭

এবং তাদের কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে তিনি ওযুতে দুই পা মাসেহ করা জায়েজ মনে করতেন, কিন্তু আমরা তাঁর কিতাবসমূহে তা দেখিনি। [১]

প্রকৃত সত্য এই যে, এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ ইমাম তবারী-এর কিতাবসমূহ বা কোনো সনদ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। এর চেয়েও গুরুতর অভিযোগ ইসলামের বড় বড় ইমামদের ওপর লাগানো হয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নিজের মুখ, লেখা বা আমল থেকে ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয় প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ সেই অভিযোগের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

যদি ইমাম তবারী-এর তাফসীর দেখা হয়, তবে এই মাসআলায় কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজন থাকে না। এতে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ওযুতে পা ধোয়া ওয়াজিব, মাসেহ করা যথেষ্ট নয়। তিনি সূরা আল-মায়িদার তাফসীরে লিখেছেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ জালা শানুহ তাঁর বান্দাদের পা ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তার ওপর মাসেহ করার নয়।” [২]

এরপর তিনি এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের মাযহাবের সমর্থনে অনেক বর্ণনাও পেশ করেছেন এবং হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী এবং হাসনাইন কারীমাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ও বহু সংখ্যক তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সবার মাযহাব ওযুতে পা ধোয়া (গোসলুল কদমাইন) ছিল, পায়ের ওপর মাসেহ করা (মাসেহ আলাল কদমাইন) নয়। [৩]

[১] সিয়্যরু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৭

[২] তাফসীরে তবারী: ৮/১৮৮, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬

[৩] ইমাম তবারী এ বিষয়ে তাঁর নিজের সনদ থেকে পেশকৃত কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ:

- আমাদের নিকট মুহাম্মদ বিন মুসআদাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইয়াযীদ বিন যুরাই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট খালিদ আল-হাদ্দা আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তি সালাত আদায় করল এবং তার পায়ের ওপর একটি নখের সমান জায়গা (শুকনো) ছিল, তখন উমর তাকে বললেন: তোমার ওযু ও সালাত পুনরায় আদায় করো।
- আমাদের নিকট হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইয়াযীদ বিন যুরাই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট হুবাইরা বিন মারইয়াম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আঙ্গুলগুলো পানি দিয়ে ধৌত করো যাতে আঙুন সেগুলোকে স্পর্শ না করে।
- আমাদের নিকট আবদুল্লাহ বিন আল-হাদ্দল আল-আম্মার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট হাফস বিন উমর আল-হাওযী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট মুরজি অর্থাৎ ইবনে রাজা আল-উতারিদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আম্মারা বিন আবি হাফসাহ মুগীরাহ বিন শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওযু করতে দেখলেন যখন সে তার পা ধৌত করছিল, তখন তিনি বললেন: তোমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- আমাদের নিকট ইবনে বাশার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট সুফিয়ান খালিদ বিন জাইদ এর মাওলা যিয়াদ বিন জাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মুসআব বিন সাঈদকে বলতে শুনেছি: উমর ইবনুল খাত্তাব একদল লোককে ওযু করতে দেখলেন এবং বললেন: (আঙ্গুলের) ফাঁকগুলো ধৌত করো।
- আমাদের নিকট ইবনে বাশার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুল ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি কাসিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: ইবনে উমর তাঁর মোজা খুলে ফেলতেন, তারপর তাঁর পায়ের ওযু করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক ধৌত করতেন।
- আমাদের নিকট ইবনে বাশার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট সুফিয়ান যুবাইর বিন আদী থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আসওয়াদকে বললাম: আপনি কি উমরকে পা ধৌত করতে দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ।
- আমাদের নিকট ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আস-সাব্বাহ মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন—আর তিনি হলেন ইবনে ইসহাক—তিনি আবান থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: গোড়ালি ও টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো।
- আমাদের নিকট ইবনে ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবদুল ওয়াহাব ও আবদুন আ'লা খালিদ থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ‘ওয়া আরজুলাকুম’ (পা ধোয়া) নসব (যবর) দিয়ে পাঠ করেছেন এবং বলেছেন: নির্দেশ ধোয়ার দিকেই ফিরে এসেছে।

তারিখ উম্মত-এ মুসলিমা

এর পরে মাসেহ-এর প্রবক্তাদেরও কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এখানে পা মাসেহ করার অর্থ কেবল মাসেহ নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো পা ধোয়ার সাথে সাথে হাত দিয়ে ঘষাও। আর এর দলিল হিসেবে এটি পেশ করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কেবল পা পানিতে ডুবিয়ে দেয় এবং তা না ঘষে, তবে ফুকাহাদের একটি দল একে মাকরুহ মনে করেছেন। [১] এরপর সামনে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি পায়ের ওপর মাসেহ করাই যথেষ্ট হতো, তবে নবী আকরাম ﷺ ঐসব লোকদের ধমক দিতেন না যাদের গোড়ালি শুকনো রয়ে গিয়েছিল। [২] এই বিষয়ে তিনি অনেকগুলো সূত্রের মাধ্যমে ‘ওয়াইলুল লিল আকাবি মিনান নার’ (আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস) এর বর্ণনা নিয়ে এসেছেন [৩] যা পা ভালোভাবে ধোয়ার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের অত্যন্ত মজবুত দলিল।

বিগত পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা:

হুসাইন বিন আলী আস-সুদায়ী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হাফস আল-গাদাইরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আমের বিন কালাব থেকে, তিনি আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আল্লাহর কিতাব পাঠ করলেন, তারা পাঠ করলেন: ‘ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কা’বাইন’ (এবং তোমাদের পা গোড়ালি পর্যন্ত)। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট এটি শুনলেন এবং বললেন: এটি এভাবেই, কিন্তু মানুষের মাঝে এটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি বললেন: ‘ওয়া আরজুলাকুম’ এটি অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী কালামের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে ওকী’ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হুসাইন বিন আলী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি শাইবান থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পাঠ করেছেন: ‘ওয়া আরজুলাকুম’।

ইবনে ওকী’ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি হারিস থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: পায়ের পাতার উপরিভাগ মাসেহ করা।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আজ-জুহরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুফিয়ান বিন উয়াইনা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুস সাওদা থেকে, তিনি ইবনে আবদ খাইর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আলীকে ওযু করতে দেখলাম, তিনি তার পায়ের পাতার উপরিভাগ ধুলেন এবং বললেন: যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না দেখতাম, তবে আমি মনে করতাম যে পায়ের পাতার নিচের অংশ মাসেহ করা উপরিভাগ মাসেহ করার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত।

আবু কুরাইব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইবনে ইয়ামান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি কাউকে দেখিনি যে পায়ের পাতার উপরিভাগ মাসেহ করে।

(তাফসীরে তাবারী: ৮/১৮৯-১৯৪, সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬)

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] আর আমরা যা বলেছি তার ব্যাখ্যায় এটি যে, পায়ের ওপর পানি দিয়ে মাসেহ করার অর্থ হলো ওযুর ক্ষেত্রে পা ধোয়াকে ব্যাপক করা, হাত দিয়ে ঘষা ছাড়া কেবল পানিতে পা ডুবিয়ে দেওয়া মাকরুহ। (তাফসীরে তাবারী: ৮/১৯৮)

[২] এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সেই সব সংবাদ যাতে তিনি বলেছেন: “আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস এবং পায়ের পাতার নিচের অংশের জন্য ধ্বংস।” যদি পায়ের কিছু অংশ মাসেহ করা যথেষ্ট হতো, তবে এর ব্যাপকতা থেকে ঐ অংশটি বাদ যেত যা পানি দ্বারা মাসেহ করা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয আদায় করেছে, তার ওপর এমন কোনো কিছুর জন্য লানত বা ধমক আসা আবশ্যিক নয় যা সে ছেড়ে দিয়েছে। বরং ওয়াজিব হলো পূর্ণ পা ধোয়া যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এটিই পানি দ্বারা পুরো পা মাসেহ করার (ধোয়ার) ফরয হওয়ার ওপর স্পষ্ট দলিল এবং আমরা যা বলেছি তার বিপরীত সব কিছু বাতিল। (তাফসীরে তাবারী: ৮/২০০, সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬)

[৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত কিছু সংবাদের উল্লেখ যা আমরা বর্ণনা করেছি:

আবু কুরাইব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ওকী’ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী ﷺ বলেছেন: “আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস।”

আবু কুরাইব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ওকী’ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মনসুর থেকে, তিনি হিলাল বিন ইয়াসাফ থেকে, তিনি আবু ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে দেখলেন যারা ওযু করছিল এবং তাদের গোড়ালিগুলো চমকাচ্ছিল (শুকনো ছিল), তখন তিনি বললেন: “আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস, ওযু পূর্ণ করো।”

ইসমাইল বিন মাহমুদ আল-হাজরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবদান বিন হারিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শু’বা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি বলেন: আমি সাঈদকে বলতে শুনেছি, তিনি জাবিরকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস।”

ইবনুল মুসান্না আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু আমির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আলী বিন মুবারক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীর থেকে, তিনি সালিম (মাওলা দাউদ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলতে শুনেছি: হে আব্দুর রহমান! ওযু পূর্ণ করো, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “আগুনের কারণে গোড়ালিগুলোর জন্য ধ্বংস।”

(তাফসীরে তাবারী: ৮/২০১-২০৭, সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬)

এর পর ইমাম তাবারী (রহ.) মাসাহ সম্পর্কিত কিছু আসার (বর্ণনা) উল্লেখ করে বলেন যে, এগুলোর সম্পর্ক এমন অবস্থার সাথে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ওজু থাকা অবস্থায় ওজুর ওপর ওজু করেছিলেন। [১]

এ কারণেই হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর তাফসীরে এই পুরো আলোচনাটি অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট ভাষায় ইমাম তাবারী (রহ.)-এর দিকে ‘মাসাহ আলাল কাদামাইন’ (পায়ে মাসাহ করা)-এর মতটি আরোপ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি লেখেন:

“ইমাম তাবারীর দিকে এটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যে, তিনি ওজুতে পা মাসাহ করার বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন এবং সেগুলো ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন না। এটি তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ। অতঃপর আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, ইবনে জারীর নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন শিয়া ছিলেন এবং এই মতটি তাঁর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত। এই আলেমগণ আবু জাফর তাবারীকে এই অপবাদগুলো থেকে মুক্ত মনে করেন। ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে এ বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি পা ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন এবং ধোয়ার সাথে সাথে ঘষাও (রগড়ানো) ওয়াজিব মনে করতেন, কিন্তু তিনি ঘষাকে মাসাহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে অনেকেই তাঁর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, তাই তারা ইমাম তাবারী সম্পর্কে এটি বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি ধোয়া এবং মাসাহ করাকে একত্রিত করতেন।” [২]

ইমাম তাবারী (রহ.) কি বাতিল আকিদার অধিকারী ছিলেন?

প্রশ্ন: ইবনুল জাওজী ‘আল-মুনতাজাম’-এ ইমাম তাবারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাম্বলী আলেম আবু বকর বিন আবি দাউদের সামনে নিজের এই আকিদা প্রকাশ করেছিলেন যে, হজুর (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় রুহ-এ মুহাম্মদীকে হযরত আলী (রা.) নিজের চেহারায় মেখে নিয়েছিলেন। এমন বাতিল আকিদার অধিকারী ব্যক্তি কীভাবে আহলে সুন্নাত হতে পারে?

جواب: এই অভিযোগটি সনদের দিক থেকে এ কারণে অগ্রহণযোগ্য যে, আল্লামা ইবনুল জাওজী (রহ.) আবু বকর বিন আবি দাউদ থেকে প্রায়...

[১] তিনি বলেন: আমাদের নিকট কাসিম বিন সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট হুশাইম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইয়লা বিন আতা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আউস বিন আবি আউস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এক গোত্রের আবর্জনার স্তুপের কাছে আসতে দেখেছি, অতঃপর তিনি ওজু করলেন এবং তাঁর দুই পায়ের ওপর মাসাহ করলেন। এ জাতীয় অন্যান্য খবর কি ওজুতে পায়ের কিছু অংশ মাসাহ করা মুজিজা হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে? তাঁকে বলা হলো: আউস বিন আবি আউসের হাদিসের ক্ষেত্রে কথা হলো, এতে এর বিশুদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ তাঁর থেকে বর্ণিত খবরে এমন কোনো উল্লেখ নেই যে, তিনি নবী (সা.)-কে এমন কোনো হাদাস (ওজু ভঙ্গের কারণ)-এর পর ওজু করতে দেখেছেন যা তাঁর ওপর ওজু করা ওয়াজিব করে দেয়। বরং তিনি তাঁর জুতার ওপর অথবা তাঁর পায়ের ওপর মাসাহ করেছেন। আর এটি সম্ভব যে, আউস যে তাঁর পায়ের ওপর মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছিল এমন ওজুতে যা তিনি কোনো হাদাস ছাড়াই করেছিলেন, যার কারণে তাঁর ওপর ওজু নবায়ন করা ওয়াজিব হয়েছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন হাদাস ছাড়া ওজু করতেন, তখন এরূপ করতেন না।

আমার নিকট মুহাম্মদ বিন উবাইদ আল-মুহারিবি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আবু বকর বিন আইয়াশ বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলিম থেকে, তিনি হাব্বাহ আল-আরানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে রাহবায় দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি, অতঃপর তিনি ওজু করলেন এবং তাঁর জুতার ওপর মাসাহ করলেন এবং বললেন: এটি সেই ব্যক্তির ওজু যার ওজু ভঙ্গ হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এভাবেই করতে দেখেছি। সুতরাং এই খবরটি আউসের হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আমরা যা বলেছি তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত করে।

[২] তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় যে, তিনি ওজুতে পায়ের ওপর মাসাহ করা জায়েজ হওয়ার কথা বলতেন এবং ধোয়া ওয়াজিব মনে করতেন না। এটি তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হয়েছে। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে, ইবনে জারীর দুইজন ছিলেন, তাঁদের একজন শিয়া এবং তাঁর দিকেই এটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। তাঁরা আবু জাফরকে এই গুণাবলি থেকে পবিত্র মনে করেন। আর তাফসীরে তাঁর যে কথার ওপর নির্ভর করা হয়েছে তা হলো, তিনি পা ধোয়া ওয়াজিব মনে করেন এবং ধোয়ার সাথে সাথে সেগুলো ঘষাও ওয়াজিব মনে করেন। কিন্তু তিনি ঘষাকে মাসাহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, ফলে অনেক মানুষ তাঁর উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। তাই তারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছে যে, তিনি ধোয়া এবং মাসাহ করাকে একত্রিত করা ওয়াজিব মনে করতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৮৬৯)

দুই শতাব্দী পরের কথা। তা সত্ত্বেও ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) তাঁর এই বক্তব্যের পক্ষে কোনো সনদ পেশ করেননি এবং কোনো কিতাবী উদ্ধৃতিও দেননি। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে আবু বকর বিন আবি দাউদের বক্তব্য কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সমালোচকদের “অজ্ঞ” ও “মূর্খ” বলে অভিহিত করেছেন এবং এ সম্পর্কে লিখেছেন:

“এই লোকেরা (অন্ধ) অনুসরণ করতে গিয়ে আবু বকর মুহাম্মদ বিন (আবি) দাউদ থেকে এই কথাগুলো গ্রহণ করেছে, যিনি ইমাম তাবারী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেন এবং তাঁর ওপর ভয়াবহ সব অপবাদ দিতেন এবং তাঁর ওপর রাফেযী হওয়ার অভিযোগও আনতেন।” [১]

যদি এমন ভিত্তিহীন কথার ভিত্তিতে মহান ইমামদের ওপর সমালোচনাকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, তবে উম্মতের অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বই নিরাপদ থাকবেন না। ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর ব্যাপারে এটিও প্রমাণিত যে, তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন; তাই ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর ব্যাপারে জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম তাবারী (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সিয়ারু আলামিন নুবালা, মীযানুল ইতিদাল, লিসানুল মীযান, তাবাকাতুল হুফাফায, তাবাকাতুল ফুকাহা এবং তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ সহ বহু কিতাবে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। জমহুর উলামায়ে কেরামও এর ওপরই আস্তা রেখেছেন।

কি ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) মিথ্যা সনদ তৈরি করতেন?

প্রশ্ন: ইবনে জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাসে শুধু মিথ্যা ঘটনাই বর্ণনা করেননি, বরং মিথ্যা সনদও নিজে তৈরি করে জুড়ে দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ হলো তিনি “সারি বিন ইয়াহইয়া” থেকে অনেক বর্ণনা নকল করেন, যিনি তাবারীর জন্মের আগেই ১৭০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাবারী কবরে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে কীভাবে বর্ণনা লিখে পাঠাতেন?

উত্তর: সারি বিন ইয়াহইয়া দুইজন: এক. সারি বিন ইয়াহইয়া বিন ইয়াস আল-বাসরী, যিনি ১৬৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাঁকে “সিকাহ” (নির্ভরযোগ্য) বলা হয়েছে। [২] দুই. সারি বিন ইয়াহইয়া বিন সারি বিন মুসআব আল-কুফী, যিনি ২৪৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাঁকে “সাদুক” (সত্যবাদী) বলা হয়েছে। [৩] তিনি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উস্তাদ হান্নাদ বিন সারী (রহ.)-এর ভাতিজা ছিলেন। ইমাম তাবারী (রহ.)-এর জন্ম ২২৪ হিজরীতে; তাই এই দ্বিতীয় বুজুর্গ থেকে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইমাম তাবারী (রহ.) যে সারি বিন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তিনি এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই। [৪]

[১] وَاِنَّمَا تَقْلِدُوا ذَٰلِكَ عَنْ اَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنِ دَاوُدَ حَيْثُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ وَيُرْمِيهِ بِالْعِظَائِمِ، وَيُرْمِيهِ بِالرَّفْضِ، [১৪/৮৪৯]

[২] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ১০/২০৪, ২০৫, ত. তাদমুরী; পৃ. ৩৭২, ত. বাশার

[৩] তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২০/৩৫৩, ত. তাদমুরী; ৬/৫৪৭, ত. বাশার

[৪] মুজামু শুয়ুখিত তাবারী লিশ শায়খ আকরাম বিন মুহাম্মদ আল-ফালুরী, পৃ. ২৫০

সারি বারবার ইমাম তবারিকে কীভাবে বর্ণনা লিখে পাঠাতেন?

প্রশ্ন: “كتب الى السرى” (সারি আমাকে লিখেছেন) সনদে ইমাম তবারি প্রচুর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাহলে কি সারি বিন ইয়াহইয়া প্রতিবার প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁকে বর্ণনা লিখে পাঠাতেন? আসলে কীভাবে? সেই যুগে সফরের কষ্ট থাকা সত্ত্বেও এটি অসম্ভব ছিল। এ থেকে বোঝা যায় ইমাম তবারি এই মিথ্যা সনদটি নিজেই তৈরি করেছেন।

উত্তর: আরজ এই যে, “كتب الى” (আমাকে লিখেছেন) সনদ বারবার আনার অর্থ এই নয় যে, বর্ণনাকারী প্রতিবার আলাদা কাগজে বর্ণনা লিখে প্রাপকের কাছে পাঠিয়েছেন। বরং বর্ণনাকারী যদি একবার তাঁর বর্ণনার সংকলন লিখিয়ে লেখকের কাছে পাঠিয়ে দেন, তবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনা নিজ নিজ স্থানে “كتب الى” শব্দেই উদ্ধৃত করবেন। যেমন এক মজলিসে শোনা বর্ণনাগুলোর প্রতিটি আলাদাভাবে উদ্ধৃত করার সময় প্রতিবার “حدثنا” (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) বলা হতো। এর অর্থ এই নয় যে, লেখক প্রতিবার আলাদা সফর করে উস্তাদের কাছে গিয়েছেন এবং হাদিস শুনেছেন।

কি হাফেজ জাহাবি রহ. ইমাম তবারির ওপর রাফেজিদের জন্য বর্ণনা জাল করার অভিযোগ এনেছেন?

প্রশ্ন: হাফেজ জাহাবি রহ. ইমাম তবারি সম্পর্কে স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি রাফেজিদের জন্য বর্ণনা জাল করতেন। এ ব্যাপারে আপনার কাছে কি কোনো উত্তর আছে?

উত্তর: আমি বিস্মিত যে আপনি কত সাহসিকতার সাথে এমন একটি কথা দাবি করছেন যা কোনোভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সম্ভবত আপনি লোকমুখে শোনা কথার ওপর নির্ভর করছেন। এমন বর্ণনা যা পুরোপুরি খিয়ানতের ওপর ভিত্তি করে। হাফেজ জাহাবি রহ. নিজে কখনোই এমন কথা বলেননি, বরং অন্য কারো কথা উদ্ধৃত করেছেন এবং এরপর ইমাম তবারি রহ. থেকে রাফেজি হওয়ার অপবাদ দূর করতে সাফাই উকিলের ভূমিকা পালন করেছেন। আপনি যে ইবারতের (উদ্ধৃতি) দিকে ইঙ্গিত করছেন, তা হলো:

اقذع احمد بن على السليمانى، فقال كان يضع للروافض، كذا قال السليمانى، وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار ائمة الاسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا ان نؤذيه بالباطل، والهوى، فان كلام العلماء بعضهم فى بعض ينبغى ان يتأنى فيه، ولا سيما فى مثل امام كبير، فلعل السليمانى اراد الآتى..... محمد بن جرير بن رستم، ابوجعفر الطبرى، [১] رافضى له تواليف، منها كتاب الرواة عن اهل البيت، رماه بالرفض عبدالعزيز الكنانى

“আহমদ বিন আলী আস-সুলায়মানি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন, তিনি রাফেজিদের জন্য (হাদিস) জাল করতেন। সুলায়মানি এমনই বলেছেন। আর এটি মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে করা একটি অপবাদ। বরং ইবনে জারির ইসলামের নির্ভরযোগ্য মহান ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাঁর ভুলের উর্ধ্ব (নিষ্পাপ) হওয়ার দাবি করি না, তবে আমাদের জন্য বৈধ নয় যে আমরা বাতিল ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাঁকে কষ্ট দেব। কেননা আলেমদের একে অপরের সমালোচনা সম্পর্কে ধীরস্থির হওয়া উচিত, বিশেষ করে তাঁর মতো একজন মহান ইমামের ক্ষেত্রে। সম্ভবত সুলায়মানি পরবর্তী ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন... মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম, আবু জাফর আত-তবারি, একজন রাফেজি যার কিছু রচনা রয়েছে, যার মধ্যে ‘কিতাবুর রুওয়াত আন আহলিল বাইত’ অন্যতম। আব্দুল আজিজ আল-কিনানি তাকে রাফেজি হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন।”

“হাফেজ আহমদ বিন আলী সুলায়মানি অপবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাফেজিদের জন্য বর্ণনা জাল করতেন। এটি একটি রটানো মিথ্যা অপবাদ। বরং ইবনে জারির তো মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য ইমামদের একজন ছিলেন। আমরা তাঁর...”

[১] মিজানুল ইতিদাল: ৩/৪৯৯, দারুল মা’রিফাহ মুদ্রণ।

ভুল থেকে নিষ্পাপ হওয়ার দাবি করি না, তবে আমাদের জন্য এটা জায়েজ নয় যে মিথ্যা ও প্রবৃত্তিগত কথা নিয়ে তাদের চরিত্র হনন করি। ওলামাদের একে অপরের সম্পর্কে মতামতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিশেষ করে যখন এমন বড় ইমামের বিষয় হয়। সম্ভবত হাফেজ সুলাইমানীর উদ্দেশ্য (ইবনে জারীর বিন ইয়াজিদ তাবারী নন বরং) সামনে উল্লেখিত ব্যক্তিত্ব।

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম আবু জাফর আত-তাবারী: এ ছিল রাফেযী, তার অনেক
কিতাব রয়েছে যেমন ‘আর-রুওয়াতু আন আহলিল বাইত’। আব্দুল আজিজ কিনানী তার
ওপর রাফযের অভিযোগ লাগিয়েছেন।

হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী দুইজন ছিলেন। তারিখ-এ-তাবারী এর লেখক ইবনে জারীর ছিলেন আহলে সুন্নাত। তারই সমনাম ও সমবংশীয় আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম আত-তাবারী ছিলেন রাফেযী। নাম, বংশ এবং কুনিয়াত বা উপনামের অসাধারণ মিল থাকার কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর আহলে সুন্নাত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তিনি তার ফিকহী শাহকার ‘তাহযীবুল আসার’ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাদিসসমূহ এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছেন। এছাড়া ‘তাহযীবুল আসার’-এ পুরো একটি খণ্ড হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর রেওয়ায়েতসমূহ এবং সেগুলোর ফিকহী ব্যাখ্যার ওপর লিখেছেন। কোনো রাফেযীর হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতসমূহ সংকলন করা এবং সেগুলো থেকে দলিল পেশ করার মধ্যে কী আত্মহ থাকতে পারে?

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) কি ইমাম তাবারীর ওপর শিয়াদের জন্য রেওয়ায়েত জাল করার অভিযোগ করেছেন?

প্রশ্ন: হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ‘লিসানুল মিজান’-এ লিখেছেন যে, ইবনে জারীর তাবারী শিয়াদের জন্য রেওয়ায়েত বানাতেন। এমন মহান আলেমের বক্তব্য কি ইবনে জারীরকে শিয়া প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়?

جواب: ہافہج ایبنہ ہاجار (رہ.)-اے پورہ بکترہ پش کرا ہلہ، یا آپنار دابر
جہارلہ اترہاد کرہے ۔

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াজিদ আত-তাবারী, মহান ইমাম, মুফাসসির আবু জাফর চমৎকার সব গ্রন্থের রচয়িতা, ৩১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী, তার মধ্যে সামান্য শিয়াজ ও ভালোবাসা ছিল যা ক্ষতিকর নয়। আহমদ বিন আলী আস-সুলাইমানী তার সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি রাফেযীদের জন্য (রেওয়ায়েত) তৈরি করতেন। সুলাইমানী এমনই বলেছেন, আর এটি মিথ্যা ধারণার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। বরং ইবনে জারীর ইসলামের নির্ভরযোগ্য বড় ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা তার ভুল থেকে নিষ্পাপ হওয়ার দাবি করি না, আর আমাদের জন্য জায়েজ নয় যে বাতিল ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাকে কষ্ট দেই। কেননা ওলামাদের একে অপরের সম্পর্কে বক্তব্যের ক্ষেত্রে ধীরস্থির হওয়া উচিত, বিশেষ করে এমন বড় ইমামের ক্ষেত্রে। সম্ভবত সুলাইমানী পরবর্তী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করেছেন। সমাপ্ত [১]

[১] এখান পর্যন্ত হাফেজ ইবনে হাজার হাফেজ যাহাবীর ‘মিযান’ এর বক্তব্য হুবহু নকল করেছেন, যা অনুবাদসহ আমরা আগে পেশ করেছি (তাই অনুবাদের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই, পাঠকরা পেছনে দেখে নিতে পারেন)। হাফেজ ইবনে হাজারের এই বক্তব্যকে কোনো আপত্তি ছাড়াই নকল করা প্রকাশ করে যে তিনি হাফেজ যাহাবীর বক্তব্যের সাথে একমত। এরপর তার নিজস্ব মন্তব্য প্রমাণ করে যে তিনি ইবনে জারীর তাবারীর প্রতিরক্ষায় হাফেজ যাহাবীর চেয়েও দুই কদম এগিয়ে। হাফেজ যাহাবী তো ‘ত্বহন’ (আক্রমণ) বলছেন, হাফেজ ইবনে হাজার কসম খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। **هَذَا** হাফেজ ইবনে হাজার যাহাবীর বক্তব্যের পর নিজের মন্তব্য এভাবে পেশ করেছেন... ‘ওয়া লাও হালাফতু’ ইত্যাদি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আর আমি যদি কসম খেয়ে বলি যে, সুলাইমানি পরবর্তী ব্যক্তিকেই (মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম) উদ্দেশ্য করেছেন, তবে আমি আমার কসমে সত্যবাদী সাব্যস্ত হব। সুলাইমানি ছিলেন একজন হাফেজ এবং সুদৃঢ় আলেম। তিনি জানতেন তাঁর মস্তিষ্ক থেকে কী বের হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি এই (তাবারী) ইমামের মতো ব্যক্তির ব্যাপারে এমন মিথ্যা অপবাদ দেবেন। আল্লাহ্ আলাম। তাবারীর ওপর তাশাইয়ু-এর অভিযোগ কেবল এই কারণে লাগানো হয়েছিল যে, তিনি গাদীরে খুমের হাদিসকে সহিহ সাব্যস্ত করেছিলেন। [১]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তিনি ইমাম তাবারী রহ.-কে নির্ভরযোগ্য ইমামদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং এই বিষয়ে কসম খেতে প্রস্তুত আছেন যে, হাফেজ সুলাইমানি রহ. যে ‘মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী’কে রাফেজি বলেছেন, তিনি তাফসির ও ইতিহাসের রচয়িতা বিখ্যাত ইমাম তাবারী রহ. নন, বরং তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম তাবারী।

ইমাম তাবারী রহ.-এর ওপর কি ইমাম দারাকুতনী রহ. জারাহ করেছেন?

প্রশ্ন: ‘সুয়ালাতুস সুলামি লিদ-দারাকুতনী’-তে আছে যে, ইমাম দারাকুতনী রহ.-কে মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ‘তাকাল্লামু ফীহি বি-আনওয়া’..... অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম তাবারীর ওপর বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আরোপ করেন। এর অর্থ হলো, ইমাম দারাকুতনী রহ. তাবারীকে নির্ভরযোগ্য বলেননি বরং তাঁকে একজন মাজরুহ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন।

উত্তর: ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর বক্তব্যের অনুবাদ সঠিক করা হয়নি। সঠিক অনুবাদ হলো: ‘ওলামায়ে কেরাম তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন।’ এই শব্দগুলো দ্বারা ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর পক্ষ থেকে কোনো জারাহ মোটেও প্রমাণিত হয় না। তিনি প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর দেননি। কেবল এতটুকু বলা সমীচীন মনে করেছেন যে, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত শোনা যায়। দৃশ্যত বাগদাদে ইমাম তাবারী রহ.-এর বিরোধী গোষ্ঠী সেই সময়েও প্রভাবশালী ছিল; তাই কিছু আলেম ইমাম তাবারী রহ.-এর সমর্থক ছিলেন এবং কিছু বিরোধী। বিভিন্ন মতামতের উপস্থিতিতে ইমাম দারাকুতনী রহ. যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো উত্তর দিতে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তবে এর দ্বারা যাই হোক না কেন, এটি প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাবারী রহ. ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর দৃষ্টিতে ওয়াযযা এবং কাযযাব ছিলেন না।

[১] লিসানুল মিজান: ৫/১০০, ত. মাকতাবা নিযামিয়া হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য। তাবারীর কিছু সমালোচক এখানে হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ‘আল্লাহ্ আলাম’ থেকে এই অর্থ বের করেছেন যে, হাফেজ সাহেবও জানতেন যে তাবারী রাফেজি এবং সুলাইমানির জারাহ সঠিক, কিন্তু ইবনে হাজারের মতো বর্ণনাপ্রিয়দের নিকট তাবারীর প্রতিরক্ষা এই জন্য জরুরি ছিল যাতে বর্ণনার ভাণ্ডার হাতছাড়া না হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মনে নিজের ভুলের খটকাও ছিল, তাই শেষে ‘আল্লাহ্ আলাম’ বলে নিশ্চিত বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটি হাফেজ ইবনে হাজারের মতো সত্যবাদী আলেমের ওপর নিছক অপবাদ। যদি তিনি হাফেজ সুলাইমানির জারাহকে সঠিক মনে করতেন, তবে তিনি তাবারীর সামান্যতম প্রতিরক্ষাও করতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হাফেজ সুলাইমানির জারাহকে নিরর্থক মনে করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর প্রতি সুধারণার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন, তাই বলে দিয়েছেন যে সুলাইমানি এমন নিবুদ্ধিতার কথা কীভাবে বলতে পারেন। নিশ্চিতভাবেই তাঁর উদ্দেশ্য মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম হবে। (কিন্তু যেহেতু সুলাইমানির মনের কথা আল্লাহই ভালো জানেন) তাই সামনে ‘আল্লাহ্ আলাম’ শব্দগুলো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

যদি তারা সত্যিই এমন হতেন, তবে ইমাম দারাকুতনী (রহ.) তাদের সমালোচনা করতে কোনো দ্বিধা করতেন না। সম্ভবত সেই সময় পর্যন্ত ইমাম দারাকুতনী (রহ.) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর রচনাবলি অধ্যয়ন করেননি; তাই তিনি সতর্কতামূলক নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

তবে এটি প্রমাণিত যে, ইমাম দারাকুতনী (রহ.) শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহ পড়েছিলেন। এরপরও যদি তাঁর এই রায় হতো যে, এই ব্যক্তি জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী, তবে তিনি কখনোই তাঁর লেখা থেকে উপকৃত হতেন না এবং সত্য প্রকাশ করে দিতেন। তিনি ‘আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন’ (দুর্বল ও পরিত্যক্ত বর্ণনাকারীগণ) গ্রন্থটি এই উদ্দেশ্যেই সংকলন করেছিলেন যাতে এমন বর্ণনাকারীদের থেকে সতর্ক থাকা যায় যাদের ভুল বর্ণনাগুলো প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এই তালিকায় ইমাম তাবারী (রহ.)-কে একেবারেই অন্তর্ভুক্ত করেননি।

এর বিপরীতে, তিনি তাঁর অন্য একটি রচনা ‘আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ’-এ বহু স্থানে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন: “আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী বলেছেন”, এবং তাঁর কিতাবসমূহ থেকে উদ্ধৃতি ও মতামত গ্রহণ করেন, এমনকি কিছু ব্যক্তি সাহাবী কি না সে বিষয়েও তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করেন। [১] ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর এই নির্ভরযোগ্যতা কি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? ইমাম দারাকুতনী (রহ.) কি রাফেযী এবং মিথ্যাবাদী লোকদের বর্ণনা থেকে দলিল গ্রহণ করতেন?

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর গাদীরে খুমের হাদীসকে সহীহ বলা কি তাঁর শিয়া হওয়ার দলিল?

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর শিয়া হওয়ার সপক্ষে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) একটি অসার দলিল পেশ করেছেন, আর তা হলো তাবারী শিয়াদের ইমামত আকিদার দলিল হিসেবে ব্যবহৃত ‘গাদীরে খুমের হাদীস’-কে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর ইবারত (উদ্ধৃতি) লক্ষ্য করুন: “وَأَمَّا نَبَذَ بِالتَّشْيِيعِ، لَأَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَ غَدِيرِ خُمٍ”

“তাবারীকে শিয়া হওয়ার অপবাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ তিনি গাদীরে খুমের হাদীসকে সহীহ বলেছেন।” [২]

এই ইবারতের অনুবাদ ভুল করা হয়েছে। সঠিক অনুবাদ হলো: “ইমাম তাবারীর ওপর শিয়া হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে; কারণ...”

[১] মাসউদ বিন রাবিয়াহ বিন খালিদ আল-আশজায়ী, তিনি আহযাবের দিন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী এটি উল্লেখ করেছেন। (আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ: ১০৯/২, ত: দারুল কুতুব)।

এবং আসবাগ বিন বকর আল-নাযরী, মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ: ১১৫৫/৩)। আবু হুরায়রা আল-হারিস বিন মুয়ায বিন নুমান আল-জাফরী, তিনি নবী (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন... মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী এটি উল্লেখ করেছেন। (আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ: ৯১৮/২)।

এবং বাশীর বিন ফাহদ, আবু জাফর আল-তাবারী তাঁকে বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ-এর বংশধারায় উল্লেখ করেছেন... (আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ: ১৩০৮/৩)।

আবু হাফস নুমান বিন শিবাহ বিন মাবাদ আল-আবাসী, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন... মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী এটি উল্লেখ করেছেন। (আল-মু’তালিফ ওয়াল মুখতালিফ: ১৬৭৭/৪)।

ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইমাম তাবারী (রহ.)-কে একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম মনে করতেন। যদি তিনি তাঁকে শিয়া বা মিথ্যাবাদী মনে করতেন, তবে কখনোই তাঁর কিতাব থেকে দলিল গ্রহণ করতেন না। বিশেষ করে সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ে যেখানে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর মতো একজন কঠোর সমালোচক যখন ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর নির্ভর করেন, তখন তাঁর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো সংশয় থাকে না। (সুয়ালাত হামযা: পৃষ্ঠা ২৭৮)।

[২] লিসানুল মিজান: ১০০/৫।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

“হাদিসে গাদীরে খুমকে সহীহ সাব্যস্ত করেছিলেন।” এখন প্রশ্ন হলো, এই বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম তাবারী রহ.-এর ওপর কীভাবে অপবাদ প্রমাণিত হতে পারে?

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তো ইমাম তাবারী রহ.-এর ওপর আরোপিত অভিযোগ উল্লেখ করে তার প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে বলছেন যে, তাঁর ওপর শিয়া হওয়ার যে অভিযোগ যে কারণে লাগানো হয়েছে, সেই কারণটি কতটা দুর্বল। এই কারণের দুর্বলতা আলেমদের কাছে তো অত্যন্ত স্পষ্ট, তবে আমার মনে হয় আপনার কাছে বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে; তাই আরজ এই যে, যদি হাদিসে গাদীরে খুমকে সহীহ সাব্যস্ত করা কারো শিয়া হওয়ার দলিল হতে পারে, তবে আহলে সুন্নাহের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণও এর আওতায় চলে আসবেন, যেমন:

- (১) ইমাম তিরমিযী রহ. যিনি এটি বর্ণনা করে হাসান বলেছেন। [১]
- (২) ইমাম নাসাঈ রহ. যিনি এটি পূর্ণ আস্ত্রার সাথে পেশ করেছেন। [২]
- (৩) ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. যিনি এটি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন। [৩]
- (৪) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ.-এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রহ. যিনি তাঁর “মুসান্নাফ”-এ এটি একাধিক সনদে উল্লেখ করেছেন। [৪]
- (৫) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. যিনি এটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [৫]
- (৬) ইমাম তহাবী রহ. যিনি একে সহীহ বলে একে মিথ্যা আখ্যাদানকারীদের অকাট্য জবাব দিয়েছেন। [৬]
- (৭) হাফেজ যাহাবী রহ. যিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইমাম তাবারী রহ.-এর হাদিসে গাদীরে খুমের প্রমাণের ওপর লেখা রিসালা (পুস্তিকা) পড়ে আমি এই হাদিসের প্রবক্তা হয়ে গেছি। হাফেজ যাহাবী রহ. এই বিষয়ে নিজেও একটি রিসালা লিখে তাতে হাদিসে গাদীরে খুমের সূত্রগুলো একত্রিত করেছেন। [৭]
- (৮) খোদ হাফেজ ইবনে হাজার রহ. যাঁর কাঁধ আপনি ব্যবহার করছেন, তিনিও শিয়া হওয়ার এই অন্ধ ফতোয়ার আওতায় চলে আসবেন; কারণ তিনি “ইতহাফুল মাহারা”-তে এই হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [৮]
- এটাই নয় বরং তিনি “ফাতহুল বারী”-তে স্পষ্টভাবে বলেছেন:

اما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد اخرجه الترمذی والنسائی، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من اسانيدھا صحاح وحسان-

(যে পর্যন্ত “মান কুনতু মাওলাহ ফা-আলিউন মাওলাহ” হাদিসের সম্পর্ক, এর সূত্রগুলো অনেক বেশি, ইবনে উকদাহ এগুলোকে একটি পৃথক কিতাবে একত্রিত করেছেন এবং এর অনেক সনদ সহীহ ও হাসান।) [৯]

যদি কেউ বলে যে: “এই মুহাদিসগণ তো কেবল এই বর্ণনাটি নকল করেছেন বা বড়জোর একে সহীহ বা হাসান বলেছেন; এর দ্বারা কোনো ভুল দলিল পেশ করেননি, তাই তাঁদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই।” তবে আরজ এই যে, ইমাম তাবারী রহ.-ও এই বর্ণনার সূত্রগুলো একত্রিত করে একে কেবল সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। যদি আপনার ধারণায় তিনি কোনো ভুল দলিলও পেশ করে থাকেন, তবে তাঁর বক্তব্য থেকে প্রমাণ পেশ করুন। বুদ্ধিমানের জন্য এতটুকু জবাবই যথেষ্ট। তবে গোঁড়ামি ও জেদের কোনো ওষুধ কারো কাছে নেই।

(১) জামে তিরমিযী, হা: ৩৭১৩, বাব ফি মানাকিবে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু

(২) আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, বর্ণনা নম্বর: ৮০৮৯, ৮৩৪৩, ৮৪১২, ৮৪১৩, ৮৪১৪ (৩) সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১২১

(৪) মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হা: ৩২০৭২, ৩২০৭৮, ৩২০৯১, ৩২০৯২, ৩২১১৮, ৩২১৩২

(৫) মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, বর্ণনা নম্বর: ৬৪১, ৯৫০, ৯৬১, ১৩১১, ১৮৪৭৯ (৬) শারহ মুশকিলিল আসার, হা: ১৭৬৫

(৭) সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/২৭৭ ... এবং দ্রষ্টব্য হাফেজ যাহাবীর রিসালা: রিসালাতু তুরকি হাদিসি মান কুনতু মাওলাহ

(৮) ইতহাফুল মাহারা, হা: ২৩৮২, ১৪৭৮১, ২০৯৫২ (৯) ফাতহুল বারী: ৭/৭৪, ত: আল-মা'রিফাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — সপ্তম খণ্ড

আবু হাইয়ান আন্দালুসি কি ইমাম তাবারীকে শিয়াদের ইমাম বলেছেন?

প্রশ্ন: আন্দালুসের মহান মুফাসসির আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ অনেক গবেষণার পর আবু জাফর তাবারীর রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণামূলক তাফসীর “আল-বাহরুল মুহিত”-এ তাবারীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলে দিয়েছেন যে, তিনি ইমামি শিয়াদের একজন ইমাম ছিলেন। ইবারতটি হলো: “আবু জাফর তাবারী তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ইমামি ইমামদের একজন ছিলেন.....”

উত্তর: এটি সম্পূর্ণ ভুল অভিযোগ বরং প্রতারণা। আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ (তাফসীর ও ইতিহাসের লেখক) সম্পর্কে কখনোই এমনটি বলেননি, বরং তাঁর উদ্দেশ্য অন্য এক আবু জাফর। তাফসীরে আল-বাহরুল মুহিত-এর সঠিক পাণ্ডুলিপি থেকে, যা ডক্টর সিদকি মুহাম্মদ জামিলের গবেষণায় দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এই বিষয়টি একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। তাতে উল্লিখিত ইবারতটি এভাবে আছে: “আবু জাফর তুসী তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ইমামি ইমামদের একজন ছিলেন, আস-সিরাত (الصرات) ‘সোয়াদ’ (ص) দিয়ে কুরাইশদের ভাষা।” [১] অর্থাৎ সঠিক পাণ্ডুলিপিতে ‘আবু জাফর তুসী’ শব্দ রয়েছে। ‘আবু জাফর তাবারী’ পাণ্ডুলিপির ভুল।

ডক্টর সিদকি মুহাম্মদ জামিলের গবেষণা সঠিক কি না? তা জানার জন্য নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

- প্রথমত: আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ এখানে একটি ভাষাগত গবেষণা উদ্ধৃত করেছেন (আর স্পষ্টতই এতে রাফেজি কেন, জাহেলি যুগের সাহিত্যিকদের থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে)। আমাদের সামনে প্রশ্ন হলো, তিনি এই ভাষাগত গবেষণায় যে “আবু জাফর”-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি কি “আবু জাফর তুসী”, নাকি “আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী”? এখন আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ-এর তাফসীরের এই একই স্থানে কয়েক লাইন পরে একটি ভাষাগত আলোচনা রয়েছে, সেখানেও “আবু জাফর তুসী” লেখা পাওয়া যাবে। [২] এই সূরা ফাতিহাতেই দুই-তিন পৃষ্ঠা আগে একটি ভাষাগত আলোচনা আছে। সেখানেও “আবু জাফর তুসী” রয়েছে। [৩] এরপর এই তাফসীরেই এই দুটি ইবারত তো সত্যকে পুরোপুরি উন্মোচন করে দেয়:

১. আমি ইমামি পণ্ডিতদের মধ্য থেকে আবু জাফর তুসীর এতে একটি বড় খণ্ড দেখেছি। [৪]

২. আমি এতে আবু জাফর তুসীর একটি বড় গ্রন্থ দেখেছি, যিনি ইমামি জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তিনি তাঁর সাথীদের মতবাদকে সমর্থন করেছেন। [৫]

- দ্বিতীয়ত: ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ-এর রচনাবলি খুঁজে দেখুন, কোথাও “আস-সিরাত ‘সোয়াদ’ দিয়ে কুরাইশদের ভাষা” বা এর সমার্থক কোনো ইবারত পাওয়া যাবে না; তাই এটি সম্ভবই নয় যে আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ থেকে এই ইবারতটি উদ্ধৃত করেছেন।

- তৃতীয়ত: আবু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ যখন ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বর্ণনা করেন, তখন সেখানে “ইবনে জারীর” বা “মুহাম্মদ বিন জারীর” অথবা “শুধুমাত্র তাবারী” বলেন। “আবু জাফর তাবারী” বলেন না। পুরো তাফসীরে তাঁর এই পদ্ধতিই বজায় রয়েছে।

[১] আল-বাহরুল মুহিত: ১/৪৫

[২] আবু জাফর তুসী বলেছেন: হিজাজবাসীরা ‘সিরাত’ শব্দটিকে ‘তরিক’-এর মতো স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে। (আল-বাহরুল মুহিত: ১/৪৫, সূরা ফাতিহা)

[৩] আবু জাফর তুসী বলেছেন, এটি হুযাইল গোত্রের ভাষা। (আল-বাহরুল মুহিত: ১/৪২, সূরা ফাতিহা)

[৪] আল-বাহরুল মুহিত: ১/২৪৯... সূরা বাকারা, আয়াত: ৫৬-৫৭

[৫] আল-বাহরুল মুহিত: ৪/৬০৬, সূরা আনআম, আয়াত: ৯৫-১০০

চতুর্থত: এই তাফসীরে আবু হাইয়ান (রহ.) প্রায় তিনশ স্থানে আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্যমূলক অর্থ নির্ধারণে ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী (রহ.)-এর তাফসীর এবং তাঁর ইবারতসমূহ থেকে উপকৃত হয়েছেন। [১] এটা কীভাবে সম্ভব যে আবু হাইয়ান (রহ.) ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-কে রাফেযীদের ইমামও সাব্যস্ত করবেন এবং আবার কুরআনের উদ্দেশ্যমূলক অর্থ বুঝতে ও বোঝাতে তাঁর ওপরই ভরসা করবেন? কোনো সুন্নী কি রাফেযীর তাফসীরী বক্তব্য মেনে নিতে পারে? যদি না পারে, তবে আবু হাইয়ান (রহ.) কেন বারবার এমনটি করলেন? আর শুধু তিনিই নন, বরং হাফেজ ইবনে কাসীর, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং আল্লামা আলুসী (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো ইসলামের বড় বড় ইমামগণ নিজেদের তাফসীরসমূহে কেন এমনটি করতে থাকলেন? তাঁরা কি সবাই গোপন রাফেযী ছিলেন? এই সত্যগুলো দেখে যে কেউ বুঝতে পারে যে আবু হাইয়ান (রহ.)-এর তাফসীরে উল্লিখিত স্থানে অনুলিখনের ভুল (কিতাবতের ভুল) চলে আসছে।

আবু হাইয়ান (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এটা জানানো যে ‘আবু জাফর তুসী’ ইমামি শিয়া, কিন্তু লেখকের অসতর্কতায় (সাহায্যে কাতিব) তা ‘আবু জাফর তাবারী’ হয়ে গেছে। কিছু লোক আবু হাইয়ানের তাফসীরের অন্যান্য স্থান না দেখেই এই অনুলিখনের ভুলকে আবু হাইয়ান (রহ.)-এর দূরদর্শিতার অভাব মনে করে নিয়েছে এবং কিছু সংকীর্ণমনা লোক আবু হাইয়ান (রহ.)-এর কাঁধ ব্যবহার করে ইমাম তাবারী (রহ.)-কে ‘ইমামি’ সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

[১] “আল-বাহরুল মুহীত”-এর কয়েকটি উদাহরণের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যেগুলোতে ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর তাফসীর থেকে উপকৃত হওয়া হয়েছে:

- তাবারী বলেন: ইবলিসের কাহিনী তাদের জন্য একটি শাখা যারা বনী আদমের মধ্য থেকে তার সদৃশ, আর তারা হলো সেই ইহুদি যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁকে অস্বীকার করেছে। (১/২৪৫, আল-বাকার)
- আর অর্থ হলো, যেমন বনী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তিকে দুনিয়াতে জীবিত করা হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ কিয়ামতের দিন মৃতদের জীবিত করবেন এবং তাবারী এই মতই গ্রহণ করেছেন। (১/৪২০, আল-বাকার)
- সংক্ষেপে এটি তেমনই যেমন মুহাম্মদ বিন জারীর বলেছেন, এটি এমন একটি শব্দ যা আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করতে অপছন্দ করেছেন। (১/৫৪৩, আল-বাকার)
- তাবারী বলেন: আল্লাহ সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ইহুদিদের ‘রাযিনা’ (رأى) শব্দ গ্রহণের প্রতি তাদের পূর্ববর্তী ঝোঁক মিটে যায়। (১/৫৬০, আল-বাকার)
- তাবারী বলেন: কোনো বস্তুর প্রতি তাঁর নির্দেশ হলো ‘হয়ে যাও’ (كن)، যা অস্তিত্বের আগে বা পরে হয় না। (১/৫৮৪, আল-বাকার)
- তাবারী বলেন: আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই যার এবং আল্লাহর মাঝে এমন কোনো আশ্রয় নেই যা বর্তমান অবস্থার চেয়ে উত্তম হওয়া আবশ্যিক। (১/৬২৪, আল-বাকার)
- মুহাম্মদ বিন জারীর একেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় হাজীদের জন্য যা নিষেধ করা হয়েছে তা হলো মহান আল্লাহর বাণী: “যে ব্যক্তি তাতে হজ্জ নির্ধারণ করে নিল...” (২/২৮০, আল-বাকার)
- তম্ভা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না... ইবনে জারীর বলেন: এর অর্থ হলো সৃষ্টিজগতকে সংরক্ষণে কোনো ক্লান্তি বা ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করে না। (২/৬০৯, আল-বাকার)
- ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: মেঘমালার ওপর তাদের আমলনামা নিয়ে তাদের হিসাবের জন্য তিনি আসবেন, তাঁর আরশ আটজন ফেরেশতা বহন করবেন। (২/৩৪৪, আল-বাকার)
- ইবনে জারীর বলেন: কুরআনের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে ফয়সালা অবতীর্ণ করা হয়েছে সে বিষয়ে যে বিষয়ে দলসমূহ ও ধর্মাবলম্বীরা মতভেদ করেছিল। (৩/৬৮, আলে ইমরান)
- তোমাদের কাছে যা আছে তা বর্জন করো, ইবনে জারীর বলেন: তোমাদের পথভ্রষ্টতা বর্জন করো। (৩/৩৯৭, আলে ইমরান)
- যদি তোমরা বুঝতে পারো... ইবনে জারীর বলেন: এর অর্থ হলো যদি তোমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বুঝতে পারো। (৩/৩৯৮, আলে ইমরান)
- ইবনে জারীর বলেন: আয়াতটি ওসিয়তের ব্যাপারে সুস্পষ্ট, আর “তাদেরকে রিযিক দাও” (فَارْزُقْهُمْ) বাক্যে সর্বনামটি নিকটাত্মীয়দের দিকে ফিরেছে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং “তাদের জন্য” (لَهُمْ) সর্বনামটি এতিম ও মিসকিনদের দিকে ফিরেছে। (৩/৫২৭, আন-নিসা)
- ইবনে জারীর বলেন: তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ক্ষমা করা জায়েজ, তারা যতক্ষণ যুদ্ধ ঘোষণা না করে এবং জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি না জানায়। (৪/২০৬, আল-মায়িদা)
- ইবনে জারীর বলেন: মুসা (আ.)-এর যুগে কাউকে এমন নেয়ামত দেওয়া হয়নি যা তাদের দেওয়া হয়েছিল; তাদের জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করা, মাঝা ও সাগরওয়া অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে সুপেয় পানি বের করা এবং তাদের ওপর মেঘের ছায়া দান করার মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছিল। (৪/২১৯, আল-মায়িদা)
- ইবনে জারীর বলেন: আয়াতে এমন কোনো দলিল নেই যে, হত্যাকারী যখন হত্যা থেকে বিরত থাকে তখন নিহত ব্যক্তি কেন নিজেকে রক্ষা করেনি। (৪/২২৯, আল-মায়িদা)
- ইবনে জারীর বলেন: তিনি দুনিয়াতে দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করেছেন এবং পরকালে প্রতিদানের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করবেন। (৪/২৮৫, আল-মায়িদা)
- ইবনে জারীর বলেন: এখানে ‘হক’ বা সত্য হলেন আল্লাহ তাআলা, আর অর্থ হলো আল্লাহ তা সৃষ্টি করেননি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত, যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। (৬/১৫৬, সূরা ইউনুস)
- ইবনে জারীর বলেন: এগুলো হলো এই সূরায় বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। (৬/৬১৩, সূরা আন-নাহল)
- ইবনে জারীর বলেন: তিনি ব্যবস্থাপনায় ভুল করেন না যে সঠিক নয় এমন কিছুকে সঠিক মনে করবেন, আর যখন তিনি তা জানেন তখন তা ভুলে যান না। (৭/৩৪৭, সূরা ত্বাহা)
- ইবনে জারীর বলেন: তিনি তাদের ঈমানের উত্তরাধিকারী করেছেন, কিতাবসমূহ কুরআন অনুসরণের নির্দেশ দেয়, তাই তারা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী এবং সে অনুযায়ী আমলকারী। এর প্রমাণ হলো: “আমি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহী করেছি তা সত্য”, এরপর তিনি বলেছেন “অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি”, সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে এটি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত, কারণ উত্তরাধিকারের অর্থ হলো কোনো এক কওমের বস্তু অন্য কওমের কাছে স্থানান্তরিত হওয়া, আর তাঁর উম্মত ব্যতীত এমন কোনো উম্মত ছিল না যাদের প্রতি তাদের পূর্ববর্তী কোনো কওম থেকে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। (৯/৩২, সূরা ফাতির)
- তাবারী বলেন: আদমকে মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই সব যখন মিশ্রিত হয় তখন তা আঠালো কাদায় পরিণত হয় যা তার পার্শ্ববর্তী বস্তুর সাথে লেগে থাকে। (৯/৯৪, আস-সাফফাত)
- তাবারী উল্লেখ করেছেন: ইবনে আব্বাস বলেছেন যবেহকৃত ব্যক্তি হলেন ইসমাইল, আর ইহুদিরা দাবি করে যে তিনি ইসহাক এবং ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। (৯/১১৯, আস-সাফফাত)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

কি হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) ইমাম তাবারীকে শিয়াদের ইমাম বলেছেন?

প্রশ্ন: আপনার জবাবে পাণ্ডুলিপির ভুলের অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর সামনে তাফসীরে আল-বাহরুল মুহীত-এর যে পাণ্ডুলিপি ছিল, তাতে “আবু জাফর আত-তাবারী”-ই ছিল; এই কারণেই হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) “লিসানুল মিজান”-এ তাবারী সম্পর্কে আবু হাইয়ানের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেন: “ইমামুম মিন আইন্মাতিল ইমামিয়াহ।”

উত্তর: হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর সামনে বিদ্যমান তাফসীরে “আল-বাহরুল মুহীত”-এর পাণ্ডুলিপিতে “আবু জাফর আত-তাবারী” শব্দই থেকে থাকবে (তবেই আবু হাইয়ান (রহ.) সম্পর্কে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে)। কিন্তু আবু হাইয়ান (রহ.)-এর বক্তব্য “ইমামুম মিন আইন্মাতিল ইমামিয়াহ”-কে তিনি কি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর জরাহ করার জন্য উদ্ধৃত করেছেন নাকি এই জরাহ খণ্ডন করার জন্য?

এর হদিস হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর পুরো বক্তব্যটি দেখে পাওয়া যেতে পারে:

“আর আমাদের উস্তাদদের উস্তাদ আবু হাইয়ান সুলাইমানীর কথায় ধোঁকা খেয়েছেন। তিনি তাঁর তাফসীরের শুরুতে ‘সিরাত’ শব্দের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: আবু জাফর আত-তাবারী বলেছেন—আর তিনি ইমামিয়াদের ইমামদের মধ্য হতে একজন ইমাম—সিরাত ‘সোয়াদ’ দিয়ে কুরাইশদের ভাষা, মাসআলার শেষ পর্যন্ত। আর আমি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছি যাতে কেউ এতে বিভ্রান্ত না হয়। কেননা তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী বর্ণনাকারী ইমামগণ তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে এমন বিশেষণে বিশেষিত করেননি। মূলত তাঁর নাম, তাঁর পিতার নাম, বংশ পরিচয়, উপনাম, সমসাময়িক হওয়া এবং অধিক কিতাব রচনার সাদৃশ্য তাঁর জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে।”

“আর আমাদের উস্তাদুল আসাতিজা আবু হাইয়ানও সুলাইমানীর কথায় ধোঁকা খেয়েছেন। তিনি তাঁর তাফসীরের শুরুতে ‘সিরাত’ শব্দের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: আবু জাফর তাবারী বলেছেন—যিনি ইমামিয়াদের ইমামদের মধ্য হতে ছিলেন—যে সিরাত ‘সোয়াদ’ দিয়ে কুরাইশদের ভাষা। এরপর শেষ পর্যন্ত এই মাসআলার ওপর আলোচনা করেছেন।

আমি এ বিষয়ে এই জন্য সতর্ক করে দিয়েছি যাতে এর দ্বারা কেউ ধোঁকা না খায়। তাবারীর অবস্থা তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তীগণ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁরা তাঁর ওপর এই অভিযোগ আনেননি। তাবারীকে তাঁর নাম, বংশ, উপনাম, সমসাময়িক হওয়া এবং কিতাব রচনার আধিক্যের ক্ষেত্রে (ইবনে জারীর বিন রুস্তম)-এর সাথে সাদৃশ্য থাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।” [১]

হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর অভিযোগ আনছেন না বরং প্রতিরক্ষা করে হাফিজ সুলাইমানীর অভিযোগকে ভুল বলছেন এবং সেই সাথে আবু হাইয়ান (রহ.)-এর মতামতকে ভুল বোঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত করছেন। [২]

হাফিজ সাহেব (রহ.)-এর বক্তব্য তাঁর বর্ণনায় এতটাই স্পষ্ট যে এর ওপর আর কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

[১] লিসানুল মিজান: ৫/১০৮, ১০৯, তবা মাকতাবা নিযামিয়া হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য।

[২] সঠিক কথা হলো, ভুলটি আবু হাইয়ান (রহ.)-এর হয়নি বরং লেখকের অসতর্কতার (সাপ্তাহিক কাতিব) কারণে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর হয়েছে; কারণ তাঁর সামনে বিদ্যমান পাণ্ডুলিপিতে “আবু জাফর তাবারী” লেখা ছিল। কিন্তু যদি তাফসীরে আবু হাইয়ান অন্যান্য স্থান থেকে দেখে নেওয়া হতো তবে প্রমাণিত হতো যে, তিনি সব জায়গায় আবু জাফর তুসীকে “ইমামিয়া ফিরকা”-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাঁর থেকে ভাষাগত আলোচনায় দলিল গ্রহণ করেন, যেখানে ইবনে জারীর তাবারী থেকে তিনি বহু স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা এবং আকাইদ ও আহকামের ক্ষেত্রেও দলিল গ্রহণ করেন। যাই হোক, এই সমস্ত আলোচনা থেকে দূরে সরে যদি আমরা মেনেও নিই যে হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর ভুল বোঝাবুঝি হয়নি বরং তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী আবু হাইয়ানের ভুল হয়েছে, তবুও এই উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাবারী (রহ.)-কে যে কেউ রাফেখী বলেছে, সে ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতেই বলেছে, এবং হাফিজ ইবনে হাজার ও হাফিজ যাহাবীর মতো গবেষকগণ এই ভুল ধারণার জোরালো খণ্ডন করেছেন।

তারিখ উন্মাতে মুসলিমা

কি ইমাম তাবারী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর অভিশাপ দিয়েছেন?

প্রশ্ন: ইমাম তাবারী হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদের ওপর প্রকাশ্যে অভিশাপ দিয়েছেন। তারিখ তাবারীতে এক জায়গায় লেখা আছে: “জাফর মুয়াবিয়ার খিলাফতের মাঝামাঝি সময়ে মারা যান, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন (লা’নাহুলাহ)”। অন্য এক জায়গায় লেখা আছে: “নওফাল ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খিলাফতের সময় মদিনায় মারা যান, আল্লাহ তাদের উভয়কে অভিশাপ দিন (লা’নাহুমালাহ)”। তার এই বক্তব্যের কি কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব?

উত্তর: এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে রাখুন যাতে ইনসাফের পথ হাত থেকে ছুটে না যায়:

- প্রথমত এটি নোট করে নিন যে, এই উভয় বক্তব্য তারিখ তাবারীতে নেই, বরং অন্য একটি বই “মুনতাখাব যাইলুল মুয়াইয়্যাল”-এ রয়েছে। এটি তারিখ তাবারীর অংশ নয়। এটি ভিন্ন কথা যে, “যাইলুল মুয়াইয়্যাল” ইমাম তাবারীর রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়।
- “যাইলুল মুয়াইয়্যাল” দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে বিলুপ্ত ছিল। অনেক সময় পর এর কিছু অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সম্ভবত মূল বইয়ের এক-তৃতীয়াংশও নয়। এই অসম্পূর্ণ অংশগুলোকে কিছু প্রকাশক “মুনতাখাব যাইলুল মুয়াইয়্যাল” নামে ছেপেছেন এবং কিছু প্রকাশক এগুলোকে তারিখ তাবারীর শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে, তাবারীর এই বইটি তার মূল অবস্থায় বিলুপ্ত। প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ অংশগুলোর ক্ষেত্রেও আংশিক বিকৃতি বা করণিক ভুলের (সাওহে কাতিব) পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। [১]
- “মুনতাখাব যাইলুল মুয়াইয়্যাল”-এর প্রতিটি পাণ্ডুলিপিতে এমনটি নেই। মুয়াসসাসাতুল আ’লামী বৈরুতের সংস্করণে বক্তব্যটি এভাবে আছে: “জাফর মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের মাঝামাঝি সময়ে মারা যান”। [২] এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কিছু পাণ্ডুলিপিতে “রাযিয়াল্লাহু আনহু”-এর স্থলে “লা’নাহুলাহ” লেখা একটি করণিক ভুল। আর এটি স্পষ্ট যে এটি অত্যন্ত গুরুতর ভুল। আল্লাহই ভালো জানেন এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে।
- দ্বিতীয় বক্তব্য “নওফাল ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার খিলাফতের সময় মদিনায় মারা যান, আল্লাহ তাদের উভয়কে অভিশাপ দিন (লা’নাহুমালাহ)”। আমরা বৈরুতের সংস্করণেও এটি এভাবেই পেয়েছি। [৩] তবে এখানেও এই পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো লেখক (কাতিব) নিজে থেকে এই শব্দটি যোগ করে দিয়েছেন। এই সম্ভাবনার স্বপক্ষে যুক্তি হলো:
- ইমাম তাবারীর রচনাবলীতে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদের উল্লেখ অনেক জায়গায় রয়েছে। কোথাও তাদের নামের সাথে এই ধরনের সংযোজন আসেনি। এমনকি তাদের মধ্যে এমন কিছু বর্ণনাও রয়েছে যেখানে আবু মুখনাফের মতো বর্ণনাকারীদের সূত্রে...

[১] এই ধরনের ভুলের সম্ভাবনা প্রতিটি শাস্ত্রের বইতেই থাকে, তা ইতিহাস হোক বা হাদীস বা ফিকহ। লেখায় ভুল হওয়ার আশঙ্কা এবং অনুলিপি থেকে অনুলিপি করার সময় বক্তব্যের অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে প্রাচীন মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা হস্তান্তরের জন্য কঠোর শর্ত নির্ধারণ করেছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ উসূলে হাদীসের উৎসগুলোতে বিদ্যমান। একইভাবে ফকীহগণও আদাবুল ইফতা-র অধীনে লিখেছেন যে, মুফতিকে ফতোয়া দেওয়ার সময় মূল উৎসের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী লিখেছেন: মূল উৎসের দিকে ফিরে যাওয়া আবশ্যিক এবং মাধ্যমিক উৎসের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। আমি বলি: পরবর্তীকালের লেখকদের প্রায় বিশটি বইতে কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত হতে পারে এবং সেই বক্তব্যটি ভুল হতে পারে যা প্রথম লেখক ভুল করেছিলেন, তারপর তার পরের জন এসে তার কাছ থেকে সেটি উদ্ধৃত করেন এবং এভাবেই একে অপরের কাছ থেকে উদ্ধৃত হতে থাকে। (শারহ উকুদি রাসমিল মুফতি, পৃষ্ঠা ৩১, ৩২)। এরপর আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী এই ধরনের ভুলের উদাহরণ পেশ করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে যদিও মাধ্যমিক উৎস নয় বরং মূল উৎসের ওপর কথা হচ্ছে, তবুও পাণ্ডুলিপিতে ভুলের সম্ভাবনা তা আছেই। যার শক্তিশালী প্রমাণ আমরা পেশ করছি।

[২] আল-মুনতাখাব মিন যাইলিল মুয়াইয়্যাল, পৃষ্ঠা ৪২

[৩] আল-মুনতাখাব মিন যাইলিল মুয়াইয়্যাল, পৃষ্ঠা ৪৭

তারিখ উন্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে অনুপযুক্ত কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিছু জায়গায় ইয়াজিদের জুলুম ও মন্দ কাজের কথাও বলা হয়েছে। যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখকের ওপর আবেগ সওয়ার হতো এবং তাকে লানতের শব্দ লিখতে হতো, তবে সে অবশ্যই ওইসব স্থানে লিখত। শুধুমাত্র এমন জায়গায় লানতের শব্দ লেখার কী প্রয়োজন ছিল যেখানে জাফর বিন আবি সুফিয়ান (রা.) বা নওফেল (রা.)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, এই মৃত্যুগুলো হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বা ইয়াজিদের শাসনকালে হয়েছিল? এর সাথে যোগ করা হচ্ছে “লা’নাহুলাহ” বা “লা’নাহুমা আল্লাহ”-র। কোনো রাফেজি লেখকও সুস্থ মস্তিষ্কে নিজের কলম দিয়ে এমন বেমানান কাজ করবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে বারবার এবং প্রতিটি স্থানে এই ব্যক্তিত্বদের নামের সাথে লানত লিখতে অভ্যস্ত। সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো মানুষ, সে রাফেজিই হোক না কেন, কেন শুধুমাত্র এই এক-দুটি অপ্রাসঙ্গিক জায়গাকে এমন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করবে?

- ৪. অভিযোগকারীরাও ইমাম তাবারী (রহ.)-কে তাকিয়াবাজ বলেন, প্রকাশ্য রাফেজি নয়। তো যদি তিনি তাকিয়াবাজই হতেন, তবে তিনি কেন নিজের রহস্য ফাঁস করার জন্য এই দুটি স্থানকে নিজেই ব্যবহার করলেন? সুন্নি হওয়ার ভান করার ওপর কেন নিজেই পানি ঢেলে দিলেন?

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দগুলো লেখকের নয় বরং কোনো লিপিকারে। হতে পারে এটি লিপিকারের ভুল, আবার এটিও সম্ভব যে লিপিকার রাফেজি ছিল। সে বেমানানভাবে এই লানতের শব্দগুলো কিছু না ভেবেই কোথাও গুঁজে দিয়েছে এবং নিজের বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। পরবর্তীকালের লোকেরা একইভাবে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই তা উদ্ধৃত করতে থাকে।

- ৫. সামান্য সম্ভাবনা এও আছে যে, দ্বিতীয় ইবারত “তুউফফিয়া নওফেল বিল মাদিনাতি ফি খিলাফাতি ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া লা’নাহুমা আল্লাহ”-তে মূল শব্দ ছিল “লা’নাহুলাহ”, যাকে পরবর্তীতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা ভুলবশত “লা’নাহুমা আল্লাহ” বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন লিপিকারের ভুলে “রাদিয়াল্লাহু আনহু”-কে “লা’নাহুলাহ” বানানো প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন শুধুমাত্র “লা’নাহুলাহ”-কে “লা’নাহুমা আল্লাহ” বানানো আর এমন কী অসম্ভব। এই অবস্থায় বড়জোর এই অভিযোগ আসতে পারে যে, ইমাম তাবারী (রহ.) ইয়াজিদের ওপর লানত করেছেন।

নিশ্চিতভাবে জমহুর আহলে সুন্নাতের মনোনীত মাযহাব হলো ইয়াজিদের ওপর লানত করার ক্ষেত্রে বিরত থাকা, তবে আহলে সুন্নাতের আলেমদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এর বৈধতার প্রবক্তাও ছিলেন, যেমন আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.)-এর এর বৈধতার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র রিসালা “আর-রাদু আলাল মুতাআসসিবিল আনীদ আল-মানি’ মিন যাম্মি ইয়াজিদ” প্রসিদ্ধ।

যা-ই হোক, এটি প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাবারী (রহ.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জন্য “লা’নাহুলাহ” কখনোই লেখেননি।

- ৬. এটি লিপিকারের ভুল নাকি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর নিজের কলমের, এর ফয়সালার জন্য এতটুকু দেখে নেওয়াই যথেষ্ট যে, ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহ শতাব্দীকাল ধরে ওলামায়ে কেরামের হাতে রয়েছে। ইবনে খাল্লিকান, ইমাম নববী, হাফেজ ইবনে কাসীর, আল্লামা ইবনে খালদুন, ইবনে তাইমিয়াহ, হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ ইবনে হাজার (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ যারা কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং প্রতিটি লাইনের ওপর যাদের দৃষ্টি থাকত, তারা ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহ থেকে নিয়মিত উপকৃত হয়েছেন। যদি সত্যিই ওই সময়ের মূল পাণ্ডুলিপিগুলোতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সম্মানিত নামের সাথে “লা’নাহুলাহ” শব্দ থাকত, তবে এই সমস্ত আহলে ইলম একযোগে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর পক্ষাবলম্বন থেকে সরে আসতেন এবং তাঁর জীবনী আলোচনা করার সময় শুরুতেই তা জানিয়ে দিতেন।

যে এই ব্যক্তি একজন সাহাবীকে লানত করেছে; তাই সে রাফেযী। তার কোনো রচনা নির্ভরযোগ্য নয়।

কিন্তু কোনো একজন বুজুর্গও এমন কোনো ইবারত (উদ্ধৃতি) চিহ্নিত করেননি। যদি থাকত তবে তারা অবশ্যই করতেন। এটা তো হতে পারে না যে সাত-আট শতাব্দী পর্যন্ত একটি ইবারত কোনো বিজ্ঞ আলেমের নজরে পড়েনি। অথবা নজরে পড়েছে কিন্তু সবাই এ ব্যাপারে অপরাধমূলক নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই লানতের শব্দগুলো পরবর্তীকালের সংযোজন।

(৭) ইমাম তাবারী রহ. “তহযীবুল আসার”-এর ফিকহী আলোচনায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন। [১] কোনো রাফেযী বরং কোনো প্রকারের শিয়া হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাযি. থেকে হাদীস গ্রহণ করে নিজের মাযহাবের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে কখনোই পেশ করে না। একজন ইনসাফপ্রিয় ব্যক্তির জন্য এই একটি বিষয়ই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, ইমাম তাবারী রহ. হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাযি.-কে সেই মাকাম বা মর্যাদা দিতেন যা অন্যান্য মুসলিম ইমামগণের নিকট স্বীকৃত।

□□□

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-তাবারী এবং মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম কি একই ব্যক্তি ছিলেন নাকি দুইজন?

সওয়াল: মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ এবং মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম একই ব্যক্তির দুটি নাম। এটা কীভাবে সম্ভব যে নাম, পিতার নাম, কুনিয়াত, এলাকা পর্যন্ত এক, এমনকি রচনাগুলোতে শিয়াদের সমর্থনকারী বিষয়বস্তুও একই ধরনের। তাবারিয়ার মতো ছোট একটি শহরে যদি এই দুইজন ব্যক্তি থাকতেন, তবে নিজেদের আলাদা পরিচয়ের জন্য কিছু তো পার্থক্য রাখতেন। আর থাকল দাদার নামের পার্থক্যের কথা, তবে আমাদের বিশ্বাস যে তার দাদার নাম প্রথমে রুস্তম ছিল কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সে নাম ইয়াযীদ রেখে নিয়েছিল।

জওয়াব: এটা নিছক ভিত্তিহীন কথা। বিশেষজ্ঞগণ উভয়কে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব বলেছেন। এর দলিল হলো এই যে, শিয়া তাবারী তার কিতাবসমূহে মুহাম্মদ বিন হারুন বিন মুসা (মৃ. ৩৪৮ হি.) এবং আবুল ফজল আশ-শাইবানী (মৃ. ৩৮৫ হি.)-এর মতো শিয়া রাবীদের থেকেও রেওয়ায়েত নকল করেছেন। “দালাইলুল ইমামাহ”-তে কিছু রেওয়ায়েত আব্দুল্লাহ বিন আল-হুসাইন আল-গাযাইরী (মৃ. ৪১১ হি.) থেকেও নকল করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, শিয়া তাবারীর সময়কাল সুন্নী তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.)-এর প্রায় এক শতাব্দী পরের। আপনার এই দাবি সম্পূর্ণ ভুল যে, উভয়ের রচনাগুলোতে শিয়াদের সমর্থনকারী বিষয়বস্তু একইভাবে বিদ্যমান। শিয়া তাবারীর কিতাবসমূহ যেমন: “নাওয়াদিরুল মু’জিজাত” এবং “দালাইলুল ইমামাহ” খুলে দেখলে তাতে স্পষ্টভাবে ইসনা আশারিয়া আকিদার দাওয়াত পাওয়া যায়। সুন্নী তাবারীর কিতাবসমূহ যেমন: “সারীহুস সুন্নাহ” এবং “আত-তাবসীর ফী মা’আলিম আদ-দীন”-এ আহলে সুন্নাতে মাসলাকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

যেখানে তারীখে তাবারীর বিষয়, নিশ্চিতভাবেই এতে সহীহ, যযীফ, ভালো-মন্দ সবকিছুই জমা করা হয়েছে। শিয়ারা এর যযীফ রেওয়ায়েতগুলো নিয়ে অপবাদ আরোপ করে, পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতে এই ইতিহাসের সহীহ রেওয়ায়েতগুলো থেকে দলিল পেশ করে।

এর দ্বারা তাবারীর ওপর কোনো অপবাদ আসতে পারে না; কারণ শিয়ারা হাদীসের কিতাবসমূহেরও অনেক যযীফ রেওয়ায়েত থেকে দলিল পেশ করে থাকে, যেখানে আহলে সুন্নাতে...

[১] তহযীবুল আসার, আল-জুযউল মাফকুদ, হা: ৭৭, ১১০, ৬২৪; তহযীবুল আসার, মুসনাদে উমর, হা: ৯৩৫, ১৩৬, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪৩।

সহীহ হাদীসসমূহ নিয়ে তারা দলিল পেশ করে। শিয়াদের এ ধরনের আক্রমণের মূল জবাব হলো, আপনারা যেসব বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করছেন, সেগুলো সনদের দিক থেকে দুর্বল হওয়ার কারণে আমাদের নিকট আকিদার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা এমন অন্ধ ছিলেন না যে তারা দুইজন ভিন্ন ব্যক্তিকে এক মনে করবেন। নাম, কুনিয়াত, পিতৃপরিচয় এবং অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের বহু উদাহরণ আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে। এটি কোনো অভিনব বিষয় নয়।

আর যদি বলা হয় যে, যদি তাবারী দুইজনই হতেন তবে তাবারিয়ার মতো ছোট একটি শহরে তাদের আলাদা পরিচয় থাকা উচিত ছিল, তবে আরজ এই যে, তাদের সময়কাল ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া এই নিসবত তাবারিয়া (জর্ডানের শহর) এর দিকে নয়, বরং তাবারিস্থানের দিকে, যা একটি অত্যন্ত বিশাল এলাকা। এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইমাম তাবারীর জীবনের বড় অংশ সফরে এবং বাকি অংশ বাগদাদে অতিবাহিত হয়েছে, তাবারিস্থানে নয়।

এই ধারণা যে রুস্তমই ইসলাম গ্রহণ করে নিজের নাম ইয়াজিদ রেখেছিলেন, তা নিছক একটি কল্পনা মাত্র। মুহাম্মদ বিন জারীর সুন্নীর বংশপরম্পরা ওপর পর্যন্ত প্রমাণিত। মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াজিদ বিন কাসীর বিন গালিব। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাদার ওপরেও তার পূর্বপুরুষগণ মুসলিম ছিলেন। সুতরাং দাদার ইসলাম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ইমাম তাবারী রহ. কি আশ্বিয়া কিরামের মাসুম হওয়া এবং সাহাবা কিরামের ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে বর্ণনা জাল করেছেন?

প্রশ্ন: তাবারীর ইতিহাস ও তাফসীরে এমন কিছু বর্ণনা রয়েছে যা দ্বারা আশ্বিয়া কিরাম ও সাহাবা কিরামের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিয়া বরং রাফেযী ছিলেন। তাকিয়া করে সুন্নী সেজে ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব বর্ণনা জাল করেছেন যাতে ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বদের সীরাত ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করা যায়।

জবাব: ইমাম তাবারী রহ.-এর ওপর এই আপত্তি মূলত রেওয়ায়েত শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ণনা সংকলন ও বিন্যাসের কাজ হয়েছিল। বর্ণনাগুলো হাদীসের হোক বা ইতিহাসের, সে সম্পর্কে অধিকাংশ আলিমের লক্ষ্য ছিল যে, কোনো না কোনোভাবে স্মৃতিতে থাকা এবং মুখে মুখে প্রচলিত এই ভাণ্ডারকে কিতাবসমূহে জমা করা। যদিও কিছু মুহাদ্দিস এই বর্ণনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে উচ্চমান বজায় রেখেছিলেন যেমন ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রহ.। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ সব ধরনের সহীহ ও যঈফ বর্ণনা জমা করার ওপর নিবদ্ধ ছিল। স্পষ্টতই, আলোচনা, দলিল ও মাসআলা উদ্ভাবনের পর্যায় বর্ণনা সংগ্রহের পরেই সম্পন্ন হতে পারত। যদি এই ব্যক্তিবর্গ এই ভাণ্ডারগুলো রেখে না যেতেন, তবে পরবর্তীদের কাছে আলোচনার জন্য কী উপাদান থাকত? প্রখ্যাত গবেষক শায়খ আব্দুল ফাত্তা᠒ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর এই বক্তব্যটি প্রাধান্যযোগ্য:

“প্রাচীন মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ঐতিহাসিকদেরও এটিই রীতি ছিল। তাদের পদ্ধতি ছিল এই যে, তারা একটি অধ্যায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীস ও সংবাদ তার সনদের উল্লেখ করে তার ওপর ভিত্তি করে বর্ণনা করে দিতেন। চাই তার সনদ সহীহ না হোক, চাই তার সনদের অসারতা সম্পর্কে তাদের জানা থাকুক; কারণ এই বর্ণনাগুলোর সাথে সনদ উল্লেখ করে দেওয়া তাদের...”

তারিখুত উন্মাতিল মুসলিমাহ

জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত করে দেয়; কারণ সেই যুগে ইলমুল আসনাদ (সনদ শাস্ত্র) মানুষের মধ্যে পুরোপুরি জীবন্ত ছিল। [১]

এরপর শেখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.), ইমাম তাবারী (রহ.)-এর মানহাজ (পদ্ধতি) রক্ষায় রাফেজীদের খণ্ডনে বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব মরহুমের বরাতে নিম্নোক্ত নীতিগত কথাটি উদ্ধৃত করেছেন:

“তাবারী এবং তাঁর স্তরের নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমদের দুর্বল বর্ণনা সংগ্রহ করার উদাহরণটি বর্তমান সময়ের সেই প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তাদের মতো, যারা কোনো মামলার বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে প্রথমে সেই বিষয়ে হাতে আসা সমস্ত প্রমাণ ও সংবাদ সংগ্রহ করেন, যদিও তাঁরা জানেন যে এর মধ্যে সন্দেহজনক ও দুর্বল (বরং পরস্পরবিরোধী ও বাস্তবতাবিরোধী) বিষয়ও থাকবে (কিন্তু তাঁরা এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলোও এই ভরসায় সংগ্রহ করেন) যে প্রতিটি জিনিসকে তার নিজ নিজ গুরুত্ব ও মান অনুযায়ী পরিমাপ করা হবে।” [২]

তাই ইমাম তাবারী (রহ.) বা অন্যান্য আলেমদের বর্ণনার এমন ভাণ্ডারকে বিভ্রান্তিকর বলা গোঁড়ামি ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনাদের এটাও দেখা উচিত যে, সামগ্রিকভাবে তারিখুত তাবারীতে আশ্বিয়ায়ে কেরাম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফজিলত, মর্যাদা ও কীর্তিগাথার বর্ণনাই বেশি। সন্দেহজনক বা অগ্রহণযোগ্য বর্ণনার অনুপাত মোট বর্ণনার তুলনায় কম। এমতাবস্থায় পুরো গ্রন্থটিকেই রাফেজীদের কারসাজি বলে অভিহিত করা কীভাবে সঠিক হতে পারে?

ইমাম তাবারীর অদ্ভুত ও বিরল বর্ণনা সংগ্রহ করা কি তাঁর ভ্রান্ত আকিদা হওয়ার প্রমাণ?

প্রশ্ন: ইমাম তাবারী যদি সুন্নি হতেন, তবে তাঁর এমন কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করা উচিত ছিল না যা মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় সৃষ্টি করে। তাবারী বা অন্য কোনো সংকলনের অধিকাংশ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য এবং কিছু বর্ণনা ভুল—এ কথা বলা নিরর্থক। বিষ মিষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এর পরিমাণ মিষ্টির তুলনায় অনেক কম থাকে, তবুও কেউ তা জেনে-বুঝে খায় না। তাবারীতে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা আমরা কোনো বুদ্ধিমান মুসলমানের সামনে পেশ করলে তিনি সেগুলোকে চরম ঘৃণ্য মনে করবেন। এমন ডজন ডজন বর্ণনা রয়েছে যা কোনো মিস্বর বা জনসভায় শোনানো সম্ভব নয়। এমন কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তু নিজেই প্রমাণ করছে যে, এর সংকলক ছিলেন আজমি সাবায়ি আন্দোলনের একজন কর্মী, যিনি ইসলামের ছদ্মবেশে কাফেরদের হয়ে কাজ করেছেন। [৩]

এমন বর্ণনাগুলোকে নিজের ইতিহাসে স্থান দেওয়া তাবারীর শিয়া হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। ভুল বর্ণনার অনুপাত কম হোক বা বেশি, উভয় ক্ষেত্রেই এমন বর্ণনার সংকলন নর্দমায় ফেলে দেওয়ার এবং ডুবিয়ে দেওয়ার যোগ্য।

[১] তালীকাত শেখ আব্দুল ফাত্তাহ আলা “আল-আজউবাতুল ফাজিলা লি আসইলাতিল আশারাতিল কামিলা” লি আবিল হাসানাত আব্দুল হাই আল-লাখনভী, হাশিয়া পৃ. ৯১, ত. হলাব।

[২] তালীকাত শেখ আব্দুল ফাত্তাহ আলা “আল-আজউবাতুল ফাজিলা লি আসইলাতিল আশারাতিল কামিলা” লি আবিল হাসানাত আব্দুল হাই আল-লাখনভী, হাশিয়া পৃ. ৯১-৯২।

[৩] এরপর প্রশ্নকারী তাবারীর বেশ কিছু বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেমন জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বিবাহের বর্ণনা, সকিফা বনী সায়েদার ঘটনা, জঙ্গি সিফফিনে রদে শামসের বর্ণনা, মাসাহিফ, তাহকিমের ঘটনা... যেহেতু আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে এই বর্ণনাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, তাই এখানে প্রশ্নে সেগুলো উদ্ধৃত করার এবং প্রতিটি বর্ণনার আলাদা আলাদা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। প্রশ্নকারীর মূল দাবির একটি নীতিগত উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ امت مسلمہ

জবাব: আপনার চিন্তাধারা আমি যতটুকু বুঝেছি, তা হলো:

“এমন কোনো বর্ণনা উদ্ধৃত করা উচিত নয় যার ফলে মহান ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন হয়, অথবা যার ফলে কোনো মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।”

এর সাথে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আপনার মনে গেঁথে আছে তা হলো:

“যে এই ধরনের বর্ণনা উদ্ধৃত করে, তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি, সে ইসলামের লেবাসে ইসলামের শত্রু।”

আপনি যদি এর পরিবর্তে বলতেন যে, “কোনো বর্ণনা থেকে মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে এমন কোনো যুক্তি উপস্থাপন করা বৈধ নয় যা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল এবং ইসলামী আকিদার পরিপন্থী,” তবে তা সম্পূর্ণ সঠিক হতো। সকল আলেমই এমনটি বলে থাকেন।

কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য এটি নয়, বরং এর চেয়েও বেশি কিছু। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, যদি বর্ণনার কোনো সংকলনে সন্দেহজনক বিষয় থাকে, তবে সেই সংকলনটি বর্জনীয় এবং এর বর্ণনাকারী বা সংকলক ইসলামের শত্রু। আপনার এই মানদণ্ডে তো হাদীসের কিতাবগুলোও উত্তীর্ণ হবে না। কোনো অতি সতর্ক মুহাদ্দিসও এই মানদণ্ড সামনে রেখে হাদীস সংগ্রহ করেননি যে, তাদের সংকলিত কোনো হাদীসের কোনো অংশ থেকে কোনো সাধারণ মানুষের মনেও কোনো মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

আপনি হাদীসের যেকোনো কিতাব ব্যাখ্যা এবং উস্তাদ ছাড়া পড়লে তার লেখককেও ইমাম তাবারী রহ. -এর কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবেন। হাদীস অস্বীকারকারীরা এই ধরনের হাদীসগুলো উপস্থাপন করে মানুষকে মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে সেভাবেই বিভ্রান্ত করে, যেভাবে আপনাকে ইমাম তাবারী রহ. -এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। [১]

[১] প্রাচ্যবিদ এবং রাফেয়ীরাও এর সুযোগ নেয়। এর কয়েকটি বর্ণনা অনুবাদ ছাড়াই পেশ করা হচ্ছে যাতে সেগুলো বিকৃত না হয় এবং বিজ্ঞজনরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারেন:

- আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, আমরা খায়বারে পৌঁছলাম। যখন আল্লাহ তাঁর জন্য দুর্গটি বিজয় করে দিলেন, তখন তাঁর কাছে ছয়াই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়্যার সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো। তাঁর স্বামী নিহত হয়েছিল এবং তিনি নববধু ছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৪২১১, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খায়বার)। প্রাচ্যবিদরা তাদের বাতিল মতবাদের পক্ষে এটি দিয়ে দলিল পেশ করে।
- সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে দান করতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন, তারপর মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখলেন যে তিনি তাঁর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না, তখন তিনি বসে পড়লেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৫০৩০, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন, বাব আল-কিরাআতু আন যাহরিল কালব)। প্রাচ্যবিদরা তাদের ভুল ধারণার পক্ষে এটি দিয়ে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করুন।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক আরব মহিলার কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি আবু উসায়িদকে নির্দেশ দিলেন তাকে ডেকে পাঠাতে। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। সে আসলো এবং সায়েদাহ গোত্রের একটি বাগানে অবস্থান করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তার কাছে আসলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে এক মহিলা মাথা নিচু করে বসে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার সাথে কথা বললেন, সে বলল: আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেন: তুমি আমার থেকে এক মহান সত্তার কাছে আশ্রয় চেয়েছ। (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল আশরিবা, বাব ইবাহাতুন নাবিয)। ইসলামের শত্রুরা তাদের উত্তপ্ত অপবাদের পক্ষে এটি দিয়ে দলিল দেয়, আল্লাহ তাদের দূরে সরিয়ে দিন।
- জাবির থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলাকে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নবের কাছে আসলেন, যিনি তখন চামড়া পাকা করছিলেন। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন, তারপর সাহাবীদের কাছে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন: নিশ্চয়ই মহিলা শয়তানের রূপে সামনে আসে এবং শয়তানের রূপেই ফিরে যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোনো মহিলাকে দেখে, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এটি তার মনের কুচিন্তাকে দূর করে দেয়। (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হাজ্জ, বাব নাদবি মান রাআ ইমরাআতান ফাওয়াকাহ ফি নাফসিহি)। নাস্তিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে এটি নিয়ে কটুক্তি করে, তাদের হাত ধ্বংস হোক।

(বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার টিকায়)

তারিখ উন্মত-ই-মুসলিমাহ

যদি এই মানদণ্ড এবং এই মূলনীতিকে মেনে নেওয়া হয়, তবে ইতিহাসের বইগুলোর পালা পরে আসবে; সবার আগে হাদিসের কিতাবসমূহ এবং সেগুলোর মধ্যে সিহাহ সিত্তার সংকলকদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। কারণ এমন অনেক বর্ণনা বুখারি ও মুসলিম শরীফেও বিদ্যমান রয়েছে যে, যতক্ষণ না সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা (তাবিল) করা হয়, মানুষ বিস্মিত হতে থাকে। গুটিকয়েক নয় বরং কয়েক ডজন বর্ণনায় জটিলতা ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয় রয়েছে। এই কারণেই সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরহ) পনেরো-পনেরো খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এগুলো এমন সব জটিলতা যা হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়া সাধারণ কোনো আলেমের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো তো দুই-তিন শতাব্দী পরে লেখা হয়েছে। এর আগে কি বুখারি, মুসলিম ও তিরমিজি ইত্যাদি অনির্ভরযোগ্য ছিল? আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো না থাকত, তবে কি ইমাম বুখারি ও মুসলিমকেও ইসলামের লেবাসে মজুসিদের হাতিয়ার বানিয়ে দেওয়া হতো? আর আজ যদি তারিখ-ই-তাবারির এমন কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা হয় যাতে আপত্তিকর বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে, তবে কি আপনি আপনার অবস্থান পরিবর্তন করে ইমাম তাবারিকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে মেনে নেবেন?

আপনি যদি আপনার চিন্তাধারার পরিপন্থী বর্ণনাকারীদের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করেন, বরং তাদের সততা এমনকি ঈমান পর্যন্ত সন্দেহজনক মনে করেন, তবে শুধু ইতিহাসবিদরাই নন, বরং বড় বড় মুহাদ্দিসগণের সংকলন এবং তাদের ব্যক্তিত্বও অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়বে। যখন হাদিসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ দুটি সংকলন সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমও আপনার কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হচ্ছে না, তবে তাবারিকে মিথ্যাবাদী ও শিয়া প্রমাণ করে ইসলামের কোন প্রতিরক্ষা হবে?

চলুন, আমরা আপনার মানদণ্ড মেনে নিচ্ছি। তারিখ-ই-তাবারি এবং এর মতো সব কিতাব আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? এরপর কি আর কেউ কোনো আপত্তি তুলবে না?

বরং বিষয়টি আরও বেড়ে যাবে। রাফেজি, প্রাচ্যবিদ (মুস্তাশরিকিন), সেক্যুলার গোষ্ঠী এবং বাতিল ফেরকাগুলো বলবে যে আপনাদের হাদিস ভাণ্ডারেও এমন সব উপাদান রয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা এমন অনেক বর্ণনা পেশ করবে যেগুলোর দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি। ইমাম তাবারির মতো ইতিহাসবিদদের প্রতিরক্ষা তো এভাবেও করা যেতে পারে যে, তিনি তার কিতাবের ভূমিকায় বর্ণনাসমূহের দায়ভার থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে এই সংকলনে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সব ধরনের বর্ণনাই রয়েছে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ)

[৫] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মহিলাকে দেখলেন যা তাকে মুগ্ধ করল, এরপর তিনি সাওদা (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং তিনি সুগন্ধি তৈরি করছিলেন, তাঁর নিকট নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। এরপর বললেন: যে ব্যক্তিই কোনো মহিলাকে দেখে এবং সে তাকে মুগ্ধ করে, তবে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যায়, কেননা তার স্ত্রীর নিকটও তেমনটিই রয়েছে যা ওই মহিলার নিকট আছে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৩১০৮, কিতাবুন নিকাহ, বাবুন নজর; সুনানে দারেমি, হাদিস নং ২২৬১, সনদ হাসান)।

এর মাধ্যমে সুন্নাহর শত্রুরা তাদের কাল্পনিক কাহিনী সাজায় এবং একে অপরের কাছে চাকচিক্যময় কথা প্রকাশ করে।

[৬] ইব্রাহিম (আ.) তিনটি মিথ্যা ছাড়া আর কোনো মিথ্যা বলেননি। (সহিহ বুখারি, আহাদিসুল আশ্বিয়া, বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা: ওয়াত্তখাযাল্লাহ ইব্রাহিমা খলিলা)।

[৭] ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) এক মহিলার দিকে তাকাছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজল (রা.)-এর চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন... (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬২২৮, কিতাবুল ইস্তিযান, বাব...)।

[৮] মুসা (আ.) তার লাঠি নিয়ে পাথরটিকে আঘাত করলেন... মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলের এক দলের সামনে দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় যাচ্ছিলেন... (সহিহ বুখারি, কিতাবুল আশ্বিয়া, বাবু হাদিসিল খিজরি মাআ মুসা)। (পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য)

কিন্তু সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ, বিশেষ করে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর তো আরও তীব্রভাবে এই আপত্তি উত্থাপিত হবে যে, তাঁরা অত্যন্ত যাচাই-বাছাইয়ের সাথে শুধুমাত্র সহীহতম বর্ণনাগুলো পেশ করার দাবি করা সত্ত্বেও কেন এমন বিষয়গুলো উদ্ধৃত করলেন যা ‘না মিস্বরে শোনানো যায়, না কোনো সংবাদপত্রে ছাপানোর যোগ্য’। যদি ইমাম তাবারীর এই ধরনের বর্ণনা সংগ্রহ করা তাঁর সাবায়ী হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ কি এই ধরনের বর্ণনা নিয়ে আসার কারণে একই অপবাদের যোগ্য হবেন না?

যদি না হন, তবে এই পার্থক্যের কি কোনো যৌক্তিক কারণ আছে? এখানে মাসুম ও অ-মাসুম অথবা সাহাবী ও অ-সাহাবীর কোনো বিষয় তো নেই। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণও তো উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাবারীও। তাঁরাও আলেম ছিলেন এবং তিনিও। তাঁরাও অনারব ছিলেন এবং তিনিও। অধিকাংশ জারাহ ও তা’দীল বিশেষজ্ঞ ইমামগণ তাঁদেরও নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরও। যদি সাবায়ী হওয়ার ভিত্তি জারাহ ও তা’দীল বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর না হয়ে বরং এর মানদণ্ড সেটিই হয় যা জনাব নির্ধারণ করে রেখেছেন, তবে এই পরিমাণ আপত্তিজনক বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ কীভাবে সুন্নী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন? ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে তো এ কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁরা ঐতিহাসিক বিষয়াদি পেশ করছিলেন; তাই সতর্কতার প্রয়োজন মনে করেননি। মুহাদ্দিসদের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে এই উত্তরও দেওয়া সম্ভব নয়।

যদি বলা হয় যে, সিহাহ সিত্তার সংকলকদের প্রতি আমাদের সুধারণা রয়েছে যে, তাঁদের অজান্তে বিচ্যুতি ঘটে গেছে, ভুল কোনো মধ্যবর্তী রাবীর হয়েছে, সে নিজের পক্ষ থেকে কিছু জঘন্য শব্দ বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে এই একই ওজর ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রে কেন গ্রহণ করা যাবে না? পার্থক্যের কারণ তো তবুও কিছু থাকে না।

আর যদি বলা হয় যে, সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ বর্ণনাগুলোকে কেবল হুবহু উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে তাবারী নিজে বানিয়ে বানিয়ে বর্ণনাগুলো লিখেছেন, তবে এটি নিছক একটি প্রমাণহীন কথা এবং চরম পর্যায়ের কুধারণা। যেকোনো বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তি সিহাহ সিত্তার সংকলক এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ প্রত্যেক মহান ইমামের ব্যাপারে এমন কুধারণা পোষণ করতে পারে।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকাংশ)

[৫] আমি উসমান ইবনে আফফানকে দেখেছি, তাঁর কাছে ওয়ালীদকে আনা হলো, সে ফজরের সালাত দুই রাকাত আদায় করেছিল, এরপর বলেছিল: আমি কি আপনাদের আরও বাড়িয়ে দেব? তখন দুইজন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল: তাদের একজন হুমরান, যে সে মদ পান করেছে এবং অন্যজন তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন উসমান বললেন: সে মদ পান না করলে বমি করত না। হে আলী, ওঠো এবং তাকে দোররা মারো। (মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব হাদুল খামর)। রাফেযীরা এটি সাহাবীদের দোষত্রুটির বর্ণনায় উল্লেখ করে।

[৬] যখন নবী ﷺ-এর অসুস্থতা তীব্র হলো, তিনি বললেন: আমার কাছে একটি কাগজ নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেব যাতে তোমরা এরপর পথভ্রষ্ট না হও। উমর বললেন: নবী ﷺ-এর ওপর ব্যথার তীব্রতা প্রবল হয়েছে এবং আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব রয়েছে যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এরপর তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তিনি বললেন: তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও, আমার কাছে বিবাদ করা সমীচীন নয়। এরপর ইবনে আব্বাস এই বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, সবচেয়ে বড় বিপদ হলো সেটিই যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর লেখার মাঝে অন্তরায় হয়েছিল। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব কিতাবাতুল ইলম)। রাফেযীরা এর মাধ্যমে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসি হওয়ার দলিল পেশ করে।

[৭] ফাতিমা এই বিষয়ে আবু বকরের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এরপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলেননি। তিনি নবী ﷺ-এর পর ছয় মাস জীবিত ছিলেন। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে রাতে দাফন করলেন এবং আবু বকরকে তা জানাননি এবং তিনি (আলী) তাঁর জানাজা পড়ালেন। ফাতিমা যতদিন জীবিত ছিলেন মানুষের মাঝে আলীর মর্যাদা ছিল। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, আলী মানুষের চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তখন তিনি আবু বকরের সাথে সমঝোতা ও বায়আত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, অথচ তিনি ওই মাসগুলোতে বায়আত করেননি। (সহীহ বুখারী, হা: ৪২৪০, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খয়বর)। এর মাধ্যমে রাফেযীরা তাদের হীনম্মন্যতার দলিল পেশ করে।

[৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সদকার উটের কাছে পাঠালেন এবং বললেন: তোমরা এগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করো। (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাতি, বাব ফি বাউলি মা ইউকালু লাহমুহু)। ইবাহিয়্যাহ ও নাস্তিকরা এই বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করে যে প্রস্রাব পবিত্র, তেমনিভাবে তাদের দৃষ্টিতে মদ ও শূকরও একটি রোগ, ফলে আল্লাহ তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

(পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকায় অবশিষ্টাংশ)

ইতিহাসে উন্মতে মুসলিমা

যদি বলা হয় যে, সিহাহ সিভার সংকলকগণ কেবল বর্ণনাগুলো সংগ্রহ করেছেন, কোনো ভুল ইস্তিদলাল (দলিল পেশ) করেননি, তবে এই কথাটিই সমস্ত উলামায়ে কেরাম দীর্ঘকাল ধরে বলে আসছেন এবং আমরা শুরু থেকেই ইমাম তাবারী রহ. সম্পর্কে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি। সত্য এই যে, এছাড়া অন্য কোনো উত্তর নেই। আর এটি কোনো বানানো কথা নয় বরং এটাই বাস্তবতা।

সিহাহ সিভার সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল ইস্তিদলালযোগ্য বর্ণনাগুলোকে সুন্দর বিন্যাসের সাথে সংগ্রহ করা। ইস্তিদলাল করার কাজ সাধারণ মুসলমানদের নয়, বরং তা ছিল আইন্মায়ে মুজতাহিদ্দীন, আইন্মায়ে উসূলে দ্বীন এবং মুতাকাল্লিমীনে ইসলামের কাজ। সাধারণ মুসলমানদের তো এর যোগ্যতাই নেই। এটি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের উলামাদের কাজ ছিল এবং তারা তা সম্পন্ন করেছেন। তাদের মধ্য থেকে আকিদাগত বর্ণনাগুলো থেকে ইস্তিদলাল করে আকিদার কিতাবসমূহ আলাদাভাবে সংকলন করা হয়েছে, যেগুলোতে আহলে সুন্নাতের কোনো মাসআলায় মৌলিক মতভেদ নেই। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে আমল সম্পর্কিত হাদিসগুলোর ওপর হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী এবং হাম্বলীগণ নিজ নিজ উসূলে ইস্তিস্বাত (গবেষণার মূলনীতি) অনুযায়ী আলোচনা করেছেন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি শরয়ী বিধানকে ফিকহী ভাঙারে বিন্যস্ত করেছেন। কেউ এক বর্ণনা থেকে ইস্তিদলাল করেছেন, কেউ তার বিপরীত অন্য বর্ণনা থেকে। এছাড়া হাদিসের ভাঙারে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর ওপর কোনো মুজতাহিদের আমল নেই। বরং সেগুলোর ওপর আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম-এ রাসূল ﷺ বা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কেও এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যাবে, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ মুতাকাল্লিমীনে ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং অন্যান্য সহীহ বর্ণনা, অকাট্য প্রমাণ বা ইজমায়ে উন্মতের আলোকে সঠিক মতবাদ সাব্যস্ত করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিমের ঐ বর্ণনাগুলোর অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিছু বর্ণনার কিছু শব্দকে রাবীর ইদরাজ (সংযোজন) বা ভ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও এই বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং আজও পঠিত ও পাঠদান করা হচ্ছে। না তো রাবীদের আমানত ও দিয়ানত (সততা) নিয়ে কোনো সন্দেহ করা হয়েছে, আর না সংকলকগণকে ভুলের শিকার মনে করা হয়েছে। বর্ণনা উদ্ধৃত করা এবং ইস্তিদলাল করার মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যটি লক্ষ্য রাখা জরুরি। চাই সেই বর্ণনাগুলো হাদিস সংগ্রাহক হোক বা ঐতিহাসিক।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

- সাবরা আল-জুহানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুতআ (সাময়িক বিবাহ) করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি এবং বনী আমিরের এক ব্যক্তি বের হলাম... (সহীহ মুসলিম, হা: ৩৪৮৫, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল মুতআ)। এখানে শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিষয়টি উদ্দেশ্য।
- সুমামা বিন হাযন আল-কুশায়রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সেই ঘরে উপস্থিত ছিলাম যখন উসমান (রা.) তাদের ওপর উঁকি দিলেন এবং বললেন: তোমাদের সেই দুই সাথীকে আমার কাছে নিয়ে এসো যারা তোমাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে... (সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৭০৩, বাবু মানাকিবি উসমান রা.)।
- আবু বকর বিন হাফস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু সালামাহকে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আয়েশা (রা.)-এর ভাই তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন... (সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৫১)। রাফেযীরা এই বর্ণনাটি তালহা, যুবায়ের, উসমান এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কুৎসা রটনায় ব্যবহার করে।
- মিকদাম বিন মাদিকারিব, আমর বিন আসওয়াদ এবং বনী আসাদের এক ব্যক্তি মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে গেলেন। মুয়াবিয়া (রা.) মিকদামকে বললেন: আপনি কি জানেন যে হাসান (রা.) ইন্তেকাল করেছেন? মিকদাম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: আপনি কি একে বিপদ মনে করেন? তিনি বললেন: আমি কেন একে বিপদ মনে করব না অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের কোলে বসাতেন এবং বলতেন: এটি আমার থেকে এবং হুসাইন আলী থেকে? আসাদী বললেন... (পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু আফসোস যে আপনার কাছে এই কথার কোনো গুরুত্ব নেই যে, বর্ণনার সংকলনগুলোর ব্যাপারে উলামায়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল; বা এই সংকলনগুলোর লেখকদের ব্যাপারে জমহুর উলামার মতামত কী ছিল। এর পাশাপাশি আপনি লেখকদের এই সুযোগ দিতেও প্রস্তুত নন যে তারা কেবল বর্ণনাকারী বা সংকলক; তাই তাদের সততা নিয়ে যেন সন্দেহ না করা হয়। বরং জোর দেওয়া হচ্ছে যে, লেখক এমন সব বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যা তিনি জেনে-বুঝে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এনেছেন।

আমার আরজ এই যে, সংকীর্ণমনা চশমা চোখ থেকে সরিয়ে ফেলুন। যদি গোঁড়ামির চশমা লাগিয়ে দেখেন তবে ইতিহাসের পাতা তো দূরের কথা, ফিকহের কিতাবুত তাহারাত এবং কিতাবুন নিকাহ ও তালাকের অনেক অধ্যায়ও অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে হবে। যদি একজন সাধারণ মানুষ মেডিকেল বইয়ের ওপর ভাসাভাসা নজর বুলায় তবে সেখানেও অনেক কিছু অত্যন্ত নির্লজ্জ মনে হবে। গাইনোকোলজি মেডিকেলের একটি শাখা। এর কোনো বই আপনি আপনার সন্তানদের সামনে খুলতে পারেন না। এর বিষয়বস্তু আপনি কোনো মিস্ত্রি বা কোনো সংবাদপত্রে বর্ণনা করতে পারেন না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটি নির্লজ্জতা এবং এই শাখাটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের কোনো মুতাকাল্লিম, কোনো মুহাদ্দিস, কোনো ফকিহ, কোনো মুহাক্কিক এবং জারাহ ও তাদিলের কোনো ইমাম এই মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন না যা আপনি উম্মতের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এই মানহাজ (পদ্ধতি) অনুযায়ী সালাফদের ইলমি ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ করা রাফযি মানসিকতার মোকাবিলায় এবং মহান ঐতিহাসিকদের ওপর অপবাদ দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সফর হাদিসের ভাণ্ডারে সন্দেহ ও সংশয় এবং তারপর মুহাদ্দিসিনদের থেকে বিদআত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্পষ্ট কথা হলো, এরপর ফুকাহাদের মাসআলা-মাসায়েল, ফকিহ ও মুতাকাল্লিমদের আকিদাগত বিষয়গুলোও এই সমালোচনার আওতায় চলে আসে। এভাবে প্রচলিত ইসলামের নামে ইসলামের পুরো ইমারত ধসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আকাবিরদের উত্তরসূরির প্রতিটি যুগে জীবিত আছেন। তারা এমন ‘বিরল গবেষণা’র দাঁতভাঙা জবাবও দিয়ে থাকেন। যার ভাগ্যে হেদায়েত থাকে সে মেনে নেয়, আর যে মানে না সে নিজেরই ক্ষতি করে। কত মানুষ এই ধরনের অন্ধকার গলি দিয়ে অতিক্রম করে হাদিস অস্বীকারের গহ্বরে গিয়ে পড়েছে। দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে হিফাজত করুন এবং কামেল হেদায়েত দান করুন।

(গত পৃষ্ঠার বাকি হাশিয়া)

১. জুমাইরিয়া তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বললেন, তিনি বললেন: আজ আমি এখান থেকে নড়ব না যতক্ষণ না আমি আপনাকে এমন কিছু শোনাব যা আপনার অপছন্দ হবে এবং আপনি তা শুনবেন। তিনি বললেন: যা ইচ্ছা বলুন, যদি আপনি সত্য বলেন তবে আমি তা সত্য বলে মেনে নেব এবং যদি মিথ্যা বলেন তবে আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলব। তিনি বললেন: আমি কি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি কি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি কি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হিংস্র পশুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার ওপর আরোহণ করতে নিষেধ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই এই সব দেখেছি। মুয়াবিয়া বললেন: আমি জানতাম যে আমি আপনার হাত থেকে রেহাই পাব না হে মিকদাম। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪১৩১, বাবু ফি জুলুদিস সিবা’ ওয়ান নুমুর]

২. আমের বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান সাদকে আদেশ দিলেন এবং বললেন: আপনাকে কিসে বাধা দেয় যে আপনি আবু তুরাবকে গালি দেন না? তিনি বললেন: আমি তিনটি কথা স্মরণ করি যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তাই আমি তাকে কখনো গালি দেব না। [সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩৭২৪]

৩. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুয়াবিয়া তার কোনো এক হজে আসলেন, তখন সাদ তার কাছে প্রবেশ করলেন। লোকেরা আলীর কথা উল্লেখ করল, তখন তিনি তাকে গালি দিলেন। সাদ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: আপনি কি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে এমন কথা বলছেন যাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা’। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১২১]

রাফেজিরা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান-এর নিন্দায় এই বর্ণনাগুলো পেশ করে থাকে এবং ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’ দ্বিতীয় খণ্ডে এর যথেষ্ট জবাব দেওয়া হয়েছে।

তারিখ উম্মত মুসলিমাহ

আহদে নববী

দুর্বল ও মিথ্যাবাদীদের তালিকা এবং জাল বর্ণনার বিষয়ে ইমাম তাবারী প্রতি কোনো আপত্তি নেই

সম্মানিত পাঠকগণ! হাদীস বিশারদগণ এবং জারাহ ও তাদীল (সমালোচনা ও সংশোধন) শাস্ত্রের ইমামগণ হাদীস ভাণ্ডার, তাফসীর এবং সীরাত ও ইতিহাসের প্রতিটি দিক খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কোনো বিষয়ই বাদ দেননি। এই ব্যক্তিবর্গ দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের শনাক্ত করার জন্য বিশেষ কাজ করেছেন এবং এমন ডজন ডজন কিতাব রচনা করেছেন যাতে প্রথম পাঁচ শতাব্দীর সমস্ত দুর্বল, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বর্ণনাকারীদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ইসলামের ইমামগণ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ শনাক্ত করার জন্যও বিশেষ পরিশ্রম করেছেন এবং এমন সংকলন পেশ করেছেন যাতে পরিত্যক্ত এবং অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহ আলাদাভাবে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এই উভয় শাখায় কাজ করা ব্যক্তিদের কেউই ইমাম তাবারী (রহ.)-এর প্রতি কোনো আপত্তি তোলেননি।

দুর্বল ও মিথ্যাবাদীদের তালিকায় ইমাম তাবারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি:

জারাহ ও তাদীল বিষয়ক কিছু কিতাব তো ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সময়ের পূর্বেই লেখা হয়েছিল; তাই আমরা সেগুলোকে উপেক্ষা করে সরাসরি সেই কিতাবগুলোর দিকে আসছি যেগুলো সেই সময়ে লেখা হয়েছিল যখন ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কিতাবসমূহের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ওলামায়ে কেরামের কোনো দলই তাঁর সম্পর্কে অনবহিত ছিল না।

জারাহ ও তাদীল-এর ইমাম ইবনে আবি হাতিম আর-রাযী (রহ.) (মৃত্যু ৩২৭ হিজরী) ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তাঁর থেকে ৭ বছর পরে ইন্তেকাল করেন। তিনি ‘আল-জারাহ ওয়াত তাদীল’ গ্রন্থে প্রায় আড়াই হাজার বর্ণনাকারীর ওপর আলোচনা করেছেন এবং দুর্বল ও মিথ্যাবাদী এমনকি রাফেযীদেরও ভালো খবর নিয়েছেন কিন্তু ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর কোনো জারাহ (সমালোচনা) করেননি। অথচ ইমাম তাবারী (রহ.) যদি এত বড় পরিসরে রাফয (শিয়া মতবাদ) প্রচার করতেন, তবে তাঁর মুখোশ উন্মোচন করা ইবনে আবি হাতিম (রহ.)-এর ওপর ফরয ছিল।

খোরাসানী মুহাদিস ইবনে হিব্বান (রহ.) (মৃত্যু ৩৫৪ হিজরী), যিনি জারাহ ও তাদীল-এর ইমামও বটে, ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ৩৪ বছর পর ইন্তেকাল করেন। তিনি ‘আল-মাজরুহীন’-এ বারোশোর বেশি দুর্বল ও মিথ্যাবাদীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন কিন্তু একবারও ইমাম তাবারী (রহ.)-এর দিকে ইঙ্গিত করেননি।

ইবনে আদী (রহ.) (মৃত্যু ৩৬৫ হিজরী) রিজাল শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি নয় খণ্ডে ‘আল-কামিল ফি দুয়াফাউর রিজাল’ সংকলন করেছেন। দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের অবস্থার বর্ণনায় এই কিতাবটি এতটাই ব্যাপক যে, জারাহ ও তাদীল-এর সম্রাট ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর কাছে কেউ যখন অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন দুর্বল বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে একটি কিতাব লেখেন, তখন ইমাম দারাকুতনী (রহ.) বললেন: “তোমাদের কাছে কি ইবনে আদী-র কিতাব নেই? সেটিই যথেষ্ট। এর ওপর আর কিছু যোগ করা যায় না।” [১]

পরিশেষে কী কারণে যে দুর্বলদের সম্পর্কে এমন ব্যাপক কিতাবেও ইমাম তাবারী (রহ.)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি?

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৫৫/১৬

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

আরও মজার ব্যাপার হলো, ইবনে আদি রহ. এমন কিছু যঈফ বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন যার সনদে ‘মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী’ও রয়েছে, কিন্তু ইবনে আদি রহ. কখনোই বলেননি যে বর্ণনায় দুর্বলতার কারণ মুহাম্মদ বিন জারীর। বরং তিনি তাঁর আগের বা পরের কোনো রাবীকে দুর্বলতার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। [১]

বাগদাদের মহান সমালোচক মুহাদ্দিস ইমাম দারাকুতনী রহ. (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী) ইমাম তাবারী রহ.-এর ৭৫ বছর পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর এবং ইমাম তাবারী রহ.-এর শহর একই ছিল। যদি ইমাম তাবারী রহ. তাকিয়াবাজ রাফেযী হতেন, তবে ইমাম দারাকুতনী রহ. অবশ্যই তা ধরে ফেলতেন এবং তাঁর আসল রূপ প্রকাশ করে দিতেন। তিনি তাঁর ইলমী শাহকার ‘আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন’ সন্দেহভাজন এবং মিথ্যাবাদী রাবীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যই সংকলন করেছিলেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি ইমাম তাবারী রহ.-কে একেবারেই অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইমাম দারাকুতনী রহ.-এর সমসাময়িক ইবনে শাহীন রহ. (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী)-এর ‘তারীখুয যুয়াফা ওয়াল কাযযাবীন’-এর উদ্দেশ্যও ছিল মিথ্যাবাদী ও সন্দেহভাজন রাবীদের মুখোশ উন্মোচন করা, কিন্তু তিনিও ইমাম তাবারী রহ.-কে এই কাতারে আনেননি।

ইমাম আবু নুয়াইম আসফাহানী রহ. (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী) ইমাম তাবারী রহ.-এর একশ বিশ বছর পরের মানুষ। তিনিও যঈফ রাবীদের অবস্থা তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সংকলন ‘আয-যুয়াফা’-তে একত্রিত করেছেন, কিন্তু তিনি ইমাম তাবারী রহ.-কে এই তালিকায় মোটেও অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) ‘আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন’-এ চার হাজারের বেশি যঈফ, মিথ্যাবাদী এবং অজ্ঞাত রাবীদের অবস্থা একত্রিত করার সময় ইবনে জারীর তাবারী রহ.-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি।

হাফেজ যাহাবী রহ. (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী)-এর ‘আল-মুগনী ফীয যুয়াফা’-তেও ইমাম তাবারী রহ.-এর কোনো উল্লেখ নেই। [২]

আল্লামা ইবনে কাসিম কুতলুবুগা রহ. (মৃত্যু ৮৭৯ হিজরী) তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের (সিকাত) মধ্যে গণ্য করেছেন। [৩]

পরিশেষে, ইলমে রিজালের এই বিশেষজ্ঞরা কি জেনেশুনে ইমাম তাবারী রহ.-এর কর্মকাণ্ড গোপন করছিলেন নাকি তাঁদের জ্ঞান অপূর্ণ ছিল? যদি আসমাউর রিজালের বিশেষজ্ঞরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে একজন মিথ্যাবাদীর আসল পরিচয় গোপন করে থাকেন, তবে এই ব্যক্তিদের নিজস্ব আমানত ও বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ হয়। আর যদি তাঁরা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগতই না থাকতেন, তবে তাঁদের রিজাল শাস্ত্রের জ্ঞানের ওপর প্রশ্ন ওঠে এবং তাঁদের সংকলিত গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধতা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই ‘علم اسماء الرجال’ (ইলমে আসমাউর রিজাল)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইলমে হাদীসও আর নির্ভরযোগ্য থাকবে না।

[১] মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আদ-দারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, বিশর বিন মুহাম্মদ আস-সুককারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আহমদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ বিন ইমরান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনে আশওয়া থেকে, তিনি শা’বী থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ হিসেবে মারা যায় এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায়। শায়খ (ইবনে আদি) বলেন: এই বিশর বিন মুহাম্মদের আমি যা উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও অন্যান্য হাদীস রয়েছে, আমি আশা করি তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর আমি তাঁর যে পরিমাণ বর্ণনা উল্লেখ করেছি তা মুনকার, আমি তাঁর বর্ণনাসমূহের মধ্যে এমন কিছু দেখিনি (যা আপত্তিকর), এবং আমি আশা করি এই হাদীসগুলো তাঁর পক্ষ থেকে নয় বরং যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছে তাদের পক্ষ থেকে, আর তিনি নিজে সমস্যায়ুক্ত নন। (আল-কামিল ফী যুয়াফাইর রিজাল: ২/১৭৭)

[২] হতে পারে কোনো “মহান গবেষক” এখানে বলবেন যে, এই ব্যক্তিদের কিতাবসমূহ তো যঈফ রাবীদের অবস্থা উন্মোচন করে। ইবনে জারীর তাবারীকে এই কিতাবগুলোতে এই জন্য স্মরণ করা হয়নি যে, তিনি তো মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তো আরজ হলো, এই যুক্তি একেবারেই অসার। “আয-যুয়াফা” শিরোনামের কিতাবগুলোতে এমন রাবীদের বিবরণও বিদ্যমান যারা কেবল যঈফই ছিলেন না বরং মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালও ছিলেন।

[৩] আস-সিকাতু মিন্ন্মান লাম ইয়াকা’ ফিল কুতুবিল সিভাহ: ৮/২১৫ থেকে ২১৭, তাবা দারুন নু’মান, সানআ, ইয়েমেন, সন ১৪৩২ হিজরী।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

জাল বর্ণনা শনাক্তকারী গ্রন্থগুলোতেও ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি।

এর পাশাপাশি এই দিকটিও লক্ষ্যণীয় যে, যঈফ ও জাল বর্ণনাগুলোকে আলাদা করার জন্য মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছেন, যার ফলে প্রাচীনকাল থেকেই জাল বর্ণনাগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। এই ধরনের বিস্তারিত গ্রন্থগুলোতে জাল বর্ণনার বর্ণনার পর এটিও বলে দেওয়া হয় যে, কোন ত্রুটি বা কোন বর্ণনাকারীর কারণে একে জাল বলা হচ্ছে। জাল বর্ণনার ওপর বিদ্যমান একাধিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করেও আমরা এমন একটি বর্ণনাও পাইনি যেখানে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর কারণে জাল হওয়ার হুকুম লাগানো হয়েছে। লেখক এই সিলসিলায় নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো দেখেছেন:

১. আল-আবাতিল ওয়াল মানাকির ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহির, আল্লামা জাওরাকানি (মৃ. ৫৪৩ হিজরী)
২. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদিসিল ওয়াহিয়া, ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হিজরী)
৩. আল-মাওদুআত লি ইবনিল জাওযী
৪. আল-মাওদুআত, আল্লামা সাগানী হানাফী (মৃ. ৬৫৯ হিজরী)
৫. আল-লাআলিল মাসনুআ ফিল আহাদিসিল মাওদুআ, সুযুতী (মৃ. ৯১১ হিজরী)
৬. তানযীহুশ শারীয়াতিল মারফুআ আনিল আখবারিশ শানিআতিল মাওদুআ, আল্লামা নূরুদ্দীন কানানী (মৃ. ৯৬৩ হিজরী)
৭. তাযকিরাতুল মাওদুআত, আল্লামা তাহের পাত্তানি (মৃ. ৯৮৬ হিজরী)
৮. আল-আসরারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওদুআ, মোল্লা আলী কারী (মৃ. ১০১৪ হিজরী)
৯. আল-ফাওয়াইদুল মাওদুআ ফিল আহাদিসিল মাওদুআ, আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (মৃ. ১০৩৩ হিজরী)
১০. আল-জাদুল হাসিস ফী বায়ানি মা লাইসা বি-হাদিস, আহমদ আল-গাজ্জী আল-আমেরী (মৃ. ১১৪৩ হিজরী)
১১. আন-নুখবাতুল বাহিয়াহ ফিল আহাদিসিল মাকযুবাহ, মুহাম্মদ আমীর আল-মালিকী (মৃ. ১২২৮ হিজরী)
১২. আল-আসারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওদুআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (মৃ. ১৩০৪ হিজরী)
১৩. আল-লু'লুউল মারসূ', আবুল মাহাসিন আত-তরাবুলুসী আল-হানাফী (মৃ. ১৩০৫ হিজরী)

এই পুরো ভাঙারে এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়নি যাতে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর উদ্ধৃতিতে জাল বর্ণনার অভিযোগ আনা হয়েছে। [১]

[১] হতে পারে কোনো ব্যক্তি এই আপত্তি করবেন যে, আমরা ইলল এবং তাবাকাতের যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেগুলো মিথ্যাবাদী ঐতিহাসিক বা মিথ্যা বর্ণনাকারীদের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং সেগুলোতে 'হাদিস' শব্দের উদ্ধৃতিতে যঈফ বা মিথ্যাবাদী লোকদের পরিচয় করানো হয়েছে। কিন্তু এই আপত্তি এই কারণে ভুল যে, এই গ্রন্থগুলোতে ইতিহাস ও সীরাতের উদ্ধৃতিতে যঈফ, সন্দেহভাজন বা মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আবু মিখনাফ, হিশাম বিন সায়েব আল-কালবী, ওয়াকিদী, নাসর বিন মুযাহিম, আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী এবং মাসউদী প্রমুখ। দ্বিতীয়ত, ইমাম তাবারী (রহ.) কেবল ইতিহাসের বর্ণনাকারী নন, বরং তাঁর থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা তাঁর ফিকহী শাহকার "তাহযীবুল আসার" এবং তাঁর তাফসীরে দেখা যেতে পারে। ইমাম তাবারী (রহ.)-এর পরে সংকলিত হাদিসের একাধিক গ্রন্থে এই বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাই ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক বর্ণনাকারী হিসেবে মর্যাদা বাস্তব সত্যের পরিপন্থী নয়।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সংগ্রহেই ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.)-এর তিন বিশাল খণ্ডে রচিত ‘আল-মাওদুআত’ও রয়েছে। এই ইবনুল জাওযী (রহ.)-ই সেই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি কোনো সন্দেহ ছাড়াই ইতিহাস ও তাফসীরের রচয়িতা ইমাম মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (রহ.)-এর ওপর এই সমালোচনা উদ্ধৃত করেছেন: ‘নুসিবা ইলার রাফদ’ (তাকে রাফেযী মতাদর্শের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে) [১]। অধিকন্তু, তিনি ‘আল-মাওদুআত’-এ দুটি স্থানে এমন বর্ণনাকেও মাওদু (জাল) বলেছেন যার সনদ বা বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (রহ.) রয়েছে। কিন্তু আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, ইবনুল জাওযী (রহ.) বর্ণনার ত্রুটির জন্য অন্য কাউকে দায়ী করেছেন। ইমাম তাবারী (রহ.)-এর দিকে এমন কোনো ইঙ্গিতও করেননি যে তাঁর কারণে বর্ণনাটি সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে, ‘জাল’ করার অপবাদ দেওয়া তো দূরের কথা। [২]

আমাদের পূর্বসূরিদের সততা এমনই ছিল যে তাঁরা মতভেদ ও সমালোচনাকে নিজ সীমার মধ্যে রাখতেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) যখন ‘আল-মুনতায়াম’-এ ইমাম তাবারী (রহ.)-এর জীবনী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পেশ করেন, তখন যেখানে তাঁর ফযীলত, মর্যাদা ও কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে গুটিকয়েক ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাঁর ওপর আরোপিত দু-একটি অভিযোগকেও রেকর্ড পূর্ণ করার খাতিরে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু যেখানে জাল ও জালিয়াতির প্রশ্ন ছিল, সেই শাস্ত্রে আলোচনা করার সময় তিনি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর প্রতি ইনসাফ বজায় রেখেছেন এবং শাস্ত্রের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস, হাদীস বা তাফসীরের কোনো কিতাবে যযীফ (দুর্বল) এমনকি কিছু মাওদু (জাল) বর্ণনা উদ্ধৃত হওয়া এক কথা, আর নিজে জালকারী বা জালিয়াতি করা ভিন্ন কথা। যযীফ বর্ণনা তিরমিযী, আবু দাউদের মতো হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে আহমদে তো কিছু মাওদু বর্ণনাও বিদ্যমান। কিন্তু এতে কোনো মুহাদিসের মর্যাদায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা দেয় না। একইভাবে তাফসীরে তাবারী বা তারিখে তাবারীতে এ ধরনের বর্ণনার কারণে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর কোনো দোষ আসে না। এটি একটি কারিগরি বিষয় যা ইলম অশ্বেষী বা চিন্তাশীল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই বুঝতে পারেন। মূর্খদের বোঝানো কারো সাধ্যের কথা নয়। প্রাচীন উলামায়ে কেরাম এই পার্থক্য বুঝতেন, তাই তাঁরা প্রতিটি বিষয়কে তার নিজ স্থানে রেখেছেন; এজন্যই যযীফ বর্ণনাকারী বা মাওদুআতের ওপর লেখা ডজন ডজন কিতাবের কোনোটিতেই ইমাম তাবারী (রহ.)-কে যযীফ বা মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি।

[১] তাঁর এই সমালোচনার ওপর আলোচনা সামনে আসছে।

[২] আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন নাসির, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবদুর রহমান বিন মানদাহ, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ বিন আলী আন-নাক্বাশ, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইসহাক আস-সুনী, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওয়াহাব, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন সাদ আল-ওয়াফাসী, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন উসমান বিন আবদুর রহমান, তিনি তাঁর ফুফু আইশা বিনতে সাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: “তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কি গর্ভবতী?” এক ব্যক্তি বললেন, আমি মনে করি আমার স্ত্রী গর্ভবতী। তিনি বললেন: “যখন তুমি বাড়ি ফিরবে, তখন তার পেটে হাত রাখবে এবং তার নাম মুহাম্মদ রাখবে, কেননা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাকে পুত্র সন্তান হিসেবে দান করবেন।” এটি সহীহ হাদীস নয়। উসমান বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেছেন, সে কিছুই নয়, এবং একবার বলেছেন সে মিথ্যা বলত। ইবনুল মাদীনী তাকে পরে যযীফ বলেছেন এবং আদ-দারাকুতনী বলেছেন: মাতরুফ (পরিত্যক্ত)। (আল-মাওদুআত লি ইবনিল জাওযী: ১৫৫/১)

আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আহমদ বিন আলী বিন সাবিত, তিনি বলেন আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আহমদ বিন উমর বিন আলী আল-ক্বাযী, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল-জাহম, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন উমর বিন ইসমাইল বিন মুজালিদ, তিনি বলেন আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন ইবনু লাহীআহ, তিনি ইবনু জুরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু দারদা (রা.) থেকে, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: “মিরাজের রাতে আমি আরশে একটি সবুজ মণি দেখেছি যাতে সাদা নূর দিয়ে লেখা ছিল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আবু বকর আস-সিদ্দীক, উমর আল-ফারুক।” এটি সহীহ হাদীস নয়, এবং এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি হলো উমর বিন ইসমাইল। ইয়াহইয়া বলেছেন: সে কিছুই নয়, চরম মিথ্যাবাদী, মন্দ দাজ্জাল ও খবীস। আন-নাসায়ী ও আদ-দারাকুতনী বলেছেন: মাতরুফুল হাদীস (হাদীস বর্ণনায় পরিত্যক্ত)। (আল-মাওদুআত লি ইবনিল জাওযী: ৩২৭/১)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

যদি এটি জারহ ও তাদীল (সমালোচনা ও প্রশংসা) শাস্ত্রের ইমামদের ভুল হয়ে থাকে যা শতাব্দীকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল, তবে রিজাল শাস্ত্র (বর্ণনাকারীদের জীবনী) আর সংরক্ষিত থাকল কোথায়? তখন তো প্রত্যেক বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা তৈরি হবে যে, সে হয়তো বাস্তবে যঈফ (দুর্বল), কাযযাব (মিথ্যাবাদী) এবং জালিয়াত ছিল, কিন্তু তাকিয়াবাজ রাফেযী হওয়ার কারণে রিজাল শাস্ত্রের কিতাবগুলোতে তাকে সাদুক, সিকাহ, হাফিজ, আল্লামা এবং হুজ্জাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো ব্যক্তি কি এটা মেনে নিতে পারে? সে কি এও ভাবতে পারে যে, তাবারীকে ইমাম, সিকাহ, সাদিক এবং ফকীহ বলা জারহ ও তাদীল শাস্ত্রের ইমামগণ, তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণকারী উলামায়ে কেরাম এবং তাবারীর মতো বর্ণনা নিয়ে আসা মুহাদিসগণ—যাঁরা তাঁর প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন করা থেকে বিরত থেকেছেন—তাঁরা সবাই তাকিয়াবাজ রাফেযী ছিলেন?

আলোচনার সারসংক্ষেপ

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর সমালোচকদের কাছে আমার মৌলিক প্রশ্ন হলো, মাজরুহীন, কাযযাবীন এবং যোয়াফা সম্পর্কে জারহ ও তাদীল শাস্ত্রের ইমামগণ যে ডজন ডজন কিতাব লিখেছেন, সেগুলোর কোনো একটিতেও কি ইমাম তাবারী (রহ.) সম্পর্কে এমন কিছু লেখা আছে যে তিনি রাফেযী, কাযযাব বা জালিয়াত ছিলেন? এটা কি সম্ভব নয় যে, রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (রহ.)-এর নাম ও বংশপরিচয় এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? অথচ তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করে যে, তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে থাকে। যদি তিনি কাযযাব হতেন, তবে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে রিজাল শাস্ত্রের যাচাই-বাছাইকারী কেউ কি থাকতেন না যিনি এই রহস্য উন্মোচন করতেন? যোয়াফা ও কাযযাবীদের চিহ্নিতকারী রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ অত্যন্ত গুরুত্ব ও দায়িত্বশীলতার সাথে বলে দিতেন যে, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং তার কিতাবসমূহ থেকে কুফর ছড়িয়ে পড়ছে।

চারটি দুর্বল উদ্ধৃতি:

ইমাম তাবারী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীরা এবং বর্তমান সময়ের ‘গবেষকগণ’ তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর ওপর ‘জারহ’ করার জন্য মাত্র ‘চারটি দুর্বল’ উদ্ধৃতি পেশ করতে পেরেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সংক্ষেপে কথা হলো:

এই চারটির মধ্যে তিনটি উদ্ধৃতি এমন যে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সেগুলোতে হয় কোনো জারহ নেই, অথবা এমন কোনো প্রমাণ নেই যা নিশ্চিত করে যে, এখানে মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াজিদ তাবারী (রহ.) উদ্দেশ্য নাকি মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম তাবারী বা অন্য কেউ?

(১) প্রথম উদ্ধৃতিটি ইমাম দারাকুতনী (রহ.)-এর। তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনো জারহ করেননি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। তিনি নিজে কোনো রায় দেননি।

(২) দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি মুফাসসির আবু হাইয়ান আন্দালুসী (রহ.)-এর। যদি তিনি ইবনে জারীর তাবারীকে (প্রকৃতপক্ষে তাবারী) ‘ইমামুল আইন্মাহ’ বলেন, তবে তিনি তাঁর কিতাবে তিনশ’রও বেশি স্থানে ইবনে জারীর তাবারীর তাফসীরকে উদ্ধৃতি হিসেবে বা নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে কেন ব্যবহার করলেন? হয় তিনি সজ্ঞানে ছিলেন না, অথবা তাঁর উদ্দেশ্য আবু জাফর তাবারী ছিলেন না বরং আবু জাফর তাবারী (শীয়া) ছিলেন।

(৩) তৃতীয় উদ্ধৃতিটি হাফিজ সুলাইমানী (আহমদ বিন আলী আস-সুলাইমানী আল-বিকান্দী আল-বুখারী... ৪০৪ হিজরী)-এর, যিনি বলেছেন “কান ইয়াদাউ” (তিনি জাল করতেন)...

“রাফেযীদের জন্য” বলে তিনি ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ওপর জারাহ (সমালোচনা) করেছেন।

হাফেজ সুলাইমানী নিশ্চিতভাবেই একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থটি লভ্য নয় যে তা দেখে বোঝা যাবে তাঁর আসল শব্দগুলো কী ছিল? প্রেক্ষাপট কী ছিল? কোন প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি জারাহ করেছেন? জাল বর্ণনার কোন কোন উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন? তাঁর তিন শব্দের এই জারাহর প্রমাণ কেবল হাফেজ যাহাবী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী জারাহ ও তা’দীল শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে হাফেজ যাহাবী (রহ.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাফেজ সুলাইমানীর কোনো একটি পুস্তিকায় জারাহর এই শব্দগুলো দেখেছেন এবং (স্বাভাবিকভাবেই প্রেক্ষাপটসহই দেখে থাকবেন, এজন্যই) এই জারাহকে গুরুত্বহীন মনে করেছেন এবং পরবর্তীতে হাফেজ সুলাইমানীর এই জারাহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য “মিযানুল ইতিদাল”-এ তা উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, এই জারাহ সম্পূর্ণ ভুল।

হ্যাঁ, তবে হাফেজ সুলাইমানীর প্রতি সুধারণা বজায় রাখার জন্য এই সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন যে, এখানে মুফাসসির ও ঐতিহাসিক তাবারী উদ্দেশ্য নন, বরং ইবনে রুস্তম তাবারী উদ্দেশ্য হবেন। এই কথাটিই “লিসানুল মিযান”-এ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনিও এই জারাহকে ভুল মনে করতেন, কিন্তু সুলাইমানীর প্রতি সুধারণার সুযোগ দেওয়ার জন্য বলেছেন যে, নিশ্চিতভাবেই তাঁর উদ্দেশ্য মুহাম্মদ বিন জারীর বিন রুস্তম হবেন। কিন্তু যেহেতু সুলাইমানীর পক্ষ থেকে সুধারণার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না; তাই “ওয়াল্লাহু আ’লাম” (আল্লাহই ভালো জানেন) শব্দগুলো যোগ করে দিয়েছেন।

কিন্তু তর্কের খাতিরে ধরে নিন যে, হাফেজ সুলাইমানী কোথাও পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন যে, আমার উদ্দেশ্য এই ঐতিহাসিক তাবারীই, তবে কি উম্মাহর অন্যান্য স্তম্ভতুল্য আলেমদের বিস্তারিত প্রশংসার (তা’দীল) বিপরীতে এই একক ব্যক্তির অস্পষ্ট জারাহ যথেষ্ট হবে? [১]

ইমাম ইবনে খুযাইমাহ, আবু হামিদ আসফারাইনী, আবু ইসহাক শিরাজী, ইবনে ইউনুস মিসরী, হাফেজ খলীলী, ইবনে সালাহ, ইমাম নববী এবং হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.)-এর মতো উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ ইমাম তাবারী (রহ.)-এর প্রশংসা ও নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী, ইমাম ইবনে আদী, ইমাম ইবনে সুন্নী এবং ইমাম বায়হাকী (রহ.) তাঁর থেকে বর্ণনা গ্রহণ করছেন। মুস্তাদরাকে হাকেমে তাঁর বর্ণনাগুলোকে হাফেজ যাহাবী (রহ.) কোথাও “মুসলিম-এর শর্তানুযায়ী” এবং কোথাও “বুখারী ও মুসলিম-এর শর্তানুযায়ী” বলছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তাঁর রচনাবলীতে তাঁর হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনাগুলো স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করে চলেছেন। উম্মাহর উলামায়ে কেরাম হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ে তাঁর মতামতের ওপর ভরসা করছেন। বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতা তাঁর মতামতের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করছেন। যদি এত কিছুই পরেও কারো নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত না হয়, তবে নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ড আসলে কী?

(৪) সুনির্দিষ্টভাবে মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (রহ.)-এর ওপর জারাহ কেবল একজন আলেম ইবনে জাওয়ী (রহ.)-এর ইতিহাস গ্রন্থ “আল-মুনতায়াম”-এ (যার কমবেশি অর্ধেক উপাদান ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর বর্ণনার ওপরই নির্ভরশীল) পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করুন যে, এই জারাহটি কী?

[১] হাফেজ যাহাবীর বর্ণনায় হাফেজ সুলাইমানী এত বড় আলেম ছিলেন যে প্রতিদিন এক পারা রিসালা (পুস্তিকা) লিখে আমাদের পড়ে শোনাতেন। কিন্তু হাফেজ যাহাবী ইহাও জানাচ্ছেন যে, হাফেজ সুলাইমানী নিজের ইলম ও মাকামের (মর্যাদা) থাকা সত্ত্বেও জারাহর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ও চরমপন্থী ছিলেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) লিখেছেন: “রা’ইতু লিস-সুলাইমানী কিতাবান ফীহি হাতুন আলা কিবারিন, ফালা ইউসমাউ মিনহু মা শাদ্দা ফীহি।” অর্থাৎ “আমি সুলাইমানীর একটি কিতাব দেখেছি যাতে বড় বড় আলেমদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, সুতরাং তাঁর সেই কঠোরতা গ্রহণ করা যাবে না।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০২/১৭)। হাফেজ সুলাইমানীর রচনাবলীর মধ্যে কোনোটিই বর্তমানে পাওয়া যায় না, বরং সব নষ্ট হয়ে গেছে। আজ এগুলোর মধ্যে কোনো একটি রিসালাও অবশিষ্ট নেই। তা সত্ত্বেও এটি বড় আলেমদের আদব ও ইহতিরাম যে, তাঁরা ইলমের বরকতে এবং দ্বীনি খিদমতের করুলিয়তের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইবনে জাওযী (রহ.) মাজহুল (কর্মবাচ্য) শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন “নুবসিবা ইলার রাফদ” (তার প্রতি রাফদ-এর সম্বন্ধ করা হয়েছে)। তিনি নিজে কোনো ফয়সালা দেননি। এমনকি কারো উদ্ধৃতিও দেননি যে, শেষ পর্যন্ত এই রাফদ-এর ফয়সালা কে দিয়েছে? পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা উলামায়ে কেরাম, যেমন হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই অপবাদটি ছিল শুধুমাত্র একজন আলেম আবু বকর বিন আবি দাউদের, যা ছিল নিছক হিংসা ও বিদ্বেষপ্রসূত। [১]

অধিকন্তু, ইবনে জাওযী (রহ.) যখন নিজেই তিন খণ্ডে “আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন” লিখলেন এবং তাতে চার হাজারের বেশি যঈফ, মিথ্যুক ও মাজহুল রাবীদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করলেন, তখনও সেই তালিকায় ইবনে জারীর তাবারী (রহ.)-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন নাকি তার ওপর কোনো চাপ ছিল? অথবা তিনিও কি রাফেযীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এই সমস্ত উলামায়ে কেরাম ইমাম তাবারী (রহ.)-এর আসল রূপ গোপন করে আসছিলেন, তবে ইলমুর রিজাল সন্দেহজনক হয়ে পড়বে এবং হাদীসের ভাণ্ডার অবিশ্বস্ত হয়ে যাবে। তখন মানুষ অনিবার্যভাবে হাদীস অস্বীকারের দিকে ধাবিত হবে এবং শরয়ী বিধানের ভিত্তি শুধুমাত্র নাসসে কুরআনি ও ভাষাজ্ঞানের ওপর রাখার দাওয়াত দেবে। সে দাবি করবে যে, ইতিহাসের ভাণ্ডার নিছক মিথ্যা এবং হাদীসের ভাণ্ডার পুরোটাই সন্দেহজনক। সে কোনো হাদীসের ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের সহীহ, হাসান বা যঈফ বলাকে নিরর্থক কাজ বলে গণ্য করবে। সে রাবীদের ব্যাপারে আসহাবে জারহ ওয়া তাদীল-এর মতামতকেও গবেষণাহীন মনে করবে।

এভাবে প্রত্যেক অযোগ্য ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে যাবে যে, সে তার ত্রুটিপূর্ণ বুঝ ও সামান্য জ্ঞান নিয়ে অহংকার করে যেকোনো হাদীস প্রত্যাখ্যান করবে এবং এমনকি আকিদাগত বিষয় ও হালাল-হারামের মাসআলাগুলোতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধ মতামতকে ফালতু বলে ঘোষণা করবে। বাহ্যিকভাবে সে গবেষক সাজবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হবে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী। সে প্রতিটি সঠিক বা ভুলের মানদণ্ড তার নিজের রুচি ও অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর রাখবে এবং কিছু মানুষকে নিজের সমমনা বানিয়ে একটি নতুন ফেরকা বা দল তৈরি করবে।

এই পর্যায়ে যারা পৌঁছে যাবে তাদের কাছে হাদীস, সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। খুলাফায়ে রাশেদীনের ফযীলত ও মর্যাদা বরং তাদের নাম ও বংশ পরিচয় পর্যন্ত তাদের কাছে সন্দেহজনক হতে পারে; কারণ নাসসে কুরআনিতে ‘যায়েদ’ ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই। যখন সাহাবীদের ব্যক্তিত্বই সন্দেহজনক হয়ে পড়বে, তখন কিসের ভিত্তিতে তাদের প্রতিরক্ষা করা হবে?

দ্বীনকে কলুষমুক্ত করা এবং সাহাবীদের প্রতিরক্ষার নামে অজান্তে দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার পথে যারা পা বাড়িয়েছে, তাদের ওপর কি কিয়ামতের দিন সাহাবায়ে কেরাম খুশি হবেন? যাদের পুরো জীবন এই দ্বীনের হিফায়তের জন্য কুরবানী দিতে দিতে অতিবাহিত হয়েছে।

এটিই হলো গোমরাহীর সেই গভীর গর্ত যেখান থেকে আমরা পাঠকদের বাঁচাতে চাই। এজন্যই এই সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। ইমাম তাবারী (রহ.) আমাদের ঈমানের অংশ নন যে, আমরা নিছক তার সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে বাঁচানোর জন্য এত গুরুত্ব দেখাব। তিনি অনেক মহান উলামায়ে কেরামের মতো একজন বড় আলেম ছিলেন। তার ইলমী খিদমতের কারণে তিনি সেভাবেই শ্রদ্ধার পাত্র যেভাবে অন্যান্য সালাফ।

বিষয়টি যদি শুধুমাত্র একজন বড় আলেমের সত্তা নিয়ে হতো তবে আমরা এই আলোচনাকে এত গুরুত্ব দিতাম না, কিন্তু হচ্ছে এই যে, অনেক মানুষের...

[১] আল্লাহর কসম, তারা এটি আবু বকর মুহাম্মদ বিন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছে, যেহেতু তিনি তার বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং তার ওপর বড় বড় অপবাদ দিতেন এবং তার ওপর রাফদ-এর অপবাদ দিতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৮৪৯)

প্রথম পদক্ষেপ ইমাম তাবারী (রহ.)-এর অবমাননা, দ্বিতীয়টি সীরাত ও ইতিহাসের প্রতি অনাস্থা, তৃতীয়টি ফন-এ-রিজাল (বর্ণনাকারী শাস্ত্র)-এ সংশয় সৃষ্টি এবং চতুর্থটি হাদীস ভাণ্ডার অস্বীকার পর্যন্ত গড়াচ্ছে। অথচ এই সুন্নাহ আমাদের দ্বীনের ভিত্তি। এর হেফাজত যে কাজের ওপর নির্ভরশীল হবে, আমরা তাকে নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে আঞ্জাম দিতে থাকব। ইনশাআল্লাহ।

বিবিধ প্রশ্নাবলী

উমাইয়া আমলের ইতিহাস কি বানোয়াট এবং তাদের বিরোধী আব্বাসী খলিফাদের তত্ত্বাবধানে লিখানো হয়েছে?

প্রশ্ন: আজকাল একটি গোষ্ঠী বনু উমাইয়ার পুরো ইতিহাসকে, যা ইতিহাসের প্রচলিত উৎসগুলোতে বিদ্যমান, সন্দেহজনক বরং বানোয়াট বলে গণ্য করে। এই গোষ্ঠীর বক্তব্য হলো, ইতিহাসের সমস্ত উৎস বনু আব্বাসের আমলে সংকলিত হয়েছে যারা বনু উমাইয়ার শত্রু ছিল। তাছাড়া এই কিতাবগুলোর লেখকরা শিয়া ও রাফেযী ছিল। বনু উমাইয়ার আমলে ইতিহাসের ওপর কোনো কাজ হয়নি। পরবর্তীকালে যারা যা চেয়েছে, তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছে; তাই তাদের মুখে কোনো উমাইয়া খলিফার দিকে সম্বন্ধযুক্ত কোনো ভুল গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর: আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। এক সময় লেখক নিজেও এই দাবির দ্বারা এক পর্যায়ে প্রভাবিত ছিলেন এবং মনে করতেন যে এই দাবিতে বড় ধরনের সত্যতা থাকতে পারে, কিন্তু যখন রিজাল শাস্ত্রের গবেষণার সাথে সাথে বর্ণনাগুলো যাচাই-বাছাই করার সুযোগ হলো, তখন ধীরে ধীরে এই দাবির হাকিকত উন্মোচিত হলো এবং জানা গেল যে এই দাবি অতিরঞ্জনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ কথা হলো, বনু উমাইয়ার আমলের ইতিহাস পরবর্তী ইতিহাসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ:

- এই আমল সাধারণ আমানত ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে পরবর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম ছিল। সাধারণত মানুষ সতর্কতার সাথে কথা বর্ণনা করত।
- বর্ণনার ধারা সংক্ষিপ্ত ছিল, সনদগুলো সংরক্ষিত ছিল।
- বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবীগণও ছিলেন, যেখানে একটি বড় সংখ্যা তাবিঈন এবং তাবে-তাবিঈনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- এই আমলের ইতিহাসের বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে নববী ভবিষ্যদ্বাণী এবং আসার-এ-সাহাবা হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।
- এই আমলের অবস্থা সম্পর্কে আইন্মায়ে মুজতাহিদীনদের বাণী ও ঘটনাবলীও সংরক্ষিত আছে।
- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম খলিফা বিন খাইয়াত, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাসীন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো সমালোচক মুহাদিসগণ রিজাল শাস্ত্রের ওপর যে কাজ করেছেন, তার অধীনেও উমাইয়া আমলের অনেক মানুষের সঠিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়ে গেছে।
- উমাইয়া আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কীর্তি এবং বিয়োগান্তক ঘটনা সম্পর্কে মুহাদিস, মুতাকাল্লিম এবং ফকীহদের লেখনীর প্রভাবও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের বর্ণনার চেয়ে ভিন্ন নয়; তাই আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে সীরাত-এ-নাবাবিয়া এবং সীরাত...

খুলাফায়ে রাশেদীনের মতো বনু উমাইয়ার ইতিহাসও আমাদের কাছে পরবর্তী সময়ের অবস্থার তুলনায় অধিক সংরক্ষিত আকারে পৌঁছেছে।

এটা সত্য যে কিছু ঐতিহাসিক বা বর্ণনাকারী শিয়া, নাসিবী, কাদরী বা অন্যান্য ফেরকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটাও সঠিক যে ইতিহাসে জালিয়াতি হয়েছে এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার ভাঙারে সহীহ, যরীফ, মাওযু—সব ধরনের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস বনু উমাইয়ার হোক বা বনু আব্বাসের, তাতে হস্তক্ষেপ আংশিকভাবে হয়েছে। উমাইয়া ইতিহাসকে ঢালাওভাবে বানোয়াট দাবি করা নিছক পক্ষপাতের কারিশমা। এই কথাটি পুরোপুরি ভুল যে, “ইতিহাস সংকলনে উমাইয়া খলিফাদের কোনো অংশ নেই এবং ইতিহাসের কাজ আব্বাসী খলিফাদের যুগে শুরু হয়েছে।”

এই দাবি হাদীস অস্বীকারকারীদের সেই ভ্রান্ত ধারণার মতো যে, “হাদীস সংকলন আব্বাসী খলিফাদের যুগে হয়েছে এবং হাদীসের পুরো ভাঙার তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর সৃষ্টি; সুতরাং একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে নিসবত করা ভুল।” হাদীস অস্বীকারকারী এবং ইতিহাস অস্বীকারকারীদের মধ্যে চিন্তা ও আদর্শগত দিক থেকে খুব বেশি দূরত্ব নেই, বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এটাই বলে যে, ইতিহাস অস্বীকার করার প্রবণতার দ্বিতীয় ধাপ হাদীস অস্বীকার করার সীমানায় গিয়ে পৌঁছায়।

বাস্তবতা হলো, যেভাবে হাদীস সংরক্ষণের ধারা প্রথম হিজরী শতাব্দীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, একইভাবে ইসলামী ইতিহাস অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ, প্রাচীন সাম্রাজ্যসমূহ, আইয়ামে জাহিলিয়াতের অবস্থা, সীরাতে নববী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সীরাত সম্বলিত বর্ণনা সংরক্ষণের ও প্রচারের কাজও সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। বনু উমাইয়ার যে যে খলিফা অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের অবস্থা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীও তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীগণ অত্যন্ত আমানত ও বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করতে থাকেন। স্বয়ং উমাইয়া খলিফাগণ ইতিহাস সংরক্ষণে আগ্রহী ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে প্রতিদিন ঐতিহাসিক বর্ণনা শোনার ও শোনানোর একটি মজলিস বসত। [১] উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.) যেখানে হাদীস সংরক্ষণের কাজকে একটি অভিযান হিসেবে শুরু করেছিলেন, সেখানে ইসলামী ইতিহাস, সীরাত এবং ব্যক্তিত্বদের অবস্থা সংরক্ষণের জন্য লোকও নিযুক্ত করেছিলেন। [২]

এই বর্ণনাগুলোই ছিল যা পরবর্তীতে আব্বাসী যুগে তাবকাতে ইবনে সাদ, ফুতুহুল বুলদান, আনসাবুল আশরাফ, তারিখে খলিফা, তারিখে ইবনে আবি খাইসামা, তারিখে তাবারী এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আত-তারীখুল কাবীর ও আত-তারীখুল আওসাত-এর মতো প্রখ্যাত কিতাবসমূহের শোভা বর্ধন করেছে। এমনটি ছিল না যে দুইশ বছর পর্যন্ত ইতিহাস কোথাও সংরক্ষিত ছিল না এবং আব্বাসী যুগে হঠাৎ কিছু লেখক উঠে এসে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু কিচ্ছা-কাহিনী পূর্ববর্তী লোকদের দিকে নিসবত করে দিয়েছেন এবং নিজেদের শত্রু উমাইয়া খলিফাদের প্রাণভরে চরিত্রহনন করেছেন।

যদি এমনটি হতো, তবে সেই লেখকদের উচিত ছিল উমাইয়া খলিফাদের কেবল চরিত্রহননই করা। তাঁদের বর্ণিত রেওয়াজেতগুলোতে উমাইয়া খলিফাদের ফযীলত, স্বভাব-চরিত্র এবং গুণাবলীর কোনো অবকাশ থাকা উচিত ছিল না। বনু উমাইয়ার মধ্যে ইয়াজিদের চেয়ে বেশি কুখ্যাত শাসক আর কে হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তার কিছু গুণাবলী যেমন—বাগ্মিতা ও অলঙ্কারিতা, দানশীলতা এবং কাব্যচর্চা ইত্যাদির বর্ণনাও সংরক্ষিত রেখেছেন।

[১] মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান লিস-সাল্লাবী, পৃ. ২৪৫, বরাতে আশ-শুআবুল লামিআহ, পৃ. ৩১০

[২] মুখতাসার তারিখে দামেশক: ১১/২৪০, জীবনী: আসেম বিন উমর বিন কাতাদাহ

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

তৃতীয় অংশ

রাখুন। এছাড়া তার যুগে সংঘটিত বিজয়সমূহ এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলোকেও পূর্ণ ইনসাফের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ছিল সততার চরম পরাকাষ্ঠা, অন্যথায় ইয়াজিদের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ঝোঁকের দাবি এটাই হওয়া উচিত ছিল যে, তার কোনো গুণের কথা উল্লেখ করা হবে না এবং তার যুগের অভিযানসমূহ ও নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজগুলোকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হবে। যদি এমনটা করা হতো, তবে পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে এটা জানা কীভাবে সম্ভব হতো যে ঐতিহাসিক উপাদানে কোনো কাটছাঁট করা হয়েছে! আবার এটাও দেখুন যে, এই ইয়াজিদের পুত্র মুয়াবিয়াকে সকল ঐতিহাসিক প্রশংসাসূচক শব্দে স্মরণ করেছেন। তার কেবল গুণাবলিই বর্ণনা করেছেন। অথচ যদি তার কোনো গুণের কথা উল্লেখ না করা হতো, তবুও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য আসত না; কারণ সে শাসনের জন্য মাত্র চল্লিশ দিন সময় পেয়েছিল। এই বর্ণনাকারী এবং ঐতিহাসিকরাই বর্ণনা করেন যে, ইয়াজিদের দ্বিতীয় পুত্র খালিদ ছিলেন ইসলামি যুগের প্রথম রসায়নবিদ। অথচ ইয়াজিদের মন্দের প্রভাবকে সুদৃঢ় করার জন্য তার সন্তানদেরকেও নিকৃষ্ট হিসেবে প্রচার করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। এটাও দেখুন যে, হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও উমাইয়া ছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ কেবল তার গুণাবলিই বর্ণনা করেন। যদি সত্যিই ঐতিহাসিকগণ এমন মিথ্যাবাদী এবং বনু উমাইয়ার ব্যাপারে এমন সংকীর্ণমনা হতেন, যেমনটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে, তবে হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চরিত্রেও কিছু কলঙ্ক লেপন করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যদি সেই যুগের বর্ণনাকারীরা উমাইয়াদের ব্যাপারে এমন পক্ষপাতমূলক নীতি অবলম্বন করতেন, তবে কোনো উমাইয়া খলিফার কোনো গুণই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাত না।

এই আলোচনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই উৎসগুলোতেই খোদ আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধেও অনেক নেতিবাচক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, এই ইতিহাসগুলো আব্বাসীয় খলিফাদের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে অথবা তাদের দেওয়া নীতি অনুযায়ী লেখা হয়েছে, তবে সেগুলোতে আব্বাসীয়দের কেবল গুণাবলি ও কৃতিত্বই বর্ণনা করা হতো। তাদের জুলুম ও মন্দ দিকগুলো থাকত না। তৃতীয় দিকটি হলো, উমাইয়া শাসকদের জুলুম ও ত্রুটি-বিচ্যুতির বর্ণনা হাদিস ভাণ্ডারেও যত্রতত্র বিদ্যমান। এটাকেও কি জালিয়াতি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ঐতিহাসিকদের মতো মুহাদ্দিসগণকেও কি “আব্বাসীয় দরবারের” কেনা গোলাম হিসেবে গণ্য করা হবে? ইনসাফের কথা হলো এই যে, (কিছু পরিচিত জালিয়াত বর্ণনাকারীকে বাদ দিয়ে) প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর বর্ণনাকারীরা সাধারণভাবে সততা ও ইনসাফের সাথে কাজ করেছেন। যে কথা তাদের কাছে যেভাবে পৌঁছেছে, সনদের ধারাবাহিকতাসহ তা সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এই বর্ণনা ভাণ্ডারে জঈফ, মুনকার, মাওজু এবং পরিত্যাজ্য বর্ণনা অবশ্যই আছে, কিন্তু রেওয়ায়েত ও দেওয়াতের মূলনীতির অধীনে কোনো বর্ণনার গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয় হওয়ার ফয়সালা করা যেতে পারে। আসমাউর রিজালের সাহায্যে বর্ণনাকারী এবং সনদের মর্যাদা জানা সম্ভব। ঢালাওভাবে উমাইয়া যুগের ইতিহাসকে অবিশ্বাস্য মনে করা নিছক মূর্থতা। এটি ঠিক তেমনই, যেমন কেউ হাদিস সংকলনগুলোতে জঈফ বা মাওজু বর্ণনা দেখে পুরো হাদিস ভাণ্ডার থেকে বিমুখ হওয়ার দাওয়াত দিতে শুরু করে। সুতরাং ঐতিহাসিক উৎসগুলোর অধিকাংশ উপাদানই গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ, কিছু খলিফার অবস্থার বর্ণনায় কিছু কথা অতিরঞ্জিত। চোখ বন্ধ করে সব বর্ণনাকে একই মর্যাদা দেওয়া সংকীর্ণমনা। মানসম্মত পদ্ধতি হলো সনদের তাহকিক করা। সনদ মজবুত হলে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। দুর্বল হলে বর্ণনাটি পর্যালোচনার দাবি রাখবে। পারিপার্শ্বিক আলামত দেখে তা সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এই সময়ে যেখানে এক পক্ষ গোঁড়ামির ভিত্তিতে বনু উমাইয়াকে “কাফের ও মুনাফিক” হিসেবে প্রচার করে রেখেছে, সেখানে অন্য পক্ষ তাদের বিশ্বাসগতভাবে না হলেও কার্যত “মাসুম” (নিষ্পাপ)-এর মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে। এজন্য তারা বনু উমাইয়ার কোনো ব্যক্তির কোনো দোষ বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। ইয়াজিদ, মারওয়ান এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক কথা গ্রহণ করে নেওয়াকে তারা নিজেদের ঈমানের পরিপন্থী মনে করে। অথচ আমাদের ঈমান কেবল আশ্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে এই যে, তাঁরা মাসুম। উমাইয়া শাসকরা ফেরেশতা ছিলেন না, নবীও ছিলেন না; বরং সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে গুণাবলিও ছিল এবং দোষত্রুটিও ছিল। গুণাবলি বেশি এবং দোষ কম। তাদের মধ্যে ভালো লোকও ছিল এবং মন্দ লোকও ছিল—ভালো বেশি, মন্দ কম।

আব্বাসীয় আমলের ইতিহাসে কি তাদের দোষত্রুটি শিয়া বর্ণনাকারীরা অন্তর্ভুক্ত করেছে?

প্রশ্ন: কিছু লোক বলেন যে, আব্বাসীয় খলিফাদের জুলুম-অত্যাচার এবং মন্দ আকিদা সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো সব শিয়া বর্ণনাকারী এবং কুচক্রী ঐতিহাসিকদের ছড়ানো। আব্বাসীয়দের সাথে আলবীয়দের (আলী রা.-এর বংশধর) কোনো বিরোধ ছিল না। আলবীয়রা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি এবং আব্বাসীয়রাও তাদের ওপর কোনো জুলুম করেনি। তারা ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর ওপর কোনো জুলুম করেনি। যেহেতু আব্বাসীয় খলিফারা আহলে সুন্নাত ছিলেন, তাই ঐতিহাসিকরা, যারা কি না প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য রাফেজি ছিলেন, তাদের প্রোপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

উত্তর: এই বক্তব্যগুলো ঢালাওভাবে সঠিক নয়। আব্বাসীয় আমলের কিছু কিতাব অবশ্যই শিয়াদের সংকলিত ছিল, যেমন: তারিখ মাসউদি, তারিখ ইয়াকুবি, মাকাতিলুত তালিবিয়িন, আল-আগানি ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উৎসসমূহ যেমন: ফুতুহুল বুলদান, আনসাবুল আশরাফ এবং তারিখ তাবারী প্রথিতযশা আহলে সুন্নাত ওলামায়ে কেরাম সংকলন করেছেন। একইভাবে চার ইমামের জীবনী নিয়ে খোদ বিজ্ঞ ফকিহগণ কাজ করেছেন; তাদের মধ্যে কেউ শিয়া ছিলেন না। আর প্রচ্ছন্ন রাফেজি হওয়ার যে কথা, আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে যে কাউকে কুফর ও নিফাকের অপবাদ দেওয়া কঠিন কিছু নয়। কোনো দুর্ভাগা ব্যক্তি সিহাহ সিত্তার সংকলক এবং চার ইমামের ব্যাপারেও এমন প্রলাপ বকতে পারে। এই কথা বিশ্বের যেকোনো আলেমের ব্যাপারেই বলা যেতে পারে।

আব্বাসীয় খলিফাদের সম্পর্কে নেতিবাচক বর্ণনাগুলো কি পুরোপুরি মিথ্যা, নাকি এর অধিকাংশ অংশ সঠিক? এটি যাচাই করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি এই সব কাল্পনিক কাহিনী হতো, তবে আব্বাসীয় খলিফারা কীভাবে এই ধরনের কিতাবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে পারতেন? তারা কত নাস্তিক ও জিন্দিককে হত্যা করিয়েছেন; নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকারীদের তারা কীভাবে স্বাধীনতা দিতেন!

এই কিতাবগুলো খোদ আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেই সংকলিত হয়েছে। বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে বনু আব্বাসের আন্দোলন এবং বিজয়ের পর বিজিতদের ওপর জুলুমের উল্লেখও এতে রয়েছে। কিছু বর্ণনায় অতিরঞ্জনের উপাদান থাকতে পারে। কিছু বর্ণনা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার ভিত্তিতে বর্জন করা যেতে পারে। একইভাবে যদি কোনো বর্ণনার সনদে কোনো বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়, তবে আজও সতর্কতার দাবি হলো তা বর্জন করা। কিন্তু যেসব বর্ণনা এই ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত, সেগুলোকে বর্জন করা যায় না।

এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দেওয়া জায়েজ। আসলে কিছু লোক ইতিহাসকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সব জায়গায় সুন্দর ও ঈর্ষণীয় দেখতে চায়। এটি একটি ভুল চিন্তা; কারণ তাহলে আমাদের ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়, হুনাইন যুদ্ধের শুরুতে পিছু হটা, কারবালার ঘটনা, ফ্রান্সে আব্দুর রহমান আল-গাফেকির পরাজয় এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের বেদনাদায়ক মৃত্যুসহ সেই সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করতে হবে যাতে আমাদের জন্য গর্ব করার মতো কিছু নেই। বরং বর্তমান যুগেরও সেই সমস্ত তিক্ত সত্য অস্বীকার করতে হবে যা আমাদের সামনে এসেছে। যাতে এমন কোনো ইতিহাস সংকলিত না হতে পারে যা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়। কিন্তু এমন ইতিহাস থেকে কী অর্জিত হবে? শুধু অতীতের ওপর গর্ব করাই কি কোনো জাতির উন্নতির জন্য যথেষ্ট হতে পারে? নিজের ভুল থেকে কিছু না শেখা কি কোনো গুরুত্ব রাখে না? শিক্ষা আসলে কিসের নাম? ভুল স্বীকার না করলে তার প্রতিকারের কী উপায় হতে পারে? গোঁড়ামি এমন এক জিনিস যা সততা ও জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়। বনু উমাইয়া হোক বা বনু আব্বাস, অথবা অন্য কোনো তৃতীয় পরিবার... কারো সমর্থনে গোঁড়ামি করাও খারাপ এবং বিরোধিতায়ও।

বনু আব্বাসের যুগে আঞ্চলিক সরকারগুলোর প্রতিষ্ঠাকে কেন গ্রহণ করা হয়েছিল?

প্রশ্ন: বনু আব্বাসের যুগে খেলাফত কেন নিজের বিভক্তিকে মেনে নিয়েছিল? ছোট ছোট রাষ্ট্র কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

জবাব: প্রথমে আমাদের চারটি মৌলিক বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্য মনে রাখতে হবে:

১. খেলাফতের প্রকৃতি ২. খেলাফতের উদ্দেশ্য ৩. খেলাফতের উপাদানসমূহ ৪. খেলাফতের প্রশাসনিক বিষয়াবলি

১. খেলাফতের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন:

“খেলাফতের অর্থ হলো শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের দুনিয়াবী ও আখেরাতের প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করা।” [১]

তারপর তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন: “খেলাফত হলো দ্বীন রক্ষা এবং দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে পয়গম্বরের প্রতিনিধিত্ব।” [২]

খেলাফতের প্রকৃতি ও স্বরূপে কখনো রদবদল হতে পারে না। এর অস্তিত্ব ফরজে কেফায়া।

২. খেলাফতের উদ্দেশ্য হলো সেই সব বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী কাম্য। অর্থাৎ ইসলাম সমুন্নত হবে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে, জিহাদ জারি থাকবে, ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর হবে, দ্বীনি নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে এবং মানুষ নিরাপদ থাকবে, মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত হবে না। কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না, কোনো মুসলমান বা কোনো জিম্মির ওপরও কোনো বাড়াবাড়ি করা হবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে শরীয়তের লক্ষ্য এগুলোই। খেলাফত যেহেতু এগুলোর মাধ্যম; তাই এর সুরক্ষা বা এর পুনর্জাগরণও কাম্য। তবে আবশ্যিক হলো কোনো অবস্থাতেই যেন মূল শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহ নষ্ট না হয়। অর্থাৎ খেলাফত এবং শরয়ী উদ্দেশ্যের মধ্যে যেন কোনো বিরোধ ও সংঘাত না ঘটে। আর বাস্তবতা হলো খেলাফতের প্রকৃতি শরয়ী উদ্দেশ্যের সাথে কখনোই সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

[১] “আল-খিলাফাতু হিয়া হামলুল কাফফাতি আলা মুকতাদান নাযারিশ শারয়ী ফি মাসালিহিহিমুল আখিরাতি ওয়াদ দুনিয়াওয়িয়াতির রাজিআতি ইলাইহা।” (মুকাদিমাহ ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ২৩৯)

[২] “ফাহিয়া ফিল হাকিকতি খিলাফাতুন আন সাহিবিশ শারয়ি ফি হিরাসাতিত দ্বীনি ওয়া সিয়াসাতিত দুনিয়া বিহি।” (মুকাদিমাহ ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ২৩৯)

৩. খিলাফতের মৌলিক উপাদানগুলো হলো—খলিফা একজন হওয়া, শূরা (পরামর্শ) ব্যবস্থা, মানসিক ঐক্য (ইস্তিনাস), ন্যায়বিচার ও ইনসাফ, জিহাদ, আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার, খোদাভীতি, ইখলাস এবং আমীরের আনুগত্যের মতো বিষয়গুলো। এগুলো সর্বদা কাম্য থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহর দলিলে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে শক্তি লাভ করে তা সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, খলিফা একজন হওয়ার শর্ত এজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকে। আমীরের আনুগত্য এজন্য আবশ্যিক যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৪. খিলাফতের প্রশাসনিক বিষয় বলতে ক্ষমতা হস্তান্তর, উত্তরাধিকার (বিলায়াত-ই-আহদ), ক্ষমতার বণ্টন ইত্যাদি বোঝায়। এসব বিষয়ে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেননি, বরং এ বিষয়ে নমনীয়তা রেখে গেছেন, যার ফলে সাহাবায়ে কেরাম উপকৃত হয়েছেন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি সামনে এসেছে।

একইভাবে রাজধানী কোথায় হবে? প্রদেশগুলো কী কী হবে? সরকারি পোশাক কেমন হবে? দেশের পতাকা কেমন হবে?... এসবই প্রশাসনিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব যে, এগুলোতে রদবদলের কারণে কখনো খিলাফতকে কোনো রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে পারে অথবা পরিস্থিতির চাপে এগুলোতে পরিবর্তন আনতে হতে পারে, কিন্তু এতে খিলাফত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মর্যাদায় কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এই মৌলিক বিষয়গুলো এবং এগুলোর পার্থক্য জানার পর এটি বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে সমস্ত মুসলমানের রাজনৈতিকভাবে এক পতাকাতলে আসা, মধ্যবর্তী সীমানাগুলো মুছে যাওয়া এবং সেনাবাহিনী কেবল কুফরি বিশ্বের সীমান্তে মোতায়েন থাকা হলো ইসলামি খিলাফতের একটি আদর্শ রূপ। তবে প্রাচীন যুগের আলেমগণ ভালোভাবেই জানতেন যে, সীমানার বিস্তৃতির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খিলাফতের উদ্দেশ্যগুলো অটুট থাকা; অর্থাৎ দ্বীনের নিদর্শনসমূহ সমুন্নত থাকা, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকা, মানুষ নিরাপদ থাকা, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকা এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা। খিলাফতের সরাসরি সমস্ত মুসলিম দেশকে নিজের সামরিক শক্তির অধীনে পরিচালনা করা অথবা কিছু দেশকে করদ রাজ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা—এটি একটি প্রশাসনিক বিষয় ছিল। এটি সেই যুগের প্রচলিত রাজনীতির একটি অংশ ছিল যার ওপর ইসলাম কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। কায়সার ও কিসরার অধীনে অনেক এলাকা করদ রাজ্য হিসেবে ছিল, যেখানে শাসক স্বায়ত্তশাসিত ছিলেন এবং কেবল বার্ষিক কর (খরাজ) প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী খ্রিস্টান শাসকদের একইভাবে করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন এবং সেখানে সামরিকভাবে দখলদারিত্ব কায়েম করেননি। [১]

মুসলিম শাসকদের জন্য এই অবকাশ আরও জোরালোভাবে থাকতে পারত যে, তাদের কিছু শর্তের ভিত্তিতে স্বাধীন সরকার বজায় রাখার বা প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হবে। এর ফলে যদি খিলাফতের সামরিক চাপ কিছুটা কমে যেত, তবে তা কোনো অগ্রহণযোগ্য বিষয় ছিল না। চতুঃসীমার সম্পর্ক খিলাফতের কাঠামোর সাথে। আয়তন কমা বা বাড়া প্রতিটি যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের ঐক্য বা অনৈক্য, তাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্নতি বা অবনতি, কেন্দ্রীয় নেতার কর্মদক্ষতা, তার ওপর আস্থা বা অনাস্থা, আমীরদের সমর্থন বা বিরোধিতা এবং অধীনস্থ কর্মকর্তাদের আনুগত্য বা অবাধ্যতার ওপর নির্ভরশীল। এসব বিষয়ের ওপর সবসময় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

যদি বনু আব্বাসের যুগে খিলাফতের আয়তন কমে গিয়ে থাকে এবং মুসলিম দেশগুলোতে অনেকগুলো সরকার গঠিত হয়ে থাকে, তবে তা ছিল সেই যুগের বাস্তব পরিস্থিতির একটি...

[১] সীরাত ইবনে হিব্বান: ১/৪৬৯, তারিখুত তাবারী: ৩/১৪৪

এটি ছিল অনিবার্য প্রভাব। এর ফলে খিলাফত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অবশ্যই হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু এর অস্তিত্ব স্বগিত হয়ে যায়নি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি তখনও খিলাফত ছিল এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশের কাছে এই খিলাফত গ্রহণযোগ্য ছিল। আব্বাসী খলিফাদের উপস্থিতিতে আহলে সুন্নাতের উলামা, সুলতান এবং সাধারণ জনগণ খিলাফতের অন্য কোনো দাবিদারকে গ্রহণ করেনি। খিলাফতের অনুসারী মুসলিম দেশগুলো হোক বা খলিফার সহযোগী সুলতানগণ, সকলেই আব্বাসী রাষ্ট্রকে খিলাফত হিসেবে মানতেন। এভাবে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি অনেকাংশেই বজায় ছিল এবং খিলাফতের অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও অবশিষ্ট ছিল।

হারুনুর রশীদ এবং পরবর্তী খলিফাগণ যদি কিছু নায়েবকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে থাকেন, তবে প্রকৃতপক্ষে তারা একটি রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে কেবল খিলাফতের কাঠামোতে পরিবর্তন গ্রহণ করেছিলেন। তারা যদি এমনটি না করতেন, তবে এর পরিণতি ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের রূপ নিত। যদিও খলিফার জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শরয়ী অনুমতি ছিল, কিন্তু বনু আব্বাস যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল তা যুদ্ধ ও বিবাদের ধ্বংসলীলার চেয়ে উত্তম ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সেই খলিফাদের দূরদর্শিতা যে তারা সময়ের দাবি বুঝতে পেরেছিলেন এবং রাজনীতির প্রেক্ষাপটে শরয়ী সীমানার মধ্যে থেকে একটি সুযোগ তৈরি করে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের এভাবে টুকরো টুকরো মনে হলেও অন্যথায় পরিস্থিতি এর চেয়েও ভয়াবহ হতে পারত; কারণ মানুষের মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোনো অঞ্চলের সরকারই উন্নতি লাভ করে না। যখন সংহতি থাকে না, তখন জোরপূর্বক শাসন করা আরও বেশি ফিতনার জন্ম দিতে পারে।

আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং ফুকাহায়ে কেরামের ভূমিকা:

সওয়াল: আঞ্চলিক সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম এবং দ্বীনি বুজুর্গদের ভূমিকা ও অবস্থান কী ছিল? ইসলামে কি আলাদা আলাদা সরকার প্রতিষ্ঠা করা জায়েজ? যদি হয় তবে তার দলিল কী? আর যদি না হয় তবে সেই যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ, উলামা এবং দ্বীনি বুজুর্গদের পক্ষ থেকে এত বড় পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ কেন সামনে আসেনি?

জওয়াব: এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উলামাদের ভূমিকার পর্যালোচনা করছি। আমাদের অধ্যয়ন অনুযায়ী, সেই যুগের মহান উলামাগণ আঞ্চলিক সরকারগুলোর অস্তিত্বকে কখনো শরীয়ত বিরোধী বলেননি বরং এগুলোকে অনিবার্য পরিস্থিতির ফলাফল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই আঞ্চলিক সরকারগুলোর তিনটি রূপ ছিল:

১. যাদের খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে ছিল, যেমন তিউনিসিয়ার আগলাবি রাষ্ট্র, খোরাসানের তাহিরি রাষ্ট্র, মাওয়ারাননহরের সামানি রাষ্ট্র এবং সেলজুক সালতানাত। [২]

[১] ফিকহী আলোচনার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা উচিত।

[২] চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত এই সরকারগুলোকে ইমারত বলা হতো এবং তাদের শাসকদের আমির। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে যখন এই সরকারগুলো আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন সেগুলোকে সালতানাত বলা হতে থাকে এবং তাদের শাসকদের সুলতান বা মালিক বলা হতো। এই খিলাফতকে আমরা এক ধরনের কনফেডারেশন বলতে পারি, যার সদস্যরা তাদের প্রতিরক্ষা, সরকার গঠন, উৎপাদন এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল, কিন্তু অন্য দেশের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন ছিল না।

(২) দ্বিতীয়ত সেই সকল আমিরাত বা সালতানাতসমূহ ছিল যা বনু আব্বাসের খিলাফত থেকে স্বাধীন ছিল। সেখানে আব্বাসী খলিফার নামে খুতবাও পাঠ করা হতো না, যেমন: ইদ্রিসী রাষ্ট্র, মুরাবিতুন রাষ্ট্র, মুওয়াহহিদুন রাষ্ট্র। খলিফাদের সাথে তাদের বিবাদও চলত। কিন্তু তারা নিজেরাও খিলাফতের দাবি করেনি। তাদের শাসকরা নিজেদের আমির বা সুলতান বলিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

(৩) তৃতীয় প্রকারের সরকারগুলো ছিল সেগুলো যারা নিজেরাই খিলাফতের দাবিদার ছিল। সহীহ আকিদাহর মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে এমন উদাহরণ কেবল আন্দালুসের ছিল, যেখানে আন্দালুসের উমাইয়া শাসকরা তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে খলিফা হওয়ার দাবিদার হন। [১]

এটা বলা যেতে পারে যে, খলিফার বাইয়াত না করা বা সমান্তরাল খিলাফত কায়েমকারীরা ভুল করেছিলেন। তবে তাদের মধ্যে কিছু শাসককে স্থান ও কালের পরিস্থিতির বিচারে অপারগ বা ওজরসম্পন্ন মনে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: আন্দালুসে যে সময় তৃতীয় আবদুর রহমান খিলাফতের দাবি করেছিলেন, সেই সময় বাগদাদের খলিফারা এতটাই দুর্বল ছিলেন যে খিলাফতের রাজধানীর পরিস্থিতিও তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এভাবে অন্তত আন্দালুসবাসীদের জন্য, যারা সবসময় ইউরোপের থাবার নিচে ছিল, নিজেদের মধ্যে অরাজকতা দমনের জন্য একজন ক্ষমতাধর খলিফার কঠোর প্রয়োজন ছিল।

একইভাবে মুওয়াহহিদুনদের উত্থানের যুগে আব্বাসী খিলাফত নিজেও দুর্বল ছিল এবং সেলজুকদের আশ্রয়ে টিকে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুওয়াহহিদুনরা, যারা আফ্রিকা ও আন্দালুসে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, খলিফার কাছে বাইয়াত হয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করাকে রাজনৈতিক কৌশলের পরিপন্থী মনে করত।

দেখা যায় যে, এশিয়ায় যেখানে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে, সেখানে আব্বাসী খিলাফত সর্বসম্মত মর্যাদা লাভ করেছিল। যদি কোনো মতভেদ থেকে থাকে তবে তা ছিল আফ্রিকা ও আন্দালুসে। সেখানকার মুসলিম শাসকদের তাদের পরিস্থিতির কারণে কিছুটা অপারগ মনে করা হলেও রাজনৈতিক ভুল থেকে মুক্ত ভাবা যায় না; কারণ মুসলমানদের বিশ্বজনীন ঐক্য তখনই বজায় থাকে যখন সকল শাসক একজন খলিফার অনুগত হন, যদিও বিভিন্ন দেশ সেনাবাহিনী, রাজস্ব এবং মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত হোক না কেন, খলিফার রূপে তাদের কাছে জাতীয় ঐক্যের অন্তত একটি প্ল্যাটফর্ম অবশ্যই থাকা উচিত।

শরীয়ত মুসলমানদের ওপর যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক করেছে, আব্বাসী যুগে তা তার আসল রূপে (খিলাফতে আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ) না হলেও কোনো না কোনো স্তরে বিদ্যমান ছিল; তাই উলামা ও ফকিহগণ এর সম্মান প্রদর্শনকে জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। একদিকে তারা কোনো স্বায়ত্তশাসিত শাসককে খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেননি, আবার অন্যদিকে তারা এই ফতোয়াও দেননি যে, খলিফার ওপর সকল শাসককে তলোয়ারের জোরে পদানত করে একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করা আবশ্যিক।

এর একটি কারণ ছিল এই যে, সেই দুর্বল খলিফাদের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবই ছিল না। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, এমন ফতোয়া জারি করলে মুসলমানরা যারা আগে থেকেই অনেক বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা আরও বেশি বিবাদে জড়িয়ে পড়ত এবং রক্তপাতের নতুন দরজা খুলে যেত।

[১] এই তিন প্রকারের সরকার ছাড়াও বাতিল ফিরকাগুলোও খিলাফত ও আমিরাতের নামে নিজেদের অনেক স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করেছিল যেমন: আফ্রিকার বনু উবাইদ রাষ্ট্র, বাহরাইনে কারামিতা সরকার। তাদের খিলাফত বাতিল হওয়া একেবারেই স্পষ্ট।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সাহাবী এবং মুজতাহিদ ইমামগণের কর্মপন্থা সাক্ষী দেয় যে, যদি কোনো সময় শরয়ী উদ্দেশ্য এবং খিলাফতের প্রশাসনিক বিষয়ের মধ্যে (খিলাফতের মূল সত্তার মধ্যে নয়) সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং উদ্দেশ্যসমূহ রক্ষার জন্য খিলাফতকে কোনো নতুন রূপ গ্রহণ করতে হয় অথবা প্রশাসনিক বিষয়ে রদবদল করতে হয়, তবে তার অবকাশ রয়েছে।

এতে প্রথম উদাহরণ হলো হযরত আলী (রা.)-এর কর্মপন্থা যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বিপরীতে একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সরকার কায়েম করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) প্রথমে ঐক্যবদ্ধ ও বিশ্বজনীন খিলাফতের প্রয়োজনে তাঁদের স্বায়ত্তশাসনে রাজি ছিলেন না, যার ফলে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে রক্তপাতের ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য দিক বিবেচনা করে তাঁর মত পরিবর্তন হয় এবং তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করেন এবং চুক্তি হয় যে, উভয় পক্ষ নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করবে। এই সিদ্ধান্তের ওপর সাহাবীগণের ঐকমত্য ছিল, কেউ এই সন্ধিকে ইসলাম বিরোধী মনে করেননি। [১]

এই কথাটি নিজ স্থানে সঠিক যে, বিশ্বজনীন ও ঐক্যবদ্ধ খিলাফত একটি উচ্চ পর্যায়ের বিষয় এবং তা অর্জন বা টিকিয়ে রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত, তবে এই সময়ে মুসলমানদের রক্ত নিরাপদ রাখার যথাসম্ভব চেষ্টাও জরুরি। হযরত আলী (রা.)-এর যুগে দুটি রাষ্ট্রকে আলাদা আলাদা বৈধতা দেওয়ার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল; তাই হযরত আলী (রা.) তেমনই করেছিলেন। হযরত হাসান (রা.)-এর যুগে নিজের রাজ্য ত্যাগ করার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল; তাই হযরত হাসান (রা.) নিজের রাজ্যের অংশও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে দিয়ে তাঁকে খলিফা মেনে নিয়েছিলেন। [২]

আন্দালুস যখন আব্বাসী খিলাফত থেকে আলাদা হয়, তখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) (মৃত্যু ১৫০ হিজরি) এবং ইমাম মালিক (রহ.) (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি) জীবিত ছিলেন। তাঁরা কখনো এই ফতোয়া দেননি যে, আন্দালুস সরকারের অস্তিত্ব ইসলাম বিরোধী এবং একে পুনরায় বিশ্বজনীন খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করা ওয়াজিব। বরং এটি প্রমাণিত যে, ইমাম মালিক (রহ.) আন্দালুসের শাসক হিশাম উমাবীর প্রশংসা করতেন। হিশাম উমাবীও তাঁর এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালিক আনিয়ে সেটিকে আন্দালুসের সরকারি আইন বানিয়েছিলেন। [৩]

ইমাম মালিকের জীবদ্দশাতেই আব্বাসী খিলাফত থেকে স্বাধীন ‘দাওলাতে ইদারিসা’ ১৭২ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় বাগদাদে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র কাজী আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানী (রহ.) উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে এর ওপর কোনো সমালোচনা প্রমাণিত নয়। যদি আঞ্চলিক সরকারগুলোর মোটেও কোনো অবকাশ না থাকত, তবে এই ইমামগণ এর ওপর বাধা প্রদান করতেন এবং এই ‘রাজনৈতিক বিদআত’-এর অবৈধতা স্পষ্ট করতেন যা তাঁদের চোখের সামনে শুরু হয়েছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ ‘কিতাবুল খারাজ’ অথবা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ‘আস-সিয়ারুল কাবীর’-এর মতো গ্রন্থগুলোতেও, যেগুলোর বিষয়বস্তুই ছিল ইসলামী রাজনীতি, এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের অবৈধতার কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম শাফিঈ (রহ.) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সামনে আরও অনেক এলাকা ইসলামী খিলাফত থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খিলাফতের শরয়ী অবস্থানের ওপর তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি সামনে আসেনি।

[১] তারিখুত তাবারী: ১৪০/৫

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৭০৪

[৩] নাফহত তীব: ২৩৭/১, ২৩০/৩

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সুলতান মাহমুদ গজনভি, মালিক শাহ, শিহাব উদ্দিন ঘুরি এবং সালাহ উদ্দিন আইয়ুবির মতো মহান ইসলামী বিজেতারা বড় বড় দেশ জয় করেও বনু আব্বাসের খলিফাদের খাদেম ছিলেন। এই যুগে ইমাম তহাবি, ইমাম গাজালি, ইমাম রাজি এবং ইবনুল জাওজির মতো ব্যক্তিত্বরা বিদ্যমান ছিলেন। তারা কখনোই তাদের সময়ের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী বা খিলাফতের এই রূপকে বাতিল বলেননি; কারণ একটি খিলাফত চাই দুর্বলই হোক না কেন, তবুও তা ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব পালন করছিল।

এই পুরো আলোচনার উদ্দেশ্য মোটেও এটি নয় যে আমরা খিলাফতের বিশ্বজনীন হওয়ার ধারণাকে অস্বীকার করছি। এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে একটি শক্তিশালী এবং বিশ্বজনীন ইসলামী সরকার আদর্শ খিলাফতের ভূমিকা আরও ভালোভাবে এবং দৃঢ়ভাবে পালন করতে পারে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটি বলা যে অতীতের মুসলমানরা খিলাফতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। যদি ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে খিলাফত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর রূপ পরিবর্তিত হয়, তবে কিছু মহান মুসলিম শাসক এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এই বিপ্লব এসেছিল এবং তারা যদি রাজনীতির এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে থাকেন, তবে তার কিছু কারণও বিদ্যমান ছিল।

পরিশেষে আমরা এটি আরজ করতে চাই যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে নিছক তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। যেখানে ইসলামের রাজনৈতিক মূলনীতি ও বিধিবিধান (যা সংক্ষিপ্ত, শক্তিশালী এবং নমনীয়) তাত্ত্বিকতার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ইসলামের রাজনৈতিক মেজাজ বাস্তবসম্মত এবং সত্যনিষ্ঠ, যা বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্মতা এবং দার্শনিক ধারণার চেয়ে বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এর লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? এ সম্পর্কে ইসলাম প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলে দিয়েছে, যার সারকথা হলো আল্লাহর হুক এবং বান্দার হুক আদায় করার সমস্ত পথ প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের উদ্দেশ্যও এই দুটিই। এখন কথা রইল যে ‘এটি কীভাবে হওয়া উচিত?’ তবে এর জন্য বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলের মুসলমানরা উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম নেতার ব্যাপারে আমরা এটি দাবি করতে পারি না যে আল্লাহর হুক এবং বান্দার হুক আদায় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য, বরং মুসলিম শাসকদের মধ্যে দীনদার, দুনিয়াদার, ভালো, মন্দ, মধ্যম সব ধরনের লোক ছিল। বলার উদ্দেশ্য কেবল এটি যে ‘কীভাবে হওয়া উচিত?’ এর জবাবে গৃহীত রাজনৈতিক কাঠামোগুলোতে শরয়ী অবকাশ ও প্রশস্ততা রয়েছে। এই পয়েন্টটি সম্পর্কে আলেমগণ আগেও অবগত ছিলেন এবং এখনও আছেন।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমরা যদি আজ বিশ্বজনীন খিলাফত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি, তবে তার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো মুসলমানদের মানসিকভাবে এক সুতোয় গাঁথা। যখন মুসলমানদের অন্তর ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন ধীরে ধীরে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মের পথও সুগম হয়ে যাবে। এই ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মকেই খিলাফত বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমে ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। ঐক্যের পরিবেশ তৈরির জন্য জাতির মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা জরুরি যা প্রথম যুগে সমগ্র উন্মতকে সিসাঢালা প্রাচীরে পরিণত করেছিল। এই প্রাচীরে ফাটল তখনই ধরেছিল যখন অভ্যন্তরীণভাবে ঈমানি সিসা গলে গিয়েছিল। এই প্রাচীরকে সেই একই কায়দায় পুনরায় জোড়া লাগানোই এর সমাধান।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস | তৃতীয় খণ্ড

সেই ঈমানি রুহ জাগ্রত করা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। এটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রথমত অসম্ভব। তর্কের খাতিরে যদি এমনটি হয়েও যায় যে, কোনো দল কেবল শক্তির জোরে অনেক দেশ জয় করে একটি বিশাল ও বিস্তৃত রাষ্ট্র গঠন করে ফেলে, তবুও অভ্যন্তরীণ রুহ মৃত হওয়ার কারণে এমন রাষ্ট্র কখনোই স্থায়ী হবে না। এটি হবে ঠিক তেমন, যেমন কোনো ফোকলা ও ফাটল ধরা দেয়ালকে লোহার তার দিয়ে বেঁধে একত্রে রাখা হয়।

বর্তমান যুগে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের জন্য জরুরি হলো তারা যেন ইতিহাসের এই সমস্ত দিক সামনে রাখেন, যাতে আমরা অতীতের ভুলগুলো থেকে বাঁচতে পারি এবং এখন যে খিলাফত কায়েম হবে তা যেন মজবুত ও স্থায়ী হয়।

ପୃଷ୍ଠା - ୧୦୪୫

•

•

•

<https://t.me/BoierSomahar>

পৃষ্ঠা - ১০৮৬

কিতাবিয়াত

প্রথম খণ্ড হতে তৃতীয় খণ্ড

<https://t.me/BoierSomahar>

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম লেখক

বর্ণ ‘আলিফ’

১. আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ জাকারিয়া আল-কাজভিনী
২. আবজাদুল উলুম সিদ্দিক হাসান খান কানৌজি
৩. আবুল হাসান আল-আশআরি হাম্মাদ বিন মুহাম্মদ আল-আনসারি
৪. আবু বকর আস-সিদ্দিক ওয়া বানুহ মাহমুদ আবদুল ফাত্তাহ শরাফ উদ্দিন
৫. আবু হানিফা: হয়াতুহ ওয়া আসরুহ মুহাম্মদ আবু জাহরা
৬. ইতহাফুল খায়রাতিল মাহরা বি-জাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারা শিহাব উদ্দিন বুসিরি আল-কিনানি
৭. ইতহাফুস সায়েল বিমা ফিত তাহবিয়া মিন মাসায়েল, শারহুল আকিদাতুত তাহবিয়া সালিহ বিন আবদুল আজিজ আল শেখ
৮. ইতহাফুল মাহরা বিল ফাওয়াইদিল মুবতাকারা মিন আতরাফিল আশারা ইবনে হাজার আসকালানি
৯. ইত্তিআযুল হনাফা বি-আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়নে আল-খুলাফা তকি উদ্দিন আল-মাকরিজি
১০. ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়া ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়া
১১. আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম আবু আবদুল্লাহ আল-মাকদিসি আল-বাসারি
১২. আহসানুল ফাতাওয়া মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভি
১৩. আহকামুল কুরআন আল-জাসসাস আর-রাজি
১৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন আবু হামিদ আল-গাজালি
১৫. আখবারু আবি হাফস উমর বিন আবদুল আজিজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন আল-আজুরি
১৬. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবুহ আল-হুসাইন বিন আলি আস-সাইমারি
১৭. আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা আবুল হাসান আলি বিন ইউসুফ আল-কিফতি
১৮. আখবারুল মাক্শিয়নে মিন তারিখ ইবনে আবি খাইসামা আবু বকর বিন আবি খাইসামা
১৯. আখবারুল ওয়াফিদাত মিনান নিসা আলা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান আব্বাস বিন বাক্কার
২০. আখবারু বিন উবাইদ ওয়া সিরাতুহম মুহাম্মদ বিন আলি সাহবাজি আল-কিফতি
২১. আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়া লেখক: অজ্ঞাত, গবেষক: আবদুল আজিজ আদ-দুরি
২২. আখবারুল কুদাত আবু বকর ওয়াকি বাগদাদি
২৩. আখবারু মক্কা (তারিখ-ই মক্কা) আবু আবদুল্লাহ আল-ফাকিহি
২৪. আখবারু মক্কা ওয়া মা জাআ ফিহা মিনাল আসার আবু আল-ওয়ালিদ আল-আজরাকি
২৫. আখলাক-ই জালালি জালাল উদ্দিন দাওয়ানি
২৬. উর্দু দাইরা মাআরিফ-ই ইসলামিয়া লেখক গোষ্ঠী
২৭. ইরশাদুস সারি লি-শারহ সহিহ আল-বুখারি আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-কাসতালানি

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

হরফে আলিফ

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৬৮২ হি. ১ দার সাদির, বৈরুত উল্লেখ নেই

১৩০৭ হি. ১ দার ইবনে হাজম ১৪২৩ হি. - ২০০২ খ্রি.

১৩১৮ হি. ১ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৯৪ হি. - ১৯৭৪ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো উল্লেখ নেই

১৩৯৪ হি. - ১৯৭৪ খ্রি. ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি ১৯৭৭ খ্রি.

৮৩০ হি. ৮ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা

.

৮৫২ হি. ১৯ মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

৮৩৫ হি. ৩ লাজনাতু ইহয়াইত তুরাসিল ইসলামি, মিশর উল্লেখ নেই

৭৫১ হি. ১ দারু আলমিল ফাওয়াইদ ১৪৩১ হি.

৩৮০ হি. ১ দার সাদির, বৈরুত ১৪১১ হি. - ১৯৯১ খ্রি.

১৩২২ হি. ১০ এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচি ১৩২৫ হি.

৭৪০ হি. ৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

৫০৫ হি. ৪ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৪৬০ হি. ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৪৩৬ হি. ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৬৪৬ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ২০০৫ খ্রি.

৭৭৯ হি. ১ দারুল ওয়াতান ১৯৯৭ খ্রি.

৪২২ হি. ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৬২৮ হি. ১ দারুস সাহওয়াহ, কায়রো উল্লেখ নেই

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ১ দারুত তালিআহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩০৬ হি. ৩ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৩৬৬ হি. - ১৯৪৭ খ্রি.

২৭৪ হি. ৫ দারু খিজির, বৈরুত ১৪১৩ হি.

৪৫০ হি. ২ দারুল আন্দালুস লিন-নাশর, বৈরুত উল্লেখ নেই

৯০৮ হি. ১ শেখ মুবারক আলী বই বিক্রেতা, লাহোর ১৪০২ হি.

.

২৪ দানিশগাহ, পাঞ্জাব ১৯৬৪ খ্রি. থেকে ১৯৯৩ খ্রি.

৯২৩ হি. ১০ আল-মাতবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়াহ, মিশর ১৩২৩ হি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

২৮ ইরশাদুল কাসি ওয়াদ দানি ইলা তারাজিমুশ শুযুখিত তাবারানি আবুল

তাইয়েব নায়েফ বিন সালাহ আল-মানসুরি

২৯ উসদুল গাবাহ ইবনুল আসির আল-জাযারি

৩০ আসমাউল মুদাররিসিন জালালুদ্দিন সুযুতি

৩১ উসুলুস সুন্নাহ (আস-সুন্নাহ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

৩২ উসুলু মাযহাবিশ শিয়াতিল ইমামিয়াহ আল-ইসনা আশারিয়াহ আরদুন ওয়া

নাকদুন ডক্টর নাসির বিন আব্দুল্লাহ আল-কাফারি

৩৩ আদওয়াউ আলাল হিন্দ (তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ) আব্দুল মুনইম আন-নামির

৩৪ ইতিকাদ আহলিস সুন্নাহ (শারহ উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ)

..... হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আবুল কাসিম আত-তাবারী আল-লালকাঈ

৩৫ ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিনা ওয়াল মুশরিকিন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি

৩৬ ইলামুল মুওয়াক্কিসিন আন রাব্বিল আলামিন ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়াহ

৩৭ আকাওয়িলুস সিকাত ফি তাউয়িলিল আসমায়ি ওয়াস সিফাত মারঈ বিন

ইউসুফ আল-মাকদিসি আল-হাম্বলি

৩৮ ইক্তিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়াহ

আল-হাররানি

৩৯ ইকমালুল মুআল্লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম (শারহ সহিহ মুসলিম) কাজি

আইয়াজ ইয়াহসুবি আস-সাবতি

৪০ ইকমালু তাহযিবিল কামাল আলাউদ্দিন মুগলতাই

৪১ আল-আহাদ ওয়াল মাসানি আবু বকর বিন আবি আসিম আশ-শাইব ۞

৪২ আল-ইবানাহ আন শারিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারি

৪৩ আল-ইহতিজাজ (ইহতিজাজে তাবারসি) আবু মনসুর আত-তাবারসি

৪৪ আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ আবুল হাসান আল-মাওয়াদি

৪৫ আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ আবু ইয়ালা আল-ফাররা

৪৬ আল-আখবারুত তিওয়াল আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি

৪৭ আল-ইখতিয়ার লি-তালিলিল মুখতার আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদ আল-মাওসিলি, আবু ফজল আল-হানফি

৪৮ আল-ইখনাইয়্যাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়াহ আল-হাররানি

৪৯ আল-আদাবুল মুফরাদ ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি

৫০ আল-ইরশাদ ফি মারিফাতি উলামাইল হাদিস আবু ইয়ালা খলিলি আল-কাযউইনি

৫১ আল-ইস্তিকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা শিহাবুদ্দিন আন-নাসিরি আস-সালাউয়ি

৫২ আল-ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব ইবনে আব্দুল বার কুরতুবি

৫৩ আল-আসরারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওদুআহ মোল্লা আলী কারী

৫৪ আল-ইশরাফ ফি মানাজিলিল আশরাফ ইবনে আবিদ দুনিয়া

৫৫ আল-ইসাবাহ ফি তামিযিস সাহাবাহ ইবনে হাজার আল-আসকালানি

তারিখ-এ মিল্লাত-এ ইসলামিয়া

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

সমসাময়িক ১ দার আল-কিয়ান, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৬৩০ হিজরি ৮ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

৯১১ হিজরি ১ দার আল-জিল উল্লেখ নেই

২৩১ হিজরি ১ দার আল-মানার, সৌদি আরব ১৪১১ হিজরি

সমসাময়িক ৩ দার আন-নাশর ১৪১২ হিজরি

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ ১ দার আল-জিল আল-জাদিদ, মিশর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

৩১৮ হিজরি ৪ দার তাইয়েবা, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরি

৬০৬ হিজরি ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৫১ হিজরি ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

১০৩৩ হিজরি ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০৬ হিজরি

৭২৮ হিজরি ২ দার আলম আল-কুতুব, বৈরুত ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

৫৩৪ হিজরি ৮ দার আল-ওয়াফা, মিশর ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

৭৬২ হিজরি ১২ আল-ফারুক আল-হাদিসিয়াহ ১৪২২ হিজরি - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

২৮৭ হিজরি ৬ দার আর-রায়াহ, রিয়াদ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

৩৮৭ হিজরি ৩ দার আর-রায়াহ লিন-নাশর, সৌদি আরব ১৪১৮ হিজরি

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ২ মাতাবিউন নুমান আন-নাজাফ আল-আশরাফ ১৩৮৬ হিজরি - ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

৪৫০ হিজরি ১ দার আল-হাদিস, কায়রো উল্লেখ নেই

৪৫৮ হিজরি ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

২৮২ হিজরি ১ দার ইহয়া আল-কুতুব আল-আরাবি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

৬৮৩ হিজরি ৫ মাতবা হালাবি, কায়রো ১৩৫৬ হিজরি - ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

৭৪৮ হিজরি ১ দার আল-খাররাজ, জেদ্দা ১৪২০ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

৪৫৬ হিজরি ১ দার আল-বাইর আল-ইসলামিয়াহ, বৈরুত ১৪০৯ হিজরি - ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

৩৩৬ হিজরি ৩ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪০৯ হিজরি

১৩১৫ হিজরি ৩ দার আল-কিতাব উল্লেখ নেই

৪২৩ হিজরি ১০ দার আল-জিল, বৈরুত ১৪১২ হিজরি - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

১০১২ হিজরি ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ উল্লেখ নেই

২৮১ হিজরি ১ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪১১ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

৮৫২ হিজরি ৮ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৫ হিজরি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং গ্রন্থের নাম লেখক

৫৬. আল-আসনাস হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি

৫৭. আল-আদদাদ আবু বকর ইবনুল আনবারি

৫৮. আল-ইতিসাম ইবরাহিম বিন মুসা আশ-শাতিবি

৫৯. আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ আলা মাজহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস আবু বকর বায়হাকি

৬০. আল-ইতিকাদ ফিল ইতিকাদ - শারহুল উমদাহ ফি আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আবুল বারাকাত আন-নাসাফি

৬১. আল-আলাকুল খাতিরাহ ফি জিকর উমারা আশ-শাম ওয়াল জাজিরাহ ইবনে শাদ্দাদ আল-হলাবি

৬২. আল-আলাম খায়রুদ্দিন আজ-জিরিকলি

৬৩. আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান জাম্মাত তারিখ শামসুদ্দিন আস-সাখাভি

৬৪. আল-আগানি আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানি

৬৫. আল-ইকতিফা বিমা তাদাম্মানাহ মিন মাগাজি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াস সালাসাহ আল-খুলাফা আবুল রাবি আল-কালাই

৬৬. আল-ইকমাল ফি জিকর মান লাহ রিওয়ায়াহ ফি মুসনাদিল ইমাম আহমাদ সিওয়া মান জুকিরাহ ফি তাহজিবিল কামাল শামসুদ্দিন আল-হুসাইনি আশ-শাফিঈ আদ-দিমাশকি

৬৭. আল-উম্ম (কিতাবুল উম্ম) মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফিঈ

৬৮. আল-ইমাম আশ-শাফিঈ মুহাম্মদ আবু জাহরা

৬৯. আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি

৭০. আল-আমওয়াল ইবনে জানজুয়াইহ

৭১. আল-ইনতিসার লিশ-শা'ব ওয়াল আসার মিন ইফতিরাআত আস-সামাভি আদ-দাল ইবরাহিম বিন আমির আল-রুহাইলি

৭২. আল-ইসতিয়াব ফি ফাদাইলিস সালাসাহ আল-আইম্মাহ আল-ফুকাহা ইবনে আব্দুল বার আল-মালিকি

৭৩. আল-আনসাব আব্দুল কারিম বিন মুহাম্মদ আস-সামআনি

৭৪. আল-ইনসাফ ফিমা ইয়াজিবু ইতিকাদুহ ওয়া লা ইয়াজুজুল জাহলু বিহি আবু বকর আল-বাকিলানি

৭৫. আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ লিমা ফি কিতাব “আদওয়া আলাস সুন্নাহ” মিনাল জালাল ওয়াত তাদলিল ওয়াল মুজাজাফাহ আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-মুয়াল্লিমি

৭৬. আল-আওয়াইল আবু হিলাল আল-আসকারি

৭৭. আমালিল কালি আবু আলি আল-কালি

৭৮. ইমাম আবু হানিফার ইসলামী আইন সংকলন ডক্টর হামিদউল্লাহ

৭৯. ইমতাউল আসমা তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি

৮০. ইমদাদুল ফাতাওয়া মাওলানা আশরাফ আলী খানভী

৮১. আনসাবুল আশরাফ আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি

৮২. মানব বিশ্বের ওপর মুসলমানদের উত্থান ও পতনের প্রভাব মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

৮৩. আনওয়ারুন নুজুম (মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী-র মাকতুবাত-ই কাসিমির উর্দু অনুবাদ) মাওলানা আনওয়ারুল হাসান শেরকোটি

তারীখে মিলাতে ইসলামিয়া

অংশ: ৩

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

২০৪ হিজরী ১ মাকতাবা শামিলা

.

৩২৮ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, বৈরুত ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯০ হিজরী ১ দারু ইবনে আফফান, সৌদি আরব ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৪৫৮ হিজরী ১ দারুল আ ফাক, বৈরুত ১৪০১ হিজরী

৭১০ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ লিত-তুরাস, মিশর ১৪৩২ হিজরী - ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

৬৮৩ হিজরী ৩ মানশুরাত ওয়াজারাতিস সাকাফাহ, সিরিয়া ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯৬ হিজরী ৮ দারু নুয়াইম লিল-মুতায়াল্লিমীন ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৯০২ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৯২ হিজরী ২৪ দারুল ফিকর, বৈরুত উল্লেখ নেই

৬৪৩ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২০ হিজরী

৭২৫ হিজরী ১ জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, করাচি উল্লেখ নেই

২০৪ হিজরী ৮ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯২ হিজরী - ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুল নাসরিল আরাবি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৭০ হিজরী ১ মাকতাবাতুন নীল, মিশর ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৫১ হিজরী ১ মারকাজুল মালিক ফয়সাল, সৌদি আরব ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৬৩ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৫২২ হিজরী ১৩ দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়াহ, দাক্ষিণাত্য ১৩৮২ হিজরী - ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

৪০৩ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ উল্লেখ নেই

১৩৮৬ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩৯৫ হিজরী ১ দারুল বাশির ১৪০৮ হিজরী

৩৯২ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল মিসরিয়াহ ১৩৪২ হিজরী - ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ ১ উর্দু একাডেমি, সিন্ধু ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮২৫ হিজরী ১৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৩৩ হিজরী - ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ ৬ মাকতাবা দারুল উলুম করাচি ১৪৩১ হিজরী - ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৯ হিজরী ১৩ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

১৩৫৬ হিজরী - ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

.

নাশিরানে কুরআন লিমিটেড, লাহোর উল্লেখ নেই

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (সৈয়দ সুলাইমান নদভী) ৮৪

আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক (শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী) ৮৫

ঈসারুল হক আলাল খালক (ইজ্জুদ্দীন আল-ইয়ামানি) ৮৬

ঈযাহুদ দালীল ফি কাতয়ি হুজাজি আহলিত তা'তীল (বদরুদ্দীন আল-কিনানি আল-হামাভি আশ-শাফিঈ) ৮৭

ঈযাহু শাওয়াহিদিল ঈযাহ (আবু আলী আল-ফারিসি) ৮৮

{হরফ-এ-বা}

আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকায়েক (ইবনে নুজাইম আল-মিসরি) ৮৯

আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর (আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি) ৯০

আল-বাদউ ওয়াত তারিখ (আল-মুতাহার বিন তাহির আল-মাকদিসি) ৯১

আল-বুলদান (কিতাবুল বুলদান) (আহমদ বিন ইসহাক আল-ইয়াকুবি) ৯২

আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া (বদরুদ্দীন আইনি) ৯৩

আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব (ইবনে ইযারি আল-মাররাকুশি) ৯৪

আল-বায়ান ফি মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ (ইয়াহইয়া আল-ইমরানি আল-ইয়ামানি) ৯৫

বুহস ফি তারিখিস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ (আকরাম যিয়া আল-উমারি) ৯৬

বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতীবিশ শায়ায়ে (আলাউদ্দীন আবু বকর আল-কাসানি) ৯৭

বায়লুল মাজহুদ ফি হাল্লি আবি দাউদ (মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী) ৯৮

বুগইয়াতুত তালাব ফি তারিখি হালাব (কামালুদ্দীন ইবনুল আদিম) ৯৯

{হরফ-এ-তা}

আল-আজউয়িবাতুল ফাযিলাহ লিল আসইলাতিল আশারাতিল কামিলাহ (মা'আ তালীকাত শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ) (মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী) ১০০

আত-তারিখুল ইসলামি (ডক্টর মাহমুদ শাকির) ১০১

তুহফাতুত তাহসীল ফি যিকরি রুওয়াতিল মারাসীল (আবু যুরআ ইবনুল ইরাকি) ১০২

তানভীরুল ঈমান উর্দু তরজমা তাতহীরুল জানান (লেখক: ইবনে হাজার হাইতামী, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল শাকুর) ১০৩

আত-তারিখুল ইসলামিল আম (আলী ইব্রাহিম হাসান) ১০৪

আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি হাত্তা সুকুতি গারনাতা (ডক্টর আব্দুর রহমান আলী আল-হাজ্জি) ১০৫

আত-তারিখুল আওসাত (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ১০৬

আত-তারিখুল কাবীর (মা'আ হাওয়াশি মাহমুদ খলীল) (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ১০৭

আত-তারিখুল কাবীর লি ইবনে আবি খাইসামাহ আস-সাফরুস সালাসা (আবু বকর আহমদ বিন আবি খাইসামাহ) ১০৮

আত-তারিখুল কাবীর লি ইবনে আবি খাইসামাহ আস-সাফরুস সানি (আবু বকর আহমদ বিন আবি খাইসামাহ) ১০৯

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৩ হিজরী, ১৩ হিজরী ১ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি ১৯৯৭ খ্রি.

৩০২ হিজরী ১৭ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রি.

৮৩০ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৯৮৭ খ্রি.

৭৩ হিজরী ১ দারুল ইসলাম লিত-তিবাতা ওয়ান-নাশর, মিশর ১৩১০ হিজরী - ১৮৯০ খ্রি.

৬০০ হিজরীর পূর্বে ১ দারুল গারব আল-ইসলামী ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রি.

হরফ বা

৯৭ হিজরী ৮ দারুল কিতাব আল-ইসলামী উল্লেখ নেই

৭২৫ হিজরী ১০ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৩২০ হিজরী

৩৫৫ হিজরী ৬ মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বিনিয়্যাহ, মিশর উল্লেখ নেই

২৯২ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২২ হিজরী

৮৫৫ হিজরী ১৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রি.

৭৯৬ হিজরী ২ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৯৮৩ খ্রি.

৫৫৮ হিজরী ১৩ দারুল মিনহাজ, জেদ্দা ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ বিসাত, বৈরুত ১৯৬২ খ্রি.

৫৪৭ হিজরী ৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রি.

১৩২৬ হিজরী ২০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

৬২০ হিজরী ১২ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

হরফ তা

উল্লেখ নেই ১ হালাব উল্লেখ নেই

২০১২ খ্রি. ২২ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রি.

৮২৬ হিজরী

.

মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৯৭৪ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, লাহোর উল্লেখ নেই

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী

.

মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ ১৯৬৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রি.

২৫৬ হিজরী ২ দারুল ওয়াযি, দারুত তুরাস, হালাব, কায়রো ১৩৯৭ হিজরী - ১৯৭৭ খ্রি.

২৫৬ হিজরী ৮ মাতবাতা উসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য উল্লেখ নেই

২৭৯ হিজরী ৩ আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, কায়রো ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রি.

২৭৯ হিজরী ২ আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, কায়রো ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা (অষ্টম খণ্ড)

ক্রমিক নং গ্রন্থের নাম লেখক

- ১১০ আত-তাবসির ফিদ দ্বীন ওয়া তাময়ীযুল ফিরকাতিন নাজিয়া মিনাল ফিরাকিল হালিকীন তাহের বিন মুহাম্মদ আল-ইসফারাইনি
- ১১১ আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর শেখ মুহাম্মদ বিন তাহের আল-আশুর
- ১১২ আত-তুহফাতুল মুকাদ্দাসিয়া ফি মুখতাসার তারিখিন নাসরানিয়া আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসি
- ১১৩ আত-তায়কিরাতুল হামদুনিয়া ইবনে হামদুন বাহাউদ্দিন আল-বাগদাদী
- ১১৪ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব আব্দুল আজিম আল-মুনযিরি
- ১১৫ আত-তাশরিউল জিনায়ি আল-ইসলামি মুকারানান বিল কানুনিল ওয়াদয়ি আব্দুল কাদির আওদাহ
- ১১৬ আত-তাদীল ওয়াত তাজরীহ লিমান খারাজা লাহ আল-বুখারী ফিল জামিউস সহীহ আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি
- ১১৭ আত-তাকরীব ওয়াসীত ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি
- ১১৮ আত-তাকরীব ওয়াত তাইসীর ইয়াহইয়া বিন শরাফ আন-নববী
- ১১৯ আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর আলা তাহরীরিল কামাল ইবনুল হুমাম ইবনে আমীর হাজ ইবনুল মুওয়াঙ্কিত আল-হাম্বলী
- ১২০ আত-তাকরীদ ওয়াল ঈযাহ শারহ মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ যাইনুদ্দিন আল-ইরাকী
- ১২১ আত-তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত তাদীল ওয়া মা'রিফাতিস সিকাত ওয়াদ দুয়াফা ওয়াল মাজাহীল ইবনে কাসীর দিমাঙ্কি
- ১২২ আত-তালখীসুল হাবীর ফি তাখরীজি আহাদীসিল রাফেয়িল কাবীর ইবনে হাজার আল-আসকালানী
- ১২৩ আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবী
- ১২৪ আত-তানবীহ ওয়াল ইশরাফ আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী
- ১২৫ আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দু আলা আহলিল আহওয়াযি ওয়াল বিদা আবু আল-হুসাইন মালতি আল-আসকালানী
- ১২৬ তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস মুরতাজা আয-যাবিদী
- ১২৭ তারিখে ইসলাম শাহ মঈনুদ্দিন নদভী
- ১২৮ তারিখে দিমাঙ্ক (৮০ খণ্ড মূল পাঠ, ৬ খণ্ড সূচিপত্র) হাফিজ ইবনে আসাকির
- ১২৯ তারিখে সিন্ধু আব্দুল হালিম শারার
- ১৩০ তারিখে সিন্ধু (গবেষণা: ড. উমর বিন মুহাম্মদ দাউদ পোতা) মীর মাসুম শাহ ভাক্কারি
- ১৩১ তারিখে ইবনে খালদুন ও মুকাদ্দিমা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন
- ১৩২ তারিখে ইবনে মাজীন (রিওয়ায়াতুদ দুরী) ইয়াহইয়া বিন মাজীন
- ১৩৩ তারিখে ইবনে ইউনুস আল-মিসরি আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি
- ১৩৪ তারিখে আবি যুরআ আদ-দিমাঙ্কি আবু যুরআ আদ-দিমাঙ্কি
- ১৩৫ তারিখে ইসলাম আকবর শাহ নাজিবাবাদী

তারীখে উন্মতে মুসলিমা

অষ্টম খণ্ড

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

৫৩ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, লেবানন ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ৩০ তিউনিস ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবায়ে শামিলা উল্লেখ নেই

৫৬২ হিজরী ৩০ দারুল সাদির, বৈরুত ১৩১৭ হিজরী

৬৯৬ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৩১৭ হিজরী

৭৩৭ হিজরী ২ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৩৭ হিজরী ৩ দারুল লিওয়া, রিয়াদ ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

.

১ দারুল ফিকর ১৩২৩ হিজরী

৬৭৬ হিজরী ১ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৮৭৯ হিজরী ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮০৬ হিজরী ১ মাকতাবায়ে সালাফিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৮৯ হিজরী - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৪ হিজরী ৪ মারকাযুন নুমান, ইয়েমেন ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ২৪ ওয়াজারাতে উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়াহ বিল মাগরিব
১৩৮৭ হিজরী

৩৩৭ হিজরী ১ দারুস সাওয়ী, কায়রো

.

৭৭ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়াহ, মিসর উল্লেখ নেই

১২০৫ হিজরী ৪০ দারুল হিদায়াহ উল্লেখ নেই

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ ২ দারুল নাশাহাত উল্লেখ নেই

৫৭১ হিজরী ৮০ দারুল ফিকর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ ১ দিল গুদাজ প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩২ হিজরী ১ মারকাযে তাহকিকাত, ইসফাহান উল্লেখ নেই

৮০৮ হিজরী ৮ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

৪২৩ হিজরী ৪ মারকাযুল বাহসিল ইলমি, মক্কা মুকাররমা ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩২৮ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৩২১ হিজরী

৪৮১ হিজরী ১ মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহ, দামেস্ক উল্লেখ নেই

বিংশ শতাব্দী ঈসাব্দী ৩ নাফিস একাডেমি, করাচি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বইয়ের নাম ও লেখক ত্রমিক নং

তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক বাশার)। অধিকাংশ স্থানে তারিখুল ইসলামের তাদমুরি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু স্থানে বাশার সংস্করণও ব্যবহার করা হয়েছে। “ত তাদমুরি” প্রথমোক্তটির এবং “ত বাশার” শেষোক্তটির প্রতীক। (শামসুদ্দিন আয-যাহাবি) ১৩৬

তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক তাদমুরি) (শামসুদ্দিন আয-যাহাবি) ১৩৭

তারিখুল খুলাফা (জালালুদ্দিন সুয়ুতি) ১৩৮

তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালি আনফুসিল নাফিস (হুসাইন বিন মুহাম্মদ আদ-দিয়ার বাকরি) ১৩৯

তারিখুত তাবারী (তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক) (ইবনে জারির আত-তাবারী) ১৪০

তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস (ডক্টর খলিল ইব্রাহিম আস-সামাররাই) ১৪১

তারিখ বিল ফিকর আদ-দ্বীনি আল-জাহিলি (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-ফাযুমি) ১৪২

তারিখুল মদিনা (উমর বিন শাব্বাহ) ১৪৩

তারিখ-এ-আন্দালুস (মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী) ১৪৪

তারিখ-এ-উপমহাদেশ (প্রফেসর এম. এ. জলিল) ১৪৫

তারিখ বাগদাদ, ওয়া যুয়ুলুহ (খতিব আবু বকর আল-বাগদাদী) ১৪৬

তারিখ-এ-দাওয়াত ও আজিমত (সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী) ১৪৭

তারিখ দামেশক (ইবনুল আসাকির, হামজা বিন আসাদ) ১৪৮

তারিখ ফালাসিফাতুল ইসলাম (মুহাম্মদ লুতফি জুমআ) ১৪৯

তারিখ মক্কা আল-মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদুল হারাম ওয়াল মদিনা আশ-শরিফাহ ওয়াল কবর আশ-শরিফ (ইবনে জিয়া আল-মাক্কি আল-হানাফি) ১৫০

তারিখ-এ-হিন্দ (ডক্টর মাকসুদ চৌধুরী) ১৫১

তারিখ ইয়াকুবি (আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবি) ১৫২

তালিফাত-এ-রশিদীয়া (মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি) ১৫৩

তাবয়ীদুস সাহিফাহ বি-মানাকিবি আবি হানিফাহ (জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি) ১৫৪

তাতিম্মাহ সিওয়ান আল-হিকমাহ (ইবনে ফান্দাক) ১৫৫

তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম (ইবনে মিসকাওয়াইহ) ১৫৬

তাহরির উলুম আল-হাদিস (আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুদি) ১৫৭

তুহফাতুল ফুকাহা (আবু বকর আলাউদ্দিন আস-সামারকান্দি) ১৫৮

তুহফা-এ-ইসনা আশারিয়া (উর্দু) (শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, অনুবাদ: মাওলানা খলিলুর রহমান নোমানী মাজাহেরি) ১৫৯

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৪৮ হি. ১৫ দারুল গারব আল-ইসলামী ২০০৩ খ্রি.

৭৪৮ হি. ৫২ দারুল কুতুব আল-আরাবি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১ মাকতাবাতু নিযার ১৪২৫ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৯৬২ হি. ২ দারু সাদির উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ১১ দারুল মাআরিফ মিসর, দারুত তুরাস বৈরুত ১৩৮৭ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুব আল-জাদিদাহ, বৈরুত ২০০০ খ্রি.

১২৩৭ হি. ১ দারুল ফিকর আল-আরাবি ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

২৬২ হি. ৪ সাইয়েদে হাবিব জেদ্দা ১৩৯৯ হি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ কুতুব খানা দারুল কুতুব, লাহোর ২০০৩ খ্রি.

১৩৭৭ হি. ১ জামিল পাবলিশার্স, করাচি ১৯৮৬ খ্রি.

৩২৩ হি. ২৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি.

১৩১৯ হি. ৮ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

৫৫৫ হি. ১ দারুল ইহসান, দামেস্ক ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ মুয়াসসাসাতু হিন্দাউয়ি, মিসর ২০১২ খ্রি.

৮৫২ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৯৮৬ খ্রি. ১ মাকসুদ এন্ড সন্স, করাচি ১৯৮৫ খ্রি.

৩৯২ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

১৩২৩ হি. ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৫৯১ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৫৬৫ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

৪২১ হি. ৭ সরুশ, তেহরান ২০০০ খ্রি.

.
২ মুয়াসসাসাতুর রায়ান, বৈরুত ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫৩০ হি. ৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

.
১ আলমি মজলিসে তাহাফফুজে ইসলাম, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

নম্বর কিতাবের নাম লেখক

১৬০ আত-তাহকীকু মুনিফুর রতবা লিমান সাবাতা লাহ শারিফুস সাহাবা

সালাহউদ্দীন আলায়ী আদ-দিমাশকী

১৬১ তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নাওয়াবী জালালুদ্দীন সুয়ুতী

১৬২ তাযকিরাতুল হুফফায (তাবাকাতুল হুফফায) হাফেয যাহাবী

১৬৩ তারতীবুল মাকারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক কাযী আয়ায বিন মুসা আল-মালিকী

১৬৪ তরজুমানুল কুরআন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

১৬৫ তাতহীরুল ইতিকাদ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমীর ইয়ামানী মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী

১৬৬ তাজীলুল মানফায়াহ বি-যাওয়াইদি রিজালিল আইন্নাতিল আরবাআহ ইবনে হাজার আল-আসকালানী

১৬৭ তাযীমু কাদরিস সালাত মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী

১৬৮ তাফসীর ইবনে আবী হতিম ইবনে আবী হতিম আর-রাযী

১৬৯ তাফসীর ইবনে কাসীর হাফেয ইবনে কাসীর দিমাশকী

১৭০ তাফসীর আল-আলুসী (তাফসীর রুহুল মআনী) শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলুসী

১৭১ তাফসীর আর-রাযী (মাফাতিহুল গায়েব) ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী

১৭২ তাফসীর আত-তাবারী (জামিউল বায়ান) ইবনে জারীর আত-তাবারী

১৭৩ তাফসীর আল-কুরতুবী (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন) শামসুদ্দীন আল-আনসারী আল-কুরতুবী

১৭৪ তাফসীর সালাবী আবু ইসহাক আস-সালাবী

১৭৫ তাফসীর আবদুর রাযযাক আবদুর রাযযাক বিন হান্নাম আস-সানআনী

১৭৬ তাফহীমুল বুখারী মাওলানা যুহরুল বারী আল-আযমী

১৭৭ তাকরীবুত তাহযীব ইবনে হাজার আসকালানী

১৭৮ তাকরীরে বুখারী শরীফ শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহারানপুরী

১৭৯ তাকবীমে আহদে নববী আলী মুহাম্মদ খান

১৮০ তাকবীমে তারিখী মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী

১৮১ তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী

১৮২ তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম খতীব আবু বকর আল-বাগদাদী

১৮৩ তালখীসু কিতাবিল ইস্তিগাসা (আল-ইস্তিগাসা, আর-রাদ্দু আলাল বাকরী লি-ইবনে তাইমিয়া) হাফেয ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী

১৮৪ তালকীহ ফুহমিল আসার ফী উযুনিত তারিখ ওয়াস সিয়াহ আবদুর রহমান বিন আল-জাওযী

১৮৫ তামহীদুল আওয়াইল ওয়া তালখীসুল দলাইল আবু বকর বাকিল্লানী

১৮৬ তাহযীবুল আসার ইবনে জারীর আত-তাবারী

১৮৭ তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত মহিউদ্দীন শরফ আন-নাওয়াবী

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

সপ্তম খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৭৬ হিজরী

.

দারুল আসিমা, রিয়াদ ১৪১০ হিজরী

৯১১ হিজরী ২ দারু তিব্যাহ উল্লিখিত

৭৩৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৫২৩ হিজরী ৮ মাতবাতা ফাদালা, মরক্কো ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

.

৩ ইসলামী একাডেমি, লাহোর উল্লিখিত

১১৮২ হিজরী - ১২৫০ হিজরী ১ মাতবাতা সাফির, রিয়াদ ১৪২৩ হিজরী

৮৫৩ হিজরী ২ দারুল বাশায়ের, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩৯৩ হিজরী ২ মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৬ হিজরী

৩২৭ হিজরী ৩ মাকতাবাতু নিয়ার সৌদি আরব ১৪১৯ হিজরী

৭২৭ হিজরী ৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী

১২৭০ হিজরী ১৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লিখিত

৬০৬ হিজরী ৩২ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২০ হিজরী

৩১০ হিজরী ২৪ দারু হাজার ১৪২২ হিজরী

৬৭১ হিজরী ১০ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৩৮৪ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩২৭ হিজরী ১০ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ১৪২২ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

২১১ হিজরী ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী

সমসাময়িক ৩ দারুল ইশাতাত, করাচি উল্লিখিত

৮৫২ হিজরী ১ দারুল রশিদ, সিরিয়া ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৩০২ হিজরী ৪ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি উল্লিখিত

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ ১ ডক্টর নূর মুহাম্মদ ইউসুফ জাই, করাচি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

.

১ ইদারা তাহকিকাত-ই-ইসলামি, ইসলামাবাদ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ মাকতাবা দারুল উলুম করাচি

.

৩২৩ হিজরী ১ তলাস লিন-দিরাসাত ওয়ান-নাশর, দামেস্ক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৭ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসারিইয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৭ হিজরী

৫৯৭ হিজরী ১ শারিকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৫০৩ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, লেবানন ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩১০ হিজরী ৩ মাতবাতুল মাদানি, কায়রো উল্লিখিত

৭৬৬ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লিখিত

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বইয়ের নাম (লেখক) ক্রমিক নং

তাহযীবুত তাহযীব (ইবনে হাজার আসকালানী) ১৮৮

তাহযীবুল কামাল (আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী) ১৮৯

তাহযীবুল লুগাহ (আবু মানসুর আল-আযহারী আল-হারাভী) ১৯০

তাওযীহুল আফকার লি-মাআনী তানকীহিল আনযার (আমীর ইযযুদ্দীন সানআনী)
১৯১

তাওযীহুল মুশতাবিহ ফী যাবতি আসমাইর রুওয়াত ওয়া আনসাবিহিম ওয়া আলকাবিহিম
ওয়া কুনা-হুম (আবু বকর ইবনে নাসিরুদ্দীন) ১৯২

{হরফ সা (ث)}

আস-সিকাত (মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস) (আবুল
হাসান আহমদ বিন সালিহ আল-ইজলী আল-কুফী) ১৯৩

আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান (ইবনে হিব্বান আল-বুস্তী) ১৯৪

আস-সিকাতু মিন্মান লাম ইয়াকা' ফিল কুতুবিস সিভাহ (আল-কাসিম বিন কুতলুবুগা)
১৯৫

সিমাৱুল কুলুব ফিল মুদাফ ওয়াল মানসুব (আবু মানসুর আস-সাআলাবী) ১৯৬

{হরফ জীম (ج)}

আল-জামি' লি-ইবনে ওয়াহাব (আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব) ১৯৭

আল-জারহ ওয়াত তা'দীল (ইবনে আবী হাতিম আর-রাযী) ১৯৮

আল-জিহাদ (আবু বকর ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী) ১৯৯

আল-জাওয়াবুস সহীহ লি-মান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ (আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে
তাইমিয়া আল-হাররানী) ২০০

আল-জাওয়াহিরুল মুদীয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়াহ (আব্দুল কাদির মুহিউদ্দীন আল-
হানাফী) ২০১

আল-জাওহারাতিন নাইয়্যিরাহ আলা মুখতাসারিল কুদুরী (আবু বকর বিন আলী আল-হাদাদী
আয-যাবীদী) ২০২

আল-জাওহারাতি ফী নাসাবিন নাবীয্যি ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ (মুহাম্মদ বিন আবী বকর
আল-বাররী আত-তিলিমসানী) ২০৩

জামিউল আহাদীস (জালালুদ্দীন সুয়ুতী) ২০৪

জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল (মাজদুদ্দীন ইবনুল আসীর আল-জাযারী) ২০৫

জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান (হাফিজ ইবনে কাসীর) ২০৬

জামিউল মাসাইল (আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী) ২০৭

জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি (ইবনে আব্দুল বার) ২০৮

জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস (আবু আবদুল্লাহ আল-হমাইদী)
২০৯

জামউল কুরআন হিফযান ওয়া কিতাবাতান (ডক্টর আলী বিন সুলাইমান আল-উবাইদ)
২১০

জামহারাতু আনসাবিল আরাব (ইবনে হাযম আয-যাহেরী) ২১১

জাওয়ামিউস সীরাতিন নাবাবিয়াহ (ইবনে হাযম আয-যাহেরী) ২১২

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৮৫২ হি. ১২ মাতবা নিজামিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩২৬ হি.

৭৪২ হি. ৩৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৭৩০ হি. ৮ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ২০০১ খ্রি.

১১৮২ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৮৩২ হি. ১০ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রি.

{বর্ণ ‘সা’}

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

২৬১ হি. ২ মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৫৩ হি. ৯ মাতবা নিজামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

৮৭৯ হি. ৮ মারকায আহমদ বিন ইয়াসিন ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৪২৯ হি. ১ দারুল মাআরিফ, কায়রো উল্লেখ নেই

{বর্ণ ‘জিম’}

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

১৯৫ হি. ১ দারুল ওয়াফা ১৪২৫ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৩২৭ হি. ৯ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ১৯৫২ খ্রি.

২৮৭ হি. ২ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৯ হি.

৭২৮ হি. ৬ দারুল আসিমাহ, রিয়াদ ১৪১২ হি.

৭৭৫ হি. ২ মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, করাচি উল্লেখ নেই

৮০০ হি. ২ আল-মাতবাআতুল খায়রিয়্যাহ ১৩০০ হি.

৬৩৫ হি.

.

দারুল রিফায়ি, রিয়াদ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১৩ ডক্টর হাসান আব্বাস জাকি (মাকতাবা শামিলা)

.

৬০৬ হি. ১২ মাকতাবা দারুল বায়ান ১৩৯২ হি. - ১৯৭২ খ্রি.

৭৭২ হি. ১০ দারু খাযরা, বৈরুত ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭২৮ হি. ৬ দারু আলমিল ফাওয়াইদ ১৪২২ হি.

৪৬৩ হি. ২ দারু ইবনে জাওযি, সৌদি আরব ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৪৪৪ হি. ১ আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৯৯৬ খ্রি.

.

১ মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা উল্লেখ নেই

৩৫৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

১২৫৬ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

অষ্টম খণ্ড তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

হরফ হা (ح)

২১৩ আল-হাভী আল-কাবীর শারহ মুখতাসার আল-মুযানী ইমাম আলী বিন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী

২১৪ আল-হুজ্জাতু আলা আহলিল মদীনা মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আশ-শায়বানী

২১৫ আল-হাসানাহ ওয়াস সাইয়্যিআহ আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২১৬ আল-হায়ওয়ান (কিতাবুল হায়ওয়ান) আমর বিন বাহর, আবু উসমান আল-জাহিজ

২১৭ হুসনুল মুহাদারা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী

২১৮ হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী

২১৯ হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী

২২০ হয়াতুস সাহাবা (আরবি) মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী

হরফ খা (خ)

২২১ আল-খারাজ (কিতাবুল খারাজ) কাজী আবু ইউসুফ

হরফ দাল (د)

২২২ দিরাসাত তারীখিয়াহ আকরাম জিয়া আল-উমরী

২২৩ দালায়েলুন নুবুওয়াহ আবু বকর আল-বাইহাকী

২২৪ আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ ইবনে হাজার আল-আসকালানী

২২৫ দিওয়ানুল হামাসাহ আবু তাম্মাম

২২৬ দুওয়ালুল ইসলাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী

২২৭ দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরী

২২৮ আদ-দীবাজুল মুযাহহাব ফী মা'রিফতি আ'য়ানি উলামাইল মাযহাব ইবনে ফারহন আল-ইয়া'মুরী

২২৯ আদ-দুরারু ফী আয-যারারি (তাযকিরাতুল আব্বা ওয়াত তাসমিয়াতুল আব্বা) ইবনে আদিম আল-হালাবী

২৩০ আদ-দীবাজুল মুযাহহাব ফী মা'রিফতি আ'য়ানি উলামাইল মাযহাব ইবনে ফারহন আল-ইয়া'মুরী

২৩১ আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়াহ মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী

হরফ যাল (ذ)

২৩২ আয-যুররিয়াতুত তাহিরা আবু বিশর আল-আনসারী আদ-দাওলাবী

হরফ রা (ر)

২৩৩ আর-রিহলাতু ফী তলাবিল হাদীস আবু বকর আল-খতীব আল-বাগদাদী

২৩৪ আর-রাহীকুল মাখতূম মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপুরী

২৩৫ আর-রাদ্দু আলা মান ক্বলা বিফানাউল জান্নাতি ওয়ান নার আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

বর্ণ ‘হা’ (ح)

৪৫০ হিজরী ১৯ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রি.

১৮৯ হিজরী ৪ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী

৭২৮ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

২৫৫ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪২২ হিজরী

৯১১ হিজরী ২ দারু ইহয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়াহ ১৩৮৭ হিজরী - ১৯৬৭ খ্রি.

৯১১ হিজরী ১ মাতাবিউর রশীদ ১৪০৯ হিজরী

৩৩০ হিজরী ১২ আস-সাআদাহ ১৩৯৩ হিজরী - ১৯৭৩ খ্রি.

১৩৮৩ হিজরী ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রি.

বর্ণ ‘খা’ (خ)

১৮২ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়াহ, মিসর (উল্লেখ নেই)

বর্ণ ‘দাল’ (د)

সমসাময়িক ১ আল-মাজলিসুল ইলমি, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রি.

৪৫৮ হিজরী ৭ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪০৫ হিজরী

৮৫২ হিজরী ২ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

২২১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রি.

৭২৮ হিজরী ২ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৯ খ্রি.

১৩০৬ হিজরী ৫ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রি.

৭৯৯ হিজরী ২ দারুত তুরাস, কায়রো উল্লেখ নেই

৬৬০ হিজরী ১ দারুল হিদায়াহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রি.

৭৯৯ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মুয়াসসাসাতু ইকরা, কায়রো ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রি.

বর্ণ ‘যাল’ (ذ)

৩১০ হিজরী ১ আদ-দারুস সালাফিয়াহ, কুয়েত ১৪০৭ হিজরী

বর্ণ ‘রা’ (ر)

২৬৩ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৩৯৫ হিজরী

২০০৬ খ্রি. ১ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ, লাহোর ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রি.

৭২৮ হিজরী ১ দারু বালানসিয়াহ, রিয়াদ ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

২৩৬ আর-রাসায়েল আমর বিন বাহর, আবু উসমান আল-জাহিজ

২৩৭ আর-রাফ' ওয়াত তাকমিল মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী

২৩৮ আর-রাওদুল উনুফ (তাহকীক: উমর আব্দুস সালাম সালামি) আবুল কাসিম

আস-সুহাইলি

২৩৯ আর-রাওদুল বাসিম ফি তারাজিম শুয়ুখিল হাকিম নায়েফ বিন সালাহ

আল-মানসুরি

২৪০ আর-রাওদুল মি'তার ফি খবরিল আকতার আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-

হিময়ারি

২৪১ আর-রিয়াদুন নাদিরা ফি মানাকিবিল আশারা মুহিব্বুদ্দিন আত-তাবারী

২৪২ রা'সুল হুসাইন আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

২৪৩ রিজালুল কাশশি (ইখতিয়ারু মা'রিফাতির রিজাল) নতুন সংস্করণ লেখক:

মুহাম্মদ বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃ. ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও পরিমার্জন:

আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আত-তুসী (মৃ. ৪৬০ হি.)

২৪৪ রিজালুল কাশশি (ইখতিয়ারু মা'রিফাতির রিজাল) পুরাতন সংস্করণ লেখক:

মুহাম্মদ বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃ. ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও

পরিমার্জন: আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আত-তুসী (মৃ. ৪৬০ হি.)

২৪৫ রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজী সালমান

মনসুরপুরী

২৪৬ রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন

আদ-দিমাশকী

২৪৭ রিসালা ইলা আহলি মক্কা ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানি

২৪৮ রিসালা তুরুুক হাদিস মান কুনতু মাওলাহ হাফিজ যাহাবী

২৪৯ রাফ'উল আস্তার ইজ্জুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমির

ইয়ামানি

২৫০ রওদাতুল আখইয়ার আল-মুনতাখাব মিন রাবিউল আবরার মুহিউদ্দিন আল-

খতিব আবুল কাসিম

২৫১ রিয়াদুন নুফুস আবু বকর আব্দুল্লাহ আল-মালিকি

{বর্ণ: য}

২৫২ আয-যুহদ (কিতাবুয যুহদ) আহমদ বিন হাম্বল

২৫৩ আয-যুহদুল কাবীর আবু বকর বায়হাকী

২৫৪ আয-যুহদ ওয়ার রাকা-ইক (কিতাবুয যুহদ) আব্দুল্লাহ বিন মুবারক

২৫৫ যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়া

২৫৬ যাহরুল আকাম ফিল আমসাল ওয়াল হিকাম নূরুদ্দিন আল-ইউসী

{বর্ণ: স}

২৫৭ আস-সুনাহ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল

ইসলামের ইতিহাস

উৎস ও তথ্যসূত্র

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

৪৬৩ হি. ৮ মাকতাবাতু খানিজি, কায়রো ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

৪৬৩ হি. ২ মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়াহ ১৪০৭ হি.

৪৬৩ হি. ৭ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৪৬৩ হি. ২ দারুল আসিমাহ, রিয়াদ ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.

৫০০ হি. ২ মুয়াসসাসাতু উলুমিল কুরআন, বৈরুত ১৪০৫ হি.

৫৬৩ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ প্রাপ্ত

৭৩৯ হি. ১

- .
- .
- .
- ১ মুয়াসসাসাতু নাশরিল ইসলামি, কুম, ইরান ১৪১৭ হি.

- ১ দানিশগাহে মাশহাদ
- .

১২৩০ হি. ২ মারকাযুল হারামাইনিল ইসলামি, ফয়সালাবাদ ২০০৭ খ্রি.

১২৫২ হি. ৬ দারুল নাশর, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৪৬৫ হি. ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত প্রাপ্ত

- ৭৩৮ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা
- .

৮১৮ হি. ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪০৫ হি.

৯৩০ হি. ১ দারুল কলমিল আরাবি, হালাব ১৪২৩ হি.

১০৬০ হি. এর পর ২ দারুল গারবিল ইসলামি ১৪০৩ হি. - ১৯৮২ খ্রি.

{হরফ যা (ي)}

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

২৩১ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

৩৫৮ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়াহ, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রি.

১৮১ হি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ প্রাপ্ত

৫৭১ হি. ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

১১০২ হি. ৩ আশ-শারিকাতুল জাদিদাহ, মরক্কো ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.

{হরফ সীন (س)}

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

২৯০ হি. ২ দারু ইবনিল কায়্যিম, দাম্মাম ১৪০৬ হি.

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম লেখক

২৫৮. আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৫৯. আস-সুনানুস সাগির আবু বকর আল-বাইহাকী

২৬০. আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী আবু বকর আল-বাইহাকী

২৬১. আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ বুরহানুদ্দীন হালাবী

২৬২. আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আবুল হাসান আলী আন-নাদভী

২৬৩. আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ ইবনে হিব্বান আল-বুসতী

২৬৪. আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী

২৬৫. আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সহীহাহ: মুহাওয়লাতু লি-তাতবীক কাওয়াইদিল মুহাদিসীন ফী নাকদি রিওয়ায়াতিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমারী

২৬৬. আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ মিনাল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ হাফিজ ইবনে কাসীর

২৬৭. আস-সিরাহ ওয়াদ দাওয়াহ ফিল আহদিল মাদানী আহমদ গালুশ

২৬৮. আস-সাইফুল মাসলুল আলা মান সাববার রাসূল তাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী

২৬৯. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সিরাতি খাইরিল ইবাদ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী

২৭০. সিমতুন নুজুমিল আওয়ালী ফী আনবাউল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালী আব্দুল মালিক আল-ইসামি আল-মাক্কী

২৭১. সুনানে ইবনে মাজাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ কাযভীনী

২৭২. সুনানে আবু দাউদ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানী

২৭৩. সুনানে তিরমিযী মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী

২৭৪. সুনানে দারাকুতনী আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী

২৭৫. সুনানে দারেমী আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী

২৭৬. সুনানে সাঈদ বিন মানসুর সাঈদ বিন মানসুর শু'বাহ আল-খুরাসানী

২৭৭. সুনানে নাসায়ী (আল-মুজতাবা) আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৭৮. সুয়ালাতুল আজুরী লি-আবি দাউদ আবু দাউদ সিজিস্তানী

২৭৯. সিয়রু আলামিন নুবালা শামসুদ্দীন আয-যাহাবী

২৮০. সিরাতে ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আল-মাদানী

২৮১. সিরাতে ইবনে হিশাম আব্দুল মালিক বিন হিশাম

২৮২. সীরাতুননবী আল্লামা শিবলী নোমানী

২৮৩. সিরাতে খাতামুল আশ্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুফতি মুহাম্মদ শফী

২৮৪. সিরাতে খুলাফায়ে রাশেদীন মাওলানা আব্দুল শাকুর লখনভী ফারুকী

২৮৫. সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজীজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম আল-মিসরী

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৩০৩ হিজরী ১২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২১ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

৪৫৮ হিজরী ৪ জামিয়া আদ-দিরাসাত আল-ইসলামিয়া, করাচি ১৪১০ হিজরী - ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪৫৮ হিজরী ১০ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩২ হিজরী ৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৩২৭ হিজরী

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ দোহা, কাতার ১৩০০ হিজরী

৩৯২ হিজরী ২ আল-কুতুব আস-সাকাফিয়াহ, বৈরুত ১৩১৭ হিজরী

সমসাময়িক ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪২৯ হিজরী - ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৭ হিজরী ৪ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৩৯৫ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬২ হিজরী ১ দারুল ফাতহ, আম্মান, জর্ডান ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৯৩২ হিজরী ১২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১১১ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৭৩ হিজরী ২ দারুল ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়াহ উল্লেখ নেই

২৭৫ হিজরী ৪ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, সিদা, বৈরুত উল্লেখ নেই

২৭৯ হিজরী ৫ মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৫ হিজরী ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩৯৫ হিজরী ৪ দারুল মা'রিফাহ, সৌদি আরব ১৩১২ হিজরী

২২৭ হিজরী ২ দারুস সালাফিয়াহ, ভারত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৩ হিজরী ৮ কুতুব আল-মাতবুয়াত আল-ইসলামিয়াহ, আলেপ্পো ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

.

১ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ২৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৫১ হিজরী ১ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৩৯৮ হিজরী - ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

২১৩ হিজরী ২ মাতবা মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ১৩৭৫ হিজরী - ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ ৭ দ্বীনি কুতুবখানা, লাহোর ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুল ইশাআত, করাচি উল্লেখ নেই

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ ১ কুতুবখানা মজিদিয়া, মুলতান উল্লেখ নেই

২১৩ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

তারীখে উম্মতে মুসলিমা তৃতীয় খণ্ড

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

২৮৬. সীরাত ওয়া মানাকিব উমর বিন আব্দুল আজিজ ইবনুল জাওযী

{হরফ শীন}

২৮৭. শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী

২৮৮. শরীয়ত ওয়া তরিকত কা তালাযুম শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী

২৮৯. আশ-শিফাউল ফিয়াদ মিন উলুমি ইবনুস সালাহ আবু ইসহাক আল-আবনাসী

২৯০. আশ-শরীয়াহ আবু বকর আল-আজুররী আল-বাগদাদী

২৯১. আশ-শিফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তফা আল-কাজী আইয়ায বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি

২৯২. আশ-শামারিখ ফী ইলমিত তারিখ জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী

২৯৩. আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়াহ (শামাইলে তিরমিযী) মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী

২৯৪. আশ-শীআহ ওয়াত তাশাইয়ু ইহসান ইলাহী যহীর

২৯৫. শরহু আকাইদিন নাসাফী সা'দুদ্দিন তাফতযানী

২৯৬. শরহুল আরবাইঈন আন-নববিয়াহ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

২৯৭. শরহুত তাবসিরাহ ওয়া তাসকিরাহ (আলফিয়াতুল ইরাকী) আল-হাফিজ যয়নুদ্দিন আল-ইরাকী

২৯৮. শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ আবু আব্দুল্লাহ আয-যুরকানী আল-মালিকী

২৯৯. শরহুস সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ আল-ফাররা আল-বাগভী

৩০০. শরহুস সুন্নাহ ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী

৩০১. শরহু সহীহ মুসলিম (আল-মিনহাজ) ইমাম শরফ আন-নববী

৩০২. শরহু উকূদি রাসমিল মুফতী আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী

৩০৩. শরহু মুশকিলিল আসার আবু জাফর আত-তাহাবী

৩০৪. শরহু মাআনিল আসার আবু জাফর আত-তাহাবী

৩০৫. শরহু নুখবাতিল ফিকার মোল্লা আলী কারী

৩০৬. শরফুল মুস্তফা আবু সাঈদ আল-খারকুশী

৩০৭. শুআবুল ঈমান আবু বকর আল-বাইহাকী

৩০৮. শাহাদাতে ইমাম হুসাইন ওয়া করদারে ইয়াযীদ (উর্দু অনুবাদ: মাওলানা আনোয়ারুল হাসান শেরকোটী) মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী

{হরফ সোয়াদ}

৩০৯. আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ আবু নাসর আল-জাওহারী আল-ফারাবী

৩১০. আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফযি ওয়ায যান্দাকাহ ইবনে হাজার হাইতামী

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমাহ সপ্তম খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৯৭ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২২ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

শ বর্ণ

১০৮৯ হিজরী ১১ দার ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬

খ্রিষ্টাব্দ

১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮০২ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৩৪০ হিজরী ৫ দারুল ওয়াতান, সৌদি আরব ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩৩ হিজরী ২ দারুল ফিকর ১৪০৯ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল আদাব উল্লেখ নেই

৭৯৩ হিজরী ১ দার ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

৫১৩ হিজরী ১ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫

খ্রিষ্টাব্দ

৭৯৩ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি ১৪৩০ হিজরী

১৩২১ হিজরী ১ দারুল শারকিল আরাবি ১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

৮০৬ হিজরী ২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১২৩ হিজরী ১২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬

খ্রিষ্টাব্দ

৫১২ হিজরী ১৩ আল-মাকতাবুল ইসলামি, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩

খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরাবা আল-আসারিয়াহ, সৌদি আরব ১৪১৫

হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৬৭৬ হিজরী ৬ দার ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৩৯২ হিজরী

১২৫৭ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩০ হিজরী

৩৩১ হিজরী ১৬ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৩২১ হিজরী ৫ আলমুল কুতুব ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

১০১০ হিজরী ১ দারুল তুরাস, বৈরুত উল্লেখ নেই

৪৬০ হিজরী ২ দারুল রায়াহ লিন-নাশরিল ইসলামি, মক্কা ১৪২৩ হিজরী

৬৫৮ হিজরী ১৪ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯৬ হিজরী ১ তাহরিক খুদাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, লাহোর
উল্লেখ নেই

স বর্ণ

৩৯৩ হিজরী ৬ দারুল ইলম, বৈরুত ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৪ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

অংশ ৩

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখক

- 311 | সাব্বুল আজাব আলা মান সাব্বাল আসহাব | আল্লামা মাহমুদ আলুসী
- 312 | সহীহ আল-বুখারী | মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী
- 313 | সহীহ মুসলিম | মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী
- 314 | সিফাতুস সাফওয়াহ | আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী
- 315 | সিফাতুন নিফাক ওয়া যাম্মুল মুনাফিকীন | আবু জাফর আবু বকর আল-ফিরইয়্যাবী

- 316 | সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস | আবু আবদুল্লাহ আল-হিময়্যারী

{হরফ দাদ}

- 317 | আদ-দুয়াফাউল কাবীর | আবু জাফর আল-উকাইলী আল-মাক্কী
- 318 | আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন | আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী
- 319 | আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন | আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী

{হরফ ত}

- 320 | আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ | তাকিউদ্দীন তামীমী
- 321 | তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান ওয়াল ওয়ারিদ্দীনা আলাইহা | আবুশ শাইখ আল-আসবাহানী
- 322 | তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিম লি-সাহাবাতিত তাবাকাতিল খামিসাহ | মুহাম্মদ বিন সাদ
- 323 | তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিম লি-সাহাবাতিত তাবাকাতির রাবিআহ | মুহাম্মদ বিন সাদ
- 324 | তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) | মুহাম্মদ বিন সাদ

দ্রষ্টব্য: অধিকাংশ স্থানে তাবাকাত ইবনে সাদের দার সাতির সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

- 325 | তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) | মুহাম্মদ বিন সাদ
- 326 | তাবাকাতুল আতিব্বা | ইবনে আবী উসাইবিয়্যাহ
- 327 | তাবাকাতুল উমাম | কাজী ইবনে সাঈদ আল-আন্দালুসী
- 328 | তাবাকাতুল আউলিয়া | ইবনুল মুলাক্কিন আল-মিসরী
- 329 | তাবাকাতুল হনাবিলাহ | আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়াল্লা
- 330 | তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ | আবদুর রহমান আস-সুলামী নিশাপুরী
- 331 | তাবাকাতুল ফুকাহা | আবু ইসহাক শিরাজী
- 332 | তাবাকাতুল ফুকাহাশ শাফিইয়্যাহ | ইবনুস সালাহ
- 333 | তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন (তরীফু আহলিত তাকদীস বি-মারাতিবিল মাউসুফীনা বিত-তাদলীস) | ইবনে হাজার আসকালানী
- 334 | তাবাকাতুল মুফাসসিরীন | জালালুদ্দীন সুয়ুতী
- 335 | তাবাকাতুল মুফাসসিরীন | আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-আদনাবী

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় অংশ

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

১৩৩২ হি ১ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৭ হি - ১৯৯৭ খ্রি

২৫৬ হি ৯ দারুত তুরুকুন নাজাত ১৪২২ হি

২৬১ হি ৫ দারুল জিল ১৪১৩ হি - ১৯৯৩ খ্রি

৫৯৭ হি ২ দারুল হাদিস কায়রো, মিসর ১৪২১ হি - ২০০০ খ্রি

৩০১ হি ১ দারুস সাহাবাহ লিত-তুরাস, মিসর ১৪০৮ হি - ১৯৮৮ খ্রি

৯০০ হি ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৪০৮ হি - ১৯৮৮ খ্রি

বর্ণ যদ (ض)

৩২২ হি ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪০৩ হি - ১৯৮৩ খ্রি

৩০৩ হি ১ দারুল ওয়াঈ, হালব ১৩৯৬ হি

৫৯৭ হি ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০২ হি

বর্ণ ত (ط)

১০১০ হি ১ মাকতাবা শামিলা

৩৯৭ হি ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১২ হি - ১৯৯২ খ্রি

২৩০ হি ২ মাকতাবাতুস সিদিক, তায়েফ ১৪১৩ হি - ১৯৯৩ খ্রি

২৩০ হি ১ মাকতাবাতুস সিদিক, তায়েফ ১৪১২ হি

২৩০ হি ৮ দারু সাদির ১৯৬৮ খ্রি

৩৩০ হি ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১০ হি - ১৯৯০ খ্রি

৬৬৮ হি ১ মাকতাবা শামিলা

৪৬৩ হি ১ বৈরুত ১৯১২ খ্রি

৮০৩ হি ১ মাকতাবাতুল খাঞ্জি, কায়রো ১৪১৫ হি - ১৯৯৩ খ্রি

৫২৬ হি ২ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত প্রাপ্ত

৪১২ হি ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৯ হি - ১৯৯৮ খ্রি

৪৬৭ হি ১ দারুল রাইদিল আরাবি, বৈরুত ১৯৬০ খ্রি

৭৩৩ হি ২ দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রি

৮৫৩ হি ১ মাকতাবাতুল মানার ১৪০৩ হি - ১৯৮৩ খ্রি

৯১১ হি ১ মাকতাবা ওয়াহবা, কায়রো ১৩৯৬ হি

একাদশ হিজরি শতাব্দী ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, সৌদি আরব ১৪১৭ হি -

১৯৯৭ খ্রি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

{অক্ষর ‘আইন’ (ع)}

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৩৩৬ আল-আশির মিনাল মশইয়াখাতিল বাগদাদিয়্যাহ আবু তাহির আস-সিলাফি

৩৩৭ আল-ইবার ফি খবর মান গাবার হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৩৩৮ আল-আরশ হাফিজ যাহাবি

৩৩৯ আল-আরফুশ শাযি শারহ সুনানিত তিরমিযি মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি

৩৪০ আল-আকাইদুন নাসাফিয়্যাহ উমর বিন মুহাম্মদ আবু হাফস আন-নাসাফি

৩৪১ আল-ইকদুল ফারিদ আবু উমর ইবনে আবদে রাবিহি

৩৪২ আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ (আলবানীর টীকা সহ) আবু জাফর আত-তাহাবি

৩৪৩ আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি

৩৪৪ আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি

৩৪৫ আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল আহমদ বিন হাম্বল

৩৪৬ আল-উলুউ আলাল গাফফার হাফিজ যাহাবি

৩৪৭ আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনে আশ-শাইখ আল-বাবরতি

৩৪৮ আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম আবু বকর ইবনুল আরাবি

৩৪৯ আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ইবনুল ওয়াযির আল-কাসিমি

৩৫০ আল-উযুন ওয়াল হাদাইক ফি আখবারিল হাকাইক (জুযউ খিলাফাতিল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক) মাআ তাজারিবিল উমাম ওয়া তাআকুবিল হিমাম লি ইবনে মিসকাওয়াইহ অজ্ঞাত

৩৫১ আরিদাতুল আহওয়াযি বি শারহি সহীহিত তিরমিযি ইবনুল আরাবি আল-মালিকি

৩৫২ আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ - মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক বর্ণনার পর্যালোচনার একটি প্রচেষ্টা আকরাম যিয়া উমারি

৩৫৩ উমদাতুত তালিব ফি আনসাযি আলি আবি তালিব ইবনে ইনাবাহ জামালুদ্দিন আল-হুসাইনি

৩৫৪ উমদাতুল কারি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি

৩৫৫ আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ ইব্রাহিম বিন বাযরাহ, ইবনুস সুন্নি

৩৫৬ আহদে নববীর যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ ডক্টর হামিদুল্লাহ হায়দ্রাবাদি

৩৫৭ আউনুল মাবুদ শারহ সুনানি আবি দাউদ শরাফুল হক সিদ্দিকী আজিমাবাদি

৩৫৮ উযুনুল আখবার ইবনে কুতাইবাহ আদ-দিনাওয়ারি

৩৫৯ উযুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা ইবনে আবি উসাইবিয়াহ

৩৬০ উযুনুর রাসাইল ওয়াল আজউইবাহ আনিল মাসাইল শাইখ আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান আল শাইখ

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

তৃতীয় খণ্ড

বর্ণ ‘আইন’

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

৫৬৭ হি. ১ মাকতাবা শামিলা উল্লিখিত নেই

৭৩৮ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লিখিত নেই

৭২৮ হি. ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারা ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৩৯৩ হি. ৫ দারুত তুরাসিল আরাবি ১৪২৫ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫৩ হি. ১ কাসিমিয়া শরহে আল-আকায়েদ আন-নাসাফিয়া, আল-মাকতাবাতুল বাশরি কর্তৃক মুদ্রিত ১৪৩০ হি. - ২০০৯ খ্রি.

৩২৮ হি. ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৩ হি.

৩২১ হি. ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪১৩ হি.

৭২৮ হি. ১ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রি.

৭২৮ হি. ১ আদওয়াউস সালাফ ১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

২২১ হি. ৩ দারুল কায়ানি, রিয়াদ ১৪২২ হি.

৭২৮ হি. ১ মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

৭৪৬ হি. ১০ দারুল ফিকর উল্লিখিত নেই

৫২৩ হি. ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৩৯৭ হি. - ১৯৭৮ খ্রি.

৮২০ হি. ৯ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১৫ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

অজ্ঞাত ১ লিডেন, হল্যান্ড ১৮৭১ খ্রি.

৫৩৩ হি. ১৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লিখিত নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল ওবাইকান ১৪৩০ হি. - ২০০৯ খ্রি.

৮২৮ হি. ২ মাতবাআ হায়দারিয়া, নাজাফ ১৯৬৯ খ্রি.

৮৫৫ হি. ২৫ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি উল্লিখিত নেই

৬৩ হি. ১ দারুল কুতুবিল লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, বৈরুত উল্লিখিত নেই

১৪২৩ হি. - ২০০২ খ্রি. ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৯৮২ খ্রি.

৩২৯ হি. ১৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হি.

৭৬৭ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হি.

২৬৮ হি. ১ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত উল্লিখিত নেই

১২৯৩ হি. ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ উল্লিখিত নেই

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ক্রমিক নং | কিতাবের নাম | লেখক

হরফ গাইন (غ)

আল-গায়া ফি শারহিল হিদায়া ফি ইলমিদ দিরায়া (শামস উদ্দিন সাখাভী) ৩৬১

গায়াতুল মাকসাদ ফি জাওয়াইদিল মুসনাদ (নূর উদ্দিন হাইসামি) ৩৬২

হরফ ফা (ف)

আল-ফারুক (আল্লামা শিবলী নোমানী) ৩৬৩

আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া হাররানি) ৩৬৪

৩৬৪

আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতাওয়া আলমগিরি) (ভারতের ফকীহগণের কমিটি) ৩৬৫

৩৬৫

আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল (সাইফ বিন উমর তামিমি) ৩৬৬

আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়া ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়া (ইবনুত তিকতাকা,

মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে তাবাতাবা) ৩৬৭

আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (আবু মনসুর আব্দুল কাহির আল-ইসফারায়িনী আল-বাগদাদী)

..... ৩৬৮

আল-ফুরকুল লুগাবিয়্যাহ (আবু হিলাল আল-আসকারী) ৩৬৯

আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (ইবনে হাজম আল-আন্দালুসি)

..... ৩৭০

আল-ফুসুল ফিল উসুল (ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আল-রাজি) ৩৭১

আল-ফুসুল ফিস সিরাহ (হাফেজ ইবনে কাসীর) ৩৭২

আল-ফিকহুল আবসাত (ইমাম আবু হানিফা) ৩৭৩

আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ (ওয়াহবা আল-জুহাইলি) ৩৭৪

আল-ফিকহুল আকবার (ইমাম আবু হানিফা) ৩৭৫

আল-ফিকহুল আকবার (ইমাম আবু হানিফা) ৩৭৬

আল-ফিকহুল মুয়াসসার ফি দাউইল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ (একদল লেখক) ৩৭৭

আল-ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ (আব্দুর রহমান আল-জাজিরি) ৩৭৮

আল-ফিহরিস্ত (ইবনে নাদিম আল-বাগদাদী) ৩৭৯

ফাতাওয়া ইবনে আস-সালাহ (ইবনে আস-সালাহ) ৩৮০

ফাতাওয়া রশিদীয়া (মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী) ৩৮১

ফাতাওয়া উসমানি (মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি) ৩৮২

ফাতহুল বারী (হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী) ৩৮৩

ফাতহুল বারী (ইবনে রজব হাম্বলী) ৩৮৪

ফাতহুল কাদির (কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম সিওয়াসি) ৩৮৫

ফাতহুল কাদির (মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী) ৩৮৬

তারিখ امت مسلمہ (তারিখে উম্মতে মুসলিমা)

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

বর্ণ غ

৯০৩ হি. ১ মাকতাবাতু আদওয়াউল মানার ২০০১ খ্রি.

৮৭০ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.

বর্ণ ف

১৯১৩ খ্রি. ১ দারুল ইশাআত ১৯৯১ খ্রি.

৭২৮ হি. ৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৭ খ্রি.

প্রায় ১১০০ হি. ৬ দারুল ফিকর ১৪১০ হি.

৩০০ হি. ১ দারুল ইখলাস ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৭০৯ হি. ১ দারুল কলম আল-আরাবি, বৈরুত ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৪২৯ হি. ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৯৭৭ খ্রি.

৩৯৫ হি. ১ দারুল ইলম ওয়া সাকাফাহ, মিশর উল্লেখ নেই

৩৯৬ হি. ৫ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৭০ হি. ৪ ওয়াজারাতুল আওকাফ আল-কুয়েতিয়াহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৭৭৭ হি. ১ মুয়াসসাসাতু উলুমিল কুরআন ১৪০৩ হি.

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়াহ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

১০১৫ খ্রি. ১০ দারুল ফিকর, দামেস্ক উল্লেখ নেই

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়াহ ১৯৯৯ খ্রি.

১৫০ হি. ১ মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাত আল-আরাবিয়াহ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাজমাউল মালিক ফাহাদ ১৪২৩ হি.

১৩৬০ হি. ৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৪৩৮ হি. ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খ্রি.

৬৩৩ হি. ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম ১৪০৭ হি.

১৩২৩ হি. ১ দারুল ইশাআত ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক

মাকতাবাতু মাআরিফুল কুরআন, করাচি ১৪৩১ হি. - ২০১০ খ্রি.

৮৫২ হি. ১৩ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১৭ হি.

৭৯৫ হি. ৯ দারুল হারামাইন, কায়রো ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খ্রি.

৮৬১ হি. ১০ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

১২৫০ হি. ৬ দারু ইবনে কাসীর ১৪১৩ হি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

৩৮৭ ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস শামসুদ্দীন আস-সাখাভী

৩৮৮ ফাতহ মিসর ইবনে আব্দুল হাকাম

৩৮৯ ফাতহ নামা সিন্দ (চাচ নামা) আবু হামিদ আল-কুফী

৩৯০ ফিতনা মাকতাল উসমান মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ তাহবান আল-কাসি

৩৯১ ফিতনা ইস্তিশরাক আল্লামা শামসুল হক আফগানি

৩৯২ ফুতুহুল বুলদান আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি

৩৯৩ ফুতুহুল শাম আল-আযদি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আযদি

৩৯৪ ফুতুহুল শাম লিল ওয়াকিদি মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি

৩৯৫ ফুতুহ মিসর ওয়াল মাগরিব আব্দুর রহমান বিন আব্দুল হাকাম আবুল কাসিম

আল-মিসরি

৩৯৬ ফাজরুল ইসলাম আহমদ আমিন

৩৯৭ ফিরাকুশ শিয়া হাসান বিন মুসা আন-নুবখতি

৩৯৮ ফাযাইহুল বাতিনিয়্যাহ ইমাম গাজালী

৩৯৯ ফাযাইলুস সাহাবা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

{হরফ ক্বাফ}

৪০০ আল-কামুসুল জাদিদ (আরবি থেকে উর্দু) ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভী

৪০১ কায়েদাতুন ফিল মুয়াররিখীন তাজউদ্দীন আস-সুবকী

৪০২ কিসসাতুল হাযারাহ উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট, অনুবাদ: ডক্টর জাকি নাজিব

৪০৩ কিসসাতুল আরব ফি ইস্পানিয়া (দ্য স্টোরি অফ মুরস ইন স্পেন) অনুবাদ:

আলী জাযিম বেক, স্ট্যানলি লেন-পুল

৪০৪ কিসাসুম মিনাত তারিখ আলী আত-তানতাভী

৪০৫ কাযায়াল মারআতি ফিল মুতামারাত আদ-দুওয়ালিয়্যাহ ডক্টর ফুয়াদ বিন

আব্দুল কারীম

৪০৬ কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদীস (ইলাউস সুনান খণ্ড: ১৮) মাওলানা জাফর

আহমদ উসমানী

৪০৭ কুতুল কুলুব আবু তালিব আল-মাক্কী

{হরফ কাফ}

৪০৮ কাইফা নাকরাউ তারিখাল আল ওয়াল আসহাব আব্দুল কারীম বিন খালিদ

আল-হারবী

৪০৯ আল-কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহ রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিভাহ হাফিজ যাহাবী

হাফিজ যাহাবী

৪১০ আল-কাফি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী

৪১১ আল-কামিল ফিত তারিখ ইবনে আসীর আল-জাহারী

৪১২ আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৯০৩ হি. ৪ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মিসর ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল ওয়াফা ১৯৯৯ খ্রি.

২১৩ হি. ১ মজলিস মাখতুতাত কাসিমিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৯৩৯ খ্রি.

সমসাময়িক ২ ইমারাতুল বাহসুল ইলমি, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৪০৩ হি. ১ সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি উল্লেখ নেই

৭৬৯ হি. ১ দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রি.

১৬৫ হি. ১ ব্যাপ্টিস্ট মিশন, কলকাতা ১৮৫৩ খ্রি.

৩০৭ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৪৫৮ হি. ১ মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দ্বীনিয়্যাহ ১৪১৫ হি.

৭১৩ হি. ১ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৯৩০ খ্রি.

তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ১ মাকতাবাতু হায়দারিয়া, নাজাফ উল্লেখ নেই

৫০৫ হি. ১ মুয়াসসাসাতু দারুস সাকাফাহ, কুয়েত উল্লেখ নেই

৪২১ হি. ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

{হরফ ক্বাফ (ق)}

১৯৯৫ খ্রি. ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১১ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৭৬৭ হি. ১ দারুল বাশাইর, বৈরুত ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

১৯৮১ খ্রি. ৪২ দারুল জিল, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

১৯৩১ খ্রি. ১ কালিমাত আরাবিয়্যাহ, কায়রো ১৯৩৩ খ্রি.

১৩২০ হি. ১ দারুল মানারাহ, সৌদি আরব ১৪২৭ হি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

১৩৯৩ হি. ১ দারুল ফিকর ১৪২১ হি. - ২০০১ খ্রি.

৪৮৬ হি. ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

{হরফ কাফ (ك)}

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ ১৪২৭ হি. - ২০০৭ খ্রি.

৭৩৮ হি. ২ দারুল কিবলাহ, জেদ্দা ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৬২০ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৬৩০ হি. ১০ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৮৫ হি. ৪ দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৪১৩ আল-কামিল ফি দুয়াফা আল-রিজাল আবু আহমদ ইবনে আদি

৪১৪ আল-কিফায়া ফি ইলম আল-রিওয়ায়াহ খতিব বাগদাদী

৪১৫ আল-কুনা ওয়াল-আসমা মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী

৪১৬ আল-কাওয়াকিব আল-দুরারি ফি শারহ সহীহ আল-বুখারী শামস আল-দীন আল-কিরমানি

৪১৭ আল-কাওসার আল-জারি ইলা রিয়াদ আহাদিস আল-বুখারী আহমদ বিন ইসমাইল আল-কুরানি

৪১৮ কিতাব আল-আসার কাজী আবু ইউসুফ

৪১৯ কিতাব আল-আদকিয়া আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি

৪২০ কিতাব আল-উলাত ওয়া কিতাব আল-কুদাত (কিতাব উলাত মিসর) আবু উমর আল-কিন্দি

৪২১ কিতাব সুলাইম বিন কাইস আল-হিলালি (তাহকীক: বাকির আল-আনসারী) সুলাইম বিন কাইস আল-হিলালি

৪২২ কাশফ আল-আসরার আল-বাতিনিয়াহ ওয়া আখবার আল-কারামিতাহ মুহাম্মদ বিন মালিক ইয়ামানি

৪২৩ কাশফ আল-আস্তার আন জাওয়াইদ আল-বাজার নূর আল-দীন হাইসামি

৪২৪ কাশফ আল-জুনুন আন আসামি আল-কুতুব ওয়াল-ফুনুন (মাআল ইদাহ আল-মাকনুন) হাজী খলিফা কাতিব চালপি

৪২৫ কাশফ আল-মুশকিল মিন হাদিস আল-সহীহাইন আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি

৪২৬ কানজ আল-দাকাইক আবদুল্লাহ বিন আহমদ হাফিজ আল-দীন আল-নাসাফি

৪২৭ কানজ আল-উম্মাল আলাউদ্দিন মুত্তাকী বুরহানপুরী

হরফ লাম

৪২৮ লুবাব আল-আনসাব ইবনে ফান্দাক আল-বাইহাকী

৪২৯ লুবাব আল-নুকুল ফি আসবাব আল-নুজুল জালাল আল-দীন সুযুতী

৪৩০ লিসান আল-আরব ইবনে মানজুর আফ্রিকি

৪৩১ লিসান আল-মিজান ইবনে হাজার আসকালানি

৪৩২ লাওয়ামি আল-আনোয়ার আল-বাহিয়াহ আবুল আউন আল-সাফারিনী আল-হাম্বলী

হরফ মীম

৪৩৩ আল-মামুন শিবলী নোমানী

৪৩৪ আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি বুরহান আল-দীন ইবনে মুফলিহ

৪৩৫ আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি বুরহান আল-দীন আবু ইসহাক ইব্রাহিম

৪৩৬ আল-মাবসুত মুহাম্মদ বিন আহমদ আবু সাহল আল-সারাকসি

৪৩৭ আল-মুহাব্বার ওয়াল-মুফতারাক খতিব বাগদাদী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৩২৫ হিজরী ৯ আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৩১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, মদিনা মুনাওয়ারা উল্লেখ নেই

৪৬১ হিজরী ২ ইমাদাতুল বাহাস আল-ইলমি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৮৬ হিজরী ২৫ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

৮৯৩ হিজরী ১১ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২৯ হিজরী - ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

১৮২ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৫৯৭ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গাজ্জালি উল্লেখ নেই

৩৫৫ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

অজানা ১ ইনতিশারাত দলিল মা, তেহরান ১৩২৮ হিজরী

৭৭০ হিজরী ১ মাকতাবাতুস সামি, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৮০৭ হিজরী ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

১০৬৭ হিজরী ৬ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ

৫৯৭ হিজরী ৪ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৭০১ হিজরী ১ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৯৭৫ হিজরী ১৬ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

বর্ণ: লাম (ল)

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৬৫ হিজরী ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

৯১১ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৭১ হিজরী ১৫ দারু সাদির, বৈরুত ১৪১৩ হিজরী

৮৫২ হিজরী ৭ মাতবাআ নিযামিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হিজরী - ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ

১১৮৮ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুল আফাকাইন ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

বর্ণ: মিম (ম)

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, ইউপি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৮৮৩ হিজরী ৮ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৩১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৮৮৩ হিজরী ৮ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৩১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৩ হিজরী ৩০ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ৩ দারুল কাদরি, দামেস্ক ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

গ্রন্থপঞ্জি

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখক

- ৪৩৮. আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম — আবু বকর আদ-দিনাওয়ারি আল-মালিকি
- ৪৩৯. আল-মাজরুহিন মিনাল মুহাদিসিন ওয়াদ দুয়াফা ওয়াল মাতরুকিন — ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি
- ৪৪০. আল-মাজমু’ শারহুল মুহাযযাব — মুহিউদ্দিন শারাফ আন-নববী
- ৪৪১. আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাউয়ি — ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ আল-বাইহাকী
- ৪৪২. আল-মুহিব্বার — মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-বাগদাদী আবু জাফর
- ৪৪৩. আল-মুহতযিরিন — ইবনে আবীদ দুনিয়া
- ৪৪৪. আল-মুহাররার ফিল ফিকহ আলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল — আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি
- ৪৪৫. আল-মিহান — আবু আল-আরব আত-তামিমি
- ৪৪৬. আল-মুখতার মিন নাওয়াদিরিল আখবার — মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইসমাইল আল-আশআরি আল-বায়ারি
- ৪৪৭. আল-মুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল — আবদুল আজিজ ইবনে জামাআহ আল-কিনানি
- ৪৪৮. আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার — আবুল ফিদা
- ৪৪৯. আল-মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ — মুহিউদ্দিন আল-কাফিয়াজি
- ৪৫০. আল-মারাসিল — ইবনে আবি হাতিম
- ৪৫১. আল-মারতাবাতুল উলইয়া ফিমান ইয়াসতাহিক্কুল কাদা ওয়াত ফুতইয়া (তারিখু কুদাতিল আন্দালুস) — আবুল হাসান আল-মালিকি
- ৪৫২. আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাহ ওয়া আনওয়াইহা — জালালুদ্দিন সুয়ুতী
- ৪৫৩. আল-মাসাইল ওয়াল আজউইবাহ — আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি
- ৪৫৪. আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন — হাকিম নিশাপুরী
- ৪৫৫. আল-মুসলিমুন ওয়া কিতাবাতুত তারিখ — ডক্টর আবদুল আলিম আবদুর রহমান খিজর
- ৪৫৬. আল-মাসাহিফ — আবু বকর ইবনে আবি দাউদ সিজিস্তানি
- ৪৫৭. আল-মুসাফফা শারহুল মুয়াত্তা মা’আল মুসাউওয়া — শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিস দেহলভী
- ৪৫৮. আল-মাআরিফ — ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি
- ৪৫৯. আল-মাআলিমুল আসিরিয়াহ ফিস সুন্নাহ ওয়াস সিরাহ — মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাসান শাররাব
- ৪৬০. আল-মু’জামুল আওসাত — আবুল কাসিম আত-তাবারানি
- ৪৬১. আল-মু’জামুস সাগির — আবুল কাসিম আত-তাবারানি
- ৪৬২. আল-মু’জামুল কাবির — আবুল কাসিম আত-তাবারানি
- ৪৬৩. আল-মু’জামুল কাবির আল-মুজাল্লাদ আন: আস-সালেস আশারা ওয়ার রাবে’ আশারা — আবুল কাসিম আত-তাবারানি
- ৪৬৪. আল-মা’রিফাহ ওয়াত তারিখ — ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাউয়ি
- ৪৬৫. আল-মু’ঈন ফি তাবাকাতিল মুহাদিসিন — হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৩৩৩ হিজরী ১০ জমিয়াতুত তারবিয়াতুল ইসলামিয়া, বাহরাইন ১৪১৯ হিজরী

৩৫২ হিজরী ৩ দারুল ওয়ায়ি, হালব ১৩৯২ হিজরী

৪৬৭ হিজরী ১ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

৩২০ হিজরী ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

২২৫ হিজরী ১ দারুল আ ফাক, বৈরুত উল্লেখ নেই

২৮১ হিজরী ১ দারু ইবনে হাজম, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৬৫২ হিজরী ২ মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৩ হিজরী ১ দারুল উলুম, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

সপ্তম হিজরী শতাব্দী ১ দারুল কিতাব, বাগদাদ ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৭ হিজরী ১ দারুল বাশির, আম্মান ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৩২ হিজরী ৪ আল-মাতবাতাতুল হুসাইনিয়াতুল মিসরিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৫৮৯ হিজরী ১ আলমুল কুতুব ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩২ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরী

৭৯২ হিজরী ১ দারুল আ ফাকুল জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ ১৪২৫ হিজরী - ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৫ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১১ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ আল-মা'হাদুল আ'লি লিল ফিকরিল ইসলামি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩১৬ হিজরী ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ, মিসর ১৪২৩ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬১ হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মাতবা ফারুকি, দিল্লি ১২৯৩ হিজরী

৩৭১ হিজরী ১ আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আন্মাহ, কায়রো ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪১১ হিজরী

৩১০ হিজরী ১০ দারুল হারাসাইন, কায়রো উল্লেখ নেই

৩১০ হিজরী ২ দারু আন্মার, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩১০ হিজরী ২৫ মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩১০ হিজরী ২ ডক্টর সাদ বিন আবদুল্লাহ উল্লেখ নেই

২৭৭ হিজরী ৩ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ১ দারুল ফুরকান, জর্ডান ১৪০৪ হিজরী

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৪৬৬ আল-মুগনি ফিল দুয়াফা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৪৬৭ আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব ডক্টর জাওয়াদ আলী

৪৬৮ আল-মাকালাত ওয়াল ফিরাক সাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশআরি আল-কুমি

৪৬৯ আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি

৪৭০ আল-মাকসাদুল আলি ফি যাওয়াইদি মুসনাদি আবি ইয়লা নূরুদ্দিন আল-হাইসামি

৪৭১ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া ইমাদ আলী জুমআ

৪৭২ আল-মিলাল ওয়ান নিহাল মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি

৪৭৩ আল-মুনতাখাব মিন যাইলিল মুযাইয়িল মুহাম্মদ বিন জারির আত-তবারি

৪৭৪ আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি

৪৭৫ আল-মুনতায়াম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযি

৪৭৬ আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ আল-বাজি আল-আন্দালুসি

৪৭৭ আল-মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ ইবনুল জারুদ নিশাপুরি

৪৭৮ আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল হাফিজ যাহাবি

৪৭৯ আল-মুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-হাশিমি আবু জাফর আল-বাগদাদি

৪৮০ আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খিতাত ওয়াল আসার (খিতাত মাকরিজি) তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি

৪৮১ আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাযাহিব একদল লেখক - গবেষণা: মানি বিন হাম্মাদ আল-জুহানি

৪৮২ আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ ফকিহগণের একটি কমিটি

৪৮৩ আল-মাওসুআতুল মুজাযাহ ফিত তারিখিল ইসলামি আবু সাঈদ আল-মিসরি

৪৮৪ আল-মুকিয়াহ ফি ইলমি মুসতলাহিল হাদিস হাফিজ যাহাবি

৪৮৫ মাআসিরুল ইনাফাহ ফি মায়ালিমিল খিলাফাহ আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি

৪৮৬ মাযা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

৪৮৭ মাজাল্লাতুস সিরাহ প্রবন্ধ: প্রফেসর নিসার আহমদ

৪৮৮ মাজমাউল আনহুর ফি শারহি মুলতাকাল আবহুর আব্দুর রহমান শাইখি যাদা দামাদ আফান্দি

৪৮৯ মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ নূরুদ্দিন আল-হাইসামি

৪৯০ মুজমালু উসুলি আহলিস সুন্নাহ আশ-শাইখ নাসির আব্দুল কারিম আল-আকল

491 মাজমুউল ফাতাওয়া আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৯২ মুহাদারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়ারাতুশ শুআরা ওয়াল বুলাগা আবুল কাসিম আর-রাগিব আল-ইসফাহানি

৪৯৩ মুখতাসারুত তুহফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ (শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদিসে দেহলভি) সারসংক্ষেপ ও পরিমার্জন: আল্লামা আল-ইরাকি মাহমুদ আল-আলুসি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৪৮ হি. ২ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

১৩০৮ হি. ২০ দারুস সাকি ১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.

৩২৯ হি. ১ মাতবা হায়দারি, তেহরান ১৩৪১ হি.

৩২৯ হি. ১ আল-মজলিসুল আ'লা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়া, কায়রো ১৩৯০ হি.

৮০৭ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ সিলসিনাতুত তুরাসিল ইসলামি ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫৩৮ হি. ৩ মুয়াসসাসাতু লাহজি উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল আ'লামি, বৈরুত ১৯৩৯ খ্রি.

৬২০ হি. ১ দারুল রায়াহ উল্লেখ নেই

৫৯৭ হি. ১৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৭৩৭ হি. ৭ মাতবাতুস সাআদাহ, মিসর ১৩৩২ হি.

৩০৭ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়াহ, বৈরুত ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৭৪৮ হি. ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

২২৫ হি. ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৯৮৫ খ্রি.

৮২৫ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪১৮ হি.

সমসাময়িক ২ দারুল নাদওয়াতিল আলামিয়াহ ১৪২০ হি.

.

৪৫ উইজারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়া, কুয়েত ১৪২৪ হি.

সমসাময়িক ১৬ মাকতাবা শামিলা

.

৭৪৮ হি. ১ মাকতাবাতুল আযমিয়াহ লিত-তুরাসিল ইসলামি, হালব ১৪১২ হি.

৮২১ হি. ৩ মাতবাতু হুকুমাতি কুয়েত ১৯৮৫ খ্রি.

১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি. ১ মাকতাবাতুল ঈমান, কায়রো উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ... জারার একাডেমি পাবলিশার্স, করাচি রমজান ১৪২৩ হিজরী

১০৭৮ হি. ২ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

৮০৭ হি. ১০ মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা

.

৭৪৮ হি. ৩৫ মুজান্নাউল মালিক ফাহাদ ১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

৫০২ হি. ২ শারিকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত ১৪২০ হি.

১৩৩২ হি. ১ আল-মাতবাতুস সালাফিয়াহ, কায়রো ১৩৭২ হি.

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৪৯৪ মুখতাসার তারিখ দিমাশক ইবনে মানজুর আল-আফ্রিকি

৪৯৫ মুখতাসার সিরাতুর রাসূল শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

৪৯৬ মুখতাসার কিয়ামুল লাইল মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযি (সংক্ষেপ করেছেন আল-মাকরিজি মৃত্যু ৮৪৫ হিজরি)

৪৯৭ মুখতাসার আল-মুযানি আবু ইব্রাহিম আল-মুযানি

৪৯৮ মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকজান আব্দুল্লাহ বিন আসআদ আল-ইয়াফেয়ি

৪৯৯ মিরআতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান সিবত ইবনুল জাওযি

৫০০ মিরআতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান সিবত ইবনুল জাওযি

৫০১ মিরকাতুল মাফাতিহ শারহ মিশকাতুল মাসাবিহ মোল্লা আলী কারী আল-হারাওয়ি

৫০২ মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার আলী বিন আল-হুসাইন আল-মাসউদি

৫০৩ মারউইয়াত গাযওয়ায়ে খন্দক ডক্টর ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-মাদখালি

৫০৪ মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার শিহাবুদ্দিন আল-আদাওয়ি আল-কুরাশি

৫০৫ মুস্তাখরাজ আবি আওয়ানা আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ইসফারায়িনি

৫০৬ মুসনাদে আহমাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

৫০৭ মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা আবু বকর ইবনে আবি শায়বা

৫০৮ মুসনাদে ইবনুল জা'দ আলী ইবনুল জা'দ আল-জাওহারি

৫০৯ মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি আবু দাউদ সুলাইমান বিন দাউদ তায়ালিসি

৫১০ মুসনাদে আবি আওয়ানা আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-ইসফারায়িনি

৫১১ মুসনাদে আবি ইয়ালা আবু ইয়ালা তামিমি আল-মাওসিলি

৫১২ মুসনাদুল বাযযার (আল-বাহরুয যাখখার) আবু বকর আল-আতকি আল-বাযযার

৫১৩ মুসনাদুল হারিস (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াইদি মুসনাদিল হারিস) আল-হারিস ইবনে আবি উসামা ও নূরুদ্দিন হাইসামি

৫১৪ মুসনাদুল হুমাইদি আব্দুল্লাহ বিন আয-যুবাইর আল-হুমাইদি

৫১৫ মুসনাদুর রুয়ানি আবু বকর মুহাম্মদ বিন হারুন আর-রুয়ানি

৫১৬ মুসনাদুশ শামিয়্যেন আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৫১৭ মুসনাদুল ফারুক হাফিজ ইবনে কাসির

৫১৮ মুসনাদুশ শাফেয়ি মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ-শাফেয়ি

৫১৯ মুসনাদুশ শিহাব আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হাকমুন আল-কুদায়ি

৫২০ মাশাহিরু উলামাইল আমসার ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি

৫২১ মুসতাহল হাদিস মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

তারিখ উম্মাতে মুসলিমা

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

৭১ হিজরী ২৯ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

২০৯ হিজরী ১ ওয়াজারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াহ, সৌদি আরব ১৪১৮ হিজরী

২৯৩ হিজরী ১ হাদিস একাডেমি, ফয়সালাবাদ ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৯৩ হিজরী ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

২৫৩ হিজরী ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়াহ, দামেস্ক ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৫৩ হিজরী ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়াহ, দামেস্ক ১৪৩৩ হিজরী - ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

১০১৩ হিজরী ৯ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২২ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৬ হিজরী ৫ আল-জামিআতুল লুবনানিয়াহ ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি বিল জামিআতিল ইসলামিয়াহ, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ ১৪২৩ হিজরী

৭৩৯ হিজরী ২৭ মাজমাউশ শায়খ, আবু ধাবি ১৪২৩ হিজরী

৩১২ হিজরী ২০ আল-জামিআতুল ইসলামিয়াহ, সৌদি আরব, মদিনা ১৪৩৫ হিজরী - ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

২২১ হিজরী ৪৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২১ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৫ হিজরী ২ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

২৩০ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতু নাদির, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

২০৪ হিজরী ৪ দারু হাজার, মিশর ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩১৬ হিজরী ৫ দারুল মারিফাহ, বৈরুত উল্লিখিত নেই

৩০৭ হিজরী ১৩ দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৯২ হিজরী ১৮ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

২৮২ হিজরী - ৮০৭ হিজরী ২ মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ, আল-মদিনা ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

২১৯ হিজরী ২ দারুন নাফায়েস, সিরিয়া ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৭ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুল কুরতুবাহ, কায়রো ১৪১২ হিজরী

৩৬০ হিজরী ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৩ হিজরী ২ দারুল ওয়াফা, মানসুরাহ ১৪১১ হিজরী - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

২০৪ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪০০ হিজরী

২৫৩ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

২৫৩ হিজরী ১ দারুল ওয়াফা, মানসুরাহ ১৪১১ হিজরী - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

১৩২১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল ইলম ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মুসতাহাহ আল-হাদিস (মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন) ৫২২

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ) ৫২৩

নোট: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ-এর পুরনো সংস্করণটি ১৫ খণ্ডে এবং এতে হাদিস নম্বরও নতুন সংস্করণ থেকে আলাদা, অর্থাৎ মাকতাবাতুল রুশদ-এর নতুন সংস্করণে মোট হাদিস সংখ্যা ৩৭,৯৩৩টি, যেখানে ১৫ খণ্ডের সংস্করণে মোট হাদিস সংখ্যা ৩৯,০৯৮টি।

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক মা'আ জামে' মা'মার বিন রাশিদ (আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম) ৫২৪

মাসাহ আলাল খুফফাইন ফিল উসুল ওয়াল ফুরু' (ডক্টর আলী বিন হামিদ আল-সালুস) ৫২৫

মা'আরিফুল হাদিস (মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী) ৫২৬

মা'আরিফুল কুরআন (মুফতি মুহাম্মদ শফি) ৫২৭

মুয়ামালাতু গায়রিল মুসলিমিন ফিল মুজতামা' আল-ইসলামি (ডক্টর এদুয়ার গালি আদ-দাহাবি) ৫২৮

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আল-সাল্লাবি) ৫২৯

মু'জাম ইবনে আল-আরাবি (আবু সাঈদ ইবনে আল-আরাবি) ৫৩০

মু'জাম আল-উদাবা (ইরশাদুল আরিব ইলা মা'রিফাতিল আদিব) (ইয়াকুত আল-হামাভি) ৫৩১

মু'জাম আল-উদাবা (ইরশাদুল আরিব ইলা মা'রিফাতিল আদিব) (ইয়াকুত আল-হামাভি) ৫৩২

মু'জাম আল-বুলদান (ইয়াকুত আল-হামাভি) ৫৩৩

মু'জাম আস-সাহাবা (আবুল কাসিম আল-বাগাওয়ি) ৫৩৪

মু'জাম শুযুখ আত-তাবারী (আকরাম বিন মুহাম্মদ আল-আসারি) ৫৩৫

মু'জাম মা ইস্তা'জাম মিন আসমাইল বিলাদ ওয়াল মাওয়াদি' (আবু উবায়দ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি) ৫৩৬

মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার (আবু বকর আল-বাইহাকি) ৫৩৭

মা'রিফাতুস সাহাবা (আবু নুয়াইম আল-আসফাহানি) ৫৩৮

মা'রিফাতুল কুররা আল-কিবর (হাফিজ জাহাবি) ৫৩৯

মাগাজি (মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি) ৫৪০

মুফাররিজুল কুর'ব ফি আখবারি বানি আইয়ুব (ইবনে ওয়াসিল আল-হামাভি) ৫৪১

মাকাতিল আত-তালিবিয়্যিন (আবুল ফারাজ আল-আসফাহানি) ৫৪২

মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লিন (আবুল হাসান আল-আশআরি) ৫৪৩

মাকামে হুসাইন ও ইয়াজিদ (মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আলভি) ৫৪৪

মাকামে সাহাবা (মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানি) ৫৪৫

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

১৩২১ হি. ১ মাকতাবাতুল আলাম, কায়রো ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৩৫ হি. ৭ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪০৯ হি.

২১১ হি. ১১ আল-মজলিসুল ইলমি, পাকিস্তান ১৪০৩ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল ফযীলাহ, রিয়াদ ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৩১৭ হি. - ১৮৯৯ খ্রি.

.

দারুল ইশাআত, করাচি ২০০৭ খ্রি.

১৩৯৬ হি. - ১৯৭৬ খ্রি. ৮ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতু গারীব ১৯৯৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল আন্দালুস, মিশর ১৪২৯ হি. - ২০০৮ খ্রি.

৩৪০ হি. ৩ দারু ইবনে জাওয়াযী, সৌদি আরব ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৬২ হি. ৭ দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৬২ হি. ৫ দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৬২ হি. ৭ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

৩১৮ হি. ৫ মাকতাবাতু দারুল বায়ান, কুয়েত ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ আদ-দারুল আসারিয়্যাহ, জর্ডান ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৪৪৭ হি. ৪ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হি.

৪৫৮ হি. ১৫ দারুল ওয়াফা, কায়রো ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

২৩০ হি. ৭ দারুল ওয়াতান লিন-নাশর, রিয়াদ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭৩৮ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২০৭ হি. ৩ দারুল আন্দালুস ১৪০৯ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.

৭৯৭ হি. ৫ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক আল-কাওমিয়্যাহ, কায়রো ১৩৯৭ হি. - ১৯৭৭ খ্রি.

৩৯৬ হি. ১ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৩২ হি. ২ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মজলিস দাওয়াতুল হক, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

১৩৯৬ হি. - ১৯৭৬ খ্রি. ১ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি ২০০৫ খ্রি.

তৃতীয় অংশ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

- মুকাদিমা যাহরুর রুবা আলা সুনানিন নাসায়ী আল-মুজতাবা — জালালুদ্দিন সুয়ুতী ৫৪৬
- মাকতুবাত মুজাদ্দিদে আলফে সানি (উর্দু অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ জাওয়ার হুসাইন শাহ) — শেখ আহমদ সিরহিন্দি ৫৪৭
- মিন কালামি আবি যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মঈন বি-রিওয়ায়াতি তাহমান — ইয়াহইয়া বিন মঈন ৫৪৮
- মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি — হাফেজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবী ৫৪৯
- মানাকিব আবি হানিফা কারদারী — মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল-কারদারী ৫৫০
- মানাকিব আবি হানিফা মাক্কী — মুওয়াফফাক বিন আহমদ আল-মাক্কী আখতাব খাওয়ারিজম ৫৫১
- মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়াহ — আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী ৫৫২
- মিনহাজুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন ফিল ফিকহ — ইমাম শরাফ আন-নববী ৫৫৩
- মিনহাজুল মুহাদিসীন ফিল কারনিল আউয়ালিল হিজরি হাভা আসরিনাল হাদির — আলী আব্দুল বাসিত মজিদ ৫৫৪
- মানহাজুস সালিকীন ওয়া তাওদীহুল ফিকহ ফিদ দ্বীন — আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-সাদী ৫৫৫
- মুয়াত্তা ইমাম মালিক — ইমাম মালিক বিন আনাস ৫৫৬
- মুজাযুত তারিখ আল-ইসলামী — আহমদ মাহমুদ আল-আসীরী ৫৫৭
- মাওসুআতু আকওয়াল আহমদ বিন হাম্বল (একদল লেখকের সংকলন) — আহমদ বিন হাম্বল ৫৫৮
- মাওসুআতু আকওয়াল আদ-দারাকুতনী ফী রিজালিল হাদীস ওয়া ইলালিহি (একদল লেখকের সংকলন) — আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী ৫৫৯
- মাওসুআতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাহ ওয়াল মানহাজ ওয়াত তারবিয়াহ — আবু সাহল মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-মাগরাবী ৫৬০
- মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল — শামসুদ্দিন আয-যাহাবী ৫৬১
- {হরফ ন}**
- আল-নিবরাস আলা শারহিল আকাইদ — আব্দুল আজিজ ফারহারী মুলতানী ৫৬২
- আন-নুজুম আয-যাহিরাহ ফী আহওয়ালি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ — ইউসুফ বিন তাগরি বারদী ৫৬৩
- আন-নুকাত আলা মুকাদিমা ইবনুস সালাহ — বদরুদ্দিন আয-যারকাশী আশ-শাফেয়ী ৫৬৪
- আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ — ইবনে হাজার আল-আসকালানী ৫৬৫
- নাসিবিয়াত তাহকীক কে ভেস মে — মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী ৫৬৬
- নবীয়ে রহমত ﷺ — সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী ৫৬৭
- নুখবাতুল ফিকার — হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ৫৬৮
- নুযহাতুল মুশতাক ফী ইখতিরাকিল আফাক — আশ-শরীফ আল-ইদরীসী আত-তালিবি ৫৬৯
- নাসাব কুরাইশ — মুসআব বিন আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী ৫৭০
- নাফহত তীব মিন গুসনিল আন্দালুস আর-রাতীব — শিহাবুদ্দিন আল-মাক্কারী ৫৭১
- নুকুশ রাসূল নম্বর ২য় খণ্ড প্রবন্ধ: সীরাতুন নবী তাওকীত কি রোশনি মে — মাওলানা ইসহাক আন-নবী আলভী (রামপুর, ভারত) ৫৭২

তারীখে উম্মতে মুসলিমা - ৩য় খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশকাল

৯১১ হিজরী ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

১০৪৩ হিজরী ৩ ইদারা মুজাদ্দিদিয়া, করাচি উল্লেখ নেই

৪৩৩ হিজরী ১ দারুল মামুন, দামেস্ক উল্লেখ নেই

৭৪৮ হিজরী ১ লাজনাতু ইহয়ায়িল মাআরিফ আন-নুমানিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩০৮ হিজরী

৮৩৭ হিজরী ২ মাকতাবা নিজামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হিজরী

৫৬৯ হিজরী ২ মাকতাবা ইসলামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩৬১ হিজরী

৭২৮ হিজরী ৯ জামিয়া ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৭ হিজরী ১ দারুল ফিকর ১৪২৫ হিজরী - ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

১৩৭৬ হিজরী ১ দারুল ওয়াতান ১৪২১ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৯ হিজরী ৬ মুয়াসসাসাতু জায়েদ বিন সুলতান আল-ইমারাত ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩
খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩১ হিজরী ৪ দারুল নাশর, আলমুল কুতুব ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৫ হিজরী ২ আলমুল কুতুব ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১০ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৪৮ হিজরী ৪ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৩৮২ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

হরফ ন

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশকাল

১২৩৯ হিজরীর পর ১ মাকতাবা রশীদিয়া, কোয়েটা উল্লেখ নেই

৮৭২ হিজরী ১৬ দারুল কুতুব, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৯৪ হিজরী ৩ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ২ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, সৌদি আরব ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুত তাকওয়া, লাহোর উল্লেখ নেই

১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরী ১ দারুল হাদিস, কায়রো ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৫৬০ হিজরী ২ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৩০৯ হিজরী

৪৩২ হিজরী ১ দারুল মাআরিফ, কায়রো উল্লেখ নেই

১০৪ হিজরী ৮ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

.

১৩ মুদির: মুহাম্মদ তুফায়েল - ইদারা ফুরোগে উর্দু, লাহোর ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখক

- ৫৭৩. নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব — শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি
- ৫৭৪. নিহায়াতুল আরাব ফি মারিফাতি আনসাবিল আরব — আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি
- ৫৭৫. নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাজহাব — আবুল মাআলি ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি
- ৫৭৬. নাহজুল বালাগাহ — সাইয়েদ শরীফ রায়ী
- ৫৭৭. নাওয়াদিরুল খুলাফা (আলামুন নাস বিমা ওয়াকাতা লিল মাক্কা মাতা বনী আব্বাস) — মুহাম্মদ দিয়াব আল-ইতলিদি
- ৫৭৮. নূরুল আবসার ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — মাওলানা হাফিজুর রহমান সিউহারভি

- ৫৭৯. নাইলুল আওতার — মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানি

{বর্ণ ও}

- ৫৮০. আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত — সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি
- ৫৮১. আল-ওয়াসিত ফিল মাজহাব — আবু হামিদ আল-গাজালি
- ৫৮২. আল-ওয়াফায়াত — ইবনে কুনফুয
- ৫৮৩. ওয়াসিলাতুল ইসলাম বিন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম — ইবনে কুনফুয আল-কুসান্তিনি
- ৫৮৪. ওয়াসায়াল উলামা ইনদা হুজুরিল মাউত — ইবনে যবর আর-রাবি
- ৫৮৫. ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা — আলী বিন আবদুল্লাহ আস-সামহুদি
- ৫৮৬. ওয়াফায়াতুল আইয়ান — ইবনে খাল্লিকান
- ৫৮৭. ওয়াকাতু সিফফিন — নাসর বিন মুযাহিম

{বর্ণ হ}

- ৫৮৮. আল-হিদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদি — বুরহানুদ্দিন মারগিনানি
 - ৫৮৯. হাদিয়াতুল আরিফিন — ইসমাইল বিন মুহাম্মদ সালিম আল-বাবানি আল-বাগদাদি
- {বর্ণ ই}
- ৫৯০. আল-ইয়াহুদ ফিল আলামিল কাদিমি — ডক্টর মুস্তফা কামাল আব্দুল আলিম
 - ৫৯১. আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াদ দুরার শারহ নুখবাতিল ফিকার — আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

৭৩৩ হিজরী ৩৩ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়া, কায়রো ১৩২৩ হিজরী

৮২১ হিজরী ১ দারুল কিতাব আল-লুবনানি ১৪০০ হিজরী - ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ২০ দারুল মিনহাজ ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩৬ হিজরী ৪ আল-মাতবাতা আল-আদাবিয়া, বৈরুত ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ হিজরী শতাব্দী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ১৪২৫ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মা'হাদুত তামসিল আল-ইসলামি উল্লেখ নেই

১২৫০ হিজরী ৮ দারুল হাদিস, মিশর ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

হরফ 'ও'

৭৬৩ হিজরী ২৯ দারু ইহয়ায়িত তুরাস ১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৫০৫ হিজরী ৭ দারুস সালাম, কায়রো ১৪১৭ হিজরী

৮১০ হিজরী ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮১০ হিজরী ১ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৯ হিজরী ১ দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৫৯১ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ১৪১৯ হিজরী

২৮১ হিজরী ৭ দারু সাদির ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

২১২ হিজরী ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

হরফ 'হ'

৫৯৩ হিজরী ৪ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবি উল্লেখ নেই

৩৯৯ হিজরী ২ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

হরফ 'ই'

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

১০৪১ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

গবেষণা:

মুআররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (মাদাজিল্লুহ)

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-৬, গুলিস্তান-এ-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

গবেষণা:

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

আল-মুহান্নাদ পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ / ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখ-এ-উম্মতে মুসলিমা

চতুর্থ খণ্ড

গবেষণা:

মুয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদাজিল্লুহু

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-এ-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩৩৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

তাহকীক:

মুয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদাজিল্লুহ

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

গবেষণা:

মুওয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদাজিল্লুহ

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-জাওহার, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের ছয়টি খণ্ড এক নজরে

.

ইতিহাসের মূলনীতি, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সামাজিক ও তাম্রদুনী (সাংস্কৃতিক) মূল্যবোধের বর্ণনা, সীরাতে নববী ﷺ-এর ঘটনাবলি, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (আবুবকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও উসমান গনির খিলাফত), উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের পরিচিতি ও পূর্ববর্তী ইতিহাস।

.

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার মূলনীতি, মতপার্থক্যের যুগ, হযরত আলীর খিলাফত, জঙ্গ জামাল (উটের যুদ্ধ), জঙ্গ সফফীন, হযরত হাসানের খিলাফত, প্রথম সালতানাত: আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফত, ইয়াজিদ, হযরত ইমাম হুসাইন ও হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের শাহাদাতের প্রেক্ষাপট, অবস্থা ও ঘটনাবলি এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের খিলাফত ও শাহাদাত, বনু উমাইয়ার অবশিষ্ট ইমামগণ, প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমী ও নৈতিক তরবিতকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবিত্গণের পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

.

বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের খিলাফত, আব্বাসী খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহ, আইম্মায়ে আরবা (চার ইমাম) এবং মহান মুহাদ্দিস ও সংস্কারকদের অবদান, বিভিন্ন ফিরকা বা দলের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, বাতিল ফিরকাসমূহের হাকিকত (বাস্তবতা), গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

.

সিলির (Sicily) ইতিহাস, ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, তাতারীদের আক্রমণ, আইয়ুবী সালতানাত, মামলুক সালতানাত, তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার, উপমহাদেশীয় ইতিহাস, উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণের যুগ, আন্দালুসের (স্পেন) ইসলামী রাষ্ট্র (প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুরাবিতুন ও মুওয়াহহিদুন যুগ পর্যন্ত), মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী ইমাম, মুজাদ্দিদ, ফকীহ এবং সুফীগণের সংগ্রামের আলোচনা।

.

আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ও বিলুপ্তি, উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত, ভারতের মুঘল খিলাফত ও সালতানাত, বাবর থেকে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত।

.

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অমুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের ইলমী ও কারিগরি অবদানের ওপর এক নজর।